বঙ্গশ্রী

মাসিক পত্রিকা

C.6-M04252-19- Ro 302454

বিংশ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড

পৌষ, ১৩৫৯—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০

756.3
.002/3

ষাণ্মাসিক সূচীপত্র

19

19

সম্পাদক

শ্রীঅমূল্যভূষণ চট্টোপাধ্যায়, এম্. এ

মেট্রোপলি[illegible]াবলিশিং হাউস লিমিটেড

বিষয় ও লেখক-সূচী

P30244

বিষয়	লেখক	
প্রবন্ধ		
অশ্বিনীকুমার দত্তের গান	রণজিৎকুমার সেন	৫৫
আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কয়েকখানি পরিপূরক গ্রন্থ	দীপঙ্কর গুপ্ত	৫৪৭
উপরে জাহাজ চলে নিচে চলে নর (সচিত্র)	প্রভাতকুমার গোস্বামী	৩৫১
উনিশ শতকে বাংলার ...-আন্দোলন	অংশুরঞ্জন সেন	২৬৫
ঐতিহাসিক বিনয় সরকার (সচিত্র)	শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়	৯৭
কবি নজরুল	বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়	৪৯৯
কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ	শ্রীমন্মথ নাথ ঘোষ	২৮৩
কবি সূর্য্যোপস্থান (সচিত্র)	শ্রীশ্যামাপদ ঠাকুর	৩৯৫
কৃষ্ণচরিত্রের গোড়ার কথা	শ্রীকালিদাস রায়	২৩১
কোম্পানীর আমলে সরকারী প্রাসাদ ও ইমারৎ বাটী (সচিত্র)	শ্রীসোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩১৪
গুরু নানক	জ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৫৭
গুর্খাযুদ্ধের পটভূমিকা	অধ্যাপক সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৬৯
চিরশিশু রবীন্দ্রনাথ	শ্রীঅনুরূপা মুখোপাধ্যায়	৩৮৪
জনকল্যাণে সৌরশক্তি	শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত	১৪৩
জয়দেব মেলা	জামালউদ্দীন আমেদ	২৯৮
জালিয়ান্‌ওয়ালাবাগের স্মৃতি (সচিত্র)	রণজিৎ কুমার সেন	৪০৪
টি, এস্, এলিয়টের জীবনদর্শন (সচিত্র)	শ্রীসুনীল চন্দ্র বসু	৫০৮
তাজমহল (সচিত্র)	কল্যাণ কুমার দাশগুপ্ত	৫১৪
তেইশে জানুয়ারী (সচিত্র)	সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	১৭
ত্রিনাথের পাঁচালী (সচিত্র)	রণজিৎ কুমার সেন	২
ধর্ম্মমঙ্গলকাব্যে সেকালের বাংলা		

বিষয়	লেখক
পণ্ডিত শীলভদ্র ও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় (সচিত্র)	শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়
প্রথম মুক্তিযজ্ঞের ঋত্বিক তাত্যা টোপে	বাণীকুমার
বন্দেমাতরম ও যুবক বাংলা	অধ্যাপিকা উমা মুখোপাধ্যায়
বর্ত্তমান চীনে নারীপ্রগতির মূল উৎস	মনোরঞ্জন বড়াল
বাংলার প্রাচীন যাত্রা	বিদ্যুৎ মিত্র
বাঙালীর হার-জিত	শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব
বিদ্রোহ ও শরণাগতি	জ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
বৌদ্ধ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য শিল্পের অঙ্কুর (সচিত্র)	অসীম মুখোপাধ্যায়
ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (সঙ্কলন)	
ভারতের বহির্বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতি	শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
মহামণি কোহিনুর	শ্রীতারিণীশঙ্কর চক্রবর্তী
মোহিতলাল মজুমদারের কথা (সচিত্র)	হরপ্রসাদ মিত্র
ম্যাগিয়ারদের দেশ (সচিত্র)	সুরেশচন্দ্র ঘোষ
যাত্রা ও বাঙলা	চুনীলাল গঙ্গোপাধ্যা...
রবীন্দ্রনাথের 'দুই বোন'	শ্রীতারক ঘোষ
রবীন্দ্র নামা	প্রফুল্ল রায়
... ফন্ বিটোফেন (সচিত্র)	শক্তিপদ রাজগুরু
...(সচিত্র)	বিনয়কুমার রায়
...কুটির শিল্প	শ্রীকুমুদবন্ধু সেন
...(সচিত্র)	দীপঙ্কর গুপ্ত
	রাণা বসু
	ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত

বিষয়	লেখক	
...নৃত্যনাট্য	শ্রীজয়দেব রায়	১৬৪
...াচক রামেন্দ্রসুন্দর (সচিত্র)	শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তী	২৪২
...সাধক ব্রজেন্দ্রনাথ (সচিত্র)	শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র	১৫২
...ত্য কল্পনা ও বাস্তব	শ্রীরাইহরণ চক্রবর্ত্তী	২৫২
...ত্যর কথা	অজিত দত্ত	৪১৩
...ত্যর দান	বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়	১৯৩
...নে হাফিজ	নরেন্দ্র দেব	২০২
	গল্প	
...াক-চরিত কথা	শ্রীগৌতম সেন	৫২৪
...ত	ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৮২
...ব রাতি শেষে	জেমস্ জয়েস্। অনুবাদ— শ্রীতন্ময় বাগ্‌চী	৫৩৩
...য়ার কালাপাহাড়	শ্রীরামনাথ বিশ্বাস	৫৯
...প্টেন ইউসুফ হাসান:		
...শঙ্খচুড়	সমর চট্টোপাধ্যায়	১৫৭
...ল	সমীর ঘোষ	৪৭৭
...	শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	২৫৯
...বালি	শচীন ভৌমিক	৫০২
	চার্লি চ্যাপ্‌লিন। অনুবাদ—আনন্দ দে	৫১২
...ল	মানস রায় চৌধুরী	৪৪৫
... ঘুঘু	দক্ষিণারঞ্জন বসু	৩২২
...	হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	১৯৭
...াবৃত্তি	অনিলকুমার ভট্টাচার্য্য	৩৭৮
...ব	শ্রীঅখিল নিয়োগী	৪০৮
...র	শ্রীবিমলকুমার ঘোষ	৩৪৬
...নুচে সোবেগ	—ইসাক লোয়েব পার্জ্জ অনুবাদ—অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২৯৫
...া কান্না	নেপাল মুখোপাধ্যায়	৪৩৪
...াবশেষ	সমীরকুমার মুখোপাধ্যায়	১০৮
...নর মানুষ	শ্রীজনরঞ্জন রায়	

বিষয়	লেখক	
মিংমা দোরজে	অচেনা	৩৪৪
মুখোস	শিবদাস চক্রবর্ত্তী	২৩৩
রায়	অক্ষয় কুমার চক্রবর্ত্তী	৩৩৩
সমাধি সৌধ	শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল	৬
সমীক্ষা	উমারঞ্জন চক্রবর্ত্তী	১৩৩
স্বপ্ন	চুং-চান-ইয়ে—অনুবাদ— প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১৭
হার	সন্তোষকুমার অধিকারী	২১৫
উপন্যাস		
অদ্বিষ্ট	প্রভাত দেব সরকার	৩৪, ১২২, ২০৫, ৩৩০, ৪১৫, ৪৯২
অয়েল	আপ্‌টন সিন্‌ক্লেয়ার অনুবাদ—যতীশ বেদজ্ঞ	১৩৯, ২৩৫, ৩২৭, ৪৪২, ৫১৭
পান্থপাদপ	শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী	৪৯, ১৪৬, ২২৫, ৩০৪, ৩৯৭
প্রতিবিম্ব	শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার	৬৭, ১৬৮, ২৪৭, ৩৪৬, ৪৫৫, ৫৩০
নাটক		
নাগ	মানবেন্দ্র পাল	২৭
কবিতা		
অন্য পৃথিবী চেয়ে	কল্যাণ সেনগুপ্ত	৩৩৬
অবগুণ্ঠন খোল	হীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়	১৩২
অভিযাত্রী	বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত	১০৪
অমর্ত্য প্রেম	প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়	৩৫৩
আগে চলার গান	শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত	৮৮
আবেশ	মৃণালকান্তি দাশগুপ্ত	৩৮২
অ্যাক্সিডেন্ট	সুনীলকুমার নন্দী	৩৩২

বিষয়	লেখক	
উদ্বোধন	শ্রীআশুতোষ সান্যাল	১৪৫
এই তো	সুজিতকুমার নাগ	২৩৮
একটি তারা	নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫৬
একটি সোনালী স্বপ্ন	হিরন্ময় মুখোপাধ্যায়	৫৮
কতদিন বলো	মণিকা দে	৫৪৬
কংকাল	শ্রীপ্রভাকর মাঝি	৫২৩
কবিতায় আছে ভুল	শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৪
নীড়	কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত	৪৫
নাকাছি	মানস রায় চৌধুরী	২৬
[illegible]	শান্তশীল দাশ	৫২০
চকিত বিস্ময়	আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	৩৩০খ
আশা	প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়	২১৯
টির পাষাণ	শ্রীশিবদাস চক্রবর্ত্তী	৪৮
শেষ	শ্রীকরুণাময় বসু	৩৪৩
কথার মালা	সুশীলকুমার গুপ্ত	৪১৪
য় চিনেছি	অনিলেন্দু চক্রবর্ত্তী	২১০
রের ডাক	শ্রীকৃতান্ত নাথ বাগচী	৫১১
বৈশাখ	শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	৩৮৩
মুক্তি	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	১৩৮
বর্ত্তমান ও অতীত	শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	১৭৪
বসন্তের কুহু	শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	২৫৬
বিবেকানন্দের ছবি	সন্তোষকুমার অধিকারী	১৬
বৈশ্য যুগ	শ্রীসুধীর গুপ্ত	৩৩২
ভগ্ন তবি	শ্রীসুধীরকুমার সেনগুপ্ত	৫০৭
মধ্যাহ্নে	সুধীর বসু ঠাকুর	
মুক্তি স্বাক্ষর	অসীম সোম	
মুহূর্ত্তের গান	অরুণবরণ চক্রবর্ত্তী	
মৃত্যুই অমৃত করে দান	শ্রীকালীপদ চক্রবর্ত্তী	
যাযাবর	সুগৌতম	
রবীন্দ্রনাথ	শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	
রবীন্দ্র-স্মরণে	সনৎকুমার মিত্র	
রূপ ও গুণ	অমূল্যরতন দাশ	
লেখনী	শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত	২
শুকতারাসম-যে ফুল তোমার বুকের আঁচলে ঢাকা	শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	
শেষ কথা	ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	
শেষ কবিতা	সনৎকুমার মিত্র	২২
সংক্ষোভ	সুবোধ কুমার গুপ্ত	৫
সঞ্চার	বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত	৪০
সুন্দরের আহ্বান	শ্রীআশুতোষ সান্যাল	৪১
সূর্য্যাস্ত	শ্রীকরুণাময় বসু	
সে কথাটি	অরুণবরণ চক্রবর্ত্তী	
স্বদেশ	রণজিৎকুমার সেন	১৫
স্বপ্নসমাধি	জগদিন্দ্রচন্দ্র বসু	৬
হেমন্তের কান্না	রমেন মৈত্র	
হে রুদ্র ভয়াল জাগো	শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী	২৬

পুস্তক ও আলোচনা—৬৭, ১৯২, ২৬৮, ৩৬০, ৪৫৮, ৫৫

সম্পাদকীয়—৮৯, ১৮১, ২৬৯, ৩৬১, ৪৫৯, ৫৫১

বিংশ বর্ষ | পৌষ—১৩৫৯ | ২য় খণ্ড—১ম সংখ্যা

বিদ্রোহ ও শরণাগতি

জ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

নোবেল প্রাইজ সম্মানিত Johan Bojerএর Great Hunger অতুলনীয় কীর্ত্তি।

দুই ভাই—ফার্ডিন্সাণ্ড হোম ও পীয়র হোম—উভয়েই অক্লান্তকর্ম্মী, সাহসী, চরিত্রবান। আত্মবিশ্বাসী, দৃঢ়চেতা—সুতরাং অর্থের অভাব নাই। গতিবাদী ফার্ডিন্সাণ্ড একান্ত বাস্তবপন্থী, পার্থিব উন্নতিমাত্রই তাহার লক্ষ্য। কলকারখানার দ্বারা ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যা দেশ বিদেশ ভরিয়া তুলুক, এই তাহার অভিলাষ; মানবের শক্তি বিশ্ববিজয়ে যাত্রা করিয়াছে, বিশ্বজয়েব অবসানে নব নব গ্রহ ও অনন্ত সৌরজগৎ বিজ্ঞানের সাহায্যে ক্রমশঃ মানুষের অধীন হইবে—ইহা তাহার দৃঢ়বিশ্বাস। এক অদম্য বিশ্বব্যাপিনী ইচ্ছা-শক্তি (world will) এই গতির উৎসস্বরূপ। সুখ মিথ্যা শান্তি মিথ্যা—এই ইচ্ছাশক্তির বলে শত বিপর্য্যয়েব মধ্যেও মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া মানুষ বলিতে পাবে, মানুষের অস্তিত্বই নাই—শুধু এই ইচ্ছাশক্তিই নিত্য, সত্য ও শাশ্বত।

শান্তিবাদী পীয়রের মতে শুধু গতিবাদের দ্বারা প্রকৃত সুখ বা শান্তি আসিবে না; তথাপি মানুষ কলকারখানা'র মতো নীরস ও অত্যধিক বস্তুতান্ত্রিক না হইয়া, অধ্যাত্মচিন্তায় ডুবিয়া না' গিয়া, বিপুল বিশ্বে কর্ম্মজীবনে বাঁচিয়া থাকুক—এই তাহার মতবাদ। ভাগ্যবিপর্য্যয়ে একদিন উন্নতিব শিখর হইতে দারিদ্র্যের বীভৎসার মধ্যে পীয়র নিপতিত হইল। প্রাণাধিক পত্নী ও নিজে দারুণ রোগে জীর্ণ হইতে লাগিল—পরম আদরের শিশু কন্যাটিকে প্রতিবেশীর এক দুরন্ত কুকুর টানিয়া ছিঁড়িয়া বিনাশ করিল; অন্নাভাবে অনটনে সংসারযাত্রা অচল হইল; নিতান্ত নিরুপায় হইয়া কোনমতে নির্জ্জনে একদিন একা নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতের সানুদেশে ভূমিশয্যা বিছাইল।

যাটনহীম পর্ব্বতের উপত্যকার উপর দিয়া সারাদিন তুষারবিধৌত হিমপ্রবাহ রহিয়া রহিয়া বহিয়া যাইতেছে—যেন মুক্ত উদার আকাশতলে গিরিরাজ নির্জ্জনে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিতেছে। দেহে মনে ক্লান্ত, রিক্ত, অভুক্ত দগ্ধ শোকাহত পীয়ব হোম্‌স্ বারম্বার দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিয়া ঔষধের মতো সেই বায়ুপ্রবাহ পান করিতেছে। ক্ষীণ-কণ্ঠে অকস্মাৎ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—

"বাঁচাও আমায় বাঁচাও, হে বাতাস, হে আলোক, হে নির্জ্জনতা, আমায় আবার সুস্থ ও কর্ম্মক্ষম করিয়া দাও—আমার যে কিছুই নাই—কাজই আমার ধর্ম্ম. আমার জীবন!"

অদ্রিরাজির উপরে দূরে মহাশূন্যে অনড় অচল সীমাহীন নীলসমুদ্রকন্দরের গভীরে অনন্ত প্রশান্তি! পীয়রের মনে হইল, এই অপরিমেয় মহান্‌ সৌন্দর্য্যের প্রাণকেন্দ্রে এমন কি কেহ আছে, যে পৃথিবীর মনুষ্যের কথা ভাবিয়া থাকে? তুমি বলিবে, নাই। কিন্তু অন্তরের ক্ষুদ্রতম প্রার্থনা ওখানে কেমন করিয়া পৌছায়?

বাঁচাও আমায় বাঁচাও! ওরে, তুই আমায় বাঁচিয়ে দে! তুই! তুই কে? ওরে তুই সেই—যে সব শুনছিস্।

ওরে. তুই কি শুনতে পাচ্ছিস্? যদি তোর দয়া হয়, এই ধরণীর শতসন্তাপ-জর্জ্জর মানবরূপ দূলিকীটের প্রতি, তবে আমায় রক্ষা কর্!

একদিন চাহিয়াছিলাম বিরাট কর্ম্মসমুজ্জ্বল জীবন, যাহাতে প্রবল আকারে কর্ম্ম গভীরে গরজিয়া চারিধার ঘিরিয়া থাকে—যাহাতে শাশ্বত সত্যের প্রতি আকর্ষণ স্তিমিত হইয়া যায়! আজ আমার ভুল বুঝিয়াছি—অহঙ্কার ও মাৎসর্য্যবশে ঐরূপ চাহিয়াছিলাম। আজ আমি অনুতপ্ত—মুক্তকণ্ঠে দোষ স্বীকার করিয়া অকপটে তোর কাছে ক্ষমাভিক্ষা করিতেছি। ওরে দয়া কর্, দয়া কর্, আমায় মানুষের দাসানুদাস করে দে—যা'তে আমি খেটেখুটে কোনমতে স্ত্রী পুত্রের মুখে অন্ন দিতে পারি। ওরে, তুই কি শুনতে পাচ্ছিস্?

বল্ দেখি, কী নামে তোকে ডাকব?—তুই যে কোটি নামধারী—অনির্ব্বচনীয়—যদি শুনতে পাস্ বলে' দে স্বর্গে কেহ কি আছে, যে অন্ধ নিয়তির লাঞ্ছনাক্লিষ্ট অসহায় মানুষের আর্ত্তনাদে খুসী হয়?

একা। মনে হইতেছে, যেন অস্তিত্বের শেষ সীমায় পৌছিয়াছি—সূর্য্য চন্দ্র তারা সব নিবিয়া গিয়াছে—তুষারশীতল অন্ধকার ও নিদারুণ শূন্যতায় আমি যেন ডুবিয়া গিয়াছি।

কেমন করিয়া জানিনা—ধীরে অতি ধীরে সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলাম। ক্রমে ক্রমে মনে হইতে লাগিল, সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া যাই নাই—কিছু যেন বাকি আছে। অন্তরের গহনে যেন এক অদম্য ক্ষীণ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অনুভব করিলাম—তাহার ক্রমবর্দ্ধমান জ্যোতিঃ যেন আমায় নবজীবন দান করিয়া শাশ্বত ইচ্ছাশক্তি ধীরে ধীরে উন্মেষিত করিয়া আলোয় আলোয় ভরিয়া দিল।

একটু বল পাইলাম।

বুঝিতে পারিলাম—নিষ্করুণ অন্ধ নিয়তি মানুষের সব কিছু কাড়িয়া লইতে পারে, কিন্তু এমন একটি অনির্ব্বচনীয় বস্তু অবশিষ্ট থাকিবে যাহা অপরাজেয়, অব্যয়। জানি, একদিন এই নবদেহ পঞ্চভূতে মিশাইবে, সকল শক্তির অবসান হইবে—তথাপি বিলীয়মান অস্তিত্বের কোন্ গোপন মণিকোঠায় এক অনির্ব্বাণ আত্মার স্ফুলিঙ্গ ধারণ করিয়া চলিয়াছি—যাহা চিরকল্যাণময় আলোক ও মিলনের জ্যোতির্ম্ময় বীজাণু—সৃষ্টি এবং সৃষ্টিকর্ত্তার প্রযোজনে নিত্য সনাতন।

হে মানসিক তেজ! হে আত্মা! তুমি ধন্য! মৃত্যু তোমায় আবরিত করিল, তুমি কিন্তু অনন্ত জীবনের স্বপ্ন-জাল বুনিতেছ। হিংসার প্রতিদানে তুমি কিন্তু অনন্ত নিখিলে সেই পরম প্রেমময় ঈশ্বরকে প্রকাশ করিতেছ।

এইরূপে স্বর্গে মর্ত্ত্যে পরিচয় হইয়া গেল পরমেশ্বরকে সৃষ্টি করিবার কার্য্যে ক্ষুদ্র মানব তাহার অংশ গ্রহণ করিল। বিদ্রোহী সন্তান শরণাগত হইয়া দুঃখকে জয় করিল। সম্পূর্ণ বিভিন্ন এক চিত্র Hunger রচয়িতা নোবেল প্রাইজ সম্মানিত Knut Hamsun (4th Aug 1859—18th Feb 1852) আঁকিয়াছেন। বিদ্রোহী সন্তান শেষ পর্য্যন্ত বিদ্রোহী রহিয়া গেল—অবশ্য তাহার পরিণতি লেখক দেখান নাই। শত চেষ্টাতেও অন্নসংস্থান করিতে

না পারিয়া, পদে পদে ব্যাহত হইয়া, বারম্বার ঈশ্বরকে ডাকিয়াও কোন ফল না পাইয়া সে বলিতেছে—যখনই আমি কোন আশ্রয় খুঁজিয়াছি, বাঁচিয়া থাকিবার উপায় চিন্তা করিয়াছি, তোমার চরণে বার বার একমুষ্টি খাদ্যের জন্য কাঁদিয়াছি—তুমি প্রতিবারই আমার সমস্ত চেষ্টা সমস্ত প্রার্থনা নির্দ্দয়ভাবে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছ। আমি তোমার কাছে কী অপরাধ করিয়াছি? যদি তুমি আমাকে তোমার কাছে টানিবার জন্য, আমায় উন্নত করিবার জন্য এইরূপ বারবার আমার কর্ম্মপথে বাধা সৃষ্টি করিতে থাক, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও তুমি ভুল করিতেছ। আমি তোমায় সম্পূর্ণ তুচ্ছ করিয়া বলিতেছি, এই অহেতুক নির্ম্মম নিগ্রহের জন্য তোমার প্রতি আমার ঘৃণা ক্রমশ: বৃদ্ধি পাইতেছে!

কিছুদিন পরে বহুকার্য্যে ব্যর্থমনোরথ হইয়া, অন্ন সংস্থানের কোন উপায় না পাইয়া, অপমানিত লাঞ্ছিত ও নিদারুণ ক্ষুধায় কাতর হইয়া—উন্মত্ত অত্যাচারিত পশুর মতো গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল—শোন শোন স্বর্গস্থ পবিত্র ঈশ্বর—তুমি নাই,তুমি নাই—তোমার অস্তিত্ব আমি অস্বীকার করি, যদি তুমি থাক, তোমায় আমি অভিসম্পাত করিতেছি—তোমার স্বর্গধাম নরকের বহ্নিজ্বালায় জ্বলিয়া উঠুক। আমি স্বেচ্ছায় তোমার দাসত্ব করিতে চাহিয়াছিলাম, তুমি আমায় তাড়াইয়া দিয়াছ, তোমার বিচার নাই, সেই জন্য আমি অনন্তকাল ধরিয়া তোমার দিকে ফিরিব না, আমি অনাহারে মরিতে বসিয়াছি, তবু তোমায় ঘৃণাভরে বলিতেছি, আমি নরকের ক্রীতদাস হইয়া থাকিব, তবু তোমার ইন্দ্রালয়ে স্বাধীন নাগরিক হইতে চাহি না। তোমার স্বর্গধাম পৃথিবীর কতকগুলা বিকৃত মস্তিষ্ক নির্ব্বোধ ও দুর্ব্বলচিত্ত ক্লীবের বিহারভূমি—পৃথিবীর অতি নীচ, ঘৃণিত লম্পট নরনারী যাহারা মৃত্যুকালে নতজানু হইয়া তোমার উদ্দেশে কাঁদিয়াছিল, তাহাদের লইয়া তোমার স্বর্গধাম পূর্ণ করিয়াছ।

আর আমি! আমি তোমার কখনও বিরুদ্ধাচরণ করি নাই, তুমি তাহা ভালরূপেই জান—(যদি তোমার সর্ব্বদ্রষ্টা সংজ্ঞা মিথ্যা না হয়)—তথাপি তুমি আমার উপর অহেতুক কী না ভীষণ নির্য্যাতন করিয়াছ!

শোন, হে স্বর্গমঞ্চস্থিত পরম রমণীয় রাক্ষস! আমার দেহের অণু পরমাণু মন আত্মা সমস্তই তোমার প্রতি বিদ্রূপ ও ঘৃণা প্রকাশ করিতে অস্থির হইয়াছে। আবার শোন, আমার যদি শক্তি থাকিত, আমি প্রত্যেক মানবাত্মাকে, প্রতিটি পুষ্প, পত্র পল্লব ও শিশির বিন্দুকে এই অবজ্ঞার বাণীতে দীক্ষিত করিতাম। তোমার নিদারুণ অযোগ্যতার জন্য তোমাকে ধিক্ শতধিক্। এই মুহূর্ত্ত হইতে তোমার সৃষ্টি তোমার সকল ঐশ্বর্য্য আমি ঘৃণাভরে অস্বীকার করিতাম। তোমার চিন্তা আর মনের কোণেও স্থান দিব না—তোমার নাম আর মুখে আনিব না—শোন আমার শেষ কথা—জীবিত বা মৃত অবস্থায় এই আমার শেষ কথা—আমি তোমার নিকট চিরতরে বিদায় লইতেছি, তোমার নিকট আর ফিরিব না, তোমার দিকে আর চাহিব না—নিজের পথে চলিয়া যাইব।

দুর্ব্বিসহ উত্তেজনায় টলিতে টলিতে ক্লান্ত, অবসন্ন বিদ্রোহী সন্তান ধীরে ধীরে সহর ছাড়িয়া সমুদ্রতীরে চলিয়া গেল—অবশেষে এক মালবাহী জাহাজের অধ্যক্ষের অনুগ্রহে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করিল। কে জানে, হয়ত কোন্ অলক্ষ্য শক্তি তাহাকে এবার কক্ষচ্যুত করিবে না!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই ব্যক্তি প্রথম হইতেই বিদ্রোহী ছিল না; অভিমান হইতে বিদ্রোহ জাগিয়াছে। প্রার্থনার ব্যর্থতায় অভিমান জন্মিয়াছিল। তাহার গতানুগতিক প্রার্থনার মধ্যে ভণ্ডামি ছিল বলিয়া নিজেকেই তিরস্কার করিয়াছে; দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণায় ক্ষুধার তাড়নায় একান্ত কাতর হইয়া বৃথায় বহুবার আবৃত্তির মতো ডাকিয়াছে—Lord my God and father: অকস্মাৎ কোনও সময়ে ক্ষণিক সাহায্য পাইলেই অন্তরের অন্তস্থল হইতে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বলিয়াছে—হে ঈশ্বর, তুমি আছ, তুমি আমার প্রার্থনা শুনিয়াছ। কিন্তু পীয়রের মতো বিশ্বাস বা নির্ভর করিতে পারে নাই—পীয়রের মতো আত্মনিক্ষেপ করিতে পারে নাই।

এই দুই অপরূপ সৃষ্টি বিশ্বসাহিত্যকে লাবণ্য দিয়াছে। নরনারীর মনের ভাষা রূপ পাইয়াছে। বিশ্বাস ও অবিশ্বাস নির্ভর ও সংশয়ের দ্বন্দ্ব চিরপুরাতন, চিরস্থায়ী। কারণ বধির যবনিকা তুলিয়া কবির প্রার্থনা মতো প্রভু কখনও

তাঁহার আলোক লোক দেখাইবেন না। ইংরাজ কবির আকুল প্রার্থনায় অদৃষ্টলিপি পরিদৃশ্যমান হইবে না।

"Great Destiny, the commissary of God,
That hast mark'd out a path and period
For everything !......Thou
Knot of all causes! Thou, whose changeless brow
Ne'er smiles nor frowns ! O ! Vouchsafe thou to look
And shew my story in they eternal book."

My story পূর্ব্ব হইতে জানিতে পারিলে পৃথিবীর মানুষ স্থাণুবৎ স্তম্ভিত ও অচল হইয়া পড়িত। এই বিশ্ব-সংসার ধ্বংস হইয়া যাইত। তাই এই পরম জিজ্ঞাসার উত্তর ব্রহ্মসূত্রের যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত মিলিল না, মিলিতে পারে না। সৃষ্টির আদিতে চৈতন্যের উন্মেষকাল হইতে নানা দেশের নানা দর্শন, ধর্ম্মশাস্ত্র ও বহু কবি ও সাধকের রচনায় ও সঙ্গীতে নির্ভর ও সংশয়ের দ্বন্দ্ব চলিয়া আসিতেছে। সাহিত্যিক বলিবে—ফাউষ্ট, ক্যেন, সার্টার রিসোর্টাস, ইন্‌মেমোরিয়ম প্রভৃতিতে, অতুলপ্রসাদ ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের গানে এই দ্বন্দ্ব মনোহররূপ ধারণ করিয়াছে। অতৃপ্তি হইতে তৃপ্তির কূলে পৌঁছিবার তীব্রতম আকাঙ্ক্ষায়, ব্যক্তিত্বের দ্বারা জগৎ পরিমাপে দুর্দ্দমনীয় বেগ লইয়া জীবনের পথে উদভ্রান্তভাবে ছুটিবার কালে ধ্রুবতারাকে দেখিবার সময় কোথা? সিনিক-চূড়ামণি শ তাঁহার Back to Mathuselaha শেষাংশে বলিতেছেন —জীবনের শেষ নাই……ইহার পর কি আছে তাহা দেখিবার জন্য দৃষ্টিশক্তি নাই; এই কথাই যথেষ্ট যে there is a beyond (আরও কিছু আছে)। সুবিখ্যাত সৈনিক কবি Rupurt Brook বলিয়াছেন ইহজগতে হাসির মেলা শেষ হইলে জ্ঞানিগণ বলিয়া থাকেন অমরত্ব লাভ হইবে—কিন্তু কিছুই বুঝি না—বুঝি এইটুকু যে এমন একটি স্থান আছে—

"......there waits a land
Hard for us to understand,
Out of time, beyond the sun...
There the Eternals are, and there
The Good, the Lovely and the True
And types, whose earthly copies were
The foolish broken things we knew...
Never a tear, but only Grief ;
Dance, but not the limbs that move ;
Instead of lovers, Love shall be,
And there, on the Ideal Reef
Thunders the Everlasting Sea"

দৈনন্দিন জীবনে এ অনুভূতি সম্পূর্ণ সাধনা সাপেক্ষ; নির্ভরের প্রশ্ন অভাব-দুঃখদীর্ণ মানবসমাজে অবান্তর। দৈহিক ও ঐহিক বিষয়ের মিল আছে। তাপমান যন্ত্রের পারদের মতো সাধারণ মানুষের আস্তিক্যবুদ্ধির হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। এই চিত্রটি সত্যেন দত্ত তাঁহার চার্ব্বাকের মাধ্যমে আঁকিয়াছেন:

কে বলে বিধাতা আছে, হায়
কে বলে সে জগতের পিতা?
পিতা কবে সন্তানে কাঁদায়,—
ক্ষুধায় কাঁদিলে দেয় তিতা!
পিতা যদি সর্ব্বশক্তিমান
পুত্র কেন তাপের অধীন?
পিতা যদি দয়ার নিধান
পুত্র কেন কাঁদে চিরদিন?
নাহি-নাহি—নাহি কোন জন,
বিধি নাই—নাহিক বিধান;
কোন ধনী-পিতার সংসারে
অনাহারে মরেছে সন্তান?

* * *

বালকের অমল হৃদয়ে
আমিও করেছি আরাধন
ধ্রুব কি প্রহ্লাদ বুঝি কভু
জানে নাই ভকতি তেমন।
ফল তার? পদে পদে বাধা
আজনম,—বুঝি আমরণ!
মরণের পরে কিবা আর?
নাহি—নাহি—নাহি কোন জন।

তারপর বহু আকাঙ্ক্ষিত মঞ্জুভাষা লাভের আশা মুকুলিত হইলে চার্ব্বাক বলিতেছে—

"ঠেকেছিল মনোতরী খান্
প্রাণনাশা সংশয়-চড়ায়,
ভাষাহীন আশা পেয়ে আজ
হর্ষে ভেসে চলে পুনরায়"
কে গো তুমি দুর্জ্জের মহান্?
কে দেবতা এলে আজি
এ আনন্দ কে দিল আমার?
আশা সুখে মন পরিপূর!
এতদিন চিনি নি তোমায়;
আজ বটে দয়াল ঠাকুর।"

কবি জানাইলেন—

"সেই একদিন শুধু জীবনে চার্ব্বাক
নত হয়েছিল নিজে চরণে ধাতার
প্রেমের কল্যাণে শুধু সেই একদিন
সে যে আনন্দের দিন—সে যে প্রত্যাশার।"

সারা জগতেই ত এই সুর—এই স্বার্থপরতার বেসাতি ঈশ্বরের সহিত। "প্রপন্ন-পারিজাতায়" শুধু গীতার ধ্যানেই রহিয়া গেল। কোথায় সেই কল্পবৃক্ষ? নিস্ফল অন্নচিন্তায় অধ্যাত্মচিন্তা ডুবিয়া যায়। এই অন্নচিন্তাই ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা। এই দেবীর পূজায় সমগ্র দেহ মন সমর্পণ করিলে দুর্লভ মনুষ্যজন্মের সার্থকতা কোথায়? স্বর্গ রচিবার জন্য, সৃষ্টিকর্ত্তাকে নব কলেবরে সৃষ্টি করিবার জন্য এই জন্ম আসিয়াছে। তাই ঋষি আকুলকণ্ঠে প্রার্থনা করিলেন "মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং, মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণং মে অস্তু"

আমায় ঢেকে দিও না, আমি নিজেকে যেন ঢেকে না দিই—ইত্যাদি।

সাংসারিক জীবনে দুঃখ দূর হইলে বা আংশিক লাঘব হইলে বিদ্রোহী মন ঈশ্বরের প্রতি ফিরিয়া চাহে। ইহা ভক্তি বা ঈশ্বরপ্রীতি নহে।

সাধুসন্তরা দুঃখ জয় করিবার কথা বলিয়াছেন। carlyle পথনির্দ্দেশ করিয়াছেন—"Make thy life's denominator a Zew'. "Love not pleasure, love God" ইত্যাদি; Danteর "Sorrows marry us to God," Tennyson এর from sin through sorrow to thee we pass, Goetheর "More light" এবং Christ-এর My father! My father! Why hast thou forgotten me" ইত্যাদি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এ দেশের ঋষিবাক্য ত এই মূল নীতিই প্রচার করিতেছে। বৈষ্ণবকবিগণ, এবং রামপ্রসাদ, তুলসীদাস, মীরাবাই, সুরদাস, নানক, কবীর প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ এই শরণাগতির মহিমাকীর্ত্তন করিয়াছেন। অতুলপ্রসাদের গান যেন বিশল্যকরণী—

"দুঃখেরে আমি ডরিব না আর
কণ্টক হোক কণ্ঠের হার;
জানি তুমি মোরে করিবে অমল
যতই অনলে দহিবে।"

কবিগুরু দুঃখকে জয় করিবার সাহসের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। বিপদে পড়িয়া রক্ষা করিবার প্রার্থনা জানান নাই। "হাস্যমুখে অদৃষ্টকে পরিহাস" করিবার সংকল্প জ্ঞাপন করিয়াছেন। দুঃখের দেবতা আসিয়াছেন—এই অত্যাশ্চর্য্য অনুভূতির প্রকাশ অপরূপ বাণীলাবণ্যে রূপায়িত হইয়াছে—

"দুঃখের বেশে এসেছ বলে তোমায় নাহি ডরিব হে
যেথায় ব্যথা তোমায় সেথা নিবিড় ক'রে ধরিব হে।"

এই নিবিড় করিয়া ধরিবার যে আকুলতা, ইহাই বিদ্রোহীর প্রতি শরণাগতির প্রশান্তির ইঙ্গিত।

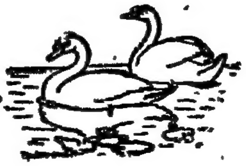

সমাধি সৌধ

শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল

মা বলে, মেয়েটা একালের আবহাওয়ায় মানুষ হ'য়েও সে একালের ভীড়ে হারিয়ে যায়নি। একালের দূষিত বাতাস ওর গায়ে লাগেনি। ও আমাদের ঘরের চিরকালের মেয়ে। স্বভাবটি এমনি মিষ্টি আর এমনি শান্তশিষ্ট যে ওকে ভালো না বেসে উপায় নেই।

গোপেন মনে মনে হাসে। নিজে পছন্দ করে বউ এনেছেন, কাজেই বউ-এর প্রশংসায় মা শতমুখ। তা ছাড়া রেখা এ বাড়ীতে এসেই এ কটি দিনে মাকে রীতিমত জয় করে নিয়েছে। ওর শান্তস্বভাব ও মধুর ব্যবহারে মা মুগ্ধ। মার চোখে একালের মেয়েরা বেহায়া, বিভ্রান্ত ও স্বার্থান্বেষী। এরা বড় বাঁধতে এসে ঘর ভাঙে, পরকে আপন করতে এসে আপনকে পর ক'রে দেয়। রেখাকে দেখে মায়ের সে ভয় ঘুচেছে। রেখার মাঝে এমনি অপার শান্ততা ছড়িয়ে আছে, তার কথাবার্ত্তায়, আচারে ব্যবহারে চলার গতিভঙ্গীতে এমনি অপরূপ শুচিতা ও শ্রী আছে যা আলোর বিস্তারের মতই সংসারকে শুভ্র ও উজ্জ্বল ক'রে তোলে। পরিপূর্ণ যৌবন ও একালের চলার পথ তার মাঝে অধীরতা আনতে পারেনি, তাকে চঞ্চল ক'রে তোলেনি। সর্ব্বদিক থেকে রেখাকে সংসারে মানিয়েছে চমৎকার আর সকলে ভালোও বেসেছে। মা'র বিস্তৃত পক্ষপুটের নীচে সে পরম নিশ্চিন্তে বাসা বেঁধেছে।

এদিকটায় গোপেন নিশ্চিন্ত। বউ এসে যে মা'র অখণ্ড আধিপত্যে হস্তক্ষেপ করবে আর সংসারে অশান্তির সূচনা করবে, বিয়ের পূর্ব্বে এই ছিল তার সবচেয়ে বড় আশঙ্কা ও দুর্ভাবনা। সে দুর্ভাবনার হাত হতে সে মুক্তি পেয়েছে—মা নিজে পছন্দ ক'রে বউ এনেছে আর বউ এসে মা'র হৃদয় জয় করেছে এই তার জীবনের সব চেয়ে বড় সান্ত্বনা।

বিয়ের পূর্ব্বে গোপেন রেখাকে দেখেনি। শুনেছিল মেয়েটা নাকি যেমনি সুন্দর তেমনি দুরন্ত। তাই মনে মনে বড় ভয় ছিল। রেখাকে দেখে শুধু যে তার ভুল ভাঙলো, তা নয়। রেখাকে দেখে সে মুগ্ধ হলো। মুগ্ধ হলো তার অপরিসীম রূপলাবণ্য দেখে। সে রূপ উদ্ধত নয়, মুখর নয়। শুক্লা তৃতীয়ার চাঁদের মতই সে রূপ স্নিগ্ধ ও কমনীয়। অপূর্ব্ব তার মুখশ্রী, সুঠাম তার দেহের গঠন। মুখে চোখে কেমন একটা কমনীয় কারুণ্য। শান্ত সে রূপজ্যোতি প্রশান্ত প্রসন্নতায় চোখে তন্দ্রা আনে। রেখার দীর্ঘ পাখায় ঢাকা কালো চোখের পানে চাইলে সত্যই মনে মায়া জাগে, গোপন উত্তেজনায় দেহ মন দুলে ওঠে না, গোপেনের ভালোই লাগে। নিজেকে সুখী মনে হয়।

সংসারে যেমন রেখা আধিপত্য বিস্তার করেছে, তেমনি তার রূপের প্রশংসায় গোপেনের বন্ধুমহলও মুখরিত। গোপেনের সৌভাগ্যকে ঈর্ষ্যা না ক'রে পারে না।

সত্যই গোপেনের জীবনে রেখার আগমন তার কাছে শুধু বিস্ময়কর নয়, একটা পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। রেখার পানে চেয়ে চেয়ে তার মনে চমক লাগে। তার শরীরের প্রতিটি খুঁটিনাটি মুক্তার মত শুভ্র বর্ণ, মসৃণ ত্বক, রক্তিম অধর, উজ্জ্বল দুটি চোখ, সুদীর্ঘ পল্লব। কালো হালকা রঙের চুলের অজস্রতা সবই যেন অপরূপ।

গোপেনের মনে হয় এই পরম রূপবতী মেয়েটি যেন দুহাতে তার আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যতের দরজা খুলে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। একে পাশে নিয়ে জীবনের পথে চলা, সে এক আনন্দময় অনুভূতি। গোপেনের গভীর অন্তরে কামনার শতদল বিকশিত হয়ে সত্যিকার রহস্যময় জীবনের আভাস দিয়ে যায়। অপলক দৃষ্টি দিয়ে সম্মোহিতের মত সে রেখার মুখের পানে চেয়ে থাকে। রেখা তার দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে তার পানে চোখ তুলে তাকায়। দুজনের দৃষ্টি বিনিময় হয়। ভেসে ওঠে রেখার আরক্ত ঠোঁটের প্রান্তে মৃদু হাসি। সে হাসি স্বল্পস্থায়ী এবং করুণ। সে মুখে যে কি আছে গোপেন

বুঝতে পারে না, তার দীর্ঘয়াত চোখের শান্ত ধীর দৃষ্টি বিদ্যুৎ প্রবাহের মত তার সমস্ত সত্তাকে আলোড়িত করে তোলে। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের উদ্দাম জীবনকে সে অভিনন্দিত করতে চায়। রেখার রূপজ্যোতি তার অতিতকে অস্পষ্ট করে দিয়ে রমণীয় নতুন পথের সন্ধান দেয়।

গোপেন সর্ব্বাঙ্গে একটা পুলকের শিহরণ অনুভব করে। একটা অজানা সুখের আস্বাদে সে বিভোর হ'য়ে থাকে। আনন্দে মন তার কাঁপে, একটা শিখা যেন তার দেহের ওপর দিয়ে তার অস্থি ভেদ ক'রে মর্ম্মের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে।

গোপেন ভাবে। এরই নাম কি প্রেম? সংসারের সমস্ত আনন্দ কি এরই মাঝে নিহিত? জীবনের ভিতর দিয়ে অনুরাগকে প্রকাশ করে কি এই বিস্ময়কর অনুভূতি?

রেখা এসেছে, গোপেনের সংসারে সৌভাগ্যের আশা আশ্বাস নিয়ে। রেখা আসার সঙ্গে সঙ্গেই সংবাদ আসে, গোপেন মুন্সেফ হ'য়েছে। গোপেন কৃতি ছাত্র, কিন্তু রেখা এলো ঐশ্বর্য্য নিয়ে, সম্পদের প্রাচুর্য্য বহন ক'রে। মা সজল নয়নে রেখার চিবুক স্পর্শ ক'রে বলে, মা আমার লক্ষ্মীর হাঁড়ি কোলে নিয়ে এসেছে।

গোপেন উচ্ছ্বলিত আনন্দে বুক বোঝাই ক'রে সালঙ্কারা রেখাকে পাশে নিয়ে কতো স্বপ্নই দেখে। সেখানে শুধু আলো আর আলো। অবারিত আকাশতলে জ্যোৎস্নার উদ্দাম আলোর উতরোল, পাখীর কণ্ঠে গান, ফুলের বুকে মধু আর সুগন্ধ। আর তারি মাঝে রেখার রূপমাধুর্য্যে দশদিক আন্দোলিত। এ সব গোপেনের কাছে একটা অজ্ঞাত জগৎ। এতোদিন তার কাছে একান্ত অনধিগম্য ছিল। তার জগৎ ছিল রাশিকৃত বই খাতার মাঝে সীমাবদ্ধ। সে লেখাপড়াই ক'রে এসেছে এতোদিন। তার বাঁধা-ধরা জীবনের বাইরের যে এই বিস্তীর্ণ জগৎ, তার সাথে পরিচয় ছিল না। সেখানে যে এতো আলো, এতো মধু, এতো বৈচিত্র্য, এ তার জানা ছিল না। রেখা তাকে হাত ধরে সত্যিকার জীবনের সাথে মুখোমুখি পরিচয় করিয়ে দিল।

গোপেন বলে, তুমি আমার ভবিষ্যতের দোর খুলে দিলে।

রেখা আনত মুখ তুলে নিঃশব্দে তার পানে চায়।

গোপেন তেমনি অন্তরঙ্গ কোমল সুরে আচ্ছন্নের মতো বলে, তুমি দিলে আমার জীবনকে সত্য ক'রে—

রেখা চমকে উঠে মৃদু হাসে। এ সেই সেকালের পুরাতনী দুর্ব্বোধ্য হাসি।

রেখা ভীরু কম্পিত কণ্ঠে বলে, ছিঃ! ও কথা বলো না। আমি কি পারি তোমার জীবনকে সত্য ক'রে দিতে? তুমি দিয়ো আমার মিথ্যেভরা জীবনে সত্যের আলো জেলে। তোমাকে ধ'রেই যেন আমি উঠতে পারি।

গোপেন অবাক্ হ'য়ে তার মুখের পানে তাকায়। রেখার কথার সে মানে খুঁজে পায় না, অথচ তাকে জিজ্ঞাসা করতেও পারে না। কেমন সঙ্কোচ হয়; সৌজন্যে বাধে।

রেখা কথা বলে কম। হাসে অতি মৃদু। হাসি মুখে সে কথা বলে। কথা শেষ হয়, সঙ্গে সঙ্গে হাসিও যায় মিলিয়ে। নিজে স্বল্পভাষী বলেই বোধ হয় গভীর মনোযোগ দিয়ে সে গোপেনের কথা শোনে। প্রশান্ত চোখে প্রসন্ন মনে সে গোপেনের পানে তাকিয়ে থাকে। চোখে প্রশ্ন নেই, মুখে জবাব নেই, শুধু উন্মুখ হ'য়ে শোনে। শুনে তৃপ্তি পেল কি না তাও বুঝবার উপায় নেই। মুখে ভাবাবেগ নেই, চোখে চাঞ্চল্য নেই, এতটুকু অস্থিরতা নেই বুকের নীচে। অথচ তার চোখের অতলে গভীর আন্তরিকতা আর ঔৎসুক্য। গোপেন লক্ষ্য করে আর ভাবে। এ কেমনতরো ভালোবাসা? এত উদাসীন কেন? প্রথম প্রথম রেখাকে তার গম্ভীর প্রকৃতির ব'লে মনে হতো, কিন্তু যতই দিন যায়, গোপেনের মনে বদ্ধমূল ধারণা জন্মায় যে রেখার প্রাণের উত্তাপ নেই, তারুণ্যের কোন আশক্তি নেই, ভরা যৌবনের নীচে মোহ নেই—কামনা নেই। সে যেন অন্তঃসারশূন্য মোমের পুতুল। গোপেন মনে মনে বেদনা বোধ করে।

রেখা নিঃস্ব হ'য়ে নিজেকে বিলিয়ে দেয়, কিন্তু নিজের জন্য কোন কিছু চায় না। সমস্ত দ্বিধা সংশয় অতিক্রম করে সে সশ্রদ্ধ অনুরাগে গোপেনের কাছে নিজেকে উৎসর্গ

ক'রে দেয়, অথচ সেই সমর্পণের নীচে গোপেন কোন দিন তার লোভের চেহারা দেখতে পায় না। তার এই অন্ধ আত্মসমর্পণ একটা পরম ঐশ্বর্য্য, এর মাধুর্য্য উপলব্ধি করবার মত। এটা তার সেবার রূপ, কল্যাণের রূপ। হোম-শিখার মত—যে আলোর পবিত্র আভায় সংসার ঝলমল করতে থাকে।

গোপেন কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারে না রেখার এই আনুষ্ঠানিক মনোবৃত্তিকে। তার মনে হয় তাদের এই মিলনের মাঝে কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে গেছে। রেখার এই সমর্পণের নীচে অন্তরের কোন যোগ নেই। তার কালো শূন্য চোখে কিসের যেন একটা গভীর ক্ষত। একটা চিন্তার আলোড়ন চলতে থাকে গোপেনের মনের অতলে। কোথায় নতুন জীবনের প্রেরণায় রেখা আনন্দে মর্ম্মরিত হয়ে উঠবে—না সে স্রেফ্ তার দাসীবৃত্তিই করে যাচ্ছে।

রেখা বলে, স্বীকার না করলেও আসলে সব মেয়েই স্বামীর দাসী। স্বামীসেবা যদি দাসীবৃত্তি হয়, তাতেই আমার তৃপ্তি, সেই আমার স্বর্গ।

কৌতুকের স্বরে গোপেন হাসতে হাসতে বলে, সে স্বর্গের পথ কিন্তু বড় দীর্ঘ আর দুর্গম।

রেখা শান্ত নির্ব্বিকার মুখ তুলে ধীর কণ্ঠে উত্তর দেয়, তাতে ভয় কি? তুমি পাশে থাকলে একদিন না একদিন লক্ষ্যে পৌঁছবই। তুমি হাত ধরে উত্তীর্ণ করে নিয়ে যাবে আমায় সেই বিপদসংকুল দুরপথে।

রেখা থেমে জিজ্ঞাসুচোখে গোপেনের দিকে তাকায়। গোপেন এবার দ্বিধাশূন্য হয়ে নিজেকে ছেড়ে দেয়, মুক্ত করে দেয় তার বহ্নিদীপ্ত কামনাকে। সে মোহাবিষ্টের মত দুহাতে রেখার ভয়চকিত কোমল মুখখানি নিজের বুকের মাঝে চেপে ধরে। রেখার মন যেন নিস্তরঙ্গ জলাশয়ের মত স্থির, সে শুধু তার আয়ত অচঞ্চল চোখ দুটি তুলে স্বামীর মুখপানে ভালো করে তাকায়। গোপেনের মুখখানা কামনায় রাঙা হয়ে উঠেছে। রেখার মনে হয় যেন ওর রক্তে আগুন ধরে গেছে। সে নিস্পন্দ হয়ে গোপেনের বুকের মাঝে চোখ বোজে। তার মুখের আলো যায় নিভে, বিষাদের একটা পাণ্ডুর ছায়ায় ক্রমশ তার মুখখানি ঢেকে যায়।

গোপেনের অদ্ভুত কামনাবেগ হঠাৎ স্তিমিত হ'য়ে আসে রেখার ভয়াতুর বিবর্ণ মুখের পানে চেয়ে। দুজনে চোখাচোখী হ'তেই রেখার মুখে ফুটে ওঠে অস্পষ্ট হাসি, সঙ্গে সঙ্গে তার চোখদুটি জলে ভরে আসে। বিমূঢ়ের মত বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে গোপেন যেন তার মুখে অন্য এক জগতের আভাষ পায়।

গোপেনের ব্যথাতুর দৃষ্টিতে রেখার এ এক নতুনতরো রূপ। এরও মাধুর্য্য আছে। মনে করুনা জাগায় মমতা জাগায়, মর্ম্মলোকে কাঁপন ধরায়। গোপেন কিন্তু বুঝতে পারে না, কিসের এই আর্ত্ত আবেদন? কিসের এই ব্যর্থতা? গোপেন আশ্চর্য্য হ'য়ে চেয়ে থাকে তার আর্দ্র চোখ দুটির পানে। ফোঁটায় ফোঁটায় অশ্রুর ধারা নেমে রেখার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে।

অনাদিকালের অখণ্ড স্তব্ধতা ঘরের মাঝে জমাট বেঁধেছে। আর সেই স্তব্ধতার মাঝে দু'টি নরনারী নিরাসক্ত ঘনিষ্ঠতায় মুখোমুখি বসে আছে দুটি প্রশ্নের মত। দুজনেরি কাতর উৎসুক চোখে একই জিজ্ঞাসা, এর সমাধান কোন্ পথে?

রেখা ঘুমিয়ে পড়ে। অকাতর সে ঘুম। নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় গোপেনকে আশ্রয় ক'রেই সে ঘুমোয়। গোপেন কিন্তু ঘুমোতে পারে না। ঘুম তার দেশছাড়া হ'য়ে গেছে। সে অনিমেষে ঘুমন্ত রেখার পানে চেয়ে থাকে। মনের মাঝে তার প্রচণ্ড আলোড়ন। তার চোখে রেখা এক অমীমাংসিত সমস্যা। ওর চেহারায় ও আচরণে যেন সামঞ্জস্য নেই। এত রূপ, দেহের কাণায় কাণায় সৌন্দর্য্য ও তারুণ্যের এই সমারোহ, অথচ অন্তরে কোন আসক্তি নেই, অধীরতা নেই, উত্তেজনা নেই ওর ত্রিসীমানায়। চলতি সংসারে এটা আশ্চর্য্য বৈকি। গোপেনের চোখে এ যেন বৈরাগ্যের রূপ, সর্ব্বহারার রূপ, তাজমহলের অনন্ত সৌন্দর্য্যের নীচে সমাধি! রেখাকে সে আবিষ্কার ক'রতে চায়।

খোলা জানালা দিয়ে বিছানায় ছড়িয়ে প'ড়ছে এক

ঝলক জ্যোৎস্নার আলো। সেই আলোর কুহক গায়ে মেখে রেখা যেন ধ্যানমগ্না তপস্বিনীর মত গা ঢেলে দিয়েছে। গুচ্ছ গুচ্ছ কালো চুল মুখের দুপাশে ছড়িয়ে পড়েছে। শুচিশুভ্র মুখে গভীর প্রশান্তি। গোপেন শিউরে ওঠে। নিজের মনের পানে চেয়ে তাকে স্পর্শ করতে সাহস হয় না।

দৈবাৎ ঘুম হ'তে জেগে রেখা বিছানায় উঠে বসে।

এখনো ঘুমোওনি?

গোপেন নিজের মনের দৈন্য ঢাকবার জন্যেই জড়িত স্বরে বলে, ঘুম ভেঙে গেল। তুমি উঠলে কেন?

রেখার মুখে ফোটে তার স্বল্পায়ু বিশেষ হাসিটি। মুখের ওপর হ'তে চুলগুলো পেছন পানে ঠেলে দিতে দিতে বলে, একটা স্বপ্ন দেখছিলুম।

বড় বড় চোখ মেলে সে গোপেনের পানে চায়। সে চোখে সুদূর তন্ময়তা,—সে চোখে তপস্যার ছায়া। গোপেন মুগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে নীরবে তার পানে তাকিয়ে থাকে। রেখা বাইরের জ্যোৎস্না-স্নাত আকাশের পানে চেয়ে আছে তার দৃষ্টিতে কিসের একটা অদ্ভুত আচ্ছন্নতা, সে যেন নিজের দৃষ্টি দিয়ে নিজের অন্তরের পানেই চেয়ে আছে

গোপেন হঠাৎ প্রশ্ন করে, তুমি কি এখানে সুখী নও রেখা?

রেখা তার পানে ফিরে তাকায়। সে যেন ঠিক এই প্রশ্নটির জন্যে প্রস্তুত হয়েই ছিল। মৃদু হেসে উত্তর দেয়, না।

গোপেন চমকে উঠে চুপ ক'রে তার মুখের পানে তাকায়। তার বুকের মাঝে কাঁপুনি ধরে।

রেখা বোধ হয় তার মনের অবস্থাটা বুঝতে পারে। সে তার পানে চেয়ে আবার বলে, আমি সুখী নই, তোমাকে সুখী করতে পারছি না বলে।

গোপেন যেন আশ্বস্ত হ'য়ে হাসি মুখে প্রশ্ন করে, কেন? আমাদের দু'জনের ঝগড়াটা কোন্‌খানে? আমি যদি বলি, তোমাকে পেয়ে আমার মত সুখী কেউ নেই, আমার মত আনন্দ কেউ পায়নি।

রেখা বলে, সেটা তো মনের কথা নয়, মুখের কথা। মন না হয় আমি তোমায় দিতে পারিনি, তাই ব'লে কি তোমার মন বুঝতে পারি না?

গোপেন থমকে দাঁড়ায়। নিজের মনের সত্যটা স্পষ্ট প্রকাশ ক'রে দিতে তো রেখার বাধলো না। গোপেন কৌতুকের ভঙ্গে উত্তর দেয়, মন তোমার। আমি হাত পেতে চাইলেই তো তুমি হাতে তুলে দিতে পারো না। আমি পেলুম না ব'লে আমার মনে থাকতে পারে বঞ্চনার ক্ষোভ, কিন্তু তুমি দিতে পারোনি বলে তোমার মনে অশান্তি থাকবে কেন?

রেখা মুখ তুলে হাসে বলে, পুরুষ তোমরা হয়তো সে কথা বুঝবে না। মন ছাড়া দেহটাকে সঁপে দেওয়া, নিজের ভোগের জন্য দেবতাকে নৈবেদ্য নিবেদনের মত দিতেই যদি হয়, তবে দিতে হবে সর্বত্যাগী হয়ে।

গোপেন চুপ ক'রে থাকে। রেখাকে এক সঙ্গে এত কথা বলতে আর কোনদিন সে শোনেনি। স্বল্পভাষী মেয়েটি যেন আজ হঠাৎ মুখর হ'য়ে উঠেছে।

রেখা বলে, কিন্তু সমস্যা তো তা নয়। কেন দিতে পারি না, সেই হচ্ছে সমস্যা। সে সমস্যার সমাধান না হ'লে তোমার স্ত্রী বলে পরিচয় দেবার আমার অধিকার নেই। সেই কথাই আজ তোমায় শোনাবো।

গোপেন উৎসুক সপ্রসন্ন দৃষ্টি মেলে তার পানে চায়।

রেখা খোলা জানলার দিকে চেয়ে বলে চলো, আমরা ছাতে যাই। জ্যোৎস্নার আলোর নিরিবিলিতে ব'সে তোমায় শোনাবো আমার অতীত জীবনের কাহিনী।

রেখা বিছানা হ'তে নেমে দাঁড়ায়। গোপেনও সঙ্গে সঙ্গে বিছানা হ'তে নামে।

গোপেন দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলে, এইখানেই বসো না রেখা। ছাদে ঠাণ্ডায়—

প্রতিবাদের স্বরে রেখা বলে, না, না। মন্দিরে ব'সে দেবতার অপমান করা হবে। আমার সঙ্গে এসো।

একটা আঘাতের জন্য প্রস্তুত হয়েই গোপেন রেখার সঙ্গে ছাদে উঠে যান।

জ্যোৎস্না প্লাবিত অবারিত আকাশের নীচে ছাদের এক কোণে বসে রেখা বলে: আমি একজনকে ভালো-বেসেছিলুম। এ সেই শাশ্বত বাল্য প্রেমের চিরন্তন

উপাখ্যান। যার মাঝে ভগবানের চির অভিশাপ—যার পাটভূমিকা নিরন্ধ্র অন্ধকারে—যার পরিসমাপ্তি মিলনে নয় —চিরবিচ্ছেদে আর বুকফাটা চোখের জলে। সে বিস্তৃত প্রেমের কাহিনী আলোচনা করে লাভ নেই।

নিঃসম্পর্ক দুটি কিশোর কিশোরীর নিরাসক্ত মনের অন্তরঙ্গতা দেখে সকলেই মুগ্ধ দৃষ্টিতে আমাদের পানে চেয়ে থাকতো। মনে কি ভাবতো তারাই জানে। বিয়ের কথাও আমাদের কানে দু' একবার এসেছিল। দুপক্ষে নাকি ঠিক ছিল—ছেলে বি,এ পাশ করলে আমাদের বিয়ে হবে। তার জন্যে আমাদের মনে কোন দুশ্চিন্তাও ছিলনা। ব্যস্ততাও ছিল না। তারুণ্যের দোরে পৌঁছে দুজনে দুজনের পানে উৎসুক দৃষ্টি মেলে চেয়ে দেখতুম আর দুজনে দুজনের পানে চেয়ে শুধু নীরবে হাসতুম। আকাশ আর পৃথিবী যেমন হাসাহাসি করে।

জীবনে জোয়ার ভাটা ছিল না। একটানা গঙ্গার মত নিরুদ্বেগে ভেসে চলেছিলুম। মনে লোভ ছিলনা, কোন ক্ষোভও ছিল না। রঙীন স্বপ্ন আঁকা চোখে দুজনে দুজনের পানে চেয়ে মনে হতো কেমন ক'রে আমরা আশ্চর্য্য ভাবে এক হ'য়ে গেছি। আমাদের আর পৃথক সত্তা নেই।

মনের কথা গোপন ছিল না। সকলেই জানতো আমরা দুজনে দুজনকে ভালবাসি।

এমনি সময় একদিন আমরা বেড়াতে গেলাম তাদের খড়দা'র বাগানে। গঙ্গার ধারে বাগানবাড়ী। সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে একসময় আমরা দুজনে গঙ্গার ধারে নিরিবিলিতে গিয়ে বসলুম, একটা পুরাণো অশথ গাছের শিকড়ের ওপর। কোন কথা নেই, শুধু দুজনে চুপ চাপ পাশাপাশি বসে থাকা আর দুজনে দুজনের পানে বাঁকা চোখে চেয়ে হাসা।

পায়ের নীচে বর্ষার ভরা গঙ্গা। সাপের ফণার মত তরঙ্গ তুলে আক্রোশে গর্জ্জন করতে করতে ছুটেছে। অশথ গাছটার পাশেই ছিল একটা চাঁপা গাছ। মাটির বুকে ঝরা ফুলের পাঁপড়ি আর বাতাসে ফুলের সুগন্ধ। আমি লুব্ধদৃষ্টিতে ওপর পানে চাইলুম। সে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আমি ফুল নিয়ে আসছি। সঙ্গে সঙ্গে সে কাঠবেড়ালীর মত গাছের ওপর উঠে গেল। দুরন্তপনায় সেও আমার চেয়ে কম ছিল না। চেয়ে দেখি একেবারে মগডালে উঠে ফুল পারছে। গাছের ফুল শেষ হ'য়ে এসেছিল। একটা ডাল গঙ্গার ওপর প'ড়েছিল, সেই ডালে ছিল কতকগুলো ফুল।

আমার মাঝে যে সর্ব্বনাশী ওৎ পেতে বসেছিল তা তো জানতুম না। আমি নীচে হতে উর্দ্ধমুখে তার পানে চেয়ে তাকে দেখিয়ে দিলুম সেই পুষ্পিত ডালটা। সে আমার পানে চেয়ে প্রসন্ন হাসিতে মুখ ভরে নিঃশঙ্কচিত্তে সেই ডালে নেমে এলো। হালকা ডাল তার ভার সইতে না পেরে ভেঙ্গে গেল, সে ছিটকে পড়লো খরস্রোতা গঙ্গার বুকে। একবার মাথা তুলেই সে জলের প্রবল স্রোতে তলিয়ে গেল। আমি অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে উঠলুম। চিৎকার করবার শক্তি পর্য্যন্ত তখন আমার লোপ পেয়েছে। আমি ছুটতে ছুটতে গঙ্গার ধারে নেমে যেতে গিয়ে হঠাৎ হোঁচট খেয়ে মুখ থেবড়ে পরে অজ্ঞান হয়ে গেলুম। সে তখন গঙ্গার অথৈ জলে তলিয়ে ভেসে গেছে।

গোপেনের মুখ হতে অজ্ঞাতে বেড়িয়ে আসে অস্ফুট আর্ত্তধ্বনি।

রেখা চুপ করে বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে গোপেনের পানে চায়।

ব্যাকুল স্বরে গোপেন প্রশ্ন করে, তারপর?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে রেখা বলে, তারপর আর কি? গঙ্গার জলে ভেসে গেল অভিশপ্ত প্রণয় লীলা।

একটু থেমে আবার রেখা বলে, প্রণয়ীর মৃত্যু ঘটলেও প্রেমের মৃত্যু নেই। প্রেম বেঁচে রইল প্রেমের এই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়।

রেখা ইঙ্গিতে নিজেকে দেখায়।

সুরু হলো জীবনের আসল সংগ্রাম। তিন মাস মৃত্যুর সঙ্গে যুঝে জয়ী হ'য়ে ফিরে এলুম। দেশ-বিদেশে ঘুরে এলুম। প্রাণের বস্তু হাতছাড়া হ'লে মানুষ তার পেছনে ছোটে, কিন্তু এ তার ছুটে গিয়ে ধরবার উপায় ছিল না। এমন কি মনের দৈন্য কারুকে প্রকাশ করে বলবার পর্য্যন্ত উপায় ছিল না। পুরুষ মানুষ তুমি বুঝবে কি না জানি

না আমার তখনকার মনের অবস্থাটা। প্রিয়জনের চির বিচ্ছেদ ব্যথা—যার অকারণ অকাল মৃত্যুর জন্যে একমাত্র আমিই দায়ী। 'আমি দায়ী।' অনির্বাণ অগ্নিশিখার মত এই চিন্তাটাই আমায় তিলে তিলে পোড়াতে সুরু করলে। সে কী যন্ত্রণা! জীবনের মাঝে প্রতিনিয়ত মানুষের যে অপমৃত্যু ঘটে—এ সেই মৃত্যুর ভয়াবহ যন্ত্রণা।

সে আমার জগৎ হ'তে চিরবিদায় নিয়ে আমার অন্তর জুড়ে নতুন করে আসন পেতে বসল। ভোলা দূরের কথা, নতুন ক'রে তাকে ভালোবাসতে আরম্ভ করলুম। বিধবা যেমন সমগ্র চেতনা দিয়ে স্বর্গত স্বামীকে ভালোবাসে। জাগ্রত দেবতার মত আমার অন্তরে হ'লো তার অধিষ্ঠান। জীবনে যাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, তাকেই মনের অদৃশ্যলোকে প্রতিষ্ঠা ক'রে নিজের মনের অতলে ডুব দিলুম।

এম্নি ভাবেই তিনটি বছর কাটলো। প্রলোভনের সংসারে আমাদের জন্ম। স্বাস্থ্যবতী মেয়ের দেহে ভরা যৌবন, সুতরাং বাড়ীর সকলে সজাগ হয়ে উঠ্‌লো। বিচ্ছেদ বেদনার মধ্যে দিয়ে যে আত্মিক আনন্দের আস্বাদ মেলে একথা তো কেউ বিশ্বাস করবে না। আমার মনের অনমনীয় দৃঢ় সঙ্কল্প দেখে মায়ের মুখে পড়ল অসন্তোষের ছায়া, বাবা সস্নেহে বুকে টেনে নিয়ে বললেন, লোক-সমাজে আমার মাথা হেঁট করিয়ো না। চারিদিক থেকে জীবনটাকে বিশ্লেষণ ক'রে মনে হলো এ বাড়ীতে আমার যে স্নেহের ঠাঁইটুকু এতদিন অব্যাহত ছিল, সকলে এক জোট হ'য়ে তা ছিনিয়ে নিচ্ছে। এরা মন দেখে না, মনের ঐশ্বর্য্যকে ধূলোয় ফেলে দিয়ে মেটাতে চায় পারিবারিক সমস্যা।

রেখা চুপ ক'রে ভোরের স্তিমিত জ্যোৎস্নার পানে তাকিয়ে দেখে। অলক্ষ্যে গোপেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

উৎসুক দৃষ্টি মেলে রেখা গোপেনের পানে চায়।

গোপেন আর্ত্তস্বরে বলে, এতো বড় আঘাত বুকে নিয়ে আমায় তুমি সুখী করতে চাও?

রেখা বলে, ভেবেছিলুম সেবা দিয়ে যত্ন দিয়ে, নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে তোমায় ভরিয়ে রাখবো। আর তোমারি হাত ধ'রে এই চোরাবালি হ'তে একদিন উঠবো। কিন্তু, তোমার জীবনে এসে আমি শুধু অপরাধী হ'য়েই রইলুম।

—অপরাধী? কেন রেখা?—সকাতরে দৃষ্টি মেলে গোপেন প্রশ্ন করে।

রেখা বলে, তোমার এই আলোকাকীর্ণ জীবনের বিস্তীর্ণ পথে এসে দাঁড়ালুম অন্ধকারের ছায়া ফেলে। তোমার এই অপর্য্যাপ্ত সুখসম্পদ, ভালো বাসবার ও ভালোবাসা পাবার এই ঔৎসুক্য আর আকুলতা,—সবার ওপর তোমার এই উদার সৌজন্য, এদের মাঝে আমার নিজেকে ভারী দরিদ্র মনে হয়। তোমাকে দেবার আমার আছে কী? সমাধিসৌধের মত এই দেহসৌন্দর্য্যের নীচে আছে শুধু অস্থি আর কঙ্কাল।

গোপেন লক্ষ্য করে রেখার আর্দ্র চোখদুটি ছাপিয়ে গালের উপর অশ্রু গড়িয়ে প'ড়ে চক্‌চক্ করছে। তার অশ্রুসিক্ত শুভ্র মুখের পানে চেয়ে গোপেনের মনে হয় চাঁদের আলোয় তাজমহলের পাষাণমর্ম্মরের মতই সে রূপ জ্যোতির্ম্ময়, সে সৌন্দর্য্য করুণ মাধুর্য্যরসে ভরা। গোপেনের বুকের নীচেটা অসহ ব্যথায় টন্ টন্ করে ওঠে। সে সহসা তার নগ্নবাহুদুটি ধরে কম্পিতকণ্ঠে বলে, তোমার এই আসল পরিচয়ই তোমার গৌরব। তোমার সত্যিকার পরিচয় তুমি। তোমার জীবনে এ একটা দৈবের দুর্ঘটনা অঘটন মানুষের আসল পরিচয়কে চাপা দিয়ে রাখে, তাকে বুঝতে দেয় না। ব্যথা তার অসহ কিন্তু সেই দুঃখ বেদনার মধ্যে দিয়েই তো প্রেমের মহিমা উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। প্রেম কখনো ব্যর্থ হয় না। প্রেম আঘাত করে, আদর্শের অপমৃত্যু ঘটায় না।

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকে। গোপেন নিজের হাতের মুঠোর ভেতর রেখার হাতদুটি চেপে ধ'রে হাসতে হাসতে বলে, আমাকে তুমি ভাল বাসতে পারচো না, এই না তোমার দুঃখ্যু?

রেখা মুখ না তুলেই কম্পিত কণ্ঠে বলে, তোমার হৃদয় আমি মথিত করেছি। জানি না, গরল উঠবে কি অমৃত উঠবে। যা উঠবে, তাই আমাকে হাত পেতে নিতে হবে।

বিস্ময় ও ভয়ে অপরাধীর মত এইবার সে চোখ তুলে গোপেনের পানে তাকায়।

দুহাতে গোপেন তাকে কাছে টেনে নিয়ে বলে, এখানে আসবার আগেই তুমি আকণ্ঠ যে সুধা পান করে এসেছো, তারি স্পর্শ আমার জীবনের হীন স্বার্থের গরলকে অমৃত করে তুলবে।

রেখা বড় বড় কালো চোখ মেলে অসহায় দৃষ্টি দিয়ে চায়। রেখার মাথাটি ধীরে ধীরে বুকের খুব কাছে টেনে নিয়ে গোপেন বলে, আর তুমিই দেবে আমাকে সেই অমৃতলোকের সন্ধান।

রেখা অভিভূতের মতো তার বুকের ওপর মাথাটি রাখে। সে যেন এই আশ্রয়টিকে একান্ত ক'রে এমনি ভাবেই চিরদিন থাকতে চায়, হৃদয়ের এই দুঃসহ ব্যথা নিয়ে।

গোপেন টের পায় রেখার তপ্ত চোখের জলে তার বুকখানা ভিজে যাচ্ছে।

★

শেষ কথা

ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

এখন কেমন আছি—চিঠি লিখে জানাতে বলেচ,
—কত জ্বর, কোথা ব্যথা—ওষুধের কি কি সব নাম,
সময়েতে পথ্যি পাওয়া—তারও কথা লিখতে ভোলনি,
আমাকে উদ্দেশ ক'রে সবশেষে দিয়েচ প্রণাম।

লিখেচ—সময় মত ঘুম ঠিক আসে কি না চোখে,
শুয়ে শুয়ে ছবি কারো দেখি কি না মনের মুকুরে?
লিখেচ—কারও কি নাম এসেচে স্মরণে—একবারও
কোন ফাঁকে বেরিয়েচে হঠাৎ তা' প্রলাপের সুরে?

লিখেচ—তোমার যেন বারবার সাধ যায় মনে
রয়েচ যেখানে সেই খাঁচা ভেঙে আসবে পালিয়ে,
—আসবে আমার কাছে—আমার এ বিছানার পাশে
বাতাসকে ভর করে তার পিঠে পড়বে ঝাঁপিয়ে।

লিখেচ—এখানে এসে চুপি চুপি বসবে পাশেতে,
হঠাৎ না দেখি যেন—সাবধানে খুব ধীরে ধীরে
কপালে রাখবে হাত, তারপরে হয়ত বা উঠবে চেঁচিয়ে:
'জানালা রেখো না খোলা, বড় বদ্ হাওয়া ঝিরঝিরে।'

ওষুধের খালি শিশি দেখে তুমি উঠবে চমকে,
পাখা নেই বিছানায়, জল নেই—জলপটি দেবে!
আমাকে ধমক্ দেবে—রোগী হওয়া সাজে না আমার,
নিজেকে মারচি আমি, কারো কথা একটু না ভেবে।

লিখেচ—জানো না আর কোনদিন দেখা হবে কি না
হয়ত তোমায় ডাকা নাম ধরে হয়ে গেল শেষ!
লিখেচ সবার শেষে—বাকি শুধু শেষের প্রণাম
লিখেচ—সমুদ্র মাঝে, মুখোমুখী দু'জনে দু'দেশ।

শিক্ষাপ্রসঙ্গে—কুটীর শিল্প

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

আজ আমাদের স্বাধীন ভারতে শিক্ষা সমস্যাই বড় সমস্যা। কোন জাতির উন্নতির বা সংস্কৃতির পরিচয় তাহার জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসারতা, তত্ত্বানুসন্ধিৎসা ও জ্ঞানার্জ্জনে উদ্যম এবং অটল অধ্যবসায়। ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার রচিত—

"Hints on National Education in India" গ্রন্থে যথার্থই বলিয়াছেন : 'In national reconstruction there is no other factor so important as education.'

আমরা ইংরাজ শাসনাধীনে আমাদের প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতি হারাইয়া ফেলিয়াছি, মোগল পাঠানের অধীনে মুসলমানের আক্রমণে ভারতে যত বিশ্ববিদ্যালয় ছিল—নালন্দা, বিক্রমশিলা, তক্ষশীলা, সেগুলি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। বৃটিশ রাজত্বে এইরূপ বর্ব্বর ধ্বংসাত্মক তাণ্ডবলীলা ছিলনা বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য সংস্কৃতির তীব্র আলোকে আমাদের চক্ষু ঝলসিয়া গিয়াছিল—ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতিকে সম্মান করা দূরে থাক, অবজ্ঞা ও হেয় চক্ষেই দেখিতাম। সেইজন্য দেখা যায় উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্য ভাগে যে ইয়ং বেঙ্গলের দল উঠিয়াছিল, তাঁহারা প্রায় সকলেই বিদ্বান, মণীষী, দেশপ্রেমিক ও দেশহিতৈষী ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল পাশ্চাত্য দেশের হাবভাবে, আচার ব্যবহার চাল চলনে এবং সমাজ পদ্ধতির দিকে। তাঁহারা মনে করিতেন যে জনসমাজের কল্যাণের জন্য দেশকে সভ্য জগতে স্থান পাইতে হইলে আমাদের ধর্ম্ম, সমাজ এবং প্রাচীন সংস্কৃতিকে পাশ্চাত্য আদর্শে সম্পূর্ণ-ভাবে রূপান্তরিত করিতে হইবে। এই বিষয়ে অনেক গ্রন্থকার ও প্রবন্ধ লেখক সেই সময়কার কথা বলিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তাহা পুনরাবৃত্তি করা বাহুল্য মাত্র। পাশ্চাত্য দেশের সংস্পর্শে আসিয়া—তাঁহাদের অপূর্ব্ব জ্ঞানভাণ্ডারের সাহায্যে আমরা নবজীবন ও নূতন দৃষ্টিভঙ্গী পাইয়াছি, তাহা ভুলিলে চলিবে না। অধীনতার নিষ্পেষণে আমাদের জাতীয়তার প্রাণটা ধুক ধুক করিয়া জীবনের চিহ্ন দেখাইত, কিন্তু তাহা ক্ষয়োন্মুখ—কোন জীবনীশক্তির সক্রিয় চেতনা ছিল না। বিদ্যালোচনার কেন্দ্রগুলিতে অধ্যাপকদের প্রতিভা ও অসামান্য জ্ঞান ধনীর শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকর্ম্মের বৃথা বিচারে জয়ের তিলক পাইবার আশায় বাদ বিতণ্ডায় পরিণত হইত। দেশের জন-সাধারণের মনে সে জ্ঞানের প্রকাশ বা প্রভাব ছিল না। শুধু পাণ্ডিত্যের সমাদর, খ্যাতি ও ধনী জমিদার বা রাজার বৃত্তি লাভেই উহা পর্য্যবসিত হইত। দেশ বিদেশে পাণ্ডিত্যের খ্যাতি লাভ করিলেও জনসাধারণ তাহাতে লাভবান হইতেন না। ইহার একমাত্র কারণ আমরা জ্ঞানার্জ্জনে উদাসীন ছিলাম। বিদ্যা শিক্ষালাভে ও প্রচারে আমরা জাতি হিসাবে আমাদের কোন উদ্যম বা চেষ্টা ছিল না—শুধু শ্রেণীগত মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে উক্ত বিদ্যা বা জ্ঞান সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ইহা স্বীকার করিতেই হইবে এই শ্রেণীর পণ্ডিতেরা ভারতের সংস্কৃতিকে জিয়াইয়া রাখিয়াছিলেন—দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া ত্যাগে ও অপূর্ব্ব নিষ্ঠায় এবং তপস্যায়। ভিক্ষালব্ধ বৃত্তিতে ও সামান্য জমি-জমার উৎপন্ন ফসল হইতে ছাত্রদিগকে বিনা বেতনে ও গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় বহন করিয়া পুত্রের মত সস্নেহ ব্যবহারে অকাতরে বিদ্যা দান করিয়াছেন। শাকান্নভোজনে পর্ণকুটীরে বাস করিয়া এইসব চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকেরা—যে চরিত্রের দৃঢ়তা, অটুট অধ্যবসায় অপরিসীম ধৈর্য্য এবং মহানুভবতা দেখাইয়াছেন, তাহা কল্পনায় চিন্তা করিলেও তাঁহাদের পাদমূলে মস্তক সহজেই অবনমিত হয়—ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্য গৌরবে চিত্ত উদ্ভাসিত ও প্রসন্ন হয়—আর সঙ্গে সঙ্গে মনে উদিত হয় যে, এই ত্যাগব্রতী শিক্ষকের দল পাইয়াও আমরা জনসমাজে জ্ঞানভাণ্ডার বিতরণ করিতে পারি নাই। কিন্তু আমাদের অযত্নে

অবহেলায় ও উদাসীনতায় ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ও শিক্ষার ধারা লুপ্ত হয় নাই। ফল্গু নদীর মত ধীরে ধীরে আমাদের জনসাধারণের সমাজ-জীবনে এই ধারা বহিতেছিল, একেবারে মজিয়া শুখাইয়া যায় নাই। মিঃ হটন তাঁহার সুবিখ্যাত বাঙ্গলার অভিধানের ভূমিকায় এই সম্বন্ধে তাঁহার স্বদেশীয় পর্য্যটকদিগকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন—

"He will hear the most profound desertations on human life and actions from the mouth of the almost naked peasant. He will discover a knowledge of character in the lowest of his menial servants, that would not dishonour the most acute penetration and accurate observation. He will behold in his progress through the country, the most delicate arts pursued in the open air and each affected by a simplicity of process that could only result from the felicitous contrivances of centuries upon centuries."

বাস্তবিকই শত শত শতাব্দীর সাধনায় এই দেশের চরকা ও ডলন, কাটির সাহায্যে সূক্ষ্ম মসলিন তাঁতিরা তৈয়ার করিত। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক Orme (অর্ম্মে) বলিয়াছেন যে, সমস্ত যন্ত্রপাতি দিয়া তাঁতিরা মসলিনের সূতা তৈয়ার করে, ইউরোপীয়রা ঐ সব যন্ত্রপাতির সাহায্যে তাহাদের মোটা শক্ত আঙ্গুলেও মোটা চট প্রস্তুত করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। এই তাঁত-শিল্প ধ্বংস হইয়াছে—ইউরোপীয় বণিকদের অত্যাচারে—সে শোচনীয় কাহিনী আলোচনা করিয়া লাভ নাই। জনসাধারণের মধ্যে দেশপ্রেম ও জাতীয় ঐক্য ছিলনা বলিয়াই বণিকেরা রাজসিংহাসনে বসিয়া দেশের শিল্প বাণিজ্য বিনষ্ট করিয়াছে। শাঁখারীরা অতি সাধারণ একরকম লোহার করাত দিয়া শাঁখ কাটিয়া শাখা তৈয়ারী করিত—সেই শাখার রেখায় রেখায় অপূর্ব্ব শিল্প সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিত, গালার রংএ অনুরঞ্জিত হইয়া লোকের নয়নরঞ্জন করিত। কাঠের উপর সূত্রধর তাহার বাঁটালি ও সাধারণ যন্ত্রপাতি দিয়া যে কারুকার্য্য দেখাইত, তাহা দেখিয়া আজিও লোকে অবাক হয়। ইষ্টকে, পাথরে কিম্বা সাধারণ কুটীর নির্ম্মাণে যে অপূর্ব্ব শিল্প নৈপুণ্য প্রকাশ পাইত, এমনকি আধুনিক যন্ত্রযুগে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় না।

শিক্ষার তিনটী অঙ্গ প্রধান, প্রথম, জ্ঞানলাভ—দ্বিতীয়, সমাজে তাহার প্রসারতা এবং তৃতীয়, ব্যবহারিক জীবনে তাহার প্রয়োগ। এই জ্ঞানের পরিধি বর্ত্তমান যুগে বহু বিস্তৃত—বহু শাখান্বিত। প্রাচীন কালে ছিল বিদ্যার দুইটী শাখা—একটী পরা, অপরটী অপরা। আর্য্য ঋষিরা শ্রুতিতে ঘোষণা করিয়াছেন—দুইটী শিখিতে হইবে। মুণ্ডকোপনিষদে আছে—"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরাচ।" ব্রহ্ম বিদ্যা ব্যতীত অপর সকল প্রকার জ্ঞানই অপরা। কিন্তু ইহাও জানিতে ও শিখিতে হইবে। যাঁহারা ভগবানকে লাভ করিতে চান—যাঁহারা সাধনাবলে তত্ত্ববেত্তা ও তত্ত্বদর্শী হইতে চান—তাঁহারা পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন করিবেন। আর সকলের পক্ষেই সাহিত্যকল্প ব্যাকরণ জ্যোতিষ প্রভৃতি নানাবিধ বিদ্যা অর্থাৎ—অপরাবিদ্যার আলোচনা করিবে। কিন্তু ইহা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা শ্রুতির ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করেন। "দ্বে বিদ্যে অধিতব্য" ঋষিদের ইহাই নির্দ্দেশ। জাতি যদি অধ্যাত্ম জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত না হইয়া শুধু অন্যান্য বিদ্যায় অনুশীলন করে, তবে তাহা কদাচিৎ লোক-কল্যাণে প্রয়োজিত হয়। মানুষ লোভ ও স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া কেবল আধিপত্য স্থাপন করিতে প্রয়াস পায়, ধর্ম্ম অর্থে মন্দির মসজিদ গির্জ্জা বা পূজাহোম জপ যজ্ঞই লোকে সাধারণতঃ বুঝিয়া থাকে। কিন্তু মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মের সংজ্ঞা অন্তরূপ দিয়াছেন—যাহাতে মানব জাতি বিধৃত হয় তাহাই ধর্ম্ম। ভ্রাতৃভাব বা আত্মীয় জ্ঞান না থাকিলে সমাজ বা মানব জাতি কল্যাণের দৃঢ়ভূমিতে দাঁড়াইতে পারে না, তাহারা ঐক্যে ও আদর্শে আপনাদের সংহতিবদ্ধ করিতে পারে না। শিক্ষার মূলে এই উচ্চ ভাবের যথার্থ আদর্শ না থাকিলে তাহা লোক-কল্যাণকর-হয় না ইহাই ছিল প্রাচীনকালের মত। কিন্তু আধুনিক যুগে যুক্তি তর্কে ধর্ম্মের কোন স্থান নাই। বিজ্ঞান এখন ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। বিজ্ঞানের ভিত্তিতে শিক্ষাসৌধ নির্ম্মিত না হইলে শিক্ষা পূর্ণরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় না। সুতরাং বর্ত্তমান কালে

বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শিখিতে বা আয়ত্ত করিতে না পারিলে জগতে মানব জাতির কোনরূপও উন্নতিলাভ করিবার সম্ভাবনা নাই। এমনকি জাতি হিসাবে বাঁচিয়া থাকাও কঠিন। ইহাই আধুনিক মত। এই বৈজ্ঞানিক যুগে শিক্ষালাভ করিবার পথে কোন অন্তরায় নাই। সকলেরই সমান সুযোগ, সমান অধিকার এবং সমান স্বাধীনতা। ইহা অস্বীকার করিবার জো নাই। বর্ত্তমান যুগে সভ্যতার মহতী বাণী—সাম্যবাদ।

কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক যুগের শিক্ষার আদর্শ এবং উপায় সম্বন্ধে দেশ বিদেশে নানাপ্রকার মতভেদ আছে। পুরাকালে যেমন শিক্ষার আদর্শ ছিল পরা ও অপরা। অপরা বিদ্যায় নানা শাস্ত্রে পারদর্শী হইতে হইবে। শিক্ষার অন্তর্গত ছিল চতুঃষষ্ঠী কলা। এই বিদ্যা শিক্ষা করিয়াও জ্ঞানের প্রসারতা বৃদ্ধি করিবার জন্য অধ্যাত্ম সাধনা ও লোক-কল্যাণে তাহার প্রয়োগ করাই ছিল নির্দ্দেশ। চরিত্রগঠন নীতিজ্ঞান ও সদাচার পালন ছিল শিক্ষার উদ্দেশ্য। বর্ত্তমান যুগে শিক্ষা ব্যবস্থায় ভারতবর্ষের বিদ্যালয়ে ইহার একান্ত অভাব। ইউরোপীয় স্বাধীন দেশে নীতি-জ্ঞানের ভিত্তিতে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রচার প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, বর্ত্তমানেও তাহার প্রভাব পাশ্চাত্য জাতির চরিত্রে ও আচার ব্যবহারে বিশেষভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। রাশিয়া যদিও ধর্ম্মকে জাতীয় জীবনে স্থান দেয় নাই, তবুও সেদিন ঋষি টলষ্টয়ের আবির্ভাব হইয়াছিল এবং তিনি সহজ সরল সত্যনিষ্ঠা ও প্রেম ধর্ম্মেরই প্রচার করিয়াছিলেন, মহাত্মা গান্ধীকে তিনি লিখিয়াছিলেন—

"What one calls non-resistance is in reality nothing else but the discipline of love undeformed by false interpretation Love is the aspiration for communion and solidarity with other souls, and that aspiration always liberates the source of noble activities. That love is the supreme and unique law of human life which everyone feels in the depth of one's soul."

এই বাণী তাঁহার শেষ জীবনের বাণী—তাই নিজেই উক্ত পত্রের ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন—

"The more I live—and specially now that I am approaching death, the more I feel inclined to express to others the feelings which so strongly move my being, and which, according to my opinion are of great importance."

টলষ্টয়ের বাণী কি আমাদের উপনিষদের সেই প্রার্থনাকে স্মরণ করাইয়া দেয় না যাহা আচার্য্য ও শিষ্যগণ উদাত্তস্বরে আবৃত্তি করিতেন? "ওঁ সহ নাববতু, স ন ভুনক্তু, সহবীর্য্য করবাবহৈ। তেজস্বিনাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ।" অর্থাৎ "হে জগদীশ্বর, তুমি আমাদের সমানভাবে রক্ষা কর, তুল্যভাবে বিদ্যাফল প্রদান কর যেন আমরা সমভাবে উহা আস্বাদন করিতে সমর্থ হই, তুল্য ভাবে লব্ধ বিদ্যায় বীর্য্যশালী হইতে পারি, আমরা যেন পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ না করি।" টলষ্টয় খৃষ্টভক্ত ছিলেন, তাই মহাত্মা গান্ধীকে লিখিয়াছিলেন—

"The law of love has been promulgated by all the philosophies—Indian, Chinese, Hebrew, Greek and Roman. I think that it had been most clearly expressed by Christ who said that in that law is contained both the law and the Prophets. But he has done more, anticipating the deformation to which that law is exposed, he indicated directly the danger of such deformation which is natural to people who live only for worldly interest"

সুতরাং খৃষ্টের আদর্শ জীবন ও বাণীকে অবলম্বন করিয়া টলষ্টয়ের মধ্যে এই প্রেমের ভাব অধিকতর স্ফূর্ত্ত হইয়াছিল। শিক্ষায় যদি যথার্থ মনুষ্যত্বের বিকাশ না হয়, যদি মানুষের চরিত্রে ব্যবহারে ও কার্য্যে সমাজ ও ব্যক্তিগত কল্যাণ ও উন্নতি সাধিত না হয়, তবে সেই শিক্ষা যুক্তি ও বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও জগতে অশান্তি ও অকল্যাণের কারণই হইয়া থাকে। ভারতীয় কৃষ্টির ধারা কল্যাণ, শান্তি ও প্রেমকে আশ্রয় করিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল। পুরাকালে মানুষের সুপ্ত আত্মবোধকে জাগাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাই আমরা পুরাণেতিহাস এবং জনপদ নগর গ্রামের বিবরণে ও নরপতিকুল ঋষিবৃন্দের জীবনে এই প্রচেষ্টা দেখিতে পাই। নানাবিধ বহিঃশত্রুর আক্রমণে ও শ্রেণীগত স্বার্থের খাতিরে এই

অবস্থার বিপর্য্যয় হয়। তবুও সেই ধারা লুপ্ত হয় নাই, শীর্ণকায় হইলেও তাহাতে স্রোতাবেগ ছিল, তাই সময়ে সময়ে ভারতে অবতার মহাপুরুষ মহামানব আচার্য্য প্রভৃতির আবির্ভাব হইয়াছিল। আমাদের চরম অধঃপতনে গ্রাম্য জীবনে ইহার প্রভাব দেখিতে পাই। নালন্দা তক্ষশীলা প্রভৃতি বিরাট বিশ্ববিদ্যালয় লুপ্ত হইলে যেমন মুষ্টিমেয় ত্যাগী শিক্ষাব্রতী ব্রাহ্মণ অধ্যাপকেরা ক্ষুদ্র চতুষ্পাঠীতে ভারতীয় বিদ্যা জ্ঞান সম্পদ বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন, পর্ণকুটীরবাসী হইয়া তাঁহাদের চরিত্র প্রভাব ও ত্যাগোজ্জ্বল মহিমায় ঋষিদের আলোকবর্ত্তিকা ধরিয়া রাখিয়াছিলেন, তেমনি ধর্ম্মানুষ্ঠানে পুরানপাঠ, কথকতা যাত্রা ও কবির গান ও কীর্ত্তনভজন বারব্রত পর্ব্বোৎসব জাতিকে উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া রাখিত। গ্রামের পর্ণকুটীরে বাস করিয়াও এই উদার সার্ব্বজনীন শিক্ষায় নরনারী নির্ব্বিশেষে কারু ও চারুশিল্পে ভারতীয় কৃষ্টির ধারা অব্যাহত রাখিতে পারিয়াছিল।

আজ আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় শিক্ষা প্রসঙ্গে কুটীর শিল্পের প্রয়োজন আছে কিনা তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। যান্ত্রিক সভ্যতার দিনে যন্ত্রশিল্পের নিকটে কুটীর শিল্প প্রতিযোগীতায় তিষ্ঠিতে পারিবে না, এইরূপ ধারণা আমাদের বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। শিক্ষা-সংস্কারে কুটীর-শিল্পের কতখানি প্রয়োজন, তাহা চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে। বর্ত্তমান ভারতসরকারও ইহার স্বতন্ত্র বিভাগ রাখিয়াছেন, কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে কুটীরশিল্প ছাত্রকে স্বাবলম্বী হইতে এবং স্বাধীন কল্পনায় কতটা উদ্বুদ্ধ করিয়া সৌন্দর্য্যানুভূতি এবং আনন্দ দান করিতে পারে, বারান্তরে তাহা আলোচনা করিব। শিক্ষা সমস্যায় কুটীরশিল্প সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয় বলিয়াই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

★

বিবেকানন্দের ছবি

সন্তোষকুমার অধিকারী

সময়কে খণ্ড খণ্ড করি যদি জীবনের মাপে,
সমস্ত জীবন জুড়ে জেগে থাকে
তবুও অখণ্ড
এক পূর্ণ অমৃত আলোক।
সে আলোকে জ্যোতির্ম্ময় পৃথিবীতে আরবার খুঁজি
জীবনকে পুণ্য বলে মানি।

অন্ধকারে ঢেকে যায় বারবার আমার আকাশ,
সে আঁধারে মুছে যায় শেষ
আলোকের স্পর্শগুলি;
তখন অশান্ত মন সীমাহীন বেদনাকলংকে
আর্ত্তনাদ করে;
যে প্রাণ অসহ ক্লান্ত যে জীবন গ্লানিতে পঙ্কিল
সেই রুদ্ধ নিরন্ধ্র আঁধারে
হৃদয়ের কান্না শুনি একা।

তারপর সহসা সুন্দর
জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশের পথ চোখে পড়ে।
আঁধারের প্রাণকেন্দ্রে দেখি সুপ্ত অমৃত আলোক,
জীবনকে দীপ্যমান প্রাত্যহিক মৃত্যুর মালিন্যে।
তারপর অনিন্দ্য সুন্দর
দেখি মুগ্ধ হাসি জাগে ধূলিলিপ্ত তোমার দু'চোখে।

স্বপ্ন

চুং-চান ইয়ে ঃ অনুবাদক—প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

[নব্য চীনা লেখক চুং-চান ইয়ে যুদ্ধের সময় ছিলেন টোকিওতে। পরে তিনি চীনে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রে কিছুকাল চীনে সৈন্যবাহিনীতে কাজ করেন। অতঃপর তিনি অধিকৃত চীন থেকে চ'লে আসেন মুক্ত চীনে এবং সেখানে শিক্ষকতা বৃত্তি গ্রহণ করেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি সরকারের পক্ষ থেকে চীন সম্পর্কে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য ইংলণ্ডে আসেন। বর্ত্তমানে তিনি কেমব্রিজে ইংরাজী সাহিত্য নিয়ে গবেষণায় রত আছেন। ১৯৩৮ সালে তাঁর প্রথম ইংরেজী গল্প প্রকাশিত হয়।

বর্ত্তমান গল্পটিতে অল্প কয়েকটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে চীনা লেখক যেন আমাদের ঘরের কথাই এঁকেছেন। ঘটনা ও চরিত্রগুলির মধ্যে আমাদেরই অনেক সংসারের রূপ প্রতিফলিত হয়েছে। এই সর্ব্বজনীন রসই গল্পটির বৈশিষ্ট্য।—অনুবাদক]

পাহাড়ের ওপর অসহ্য গরম···শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। আমি দিন ভোর হেঁটে চলেছি। সারা দেহ ঘর্ম্মাক্ত হয়ে গেছে, পায়ে ফোস্কা পড়েছে···তবুও চলেছি। অবশেষে এসে পৌঁছলুম একটা ঢালু জায়গায়। কিছুটা নিচে নামতেই চোখে পড়লো তুং-তিং লেক। সূর্য্য ঢ'লে পড়েছে পশ্চিমে। মৃদু মন্দ শীতল বাতাস বইতে সুরু করেছে। এখানে বাস্তুহারার দল নেই, রাস্তায় লোকের ভীড় নেই, আর মাথার ওপর জাপানী বিমানও নেই। যাক, যুদ্ধ ক্ষেত্রকে তাহ'লে পিছনে রেখে আসতে পেরেছি! বুকভরা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলুম···স্বস্তির নিশ্বাস।

ছেঁড়া-কোঁড়া কাপড়ের বোঝাটা পিঠের ওপর থেকে নামিয়ে মাটিতে রাখলুম। তারপর কাপড়ের বাণ্ডিলটা মাথায় দিয়ে ঘাসের ওপর শরীরটাকে এলিয়ে দিলুম। মাথার ওপরে আকাশ নীচের ঐ জলের মতই নীল আর নিথর। ধীরে ধীরে একটা লাল আভা সারা আ ঘিরে ফেললো, যেন লজ্জায় ওর মুখখানা অ হয়ে উঠেছে। এক ঝাঁক হাঁস পূবাকাশে গেল···ওরা বাসায় ফিরে যাচ্ছে। সূর্য্য ততক্ষ গিয়েছে।

চারিদিক নিঝুম নিস্তব্ধ। কিন্তু ক্রমে একটা একটানা কিসের শব্দ কানে এসে পৌঁছুলো, যে দূরের সমুদ্র থেকে একটা বিশাল ঢেউয়ের শব্দ আসছে। এক ঝলক বাতাসের সঙ্গে শব্দটা একব জোরেই কানে এসে বাজলো। বুঝলুম ব্যাপার গান হচ্ছে—আমার পবিচিত গানই। মধ্য এককালে যখন গরু চড়াতুম, তখন প্রায়ই মাঠে যে এই গানটি গাইতে শুনতুম। গানখানির করুণ আমাকে বিষণ্ণ ব্যথিত ক'রে তুলতো :

"চল যাই তব সাথে আকাশের নীলিমায়
তব সাথে চল যাই সাগর পারে।
সাগব শুকায়ে যাক,
ক্ষয় হোক পাষাণের,
তবু, অন্তর মম কভু হ'বে না চঞ্চল
ওগো, অন্তর মম রবে চির অচঞ্চল।"

বিস্মিত হলুম। এই নির্জ্জন স্থানে এ গা গাইছে! নিশ্চয় নিকটেই লোকের বাস আছে। লে বাস—ভাবতেই যেন পেটে ক্ষিদে অনুভব করলুম। ভাবতে লাগলুম, ক্ষিদে ততই বাড়তে লাগলো। সারাদিন কিছু খাওয়া হয় নি। মনে হ'তে লাগলে সপ্তা'র পর সপ্তা' অনাহারে কাটছে। সন্ধ্যার অ নেমে আসছে। ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে নির্ব মত তাকিয়ে ঘাসের ওপর শুয়ে থাকার কোনই অ না। লাফিয়ে উঠে প'ড়ে গানের শব্দ লক্ষ্য ক'রে চ আরম্ভ করলুম।

লেকের ডান দিকটায় মেপল্ গাছের সারি। তারই পিছনে একটা গাঁ দেখা গেল। এক জায়গায় একটা ভীড় ক্রমেই পাতলা হয়ে যাচ্ছে। ভীড়ের মধ্যে ছেলে-বুড়ো-যুবা সকলেই আছে। কারুর মুখে বেদনার ছায়া, কেউ বা নির্ণিমেষে তাকিয়ে আছে নর্ত্তকীদের দিকে, মুখে তাদের বিস্ময়। রহস্যময় ঘনান্ধকারের দিকে বিহ্বল দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে নর্ত্তকীরা। ওদের চোখের পাতায় জলের রেখা। গানের কলিগুলো ওদের কোমল হৃদয়ে বুঝি নাড়া দিয়েছে জানি গানটা বড় করুণ, ওর পেছনে রয়েছে একটা বিয়োগান্ত ইতিহাস।... পিঠের বোঝাটাকে টানতে টানতে নিয়ে যখন আমি ওদের পাশে হাজির হলুম, ভীড় তখন একেবারে স'রে গেছে। ভাবলুম এরা ভাগ্যবানই বটে, যুদ্ধের কোন খবরই এরা রাখে না। কেন জানি না, মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো।

চোখ তুলে তাকাতেই দেখি মুখে নির্বুদ্ধিতার ছাপ আঁকা এক বুড়ো ভবঘুরে আর দু'টি যুবতী নর্ত্তকী আমার সামনে দাঁড়িয়ে। ওদের মধ্যে একজন একটু মোটাসোটা, কিন্তু চেহারায় বেশ একটা জৌলুস ও লালিত্য আছে; অপর মেয়েটি একটু রোগাটে—চিন্তাকুল মুখে এখনও সেই অজানা দূরের পানেই চেয়ে রয়েছে। আমরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইলুম, কারোও মুখে কথা নেই। একটু একটু ক'রে অন্ধকার নেমে এল গাঁয়ের ঐ মাঠের ওপর। ক্রমে আমাদের আর আমাদের চার পাশের সব কিছুকে ঘিরে ফেললো প্রকৃতির নিরবচ্ছিন্ন কালো আবরণ।

—'তুমিও কি আমাদেরই মত গৃহহারা, ভবঘুরে?' নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে অবশেষে বৃদ্ধ প্রশ্ন করলো আমাকে।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, জাপানী আক্রমণ এড়িয়ে কোন রকমে আমি পালিয়ে এসেছি। এই সেদিন জাপানীরা মধ্যচীনের রাজধানী উচাং দখল করেছে।' আমি উত্তর দিই।

'তাহ'লে আমরা সবাই একই ব্যথার ব্যথী, কি বলো? যাক, চল একটা আস্তানার খোঁজে যাওয়া যাক, রাতটা কাটাতে হ'বে তো,!' বললো সে।

বৃদ্ধ এগিয়ে চললো। মন্ত্রমুগ্ধের মত আমি তাকে অনুসরণ করতে লাগলুম। আমার পিছনে আসতে লাগলো তরুণী দু'টি।...আবার নিস্তব্ধতা। কেমন যেন একটা অস্বস্তি ও লজ্জা বোধ করতে লাগলুম। মেয়েদের সঙ্গ আমার জীবনে এই প্রথম...বৃদ্ধই বাঁচালো আমাকে। সে কথা বলতে আরম্ভ করলো। সামনের দাঁতগুলো না থাকায় ওর কথা একটু অস্পষ্ট।

'জানো তো, আমি একজন 'বাজিয়ে'?'

'জানি বৈকি,' বৃদ্ধের কাঁধের ওপর থেকে ঝোলানো জীর্ণ ড্রামটার দিকে তাকিয়ে আমি বললুম। তবুও আমি ইচ্ছা ক'রেই জিজ্ঞেস করলুম, 'আচ্ছা, কি ধরণের বাজনা আপনি বাজিয়ে থাকেন?'

'কেন, আমি ড্রাম বাজাই, দেখোনি তুমি?' বৃদ্ধ বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললো। একটু থেমে জোর দিয়ে আবার বললো, 'দলের ম্যানেজারও আমিই।'

'দল। কিসের দল?' আমি যেন একটু বোকা বনে' যাই।

'যাত্রার দল। তোমার পিছনে মেয়েদুটিকে দেখছো না? ওরা অবশ্য আমারই মেয়ে, কিন্তু হ'লে হবে কি, ওরা আমার দলেরই শিল্পী। পাকা নাচিয়ে, একেবারে পয়লা নম্বরের।'

কথা ব'লতে ব'লতে আমরা একটা ছোট পাহাড়ের পাদদেশে একটি প্রাচীন মন্দিরের কাছে এসে পড়লুম। বৃদ্ধ বললে, 'এখানেই আমরা রাত কাটাবো।'

ভেতরে ঢুকে পড়া গেল। নির্জ্জন মন্দির, কোথাও জনমানব নেই। তেলের প্রদীপটা জাললুম। আশ্চর্য্য, একটা ইঁদুরকেও পালাতে দেখলুম না। পুরানো প্রদীপের মিটমিটে আলোয় আমি বোকার মত দাঁড়িয়ে আমার কাপড়ের বাণ্ডিলটা নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রতে লাগলুম। কি যে করবো, ভেবে পাচ্ছি না।

'এর নাম ভায়োলেট, আমার বড় মেয়ে,' ঈষৎ স্থূলকায়া মেয়েটিকে দেখিয়ে বৃদ্ধ বললে। 'আর ও আমার ছোট মেয়ে বসন্ত।' পরিচয় করিয়ে দিয়ে বৃদ্ধ হাত-পা ছড়িয়ে সটান শুয়ে পড়লো খড়ের গাদার ওপর। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো বৃদ্ধ।

মেয়ে দু'টির দিকে তাকিয়ে আমি হাসলুম, ওদের মুখেও মৃদু হাসি ফুটে উঠলো। সেই বন্ধুত্বমাখা হাসি যে কি মিষ্টি তা ব'লতে পারি না। ওদের জলজ্বলে চোখ-

গুলোতে মৈত্রী ও আন্তরিকতা মাখানো। তখুনি একটা কথা আমার মনে হ'ল, বৃদ্ধকে বললুম :

'খুড়ো, তোমার দলে নেবে আমাকে ?'

'কেন, তোমাকে তো দেখলে ছাত্র বলেই মনে হয়—বিদ্যা-বুদ্ধি রয়েছে তোমার,' বিস্ময়াবিষ্ট দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধ বললে, 'সত্যি বলতে কি, আমাদের এ কাজ বড ভাল নয়।'

আমি উৎসাহভরে বললুম, তাতে কিছু যায়-আসে না। আমি দোতারা 'এরু' বাজাতে পারি। আমাকে নিলে তোমার উপকার হ'বে, অবশ্য তুমি যে নিজে একজন ভাল বাজিয়ে তা আমি জানি।' আমার কথায় বৃদ্ধ কিছু খুসী হ'ল বলেই মনে হল। বললে, 'আচ্ছা, তোমার যখন একান্ত ইচ্ছে, তখন এসো আমাদের দলে।'

আমি খুব খুসী হলুম। মুহূর্ত্ত মধ্যে আমার সব লজ্জা সঙ্কোচ দূর হয়ে গেল। মেয়ে দু'টির সঙ্গে আমি রান্নার কাজে লেগে গেলুম। নানারকম গল্প গুজবে আমরা মেতে গেলুম—দলের গল্প, দেশের গল্প। জানতে পারলুম ওরা মাঞ্চুরিয়ার লোক, ওদের পূর্ব্বপুরুষ এসেছিল মধ্য চীন থেকে। এই জন্তেই ওদের গান আমার কাছে এত পরিচিত ব'লে মনে হয়েছিল। আরও আবিষ্কার করলুম যে, ভায়োলেটের মৃদু নারীসুলভ মিষ্টি কণ্ঠস্বর আমাকে মুগ্ধ করেছে। বসন্তের দীর্ঘপক্ষ কালো চোখ দু'টিও আমাকে প্রীত করেছে।

রাতের আহার সেরে খুড়ো খড়ের গাদায় শুয়ে অনতিবিলম্বেই নিদ্রাভিভূত হ'ল।

ভায়োলেট ওর স্বভাবসিদ্ধ মিষ্টি গলায় আমাকে ডেকে বললো, 'চাঁদের দিকে তাকিয়ে দেখুন তো, আজ ওকে কী সুন্দরই না দেখাচ্ছে!'

মুখ তুলে তাকালুম। উঠানের ওপারে নির্মেঘ আকাশে নির্ম্মল চাঁদ যেন হাসছে। জাপানীরা মধ্য চীনে আক্রমণ সুরু করার পর থেকে এ সকল বস্তুর কথা বিলকুল ভুলে গিয়েছিলুম।

'কী সুন্দর!' আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি। 'চাঁদের মধ্যে আমি স্বয়ং ভগবানকে দেখতে পাচ্ছি, যেন কেসিয়া গাছের মধ্য দিয়ে অস্পষ্ট দূরের দিকে স্বপ্নালু চোখে তাকিয়ে আছেন।' বেশ গলার জোরেই উল্লাস প্রকাশ করেছিলুম। বসন্ত ক্রুদ্ধকণ্ঠে থামিয়ে দিল আমাকে।

'চুপ করুন', উঠানের ওপর বুড়ো দেবদারু গাছটাকে দেখিয়ে সে বললে, 'দেখুন ঐ দিকে।'

গাছটার দিকে চোখ ফেরালুম। পাক খাওয়া, নুয়ে পড়া বুড়ো গাছটা—দেখলেই মনে হ'বে বয়েস একশ পেরিয়ে গেছে। ওপরের ডালগুলোর মধ্যে থেকে পাখীর ডানা ঝাপটানোর শব্দ কানে এলো।

'একটা প্রবাদ মনে পড়ছে,' বসন্ত ব'লে চললো, শান্ত হয়ে এসেছে ওর গলার স্বর, 'তিনবার ঘুমন্ত পাখীর ডানা ঝাপটানোর শব্দ শুনলে সে নিশ্চয়ই একটা ভাল স্বপ্ন দেখবে, আর তা সত্যি হবে।'

'তুমি ক'বার শুনেছো?' কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করি।

'ঠিক তিনবার।'

'তাহ'লে তুমি ভাল স্বপ্ন দেখবে।'

'ছাই', ঠোঁট উলটিয়ে বললো বসন্ত, 'ক'বছর তো খালি দুঃস্বপ্নই দেখে আসছি।'

'একটাও ভাল স্বপ্ন দেখনি? কী আশ্চর্য্য! কিন্তু কেন বলতো?'

যেন বড় বেশী কৌতূহল প্রকাশ করলুম। সত্যি, বুঝতে পারিনা অপরের স্বপ্নের ব্যাপারে আমি কেন এত অগ্রণী হয়ে উঠলুম।

বসন্ত কোন উত্তর দিল না। সে তার ঘন কালো, জলজলে চোখ জোড়াটা আমার দিকে মেলে ধরলো। কেমন যেন হতভম্ব হ'য়ে গেছে সে। ওর এই ভাব দেখে আমিও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলুম। জমাট নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলে ভায়োলেট।...চালাক মেয়ে।...ও-ই কথাটার জবাব দিলে, বললে,

'কেন জানেন? কারণ আমাদের জীবনে বড় অশান্তি। চার বছর আগে জাপানীরা আমাদের গাঁ পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দেবার পর থেকে একদিনও সুখে-স্বস্তিতে থাকতে পারিনি। যেখানে গেছি, শত্রুর মুখে পড়েছি।'

'তবে এখন আমরা শান্তি পেয়েছি বৈকি,' সহসা বসন্ত ব'লে উঠল, 'এখানে তিনদিন তো জাপানীদের নাম-গন্ধও পাইনি।…'

আমি এ বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ ছিলুম না। মনে মনে মাথা নেড়ে বললুম, 'অপেক্ষা ক'রে দেখ বাপু।' কিন্তু ওদের বিশ্বাস নষ্ট ক'রতে আমি চাইনি। তাই বললুম, 'তাহলে তোমরা ভাল স্বপ্নই দেখবে। কিন্তু কি ধরণের স্বপ্ন দেখতে চাও? যাদুদণ্ড দেখতে চাও, যার প্রভাবে ছোঁওয়া মাত্রই সব কিছু সোনা হয়ে যাবে? না, এক-জোড়া ডানা, যা দিয়ে তোমরা সুখের রাজ্যে উড়ে যেতে পারো?'

'আমরা ভবঘুরের মেয়ে, অত উচ্চাশা নেই আমাদের,' বললো বসন্ত। 'আমি ছাত্রজীবন চাই, লিখতে-প'ড়তে পারলেই আমি খুসী। আমি গান শিখতে চাই, পড়তেও চাই। মা যখন আমাদের গান শোনাতো, কী ভালোই না লাগতো! মা খুব ভাল নাচতে পারতো, রোজগারও করতো বাবার চেয়ে অনেক বেশী।' সহসা সে থেমে গেল আর বড় বড় চোখে আবার তাকিয়ে রইল…স্বপ্ন ও সত্যের মধ্যে ওর চোখের দৃষ্টি যেন দিশেহারা।

পলকের জন্যে ভায়োলেটের মুখ-চোখও উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, কিন্তু মুহূর্ত্তে আবার বিষণ্ণ হয়ে উঠলো। একটা গোপন দীর্ঘশ্বাসও ত্যাগ করলো। সেটুকু আমার দৃষ্টি এড়ালো না। ভায়োলেট বললে, 'ছাত্রজীবন আমিও চাই।'

'বটে', আবেশের ঘোর কেটে বসন্ত যেন ফেটে পড়লো, 'সেদিন জমিদারবাবু তোমার নাচ দেখে খুব প্রশংসা করলেন। পরে তিনি বাবার কাছে বললেন যে, তোমাকে তিনি মেয়ের মত ক'রে রাখতে চান, স্কুলে পাঠিয়ে লেখাপড়া শেখাতে চান। ওর স্ত্রী মারা গেছেন, ছেলেপুলেও নেই কি না তাই। কিন্তু তুমি তাতে রাজীই হ'লে না, বললে, এ তুমি চাও না। বাবার এই কঠোর জীবনের ভাগ নিতেই তুমি চাও।'

ভায়োলেট কুণ্ঠিতা হ'ল। প্রত্যুত্তর দিতে ও পারলো না। শুধু আমতা আমতা ক'রে বললো: ওই বুড়ো বদমায়েসটা যা বলেছিল, তা তার উদ্দেশ্য নয়, তার লক্ষ্য ছিল সম্পূর্ণ অন্য রকম।'

'কে কোথায় আছো, সাহায্য কর।…দাও…দাও… ফিরিয়ে দাও আমার বউকে,' বজ্রপাতের মত চীৎকারটা ভেসে এল। আমাদের আলাপে বাধা পড়লো। বৃদ্ধই চীৎকার করে উঠেছে। খড়ের গাদার ওপর নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে ও। মনে করলুম, বৃদ্ধকে বোধ করি, সাপে কামড়েছে। এ রকম নির্জ্জন স্থানে সর্পের আবির্ভাব কিছু বিচিত্র নয়। তাই আমি লাঠির খোঁজে দৌড়তে গেলুম। কিন্তু ভায়োলেট বাধা দিলে আমাকে।

'ও নিয়ে মাথা ঘামাবেন না', বললে ও, 'তিনি দুঃস্বপ্ন দেখছেন। জাপানীরা আমাদের গাঁয়ে এসে মাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবার পর থেকেই বাবা ওরকম দুঃস্বপ্ন প্রায়ই দেখেন। মায়ের খবর সেই থেকে আর আমরা পাই নি। বোধ করি মা আর বেঁচে নেই।…'

ক্রমেই ব্যাপারটা বুঝতে পারছি। কাহিনীটি নিশ্চয় খুবই দুঃখের। কিন্তু বিস্তারিত জানতে আর সাহস হ'ল না। ওরা হয়ত তা'তে ভারী আঘাত পাবে, আর—আর আমিও। তাই শুধু বললুম, 'এখন শুতে যাওয়া যাক। আমি আবার একজন বাড়তি লোক জুটেছি, কাজেই কাল তোমাদের খাটতে হ'বে একটু বেশী।' ওদের তরুণ অন্তরে একটু আশা জাগাবার জন্যে বললুম: 'আমাদের দেশ মুক্ত স্বাধীন হ'লে আমাদের প্রত্যেকের জন্যেই বিনা বেতনে স্কুলের ব্যবস্থা হ'বে। তখন সকলেই প'ড়তে পারবে, গান শিখতে পারিবে।'

পরদিন সকালে আমরা কাছেই একটা গাঁয়ে গেলুম। আমি এক বাজালুম, আমাদের বৃদ্ধ তার ছোট্ট ড্রামটি বাজালো। বেশ ভালই বাজাচ্ছিলুম মনে হল। বহুদিন হ'ল এ রকম বাজাযনি। ভায়োলেটের ওপর নিশ্চয়ই এর একটা প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। সে নাচছিল, আর বসন্ত গাইছিল। আগেই বলেছি ভায়োলেট একটু মোটা, কিন্তু আমার বাজনার তালে তালে ও লীলায়িত ছন্দে নেচে যাচ্ছিল, যেন জলের ওপর দিয়ে ও ভেসে চলেছে। আর নাচের সঙ্গে সঙ্গে ও যখন গান গাইছিল,

P30244

ওর কোমল কণ্ঠস্বরে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলুম, তরুণ গ্রামবাসিদের হৃদয়েও দোলা লেগেছিল।

কিছু পরে আমরা আমাদের তল্পি গুটিয়ে আর একটি গাঁয়ের দিকে এগিয়ে গেলুম।...রাস্তায় কাতারে কাতারে লোক চলেছে...ঝুড়িতে ছেলেপুলে...পিঠে ঝোলাঝুলি ...ওদের মাথা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। দুপুরের সূর্য্য ওদের ললাটদেশকে উজ্জ্বল ক'রে তুলেছে। ঘাম ঝ'রে পড়ছে গালের ওপর দিয়ে। ব্যাপারটা অনুমান ক'রতে পারলুম। তবুও নিশ্চিত হওয়ার জন্যে এক বুড়ো চাষীকে দাঁড় করালুম।

'জাপানীরা এগিয়ে আসছে', বললে সে, 'আজ সকলে বিশাল একটা লোহার ঈগল আমাদের গাঁয়ের ওপর ডিম ফেলেছে। ওগুলো ফেটে পঁচিশজন লোক, গরু, শুকরছানা মরেছে।'

'উঃ, পৃথিবীটা কি সাংঘাতিক,' বৃদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ফেলে, 'গত চার বছর ধরে এই সকল বিভীষিকা থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছি, কিন্তু কোথাও শান্তি পেলুম না।' মেয়েদের দিকে ফিরে বৃদ্ধ বললে, 'ওরে বাছারা, কি করি বল্ তো তোদের জন্যে? আমি তো বুড়ো হয়ে ম'রতে চলেছি, কিন্তু তোদের যে এখন উঠতি বয়েস।...'

মেয়ে দুটি নিরুত্তর। ওরা মাথা হেঁট করে রইল। দেহগুলোকে টেনে নিয়ে আমরা এগিয়ে চললুম। আর একটা গাঁয়ে এসে পৌঁছলুম। শূন্য গাঁ। এরপর যে গাঁয়ে এলুম তাও জনমানবশূন্য। সারাদিন রোজগার-পত্তর কিছুই হয়নি, তাই সেদিন আমাদের অনাহারে কাটলো। শ্রান্ত দেহ নিয়ে চলেছি, পা যেন টলছে।

'চল, কালকের সেই মন্দিরেই ফিরে যাই,' বৃদ্ধ বললো অবশেষে, 'এগিয়ে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই, বড় ক্লান্ত আমি।'

বৃদ্ধকে অনুসরণ ক'রে আমরা ফিরে চললুম। মন্দিরে এসে আমরা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলুম না। ভায়োলেট আর বসন্ত খড়ের গাদার ওপর এসে ব'সে পড়লো, আমি ওদের পাশের দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসলুম আর বৃদ্ধ বসলো আমাদের সামনে। আমরা কথা বলতে পারলুম না। যেন আমাদের জিহ্বা নেই। কিন্তু মেয়ে দুটির সারল্য মাখা চোখে আমি একটা কিছু আবিষ্কার করলুম—একটা অসহায়তা ও বিহ্বলতা। বৃদ্ধের প্রতি নিবদ্ধ ওদের দৃষ্টি। বৃদ্ধ কেশবিহীন মস্তকে হাত বুলিয়ে যাচ্ছে পাগলের মত পরিশেষে সে লাফিয়ে উঠে বললো:

'খাবার আমাদের চাই-ই। জমিদারের কাছ থেকে কিছু চাল ধার করে আনতে চেষ্টা করবো।' ভায়োলেটের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো বৃদ্ধ, 'লোকটাকে তো বদমায়েস ব'লে মনে হয় না।'

সে বেরিয়ে গেল। প্রকৃতই সে বড় ক্লান্ত আর বয়সও যথেষ্ট হয়েছে—এ পরিশ্রম তার সাজে না। কিন্তু কে-ই বা এ কাজ করবে? আমরা যে কতটা অসহায় এই প্রথম তা উপলব্ধি করলুম।

ঘণ্টা দুই পরে ফিরে এল বুড়ো—হাতে তার ছোট এক পুটুলি চাল। আমাদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। আমি ছুটে গিয়ে চালের পুটুলিটা হাতে নিলুম। যেন সোনার মতই মনে হ'ল। বসন্ত বাবাকে নিয়ে গিয়ে বসলো খড়ের ওপর, ভায়োলেট বাতাস করতে লাগলো কিন্তু বুড়ো যেন কিছুতেই শান্তি পাচ্ছে না। সে বললো, 'বোস্ বাছারা,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভায়োলেটের দিকে ফিরে বললো, 'তোর জন্যে একটা ব্যবস্থা ক'রে এলুম। খারাপ কিছু নয়। তবে বড় তাড়াহুড়ো ক'রে করতে হ'ল, এজন্যে দুঃখ হচ্ছে।'

'কি বলছো, বাবা?' ভায়োলেটের চোখের দৃষ্টি দিশেহারা।

'যে জমিদার আমাকে চাল দিয়েছেন, তিনি এইমাত্র বলছিলেন তোর কথা...কার কথা বলছি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিস। তিনি তোকে বিয়ে করবেন আর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তোকে সুখী করবেন।'

'তুমি তাঁকে কথা দিয়েছো?' ভায়োলেট জিজ্ঞেস করে।

'নিশ্চয়ই।'

'বাবা! আমি তোমার কাছেই থাকতে চাই।'

'নির্বোধ! একটু রুক্ষ ভাবেই বললো বৃদ্ধ। কিন্তু ক্রমে সে নরম হয়ে এল এবং শান্তকণ্ঠে বললে, 'জানি

তোর পক্ষে তার বয়েসটা কিছু বেশীই। কিন্তু মা, আমার সঙ্গে এভাবে থেকে লাভ কি? আমি তো বুড়ো হযে চলেছি। অবস্থার উন্নতি করতে এ জীবনে আর পারবো না। জমিদার ধনী। তোর কোন কষ্টই হ'বে না। তোর ছেলেমেয়েরা স্কুলে যেতে পারবে, লেখাপড়া শিখে বিদ্বান হবে। দেখ এতদিন ধ'রে আমি তোর কি করতে পেরেছি, তোকে ভবঘুরের মেয়ে ক'রে তুলেছি মাত্র…' বৃদ্ধের জীর্ণ কণ্ঠ ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতব হযে ক্রমে নীবব হ'ল।

ভায়োলেটেব মাথাটা নুয়ে পড়েছে।…বাইরে বাতাস উঠলো, বাতাসের মধ্যে একটা গোলমাল শোনা গেল। বৃদ্ধ মাথা তুলে ক্ষীণ কণ্ঠে আবাব বললো, 'জমিদার তোকে নিতে পাঠিযেছেন। শত্রুরা ক্রমেই কাছে এসে পড়ছে। আর সময় নেই, মা। জমিদার এখনই শান্তি-পূর্ণ কোন যায়গায় চ'লে যাবেন। বোকার মত কাজ করিস নি। যাবার জন্যে তৈরী হয়ে নে।'

একটি পাল্কী এসে দাঁড়ালো দরজায়। লাল রঙের পাল্কী—এমব্রয়ডারী করা পর্দা ঝুলছে ওব গায়ে। একটা দুশমন গোছের লোক ভেতরে এলো, পেছনে দু'জন পাল্কী-বেযারা। লোকটি জমিদারেব পরিচারক। বেয়ারা দু'টি বেশ বলশালী, খালি গা, মাংসপেশীগুলো বেশ প্রকট।

বৃদ্ধ একটুও নড়লো না, পরিচারককে অভ্যর্থনাও জানালো না। সে নির্ব্বোধেব মত ব'সে বইল নীরবে। সহসা সে ব'লে উঠলো, 'ভায়োলেট, প্রকৃতই যদি আমাব প্রিয় সন্তান হ'স্, আমার কথা শোন্। যা, পাল্কীতে গিয়ে ব'স্। আমি তোর বাপ। তোর সুখ-সমৃদ্ধিই আমার জীবনের একমাত্র কাম্য।'

ভায়োলেটের মুখে কথা সরলো না। মন্ত্রমুগ্ধেব মত সে পাল্কীতে গিযে বসলো। সেই ভীষণদর্শন পরিচারকটি দরজা বন্ধ করলো আর বেয়ারা দু'টি অবলীলাক্রমে পাল্কীটা কাঁধে তুলে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আঁধার ঘনিয়ে আসছে। পশ্চিম দিগবলয়ে সুন্দর একটা অর্দ্ধস্ফুট রামধনু দেখা দিয়েছে। নিশ্চই কোথাও ঝড হয়ে গেছে। বাতাসটা ঠাণ্ডা। মেপল্ গাছের পাতাগুলোয় মর্ম্মর শব্দ শোনা যাচ্ছে—যেন কখনও ওরা গান গাইছে, আবার কখনও যেন নালিশ জানাচ্ছে।

সহসা একটা উন্মত্ত চীৎকার ভেসে এল। যেন মা-হারা সন্তানের আর্ত্তনাদ। ভায়োলেটের কণ্ঠস্বর বুঝতে আমার কষ্ট হ'ল না। ক্রমে শব্দটা মিলিয়ে গেল বাতাসের মধ্যে। আবার নিশ্ছিদ্র নীরবতা।

বুকটা আমার ভারী হয়ে উঠলো, সীসার মত ভারী। আমি প্রায় আর্ত্তনাদ ক'রে উঠেছিলুম। ওঃ, এই আমার পূর্ব্বপুরুষের দেশ, এই আমাদের জীবন! এইখানেই আমি জন্ম নিয়েছিলুম। এইখানেই আমাকে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে হ'বে। বৃদ্ধের কাছে এগিয়ে গেলুম। সারাক্ষণ সে চোখ বুজে ব'সে ছিল।

'খুড়ো, মাপ করো আমাকে, তোমার ঘুমে বাধা দিলুম। আমি গেরিলাদলে যোগ দিতে চাই। হানাদারদের সঙ্গে আমি যুদ্ধ করবো। তোমাদের ছেড়ে যেতে সত্যিই আমার দুঃখ হচ্ছে।'

বৃদ্ধ শিল্পী চোখ খুললো। ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে মৃদুস্বরে বললো, 'বেশ, পৃথিবীটা তো তোমাদেরই জন্যে। তবে আজ তোমার কিছুই খাওয়া হয় নি। খাওয়া দাওয়া সেরে কাল যেও।' আবার চোখ বন্ধ করলো বৃদ্ধ।

বড় একা মনে হচ্ছে আজ। বসন্তর দিকে ফিরলুম। খড়ের গাদার ওপর ও চুপ ক'রে ব'সে ছিল। ভেবেছিলুম বোনের জন্যে ও গোপনে কাঁদবে। কিন্তু ভারী বিস্মিত হলুম, একটুও চোখের জলও ফেলে নি। অবলুপ্ত প্রায় রামধনুটার দিকে চেয়ে ও নিজের মনে বলছিল, গতরাতে যে স্বপ্ন দেখেনি, এ আশ্চর্য্য। তিনবার পাখীর ডানা ঝাপটানোর শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেলুম…'

'ওটা সংস্কার', আমি মন্তব্য করলুম। চমকে ফিরে তাকালো বসন্ত।

'না, না, আমার মা এ বিশ্বাস করতো,' তাড়াতাড়ি ও বলে। আমার উপস্থিতিতে ও সন্ত্রস্ত হযে উঠলো। 'আপনি ছাত্র ছিলেন তো?'

'নিশ্চয়ই।'

'তাহ'লে আমাকে পড়তে শেখান,' কাকুতিভরা কণ্ঠে বসন্ত বলে।

বালির ওপর কাঠি দিয়ে কয়েকটা অক্ষর আঁকি, তারপর ওকে বোঝাই।

বসন্তর চোখ গর্ব্বে জলজল করে ওঠে। 'ওঃ, মা যে সব গান গাইতো, সব যদি আমি পড়তে পারতুম…'

'বাজে ব'কো না,' আমি চেঁচিয়ে উঠি। বসন্ত সবকিছু ভুলে গেছে, বোনের ভাগ্যের কথাও ভুলে গেছে। এতে আমি বড় ব্যথা পেয়েছি। অক্ষর পরিচয় করাবার মত মনের অবস্থা আর আমার নেই। আমি ক্লান্তির ভান ক'রে বিছানায় এলিয়ে দিলুম দেহটাকে। কিন্তু ঘুম এল না। ভায়োলেটের কথা মনে পড়লো, মনে পড়লো ওর কোমল কণ্ঠস্বর, লাল ঠোঁটদুটি আর বিষাদমাখা হাসিটি।

পরদিন প্রাতে সকলের আগে ঘুম থেকে উঠলুম আমি। বৃদ্ধ আর বসন্তের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাব ঠিক করলুম। কিন্তু বৃদ্ধ গভীর নিদ্রাভিভূত থাকার ভাণ করলো। অথচ তার চোখের পাতা নড়ছে—যেন খুব বিচলিত, যেন গোপনে অশ্রু বিসর্জ্জন করছে। আমি কথা বলতে সাহস পেলুম না। বসন্তও পাথরের মত নিশ্চল হয়ে গেছে। তাই আমি বিদায় না জানিয়েই চলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলুম। ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছি, সহসা বসন্ত চোখ খুললো—জলভরা একজোড়া বিষণ্ণ চোখ।

'চললেন তা হ'লে?' বললো বসন্ত, 'শুনুন, কাল রাতে স্বপ্ন দেখলুম।'

'শুভ স্বপ্ন?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'হ্যাঁ, শুভ,' বিষণ্ণ ঠোঁটে জোর করে হাসি টেনে এনে বললো সে, 'স্বপ্ন দেখলুম ভায়ালেটের বিয়ে হয়েছে একজন সুদর্শন যুবক ছাত্রের সঙ্গে। এখন সে গান লিখতে ও পড়তে পারে…'

বলতে যাচ্ছিলুম—'কামনা করি স্বপ্ন সফল হোক,' কিন্তু একটা অজানা শক্তি আমার মুখ বন্ধ ক'রে দিল। নির্ব্বাক, নির্ব্বোধের মত দাঁড়িয়ে রইলুম। 'তাহলে বিদায়', অবশেষে বসন্ত আমাকে বললো। ওর দৃষ্টি যেন ক্রমেই দিশেহারা হয়ে উঠছে, যেন ও আরও কিছু বলতে চায়। ওকে আর ওর বাবাকে ছেড়ে আমি পথে নেমে পড়লুম। বহুক্ষণ ধ'রে ওর নিষ্পলক দৃষ্টির অর্থ অনুধাবন করতে চেষ্টা করলুম, কিন্তু ব্যর্থ হলুম।

★

সে কথাটি

অরুণবরণ চক্রবর্ত্তী

পশ্চিমে হেলিয়া সূর্য্য : স্বপ্নময় শুভ্রালোক তারি
পড়িয়াছে দোতলার বারান্দায়, নিমের পাতার
ছায়া-করা পর্দ্দা ভেদি'। আমি ও সে—কেহ নাহি আর—
দাঁড়িয়ে রয়েছি সেথা—একান্ত আগ্রহে দু'জনারি।

এমন নিরালা তারে পাই নাই আর কোন দিন।
ভাবিলাম হৃদয়ের সে কথাটি আজ বলে যাই।
দেখিলাম তারো মুখে যেন এই চিন্তার ছায়াই।
বাসন্তী বৈকালে আজ নীড়মত্ত তারো চিত্তবীণ।

বহুক্ষণ গেল কেটে : আজে বাজে দু' একটা কথা
দু'জনাতে হলো শুধু। গোধূলির রক্তের সাগরে
ডুবে গেল সূর্য্যদেব। পূর্ব্ব-বনান্তের তরু'পরে
ঝলিল মৃত্যুর আলো—ঘনাইল ক্রমে নীরবতা।

বলি বলি তবু নাহি হলো বলা—বিদায়ের ক্ষণে
প্রকাশের ব্যর্থতার ব্যথা দেখি তারো আঁখি কোণে।

পণ্ডিত শীলভদ্র ও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

বৌদ্ধযুগ হচ্ছে ভারতীয় সভ্যতার সব চেয়ে গৌরবময় যুগ এবং বর্ত্তমান বিহারের অন্তর্গত প্রাচীন মগধদেশে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের সবচেয়ে বড় ধর্ম্মকেন্দ্র। শুধু ধর্ম্মকেন্দ্র কেন, ভারতের শিক্ষাদীক্ষা,

নালন্দার প্রধান চৈত্য

জ্ঞান-বিজ্ঞানের তীর্থস্থান, ভারতের চিরগৌরব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সুবৃহৎ শিক্ষানিকেতন। কেবলমাত্র ভারতেই নয়, ভারতের বাইরে থেকেও, বহু দূরদূরান্তর দুর্গম পথ অতিক্রম করে—চীন, তিব্বত, শ্যাম, সিংহল থেকেও জ্ঞানপিপাসুরা এখানে এসে শিল্প সাহিত্য, দর্শন-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করতেন; তারপর জ্ঞানার্জ্জন সমাপ্ত হলে তাঁরা আবার ফিরে যেতেন যে যাঁর নিজের দেশে। অনেকে আবার সংসার ত্যাগ করে স্থায়ীভাবে রয়েও যেতেন এখানে। জ্ঞানের দীপ্তিতে শোক-তাপ-জরা মৃত্যুর উর্দ্ধে গিয়ে, পার্থিব আসক্তি-মুক্ত হয়ে পরবর্ত্তী জীবনকে দেখতেন ভিন্ন আদর্শে। ন্যূনপক্ষে দশ সহস্র ভিক্ষু ও ছাত্র মিলে বিভিন্ন বিষয়ে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করতেন। রাজগীর থেকে চৌদ্দ ক্রোশ উত্তরে পাটনা জেলার বড়গাঁও নামক গ্রামের মধ্যে ছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়। একটি স্নিগ্ধ সুন্দর ও শান্ত প্রকৃতির পরিবেশের মধ্যে চারিদিকে উঁচু প্রাচীরে ঘেরা ছিল এই আশ্রমটি এবং এরই মধ্যে ছিল শত শত মঠের সারি। কেবল মাত্র ভিক্ষুদের জন্যই ছিল তিন চার সহস্র কক্ষ। সুউচ্চ মঠের সৌন্দর্য্যমণ্ডিত চূড়াগুলি বহুদূর থেকেই শিক্ষার্থীদের সাদর সম্ভাষণ জানাত।

কথিত আছে, পূর্ব্বে এখানকার একটি আম্রকুঞ্জেই ভগবান বুদ্ধ তাঁর ধর্ম্মপ্রচারের জন্য অবস্থান করেন। বুদ্ধদেবের জীবদ্দশাতেই পাঁচ শত শ্রেষ্ঠী তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়ে সমবেতভাবে দশকোটী স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে জায়গাটি কিনে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে ভক্তি-উপহার দেয়। তারপর বহুকাল কেটে যায়, তথাগতও নির্ব্বান লাভ করেন! তাঁর দেহত্যাগের পর সক্রাদিত্য, বালাদিত্য, নরসিংহ গুপ্ত, বুদ্ধ গুপ্ত, তথাগত গুপ্ত ও বজ্ররাজ নামক পাঁচজন নৃপতি বুদ্ধদেবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাভক্তির নিদর্শন স্বরূপ তাঁর স্মৃতিচিহ্নকে অক্ষয় করে রাখতে এই বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন ৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে। এ ছাড়াও সে সময়কার বহু রাজারাজড়ারা ক্রমান্বয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি সাধনে তাঁহাদের সাধ্যমত সাহায্য করেছিলেন বলে জানা যায়। স্থাপত্য শিল্পের এক অপরূপ নিদর্শন হিসাবে অপূর্ব্ব মহিমায় গড়ে উঠেছিল এই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। বিলেতে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মত ছাত্ররা এখানে কেবলমাত্র অধ্যয়ন করেই চলে যেতেন না, তাঁরা এখানে অবস্থান করতে পারতেন, আহারাদি করতে পারতেন। গুরুগৃহে বাসের মত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আচার্য্যদের ছিল নিবিড় সম্পর্ক। প্রত্যেক ছাত্রের জন্য এখানে স্বতন্ত্র কক্ষের ব্যবস্থা ছিল। সেই প্রকোষ্ঠগুলি দৈর্ঘ্যে

ছিল ব'রো হাত এবং প্রস্থে আট হ'ত। আহারের জন্য প্রত্যেক ছাত্রকে প্রত্যহ ১২০টি নেবু, ২০টি জায়ফল, ২০টি খেজুর, আড়াই তোলা কর্পূর, এক পোয়া মহাশালী ধানের চাল, তিন রাশি তেল ও কিছু মাখন দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল।

কেবলমাত্র বৌদ্ধ দর্শনই এখানে শিক্ষা দেওয়া হ'ত না, যে যা শিখতে চাইতেন, সেই তা শিখতে পেতেন। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ছাড়া শিল্প বিদ্যাও এখানে শিক্ষা দেওয়া হ'ত। মহামহারথি পণ্ডিতগণ সযত্নে নানাবিষয়ে এখানে শিক্ষা দিতেন। নানা দূর-দূরান্তর থেকে যেমন ছাত্ররা এখানে অধ্যয়ন করতে আসতেন, তেমনি আসতেন আচার্য্যরাও। ছাত্রদের মধ্যেও হয়ত অনেকে যথাযথ জ্ঞানার্জ্জনের পর আচার্য্য ভিক্ষুপদে উন্নীত হয়ে এখানেই রয়ে যেতেন চিরতরে। বিভিন্ন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত প্রায় তিন চার হাজার আচার্য্য ছিলেন এখানে। এঁদের মধ্যে থেকেই এক একজন বয়স ও পাণ্ডিত্য অনুযায়ী প্রধান অধ্যক্ষের পদে, অর্থাৎ মহাস্থবিরের পদমর্য্যাদায় ভূষিত হতেন।

মহামতি পণ্ডিত শীলভদ্র ছিলেন এই অধ্যক্ষবৃন্দের অন্যতম—নালন্দা মহাবিহারের মহাস্থবির। জাতিতে তিনি ছিলেন বাঙালী, ব্রাহ্মণ সন্তান। সেই সময়ে এবং তার পরবর্তী সময়ে ভারতে ও ভারতের বাইরে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। পণ্ডিত শীলভদ্র ছিলেন সমতটের রাজপুত্র। গুপ্ত সাম্রাজ্যের শেষ দিকে বর্ত্তমান ত্রিপুরা জেলার এক অংশের নাম ছিল সমতট। এ সম্বন্ধে মতান্তর থাকলেও অনেকে বর্ত্তমান কুমিল্লার প্রাচীন নামই সমতট ব'লে উল্লেখ করেন। রাজবংশে জন্মগ্রহণ করলেও, বাল্যকাল থেকেই শীলভদ্র ধর্ম্মার্জ্জন ও বিদ্যাচর্চ্চার উপর বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। সংসারে মাঝে মাঝে তাঁর মন উদাসীন হয়ে যেত—বৈরাগ্য এসে আশ্রয় করত তাঁকে। তাঁর বয়স যখন ত্রিশ বৎসর, তখন তিনি গৃহত্যাগ করে শাস্ত্রজ্ঞান লাভের তীব্র আকাঙ্খায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে উপস্থিত হন। তখন বোধিসত্ত্ব ধর্ম্মপাল ছিলেন এই আশ্রমের সর্ব্বাধ্যক্ষ। শীলভদ্র ধর্ম্মপালের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এর কিছুকাল পরে এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম্মপালের সঙ্গে ধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্ক করতে আসেন। শীলভদ্র গুরুকে যেতে না দিয়ে নিজেই তাঁর সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং কয়েকদিনের

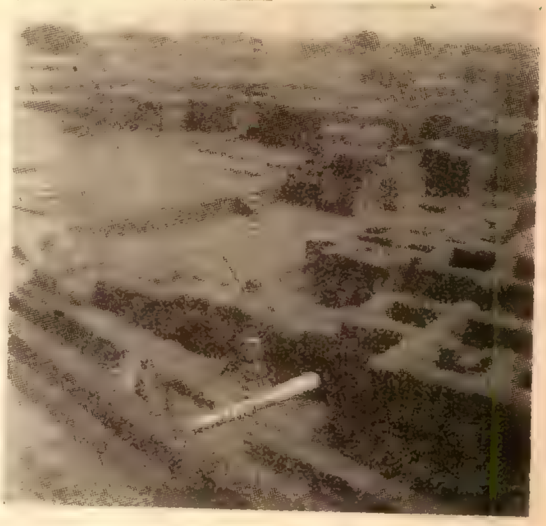

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসস্তূপের একাংশ

পর উক্ত পণ্ডিতকে পরাস্ত করেন। নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে উপস্থিত হবার কিছুকালের মধ্যেই এই ধরণের পাণ্ডিত্যের প্রভায় শীলভদ্রের নাম চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়ে পড়ে এবং তাঁর চারিত্রিক বহুবিধ গুণে ক্রমশঃ তিনি ভিক্ষু, মহাভিক্ষু ও পরিশেষে ধর্ম্মপালের স্থানে মহাস্থবিরের পদে উন্নীত হন।

৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে হিয়াংচুয়াং নামক একজন চৈনিক পর্য্যটক নালন্দায় আসেন এবং পণ্ডিত শীলভদ্রের তর্ক-শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে গুরুত্বে বরণ করেন। প্রায় দীর্ঘ পনেরো মাসকাল সেখানে পণ্ডিত শীলভদ্রের কাছে তিনি সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। হিয়াংচুয়াংয়ের বর্ণনা থেকে তৎকালীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালী ও সেখানকার বিখ্যাত পণ্ডিতদের অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান সম্বন্ধে বহু তথ্য জানা যায়। হিয়াংচুয়াং শীল-ভদ্রের মত ধর্ম্মপাল, চন্দ্রপাল, গুণমতি, স্থিরমতি, প্রভা-মিত্র, জিন-মিত্র প্রভৃতি সে সময়কার আরও কয়েকজন পণ্ডিতের নামোল্লেখ করেছেন।

যোগশাস্ত্র সম্বন্ধেও শীলভদ্রের অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। উপযুক্তভাবে সংস্কৃত শিক্ষালাভের পর হিয়াংচুয়াং তাঁর কাছে যোগশাস্ত্র সম্বন্ধেও শিক্ষালাভ করেন। সে সময়ে যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে এমন পাণ্ডিত্য ভারতে আর ছিল না বললেই হয়।

সর্ব্বাধ্যক্ষ মহাস্থবিরের পদে উন্নীত হলেও শীলভদ্র ছাত্রদের নানা সাধারণ বিষয়েও শিক্ষা দিতেন, দেখাশুনা করতেন। ভিক্ষু জীবনের নিয়মকানুনের কঠোরতা সম্বন্ধে, সংযম সম্বন্ধে, বিভিন্ন নীতি, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি সম্বন্ধে নবাগত ছাত্রদের সমক্ষে তিনি প্রায়ই উপস্থিত হয়ে তাঁর জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দিতেন। ছাত্ররা অভিভূত হয়ে তাঁর ভাষণ শুনত এবং স্ব স্ব জীবনে প্রতি অক্ষরে তা পালন করার চেষ্টা করত। ছাত্রদের অধ্যয়ন শেষ হলে বিদায়কালে তিনি আর একবার তাদের কাছে উপস্থিত হতেন এবং তারা গার্হ্যস্থ জীবনে পদার্পণ করার পূর্ব্বে তাহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আন্তরিকতাপূর্ণ উপদেশ দিতেন।

বিদায়কালে ছাত্রদের প্রত্যেককে প্রশংসাপত্র দেওয়া হত। ব্যাপারটা প্রায় হত সমাবর্ত্তন উৎসবের মত। এই সময় শীলভদ্র তাঁর ভাষণের উপসংহারে বলতেন: "সংসার বড়ই বিপদের জায়গা, তাই আপনাদের অনুরোধ করছি, আপনারা এই উপদেশটি মনে রাখবেন—

"অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে
জিনে কদারিযং দানেন সচ্চেন অলীক বাদিনং॥"

"ক্ষমার দ্বারা ক্রোধ জয় করবে, সাধুতার দ্বারা অসাধুকে জয় করবে, কৃপণকে দান করে আর সত্য দিয়ে মিথ্যাবাদীকে জয় করবে।"

বহু শতাব্দী পূর্ব্বে বিনয়ের প্রতীক, সংযমের গুরু, জ্ঞানের অনন্ত প্রদীপ মহাপুরুষ বাঙালী পণ্ডিত মহাস্থবির শীলভদ্রের তিরোধান ঘটেছে বটে, কিন্তু পৃথিবীর মনীষীদের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের কাছে আজও শীলভদ্রের নাম উজ্জ্বল শিখার মত ভাস্বর হয়ে আছে।

★

কাণামাছি

মানস রায়চৌধুরী

আকাশ পেরিয়ে কখন দিনের ট্রেণ যে থামে;
বাতিওলা গ্যাস জ্বালে, ঘাসে নীল স্বপ্ন নামে!
বেন্‌চে রেলিং-এ মর্শুমী ফুলে ঝরে নিঅন্—
দূরে সুর শুনি, বেতারে সেতারে কাঁপে ইমন।
হাওয়া নেচে যায় এখানে ওখানে কৃষ্ণচূড়ায়…
ক্লান্ত এ মন মুখ ছাখে ভিজে ঘাস-আয়নায়।
শুধু দিশেহারা তাকে পেতে গিয়ে ফুলের হৃদয়ে,
লজ্জায় রাঙা বিকেলের মেঘ কী যেন ভয়ে
উড়ে যায়। তবু হাতছানি দিয়ে প্রাণ নাচায়;
কানামাছি প্রেম জীবন-সন্ধ্যা ঢাকে বেদনায়।

ডাক

আনন্দ বাগ্‌চী

সূর্য্যের সোপান ভেঙে অনবদ্য উঠন্ত সকাল
উঠোন ত পেরোলই। সময়ের অরণ্যে এখন,
পাইন বনের শান্তি ছায়াঘন একোণ ওকোণ
ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যায় ঘুয়ে ঘুয়ে সমান্তরাল,
ঘ্রাণের বিলাস বৃষ্টি নেমে আসে অগণ্য শাখায়
ঘনতর অরণ্যের। মেঘ মেঘ আকাশ ছড়ায়।
আকাশ ছড়ায় বুকে। মেঘ মেঘ একাকী দুপুর
হৃদয়ের কোন এক নির্জ্জন স্বাক্ষরে মুখোমুখী
দাঁড়ায় এবার। একা হ'ল তাই ছায়া মারে উঁকি,
সন্ধ্যা-গাঢ় আভা নামে, ঝরে সেই মুহুর্মুহুঃ সুর
স্তম্ভিত রাত্রির। ভিড় নেই। এই জীবন অবাক।
নৈমিষারণ্যের থেকে আসে দূর সমুদ্রের ডাক।

নার্স

মানবেন্দ্র পাল

প্রথম দৃশ্য

[রিক্সা একটা চলেছে : ঠুন্—ঠুন্—ঠুন]

অসিত। (ব্যস্ত হয়ে) এই রিক্সা রোখো—রোখো—সাবিত্রীদি না? (একটু থেমে)

কী, চিনতে পারছেন না বুঝি? তা অবিশ্যি অনেক দিন হয়ে গেল, মনে না থাকবারই কথা।

সাবিত্রী। না, না, চিনতে পেরেছি বৈকি! কিন্তু আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি এই ভেবে যে, এখনো আমাকে আপনার মনে আছে!

অসিত। মনে না থাকবারই বা কারণ কি?

সাবিত্রী। না, কারণ কিছু নেই,—তবে কি জানেন? কেউ তো বড়ো একটা আমাদের কথা মনে রাখে না।

অসিত। অপরাধ সত্যিই। কিন্তু কর্ম্মব্যস্ত পৃথিবীতে মানুষকে এই নিয়ে দোষ দেওয়াও যায় না। স্মৃতির যে নার্ভটা মানুষকে ভাববার শক্তি যোগায়, তার নিজের শক্তি কতখানি, তা তো বুঝতে হবে!

সাবিত্রী। (হাসির সঙ্গে) ঐ যে ক্রমশঃ দেখছি এন্যাটমিতে চলে এলেন। যাক্, এখন বাড়ির খবর কী বলুন। খোকন কেমন আছে?

অসিত। খোকনের খবর আর মাঝপথে দাঁড়িয়ে কেন? এই তো কাছেই বাসা, দু' পা এগিয়েই চলুন না দেখে আসবেন!

সাবিত্রী। (ইতস্ততঃ করে) কারও বাড়িতে যাবার এই কী সময়! আপনিও তো অফিসমুখো। বরং সময় করে কোনোদিন সকাল কিম্বা সন্ধ্যের দিকে আসব।

অসিত। আসবেন তো নিশ্চয়ই, তাই বলে বাসাটাও তো চিনে যেতে হয়! অফিসে আমার দু' দণ্ড দেরী করে গেলে কোনো ক্ষতি নেই। চলুন, দেখবেন—আপনার পেসেন্ট আপনাকে পেয়ে কী রকম খুসি হবে।

সাবিত্রী। তাই চলুন। বাসাটা অন্ততঃ চিনে রাখি। বসতে তো পারবো না এখন, শুধু চোখের দেখা। (একটু থেমে) খোকন খুব দুষ্টু হয়েছে, তাই না? বয়েস যেন ঠিক কত হল?

অসিত। দু বছর পূর্ণ হয়ে দু' মাস। দুষ্টুর একশেষ। ওকে তো সামলানোই দায় হয়ে উঠেছে। গিয়ে নিজের চোখেই দেখতে পাবেন সব।

সাবিত্রী। কত দূর আপনার বাসা?

অসিত। ঐ তো, ঐ মোড়টা ঘুরলেই—চলুন না, এই তো এসে পড়েছি। হ্যাঁ, কী বলছিলাম—

আপনার হয় তো মনে নেই, আপনি আমায় ঠিকানা দিয়েছিলেন, কিন্তু গিয়ে যে দেখা করবো, এমন সময় পেয়ে উঠি নি। শেষে এমন হ'লো—যত দেরী হতে লাগল, ততই লজ্জা আর সংকোচ বেড়ে উঠতে লাগল। ভাবলাম, এতদিন পরে আর হঠাৎ যাইই বা কী ব'লে?

সাবিত্রী। তা বটে; কিন্তু যদি সেদিন প্রয়োজন পড়ত, তা হলে নিশ্চয়ই সংকোচের দোহাই দিয়ে বসে থাকতেন না।

(একটু থেমে স্বগত)

আমাদের সঙ্গে যে সাধারণের প্রয়োজনেরই সম্পর্ক। প্রয়োজন না থাকলে সম্পর্কও থাকে না। (দীর্ঘনিশ্বাস) (পরে স্বর বদলে)—তা যাক্, মহাশয়ের অদূর ভবিষ্যতে কি আর আমাকে প্রয়োজন হবে না?—মানে নতুন কোনো সম্ভাবনা?

অসিত। রক্ষে করুন, রক্ষে করুন,—একটাতেই কুল পাই না, আরও? গরীবের সংসারে বাপ-মায়ের সখ থাকাও পাপ।

সাবিত্রী। একে যদি পাপ বলেন তো পুণ্য বলে যে সংসারে আর কিছুই থাকে না অসিত বাবু! হাসপাতালের বাঁধাধরা কর্ত্তব্যকর্ম্মের মধ্যে এই তো আমাদের মস্ত বড়ো

সান্ত্বনা। প্রতিদিন কত নতুন শিশু জন্ম নেয়—দেবতা নেমে আসে পৃথিবীতে। তাদের সেই অকৃত্রিম স্বর্গীয় সুষমার দিকে তাকিয়েই যে আমাদের পুণ্য-স্নান!

অসিত। এই যে দিদি, এই বাড়ি। ঐ তো করুণা। (তারপর করুণার উদ্দেশে) কী, চিনতে পারছ না দিদিকে?

করুণা। চিনতে আবার পারব না? আসুন দিদি, বাব্বাঃ, এত দিনে মনে পড়ল?

অসিত। রাস্তার মোড় ঘুরতেই হঠাৎ দিদির সঙ্গে দেখা। এত কাছাকাছি এসেও আমাদের বাড়ি না হয়ে যাবেন, তা কি হয়? ধরে আনলাম।

করুণা। ও মা! এত কাছাকাছি এসেও পালিয়ে যাচ্ছিলেন!

সাবিত্রী। পালাব আর কোথায় বোন? পালাবার কী পথ আছে? কই, খোকন কই—খোকন?

করুণা। বাসু? পাশের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছে। এখুনি আসবে। (একটু থেমে)—এই তো শ্রীমান এসে পড়েছে।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে দিদি, বাসু আপনাকে ডাকবে কী বলে—মাসী না পিসি?

সাবিত্রী। সেটা বাসুর ওপরই ছেড়ে দেওয়া যাক্। সুবিধে মতো বাসুই এক সময়ে বেছে নেবে।

এসো, এসো, আমার কাছে এসো। বাঃ! বেশ লক্ষ্মী ছেলে তো!—

অসিত। আপনি একটু বসেই যান দিদি। বাসুর সঙ্গে আলাপ না করলে বাসু ক্ষুণ্ণ হবে। আমি পালাই। আবার দেখা হবে। [প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

অসিত। (স্বগত) ছ বছর আগের সেই সাবিত্রীদি! দীর্ঘ সবল সুশ্রী চেহারা—মুখে মিষ্টি হাসি—আর একটা অপূর্ব্ব লাবণ্য আর দৃঢ়তার স্পষ্ট প্রকাশ।

করুণাকে নিয়ে গিয়ে ভর্ত্তি করে দিয়ে এলাম হাসপাতালে। তিলার্দ্ধ জায়গা নেই। দরজায় দরজায় কর্ত্তৃপক্ষের নোটিশ—স্থানাভাব।...তবু বহু কষ্টে তারই মধ্যে একটা জায়গা পাওয়া গেল। অনেক চিন্তা আর দুর্ভাবনার মধ্যে একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

কিন্তু করুণা? করুণার দিকে যে তাকানো যায় না।

করুণা। (আর্ত্তস্বরে) উঃ, আমি যে কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না গো! হয় ডাক্তারকে বলে ওষুধের ব্যবস্থা করো, নয় তো মেরে ফেলো আমাকে। উঃ, সমস্ত শরীর যেন আমার ছিঁড়ে গেল।

অসিত। তুমি একটু চুপ করো লক্ষ্মীটি। দেখি, কী করতে পারি! ঐ যে একজন নার্স আসছেন।

(গলা ঝেড়ে নিয়ে নার্সকে)—পেসেন্ট কিছুতেই পেইন সহ্য করতে পারছে না। কিছু একটা ব্যবস্থা যদি করেন দিদি—।

সাবিত্রী। কী ব্যবস্থা করব বলুন?

(করুণাকে) খুব কষ্ট হচ্ছে, না। মা হওয়া কি এতই সহজ? সহ্য করতে হবে বৈকি!

করুণা। আমি পারছি না—আমি পারছি না দিদি, বিষ দিয়ে আমায় মেরে ফেলুন।

সাবিত্রী। মেরে ফেললে আর ছেলের মুখ দেখবেন কী করে? নিন্ চুপ করুন। এবার চেঁচালে লেবার রুমে নিয়ে গিয়ে ফেলে রাখব। ষ্টাফ এরপর আর এ্যালাউ করবে না এখানে।

(করুণার আবার কাতর ক্রন্দন)

অল্প বিরতি

সাবিত্রী। (অসিতকে) এ কী, আপনি পুরুষ মানুষ না? আপনিও এতো নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

অসিত। না, তা নয়। মানে—সত্যি সত্যিই তাহলে ওকে লেবার-রুমে নিয়ে গেলেন?

সাবিত্রী। উপায় কি! ষ্টাফের অর্ডার।

অসিত। সিরিয়াস কিছু হবে না তো?

সাবিত্রী। (হেসে) অত বলবার অর্ডার নেই আমাদের। বাইরে বেঞ্চি রয়েছে, ওখানে গিয়ে অপেক্ষা করুন। আশা করছি ভালো খবর নিয়েই আজ বাড়ি ফিরতে পারবেন।

অসিত। কী বলে আপনাকে ধন্যবাদ দেব দিদি—

সাবিত্রী। নীরস ধন্যবাদে ঘেন্না ধরে গেছে। কী দেবেন তাই বলুন।

অসিত। ভালো খবরটাই আগে পাই, তবে তো—।

সাবিত্রী। পুরো দশটাকার একখানি নোট চাই, বলে রাখছি। বাজারে আজকাল মিষ্টির দামটাও নেহাৎ কম নয়; জানেন তো?

অসিত। জানি বৈকি! তা—দশ হোক্ পাঁচ হোক্ দেখা যাবে। (একটু থেমে) আপনি দয়া করে আর একবার দেখে আসুন, বড়ো ভাবনা হচ্ছে।

সাবিত্রী। উঃ, আপনি দেখছি এখানকার ডিসিপ্লিন রক্ষা করে কাজ ক'রতে দেবেন না। [প্রস্থান]

পরের দিন।

অসিত। কেমন বোধ করছ আজ?

করুণা। অনেকটা ভালো। তুমি এত দেরীতে এলে?

অসিত। কয়েকটা জিনিস কেনবার ছিল; তাই দেরী হয়ে গেল।

করুণা। কী দেখছ অমন করে? এখন বুঝি আর আমায় দেখতে ইচ্ছে করে না?

অসিত। নতুনের আদর চিরদিনই একটু বেশি। তাই অকৃপণ দৃষ্টিপাতে তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

করুণা। কার মতো দেখতে হবে বলো তো?

অসিত। কী জানি! আমাদের দৃষ্টিটা বড়ো স্থূল।

করুণা। সাবিত্রী দি বলেছেন, ঠিক তোমার মতো।

অসিত। সাবিত্রী দি! তিনি আবার কে?

করুণা। বাঃ, সাবিত্রীদির সঙ্গে কাল এত কথা বললে আর আজ জিজ্ঞেস করছ সাবিত্রীদি কে?

অসিত। ও! ঐ নার্স ভদ্রমহিলা?

করুণা। নার্সের রূপটাই তোমরা দেখো, কিন্তু এই দুটো দিনের মধ্যে আমি ওঁর আসল রূপ দেখে নিয়েছি। বড়ো চমৎকার! এই ওয়ার্ডে দেখলাম ঐ একটি মাত্র মানুষকে—যিনি সর্বান্তঃকরণে সেবা করেন। আমার মনে হয়—ওঁরও ঘর আছে, সংসার আছে। নইলে এমন করে—

ঐ আসছেন সাবিত্রী দি।

সাবিত্রী। কেমন, ছেলের চাঁদমুখ দেখে এবার শান্ত হলেন তো?

অসিত। (কতকটা ইতস্ততঃ কণ্ঠে) হ্যাঁ—অ—কিছুটা অস্থির হয়েই পড়েছিলাম বৈকি!—এ সত্য লুকোলে যে অন্যায় হবে। কিন্তু তবু বলব আমার সেই শোচনীয় মুহূর্তে আপনিই ছিলেন একমাত্র নির্ভরস্থল। আপনিই রক্ষে করেছেন, আপনার কাছে আমার ঋণের শেষ নেই দিদি।

সাবিত্রী। নিন থামুন, যথেষ্ট হয়েছে। ছেলের মুখ কি শেষে শুধু-হাতেই দেখলেন?

অসিত। উপায় কি? গরীব বাপ—বুকভরা আশা আর আশীর্ব্বাদ—এই তো সম্বল! সোনা দিয়ে মুখ রাখি এমন সাধ্য কই? (একটু থেমে) তা বলে আপনাকে বঞ্চিত করলে আমি অকৃতজ্ঞ হব। এই নিন—খুশির যৎ-সামান্য দক্ষিণা (ব'লে পাঁচ টাকার একখানি নোট সে এগিয়ে ধ'রলো সাবিত্রীর দিকে)।

সাবিত্রী। বাঃ রে! এই বুঝি কথা ছিল?

অসিত। অবস্থা তো বুঝতেই পারছেন। এই দিয়েই কোনোরকমে মিষ্টিমুখ সেরে নেবেন। কিন্তু এরপর একদিন আপনাকে আমার বাসায় চাই-ই। আপনার ঠিকানাটা পেলে অন্ততঃ জোর করে ধরে আনতে পারব।

সাবিত্রী। বাড়ি বলতে আপাতত আমার কিছুই নেই। থাকি এখানকার নার্সেস কোয়ার্টারে। তবু আসবেন, চেষ্টা করব যাবার। আত্মীয়তায় আপত্তি নেই।

অসিত। বেশ, এই কথাই তবে রইল।

তৃতীয় দৃশ্য

করুণা। এ কী আরম্ভ করেছেন দিদি! এ রকম করলে কিন্তু ঝগড়া সুরু করব।

সাবিত্রী। আমাদের দেশে বোনে বোনে এই চিরন্তন ঝগড়াটার ভেতরেই একটা গভীর অনুরাগ লুকনো

থাকে। আমি সে-রকম ঝগড়ার জন্যে সব সময়েই প্রস্তুত।

করুণা। না—না—ও কী। এত খেলনা—এত খরচ করে রোজ রোজ—উনি কিন্তু খুব রাগ করবেন। আর দেখুন বাস্নুকে, কী লোভী। ওঁর এদিকে হুঁশই নেই। ওঁর যেন সব ক'টিই দরকার।

দেখুন, দেখুন, কী ভাবে আগ্‌লে ধরেছে!—যেন আমি কেড়ে নিতে যাচ্ছি।

সাবিত্রী। সামান্য খেলনা দিয়ে এই যে উপভোগ, এর কি তুলনা আছে বোন?

করুণা। এই তো উনি এসে পড়েছেন।

(অসিতের প্রবেশ)

সাবিত্রী। আসুন—নমস্কার।

অসিত। কী সৌভাগ্য। কতক্ষণ?

সাবিত্রী। তা অনেকক্ষণ হল বৈ কি।

করুণা। দেখো দিকি দিদির কাণ্ড। আবার এক-গাদা খেলনা এনেছেন বাস্নুর জন্যে।

অসিত। হুঁ,-তাই তো দেখছি। (একটু থেমে) মাসীর কোলের চেয়ে মাসীর দেওয়া বলটাই বুঝি বেশি প্রিয় হয়েছে বাস্নুর?

সাবিত্রী। বাস্নুর কাছে দুইই প্রিয়। কোনোটাই কোনোটা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বিচ্ছিন্ন করবার চেষ্টাও করে না।

অসিত। এক কাজ করুন দিদি, বাস্নুকে বরং আপনি নিয়ে যান। ওর মা ওকে মোটেই দেখতে পারে না। বিশ্বাস না হয় জিজ্ঞেস করুন বাস্নুকেই।

সাবিত্রী। (স্মিতহাস্যে) পারবেন হাতে করে তুলে দিতে ছেলেকে? একটুও বাজবে না?

করুণা। উনি পারবেন বাস্নুকে ছেড়ে থাকতে—তবেই হয়েছে! আপিস থেকে এসে দু' দণ্ড বাস্নুকে দেখতে না পেলে যিনি অস্থির হয়ে ওঠেন, তিনি থাকবেন আবার বাস্নুকে ছেড়ে।

সাবিত্রী। দরকার নেই আপনাদের বাস্নুকে ছেড়ে থেকে। আমি এমনি করে এসে এসেই বাস্নুকে চোখের দেখা দেখে যাব। এই আমার যথেষ্ট।

চতুর্থ দৃশ্য

করুণা। চিঠি আছে।

অসিত। কার?

করুণা। তোমার। আমারও অবশ্য আছে, দু'লাইন।

অসিত। বাঃ চমৎকার হাতের লেখা তো! কে লিখেছে?

করুণা। খুলেই দেখো না।

অসিত। (চিঠি খুলে) এ কি, সাবিত্রীদি!

(চিঠি পাঠ)—হ্যাঁ, হঠাৎই চিঠি লিখতে বসলাম। এক একসময় নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলো এত ভারি হয়ে ওঠে যে, তখন মনে হয় কোথাও ছুটে যাই—বেরিয়ে পড়ি এ কারাগার থেকে।

কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে চাবুক মেরে প্রকৃতিস্থ করে নি। আমার এই চিঠি লেখা সেই চাবুক খাওয়া মুহূর্তের প্রতিক্রিয়া মাত্র।

দৈব দুর্বিপাকে—দৈব দুর্বিপাকই বলব, সেদিন আপনাদের ওখানে সেই যে প্রথম গেলাম—সেই থেকে কিছুতেই ভুলতে পারছি না আপনাদের। ভাববেন হয়তো, এতে আর ভাবনা কি? গিয়ে দেখা করলেই তো পারি।

কিন্তু পারি না কেন, তা যে বোঝাবার ক্ষমতা নেই!

বাস্নুকে দেখে অবধি জানি না আমার কী হল। আমি আর অন্য কিছু চিন্তা করতে পারছি না। তাই ভয় হয়, বুঝিবা বাস্নুও আমার জীবনে একটা ক্ষণস্থায়ী স্বপ্ন! ওকে কোলে নিতে গিয়ে তাই আমার সর্বাঙ্গ কেঁপে ওঠে। কেন তা জানি না। সে আমি কাউকে বোঝাতে পারব না অসিত বাবু।

একদিন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম—আত্মীয়তায় আপত্তি নেই। সেই অধিকারেই আজ আমি আপনাদের অনুরোধ করব—বাস্নুকে মানুষ করে তুলুন, সার্থক করে তুলুন ওর জীবনকে। ওর ভেতর দিয়ে যেন আমরা বেঁচে থাকি—এই আশ্রয়টুকুই ভিক্ষা।

আপনি বলবেন হয় তো—ছেলেস ভবিষ্যৎ গড়ে তোলবার কী সম্পদ আছে আমাদের? চাকরী জীবনে উন্নতি নেই, বাজার অন্ধকার—চারিদিকে হতাশা…।

তবু আমি বলব, সেই অন্ধকারের ভেতরেই আলো জ্বালতে হবে আপনাদের। উত্তর-পুরুষের পথ পূর্ব্ব পুরুষেরা যদি তৈরী করে দিয়ে না যায়, তা হলে দিকভ্রম হবে যে!

শুনেছেন বোধ হয়, হাসপাতালের চাকরীটা সম্প্রতি আমি ছেড়ে দিয়েছি। নতুন বাসা নিয়েছি মনোহর দাস লেনে। প্রাইভেট্‌লি কাজ করব, অবশ্য নার্সেস ইউনিয়নের আওতারেই। এতে কর্ত্তৃপক্ষের কাছে যখন-তখন জবাব-দিহি করতে হবে না, এই যা আনন্দ।

এ ছাড়া আর একটা আনন্দ আছে—নতুন করে সংসার করবার অভিনয়। দেখি খেলাঘর নিয়ে কতকাল খেলা করা যায়!

আসুন না একদিন করুণা আর বাসুকে নিয়ে। আমার নতুন পাতানো সংসারে আমার সর্ব্বান্তকরণের অরুপণ আমন্ত্রণ রইল। ইতি—

করুণা। সত্যিই যাবে নাকি একদিন বেড়াতে?

অসিত। মন্দ কি! উদ্যোগ ক'রে গেলেই হল একদিন।

করুণা। যেমন ক'রে বললে, তাতে যাবার ইচ্ছে বোঝায় না। সমাজে বাস কর, অথচ কারুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাও না—তুমি কী বলো তো!

অসিত। দশ বছর কেরাণীগিরি ক'রে কি আর মানুষ আছি যে সমাজ সম্বন্ধে ভাববো?

করুণা। কিন্তু আমারও তো সাধ আহ্লাদ ব'লে কিছু আছে! আমি তো তোমার মতো এমন বুড়িয়ে যাইনি। কোথাও বেরোতে পারবো না—কেবল ঘরে বসে হাঁড়ি ঠেলবো আর তোমার ছেলে আগলাবো—এই কী আমার সব!

অসিত। দোহাই তোমার, একটু চুপ করো। এক-দিন বেড়াতে যেতে চাও—এই তো? উদ্যোগ ক'রে কখনও বেরিয়ে প'ড়লেই হলো। এই নিয়ে খেদ বাড়িয়ে লাভ কি!

করুণা। খেদ ক'রেই যার জীবন কাটলো, তার আ-খেদ ক'রে লাভ কি! ঠিকই তো!

(বলতে বলতে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

[দরজায় করাঘাত—ঠক্—ঠক্—ঠক্]

সাবিত্রী। যাই। (দরজা খোলার শব্দ)

(বিস্ময়ে) এ কী, আপনি! আসুন, আসুন, ভেতরে আসুন। কিন্তু একা? করুণা কৈ? বাসু?

অসিত। প্রশ্ন তো অনেকগুলিই করলেন এক সঙ্গে। কিন্তু একে একেও অতগুলো উত্তর জোগাবে না আমার মুখে। এক কথায় সারি—সম্পূর্ণ খেয়ালের বশে আজ হঠাৎই চলে এলাম অফিস থেকে। ভাবলাম প্রথম দিন এসে বাড়িটা তো অন্ততঃ চিনে যাই।

সাবিত্রী। সেটুকুও আমার ভাগ্য! আসুন, এই আমার ঘর—আমার নতুন সংসারও বলতে পারেন।

বাসু আর করুণাকে নিয়ে এলে সত্যি আমি আরও খুশি হতাম।

অসিত। খুশি আমিই কি কম হতাম? কিন্তু—

সাবিত্রী। থাক্ আপনার 'কিন্তু'; বাসু ভালো আছে তো?

অসিত। যেমন দেখে এসেছিলেন, তার চেয়ে খারাপ নয়। করুণাও তাই; আমারই কেবল পরিবর্ত্তন। আজ আনন্দ, কাল দুঃখ, আজ আশা, কাল হতাশা, আজ সুস্থ, কাল অসুস্থ। হা-হা হা-হা! বুঝতেই তো পারছেন—সংসারচক্রে একেবারে নিষ্পেষিত হয়ে গেছি।

সাবিত্রী। থামুন দয়া করে; ও আর শুনতে ভালো লাগে না।

অসিত। জানি, পুরুষদের কৃচ্ছ্রসাধনা মেয়েদের হৃদয় স্পর্শ করে না।

সাবিত্রী। তাদের সেই সাধনা যেখানে অহমিকাশূন্য, সেখানে তারা নমস্য, কিন্তু যেখানে তাদের নিজের ব্যক্তি-মানুষটিই বড়ো হয়ে দেখা দেয়, সেখানে মেয়েদের মনে বড়ো বেশি সাড়া না জাগাটাই তো স্বাভাবিক।

অসিত। আপনার হেঁয়ালি বুঝতে পারি, এমন বুদ্ধি আমার নেই দিদি। বরং—

সাবিত্রী। (হেসে) বরং—একটু বিশ্রাম করুন, আমি চায়ের জোগার করি। মালতী-বৌ, ও মালতী-বৌ, বলি জল চড়িয়েছ?

অসিত। ইনি আবার কে? আমি তো জানতাম—

সাবিত্রী। আমারই মতো আর এক হতভাগিনী। কপাল পুড়েছিল আগেই, তারপর যেটুকু আশ্রয় ছিল, তাও গেল দেশ-বিভাগের কল্যাণে। আমার বাপের বাড়ির দেশেরই মেয়ে মালতী;—একই গাঁয়ের বৌ হয়ে স্বামীর ঘর করেছিল কিছুকাল। তারপর বিধবা হয়ে কপাল ভাঙল। (একটু থেমে) ওর জন্তেই তো বিশেষ করে বাসা নেওয়া। দেখি—নার্সেস ইউনিয়নে যদি কিছু একটা সুবিধে করে দিতে পারি।

অসিত। (দুঃখিত কণ্ঠে) জানি না দেশ-বিভাগের ফল আমাদের জাতির ভাগ্যে কতখানি সুকৃতি বয়ে নিয়ে এসেছে, তবে এইটুকু জানি—আর যাই হোক, চরম দুঃখকে আলিঙ্গন করতে হয়েছে মালতীর মতো অসহায় নিঃসম্বল হাজার হাজার মেয়েদের। উলুখড়ের মতো ভেসে চলেছে তাদের লক্ষ্যহীন জীবন। বিধাতা জানেন—সমাজের কোথায় কোন্ স্তরে গিয়ে দাঁড়াবে তারা?

সাবিত্রী। (ব্যঙ্গচ্ছলে) বিধাতাই জানেন বটে! তা যাক্—

(স্বল্প থেমে) ঐ দেখুন না, দরজার আড়ালে উন্মুখ হ'য়ে রয়েছে মালতী-বৌ। কিছু বলতে চায় আমাকে। বাইরের একজন পুরুষের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলবার সাহসটুকু পর্য্যন্ত ওর নেই। কী লজ্জা!

ভাবি, এই লজ্জা আর সংকোচ নিয়ে জীবন-সংগ্রামে ও টিকবে কী ক'রে!

অসিত। মানুষের জীবনে সত্যিকার সংগ্রামের দিন যখন আসে, তখন আর মানুষ তার লজ্জা আর সংকোচের ঘেরাটোপে আঁটকে থাকে না, স্রোতোস্বতীর মতই তাকে তখন সামনে ঝাপিয়ে পড়তে হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনও তৈরী হ'য়ে যায়, তা নিয়ে কাউকেই বড় একটা ভাবতে হয় না দিদি।

সাবিত্রী। আমি বলি, মন প্রস্তুত হলেই সময় উপস্থিত হয়। সময়টাতো মনেরই রচনা। তা যাক্—

আপনি একটু একা বসুন ভাই, একবারটি ভিতর থেকে ঘুরে না এলে এরপর মালতী-বৌ আমাকে আর আস্ত রাখবে না। এমন মানুষকে নিয়ে ঘর ক'রে কী সুখেই আছি দেখুন না!

(উঠে ক্রমে দরজার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল)

অল্প বিরতি

সাবিত্রী। (ফিরে এসে) কী ভাবছেন বলুন তো?

অসিত। (চিন্তিত কণ্ঠে) আপনার এই নতুন সংসার দেখে কেবলই মনে হচ্ছে, এ যেন একটা বিদ্রূপ। কবে কোথায় যেন কী একটা বস্তু পথের মাঝে হারিয়ে গিয়েছিল—আজ দীর্ঘ দিন পর সেই ব্যথার ওপর অভিমান করে পথের ধুলোয় পেতেছেন আসন।

দেহ পুড়ে ছাই হয়ে গেল—তবু তার নিস্পন্দ ছবি বুকে আঁকড়ে ধরার যে রোমাঞ্চ—আজ যে তারই প্রকাশ দেখি আপনার সর্ব্বাঙ্গে।

সাবিত্রী। এ সব আপনি কী বলছেন অসিত বাবু!

অসিত। সত্যি করে বলবেন সাবিত্রী দি, হতভাগিনী মালতীর ভাগ্য আর আপনার ভাগ্য—এর মধ্যে কি খুব বেশি প্রভেদ আছে?

(একটু থেমে) চুপ করে রইলেন কেন? বলুন। বাধা থাকলে অবিশ্যি বলতে হবে না, কিন্তু ভাই হিসেবেও তো একটা কৌতূহল আছে!

সাবিত্রী। আমি সব কথাই বলব অসিত বাবু। এতদিন এমন একজনকেও পাইনি—যার কাছে অকপটে খুলে বল্‌তে পারি আমার জীবনের ইতিহাস। বল্‌বার জন্তে আমারই কি বুকখানি কম আকুলি বিকুলি করে! এতদিনে আজ হয়ত সেই সুযোগ খানিকটা এলো!

(একটু থেমে) জানেন অসিত বাবু, সুন্দর সংসার একদিন আমারও ছিল। সেই সংসারে আমি ছিলাম সম্রাজ্ঞী। তিলে তিলে স্নেহ আর ভালোবাসা দিয়ে সেই সুন্দর সংসারটিকে আমি পরিপূর্ণ ক'রে তুলেছিলাম।

আমরা তিনজন। স্বামী, স্ত্রী আর একটিমাত্র ছেলে। —রাজা রাণী আর রাজকুমার। সাধ করে ছেলের নাম রেখেছিলাম গৌতম।

হয়তো একদিন সে সিদ্ধার্থও হতে পারতো, কিন্তু —কিন্তু বিধাতার প্রাণে তা সইল না।

হঠাৎ একদিন সে অসুখে পড়ল। ডাক্তার এল—এল দামি দামি ওষুধ। কিন্তু গৌতম আমার আর চোখ মেলল না। এই বুকে মিলিয়ে গেল তার শেষ নিশ্বাস। (ব'লে অশ্রু চেপে নিল)

কেন যে আমার 'গৌতম' হয়ে এসেছিল সে—আর কেন যে এম্‌নি করে অসময়ে পালিয়ে গেল, তার উত্তর আজও খুঁজে পেলাম না অসিত বাবু।

কিন্তু ঠিক সেই মুখখানি আজ কত কাল পর—কত কাল পর আবার বুঝি খুঁজে পেলাম!

অসিত। কার মধ্যে?

সবিত্রী। আপনার বাম্বুর মধ্যে।

অসিত। এমনি করে চোখের জল ফেল্‌তে নেই দিদি। আমার বাম্বু তো আপনারই। আপনিই তো বাম্বুর প্রথম মর্য্যাদা দিয়েছেন। ছিঃ, এত অধীর হতে নেই দিদি।

সবিত্রী। অধীর আর হলাম কবে? শক্ত করেই যে বুক বেঁধেছি। কিন্তু সেদিন যে শক্তি দিয়েও পারলুম না নিজেকে বাঁচাতে।

গৌতমের সঙ্গে সঙ্গে আমারও মৃত্যু হল সেদিন। শয্যাশায়ী হয়ে পড়লাম দীর্ঘ দিনের জন্যে। সেই সময় দেখলাম আর এক পরিবর্ত্তন—নিষ্ঠুর পরিবর্ত্তন অসিতবাবু।

গৌতমের বাবা পিছ্‌লে গেলেন ধর্ম্মের পথ থেকে। নারীদেহের প্রলোভন তাঁর ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ে জ্বালালো আগুন। তুচ্ছ তখন তাঁর কাছে আমার সেই রোগজীর্ণ দেহ—তুচ্ছ তখন পুত্রশোক—তুচ্ছ সংসারের আসক্তি! তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন আগুনের শিখা বুকে জড়িয়ে। সেই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল সুখ-বিলাসিনী রাজ-অন্তঃপুরিকা এই মহারাণী।

বল্‌লাম—আমার এই সংসারে যাকে-তাকে নিয়ে এসে তুমি এমন হাসি-তামাসা করতে পারবে না। দোহাই তোমার, আমার মৃত্যু পর্য্যন্ত অন্ততঃ অপেক্ষা করো।

স্বামী উত্তর দিলেন—সহ্য করবার শক্তি যদি না থাকে তবে সরে দাঁড়াও। আমার প্রয়োজন আমার কাছে প্রশ্রয় পাবেই।

রাজ-গৃহে রাজার সঙ্গে রাণীর সেই শেষ সম্পর্ক। একটা দিনও আর থাকতে পারলুম না সেখানে। সেই দুর্ব্বল দেহভার টানতে টানতে পথে এসে দাঁড়ালাম।

অসিত বাবু, জানি, পথের মাঝে একদিন যা হারিয়েছি, আজ সেই ব্যথা স্মরণ করে—পথের ধূলোয় আসন পাতা আমার ব্যর্থ—তবু যে পারি না—পারিনা সব ছেড়ে—নিরালায় বসে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে নিষ্ঠুর ভাবে।

যে অমৃতে একদিন সর্ব্বাঙ্গে বিষ ঢেলে দিয়েছিল, আজ সেই শূন্য ভাণ্ডটাই বড্ড বড়ো সান্ত্বনা।

(কাঁদলো সাবিত্রী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে)

[অসিতের কণ্ঠে কোনো কথা প্রকাশ পেলো না, ধীরে ধীরে উঠে একসময় সে বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল]

অষ্টম দৃশ্য

চলার পথে:

অসিত। (স্বগত)—যে নারী হাজার হাজার রোগীর দুঃসহ যন্ত্রণা সেবা দিয়ে শুশ্রূষা দিয়ে সুস্থ করে তুলে সমাজে নতুন করে নবজীবনের পথ তৈরী ক'রে দিচ্ছে—তার নিজের নিরুদ্ধ জীবনের বুক-ফাটা যন্ত্রণা মুছে দিতে পারে এমন নার্স কে আছে পৃথিবীতে?

আমরা শুধু মানুষের বাইরেটাকে নিয়েই চিরকাল বিচার করেছি, ভেতরটাকে অনুসন্ধান করে দেখতে যাই নি। সেখানে যে কত ব্যথা—কত হাহাকার—কত ক্লেদ —মাঝে মাঝে তা এমনি করেই চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠে সমস্ত অনুভূতিকে একেবারে ঘুলিয়ে দিয়ে যায়। মনকে সান্ত্বনা দেবার কোনো ভাষা কিম্বা প্রতিকারের কোনো পথই তখন চোখে পড়ে না।

(স্বল্প থেমে) বিদায় সাবিত্রী, তোমার মাতৃত্বের মহিমার উদ্দেশে নমস্কার করি—নমস্কার করি তোমার বঞ্চিত জীবনের এই দুর্গম অভিযানকে। তুমি জয়ী হও। *

*'কথা সাহিত্য'—চৈত্র, ১৩৫৮-এ প্রকাশিত শ্রীরণজিৎ কুমার সেনের বিখ্যাত 'নার্স' গল্পের নাট্যরূপ প্রস্তাব।—অভিনয়ের ভিত্তিতে প্রধানতঃ এই নাটিকা গড়িয়া উঠিয়াছে।—নাট্যকার

প্রভাত দেব সরকার

সেদিনটা বোধ হয় এমনি ছিল।

এমনি কয়লার ধোঁয়ার মত নুয়ে-পড়া বিবর্ণ আকাশ, এখনি হব-হব-বৃষ্টি, থমথমে ভাব, অচেনা-অদেখা স্থানেব বিস্ময়, ভয়।

ঠিক জায়গায পৌঁছলুম তো। গাড়ীর জানালার বাইরে মুখ বাড়িয়ে ত্রস্ত চোখে চেয়ে দেখেছিল নিভা। না, এইখানেই নামতে হ'বে—শিলাপট্টে কালো অক্ষরে ষ্টেশনের নাম লেখা, হাওবাগ।

হাতে ধরে নামাবার যখন কেউ নেই, তখন নিজে থেকে নামতে হয়। তাড়াহুড়োও করতে হয়। কি জানি গাড়ি যদি ছেড়ে দেয় আবার।

প্ল্যাটফরমে নেমে চোখ তুলে চারিদিক চেয়ে দেখলে নিভারাণী। বিদেশ মানে যে কি, সহসা তার উপলব্ধিতে মুহূর্তে হাত-পা যেন হিম হয়ে যায়। জন্মভূমির সমস্ত অবজ্ঞা, অনাদর, অবহেলা এখন যেন শতগুণ শ্রেয় মনে হয় নিভার। দেশে দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের আশ্রয়ের লাঞ্ছনার ভয়ে এতদূরে চলে আসাটা বোধ হয় ঠিক হয়নি। একি দেশ! আর যাদের ভরসায় এখানে আসা, তারাই বা কেমন!

দু-পাশে ধুসর পাহাড়, মাঝখানে নির্জীব ময়ালের মত রেল লাইন, মাথার ওপর গুমরে ওঠা মেঘলা আকাশ—সবটা মিলিয়ে একটা প্রাগৈতিহাসিক রহস্যের দুর্বোধ্যতা। গা ছম্-ছম্ অপরিচিতি। ষ্টেশনটা যেমন নেড়া-নেড়া মানুষ-জনও এখানের তেমনি বোকা-বোকা। কারুর মুখে চোখে এতটুকু প্রাণের স্পর্শ নেই। পাথরের দেশে সব যেন পাথর। ধূসর বর্বণ সর্বত্র।

বুকের ভেতর থেকে হাতড়ে টিকিটটা বের করলে নিভা। ছত্রিশ ঘণ্টা বুকের উত্তাপে টিকিটটা কেমন যেন ফুলে উঠেছে—ঘামে ভিজে জুতোর মত খস্ খস্ করছে। Howrah to HowBagh—765 miles.

বুকটা যেন খালি হয়ে যায় এতক্ষণে। অনেকটা পথ চলে আসা হ'য়েছে বিকারগ্রস্থের মত—যেন কিছুরই খেয়াল ছিল না। চোখের সামনে পাহাড়ের ওপারে উধাও রেল লাইনটা মনটাকে আরো শূন্য করে দেয়—অজানা বেদনায় মন হুহু ক'রে ওঠে।

রেণু কাকীমা এমন কি আর নির্য্যাতন করতেন! পরের বাড়ী গলগ্রহের মত থাকতে গেলে অমন সহ্য করতেই হয়। যতই পর হোক তবু তো দেশের স্বজন। দুঃসময়ে আশ্রয় দিয়েছিলেন ওঁরাই। এক আধ বছর নয়, আট বছর ছিল সে ওখানে। কি সম্পর্ক ওঁদের সঙ্গে? বাবার পিসতুতো ভাইএর শালা রেণু কাকীমার স্বামী বিনয় কাকা। যত গঞ্জনা দিক, যত লাঞ্ছনা করুক, বাড়ী থেকে তো বার করে দেয়নি তাঁরা। বাড়ীর আর পাঁচ জনের মত ভাত-কাপড় সমানে জুগিয়ে এসেছেন।

সত্যি কি খুব অসহ্য হ'চ্ছিল? আর হ'লেও এতদুর আসবার কি প্রয়োজন ছিল্। দেশে আরকোথাও কি

আশ্রয় মিলতো না? উনিশ কুড়ি বছরের মেয়ে সে কোন্ সাহসে এতদূর ছুটে এল একলা-একলা? পথেঘাটে বিপদ হ'তে কতক্ষণ! রেণু কাকীমা কিছু না মনে করুন, বিনয় কাকা যখন জানবেন, কি ভাববেন! কিছু না হোক, জানিয়ে এলে সে পারতো অন্ততঃ। আট বছরের অন্নদাতা পিতারই সমান! এতটা নিমকহারামী তার পক্ষে শোভা পায় না।

নিভারাণী বুঝতে পারে না, ইতিমধ্যে কখন অনাদরের সব জ্বালা জুড়িয়ে গেছে, বিনয়কাকার সংসারের শত লাঞ্ছনা, গঞ্জনা এখন মধুর হযে অদৃশ্য সহস্র হাতে তাকে আকর্ষণ করছে। আশ্চর্য্য, এতটুকু ক্ষোভ নেই আর এখন রেণু কাকীমার ওপর। মা থাকলে, বোধ হয় অমনই করতেন—রেণুকাকীমা তো মায়ের মত ছিলেন!

বাষ্পাকুল চোখ দুটো মুছতে গিয়ে নিভার চকিতে মনে হ'লো, আবার ফিরে যাওয়া যায় না কি সেখানে! সেই ছোট্ট ঘরে—জন্মভূমিতে?

হাওবাগ থেকে হাওড়ার গাড়ি আবার কখন ছাড়বে? ফিরে গিয়ে বলবে—না না, কিছুই বলবে না সে, যত অপমানই হোক মুখ বুজে থাকবে। যত নিরানন্দের হোক তবু সে তার দেশ, মন যাই বলুক রক্তের সঙ্গে কোথায় কি যেন সম্বন্ধ রয়ে গেছে অবিচ্ছেদ্য হয়ে।

নিভারাণী হাতের টিকিটটা চোখের ওপর তুলে ধরলে। ফ্যাকাশে হলুদে দেহের উত্তাপে অদ্ভুত এক রঙ-এর সৃষ্টি হয়েছে—লেখাগুলো অস্পষ্ট হয়ে গেছে। 'হাওড়া' কথাটা নিশ্চিহ্ন প্রায়। পূর্ব্বের সমস্ত সম্পর্ককে কেটে-ছেঁটে বাদ দেওয়ার মত এ এক আশ্চর্য্য সংঘটন। 'কোথায় ছিলাম, কোথায় এলাম' এর মত স্মৃতি বিভ্রম। কোথা থেকে যেন বত্রিশ নাড়িতে একটা দুর্ব্বোধ্য যন্ত্রণা উপলব্ধি করা যায়।

ঝুয়ে পড়ে তোরঙ্গটা খুলে এক টুকরো কাগজ বার করলে নিভারাণী। এ দেশের আশ্রয়ের ঠিকানাটা লেখা ছিল তাতে—Mr. S. K. Bose, Engineer, Andhardeo, Jabbalpore, C. P.

কুলির মাথায় তোরঙ্গ-বিছানা তুলে দিয়ে গুটি গুটি এগুতে এগুতে বার বার ঠিকানাটা পড়তে পড়তে, একটু বোধ হয় অভিমান হয় নিভারাণীর। আগে থেকে চিঠি সে দিয়েছিল, কিন্তু কেউ তো তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এল না। তার জন্যে যা হোক পথের দীর্ঘতার কথা ভেবে অন্ততঃ কারো আসা উচিত ছিল। হতে পারে নিভা কোলকাতার মেয়ে, কিন্তু তাতে কি প্রমাণ হয় এত দূর-দেশও সে স্বায়ত্তা, সাহসিকা!

হঠাৎ কেমন ভয় আর বিমূঢ়তায় মনটা ভরে ওঠে। রেণুকাকীমার সম্পর্কে কাউকে তার বিশ্বাস করা উচিত হয়নি। ক'দিনই বা সে এই প্রবাসী যুবকটিকে জানে! ন'মাসে ছ'মাসে কার্য্যোপলক্ষে যখন কলকাতায় আসতেন তখন রেণুকাকীমাদের বাসায় এসে উঠতেন। পশ্চিমের স্বাস্থ্যবান, সরল যুবক—ক'দিন হৈ-হল্লোর আর আমোদ আহ্লাদে সারা বাড়িটাকে নাড়িয়ে দিয়ে চলে যেতেন। অবাক লাগলেও খুব একটা যেন উৎসুক্য নিভা প্রথম প্রথম বোধ করতো না। মানুষটাকে দূর থেকেই সে দেখতো আড়ষ্ট হয়ে, চুপি-চুপি চোরের মত লুকিয়ে কি জানি কোন কথা যদি আবার ওঠে, তার সপ্রতিভ পদচারণা বাইরের লোকের সামনে হয়েছে অপরাধের।

কিন্তু অবশেষে একদিন অমল নিজে থেকে তার সন্ধান করলে। সবার সামনে তাকে জাহির করলে। মনে আছে নিভারাণীর পুরুষের সেই প্রথম স্পর্শ! শুধু লজ্জা নয়, বেদনারও যেন ভার ছিল তাতে।

তাস খেলার খেঁড়ি জুটছিল না। তাই ওকে তার নিভৃত আশ্রয় থেকে ধরে আনা হয়েছে। হয়তো সম্মানও দেখান হয়েছে। কিন্তু সে তো খেলা জানে না। কাজ কর্ম্ম-চুকে-যাওয়া দ্বিপ্রহরে অবসর বোধ হয় তার কাটে কেবল ভাবনা নিয়ে। সে কেবল ভাবতেই জানে—কি যে সে-ভাবনা, কেন যে ভাবনা, স্পষ্ট তার ধারণাই নেই। তবু তা ভাবনা, নিস্তব্ধ দুপুরে তার ছোট্ট ঘরে মুখর হয়ে ওঠে।

ফাই-ফরমাস, কাজ ছাড়া যে কেউ তাকে কাছে টানবে নিভা কোনদিন ভাবতে পারেনি। প্রথমটা সে যত না বিস্মিত হয়েছিল, তার থেকে বেশী অভিভূত হয়ে পড়েছিল ভয়ে—জানা নেই, শোনা নেই, বলা নেই, কওয়া

নেই, এমনি করে কোন যুবক এসে হাত ধরে টানাটানি করতে পারে? তাও তাস খেলবার জন্তে!

'ধরণী দ্বিধা' হওয়ার লজ্জায় তাসের আসরে এসে নিভা দাঁড়িয়ে ছিল। বেণুকাকীমা, তাঁর বড় মেয়ে গৌরী তার দিকে রোষকষায়িত চোখে চেয়েছিল। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে অমল নিজের আবিষ্কারে নিজেই রসিয়ে রসিয়ে হাসছিল।

ভীতা, ব্রীড়াবনতা নিভার তখন-তখন কি মনে হয়েছিল আজ বছর কুড়ি পরে যথাযথ মনে না থাকলেও এ কথা নিভার স্পষ্ট মনে আছে যে, আগাগোড়া ব্যাপারটা সে বিপরীত ব্যাখ্যাই করেছিল। ছাতুখোরের দেশে মানুষ বলে লোকটা তার সঙ্গে অমন রসিকতা করতে সাহস করেছিল। কুপিতাও সে যথেষ্ট হয়েছিল। বস্ত্রহরণের উদ্দেশ্যে দ্রৌপদীকে যখন সহস্র কুটিল চোখের সামনে আনা হয়েছিল, তিনি বোধ হয় অনুরূপ কুপিতা হয়েছিলেন। শুধু ক্রোধ নয়, ঘৃণাও বোধ করেছিলেন। বাহাদুরী নিতে হাসতে হাসতে অমল বললে, বসুন, আপনাতে আমাতে। চেষ্টা করলে আর পার্টনার পাওয়া যায় না!

বক্রদৃষ্টিতে গৌরী মার মুখের দিকে চেয়ে কি যেন ইঙ্গিত করেছিল। ক্রোধচাপা সমাকুল চোখ দুটো নিভার সহসা শুষ্ক হ'য়ে গিয়েছিল। ষড়যন্ত্র ছাড়া এ আর কি! প্রথম পুরুষ-স্পর্শের লজ্জা পাওয়ার জন্তে নিজের কাছে নিভা লজ্জা পেলে।

সঙ্গে সঙ্গে রেণুকাকীমা বেকা সুরে বললেন, নাও, আর দাঁড়িয়ে কেন। বসে পড়।

নিভা বসেনি। ক্রোধ কম্পিত কণ্ঠে বলেছিল, আমি তাস খেলতে জানি না—না—না।

তারপর একরকম ছুটে কাঁদতে কাঁদতে নিজের ঘরে চলে গিয়েছিল। তারও অনেকক্ষণ পরে এলোচুলটা সামলাতে সামলাতে এক কোণের জানালা দিয়ে পড়ন্ত রোদের ছায়া দেখে নিভার মনে হয়েছিল—তার রাগ করার যথেষ্ট কারণ থাকলেও ওভাবে রাগের প্রকাশটা তার পক্ষে অশোভন হ'য়েছে। হাজার হোক অমল বাবু এ গৃহের অতিথি, দূর প্রবাসী আত্মীয়। কোন বিষয়েই বাড়াবাড়িটা ভাল নয়।

এ নিয়ে কুণ্ঠা যতই থাক, নিভার কণ্ঠ কোনদিন আক্ষেপে কুঞ্চিত হয়নি, অমলও বোধ হয় কিছু প্রত্যাশা করেনি। পরের ব্যাপারটা নিভার মনে আছে—কয়েক দিন পরে অমল চলে গেলে, অকারণে দারুণ অভিমান হ'য়েছিল তার। কিন্তু আশ্চর্য্য, যে লোকটার ব্যবহারে সে কদিন আগে অপমানিত, লাঞ্ছিত, ক্রুদ্ধ হ'য়েছিল, তারই অনিবার্য্য অদর্শনে এমন অভিমান হয় কেন! সম্পর্ক কি অভিমানের?

তারপর কাজ নিয়ে আরো বার কয়েক অমল এসেছিল কলকাতায়। দুপুরে তাস খেলার সঙ্গী হ'তে নিভা আর কোন আপত্তি করেনি। রেণু কাকীমাদের পরিবারের একজন লোকের মতই অমলকে সে মেনে নিয়েছিল।

মেলামেশার সুরু থেকেই মনের মধ্যে সঙ্কোচ বা কোন দুরাশা ঠিক ছিল কি না, নিভারাণীর আজ মনে নেই; তবে ন'মাসে ছ'মাসে রেণু কাকীমাদের সংসারে অমলের আবির্ভাব তার মনে বিশেষ একটা মনোভাবের সৃষ্টি করতো—কি সে মনোভাব, নিজে বুঝলেও আর কাউকে বলে বোঝান যায় না, এমনি। বিশেষ একটি বয়েসে বিশেষ একরকম ভুলের মানেই বোধ হয় তাই।

খেলায় নিভা পারদর্শিনী ছিল না, বিরুদ্ধপক্ষীয় গৌরীর অনেক কটাক্ষ বিদ্রূপ তাকে সহ্য করতে হ'তো। অমল কিন্তু মানিয়ে নিতো মুখে হাসি নিয়ে। রেণুকাকীমা কি আর করবেন—এমনি ভাব করে মুখ বুজিয়ে খেলে যেতেন। অমলের আব্দারে পড়ে তিনি খুব একটা অনুচিত কাজ করছেন যেন। কুকুরকে নাই দেওয়ার মত।

রেণু কাকীমার সংসারে থাকাকালীন অমলের ব্যবহারে আর যাই মনে হোক, নিভারাণীর লোকটাকে খুব বেশী আত্মীয় বলে মনে হতো। রেণুকাকীমার সম্পর্কে কেউ যে তার প্রতি এমন সদয় ব্যবহার করবে, নিভা কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি। যেন রেণুকাকীমার আর একটি মেয়ে সে। অনেক দুঃখে মনে হ'তো, ভগবান তাকে কোন একদিক থেকে সুখী করছেন, যত অনাদরই থাক, একদিক থেকে পুষিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু তবুও দুঃখ ছিল, এই সুখী হওয়াটা, পুষিয়ে যাওয়াটা বড় গোপনীয়, নিভৃত চিন্তার মতো আপনায় আপনি সম্পূর্ণ। প্রকাশের কোন উপায়ই ছিল না। কে জানে অমল সে কথা বুঝতো কি না। আর বুঝলেও নিভার পক্ষ থেকে বোঝাবার কোন সুযোগ ছিল না। তাস খেলায় যোঁড়ি হওয়া, খাবার সময় আসন পেতে দেওয়া, কি খাওয়া শেষে পান-মশলা নিয়ে নত মুখে একধারে আরষ্ট হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকা। তারপর—

যখন নিভার সময় হ'তো, তখন সব ঘরের আলো প্রায়ই নিভে যেতো—অমল তো বলতে গেলে সাতশো মাইল দূরে সরে যেতো। নিজের ঘরে বৃথা আলো জেলে নিভা অপেক্ষা করতো। টান টান করে কপাল-ভাসা চুলবাঁধাটা খুলতে খুলতে কি যে ভাবতো সে দোতলা ঘরের কোন একটা জানালার দিকে চেয়ে, সে-ই জানে। হয়তো নিভৃতে একটু সাজবার কথা মনে হ'তো। পাশের বাড়ীর দেওয়াল ঘড়িতে কটা যেন বাজতো, এক-দুই-তিন…এগারটা কি বারটা স্পষ্ট, হয়তো অনেক রাত হয়েছে। রান্না ঘরের টিনের চালে একটা বেড়াল লাফিয়ে পড়লো, দোতলার বারান্দা থেকে কে যেন কলতলায় খানিকটা জল ফেলে দিলে ছড়াৎ করে। রেণুকাকীমা এখনো হয়তো দরজায় খিল দেননি। কর্ত্রীত্বের শেষ পাহারাটুকু বিঘোষিত করলেন।

নিভা তাড়াতাড়ি আলোটা নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে। কাল হয়তো কৈফিয়ৎ দিতে হবে, রোজ এত রাত পর্য্যন্ত আলো জ্বালিয়ে কি রাজকার্য্যটা করা হয়! সত্যি বললেও রেণুকাকীমা বিশ্বাস করবেন না, মিথ্যে বললেও না।

এত লুকোচুরি, এত ঠারাঠারি—তবু এই প্রতীক্ষায় যে কি মাদকতা ছিল, বলবার নয়। পশ্চিমে মানুষ বলে অমল এ সব ব্যাপারে একেবারে যেন ভোঁতা—কোনদিন যদি নিভার মনে হয়েছে লোকটা কিছু বোঝে! ছেলেমানুষের মত হাসি-হৈ-হুল্লোর ছাড়া আর কিছু বোধ হয় জানে না। তবু মনে মনে ওকেই নিভারাণী মনোপ্রাণ সপে দিয়েছিল। অভিমানে রাগে একান্ত করে ঐ লোকটিকেই নিজের করে পাবার ইচ্ছে করতো, ইচ্ছে নয়, কামনা করতো সে।

… … … …

বৃষ্টিটা হয়ে গেলেই যেন ভাল হ'তো। বুকচাপা দুঃস্বপ্নের মত মেঘটা পরিবেশটাকে চেপে আছে—পাথর চাপা দিয়ে জাকিয়ে ছানার জল বার করার মত।

নতুন জায়গা সম্বন্ধে নিভা উৎফুল্ল হ'তে পারে না। পাহাড়ে দেশ মানে এই নাকি! চারিদিকে পাণ্ডুর স্তব্ধতা! এখানে ধুলোর রং-ও যেন কেমন ধারা মরা ছাই-এর মত।

টাঙ্গায় উঠতে বুক দুরু দুরু করেছিল, হাত-পা কেঁপেছিল, গা বমি বমি করেছিল। পিছন ফিরে সামনে এ আবার কেমন ধরণের যাওয়া। যে পথ ফেলে আসতে হ'বে তাকেই দেখতে দেখতে সামনে এগোন। গাড়িতে চড়া নয়, পা ধরে জোর করে টেনে নিয়ে যাওয়া জবরদস্তি দৌড়!

মনটা যেন হু হু করে—দীর্ঘ পথ ফেলে আসার স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যে পথে তুমি যাবে সে পথে চোখ-বাঁধা, কিন্তু যে পথ দিয়ে আসবে, সে-পথ তোমার চোখের ওপর মেলে ধরা। উল্টোপাকে সুতো এলিয়ে দেওয়ার মত।

রেণুকাকীমা কাল থেকে নিশ্চয়ই খুব গালাগালি করছেন। একে কুড়ে মানুষ, তায় নিভা চলে আসায় সংসারের সমস্ত ঝক্কি এখন তাঁকেই পোহাতে হচ্ছে। গৌরী থাকলে না হয় কথা ছিল। কিন্তু আজ দু'বছর হ'লো তারও বিয়ে হয়ে গেছে। অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে রেণু কাকীমার, রোগা শরীরে কি করে যে সামলাবেন! বেচারা বিনয় কাকার হয়তো অর্দ্ধেক দিন খাওয়াই হবে না। ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে-গুলোরও হেনস্তা কম হবে না! হ'তেব দোসর এখন কেউ নেই!

মনে মনে জব্দ করবার অভিপ্রায় বহুদিনের পুঞ্জীভূত ক্রোধের ফল হ'লেও আজ নিভার মায়া হয় কল্পনায় রেণুকাকীমার অবস্থাটা উপলব্ধি ক'রে। যে পরিমাণ কষ্ট তিনি এখন পাচ্ছেন নিভার অনুপস্থিতিতে, সে পরিমাণ কি আর এমন গালাগাল করতে পারছেন!—গালাগাল দিয়ে কি তিনি পূর্ব্বের স্বস্তি ফিরে পাবেন?

সে অকৃতজ্ঞ ? ঠোঁটের একটা পাশ যেন নিভার বক্র হ'য়ে ওঠে, চোখের কোণে একটা কিসের ঝিলিক দেয়। হয়তো তাই সে।

কিন্তু অকৃতজ্ঞ কাকে বলে ? বিনিময়ে কিছু না পাওয়াই তো, সে দিক থেকে এই আট বছর তো নিভা রেণু কাকীমাদের অনেক কিছুই দিয়ে এসেছে—যা পরিশ্রম করেছে, তাতে কি কৃতজ্ঞতার ডৌল সমান হয়নি। আরও চাই!

চাইলেই কি মানুষ দিতে পারে, না আমরণ দেয় ? দাসপ্রথা তা হলে কি দোষ করলো! বাবার সঙ্গে সম্পর্ক একটা ছিল তাই না তাঁদের আশ্রয়ে সে এসেছিল, না হ'লে—

সে কথা আলাদা। একটি অসহায় কুমারী মেয়ের পক্ষে যতখানি সম্ভব, সে কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করেছে। আজ যদি সে নিজের ভবিষ্যৎ খুঁজে নেয়, রাগ করবার কি আছে! বরং খুসী হওয়াই উচিত, বোঝা নেমে গেল তাঁদের। একটা পরের মেয়ে আপদ বই তো কিছু না।

গাড়িটা হঠাৎ নড়ে ওঠায় চিন্তার সূত্রটা যেন এলোমেলো হয়ে যায়। মা বাবার কথা মনে হয় নিভার, তাঁরা বেঁচে থাকলে কে জানে তার জীবন কেমন হতো আজ। হয়তো এতো দিনে একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয় তার মিলতো—শুধু উষ্ণই নয়, রোমাঞ্চকর। এই ধূলো মাখা, ঘর্ম্মসিক্ত, গা ঘিন-ঘিন অনুভূতি নয়। এই সকাল আর সেই সকালের অনেকখানি তফাৎ নিশ্চয়ই থাকতো। হ'তো না হয় তারা গরীব, তাতে কী—পুরুষের আশ্রয় নারীর কল্যাণস্পর্শে মধুময় হয়ে উঠতো। যা পাওয়া যেত তাই নিয়েই মন ভরে উঠতো, যা পাওয়া যায়নি তার জন্যে আক্ষেপ থাকতো না।

চোখের ওপর গৌরীর বিয়ে দেখে নিভার সেদিন অনেক কথাই মনে হয়েছিল। এতদিনে রেণু- কাকীমাদের আশ্রয় সত্যিই অসহ্য মনে হয়েছিল। সেদিনের উৎসব-মুখরতা : তার প্রতি নিদারুণ অবহেলার মত মনে হয়েছিল। আর সত্যি কথা বলতে কি, গৌরীকে সে মনে মনে হিংসা করেছিল সেদিন, শুধু কনে চন্দন আর বেনারসী গৌরী পেলে না, আর যা পেলে তা নিভা হয়তো কোনদিন পাবে না—না—দুরাশা মাত্র। বিনয় কাকা তার কথাটা ভাবলেন না কেন একবার—গৌরীর মত বর না হোক তার মত একটা ছেলে তিনি যোগার করতে পারতেন।

বিয়ে বাড়ীতে অমল যেতে গিয়েছিল। আশ্চর্য্য, লোকটা অত দূর থেকে কোন না কোন সম্পর্কে মাসীর মেয়ের বিয়েতে খাটবে বলে এসেছে। কতবার নিভা দেখার চেষ্টা করেছে অমলের চোখে আজকের দিনে কোন মাদকতা আছে কি না, যদি থাকে নিশ্চয়ই তা নিভা আজ সম্পূর্ণ খুঁজে পাবে : পশ্চিম প্রবাসীর রুক্ষ আপনভোলা দৃষ্টিকে কিছুমাত্র সরস আর আত্মগত করবার চেষ্টা না করলেও।

হ্যাঁ, সেজেছিল বৈ কি নিভা সেদিন। অপরাধের কিছু নয়, উৎসব বাড়ীতে একটু বিপরীত সজ্জার প্রয়োজন হয়। আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই, সন্দেহ করার কিছু নেই, মেয়ে পার হওয়ার খুসীতে রেণু কাকীমাই বরং বলেছিলেন তাকে বেশবাস একটু সভ্যভব্য করতে। পাঁচ জন আসবে যাবে, দেখলে কি ভাববে। চাকরাণীর রাণী সাজবার এই বোধ হয় সুযোগ—গিন্নীমার ঢালাও হুকুম।

গৌরীর গায়ে হলুদের দিন মাথা ঘসেছিল নিভা। কর্ম্মবাড়ীতে কে যেন বক্র মন্তব্য করেছিল তাই নিয়ে : তোর মাথায় কি হলো রে নিভু। গিলে খাবি নাকি তুই সবাইকে।

তবু রক্ষা রেণু কাকীমা কোন মন্তব্য করেন নি। বলতে নেই, গৌরী বরং সেদিন উপযাচক হয়ে বলেছিল, তোকে বেশ দেখতে হয়েছে নিভাদি, কি সুন্দর তোর চুল!

বিয়ের সময় বোধ হয় মেয়েরা উদার হয়, ঈর্ষ্যা-বিদ্বেষ বোধ হয় ভুলে যায়। নিভা আশ্চর্য্য হয়েছিল গৌরীর প্রশংসা বাক্যে। যে মানুষটি তার চালচলন কোনটাই কোনদিন সুনজরে দেখে নি, সে আজ বলে কি—দিদি তোর চুল কি সুন্দর!

গৌরীর আজ হ'লো কি! কে ওকে এমন হ'তে বললে! কার অদৃশ্য প্রভাবে ও এমন বদলে গেল!

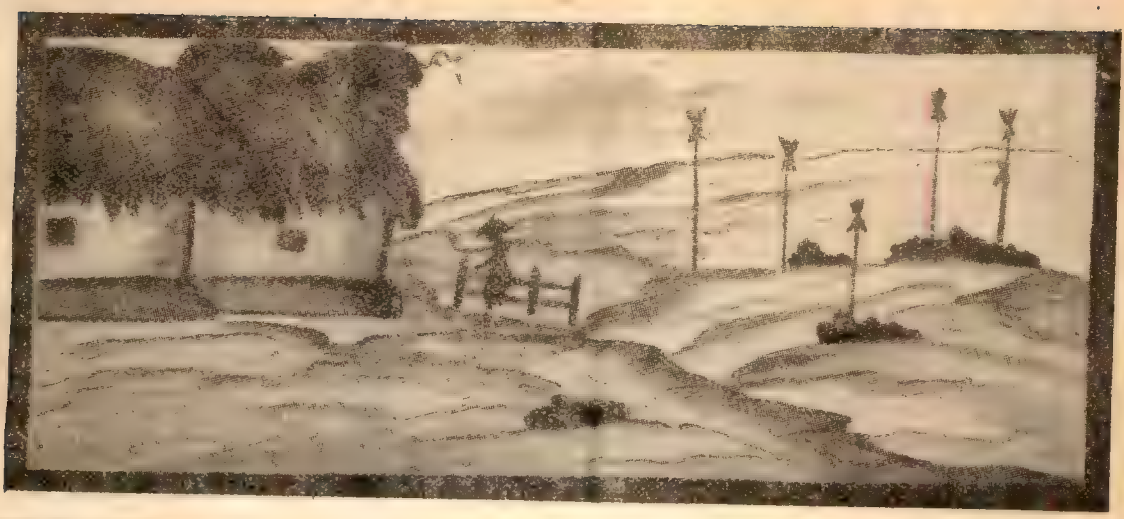

সাজবার জন্যে তোলা কাপড়ও বার ক'রে দিয়েছিল গৌরী—মাথার কাঁটায়ও কটা ঘুঙুর লাগান। ব্রঞ্জের ক'গাছা তেড়াবেঁকা চুড়িও বদলে গৌরী কাঠাল কাট পাটর্ণের বালা যোড়াটাও হাতে তুলে দিয়েছিল। তারপর নিভার কান লাল করে' বয়ঃকনিষ্ঠা গৌরী একসময় রসিকতা করেছিল, তোরও যদি আজ গায়ে হলুদ হ'তো, বেশ হ'তো!

যাদের কাছ থেকে অনাদর, অবজ্ঞা আর অবহেলাই পাবার কথা,তারা সেদিন অদ্ভুত অসম্ভব ব্যবহার করেছিল। যেন গৌরীর ছোট বোনকে দিদির সৌভাগ্যের জন্য আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু যার কাছ থেকে অনেক কিছু আজকে পাবার কল্পনা ছিল, সে তো কই—

গাড়িটার গতি খুব মন্থর হ'য়ে এসেছে।

সামনে চড়াই। নিভারাণী চেয়ে দেখে এদিক ওদিক। দু' পাশ থেকে পাহাড়গুলো যেন চেপে ধরেছে, পথ সঙ্কীর্ণ। ঘিয়ে ভাজা পাহাড়ী ঘোড়াটার পা জড়িয়ে যাচ্ছে, চাবুকের শব্দে অশুভ উৎকণ্ঠা। হঠাৎ পাহাড় ধ্বসে রাস্তা বন্ধ হ'য়ে যাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

বার বার মাথার চুলকে হাত ঘুরিয়ে ঠিক করতে হয়—বার বারই কবরীবন্ধন শিথিল হয়ে যায়। দেহটাও বোধ হয় এবার ভেঙে পড়বে। মুখে হাত দিলে হাতটাও কালীবর্ণ হয়ে যায়···আজ নিয়ে দু'দিন স্নান হয়নি। কতক্ষণে পৌছবে?

বিনয় কাকার ওখানে এতক্ষণে কখন সে কলঘর থেকে বেড়িয়ে আসতো। প্রাতঃকালীন চা করাও তার শেষ হ'য়ে যেত। রেণু কাকীমা ঘুম-ঘোরে চায়ের বাটি নিয়ে এক চুমুক দিয়ে বলতেন, এখনো ভাত চড়েনি! আজ আর অফিস যেতে হ'বে না।

সে-ছবিটা আজো নিভার মনে আছে···ঘুম-ভাঙা আলুথালু চায়ের বাটি হাতে রেণুকাকীমাকে তখন-তখন তার ছেলেবেলার স্কুলের চপলা দিদিমণির মত দেখতে লাগতো। যেন বিনয়কাকার বদলে উনিই অফিস যাবেন। সময় মত ভাত না পেলে অভুক্তই থাকবেন সারাদিন।

তারপর চা পান শেষ হ'লে বাটিটা ঠক্ করে' মেঝের ওপর বসিয়ে হাটু ধরে উঠতে গিয়ে ফুটন্ত ভাতের গন্ধ পেয়ে রেণুকাকীমা রোজই বলতেন, ইস্-স্ আজ বড্ড বেলা হয়ে গেল।

যতই বকা-ঝকা হেনস্তা রেণু কাকীমা করুন, এ সময়টা তিনি বিলম্বে শয্যাত্যাগের জন্যে প্রকারান্তরে নিভার কাছে কুণ্ঠিত হ'তেন। কে বলতে পারে, নিভার কর্তব্য-নিষ্ঠার জন্যে মনে মনে তিনি কৃতজ্ঞ ছিলেন কিনা। শুধু কি ভাতের হাঁড়ি, আরো কত কি নিভা সে-সংসারের দেখতো।

ঘড়ির কাঁটা বেঠিক হ'লেও একটা দিনের জন্যে সে বেঠিক হয়নি। বাপ-মা খাওয়া মেয়ে বলেই বোধ হয় তার স্বাস্থ্যটা চিরকালই অটুট।

পিছন ফিরে সামনে এগোনর মত রেণু কাকীমাদের সব কথা মনে পড়ছে। কিন্তু আশ্চর্য্য, গত ছত্রিশ ঘণ্টায় তাঁদের বিরুদ্ধে যে বিরূপতা এবং ঘৃণা নিয়ে আশ্রয় ত্যাগ করেছে, তার এতটুকু আঁচ এখন যেন উপলব্ধি করা যায় না। অতো স্বার্থপর, নীচ, ইতর মানুষটার ভালও দেখা যায়।

অথচ দুদিন আগেও কি ব্যাপারটাই না করেছেন ওঁরা! ভাবতে গেলে শরীরটা কেমন অবশ হ'য়ে যায়! কেমন একটা অসহায়, স্বজন বন্ধুহীন অস্তিত্বের শূণ্যতা মনকে অসাড় করে দেয়। এত বড় পৃথিবীতে কি-ই বা তার প্রয়োজন! মা-বাবার সঙ্গে সে-ও যদি চলে যেত! এত অনর্থক মনে হয় সব!

শক্ত করে' দোদুল্যমান টাঙ্গাটার একটা পাঁজর চেপে ধরে স্থির মৌন দৃষ্টিতে সামনে চেয়ে নিভা বসে থাকে—কোন আশা নেই, কোন ভরসা নেই, এত বড় সংসারে বোধ হয় কারো আর তার কাছে কোন প্রত্যাশা নেই। কিছু তো দেয়নি, কি সে পেতে চায়!

আরো কিছুক্ষণ এমনি মুখ বুজে চ'ললে বোধ হয় সে পাথর হ'য়ে যাবে। যে মনগড়া প্রত্যয়ের দৃঢ়তায় সে এতদূর ছুটে এল, তার ভিত্তিভূমিটা যেন বড় পলকা আর তার স্বীকৃতিটাও বোধ হয় আশানুরূপ হ'বে না। অমল যদি তাকে স্বীকার না করে আজ! কলকাতার পরাশ্রয়ে অবগুণ্ঠিত, কুণ্ঠিত নিভা আর এতদূর একলা-একলা চলে-আসা সাহসিকা কি এক? শান্ত, নম্র, ধীর ভেবে যাকে আদর করা যায়, স্নেহ দেখান যায়, কোন অজুহাতে তাকেই আবার উগ্র, রূঢ়, স্বাধীনা দেখে পূর্ব্ব মনোভাব বজায় রাখা যায় কি! কুমারী মেয়েদের স্বভাবের কোন্ ভাবটা যুবা পুরুষদের আকৃষ্ট করে? পড়ে পড়ে মার খেতে পারে যে-মেয়ে, তাকেই কি শৌর্য্য-বীর্য্যবানরা চায়? না, যারা স্বাধীকারে পুরুষের সমকক্ষ হবার যোগতা রাখে, তারাই কাম্য?

হয়তো কিছুই না। চাওয়া এবং পাওয়ার কোন যোগসূত্র নেই: অন্ততঃ তাদের সমাজে। আর মানুষের মনের কথা কে বলতে পারে!

সেই কবে অমল একবার নিভৃতে তার হাত চেপে ধরেছিল, তারপর এই ক'বছরে কতবার সাক্ষাৎ হ'য়েছে, কই মনে রাখবার মত কিছু তো মনে পড়ছে না। বরং সে-ই নিজে থেকে যত কাছে আসতে চেয়েছে, অমল যেন ক্রমশঃ দূরে সরে গেছে।

তবু সে ভালবেসেছিল, অমলকে কেন এতদিন বলতে পারেনি মুখ ফুঠে! ভালবাসার দাবীতে তাই আজ আসতে এত সঙ্কোচ হ'চ্ছে। আজ অমল তাকে প্রত্যাখ্যান করলে ফিরে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই নিভার। অথচ এখানে ছুটে আসার কারণ মেয়েটির বিশেষ একটি স্বভাব দোষের অপবাদ।

মনের সঙ্গোপনে কিন্তু সভয় আত্মীয়তার দাবীই বোধ করে নিভা। তাকে দেখলে অমল খুসীই হ'বে—সমাদরে ঘরে স্থান দেবে। আর কিছু না ভেবে হোক একজন দুঃস্থ, অনন্যোপায় আত্মীয় ভেবে।

না, ভালবাসার কথা নিভা ভুলবে না, ভালবাসার দাবীতে আর যাই করা যাক, ভিক্ষা করা যায় না। আর এ তো আশ্রয় ভিক্ষা!

টাঙ্গা থেমে গেল। নিভা চেয়ে দেখলে, পাহাড়ের গায়ে একটা ছোট বাংলো মত বাড়ী। এত নিস্তব্ধ যেন কোনো ছবি।

কিছুক্ষণ নিভা নির্ব্বাক বিস্ময়ে অপেক্ষা করলে।

আর কোথাও বাড়ী-ঘরের চিহ্নমাত্র নেই, যেন স্বপ্নদৃষ্ট কোন এক জায়গায় কোন এক অস্পষ্ট বাড়ীর সামনে এসে থেমেছে সে, কে বলতে পারে, বাড়ীটাকে সে স্বপ্নে কখনো দেখেনি।

গাড়োয়ান নামতে বললে, জানালে—এই-ই বোস সাহেবের কুঠি। আন্‌কারদেও।

সন্তর্পণে টাঙ্গা থেকে নিভা নামলো। আর একবার আলুলায়িত কেশদাম কবরী বন্ধনে বিন্যাস করলে। শাড়ির আঁচলে মুখটা মুছে নিলে। তারপর বিস্ফারিত চোখে বাড়ীটাকে দেখলে।

গাড়োয়ানকে দিয়ে তোরঙ্গটা গেটের ভেতরে এনে

ঢাকা বারান্দার উপর রাখবার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি নেমে এল ঝম্ ঝম্ করে—পাহাড়ে বৃষ্টি ভীষণ আর প্রখর।

বৃষ্টির কণায় কিছুক্ষণের জন্যে সামনেটা ধোঁয়ার মত অস্পষ্ট হয়ে গেল। যেন আকাশ ধোয়া ময়লা আস্তরণ একটা। ভৌতিক পরিবেশের মধ্যে কোন্ এক হানাবাবাড়িতে ঐ টাঙ্গাগাড়িটা তাকে রেখে গেল। হয়তো সে ভিন্ন আর কোনো জীবের অস্তিত্ব নেই এখানে।

বৃষ্টি থামতেও অনেকক্ষণ নিভা সাহস করে' বারান্দা পেরিয়ে সদর দরজায় ঘা দিতে পারলে না। এখনো তার মনস্থির নিশ্চয় নয় যে, এটা স্বর্গত সুবোধ বসুর বাড়ি—অমল এইখানেই থাকে। মানে অমল এর উপস্থিত মালিক।

চিঠিটা হয়তো অমলের হাতে পড়ে নি, কি রাস্তায় খোয়া গেছে। কিন্তু সে এসে পৌছল আর চিঠিটা পৌছল না! নিজে রওনা হবার তিন চারদিন আগে চিঠিটা নিভা ডাকে দিয়েছে। ঠিকানা ভুল করবে কেন, তার ক্লাস সেভেন বিদ্যেতে যতদূর পেরেছে স্পষ্ট করে ধীরে ধীরে লিখেছে—প্রথমে অমলের নাম, তারপর কাগজে যা লেখা আছে।

পর পর দু'রাত জেগে এমনিই নিভার মাথা গরম হ'য়ে আছে, তার পর এই সব চিন্তা, নিজেকে নিভা আর ঠিক রাখতে পারে না। প্রচণ্ড ক্রোধ আর অপমানে ব্রহ্মতালু তার জ্বালা ক'রতে থাকে, অমুচ্চারিত এমন সব কটু বাক্য অমলের উদ্দেশ্যে সে বলে যে কহতব্য নয়। রেণুকাকীমাদের তবু বোঝা গেছে, কিন্তু এ লোকটি আরো সাংঘাতিক, নীচাশয়, কপট!

কিন্তু এসে যখন পড়েছে তখন একবার শেষ না দেখে নিভা যাবে না। যতই অনাদর আর অবজ্ঞা পাক না কেন! [ক্রমশঃ

★

হেমন্তের কান্না

রমেন মৈত্র

স্মৃতির কুসুমে ঢাকা পদচিহ্ন রয় আজও
জীবনের এ আঙিনা 'পরে,
নীরবে শ্বসিছে তার গোপন বেদন লয়ে
হেমন্তের সারা বেলা ধরে'।
জীবনের উৎসব
নীরব হয়েছে সব
চরণের ধ্বনি শুধু স্মরণেরে রাখিয়াছে ভ'রে।

হেমন্তের নিশীথ আকাশ
মেদুর মেঘেতে হারা,
তাই শুধু ফেলে দীর্ঘশ্বাস।
বেদন-কাতর আঁখি
কেমনে লুকায়ে রাখি?
জেনে যাও, জেনে যাও
আজও আঁখি কার লাগি ঝরে?

মহামণি কোহিনুর

শ্রীতারিণীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী

সৃষ্টির আদিম ইতিহাসের সময় হইতে কত রাজ্য কত জনপদ গড়িয়া উঠিয়াছে, কত রাজা ও সম্রাট পৃথিবীর এ রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইয়াছে এবং মহাকালের অলঙ্ঘ্য ইঙ্গিতে ধরণীর ধূলায় মিশিয়া গিয়াছে—কিন্তু সর্ব্বকালের মহাসাক্ষ্যরূপে কালজয়ী ইতিহাস প্রসিদ্ধ হীরক কোহিনুর আজিও তাহার অস্তিত্ব সগৌরবে ঘোষণা করিতেছে।

কোহিনুরের আদি ইতিহাস যদিও ঐতিহাসিকের নিকট অপরিজ্ঞাত, তথাপি সাধারণের ধারণা গোদাবরী নদীর পাদদেশে ইহা সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয়। প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথম এই অমূল্য মহামণি মানব সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু ইহা কবে কাটা ও পালিশ করা হয় তাহার বিবরণ আজিও তমসাচ্ছন্ন। যদিও ইহার সঠিক ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায় না। তথাপি এ সম্পর্কে এক প্রকার স্থির ভাবে জানা গিয়াছে যে খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৬ অব্দে উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজমুকুটে ইহা প্রথম শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে।

কালের প্রবাহে এই মহামণি লোকচক্ষের অগোচরে চলিয়া যায় এবং ১৩০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আর কিছুই শোনা যায় না। অবশেষে ১৩০৪ খৃষ্টাব্দে একদিন মালব রাজের কোষাগার হইতে ইতিহাস-বিখ্যাত এই হীরকখণ্ডের পুনরায় আবিষ্কার হয়। কিন্তু এই আবিষ্কারের পর ইহা মালয় রাজের কোষাগার বেশীদিন আলোকিত করিতে পারে নাই। ঐ বৎসরেই দিল্লীর নরপতি আলাউদ্দিন মহম্মদ শা কর্ত্তৃক মালয় রাজ্য বিজীত হওয়ায় ঐ মহামণি দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়।

এই ঘটনার পর শোণিত-রেখায় কোহিনুরের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। এতদিন পর্য্যন্ত এই মহামণির কোন নামকরণ হয় নাই। আরও কয়েক শতাব্দীর পর এই বৃহৎ হীরকখণ্ডের 'কোহিনুর' নাম অভিহিত।

মালব বিজয়ী আলাউদ্দিন চরম নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজত্বের ইতিহাস নরহত্যা, লুণ্ঠন ও অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনীতে মসীলিপ্ত। ১৩১৬ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পর দিল্লীর রাজকীয় কোষাগারে এই বিশ্ববিখ্যাত মহামণি পুনরায় লোকচক্ষুর অন্তরালে অন্তর্হিত হয়।

আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পরে তাঁহার রাজ্য শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তাঁহার মৃত্যুর প্রায় বিরাশি বৎসর পর ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে ইতিহাস-বিখ্যাত অত্যাচারী তৈমুরলঙ্গ সমরখন্দ হইতে, মধ্যপ্রাচ্য ও ককেশিয়া অঞ্চল হইতে সংগৃহীত দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যদল লইয়া বিশ্ববিজয় ও লুণ্ঠনে বহির্গত হন। খাইবার গিরিপথ ও সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া ঐ বৎসরের শেষভাগে ডিসেম্বর মাসে দিল্লী অভিযান করেন। দিল্লী অবরোধের সময় তাঁহার আদেশে এক লক্ষ বন্দী নরনারীকে নির্ম্মমভাবে হত্যা করা হয়। এই ঘটনার কিছুদিন পর দিল্লী নগরীর পতন হয়।

দিল্লী নগরীর পতনের পর পাঁচদিন কাল অবিশ্রান্তভাবে লুণ্ঠন ও নরহত্যায় দিল্লীর রাজপথ রঞ্জিত হয়। সমগ্র রাজধানীর গৃহগুলিতে অগ্নিসংযোগের ফলে দিল্লীসহর এক বিরাট অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হইল। লুণ্ঠিত রাজকোষের ধনরত্ন দিল্লী হইতে সমরখন্দে স্থানান্তরিত হইল। কিন্তু এই দুর্য্যোগের মধ্যেও কোহিনুর মণি ভারতবর্ষে থাকিয়া যায়।

দিল্লীর তদানীন্তন নরপতি নাজির শাহ সম্ভবতঃ পলায়ন কালে কোহিনুর তাঁহার সঙ্গে লইয়া পলায়ন করেন। ভারতে তৈমুরলঙ্গের অভিযানের প্রায় শতাব্দী কাল পর্য্যন্ত পুনরায় কোহিনুর লোকচক্ষুর অগোচরে চলিয়া যায়।

তৈমুরলঙ্গের অভিযানের এক শত বৎসর পরে তাঁহার বংশধর জাহিরুদ্দিন মহম্মদ বাবর পুনরায় ভারত অভিযানে

বাহির হন, সেই সময় বাবরকে মধ্য প্রাচ্যের "সিজার" নামে অভিহিত করা হইত। বাবর পর পর চার বার ভারত অভিযানে বাহির হইলেও লাহোরের দক্ষিণ দিকে নানা কারণে আসিতে পারেন নাই। ১৫২৫ সালে বাবর অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া আফগানিস্থান হইতে পুনরায় ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন। এই পঞ্চম অভিযানের সময় তিনি সিন্ধুনদ অতিক্রম করেন, ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে ২১শে এপ্রিল পাণিপথের প্রান্তরে ইব্রাহিম লোদীর সহিত বাবরের যুদ্ধে ভারতবর্ষের নূতন ভাগ্যের সূচনা করে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের এই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে কোহিনুর মণির পুনরাবির্ভাব হয়, এই কোহিনুর সম্পর্কে বাবর স্বহস্ত-লিখিত রোজনামচায় এক চিত্তাকর্ষক বিবরণে বলেন, "সুলতান ইব্রাহিম লোদীর পরাজয়ের পর গোয়ালিয়রের হিন্দু রাজা বিক্রমজিতের নরকস্থ প্রাপ্তি ঘটে, বিক্রমজিতের পরিবার ও পুত্রকন্যাগণ সেই সময়ে আগ্রায় অবস্থান করিতেছিলেন, যখন বাবরের পুত্র হুমায়ুন আগ্রায় উপস্থিত হইলেন তখন বিক্রমজিতের পরিবারস্থ লোকজন সহ আগ্রা হইতে পলায়নের উদ্যোগ করিতেছিলেন। কিন্তু হুমায়ুনের কঠোর প্রহরীর ব্যবস্থা থাকায় তাঁহাদের পক্ষে আগ্রা হইতে পলায়ন সম্ভব হয় নাই। মুক্তিপণ হিসাবে বিক্রমজিতের পরিবারস্থ লোকেরা কোহিনুর সমেত বহু মণিমাণিক্য ও স্বর্ণ হুমায়ুনকে প্রদান করেন। এই মহামূল্য হীরকের কোন মূল্য নিরূপণ করা সম্ভব নয়। তবে সাধারণ হিসাবে সমগ্র পৃথিবীর লোক-সংখ্যার আড়াই দিনের খাদ্য মূল্যের সমান ধরা হইয়াছে, হুমায়ুন এই মহামণি আগ্রায় আসিবার পর আমায় দেয়।"

দিল্লীর রাজকীয় কোষাগার হইতে গোয়ালিয়র রাজ্যের নিকট কিভাবে এই অমূল্য রত্ন স্থানান্তরিত হয়, সেই সম্পর্কে সঠিক কোন ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পর যে অরাজকতা ও বিভীষিকার রাজত্ব দেখা দেয়, সেই সময় এই মহামণি দিল্লীর কোষাগার কক্ষ পরিবর্ত্তন করিয়া গোয়ালিয়র রাজ্যের কোষাগার আলোকিত করে।

ইহার কিছুদিন পরে ১৫৩০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর বাবর দেহত্যাগ করেন। বাবরের মৃত্যুর পর হুমায়ুনের ভাগ্যচক্রের বিবর্ত্তন দেখা দেয়। মাত্র দশ বৎসর রাজত্ব করার পর ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে কনৌজের যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার পরাজয় ঘটে। তিনি প্রাণভয়ে দেশ হইতে দেশান্তরে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। এই সময় হুমায়ুন হামিদা নাম্নী আরব দেশীয় এক বালিকার অনুরাগী হন এবং তাঁহাকে বিবাহ করেন।

১৫৫২ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুদেশের মরুভূমি অঞ্চলে অমরকোট নামক স্থানে একটি ক্ষুদ্র সহরে হামিদা একটি পুত্রসন্তান প্রসব করে। ইনিই ইতিহাস বিখ্যাত সম্রাট আকবর। জীবনের চরম দুর্দ্দিনেও হুমায়ুন কোহিনুর মহামণিকে হস্তান্তর করেন নাই। সিংহাসনচ্যুত সম্রাট পারস্যের শাহের নিকট তাঁহার দুর্ভাগ্যের কাহিনী বিবৃত করেন। সেই সময় তাঁহার ভ্রাতা কামরাণ কান্দাহারে হুমায়ুনের স্ত্রী ও তাঁহার পুত্রকে বন্দী করিয়া রাখেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, হুমায়ুন পারস্য সম্রাটকে তাঁহার আশ্রয় ও সাহায্যের বিনিময়ে ভারতবর্ষ হইতে আনিত মহামণি কোহিনুর ও অন্যান্য রত্নরাজি দিতে স্বীকৃত হন।

ঠিক এই সময়ে ১৫৪৫ সাল হইতে ১৬০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কোহিনুরের অস্তিত্বের সঠিক ইতিহাস জানা যায় না। ষোড়শ শতাব্দীর পর মোগল সম্রাটের কোষাগারে সঞ্চিত মণিমাণিক্যের ভিতর পুনরায় কোহিনুর আবিষ্কৃত হয়। ইহার পর প্রায় তিন শত বৎসর কাল পর্য্যন্ত মোগল-সম্রাজ্ঞীদের কণ্ঠদেশ শোভাবর্দ্ধন করে।

১৫২৬ খৃষ্টাব্দে মোগল সাম্রাজ্যের যে প্রতিষ্ঠা হয় তাহা ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে আওরঙ্গজেবের আমলে উন্নতি ও সমৃদ্ধির শীর্ষদেশে পৌছায়। ইহ'র পরে সম্রাটদের সাম্রাজ্যের বাঁধন শিথিল হইতে থাকে, ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে নাদির সাহের আক্রমণের ফলে সাম্রাজ্যের বন্ধন চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র গৃহযুদ্ধ বাধিয়া উঠে। তাঁহার মৃত্যুর ৩১ বৎসর পর উত্তর ভারতের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠে এবং পারস্যের নাদির শাহের লুব্ধ দৃষ্টি এই দিকে পতিত হয়। নাদির কুলি বাল্যজীবনে একজন সাধারণ রাখালবালক ছিলেন। কিন্তু পরে তিনি একটি সুশৃঙ্খল সৈন্যের অধিনায়ক হন এবং নিজেকে পারস্যের শাহ বলিয়া ঘোষণা করেন।

নাদির শাহ তাঁহার সৈন্যদল লইয়া উত্তর ভারত আক্রমণ করেন—এবং ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে লাহোর অধিকার করেন। ৭ই মার্চ্চ পারস্য সম্রাট পরাজিত মোগল সম্রাট মহম্মদ শাহকে হাওদার পশ্চাতে লইয়া দিল্লী প্রবেশ করেন। দিল্লী প্রবেশের চারদিন পর সহরে অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিল। নাদির সাহ তরবারী সাহায্যে কঠোরভাবে বিদ্রোহ দমন করিবার নির্দ্দেশ দান করেন।

ঐতিহাসিক লকহার্ট নাদির শাহের লুণ্ঠনের এক বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, "সূর্য্যোদয়ের পর নাদির শাহ অশ্বারোহণে চাঁদনীচকের নিকটবর্ত্তী রোসেন-উ-দ্দৌল্লার মসজিদে পৌঁছিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া মসজিদের উপরে উঠিয়া সহরের কোন কোন অঞ্চলে তাঁহার সৈনিক-দলের প্রতি আক্রমণ হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিলেন। তাহার পর তিনি সেই সকল অঞ্চলের অধিবাসীদের নির্ব্বিচারে হত্যার নির্দ্দেশ দিলেন।"

প্রাতে নয় ঘটিকার সময় শাহের সৈন্যদল নির্ব্বিচারে নিধনযজ্ঞ আরম্ভ করে। নির্ব্বিচারে হত্যার সঙ্গে সঙ্গে হীরা, জহরত প্রভৃতির দোকানসমূহ নিঃশেষে লুণ্ঠিত হইল। নরনারী নির্ব্বিশেষে আবাল বৃদ্ধ বণিতাসহ বৃহৎ অট্টালিকা সমূহে সাহের নির্দ্দেশে অগ্নিসংযোগ করা হইল।

অবিশ্রান্ত গতিতে বেলা তিনটা পর্য্যন্ত যখন এই নারকীয় উৎসব চলিতেছিল তখন নাদির শাহ মসজিদের উপর বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য উপভোগ করিতেছিলেন। অবশেষে দুর্গে আবদ্ধ মোগল সম্রাট তাঁহার প্রধান মন্ত্রীকে নাদির শাহের নিকট করুণা ভিক্ষা চাহিয়া পত্র প্রেরণ করেন। নাদির শাহ পত্র পাওয়ার পর হত্যাকাণ্ড বন্ধ করার নির্দ্দেশ দিলেন।

নাদির শাহ কর্ত্তৃক রাজকোষ লুণ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে মোগল সম্রাট মহম্মদ শাহ কোহিনুর সহ রাজকোষের সঞ্চিত ধনরত্নাদি নিরাপদ স্থানে প্রেরণ করিবার জন্য কোন প্রকার চেষ্টাই করিলেন না। নির্ব্বিচারে দিল্লীর অধিবাসী-দের হত্যা করিবার পর নাদির শাহ রাজকোষের সমগ্র ধন-সম্পদ হইতে সহরের যাবতীয় ধন রত্নাদি লুণ্ঠন করার নির্দ্দেশ দিলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে ৩৪৮ বৎসরের সঞ্চিত ভারতের অমূল্য ধন-রত্নাদির হাত পরিবর্ত্তন করিল। লুণ্ঠিত এই ধন রত্নাদির মধ্যে সম্রাট শাহজাহানের মহামূল্য ময়ূর সিংহাসন এবং ইতিহাস বিখ্যাত মহামণি। পারস্যের সম্রাট ঐ হীরক খণ্ড হস্তগত করার পর ইহার নাম "কোহিনুর" বা আলোর পর্ব্বত রাখিলেন।

অবশেষে কোহিনুর ১৬ই মে, ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে পারস্যের পথে যাত্রা করিল। কোহিনুরের সহিত চলিল কয়েক শত হস্তী, খচ্চর ও উষ্ট্র পৃষ্ঠে বোঝাই করা ভারতের সঞ্চিত বিপুল ধনরত্ন। কিন্তু এই সর্ব্বনাশা মহামণি তাঁহার ভাগ্যে বেশীদিন সহিল না। দিল্লী হত্যাকাণ্ডের সাত বৎসর পর ১৭৪৭ সালের ১৯শে জুন আততায়ীর হস্তে নাদির শাহ নিহত হন।

নাদির শাহের নিহত হওয়ার পর কয়েক বৎসরের মধ্যেই কোহিনুর কয়েকজনের নিকট হাত বদল হইল। অবশেষে আফগানিস্থানের নরপতি শাহ সুজা দুরানীর হস্তে ইহা আসিয়া পড়ে।

ঠিক এই সময়ে সম্রাট নেপোলিয়ান প্রাচ্যে রাজ্য জয়ের বাসনায় ভারতের অভিমুখে আসিবার এক পরি-কল্পনা করেন। ভারতের তদানীন্তন ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ নেপোলিয়ানের ভয়ে ভীত হইয়া কাবুলের রাজা শাহ সুজার সহিত ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে পেশোয়ারে এক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। শাহ সুজা যখন সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন তখন তাঁহার হস্তের মণিবন্ধে বাঁধা কোহিনুর হীরকের প্রতি ইংরাজের প্রতিনিধি Mount Stuart Elphinstone-এর দৃষ্টি পড়ে। ইহার অল্পকাল মধ্যেই ইংরাজের ষড়যন্ত্রে শাহ সুজাকে সিংহাসনচ্যুত করা হয়।

প্রাণভয়ে শাহসুজা কোহিনুর মণি সমেত সপরিবারে পাঞ্জাবে পলায়ন করেন। এই সময় মহারাজা রণজিৎ সিংহ সমগ্র পঞ্চনদের অধিনায়ক। পলায়িত শাহ সুজা পাঞ্জাবের রাজধানীতে পৌছানো মাত্র মহারাজা রনজিৎ সিংহ তাহার নিকট হইতে কোহিনুর মণি দাবী করিলেন। এই মহামণিকে হস্তগত করিবার বহুদিনের বাসনা এতদিন পর পূর্ণ হইল।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর সমগ্র রাজ্যে এক চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। রণজিৎ

সিংহের ইউরোপীয় আদর্শে শিক্ষিত খালসা সৈন্যদলের মধ্যে প্রবল অসন্তোষ দেখা দেয়। এই অসন্তোষ ক্রমে বিদ্রোহের আকার ধারণ করে। অবশেষে খালসা সৈন্যদল ইংরাজ অধিকৃত ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া বসিল। পর পর ফিরোজপুর ও আলিওয়ালের যুদ্ধের পর ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ২১ শে ফেব্রুয়ারী চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধে শিখগণ সম্পূর্ণ রূপে পরাভূত হয়।

ইহার এক মাস পরে ২৯শে মার্চ্চ সমগ্র পাঞ্জাব এক ঘোষণার দ্বারা ব্রিটিশ ভারতের সহিত সংযুক্ত হইল। তরুণ মহারাজ দিলীপ সিংহকে সিংহাসন পরিত্যাগে বাধ্য করা হয় এবং সন্ধিপত্রের সর্ত্ত অনুযায়ী কোহিনুর মহামণি ইংলণ্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে দিতে স্বীকৃত হন।

পর বৎসর ১৮৫০ সালের ৩রা জুলাই ভারতবর্ষ ছাড়িয়া কোহিনুর সাগরপারে যাত্রা করিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডেপুটি চেয়ারম্যান এক আনুষ্ঠানিক পর্ব্বের ভিতর দিয়া ইংলণ্ডের মহারাণীকে উপঢৌকন হিসাবে প্রদান করেন। এই মহামণি বর্ত্তমানে ইংলণ্ডের মহারাণীর স্বর্ণমুকুটে শোভা পাইতেছে। যে কেহ দুই পেনি খরচ করিয়া লণ্ডনের ওয়েকফিল্ড টাওয়ারে সংরক্ষিত মুকুটটিকে দেখিতে পারে।

এই সর্ব্বনাশা মহামণির রূপের আগুনে যুগ যুগান্ত ধরিয়া কত রাজা, মহারাজা, সম্রাট আত্মাহুতি দিয়াছে, কত দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছে, তাহার কোন হিসাব নাই। এই মহামণিকে ক্রয় করিবার কাহারও সাধ্য নাই। বল-দর্পীর নিকট যুগে যুগে কোহিনুর আত্মসমর্পণ করিয়াছে। ভারতের এই মহামণি আজ প্রায় একশত বৎসর সাগরের ওপারে। ইহার পরে এই রূপসী কোহিনুরের গতিবিধি কোথায়, তাহা একমাত্র কোহিনুরই বলিতে পারে।

★

ক্ষণ-নীড়

কল্যাণ কুমার দাশগুপ্ত

এই পৃথিবী দু'দিন মোটে
তার বেশি তো নয়,
(তবে) করিস কেন পরকালের
ভাবনাতে কাল ক্ষয় ?
(যখন) দু'দিন বাদে সবাইকে হায়
চলেই যেতে হবে,
সেই দু'দিনের ভোগেতে বল
ভাবনা কেন তবে !
যাবার আগে তাই নিয়ে যা'
ধরার পরিচয়।

(তাই) চৈত-ফাগুনের রঙে রঙীন
শ্রাবণ-ধারায় ভেজা—
পরাণ ভরে ভোগ করে নে
পারিস তোরা যে-যা।
(ওরে) এই পৃথিবীর দুখের বনে
বেদনা-বৃন্তে-ই
চিরদিনের আনন্দেরি
গোলাপ ফুটে রয়।
যাবার আগে তাই নিয়ে যা
ধরার পরিচয়।

শিল্পী-পরিচিতি

[আমরা এই বিভাগে মাঝে মাঝে বাংলার প্রবীণ ও নবীন শিল্পীদের জীবন ও শিল্প-আলোচনা প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছি। ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে সৃষ্টি-জীবনের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। বাঙালী শিল্পীমাত্রকেই আমরা এই বিভাগে সহযোগিতা করিতে সাদর আহ্বান জানাইতেছি। —সম্পাদক : 'বঙ্গশ্রী']

★

রোভার শক্তি হালদারের শিল্প-প্রদর্শনী

দীপঙ্কর গুপ্ত

প্রতিভা কখনও কোনো কেন্দ্রসাপেক্ষ নয়। সুযোগ আসিলেই তাহার বিকাশের পথ উন্মুক্ত হইয়া পড়ে। অনুরূপ একটা বিকাশের পথেই শিল্পী শক্তি হালদারের

গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন

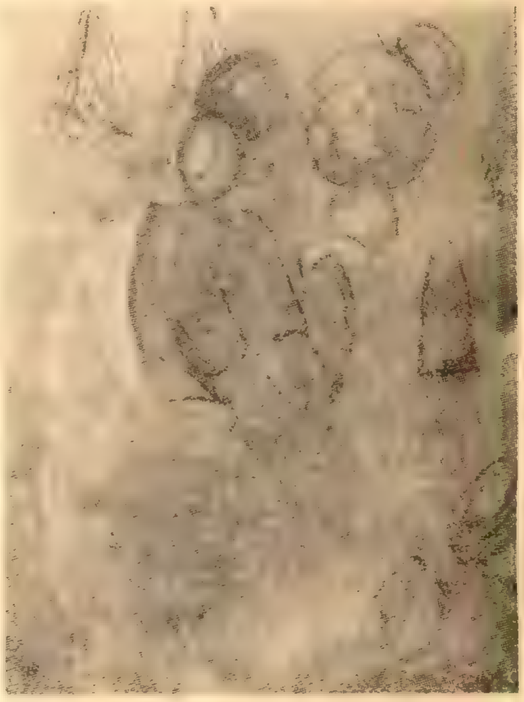

তাঁড়ার

সঙ্গে আমাদের পরিচয়। যে সময়ে কলিকাতায় ইন্দ্র দুগারের শিল্প-প্রদর্শনী লইয়া বিদগ্ধ সমাজে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, বড়র আসরে যেখানে ছোটর প্রবেশ নিতান্তই ছাড়পত্র সাপেক্ষ, ঠিক অনুরূপ সময়ে অনুরূপ পরিবেশের পাশে শক্তি হালদারের শিল্প-প্রদর্শনী একটা বিশেষ আত্মস্বাতন্ত্র্য লইয়াই সমজদার মণ্ডলীকে আহ্বান জানাইল। সেই আহ্বানে কেহ মুখ ফিরাইয়া থাকিতে পারিল না। ৫নং গভর্ণমেণ্ট প্লেস, নর্থে—গত ১৭ই হইতে ২২শে নভেম্বর পর্য্যন্ত এই প্রদর্শনীর দ্বার উন্মুক্ত থাকে।

গারোদের গৃহ

যে প্রতিভার কথা বলা হইতেছিল, শিল্পী শক্তি হালদারের মধ্যে তাহার স্ফুরণ হঠাৎই কিছু সম্ভব হয় নাই। তিনি বয়সে তরুণ, সেই তারুণ্যের সহজ শক্তি লইয়াই প্রথম বয়স হইতে তিনি South Calcutta Bharat Scouts and Guidesএর সঙ্গে জড়িত আছেন এবং একজন সক্রিয় Rover হিসাবে সমাজের কল্যাণকর কাজে আত্মনিয়োগ করিয়া আসিয়াছেন। অবকাশ মতো ভিতরে ভিতরে শিল্প সাধনা চলিতেছিল। তজ্জন্য তাঁহাকে অবশ্য শিল্প-বিদ্যালয়েও পাঠ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তাঁহার স্বভাবগত লজ্জাটি তাঁহার চরিত্রের অলঙ্কারস্বরূপ। সেই নমনীয় লজ্জাশীলতাই এতকাল শিল্পীকে নিজের চিত্রকে লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রাখিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু গুড়ের সন্ধান পিঁপড়ের কাছে ঢাকা থাকে না। বন্ধু বান্ধবদের আকস্মিক আক্রমণে একদিন শিল্পীর শিল্পসাধনা আবিষ্কৃত হইয়া পড়িল এবং তাঁহারাই প্রধান উদ্যোগী হইয়া শিল্পীকে অনুপ্রাণিত করিলেন প্রদর্শনীর মাধ্যমে চিত্রগুলিকে লোকচক্ষুর সাম্‌নে তুলিয়া ধরিতে। তাহারই ফল স্বরূপ অবশেষে শক্তি হালদারের এই চিত্র-প্রদর্শনী।

ইহাতে মোট ৫০ খানি চিত্র প্রদর্শিত হয়। Tri-colour, water colour, Black and White. Pencil sketch, Satch—প্রভৃতি নানা বর্ণাঢ্যে চিত্রগুলি বিশেষ আকর্ষণীয় হয়। প্রত্যেকটি বর্ণ লইয়াই তরুণ শিল্পী তাঁহার শিল্পের বর্ণমালা রচনা করিয়াছেন। কোথাও বা তাহা বিশেষ কোনো মূর্ত্তিতে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে, কোথাও বা প্রাকৃতিক রেখাচিত্রে রেখায়িত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার মধ্যে একাধিক চিত্র জীবন্ত হইয়া না উঠিলেও শিল্পীর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার স্পষ্ট ছাপ তাহাতে খুঁজিয়া পাওয়া দুর্লভ নয়। যে চারখানি চিত্র আমাদের বিশেষ ভাবে ভালো লাগিয়াছে, তাহা এই সঙ্গে পরিবেশিত হইলে (ক) ৩৫ নং চিত্র Summer Noon

গ্রাম্য সেচ

(গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন), (খ) ২৬ নং চিত্র Store-Room (ভাঁড়ার), (গ) ১২ নং চিত্র Garo House (গারোদের গৃহ), এবং (ঘ) ১৮ নং চিত্র Village Irrigation (গ্রাম্য সেচ)। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ইহার তিনটিই বাংলার প্রাণসম্পদে পূর্ণ। ১২ নং চিত্রের Garo House প্রধানতঃ গারো অঞ্চলের ভিত্তিতেই অঙ্কিত। যেখানে যে পরিবেশের মধ্যে যে চিত্র বা যে স্বপ্নটি শিল্পী-মনে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাকেই অনায়াসলব্ধ ভাবে শিল্পী চিত্রে রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কোথাও তাহা সার্থকতায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, কোথাও তাহা পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিয়া গিয়াছে। সামনে এখনও তাঁহার অনন্ত ভবিষ্যৎ পড়িয়া রহিয়াছে। সাধনা যদি ঐকান্তিক হয়, এবং স্বপ্ন যদি সত্যের দ্বারা মার্জ্জিত হয়, তবে জীবনের ধন কিছুই তুচ্ছতার অবলিপ্ত হইতে পারে না। শিল্পী শক্তি হালদারকেও আমাদের সেই একই কথা। নতুন নতুন অভিজ্ঞতার মধ্য হইতে প্রাণ-সম্পদ আহরণ করিয়া জীবনকে সাজাইতে হইবে, সজীব করিয়া তুলিতে হইবে। এই সজীবতাই সব কিছুর প্রাণশক্তি, জীবনীশক্তি। প্রদর্শনীর মাধ্যমে আজ শিল্পীর যে প্রাণশক্তির পরিচয় প্রকাশের দ্বারা জয়যুক্ত হইল, অদূর ভবিষ্যতে তাহা জীবনীশক্তির অমিয় মাধুর্য্যে ললিতশুভ্র হইয়া দেশ ও জাতির বৃহত্তর প্রয়োজনে উৎসর্গীকৃত হইবে, এ আশা আমরা রাখি।

★

চির-পাষাণ

শ্রীশিবদাস চক্রবর্ত্তী

মানবের চির বিরহ ব্যথার
স্মৃতিময়ী হে পাষাণ!
নও নও তুমি মর্ম্মর-মায়া
নহ নহ নিষ্প্রাণ।

বিরহী যে-কথা পারেনি কহিতে
তুমি মাতোয়ারা তারি সঙ্গীতে,
যে নদী মিলালো মরু সাহারায়
তুমি তারি কলতান।

মিলন-বাসরে যে মহাবাসনা
অন্তরে গুমরায়,
তুমি তারে সুরে করেছ প্রকাশ
বিরহ মূর্চ্ছনায়।

তুমি চিরদিন রবে বন্দিতা
অমর আখরে লেখা প্রেম-গীতা,
সাজাহান তোমা রচেনি, তুমিই
রচিয়াছ সাজাহান।

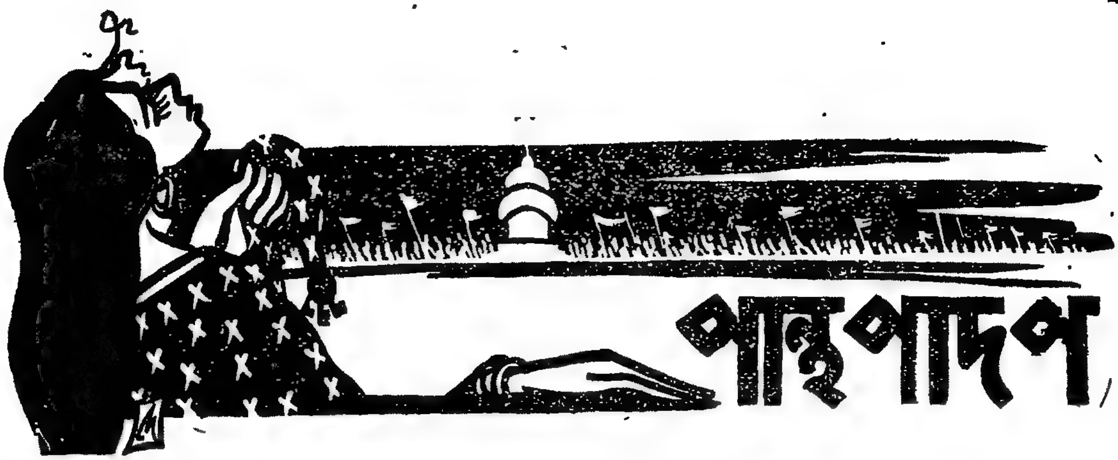

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(১৯)

মেলাস্থলের মাঝখানে দাঁড়ায় ভারতী, তাকে ঘিরে দাঁড়ায় বহুলোক। এদের মধ্যে অনেকেই তাকে চেনে, বিশেষ করে যারা গ্রামে থাকে।

ভারতী জিজ্ঞাসা করলে, "শুনছি নাকি, তোমরা চলে যাচ্ছো, আরও অনেকে চলে গেছে?"

অগ্রসর হয়ে এলো তারক মহান্তি। মেদিনীপুর জেলার কোন এক অখ্যাতনামা গ্রামে তার বাড়ী হলেও বহুকাল ধরে সে এখানে বাস করছে। বয়স প্রায় পঞ্চাশের উপরে গেছে, মাথার সমস্ত চুল সাদা হয়ে গেছে, সামনের দাঁত কয়েকটা নাই। তবুও মুখে সে হাসি ফুটায়, বললে, "কি করে এখানে আমরা থাকব মা? যেতে চায়নি বলে আমাদের গোবিন্দ রুইদাস, গোপাল, রামচন্দর তাছাড়া আরও কত লোক এমন মার খয়েছে যা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। জিনিসপত্র সব ভেঙ্গেচুরে ছড়িয়ে তছনছ করে দিয়েছে। খাওয়ার জিনিষ যা কিছু ছিল সব ওরা টেনেটুনে খেয়ে ফেলেছে। এখন-জোর করে হুকুম দিয়েছে এ জায়গা খালি করে দিতে হবে, না হলে ওরা আমাদের ঘেরাও করে মারবে, তারপর গুলীও চালাবে হয় তো—"

গুলী চালাবে—

কিন্তু অসম্ভবও নয়; জনতাকে ছত্রভঙ্গ করবার জন্য আরও কত জায়গায় পুলিশ অবশ্য গালাগালি করেছে, বন্দী করেছে, মারধর করেছে। কত জায়গায় চলেছে গুলী, কত লোক মরেছে। মানুষের তাজা লাল রক্তে ভেসে গেছে ধরণীর সবুজ বুক, সেই রক্তের উপর দিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেছে ওরা, নিষ্ঠুর প্রাণে এতটুকু রেখাপাতও হয়নি।

উনিশ শো পাঁচ খৃষ্টাব্দ—

হ্যাঁ, ওই খৃষ্টাব্দ হতেই নাকি আরম্ভ হয়েছে গণ-জাগরণ—অর্থাৎ গণ-আন্দোলন। দেশে যে মানুষ ছিল না নয়, কিন্তু তারা পড়ে শুধু মারই খেয়েছে, আর আগে তারা ভাবতেও পারে নি এত বড় বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ানো যেতে পারে। অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্পষ্টভাবে কথা বলবার অধিকার পর্যন্ত ছিল না লোকের, দেয়ালঘেরা ঘরের মধ্যে রাজশক্তির বিরুদ্ধে কথা বলতে তখনকার দিনের লোক ভয় পেয়েছে—কারণ দেয়ালেরও কান আছে।

আজ মনে পড়ে কোন সে একদিন—শাসক যেদিন শাসক মূর্তিতে আসে নি, এসেছিল পণ্যদ্রব্য মাথায় নিয়ে, দেশের পথে পথে অখ্যাত অজ্ঞাত এই সব লোকেরা মাথায় করে বিক্রেয় জিনিস নিয়ে ঘুরে বেড়াত। ফেরিওয়ালা ইংরেজ সেদিন পথে পথে ঘুরে দেশের অবস্থা সম্যকভাবে জেনেছিল, তাই না অত সহজে পলাশীর রণক্ষেত্রে ওরা সামান্য সৈন্য নিয়ে সামান্য সময় যুদ্ধ করে জয়লাভ করলে? বিশ্বাসঘাতক সেনাপতির নির্দেশমাত্র না পেয়ে দেশভক্ত সহস্র সহস্র সৈনিক একান্ত নিঃসহায়ের মত শুধু দাঁড়িয়ে মার খেলে?

বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে—

আজ বার বার সেই কথাটাই মনে হয়। ফেরিওয়ালা হল রাজা, সম্রাট হয়েও মনের উন্নতি তার হয় নি, সে তাই সকলকে করে সন্দেহ। আজ তাই না এনেছে এখানে সশস্ত্র মিলিটারী, বিশ্বাস সে করতে পারছে না এখানে

কেবলমাত্র চিরাচরিত নীতি অনুসারে মেলাটাই অনুষ্ঠিত হবে?

এ যাবৎ মার খেয়ে আসছে দেশের লোক। সাদা লোকের বুটের তলায় কত লোকই না মরলো। প্রমাণ হল প্লীহা ফেটে নাক মুখ দিয়ে রক্ত বার হয়েছে এবং তাই হচ্ছে মৃত্যুর কারণ। ইংরেজ ডাক্তার স্পষ্ট রিপোর্ট দিলেন এ দেশের লোকেদের প্রধান ব্যারামই হল প্লীহা—এবং প্রায়ই তাদের প্লীহা ফাটে।

অত্যন্ত স্বাভাবিক মৃত্যু, ম্যালেরিয়ায় ভুগে প্লীহা বড় হয়; যাকে বলে পেটজোড়া প্লীহা—যে কোন মুহূর্তে ফেটে যাওয়া বিচিত্র নয়।

ভারতীয়েরা কি চোখেই দেখেছে সাদা লোকদের, সর্বাংশে ওদের অনুকরণ করে এরা ধন্য হয়ে গেছে। ইংরাজের কথায় চালচলনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে এরা নিজেদের জন্য নূতন সমাজ সৃষ্টি করে নিয়েছে। যারা চারিদিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে, ভারতী সকলের মুখের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়।

এদের মুখ দেখেই জানতে পারা যায় এরা অত্যন্ত ভয় পেয়েছে। একে সাহেব তার উপর খাস। মিলিটারী, ওদের অসাধ্য কাজ জগতে কিছুই নাই। মিলিটারী আসার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা ঘরের মধ্যে লুকিয়েছে, পথ দিয়ে লোক প্রায় হাঁটে না, শিশুরা চীৎকার করতে, কাঁদতে ভুলে গেছে।

অত্যাচারিত লোকেরা ভারতীকে কতকগুলি দোকান দেখায়, এগুলি ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলা হয়েছে, জিনিসপত্র সব নষ্ট হয়ে গেছে। খাবারের দোকানগুলি একেবারেই খালি,—সেখানে লোকমাত্র নাই।

ভারতী নিস্তব্ধে দাঁড়িয়ে থাকে।

তার চারপাশের লোকজন কখন আস্তে আস্তে চলে গেছে তাও সে জানে না। যখন সে চেতনা ফিরে পায় তখন দেখতে পায় সে একাই দাঁড়িয়ে আছে।

আস্তে আস্তে ফিরে আসে সে—

বারান্ডার রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন রতনমণি দত্ত; উদাসদৃষ্টি তাঁর সামনের দিকে প্রসারিত, সে দৃষ্টি কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে—জনতার উপর কি অদূরে প্রবাহিতা পদ্মদহের ওপারে ধু ধু করা মাঠের উপর—কে জানে।

হঠাৎ আজই যেন নূতন করে ভারতী পিতাকে দেখতে পেলে। দীর্ঘাকৃতি পিতা সামনের দিকে অনেকটা নুয়ে পড়েছেন, মুখখানাও সরু লম্বা দেখাচ্ছে। নাকটা উঁচু হয়ে উঠেছে, গন্ডাস্থি বার হয়ে পড়েছে। বড় বড় দুইটি চোখে কিসের ছায়া দেখা যায়?

অগ্রসর হতে গিয়ে ভারতী থমকে দাঁড়ায়।

রতন দত্ত তার পায়ের শব্দ পেয়ে মুখ ফিরালেন। শীর্ণ এতটুকু হাসির রেখা তাঁর শীর্ণ মুখের উপর ফুটে উঠলো, জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হল ভারতী?"

অবসন্ন কণ্ঠে ভারতী উত্তর দিলে, "কিছুই হল না বাবা, কিছু হবেও না, আমি একটি কথাও ওদের বলতে পারি নি বাবা, একটি সাহসের কথা পর্যন্ত বলিনি। ওরা অনেকে চলে গেছে, আর সবাই চলে যাবে।"

যেন আপন মনেই রতন দত্ত মাথা দুলালেন, "আমি জানি, আমি তা জানি, জানি ওরা কেউ থাকতে পারবে না।"

ক্ষুব্ধকণ্ঠে ভারতী গর্জে ওঠে, "কাপুরুষ—"

হাসলেন রতন দত্ত, "জীবনের মায়া বড় বেশী মা, সাধ করে কে মরতে যাবে বল দেখি?"

ভারতীএকটি নিঃশ্বাস ফেলে—

রতন দত্ত বলে চলেন, "হ্যাঁ, জীবনের মায়া বড় বেশী। ওরা কল্পনায় দেখতে পাচ্ছে বন্দুকের গুলী, দেখছে সঙ্গীনের ফলা, সেই গুলী ওদের বুকে লাগলে ওরা সঙ্গে সঙ্গে মরে যাবে। মানুষ জানে সে মরবে, তবু এমনভাবে মরতে তারা চায় না। সবাই চায় আত্মীয়স্বজনের মাঝে শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে—কেউ চায় না আত্মীয়স্বজন হতে দূরে থেকে এমনভাবে মরতে।"

ভারতী রুক্ষ হয়ে ওঠে, দৃপ্তকণ্ঠে বললে, "ওইটিই মানুষের সব চেয়ে বড় দুর্বলতা বাবা। তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করার চেয়ে একেবারে মরে যাওয়া ভালো—আর সে মরণ যদি গুলীতে হয়, সে তো বড় আনন্দের।"

পিতা হাসলেন, "ঠিক কথা,—সে মরণ হাজারবার লক্ষবারও ভালো, কিন্তু মানুষ তা বুঝলো কই ভারতী? এত সরল আর সত্য কথা ওরা বুঝতে পারে নি, কোনদিন বুঝতে পারবেও না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলছে এই জন্ম মৃত্যুর চিরন্তনী খেলা, তবু মানুষ আনন্দ করে আবার ভয়ও পায়।"

ভারতী চুপ করে থাকে—

এই মুহূর্তে তার মনে পড়ে সেই ছেলেটির কথা; সেই জয়ন্ত—যে সোজা এসে তার ঘরে প্রবেশ করেছিল। অনেক কাজের মাঝে, অনেক ভাবনার চাপে সে কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল, আজ মনের অতলতল হতে আস্তে আস্তে ভেসে উঠলো সে।

"আচ্ছা বাবা, তোমার যে এক মামা ছিলেন শুনেছি, তাঁর খবর কিছু রাখো—?"

রতন দত্ত অর্থহীন চোখের দৃষ্টি কন্যার মুখের উপর রাখেন, উত্তর দেন, "না, সে দ্বীপান্তরে গিয়েছিল, কিন্তু আন্দামানে পৌঁছে আর তাকে দেখা যায় নি। কেউ বলে জলে ঝাঁপ দিয়েছে, কেউ বলে পালিয়েছে, আমি তার কোন খবরই জানি নে ভারতী। সে আজ অনেক কাল আগেকার কথা, মনে হয় সে বেঁচে নেই, বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই তার খবর পেতুম।"

ভারতী বললে, "আমি বলছি বাবা, তিনি বেঁচে আছেন —তবে প্রকাশ্যভাবে নেই, লুকিয়ে রয়েছেন। বয়সও তো বড় কম হল না, তোমারই বয়সী তো, এ বয়সে আর দৌড়-ঝাঁপ করে কাজ করার ক্ষমতা তাঁর হবে না!"

শুষ্ক হাসি হাসেন রতন দত্ত—

"তুই যে অনেক খবরই রাখিস ভারতী, কিশোরকে তুই জানলি কি করে, তুই তো তাকে দেখিস নি—।"

ভারতী উত্তর দেয়, "জানি বাবা, না দেখলেও তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পেরেছি। তুমি তখন জেলে, দাদু একখানা পত্র পাঠিয়েছিলেন—"

"দাদু—মানে কিশোর—"

রতন দত্ত বিস্ময়ে ভারতীর পানে তাকান।

ভারতী সেদিনকার সব কথা বলে যায়, নিস্তব্ধে রতন দত্ত সব শুনে যান।

ভারতী সব শেষে বললে, "দাদু কাছাকাছিই আছেন বাবা, হয়তো কোন দিন এসে পড়তে পারেন—"

রতন দত্ত মাথা নাড়লেনঃ

"না ভারতী, সে আসবে না। কিশোরকে তুমি চেনো না, অমন দৃঢ়চিত্ত অথচ একগুঁয়ে লোক তুমি আর দেখতে পাবে না। সে যখন এ বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে—তখন তার বয়স কত শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবি তুই। তারপর চলে গেছে কতদিন—কত মাস—কত বছর, কিশোর আর এ বাড়ীতে পদার্পণ করে নি। সে বলে গেছে সে আর এ বাড়ীতে আসবে না।"

ভারতী স্নিগ্ধকণ্ঠে বললে, "কিন্তু আমি বলছি বাবা, দাদু আসবেন—আবার এ বাড়ীতে আসবেন। যে রতনমণি দত্তের উপর অভিমান করে তিনি চলে গিয়েছিলেন, সে রতনমণি দত্ত আজ নেই, নূতন রতনমণি দত্ত জন্মগ্রহণ করেছেন তোমার মধ্যে—যাকে তিনি দেখতে চেয়েছিলেন, যাকে পেতে চেয়েছিলেন।"

রতনমণি নিস্তব্ধে সামনের মেলাস্থলের পানে তাকিয়ে থাকেন।

উনিশশো পাঁচ হতে উনিশশো এগারোঃ এর মধ্যে ছুটে গেছে কত ঘটনা। এই কয় বৎসরের মধ্যে ঘটলো কত ঘটনা, কত আবর্তন বিবর্তন। উনিশশো দশে গেল কিশোর হারিয়ে,—

মিলিটারী গোরা কয়েকটা নাগরদোলায় দোল খাচ্ছে। ভারি স্ফূর্তি তাদের। নাগরদোলাটাকে তারা নিয়ে যেতে দেবে না ঠিক করে ফেলেছে। যে কয়টা দিন তারা এখানে থাকবে, নাগরদোলায় দুলবে, তারপর চলে যাওয়ার সময় ভেঙ্গে দিয়ে চলে যাবে।

একদিনেই তারা হাঁপিয়ে উঠেছে। ওদিকে শব্দদহের দিকে এরই মধ্যে কতকগুলো তাঁবু খাটানো হয়ে গেছে, এদিক ওদিক জঙ্গল, খানা, ডোবা, তার পরে মশা মাছি, সকলকে ছাড়িয়ে উঠেছে শৃগালের চীৎকার।

তবু হ্যাঁ, স্বীকার করতে হবে, এ জাতির মেরুদণ্ড শক্ত হাজার কষ্ট পেলেও এর নুইয়ে পড়বে না, কর্তব্য এরা ভুলবে না।

এরা সেই দেশের ছেলে যারা জন্ম হতে শেখে কর্তব্য-পরায়ণতা, দেশকে একনিষ্ঠ ভাবে ভালবাসা, এরা দেখে উন্নতির স্বপ্ন, কেবল নিজের নয়—নিজের জাতির—নিজের দেশের। তাই না অতটুকু দেশ ইংল্যান্ড, সে হল আজ কত বড়, তার উপর দৃষ্টি পড়ে আছে কত দেশের

কিন্তু এ দেশের ছেলেরাও তো এমনি শিক্ষা পেয়ে গড়ে উঠতে পারে। এই যে বিপ্লব জেগেছে বাংলা দেশে এ আগুন সীমাবদ্ধ থাকবে না, ছড়িয়ে পড়বে জনগণের মধ্যে; আজ যারা বাধা দিচ্ছে, তাদের মাথা নোয়াতেই হবে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে আসে—

অমাবস্যার রাত্রিই হবে হয় তো। কে জানি বৈকালে বলেছিলো—আজ অমাবস্যা। অন্ধকার জমাট বেঁধে উঠছে ক্রমে ক্রমে।

আকাশে বৈকাল হতে পাতলা মেঘ কুয়াশার মত জড়িয়ে পড়ছিল, বাতাসের জন্য জমাট বাঁধতে পারেনি। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসটা থেমে এলো—আকাশের পাতলা মেঘ জমাট-বেঁধে দাঁড়াল।

অন্ধকারে বারান্ডার রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল ভারতী। কাল সকালে পিতাকে নিয়ে তারা চলে যাবে গ্রাম ছেড়ে, আর তারা এখানে আসবে না।

রতন দত্ত সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঘরে শুয়ে পড়েছেন, আজ কিছুই তিনি আহার করবেন না। বলে দিয়েছেন তাঁকে যেন না ডাকা হয়, তিনি সারারাত বিশ্রাম চান।

এই গ্রাম, এই দেশ, এই ভিটকে তিনি বড় ভালবাসেন, এই গ্রামের সব কিছু তাঁর বড় প্রিয়। তাঁকে আজ

সব ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে,—মহামান্য জমিদার রতনমনি দত্ত আজ রাত গেলে কাল্ সকালে অত্যন্ত গোপনে গ্রাম ত্যাগ করবেন।

অতীতের শত সহস্র স্মৃতিময় জন্মভূমি।

ভারতী যেমন রেলিংয়ে ভর দিয়ে তাকিয়ে আছে গ্রামের পানে, রতন দত্তও খোলা জানালাপথে তেমনই তাকিয়ে ছিলেন অন্যমনস্ক ভাবে। মিলিটারী ক্যাম্পসমূহে আলো জ্বলছে, তার উজ্জ্বল আলোয় বহু দূর আলোকিত হয়ে উঠেছে।

"খোকা—"

কে ডাকে—?

কোথায় কে ডাকে? মায়ের ডাক ভেসে আসছে, মায়ের অশরীরি আত্মা তাঁর খোকাকে খুঁজে ফিরছে।

রাণীমা—মহেশ্বরী দেবী কি ফিরে এসেছেন? তাঁর শ্বশুরের ভিটায় শেষ বংশধর আজ শেষ রাত্রি যাপন করছে, তিনি আজ শেষবার ডাকছেন, শেষবার খোকাকে দেখে নিচ্ছেন।

পিতৃপুরুষের আকুল দীর্ঘশ্বাস কানে ভেসে আসে। যুগপৎ হাজার কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে—"না না না, এ ভিটে ছেড়ে যেয়ো না—যেয়ো না—"

কিন্তু যেতে হবেই, রতন দত্তের এখানে থাকবার আর অধিকার নাই। পিতৃপুরুষের জমিদারী হস্তচ্যুত হয়েছে, একে একে সব গেছে,—আজও আছে এই বাড়ীখানি, পিতৃপুরুষের ভিটাটুকু। কেবল মাত্র ভিটার মায়ায় জাতিসর্ব্বস্ব জাতিমান রতন দত্ত এখানে থাকতে পারেন না।

ওধারে বাগান বাড়ী—

আজও ফুটেছে কি একটা নাম না জানা ফুল, তার সুমিষ্ট গন্ধ যেন এতদূর পর্যন্ত ভেসে আসছে। পূর্ব পুরুষ কারও বুঝি ফুলের নেশা ছিল, দেশ বিদেশ হতে কত জাতীয় ফুলগাছ সংগ্রহ করে সমস্ত বাগানটীতে তিনি সাজিয়েছিলেন। সে সব গাছের দু একটী আজও আছে মৃতপ্রায় হয়ে, আর সব মরে গেছে। দেশী বিদেশী যে কয়টী ফুলগাছ আজও আছে, আজও বসন্ত কালে তাতে ফুল ফোটে, বাতাসে তার গন্ধ ভেসে আসে পথের ওপারে রতনমনি দত্তের শয়নকক্ষে।

এই ফুলের গন্ধ যৌবনের হারানো স্মৃতি ফিরিয়ে আনে।

আজ মনে হয় কোথায় কার কাছ হতে সত্যকার ভালোবাসা, স্নেহ মমতা পেয়েছিলেন।

সবাই করেছে ছলনা, সবাই তাঁকে প্রতারণা করেছে, করেনি জানকী বাই।

বিখ্যাত গায়িকা বাইজী জানকী বাই। রতন দত্তকে সে প্রকৃতই ভালোবেসেছিল তাই নিজের দেশ, যশ অর্থ সব ছেড়ে সে এসেছিল বাংলার এই গ্রামে। এই বাংলায় সে থাকতে চেয়েছিল, রতন দত্তের সুখ-দুঃখের সমান ভাগ সে নিতে চেয়েছিল।

মনে পড়ে তানপুরার সঙ্গে সে গাইতো—

বরখা লাগি মেরে গুঁইয়া

সেঁইয়া নেহি আওয়ে মোর—

সেই সুর আজও যেন কানে ভেসে আসছে, কান্নাভরা সুরে বাদল আকাশের পানে চেয়ে সে গাইছে—

বাদল গরজে বিজলী চমকে

দাহর মাচাওয়ে সোর—

সেঁইয়া নেহি আওয়ে মোর—।

কে কাকে ডাকে—কে কাকে চায়? আকাশে কালো মেঘ, বিদ্যুতে চোখ ঝলসে যাচ্ছে; বিরহিনী তার প্রিয়দয়িতের প্রত্যাশায় পথের পানে তাকিয়ে আছে,—সে কাঁদছে, সে ডাকছে—এসো, তুমি এসো।

আত্মবিস্মৃত ভাবে সে ভালোবেসেছিল রতন দত্তকে, কিন্তু ভুল তার ভেঙ্গে গেল একদিন,—যেমন ভাবে ভেঙ্গে ছিল সুশ্বেতার। একদিন সে বুঝলো—রতন দত্ত ভালোবাসতে পারেন না,—স্রোতের মুখে ভেসে যাওয়ার প্রবৃত্তি তাঁর চিরস্থায়ী।

তবু সব বুঝেও সে তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়েছিল, তার কালো কোঁকড়া চুলে রতন দত্তের সুগৌর সুন্দর পা দুখানা ঢেকে দিয়েছিল, পদ্মফুলের মুখখানা রতন দত্তের পায়ের উপর রেখেছিল, তার আঁখিজলে ভিজে উঠেছিল সেই পা দুখানি। শেষ প্রার্থনা সে করেছিল—"তুমি ভালো হও, তুমি সৎ হও। আমি তোমার জন্যে ঐশ্বর্য যশ সব ছেড়ে এসেছি, আমায় তুমি এমন করে অবহেলা করো না।"

রতন দত্ত কেবল হেসেছিলেন, বিদ্রূপের তীব্র হাসি।

নটির প্রেম—নটির ভালোবাসা,—

পদ্মপত্রে জলের মত সতত টলায়মান, এর স্থায়িত্বের আশা কেউ করে না।

সে হাসি ছুরির মতই বিঁধেছিল জানকী বাইয়ের বুকে, —তারপর সে আর একটী কথাও বলেনি, নিঃশব্দে একটী প্রণাম করে উঠেছিল এবং শেষ-বিদায় নিয়েছিল। আজ কোথায় সে জানকী বাই? আকাশে মেঘ সেজে আছে,

বিদ্যুতে চোখ ঝলসে যায়, জানকী বাইয়ের মধুর কণ্ঠে আর সে গান শোনা যায় না।

দশ বৎসর পরে খবর পাওয়া গেছে ভারত বিখ্যাত বাইজী জানকী বাইয়ের,—তার এক রাত্রের মুজরা দিতে বড় বড় রাজা মহারাজার ঐশ্বর্য নিঃশেষ হয়। অথচ এই মেয়েটাই চেয়েছিল এখানে অত্যন্ত সাধারণভাবে থাকতে,—সে ফিরে যেতে চায়নি।

রতন দত্ত অন্যমনস্ক হয়ে থাকেন, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন।

জীবনে কত এলো আবার কোথায় সব চলে গেল জলবিম্বের মত দেখা দিয়ে। আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, যারা সেদিন পর্যন্ত তাঁকে ঘিরে থাকতো, আজ তারা সবাই বিদায় নিয়েছে।

সুশ্বেতা—তোমার অভিশাপ—

চমকে ওঠেন রতন দত্ত।

মানুষকে মানুষ যে সত্যই ভালোবাসতে পারে এ ধারণা তিনি কোন দিনই করতে পারেননি, তাই আঘাতের পর আঘাত করেছিলেন সুশ্বেতাকে, তার পর জানকী বাইকে। সুশ্বেতা জগতে স্থান পেলে না, সে মরে বেঁচেছে, জানকী বাই তার নিজের জগতে ফিরে গেছে।

রতন-দত্ত একবার চারিদিকে তাকাল।

"এবার—এবার—"

কানের কাছে কে যেন বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলে যায়।

সচকিত হয়ে ওঠেন রতন দত্ত,—কে কথা বলে— কে ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে বলে—?

চেঁচিয়ে ওঠেন তিনি,— "এবার কি—এবার কি হবে?"

কাণের কাছে তীব্র বিদ্রূপের হাসির শব্দ ভেসে আসে —"এবার অনুতাপ কর—অনুতাপ, আত্মাহুতি দিতে হবে নিজেকে, এই যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দাও—"

"সুশ্বেতা—আজ আমায় ভয় দেখিয়ে জয় করতে এসেছো সুশ্বেতা—? কিন্তু না, কখনও না,—আমি রতন দত্ত, জানো আমি রতন দত্ত, ভয়কে জয় করার শক্তি আমার আছে—'

অন্ধকার ঘরের মধ্যে রতন দত্ত মুষ্ঠিবদ্ধ হাত আন্দোলিত করেন, অলক্ষ্যে কে আছে তাকে তাড়িয়ে দিতে চান।

"বাবা—বাবা—"

ভারতী দরজায় আঘাত করে, পিতার চীৎকার শুনতে পেয়েছে সে।

প্রকৃতিস্থ হন রতন দত্ত—

নাঃ, কেউ নাই, কেউ নাই থাক, আছে তাঁর ভারতী, তাকে নিয়ে তিনি যে কোন জায়গায় যে কোন অবস্থায় বাস করতে পারবেন।

কোথায় মিলিয়ে গেছে সুশ্বেতা, ভারতীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সে পালিয়েছে। নিস্তব্ধ বিছানায় রতন দত্ত এলিয়ে পড়েন, বলেন, "কিছু হয়নি মা, তুই শুতে যা।"

ভারতী তবু খানিকক্ষণ রুদ্ধ দরজায় উৎকণ্ঠাকুল মনে কাণ পেতে দাঁড়িয়ে থাকে।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলার শব্দটুকু কানে আসে। হয় তো কত পড়ছে চোখের জল, উপাধান হয় তো সিক্ত হয়ে গেছে। তা উঠুক, আজ রতন দত্তের এ ভিটায় শেষ রাত্রি যাপন,—আর তো নয়। কাল হতে তাঁরা মহানগরীর নাগরিক, গ্রামের সঙ্গে আর তাঁদের কোনও সম্পর্ক থাকবে না। আজকের দিনটা পিতা তাঁর অতীতকে দেখুন,—ভারতী তাঁকে উত্যক্ত করবে না।

ঘন কালো হয়ে গেছে রাতের আকাশ, খানিক আগে বেশ এক পশলা জল হয়ে গেছে। এখনও বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, তারই আলোয় দেখা যাচ্ছে গ্রামের ঘরগুলি, গ্রামের পথ। সারাগ্রাম নীরব নিঝুম ; মিলিটারী ক্যাম্প ছাড়া তার কোথাও আলো দেখা যায় না।

দেখা যাচ্ছে পদ্মদহের সাদা চকচকে জল—

নাগিনী পদ্মদহ, রাক্ষসী পদ্মদহ—

কত লোকেরই না সর্বনাশ করলে এই পদ্মদহ। ওদিকে নগর তৈরী হতে সুরু হয়েছে,—একদল মিশনারী এসে বসেছেন। নিজেদের সুবিধা-স্বাচ্ছন্দের সমস্ত কিছু কোম্পানী ঠিক করে নিচ্ছেন। তাঁদের চেষ্টায় নিত্যকার বাজার বসেছে, হপ্তায় দুদিন করে হাটও বসছে। গ্রামান্তর হতে কত জিনিসপত্র সেখানে বিক্রয়ার্থে আসছে, কত গ্রামের লোকে তা কেনে। যে কোম্পানী লিজ নিয়েছেন গভর্ণমেন্টের কাছ হতে, তিনি ওখানে কল কারখানা গড়ছেন, —যন্ত্রপাতির অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে। বড় বড় গাছ ঝোপ জঙ্গল সব কাটা হয়ে গেছে, বড় বড় রাস্তার পরিকল্পনাও হয়েছে।

এই তো কিছুদিন আগেকার কথা—

রামজলার মাঠের ওদিকে গ্রামে প্রবেশ করবার মুখে পথের উপর ছিল মস্ত বড় বট গাছ, তার তলাটা ছিল বাঁধানো। বনশিউলীর ঘন বনে পরিবেষ্টিত স্থান, হঠাৎ ওদিকে চাইতেও ভয় হতো। কিন্তু ওই মানুষ—সমান বনশিউলির বনের মধ্য দিয়েই ছিল সরু একটী পথ, এই পথ দিয়ে লোক চলাচল করে এসেছে বরাবর। এই বটতলাটী চণ্ডীতলা নামে আশপাশ সকল গ্রামের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল।

গ্রামের মেয়েরা এখানে বরাবর পূজো দিতে আসে, সারাদিন উপবাস করে থেকে সন্ধ্যার দিকে পারণ করে চলে যায়। সাহেবের আদেশে দুদিন আগে বিদেশী জন কয়েক লোক এনে সে গাছ কাটা হয়েছে, হিন্দু কেউ বহু টাকার প্রলোভনেও গাছ কাটতে চায়নি।

গ্রামবাসীরা বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে, সাহেব নিজে সেখানে উপস্থিত না থাকলে তারা বিদেশী লোক কয়টাকে মেরে তাড়াতো—কিন্তু সাহেব দেখে তারা অগ্রসর হতে সাহস করেনি।

গাছ কাটবার আগেই তারা দল বেঁধে এসে পড়েছিল রতনমুনি দত্তের কাছে—তিনি দাঁড়ান, চণ্ডীতলাকে রক্ষা করুন। চণ্ডীতলা ধ্বংস হলে গ্রামের ধ্বংস অনিবার্য।

কিন্তু রতন দত্তের কাছে তারা পৌঁছাতে পারেনি, ভারতী তাদের কথা শুনেছে, শান্ত কণ্ঠে বলেছে—"তোমরা নিজেরা যদি বাধা দিতে পারো বাধা দাও গিয়ে; বাবা যা পারবেন না, তার জন্যে তাঁকে ধরতে এসো না।"

নির্বাকে তারা চলে গেছে।

নির্বোধ বীর্যহীন, শক্তিহীন এই সব গ্রামবাসী বাধা দেওয়া দূরে থাক, একটা কথাও তারা বলতে পারেনি। রাগও হয়—দুঃখও হয়। কবি এদেরই লক্ষ্য করে বড় দুঃখে বলেছেন—

নাহি জানে কার কাছে দাঁড়াইবে বিচারের আশে।
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে—

কিন্তু এদের জাগাতে হবে, এই সব মূঢ় ম্লান মুখে ভাষা দিতে হবে—কে আসবে, কে দেবে ভরসা, কে দেবে সাহস, কে দেবে শক্তি?

ভারতী চীৎকার করে বলতে চায়—"ওরে তোরা মানুষ হ। এমন করে বুক পেতে দিসনে অত্যাচারীর পায়ের তলায়। তোরা মাথা উঁচু করে দাঁড়া, তোরা বল—সইবো না অত্যাচার লাঞ্ছনা, আমরা আমাদের এতটুকু বস্তুও দেব না বিলিয়ে। আমরা বাঁচতে চাই, আমরা বাঁচব, এমন করে অনাহারে শুকিয়ে কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে আমরা মরতে চাই নে।"

কিন্তু বদলে গেছে মানুষের মন। কতগুলি লোক মরেছে, কতকগুলি জেলে গেছে—আর যারা আছে তারা ভীরু হয়ে গেছে, সাহস তারা আর করতে পারে না। একদিন তারা এগিয়েছিল, আজ তারা এতখানি পেছিয়ে গেছে যে আর তাদের সামনে আনা সম্ভব নয়।

আবার কতদিন, কত বৎসর, কত যুগ পরে এরা সাহস পাবে, বুকে শক্তি নিয়ে এগিয়ে আসবে কে জানে!

ভারতী নিঃশ্বাস ফেলে। [ক্রমশ

★

কবিতায় আছে ভুল

শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

চাঁদে কলঙ্ক আছে চিরকাল, তবু সে তো সুন্দর;
কেতকী-গোলাপে কাঁটা আছে তবু আমোদিত করে ঘর।
কবিতার আছে ভুলঃ
জীবনে জড়ানো রয়েছে শতেক বেদনা-রক্ত-ফুল।
স্খলন-পতন, ত্রুটি-বিচ্যুতি, অপরাধ-আপশোষ;
অক্ষমতাব গ্লানি আক্ষেপ, অশ্রু-অসন্তোষ।
অলঙ্কারের দৈন্য প্রচুর; অনেক অসঙ্গতিঃ
কঙ্কর-ভরা খরা সাহারার দাবদাহ-দুর্গতি।
ছন্দের গরমিলঃ
বন্ধুর ধরা, ক্লান্ত চরণ; হলাহলে গঙ্গা নীল।
প্রমত্তা নদী পদ্মা প্রখরা, পড়ে খালি ভেঙ্গে পড়ে;
জীর্ণ কুঁড়ের চাল উড়ে যায় কাল-বৈশাখী ঝড়ে।
অসংখ্য রসাভাসঃ
প্রতি মুহূর্তে অপমৃত্যুর উদ্গত নিঃশ্বাস।
দূরের আকাশে উচ্ছ্বাসে তবু ঝিলমিল ছায়া-আলো;
বঞ্চনা-ভরা বহুস্যময় ধরণীরে লাগে ভালো।
কবিতায় আছে ভুলঃ
অনেক অমিলে সাদা-লাল-নীলে জীবনের নেই তুল॥

অশ্বিনীকুমার দত্তের গান

রণজিৎ কুমার সেন

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় মহাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের আপামর জনসাধারণের সামনে সেদিন কংগ্রেস যে আবেদন নিয়ে এসে দাঁড়ায়, সেই আবেদনের মূলগত সুরটি দীর্ঘকাল পূর্ব থেকেই তৎকালীন চিন্তানায়কদের হৃদয়-তন্ত্রীতে অনুরণিত হচ্ছিল। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে জাতীয় মহাসমিতি গঠিত হ'য়ে প্রকাশ্যভাবে সর্বপ্রথম তার অভিব্যক্তি ঘটে। রাজনীতির প্রকাশ্য মঞ্চে এসে না দাঁড়ালেও পূর্ববঙ্গের জীবনসত্তাকে যিনি ত্যাগ, নিষ্ঠা ও জাতীয়তার মন্ত্রে সেদিন উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলেছিলেন, তিনি হচ্ছেন সাধননিষ্ঠ মহাপুরুষ অশ্বিনীকুমার দত্ত। জাতীয় মহাসমিতি প্রতিষ্ঠার বহু বৎসর আগে থেকেই তিনি নানা সঙ্গীত ও বাণী প্রচার ক'রে একদিকে যেমন অশিক্ষিত জনসাধারণকে জ্ঞানের মন্ত্রে উদ্বোধিত ক'রে তুলেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকেও সমাজ ও রাষ্ট্রীয় চেতনায় উদ্দীপিত ক'রে তুলেছিলেন। ১৮৮০ থেকে '৮৫ সালের মধ্যে অশ্বিনীকুমারের 'ভারত-গীতি' রচিত, গীত ও প্রচারিত হয়। ঋষি বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরম' তখনও বিশেষভাবে জনগণের হৃদয়ে আশ্রয়লাভ করেনি। তা না ক'রলেও জাতীয় মহাসমিতি প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ বৎসর পূর্ব থেকেই বাঙালী চিন্তানায়ক ও কবিরা তাঁদের মননশীল চিন্তাধারা ও কাব্যের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদ তথা সামাজিক কর্মনিষ্ঠাকে সম্প্রসারিত ক'রে তুলছিলেন। সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, মনোমোহন বসু, গোবিন্দ রায় আর অশ্বিনীকুমারের মধ্যে কোনো তারতম্যই নেই। স্বামী বিবেকানন্দের বাণীও সেখানে একই তন্ত্রীতে অনুরণিত হ'য়ে উঠেছিল। গোবিন্দ রায়ের—

> 'কতকাল পরে বল ভারত রে,
> দুঃখসাগর সাঁতারি পার হবে।
> ... ...
> পর দীপশিখা নগরে নগরে
> তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।'

প্রভৃতি সঙ্গীত সেই দেশাত্মবোধ বা জাতীয়তাবাদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হ'য়ে রয়েছে। অশ্বিনীকুমারের 'ভারত-গীতি'র আবেদন কিন্তু আরও গভীর। জনসাধারণের একেবারে মর্মে গিয়ে তা আঘাত ক'রেছিল। তাঁর সঙ্গীতের ভাষা যেমন সহজ ও সর্বজনবোধ্য, তেমনি আবেদনের দিক থেকেও অত্যন্ত প্রাণধর্মী। নিরক্ষর চাষী থেকে সুরু ক'রে শিক্ষিত ব্যক্তি পর্যন্ত সকলেই তাঁর সেই সহজ প্রাণধর্মকে উপলব্ধি ক'রে এক নবীন জীবন-চেতনায় উজ্জীবিত হ'য়ে উঠেছিল। 'ভারত-গীতি'র একটি সঙ্গীতে অশ্বিনীকুমার বলছেন :

> 'আয় আয় সবে ভাই, যাই দ্বারে দ্বারে,
> ভারতের ভাগ্য দেখি ফিরে কিনা ফিরে।
> সোনার এই রাজ্য ছিল, ক্রমে ক্রমে সকল গেল,
> এমন যে ভারতবর্ষ, গেল ছারেখারে।
> অন্নপূর্ণা রাজ্যে হা রে, 'হা অন্ন হা বস্ত্র' করে,
> লক্ষ্মীর ঘরে এমন কষ্ট, কে সহিতে পারে?
> ছিল ধনধান্যে ভরা, হ'ল এমন কপাল পোড়া
> অন্নাভাবে হা হতোস্মি, প্রতি ঘরে ঘরে।
> এই দেশেতে তুলা হয়, এই তুলা বিলেতে যায়,
> এই তুলাতে কাপড় তথায় বোনে ম্যাঞ্চেষ্টারে ;
> ম্যাঞ্চেষ্টার হ'তে এসে ঘরের টাকা নেয় রে শুষে,
> এদিকে দেশের তাঁতি অনাহারে মরে!
> এই কি দেশের ভালবাসা, তাঁতি ভাইদের এই দশা,
> তাদের এই দুঃখ তোরা, দেখিস কেমন ক'রে?
> আয়রে চেষ্টা করি সবে, দেশী কাপড় বিক্রী হবে,
> সাজাব দেশী তাঁতি সবে, ধনরত্নহারে।
> ইংরেজ-শিল্পী দেখ গিয়ে বাঙালীর টাকা নিয়ে
> তেতালা চৌতালায় কেমন সুখে বিরাজ করে ;
> (আর) বাঙালী শিল্পী যারা অনাহারে মরে তারা,
> দেখে তাদের এ দুর্দশা, প্রাণ যে কেমন করে!
> এক সমান জিনিষও হ'লে, যেটারে বিলাতী বলে,
> দেশী জিনিষ ছেড়ে তাই, নেয় হুল্লাঙ্গারে ;
> কেন কুলাঙ্গার হব? দেশের মোরা ধন বাড়াবো,
> সুখে রাখিব যত দেশী দোকানদারে।
> আয় সবে দ্বারে দ্বারে, ভাই সকলের পায়ে প'ড়ে
> (যাতে) দেশী লোকের টাকা হয়, বলি তা সবারে ;
> বিলাতী ফাঁকিতে ভুলে আর যেন না টাকা ফেলে,
> যতন যেন করে যাতে দেশের টাকা বাড়ে।

গানখানির অন্তর্নিহিত ভাবটি ব্যাখ্যা ক'রে বোঝাবার

অপেক্ষা রাখে না। স্বদেশী আন্দোলনের প্রায় পঁচিশ বছর আগে বরিশালের পথে পথে এই গান গেয়ে অশ্বিনীকুমার স্বদেশানুরাগ ও জাতীয়তাবাদের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন। ব্রজমোহন বিদ্যালয় ছিল তাঁর প্রধান প্রচারকেন্দ্র। সমগ্র ভারত যখন ইংরেজের রক্তচক্ষুর কাছে ভীত সন্ত্রস্ত, অশ্বিনীকুমারের পরিচালনায় বরিশালে তখন দেশী জিনিষের আদর ও তজ্জন্য স্বদেশী ভাণ্ডার স্থাপনার কাজ সুসম্পাদিত হ'য়ে গিয়েছিল। নীলকুঠীর অত্যাচার দমনে একসময় তিনি যে শক্তি নিয়োগ ক'রেছিলেন, তার প্রভাবও উত্তরকালে অশ্বিনীকুমারের নানা কার্যে স্পষ্ট হ'য়ে উঠতে দেখা গিয়েছে। ১৯০৫ সালে তাঁর নেতৃত্বে 'বরিশাল স্বদেশ বান্ধব' সমিতি গড়ে ওঠে। এ সময়ে ইংরেজের চক্রান্তে ও লর্ড কার্জনের নেতৃত্বে বঙ্গবিভাগ কার্য দ্রুত অগ্রসর হয়ে চ'ললো। 'বরিশাল স্বদেশ বান্ধব' সমিতির মূল উদ্দেশ্য ছিল—এই বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলন গ'ড়ে তোলা, বিলাতি বর্জন এবং স্বদেশী গ্রহণ। অদ্ভুত ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে সম্মুখপথে অগ্রসর হ'য়ে কোনোদিন পরাজয় স্বীকার করেন নি অশ্বিনীকুমার। এ ক্ষেত্রেও তিনি আরব্ধ কার্যে জয়ী হয়েছিলেন। তাঁর প্রধান শিষ্য চারণ কবি মুকুন্দ দাসের কণ্ঠও তখন বজ্র-নির্ঘোষে উচ্চকিত হ'য়ে উঠেছে। দেশবাসীকে আহবান করে তিনি গেয়ে উঠলেনঃ

'বান ডেকেছে মরা গাঙে
খুল্‌তে হবে নাও,
তোমরা এখনও ঘুমও?'

এতদ্ভিন্ন অশ্বিনীকুমারের বহু গানই আমরা মুকুন্দ দাসের কণ্ঠে গীত হ'তে শুনেছি।

লক্ষ্য করবার মতো একটা মস্তবড় বিষয় হ'চ্ছে এই যে, এ সময় থেকে অশ্বিনীকুমারের মধ্যে একটা অপূর্ব সাম্যবাদী মতবাদ গ'ড়ে ওঠে। সবাকে মিলিয়েই তবে দেশের মুক্তিস্বর্গ সার্থক, সমষ্টিকে বাদ দিয়ে ব্যষ্টির যে সুখ—তা অর্থহীন। ১৯০৯ সালে ১৭ই মার্চ্চ লক্ষ্ণৌ জেলে ব'সে অশ্বিনীকুমার গান রচনা ক'রলেন—

'মিষ্ট মধুর খাবার তোমার একলা খাবার নয়,
আশে পাশে সবাইকে তা বেটে দিতে হয়।
বেদ ব'লেছে একলা কেহ
খেলে ভরে পাপে দেহ,
ভালো নাই তার কভু ইহ, পরলোকেও ক্ষয়।

প্রহ্লাদ তাই ব'ল্‌লে দেখ,
একা মুক্তি নেবো নাকো,
কাঙাল ভুকো তাদের ডাকো, নিবি মিলি একসময়।

এই ভাবেই তিনি চিন্তা ক'রতে শিখেছিলেন: এবং এই সমষ্টিগত জাতীয় জীবনকে কেন্দ্র ক'রে যে এক অখণ্ড ব্রহ্মসত্তা বিরাজ ক'রছে—এই অনুভূতির বশেই তিনি আত্মগত সাধনায় বিভোর হ'য়ে যেতেন। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব, ঋষি রাজনারায়ণ বসু, স্বামী বিবেকানন্দ, পূজ্যপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতির সংস্পর্শলাভের ফলেই যে ধীরে ধীরে অশ্বিনীকুমারের মধ্যে ভূমার সাধনা জাগ্রত হ'য়ে ওঠে, তা অস্বীকার করা যায় না। কালের পরিবর্তন যেমন বিশ্বনিয়মের এক অবধারিত ফল, মানব-প্রকৃতির পরিবর্তনও তেমনি সৃষ্টি-রহস্যের এক অতিগ্রাহ্য বস্তু। অশ্বিনীকুমারের যে-জীবন সুরু হ'য়েছিল—দেশাত্মবাদ ও শিক্ষানীতিকে ভিত্তি করে, সে জীবন ক্রমে তদ্‌ভূমার অনন্ত রহস্যের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় খুঁজে পেতে চাইল। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে পূজ্যপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছে তিনি ব্রাহ্মমতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ ক'রে যত বেশী মানুষের সঙ্গ তিনি লাভ করেছেন, ততই তাঁর মন মানুষ থেকে অতিমানুষের দিকে ধাবিত হ'য়েছে। তাই ব'লে মানুষকে তিনি কোথাও বর্জন করেননি, বরং মানুষের জন্যই তিনি আজীবন কাজ ক'রে গেছেন এবং মানুষকে তিনি নর-নারায়ণরূপেই সেবা ক'রেছেন। এই নর-নারায়ণ থেকেই তাঁর সেই অতি-মানুষ বা পরম-পুরুষে উত্তরণ। কারাগারের নিভৃত জীবনে সেই সাধনা তাঁর ক্রমেই একাগ্র হ'য়ে উঠেছে। লক্ষ্ণৌ জেলে থাকতেই ১৯০৯ সালের ২৯শে ডিসেম্বর তিনি তন্ময়-সাধনায় সুর রচনা ক'রে লিখ্‌লেন—

তুমি মধু, তুমি মধু, তুমি মধু।
মধুর নিঝর, মধুর সায়র, আমার পরাণ-বঁধু।
(আমার সকল তুমি বঁধু হে)
(আমি যা কিছু চাই এ সংসারে)
(আমার সাধন ভজন তুমি) (আমার তন্ত্র তুমি মন্ত্র তুমি)
(ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ, বঁধু হে আমার সকল তুমি)।
মধুর মুরতি, মধুর কীরতি, মধুর মধুর ভাষ;
মধুর চলনি, মধুর দোলনী, মধুর মধুর হাস।
মধুর চাহনি, মধুর সাজনী, মধুর রূপের লেখা;
মধুর মধুর মধুর মধুর মাহেন্দ্র ক্ষণের দেখা।

(সে কি ভুল্‌তে পারি)
(সে ক্ষণের কথা কি ভুল্‌তে পারি)
মধুর রূপের মধুর কাহিনী মধুর কণ্ঠে গায়।
শুনিতে শুনিতে গলিতে গলিতে প্রাণ মুধ্‌ হ'য়ে যায়।
(তখন) অনলে অনিলে জলে, মধু প্রবাহিনী চলে,
মেদিনী হয় মধুময়।
(সব মধুময় হয়ে যায়)
(ঐ রূপে নয়ন দিলে বিশ্ব মধুময় হ'য়ে যায়)
(তখন) প্রকৃতি মোহিনী সাজে, হৃদয়ে মৃদঙ্গ বাজে,
মধুর মধুর ধ্বনি হয়।
(তখন) যেরূপ ভাতে যেখানে, যেকথা পশে গো কানে,
স্তুতি নিন্দা সকলি মধুর ;
(তখন গালিও যে মিঠা লাগে)
(তখন) বজ্রনাদ, কুহুধ্বনি, গুরু সোম, রাহু শনি,
মধুরসে সকলি ভরপুর।

অন্তিমানুষ বা পরম-পুরুষকে বন্ধুরূপে কল্পনা ক'রে সখ্যভাবেই সাধনা ক'রেছেন অশ্বিনীকুমার। যিনি ভূর্ভুবঃস্বঃ, যিনি রুদ্র, যিনি ক্ষমা, যিনি বিশ্ব-চরাচরকে আপন মহিমায় ধারণ ক'রে আছেন, যাঁর উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ ব'লেছেনঃ

'রূপ-সাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপ রতন আশা করি' ;
ঘাটে ঘাটে ঘুরবো না আর
ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী।'...

সেই অরূপ রতন প্রাণ-বল্লভের উদ্দেশ্যে আত্মনিবেদন ক'রে অশ্বিনীকুমার গাইলেন—

—আমার সকল তুমি বঁধু হে,...
আমার সাধন ভজন তুমি,
আমার তন্ত্র তুমি, মন্ত্র তুমি,
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ, বঁধু হে আমার সকল তুমি।...

সেই 'তুমি'র 'রূপে নয়ন দিলে বিশ্ব মধুময় হ'য়ে যায়।' তিনি যে বিশ্ব-রূপ, দীন দয়াময় পরম ব্রহ্ম তিনি। তাঁকে না জান্‌লে, না ডাক্‌লে পরিত্রাণ নেই। প্রাণ যে তাঁর মহিমময় রূপের ঢেউয়ে আচ্ছন্ন হ'য়ে যায়, তিনিই শরণা-গতি, রবি-শশী গ্রহ-নক্ষত্র তরু-লতা আকাশ-মৃত্তিকা—এ সবই যে তাঁর প্রেমময় রচনা, তাঁরই নিত্য খেলার সাথী। জীবন-বল্লভ তিনি, বিশ্ব-জীবনের সঙ্গে তাঁর নিত্যলীলা। সেই নিত্য-পুরুষের উদ্দেশ্যেই ভক্তপ্রাণ অশ্বিনীকুমার প্রাণের নৈবেদ্য উৎসর্গ ক'রে গাইলেন—

ওহে দীন দয়াময়, মানস বিহঙ্গ সদা চায়,
প্রাণ খুলে মনের সাধে ডাকি হে তোমায়।
ওহে তরুগণ শাখা 'পরে, পাখিগণ গান করে,
কেমন মোহন গুণ গায় হে ;
কিবা প্রভাত সমীরণ, বহে মৃদু মন্দ ঘন,
ভগবৎ-প্রেম বিলায় হে।
ওহে মনের হরষে আজি, নব সাজে সনে সাজি,
প্রেম গুণ গানে মাতায় হে ;
তব গুণ গাওত, প্রাণ মন নাচত,
পাগল ক'রল সবায় হে।
ওহে চিত্ত-বিনোদন, ভকত জীবন
সদা বাধা রব তব পায় হে ;
যাচত প্রেম দাস, পুরাও হে মন আশ,
তুহি মম জীবন সহায় হে।

গানখানি 'প্রভাতি-ঠুংরি' সুরে রচিত। অনুরূপ আর একখানি গান—

বিষয়-বাসনা ভুলি প্রেমের নিশান তুলি,
গাই সবে জয় ব্রহ্মনাম।
ও সেই দেশে যাব, কি সুখে আর হেথা র'ব,
যেথায় নাহি জাতি কুল মান
(যেথায় নাহি মান অপমান) ;
প্রেমে পুলক হবে সকল জ্বালা দূরে যাবে।
(তাপিত প্রাণ শীতল হবে)॥

দুখানি গানই ব্রহ্ম-সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত। ইহজন্ম প্রবাস-জীবনেরই নামান্তর মাত্র। জাত কুলের বিচার নিয়ে মান অপমানের পালা এখানে,—এখানে জনে জনে পার্থক্য, মনে মনে বিরোধ। সমস্ত বিরোধের পারে একমাত্র সম-ন্বয়ের মধুর ক্ষেত্র হ'চ্ছে ব্রহ্ম-বিহার ; সৃষ্টির সেই আদি ও অকৃত্রিম প্রচ্ছন্ন ক্ষেত্র। এ সংসারের বিষয়-বাসনা ভুলে একবার সেই প্রেম-নিকেতনের প্রেম-বান্ধবের সান্নিধ্যলাভ ক'রতে পারলে জরামৃত্যুর ঊর্ধ্বে এক পরম প্রশান্তিতে আত্মা আচ্ছন্ন হ'য়ে যবে। তখন 'সেই তুমি' আর 'এই আমি' একীভূত হ'য়ে এ্ক হ'য়ে উঠ্‌বে। মানুষে মানুষে ঐক্যবন্ধনের মধ্য দিয়ে একদিন যিনি সাম্যের বাণী রচনা ক'রেছিলেন এই ধূলিধূসর পৃথিবীতে, পরবর্তী জীবনে তিনিই পরম ব্রহ্ম ও ব্যক্তি-মানসের ঐক্যের সঙ্গীত গেয়ে ইহলোক ত্যাগ ক'রে গেলেন। অশ্বিনীকুমারের সঙ্গীত-সাধনার এই অনুবর্তিত ধারা দুটি বিশেষ লক্ষ্য ক'রবার মতো। মহাপুরুষ মাত্রের জীবনেই সাধনার এই বৈপরীত্য লক্ষণ দেখা যায়। তাঁদের বিপ্লব ও বিদ্রোহের অন্তরালে নির্বাণের যে আলোটি স্তিমিত রেখায় প্রজ্বলিত হ'তে থাকে, বিপ্লবের অবসানে সেই আলোটিই ধীরে

ধীরে একদিন উজ্জ্বল ভাস্করের মতো বহ্নি-মান হ'য়ে ওঠে। সেই বহ্নি-যজ্ঞ থেকে যে মন্ত্র উদ্গীত হয়,—সেই মন্ত্রই হ'চ্ছে নির্বাণের মন্ত্র, শান্তির মন্ত্র। অশ্বিনীকুমারও তাঁর সারা জীবনের সাধনার মধ্য দিয়ে সেই শান্তি-সাম্যের সঙ্গীতই গেয়ে গেলেন। উত্তরকালে বহু সাধকের জীবনেই আমরা অশ্বিনীকুমারের প্রভাব লক্ষ্য ক'রেছি। এই প্রভাব-কীর্তির মধ্য দিয়েই ভক্তপ্রাণ অশ্বিনীকুমার অমর হ'য়ে রইলেন।

★

একটি সোনালী স্বপ্ন

হিরন্ময় মুখোপাধ্যায়

একটি সোনালী স্বপ্ন—সোনালী ধানের স্বপ্ন গানে বেঁধে শোনাবো তোমাকে ;
যে ধান হাওয়ায় লাখে লাখে
এদেশের মাঠে ক্ষেতে দুলেছিল একদিন—তার কথা শোনাবো তোমাকে।

সে গান শোনার পরে হয়ত তোমার চোখে ঘনিয়ে আস্‌বে বিস্ময়,
হয়ত ভাব্‌বে তুমি—'কাঠফাটা এ মাটীতে ধান ফলেছিল ? তা কি হয় ?'
সে ধান, সে মাঠ তুমি দেখনি : এমন মনে হওয়া তাই বিচিত্র নয়।
কিন্তু আমি তো জানি, আমি তো দেখেছি এই মাটীতেই ফ'লেছিল সোনা,
তখন এ মাঠে, এই ক্ষেতে আজকের মত অজস্র ফাটল ছিলো না।
ছিলো না তখন সারা দেশ জুড়ে হাহাকার—খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়
কাটেনি আমার দিন ; এখন সে মাঠ, সেই ক্ষেতভরা ফসল কোথায় ?

জানো কি নিশ্চিহ্ন হোলো এ মাটীর বুক থেকে কেমনে সে ধান ?
যুদ্ধ এলো পৃথিবীতে—
বিদেশী শাসক তাই এ মাটীতে দুর্গ গ'ড়ে বসালো কামান।
তারপরও এলো কত প্রাকৃতিক বিপর্যয়, কত ঝড় অবিশ্রান্ত জলে,
বোশেখী মেঘের মত আকাশকে কালো ক'রে এল পঙ্গপাল দলে দলে—
এসে তারা ব'সেছিল ক্ষেত ভরা সোনার ফসলে।

সে ধান, সে মাঠ গেল সকলের অত্যাচারে—গোলা ও মরাই হোলো ফাঁকা,
চড়া রোদে পুড়ে পুড়ে এ মাটীতে চিড় খেলো : শূন্য মাঠ আজ করে খাঁ খাঁ ;
তবু আমি স্বপ্ন দেখি : সারিতে দাঁড়িয়ে এই খাদ্য খোঁজা—আছে এর শেষ,
ধন-ধান্যে-পুষ্পে ফের পৃথিবীর মধ্যে সেরা হবে জানি আমার এ দেশ।

কেনিয়ার কালাপাহাড়

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

হ্যাঁ, মনের দুঃখ, দুঃখ ছাড়া আর কি হতে পারে? মা নিগ্রাণী, বাবা ইণ্ডিয়ান্। বাবা পরিত্যাগ করেন নি, সন্তানের মায়ায় সমাজ ত্যাগ করেছেন। সমাজ ত্যাগ করা বলা চলে না, সমাজ হতে বহিস্কৃত হয়েছেন। তাতেও নিষ্কৃতি নাই, একেবারে অর্থনৈতিক বয়কট্। 'জুতা মেরামতের কাজ আর পাচ্ছেন না, যারা বাবাকে কাজ দিত, তারা বলে দিয়েছে—নিগ্রাণীকে তিনি বিয়ে করেছেন, তাঁকে কাজ দিলে দোকানের মালিকেরও চাকরি যেতে পারে। কি আর করেন—অবশেষে সহরের বাইরে পথের পাশে একটি গাছের তলায় বসে জুতা মেরামত করতে আরম্ভ করলেন। বাবা সহর ছেড়ে গ্রামে আসলেন, নিগ্রোদের গ্রামে থাকতে আরম্ভ করেছেন। অবসর সময়ে চুপ করে বসে থাকেন, কোথাও যান না, বাবার শরীর ক্রমেই ভেঙ্গে যাচ্ছে, বোধ হয় বেশিদিন বাঁচবেন না। এর কি প্রতিকার? এই দুঃখের কি প্রতিকার নাই?

ইণ্ডিয়ানদের পরম মিত্র বৃটিশ। এরা বৃটিশের বিরুদ্ধে কথা বলে যখন তাদের দেশের কথা মনে হয়; অন্য সময় বেশ দহরম-মহরম যদিও বৃটিশ ইণ্ডিয়ানদের ঘৃণা করে। ইণ্ডিয়ানরা গ্রামে সহরে সর্বত্র ব্যবসা একচেটিয়া করেছে, নিগ্রোরা বুঝে না ব্যবসা, বুঝে না হালচাষ, শুধু অলসভাবে জীবন কাটাতে জানে। আমি ত ইণ্ডিয়ান নই। বাবা শত চেষ্টা করেও আমাকে ভারতীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি করাতে পারেন নি। কোন দিন এক জন ভারতীয় মুখ তুলে আমাদের দিকে তাকায় নি। আমরা ইণ্ডিয়ান হতে পারি না, আমাদের সে পথ বন্ধ; আমাদের নিগ্রো হয়েই জীবন কাটাতে হবে। অর্ধ-নিগ্রো হয়েও এতদিন নিগ্রোদের ঘৃণা করে আসছি, আর নিগ্রোদের ঘৃণা করা আমার পক্ষে অনিষ্টকারক, আজ হতে আমি নিগ্রো।

মাকাটির বাবা মাকাটিকে কান্চি ডাকতেন, মা মাকাটি নামেই সকলের কাছে পরিচয় করে দিতেন। আমার নাম কান্চি হওয়া উচিত নয়, মাকাটি হওয়াই ভাল। ঠিক নামই হয়েছে। রুটির লোভে মা বাবাকে বিয়ে করেছিলেন। রুটির লোভ দেখিয়ে বাবা মায়ের চিত্ত জয় করেছিলেন। আমার জন্ম হবার পর অনেক চিন্তা করে আমার মা আমার নাম মাকাটি রেখেছিলো। আমার জন্মের তথ্য যদি বিশ্লেষণ করি তবে দেখতে পাই নিগ্রোদের মধ্যে রুটির অভাব এবং তাতে লোভও রয়েছে। কিন্তু রুটি পেতে হলে নিগ্রোদের জমি পেতে হবে। জমির মালিক বৃটিশ। বৃটিশের কাছ থেকে জমি ছিনিয়ে না নিতে পারলে গমের ক্ষেত হবে না। এ যে মহা মুস্কিল! একটার সঙ্গে অন্যটা জড়িয়ে আছে।

হাঁ, বাবার বুদ্ধি আছে, ইণ্ডিয়ানদের সংগও ত্যাগ করেছেন, বোধ হয় মায়ের মায়ায় তাঁর দেশ ভুলে গেছেন, ইণ্ডিয়ানদের সংগে মিশবার চেষ্টা করবেন না। তবুও বাবা জাতে ইণ্ডিয়ান, সহজে বিশ্বাস করা চলে না। একটু বাজিয়ে নেওয়া যাক। এই ত গত বৎসর নারার বাবা তার মাকে ছেড়ে চলে গেল, তবুও নারা তার বাবার পেছন নিয়েছিল, যখন নারার বাবা তাকে পদাঘাত করল এবং পরিস্কার ভাষায় বলল, "একদিনের উত্তেজনার ফলে তোর জন্ম হয়েছে। তোকে সঙ্গে রেখে কি আমি আমার সমাজ হতে বিতাড়িত হব? তুই যা, থাকগে তোর মায়ের সংগে, আমার সংগে আর দেখা করিস না বুঝলি—নিগ্রাণীর ছেলে?"

নারা বলেছিল, "তবে কি আমি তোমার ছেলে নই বাবা?"

নারার বাবা বলেছিল, "তুই আমার ছেলে কি করে হবি? আমার ছেলে নস্, তুই মেয়েই, তুই হলি নিগ্রাণীর ছেলে।"

নারা রাগ সামলাতে না পেরে তার বাবার মুখে একটা ঘুসি মেরেছিল। ঘুসির চোটে নাক হতে রক্ত পড়েছিল। পুলিশ নারাকে ধরে নিয়ে ছয় মাসের জন্য জেলে পাঠিয়েছিল। ঘরে এসে নারা তার মায়ের কাছে মাথা নত করে যখন বসেছিল, তখন নারার মা বলেছিলেন, "বেশ করেছিস নারা, এখন বিদেশী হারমজাদাকে আমার পক্ষে নিয়ে করাই অন্যায় হয়েছিল, এখন থেকে তুই শুধু আমার ছেলে, নিগ্রাণীর ছেলে, তুই নিগ্রো ছাড়া আর কিছু হতে পারিস না।"

মাকাটি ভাবল, নারা এখন কি করছে—না করছে, জেনে লাভ নাই, এখন তার বাবার মানসিক অবস্থা জেনে নেওয়া দরকার তারপর যা করবার করবে। মাকাটি একটা ঘর তৈরী করছিল। খেলার ঘর বললেও চলে। ঘরটা মাত্র

ছয় হাত লম্বা, চার হাত চওড়া, উঁচু আরও কম। ঘরের কাজ বন্ধ ক'রে সে বাড়িতে গেল। তখন মাকাটির বাবা রামজী একটা জুতা মেরামতের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। মাকাটিকে দেখা মাত্র তার বাবা বল্লেন, "একবার নারাকে ডেকে নিয়ে আসবি ত, আমার বিশেষ কাজ আছে। পারিস ত এখনই ডেকে নিয়ে আয়।"

মাকাটি নারার ঘরে গেল। নারা তখন নূতন প্রথায় ভুট্টার লেই তৈরী করছিল। মাকাটিকে দেখা মাত্র নারা জিজ্ঞাসা করলে, "তোর বাবা কি এখনও তোদের বাড়িতেই থাকে?"

—"তবে আর যাবে কোথায়? বাবা তোকে ডাকছেন, এখনই চলে আয়, বিশেষ কথা আছে তোর সংগে।"

—"আর না মাকাটি, আর ইণ্ডিয়ানদের সংস্পর্শে যাব না। গুজরাতী শিখেছিলাম, ভুল করে সোহেলী শিখি নি। এবার সোহেলী শিখতে হবে।"

আমার বাবা আমাকে শুধু সোহেলী শিখান নি, গুজরাতী এবং ইংলিশও শিখিয়েছিলেন; এখন আমি তিনটি ভাষায় লিখতে এবং পড়তে পারি। তোর বাবা তোকে 'বড় আশা' দিয়েছিল সেজন্যই বড় আশায় ছাই পড়েছে। আমার বাবা আমাকে 'বড় আশা' দেন নি, শুধু আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন যাতে আমি মানুষ হই। এখন আর কিছু বলেন না, শুধু আপন মনে কাজ করে যান। তিনি যা রোজগার করেন সবই মায়ের হাতে দিয়ে দেন।

নারা বলল, "আমার বাবা কিন্তু আমার মাকে একটি পয়সা দিয়েও বিশ্বাস করত না, সে বলত, ভারতীয় নিয়ম মতে স্ত্রীলোকের কাছে পয়সা গচ্ছিত রাখার নিয়ম নাই। লোকটা যে প্রথম নম্বরের প্রতারক বহু পূর্বেই আমাদের বুঝা উচিত ছিল, কিন্তু সুরু থেকেই আমার ভুল হয়েছে, মাকাটি।"

ভুল কিছুই হয় নি, আমি তুমি এবং আরও অনেকের জন্ম হয়েছে ইণ্ডিয়ানদের সংস্পর্শে এসে। আমরা খাঁটি কিকুইদের চেয়ে একটু ভাল, অনেক কিছু বুঝতে পারি। চল্ ত শুনে আয় বাবা কি বলেন?

চল্ যাই, হারামজাদারা প্রথম নম্বরের ধূর্ত, এ আবার কোন্ চালবাজি খেলে কে জানে?

মাকাটি এবং নারা উভয়ে লালজীর কাছে গেল। লালজী উভয়কে বসতে বললেন। এদিকে হাতের কাজ চলছিল। লালজী বললেন, "শোন তোমরা, যা বলি মন দিয়ে শুনবে এবং বুঝতে চেষ্টা করবে।"

"ইণ্ডিয়ার গুজরাত প্রদেশে আমার জন্ম। সেখানে অনেক রকমের ধর্ম আছে, হিন্দু ধর্ম তার মধ্যে একটি আমি সেই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত, এখনও আমার মন হতে ধর্ম-বিশ্বাস যায় নি, কিন্তু বুঝতে পেরেছি এসব সংস্কার মাত্র ভবিষ্যতে হয়ত মনের আরও পরিবর্তন হবে, তখন 'ধর্ম-কর্ম' মন থেকে একেবারে চলে যাবে। এসব হল আমার ব্যক্তিগত বিষয়, এসব বিষয় নিয়ে তোমাদের মাথা ঘামাতে হবে না। এখন আসল কথায় আসা যাক।

"গুজরাতে আমার যে বংশে জন্ম সেই বংশটা হল হিন্দুদের সব চেয়ে নীচ স্তরের। দেশে থাকলে আমাকে এমনই নিকৃষ্ট কাজ করতে হ'ত যা তোমরা কল্পনাও করতে পারতে না। সেজন্যই দেশ ত্যাগ করতে পরিকল্পনা করেছিলাম। শুধু পরিকল্পনা করলে ত হয় না, পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে হয়। চেয়ে দেখলাম—একটি মাত্র পথ খোলা। সেই পথ হল কোন জাহাজে চাক্‌রি নিয়ে বিদেশ পলায়ন। বিদেশে যেতে হলে বোম্বাই যাওয়া চাই। আমার মত লোকের কাছে বোম্বাই পৌঁছারও গাড়িভাড়া ছিল না। অতিকষ্টে গাড়িভাড়া যোগাড় করে বোম্বাই পৌঁছি এবং অতি সহজে জাহাজের চাকরি পাই। জাহাজের কাজ নিয়ে দুই তিন বার মোম্বাসা আসি এবং একবার নাইরবীও দেখে যাই। নাইরবী সহরটা আমার কাছে বেশ ভাল লেগেছিল। চতুর্থবারে ছুটি নিয়ে নাইরবী পৌঁছি এবং জাহাজে আর ফিরে যাই নি। সরকারও আমাকে পাকড়াও করার জন্য কোনরূপ হুলিয়া বের করেন নি।

"নাইরবীতে এসেই সর্বপ্রথম দেখা হয় মাকাটির মায়ের সংগে। কিকিউদের মধ্যে মাকাটির মার সৌন্দর্য এতই বেশি ছিল যে অনেক ধনী ভারতবাসীও তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। কি জানি কি ভেবে মাকাটির মা আমাকেই গ্রহণ করেছিলেন। বিয়ে হবার পর আমরা সহরে যাই এবং ভারতবাসীর একই সংগে থাকতে চেষ্টা করি। আমার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। তারপর মাকাটির জন্ম হবার পর থেকে ভারতীয় সমাজে প্রবেশ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেও কৃতকার্য হতে পারি নি। অবশেষে নিজেই মাকাটিকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করি। তোমরা নিশ্চয়ই জান, আমি গুজরাতী অথবা ইংলিশ অক্ষরও জানি না, তবুও একটি ভারতীয় শিক্ষককে মাকাটির শিক্ষার্থে রেখেছিলাম। সেই শিক্ষকও গত বছর থেকে এখানে আসা বন্ধ করেছেন। মাসে প্রায় দু' শ টাকা দিতে হ'ত, তিনি এখন আরও বেশি মাইনে চান। নিজে না খেয়ে মাকাটির শিক্ষার্থে প্রত্যেক মাসে দু' শ টাকা খরচ করেছি, এখন আমার ব্যবসা নাই, শিক্ষককেও বেশি মাইনে দেবার ক্ষমতা নাই। আমার মনে

হয় মাকাটি যা শিখেছে, তাতেই ভবিষ্যতে উন্নতি করতে পারবে।

"মাকাটিকে চাকরি অথবা ব্যবসায়ে নিযুক্ত করতে চাই না। আমি চাই মাকাটি তার মায়ের জাতের উন্নতি করুক, কিকুউ জাতকে বৃটিশের নাগপাশ হতে মুক্ত করুক, তুমি কি এখনও অর্ধ নিগ্রোরূপেই পরিচিত হতে চাও নারা?"

—"আমি আর অর্ধ নিগ্রো নই, আমি নিগ্রাণীর ছেলে, নিগ্রো ছাড়া আর কিছুই নই, আমি সর্বপ্রথম নিগ্রো তারপর কিকিউ। কিকুউ জাতের অর্থাৎ আমার নিজের জাতের মুক্তি প্রথম তারপর অন্যান্য নিগ্রোদের মুক্তির চেষ্টা করব লালজী।"

—"তাই যদি হয়, তবে তুমি এবং মাকাটি উভয়ে মিলে বিপ্লবী দল গঠন কর এবং তার নাম দাও মাও-মাও। বিপ্লব এক দিনে হয় না, ক্রমাগত চেষ্টা করতে হবে, হয়ত কৃতকার্য নাও হতে পার, কিন্তু মনে রেখো কিকুউ জাতকে যদি মুক্ত করতে হয় তবে আপ্রাণ পরিশ্রম করতে হবে। কি করে বিপ্লবী দল গঠন করতে হবে, আমি তোমাদের বলে দেব।"

"আমি যে দেশে জন্মগ্রহণ করেছি, সে দেশও মস্ত বড়। তোমাদের মধ্যে যেমন নানা জাতের লোক আছে, অথচ তোমরা সকলেই নিগ্রো, আমাদের দেশেও ঠিক তেমনি নানা জাতের লোক আছে, অথচ আমরা সকলেই ইন্ডিয়ান। আমাদের দেশের পূর্বদিকে এক জাত লোক বাস করে, তারা বাঙ্গালী নামে পরিচিত। তারাই আমাদের দেশে বিপ্লব করেছিল সর্বপ্রথম। তারা কি করে বিপ্লব করেছিল, জানবার জন্য আজই আমি সহরে যাব এবং জেনে আসব বিপ্লব কি করে করতে হয়। তারপর তোমরা বিপ্লবী কাজে লাগবে, রাজি আছ ত?"

—"হাঁ, নিশ্চয়ই রাজি, কিন্তু লালজী তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না, তুমিও ইন্ডিয়ান।" নারা বল্‌লে।

আমি যে ইন্ডিয়ান, তা অস্বীকার করার উপায় নাই, কিন্তু ইন্ডিয়ানরা যদি আমাকে তাদের জাতভাই অস্বীকার করে, তাদের কাছেও ঘেঁসতে না দেয়, সে অবস্থায় আমাকে নিগ্রো হওয়া ছাড়া আর কি উপায় থাকতে পারে?"

—"যদি কোন সময় ইন্ডিয়ানরা তোমাকে ডেকে নেয়, তোমার স্ত্রী-পুত্রকে সমাজে স্থান দেয়, তখন ত তুমি আমাদের হয়ে আর থাকবে না, এক দৌড়ে তাদের বাড়িতে চলে যাবে, তখন ভুলে যাবে আমাদের কথা। তখন তোমার ছেলেমেয়েরা আর অর্ধ নিগ্রোও থাকবে না, একেবারে খাঁটি ইন্ডিয়ান। দ্বিতীয়ত যে কোনও কাজে ইন্ডিয়ানদের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে সেই কাজই পণ্ড হয়েছে আজকে রাগের বশীভূত হয়ে ইন্ডিয়ানদের ক্ষতি করার জন্য আমাদের দিয়ে বৃটিশের হয়ত বিপ্লবের সৃষ্টি করতে পারেন, কিন্তু আগামীকাল বিপ্লব দানা বাঁধলে বৃটিশ যখন আপনার সাহায্য চাইবে, আপনার জাতভাই যখন আপনার সাহায্য চাইবে, তখন আপনি কি আমাদের সংগে থাকবেন?"

—"বিপ্লব সৃষ্টি করা এক, বিপ্লব চালিয়ে যাওয়া অন্য আর কিছু, সে-কথা তোমাদের জানা চাই নারা। প্রকৃত বিপ্লবের সময় যদি আমি বিরুদ্ধাচরণও করি, তখন তোমাদের কিছু আসে যাবে না। তর্ক পরিত্যাগ কর, এখন যেভাবে আমি তোমাদের পরিচালনা করি, সেইভাবে চল। কিকুউ উপজাতি বড়ই দুর্বল। অল্পেতে অল্প ভেঙ্গে পড়ে, এই জাতকে সম্বল করে সমস্ত আফ্রিকায় বিপ্লবের সৃষ্টি করতে হবে। মস্তবড় কাজ, এতে সময় ক্ষেপণ করা মোটেই ভাল হবে না।

সেদিন বিকালের গাড়িতেই লালজী নাইরবীতে গেলেন। থাকলেন ধর্মশালায় এবং বিপ্লব কি করে করতে হয় সেই উপদেশ লাভ করার জন্য চেষ্টা করতে আরম্ভ করলেন। উপদেশ তিনি পেয়েছিলেন। উপদেশ অনুযায়ী কাজ করার মত মনকেও তৈরী ক'রেছিলেন। এর পর গ্রামে যেয়ে স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পিতা এবং পুত্রে গ্রামত্যাগী হন। বিদায়ের পূর্বে লালজী তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন, "তোমাদের মত নিগ্রাণীদের সম্মান যত বৎসর অর্জন না করতে পারি, তত বৎসর আর তোমার সংগে দেখা হবে না; যাও মাও।"

বিদায়ের বাণী লালজীর স্ত্রী শুনেছিলেন। স্বামীর বিচ্ছেদে তাঁর মন একটুও বিচলিত হয় নি। তাঁর মনে প্রতি মুহূর্তে শুধু সেই বাণীই ধ্বনিত হ'ত: 'মাও মাও'।

প্রতিবিম্ব

[তৃতীয় পরিচ্ছেদ]

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

কে নাকি একজন, বলরাম তাহার নাম, হলের ফলকে ধরিত্রীটাকে উপড়াইয়া, উল্টাইয়া, উপুড় করিয়া ফেলিয়া দিবার ক্ষমতা পোষণ করিত। জেলা বোর্ডের সাইত্রিশজন সদস্যের মধ্যে একটা সুবৃহৎ অংশ বুকের ভিতরে বিড়ালের আঁচড় কামড় সহ্য করিতে করিতে—সে কি সহজে সহ্য করা যায়?—আকুল আবেগে সেই অনন্যসাধারণ হলচালনাকারী বলরামের সাহায্য ভিক্ষা করিতেছিলেন, নিঃসংশয়েই তাহা বলিতে পারা যায়। কাঁঠালভাঙ্গার পার ঘাটের খেয়া বন্দোবস্ত সান্যাল মহাশয় বিগত বাইশ বৎসর যাবত সম্ভোগ করিয়া আসিতেছেন; জেলার জজ ম্যাজিস্ট্রেট হইতে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিমাত্রেই খেয়ার নৌকা, মাঝি, দাঁড় বোটে লগি ইস্তক নোঙ্গরের কাছিটির প্রশংসা সান্যাল মহাশয়ের ভাবী পৌত্রী শ্রীমতী সুসম্ভাবা দেবী-রক্ষিত মন্তব্য পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেদিক দিয়া খেয়া পরিচালনার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিবার সাধ্য কাহারও নাই। এবং সুনিয়মে পরিচালিত ঘাটোয়ালকে উচ্ছেদ করিয়া কোন নূতন ও আনাড়ী ঠিকাদারকে খেয়া বিলি করারই বা কি সার্থকতা থাকিতে পারে? তবু যে বর্তমান বৎসরের বন্দোবস্ত বিলম্বিত হইয়া বৃদ্ধ সান্যাল মহাশয়কে বিচলিত ও উদ্বিগ্ন করিয়াছে তাহার জন্য সুধাকর সাহেবের গাফিলতিই দায়ী ও দোষী; এবং যদি কোনও কারণে ঘাটটি হস্তান্তরিত হইয়া যায় ও মনঃক্ষুণ্ণ ব্রাহ্মণের সাশ্রু দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে, তবে সুধাকর সাহেবকেই সে পাপের সমুদয় বোঝা বহন করিতে হইবে। পরহিতব্রতী প্রশান্তচিত্ত সান্যাল মহাশয় সুধাকর সাহেবের নিস্কৃতির উপায় নিরাকরণ করিতে চাইলে ব্যাক্ ডেটের আশ্রয় অবলম্বনের উপদেশ দিতে দিতে মুখে ছাতু গুলিয়া ফেলিতেছেন; ভীরু স্বভাব সুধাকর তাহাতেও নারাজ। যদুনন্দন বাবুর শ্যালিকানন্দনের চাকরীটা এতদিনে পুরানো হইয়া যাইবার কথা কিন্তু সুধাকর আজ থাক্, কাল্ নয় পর্শু করিয়া কালহরণ করিয়া আজ তাঁহাকে অকূলে নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন। শ্যামাচরণ সিংহ মহাশয়ের অনুযোগও অনুরূপ এবং গুরুতর। সকাল হইতেই সুধাকর সাহেবের ঘরে রথদোলের ভিড়। প্রথমটা সকলেই দুষ্ট ও দাম্ভিক গভর্নমেণ্টের আদেশটাকে হলের ফলকে উপাড়িয়া ফেলিবার পরামর্শই আঁটিতেছিলেন, কিন্তু হায়, অতঃপর মর্মান্তিক ক্ষেদ-সহকারে তাঁহারাই স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে, সে হলধর কি আর আছে? সে বাঙ্গলা দেশও নাই, সে সকল বলরামও, হায়, কোথায় অবলুপ্ত হইয়াছে! থাকিত যদি সেই ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল চাকী সত্যেন বোস্, ছার গভর্নমেণ্টের সাধ্য কি ছিল যে এরূপ কাজির বিচার করে? আজ যদি সুরেন্দ্র বাঁড়ুজ্যে, আনন্দমোহন বোস, কৃষ্ণ মিত্র, বিপিন পাল জীবিত থাকিতেন, ম্যাকেঞ্জির মানসপুত্রগণ নাকের জলে চোখের জলে হইয়া দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া ঐ উদ্ভট আদেশ প্রত্যাহার করিয়া লইতে পথ পাইত না। বাঙ্গালীর বরাত মন্দ, নহিলে নেতাজীই বা নিরুদ্দেশ হইবেন কেন? নেতাজী বিদ্যমান থাকিলে এত বড় একটা স্বৈরাচার করিয়া এই গভর্নমেণ্ট একদিনও রাইটার্স বিল্ডিংসে গদীনসীন থাকিতে পারিত কি? বিরাজ বাবু এক বিষম বিরাশীসিক্কা-ওজনের মুষ্ট্যাঘাতে সুধাকর সাহেবের সেক্রেটারিয়েট্ টেবিলটার প্লীহা ফাটাইয়া দিয়া গর্জিয়া উঠিলেন, ও'রা ত ও'রা! ও'দের গুরুঠাকুররা পেরেছিল ব্ল্যাক হোল্ 'মনুমেণ্টটাকে' লালদীঘির পাড়ে দাঁড় করিয়ে রাখতে। ওদিক দিয়ে নেতাজীও বেরিয়েছেন, বাপের সুপুত্র হয়ে মনুমেণ্টটাকে গন্ধমাদনের মত ঘাড়ে করে বাছাধনরা যে কোথায় স'ড়ে পড়লেন, আজ পর্যন্ত তার হদিস্ কেউ পেয়েছেন আপনারা? লাটকে কেবল একখানি চিঠিঃ আমাকে তোমরা জেল থেকে মুক্তি দেবে, কি দেবে না তাই আমি জানতে চাই! চিঠিও পাওয়া, সুড়সুড় করে জেলের ফটক খুলে ধরা। বিলেতে চার্চিলের তর্জনগর্জন, লাখে লাখে ইংরেজ আমেরিকান, চীনে, আফ্রিকান সৈন্যসামন্ত ভারতবর্ষে গিজগিজ করছে, যেন চিংড়ি মাছের গাঁদি লেগেছে রে! চার্চিলের প্রচণ্ড সেই দম্ভোক্তি—ভারতবর্ষে এত সৈন্য সামন্ত গোলা বারুদ বোমা কামান খাড়া আছে যে, এ সময়ে বদিয়তি করিলে

গোটা দেশটাই ধুলো করে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারবে। চার্চিল সাহেবের থোতা মুখ ভোঁতা করে নেতাজী সুভাষ যখন ভারতবর্ষের মাথার মণি আসামের বুকের উপর তাঁর ত্রিবর্ণ পতাকা গাড়লেন! ঐ যে বললুম, বাঙ্গালীর বরাত মন্দ, আজ নেতাজী নেই; নইলে বোর্ড বাতিল করা বেরিয়ে যেতো।

নন্দ বটব্যালও ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল, তাহার কয়লার কন্ট্রাক্টটা আটকা পড়িয়া গিয়াছে; "ব্যাক্‌ ডেটের" কাতর অনুনয় সে-ও করিয়াছে, কিন্তু ফলোদয় হয় নাই। সুধাকর সাহেব হাত গুটাইয়া বসিয়াছেন। নন্দ লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, কমিউনিস্টগুলো গেলো কোন্‌ চুলোয় আমি তাই ভাবছি শুধু। খাতা পত্তরগুলো জ্বালিয়ে দিক্‌ না এসে—

সান্যাল কহিলেন, তা'তে সুবিধেটে কি আর হবে বাপু? কাগজ পুড়লে নতুন কাগজ আসবে। মাস্টার মরলে মাস্টার আসতে কি দেরী হয়?

নন্দ বলিল, বাপ মরলে ত আর বাপ গজায় না। আমিও ত তাই বলছি মশাই, লণ্ডভণ্ড করতে কমিউনিস্টদের ত জুড়ি নেই—যা হোক করে বাতিলটা বাতিল করে দিক্‌, যেমন তার তেমনি!

আবার এক প্রস্থ তর্ক বিতর্ক উপস্থিত এবং সান্যাল মহাশয় কমিউনিস্টদের ভূত ভাগাইতে ভাষার আবরু পর্দা ভাঙ্গিয়া এমন এক বীভৎস নগ্নতায় রূপান্তরিত করিয়া ফেলিলেন যে, প্রথমে অন্যমনস্ক, পরে কাণে আঙুল, তারও পরে "দেখি আফিস ঘরগুলো একবার দেখে আসি" করিয়া সরিয়া না পড়িয়া কোন মতেই পারিলেন না। খেয়া ঘাটের শোকই দুরপণেয়, তার উপর কমিউনিস্ট অভ্যুত্থান অনুমান করিয়া সান্যাল মহাশয়ের দিগ্বিদিক জ্ঞান রহিত হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি শুনিয়াছেন কমিউনিস্টরা চুরিডাকাতি রাহাজানি বাটপাড়ি দাঙ্গাবাজি করিয়া যাহার যাহা কিছু আছে তাহা কাড়িয়া লইয়া এক বিঘা এ'টেল মাটির জমি ও একজোড়া দামড়া গরু দিয়া বলে—যাও চ'রে খাও গে। বোর্ডের আশ্রয়ে থাকিয়া জয় মা কালীর ইচ্ছায় সান্যাল মহাশয় তাঁহার বংশধর নাতি নাতকুড়দের জন্য যাহা কিছু শস্যঞ্চ গৃহমাগত করিয়াছেন, সে সব কি ঐ সকল হাবাম্বেটেদের বুক ও পেট ভরাইবার জন্য? ওরে আমার কমিউনিস্ট রে!

সান্যাল মহাশয়ের সংযুক্ত বীরকরুণরসাশ্রিত গীতাভিনয় সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই টেবিলের টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। সুধাকর সাহেব অনুপস্থিত—সান্যাল মহাশয়ের সার্কাসক্ষেত্র হইতে বেগে প্রস্থান করতঃ কোথায় গিয়াছেন কাহাকেও বলিয়া যান্‌ নাই, অথচ টেলিফোনের ঘণ্টী ক্রমেই উচ্চতর আরাবে বাদিত হইয়া চলিয়াছে, কলটা তোলা উচিত অথবা অনুচিত বিচার বিবেচনায় প্রত্যেকেই প্রত্যেকের পানে সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন, তুলিতেই ইচ্ছা কিন্তু সাহসের অভাববশতঃই ইতস্ততঃ ক'রতে হইতেছে, সান্যাল মহাশয় ধাঁ করিয়া কলটা তুলিয়া কাণে লাগাইয়া "হ্যালো" করিয়াই তড়িতাহতের মত বসিয়া পড়িয়া শুষ্কস্বরে পিপাসার্তের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন, তোমরা কেউ ডাকো না গো!

কে? কে?

এ-সি কারেন্ট নিশ্চয়ই নহে, সান্যাল মহাশয় ধাক্কাটা তাই সামলাইয়া লইতে পারিলেন। ক্ষণপরে উঠিয়া বসিয়া ফিস ফিস করিয়া কহিলেন, চীফ কমিশনার সুধাকর সাহেবকে ডাকছেন।

ডাকুক্‌ গে!

ঘণ্টা তখনও বাজিতেছে এবং সুধাকর সাহেবের কাণেও তাহা গিয়াছে, শশব্যস্তে ঘরে ঢুকিয়া কল কাণে লাগাইলেন।

টেলিফোন যন্ত্র এক অদ্ভুত বস্তু। মানুষটা কে, কোথা হইতে—কতদূর হইতে কথা কহিতেছে, শ্রবণকারীকে দেখাও যায় না, আয়ত্তেরও বাহিরে; তথাপি উভয় প্রান্তেই ভাব ও ভাষার কি যে অপরূপ ডন্ বৈঠক সুরু হইয়া যায়, তাহা দেখিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। সুধাকর সাহেব বোর্ডের চেয়ারম্যান, নম্বর ওয়ান্‌, "ইয়েস্‌"টা সেই চিরাচরিত পয়লা নম্বরের অনুপাতেই উচ্চারিত হইয়াছিল; পরমুহূর্তে সে কি বৈষ্ণবদীনত—যেন খর্জুর বৃক্ষ যাদুমন্ত্রে কদলী পাদপ।

ফোনে কথোপকথন সাঙ্গ করিয়াই সুধাকর সাহেব ঘণ্টা টিপিয়া চাপরাশী ডাকিয়া সেক্রেটারীকে সেলাম দিলেন।

মিস্‌ সুলতা সরকারের ফাইল কোথায়?

সেক্রেটারী সেই ঘরের প্রাচীরে গ্রথিত লোহার সিন্দুক দেখাইয়া কহিলেন, ঐখানেই আছে।

সুধাকর ড্রয়ার হইতে চাবীর তাড়া ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, নিয়ে গিয়ে দেখুন, ফাইল কম্‌প্লিট করে শীলমোহর করে নিয়ে আসুন, সি-সি চাইছেন।

সেক্রেটারী সিন্দুক খুলিয়া ফাইল লইয়া প্রস্থান করিলে সান্যাল মহাশয়ই কক্ষের গভীর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কহিলেন, ও বাবা! এযে গাছে না উঠতেই কাঁধি! এত তাড়া, ভদ্রমহিলার চাকরীটি না খেলে বড় সাহেবের ঘুম হচ্ছিল না বুঝতে পারছি!—বলিয়াই তিনি সুধাকর সাহেবের উদ্দেশে

অগ্নিবাণ হানিয়া কহিলেন, সেই কালে একটা হেস্ত নেস্ত করে দিতেন যদি মশাই, তাহ'লে আজ আর ভদ্রমহিলার চাকরী নিয়ে টানাটানি পড়তো না। কি যে আপনার গড়িমাসি গয়ংগচ্ছ ভাব, তা বুঝি না।

নন্দ বটব্যাল লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, ও মাগীকে বাঁচাতে গেলে সুধাকর সাহেবেরই গণেশ ওল্টাতো। কেউ ঠেকাতে পারতো না।

সান্যাল মহাশয় গরম হইয়া বলিলেন, যাও, যাও, জানোনা শোনোনা টক্‌খাই টক্‌খাই করো না। সুলতার অপরাধটা কি শুনি?

শ্যামাচরণ সিংহ কহিলেন, সে কি সান্যাল মশাই? সাতকান্ড রামায়ণ, সীতে কার পিসে। মাগী হাতে নাতে ধরা পড়লো, আমাদের ইস্কুলের মেয়ে নিয়ে আশু শীলের বাগানে নাচের পার্টিতে জলসা বসিয়েছিল—কে না জানে, বলুন! বোর্ডে যদি দলাদলির ঘটকচ্ছ বাঁধিয়ে না রাখতেন আপনারা, ও মাগীকে কবে দূর করে দেওয়া যেতো তার আর ঠিকানা আছে!

জানি হে জানি, সব জানি! যারা হাতে নাতে ধরেছে তাদেরও জানি; কেন ধরেছে তা'ও জানি; আবার ধরিয়ে দিয়েছে যারা, তাদেরও জানি। আমি ত আর আজকের নই হে, সব খবরই রাখি। কে যে কত গুণের গুণনিধি তা'ও আমার জানতে বাকী নেই। ভদ্রমহিলাকে রাসলীলায় রাজী করাতে পারলে বোধ হয় ধরিয়ে দেবার দরকারও হোত না, পুলিশ ডাকতেও হোত না। ছিঃ ছিঃ এই কি ভদ্রলোকেদের কাজ!

সান্যাল মশাই, বেশী ঘাঁটাবেন না তা বলছি। বোর্ডের এনকোয়ারী কমিটির মেম্বরদের বাড়ী বাড়ী ঘুরে পায়ের দড়ী ছিঁড়েছিল কে, সে খবর আমরা রাখি। কমিটিতে যাতে কোরাম্ না হয়, তার জন্যে মিটিঙের দিন ফটকের কাছে "বাবা তারকনাথের জয়" ক'রে হত্যে দিয়ে প'ড়ে থাকতো কে, সেও কি আমরা দেখি নি মনে করেছেন? আচ্ছা সান্যাল মশাই, বোর্ডের সেই বুড়ী খৃশ্চান মাস্টারণীটা যখন তিন মাসের এক্সটেন্সনের জন্যে হাতে পায়ে ধরাধরি করেছিলো, কৈ, তখন ত আপনার দয়া উথলে পড়তে দেখা যায় নি। দয়া বুঝি রূপ ও বয়স বিবেচনায় ওঠে নামে? কিন্তু একটা জিনিস কিছুতেই বুঝতে পারছি না মিস্ সরকারের হাইহিল জুতোর গোড়ালীতেও হাত দিতে পারবেন কি আপনি? সে বলে পোস্ট-ওয়ার কলকাতার উর্ব্বশী, আপনি কি—

সান্যাল মহাশয় খেপা ঘোড়ার মত ছিট্‌কাইয়া পুড়িয়া বলিলেন, থামো, থামো! একজন ভদ্রলোকের মেয়ের চাকরী যেতে বসেছে, ও'দের বস্তা-পচা রদ্দি রসিকতার এই হোল কি-না সময়। ভদ্দর লোকের সমাজে তোমরা যে এখনও মুখ দেখাও কি করে তা'-ত বুঝতে পারি নে।

সেক্রেটারী ফাইলখানিকে আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, আপনি কি এর সঙ্গে কোনও নোট্ দেবেন না স্যার?

সুধাকর তাচ্ছিল্যভরে কহিলেন, কি দরকার আমার? যা-কিছু ওর ভেতরেই আছে, যা খুশী উনিই করুন।

সেক্রেটারী বলিলেন, না স্যার, কমিটি যখন কোনও সিদ্ধান্ত দিতে পারে নি, তখন সে কথাটা অন্ততঃ একটা নোটে আপনার ব'লে দেওয়া ভাল।

সান্যাল মহাশয় বলিলেন, ভালই ত! —তারপর কতকটা ব্যগ্রতা সহকারে সুধাকর সাহেবকে জনান্তিকে কহিলেন, দু'টো ছত্র লিখেই দিন্ না কেন যে, কমিটি বিশেষ কিছু পায় নি।

নন্দ বটব্যাল বলিল, সেকথা বললে উনিই মারা পড়বেন। কমিটি বসতেই পেলো না কোরামের অভাবে, তদন্ত করলে কখন?

সান্যাল মহাশয় খপ্ করিয়া তাহার হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া মিনতিভরে কহিলেন, নির্দোষীর অন্ন মারিস নে রে নন্দ, ভাল হবে না। ছেলে মেয়ে নিয়ে তুইও ঘর করিস, লোকের চোখের জল পড়লে—

নন্দ বটব্যাল হাসিয়া বলিল, দোহাই দাদা, শাপ দিও না যেন! আর চাকরী যাবে যে, তাই বা কি করে জানলেন? হয়ত সাসপেন্সন অর্ডার বাতিল হবে, তাই ফাইল চেয়ে পাঠিয়েছেন।

সান্যাল মহাশয়ের মন এ প্রবোধ বাক্যে শান্ত হইল না। তিনি বিরসমুখে কহিলেন, ওরে বাবা, না, না। আজকের কাগজেই কোন্ এক ব্যাটা লেটার্স টু দি এডিটর কলমে কি লিখেছে দেখিস্ নি?

কৈ, না, ত! কোন্ কাগজে, কোন্ কাগজে? অনেকেই এক সঙ্গে কলরব করিয়া উঠিলেন। সান্যাল মহাশয় তৎপ্রতি কর্ণপাত না করিয়া কহিলেন, এইখানকারই কোনও সম্বন্ধীর কাজ, বোঝাই যাচ্ছে। দেখলে এদের দিয়ে ত কিছু হোল না, চীফ কমিশনারকে উস্কে দেওয়া যাক্।

যতীন চক্রবর্তী এক পাশে বসিয়াছিল। তাহারও একটা "ব্যাক্ ডেটিং" কারবার ছিল, আশা ভরসা নাই বুঝিয়া সে এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। এক্ষণে বলিল, সান্যাল দা', চাকরী

অমনি গেলেই হোল! ইউনিয়ন ব্যাটারা গলা টিপে ধরবে না? চারদিকে ওৎ পেতে বসে আছে, ক্যাঁক করে ধরবে'খন।

শ্যাম সিং কহিলেন, ভাল কথা, ইউনিয়নের গুণ্ডা-পাণ্ডাগুলো গেলো কোথায়? গভর্নমেণ্ট এক হুকুমে এতো কালের বোর্ড বাতিল করে দিলে, তারা যে টুঁ শব্দটি করলে না, এটা যেন কেমন কেমন মনে হচ্ছে না?

ঘন অন্ধকারে অকস্মাৎ স্টীমারের ফ্ল্যাশলাইটের মত সান্যাল মহাশয়ও যেন হঠাৎ আলোক রশ্মি দেখিতে পাইয়া হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন এবং সোৎসাহে কহিলেন, বেটারা খবর পেলে না নাকি? দিক্ না একটা স্ট্রাইক্ কল্ এই সময়! বলুক হয় সুপারসেসন অর্ডার উইথড্র করো, না হয় অল্ আউট স্ট্রাইক্!

শ্যাম সিং কহিলেন, দেখুন না একবার চেষ্টা চরিত্র ক'রে।

সান্যাল মহাশয় একে একে সকলের মুখের পানে চাহিয়া সমর্থন বাঞ্ছা করিতে লাগিলেন; শেষকালে সুধাকর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সাহেব কি বলেন? দেখবো একবার বেয়ে ছেয়ে?

সুধাকর সাহেব নির্লিপ্ত স্বরে কহিলেন, আমরা চাকর, হুকুমে উঠি, হুকুমে বসি। আমাদের জিজ্ঞাসা করা বৃথা।

নন্দ বটব্যাল অস্যার্থ করিয়া কহিল, অর্থাৎ আপনারা করাতে পারেন, উত্তম কথা। না পারেন—না পারলেন! কেমন, এই ত?

সুধাকর মৃদু হাস্য করিলেন।

সান্যাল কহিলেন, ছোঁড়াটার নামটা কি ভাল? শিব শঙ্কর না কি ভাল? আর একটা যদু—যদু মিত্তির, তাই না? দেখবো আফিসে আছে কি-না। থাকে ত ডাকি কি বল ভায়া?

সুধাকর একখানা ফাইল পার্শ্বের তাক্ হইতে টানিয়া লইয়া দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে কহিলেন; কিন্তু এখানে নয়। বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

সান্যাল মহাশয় অবজ্ঞাভরে কহিলেন, ওয়েই ম'লো ছোকরা! টাই-ই পরুক আর প্যাণ্টালুনই কসুক, ওয়েই সারা। ডাকি—কি বলো?

শ্যাম সিংহ বলিলেন, আপনি আগে কথাটা ক'য়ে আসুন না, তারপর যা হয় দেখা যাবে।

যতীন চক্রবর্তী বলিল, যদুপতি ফদুপতির দ্বারা হবে না, সত্যশরণটাকে রাজী করতে পারেন ত দেখুন।

তাই দেখি, বলিয়া সান্যাল মহাশয় বাহির হইয়া গেলেন। অল্পক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, ব্যাটারা দাঁও কসতে চায় হে! বলে, স্ট্রাইক পিরিয়ডের খরচ বইতে যদি আপনারা রাজী থাকেন, তাহ'লে আমরা বিবেচনা করতে পারি। আমাদের গরজ বুঝেছে আর কি! অ ম'লো যা! এই যে গেল বছর তিন মাস জেনেরাল স্ট্রাইক করলি, কে তোদের টাকা দিয়েছিল রে ব্যাটা!

যতীন চক্রবর্তী বলিল, আপনি বুঝি যদুপতির পাল্লায় পড়েছেন! বললুম ওদের কম্মো নয়—

সান্যাল বলিলেন, না, না, সব বেটাই ছিল হে, সব শেয়ালের এক রা। বলে, বিশটি হাজার মুদ্রা জমা রাখুন, দেখি একবার কতদূর কি করা যায়।

নন্দ বটব্যাল কহিল, মিস্ সরকারের কথাটা বললেন না-কি?

না, সেটা এখনও বলি নি। আগে দেখছিলাম যদি সুপারসেসন অর্ডারটাকে ইস্যু ক'রে লেগে পড়ে

নন্দ বলিল, দাদা, রাগ করবেন না, এরেই বলে ভীমরতি। গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে পারবে কেন? আপনি মিস্ সরকারের কথাটা বলুন, লুফে নেবে।

তাই যাই, কি বলো? তোমরাও কেউ এসো না আমার সঙ্গে, দু'চারজন মেম্বারকে দেখলে সাহস পাবে। স্ট্রাইক জোরদার করতে পারলে সুপারসেসন উল্টে যেতেও পারে। খেরো খাটটা—

কথাটা শেষ হইল না। সুধাকর সাহেবের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে খোদ সত্যশরণ ঘরে ঢুকিল। যতীন চক্রবর্তী সান্যাল মহাশয়কে উৎসাহিত করিয়া বলিল, মেঘ খুঁজছিলেন, ঐ দেখুন ঘোর বর্ষা উপস্থিত। উনিই সত্যশরণ বাবু, এম্প্লয়িজ এসোসিয়েসনের প্রধান পাণ্ডা।

সান্যাল মহাশয় কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়াই গ্রন্থারম্ভ করিলেন; বলিলেন, হ্যাঁ রে ভাই, স্বদেশী গভর্নমেণ্ট গোটা বোর্ডটাকেই বাতিল ক'রে দিলে! এরই নাম স্বাধীনতা?

সত্যশরণ সহাস্যে কহিল, তাই ত দেখছি।

সান্যাল মহাশয় ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, শুধু দেখছি বললে হবে কেন চাঁদ! সাঁইত্রিশ জন মেম্বরকে তাড়িয়ে একজন আই-সি-এসের হাতে এত বড় বোর্ড তুলে দিলে, আর তোমরা ইয়ং ম্যান্ হয়ে তাই সহ্য করলে! এই বুঝি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বেঙ্গল?

সত্যশরণ সহাস্যে কহিল, ইয়ংম্যান ত সহ্য করতেই আছে মশায়! আপনারা ঝাঁটা লাথি মেরেছেন, কষ্ট হয়েছে, অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হয়েছে কিন্তু সহ্য করেছি; আবার যাঁরা আসছেন তাঁরাও ঝাড়ু বাল্তি ঘাড়ে নিয়েই আসছেন, বেঝো

হয়ে ভূত ঝাড়াবেন, ইয়ংম্যান সহ্য করতেই আছে; সহ্য করবে এক বিন্দু ফারাক্ হবে না।

এতখানি লম্বা বক্তৃতা শুনিবার ধৈর্য সান্যাল মহাশয়ের ছিল না, প্রত্যেকটি শব্দ শেষে বদন ব্যাদান করিতেছিলেন কিন্তু বাক্যোচ্চারণের সুযোগ পান্ নাই; এক্ষণে সত্যশরণকে থামিতে দেখিয়া বলিলেন, কেবল বাক্য ভুড়ভুড়ি! হরি হরি! এর নাম ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কাশ্মিট্ট!

সত্যশরণ কহিল, কাশ্মিট্ট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ঠিকই; কিন্তু এই পেট্! এর ইণ্ডিপেণ্ডেন্স কোথায়? বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ঘরের ইয়ংম্যানদের অবস্থাটা কি, ভেবে দেখবার সময় কোনদিন কি পেয়েছেন মশাই? তারা খায় কি, ছেলেমেয়েকে কি খেতে দিতে পায়, পুরো মাস আদৌ পায় কি না, কোনও দিন রেখেছেন কি সে খবর? খবর আমরা দিতে গেছি, বারম্বার গেছি, কথা কাণ দিয়ে শুনেছেন কি?

সান্যাল মহাশয় বলিলেন, এরা শুনবে? তাই বুঝি ভেবে ব'সে আছ?

এক ভস্ম আর ছার! তাদের ভরসায় আমরা বসে আছি, এমন ভুলটা বুড়ো দাদা আপনার করা উচিত হয় নি। বাঙ্গলার মধ্যবিত্ত সমাজ আবার যদি কোনদিন ওঠে, নিজের চেষ্টাতেই উঠ্‌বে। একদিন তারাই ছিল বাঙ্গলা দেশের পুরোভাগে। ঠাকুর্দা মশাই, সে মন্ত্র আমাদের জানা আছে। আঙুল বাঁকাতে যারা জানে, ঘি বার করা তাদের অসাধ্য হবে না। কথা শোনাতে হয় কেমন ক'রে, সেটাও আমরা জানি; এবং জানি যে এই বোর্ডের, আশা করি, সেটা ভালই জানা আছে।

ওরে বাবা, সেই জন্যেই ত তোকে গরু খোঁজা ক'রে বেড়াচ্ছি রে, দে' না একটা প্যাঁচ! এমন সুযোগ যে আর কখনও পাবি না রে বাবা। লাগ্ ঝমাঝম্ দে দেখি একহাত। বুঝুক ওরা যে বাঙ্গলার ছেলেরা আজও মরে নি।

সত্যশরণ হাসিয়া বলিল, মরে নি বটে তবে বেঁচেও নেই। কিন্তু কি চান কি খুলে বলুন ত ঠাকুর্দা মশাই?

সান্যাল মশাই সত্যর কাণের কাছে মুখটি লইয়া গিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন, সুপারসেসন হ'তে না হতেই সুলতা সরকারের ফাইল তলব হয়েছে, শুনেছিস্ ত?

শুনেছি।

ডিস্‌মিস্ করবে, তা বুঝেছিস্ ত?

করবে কি? বোধ ত হয় না। গভর্নমেণ্টে ও'র তদ্বিরের লোক আছে ব'লে মনে হচ্ছে।

দূর! একেই ব'লে ছেলেবুদ্ধি। বাঁচাবার হ'লে আজই কখনও ফাইলের তলব হয়? দু'দশদিন পরে হোত। তোদের ইউনিয়ন থাকতে, তোরা থাকতে হাতে মাথা কাটবে!

সত্য সহাস্যে কহিল, কাটুক না। কাটা জোড়া লাগাবার মন্ত্র আছে।

তার চেয়ে সুপারসেসন্ অর্ডারটা বাতিল করবার শ্লোগান্ দে-না!

ঐটি পারবো না, ঠাকুর্দা মশাই।

সে কি রে! বলিয়া সান্যাল মহাশয় চক্ষু কপালে তুলিয়া বসিলেন। এক মিনিট পরে বলিলেন, অটোনমাস্ বোর্ডে আই-সি-এস্ অটোক্রেসী রাজ বসবে? এতকালের স্বাধীন বোর্ড আই-সি-এসের পদানত হবে, আর তোরা তাই বরদাস্ত করবি? বুঝে দেখ্, আমরা ত গেছিই, তোদের সুধাকর সাহেব, তাকে ত তোরা ভালবাসিস, তাকেও পায়ে ক'রে খেৎলাবে! আজ থেকে একটা এল্-ডি ক্লার্ক যে সুধাকরও সেই।

কিন্তু ঠাকুর্দা মশাই, চেঞ্জ আমরা চাই।

কথামধ্যে নাটকীয় ভাষায় বজ্র পতন হইলে যে অবস্থা হয়, সেই অবস্থাই দৃষ্ট হইল। সকলেই বদন ব্যাদান করিয়া বসিয়া রহিলেন। সত্যশরণ পুনরায় কহিল, ক' বছর ধ'রে যে কাণ্ডটা আপনারা চালিয়েছেন তা'তে ক'রে গভর্নমেণ্টকে সুপারসিড করবার পরামর্শ আমরাই দিতাম। চেঞ্জ আমরা চাই—তা ভালই হোক্, আর মন্দই হোক্!

সুধাকর-সাহেব বলিলেন, কিন্তু আমি ত আর থাকতে পারছি নে। আমাকে আবার—

সত্যশরণই সকলের আগে নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল। ফরাসকে চাবী হস্তে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সান্যাল মহাশয়গণও সভা বন্ধ না করিয়া আর পারিলেন না।

[ক্রমশ

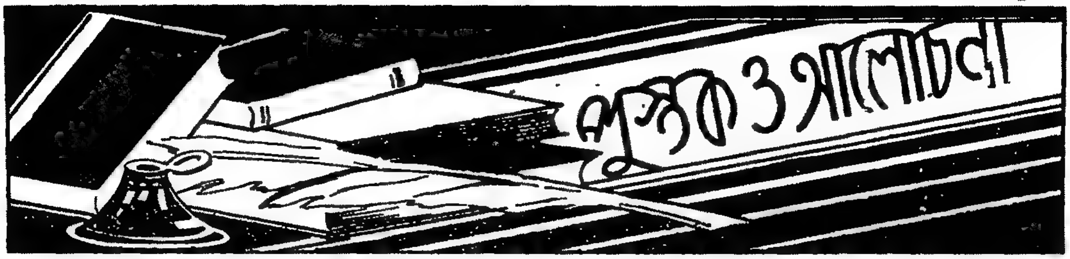

দাদূর বাণী: গীতিগাথা। শ্রীযোগেশচন্দ্র মজুমদার অনূদিত। বীণা লাইব্রেরী: ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

মধ্যযুগের ভারতীয় সাধক সম্প্রদায়ের মধ্যে দাদূ অন্যতম। এই প্রসঙ্গে রামানন্দ, কবীর, নানক, মীরাবাঈ, তুলসীদাস প্রভৃতিরও নাম করিতে হয়। দুঃখের বিষয় বাঙালী পাঠক সম্প্রদায় বাংলার বাহিরের এই সাধকবৃন্দের জীবনের সঙ্গে এ পর্যন্ত পরিচিত হইবার সুযোগ পান নাই। ইতিপূর্বে জীবনীসহ মীরাবাঈয়ের ভজন এবং আলোচনার মাধ্যমে তুলসীদাসী রামায়ণের সঙ্গে জনসাধারণের কিছু কিছু মাত্র পরিচয় ঘটার সুযোগ হইয়াছে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন দাদূ সম্পর্কে সুদীর্ঘ গ্রন্থ রচনা করিয়া দাদূ-সম্পর্কিত বাঙালী অজ্ঞতা ঘুচাইয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের মাধ্যমে দাদূ সম্পর্কে বাঙালী পাঠকবৃন্দ অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পাইয়াছেন। উক্ত গ্রন্থ হইতে দাদূর দেড়শত বাণী সংগ্রহ করিয়া শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মজুমদার সুললিত কবিতায় উহার অনুবাদ করিয়া আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়াছেন। কবিতাগুলি প্রথম শ্রেণীর না হইলেও অনুবাদ স্বচ্ছ ও মূল সম্পৃক্ত হইয়াছে। গ্রন্থসূচনায় দাদূর সংক্ষিপ্ত জীবনী সংযোজনা করিয়া দেওয়াতে পাঠকবৃন্দের পক্ষে উপকার হইয়াছে। যোগেশ বাবুর এই উদ্যম প্রশংসনীয়।

চক্রবৎ: উপন্যাস। শ্রীবিষ্ণুপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। রীডার্স কর্ণার: ৫, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা। মূল্য চারি টাকা মাত্র।

বিষ্ণুবাবু স্বভাবতঃ কবি। ডেলাইটের তীব্রতার চাইতে জোনাকীর স্নিগ্ধ ঔজ্জ্বল্যই তাঁহার অধিক প্রিয়। তাঁহার কাব্যেও আমরা এতকাল অনুরূপ নমনীয়তাই লক্ষ্য করিয়াছি। জীবনধর্মে তিনি বহুতর অভিজ্ঞতার অধিকারী। খুব সম্ভবতঃ সেই অভিজ্ঞতাই বিষ্ণুবাবুকে চক্রবৎ রচনা করিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। অবস্থাপারম্পর্যে মানুষ যখন ভাগ্যের ক্রীড়নক হইয়া পড়ে, তখন তাহার অবস্থা দাঁড়ায় অনেকটা গ্রন্থের মূল চরিত্র সুশান্ত ও সুলতার ন্যায়। ভাগ্যহতা বেলা নিজেকে রক্ষিতা রূপে গ্রহণের আবেদন লইয়া দাঁড়াইয়া যে বিতৃষ্ণা লাভ করে, পরবর্তীকালে সুশান্তর পক্ষ হইতে সেই বিতৃষ্ণাই প্রেমরূপে প্রকাশ পায়। সমস্ত ঘটনা মিলাইয়া গ্রন্থখানিতে Middle-Class Frustration-এর চিত্রটিই স্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে wit and humour-ও লক্ষ্য করিবার মতো। বিষ্ণুবাবুর ইহা স্বভাবগুণ। গ্রন্থের সযত্ন প্রকাশনার জন্য শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্র মিত্রের কৃতিত্ব প্রশংসনীয়।

অন্তরায়: উপন্যাস। শ্রীকুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। প্রাপ্তিস্থান: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এ্যান্ড সন্স, কলিকাতা। মূল্য—২৷৷০ টাকা মাত্র।

লেখক বাংলা দেশের বিশেষ একজন বৈজ্ঞানিক প্রাকৃতিক চিকিৎসার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসাবে খ্যাতিমান। উপজীবিকা হিসাবে তিনি সাহিত্যকে গ্রহণ না করিলেও তাঁহার চিকিৎসা-সাধনার সঙ্গে সঙ্গে অকৃত্রিম সাহিত্যসাধনাও একই খাতে বহিয়া চলিয়াছে। আলোচ্য উপন্যাসখানি তাঁহার পাঁচখানি উপন্যাসের অন্যতম। কুলরঞ্জন বাবুর প্রায় প্রত্যেকটি গ্রন্থেই বাংলার একটি সুন্দর গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতে দেখা যায়। আলোচ্য গ্রন্থেও সে চিত্র অবর্তমান নয়। আলোচ্য গ্রন্থের প্রধানতম চরিত্র গীতা তাহার স্বভাবে বাংলার শ্যামলতা-মুখরিত রৌদ্র-ছায়ার লুকোচুরী, অথচ কোথাও সে প্রগলভা নয়, আপনার মধ্যে আপনি জীবন-স্বপ্নে বিধুরা। পাশাপাশি দেবকুমারও সম-পর্যায়ে নিষ্ঠাশীল পৌরোহিত্যের অকৃত্রিম মন্ত্রচারী। বিশেষভাবে এই দুইটি জীবনকে কেন্দ্র করিয়াই 'অন্তরায়' গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এ কিসের অন্তরায়? সমাজের—না অন্তরের? সার্থক লিপিকুশলতায় লেখক তাহা মরমী চিত্রে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। লেখকের ভাষা সহজ ও সরল, কাহিনীকে তাহা অবাধ গতিতে পরিণতির দিকে অনায়াসেই টানিয়া নেয়, পাঠকচিত্তকেও কোথাও তাহা থামিতে দেয় না। গ্রন্থখানি গল্পামোদী পাঠকমাত্রকেই আনন্দ দিবে।

দূরভাসিনী: উপন্যাস। শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র। ইণ্ডিয়ান লিমিটেড: ২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য আড়াই টাকা মাত্র।

এক টেলিফোন-কন্যার জীবন-নাট্যকে কেন্দ্র করিয়া 'দূরভাসিনী'র মূল আখ্যানভাগ গড়িয়া উঠিলেও প্রধানত

ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের চিত্রই গ্রন্থখানিতে বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বীণা গুহঠাকুরতা এ কাহিনীর অন্যতমা নায়িকা হইলেও অনন্যা নয়, আজকের বিক্ষুব্ধ মধ্যবিত্ত সমাজের ফাটলধরা বাঙালী নারী-জীবনের সে একটি প্রতীক মাত্র। গিরীশ বাবু, মৃন্ময়, কমলা, নকুল, বিমল প্রভৃতি সম্পর্কেও সেই একই কথা। গ্রন্থের আবহ কাহিনীর মধ্যে বিশেষভাবে কমলা মনের উপর রেখাপাত করিয়া যায়। আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়া সে সমাজকে বিদ্রূপ হানিয়া গেল। কাহিনীকারের অনুসন্ধানী চরিত্রের মধ্যে সমস্ত বিষয়গুলি এক অপূর্ব সামঞ্জস্যের রূপ লইয়া সমাজের একটি বিশেষ দিক আনন্দ-বেদনায় মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। নরেনবাবুর বিশেষত্ব এইখানেই। লিপি-কুশলতায় তিনি সহজ-সরল-পথের মানুষ; গল্পরচনায় তাঁহার সেই সারল্য সর্বত্র সঞ্চারিত। পাঠকমাত্রেই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিবেন।

প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়—কথায় ও চিত্রেঃ শ্রীহরিহর শেঠ। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানীঃ ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা।

সুদীর্ঘ কুড়ি বৎসর পূর্বে যখন 'প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়' ধারাবাহিকভাবে 'ভারতবর্ষ' মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইতে থাকে, তখনই ইহা বিদগ্ধ সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। এই সুদীর্ঘকাল অতীত হইবার পর বর্তমানে উহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ায় ইতিহাস-সন্ধানী ব্যক্তিমাত্রেরই বিশেষ উপকার হইল। ইতিহাসের দিক হইতে কাহারও পক্ষেই দৃষ্টি ফিরাইয়া রাখা সম্ভব নয়। বিশেষতঃ কলিকাতার ন্যায় ঐতিহ্যশালিনী নগরীর প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে একটা স্বাভাবিক ঔৎসুক্য ব্যক্তিমাত্রেরই রহিয়াছে। গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার স্পষ্টই বলিয়াছেনঃ 'হিন্দু যুগের গৌড় বঙ্গদেশ অথবা মুসলমান কালের সুবা-বংগাল্, এ কোনোটিরই রাজধানী বা সংস্কৃতির কেন্দ্র কলিকাতা বা তাহার নিকটবর্তী ভূমিতে ছিল না। ইংরাজ-ফরাসী-ডচ্ বণিকদের অনুগ্রহেই হুগলী হইতে কলিকাতা এই ২৪ মাইল তটভূমিতে ধনজন, বাণিজ্য-ব্যবসায়, জ্ঞান ও ধর্ম সকলেই এক নব কেন্দ্র স্থাপন করিল। কালে কলিকাতা সমগ্র ভারতের রাজধানী হইল। এ হেন-কলিকাতা নগরীর জীবনের প্রথম যুগের পরিচয় স্মরণ রাখা যে কত আবশ্যক, তাহা কি বলিতে হইবে?' গ্রন্থে সুতানুটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুরের উৎপত্তি হইতে ১৮৬৫ সাল অবধি কলিকাতার পূর্ণ জাগৃতি পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ের সঙ্গে মণীষীদের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত—কোনো কিছুকেই বর্ণনা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার বর্জন করেন নাই। গ্রন্থখানি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া প্রকাশক বিশেষ সুকীর্তির পরিচয় দিয়াছেন। প্রতিটি গ্রন্থাগারেই গ্রন্থখানি রাখা কর্তব্য।

মহাবির্ভাবঃ শ্রীঅনিলবরণ রায় ও শ্রীযোগানন্দ ব্রহ্মচারী প্রণীত। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী। মূল্য ৫ টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্ ভারত ব্রহ্মচারী ও শ্রীশ্রীজগন্মাতার জীবনকথা ও বাণী সাধারণ্যে প্রচার করিবার উদ্দেশ্যেই মূলতঃ এই গ্রন্থখানি রচিত। শ্রীঅরবিন্দের কয়েকখানি পত্র গ্রন্থখানির সমৃদ্ধি অধিকতর বাড়াইয়াছে। শক্তিশালী ভারত-গঠনকার্যে কিভাবে এদেশ ধীরে ধীরে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার নিদর্শন যুগে যুগে ভারতে বহু আধ্যাত্মিক শক্তিশালী মহাপুরুষের আবির্ভাব, সাধুসন্তের আবির্ভাব—এই ধারাই দীর্ঘকাল যাবৎ চলিয়া আসিয়াছে। অনুরূপ মতবাদের ভিত্তিতেই আলোচ্য দুইটি আশ্রমিক মহাজীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীঅনিলবরণ রায় ও শ্রীযোগানন্দ ব্রহ্মচারী মহাবির্ভাব গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। গ্রন্থে যে শিক্ষণীয় দিকটি উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রের পক্ষেই উপকারে আসিবে। গ্রন্থখানি আগাগোড়া সুদৃশ্য মনোটাইপে মুদ্রিত হওয়ায় ইহার অঙ্গসজ্জা আরও মনোরম হইয়াছে।

আল্পনাঃ কাব্যগ্রন্থ। শ্রীরণজিৎকুমার রায়চৌধুরী। দি বুক হাউস, কলিকাতা। মূল্য—১ মাত্র।

কবি সেই নির্লোভ জগতের মানুষ—যেখানে দাঁড়াইয়া প্রসন্ন চিত্তে বলা যায়—

'চাই না আমি পদ যশোমান চাই না হ'তে ধনী।
পল্লী মায়ের কোলটি জুড়ে
বাঁধবো আমি পাতার কুঁড়ে,
বালাখানায়, তোষাখানায়, তুচ্ছ ব'লে গণি॥'...
('আকিঞ্চন')

ভক্ত ও সাধকের স্বভাবধর্ম লইয়া সহজসুরে তরুণ কবি তাঁহার মনের তারুণ্যকে বাগ্দেবীর চরণে উৎসর্গ করিয়াছেন। গ্রন্থে ছোটবড় অন্যূন ৭১টি কবিতা স্থান পাইয়াছে, প্রায় প্রত্যেকটি কবিতাই আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। নিয়মিত সাধনার মধ্য দিয়া কবি একদিন তাঁহার খাঁটি জীবন-দর্শনে পৌঁছাইতে পারিবেন, এ বিশ্বাস আমরা রাখি।

ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

গত ৮ই ডিসেম্বর প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার চূড়ান্ত বিবরণী সংসদে উপস্থাপিত করা হয়। অনুরূপ পরিকল্পনা ধারাবাহিকভাবে কার্যকরী করিতে পারিলে আগামী ২৭ বৎসর অন্তে ভারতের জন প্রতি আয় বর্তমান অপেক্ষা দ্বিগুণ হইবে।

পরিকল্পনা কমিশন গত বৎসর জুলাই মাসে যে খসড়া বিবরণী পেশ করেন এই চূড়ান্তরূপী পরিকল্পনা তাহা হইতে কতকাংশে স্বতন্ত্র। ইহা এক পর্যায়ভুক্ত অবিভাজ্য একটি জাতীয় পরিকল্পনা। চূড়ান্ত পরিকল্পনায় বিদেশী সাহায্য গ্রহণে স্বীকৃতি থাকিলেও বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরশীল নহে। খসড়া পবিকল্পনায় ১,৫০০ কোটি টাকাব আনুমানিক ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছিল কিন্তু বর্তমান পরিকল্পনায় মূলধন ২,০৬৯ কোটি টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

দুইটি কারণে এইরূপ বর্ধিত ব্যয়বরাদ্দের প্রয়োজন হইয়াছে ;— প্রথমতঃ কতকগুলি নূতন পবিকল্পনার অন্তর্ভুক্তি, দ্বিতীয়তঃ কয়েকটি আরব্ধ পরিকল্পনাকে বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে সার্থক করিবার উদ্দেশ্যে সুযোগ দান।

কৃষি ও সমাজ পরিকল্পনার প্রতি যে গত বৎসর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে তাহা কৃষি, সমাজ উন্নয়ন, সেচ এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিকল্পনার জন্য ব্যয়বরাদ্দের পরিমাণের দিকে লক্ষ্য করিলে সহজেই প্রমাণিত হয়। খসড়া পরিকল্পনায় এই সমস্ত বিষয়ের জন্য ৬৪২ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব ছিল ; বর্তমানে সেই বরাদ্দের পবিমাণ ৯২২ কোটি টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হইযাছে।

যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও বরাদ্দের পরিমাণ আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাইয়া ৪৯৭ কোটি টাকা ধার্য হইয়াছে ; অথচ খসড়া পরিকল্পনায় বরাদ্দের পরিমাণ ৩৪৮ কোটি টাকা। অনুরূপভাবে শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে পূর্ব বরাদ্দের পরিমাণ ১০১ কোটি টাকাকে বৃদ্ধি করিয়া ১৭৩ কোটি টাকা ধার্য করা হইযাছে। সমাজকল্যাণ প্রচেষ্টার ক্ষেত্রেও পূর্বের বরাদ্দতে ২৫৪ কোটি টাকার সহিত অতিরিক্ত ৪৬ কোটি টাকা যোগ করা হইয়াছে।

পরিকল্পনায় কৃষি-ব্যবস্থাকেই সর্বাপেক্ষা অগ্রাধিকাব দেওয়া হইয়াছে এবং ইহাব সহিত সংশ্লিষ্ট প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যয়বাবদ মূলধনেব অর্ধেকের বেশী পরিমাণ নিঃশেষিত হইবে। কৃষির ক্ষেত্রে পরিকল্পিত উৎপাদন বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করিবাব জন্য সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা বাবদ ৯০ কোটি টাকা, সেচ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্মসূচী কার্যকরী করিবার জন্য ও একটি জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য ৩০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে। কৃষি-সমস্যা সমাধানের দুইটি পন্থা নির্ধারিত হইয়াছে —প্রথমতঃ উৎকৃষ্ট বীজ ও সার সরবরাহ এবং উপযুক্ত সেচ-ব্যবস্থাব দ্বারা জমির উর্বরতা বৃদ্ধি, দ্বিতীয়তঃ কৃষকদের মধ্যে উন্নততর কারিগরী জ্ঞানের বিস্তার।

কৃষি-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধিই প্রধান লক্ষ্য। ১৯৫০-৫১ সালে উৎপন্ন খাদ্যশস্যের পরিমাণ ছিল ৫২.৭ লক্ষ টন ; পরিকল্পনানুযায়ী ১৯৫৫-৫৬ সালে এই পরিমাণ বর্ধিত হইয়া ৬১.৬ লক্ষ টন হইবে বলিয়া আশা করা যায়। অনুরূপভাবে তুলাব উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে ২.৯৭ লক্ষ গাঁইট হইতে ৪.২২ লক্ষ টন পর্যন্ত, পাট ৩.৩ লক্ষ গাঁইট হইতে ৫.৩৯ লক্ষ গাঁইট পর্যন্ত, ইক্ষু ৫.৬ লক্ষ টন হইতে ৬.৩ লক্ষ টন পর্যন্ত এবং তৈলবীজ ৫.১ লক্ষ টন হইতে ৬.৫ লক্ষ টন পর্যন্ত।

সেচ ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থার লক্ষ্যও আশাপ্রদ। নূতন সেচ পরিকল্পনানুযায়ী ১৯৫৫-৫৬ সন পর্যন্ত ৫০ লক্ষ একর জমির স্থলে ৬৯.৭ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা যাইবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য আবদ্ধ সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন ব্যবস্থার পরিসমাপ্তি। এই বাবদ মোট ৭১৫ কোটি টাকা ব্যয় করা প্রয়োজন হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে ; কিন্তু পবিকল্পনাধীন সময়ের মধ্যে ৫৬৮ কোটি ব্যয় করা হইবে। পরিকল্পনাগুলি এইরূপভাবে পর্যাযভুক্ত করা হইয়াছে যে কর্মসূচী রূপায়নের দ্বারা ক্রমশঃ সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি উদ্বৃত্ত তহবিলেই কিছু কিছু আয়ের সম্ভাবনা আছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার প্রসারও চূড়ান্ত পরিকল্পনার কর্মসূচীর অন্তর্গত।

দেশের উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তির জন্য কর্মসংস্থান করিতে না পারিলে কৃষি-ব্যবস্থার উন্নয়ন ব্যাহত হইবে বিবেচনা করিয়া পরিকল্পনায় শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থার প্রসারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের পরিচালনাধীনে বিভিন্ন শিল্পোন্নয়ন পবিকল্পনার রূপায়নের জন্য ৯৪ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ হইযাছে।

বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যে সমস্ত উন্নয়ন পরিকল্পনার রূপায়ন সুরু হইয়াছে সেগুলিও সমাপ্ত করা হইবে। নূতন প্রস্তাবিত লৌহ ও ইস্পাত পবিকল্পনাব জন্য আপাততঃ ৩০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ করা হইলেও ছয় বৎসরে এ বাবদ মোট ৮০ কোটি লাগিবে বলিয়া অনুমান করা হইযাছে। শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে ৯৪ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে।

বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যে সমস্ত উন্নয়ন পরিকল্পনার রূপায়ন সুরু হইয়াছে সেগুলিও সমাপ্ত করা হইবে। নূতন প্রস্তাবিত লৌহ ও ইস্পাত পরিকল্পনার জন্য আপাততঃ ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ববাদ্দ করা হইলেও ছয় বৎসরে এ বাবদ মোট ৮০ কোটি লাগিবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে ৯৪ কোটি টাকা ছাড়াও পবিকল্পনায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যানবাহন ব্যবস্থাসহ মূল শিল্প সম্প্রসারণের জন্য আরও ৫০ কোটি টাকার ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে।

বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকেই উদ্যোগী হইয়া ব্যাপক শিল্প-সম্প্রসারণের দায়িত্ব লইতে হইবে। কমিশন ৪২টি সুসংগঠিত শিল্পেব জন্য একটি বিস্তৃত কর্মসূচী নির্ধারিত করিয়াছেন। বেসরকারী শিল্প প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে শিল্প সম্প্রসারণের জন্য মোট ২৩৩ কোটি টাকার মূলধন বিনিয়োগ প্রয়োজন। এই মূলধনের

প্রায় শতকরা আশী ভাগ ব্যয়িত হইবে প্রধানতঃ লৌহ ও ইস্পাত, পেট্রোলিয়াম, সিমেন্ট, য়্যালুমিনিয়ম, কৃত্রিম সার, ভারী রাসায়নিক দ্রব্য, য়্যালকোহল প্রভৃতি শিল্পের প্রসারের জন্য।

নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির বেলায় দেশে প্রাপ্ত সম্পদের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্য পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য নূতন প্রণালীতে উপযুক্ত মূলধন বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি আছে। পরিবহন ও যোগাযোগ কর্মসূচীর জন্য যে বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহার চার-পঞ্চমাংশের কিছু বেশী রেলওয়ের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে; কারণ রেলওয়ের পুনর্গঠন ও প্রচুর যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করাই বর্তমানে ভারতীয় রেলওয়েসমূহের কঠিন সমস্যা। প্রতি বৎসরে গড়ে ৮০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইলে আশা করা যায় পাঁচ বৎসরে রেলওয়েসমূহ বর্তমান স্তরে যাত্রী ও মাল চলাচল কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে পারিবে। পরিবহন সহ মূল শিল্পসমূহের জন্য কমিশন যে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন তাহার উল্লেখযোগ্য একাংশও রেলওয়ের কাজেই ব্যয় করা হইবে।

পরিকল্পিত মূলধনের মধ্যে ১২৫৮ কোটি টাকা আসিবে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের স্বাভাবিক বাজেট আয় হইতে। তন্মধ্যে উদ্বৃত্ত রাজস্বের পরিমাণ হইবে ৭৩৮ কোটি টাকা, জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ, মুদ্রা সঞ্চয় পরিকল্পনা প্রভৃতি বাবদ আসিবে ৫২০ কোটি টাকা।

এইভাবে সাধারণ বাজেট আয়ের সূত্র হইতে ১২৫৮ কোটি টাকা ব্যতীত বৈদেশিক সূত্র হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে হইবে। ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যান্ড প্রভৃতি সূত্র হইতে ১৫৬ কোটি টাকা পাওয়া গিয়াছে। আরও ৬৫৫ কোটি টাকার প্রয়োজন। এই পরিমাণ টাকাটা বৈদেশিক সূত্র হইতে ঋণ করা যাইতে পারে। তাহা সম্ভবপর না হইলে কর ধার্য করিয়া অথবা ঋণ করিয়া সংগ্রহ করিতে হইবে। ইহা সত্ত্বেও আনুমানিক ২৯০ কোটি টাকা ঘাটতি লইয়া কাজ চালাইয়া যাইতে হইবে।

জাতীয় আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনানুযায়ী কার্য নির্বাহ হইবে। জাতীয় উন্নয়নের জন্য ক্রমবর্ধমান মূলধন বিনিয়োগ; আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান প্রভৃতি কার্যের প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসাবে এই পরিকল্পনাকে গণ্য করিতে হইবে।

পরিকল্পনার বিশদ বিবরণী

১৯৫০ সালের মার্চ মাসে পরিকল্পনা কমিশন নিয়োগ করা হয়। এই চূড়ান্ত রিপোর্ট কমিশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ। ইহা শুধু পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা নহে; ইহাতে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি অবস্থার বাস্তব পর্যালোচনা এবং জাতীয় সম্পদের হিসাব নিকাশ করা হইয়াছে। পরিকল্পিত সময়ে কিরূপ আর্থিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণ করা হইবে এবং শাসনব্যবস্থা কিরূপে উন্নয়ন ও শক্তিশালী করিয়া জনহিতকামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালন করা হইবে, তাহাও ইহাতে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে।

১৯৫১ সালের জুলাই মাসে পরিকল্পনা কমিশন খসড়া রিপোর্ট পেশ করিয়াছিলেন। জনমত সংগ্রহ করাই যেন মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। কমিশন বলিয়াছিলেন, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিকল্পনা সমাজ-উন্নয়নের অঙ্গ বিশেষ; কোন কোন ক্ষেত্রে প্রত্যেক নাগরিকেরই ইহাতে অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ থাকিবে। খসড়া প্রকাশিত হইবার পর বহু ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সংবাদপত্রাদি এই বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। পরিকল্পনা কমিশন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারসমূহ এবং তাঁহাদের বিশেষজ্ঞদের সহিত এবং বহু অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী বেসরকারী নরনারীর সহিত আলোচনা করিয়াছেন। সম্প্রতি কমিশন ভারতের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল, বিখ্যাত নারী-কর্মী ও সংসদ সদস্যের সহিত আলোচনা করেন। চূড়ান্ত রিপোর্ট রচনায় এই সমস্ত মতামত ও আলাপ আলোচনা কমিশনের খুব কাজে লাগিয়াছে।

বর্তমান চূড়ান্ত রিপোর্ট তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে অনুন্নত অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন পদ্ধতির বিশ্লেষণ এবং জাতীয় প্রচেষ্টা ক্রমশঃ যে লক্ষ্যে উপনীত হইবে তাহাও এই রিপোর্টে বিবৃত হইয়াছে। প্রথম অংশের শেষে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং ইহার মাধ্যমে কী লাভ করা যাইবে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অংশে আলোচিত হইয়াছে পরিকল্পনার পরিচালন-ব্যবস্থা এবং জনসহযোগিতার বিষয়। তৃতীয় অংশের প্রধান বিষয় উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী। এই কর্মসূচীগুলি মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে; যথা—কৃষি, সেচ ও সমাজ উন্নয়ন; শিল্প ও যোগাযোগ; সমাজকল্যাণ ও কর্মসংস্থান। উন্নয়নের প্রতিটি দিক লইয়া তাহার প্রয়োজন ও সম্পদের আলোচনাপূর্বক অনুসরণীয় নীতি ও কর্মক্রমের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। স্বতন্ত্র একটি খণ্ডে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত প্রধান প্রধান উন্নয়ন পরিকল্পনার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

বর্তমানে উপস্থাপিত পরিকল্পনায় খসড়া পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত পরিকল্পনা সহ তদুপরি যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হইয়াছে তাহাও স্থান পাইয়াছে। পূর্বের পরিকল্পনাগুলি দেশের প্রয়োজনের অনুপাতে অপর্যাপ্ত মনে করিয়াই পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিতে হইয়াছে।

বিনিয়োগ পরিকল্পনা

মোট অর্থ বিনিয়োগ পরিকল্পনারও যথেষ্ট সম্প্রসারণ করিতে হইয়াছে। খসড়া পরিকল্পনায় পরিকল্পনাসমূহকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া প্রথম ভাগের জন্য ১,৪৯৩ কোটি টাকা দ্বিতীয় ভাগের জন্য বিদেশী সাহায্য পাওয়া গেলে ৩০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব ছিল। চূড়ান্ত রিপোর্টে দুইটি স্বতন্ত্র বিভাগ রাখা হয় নাই। সমস্ত কর্মসূচীকে একই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া ইহার জন্য প্রায় ২,০৬৯ কোটি টাকার মূলধন বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

খসড়া পরিকল্পনায় প্রধান প্রধান খাতে কি ভাবে ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছিল এবং চূড়ান্ত পরিকল্পনায় কিভাবে বরাদ্দ করা হইয়াছে নিম্নে তাহার তুলনামূলক ইতিবৃত্ত দেওয়া হইল ঃ—

নিম্নের হিসাব কোটি টাকায় প্রদত্ত

	১৯৫১-৫৬ সালে ব্যয়বরাদ্দ চূড়ান্ত পরিকল্পনা	খসড়া পরিকল্পনা	ব্যয়বরাদ্দের শতকরা হিসাব চূড়ান্ত পরিকল্পনা	খসড়া পরিকল্পনা
কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন	৩৬০·৪৩	১৯১·৬৯	১৭·৪	১২·৮
সেচ ও বিদ্যুৎ	৫৬১·৪১	৪৫০·৩৬	২৭·২	৩০·২
পরিবহন ও যোগাযোগ	৪৯৭·১০	৩৮৮·১২	২৪·০	২৬·১
শিল্প	১৭৩·০৪	১০০·৯৯	৮·৪	৬·৭
সমাজকল্যাণ	৩৩৯·৮১	২৫৪·২২	১৬·৪	১৭·০
পুনর্বাসন	৮৫·০০	৭৯·০০	৪·১	৫·৩
বিবিধ	৫১·৯৯	২৮·৫৪	২·৫	১·৯
মোট—	২০৬৮·৭৮	১৪৯২·৯২	১০০	১০০

পরিকল্পনা এক নজরে

(কোটি টাকায় প্রদত্ত)

	১৯৫১-৫৬ সাল পর্যন্ত মূলধন বিনিয়োগ	মোট মূলধনের শতাংশ
কৃষি ও সমাজ উন্নয়নে	৩৬০·৪৩	১৭·৪
সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন	৫৬১·৪১	২৭·২
পরিবহন ও যোগাযোগ	৪৯৭·১০	২৪·০
শিল্প	১৭৩·০৪	৮·৪
সমাজ সেবা	৩৩৯·৮১	১৬·৪
পুনর্বাসন	৮৫·০০	৪·১
বিবিধ	৫১·৯৯	২·৫
মোট	২০৬৮·৭৮	১০০·০

উৎপাদনের প্রধান প্রধান লক্ষ্য

১। কৃষি :	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬
খাদ্যশস্য (লক্ষ টনে)	৫২·৭	৬১·৬
তুলা (লক্ষ গাঁইটে)	২৯·৭	৪২·২
পাট (লক্ষ গাঁইটে)	৩৩·০	৫৩·৯
ইক্ষু (লক্ষ টন)	৫·৬	৬·৩
তৈলবীজ (লক্ষ টন)	৫·১	৫·৫
২। সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন :		
প্রধান ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেচ কার্য (লক্ষ একরে)	৫০·০	৬৯·৭
বৈদ্যুতিক শক্তি (সরবরাহ শক্তি লক্ষ কিলোওয়াটে)	২·৩	৩·৫
৩। শিল্প :		
কারখানার জন্য প্রাপ্তব্য ঢালাই লৌহ (লক্ষ টনে)	৩·৫	৬·৬
তৈরী ইস্পাত (লক্ষ টনে)	৯·৮	১৩·৭
সিমেণ্ট (লক্ষ টনে)	২৬·৯	৪৮·০
য়্যালুমিনিয়ম (হাজার টনে)	৩·৭	১২·০
সার (হাজার টনে) য়্যামোনিয়ম সালফেট	৪৬·৩	৪৫০·০
ইঞ্জিন (নম্বরে)	—	১৭০
সুপারফস্ফেট	৫৫·৯	১৮৩·০
যন্ত্রপাতি (নম্বর প্রতি হাজারে)	১·৯	৪·৬
পেট্রোলিয়ম পরিস্রাবক তরল পেট্রোলিয়ম (লক্ষ গ্যালনে)	—	৪০৩·০
শিলাজতু (হাজার টনে)	—	৩২·৫
তুলার সূতা (হাজার পাউণ্ডে)	১,১৭৯	১·৬৪০
মিলের কাপড় (লক্ষ গজে)	৩·৭১৮	৪·৭০৬
তাঁতের কাপড় (লক্ষ গজে)	৮১০	১৭০৩
পাট শিল্প (হাজার টনে)	৮৯২	১২০৩
৪। পরিবহন :		
জাহাজ নির্মাণ (টন ধরে)		
উপকূলবাহী	২১১·৩	৩১৪·০
সমুদ্রগামী	১৭০·৪	২৮৩·০
সড়ক :		
জাতীয় রাজপথ (হাজার মাইলে)	১১·৯	১২·৫
রাজ্যাভ্যন্তরীণ পথ (হাজার মাইলে)	১৭·৬	২০·৬

কৃষি উৎপাদনের উদ্দেশ্য যাহাতে সার্থক হয় তজ্জন্য কৃষি ও সমাজ উন্নয়নের ক্ষেত্রে কতকগুলি অতিরিক্ত পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য এবং জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা প্রতিষ্ঠা ও অতিরিক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার জন্য বরাদ্দ পাইয়াছে ৩০ কোটি টাকা। সেচ ও বিদ্যুৎ সংক্রান্ত যে সমস্ত পরিকল্পনাগুলি বর্তমানে চালু রহিয়াছে সেগুলি ছাড়াও কতকগুলি নূতন নদী উপত্যকা পরিকল্পনার জন্য ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে।

শিল্প

শিল্পের জন্য খসড়া পরিকল্পনায় যে অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছিল কৃষি ও সেচ উন্নয়নের জরুরী প্রয়োজনের জন্য অনুপাতে অল্প বিবেচিত হওয়ায় উহা আরও বৃদ্ধি করা হইয়াছে। একটি সুসংগঠিত ইস্পাত কারখানা এবং বড় বড় বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, সার প্রভৃতি উৎপাদনের কয়েকটি কারখানা স্থাপন এবং শিল্প ও খনি উন্নয়নের জন্য অধিকতর পরিবহন ব্যবস্থা করা হইবে। এ বাবদ মোট ৫০ কোটি টাকার বরাদ্দ করা হইয়াছে।

বাণিজ্য ও শিল্প দপ্তর এবং শিল্পী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সহিত পরামর্শ করিয়া বেসরকারী প্রচেষ্ট হিসাবে কমিশন প্রায় ৪০টি শিল্পের উন্নয়ন পরিকল্পনা করিয়াছেন।

কুটীর শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প ও হস্তশিল্পের উপর পরিকল্পনায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার ইতোমধ্যেই খাদি, কুটীর শিল্প ও হস্ত শিল্পের উন্নতির জন্য বোর্ড গঠন করিয়াছেন; খাদি ও তাঁত শিল্পের প্রসারের উদ্দেশ্যে মিলের কাপড়ের উপর কর ধার্য করিয়া তাঁত শিল্পের জন্য বিশেষ কয়েক শ্রেণীর বস্ত্র উৎপাদন নির্দিষ্ট রাখা হইয়াছে। কুটীর শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ ৫ কোটি টাকা হইতে বাড়াইয়া ১৫ কোটি টাকা করা হইয়াছে।

সমাজহিতকর প্রচেষ্টার ক্ষেত্রেও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা আছে। ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণের একটি পরিকল্পনা ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। তপশীলভুক্ত খণ্ডজাতি,

তপশীলী ও অপরাধ প্রবণ অনুন্নত জাতির উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে। শ্রমিকদের বাসগৃহ নির্মাণের জন্য বরাদ্দ হইয়াছে ৪৯ কোটি টাকা। যুবকদলের জন্য কারিগরি শিক্ষা, কর্মসংস্থান প্রভৃতির জন্যও ব্যাপক সুযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পশ্চিম পাকিস্থান হইতে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কাজ চালাইয়া যাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং প্রয়োজন হইলে অনিবার্য অবস্থায় পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্যও অধিকতর অর্থ বরাদ্দ হইবে—এ সম্বন্ধেও স্পষ্ট স্বীকৃতি আছে।

খাদ্যাভাবগ্রস্ত অঞ্চলের সাহায্যের জন্য এই পরিকল্পনায় ১৫ কোটি টাকার ব্যবস্থা আছে। অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির ফলে বিভিন্ন স্থানে কখনো কখনো খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে এবং তজ্জন্য পরিকল্পনা রূপায়নের পথে বাধার সৃষ্টি হইতে পারে। এইরূপ আশঙ্কা দূর করিবার উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা।

প্রত্যেক রাজ্যের এলাকাভুক্ত পরিকল্পনাগুলিকে জেলা ও মহকুমার ভিত্তিতে ভাগ করা হইয়াছে, কারণ ইহার দ্বারা সহজে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতা লাভ করা যাইবে। যে সমস্ত স্থানীয় অধিবাসীরা পরিকল্পনার জন্য কাজ করিবে তাহাদের পারিশ্রমিকের জন্য প্রথম তিন বৎসর ১৫ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হইয়াছে। যে সমস্ত জনকল্যাণ সংস্থা স্বেচ্ছায় সহযোগিতা করিবে তাহাদের কর্মক্ষেত্র প্রসারের জন্য ৪ কোটি টাকার ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। অবশ্য এই উদ্দেশ্যে একটি সমাজ-কল্যাণ বোর্ড স্থাপন করা হইবে।

অনেক ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে নীতি নিরূপণ করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে; তাই জাতীয় উন্নয়নের সহিত জড়িত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও কর্ম-পরিচালন-ব্যবস্থা সম্পর্কে গবেষণা ও তথ্যাহরণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা লাভ করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে পরিকল্পনায় ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে।

নিরবচ্ছিন্ন প্রণালী

রিপোর্টে প্রকাশ, কমিশন সুপারিশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে আর্থিক ও সামাজিক নীতি নিরূপণ একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রণালী। বর্তমানে নির্ধারিত লক্ষ্য ও অগ্রাধিকারের বেড়াজালের মধ্যে জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে বাস্তব অভিজ্ঞতানুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করিতে বাধা থাকিবে না। নীতি নিরূপণের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে আন্তরিক সহযোগিতা রাখিয়া চলিতে হইবে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী ও রাজ্যসমূহের মুখ্য মন্ত্রিগণকে লইয়া গত আগষ্ট মাসে যে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ গঠিত হইয়াছে তাহাতে এইরূপ সহযোগিতা লাভ সহজ হইবে।

কমিশন বলেন, পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার সার্থক রূপায়নের জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে, রাজ্য সরকার ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে, সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে এবং জনসাধারণ ও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে,—এক কথায় সমগ্র জাতির মনে সহযোগিতার ভাব জাগ্রত করিতে হইবে। পরিকল্পনাভুক্ত অনেকগুলি কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। আগামী কয়েক বৎসরের জন্য প্রত্যেক নাগরিককে সমান ভাবে ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে এবং সমগ্র জাতীয় প্রচেষ্টা ও সম্পদকে এই পরিকল্পনার পিছনে নিয়োগ করিতে হইবে। তাহা হইলে উন্নয়নের গতিবেগ বর্ধিত হইয়া এই পরিকল্পনা সমগ্র দেশের মুখ্য কর্মকেন্দ্রে রূপান্তরিত হইতে পারিবে।

ভারতে এই পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য জনসাধারণের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন এবং তাহাদিগকে আরও উন্নত ও বৈচিত্র্যময় জীবনযাপনের সুযোগ দান। সুতরাং পরিকল্পনার নিশ্চিত লক্ষ্য হইবে ভারতের জনবল ও অন্যান্য সম্পদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োগের দ্বারা আয়, ধন ও সুযোগের অসাম্য হ্রাস।

প্রাথমিক অবস্থায় উৎপাদন বৃদ্ধির উপরেই গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে। এমনকি প্রথম পর্যায়ের পরিকল্পনায়ও প্রচলিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যেই কর্মধারা সীমায়িত করা চলিবে না। ঐ কাঠামোকেই পরিবর্তন করিয়া এমনভাবে গড়িতে হইবে যাহাতে সমাজের সকল লোকের জন্য পূর্ণ কর্মসংস্থান, শিক্ষা, ব্যাধি প্রতিষেধক ব্যবস্থা এবং পর্যাপ্ত আয়ের ব্যবস্থা করা যায়।

সর্বক্ষেত্রে সমকালীন অগ্রগতিই পরিকল্পনার সার কথা। যেহেতু সমাজের সম্পদ সীমাবদ্ধ, সেই জন্য অগ্রাধিকারের বিষয়গুলি নির্দিষ্ট করিয়া সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয় সর্বাগ্রে হাতে লইতে হইবে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে সম্পদগুলি কাজে লাগাইতে হইবে।

মূলধন গঠন

উৎপাদন স্তর এবং কোনও দেশের উন্নতি প্রধানতঃ নির্ভর করে ইহার মূলধন সরবরাহের যোগ্যতার উপর—জন প্রতি জমির পরিমাণ, কারখানা, ইঞ্জিন, যন্ত্রপাতি, সেচের সুবিধা, বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর। এইরূপ উৎপাদন-ব্যবস্থা সংগঠনের জন্য সম্পদের ব্যবহারকেই 'মূলধন গঠন' বলে এবং এই মূলধনের উপরেই অর্থনৈতিক উন্নতির গতি নির্ভর করে।

বর্তমানে দেশের জনপ্রতি আয় অতি অল্প। যথাসম্ভব কম সময়ের মধ্যে এই আয়ের হার বাড়াইয়া অন্ততঃ দ্বিগুণ করাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশন তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা করিয়াছেন—(ক) জনসংখ্যার গতি—প্রতিবৎসর শতকরা ১¼ জন হিসাবে লোক বাড়িতেছে (খ) অর্থ বিনিয়োগ ও উৎপাদনের পারস্পরিক হার এবং (গ) জাতীয় উৎপাদনের যে পরিমাণ অংশ পুনরুৎপাদনের জন্য নিয়োগ করা যায়।

বর্তমানে পরিকল্পনায় প্রতি বৎসরে অতিরিক্ত জাতীয় আয়ের ২০ শতাংশ করিয়া মূলধন গঠন বৃদ্ধি পাইবে। এই ভাবে দেশের অভ্যন্তরে যে সম্পদ পাওয়া যাইবে, বাহিরের সম্পদ আনাইয়া তাহা কিছু পরিমাণে বাড়ানো যাইবে। ১৯৫৫-৫৬ সালে জাতীয় আয় বাড়িয়া প্রায় ১০,০০০ কোটি টাকা, অর্থাৎ প্রায় ১১ শতাংশ বাড়িবে।

১৯৫৬-৫৭ সাল হইতে যদি প্রতি বৎসর অতিরিক্ত উৎপাদনের প্রায় ৫০ শতাংশ হারে অর্থ বিনিয়োগ বাড়িতে থাকে, তাহা হইলে প্রায় ২৭ বৎসরে জনপ্রতি আয় দ্বিগুণ করা সম্ভবপর হইবে।

ব্যবহৃত পদ্ধতির কার্যকারিতার উপর উৎপাদনের বৃদ্ধি নির্ভর করে। গত কয়েক বৎসরে বিজ্ঞান কারিগরি জ্ঞানের দ্রুত উন্নতির ফলে নূতন নূতন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। এগুলির সদ্ব্যবহার করিতে হইলে উৎপাদন-পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে এগুলির পরীক্ষা করা প্রয়োজন। ভারতবর্ষে এবিষয়ে প্রভূত উন্নতির সুযোগ রহিয়াছে।

কর্মসংস্থান

ভারতে কোনও কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইলে কর্ম-সংস্থানের ক্ষেত্রের বিস্তৃতির প্রয়োজন সর্বাগ্রে বিবেচ্য। দেশের মূলধন গঠন প্রচেষ্টার অগ্রগতির অনুপাতে ক্রমবর্ধমান পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রচেষ্টা সার্থক হইতে পারে। সেচকার্য, বিদ্যুৎ উৎপাদন, মূল শিল্প স্থাপন, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় এই দিকে অগ্রগতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

অনুন্নত অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে বেকার-সমস্যা নাশ সময়-সাপেক্ষ; বেকারদশাজনিত যে সমস্ত সমস্যার ইতোমধ্যেই সৃষ্টি হইয়াছে সেগুলিকে বৃহত্তর সামাজিক দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। এ বিষয়ে কমিশন কতকগুলি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যেমন, কারিগরি ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে অস্বাভাবিক বেকার-দশার সৃষ্টি না হয়, নূতন নূতন শিল্পে মূলধন নিয়োগকালে কোন্ শিল্পে কত সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করা যাইবে তাহা আগে বিবেচনা করিয়া কাজে অগ্রসর হইতে হইবে এবং সর্বদা কর্মসংস্থানের অগ্রগতির দিকে লক্ষ্য করিয়া কাজ করিতে হইবে।

সর্বাধিক পরিমাণ উৎপাদন, পূর্ণ কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক সাম্য স্থাপন, সামাজিক ন্যায়ের বিধান বর্তমান অবস্থায় পরিকল্পনার স্বীকৃত আদর্শ। এই আদর্শগুলি বিক্ষিপ্ত নহে, পরস্পর সম্বদ্ধ। তবে পরিকল্পনা রূপায়নের প্রাথমিক অবস্থায় সকল বিষয়ে সমকালীন উন্নতির আশা করা ভুল হইবে। এমন একটি সময় আছে যে পর্যন্ত এক বিষয়ের সহিত অন্যের কিছুটা সংঘাত বাধিবে, সেই জন্য খুব সাবধানে অগ্রাধিকার-ক্রম অনুসারে কাজ করিয়া যাইতে হইবে। যেমন, দেশের বেকার জনশক্তিকে সার্থকভাবে কাজে লাগানো নীতির প্রধান অঙ্গ হইবে। কিন্তু এই কাজও সতর্কতার সহিত করিতে হইবে যাহাতে কৃত্রিম অর্থস্ফীতির সৃষ্টি না হয়।

এই সমস্ত ব্যাপারে অতি দ্রুত ও অধিক দূর অগ্রসর হওয়ার যেমন বিপদ আছে, একেবারে অগ্রসর না হওয়ার বিপদও তেমন কম নহে। অর্থনৈতিক কাঠামোর বড় রকমের পরিবর্তনের সময় যে সমাজ যে পরিমাণে ঐক্যবদ্ধ থাকিতে পারে সে সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতির গতি তত দ্রুত হওয়া সম্ভব।

রাষ্ট্রের ভূমিকা

এই সকল পরিকল্পনায় রাষ্ট্রের যে ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে তাহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সকল শিল্পের জাতীয়করণ অথবা কৃষি, ব্যবসা বা উৎপাদন শিল্পে বে-সরকারী ব্যক্তি বা সংস্থার বিলোপ-সাধনও কাম্য নহে; কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের পরিধি সম্প্রসারণ এবং সুপরিকল্পিত অর্থনীতিক ভিত্তিতে বে-সরকারী ব্যক্তি বা সংস্থার শিল্পে আত্মনিয়োগ অবশ্যই কাম্য।

কতিপয় মূল শিল্পের ও শিল্পোন্নয়ন কার্যে রাষ্ট্র বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ অংশ ইতোমধ্যেই গ্রহণ করিয়াছে। বে-সরকারী ব্যক্তি বা সংস্থাসমূহও রাষ্ট্রবিহিত বিধান অনুসারে এবং রাষ্ট্রসৃষ্ট পরিস্থিতিতেই শিল্পোন্নয়নের কার্য করিয়া থাকে। সুপরিকল্পিত অর্থনীতিক শিল্পের রাষ্ট্রীয় অংশ ও বে-সরকারী অংশের গুরুত্ব আপেক্ষিক মাত্র। উভয়েই একই যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ মাত্র এবং সেইভাবেই উহাদিগকে কাজ চালাইয়া যাইতে হইবে।

সমবায়ের উপর গুরুত্ব

পরিকল্পনার উদ্দেশ্য অনুযায়ী অর্থনীতির রূপান্তর করিতে হইলে সমবায়মূলক সংস্থার দ্রুত সম্প্রসারণ করিতে হইবে। ক্ষুদ্র শিল্প, কুটির শিল্প, কৃষি দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়, গৃহনির্মাণ এবং পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ে সমবায়ের যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে। এই সকল ক্ষেত্রে সমবায়মূলক উদ্যোগের সর্বাপেক্ষা অগ্রাধিকার দিতে হইবে।

সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন

পরিকল্পনা রূপায়নের সময় দুইটি উদ্দেশ্য লইয়া বর্তমানের কয়েকটি সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন করা হইবে:—প্রথমতঃ পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যের যত নিকটে সম্ভব পৌঁছান এবং দ্বিতীয়তঃ এই সকল গলদ দূর করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি-কল্পে জমির মালিকানা ও ভূমিব্যবস্থার বড় রকমের পরিবর্তন করিতে হইবে। জমিদারী ব্যবস্থার অবসান ঘটিলে দেশের বিস্তৃত অঞ্চল সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিবে। অপরাপর অঞ্চলে অনুরূপ যে সকল ব্যবস্থা আছে সেগুলিরও দ্রুত পরিবর্তন করিতে হইবে। কৃষি সংস্কার সম্পর্কে রিপোর্টে বিস্তারিতভাবে সুপারিশ করা হইয়াছে।

সম্পদ বণ্টন ও মূল্য নীতি

সুপরিকল্পিত অর্থনীতির লক্ষ্য হইল প্রাপ্তব্যসম্পদ পরিপূর্ণ-ভাবে নিয়োগ করা এবং তাহা যথাযথভাবে বণ্টন করা। মূল নীতির দ্বারা ইহা অনেকটা কার্যকরী করা হইবে। পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট লক্ষ্য অনুযায়ী যাহাতে সম্পদ বণ্টন করা হয় তদুদ্দেশ্যে আর্থিক ও কার্যকরী নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন। উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রথম দিকে উৎপাদন অপেক্ষা আয় দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। ইহাতে মুদ্রাস্ফীতি ও আর্থিক বিপর্যয়ের বিপদ নিহিত থাকে। এই বিপদ এড়াইবার জন্য অর্থ ও ক্রেডিট সংক্রান্ত নীতি অনুসরণ করিতে হইবে

আর্থিক অসাম্য দূরীকরণ

আয় ও সঞ্চিত ধনের অসাম্য যতদূর সম্ভব হ্রাস করিতে হইবে। ইহার প্রধান অস্ত্র হিসাবে মৃত্যুকর ধার্য করা যাইতে পারে। আয়-করের হার যদি আয়ের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান হয় এবং নিয়ন্ত্রণের কাঠামো যদি অব্যাহত থাকে তাহা হইলে অতিরিক্ত মুনাফা সঞ্চয় করা সম্ভব হইবে না। ইহার উপর মৃত্যুকর ধার্য করা হইলে অসাম্য অনেক পরিমাণে দূর করা যাইবে।

পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ

সম্পদ ইচ্ছানুযায়ী বণ্টন করিতে হইলে, মূল্য কম রাখিতে হইলে এবং ন্যায্য হারে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পণ্য বিনিময় অব্যাহত রাখিতে হইলে নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা অপরিহার্য। কোন কোন ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মূল্য নির্দিষ্ট করিয়া দিলেই চলিতে পারে। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে উৎপাদকগণ যাহাতে উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য উপযুক্ত মূল্য লাভ করিতে পারে তজ্জন্য সর্বনিম্ন মূল্য বাঁধিয়া দিতে হইবে। নিয়ন্ত্রণ এক শ্রেণীর লোকের সুবিধা করিয়া দিতে পারে সত্য; কিন্তু যথাযথভাবে পরিচালিত হইলে তাহা সর্বশ্রেণীর দাবীর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারে।

অগ্রাধিকার

দেশের আশু প্রয়োজন এবং সেই সঙ্গে অর্থনীতির দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রাধিকার নির্ণয় করিতে হইবে।

পাঁচ বৎসরকালের প্রথম দিকে সেচ ও বিদ্যুৎসহ কৃষি ব্যবস্থাকেই সর্বাপেক্ষা অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। উন্নয়নকালের প্রথম দিকে খাদ্য উৎপাদন এবং শিল্পের জন্য কাঁচামালের উৎপাদন বেশ কিছু পরিমাণে বৃদ্ধি না পাইলে পরবর্তীকালে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব হইবে না। আর্থিক ব্যবস্থা গোড়াতেই শক্ত করিয়া গড়িতে হইবে। কৃষির ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিমাণ উদ্বৃত্ত রাখিয়া পরে অন্যান্য ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে কর্মসংস্থানের চেষ্টা করিতে হইবে। সেচ, বিদ্যুৎ ও পরিবহন-ব্যবস্থার উন্নতি করিতেই সরকারীসূত্রে প্রাপ্ত টাকার বেশীর ভাগ ব্যয় হইয়া যাইবে। কাজেই শিল্পের উন্নয়ন বেশীর ভাগ বে-সরকারী উদ্যোগের উপরেই নির্ভর করিবে। তবে লৌহ, ইস্পাত শিল্পে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি প্রভৃতি মূল শিল্পের উন্নয়নে সরকারের বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে। এইগুলি ছাড়া আধুনিক জগতে উন্নয়ন সম্ভব নহে। কাজেই এই অবস্থায়ই এই সকল মূল শিল্প উন্নয়নে হাত দিতে হইবে।

সম্পদের হিসাব-নিকাশ

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করিতে গিয়া কমিশন বলিয়াছেন যে, ইহার জন্য ২০৬৯ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হইলেও বে-সরকারী ক্ষেত্রে যাহাতে উন্নয়ন ব্যাহত না হয় তাহার উপযোগী অবস্থা অবশ্যই সৃষ্টি করিতে হইবে। সরকারী ও বে-সরকারী উদ্যোগের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের একটি মাত্র ক্ষেত্র রহিয়াছে। কাজেই শুধু সরকারী উদ্যোগের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিলে চলিবে না, অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রেও সম্প্রসারণ করিতে হইবে এবং এইভাবে যে অর্থ সংগৃহীত হইবে তাহা নির্ধারিত অগ্রাধিকার অনুসারে উভয়ের মধ্যে বণ্টন করিয়া লইতে হইবে।

হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে যে, পরিকল্পনাকালে উদ্বৃত্ত রাজস্ব হইতে মোট ৭৩৮ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে। জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ, মুদ্রা সঞ্চয় পরিকল্পনা প্রভৃতি বাবদ ৫২০ কোটি টাকা আসিবে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের আয়ের এই দুইটি প্রধান সূত্র হইতে বেশী টাকা অর্থাৎ বরাদ্দ ২০৬৯ কোটি টাকার মধ্যে ১২৫৮ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে।

নিম্নে ১৯৫০-৫১ সালের সহিত পরিকল্পনাকালের একটি তুলনামূলক হিসাব দেওয়া হইল :—

	১৯৫০—৫১			পরিকল্পনাকাল		
	কেন্দ্র ও 'গ' শ্রেণীর রাজ্য	'ক' ও 'খ' শ্রেণীর রাজ্য	মোট	কেন্দ্র ও 'গ' শ্রেণীর রাজ্য	'ক' ও 'খ' শ্রেণীর রাজ্য	মোট
সরকারী আয়—						
(১) বর্তমান রাজস্ব	৭১	৫১	১২২	১৬০	৪০৮	৫৬৮
(২) রেলওয়ে	২৩	—	২৩	১৭০	—	১৭০
বে-সরকারী সূত্রে আয়—						
(১) জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ	১১	৮	৩	৩৬	৭৯	১১৫
(২) ক্ষুদ্র সঞ্চয় এবং অন্যান্য ঋণ	৪২	—	৪২	২৭০	—	২৭০
(৩) জমা এবং বিবিধ	—	৩৮	৩৮	৯০	৪৫	১৩৫
মোট	১২৫	৯৭	২২২	৭২৬	৫৩২	১২৫৮

বাকী টাকা

এইভাবে সাধারণ আয়ের সূত্র হইতেই ১২৫৮ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে। বৈদেশিক সূত্র হইতেও ঋণ গ্রহণ করিতে হইবে। ইতোমধ্যেই আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যান্ড প্রভৃতি সূত্র হইতে ১৫৬ কোটি টাকা পাওয়া গিয়াছে। আরও ৬৫৫ কোটি টাকার দরকার। এই টাকাটা বৈদেশিক সূত্র হইতে ঋণ করা যাইতে পারে। তাহা পাওয়া না গেলে কর ধার্য করিয়া ঋণ করিয়া টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে এবং অনুমাণ ২৯০ কোটি টাকা ঘাটতি লইয়া কাজ চালাইয়া যাইতে হইবে।

উন্নয়নের প্রথম দিকে বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া গেলে সম্ভাব্য বিপর্যয় রোধ করা সহজ হইবে। দেশের বর্তমান অবস্থায় বৈদেশিক সাহায্য ব্যতীত অপেক্ষাকৃত কম লক্ষ্য লইয়াও পরিকল্পনা রচনা করা সম্ভব নহে। বৈদেশিক সাহায্য প্রয়োজনমত পাওয়া না গেলে পরিকল্পনা কিছুটা রদবদল করা চলিবে সন্দেহ নাই। তবু ভবিষ্যতে দ্রুত উন্নয়নের ভিত্তি স্থাপন করিতে হইলে পরিকল্পিত ২০৬৯ কোটি টাকা বরাদ্দের লক্ষ্যই স্থির রাখিতে হইবে।

অর্থ বিনিয়োগ ও চূড়ান্ত উদ্দেশ্য

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৫১—৫৬ সনে উন্নয়ন কার্যে মোট ২০৬৯ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। ঐ ব্যয়ের বরাদ্দ নির্ধারণকালে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে :—

১। যে সকল উন্নয়ন কার্য বর্তমানে আরম্ভ না করিলে ভবিষ্যতে ঐগুলি আরম্ভ করিতে অধিকতর অর্থের প্রয়োজন হইবে;

২। উন্নয়নকার্যে ব্যবহারোপযোগী দেশী সম্পদের খতিয়ান;

৩। উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ ও উহার ব্যবহারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ;

৪। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যারম্ভের পূর্বে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য গবর্ণমেন্টসমূহের আরব্ধ পরিকল্পনাসমূহের সম্পাদনের আবশ্যকতা এবং

৫। যুদ্ধ ও দেশ বিভাগের ফলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যে অসমতা দেখা দিয়াছে তাহার সংশোধনের প্রয়োজন।

অগ্রাধিকার ও অর্থ বিনিয়োগের নমুনা

জনহিতকর উন্নয়ন কার্যাদিতে নিম্নে প্রদর্শিত হারে অর্থ বিনিয়োগ করা হইবে :—

কৃষি ও সমাজ

উন্নয়ন পরিকল্পনা ৩৬১ কোটি টাকা অথবা মোট ব্যয়ের ১৭·৫ শতাংশ

সেচ ১৬৮ „ „ „ „ „ ৮·১ „

বহুমুখী সেচ ও

শক্তি পরিকল্পনা ২৬৬ „ „ „ „ „ ১২·৯ „

শক্তি উৎপাদন	১২৭	,,	,,	,,	,,	,,	৬·১	,,
পরিবহন ও যোগাযোগ	৪৯৭	,,	,,	,,	,,	,,	২৪·০	,,
শিল্প	১৭৩	,,	,,	,,	,,	,,	৮·৪	,,
সমাজ উন্নয়ন কার্যাদি	৩৪০	,,	,,	,,	,,	,,	১৬·৪	,,
পুনর্বাসন	৮৫	,,	,,	,,	,,	,,	৪·১	,,
বিবিধ	৫২	,,	,,	,,	,,	,,	২·৫	,,
মোট	২০৬৯						১০০·০	

বরাদ্দকৃত ২০৬৯ কোটি টাকা উন্নয়নকার্যাদিতে ব্যয়ের মূল উদ্দেশ্য এই যে, উহার ফলে দেশে উন্নয়ন যন্ত্রাদি বিশেষ সুলভ হইবে এবং ঐ সকল যন্ত্রাদির সাহায্যে পরবর্তীকালে উন্নয়নকার্যাবলী ক্রমেই বিস্তার লাভ করিতে পারিবে। ঐ ব্যয়ের বরাদ্দ নিম্নে দেওয়া হইল :—

১। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য গবর্ণমেণ্টসমূহের উন্নয়ন কার্যাদিতে নিয়োজিত মূলধন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ...	১,১৯৯ কোটি টাকা
২। বেসরকারী উন্নয়ন কার্যাদিতে নিয়োজিত মূলধন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে	
(ক) কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন বাবদ (সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও অভাবগ্রস্ত অঞ্চলের জন্য বিশেষ বরাদ্দ ব্যতীত)	২৪৪ কোটি টাকা
(খ) শিল্প ও পরিবহন বাবদ ঋণ ...	৪৭ কোটি টাকা
(গ) স্থানীয় উন্নয়ন কার্যাদিতে বিশেষ উৎসাহ প্রদান বাবদ (সমাজ উন্নয়ন কার্যাদিতে) ...	১০৫ কোটি টাকা
৩। সমাজসেবা কার্যাদিতে মূলধন বাবদ	৪২৫ কোটি টাকা
৪। অভাবগ্রস্ত অঞ্চল ও অন্যান্য অনির্দিষ্ট কার্য বাবদ ...	৪৯ কোটি টাকা
মোট	২০৬৯ কোটি টাকা

উপরোক্ত হিসাবে দেখা যায় যে, বরাদ্দ অর্থের প্রায় শতকরা ৬০ ভাগই কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের উন্নয়নকার্যাদিতে সরাসরিভাবে নিয়োগ করা হইবে এবং উহা প্রধানতঃ সেচ ও শক্তি, পরিবহন ও যোগাযোগ ও শিল্পকার্যে ব্যবহৃত হইবে। অবশিষ্ট শতকরা ৪০ ভাগ বরাদ্দ অর্থ বে-সরকারী উন্নয়নকার্যের প্রসার; কার্যকরী মূলধন, পরিচালন ব্যয় নির্বাহ, সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যয় ও উহাতে উৎসাহ প্রদানমূলক কার্যাদিতে ব্যবহৃত হইবে।

ব্যয়-বরাদ্দ

মোট ২,০৬৯ কোটি অর্থ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য গবর্ণমেণ্টের মধ্যে নিম্নে প্রদর্শিত হারে বণ্টন করা হইয়াছে :—

কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট (রেলওয়ে সহ) ...	১,২৪১ কোটি টাকা
(ক) তপশীলভুক্ত রাজ্যসমূহ ...	৬১০ কোটি টাকা
(খ) ,, ,, ...	১৭৩ কোটি টাকা
(গ) ,, ,, ...	৩২ কোটি টাকা
জম্মু ও কাশ্মীর	১৩ কোটি টাকা
মোট ...	২,০৬৯ কোটি টাকা

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য গবর্ণমেণ্টসমূহ (জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ব্যতীত) ঐ অর্থ কি কি খাতে ব্যয় করিবেন তাহা নিম্নে দেখান হইতেছে :—

(কোটি টাকায়)

	কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট	(ক) তপশীল রাজ্যসমূহ	(খ) তপশীল রাজ্যসমূহ	(গ) তপশীল রাজ্যসমূহ
কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন	১৮৬·৩	১২৭ ৩	৩৭·৬	৮.৭
সেচ ও শক্তি	২৬৫·৯	২০৬ ১	৮১·৫	৩.৫
পরিবহন ও যোগাযোগ	৪০৯·৫	৫৬ ৫	১৭·৪	৮.৮
শিল্প	১৪৬·২	১৭ ৯	৭·১	০.৫
পুনর্বাসন ও সমাজসেবা	১৯১·৪	১৯২ ৩	২৮·৯	১০.৪
বিবিধ	৪৩·২	১০·০	০·৭	—
মোট	১,২৪০·১	৬১০ ১	১৭৩·২	৩১.৯

জম্মু ও কাশ্মীর ব্যতীত ভারতের অন্যান্য রাজ্যে ঐ অর্থ নিম্নরূপ হারে ব্যয় হইবে :

(ক) তপশীলভুক্ত রাজ্যসমূহ		(খ) তপশীলভুক্ত রাজ্যসমূহ		(গ) তপশীলভুক্ত রাজ্যসমূহ	
আসাম	১৭·৪৯	হায়দরাবাদ	৪১·৩৫	আজমীঢ়	১·৫৭
বিহার	৫৭·২৯	মধ্যভারত	২২·৩২	ভূপাল	৩·১০
বোম্বাই	১৪৬·৪৪	মহীশূর	৩৬·৬০	বিলাসপুর	০·৫৭
মধ্যপ্রদেশ	৪৩·০৮	পেপসু	৮·৯৪	কুর্গ	০·৭৩
মাদ্রাজ	১৪০·৮৪	রাজস্থান	১৬·৭২	দিল্লী	৭·৪৮
উড়িষ্যা	১৭·৮৪	সৌরাষ্ট্র	২০·৩১	হিমাচল প্রদেশ	৪·৫৫
পাঞ্জাব	২০·২১	ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন	২৭·৩২	কচ্ছ	৩·০৫
উত্তর প্রদেশ	৯৭·৮৩			মণিপুর	১·৫৫
পশ্চিমবঙ্গ	৬৯·১০			ত্রিপুরা	২·০৭
				বিন্ধ্যপ্রদেশ	৬·৩৯
মোট	৬১০·১২	মোট	১৭৩·২৬	মোট	৩১·৮৬

প্রায় বৎসরাধিককাল পূর্বে বিভিন্ন রাজ্য গবর্ণমেণ্টের সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের ভিত্তিতে এবং উঁহাদের সহিত পরামর্শক্রমে উপরোক্ত ব্যয়-বরাদ্দ নির্ধারিত হইয়াছে। অতঃপর যে সকল রাজ্য গবর্ণমেণ্ট উঁহাদের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের পরিধি বৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন, অতিরিক্ত ব্যয় বহনে উঁহারা সক্ষম থাকিলে ঐ সকল প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশন অনুমোদন করিয়াছেন।

নিম্নে পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার আর্থিক ভিত্তির তালিকা দেখান হইল :—

(কোটি টাকায়)

	কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট	রাজ্য গবর্ণমেণ্টসমূহ (জম্মু ও কাশ্মীরসহ)	মোট
পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নয়ন কার্যে বিনিয়োগ	১২৪১	৮২৮	২০৬৯
বাজেট হইতে আয়—			
(১) উদ্বৃত্ত রাজস্ব	৩৩০	৪০৮	৭৩৮
(২) মূলধনী আয় সঞ্চিত অর্থসংগ্রহ ব্যতীত	৩৯৬	১২৪	৫২০
(৩) পরিকল্পনা অনুযায়ী আন্তঃ গবর্ণমেণ্ট লেনদেন অথবা কেন্দ্রীয় সাহায্য	২২৯*	২২৯*	—
	৪৯৭	৭৬১	১২৫৮
বিদেশ হইতে প্রাপ্ত	১৫৬	—	১৫৬
মোট	৬৫৩	৭৬১	১৪১৪

* আসাম রাজ্যের উপজাতীয়দের উন্নয়নার্থ যে ৪ কোটি টাকা ব্যয় হইবে তাহা সহ।

উপরোক্ত হিসাব মতে, বে-সরকারী উন্নয়নকার্যাদির ব্যয় বাবদ ৬৫৬ কোটি টাকা ঘাটতি হয়। ঐ ঘাটতি বৈদেশিক সাহায্য, আভ্যন্তরীণ কর বৃদ্ধি অথবা ঋণ করিয়া মিটাইতে হইবে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যসূচীর স্বীকৃতি

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলাফল নির্ধারণের সময়ে বে-সরকারী উন্নয়নকার্যসূচী ধরা হইবে না। মোটের উপর অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রয়োজনের স্বীকৃতির উপর এই কার্যসূচী স্থাপিত এবং বে-সরকারী প্রচেষ্টার নির্ধারণের সহিত সম্পৃক্ত। কৃষিকার্যের ব্যাপারে প্রধান সমস্যা হইতেছে সেচ, রাসায়নিক সার, সার, উত্তম বীজ, কৃষকদের মধ্যে কারিগরি জ্ঞানের বিস্তার প্রভৃতি সমস্যা। এই ব্যাপারে কৃষকদের নিজেদের শ্রমই অনেক পরিমাণে পরিপূরক। শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে আমরা ৪০টি বড় ও মাঝারি ধরণের শিল্পের কথা ধরিয়াছি। এ দেশের কারখানাসমূহে মোট যে উৎপাদন হয় তাহার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ঐ সকল শিল্পে উৎপন্ন হয়। কৃষি ও পাকা শিল্পের দিক দিয়া বলিতে গেলে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলাফল ব্যাপকভাবে বিচার করিতে হইবে। অন্যান্য প্রকার উন্নয়ন বিশেষতঃ বৃত্তি, পরিবহন ও শিল্পের ছোটখাটো উদ্যম সম্পর্কে বর্তমানে কেবলমাত্র মোটামুটি বিচার করিতে হইবে; শিক্ষার প্রসার, স্বাস্থ্যরক্ষা, যোগাযোগ স্থাপন প্রভৃতির ব্যাপারে সমাজোন্নয়ন প্রচেষ্টার যে অবদান তাহা অগ্রেই সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যাইবে না।

উন্নয়ন পরিকল্পনার ফলাফল কিরূপ হইতে পারে তাহা নিম্নের বিবৃতি হইতে জানা যাইবেঃ—

	(১৯৫০-৫১)	(১৯৫৫-৫৬)
১। কৃষি—		
খাদ্যশস্য ডাইলসহ (লক্ষ টন)	৫২৭	৬১৬
তুলা (লক্ষ গাঁইট)	২৯·৭	৪২·২
পাট (লক্ষ গাঁইট)	৩৩·০	৫৩·৯
ইক্ষু (লক্ষ টন)	৫৬	৬৩
তৈলবীজ (লক্ষ টন)	৫১	৫৫
২। সেচ ও বিদ্যুৎ—		
বৃহৎ সেচ ব্যবস্থা (লক্ষ একর)	৫০০	১১২
ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থা (লক্ষ একর)	—	—
বৈদ্যুতিক শক্তি (লক্ষ কিলোওয়াট)	২৩	৩৫
৩। শিল্প—		
লৌহ ও ইস্পাত (লক্ষ টন)		
কাঁচা লৌহ	৩·৫	৬·৬
তৈয়ারী ইস্পাত	৯·৮	১৩·৭
সিমেণ্ট (লক্ষ টন)	২৬·৯	৪৮·০
এ্যালুমিনিয়াম (সহস্র টন)	৩·৭	১২·০
সার (সহস্র টন)		
এ্যামোনিয়াম সালফেট	৪৬·৩	৪৫০·০
সুপার ফসফেট	৫৫·১	১৮০·০
রেল ইঞ্জিন (শুধু সংখ্যায়)	—	১৭০
যন্ত্রপাতি (সহস্র)	১·১	৪·৬
পেট্রোল সংশোধন (লক্ষ গ্যালন)	৪০৩·০	
বিটুমেন (সহস্র টন)	—	৩৭·৫
সুতা (লক্ষ পাউণ্ড)	১১৭৯০	১৬৪০০
সূতী কাপড় (লক্ষ গজ)	৩৭১৮০	৪৭০০০
তাঁতের কাপড় (লক্ষ গজ)	৮১০০	১৭০০০
পাটজাত দ্রব্যাদি (সহস্র টন)	৮৯২	১২০০
কৃষি যন্ত্রপাতি		
(ক) শক্তিচালিত পাম্প (সহস্র)	৩৪·০	৮৫·০
(খ) ডিজেল ইঞ্জিন (সহস্র)	৫·৫	৫০·০
বাইসাইকেল (সহস্র)	১০১·০	৫৩০·০
সুবাসার (লক্ষ গ্যালন)	৪৭	১৮০
৪। পরিবহন—		
জাহাজ (সহস্র টন)		
বিদেশগামী	১৭৩·৫	২৮৩·০
উপকূলচারী	২১১·০	৩১৫·০
সড়ক (সহস্র মাইল)		
জাতীয় সড়ক	১১·৯	১২·৫
রাজ্য সড়ক	১৭·৬	২০·৬
৫। শিক্ষা (সংখ্যা পরিবর্তন সাপেক্ষ)—		
ছাত্র সংখ্যা		
প্রাথমিক বিদ্যালয় (লক্ষ)	১৫১·১	১৮৭·৯
প্রাথমিক বুনিয়াদী বিদ্যালয় (লক্ষ)	২৯·০	৫২·৮
মাধ্যমিক বিদ্যালয় (লক্ষ)	৪৩·৯	৫৭·৮
শিল্প বিদ্যালয় (সহস্র)	১৪·৮	২১·৮
অন্যান্য কারিগরী ও পেশাদারী বিদ্যালয় (সহস্র)	২৬·৭	৪৩·৬
৬। স্বাস্থ্য—		
হাসপাতাল (বেডের সংখ্যা সহস্র)	১০৬·৫	১১৭·২
চিকিৎসালয়		
শহরাঞ্চলে	১৩৫৮	১৬১৫
গ্রামাঞ্চলে	৫২২৯	৫৮৪০

৭। উন্নয়নমূলক কেন্দ্র—		
পঞ্চায়েৎ (সহস্র)	৫৫·১	৬১·১
সমবায় সমিতি (পাঞ্জাব, উড়িষ্যা, হায়দরাবাদ, পেপস্ এবং 'গ' তপশীলভুক্ত অধিকাংশ রাজ্য ব্যতীত)		
ঋণ	৮৭·৮	১১২·৫
ক্রয়-বিক্রয়	১৪·৭	২০·৭
সর্বার্থসাধক	৩১·৫	৪০·৫
সেচ	১১২·০	৫১৪·০
সমবায় কৃষিক্ষেত্র	৩৫২·০	৯৭৫·০
অন্যান্য (সহস্র)	২৭·৩	৩৫·৮
মোট (সহস্র)	১৬১·৯	২১১·১

পল্লী উন্নয়ন ও গ্রাম সংস্কার

গ্রামসমূহের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন পরিবর্তনের যে পদ্ধতি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় চালু করা হইবে সমাজ উন্নয়নের পথেই তাহা সম্ভব এবং গ্রাম সংস্কারের মাধ্যমেই তাহা করিতে হইবে।

১৯৫২ সালে যে সমাজ উন্নয়ন কার্যসূচী চালু করা হইয়াছে অতীতে গ্রামোন্নয়নের বিবিধ অভিজ্ঞতা হইতেই তাহা নির্ধারণ করা হইয়াছে। বর্তমান পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রত্যেক সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য প্রায় ৩০০টি গ্রাম লইয়া একটি কেন্দ্র গঠিত হইবে। ইহাতে প্রায় ১,৫৪,০০০ একর জমি এবং প্রায় ২,০০,০০০ জন লোক থাকিবে। এই এক একটি কেন্দ্র ৩টি করিয়া উন্নয়ন ব্লকে বিভক্ত হইবে। এক একটি ব্লকে থাকিবে প্রায় ১০০টি গ্রাম এবং প্রায় ৬০,০০০ হইতে ৭০,০০০ লোক। প্রতিটি উন্নয়ন ব্লক আবার পাঁচটি করিয়া গ্রামে বিভক্ত থাকিবে। এই পাঁচটি গ্রামের জন্য একজন করিয়া পল্লীসেবক থাকিবে। ১৯৫২ সালে যে কার্যসূচী চালু করা হইয়াছে তাহাতে ১ কোটি ৫ লক্ষ লোকের উন্নতির ব্যবস্থা আছে। কৃষি ও আনুষঙ্গিক কাজ, যোগাযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবসরকালীন কর্মসংস্থান, গৃহনির্মাণ, শিক্ষণ, সমাজ কল্যাণ।

এই কর্মসূচীর অঙ্গ হইল গণ-সহযোগ। পরিকল্পনা অঞ্চলের সকল বে-সরকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদিগকে লইয়া একটি প্রোজেক্ট য্যাডভাইসরী কমিটি বা পরিকল্পনা উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হইবে। এই কমিটি পরিকল্পনা আঞ্চলিক অফিসারকে তাঁহার কার্যে সাহায্য করিবেন। পরিকল্পনা অঞ্চলগুলিতে ভারতসেবক সমাজ স্থাপিত হইলে উহার সাহায্যে এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে গ্রামবাসীদের সহযোগিতা লাভ সহজ হইবে। এই পরিকল্পনায় যে সকল কাজের ব্যবস্থা করা হইয়াছে সেইগুলি সাধারণতঃ সরকারী সংস্থাগুলি সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহাতে সরকারী কর্মচারীদের বেতন প্রভৃতিতে অনেক খরচ হয়। জনগণ যদি স্বীয় ভাগ্যের নিয়ন্তা হইতে চান, তবে তাঁহাদিগের উপর এই সকল কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত করিতে হইবে—সরকারী সাহায্য প্রভৃতি দান করিবে। গ্রামবাসীরা অর্থ দিয়া বা শ্রম দিয়া সাহায্য করিবেন। অনুন্নত অঞ্চলগুলিকে অথবা তপশিলী জাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে গ্রামীণ কর্মীরা শ্রম দিয়া সাহায্য করিবেন।

একটি গ্রামীণ সমাজ পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে ৩ বৎসরে ৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। আর একটি সহর কেন্দ্র যুক্ত গ্রামীণ পরিকল্পনা রূপায়নে ব্যয় হইবে ১ ক্রোটি ১১ লক্ষ টাকা।

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির উপর আর্থিক দায়িত্ব ন্যস্ত করিয়াছে। মোটামুটিভাবে এককালীন ব্যয়ের ৭৫ শতাংশ কেন্দ্র এবং ২৫ শতাংশ রাজ্য সরকার বহন করিবেন, আর বাৎসরিক ব্যয়ের অর্ধেক কেন্দ্রীয় সরকার ও অর্ধেক রাজ্য সরকার বহন করিবেন। কোনও কোনও পরিকল্পনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ঋণও দিবেন। তৃতীয় বৎসরের পর রাজ্য সরকারই সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা

প্রত্যেক চাষীকে সাহায্য করিতে পারে এবং সমগ্র গ্রাম্য জীবনের সুসংহত উন্নতি বিধানে সাহায্য করিতে পারে এমন একটি জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা গঠনের জন্য খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি অনুসন্ধান কমিটি সুপারিশ করেন। কমিটির মতে উক্ত সংস্থা স্থাপনে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে সাহায্য করিবেন। এই সংস্থাগুলি ১০ বৎসরে তাহাদের অধীনস্থ গ্রামগুলির সামগ্রিক উন্নয়ন সাধনের ব্যবস্থা করিবেন। পরিকল্পনার অন্তর্গত পাঁচ বৎসরে মোট ১,২০,০০০ গ্রাম এই সংস্থাগুলির কার্যের আওতায় আসিবে। ইহার ফলে গ্রাম্য কল্যাণমূলক কার্যের বিশেষতঃ কৃষিকার্যের বিশেষ উন্নতি হইবে।

খাদ্যনীতি

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সার্থক রূপায়নকল্পে একটি সুনির্দিষ্ট খাদ্যনীতি অত্যাবশ্যক। পণ্যদ্রব্যের মূল্যমান ব্যবস্থায় খাদ্যদ্রব্য একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। কারণ, খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হইলে সঙ্গে সঙ্গেই জীবনধারণের ব্যয় বাড়িয়া যায় এবং চারিদিকের উৎপাদন ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধকালীন খাদ্য কৃচ্ছ্রতার দরুণ অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হইলে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরোপিত হইয়াছিল—একথা সত্য; কিন্তু সুপরিকল্পিত অর্থনীতিতে ইহার কতকগুলি নির্দিষ্ট কাজ আছে। খাদ্য নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকিলে ধনীদের অতিরিক্ত পরিমাণ খাদ্য গ্রহণে বাধা পড়ে এবং দরিদ্রদিগের ন্যূনতম খাদ্য সরবরাহ সুনিশ্চিত থাকে এবং বেকার লোকদের কাজে লাগাইবার সুপরিকল্পিত কর্মসূচী কার্যকরী করা সহজ নয়।

কমিশন বলিতেছেন, খাদ্যের কি পরিমাণ ঘাটতির ব্যবস্থা করিতে হইবে তাহা উৎপাদন ও প্রয়োজনের বর্তমান হিসাব হইতেই সবাসরি নির্ধারণ করা সম্ভবপর নহে। প্রকৃত সত্য এই যে, গত কয়েক বৎসর যাবৎ গড়ে প্রায় ৩০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানী হইয়াছে। ১৯৪৮ সাল হইতে এ পর্যন্ত যে পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানী হইয়াছে তাহার মোট ব্যয় ৭৫০ কোটি টাকার মত।

খাদ্যনীতির লক্ষ্য

দেশের খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধিতে যাহাতে আরও অধিক পরিমাণে খাদ্যশস্য বাজারে বিক্রয় হয় তাহার ব্যবস্থা করা, ঐ খাদ্যশস্য যথাসম্ভব সমভাবে বন্টনের ব্যবস্থা করা এবং ক্রমে ক্রমে বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানীর প্রয়োজনীয়তা দূর করাই খাদ্যনীতির লক্ষ্য। খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা ফলবতী হইতে সময় লাগিবে।

খাদ্যের অনটন কিছুকাল বজায় থাকিবে ধরিয়া লইয়াই খাদ্যনীতি নির্ধারণ করিতে হইবে। রেশন ব্যবস্থা, খাদ্যশস্য সংগ্রহ এবং ন্যূনতম খাদ্যশস্য আমদানী পরিকল্পনান্তর্গতকালে দৃঢ় খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রধান উপায়। অর্থ বিনিয়োগ কর্মসূচীর উপর খাদ্যনীতির প্রত্যক্ষ প্রভাব রহিয়াছে। খাদ্য সরবরাহ যত বেশী হইবে, ততই সমাজের পক্ষে বিভিন্ন কর্মে অর্থ বিনিয়োগ প্রচেষ্টা বাড়িবে। কারণ, নানা প্রকার নির্মাণকার্যে এবং মূল যন্ত্রপাতি উৎপাদনকার্যে যে সকল শ্রমিক নিয়োজিত থাকে খাদ্যই তাহাদের প্রধান রসদ জোগায়। খাদ্য ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি ন্যায্য মূল্যে সরবরাহ ও বণ্টন-ব্যবস্থা করিতে পারিলে শিল্পকার্য পূর্ণতরভাবে আত্মনিয়োগকল্পে ঘাটতি হওয়া সত্ত্বেও অর্থ সরবরাহ করা যাইতে পারে।

নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা

উপরি উক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, নিয়ন্ত্রণের মূল ব্যবস্থা পরিকল্পনার রূপায়নের সময়ে অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। দেশে খাদ্যোৎপাদন ৭৫ লক্ষ টন না বাড়া পর্যন্ত দেশের যাবতীয় প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে প্রচুর খাদ্যশস্য নিশ্চিতভাবে সরবরাহ করা সম্ভব হইবে বলিয়া ধরিয়া লওয়া উচিত নহে—ইহাই কমিশনের সুচিন্তিত অভিমত। ঐ অতিরিক্ত পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইলে এবং দেশের এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে খাদ্যশস্য প্রেরণের জন্য পরিবহনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা হইলে পরে নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা যাইতে পারে অথবা তাহার প্রয়োগ ব্যবস্থার পরিবর্তন করা যাইতে পারে। খাদ্য ব্যবস্থার এই পরিবর্তন কতদূর সম্ভব হইবে তাহা তৎকালীন অর্থ বিনিয়োগ পরিস্থিতির উপর নির্ভর করিবে।

কতকগুলি নির্দিষ্ট মাপের সহরে বিধিবদ্ধ রেশন ব্যবস্থা অবশ্যই চালু থাকিবে, আর ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের ন্যায় ঘাটতি অঞ্চলের প্রয়োজনের দিকেও বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে। খাদ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা স্থানীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী বাধ্যতামূলক অথবা লেভী প্রথা অনুযায়ী হইবে। উদ্বৃত্ত রাজ্যসমূহ হইতে আরও বেশী পরিমাণে খাদ্যশস্য চালনের ব্যবস্থাও করিতে হইবে।

সর্ব ভারতীয় নীতি হিসাবে খাদ্যনীতি পরিচালনা করিতে হইবে। বিভিন্ন রাজ্যে ইহার পরিচালন ব্যবস্থা বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে। কিন্তু ইহার মূল উদ্দেশ্য হইবে প্রত্যেক উদ্বৃত্ত অঞ্চল হইতে যত বেশী সম্ভব খাদ্যশস্য কেন্দ্রীয় ভাণ্ডারে জমা দেওয়া এবং প্রত্যেক ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্য সংগ্রহ ও বণ্টন ব্যবস্থা এমনভাবে পরিচালিত করা যাহাতে কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার হইতে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম পরিমাণ খাদ্যশস্য পাইলেই চলিতে পারে। খাদ্য সংগ্রহ ও খাদ্য বিক্রয়ের মূল্য নির্ধারণ এবং রাজ্যসমূহের নিয়ন্ত্রণ নীতি সংহতি বিধানের দায়িত্ব থাকিবে কেন্দ্রীয় সরকারের।

খাদ্য অভ্যাসের পরিবর্তন

সমগ্র পৃথিবীতেই চাউলের অভাব রহিয়াছে এবং ইহা আমদানী করিবার জন্য উচ্চ মূল্য দিতে হয় বলিয়া জনসাধারণের খাদ্যে খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন প্রয়োজন। মোট প্রয়োজনের তুলনায় আমাদিগের চাউলের অভাব ২ অথবা ৩ শতাংশের বেশী হইবে না। গমজাত দ্রব্য বা অন্যান্য পরিপূরক খাদ্য ব্যবহার করিয়া ঐ অভাব পূরণ করা মোটেই কঠিন নহে।

সেচ ও বিদ্যুৎ

পরিকল্পনা কমিশন সেচ ও বিদ্যুৎ সম্পর্কে যে কর্মসূচী সুপারিশ করিয়াছেন, তাহাতে আছে বহুমুখী সেচ পরিকল্পনা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা, নলকূপ নির্মাণ এবং জলসম্পদ হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন।

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, যে সকল নূতন সেচ পরিকল্পনা চালু হইয়াছে, অথবা যেগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে অথবা যেগুলি কেবল বিবেচনা করা হইতেছে সেইগুলি কার্যকরী করিতে প্রায় ২০০০ কোটি টাকা লাগিবে। এই সকল সেচ পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে আরও ৪½ কোটি একর জমিতে সেচ কার্য চলিবে এবং প্রায় ৭০ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতে পারিবে। কমিশন বলিতেছেন, "এইরূপ একটি বিরাট কর্মসূচীর রূপায়নের ফলে এবং কৃষিপদ্ধতির মান উন্নয়নের জন্য এবং বড় বড় শিল্প ছাড়াও সমগ্র দেশে কুটীর শিল্পের উন্নতি বিধানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে তবেই এই দেশে জীবন ধারণের মান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করা সম্ভব—এই বিষয়ে আমরা দৃঢ়নিশ্চয়।

আমাদের সর্বাধিক প্রয়োজন কি তাহা এক্ষণে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যাইতেছে; কিন্তু আমাদের সম্পদ অনুযায়ীই আমাদের সর্বনিম্ন কার্যসূচী প্রণয়ন করিতে হইবে। ইতোমধ্যেই অনেকগুলি সেচ পরিকল্পনায় হাত দেওয়া হইয়াছে। কাজেই প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১৯৫১ সালে যে সকল সেচ পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মাণকার্য হইতেছে সেইগুলি সম্পূর্ণ করার ব্যবস্থা আছে। ১৯৫১ সালের ৩১শে মার্চের মধ্যে এই সকল সেচ পরিকল্পনা বাবদ ১৫৩ কোটি টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে।

নূতন পরিকল্পনা

কমিশন বলেন, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসরের মধ্যে কোনও নূতন পরিকল্পনায়ই হাত দেওয়া যাইবে না। শেষের দিকে কয়েকটি নূতন পরিকল্পনায় হাত দিতে হইবে। কারণ তাহা না হইলে গত কয়েক বৎসর যাবৎ যে সকল কারিগরি কর্মী শিক্ষালাভ করিয়া উঠিয়াছে, তাহাদিগকে পুরাপুরি কাজে লাগান যাইবে না। এই পরিকল্পনায় যে সকল নূতন সেচ পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে সেইগুলি বাবদ পরিকল্পনান্তর্গত কালে ৪০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। আর এইগুলি এই পরিকল্পনায় অন্তর্গত করার ফলে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হইতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পর্যন্ত উন্নয়নকার্য অব্যাহত থাকিবে।

নূতন পরিকল্পনাগুলি হইল কোশী, কয়না, কৃষ্ণা, চম্বল এবং রিহান্দ। এইগুলি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল:-

পরিকল্পনার নাম	যে অঞ্চলে চালু হইবে	আনুমানিক মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	কি উপকার হইবে সেচ (হাজার একরের হিসাবে)	কত কিলোওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাইবে)
কোশী (প্রথম পর্যায়)	বিহার ও নেপাল	৬৬,০০	২,৬২০	৪০ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ
কয়না (প্রথম পর্যায়)	বোম্বাই	৩৩,০০	—	২৪০

কৃষ্ণা	মাদ্রাজ ও হায়দরাবাদ	হিসাব পাওয়া যায় নাই	হিসাব পাওয়া যায় নাই	
চম্বল (প্রথম পর্যায়)	মধ্য ভারত ও রাজস্থান	৩৩,৭৫	১,২০০	৮০
রিহান্দ্	উত্তরপ্রদেশ	৩৫,০০	—	২৪০

এই সকল পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে সাকুল্যে ২০০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। ইহার মধ্যে পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে ৪০ কোটি টাকা ব্যয় করা সম্ভব হইতে পারে।

খসড়া পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নির্মীয়মান সেচ পরিকল্পনাগুলির জন্য ৪৫০ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হইয়াছিল। এখন দেখা যাইতেছে যে, কতকগুলি পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে নির্মাণ ব্যয় বর্ধিত হওয়ার দরুণ এবং অন্যান্য কারণে পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে আরও ৫০ কোটি টাকা বেশী ব্যয় করার প্রয়োজন হইবে।

যে সকল বহুমুখী পরিকল্পনার কথা বিবেচনা করিয়া দেখা হইতেছে, সেইগুলি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বৎসরে অতিরিক্ত ৮৫ লক্ষ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করিতে এবং অতিরিক্ত ১০ লক্ষ ৮০ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করিবে। এই সকল পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী হইলে মোট সেচ-সিক্ত জমির পরিমাণ আরও ১ কোটি ৬৯ লক্ষ একর এবং উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমাণ মোট ১৪ লক্ষ ৬০ হাজার কিলোওয়াট বাড়িবে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেচকার্য

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেচকার্য আরও বাড়াইবার কথা কমিশন বলিয়াছেন। খসড়া পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষির উন্নয়নকল্পে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেচ কার্যের ফলে ১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে ৪৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭৯ লক্ষ একর জমিতে জল সেচন হইবে বলিয়া বলা হইয়াছিল। কমিশন এখন সুপারিশ করিতেছেন যে, ছোট ও মাঝারি সেচ কার্যের জন্য আরও ৩০ কোটি টাকা ব্যয় করা উচিত।

জাতীয় নীতি গ্রহণের প্রয়োজন

সেচ ও বিদ্যুৎ ব্যাপারে সমগ্র ভারতের জন্য একটি জাতীয় নীতি গ্রহণের উপর কমিশন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

যে স্থলে সেচের চাহিদা প্রত্যেক বৎসর একরূপ থাকে না এবং সেচ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ সুযোগ সর্বদা লওয়া হয় না, সেখানে একটি সেচ-কর স্থাপনের কথা কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন। যেখানে অনেক বৎসর পূর্বে এই কর স্থাপন করা হইয়াছিল, সেখানে শস্যের দর বৃদ্ধি হইয়া থাকিলে এই করের হারও বাড়ান যাইতে পারে। শস্যের মূল্যের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া করের হার হ্রাস বৃদ্ধি করার নীতি কমিশন অনুমোদন করেন।

উন্নয়ন-কর

যে সকল অঞ্চলে সেচকার্যের ব্যবস্থা করা হইবে সেই সকল স্থানে শস্য বৃদ্ধি পাইলে একটি উন্নয়ন-কর ধার্য করার সুপারিশ কমিশন করিয়াছেন। কমিশনের মতে এই অনর্জিত বৃদ্ধির কতকাংশ রাষ্ট্র দাবী করিতে পারে।

সেচ ভাণ্ডার

কমিশন প্রত্যেক রাজ্যে একটি সেচ উন্নয়ন ভাণ্ডার স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রত্যেক বৎসর সাধারণ রাজস্ব হইতে অথবা ঋণ অথবা সঞ্চয় হইতে অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত সাহায্য বা ঋণ হইতে কিছু টাকা এবং জল-কর বা উন্নয়ন-কর বাবদ সংগৃহীত সকল টাকাই ঐ ভাণ্ডারে জমা হইবে। এই ভাণ্ডার হইতে সেচ ও বিদ্যুৎ পরিকল্পনা সংক্রান্ত জাতীয় খরচ মিটান হইবে।

নূতন সেচ ও বিদ্যুৎ পরিকল্পনাগুলির জন্য কমিশন একটি বিশেষ পদ্ধতির প্রস্তাব করিয়াছেন। এই প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, একটি বিশেষ কমিটি সমগ্র ভারতীয় ভিত্তিতে পরিকল্পনাগুলিকে অগ্রাধিকার দিবেন। কমিশনের রিপোর্টে এই স্পেশ্যাল কমিটির সদস্যদের নাম দেওয়া হইয়াছে।

শিল্প

পরিকল্পনা কমিশন কি উপায়ে উন্নয়ন সমস্যার সমাধান করিতে চাহেন এবং এই উন্নয়ন সাধন কার্যে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাসমূহ কোন্ কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করিবে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য এবং উপায় ব্যাখ্যা করিবার সময়ই তাহা বিবৃত হইয়াছে। শিল্পোন্নয়ন ক্ষেত্রে সরকারের মূলনীতি ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসের শিল্পনীতি সংক্রান্ত প্রস্তাবেই নির্দিষ্ট হইয়াছে। ঐ প্রস্তাবে উল্লিখিত হইয়াছে যে, অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদন, পরমাণবিক শক্তি উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণ এবং রেলওয়ে পরিবহন পরিচালন প্রভৃতি শিল্পগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য বিশেষভাবে সংরক্ষিত থাকিবে। অন্যান্য কতকগুলি শিল্প যেমন, কয়লা, লৌহ ও ইস্পাত, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ এবং বেতার যন্ত্র নির্মাণ, খনিজ তৈল উৎপাদন, শিল্পের উন্নয়নের দায়িত্ব প্রভৃতি রাষ্ট্র অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকার এবং অন্যান্য সরকারী সংস্থার উপরই ন্যস্ত থাকিবে, তবে এই কার্যে বেসরকারী সংস্থাগুলির সহযোগিতাও প্রয়োজন হইবে।

শিল্প ক্ষেত্রের অন্যান্য সকল স্তরেই বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির অবাধ অধিকার থাকিবে—তাহারা এককভাবে অথবা সমবায়ের ভিত্তিতে ঐগুলি পরিচালনা করিতে পারিবেন, তবে যখনই দেখা যাইবে যে, বেসরকারী পরিচালনায় কোনও শিল্পের উন্নতি ব্যাহত হইতেছে, তখনই রাষ্ট্র তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবে। মূলধন বিনিয়োগ ও কারিগরি নিপুণতার দিক দিয়া গুরুত্বপূর্ণ ১৮টি নির্দিষ্ট শিল্পে কেন্দ্রীয় পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব করা হইয়াছে। কমিশন মনে করেন, এই নীতির আওতার মধ্যে দেশের প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে পর্যাপ্ত একটি শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব।

অগ্রাধিকারের ক্রম

শিল্প ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের ক্রম নিম্নরূপ হওয়া উচিত বলিয়া কমিশন প্রস্তাব করেন :—

১। পাট, প্লাইউড প্রভৃতি উৎপাদক দ্রব্যশিল্পে এবং বস্ত্র, চিনি, সাবান, বনস্পতি, রং ও বার্নিশ প্রভৃতি ব্যবহারের দ্রব্য-শিল্পে বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণতর সদ্ব্যবহার।

২। লৌহ ও ইস্পাত, এ্যালুমিনিয়ম, সিমেন্ট, কৃত্রিম সার, ভারী রাসায়নিক দ্রব্য, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি প্রভৃতি শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার সম্প্রসারণ।

৩। যে সকল শিল্প নির্মাণকল্পে মূলধনের এক অংশ ইতোমধ্যেই ব্যয় করা হইয়াছে সেইগুলি সম্পূর্ণকরণ।

৪। বর্তমান শিল্পসমূহের অভাব-অভিযোগ মিটাইয়া এইগুলিকে শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্যে আমাদের দেশের সম্পদ অনুযায়ী নূতন নূতন শিল্প—যেমন জিপসাম হইতে সালফার প্রস্তুত রাসায়নিক মণ্ড এবং রেয়ন বা কৃত্রিম রেশম শিল্প প্রভৃতি স্থাপন।

যে ব্যাপক ভিত্তিতে দেশে প্রাপ্ত সম্পদসমূহ কার্যে নিয়োগ করা হইবে অগ্রাধিকারের পরিকল্পনায় তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে। তবে কোন বিশেষ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সময় অন্যান্য বিষয়েও যে বিবেচনা করিতে হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আশা করা যায় যে, ১৯৫১ সালের শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইনে নির্ধারিত লাইসেন্স প্রদান পদ্ধতিতে নূতন প্রতিষ্ঠান গঠন এবং সকল প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব আছে—তাহাদের সম্প্রসারণ সম্পর্কিত সমস্যা-সমূহ সম্বন্ধে সতর্কতার সহিত বিবেচনা করার সুবিধা হইবে।

এই পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারসমূহের অধীন শিল্প-পরিকল্পনার জন্য ৯৪ কোটি টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা আছে।

নিম্নলিখিত ১০টি কুটীর শিল্পের জন্য বিশেষজ্ঞদের সহিত পরামর্শ করিয়া ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনা করা হইয়াছে: (১) গ্রাম্য তৈল-শিল্প, (২) নিম তৈলের সাবান প্রস্তুত, (৩) ধান ভানা, (৪) তালগুড়, (৫) গুড় ও খান্দেশ্বরী, (৬) চামড়া, (৭) পশমের কম্বল, (৮) হাতে প্রস্তুত ভাল কাগজ, (৯) মৌমাছি পালন এবং (১০) দিয়াশলাই।

খাদি এবং গ্রাম্য-শিল্প বোর্ড রাজ্য-সরকার এবং গ্রাম্য-শিল্পের সহিত জড়িত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত পরামর্শ করিয়া এই ব্যাপারে আর যাহা উচিত তাহা করিবেন।

বে-সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকেই শিল্প সম্প্রসারণে উদ্যোগী হইতে হইবে। কমিশন সংশ্লিষ্ট শিল্পসমূহের সহিত পরামর্শ করিয়া ৪২টি সুসংগঠিত শিল্পের জন্য একটা কর্মসূচী নির্ধারিত করিয়াছেন। বে-সরকারী শিল্পের ক্ষেত্রে শিল্প-সম্প্রসারণের জন্য আনুমানিক ২৩৩ কোটি টাকা নিয়োগ করা প্রয়োজন।

পল্লী শিল্পের উন্নয়ন করিতে হইলে স্থানীয় লোকদের সহযোগিতা এবং কর্মপ্রেরণা প্রয়োজন। তাহারা যাহাতে কাজে সাফল্য-লাভ করিতে পারে তজ্জন্য একটা উপযুক্ত অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ অতীতে যে সকল কারণে পল্লী শিল্প নষ্ট হইয়াছিল তাহা পর্যালোচনা করিতে হইবে এবং সেই সকল কারণ যাহাতে পুনরায় দেখা না দেয় সেইভাবে পরিকল্পনা স্থির করিতে হইবে। পল্লীবাসীরা যদি একটি সঙ্ঘবদ্ধ দল হিসাবে কাজ করে এবং পল্লীবাসীরা যদি ঐ ব্যাপারে যথেষ্ট মনোযোগ দেয় তবেই পল্লী শিল্পের উন্নতি সম্ভব।

ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে:—(১) যে সকল শিল্প বৃহৎ বৃহৎ শিল্পের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, (২) যে সকল শিল্প বৃহৎ শিল্পের পরিপূরক, (৩) যে সকল কুটীর শিল্প বৃহৎ বৃহৎ শিল্পের প্রতিদ্বন্দ্বী। তৃতীয় বিষয় সম্বন্ধে উদাহরণস্বরূপ হস্তচালিত তাঁতশিল্পের উল্লেখ করা যাইতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একটি কমিটি সাময়িক সাহায্য হিসাবে এই শিল্পের রক্ষা ব্যবস্থার বিষয়ে বিবেচনা করিয়াছেন। পরিকল্পনার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য বাণিজ্যিক নীতি সুষ্ঠুভাবে রচনা করিতে হইয়াছে।

শ্রম

দুইদিক হইতে শ্রম-সমস্যার সমাধানের আলোচনা করিতে হইবে—উহার একটি হইতেছে শ্রমিকদের কল্যাণ এবং আর একটি হইতেছে দেশের আর্থিক স্থায়িত্ব ও অগ্রগতি। খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়—শ্রমিকদের এই মূল অভাবগুলি দূর করিতেই হইবে। শুধু তাহাই নয়, তাহাদের স্বাস্থ্যরক্ষা উন্নত ব্যবস্থা, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যাপক ব্যবস্থা, শিক্ষার উত্তম আয়োজন, আমোদ-প্রমোদ উপভোগ ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির ব্যবস্থাও করিতে হইবে। যাহাতে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন থাকে এবং পেশা সম্পর্কিত ও অন্যান্য প্রকার বিপদ হইতে তাহাদের স্বাস্থ্যরক্ষা হয়, সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদের কাজের অবস্থা ঠিক করিতে হইবে। পরিচালকবর্গকে তাহাদের অবস্থা ভালভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। যদি শ্রমিক সুব্যবস্থা না পায়, তবে নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানের নিকট যাহাতে সে সুবিচার পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মোটের উপর শ্রমিকদের নিজ নিজ অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইবার ও বৈধ উপায় অবলম্বন করিবার স্বাধীনতা থাকিবে।

এই সকল অধিকারের অধিকাংশই স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে এবং সেগুলি সংবিধানে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগণ সে সকল বিষয়ে সতর্ক আছেন। কারখানা, ট্রেড ইউনিয়ন এবং আঘাত ও মৃত্যু সম্পর্কে ক্ষতিপূরণ বিষয়ক কতকগুলি আইন বহু পূর্ব হইতেই প্রচলিত আছে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হইয়াছে এবং শ্রমিকদের কল্যাণ সম্পর্কিত কতকগুলি ব্যবস্থা চালু করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে কয়লাখনি প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও বোনাস পরিকল্পনা আইন, নিম্নতম বেতন আইন, শ্রমিকদের জন্য রাষ্ট্র বীমা আইন (১৯৪৮) আবাদী শ্রমিক আইন (১৯৫১), খনি আইন এবং প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আইন (১৯৫২)-এর উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের গৃহ নির্মাণ ও পুনর্বাসন পরিকল্পনায় যে অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে, তাহা ছাড়া পরিকল্পনা কার্যকরী করার সময়ে শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগণ ৬ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

শ্রমিক কল্যাণ সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়ে সুপারিশ করা হইয়াছে:—

(১) শ্রমিক মালিক সম্পর্ক, (২) বেতন ও সামাজিক নিরাপত্তা, (৩) কাজকর্মের অবস্থা, (৪) শ্রমিকদের নিয়োগ ও শিক্ষা, (৫) উৎপাদন ক্ষমতা।

১। শ্রমিক মালিক সম্পর্ক

(ক) বে-সরকারী বিভাগ—পরিকল্পনার শ্রমশিল্প বিভাগে যে লক্ষ্য সম্মুখে রাখা হইয়াছে, তাহা কার্যকরী করিতে গেলে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সৌহার্দ্য থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ মালিক ও শ্রমিকের শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকিলে আর্থিক উন্নয়ন সম্ভব। শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে এমন সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে শ্রমিকেরা শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় অধিকতর অংশ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। শ্রমিক মালিক সম্পর্কের প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে শ্রমিকদের সঙ্ঘগঠন এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে দাবী দাওয়া উত্থাপনের অধিকার স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। শিল্প ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে ট্রেড ইউনিয়ন-সমূহকে স্বীকার করিয়া লইয়া সেগুলিকে সাহায্য করিতে হইবে। উভয় পক্ষের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইলে শিল্পের মঙ্গল ও সমাজের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আপোষের মনোভাব লইয়া উহার মীমাংসা করিতে হইবে। মতবিরোধের শেষ ব্যবস্থা হিসাবে উহার নিরপেক্ষ

অনুসন্ধান ও সালিশ বিচারের আশ্রয় লইতে হইবে। ন্যায়বিচার বিরোধী সিদ্ধান্ত ছাড়া শিল্প বিরোধ আদালতের কোন সিদ্ধান্তের উপরে অপীল অর্থাৎ পুনর্বিচার চলিবে না।

বিরোধ পরিহার—শিল্প-বিরোধ পরিহারের জন্য শ্রমিক ও মালিকের কর্তব্য ও দায়িত্ব কি তাহা পরিষ্কারভাবে নির্দিষ্ট করিতে হইবে। সেজন্য প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মীর জন্য নির্দেশনামা রাখিতে হইবে। শ্রমিকেরা যাহাতে তাহাদের অভিযোগের প্রতিকারার্থে যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষের সম্মুখীন হইতে পারে সে সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট নিয়ম স্থির করিতে হইবে। শিল্পের অবস্থা ও পরিচালনার সহিত যাহাতে তাহাদের যোগাযোগ থাকে তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। অনুরূপভাবে শ্রমিকদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোন পরিবর্তন সাধন করিতে গেলে তাহা তাহাদিগকে জানাইতে হইবে। শ্রমিকগণও তাহাদের কার্যের সর্তাদি পরিবর্তনের অভিপ্রায় জানাইতে পারিবে। ইহাতে অবিবেচনাপ্রসূত কোন প্রকার কাজ করিতে পারিবে না। নিয়ম লঙ্ঘনকারী যে কোন পক্ষের প্রত্যক্ষ আক্রমণ আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবে।

বিরোধের মীমাংসা—কর্মসংস্থলের উদ্ভুত বিরোধের মীমাংসার জন্য কয়েকটি কমিটি গঠন করিতে হইবে এবং বিশেষ ও ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কয়েকটি যোগ্য কমিটি কার্য করিবে।

যদি শ্রমিকেরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া শক্তিশালী হয় এবং মালিকদের মীমাংসায় আন্তরিক অভিপ্রায় থাকে কেবলমাত্র তাহা হইলে সঙ্ঘবদ্ধ দাবী-দাওয়া উত্থাপন সফল হইতে পারে। যদি বিরোধ কিছুদিন ধরিয়া চলিতে থাকে, তবে রাজ্য সরকার সালিশের মনোভাব লইয়া অগ্রসর হইয়া আসিতে পারেন। বড় বড় ব্যাপারে অস্থায়ী বা স্থায়ী সালিশ বোর্ড নিয়োগ করার প্রয়োজন হইতে পারে। বেসরকারী সালিশ বিচারক লইয়াও কমিটি গঠন করা যাইতে পারে।

ট্রেড ইউনিয়ন ও মালিক প্রতিষ্ঠানের কার্য

পরিকল্পনা সাফল্যের সহিত কার্যকরী করিয়া তুলিবার জন্য ট্রেড ইউনিয়ন ও মালিকদের মধ্যে সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। এই সহযোগিতা রাখা বিভিন্ন উপায়ে সম্ভব হইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, ইউনিয়ন ও মালিকদের মধ্যে পরিকল্পনাটির আলোচনা দ্বারা তাহাদের মধ্যে সে সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি করা যাইতে পারে।

তাহা ছাড়া পরিকল্পনাটি যখন কার্যকরী করা হইতেছে তখন ইউনিয়নগুলি শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে শান্তি রক্ষার কার্য বন্ধ পরিহারে ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করিতে পারে। নূতন যন্ত্রপাতি স্থাপন, উৎপাদনের প্রণালী ও উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস সম্পর্কে মালিকগণ শ্রমিকদের সহিত পরামর্শও করিতে পারেন।

(২) বেতন ও সামাজিক নিরাপত্তা

(ক) **বেতন**—সম্প্রতি কয়েক বৎসরে পণ্যদ্রব্যের মূল্য দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে। শিল্প প্রতিষ্ঠানের লাভের অঙ্ক যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়াছে এবং সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিকেরা তাহাদের বেতনের হারও বাড়াইয়া লইয়াছে। পরিকল্পনা কার্যকরী করার সময় মুদ্রাস্ফীতি নিবারণের উদ্দেশ্যে লাভ ও বেতনের হার কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে।

বেতন সম্পর্কিত নীতির বিষয় বলা যায় যে, আয়ের অসামঞ্জস্য হ্রাস করিতে হইবে। জাতীয় আয়ের ব্যাপারে শ্রমিক অবশ্যই তাহার ন্যায্য পাওনা পাইবে এবং বেতনের হারের নির্দিষ্ট মান বাড়াইতে হইবে। বিভিন্ন প্রকার কাজের মধ্যে বেতনের পার্থক্য যতটা সম্ভব দূর করিতে হইবে, তবে কর্মীর নিপুণতা, শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, মানসিক ও শারীরিক প্রয়োজন, বিপদের দায় বিবেচনা করিয়া যতটা পার্থক্য রাখা সমীচীন বিবেচিত হইবে ততটা রাখিতে হইবে। তাহা ছাড়া বিভিন্ন বৃত্তি ও শিল্প কাজের তুলনামূলক গুরুত্ব কতখানি তাহাও নির্ধারণের চেষ্টা করিতে হইবে। ৫ বৎসরের মধ্যে নিম্নতম বেতন আইন কার্যকরী করিতে হইবে। অগ্রেই অনুন্নত অঞ্চলের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। অর্থের অভাব ও পরিচালনা অসুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া কৃষি শ্রমিকদের নিম্নতম বেতন নির্ধারণ সম্পর্কে একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। এবং অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাজের পরিধি বাড়াইতে হইবে। সেই সঙ্গে বিদেশের বিশেষজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠানের সহায়তালাভের অংশ বিভাগ ও বোনাস প্রদানের বিষয় পর্যালোচনা করিতে হইবে। বোনাসের টাকা সবটা নগদে না দিয়া উহার কিছু অংশ শ্রমিকের সঞ্চয়ের তহবিলে জমা দিতে হইবে।

বেতন সমস্যা, সমাধান, তথ্য সংগ্রহ এবং বেতনের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য পরিস্থিতির পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগণ স্থায়ী ত্রিদলীয় বেতন বোর্ড গঠনের কথা বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন।

বিভিন্ন রাজ্যসরকারের শ্রমিকদের ক্ষতি পূরণ আইন ও প্রসূতি-মঙ্গল আইনে শ্রমিকদের কতকগুলি দাবী মিটাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শ্রমিকদের রাষ্ট্রবীমা আইনে শ্রমিকদের রোগের চিকিৎসা, প্রসূতি মঙ্গল ও কাজের সময়ে আঘাতের প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আইনের অভিনবত্ব, পরিচালন সংক্রান্ত ও অন্যান্য প্রকার অসুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া এ বৎসরের মধ্যে আইনটি যথাযথভাবে কার্যকরী করা এবং একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করার দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে।

১৯৫২ সালের প্রভিডেন্ট ফান্ড আইনের বা শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ সংস্থানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বর্তমানে ঐ আইনটি ছয়টি বড় বড় শিল্পে চালু করা হইয়াছে। ৫০ জন বা অধিক শ্রমিক নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে ঐ আইন চালু করার জন্য একটি কার্যসূচী রচিত হইবে।

(৩) **কাজের পরিবেশ**—কারখানাসমূহের কাজের পরিবেশের উন্নয়ন সাধন করিতে হইবে। এ সম্পর্কে আইনগত বিষয়ে ১৯৪৮ সালের কারখানা আইন, ১৯৫১ সালের আবাদী শ্রমিক আইন, দোকান প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কাজ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রস্তাবিত আইন এবং মোটরযান বিভাগ যথেষ্ট।

(৪) **শ্রমিকদের নিয়োগ ও শিক্ষা**—জনশক্তির সদ্ব্যবহার জাতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কারণ যথেষ্ট সংখ্যায় যথা আবশ্যক নিপুণ শ্রমিক নিয়মিত পাওয়ার উপর উৎপাদন নির্ভর করে। কর্মসংস্থান কেন্দ্র স্থাপন এবং শ্রমিকদের শিক্ষার জন্য অধিকতর সুবিধার ফলে যদিও এ বিষয়ে কিছুটা উন্নতি হইয়াছে তবুও এখনও অনেক কিছু করিবার আছে।

উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করিবার উদ্দেশে যে সকল শিল্পে শ্রমিক সংখ্যা অধিক সে সকল ক্ষেত্রে শিল্পের সামঞ্জস্য করিতে

হইবে। তবে স্বার্থে কতকগুলি রক্ষা কবচের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। প্রধান রক্ষা কবচগুলি এইরূপ:—শ্রমিকদের তালিকার মান স্থির এবং কার্যভার নির্ধারণ করিতে হইবে। উদ্বৃত্ত শ্রমিকদিগকে অন্যান্য বিভাগে কাজের সংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। শ্রমিকেরা যাহাতে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করে তজ্জন্য গ্র্যাচুইটি দিতে হইবে। শ্রমিকরা যাহাতে অন্যান্য কাজকর্ম পুনরায় শিখিবার সুযোগ পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সেক্ষেত্রে সরকারকে শিক্ষার ব্যয় বহন করিতে হইবে।

পরিবহন ও যোগাযোগ

রেলওয়ে

পরিবহন ও যোগাযোগ কর্মসূচীর জন্য যে বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহার চার-পঞ্চমাংশের কিছু কম রেলওয়েসমূহের জন্য ধরা হইয়াছে।

যুদ্ধ-জনিত ক্ষয়ক্ষতি সারাইয়া রেলের পুনর্গঠন ও প্রচুর যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করাই বর্তমানে ভারতীয় রেলওয়েসমূহে সর্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যা। ১৯৩০ সালের পরে দেশে যে অর্থনীতিক মন্দা দেখা দেয় তাহার ধাক্কা সামলাইয়া রেলওয়েগুলি ১৯৩৭ সালে মাথা খাড়া করিয়া উঠিতে না উঠিতেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখা দিল এবং সব বিপর্যস্ত হইয়া গেল। যুদ্ধের সময় স্বাভাবিক সময়ের কর্মসূচী অনুযায়ী নূতন নূতন গাড়ী সরবরাহ বা পুরাতন গাড়ী সংস্কার করা সম্ভব হয় না; রেল পুনর্গঠনের কাজও বহুলভাবে ব্যাহত হয়। যুদ্ধের পর এবং দেশ বিভাগের ফলে আরও নূতন নূতন সমস্যা দেখা দিল। পরিকল্পনা কমিশন হিসাব করিয়াছেন, সাধারণ নিয়মে ১৯৫৬ সালের ৩১শে মার্চ তারিখের মধ্যে ২,০৯২টি ইঞ্জিন; ৮,৫৩৫টি গাড়ী; এবং ৪৭,৫৩৩টি ওয়াগন অকেজো হইয়া পড়িবে। তদুপরি, গত ২০ বৎসরে রেলওয়ে লাইনেরও যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে এবং ঐগুলির সংস্কার প্রয়োজন।

ইঞ্জিন সরবরাহের জন্য যাহাতে বিদেশের মুখাপেক্ষী না হইতে হয় তজ্জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে চিত্তরঞ্জনে একটি রেলওয়ে ইঞ্জিনের কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। পরিণামে এই কারখানায় প্রতি বৎসর ১২০টি ইঞ্জিন এবং ৫০টি অতিরিক্ত বয়লার নির্মিত হইবে। পরিকল্পনা কমিশন মনে করেন যে, পাঁচ বৎসরে মাত্র ৩০০টি ইঞ্জিন তৈয়ারী হইবে। টাটা লোকোমোটিভ ইঞ্জিনীয়ারিং-এর মূলধন হিসাবে প্রায় ২ কোটি টাকা দিয়া ভারত সরকার ইহাকে সাহায্য করিয়াছেন। পরিকল্পনান্তর্গত কালে এই প্রতিষ্ঠান প্রায় ২০০টি ইঞ্জিন সরবরাহ করিবে। যুদ্ধকাল হইতেই এই পর্যন্ত যে সকল ক্ষয়ক্ষতি পূরণ ও সংস্কারের কাজ জমা হইয়া আছে সেইগুলি সম্পূর্ণ করিয়া জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে রেলওয়ের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ কল্পে পাঁচ বৎসরের রেলওয়ে পরিকল্পনায় প্রতি বৎসর গড়ে অন্ততঃ ৮০ কোটি টাকা অথবা মোট ৪০০ কোটি টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন বলিয়া কমিশন মনে করেন। ইহার ফলে বর্তমান স্তরে যাত্রী ও মাল চলাচল কার্য সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব হইবে। তদুপরি মূল শিল্পসমূহ ও পরিবহনের জন্য যে ৫০ কোটি টাকা কমিশন বরাদ্দ করিয়াছেন তাহাও রেলওয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনার সহায়ক হইবে—কারণ ইহার এক উল্লেখযোগ্য অংশ রেলের কাজেই ব্যয় হইবে।

মোট ৪০০ কোটি টাকা ব্যয়ের মধ্যে কেন্দ্রীয় রাজস্ব হইতে ৮০ কোটি টাকা দেওয়া হইবে এবং অবশিষ্ট ৩২০ কোটি টাকা রেলওয়েগুলি তাহাদের নিজ সম্পদ হইতেই সংগ্রহ করিবে।

জাহাজ চলাচল

জাহাজ চলাচল সংক্রান্ত উন্নয়নসূচী কার্যকরী হইলে ১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতের উপকূল ও বিদেশগামী জাহাজের মোট পরিমাণ ৬,০০,০০০ টন বাড়িয়া যাইবে। পরিকল্পনা কমিশন জাহাজ কোম্পানীগুলিকে জাহাজ কিনিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার হইতে ১৫ কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার সুপারিশ করিয়াছেন। আরও জাহাজ ক্রয় করিবার জন্য—বিশেষতঃ খাদ্য বহনের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক সাহায্য প্রদান করিবেন বলিয়াও কমিশন আশা করেন।

বন্দর উন্নয়ন

ভারতের পাঁচটি প্রধান বন্দর—কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, কোচিন ও বিশাখাপত্তনম্—বৎসরে ২ কোটি টন মাল পারাপার করে। প্রয়োজনের তুলনায় ইহা যথেষ্ট নহে। নিম্নলিখিত কারণেও বন্দর উন্নয়ন প্রয়োজন:—

(১) দেশ বিভাগের ফলে করাচী বন্দর ভারতের হাতছাড়া হওয়ায় ঐ পথে যে মাল যাতায়াত করিত সেইগুলির জন্য একটি বন্দর স্থাপন।

(২) বন্দরগুলির যন্ত্রপাতির অধিকাংশই পুরাতন ও অপ্রচুর।

(৩) বোম্বাইয়ে প্রস্তাবিত পেট্রোলিয়াম শোধনাগারগুলির জন্য বন্দরের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিবেন বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকার স্বীকৃত হইয়াছেন।

উপরোক্ত প্রয়োজনগুলি স্মরণ রাখিয়াই কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন। করাচী বন্দরের মাধ্যমে পূর্বে যে মাল যাতায়াত করিত, কান্দালা বন্দর দিয়া এখন সেইগুলি চলাচল করিবে। এই বন্দরের জন্য পরিকল্পনান্তর্গত কালে ১২ কোটি ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। তৈল শোধনাগার প্রভৃতির জন্য বন্দরাদির সুবিধা করিয়া দিতে ৮ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে বলিয়া সুপারিশ করা হইয়াছে। প্রধান প্রধান ৫টি বন্দরের—বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, বিশাখাপত্তনম্ এবং কোচিন—উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ কার্যের জন্য পাঁচ বৎসরে সরকারের ৮ কোটি টাকা অগ্রিম ঋণ দেওয়া উচিত বলিয়া কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন। ইহার অতিরিক্ত যে টাকা লাগিবে প্রায়—১৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, বন্দর কর্তৃপক্ষ তাহা নিজেদের সম্পদ হইতেই সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

রাস্তা

জাতীয় রাজপথ উন্নয়ন সংক্রান্ত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে সকল রাস্তা বা সেতু নির্মাণ কার্য চলিতেছে সেইগুলি বাদেও ৪৫০ মাইল নূতন রাস্তা ও ৪০টি বড় সেতু ও অনেক ছোট ছোট সেতু নির্মাণের ব্যবস্থা আছে। তদুপরি, প্রায় ২,২০০ মাইল রাস্তার উন্নতি সাধনকরা হইবে। ১৯৫৫-৫৬ সালে ইহার দুই-তৃতীয়াংশ কাজ সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় রাজপথ উন্নয়নের জন্য পাঁচ বৎসরে ২৪ কোটি টাকা ব্যয় করিবেন। তাহা ছাড়া, আরও কতকগুলি রাস্তা উন্নয়নের আর্থিক দায় কেন্দ্রীয় সরকার ইতঃপূর্বেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং ৪ কোটি টাকা তজ্জন্য বরাদ্দ করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় বর্ষ গবে-

ষণা প্রতিষ্ঠানের জন্যও ২১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা ব্যয় হইবে।

বিভিন্ন রাজ্যে রাস্তাঘাট উন্নয়নের জন্য ৭৩ কোটি ৫৪.লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে। ইহার মধ্যে "ক" শ্রেণীভুক্ত রাজ্যগুলির ব্যয় হইবে ৫০ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা; "খ" শ্রেণীভুক্ত রাজ্যগুলির ব্যয় হইবে ১৬ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা; আর অবশিষ্ট টাকা ব্যয় হইবে "গ" শ্রেণীভুক্ত রাজ্যগুলিতে।

অসামরিক বিমান চলাচল

অসামরিক বিমান চলাচল উন্নয়ন পরিকল্পনার আর একটি দিক। দেখা গিয়াছে যে, যে পরিমাণ যাত্রী ও মাল চলাচল হয় তাহাতে বর্তমান বিমান পরিবহন কোম্পানীগুলি অর্থনীতিক ভিত্তিতে কার্য পরিচালনা করিতে পারে না। কাজেই ঐগুলি মিলিত হইয়া একটি সংস্থা গঠন করা উচিত। এই পরিকল্পনায় চলতি বিমান কোম্পানীগুলিকে ক্ষতিপূরণ বাবদ এবং নূতন বিমান ক্রয় বাবদ ৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

ডাক, তার ও টেলিফোন

পরিকল্পনা কমিশন একটি ৫০ কোটি টাকার ডাক, তার ও টেলিফোন উন্নয়নের কর্মসূচীর সুপারিশ করিয়াছেন। ২,০০০ অথবা ততোধিক অধিবাসীর প্রত্যেক গ্রামের জন্য একটি করিয়া ডাকঘর এবং বড় বড় শহরগুলিতে টেলিফোন ব্যবস্থা সম্প্রসারণের উপরই প্রধানতঃ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

শিক্ষা

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষার উন্নয়নের জন্য ১৫৪ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহা সমাজ সেবামূলক ব্যবস্থাদির জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের ৪৬ শতাংশ এবং সমগ্র পরিকল্পনার ব্যয়ের ৭ শতাংশ।

ইহার মধ্যে ৩৯ কোটি ২ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা কর্মসূচী বাবদ ব্যয় হইবে। রাজ্য সরকারসমূহের সহযোগিতায় এই কর্মসূচী কার্যকরী করা হইবে। উচ্চতর শিক্ষা, বিশেষতঃ কারিগরি শিক্ষা এবং সমগ্র ভারতীয় ভিত্তিতে সমাজ সেবামূলক শিক্ষা ও বুনিয়াদি শিক্ষার জন্য যে সকল গবেষণাদি প্রয়োজন প্রধানতঃ সেই সকল ক্ষেত্রেই এই অর্থ ব্যয় হইবে। কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, প্রাক্-স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থার সংহতি সাধন, প্রিন্টিং টেকনলজি প্রভৃতি বিষয় প্রাক-স্নাতক স্তরে শিক্ষার ব্যবস্থা ; এবং স্থাপত্য ও শহর পরিকল্পনা শিক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতির উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সাহিত্যাদি বিষয়সমূহ অধ্যাপনার ব্যবস্থা দৃঢ়তর করিবার আয়োজনও ইহাতে আছে। নয়াদিল্লীতে একটি জাতীয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপনের বিষয়ও বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

প্রত্যেক রাজ্যে প্রাক্-বুনিয়াদি বিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া স্নাতকোত্তর বুনিয়াদি শিক্ষণ কলেজ প্রতিষ্ঠার কথা বিবেচনা করা হইতেছে শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে গবেষণা প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি সঙ্কলনের ব্যবস্থা করা হইবে। সমাজ সেবা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যালয় ও সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন, সমাজ সেবা শিক্ষা কর্মীদের জন্য জনতা কলেজ স্থাপন, প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি প্রণয়ন ও সঙ্কলন প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রাজ্যসমূহের কর্মসূচী

রাজ্যসমূহের কর্মসূচী বাবদ মোট ১১৫ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা অর্থাৎ বৎসরে ২৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। ১৯৫০-৫১ সালে শিক্ষার উন্নয়ন বাবদ ১৮ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষা বাবদ যে টাকা ব্যয় করিবেন তাহা অধিকাংশই রাজ্যগুলিতে ব্যয় হইবে বলিয়া উহাতে রাজ্যসমূহের সম্পদ বৃদ্ধি পাইবে।

বিভিন্ন স্তরে সম্প্রসারণ কার্যের জন্যই অধিকাংশ ব্যয় হইবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ফল দাঁড়াইবে, এইরূপঃ—

(১) প্রাথমিক শিক্ষা—প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়িবে শতকরা ১৭ ভাগ এবং ছাত্র সংখ্যা বাড়িবে শতকরা ২৫ ভাগ। প্রাথমিক বনিয়াদী বিদ্যালয়গুলির অনুপাতিক বৃদ্ধির হার হইবে যথাক্রমে ২২ শতাংশ ও ৮১ শতাংশ। ১৯৫০-৫১ সালে ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়স্ক বালকবালিকাদের ৪৪·৫ শতাংশ স্কুলে পড়িতেছে ; ১৯৫৫-৫৬ সালে উহা বাড়িয়া ৫৫·৭ শতাংশ হইবে।

(২) মাধ্যমিক শিক্ষা—মাধ্যমিক বিদ্যালয় বৃদ্ধি পাইবে। ১৮ শতাংশ হারে এবং ছাত্র সংখ্যা ৩২ শতাংশ হারে। ১১ হইতে ১৭ বৎসর বয়স্ক ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধির হার হইবে ১৯৫০-৫১ সালের ১০·৮ শতাংশ হইতে ১৯৫৫-৫৬ সালে ১৩·৩ শতাংশ।

(৩) কারিগরি ও বৃত্তি শিক্ষা—(শিল্প সংক্রান্ত শিক্ষালয় ব্যতীত) —বৃদ্ধির শতকরা হার হইবে প্রতিষ্ঠানাদির বেলায় ৫৭ এবং প্রতি বৎসরে শিক্ষাপ্রাপ্তদের বেলায় ৬৩।

স্বাস্থ্য

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত স্বাস্থ্যোন্নয়ন কর্মসূচীতে অগ্রাধিকারের ক্রম নিম্নরূপে ধার্য আছে —

১। জল সরবরাহ এবং স্বাস্থ্যবিধি পালনের ব্যবস্থা।

২। ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ

৩। স্থায়ী ও ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে গ্রাম্য লোকদের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা।

৪। প্রসূতি ও শিশুদের জন্য স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা।

৫। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত শিক্ষাদান ব্যবস্থা।

৬। ভেষজাদি বিষয়ে এবং যন্ত্রপাতির ব্যাপারে স্বয়ং নির্ভরশীল হওয়া।

৭। পরিবার পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারসমূহের চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য পরিকল্পনাসমূহ রূপায়নে মোট ৯৭ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে ; ইহার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় হইবে ১৭ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা, উচ্চতর শিক্ষা, গবেষণা এবং কতকগুলি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা রূপায়নে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকে সাহায্য করিবেন।

চিকিৎসা সূচীর জন্য যে ৪৭ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে, তাহার ৫০ শতাংশ হইবে হাসপাতাল ও ডিসপেনসারী বাবদ এবং প্রায় ৪০ শতাংশ হইবে চিকিৎসা শিক্ষা বাবদ। অখিল ভারত চিকিৎসা মন্দির স্থাপন ; আসাম, বোম্বাই, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে নূতন মেডিকেল কলেজ স্থাপন ; বর্তমান মেডিকেল স্কুলগুলিকে কলেজে রূপান্তরণ ; নার্স, ধাত্রী ও কম্পাউন্ডার প্রভৃতি চিকিৎসাকর্মীর শিক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতি চিকিৎসা

শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্গত।

এই পরিকল্পনা রূপায়িত হইলে শিক্ষিত চিকিৎসা কর্মীর সংখ্যা নিম্নরূপে বাড়িয়া যাইবে ঃ

শিক্ষাপ্রাপ্তের সংখ্যা	১৯৫০-৫১ সালে	১৯৫৫-৫৬ সালের শেষভাগে	শতকরা হার বৃদ্ধি
ডাক্তার	২৫০৪	২৭৮২	১১·১
কম্পাউণ্ডার	৮৯৪	১৬২১	৮১·৩
নার্স	২২১২	৩০০০	৩৫·৬
ধাত্রী	১৪০৭	১৯৩২	৩৭৩·৩
বৈদ্য ও হাকিম	৯১৪	১১১৭	২২·২

হাসপাতাল ও ডিস্‌পেনসারী বৃদ্ধির সংখ্যা এবং ঐগুলিতে শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধি নিম্নরূপ হইবে বলিয়া আশা করা যায় ঃ—

	১৯৫০-৫১ সালে	১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে	বৃদ্ধির শতকরা হার
হাসপাতালের সংখ্যা	২০১	২০৬২	২·৪
ডিস্‌পেনসারীর সংখ্যা			
(সহরে)	১৩৫৮	১৬৯৫	২৪·৮
(গ্রামে)	৫২২৯	৫৮৪০	১১·৬
হাসপাতালে শয্যাসংখ্যা	১০৬৪৭৮	১১৭২২২	১০·১
ডিস্‌পেনসারীতে শয্যাসংখ্যা			
(সহরে)	২০১৩	২২৩৩	১১·৪
(গ্রামে)	৫০৬৬	৫৫৮২	১০·২

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারসমূহ কর্তৃক আরব্ধ জনস্বাস্থ্য কর্মসূচী বাবদ মোট ৫০ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। জল সরবরাহ, নর্দমা নির্মাণ এবং ম্যালেরিয়ানাশক ব্যবস্থার দরুণই এই টাকার অধিকাংশ ব্যয় হইবে। ১৯৫০-৫১ সালে উন্নয়ন বাবদ যে ব্যয় হইয়াছে পরিকল্পনার অন্তর্গত সময়ের মধ্যে তাহা প্রায় চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইবে।

ভারতের জনস্বাস্থ্য সমস্যাবলীর মধ্যে ম্যালেরিয়া সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই এই ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণেরই প্রথম অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৭ কোটি ৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে, ইহার মধ্যে ৭ কোটি ৪ লক্ষ টাকা রাজ্য সরকার এবং ১০ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার ব্যয় করিবেন। ২০ কোটি লোককে ম্যালেরিয়ার হাত হইতে রক্ষার জন্য গ্রামাঞ্চলে কীটঘ্ন ঔষধ ব্যবহার এবং ম্যালেরিয়া-নাশক ভেষজ সরবরাহও এই পরিকল্পনার অন্তর্গত। অল্প দামে ডি ডি টি সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্যে দুইটি ডি ডি টি উৎপাদন কারখানা স্থাপনও এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। রাজ্য সরকারসমূহ এবং কেন্দ্রীয় সরকার মিলিয়া এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার অর্থ যোগাইবেন।

ম্যালেরিয়ার পরই আসে যক্ষ্মার কথা। যক্ষ্মা-নিরোধ পরিকল্পনার মধ্যে আছে স্যানাটোরিয়াম স্থাপন ও পরিচালনা ব্যবস্থা, হাসপাতাল ও ক্লিনিক স্থাপন, হাসপাতাল প্রভৃতিতে শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যবস্থা এবং বি সি জি টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা। ১৯৫০-৫১ সালের তুলনায় ১৯৫৫-৫৬ সালে নিম্নলিখিত পরিবর্তনের ব্যবস্থা উক্ত পরিকল্পনায় করা হইয়াছে ঃ—

	(১৯৫০-৫১) প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	(১৯৫০-৫১) শয্যা সংখ্যা	(১৯৫৫-৫৬) প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	(১৯৫৫-৫৬) শয্যা সংখ্যা
স্যানাটোরিয়াম	৩৭	৪১৬১	৪৬	৫৬৫৬
হাসপাতাল	৪৮	৩০৭৭	৫০	৪৮১৪
ক্লিনিক	১২৭	২৩২৩	১৮০	২৫৬২

যৌন ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ, প্রসূতি ও শিশুকল্যাণ, চিকিৎসা শিক্ষা, গবেষণা প্রভৃতির জন্যও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

সম্প্রতি ভারতের লোক সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দেশের সীমাবদ্ধ সম্পদের উপর অত্যধিক চাপ পরিবার পরিকল্পনা ও লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সমস্যার গুরুত্ব বৃদ্ধি করিয়াছে। প্রসূতির স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য এবং সন্তানদের প্রতি অধিকতর যত্ন লওয়া সম্ভব করিতে হইলে পরিবারের লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বা জন্মশাসন প্রয়োজন। এই বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য এই পরিকল্পনায় ৬৫ লক্ষ টাকার বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। ইহাতে নীতি ও গবেষণা কমিটি এবং লোকসংখ্যা কমিশন স্থাপনের ব্যবস্থা আছে।

গৃহ নির্মাণ

পরিকল্পনা কমিশন গৃহ নির্মাণ সমস্যা সম্পর্কে কতকগুলি বিশেষ সুপারিশ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে গৃহ নির্মাণ নীতি, গৃহ নির্মাণের মান, ব্যয়ের হিসাব, বস্তী পরিষ্কার, শহর ও গ্রাম পরিকল্পনা, গ্রামাঞ্চলে গৃহ নির্মাণ, গৃহ নির্মাণ সংক্রান্ত গবেষণা এবং কমিশনের সুপারিশগুলি কার্যকরী করিতে যে সকল আইনের প্রয়োজন হইবে, সেইগুলি সম্পর্কে বিশেষভাবে সুপারিশ করা হইয়াছে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহ নির্মাণ বাবদ মোট ৪৯ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। ইহার মধ্যে কেন্দ্রের ব্যয় হইবে ১০ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা।

শিল্পাঞ্চলে গৃহাদির অভাব ও ঘনবসতি খুব বেশী বলিয়া ঐ সকল অঞ্চলে গৃহাদি নির্মাণের উপরই কমিশন প্রথমে জোর দিয়াছেন। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য করিবেন। রাজ্য সরকারসমূহ গ্রামাঞ্চলে গৃহ নির্মাণকল্পে মনোযোগ দিবেন। গৃহ নির্মাণ বাবদ শুধু রাজ্য সরকারসমূহকেই নহে—শিল্পপতিদিগকে এবং শিল্প শ্রমিকদিগের সমবায় গৃহ নির্মাণ সমিতিসমূহকেও কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য প্রদান করিবেন। শেষোক্ত ক্ষেত্রে জমির দামসহ গৃহ নির্মাণ ব্যয়ের ২৫ শতাংশ পর্যন্ত সাহায্য প্রদান করা হইবে। তদুপরি মোট নির্মাণ ব্যয়ের ৩৭½ শতাংশ পর্যন্ত উপযুক্ত সুদে ঋণ দেওয়া হইবে। ১৫ বৎসরের মধ্যে এই ঋণ শোধ করিতে হইবে। একটি একতলা বাড়ী নির্মাণের জন্য ২,৭০০ টাকা এবং একাধিকতলা বাড়ীর জন্য ৪,৫০০ টাকা ব্যয় হইবে ধরিয়া লইয়া ঋণ ও সাহায্য দেওয়ার হিসাব ধার্য হইয়াছে।

গৃহ নির্মাণ কৌশল সংক্রান্ত যাবতীয় গবেষণার ফল এবং গৃহ নির্মাণ সংস্থাগুলি কর্তৃক ঐগুলির প্রয়োগকার্যে সংহতি সাধনের উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় গৃহনির্মাণ সংস্থা (ন্যাশন্যাল বিল্ডিং অর্গানিজেশান) স্থাপনের প্রস্তাব কমিশন করিয়াছেন। গৃহ নির্মাণ কর্মসূচী রূপায়নের জন্য একটি কেন্দ্রীয় গৃহ নির্মাণ বোর্ড (সেণ্ট্রাল

হাউসিং বোর্ড) এবং কতকগুলি আঞ্চলিক গৃহ নির্মাণ বোর্ড (রিজিওন্যাল হাউসিং বোর্ড) স্থাপনের সুপারিশও করা হইয়াছে। এই বোর্ডগুলি হইবে বিধিবদ্ধ আত্মকর্তৃত্বসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান। সময় সময় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারসমূহের নিকট হইতে তাহারা যে সকল সাহায্য পাইবে তাহা ছাড়াও তাহাদের স্বাধীন আয়ের পথ থাকিবে।

কমিশন প্রস্তাব করিয়াছেন যে, জাতীয় সহর ও গ্রাম পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য আইন প্রণয়ন করিতে হইবে। নূতন গৃহাদি নির্মাণের জন্য পতিত জমি ও বস্তী অঞ্চল অধিকারের জন্য ১৮৯৪ সালের জমি অধিকার আইন সংশোধনের প্রস্তাবও করা হইয়াছে।

খনিজসমূহ

ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা, খনি সংস্থা এবং জাতীয় গবেষণা মন্দিরগুলির দ্বারা দেশের গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ সম্পর্কে সুসংহত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান কার্য চালাইবার ব্যবস্থা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় করা হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত শুধু রপ্তানি করিবার উদ্দেশ্যেই ভারতের খনিজ সম্পদ আহরিত হইত। এইগুলি যে জাতীয় সম্পদ এবং দেশের স্বার্থে এইগুলির সুপরিকল্পিত ও যথাযথ প্রয়োগ দরকার—একথা খেয়াল করা হইত না। খনিজ দ্রব্যাদিই আধুনিক শিল্প ও যুদ্ধের মূল রসদ। কাজেই এইগুলির আহরণ ও অর্থনীতিক উপায়ে ব্যবহার, বিষয়ে একটি সুসংবদ্ধ জাতীয় নীতি থাকা প্রয়োজন। কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন যে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি এইরূপ একটি নীতির অপরিহার্য অঙ্গ :—

১। সম্পদের পরিমাপ ; বিভিন্ন খনিজ দ্রব্য কি পরিমাণ আছে এবং তাহার মূল্য কি হইতে পারে তাহা নিরূপণকল্পে নিয়মিতভাবে অনুসন্ধানকার্য পরিচালন।

২। খনি সংক্রান্ত কার্যাদি যথাযথভাবে পরিচালনা, খনিজ সংক্রান্ত কার্যাদি পরিচালনার জন্য উপযুক্ত কারিগর নিয়োগ, উচ্চস্তরের খনিজ দ্রব্য বাছিয়া বাছিয়া তুলিবার ব্যবস্থা বন্ধ করিয়া দেওয়া যাহাতে মূল্যবান খনিজ দ্রব্যাদি নষ্ট হইয়া না যায় তাহার ব্যবস্থা করা এবং লৌহপিণ্ড, ম্যাঙ্গানীজপিণ্ড, ক্রোমাইট, বক্সাইট প্রভৃতি অত্যাবশ্যক খনিজ দ্রব্যের লীজদান ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতিদান।

৩। সাল্ফার, টাংস্টেন, টিন পিণ্ড প্রভৃতি সামরিক গুরুত্বসম্পন্ন ধাতুসমূহ কোথায় কোথায় আছে তাহার অনুসন্ধান এবং ঐগুলির উন্নয়ন।

৪। নিম্নস্তরের খনিজ দ্রব্য কোথায় আছে তাহার সমীক্ষণ এবং খনিজ দ্রব্য সংশোধনের সমস্যা সংক্রান্ত গবেষণা।

৫। রপ্তানির জন্য খনিজ দ্রব্যকে সম্পূর্ণভাবে তৈয়ারী বা আধা তৈয়ারী দ্রব্যে রূপান্তরিত করা।

৬। ভারতের খনিজ সংস্থা (ইণ্ডিয়ান ব্যুরো অব্ মাইনস্)কে খনিজ সম্পদের অর্থনীতি সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সংগ্রহের ক্ষমতা অর্পণ।

উপরে উল্লিখিত নীতিগুলির ভিত্তিতে এবং অগ্রাধিকারের ক্রমানুসারে সজ্জিত একটি কার্যসূচী কমিশন প্রণয়ন করিয়াছেন। কয়লা, লৌহপিণ্ড, ম্যাঙ্গানীজপিণ্ড, মাইকা, জিপ্সাম, সাল্ফার, লৌহেতর ধাতু, ক্রোমাইট, বক্সাইট প্রভৃতি কতকগুলি প্রধান প্রধান খনিজদ্রব্যের উন্নয়নকল্পে কমিশন কতকগুলি সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করিয়াছেন।

কারিগরি সংহতি সাধন কমিটি

ভারতের খনিজ সম্পদের নির্ধারণ, উৎকর্ষ নিরূপণ, খনি ব্যবস্থার উন্নতি সাধন, খনির কাজে উন্নতি এবং খনিজ দ্রব্য সম্পর্কে গবেষণাদির কার্য যাহাতে সুসংহত উপায়ে পরিচালিত হয়, সেইজন্য পরিকল্পনা কমিশন প্রস্তাব করিয়াছেন যে, ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা, ভারতীয় খনি সংস্থা এবং জাতীয় গবেষণা মন্দিরগুলির (জ্বালানী, গবেষণা মন্দির, জাতীয় ধাতু গবেষণা মন্দির এবং কেন্দ্রীয় কাচ ও মৃন্ময়পাত্র সংক্রান্ত গবেষণা মন্দির) সংহতি সাধন প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে একটি কারিগরি সংহতি সাধন কমিটি স্থাপনের প্রস্তাব কমিশন করিয়াছেন।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ভারতের শাসনতন্ত্রে বর্ণিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক আদর্শকে একটি জাতীয় কর্মসূচীর মাধ্যমে রূপায়িত করা ; ইহা দেশের প্রয়োজন ও সম্পদের ভিত্তিতে করিতে হইবে। উন্নয়নের গতি নির্ভর করিবে প্রধানতঃ দেশের শাসন-ব্যবস্থার উৎকর্ষের উপর, অর্থাৎ ইহা যে পরিমাণ যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পারিবে এবং যে পরিমাণ জনসহযোগিতা আদায় করিতে পারিবে।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দ্রুত অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য কর্মক্ষেত্রের সর্বত্র নেতৃত্বের প্রয়োজন।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারগঠনকারী রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং শাসনব্যবস্থা পরিচালনকারী সরকারী কর্মচারী, একে অন্যের পরিপূরক কার্য করিবেন। রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষকে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে জনসাধারণের প্রয়োজন কী কী, তাহারা কী চায় এবং কীভাবে সে দাবী মিটানো যাইতে পারে। এ কারণ কর্মক্ষেত্রের সর্বত্র সুষ্ঠু নীতি ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারণের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে এবং লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে সেগুলি নিশ্চিতভাবে সহিত অনুসৃত হয়। সরকারী কর্মচারীদের প্রধান ভূমিকা হইবে সরকার-নিরূপিত নীতির অনুসরণ এবং কর্মসূচীর রূপায়ন।

গত কয়েক বৎসরে শাসকমণ্ডলীর কর্তব্যকর্মের মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়াছে ও অভিজ্ঞ সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে ; এইজন্য গুরুদায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত কর্মচারীদের অত্যন্ত কাজের চাপ বাড়িয়াছে। কমিশন বলেন দেশের বর্তমান সরকারী কর্মচারীদের, বিশেষতঃ উচ্চপদস্থদের সম্মুখে ব্যক্তিগতভাবে ও দলগতভাবে এমন একটি শাসনসংস্থা প্রতিষ্ঠার ও জনসেবার ঐতিহ্য সৃষ্টির এমন একটি সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে এবং তাঁহাদের উপর এমন গুরু দায়িত্বভার বর্তিয়াছে যাহাতে জাতীয় কর্মসূচীর সার্থক রূপায়নের মাধ্যমে তাঁহারা জাতির ভাবী অগ্রগতির সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিতে পারিবেন।

দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে ঐক্য, কার্যকারিতা, অর্থনৈতিক উন্নতি ও জনসহযোগিতা লাভ। এই সমস্ত উদ্দেশ্যগুলি পরস্পর সংশ্লিষ্ট এবং কতকাংশে পারস্পরিকভাবে নির্ভরশীল। একটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অবলম্বিত উপায় অপরগুলি পাওয়ার পথে সাহায্য করিবে।

সরকারী কার্যের যে কোনো ক্ষেত্রে ঐক্য বিধান করিতে না

পারিলেই সমগ্র শাসন ব্যবস্থার কাঠামোটি দুর্বল হইয়া পড়িবে এবং জনসাধারণ শাসন ব্যবস্থায় আস্থা হারাইবে। সুতরাং শাসন ব্যবস্থায় ও জনজীবনের সর্বপ্রকার দুর্নীতির সহিত অবিরাম সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইবে।

সরকারী দপ্তর যখন পরম দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া পড়িয়াছে তখন গণতান্ত্রিক সরকারের স্বার্থেই সমাজ জীবনে যথাসম্ভব আদর্শ বজায় রাখিবার জন্য উপায় অবলম্বন করা উচিত। এই উদ্দেশ্যে এমন একটি ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা কর্তব্য যাহাতে যে কোনো পদস্থ ব্যক্তির বিরুদ্ধে অসাধুতার অভিযোগ আনীত হইলে সে বিষয়ে যথোচিত অনুসন্ধান করিতে পারা যায়।

প্রয়োজনীয় ঐক্য

দেশের শাসন ব্যবস্থায় অধিকতর ঐক্যের আদর্শ বিধানের জন্য পরিকল্পনায় যে সমস্ত নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটি বিবৃত হইল :

(১) যেখানে কোন সরকারী কর্মচারীকে সরাসরি দুর্নীতিপরায়ণতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা যায় না অথচ দেখা গেল তাহার কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় সহসা ধনী হইয়া উঠিয়াছে,—দুর্নীতি দমন আইনের ক্ষমতা এইরূপ ক্ষেত্র পর্যন্ত সম্প্রসারণের বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে।

(২) প্রত্যেক সরকারী কর্মচারীকে প্রতি বৎসরান্তে তাহার নিজস্ব ও নিকট আত্মীয়ের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ দাখিল করিতে হইবে।

(৩) যে সমস্ত কর্মচারীর সাধুতার খ্যাতি নাই তাহাদিগকে কখনই এমন পদে বহাল করা উচিত নয়, যেখানে বিচক্ষণতার প্রয়োজন।

(৪) কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ পুলিশ বাহিনীকে এমনভাবে সুগঠিত করিতে হইবে যাহাতে তাহাদের ক্রিয়াকলাপ শুধু কেন্দ্রে কৃত অপরাধের অনুসন্ধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে; প্রয়োজনানুসারে তাহারা রাজ্য সরকারকেও সাহায্য করিতে পারে অথবা রাজ্য সরকারের পুলিশ বাহিনীর পরিবর্তে কার্জ করিতে পারে।

(৫) শাসনতান্ত্রিক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণকে জনসাধারণের সহিত এমন সামাজিক ব্যবহার করিতে হইবে যাহাতে জনসাধারণ তাহাদের নিঃস্বার্থপরায়ণতা ও অপক্ষপাতিত্বের বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ আস্থা স্থাপন করিতে পারে।

দুর্নীতি দমন

উপরিউক্ত পন্থানিচয়ের অনুসরণ এমন অবস্থা সৃষ্টির সহায়তা করিবে, যে অবস্থা রাজ্যগুলি উচ্চস্তরের ঐক্য বিধানে সমর্থ হইবে। দুর্নীতি দমনের প্রধান অস্ত্র হইবে শাসন ব্যবস্থার সমস্ত বিভাগের কার্যকারিতা বৃদ্ধি। এই দিক হইতে বিবেচনা করিয়া এইরূপ নির্দেশ দেওয়া হইল :

(১) বিভাগীয় প্রধানগণ সম্ভাব্য দুর্নীতি প্রবেশের পথগুলিকে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টির মধ্যে রাখিবেন এবং এজন্য স্পষ্ট নির্দেশ দিবেন ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন।

(২) কোন দরখাস্ত অথবা বিষয়ের বিলম্বিত মীমাংসা দুর্নীতি প্রবেশের একটি প্রধান পথ। সুতরাং কোন ব্যাপারের মীমাংসায় বিলম্বের হেতু পরীক্ষা করিয়া তদানুসারে কাজ করিতে হইবে।

(৩) যে সমস্ত পদের অধিকারীদের দুর্নীতিপরায়ণ হইবার অধিকতর সুযোগ আছে সেই সমস্ত পদের জন্য ব্যক্তি নির্বাচনে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

(৪) সৎ ও যোগ্যতাসম্পন্ন কার্যকে পুরস্কৃত করিবার জন্য এবং অযোগ্যতা ও অসাধুতার শাস্তিবিধানের জন্য নিশ্চিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

দুর্নীতিনিরোধের জন্য জনমত জাগ্রত করা এবং শাসন ব্যবস্থায় ঐক্য বজায় রাখিবার জন্য জনসহযোগিতা লাভ করা একান্ত প্রয়োজনীয়।

শাসনযন্ত্রটি এই কার্যের উপযোগী হইতে হইলে কর্মধারার নানা পরিবর্তন করিতে হইবে এবং নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া কাজ করিতে হইবে।

সরকারী কার্যাবলীর সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে নিম্নলিখিত ব্যাপারে বর্তমানের কর্মচারী-নিয়োগ বন্দোবস্তেরও অদলবদল করিতে হইবে :

(১) অর্থনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্র,

(২) সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান (প্রয়োজনীয় কর্মচারী নিয়োগের প্রশ্ন বর্তমানে বিবেচনাধীন) ; এবং

(৩) জেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা সংক্রান্ত কার্যাবলী, ভূমি সংস্কার এবং খাদ্য নিয়ন্ত্রণ। প্রধানতঃ এই সমস্ত দায়িত্বের ভার জেলাগুলির উপর থাকিবে।

প্রথমোক্ত বিষয়ের জন্য পরিচালনতন্ত্রের জন্য উপযুক্ত অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মচারী বহাল একটি সমস্যা। এই উদ্দেশ্যে নির্দেশ দেওয়া যায় যে—

(১) উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন অথবা অর্থনীতিতে বিশেষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে সরকারী পরিচালন সংক্রান্ত কার্যে নিয়োগ করিতে হইবে।

(২) কিছুসংখ্যক নিম্নপদস্থ অফিসার নির্বাচনপূর্বক তাহাদের চাকুরীর প্রথম জীবনে অর্থনীতি বিষয়ক শিক্ষা দিতে হইবে ; এবং

(৩) উচ্চপদস্থ অফিসারদিগের বেলায়, প্রয়োজন অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যাঙ্ক, শিল্প প্রভৃতি অপরাপর ক্ষেত্র হইতে বিশেষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে সরকারী চাকুরীতে বহাল করিতে হইবে।

জনসহযোগিতা

পরিকল্পনা রচনার পিছনে জনসহযোগিতা ও জনমতই প্রধান শক্তির উৎস। সরকারী দপ্তরগুলি যদি জনসাধারণের প্রকৃত ভূমিকা কী তাহা জানিয়া উৎসাহিত না হয় এবং তাহাদের সক্রিয় সাহায্যের জন্য আগ্রহান্বিত না হয় তাহা হইলে কোন পরিকল্পনাই কার্যকরী করা সহজ হইতে পারে না। জনসহযোগিতা বলিতে পরিকল্পনায় যে ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহা দলগত অনৈক্যের ঊর্ধ্বের জিনিস। গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে কোন পরিকল্পনাকে বাস্তবোপযোগী করিতে হইলে প্রথমেই জনমনে এরূপ বিশ্বাস উৎপাদন করা প্রয়োজন যে, তাহাদের রাষ্ট্র এমন এক সমাজ ব্যবস্থা রূপায়নের জন্য চেষ্টিত যেখানে আর্থিক অসাম্য অনেকাংশে দূরীভূত হইবে ও সকলের জন্য সমান সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা হইবে। এইভাবে দলগত স্বার্থ দূরে সরিয়া যাইবে এবং সমগ্র জাতির সাধারণ লক্ষ্যগুলি একসূত্রে গ্রথিত হইয়া যাইবে।

পরিকল্পনার লক্ষ্যগুলি সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানবিস্তার ইহার সার্থক রূপায়নের জন্য একান্ত প্রয়োজন। এই বিষয়ে প্রতিভাবান লেখক, শিল্পী ও সংবাদপত্রের সহযোগিতালাভ করিতে হইবে। এবং বেতার, ফিল্ম, গান ও নাটকের মাধ্যমে ইহার প্রচার করিতে হইবে। এই পরিকল্পনা যে জনসাধারণের প্রয়োজন-পূরণ ও সমস্যা সমাধানের জন্য রচিত ইহাই হইবে প্রচারের বিষয় এবং ইহার বিবরণের জন্য সহজ সরল ভাষায় পুস্তিকা রচনা করিতে হইবে। সমগ্র জাতীয় পরিকল্পনা ও রাজ্য পরিকল্পনাকে জেলা, সহর, গ্রাম প্রভৃতি স্থানীয় ভিত্তিতে বিভক্ত করিবার কাজ ইতোমধ্যেই সুরু হইয়া গিয়াছে এবং শীঘ্রই উহা সারা করিতে হইবে। স্থানীয় ভিত্তিতে কর্মসূচী রচনা করিতে পারিলেই তবে স্থানীয় নেতৃত্ব ও জনশক্তি যথাযথ ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে। তখন পরিকল্পনা দেশের সর্বত্র সংগঠনী কার্যের কেন্দ্রস্থলরূপে পরিণত হইয়া জনসাধারণের প্রচেষ্টায় আরও সুদৃঢ় হইতে পারে। এইভাবে জনসাধারণকে পরিকল্পনার অংশীদার করিয়া তোলা চলে এবং তখন তাহারাও ইহার কর্মসূচী রচনা ও রূপায়নের প্রত্যেক স্তরের সহিত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা করিতে পারে।

আগে চলার গান

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

মুসাফির! মুসাফির!
চল ভাই মুসাফির!
ফিরে ফিরে কেন চাস্ পিছনে?

আগে চল্, আগে চল্
পিছু ফিরে কিবা ফল?
রে পথিক! পথহারা বিজনে।

আগুয়ান, আগুয়ান,
আগে চল্ রে যোয়ান!
যেতে চায় দুনয়ান সেদিকে
রাত্রির অবসান
সুরু হ'ল দিনমান
বন্ধুর সন্ধান যেদিকে।
কুচি কুচি পাথরের
কাঁটা হেন পথে ঢের
ফোটে পা'য় বজ্রের মত সে
সারা গায় অবসাদ
সব সাধে সাধে বাদ
ভীরুতায় জড়তায় আলসে।

হুঁসিয়ার মুসাফির!
মনোরথ-সিদ্ধির
আসেনিক আসেনি রে সুসময়
আছে দূর, কিছু দূর
পর্বত বন্ধুর
ধীর পায়ে উঠে পড় কি বা ভয়?

মেঘ-ঝড়-ঝঞ্ঝায়
ভয় নাই সন্ধ্যায়
সন্ধ্যার পরে চাঁদ উঠ্‌বে
আনন্দে উজ্জ্বল
পৃথিবীর পরিমল
রজনীগন্ধা হ'য়ে ফুটবে।

মুসাফির তৎপর
নাই ডেরা নাই ঘর
কোন টানে পিছু টান লাগে তোর?

কিছু নাই, নাই কিছু
কেন মিছে চাস্ পিছু
কত হ'ল দিন-শেষ নিশি-ভোর।
আসেনিক অবসর
আসেনিক সুসময়
মুক্তির তীর্থের
মেলে নাই পরিচয়
সুরু পথ সারা হয় যেখানে।
আসেনিক পাশে কেউ
বাসেনিক ভালো কেউ
কোনো সুখ স্বপনের খেয়ানে।

দূরে ঐ কালো মেঘ
বাত্যায় বাড়ে বেগ
ঢেকে যায় নীলাকাশ ধূলাতে
গিরি-মরু-প্রান্তর
হেরি কেন মন্থর
মনে তোর কোন-রঙ্ বুলাতে?
বাধা হেরে ভীরু জন পায় ভয়
কেশরীর মত বীর চায় জয়
ক্ষতি হোক ক্ষত হোক মানে না
ক্লান্তি ও অবসাদ
ভ্রান্তি ও পরমাদ
হতাশা হতাশ্বাস জানে না।
চল ভাই মুসাফির!
চল ভাই দরবেশ!
সন্ত-ফকির-পর (ম্) হংস!
পদ্মপত্রে নীর
পরমায়ু হয় শেষ
মন বিনা মনোরথ ধ্বংস।
জ্যোৎস্নার হাসি নয়
বিজলীও জ্বালাময়
চপলা ও থির নয় এক পল
বজ্রের গরজন
বাঁধি নিয়া হিয়া মন
চল চলি চলিবি অচঞ্চল।
কেন বুক থরথর
কিসের আতঙ্ক?
সাহসে করিয়া ভর—
হও নিঃশঙ্ক—
সৃষ্টির সূচনাই
প্রলয়ের ইঙ্গিত
হাসি মুখে চল ভাই
চলি নিশ্চিন্তিত—
ভরসায় ভর করা চাই আজ;
দস্তুর মৃত্যুর
পরিচয় নিষ্ঠুর
পল্‌কা ও দেহপুর
প্রাণ ক্ষণ ভঙ্গুর
বুকে এঁকে রাখ তুই
আঁখি দুটী বন্ধুর
হবে জয় নাই ভয় নাই লাজ।
মুসাফির! চল বীর!
ঊর্ধ্বে তুলিয়া শির
তার পানে চেয়ে বল কিনা সয়?
তীর্থের মন্দির
তপস্যা সিদ্ধির
দূর নাই দূর কর সংশয়।

সম্পাদকীয়

এবারের নিখিলভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন

এ বৎসর নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন (প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন)-এর অধিবেশন কটকে অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। উড়িষ্যা বাংলার নিকটতম রাজ্য হইলেও এ পর্যন্ত এই রাজ্যে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় নাই। অথচ উড়িষ্যা ও আসামের সঙ্গে বাংলার লিপি-বিজ্ঞানের আকৃতিগত মিলের মাধ্যমে এই তিনটি ভগ্নী-সদৃশ্য রাজ্যের পারস্পরিক সংযোগ আশৈশব। একসময় বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম প্রভৃতি রাজ্যের শিক্ষানীতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রবর্তিত হইত। এতদ্ব্যতীত পুরী, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি হিন্দুর পুণ্যভূমিতে তীর্থ ব্যপদেশে, কেহ বা বাৎসরিক স্বাস্থ্য পরিবর্তনের মানসে অথবা উড়িষ্যার প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত অপরূপ শিলাভাস্কর্যের চিরন্তন আকর্ষণে, কেহ বা জীবনের শেষভাগে অবসর যাপনের উদ্দেশ্যে বা সরকারী কার্যে কিম্বা অন্যাবিধ প্রেরণায় বাংলা দেশের জনপ্রবাহ বহু শতাব্দী পূর্ব হইতে এ রাজ্যে আগমন করিয়াছে। উড়িষ্যাবাসীও সর্বকার্যে চিরকাল বাংলার সঙ্গে আত্মিক যোগাযোগ ও আদানপ্রদান রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। এইসব দিক হইতে এ বৎসর উড়িষ্যার কটক সহরে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন আহূত হওয়ায় বাংলা ও উড়িষ্যার সেই আশৈশব প্রীতি যে আরও বহুগুণে বর্ধিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নীলাচল-বাসের সময় সমগ্র ভারত আসিয়া একদা উড়িষ্যায় ভিড় করিয়াছিল। সে একটা একত্রীভূত সামগ্রিক জীবনধারার দিন গিয়াছে। প্রসঙ্গতঃ শ্রীসরলাবালা সরকারের রচনা হইতে কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করিয়া বলা যাইতে পারেঃ—'মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম গ্রহণ করেন, তখন জননী শচী দেবীর ইচ্ছানুসারে তিনি পুরীধামে বাস করিয়াছিলেন। উড়িষ্যা যাত্রার সময় আঠারো নালার পথ হইতে শ্রীমন্দিরের চূড়া যেমনি দেখিতে পাইলেন; অমনি তিনি ভাবে বিভোর হইলেন, তিনি যেন দেখিতে পাইলেন মন্দিরের চূড়ার উপর দাঁড়াইয়া—কৃষ্ণবর্ণ শিশু এক মুরলী বাজায়।'—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে মধ্য খণ্ডে মহাপ্রভুর এই নীলাচল-বাসের বর্ণনা বিস্তারিতভাবে লিখিত আছে। এক হিসাবে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এই বর্ণনাকে ইতিহাসও বলা যাইতে পারে।'

প্রকৃতপক্ষে মহাপ্রভুর এই কাল হইতে বাংলা ও উড়িষ্যার মধ্যে একটা ধর্মীয় সম্বন্ধও বিশেষভাবে গড়িয়া ওঠে। পুরীর রথযাত্রা কিন্তু কেবল উড়িষ্যাবাসীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিল না, বাঙালীকেও তাহা একান্তভাবে প্রভাবিত করিল, ভুবনেশ্বরের মন্দির উড়িষ্যার ভৌগোলিক সীমার মধ্যে থাকিয়া বাঙালীকেও সমভাবে আকর্ষণ করিল, পুরীর সমুদ্র দেখিয়া বাংলার কবিই সর্বপ্রথম তাহাকে সাহিত্যে রূপায়িত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

'হে আদি জননী সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার,
একমাত্র কন্যা তব কোলে তাই তন্দ্রা নাহি আর
চক্ষে তব। তাই বক্ষ জুড়ি সদা শঙ্কা, সদা আশা,
সদা আন্দোলন।'...

এতদ্ব্যতীত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি মনীষীশ্রেষ্ঠ কবি, ঔপন্যাসিক ও ঐতিহাসিকবৃন্দ দীর্ঘকাল কার্যব্যপদেশে উড়িষ্যায় বসবাস করিয়া অমর কীর্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন। উড়িষ্যা তাহার স্নেহশীতল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে তাঁহাদের মননক্ষেত্রকে মধুর করিয়া তুলিয়াছে। সর্ব দিক হইতেই তাই দেখা যাইবে—বাংলা ও উড়িষ্যার মধ্যে আশৈশবের ভগ্নী-সম্বন্ধটি ক্রমেই গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছে।

উড়িষ্যার সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক ঐতিহ্যও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার মতো। ১৯৩৬ সনে এখানে ছিল সর্বশুদ্ধ ৮৬৯৮টি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। ইহার মধ্যে ৪টি আর্ট কলেজ, ১টি আইন কলেজ, ৩৪টি উচ্চ বিদ্যালয়, ১৮১টি মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়, ৭৫৬৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও অন্যান্য স্কুল। মোট ছাত্রের সংখ্যা ছিল ৩,৩০৬৩৯ ; ইহার মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যাই হইতেছে ৬১,২৪৯ জন। ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কুলের সংখ্যা ছিল ১০টি, উহাতে ছাত্রসংখ্যা ছিল ২৩৪

জন। উচ্চতর কারিগরী শিক্ষা ও মেডিক্যাল কোর্স পড়িবার জন্য অন্যপ্রদেশে যাইতে হইত। প্রদেশে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। বর্তমানে উড়িষ্যায় আছে ১৯টি কলেজ, ১৩৯টি উচ্চ বিদ্যালয়, ৪৪৭টি মাইনর স্কুল, ৭৪২টি উচ্চ প্রাথমিক স্কুল, ৮৪৪০টি নিম্ন প্রাথমিক স্কুল; একটি উচ্চতর ও ৩৬টি নিম্নতর বুনিয়াদী শিক্ষা স্কুল আর ৫২২টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র। টেকনিক্যাল স্কুলের সংখ্যা হইবে প্রায় ৩০টি। সরকারের শিক্ষাব্যয় ১৯৩৭-৩৮ সাল হইতে বৃদ্ধি করা হইয়াছে শতকরা ৪৮২ ভাগ। (হিন্দীকেও অবশ্য পাঠ্য হিসাবে গণ্য করা হইয়াছে)। ছাত্ররা যাহাতে প্রাথমিক সামরিক শিক্ষা পাইতে পারে, তজ্জন্য স্কুলে ও কলেজে বন্দোবস্ত করা হইয়াছে এবং দুই ডিভিসন জাতীয় রক্ষী বাহিনী গঠন করা হইয়াছে। বর্তমানে উড়িষ্যাতে একটি মেডিক্যাল কলেজ, ৩৩৯টি হাসপাতাল ও ডিস্পেনসারী, ১টি আয়ুর্বেদীয় কলেজ ও ১টি টি-বি স্যানাটোরিয়াম আছে। কটক মেডিক্যাল স্কুলকে কলেজে পরিবর্তিত করা হইয়াছে এবং কলেজটি উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত। এতদ্ব্যতীত কৃষি ও খাদ্যশস্যের দিক হইতে প্রায় ১৪০০টি অনাবাদী জমিতে চাষ করা হইতেছে। ৯৫১টি ছোটখাটো সেচ-ব্যবস্থাকে কার্যকরী করা ছাড়াও ৩টি বড় সেচ পরিকল্পনায় হাত দেওয়া হইয়াছে। রাজ্যে শিল্প ও কুটীর শিল্পোন্নয়নের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাপড়ের কল, সিমেন্ট ফ্যাক্টরী, রিফ্রেজেটার তৈরীর কারখানা, বনস্পতির কারখানা প্রভৃতি নির্মাণের চেষ্টা চলিতেছে। কুটীর শিল্প হিসাবে খাদি এখানে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছে। রাজ্যের আদিবাসীদের অবস্থার উন্নতির জন্যও নানারূপ বন্দোবস্ত করা হইতেছে। স্বাধীনতালাভের পর কতকগুলি পার্শ্ববর্তী দেশীয় রাজ্য উড়িষ্যার সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় ইহার আয়তনের সঙ্গে সঙ্গে সম্পদও অধিক পরিমাণে বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। শরণার্থীদের পুনর্বসতির ব্যাপারে এ পর্যন্ত উড়িষ্যা বহুলাংশেই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে। পূর্ব-বঙ্গের প্রায় ৩০ হাজার গৃহচ্যুত শরণার্থীদের দায়িত্ব উড়িষ্যা সরকার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন।

এই দিক হইতেও আজ আবার নতুন করিয়া যে উৎকল-বঙ্গের সামঞ্জস্য দেখা দিয়াছে—ঐতিহাসিক ভিত্তিতে তাহার মূল্য কমখানি নয়। মহা ভারতের বিজয়-বৈজয়ন্তীতে নিনাদিত সঙ্গীত প্রতিমুহূর্তেই আমাদের কানে আসিয়া বাজিতেছে—

…'পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশীষ মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণমঙ্গলদায়ক জয়হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা।'…

উড়িষ্যার কটক সহরে তাই এবারে নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন হওয়ায় ভারতীয় ঐতিহ্যেরই একটি বিশেষ দিক যেন আজ স্পষ্ট প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছে। সম্মেলনের পক্ষ হইতে যে বিষয়গুলি সম্পর্কে ঘোষণা করিয়া বলা হইয়াছে, সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে উহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:

নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অন্যতম কর্ম-সূচী হিসাবে বিশেষভাবে উৎকল-বঙ্গের কৃষ্টি সমন্বয়ে পরিপুষ্ট সাহিত্য ও শিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ করিয়া একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। আগামী ২৪শে হইতে ২৬শে ডিসেম্বর তিনদিনব্যাপী সম্মেলনের সঙ্গে এই প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইবে। প্রদর্শনীতে যথা-সম্ভব নিম্নোক্ত বিষয়াদি ও দ্রব্যরাশি সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হইতেছে, যথা: (১) প্রাচীন সাহিত্য সম্পর্কিত উড়িয়া হরফে রচনাবলী সংগ্রহ—প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত, কোথাও বা পাণ্ডুলিপিতে উভয় পর্যায়ে প্রাচীন পুঁথি, রামায়ণ-মহাভারত, পুরাণোক্ত পুরাতন কাহিনী, গ্রাম্য গাথা ইত্যাদি। (২) বাংলা ও উড়িয়া সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ও ইতিহাস সম্পর্কিত তালিকা পরিচয়, সম্ভব হইলে পুস্তকাদি—যথা নাটক, প্রবন্ধ, কবিতা, ইতিহাস, শিলা, বিজ্ঞানাদি বিষয়ের প্রদর্শন। লেখক-লেখিকাদের পরিচয়, সংক্ষিপ্ত জীবনী, ফটো চিত্রাদি। (৩) উড়িষ্যাতে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে থাকাকালীন বাঙালী সাহিত্যিকগণের রচনাবলী, পুস্তক বা পত্রাদি সংগ্রহ, ইহাদের ইতিহাস, রচনাবলীর স্থান ও সময় নির্দেশ, তখনকার ও বর্তমান অবস্থার বর্ণনা ইত্যাদি। (৪) বাংলা সাহিত্যে উড়িষ্যা সংক্রান্ত বিষয়াদি, বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস পুস্তকাদিতে মাসিক, দৈনিক বা সাময়িক পত্রাদিতে, চিঠিপত্রের গুচ্ছে, ভ্রমণ কাহিনী প্রভৃতিতে উড়িষ্যার জীবন, সাহিত্য, শিল্পকলা, ভাস্কর্য, মনোরম প্রকৃতির বর্ণনা বিষয়াদি ও চিত্রাদির সমাবেশ। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাদি কর্তিত আকারে দিলেও চলিবে। (৫) বাঙালী ও উড়িয়া চিত্রশিল্পীদের অঙ্কিত নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ চিত্র-প্রদর্শনী। (৬) উড়িষ্যার নৈপুণ্যময় কলা ও কুটীর শিল্পাদির নিদর্শন, হস্তলিপি দ্রব্যাদির নমুনা, আদিবাসীদের শিল্প প্রভৃতি। (৭)

উড়িষ্যার প্রাচীন শিল্প ও ভাস্কর্যের, সম্ভব হইলে বাংলারও, নমুনা তাম্রলিপি, প্রাচীন মুদ্রা, চিত্রাদির সমাবেশ।—এই প্রদর্শনীর বিভিন্ন বিভাগের নিমিত্ত নূতন, পুরাতন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, প্রবন্ধ, চিত্র ও তথ্যসমূহ এবং শিল্পদ্রব্যাদির সংগ্রহকার্যে আমরা পশ্চিম বাংলার, উড়িষ্যার ও অন্যান্য রাজ্যের সাহিত্যিক, শিল্পী ও কৃষ্টি অনুরাগী সকল শ্রেণীর ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয় ও প্রতিষ্ঠানাদির কর্তৃপক্ষ সমীপে আবেদন জ্ঞাপন করিতেছি। বহু অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির আন্তরিক সহযোগ ব্যতিরেকে এইরূপ বৈচিত্র্যময় প্রদর্শনী অনুষ্ঠান সম্ভবপর হইতে পারে না।'—ইত্যাদি।

দল নির্বিশেষে প্রত্যেকটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানই এই প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়া সম্মেলনকে সার্থকমণ্ডিত করিয়া তুলিবেন, এইরূপ আশা করা বোধ করি মিথ্যা হইবে না। প্রসঙ্গতঃ সম্মেলনের উদ্যোক্তা ও কর্তৃপক্ষকে একটি বিষয় অনুরোধ করিব। সম্মেলন যাহাতে বাৎসরিক সম্মেলনেই মাত্র পর্যবসিত না হইয়া উহার মাধ্যমে একটা বিশেষ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে পারে, শুধু সর্বভারতীয় ভিত্তিতেই মাত্র নয়, পৃথিবীর যেখানে যত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আছে, তাহার সঙ্গে আন্তরিক যোগাযোগ রক্ষা করিয়া কৃষ্টির এক নতুন দীপালোক প্রজ্বলিত করিয়া তুলিতে পারে, এবং যাহাতে প্রত্যেকের জন্য প্রত্যেকের একটা সহানুভূতিশীল হৃদয়বত্তা সর্বদা প্রসন্ন সূর্যের মতো কাজ করে, তাহার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে। অন্যথায় বহুতর অর্থ ব্যয় করিয়া প্রতি বৎসর শুধু সম্মেলন আহবান করিলে তাহা মাত্র কয়েকদিনের জন্য জাঁকজমক ও ভ্রমণ-বিলাসের মধ্যেই পর্যবসিত হইবে, বৃহত্তর জাগতিক পরিবেশের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের উন্নততর অগ্রগতির কাজ বড় বেশী সাফল্যমণ্ডিত হইবে না।

এতদ্ব্যতীত আর একটি বিষয় সম্পর্কে আমাদের কিছু বলিবার আছে। এই সম্মেলন হইতে সঙ্গীতকে প্রায় পুরাপুরি বর্জন করাই হইয়াছে। অথচ বাংলাসাহিত্য একদা সঙ্গীতধর্মের ভিত্তিতেই মাধুর্যরসে রসায়িত হইয়া উঠিয়াছে। চণ্ডিদাস, জ্ঞানদাস হইতে সুরু করিয়া রামপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, নজরুল ইস্‌লাম ও দিলীপ রায় পর্যন্ত প্রত্যেকেই তাঁহাদের স্ব স্ব গীতিসাহিত্যকে ভিত্তি করিয়া খ্যাতির উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'গীতাঞ্জলির' জন্যই 'নোবেল লরিয়েট' হইলেন। বাংলার গদ্যসাহিত্য এখনও গীতিসাহিত্যকে অতিক্রম করিয়া বিশ্ব-চেতনাকে নাড়া দিবার সুযোগ পায় নাই। আলোচ্য সাহিত্য সম্মেলনের অঙ্গ হিসাবে সঙ্গীত-শাখাকে প্রতিবারই রাখা হয়, সত্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা প্রবন্ধধর্মী আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে; কিম্বা খুব বড়জোর কোনো কোনোবার উক্ত প্রবন্ধালোচনাকে গীতিআলেখ্যের পরিচিতির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। খাঁটি বাংলা গানের পূর্ণ প্রাধান্য কোনো সম্মেলনেই থাকে না। বাংলার লোকসঙ্গীত একটা বিরাট ব্যাপার; বাংলার বাউলের তুলনা সারা পৃথিবীতে নাই। তাহার মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতির একটা মহত্তর অঙ্কুর লুকাইয়া রহিয়াছে। সেগুলিকে একত্রে সংগ্রথিত করিয়া তাহার সার্থক রূপায়নের প্রয়োজন। তাহার সঙ্গে চণ্ডিদাস হইতে সুরু করিয়া অধুনাতম কবি পর্যন্ত নির্দিষ্ট বাছাই বাছাই গানের সংযোগে একটি স্বতন্ত্র অধিবেশনের দ্বারা নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনকে অধিকতর সাফল্যমণ্ডিত করা সম্পর্কে আমরা সম্মেলনের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আশা করি, তাঁহারা বিষয়টির উপর অবশ্যই গুরুত্ব আরোপ করিয়া এতদ্‌সম্পর্কে তাঁহাদের ভবিষ্যৎ কার্যসূচী রচনা করিবেন।

আমরা আসন্ন সম্মেলনের সর্বাঙ্গীণ কৃতকার্যতা ও সার্থকতা কামনা করি।

কলিকাতায় শিশুর জন্ম ও মৃত্যু

সম্প্রতি কলিকাতা সহরে শিশুর জন্ম ও মৃত্যুর যে তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়—বর্তমানে জন্মিবার এক বৎসরের মধ্যে প্রতি ছয়টির একটি শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কলিকাতা কর্পোরেশন অবশ্য আশা করেন যে, আগামী বৎসরের মধ্যে এই অবস্থার উন্নতি হইবে। কিন্তু গত দশ বৎসরের মধ্যে যে অবস্থার আদৌ উন্নতিকর পরিবর্তন দেখা গেল না, সহসা আগামী এক বৎসরের মধ্যে তাহা কিভাবে উন্নীত হইবে, ইহা স্বভাবতঃই চিন্তার বিষয়।

গত ১৫ই নভেম্বর পর্যন্ত বিগত দশ বৎসরের মধ্যে কলিকাতায় শিশুর জন্মসংখ্যা এবং জন্মিবার এক বৎসরের মধ্যেই শিশু-মৃত্যুর হাজারকরা হার এইরূপঃ

বৎসর	রেজিষ্ট্রীকৃত জন্ম	মৃত্যু	হার
১৯৪১	২৫৭৪৪	৪৬৯৯	১৮২·৫
১৯৪২	১৯৭১৩	৩৭১৫	১৮৮·৫
১৯৪৩	১৯৯৮৩	৯৭১৩	৪৯০·১
১৯৪৪	২২০৭৮	৯২৮০	৪২০·৩
১৯৪৫	৩১২০৬	৭৬৫০	২৪৫·২

১৯৪৬	৩২৮৩৪	৮২৯১	২৫২·৫
১৯৪৭	৩২৯৩৮	৯৬০১	২৯১·৫
১৯৪৮	৪২২৪৪	৯৭৮৯	২৩১·৭
১৯৪৯	৪৫৪৭৪	৯৯৯৯	২১৯·৯
১৯৫০	৫০৪২৪	১২২৫৫	২৪৩·০৪
১৯৫১	৬০০২৩	১০৬৭৮	১৭৭·৯
১৯৫২	৩৮৬৪০	৬৮৭৩	১৭৭·৯

পৌর কর্তৃপক্ষ নগরীতে যে সকল জন্ম রেজিষ্ট্রী করেন, প্রকৃত জন্মসংখ্যা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। পৌর কর্তৃপক্ষের কেহ কেহ মনে করেন—জন্ম রেজিষ্ট্রী করার ব্যবস্থার উন্নতি হইলে শিশুমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ১৭৮ হইতেও কম দেখা যাইবে।

কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে—জন্মের হার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কি এই মৃত্যুর হারও ঊর্ধ্বগামী হইবে না? এ পর্যন্ত যাহা দেখা যাইতেছে, তাহাতে অন্ততঃ তাহাই তো অনুমিত হয়। সকল সভ্য দেশেই এই জাতীয় মৃত্যুর হার প্রতিরোধের জন্য বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক গবেষক ও চিকিৎসকের গবেষণার মাধ্যমে গভর্ণমেণ্ট ও পৌর প্রতিষ্ঠান কার্যে অগ্রসর হন। এখানেও যতদিন অনুরূপ ব্যবস্থা না হইতেছে, ততদিন ইহার আদৌ কোনো উন্নতি পরিলক্ষিত হইবার সম্ভাবনা নাই। শিশু-মৃত্যুর একটি প্রধান কারণ হইতেছে পিতা-মাতার শারীরিক পুষ্টির অভাব। ইহার পরেও শিশুর খাদ্যের প্রশ্ন আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়া হইতে গত দশ বৎসরে এ দেশের খাদ্য সামগ্রীতে এত বেশী ভেজালের সৃষ্টি হইয়াছে—যাহা শিশুর জীবনীশক্তির পক্ষে হানিকর তো বটেই, পিতামাতার পক্ষেও একইরূপ ক্ষতিকারক। ভ্রূণ অবস্থায় মায়ের দেহ হইতে শিশু আহার্য সংগ্রহ করিয়া নিজ দেহকে রক্ষা করে। মা যেখানে নিজেই পুষ্টিহীনতার বিষে ও গ্লানিতে জর্জরিত, সেখানে শিশুর পরিণতি কি হইবে? যে সমাজব্যবস্থার মধ্যে মানুষ বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য লইয়া বলিষ্ঠ সন্তানকে মানুষ করিয়া তুলিতে পারে, বিগত মহাযুদ্ধের সুরু হইতে এদেশের সেই সমাজ ব্যবস্থা (কোনোকালেই অনুকূল ছিল না) একেবারেই ভাঙিয়া তচ্‌নচ্‌ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু স্বাধীন জাতীয় সরকারের প্রধান কর্তব্য হইতেছে তাঁহার নাগরিকবৃন্দের স্বাস্থ্যের বলিষ্ঠতা সংরক্ষণ করা। এ কাজে পৌর প্রতিষ্ঠানেরও সমান দায়িত্বই রহিয়াছে। আমরা আশা করিব, আমাদের গভর্ণমেণ্ট এবং কর্পোরেশন সহগামী চিন্তা এবং সংযুক্ত কর্মপ্রসূতা দ্বারা অবিলম্বে দেশ ও জাতির এই গ্লানি মুছিয়া দিতে অগ্রসর হইবেন।

একটি সংক্ষিপ্ত সংবাদ

একটি ছোট্ট সংবাদের উপর আমাদের পাঠকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করা বোধ করি অসমীচীন হইবে না। সংবাদটি কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারিগণের ভ্রমণের ব্যয় সম্পর্কিত। সংবাদটি এইরূপ ঃ

"নয়াদিল্লী, ৯ই ডিসেম্বর—সরকারী কর্মচারীদের সরকারী কাজে বিদেশে যাইবার সময়ে ভ্রমণ ও খাওয়াথাকার জন্য যে ভাতা দেওয়া হয়, অদ্য সকল রাজ্য পরিষদের অধিবেশনে ঐ সম্পর্কে আলোচনা হয়। —শ্রী বি সি ঘোষের প্রশ্নের উত্তরে সরকারী অর্থমন্ত্রী শ্রী এম্‌ সি শাহ এই সম্পর্কে এক লিখিত বিবৃতিতে বলেন, ১৯৫১-৫২ সাল পর্যন্ত এই বাবদ ১২২৬৫৪৯৬ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ১৯৪৭-৪৮ সালে ব্যয় হইয়াছে ২৩৬৬৭৩১ টাকা, ১৯৪৮-৪৯ সালে ২৫৫৫৮৪২ টাকা, ১৯৪৯-৫০ সালে ৪৫৮০৮২৩ টাকা, ১৯৫০-৫১ সালে ১২৬১১০০ টাকা এবং ১৯৫১-৫২ সালে ১৫০১০০০ টাকা। শ্রীঘোষ প্রশ্ন করেন, এই ব্যবস্থার সুযোগ লইয়া কর্মচারিগণ ক্লারজ, ডরমেণ্টার এবং অন্যান্য ফ্যাস্‌নেবল হোটেলে অবস্থান করিতেছেন, ইহা গভর্ণমেণ্ট জানেন কি?

শ্রীশাহ বলেন, অর্থমন্ত্রী সম্প্রতি বিদেশ হইতে ঘুরিয়া আসিয়াছেন। খাওয়া-থাকার ভাতা পরিবর্তন সম্পর্কে তিনি একটি প্রস্তাব করিয়াছেন এবং গভর্ণমেণ্ট ঐ নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। শীঘ্রই নূতন নিয়ম প্রবর্তিত হইবে।"

ভাবিতেছি—উক্ত নূতন নিয়ম প্রবর্তিত হইবে কি সরকারী কর্মচারীদের আরও ব্যয়স্বাচ্ছন্দ্যের ভিত্তিতে—না ব্যয় সঙ্কোচের উপায় হিসাবে? এদিকে দেশ যে ক্রমেই পরানুগৃহীত হইয়া ডুবিতে বসিল।

ভাষাভিত্তিক প্রদেশ-স্বাতন্ত্র্যে অন্ধ্রদেশ

স্বতন্ত্র অন্ধ্রপ্রদেশ গঠনের দাবীতে গত কিছুকাল যাবৎ ভারত সরকারের উপর যেরূপ হুমকি দেওয়া হইতেছিল এবং নেতৃস্থানীয় কাহারও কাহারও অনশনধর্মের মাধ্যমে যেভাবে এই দাবীকে ক্রমেই জোরালো করিয়া তোলা হইতেছিল, তাহার ফলে অন্ধ্র প্রদেশের স্বতন্ত্রীকরণ সম্পর্কে সম্প্রতি ভারত সরকার বিশেষ সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন। রাষ্ট্রপরিষদে আলোচনাপ্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরু বলিয়াছেন ঃ 'কেন্দ্রীয় সরকার এখনই অন্ধ্রপ্রদেশ গঠনে সম্মত আছেন, যদি অন্ধ্রপ্রদেশ গঠনের দাবীদারেরা কয়েকটি সর্তে সম্মত হন।' সর্ত কয়টি হইতেছে—(১)

মাদ্রাজ সহরের উপর অন্ধ্রপ্রদেশের দাবী সম্পূর্ণ ছাড়িতে হইবে ; (২) সম্পূর্ণ তেলেগুভাষী অঞ্চল লইয়া উহা গঠনে স্বীকৃত হইতে হইবে ; এবং (৩) এখন যাহা স্থির হইবে, তাহার বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে আর কোনো আন্দোলন করা হইবে না। খুব সম্ভব অন্ধ্রপ্রদেশ এই সর্ত গ্রহণ করিতে অবিলম্বেই স্বীকৃত হইবেন এবং অচিরেই স্বতন্ত্র অন্ধ্রপ্রদেশ গঠিত হইয়া যাইবে। উক্ত তিনটি সর্ত ভিন্ন আরও দুইট বিষয় বিবেচ্য ছিল। অন্ধ্রপ্রদেশ গঠনের প্রস্তাব বিবেচনার জন্য নিযুক্ত 'দর কমিটি' ইতিপূর্বে দুইটি অসুবিধার প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন, একটি—'পৃথকভাবে গঠিত অন্ধ্রপ্রদেশের আর্থিক অসচ্ছলতা এবং শাসনকার্য চালাইবার অর্থাভাব', দ্বিতীয়টি—'প্রস্তাবিত অন্ধ্রপ্রদেশের যে অংশকে 'রয়ালসীমা' বলে, সেই অংশের অধিবাসীদের পৃথক অন্ধ্রপ্রদেশ গঠনে অসম্মতি'। এই অসুবিধাগুলি যে ইতিমধ্যেই মীমাংসিত হইয়া গিয়াছে, অনুরূপ সংবাদ অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নাই। এতৎসত্ত্বেও যখন ভারত সরকার স্বতন্ত্র অন্ধ্রপ্রদেশ গঠননীতিকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, তখন এইরূপ মনে করা হয়ত অযৌক্তিক হইবে না যে, স্বতন্ত্র অন্ধ্রের অতিরিক্ত দায় বহন করিতেও ভারত সরকার মনে মনে স্বীকৃত হইয়াছেন।

শুধু যে ভাষাভিত্তিক সমস্যাই অন্ধ্রের এই আন্দোলনকে এতদূর সম্প্রসারিত করিয়াছে, তাহা নয়, ইহার পিছনে রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপও প্রবল আকারে রহিয়াছে। স্বতন্ত্র অন্ধ্রপ্রদেশের ব্যবস্থায় কম্যুনিষ্ট দল পুলকিত হইয়া ঘোষণা করিয়াছেনঃ 'মাদ্রাজকে আপাতত বাদ দিয়াই স্বতন্ত্র অন্ধ্রপ্রদেশ গঠন করিতে হইবে এবং মাদ্রাজ-সহরের ভাগ্য নিরূপণ করিতে হইবে গণভোটের মাধ্যমে।' ভারত সরকার এ সম্পর্কে যে অবহিত না আছেন, এমন ধারণা করা ভুল।

সম্প্রতি অন্ধ্র রাজ্য গঠনের দাবীতে ৫৮ দিন অনশনের পর গত ১৫ই ডিসেম্বর অন্ধ্রনেতা শ্রীপত্তি শ্রীরামুলু মৃত্যু-মুখে পতিত হন। নিজের জন্মভূমি ও জাতির কল্যাণের জন্য এইরূপ আত্মত্যাগ বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে খুব একটা পাওয়া যায় না। শ্রীরামুলুর মৃত্যুর ফলে প্রায় এক হাজার দুর্বৃত্ত বিক্ষোভ-প্রদর্শনকারী ছাত্রদের সহিত যোগ দিয়া বিজয়বাড়া স্টেশনটি দখল করে। এতদ্ব্যতীত টেলি-গ্রাফ তার বিচ্ছিন্ন করা, নানা স্থানে অগ্নিসংযোজন প্রভৃতি ঘটনাও তীব্রভাবে ঘটিতে আরম্ভ হয়। অন্যদিকে বোম্বাই-য়ের একটি সংবাদে প্রকাশঃ অন্ধ্র রাজ্য গঠনের দাবীর পশ্চাতে বোম্বাইবাসী অন্ধ্রদের সমর্থন জ্ঞাপন এবং এই ব্যাপারে ভারত সরকারের উদাসীন মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য বোম্বাইর সমাজবাদী অন্ধ্র মহাজন সভার সেক্রেটারী শ্রীরাজারাম পাসকান্তি গত ১৬ই ডিসেম্বর হইতে অনশন আরম্ভ করিয়াছেন। শ্রীপাস-কান্তি বলেন যে, তাঁহার অনশন কবে শেষ হইবে, তাহার ঠিক নাই।

লোকসভায় বিরোধী দল ইহা লইয়া আলোচনা করিয়া সভাকক্ষ পরিত্যাগ করেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল

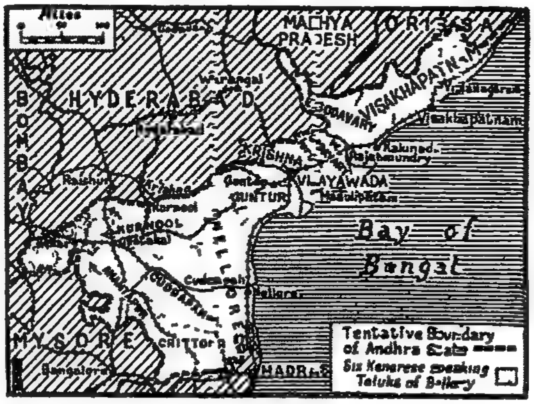

নেহেরু বলেন যে, অন্ধ্র রাজ্য গঠন সম্পর্কে এমন কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে যাহার ফলে পরে 'জ-ব-প' (জওহরলাল-বল্লভভাই-পট্টভি) রিপোর্টের ভিত্তিতে আরও আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হইবে।

কিন্তু সম্প্রতি অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে এ ব্যাপারে কালক্ষেপ মোটেই সহনীয় কিম্বা বাঞ্ছনীয় হইবে বলিয়া মনে করা যায় না। এই কথাটাও কেন্দ্রীয় সরকারকে অবহিত হইতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের দাবীর কথা নতুন করিয়া আর একবার ভারত সরকারের নিকট উপস্থিত করিলে বোধ করি অন্যায় হইবে না। পশ্চিমবঙ্গও ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের উদ্যোগে বিহারভুক্ত তাহার স্থানগুলি পুন-রায় ফিরিয়া পাইবার জন্য মুহুর্মুহুঃ আবেদন করিয়া আসিতেছে। প্রধানমন্ত্রী প্রতিবারই এ সম্পর্কে ভারত সরকারের অস্বীকৃতির কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—'এই জাতীয় কাজের দ্বারা জাতিকে শুধু দুর্বল করিয়াই দেওয়া হইবে এবং সেই সঙ্গে জাতীয় অগ্রগতিও ব্যাহত হইবে।' কিন্তু প্রশ্ন হইল এই যে, যদি অন্ধ্রকেই তাহার স্বাতন্ত্র্য দেওয়া সম্ভব হইল, তবে পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কেই বা তাহা সম্ভব হইবে না কেন? আমরা আশা করি, প্রধানমন্ত্রী তথা ভারত সরকার বিষয়টি সম্পর্কে বিশেষভাবে চিন্তা

করিয়া তাঁহাদের ভবিষ্যৎ রায় দানে উদ্যোগী হইবেন। অন্যথায় অন্ধ্রের অবস্থা পশ্চিমবঙ্গে ঘটিলেও হয়ত আশ্চর্যকর কিছু হইবে না।

সাঁচীতীর্থে বুদ্ধশিষ্যের পূতাস্থিসংরক্ষণ উৎসব

নূতন বিহারে ভগবান তথাগত বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য সারিপুত্ত ও মহামোগ্গল্লানের পূতাস্থি অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশ হইতে প্রায় ৫০ সহস্রাধিক নরনারী আসিয়া গত নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে সাচীর তীর্থক্ষেত্রে সমবেত হন। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মহাবোধি সোসাইটির সভাপতি ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরুও যথাসময়ে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া বক্তৃতা প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত ও আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের জন্য ভগবান বুদ্ধের আদর্শ—প্রেম—সহিষ্ণুতা ও করুণা—অবলম্বন করিতে বিশ্ববাসীকে আহ্বান জানান। তিনি বলেনঃ তরবারীর দ্বারা অর্জিত জয়লাভ যে স্থায়ী হয় না, বর্তমান যুগের কোলাহল ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে মানুষ তাহা বিস্মৃত হয়। কিন্তু হিংসার পথ অবলম্বন করিয়া উহার ফল স্বরূপ বিপর্যয় স্বীকার করিয়া লওয়া হইবে, না, ভগবান বুদ্ধ ও মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশিত পথ অনুসরণ করা হইবে, তাহা স্থির করিবার দিন আসিয়াছে। দুইটি মহাযুদ্ধ ঘটিয়া গেল, কিন্তু তদ্দ্বারা পৃথিবীর কয়টি সমস্যার সমাধান হইয়াছে? অস্ত্র ও গোলা-বারুদের সাহায্যে যে চিরন্তন জয়লাভ সম্ভবপর নহে, মানবচিত্তকে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াই যে তাহা অর্জন করিতে হয়, বিশ্ববাসী আজও তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না। কিন্তু ভারতবর্ষ—সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ও বহুযুগসঞ্চিত বিপুল গৌরবের অধিকারী আমাদের এই ভারতবর্ষ সেই সুমহান সত্যকে বিস্মৃত হইবে না এবং পৃথিবীর সর্বত্র শান্তির বাণী প্রচারের ব্রত গ্রহণ করিবে। —সম্রাট অশোক রণক্ষেত্রে পূর্ণ জয়লাভের পর তরবারী ত্যাগ করিয়াছিলেন। কেন না, তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তরবারীর দ্বারা প্রকৃত জয়লাভ সম্ভবপর নহে, প্রীতি ও ভালোবাসার দ্বারাই তাহা অর্জন করিতে হয়। ভগবান বুদ্ধের বাণীর মধ্যেই তিনি প্রগতি ও সমৃদ্ধির পথের সন্ধান পাইয়াছিলেন এবং সে-পথের কথা সকলকে জানাইয়া দেওয়া জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কোনো সম্রাট শান্তির জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন, বিশেষ করিয়া পৃথিবীর এক বৃহৎ অংশের উপর নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়া অক্লেশে তাহা বর্জন করিতে পারিয়াছেন, মানব ইতিহাসে এমন ঘটনা দুর্লভ। —আমাদের রাষ্ট্রীয় পতাকায় অশোকচক্র এবং জাতির প্রতীক হিসাবে অশোকস্তম্ভ গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু উহা নিছক একটি আকস্মিক ঘটনা নহে। বহু চিন্তা করিয়াই এগুলি গ্রহণ করা হইয়াছে। এ সকল প্রতীক শান্তির জন্য আমাদের আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে, শান্তির জন্য অবিরাম কাজ করিয়া যাইতে জনসাধারণকে আহ্বান জানাইতেছে। কীর্তিমান মহাপুরুষেরা যেপথ দেখাইয়া গিয়াছেন, ভারতবর্ষ সেই পথেই অগ্রসর হইতে চাহে এবং বিশ্বকে বিপর্যয়ের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সাধ্যমত সকল চেষ্টাই করিতে চাহে। ভারতের অশোকচক্রলাঞ্ছিত পতাকা পৃথিবীর সকল দেশের প্রতি প্রীতি ও বন্ধুত্বের পরিচয় দিতেছে এবং গৌরবময় অতীত সম্পর্কে প্রতি-মুহূর্তেই আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। বর্তমান অনুষ্ঠান বাহ্যতঃ পূতাস্থির স্বীয় আবাসে প্রত্যাবর্তনের অনুষ্ঠান। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহার গভীরতর তাৎপর্য রহিয়াছে। পূতাস্থি লইয়া শোভাযাত্রা করিয়া এখানে অগ্রসর হইবার কালে আমার বার বারই মনে হইয়াছে যে, হাজার হাজার বৎসর পূর্বে এই পথে অসংখ্য তীর্থযাত্রীর আনাগোনা চলিয়াছে, অসংখ্য মানুষের পদচিহ্নে এই পথ পবিত্র হইয়া রহিয়াছে। উহা কি দেশের প্রাচীন গৌরবের কথাই স্মরণ করাইয়া দিতেছে না? এই পূতাস্থির বৈশিষ্ট্য তখনই উপলব্ধি করা হইবে, যদি প্রত্যেক নরনারী স্বীয় হৃদয়ে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া সে মন্দিরে প্রাচীন যুগের স্মৃতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন। বর্তমান যুগের সংশয়াচ্ছন্ন পৃথিবীতে এ সকল সুপ্রাচীন স্মৃতিই তাঁহাদিগকে পথ দেখাইয়া নিবে।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেনঃ আমাদের জীবদ্দশায় পর পর দুইটি যুদ্ধে এই বিশ্ব চুরমার হইয়া গিয়াছে, তাহা সত্ত্বেও শঙ্কা, বিরোধ, সন্দেহের কালমেঘ দূর হইয়া যায় নাই। আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে গৌতম বুদ্ধ প্রেম, শান্তি ও মিলনের বাণী এমনভাবে উপস্থিত করিয়াছিলেন, যাহাতে শুধু জ্ঞানীজনই তৃপ্ত হন নাই, জনগণও তাহাতে আকৃষ্ট হইয়াছে। উহা বিশ্বের কোটি কোটি মানবকে তৃপ্তি, সান্ত্বনা দিয়াছে এবং উহা দূর দূরান্তরে প্রচার করিতে কোনো তরবারী বা সৈন্যবাহিনীর আবশ্যক হয় নাই। গৌতম বুদ্ধ দৈবাৎ ভারতের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেন নাই। স্মরণাতীত কাল হইতে এই দেশের শ্রেষ্ঠ পুরুষরা, ঋষি, মণীষীরা তাঁহাদের বাণী ও কর্মদ্বারা ভারতের প্রতিভাকে প্রতিফলিত করিয়াছেন। তাঁহারা

সমাজের প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষানুযায়ী এই দেশ ও বিশ্বকে আলোর সন্ধান দিয়া গিয়াছেন। যখন জাতির জীবনে বন্ধ্যাত্ব আসে, যখন ধর্মের বহিড়াম্বর সত্যিকার ধর্মের গতিশীলতা নষ্ট করিয়া দেয়, তখনই মহাপুরুষেরা আসিয়া উপস্থিত হন এবং ধ্বংস হইতে রক্ষা করেন।

এই ভাবেই আজ হইতে আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে ভারতভূমিতে ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি আসিয়া জগৎকে বিশ্বশান্তি ও বিশ্বমৈত্রীর বাণী শুনাইলেন। তাঁহারই পূর্ণ আদর্শে গঠিত দুই শিষ্য সারিপুত্ত ও মহামোগ্গল্লায়ন। তাঁহাদের পূতাস্থি সংরক্ষণের উৎসবের পিছনে ভগবান বুদ্ধেরই জীবনসাধনা ও আদর্শ বিশেষ ভাবে জাগ্রত রহিয়াছে। বিজ্ঞানের জয়যুক্ততার পথে পৃথিবী আজ ক্রমেই মৃত্যুর দিকে ধাবিত হইয়া চলিয়াছে। মানুষের জন্যই বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের জন্য মানুষ নয়; কিন্তু মানুষ সেই বিজ্ঞানকে মানবকল্যাণে ব্যবহার না করিয়া ধ্বংসকার্যে নিয়োজিত করিয়া চলিয়াছে। পৃথিবীর পর পর দুইটি মহাযুদ্ধই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আণবিক বোমার ভয়াবহত্ব আমরা বিগত মহাযুদ্ধেই লক্ষ্য করিয়াছি; বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে ইতিমধ্যে আরও তীব্রতর বোমার আবিষ্কার হইয়াছে; ইহার পরেও আছে 'মরণ-রশ্মি'। ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া আর-একদিকে চলিয়াছে বিশ্বশান্তি-পরিকল্পনা। কিন্তু যুদ্ধবিদ্রোহ বা বোমা-বারুদের দ্বারা যে বিশ্বশান্তি সম্ভব নয়, তাহা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। বিশ্বশান্তির পথ হইতেছে ভারতের শান্তি ও আদর্শের পথ। এই পথেরই প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন ভগবান বুদ্ধ। সাঁচীতে অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক উৎসবে উপস্থিত হইয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরু এবং ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ইহারই উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া উপরোক্ত যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহা একদিকে যেমন ঐতিহাসিক সত্য, তেমনি চমৎকারিত্বের দিক হইতেও মধুর। জনসাধারণ যদি ইহা উপলব্ধি করিয়া বিশ্বশান্তির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, তবেই ভগবান বুদ্ধ তথা সারিপুত্ত ও মহামোগ্গল্লানের আদর্শ সার্থক হইবে, ভারতের অন্তর-বাণীর পূর্ণ মাধুর্য বিকশিত হইয়া উঠিবে।

কাশ্মীর প্রসঙ্গ

কাশ্মীর সম্পর্কে ইতিপূর্বে ইঙ্গ-মার্কিন তরফ হইতে যে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, ভারত তাহা পুরাপুরি প্রত্যাখ্যান করেন বলিয়াই যথাসময়ে ঘোষিত হইয়াছিল। এতদ্-সম্পর্কে আমাদের গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় আমরা বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি। গত ৮ই ডিসেম্বর শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত নিরাপত্তা পরিষদকে ইহা জানাইয়া দিয়াছেন।

যুক্ত ইঙ্গ-মার্কিন প্রস্তাবটি গত ৫ই নভেম্বর নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপিত হয়। উক্ত প্রস্তাবে কাশ্মীরে যুদ্ধবিরতি সীমারেখার উভয় পার্শ্বে কি পরিমাণ সৈন্য থাকিবে, তৎবিষয়ে মতৈক্যে উপনীত হইবার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের সদর কার্যালয়ে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে অবিলম্বে মীমাংসা আলোচনা আরম্ভ করিতে অনুরোধ জানানো হইবে। রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতিনিধি ১৯৫২ সালের ১৩ই জুলাই তারিখের প্রস্তাবে এই সুপারিশ করিয়াছিলেন যে, যুদ্ধবিরতি সীমারেখার পাকিস্থান অধিকৃত অঞ্চলে তিন হাজার হইতে ছয় হাজার এবং ভারতীয় অঞ্চলে ১২ হইতে ১৮ হাজার সশস্ত্র সৈন্য থাকিবে।

শ্রীযুক্তা পণ্ডিত নিরাপত্তা পরিষদে তাঁহার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, পাকিস্তানী সৈন্য এবং উপজাতীয় হানাদারগণ কর্তৃক কাশ্মীর আক্রান্ত হইবার পর ভারত নিরাপত্তা পরিষদে অভিযোগ করে। ইহার পর পাঁচ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। পাকিস্তান যাহাতে হানাদারদিগকে সাহায্য দেওয়া বন্ধ করে এবং ভারতের বিরুদ্ধে এই আক্রমণাত্মক অভিযান হইতে বিরত হয় পাকিস্তানকে সেই মর্মে নির্দেশ দেওয়ার জন্য ভারত সরকার নিরাপত্তা পরিষদকে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। পাকিস্তান জোর গলায় এই আক্রমণের অভিযোগ অস্বীকার করিলেও ভারতের অভিযোগ পরে সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ পক্ষে পরবর্তী কয় মাসে ভারতের এই অভিযোগের জাজ্বল্যমান প্রমাণই পাওয়া গিয়াছে। পাকিস্তানের অস্বীকৃতি ও নির্দোষিতার সাফাই সত্ত্বে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের নিজেদের কথাতেই প্রকাশ পাইয়াছে যে, পাকিস্তানের নিয়মিত ফৌজও ১৯৪৮ সালের ৮ই মে তারিখে কাশ্মীর অভিযানে অংশ গ্রহণ করে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এই অহেতুক আক্রমণ দ্বারা যে রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদ ও আন্তর্জাতিক বিধি নির্লজ্জভাবে লঙ্ঘন করা হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

—এইরূপে পাকিস্তান আক্রমণে সাহায্য ও উৎসাহ দিয়াই সন্তুষ্ট না হইয়া প্রত্যক্ষভাবে আক্রমণকারী হইল। পাকিস্তান-সেনা আজও কাশ্মীর রাজ্যের এক বৃহৎ অংশ বলপূর্বক বেআইনীভাবে দখল করিয়া আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করিয়া যাইতেছে। এ পর্যন্ত এই ব্যাপারের মীমাংসা হয় নাই, কারণ সংঘর্ষের কারণ এখনও বজায় রহিয়াছে। উহা হইতেছে এই যে, পাকিস্তান এখনও জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের একটি বৃহৎ অংশ বেআইনীভাবে দখল করিয়া

রহিয়াছে। পরিষদ যদি সাহস ও দৃঢ়তার সহিত এই মূল সমস্যার সম্মুখীন না হইতে পারেন, তবে সমস্যার ন্যায়-সঙ্গত ও স্থায়ী মীমাংসা হইবে না।

এ সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদ এখনও অবহিত হইতে না পারায় নিজেদের অযোগ্যতারই পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহারা এখনও বিষয়গুলিকে জিলিপির প্যাঁচের মতো প্যাঁচাইয়া প্যাঁচাইয়া নিত্য নূতন প্রস্তাবের উত্থাপন করিয়া মূল সমস্যাটিকে অধিকতর ঘোরালো করিয়া তুলিতেছেন। আমাদের প্রশ্ন শুধু এই যে, এইরূপ খেলা তাঁহারা আর কতকাল খেলিবেন?

সিংহলে ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীরত্ননায়কের বিবৃতি

সিংহলে ভারতীয়দের অবস্থা সম্পর্কিত সমস্যা ইতি-মধ্যে আরও বহু দূর অগ্রসর হইয়াছে। এতদ্সম্পর্কে সিংহল ও ভারতের প্রধানমন্ত্রিদ্বয় শীঘ্রই এক বৈঠকে মিলিত হইয়া সমস্যা সমাধানের ভিত্তিতে পাকাপাকি আলোচনা করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। সম্প্রতি মাদ্রাজে বিবৃত সিংহলের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী এ, রত্ননায়কের এতদ্সম্পর্কিত ভাষণটিতে কিছু চিন্তা করিবার বিষয় আছে। তাঁহার বক্তব্য হইতেছে এই যে, সিংহলে ভারতীয়গণের প্রতি বর্তমানে যেরূপ উত্তম আচরণ করা হইতেছে, সম্ভবতঃ পৃথিবীর আর কোনো দেশেই সেরূপ করা হয় না।

ইহা অনেকটা পূর্ব-পাকিস্তান-সরকার-ব্যবহৃত বিবৃতিরই অনুরূপ। ইহার পিছনে ঐতিহাসিক সত্য কমই রহিয়াছে।

ভারতীয় ও পাকিস্তানী নাগরিক অধিকার আইনের সংশোধন সম্পর্কে শ্রীরত্ননায়ক বলেন, প্রচার ও ভুল বুঝাইবার ফলে ঐ বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। কমন-ওয়েল্‌থভুক্ত অন্যান্য দেশের মতো সিংহলও স্বাধীনতা লাভ করিলে সিংহলের যাহারা অধিবাসী নহে, তাহাদিগকে বাদ দিয়া কেবল সিংহলীদিগের জন্য নাগরিক অধিকার আইন প্রবর্তন করা হয়।

কিন্তু এ বিষয়ে যদি ভারতীয় পন্থা গ্রহণ করা হইত, তবে আজ আর এ সমস্যা দেখা দিত না; কিন্তু সিংহল গভর্নমেণ্ট এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে চিন্তা করিবারও অবকাশ পান নাই।

শ্রীরত্ননায়ক বলেন, সিংহলস্থ ভারতীয়গণের বিশেষ অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া উক্ত আইনে যে সমস্ত ভারতীয় প্রমাণ করিতে পারিবেন যে, উহারা সিংহলে স্থায়ী-ভাবে বাস করিতেছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে ইচ্ছাধীন ডোমি-সাইল অধিকারের ব্যবস্থা করা হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও সিংহলের পূর্বতন প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে বহু সাক্ষাৎকার ও পত্রালাপের পর উক্ত আইন প্রবর্তিত হয়। —উক্ত আইনে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে স্থায়ী বসবাস সম্পর্কে প্রমাণ দানের কথা আছে। উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রিদ্বয়ের সম্মতিক্রমে স্থির হয় যে, অবিবাহিত ভারতীয়কে প্রমাণ করিতে হইবে যে, তিনি ১৯৪৬ সালের পূর্ব হইতে ১০ বৎসর যাবৎ সিংহলে বসবাস করিতেছেন। ডোমিসাইল অধিকারের জন্য বিবাহিত ভারতীয়ের পক্ষে ঐ সময় ৭ বৎসর করা হয়। উক্ত আইনে এইরূপ ব্যবস্থা ছিল যে, দরখাস্তকারীর পত্নী ও তাহার উপর নির্ভরশীল নাবালকগণকে তাঁহার সহিত একত্র বাস করিতে হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উক্ত আইনের ভাষার দোষে উহার অর্থ এইরূপ দাঁড়াইল যে, দরখাস্তকারীর পত্নীকে ও তাঁহার নাবালক শিশুগণকে সাধারণতঃ তাঁহার সহিত একত্র বসবাস করিতে হইবে। তাহার ফলে উহার এইরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া হইল যে, ঐ সময়ের জন্য দরখাস্তকারীর পত্নী ও তাহার নাবালক শিশুগণকে তাঁহার সহিত একত্র নিরবচ্ছিন্নভাবে বসবাস করিবার প্রয়ো-জন নাই।

উপসংহারে শ্রীরত্ননায়ক বলেনঃ 'আমরা ভারতের সহিত বন্ধন দৃঢ় করিতে এবং তাহার সহিত প্রীতির সম্পর্ক রক্ষা করিতেই চাই, কারণ প্রত্যেক বিষয়ে আমরা পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যুক্ত।'

ভারতও সিংহল সম্পর্কে ইহার ব্যতিক্রম কিছু ভাবে না। সেই সম্পর্ককে মধুর করিয়া তুলিতে হইলে শুধু বিবৃতি দিলেই চলিবে না, কাজের দ্বারা তাহা উপলব্ধি করাইবার প্রয়োজন। আমরা বিবৃতির উপর সমস্ত গুরুত্ব চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে রাজি নই; যে সমস্যা আজ অধি-কারের দাবীর ভিত্তিতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, আমরা চাই উহার সত্বর সমাধান। এই সমাধানের উপরেই সিংহল ও ভারতের সম্পর্ক মধুর ও নিবিড় হইয়া উঠিতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক মেট্রোপলিটন প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস্ লিমিটেড
১৪১, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

'বেলা যে প'ড়ে এল জল্‌কে চল্‌—'

[শিল্পী—সুনীলমাধব সেনগুপ্ত

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

বিংশ বর্ষ | মাঘ—১৩৫৯ | ২য় খণ্ড—২য় সংখ্যা

ঐতিহাসিক বিনয় সরকার

(১৮৮৭-১৯৪৯)

শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়

বিংশ শতাব্দীর বাঙালী মনীষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিমূর্ত্তি বিনয় সরকার (১৮৮৭-১৯৪৯)। বঙ্গ সংস্কৃতিতে তাঁর দানের প্রাচুর্য্যের কথা ভাবলে বিস্ময় লাগে। একালের শিক্ষিত মহল তাঁকে সাধারণত একজন শ্রেষ্ঠ সমাজ-বিজ্ঞানী ও অর্থশাস্ত্রীরূপে সম্‌ঝিতে অভ্যস্ত। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি যে আবার আজীবন একজন প্রধান ঐতিহাসিক-গবেষক, সে কথাও ভুল্‌লে চল্‌বে না।

বিনয় সরকারের ইতিহাস-গবেষণার ফলাফল আধুনিক দুনিয়ার গোটা পাঁচেক ভাষায় লিপিবদ্ধ র'য়েছে। ফরাসী, জার্ম্মাণ ও ইতালীয়ান ভাষায় তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধ, পুস্তিকা ও গ্রন্থের তালিকা বর্ত্তমান হিসাব থেকে বাদ দিয়ে যাচ্ছি। কেবল ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় লিখিত গ্রন্থগুলির ভিত্তিতেই বর্ত্তমানে আলোচনা চালাতে চাই। একমাত্র ইংরেজী ভাষাতেই তাঁর ঐতিহাসিক গবেষণার সাক্ষ্য বহন করছে প্রায় কুড়ি বাইশখানা গ্রন্থ। এই গুলির মধ্যে "দি সায়েন্স অব হিষ্ট্রি অ্যাণ্ড হোপ অব ম্যানকাইণ্ড" (লণ্ডন, ১৯১২), "শুক্রনীতি" (এলাহাবাদ, ১৯১৪), "দি পজিটিভ্‌ ব্যাকগ্রাউণ্ড অব হিন্দু সোশিও-লজি" তিন খণ্ড—(এলাহাবাদ, ১৯১৩-৩৭), "দি পোলিটিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউশান্স অ্যাণ্ড থিয়োরীজ্‌ অব দি হিন্দুজ্‌" (লাইপজিগ, ১৯২২), "দি ফিউচারিজম্‌ অব ইয়ং এশিয়া" (লাইপজিগ, ১৯২২), "হিন্দু পলিটিক্স ইন্‌ ইতালিয়ান্‌" (কলিকাতা, ১৯২৬), "দি পোলিটিক্যাল ফিলজফীজ সিন্স

১৯০৫" চার খণ্ড (মাদ্রাজ ও লাহোর, ১৯২৮-৪২), "ক্রিয়েটিভ ইণ্ডিয়া (লাহোর. ১৯৩৭) ও "ডোমিনিয়ান্ ইণ্ডিয়া ইন্ ওয়ার্ল্ড পারস্পেকটিভস্" (কলিকাতা, ১৯৪৯) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাংলাভাষায় বিনয় সরকারের ঐতিহাসিক গ্রন্থ বহু সংখ্যক। তার ভেতর "প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা" (১৯১০), "ঐতিহাসিক প্রবন্ধ" (১৯১২), "বর্ত্তমান জগৎ" তের খণ্ড (১৯১৪-৩৫) "হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন" (১৯২৬), "একালের ধন-দৌলত ও অর্থশাস্ত্র" দুই খণ্ড (১৯৩০-৩৫), "বাড়তির পথে বাঙালী" (১৯৩৪) ও "বাংলায় দেশী-বিদেশী" (১৯৪২) সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণযোগ্য।

বিনয় সরকারের ঐতিহাসিক গবেষণার সূত্রপাত সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত "ডন সোসাইটির" আবেষ্টনে (১৯০২-০৭) ও জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্ প্রতিষ্ঠিত "বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজ অ্যাণ্ড স্কুলের" আবহাওয়ায় (১৯০৬-১৯১০)। স্বদেশী যুগে ইতিহাস গবেষণার গুরুস্থানীয় ব্যক্তিদের ভেতর রমেশ দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯), হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১), দীনেশ সেন (১৮৬৬-১৯৩৯), ও যদুনাথ সরকার (১৮৭২—) স্মরণীয়। সেই সংগে আর একজন অধুনাবিস্মৃত বাঙালী জ্ঞান সাধকের নামোল্লেখও প্রয়োজন। এই ব্যক্তি 'ডনের' সতীশ মুখোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৮)। "ডন" পত্রিকার (১৮৯৭-১৯১৩) মারফৎ তিনি ভারতীয় ঐতিহাসিক গবেষণার ধারাকে উল্লেখযোগ্যভাবে সমৃদ্ধ করতে পেরেছিলেন। তাঁর স্বকীয় রচনাগুলি আজ পর্য্যন্তও কোনো পুস্তকাকারে প্রকাশিত না হওয়ায় এবং সর্ব্বদা উচ্চ আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হয়ে নাম যশের পথ থেকে আপনাকে লুক্কায়িত রাখায়, নব্য বাংলার অন্যতম দীক্ষাগুরু সতীশচন্দ্র এযুগের বাঙালীর কাছে বিস্মৃত * (১)। দেশকে ভালবাসতে হলে দেশের মাটি ও মানুষকে জানতে হবে, এই আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে গবেষণার পথে তিনি নেমেছিলেন। আপন অন্তর্নিহিত আদর্শবাদকে যুবকদের ভেতর সঞ্চারিত করবার দুর্লভ ক্ষমতাও তাঁর ছিল। তিনি যে লেখক-গোষ্ঠী তৈরী করেছিলেন, তাঁদের অনেকেই ঐতিহাসিক গবেষণার দ্বারা জাতীয় সংস্কৃতিকে পুষ্ট করতে পেরেছেন। হারাণ চাক্‌লাদার, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, বিনয় সরকার, উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ সতীশ মণ্ডলেরই অন্তর্গত। ভারতীয় ঐতিহাসিক গবেষণার ধারায় এঁদের দান বড় কম নয়।

ডন সোসাইটি ও জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের আবহাওয়ায় বিনয় সরকার যে গবেষণার আদর্শ গ্রহণ করেন, সারাজীবন তা তিনি পালন করে গেছেন। ডিগ্রীর মোহ বা পয়সার প্রলোভন তাঁর জ্ঞানচর্চ্চার পশ্চাতে ছিল না। সতীশচন্দ্রের যোগ্য শিষ্য হিসাবে তিনিও আজীবন দেশসেবার আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে জ্ঞান-চর্চ্চায় লিপ্ত ছিলেন। ১৯০৫-১৪র যুগে তিনি একই সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যায় পারদর্শী হবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যার গবেষণা চালাতে থাকেন। ১৯১১ সনের "প্রবাসীতে" তাঁর "ইতিহাস বিজ্ঞান ও মানবজাতির আশা" নামক বড় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি প্রথম "বিশ্বশক্তি সদ্ব্যবহারের" সঙ্গে জাতীয় ভাঙা-গড়ার সম্বন্ধ বিশ্লেষণ করেন। কোনো জাতির উন্নতি বা অবনতি,—রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও আর্থিক, একমাত্র আভ্যন্তরীণ ঘটনাস্রোতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রভাবও. জবরদস্তভাবে থাকে। "বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহারের" গুরুত্ব জাতীয় ইতিহাসে যে কত বেশী, তা ইংরেজীতে প্রচারিত হয় তাঁর "সায়েন্স অব হিষ্ট্রি অ্যাণ্ড হোপ্ অব ম্যানকাইণ্ড" (লণ্ডন, ১৯১২) গ্রন্থে। "বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহারের" মন্ত্র বিনয় সরকারী ঐতিহাসিক গবেষণার প্রথম মুদ্রা।

১৯১০-১১ সনে বিনয় সরকার এলাহাবাদের শ্রীশ বসু ও মেজর বামনদাস বসুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন ও প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির গবেষণায় ১৯১১-১৪র যুগে এলাহাবাদের পাণিনি আফিসে লিপ্ত থাকেন। বামনদাস বসুর প্রস্তাবে তিনি ১৯১১-১৩ সালের ভেতর মূল সংস্কৃত থেকে "শুক্রনীতি" ইংরেজীতে অনুবাদ করেন ও বিশদ টীকা-টীপ্পনিসহ ১৯১৪ সনে উহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই

* (১) মৎ প্রণীত: "সতীশ মুখার্জী" বিষয়ক ইংরেজী ও বাংলা পুস্তিকা (১৯৪৮) দ্রষ্টব্য।

অনুবাদ ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক বিশেষ ভাবে সমাদৃত হয়ে আসছে। ডাঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর "পোলিটিক্যাল হিষ্ট্রি অব এন্‌শেণ্ট ইণ্ডিয়া" ও ডাঃ অতীন্দ্রনাথ বসুর "সোশ্যাল অ্যাণ্ড রুর‍্যাল ইকনমি অব নর্দ্দান ইণ্ডিয়া" গ্রন্থে বিনয় সরকারের "শুক্রনীতির" ব্যবহার হয়েছে। ডাঃ ভুপেন্দ্রনাথ দত্তকেও ঐ গ্রন্থের তারিফ করতে দেখেছি। বিদেশী ভারততত্ত্বজ্ঞদের ভেতর জার্মাণ পণ্ডিত মায়ার ও ফরাসী পণ্ডিত লুই রেণো উক্ত গ্রন্থের বিশেষ সমাদর করে থাকেন। "শুক্রনীতির" ভেতর প্রাচীন হিন্দুজাতির শক্তি যোগ ও বস্তুনিষ্ঠার মূর্ত্তি উজ্জ্বল আকারে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

শুক্রনীতির তর্জ্জমাকালে (১৯১১-১৩) বিনয় সরকারের মনে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ে এক নতুন ধারণা জন্মে। হিন্দু জাতি প্রাচীন কালে শুধু আধ্যাত্মিকতার মোহে মস্‌গুল্ থাকৃতো না—শক্তিযোগের সাধনাও তার জীবনের এক প্রধান ধান্ধা ছিল। বিনয় সরকারের নিজের কথাই উদ্ধৃত করে বলি: "সেই শুক্রনীতি তর্জ্জমার যুগে (১৯১১-১৩) ফিরে যাচ্ছি। ভারতীয় সংস্কৃতির এক নয়া মূর্ত্তি আমার নজরে জোরের সহিত দেখা দিতে সুরু করেছিল। সে হচ্ছে সমরনিষ্ঠ, সংসার নিষ্ঠ, রাষ্ট্রনিষ্ঠ, হিংসানিষ্ঠ, শক্তিনিষ্ঠ ভারত। তার পাশে নিবেদিতা-প্রচারিত ভারত-মূর্ত্তি অতি-কাল্পনিক, অতি-অলীক, অতি-ভাবনিষ্ঠ, অতি-আদর্শনিষ্ঠ মনে হচ্ছিল। অর্থাৎ হিন্দু-সংস্কৃতি-বিষয়ক নিবেদিতা-প্রচারিত ব্যাখ্যাগুলোকে আমি ডন সোসাইটির চিন্তাধারা, ব্রহ্মবান্ধবের বাণী, রবীন্দ্র-সাহিত্য ইত্যাদির মতন প্রায় একই দরের ভেবেছি। সবই এক সঙ্গে বর্জ্জনও করেছি। এই সুপরিচিত ধারার প্রভাবে প্রাচ্য-গৌরব উজ্জ্বল আকারে দেখা দেয়। আর বুকটাও বেশ কিছু ফুলে উঠে। কিন্তু ব্যাখ্যাগুলা অনেকটা তথ্যহীন ও বস্তুহীন"*(২)।

ভারতীয় সংস্কৃতির আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যে এ ভাবে বিনয় সরকারের মনে "শুক্রনীতি" এক তীব্র সংশয় সৃষ্টি করে। ব্যাপক গবেষণার ফলে তিনি স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেন ভারতীয় মনোবৃত্তি আর ইউরোপীয় মনোবৃত্তি আসলে অভিন্ন। "ভারতবর্ষ ততখানি বস্তুনিষ্ঠ, ততখানি যুদ্ধপ্রিয়, ততখানি শক্তিযোগী, ততখানি সাম্রাজ্যবাদী, যতখানি ইয়োরোপ। আবার ইয়োরোপ ততখানি নীতিনিষ্ঠ ও আধ্যাত্মিক বা ঐ ধরণের আর কিছু, যতখানি ভারতবর্ষ"*(৩)। এই মতবাদ বিনয় সরকার প্রথম প্রচারিত করেন তাঁর "পজিটিভ ব্যাকগ্রাউণ্ড অব হিন্দু সোসিওলজি" গ্রন্থে। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯১৪ সনে এলাহাবাদের পাণিনি আফিস্ থেকে। গ্রন্থখানি পণ্ডিতমহলে এক উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। উনবিংশ শতাব্দীতে বিদেশী ভারত-তত্ত্বজ্ঞরা প্রচার করেন যে প্রাচীন হিন্দু জাতির সত্যকার পরিচয় তার অধ্যাত্ম-গৌরবে। প্রাচ্যের সভ্যতায় সংসারনিষ্ঠার চেয়ে পরলোক চর্চ্চার প্রাধান্য বেশী। পাশ্চাত্যবাসীর জীবনের আদর্শ ঠিক উল্টা। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদের এই ভারত-ব্যাখ্যায় দেশী পণ্ডিতেরাও সায় দিয়ে চলেছিলেন। বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে ভারতের আধ্যাত্মিক স্বাতন্ত্র্যের বাণী বার বার উচ্চারিত হয়েছে। এই সুপ্রচলিত ভারত-ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে বিনয় সরকারের "পজিটিভ ব্যাকগ্রাউণ্ড" এক বিরাট প্রতিবাদ বিশেষ। তিন খণ্ডে সমাপ্ত প্রায় দেড় হাজার পৃষ্ঠার এই বিশাল গ্রন্থে হিন্দু জাতির সংসারনিষ্ঠ, বিজ্ঞাননিষ্ঠ, বস্তুনিষ্ঠ, লড়াইদক্ষ শক্তিযোগী মূর্ত্তি জল্ জল্ করছে।

ঐতিহাসিক ভিন্‌সেন্ট্ স্মিথ তাঁর "অক্সফোর্ড হিষ্ট্রী অব ইণ্ডিয়া"য় (১৯২৩এর সংস্করণ, পৃঃ ৯৩) বিনয় সরকারের "পজিটিভ্ ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড" গ্রন্থকে মূল্যবান বলে ঘোষণা করেছেন, যদিও "কাম্‌ব্রাস্ টাইটেল।" গ্রন্থের নামকরণের প্রথমেই "পজিটিভ" শব্দের ব্যবহার থাকায় অর্থ বুঝতে তাঁর মত পণ্ডিতকেও এতখানি যে বেগ পেতে হবে আশ্চর্য্যের বিষয়। কোঁৎ-দর্শনের অ-আ-ক-খ যাঁরা জানেন, তাঁদের কাছে গ্রন্থের নামকরণ বিশেষ তাৎপর্য্য-পূর্ণ। "পজিটিভ" শব্দটা ফরাসী দার্শনিক কোঁতের মার্কামারা পারিভাষিক। কোঁৎ-দর্শনে পজিটিভ শব্দের অর্থ সংসারনিষ্ঠ, বস্তুনিষ্ঠ, ইন্দ্রিয়নিষ্ঠ বা

* (২) মৎ প্রণীত: "বিনয় সরকারের বৈঠকে" কলিকাতা, ১৯৪২, পৃঃ ২৯২)।

* (৩) মৎ প্রণীত: "বিনয় সরকারের বৈঠকে" (কলিকাতা, ১৯৪২, পৃঃ ৩৬-৩৭)।

জাগতিক অর্থাৎ অতীন্দ্রিয়, পারলৌকিক শব্দের ঠিক উল্টো।

এ যুগের সুপ্রসিদ্ধ বৃটিশ অর্থশাস্ত্রী আল্‌ফ্রেড মার্শাল, মার্কিণ দার্শনিক হকিং (হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়) এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক-পণ্ডিত গিলবার্ট মারে ও নৃতত্ত্ববিদ ম্যারেট প্রমুখ মনীষিগণও "পজিটিভ ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড" গ্রন্থের চিন্তাধারায় ভারতবর্ষের এক নূতন মূর্ত্তি দেখেছেন। সেটা সংসারনিষ্ঠা ও বিজ্ঞাননিষ্ঠার মূর্ত্তি।

ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে গবেষকদের ভেতর জার্ম্মাণ পণ্ডিত ভিণ্টারনিট্‌স্‌, যোলি, হিলেব্রাণ্ট এবং মায়ার, ফরাসী পণ্ডিত মাস্‌সন্ উর্সেল্ এবং ইংরেজ পণ্ডিত কীথ ও টমাস্ এই বই নিজ নিজ রচনায় ব্যবহার করেছেন। এই গ্রন্থের তথ্য মার্কিণ সমাজশাস্ত্রী সোরোকিন, বার্ণস্ ও বেক্‌কার কর্ত্তৃক তাঁদের একাধিক গ্রন্থে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে।

ভারতীয় গবেষক মহলেও উক্ত গ্রন্থের প্রভাব সুপরিস্ফুট। ঐতিহাসিক নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "ডেভেলাপমেণ্ট অব হিন্দু পলিটি" (১৯৩৯) গ্রন্থে ও অতীন বসু-প্রণীত "সোশ্যাল এ্যাণ্ড্ রুর‍্যাল ইকনমি অব নর্দার্ন ইণ্ডিয়া" (দুই খণ্ড, ১৯৪২-৪৫) পুস্তকে হিন্দু পজিটি-ভিজমের জয়জয়কার দেখতে পাই। কালিদাস মুখোপাধ্যায় ও রণজিৎ সেনগুপ্ত'র "অধ্যাত্মবাদ ও বস্তুতান্ত্রিকতা" পুস্তকে ও অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের "হিন্দু সভ্যতার ঐতিহাসিক রূপ" (সোনার বাংলা, শারদীয়া সংখ্যা, ১৯৪২) প্রবন্ধে বিনয় সরকারী চিন্তাধারার সাক্ষাৎ ও সুস্পষ্ট ধ্বনি শুনতে পাই। ১৯২৮ সনে মেজর বামন দাস বসু লিখেছিলেন যে, আজকের দিনে প্রাচীন ভারতের সংসারনিষ্ঠা বা পজিটিভিজমের বিষয়ে দেশী পণ্ডিত মহলে যে গবেষণা-প্রবণতা দেখা যায়, তার সূত্রপাত বিনয় সরকার করেন পজিটিভ্ ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড গ্রন্থে ১৯১৪ সনে। ১৯৪৮ সনে কলিকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে বক্তৃতাকালে অধ্যাপক নির্ম্মল ভট্টাচার্য্য বলেছিলেন যে, প্রাচীন হিন্দু জাতির সাংসারিক বা জাগতিক ধারা নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে "পজিটিভ্ ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড" গ্রন্থের লেখক বিনয় সরকার পথ প্রদর্শক।

এই গ্রন্থের শেষ খণ্ডের নাম "ইন্‌ট্রোডাকশান্ টু হিন্দু পজিটিভিজম্" (১৯৩৭, পৃঃ ৭৭০)। একজন বিশিষ্ট ফরাসী মনীষী লিখেছেন: "এইটেই হচ্ছে বিনয় সরকারের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। গ্রন্থকার ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে শিক্ষা ও সমাজবিজ্ঞান ক্ষেত্রে আধুনিক ভারতীয় চিন্তাধারার একজন প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে সুপরিচিত। ডক্টর বিনয় কুমার সরকার ঠিক যেন একটা বিশ্বকোষ। বাংলা, ইংরেজী, ফরাসী, জার্ম্মান এবং ইতালিয়ান্ ভাষায় তাঁর লেখা সুবিস্তর। আর তিনি বহু সংখ্যক বিভিন্ন বিষয় সম্পূর্ণ নূতন নূতন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে আলোচনা করতে অভ্যস্ত। পাশ্চাত্যবাসিগণ যদি সমাজবিজ্ঞানে বর্ত্তমান ভারতকে সবচেয়ে ভালভাবে বুঝতে চায়, তবে এই বইখানা অপরিহার্য্য।" এই মনীষী হচ্ছেন মঁসিয় জঁ আল্‌বেয়ার। ইনি রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও অরবিন্দ'র গ্রন্থাবলী ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করে পাশ্চাত্য জগতে ও ভারতের সুধীমহলে পরিচিত। এই ব্যক্তি বিনয় সরকারের উল্লিখিত গ্রন্থের ফরাসী, জার্ম্মান ও ইতালিয়ান ভাষায় সত্বর অনুবাদের জন্য ফরাসী পত্রিকার মারফৎ পাশ্চাত্যবাসীর কাছে আবেদন জানান।

পজিটিভ্ ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড গ্রন্থে বিনয় সরকার 'প্রাচ্য-পাশ্চাত্য'র আদর্শ ও সংস্কৃতি-গঠনের যে সাম্য-দর্শন প্রচার করেন, তার সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য আলোচনা পাওয়া যায় তার "ফিউচারিজম্ অব ইয়ং এশিয়া" (লাইপজিগ, ১৯২২) গ্রন্থে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যর সভ্যতার তুলনামূলক বস্তুনিষ্ঠ ও ব্যাপক আলোচনার ক্ষেত্রে এই গ্রন্থের জুড়িদার দ্বিতীয় বই আজ পর্য্যন্তও আর কোনো বাঙালী বা ভারতীয় ঐতিহাসিক গবেষকের হাত দিয়ে বের হয়নি। যে পাণ্ডিত্যের পরিচয় এ গ্রন্থে পরিস্ফুট হয়েছে তা বিশ্ব-গ্রাসী। পাশ্চাত্যমহলে প্রায়ই বিনয় সরকারকে ওস্‌ওয়াল্ড্ স্পেংলারের বিশ্বগ্রাসী পাণ্ডিত্যের সংগে তুলনা করা হয়েছে। দেশী নজির দিয়ে বলা যায় ব্রজেন শীলের ধারা বিনয় সরকারের জীবনে বাড়তির পথে চলেছে।

পাণ্ডিত্যের কথা বাদ দিলেও, একমাত্র মৌলিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর জন্যই বইখানা বিশেষভাবে সমাদৃত হবার দাবী রাখে। আধুনিককালে রামমোহন রায়ই বোধ হয় তুলনা

মূলক আলোচনায় ভারতের প্রথম গুরু। সে সময় থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত ভারতীয় চিন্তাবীরদের প্রায় সকলেই কমবেশী তুলনামূলক আলোচনা-প্রণালীর প্রয়োগ করে আসছেন। এই তুলনামূলক আলোচনা-প্রণালীতে ভারতকে ফেলা হতো বিলাত বা বড়জোর বিলাত-মার্কিণের পরিপ্রেক্ষিতে। বিদেশী দৃষ্টিভঙ্গী বল্‌লে সাধারণত অ্যাংলো-মার্কিণ দৃষ্টিভংগীই ভারতে বুঝানো হতো। বিলাতী-মার্কিণ চোখ দিয়ে বিশ্বপর্য্যালোচনার সীমানা থেকে ভারতীয় পাণ্ডিত্যকে মুক্ত করবার জন্য বিনয় সরকার "ফিউচারিজম অব ইয়ং এশিয়া" গ্রন্থে দস্তুরমাফিক লড়াই করেছেন। বিনয় সরকার প্রবর্ত্তিত তুলনামূলক আলোচনা-প্রণালীতে বিদেশ বল্‌তে শুধু বিলাত বা বিলাত-আমেরিকা বুঝায় না। তাঁর আলোচনায় ভারত এসে হাজির হয় বিশ্ব-সংস্কৃতির পাশে। জাপানী সংস্কৃতি, চীনা সংস্কৃতি, রুশ সংস্কৃতি, বল্কান্ সংস্কৃতি, জার্ম্মাণ সংস্কৃতি, ফরাসী সংস্কৃতি, ইতালিয়ান্ সংস্কৃতি ও বিলাত-মার্কিণ সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে বিশদ্‌ভাবে আলোচিত হয়ে থাকে বিনয় সরকারের রচনায়। এই বিশ্বসংস্কৃতির পাশে ভারতীয় সংস্কৃতিকে দাঁড় করানো হয়েছে তাঁর গ্রন্থে।

বিনয় কুমার সরকার

তাছাড়া, আরও একটা উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব আছে "ফিউচারিজম্ অব ইয়ং এশিয়া" গ্রন্থের। সেটা হলো এক মৌলিক তুলনামূলক আলোচনা-প্রণালীর প্রবর্ত্তন। উন-বিংশ শতাব্দী থেকে বিংশ-শতাব্দীর প্রথম দিক পর্য্যন্ত দেশী-বিদেশী পণ্ডিতেরা তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে প্রায়ই যুক্তিনিষ্ঠ মেজাজের পরিচয় দিতে পারেন নি। তাঁদের তুলনামূলক আলোচনায় প্রধানত তিন প্রকারের গলদ থেকে যেতো।

প্রথমত, ঐ সকল তুলনামূলক আলোচনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য থেকে "সমশ্রেণীর তথ্য" (সেম্ ক্লাস্ অব ফ্যাক্ট্‌স্) গৃহীত ও ব্যবহৃত হতো না। পশ্চিমা পণ্ডিতেরা প্রায়ই উণবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংগে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারত-সংস্কৃতির তুলনা করতেন। পাশ্চাত্যের যুক্তিনিষ্ঠ মনীষীদের চিন্তা ও সৃষ্টির সংগে ভারতীয় জনসাধারণের নানা কুসংস্কারপূর্ণ জীবনধারাকে তুলনা করে প্রাচ্যের দৈন্য ও হীনতাকে বড় আকারে দেখানো হতো। পক্ষান্তরে, ভারতীয় পণ্ডিত ও প্রচারকেরা ভারতীয় আধ্যাত্মিক স্বাতন্ত্র্য ও মহিমা সপ্রমাণ করবার আশায় পাশ্চাত্য আধ্যাত্মিক সাধনার ধারাকে অনেক-সময়ই সজ্ঞানে অজ্ঞানে বয়কট করে চলতেন।

দ্বিতীয়ত, একই ধরণের ব্যাখ্যা-প্রণালী (সেম্ ইনস্ট্রুমেণ্ট অব ইণ্টারপ্রিটেশান্) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'র তথ্য-ব্যাখ্যায় প্রয়োগ করা হতো না।

তৃতীয়ত, দফায়-দফায় (আইটেম্ বাই আইটেম্) অর্থাৎ আদর্শ ও চিন্তার সংগে আদর্শ ও চিন্তার এবং কর্ম্ম-প্রচেষ্টা বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কর্ম্মপ্রচেষ্টা ও প্রতিষ্ঠানের তুলনাসাধন হতো না। প্রাচ্যের আদর্শকে তুলনা করা হতো পশ্চিমের বাস্তব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে, আবার পশ্চিমা আদর্শকে তুলনা করা হতো প্রাচ্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। যুগের পর যুগ ধরে দফায়-দফায় বিজ্ঞাননিষ্ঠ মেজাজে তুলনায় আলোচনা চালানো হতো না বলে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির স্বরূপ নিয়ে অনেক অনৈতিহাসিক

ও অবৈজ্ঞানিক মতবাদ দেশে-বিদেশে প্রচারিত হয়েছিল এবং আজও হয়ে থাকে। ১৯৪৩ সনে প্রকাশিত ক্ষিতিমোহন সেনের "ভারতের সংস্কৃতি", ১৯৪৬ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত ব্রজসুন্দর রায়ের "ভারতীয় সভ্যতা" গ্রন্থে এই ভুল ব্যাখ্যার সাম্প্রতিক নজির মেলে।

উল্লিখিত তিনপ্রকার গলদ থেকে তুলনা মূলক আলোচনাকে মুক্ত করবার জন্য বিনয় সরকার তাঁর "ফিউচারিজম্ অব ইয়ং এশিয়া" গ্রন্থে (১৯২২) সজ্ঞানে লড়াই করেছেন। বস্তুনিষ্ঠ ও বৈজ্ঞানিক তুলনামূলক আলোচনার ফলে যে সত্য তাঁর দৃষ্টিকে বারেবারে আকর্ষণ করে, তা হলো সভ্যতার আদর্শ ও সংস্কৃতি বিকাশের ধারায় প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মূল পার্থক্য টানতে যাওয়া নেহাৎ গা-জুরী। প্রাচ্যের সভ্যতায় তথাকথিত আধ্যাত্মিকতা, ধর্ম্মসাধনা বা অতীন্দ্রিয়ামির বিশেষ কোনো বাণী বা বৈশিষ্ট্য নেই, আবার পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতেও তথাকথিত জড়নিষ্ঠা, সংসারধর্ম্ম বা ভোগবাদের বিশেষ কোন দর্শন বা স্বাতন্ত্র্য নেই। প্রাচ্য পশ্চিম থেকে বেশী নীতিনিষ্ঠ, বেশী আধ্যাত্মিক, বেশী ধর্ম্মপ্রবণ নয়। আবার পশ্চিম প্রাচ্য থেকে বেশী সংসারনিষ্ঠ, বেশী ইন্দ্রিয়নিষ্ঠ, বেশী ভোগবাদী নয়। আমরা সাধারণত প্রাচ্য ইতিহাসের সংসারনিষ্ঠার ধারাগুলির যথেষ্ট খেয়াল রাখি না বলে এবং পশ্চিমা ইতিহাসের ধর্ম্ম-সাধনার ঐতিহ্য যথেষ্টভাবে জানি না বলে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিষয়ক ভুল মতবাদ যখন-তখন ইতিহাস ও বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে চালিয়ে থাকি। এই অভিযোগ বিনয় সরকার তুলেছেন দেশী-বিদেশী ইণ্ডোলজিষ্টদের বিরুদ্ধে।

বিনয় বাবুর নিজের ভাষায় তবে বলি : "ইয়োরোপীয়ান পণ্ডিতদের ভিতর যাঁহারা 'ভারত তত্ত্বের' আলোচনা করেন তাঁহারা ইয়োরোপের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে মহা পণ্ডিত নন। তাঁহারা সংস্কৃত, পালি, আরবী, ফার্শী ইত্যাদি ভাষা জানেন বটে। এই সকল ভাষায় প্রচারিত পুঁথি ঘাঁটাঘাঁটি করিবার বিদ্যায় তাঁহাদের কাহারও কাহারও অভিজ্ঞতাও আছে প্রচুর সন্দেহ নাই।

"কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশই না জানেন নৃতত্ত্ব, না জানেন চিত্ত-বিজ্ঞান। কি সঙ্গীত, কি চিত্রকলা, কি আইন, কি তর্ক-প্রণালী, কি ধনদৌলত, কি নগরজীবন, কি শিক্ষা-প্রণালী, কি পদার্থ-বিজ্ঞান, কি দর্শন-শাস্ত্র এই সকল বিষয়ের ইয়োরোপীয় ধারা সম্বন্ধে প্রায় প্রত্যেকেই অনভিজ্ঞ। কথাটা ভারতবাসীর মরমে প্রবেশ করিবে কি ?

"ইংরেজ গাড়োয়ানরা শেক্‌স্‌পীয়ারের ভাষায় কথা বলিতে পারে, হাসিঠাট্টাও করিতে পারে। কিন্তু তাহা বলিয়া ইংরেজ মাত্রকেই শেক্‌স্‌পীয়ার সম্বন্ধে ওস্তাদ্ বিবেচনা করা চলিবে কি ? হিন্দুমাত্রেই 'মহাভাষ্য', 'সূর্য-সিদ্ধান্ত' আর 'সঙ্গীত-রত্নাকর' ইত্যাদি গ্রন্থের 'বোদ্ধা' বিবেচিত হইবে কি ? সেইরূপ জার্ম্মাণ, ইংরেজ, ফরাসী, ইতালিয়ান, মার্কিণ রুশ ইত্যাদি ভারত-তত্ত্বের ব্যাপারীরা ইয়োরামিকায় জন্মিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা খৃষ্টিয়ান ধর্ম্ম, গ্রীক দর্শন, রোমান আইন, রেণেশাঁস যুগের স্থাপত্য, বুঁর্ব রাষ্ট্রনীতি, সমাজে পাশ্চাত্য নারীর ঠাঁই আর ইয়োরোপীয় কিষাণদের আর্থিক অবস্থা সবই বুঝেন এইরূপ বিশ্বাস করিলে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। এই সকল বিষয় সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান এক একটা স্বতন্ত্র বিদ্যা। তাহার জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র 'লেখাপড়া', গবেষণা, অনুসন্ধান চালানো দরকার।

"অর্থাৎ পশ্চিমা 'ইণ্ডোলজিষ্ট'রা আজ পর্য্যন্ত ভারত সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়াছেন, সবই 'আলোচ্য বিষয়টার বিজ্ঞানে'র কষ্টি-পাথরে ঘষিয়া দেখিতে হইবে। সংস্কৃত ফার্শী তাঁহারা যতই জানুন না কেন, প্রত্যেক মিঞাকেই 'বাজাইয়া' দেখা আবশ্যক। আমাদের ভাষায় তাঁহাদের দখল আছে বলিয়া তাঁহাদের পা চাটীতে অগ্রসর হওয়া আহাম্মুকি।

"এই গেল বিদেশী ভারত-তত্ত্বজ্ঞদের কথা। ভারতীয় ভারত-তত্ত্বজ্ঞদের অবস্থা কিরূপ ? কেবল ভারত-তত্ত্বজ্ঞ কেন, আমাদের যে-কোনো লাইনের চরম পণ্ডিতেরাও ইয়োরোপীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, আদর্শ এবং চিন্তা-প্রণালীর বিকাশধারা সম্বন্ধে প্রায় পূরাপূরি অজ্ঞ। কথাটা শুনাইতেছে খুবই কড়া। কিন্তু ভারতসন্তান বুকে হাত দিয়া বিগত পঞ্চাশ বৎসরের ভারতীয় পাণ্ডিত্য তলাইয়া

মজাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করুন। দেখা যাইবে,—কেন এই বিষয়ে কথাটা 'ঢাক্ ঢাক্ গুড়্ গুড়্' না করিয়া খুলিয়া বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিলাম না।

"ইয়োরোপের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে কেতাব মুখস্থ করিয়াছেন আমাদের অনেকেই। একথা অজানা নাই কাহারও। কিন্তু চাই 'স্বাধীন' ভাবে 'ভারতীয় স্বার্থে' ইয়োরামেরিকার ভূত-ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সম্বন্ধে গবেষণা করিবার ক্ষমতা। পশ্চিমারা যেমন 'ভারত-তত্ত্ব' 'প্রাচ্য তত্ত্ব' ইত্যাদি বিদ্যা কায়েম করিয়া নিজেদের জ্ঞান-মণ্ডল বাড়াইয়া তুলিতেছে, ভারত-সন্তান সেইরূপ ইয়োরামেরিকা-তত্ত্ব বা পাশ্চাত্য তত্ত্ব পড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছে কি? সেই ক্ষমতা সৃষ্টি করিবার জন্য ভারতে ব্যবস্থা কোথায়?

"এই অজ্ঞতা যতদিন থাকিবে ততদিন ভারতবাসী ইয়োরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের (রাষ্ট্র-সাধনার ক্ষেত্রে) তুলনা সাধন করিতে ভয় পাইবে। 'বাপ্ রে! গ্রীস?' 'বাপ্ রে রোম?' এইরূপ থাকিবে ততদিন ভারতীয় পণ্ডিতদের চিন্তা প্রণালীর ঢঙ।

"আর ততদিন ভারতবাসী ভারতীয় সভ্যতাকে 'আধ্যাত্মিক' হিসাবে ইয়োরোপীয়ান সভ্যতা হইতে উচ্চতর ভাবিয়া ঘরের দুয়ার বন্ধ করিয়া গোঁফে চাড়া মারিতে লজ্জা বোধ করিবে না"*(৪);

'ফিউচারিজম্ অব ইয়ং এশিয়া'র লেখক বিনয় সরকার পাশ্চাত্যের চিন্তামহলে এক তুমুল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেন। জার্ম্মাণ জগতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় মনীষী ডাঃ কার্ল হাউসোফার ঐ বই সম্বন্ধে লিখেছিলেন: "গ্রন্থখানিকে এশিয়ান্ আন্দোলনের কর্ম্মবীর ও নেতাদের জীবনবাদের দিগ্‌দর্শন বলে গ্রহণ করা চলে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সমস্যাগুলির স্বরূপ যদি কেউ খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে বুঝতে চান, তবে তাঁকে সকলের আগে বিনয় সরকারের দার্শনিক মেজাজ ও দৃষ্টিভঙ্গী বিশ্লেষণ করে অগ্রসর হতে হবে। সরকারের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী এশিয়াকে জাগিয়ে তোলার পক্ষে বিশেষ কার্য্যকরী। এশিয়ান দৃষ্টিভঙ্গী থেকে রচিত যত বই আমি পড়েছি, তাদের মধ্যে এ বইখানি সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।" মার্কিণ দার্শনিক জন ডুয়ী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গার্ণার, সমাজশাস্ত্রী সোরোকিন প্রমুখ মনীষীগণও এই বইকে অত্যন্ত উঁচুদরের বলে সমাদর করে থাকেন। ভারতীয় রাষ্ট্রিক নেতাদেরও অনেকেই এই বইয়ের মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। শুধু জওহরলাল নেহেরু, ভি. জে. প্যাটেল্ ও সুভাষ বসুর নাম করেই ক্ষান্ত থাকলুম।

যে-বৎসর বিনয় সরকারের "ফিউচারিজম্ অব ইয়ং এশিয়া" গ্রন্থ লাইপজিগ সহর থেকে প্রকাশিত হয়, সে-বৎসরই আবার তাঁর পোলিটিক্যাল্ ইন্‌ষ্টিটিউশান্‌স্ অ্যাণ্ড থিয়োরীজ্ অব দি হিন্দুজ্" আত্মপ্রকাশ করে। প্রাচীন ভারত-বিষয়ক ভারতীয় গবেষণার এক প্রকাণ্ড দলিল তাঁর এই শেষোক্ত গ্রন্থখানি। হিন্দুজাতির রাষ্ট্রিক তত্ত্ব ও রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক আলোচনা পাওয়া যায় এই পুস্তকে। পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রিক তত্ত্ব ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা যে কোনো পাঠকের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করে। প্রাচীন লিপি, মুদ্রা ও বৈদেশিক ভারত বৃত্তান্তর ঐতিহাসিক তথ্যের উপরেই বইখানি মূলত প্রতিষ্ঠিত। তৃতীয়টার অর্থাৎ বিদেশী ভারত-বৃত্তান্তর নজির তোলা হয়েছে বটে, কিন্তু বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে। মেগাস্থিনিস্, যুয়ান-চুয়াঙ্ ইত্যাদির রিপোর্টগুলা কতখানি বস্তুনিষ্ঠ সে প্রশ্ন প্রতিপদে জিজ্ঞাসা করতে করতে লেখককে অগ্রসর হতে হয়েছে। সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যের মালমশলা মোটের উপর গ্রন্থকার বর্জ্জন করেছেন। এমন কি কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রকে'ও যথাসম্ভব বাদ দেওয়া হয়েছে, কারণ বাস্তব অবস্থার প্রতিচ্ছবি 'অর্থশাস্ত্রে' কতখানি সে-সন্দেহ গ্রন্থকারের মনে সর্ব্বদা জাগরূক। বাংলা, ইংরেজী, ফরাসী, জার্ম্মাণ ও ইতালিয়ান ভাষায় আলোচিত ভারততত্ত্ববিষয়ক ও পাশ্চাত্যবিষয়ক রচনাগুলিও প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে, তথ্যসমৃদ্ধির কথা বললেই বিনয় সরকার সম্বন্ধে বলা শেষ হয় না। তাঁর স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও দার্শনিক বিশ্লেষণ-প্রণালী সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার ঐ বই সম্বন্ধে লিখেছিলেন: "প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠান বিষয়ক ব্যাপক ও সঠিক গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর (বিনয় সরকারের)

*(৪) বিনয়কুমার সরকার: "হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন" (কলিকাতা, ১৯২৬, ভূমিকা : পৃষ্ঠা ৮/০—৮৶০) দ্রষ্টব্য।

চেয়ে কোনো যোগ্যতর লোকের কথা ধারণা করা কঠিন। তাঁর নিজস্ব ও স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গী সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য। সত্য আবিষ্কারের সাধনায় তিনি কার্লাইল-বর্ণিত 'হিরো-প্রফেট্' বা বীরপুরুষের মতন। ভারতের জাতীয় জাগরণের সন্ধিক্ষণে এমন সত্যসন্ধ সাধকেরই প্রয়োজন।" এই বইয়ের তথ্য 'কেম্‌ব্রিজ এন্‌সেন্ট্‌ হিস্‌ট্রির' সপ্তম খণ্ডে (পিউনিক ওয়ার সংক্রান্ত গ্রন্থে) ব্যবহৃত হয়েছে। মাসসন্ উর্সেল, বোলি, হিল্লেব্রান্ট্, গিগার প্রমুখ ভারততত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরাও এই বইয়ের বিশেষ সমাদর করেছিলেন। ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে প্রাচীন ভারত বিষয়ক বই পড়তে হয়। কিন্তু "পোলিটিক্যাল্ ইন্‌স্টি-টিউশান্‌স্ অ্যাণ্ড থিয়োরীজ্ অব দি হিন্দুজ্" (১৯২২) বইয়ের মত মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রিক ইতিহাস এখনো নজরে পড়েনি। ১৯২৩ সনে ডক্টর হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত "পোলিটিক্যাল্ হিস্‌ট্রি অব এন্‌সেন্ট্ ইণ্ডিয়া" গ্রন্থ এক বস্তু—বিনয় সরকারের প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রিক ইতিহাস ভিন্ন চীজ্।

বিনয় সরকারের ভারত-বিষয়ক আর একখানি বড় গ্রন্থের নাম "ক্রিয়েটিভ্ ইণ্ডিয়া" বা "স্রষ্টা ভারত" (লাহোর, ১৯৩৭, পৃঃ ৭২৫)। মোহেনজোদারো সভ্যতার যুগ থেকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের সময় পর্য্যন্ত ভারতীয় সৃষ্টির বৈচিত্র্য ও পরিমাণ জরিপ করা হয়েছে ঐ বইটাতে। বিশ্বসংস্কৃতির সঙ্গে তুলনায় আলোচনা চালানো হয়েছে যুগের পর যুগ ধরে। জনৈক ফরাসী অধ্যাপক এই বইখানি সম্বন্ধে লিখেছিলেন: "বিনয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী ভারতীয় স্বার্থের খাতিরে এবং সত্যনিষ্ঠার খাতিরে উভয়বিধ কারণেই মূল্যবান। তিনি যে শুধু আমাদের যথেষ্ট পরিমাণ নূতন নূতন তথ্যেরই সন্ধান দিয়েছেন তা নয়, যাঁদের আমরা জানি বলে ধরে নিয়েছিলাম, তাদেরও আগাগোড়া নূতন-নূতন মূর্ত্তিতে আমাদের দেখিয়েছেন। এখন থেকে মানব সংস্কৃতির বিষয়ে মূল্য নিরূপণের মানও আমরা পাল্টিয়ে ফেল্‌তে বাধ্য হবো।"

★

অভিযাত্রী

বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

পৃথিবীর বুকে জমাট রয়েছে রাত
দুঃসহ ব্যথা এখনো অনেক বুকে,
দুর্জ্জয় তৃষা এখনো প্রসারি' হাত
তোমারে বন্ধু, ডাকিতেছে সম্মুখে।
দুর্যোগ তব এখনো হয়নি শেষ
উষার কিরণ এখনো অনেক দূরে,
এখনো উষর ধূসর মরুভূ দেশ
ডাকিছে তোমারে বহ্নি জ্বালার সুরে।
এখনো সমুখে অসীম সাগর জল
ফুঁসিয়া ফুঁসিয়া ভীম তরঙ্গ তোলে
বজ্র-বিষাণ ঈশান গগন তল
ডাকিছে তোমারে জীবনের মহারোলে।
হয়তো তোমার সমুখে নতুন দিন—
পিছনের যত কালো কুৎসিৎ রেখা
তোমার জীবনে তার কাছে কোনো ঋণ
সমুখে আনিল অজেয় জ্যোতির্লেখা,
যত গ্লানিভার দুঃসহ সে তো নয়
তাহারে মুছিতে কর প্রযত্ন আজি,
উদয়-শিখরে নবীন সূর্যোদয়
ভাতিবে তোমার অমৃত রূপে রাজি।
বিষণ্ণ যত নিষ্ক্রিয় যত ম্লান,
মৌন বেদনে রয়েছো আঁধার কূপে
অসীম শূন্যে শোনো দেবতার গান
ডাকিছে তোমারে নব নির্ভীক রূপে।
হে অভিযাত্রী বাহিরিয়া এস আজ
হীন পঙ্কিল কুটিল স্বপ্ন ফেলি'
মৃত্যুরে তুমি হানো হানো মহালাজ
অমর জীবন রয়েছে দু'বাহু মেলি।

শিশু হাসিল কেন

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত

নেহাৎ বেড়াইতে যাওয়া। একটি মফস্বল শহর; শহর হইতেও ছ'সাত মাইল দূরে। চারিদিকে ছোট ছোট শালবন, তাহারই মাঝে মাঝে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত বাংলো নমুনার কয়েকটি বাড়ি। জনমানবের বিরল বসতি, লোকজনের আনাগোনাও কম। অনেক দূরে দূরে এখানে সেখানে আদিম জাতিগণের বাস, পথেঘাটে দেখা তাহাদের সঙ্গেই। চারিদিকে একটা স্নিগ্ধ নির্জ্জনতা।

আমাদের দলের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিল বছর তিনেকের একটি মেয়ে। সকাল বেলায় আমরা দল বাঁধিয়া এখানে সেখানে বেড়াইতেছি; কিন্তু লক্ষ্য করিলাম, সারাটি সকাল মেয়েটি তাহার মায়ের গা ঘেঁষিয়া আছে। এতখানি অপরিচয় এবং নির্জ্জনতা তাহাকে বোধ হয় আজ সকালে আরও অনেকখানি মায়ের কাছে টানিয়া আনিয়াছে।

স্নান করিয়া জামা গায় দিতে একশ'রকম ওজর-আপত্তি এবং তাহা লইয়া মাকে খানিকটা হয়রানি করা, ইহা শিশুমাত্রেরই একটা নিত্যলীলা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। এই জাতীয় অবস্থায় মাকেও বিবিধ প্রকারের ছলাকলার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, তাহার ভিতরে আদর থাকে, অনাদর থাকে; বিবিধ প্রলোভন থাকে, বিবিধ ভয় প্রদর্শন থাকে; এবং শেষ পর্য্যন্ত থাকে সম্পূর্ণ অসহযোগের সঙ্কল্প জ্ঞাপন।

আজও সেই নিত্যলীলারই নৈমিত্তিক অভিনয়। মা শিশুকে ধমকাইয়া বলিলেন,—'খুকু, তুমি অমনি দুষ্টুমি করলে আমি তোমাকে এখানে ফেলে চ'লে যাব।' শিশুটি যেন সমূহ একটু বিপদ মানিল, কারণ চারদিকের নির্জ্জনতা এবং নীরবতা তাহার মনের উপরে হয়ত একটা অস্বস্তিকর একাকিত্বের অস্পষ্ট ছায়া ফেলিয়া আছে। সে খানিকটা একটু ভাবিয়া লইয়া ঈষৎ-ভীত কণ্ঠে বলিল, 'যাও তুমি, আমি ঠাকুমার কাছে থাকব।' মা বলিলেন,—'ঠাকুমাও আমার সঙ্গে চ'লে যাবেন।' শিশু বলিল,—'তবে ত দাদু আছেন।' মা জানাইয়া দিলেন দাদুও এমন দুষ্টু মেয়ের সঙ্গে থাকবেন না। শিশু পিসিমাকে আশ্রয়ের সঙ্কল্প জানাইল; কিন্তু মা যখন সে সম্ভাবনারও বিরোধিতা করিবেন জানাইলেন, তখন শিশুটি খানিকক্ষণ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা খিল্ খিল্ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল; সে কি হাসি!—হাসি যেন আর থামে না!

শিশু ত একরাশ হাসিয়া তাহার বিপদ বাধা সবই মুহূর্ত্তে উড়াইয়া দিল; মাও তাহার সঙ্গে খানিকটা হাসিয়া এবং সেই সুযোগে জামাটি পরাইয়া দিয়া খালাস। ইঁহারা উভয়েই বাস করেন শুভ প্রাণের রাজ্যে, শয়তানের সেখানে কোনও প্রবেশাধিকার নাই; কিন্তু শয়তান চাপিয়া বসিয়া আছে আমার মাথায়, সুতরাং আমি বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম,—'শিশু হাসিল কেন?'

শিশু হাসিয়া উঠিয়াছে এমন একটি মন লইয়া—যে মন সম্পূর্ণরূপে উপায়হীন—আশ্রয়হীন। কচি লতা বাড়িয়া উঠিবার পথে যেমন সর্ব্বদা শক্ত আশ্রয় চায়, শিশুমন সহজাত ধর্ম্মবশে তেমনই সর্ব্বদা কাহাকেও এবং মুখ্যত: তাহার মাকে আঁকড়াইয়া থাকিতে চায়। এ আশ্রয় শিথিল হইলে সে ভীত হয়, সন্ত্রস্ত হয়; কাছাকাছি যাহাকে পায়, আঁকড়াইয়া ধরিতে চায়। আশ্রয়ের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে যতক্ষণ তাহার মন বিচরণ করে, ততক্ষণ সে ভীত-সন্ত্রস্ত; কিন্তু এই সম্ভাবনার একটা পরিধি আছে, সেই পরিধির বাহিরে যখন সে চলিয়া যায়, তখন আমাদের সহজ বিচারে এবং বিশ্বাসে তাহার আর একটি পথই থাকা উচিত—উহা চরম আশ্রয়হীনতার চিৎকার। কিন্তু সংসারে দেখা যায়, এরূপ ক্ষেত্রে শুধু এই একটি জিনিষই যে সর্ব্বদা ঘটে তাহা নহে—তাহার চরম চিৎকারের মুহূর্ত্তে তাহার মুখে চিৎকার দেখিতে না পাইয়া আমরা

দেখিতে পাই, অনাবিল অফুরন্ত হাসি। সুতরাং বসিয়া বসিয়া ভাবিতে হয়, 'শিশু হাসিল কেন!'

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শিশু বাস করে অনাবিল প্রাণের রাজ্যে, মনেব রাজ্যে পা ফেলে সে কদাচিৎ। মনের রাজ্যে, সে যে একেবারে নবাগত বিদেশী; তাই পা ফেলিতে তাহার কেবলই ভয়, সংশয়, বেদনা; চঞ্চল পথিক তাই কেবলই ছুট দিতে চায় সেই অপরিচিত ভয়-সঙ্কুল বিদেশ ছাড়িয়া নিজের নিশ্চিন্তের রাজ্যে। মনের পরিধি অতিক্রম করিতে পারিয়া শিশুর তাই একটা অনাবিল আনন্দ। যে-পর্য্যন্ত মেয়েটি আপন প্রাণপ্রাচুর্য্যে অহেতুক ভাবে লীলা-চঞ্চল, তখন পর্য্যন্ত সে তাহার সহজ আনন্দেব রাজ্যেই বিচরণ করিতেছে; মা যখন তাহাকে একা ফেলিয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন তখন তিনি অকস্মাৎ একটা ধাক্কা দিয়া তাহাকে প্রাণ রাজ্য হইতে মনের রাজ্যে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন; সেখানে তাহার বিচরণ-ভূমিব পরিধি খুব বেশী নয়,—দাদু-দিদিমা বা বনগাঁ-বাসী মাসি-পিসি পর্য্যন্ত; এইটুকু পর্য্যন্ত তাহার অস্বস্তির গণ্ডি; যখন সে এইটুকু অতিক্রম করিল তখন সে তাহার মনোরাজ্য হইতে অমনি ছুট পাইল—আবার প্রতিষ্ঠিত হইল তাহার নিঃসীম নিঃশঙ্ক প্রাণরাজ্যে, তখন আবার তাহাকে কে পায়—হাসি শুধু হাসি!

'শিশু কেন হাসিল'—ভাবিতে ভাবিতে বুঝিতে পারিলাম, এই শিশু শুধু বিশেষ কোনও শিশুর ভিতরে নহে, শুধু শিশুর ভিতরেও নহে—নিখিল মানবের ভিতরে বাসা বাঁধিয়া আছে। মানুষের স্থিতি সাধারণতঃ মনের রাজ্যে; এই মনের রাজ্যে সে যে কখনও হাসে না এমন নহে, কিন্তু প্রাণ ভরিয়া খোলা মনে বড় একটা হাসিতে পারে না—তাহার আষ্টে-পৃষ্ঠে-ললাটে হাজারো চিন্তা ভাবনা। এত চিন্তা—এত ভাবনা কিসের? জীবন-সংগ্রামের ক্ষেত্রে নিজের অস্তিত্বকে টিকাইয়া রাখিবার জন্য শুধু সম্বল খোঁজা—শুধু আশ্রয় খোঁজা। খুঁজিতে খুঁজিতে মানুষ কূল-কিনারা পায় না; নিজেকে কেন্দ্র করিয়া সে একটি সীমিত পরিধিতে ঘোরাফেরা করিতে থাকে। সে শ্রান্ত হয়—ক্ষত-বিক্ষত হয়। এই জাতীয় মানসিক অবস্থান হইতে দুইটি অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে। এক অবস্থায় মানুষ জীবনের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা হারাইয়া ফেলিয়া একেবারে মুস্‌ড়াইয়া পড়ে। অন্য অবস্থায় সে সকল আশ্রয় হারাইয়া অনন্যশরণভাবে এক পরম-আশ্রয়কে সমস্ত জীবন মন দিয়া জড়াইয়া ধরে; এই পরম আশ্রয়ের স্বরূপ সে জানে না,—সেই পরম-শরণ এবং নিখিল শরণের সহিত ব্যক্তি জীবনের কি সম্পর্ক তাহাও সে জানে না,—তবু তাহার মন প্রাণ চায়—তাহাব নিজের ছড়াইয়া পড়া সমগ্র জীবনের কেন্দ্রে—শুধু তাহার জীবনের নয়—বিশ্ব-জীবনের কেন্দ্রে কেহ একজন থাকুক—যাঁহাকে আঁকড়াইয়া বিশ্ব-নিখিল বলিতে পারে,—'তুমি একজন, হৃদয়েরই ধন'—অথবা 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা!' এই যে এক পরম শরণের চাহিদা—ইহা মানুষের একটা মানসিক প্রয়োজন; নিখিল শূন্যে ঘুরিয়া মরিতেছে যে মন, তাহার একটা আশ্রয়স্থল চাই। সে যে ডালে ভর করে সেই ডালই ভাঙিয়া যায়,—শুধু বিষয় হইতে বিষয়ে—আশ্রয় হইতে আশ্রয়ে তাহাকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইতেছে; সে শ্রান্ত—তাহার বসিবার ঠাঁই চাই; এমন করিয়াই হয়ত মানুষের মনে জাগিয়া ওঠে যে পরম আশ্রয়, তিনিই জীবনদেবতা—বিশ্বদেবতারূপে মানুষেব চিত্তে নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছেন; মানুষের ধর্ম্ম-বোধের উদ্বোধের ভিতরে এ হয়ত একটি মৌলিক সত্য।

বলিতেছিলাম জীবনের মধ্যে শিশুর মত মন খোলা হাসির কথা। কাহারও কাহারও জীবনে এই হাসি সম্ভব হইয়া উঠিতে পারে ব্যক্তি-জীবনের এবং বিশ্ব-জীবনের কেন্দ্রে এইরূপ একটি পরম আশ্রয় 'একে'র প্রতিষ্ঠা করিয়া, তখন সংসারের যে অবস্থার ভিতরেই থাকুক না কেন, সে পরম নির্ভরের ফলে পরম নির্ভয়ে বলিয়া উঠিতে পারে—

'সবাই ছেড়েছে নাই যার কেহ,
তুমি আছ তা'র, আছে তব স্নেহ,—
নিরাশ্রয় জন, পথ যার গেহ,
সেও আছে তব ভবনে;'

এইভাবে পরম 'একে'র মধ্যে সমাহিত হইতে পারিলে মনোরাজ্য অতিক্রম করিয়া প্রাণ খোলা হাসির রাজ্যে

পৌঁছিবার একটি পথ মেলে। এই যে পরম-ইষ্ট বা পরম আশ্রয়, ইহা অনেকখানি স্পষ্ট এবং নির্দ্দিষ্ট। স্বরূপে ইহা যাহাই হোক না কেন, মানুষের বিশ্বাস ইহাকে একটা রূপও দান করিয়া লইয়াছে, একটা স্বরূপও দান করিয়া লইয়াছে, এবং বিশ্বাসী মানুষ সর্ব্বদাই বলিতে থাকে—

'ভুলে যদি থাকি প্রভু ভাস্তিও না ভুল।'

কিন্তু আমরা যে মূল প্রশ্ন দিয়া আরম্ভ করিয়াছিলাম, অর্থাৎ, 'শিশু কেন হাসিল,' সেই প্রশ্নে ফিরিয়া গেলে দেখিতে পাই, শিশু সকল আশ্রয় হারাইয়া কোনও 'এক'কে আশ্রয় করিয়া হাসে নাই—নিরালম্ব চিত্তে হাসিয়াছিল। এই নিরালম্ব চিত্তে হাসির তাৎপর্য্য কি? আমার মনে হয়, ইহা আমাদের মনের অজ্ঞাতে এক প্রকারের 'ব্রহ্ম-বিহার'। ব্রহ্ম বিহার কথাটিকে এখানে আমি ইহার বৌদ্ধ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করিতেছি না, সাধারণভাবে ইহার আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার করিতেছি। ব্রহ্ম-বিহারের অর্থ সর্ব্ববিধ সীমাকে অতিক্রম করিয়া বৃহতের ভিতরে অবস্থান, দেহে মনে আত্মায় এক অজানিত বৃহতের ভিতরে অবস্থানেই আমাদের গভীর আনন্দ।

একটি শিশু যখন সহসা এমন একটা অবস্থার সম্মুখীন হয় যেখানে সে তাহার অতি স্তিমিত চেতন-লোকের ভিতরে একান্ত অবোধপূর্ব্বভাবে অনুভব করে যে, তাহাকে ঘিরিয়া তাহার চারিপাশে কেহ নাই, তাহার সেই পরিচিত জগৎটিও নাই—শুধু সে আছে—তখন সে তাহার একটা উপাধিমুক্ত বিশুদ্ধ সত্তায় অবস্থান করে—সেই উপাধিহীন বিশুদ্ধ সত্তায় স্থিতিই এক প্রকারের আনন্দময় ব্রহ্ম-বিহার। শিশু নিজে ইহার আর কোনও অংশই জানে না, শুধু আনন্দানুভূতির অংশটুকুর ভাগীদার হয়।

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের স্থূলতার মধ্যেও এই আনন্দময় 'ব্রাহ্মী স্থিতি'র আভাস আমরা সময় সময় পাইয়া থাকি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের স্থূল জৈবিক সত্তায় আমরা যখন আত্মকেন্দ্রিক ভাবে অবস্থিত থাকি, তখন কায়মনোবাক্যে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার প্রচেষ্টাই আমাদের মুখ্য হইয়া ওঠে; কিন্তু ইহারই ফাঁকে ফাঁকে একদিন প্রভাত বেলা যখন দেখিতে পাই, সোনার আলো ছড়াইয়া পড়িয়াছে সবুজ মাঠের ঘাসে ঘাসে, প্রান্তরের গাছে গাছে—অদূরের জঙ্গলা ভূমি হইতে ভাসিয়া আসিতেছে কাকের আর শালিকের কা-কা কিচির-কিচির কোলাহল—একটু দূরে ঘুঘুর ঘুঘুঘু-ঘু ঘুঘুঘু-ঘু রব তখন সহসা ক্ষণিকের জন্য অন্ততঃ মনে হয়,- আমার চারিদিকে মাটির নীচে—মাটীর উপরে—কি অফুরন্ত প্রাণের লীলা! তৃণেগুল্মে, তরুলতায়,পশুতে-পাখীতে—চারিদিকে প্রাণ—শুধু প্রাণ—সে এক 'নিরাধার মহাপ্রাণ!' এই 'নিরাধার মহাপ্রাণে'র সহিত যদি মুহূর্ত্তের জন্যও নিজের প্রাণ-প্রবাহকে যুক্ত করিয়া দেখিতে পারি, তাহাতেই গভীর আনন্দ; ইহাকেই আমি বলি প্রাত্যহিক স্থূল জীবনে 'ব্রাহ্মী স্থিতি'র অস্পষ্ট আভাস। এই আভাসের ক্ষণিক স্পর্শও চিত্ত-আনন্দে ভরপুর হইয়া যায়—শুধু সেই শুভ মুহূর্ত্তেই দেখা দেয় মানুষের মধ্যে অনাবিল হাসি—অন্ততঃ মুহূর্ত্তের জন্যও প্রাণখোলা হাসি।

ভস্মাবশেষ

সমীরকুমার মুখোপাধ্যায়

পূর্ব্বপুরুষের মধ্যে সম্ভবতঃ রোগটার বীজ নিহিত ছিল। অদূর বংশধরের মধ্যে তাই বুঝি সেটা অঙ্কুরিত হ'তে চ'লেছে। অন্ততঃ দুর্গামণির তাই ধারণা। নইলে যে মানুষটা ক'বছর আগেও হাসিখুসী ভাবে ঘুরে বেড়িয়েচে, কাজ ক'রেচে সাধারণ মানুষের মত, কথা-বার্ত্তা, হাবভাব আর চালচলনে কোন অসঙ্গতিই যার সেদিন চোখে পড়েনি কারুর, আজ ক' বছর বাদে বিয়ের কিছু পরেই তার এই বিস্ময়কর অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন কেমন ভাবে সম্ভব হ'তে পারলো?

পাড়া-পড়শীরা যে-মাত্রায় বিস্মিত হয়, তার চেয়ে বেশী পরিমাণে বিস্মিত হন দুর্গামণি নিজে। আর বিস্মিত হবারই কথা।

রাত্রে ঘুম আসতে চায় না দু'টো পোড়া চোখে। অতি শীতের দিনেও গরম বোধ করেন দুর্গামণি। চোখ দু'টো জ্বালা করতে থাকে,—মাথাটা করতে থাকে ঝিম্‌ঝিম্। কাণের মধ্যে দিয়ে যেন রেল ইঞ্জিন চলতে থাকে।

অসহ্য বেদনায় পাখা দিয়ে বাতাস করতে থাকেন নিজেকে। দুর্ভাবনায় ছট্‌ফট্ করতে থাকেন কেবল। আর এ দুর্ভাবনা শুধু কি তাঁরই? আরও একজনে ভুগচে এই রোগে যার দুশ্চিন্তা আর মনোবেদনা তাঁর চেয়েও গভীর—তাঁর চেয়েও মর্ম্মস্পর্শী।

অথচ উপায় নেই কোন। বিকৃত বুদ্ধি আর অপরিণত মন, যেখানে চ'লেছে অভ্যস্ত—সরল চিরাচরিত পথে, অনুরোধ জানিয়ে—উপদেশ দিয়ে—কোন কিছু ব'লে ঘটনার মোড় ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা সেখানে শুধুই বিড়ম্বনা মাত্র।

কথাটা খাটে দু'জনের পক্ষেই। এ ঘরে শক্ত কাঠের তক্তাপোষে রুক্ষ শয্যায় শুয়ে বিধবা দুর্গামণি তাই দুশ্চিন্তা আর অমঙ্গল আশঙ্কায় ছটফট করতে থাকেন, অ'র ওঘরে যৌবনোচিত পেলব শয্যায় শুয়েও এক কিশোরী বধূর ক্ষুধিত শূন্য হৃদয় শুধুই নিস্ফল হাহাকার করতে থাকে।

সবই বুঝতে পারেন দুর্গামণি। যে-কারণে ঘুম আসে না তাঁর চোখে—ঠিক সেই কারণেই অন্যজনেরও। চোখের সামনে একটা দেওয়ালের আড়াল থাকলেও সবই স্পষ্ট দেখতে পান তিনি।

যৌবনবতী কিশোরীর নিস্ফল কাতরোক্তি—অসহ্য বেদনার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি।......পুরুষহীন নিঃসঙ্গ জীবন—বিস্বাদ আর মূল্যহীন। পাশে শুয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে বছর চারেকের ছেলেটা। তাকে চাপড়ে—বারবার বুকে জাপটে ধ'রে—চুম্বন ক'রে তৃপ্তি পাচ্ছে হয়তো। অসীম যন্ত্রণা। আর সম্বল যা তা হচ্ছে চোখের জল। আর কিছু নেই।

সাধারণ লোকে আখ্যা দেয়—পাগল। শত্রুরা কিন্তু তার সংগে আরও দু'একটা সাংঘাতিক কথা জুড়ে দিয়ে তৃপ্তি পায়।

দুর্গামণির মন কিন্তু প্রবল অস্বীকৃতি জানায়। না না পাগল নয়। লোকে বলে বলুক। সবাই বলুক। আকস্মিক বিপর্য্যয় গোছের কিছু একটা ঘটে গেছে বোধ হয় লোকটার ওপর দিয়ে। তারই অনিবার্য্য পরিণতি স্বরূপ মাথাটা হয়তো একটু বিগড়ে গেছে—মেজাজটা হ'য়েচে একটু খিট্‌খিটে। তাই বলে পাগল বলা তাকে চলে না মোটেই।

দিনকতক বাড়ীতে থাকে। সকালে দুপুরে কাজে যায়—কারখানায়। বাড়ীতে ফিরে আসে। দিনকয়েক পরেই আবার কোথায় উধাও হ'য়ে যায়।

কয়েকটা দিন পথে ঘাটে কাটায়। দোকানে বা রেষ্টুরেন্টে খায়, নদীর ঘাটে, কোন সম্ভ্রান্ত লোকের বার-

বাড়ীর দেউড়িতে অথবা পথে ঘাটে কিংবা গাছতলায় যেখানে হোক পড়ে ঘুমোয়। দু'দিন বাদে আবার অপ্রত্যাশিতভাবে ফিরে আসে। নিজের রোজগার থেকে কিছু টাকা দেয় সংসারের জন্যে। দুর্গামণি হয়তো কোন কাজে ব্যস্ত, সেখানে গিয়ে মেঝের ওপর তাঁর সামনে টাকা ক'টা রাখে তারপর মেঝের দিকে চেয়ে থেকে নির্লিপ্তকণ্ঠে বলে, "টাকা কটা রইলো।"

দুর্গামণি হয়তো বেশ আগ্রহ ভরে তার সংগে কথা কইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু দু'একটা কথা, বলতেই বিতৃষ্ণা ধরে যায় তাঁর। কোন উত্তর দেয় না সে। বড় একটা কথা বলতে চায় না। তবু কচিৎ দু'একটা সংক্ষিপ্ত 'হ্যাঁ' বা 'না' দিয়ে তার উত্তর শেষ করে।

তবু আর একবার চেষ্টা করেন তিনি। এদিক ওদিক চেয়ে নিম্নস্বরে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলেন, "ওই সংগে বৌমাকেও কেন দু'টো টাকা দিয়ে দে না! আহা, ছেলে মানুষ। বড় কষ্ট ওর। দে না বাবা!"

সংগে সংগেই তার মুখখানা কঠিন হ'য়ে যায়। চোখ দু'টো জলুজল করতে থাকে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ক্ষণিকের জন্যে একবার দুর্গামণির দিকে তাকিয়ে সংগে সংগেই দৃষ্টিটা ফিরিয়ে নেয়। একটু ভয় পেয়ে যান তিনি।

ট্যাকে গোঁজা অবশিষ্ট টাকা থেকে এবার বিপিন একটা এক টাকার নোট বার করে, তারপর নির্লিপ্ত মুখে রেখে দেয় সেটা মেঝের ওপর। দ্রুতপদে উঠে যায় তখন সেখান থেকে।

এমনিই চলে আসচে বহুদিন ধ'রে। কোন আকর্ষণ নেই—নেই কোন নিজস্ব রুচি বা সখ। কোন দাবী-দাওয়া নেই কারুর কাছে। সংসারে কারুর দিকে তেমন ফিরেও তাকায় না। কোন বক্তব্যও পেশ করে না কারুর কাছে। লোকটা নিজের মধ্যেই নিজে সর্ব্বদা মশগুল।

অথচ মজা এই, যে, সাধারণতঃ উদাসীন হ'লেও অনেক বিষয়ে দেখা যায় তার উচ্ছ্বসিত কৌতূহল। সংসারে বিনা প্রয়োজনে বড় একটা কারুর সংগে তাকে কথা বলতে দেখা যায় না—কিন্তু তবু এই অন্তর্মুখী লোকটারও আছে অনেকগুলো বন্ধুবান্ধব।

চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে বসে প্রফুল্লমনে গল্পগুজব করতে করতে চা খায় আর কারণে অকারণে শুধু হাসে। তবু আশ্চর্য্য হ'তে হয়, যে, সে হাসির সংগে কোন অস্বস্তিকর উদাসীনতার ছোঁয়াচ নেই—নেই তাতে কোন কিছুকে নির্ম্মমভাবে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা।

দেহমনের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে আশার সুর ধ্বনিত করে তোলেন দুর্গামণি। হাল ছাড়লে চলবে না। চেষ্টা করে যেতে হবে অসীম ধৈর্য্যের সংগে। হয়তো একটা সাময়িক মনোবিকার। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই তাই। নইলে বংশের অতবড় একটা জলজ্যান্ত ছেলে, অতীতে যার নাম বেশ প্রশংসার সংগেই ঘুরতো লোকের মুখে মুখে,—সেই ছেলে কিনা এমনভাবে—

(২)

ঠিক তিন রাত্তির বাইরে কাটিয়ে আজ সকালবেলায় এসে উপস্থিত হোল বিপিন। চুলগুলো রুক্ষ আর অবিন্যস্ত। পরণে ছেঁড়া আধ-ময়লা একটা ঢলঢলে গেঞ্জি আর তেমনি ময়লা মোটা একটা সাতহাতি ধুতি। পায়ে জল-কাদা মাখা অল্প দামী একটা রবারের জুতো। মস্ত বড় একটা গর্ত্ত দিয়ে ডান পায়ের একটা আঙুল উঁকি দিচ্ছে। আর সারা মুখটায় খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

এসেই সোজা ঘরের ভেতরে তক্তাপোষের ওপর বসে পড়লো। সে বসে পড়ার মধ্যে কোন অবসাদ নেই—নেই কোন অস্বাভাবিকতার ছাপ—অত্যন্ত সহজ আর স্বাভাবিক।

প্রথম কয়েকটা মুহূর্ত্তে বড় উস্‌-খুস্ করতে লাগলেন দুর্গামণি। পরে আর থাকতে না পেরে সব কাজ ফেলে এসে ঘরে প্রবেশ করলেন। মুখ নীচু করে নখ দিয়ে পায়ের তলাকার একটু শক্ত মাংস খুঁটছিল বিপিন। দুর্গামণি প্রথমে দু' একটা অবান্তর প্রশ্ন দিয়ে আরম্ভ করলেন। তার দু'একটা সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল বিপিন। বেশ স্বাভাবিক কথাবার্ত্তা। কোথাও কোন অসংগতি নেই। বেশ বিস্মিতই হন দুর্গামণি। তা'হলে গলদটা যে কোথায় তাও বুঝে উঠতে পারেন না। আচ্ছা সমস্যায় ফেলেচে বাবা। অস্বস্তি বোধ করেন তিনি।

পরে সাহস ক'রে ছেলের কাছে তারই বিরুদ্ধে নিজেদের কয়েকটা অভিযোগ আনলেন। ছেলে চুপ ক'রে রইলো। পরে কিন্তু এমন ভাবে আলগোছে চাইলো দুর্গামণির মুখের দিকে যে তার বিরুদ্ধে তাঁরই আনীত অভিযোগের সত্যতা সম্বন্ধে অবশেষে সন্দিহান হ'য়ে উঠলেন।

ব্যাপারটা যে ঘোরালো সন্দেহ নেই। দুর্গামণি অস্বস্তির সংগে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

শান্তিও নেই মনে। স্বামী এসেছে বাড়ীতে—বউ সুষমাও তাই প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে আসপাশে ঘোরাঘুরি করে। একজন হয়তো বা ভয়ে ভয়ে অপরের মুখের দিকে তাকায়—কথা বলবার চেষ্টা করে, অপরজন কিন্তু ভুলেও সেদিকে ফিরে তাকায় না। বউ অন্ততঃ অভিমানে না হোক্, লোকটার নির্লিপ্ত মনকে একটু দোলা দিয়ে খুসী হবার আশায় সামনে দিয়ে দুম্ দুম্ পা ফেলে বেরিয়ে আসে।

অবশেষে দুর্গামণি হাল ছেড়ে দেন। অনেক বিশ্লেষণ ক'রে দেখবার পর দুপুরে যে ধারণাটা উদয় হোল, সন্ধ্যে বেলায় সেটা হ'য়ে গেল বদ্ধমূল। হ্যাঁ, মন তাঁর সর্ব্বান্তঃকরণে সায় না দিলেও অত্যন্ত দুঃখের সংগেই লক্ষ্য করেন—লোকের কথা একেবারে উড়িয়ে দেবার মত নয়।

পাগল। পাগলই হ'য়ে গেছে তাঁর বিপিন। তবে আর পাঁচটা পাগলের মত নয়—অন্যরকম, এই যা। অনেক ভেবে দেখে—অনেক দিক দিয়ে গম্ভীর ভাবে বিশ্লেষণ ক'রে দেখে তবে এই নিদারুণ মর্ম্মস্পর্শী সিদ্ধান্তে আসতে হ'য়েচে।

দেহমন ভেংগে যায় দুর্গামণির। কোন কাজে মন বসে না আর। কথাটা ভাবতেও—

তাঁরই আদরের বিপিন—তাঁর নাড়ি-ছেঁড়া ধন! সংসারের খুঁটি! মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে তার। যা কোনদিন কেউ ভাবতে পারে নি। তবু যা হ'য়েচে তা ঠিকই—নির্ম্মম সত্য।

আর তো সুষমার কাছে অপরাধী সেজে বসে থাকা চলে না। কথায় হাবভাবে আকারে প্রকারে তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে তা।

হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে উঠে আসে একটা সকরুণ দীর্ঘশ্বাস।

(৩)

সিদ্ধান্তটা যে অপ্রিয় হ'লেও সত্যি, তার একটা অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় পরের দিন দুপুরে।

দুর্গামণি কি কাজে যাচ্ছিলেন ভাঁড়ারের দিকে। আধ-পথে গিয়ে আর্ত্তনাদ করতে করতে ফিরে এলেন।

"বৌমা, দ্যাখগে যাও বিপিনের কাণ্ড। উঃ, শেষ কালে আমাদের এমনভাবে—"।

সুষমা রান্নাঘরে ময়দা মাখছিল। শাশুড়ীর চীৎকার শুনে দ্রুতপদে উঠে এলো। স্বামীকে চেনে সে। বিশেষতঃ এ কদিনে বেশ ভালভাবেই চিনেচে। একটা কিছু অঘটন ঘটিয়েচে বোধ হয়। এই রকমই কিছু একটা আশা করছিল ও।

"কি হয়েচে,—চেঁচাচ্ছেন কেন?"

"না, চেঁচাবো আর কেন? যা হবে সব মুখ বুজে দেখে যাব। আমারও হ'য়েচে এক জ্বালা, নইলে—"

"হ'য়েচে কি তাই বলুন না?"

"আর পারি না বাবা তোমাদের সংগে। যা খুসী হয় করগে তোমরা।—আমি ওসবের ভেতর নেই।"

সুষমার জিজ্ঞাসু চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এসো, দেখবে এসো।"

দুর্গামণি আগে আগে চললেন বিপিনের ঘরের ভেতর। সুষমা পেছন পেছন গিয়ে উপস্থিত হোল—দেখলে সবই।

কিন্তু এতে আর চেঁচামেচির কি আছে? এমন কিছু হয়নি যার জন্যে—

"দ্যাখো, দ্যাখো বৌমা বিপিনের কাণ্ড।"

সুষমা নীরবে অগ্রসর হোল—গিয়ে দাঁড়ালো বিপিনের ঠিক পাশটীতে।

লোকটার কিন্তু কোনদিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই। বড় সুটকেশটার ওপরে সুষমার একটা এবং কেবল মাত্র একটাই আটপৌড়ে শাড়ী ছিল। সেটাকে টেনে বার ক'রেচে বিপিন। কাঁচি দিয়ে সমানভাবে তাকে দ্বিখণ্ডিত ক'রেচে—তারপর ছুঁচসূতো দিয়ে সেলাই করচে।

এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পারলো সুষমা—লুঙি তৈরী হচ্ছে। চেঁচামেচি; দু'জন লোক হুড়মুড় ক'রে ঘরের ভেতর ঢুকে প'ড়েচে আগ্রহ ভরে, বিপিন কিন্তু তাকে আমলই দিল না। মুখ তুললো না পর্য্যন্ত—আপন মনে কাজ ক'রে চলেচে।

সুষমার এই নীরবতায় একটু বিরক্তই হোলেন দুর্গামণি, বললেন, "চেয়ে দেখচো কি?—কি করবে এবার করো।"

সেই সঙ্গে অস্ফুটস্বরে গালিগালাজ করলেন ছেলেকে। কানা চোখো। দেখতে পারনা কিছু? অভাবের সংসার দুটোর বেশী তিনটে শাড়ী নেই সুষমার। প্রথমটা সকালে কেচে দেয়—দ্বিতীয়টা পরে। বিকেলে দ্বিতীয়টা কেচে দেয়—প্রথমটা পরে। এমনিই চ'লে আসচে চিরকাল। সুষমাও কোনদিন মুখ ফুটে কিছু বলে নি।

শুকনো কাপড়টা রেখে দিয়েছিল সুষমা সুটকেশটায়। আজই বিকেলে পরবে। আর সেটাকে কি না হতচ্ছাড়া উন্মাদটা—!

দুর্গামণির ছোট ছেলে নবীন বাড়ী এলো। বছর চব্বিশ পঁচিশ বয়স। বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্যবান, মাথায় কোঁকড়ানো চুল। বাড়ীর সবাইকে এ ঘরে জড়ো হ'তে দেখে সে এসে ঢুকলো এ ঘরে।

দুর্গামণির ক্রুদ্ধ দৃষ্টির অনুসরণ ক'রে মেঝেতে বসে বিপিন যেখানে একটা লুঙি শেষ ক'রে অপরটা শেষ করতে চ'লেছে, সেই দিকে তাকালো নবীন। দেখলো সবই! কোন কথা না ব'লে সে রাগতঃভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

সুষমা একবার শাশুড়ির কাণে কাণে বললে—"যাকগে যা হ'বেচে হ'য়েচে—আর কিছু বলবেন না।"

দুর্গামণি ঝাঁঝিয়ে উঠলেন: "না তা বলতে যাব কেন? বেশ তো লুঙি করবে করুক না—নিজে রোজকার করে না ও? অপরের জিনিষে হাত দেয় কেন?··· ঝেঁটিয়ে সিধে ক'রে দিতে হয়—।"

চুপ ক'রে গেলেন। সুষমা কর্ম্মরত লোকটার দিকে চেয়ে হাসচে মিটি মিটি।

খুসী মনে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। হাসিমুখে সুষমা দাঁড়িয়েচে গিয়ে বিপিনের ঠিক পাশটিতে—গা ঘেঁষে। হাসচে হাসুক। এবারে কথা কইনে হয়তো দুটিতে। আহা, তাই হোক। ভগবান যেন মুখ তুলে চান। বুকের জ্বালা জুড়োক মেয়েটার।

প্রফুল্লমনে ঘরে গিয়ে দুর্গামণি সুষমার অসমাপ্ত ময়দাটা ঠেসতে লাগলেন। কিছু শুনতে পাচ্ছেন ওদের কথা? ধ্যুৎ? ওরা কি বলবে লোককে শুনিয়ে শুনিয়ে? আস্তে আস্তে কইবে দুজনে মনের কথা।

সুষমা প্রথমে বুকটা হাল্কা করবার আশায় কথা কইতে চাইবে হয়তো, কিন্তু তবু অভিমানভরেই চুপ ক'রে থাকবে। হ্যাঁ, বিপিন—তাঁর উন্মাদ বিপিনই, হুস হ'য়ে মান ভাঙাতে চেষ্টা করবে বউয়ের। তখনই কথা কইবে সুষমা। স্বামীর চোখের ওপর নিজের চোখ রেখে বলবে অভিমানভরে, "কিন্তু আমাকে বললেই পারতে—স্বেচ্ছায় কাপড়টা দিয়ে দিতুম। তাতে কি আমার কম সুখ গো?"

প্রথমটায় ভাবাবেগে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হ'য়ে আসবে বিপিনের—কথা কইবে না কোন। সপ্রেম দৃষ্টিতে শুধুই চেয়ে থাকবে স্ত্রীর মুখের দিকে। ভাবটা বোধ হয় এই যে, "আমি যে যেচে তোমার কাপড়টা নিয়েচি, তাতে তোমার কি কম সৌভাগ্য?"

তখন বেশ নির্ভয়ে স্বামীর কাঁধে একটা হাত রেখে জোরের সঙ্গেই বলবে সুষমা, "তা ক'রেচ বেশ। তবে এই মাসেই দুটো শাড়ী কিনে দিতে হবে আমায়—কোন কথা শুনবো না। আর খোকার জন্যে একটা ভাল ছিটের জামা। ওর একেবারেই নেই।"

আত্মসম্বিৎ ফিরে পান। কিন্তু এত দেরী হচ্ছে কেন? সহসা পেছনে চুড়ির শব্দ শুনে ফিরে তাকান। তাঁর অজ্ঞাতসারেই কখন এসে বসেচে সুষমা—মুখ নীচু ক'রে কুটনো কুটছে।

হঠাৎ এক সময় হতভম্ব হ'য়ে যান তিনি। সুষমার দু'চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে দর দর ধারায়। সমস্ত শরীরটা কি একটা অব্যক্ত বেদনায় থর থর ক'রে কেঁপে কেঁপে উঠচে। বার বার। মুখের চেহারাটা যন্ত্রণায় লাল হয়ে

উঠেচে। দেখে মনে হয় আগে কয়েকবার লুকিয়ে লুকিয়ে শাড়ীর আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছেচে সুষমা। এই প্রথম সুষমার চোখে দরবিগলিত ধারায় এই ধরণের বেদনাশ্রু দেখতে পান তিনি।

বিচলিত হয়ে সহসা চীৎকার ক'রে ওঠেন তিনি। "কি হোল বৌমা? অমন ক'রে —?"

কথা বলতে গিয়ে বার কয়েক গলাটা কেঁপে উঠলো সুষমার, পরে বললে দম নিয়ে—"আমার—আ-মার গলা টিপে দিলেন।"

দুর্গামণি আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলেন: "এ্যা। বৌমা, তোমার গলা টিপে দিলে হতচ্ছাড়াটা?"

সুষমাকে নীরব দেখে আবার বললেন—"উঃ, আমার হ'য়েচে এক জ্বালা। আর পারি না বাছা···তা, কি হয়েছিলো বলতো?"

সব ব'লে যায় সুষমা, বাদ দেয় না কিছুই। মাগো! মানুষটাই দূরে সরে গেছেন তার কাছ থেকে—হারাতে বসেচে আজ তাঁকে সব দিক থেকে—আর ও যাবে কাপড় কেটে লুঙি তৈরী করবার জন্যে তাঁর কাছে কৈফিয়ৎ তলব করতে। মাগো, মরণ হয় না তার? ওরকম কিছুই বলে নি সে। সেরকম মেয়ে নয় ও। শুধু অনেকক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকবার পর সাহস করে কাছে গিয়ে অল্প হেসে বলতে গেছলে একবার, "বললেই পারতে—আমি নিজেই সেলাই করে দিতুম। ছিছিছিছি—। তাইতেই ত্যো—"

রাগে আর উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে দুর্গামণি ছুটে যান বিপিনের ঘরের দিকে।

"ওরে হতচ্ছাড়া—ওরে,···বৌয়ের গায়ে হাত তুলেছিস? তোকে নিয়ে কি করি আমি?"

কিন্তু কোথায় বিপিন? লুঙি সেলাই শেষ ক'রে একটা ময়লা জামা গায়ে দিতে দিতে ঠিক সেই সময় পথে গিয়ে পড়লো সে। সহজ আর স্বাভাবিক তার প্রস্থান। ভাবলেশ হীন মুখ চোখ। যেন কিছুই হয় নি।

সব কিছুকে চোখ কান বুজে সয়ে যাওয়ার মত মানুষ মন দুর্গামণি। তাই আবার ছুটলেন নবীনের ঘরের দিকে।

"জানিস নবীন? বৌয়ের গায়ে হাত তুলেচে বিপ্‌নে। এত বড় আস্পর্দ্ধা ওর? গলা টিপে দিয়েচে? কেন আমরা কি সব ম'রে গেছি।'···শুনচিস্?"

(৪)

প্রথমটায় অনেক আশা আশ্বাস আর সান্ত্বনার মধ্যে কাটলেও এখন কিন্তু ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে গেছে সুষমার।

তাই দিন তিনেক পরে বিপিন যখন আবার এসে উপস্থিত হোল এবং পূর্ব্বেকার মতই দিন তিনেক থেকে পথে বেরিয়ে পড়লো, তখনই সে মন স্থির ক'রে ফেললো।

শাশুড়ী আর নবীনের তরফ থেকে অবশ্য তাকে সান্ত্বনা আর আশ্বাস দেওয়ার ত্রুটি নেই। তবু আজ সেই সান্ত্বনা বা আশ্বাসের দাম কতটুকু।"

নবীন অবশ্য তাকে একরকম কথা দিয়েই রেখেচে। বেকার ব'সে থাকার পর কিছুদিন হোল ও একটা চাকরী পেয়েচে। ব'লেচে "বৌদি এমাসে মাইনে পেয়েই আমি তোমাকে একখানা ছেড়ে দু'খানা শাড়ী কিনে দোব। ওর জন্যে ভেবো না কিন্তু।"

এটা আবার একটা ভাবনা না কি? অতি দুঃখেও হাসি পায় সুষমার। বয়স হোলেও নবীন এখনো শিশু। অবশ্য পরক্ষণেই ব'লেচে সে নিম্নস্বরে, "আর দাদার সম্বন্ধে ভেবো না কিছু। আগে তো বেশ ভালই ছিল। এ ক'দিনে কেমন যেন হ'য়ে গেছে। তবে আমি এর ভার নিচ্ছি—ঠিক ক'রে দোব সব; আগে যেমন ছিল। এ একটা সাময়িক মনোবিকার গো'ছের। অন্ততঃ আমার তো তাই মনে হয়। কিছু নয়—শুধু দুদিন কষ্ট ক'রে ধৈর্য্য ধ'রে থাক। ব্যস,—সব ঠিক হ'য়ে যাবে।"

বুঝেচে সুষমা—এ শুধু নিষ্ফল সান্ত্বনা। আগে যেমন ছিল সব যে ঠিক সে রকম হয়ে যাবে সে সম্বন্ধে ওদের নিজেদেরই সন্দেহ আছে। ওদের ভাবভংগী দেখেই তা বুঝতে পারা যায়।

তবে নবীন তাকে শ্রদ্ধা করে—ভালবাসে বেশ। বৌদির মুখে হাসি ফোটাতে চেষ্টার আর অন্ত নেই ওর।

শাশুড়ী দুর্গামণিও প্রায় বসে নেই। এই অবাঞ্ছিত অস্বস্তিকর পরিবেশ থেকে মুক্ত হবার জন্যে তিনি সুষমার

অজ্ঞাতসারে অনেক কিছুই করে থাকেন যার কিছু কিছু জানলেও সবটা জানে না সে।

তবু আজ আর স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, একরকম মনস্থির করেই ফেলেছে সুষমা।

দিন তিন চার পরে তাই যখন রান্নাঘরে একদিন নবীন খেতে বসেচে আর দুর্গামণি আনুষংগিক আজ্ঞকর্ম্ম করচেন, তখন সুযোগ বুঝে সুষমা কথাটা পাড়লো।

দুর্গামণি বললেন, "তা বেশ তো ঘুরে এসো না দিনকতক হুগলী থেকে? আহা! মন কেমন করে তো! কতদিন দেখেনি ওদের! তাহলে নবীনই নিয়ে যাক—"।

বাকী কথাকটা দুর্গামণিকে শেষ করতে না দিয়ে মুখ নীচু করে বেশ দৃঢ়তার সংগেই সুষমা বললে, "আমি একেবারেই যাব।"

হুগলীতে সুষমার বাপের বাড়ী।

শুনে দুর্গামণি হতভম্ব হ'য়ে গেলেন। ভাতের একটা দলা আটকে গেল নবীনের গলায়।

আবার বললে সুষমা, "আমি বাড়ীতে চিঠি দিয়ে দিয়েচি।"

হুগলী থেকে চিঠি পেয়েচে সুষমা। আর দুদিন বাদে ওর ছোট ভাই ওকে নিতে আসবে। দম বন্ধ হয়ে আসচে এখানে—আর এ জায়গায় একদণ্ডও থাকতে ইচ্ছে নেই তার।

এবার বিপিন বাড়ী থেকে বেড়িয়েচে প্রায় ছ'দিন হোল। আজ শনিবার। কারখানা থেকে হপ্তা নিয়ে সন্ধ্যের সময় ফিরে এলো। একটা ছোট চটের থলির মধ্যে এক্ছড়া পাকা কলা, কিছু তরি-তরকারী আর মাছ নিয়ে এসেচে।

এই অভাবিত পরিবর্ত্তনে বাড়ীর তিনজন প্রাণীর দু'জনের মধ্যে, বিস্ময়ের ভেতর দিয়ে আশার সঞ্চার হোল আর অন্যজন শুধুই গতানুগতিক দৃষ্টি দিয়ে দেখে গেলো সব। অন্য দু'জনের মত এর মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছুই দেখতে পেল না।

তবু মানুষ মানুষই। দেবতা নয় সে। দেবতা হ'তেও পারতো, যদি তার মধ্যে যে আবেগ-অনুভূতির বাসা, তার দাম থাকতো না তার জীবনে কোনই, মানসিক কোন অবস্থাই তাকে পারতো না যদি টলাতে।

যদিও আজ বিশ্বাসের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে সুষমার। সে জায়গায় এসে প্রবেশ করেচে অবিশ্বাসের লোনা জল

তবুও কি জানি কেন আজ বড় অধীর হয়ে উঠেচে সে, মরিয়া হয়েই স্বামীর ঘরের আসপাশে বড় ঘোরাঘুরি করছিল।

আর বিপিনের অতীত জীবনটা আজ ক'দিন ধ'রে সুষমার মনে পড়ছিল বারবার।

বর্ত্তমানে যাই হোক, অতীতে বিপিন লোকটা মন্দ ছিল না মোটেই। সে কথা সুষমা শুনে আসচে এ বাড়ীতে এসে অবধি।

বিপিন আর নবীনের শৈশবে এ বাড়ীর অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল ছিল না। স্বামী চোখ বুজতে চোখে অন্ধকার দেখেন দুর্গামণি। কি আর করেন, মান সম্ভ্রম বিসর্জ্জন দিয়ে দু'তিনটে বাড়ীতে রাঁধুনির কাজ করতে লাগলেন। তাইতেই কোন রকমে সংসার চলতো।

শুধু পড়াশোনা কেন, সব বিষয়েই কি উৎসাহ ছিল বিপিনের। আলোর সুব্যবস্থা ছিল না বাড়ীতে; তবু কিছুই টলাতে পারেনি তাকে। বাইরে রাস্তার গ্যাসের আলোয় সাঁকোর উপর বসে পড়া তৈরী করতো। সকাল সন্ধ্যায় দুর্গামণি কাজে বেরিয়ে যেতেন। সে সময় বিপিন বাড়ীর রান্নাবান্না সব একাই করতো—নবীনকে খাইয়ে নিজে খেয়ে ইস্কুলে যেত। ছোট্ট ভাইটাকে কি ভালই না বাসতো। অথচ বাড়ীতে কেউ থাকতো না—একা ছোট্ট ছেলে কোথায় জলে-টলে গিয়ে পড়বে, তাই নবীনের মঙ্গলের জন্যই ওর কচি পায়ে আলগোছে দড়ি বেঁধে জানলার সংগে বেঁধে রাখতো, কিংবা পাড়াপড়শীর জিম্মায় তাকে রেখে যেত। মাঝে মাঝে অবশ্য দুর্গামণি নবীনকে যাবার সময় সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন; তবে তাতে এই দুরন্ত ছেলেকে নিয়ে বড় অসুবিধেয় পড়তে হোত।

এ ছাড়া বাড়ীতে কাজেরও আর শেষ ছিল না বিপিনের। তবু কোন অসুবিধে হোলে ওরই মধ্যে অবসর সময়ে পাড়াপড়শীর বাড়ী গিয়ে আগ্রহভরে পড়া জেনে

নিত। আর প্রত্যেকবারই ক্লাসে ফার্ষ্ট হোত—তাতে পুরস্কারও পেয়েচে কত।

শুধু তাই নয়, চিরকালটাই ছিল এই রকম। প্রতি-বেশীদের মুখে মুখে ওর নাম ঘুরতো প্রশংসার সঙ্গে। সবার ছিল আদর্শ।

ব্যতিক্রম হ'য়েচে শুধু বর্ত্তমানে। আর আজ নবীনের ওপর ওর শুধু অহেতুক বিদ্বেষই নেই, সেই সঙ্গে তার ওপর ওর নির্লজ্জ সন্দেহ আর ঘৃণা। নবীনের সম্বন্ধে যে কটূক্তি করতেই আজ আর বিপিনের বাধে না।

হাত-পা ধুয়ে রোজকার মত তক্তাপোষে বসে বসে একটা আধ-পোড়া বিড়ি টানছিল বিপিন। সুষমাকে দেখে মুখ নামিয়ে নিল।

খোকা ত তক্তাপোষের ওপর দেওয়াল-ঘেঁষে বসে একটা ভাঙ্গা অবাধ্য টিনের এরোপ্লেনকে বেশ মনোযোগের সঙ্গে মেরামত করতে চেষ্টা করছিল। এরোপ্লেনটার কর্ম্ম-দক্ষতায় মাঝে মাঝে সন্দেহ হওয়ায় মধ্যে মধ্যে হাল ছেড়ে দিচ্ছিল।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে বিপিন এবার মেঝের দিকে চেয়ে ভাববাচ্য প্রয়োগ করলো: "মাছক'টা কুটতে হবে, আর এই কলার ছড়াটা—"

—"নিয়ে যেতে হবে"? অতি দুঃখের মধ্যেও হাসি পায় সুষমার।

কি জানি কেন একটু পরিহাসপ্রবণতা পেয়ে বসলো সুষমাকে।

বললে, "মাছটা কুটতে হবে, আর কলার ছড়াটা যে নিয়ে যেতে হবে, তা আমার জানা আছে।"

একটি মুহূর্ত্ত। সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছ্লো আর কি। সুষমার আকস্মিক হাসির উচ্ছ্বাসে বিপিন একবার ক্ষণিকের জন্যেই,—হয়তো বা কোন্ কুক্ষণেই, চেয়ে ফেলেছিল স্ত্রীর মুখের দিকে। চকিতে দৃষ্টিটা নামিয়ে নিল সে।

আশ্চর্য্য! দুর্ব্বোধ্যও বটে। অপরের প্রতি বটেই, নিজের প্রতিও তা হোলে দুর্ব্বলতা আছে লোকটার? কোন আশার ক্ষীণ আলোও দেখতে পায় না সুষমা।

হঠাৎ দৃষ্টি পড়লো ছেলেটার দিকে। এরোপ্লেনটা কোন সময় জানলা গলিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছে আর উপুড় হ'য়ে শুয়ে মুখ গুঁজে কাঁদছে। এই রকমই স্বভাব ওর। কিছুক্ষণ মার দেখা না পেলে, কিংবা অন্য কোন কারণে বা অকারণে কাঁদে। কি যে ব্যথা ওর, কোথায় যে কষ্ট তা প্রকাশ করতে পারে না। ভয়ানক চাপা।

আর কিন্তু সামলাতে পারলো না সুষমা। সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো বিপিনের ওপর।

সমস্ত সংকোচ ত্যাগ ক'রে কাছে গিয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠলো: "আমার দিকে না হয় নাই তাকালে; কিন্তু কেমন বাপ—একটু ভোলাতে পারো না ওটাকে?"

মুহূর্ত্তেই উত্তর বেরিয়ে এলো, "আমার ছেলে কোথায়? ওর বাপ তো ওইখানে।" ব'লে পাশের যে ঘরটায় নবীন বাড়ী ফিরে জলযোগান্তে একটা নতুন বাংলা উপন্যাসের পাতা ওল্টাচ্ছিল, সেই দিকে বিপিন আংগুল দিয়ে দেখালো।

মুহূর্ত্তের মধ্যে ঘৃণায় আর অপমানে সুষমার সারা শরীর কুঞ্চিত হ'য়ে উঠলো। সময় সময় আচ্ছা মর্ম্মস্পর্শী ঠাট্টা করে তো! ক্রুদ্ধা সর্পিণীর মত ভয়ঙ্কর ভাবে সুষমা তাকালো স্বামীর দিকে। বিপিনের চোখে মুখে নিলজ্জ তীক্ষ্ণ মিটিমিটি হাসি। যেন রংগ করছে একটু। অনেক দিন পরে আজ বউয়ের মুখের দিকে ভালভাবে তাকালো বিপিন।

—কিন্তু কি মর্ম্মান্তিক শাস্তি!

এমন আত্মবিস্মৃত মানুষ! নিজের মধ্যেই নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে?—এর চেয়ে কেন…

আর ভাবতে পারলো না সুষমা। চোখের সামনে ক্ষণিকের জন্যে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো, মাথাটা গেল ঘুরে—

প'ড়ে যাচ্ছিলো আর একটু হোলে, বেরোবার সময় দোরের হাতলটা ধ'রে ফেলেছিল ভাগ্যিস।—

বর্ত্তমান চীনে নারী-প্রগতির মূল উৎস

মনোরঞ্জন বড়াল

১৯৪৯ সনের শেষের দিকে বর্ত্তমান চীনের নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারপর, বিশেষ করে গত এক বৎসরে ভারতের বহু প্রতিনিধি বিবিধ অনুষ্ঠান উপলক্ষে কিংবা সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের জন্য বন্ধুত্ব-সুলভ ভ্রমণের জন্য চীনে গিয়েছেন। বিভিন্ন সূত্রে চীন সম্বন্ধে যতটুকু খবর আমরা পাই তাতে চীনের অগ্রগতির কথাই শুনি; এমন কি শত্রুপক্ষ পর্য্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে চীনের অগ্রগতির কথা উল্লেখ না করে পারেনি। চেয়ারম্যান মাও-সে-তুঙ পরিচালিত সরকার যে চীনের জনগণের অপরিসীম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জ্জন করেছে—তা আজ কেউ অস্বীকার করতে পারে না। ভ্রমণ-প্রত্যাগত ভারতীয় প্রতিনিধিরা স্বচক্ষে চীনের অগ্রগতির জয়যাত্রা দেখে এসে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছেন। দুই বৎসরের মধ্যে এতখানি করা যে সম্ভব তা চোখে না দেখলে নাকি সত্যিকার ভাবে উপলব্ধি করা যায় না।

বিভিন্ন ক্ষেত্রের চীনের অগ্রগতির কথা সকলে বল্লেও একটি জিনিষ দেখে সবাই বিস্মিত হয়েছেন। চীনের নারী জাতির সচেতন জাগরণ এবং কর্ম্মচাঞ্চল্য সকলের নিকটেই এক বিস্ময়কর ব্যাপার। এই কিছুদিন আগে সরকারী ও বেসরকারী দুইটি প্রতিনিধি দল চীন ভ্রমণ করে এলেন; তাদের সুযোগ হয়েছিল ১লা মে চীনের উৎসব দেখার; আরো বিভিন্নস্থানে তারা হাজার হাজার চীনবাসীর দ্বারা অভ্যর্থিত এবং সম্মানিত হয়েছিলেন। তারা সকলে এইসব অনুষ্ঠানে এবং বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে নারীদের সক্রিয় ভূমিকা দেখে অবাক হয়েছেন। বর্ত্তমানে এই প্রতিনিধিরা যে সব ভাষণ দিচ্ছেন তাতে এই বিশেষ দিকটি সকলেই বিশেষ করে তুলে ধরছেন। সরকারী প্রতিনিধি দলের নেত্রী ভারতীয় কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত উচ্ছ্বাসের সঙ্গেই চীনের নারী জাগরণের কথা উল্লেখ করেছেন।

মহাচীনের বিরাট নারী জাতির এই বিস্ময়কর জাগরণ কিন্তু শুধু প্রশংসা করারই নয়, ভাববার বিষয়ও বটে। কিছুদিন আগেও চীনের নারী সমাজ ছিল দ্বিবিধ পরাধীনতায় আবদ্ধ। শোষণশীল শাসন ও সমাজ ব্যবস্থার অসহায় শিকার ছিল চীনের বিরাট জনতা; এই বিরাট জনতার অর্দ্ধাংশ চীনের নারী সমাজও। চীনের নারী সমাজের দ্বিতীয় শোষণ ছিল—পুরুষ প্রধান সমাজের আইন-কানুন, রীতি নীতি সংস্কার প্রভৃতির শোষণ। আজকে সুবিশাল ভারতের নারী জাতিকে যে সব বাধার এবং নিষেধের মধ্য দিয়ে চলতে হয়—মাত্র দুই বৎসর আগেও চীনের নারী জাতির সম্মুখে তার চেয়ে কম বাধা ছিল না; কোন কোন ক্ষেত্রে বরং আরো বেশীই ছিল।

চীনের সেই নারী জাতির আজকে যে মহান অগ্রগতি তারও প্রধান কারণ—তারা দ্বিবিধ পরাধীনতার হাত থেকে আজ মুক্ত। প্রথমতঃ ১৯৪৯ সালে যখন সমগ্র চীনে শোষণহীন গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হল, তখন চীনের বিরাট জনতার প্রধানতম শত্রু-মুষ্টিমেয়ের শোষণ অপসারিত হল—চীনের মহান জনতা রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করার পূর্ণ সুযোগ পেল। চীনের জনতার অর্দ্ধাংশও অর্থাৎ নারী জাতি এই সরকার প্রতিষ্ঠায় একটি পরাধীনতা থেকে মুক্ত হল; কিন্তু তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা আসতে দ্বিতীয় যে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনের দরকার ছিল তা আনতেও বেশী দেরী হল না। নারীদের দ্বিতীয় পরাধীনতার প্রধান কারণগুলি হচ্ছে সমাজে ও রাষ্ট্রে নারী পুরুষে পরস্পরের সম্পর্কের বৈষম্য। আর এই সম্পর্কের প্রধানতম সম্পর্ক হচ্ছে বিবাহ বন্ধনের নীতি ও কর্ত্তব্য। সুতরাং চীনের জনপ্রিয় নতুন সরকার প্রথম থেকেই এই দিকে সচেতন হল। এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য তাদের দুইটী প্রধান হাতিয়ার ছিল।

প্রথম হচ্ছে—১৯১৭ সালের নভেম্বর বিপ্লবের পর সোভিয়েট রুশিয়ায় এই সমস্যার সমাধানে যেসব কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করেছে তার সাফল্যজনক অভিজ্ঞতা; দ্বিতীয় হচ্ছে উত্তর চীনে ইয়েনানে মাও-সে-তুঙএর নেতৃত্বে যে সরকার পূর্ব্বেও প্রতিষ্ঠিত ছিল তাদের কর্ম্মক্ষেত্রে এই সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা এবং বেশ খানিকটা সাফল্য। সমগ্র চীনব্যাপী নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার আগেও এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা সমগ্র চীনের নতুন বিবাহ-বন্ধনের আইন-কানুন রচনা, পরীক্ষা ও নিরীক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন। ১৯৫০ ১লা মের আগে ১৭ মাস ধরে এই বিষয়ে তারা কাজ করেন। মুক্তি ফৌজের এই সময়কার বিস্ময়কর অভিযান আনে সমগ্র চীনের মুক্তি। আর সমাজ-বিশেষজ্ঞরাও ব্যস্ত ছিলেন নারী জাতির দ্বিতীয় পরাধীনতার মুলোচ্ছেদের হাতিয়ার তৈরী করতে।

দুনিয়ার মানুষের কাছে প্রতি বৎসরের ১লা মে বয়ে আনে মুক্তির আনন্দ, মুক্তদেশের অগ্রগতির উজ্জল আশা, পদানত দেশের মানুষের জন্য মুক্তি-সংগ্রামের প্রেরণা। ১৯৫০ সালের ১লা মে মুক্ত চীনের প্রথম মে দিবস। সমগ্র চীন নরনারীর অভূতপূর্ব্ব আনন্দের জোয়ার বয়ে যায় সমগ্র চীনে। এই ১লা মে চীনের নারীজাতির পরাধীনতার দ্বিতীয় শৃঙ্খলও ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। জনপ্রিয় মাও-সরকার ১লা মে চীনের নতুন বিবাহ আইন প্রবর্ত্তন করে। কর্ম্মমুখর প্রেরণা-পাগল, মুক্তি-উদ্দীপ্ত চীনের জনতা, বিশেষ করে নারীজাতি এই দুই বৎসরের সংক্ষিপ্ত সময়টুকুর প্রতিটি মুহূর্ত্তে তাদের লব্ধ স্বাধীনতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছে। আজকে চীনে আগত বিদেশী বন্ধুরা যদি চীনের নারীজাতির বৈপ্লবিক প্রাণচাঞ্চল্য ও বলিষ্ঠ সঙ্কোচহীনতা দেখেন তবে তাদের শুধু প্রশংসা করলেই চলবে না, এ থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজ নিজ দেশের নারী সমাজের মধ্যে ঐ প্রেরণা ছড়িয়ে দেবার দায়িত্বও গ্রহণ করতে হবে।

বিয়ের নতুন আইন প্রবর্ত্তনের আগ পর্য্যন্ত চীনে যে রীতিনীতি বিবাহ-ক্ষেত্রে প্রযুক্ত ছিল—তা ছিল সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও শাসনের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। বিবাহ বন্ধনে নারীর অধিকার এবং যে-রীতিনীতি সপ্তম শতাব্দীর তাঙ্ বংশের শাসন আমলে ছিল—১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত সেই নিয়মই প্রবর্ত্তিত ছিল। তার পরের কুড়ি বৎসরের কুওমিণ্টাঙ শাসনেও মূলতঃ সেই সামন্ততান্ত্রিক রীতিনীতির বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয়নি। ১৯৪৯ সালের শেষেও হোফেই প্রদেশের একটি গ্রামে দেখা গেল ২৮১ ঘর গৃহস্থের মধ্যে ২৫৯ ঘরেই রয়েছে শিশু পুত্র-বধু। কুওমিণ্টাঙ্ আমলের রাজধানী ছিল নানকিঙ; মুক্ত হবার পরে একব্যক্তি এসে নালিশ জানাল যে কিছু দিন আগে একবস্তা চালের পরিবর্ত্তে সে তার স্ত্রীকে বিক্রয় করেছিল —কিন্তু ক্রেতা এখনও সে চালটা পুরোপুরি দেয়নি বলে সে বিচার চায়। হোনান প্রদেশ মুক্ত হবার কিছুদিন আগেও একটা ঘটনা ঘটে যে একজন বিধবা পুনরায় বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করায় তাকে গ্রামের মুরুব্বিরা পিটিয়ে মেরে ফেলে দেয়। চীনের মেয়েদের মধ্যে সামাজিক কুসংস্কার, কলঙ্কের পথে জীবন যাপনের কাহিনী বিদেশেও গল্পের মত প্রচারিত ছিল।

এইরূপ ভাবে অনগ্রসর জীবনযাত্রার পথ থেকে নারী-সমাজকে যুগোপযোগী পথে আনা, শিক্ষা দেওয়া, সমাজের এবং রাষ্ট্রের কাজে অংশ গ্রহণ করান কম দুরূহ কাজ ছিল না। এই দুরূহতা অপসরণ করতে নারী-পুরুষের সম্পর্ক নির্ণয় এবং তার সফলতা অর্জ্জন এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। বিবাহ আইনের ধারাগুলির কিছুটা পরিচয় দিলেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

বিবাহ-বন্ধনের নীতি ঘোষণা করতে গিয়ে নতুন আইনে বলা হল—অন্য লোক দ্বারা ঠিক করা, জোর করে ব্যবস্থা করা সামন্ততান্ত্রিক বিবাহ পদ্ধতি আর চলবে না। এরূপ বিবাহে নারীর উপর পুরুষের প্রাধান্য রয়েছে, সন্তানদের স্বার্থ রক্ষা হয় না। তার পরিবর্ত্তে নতুন গণতান্ত্রিক বিবাহ পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করা হল। এর ফলে এক বিবাহ ভিত্তিতে পুরুষ কিংবা নারী নিজ নিজ স্ত্রী কিংবা স্বামী মনোনয়ন করবে। স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকার থাকবে; সন্তানদের কিংবা স্ত্রীর আইনানুগ স্বার্থ বজায় থাকবে। বহু বিবাহ করা, উপপত্নী রাখা, শিশুকন্যা বিবাহ করা, পুনঃ বিবাহে বাধা দেওয়া, কিংবা বিবাহ

উপলক্ষে কোন প্রকার অর্থ আদায় করা আইনানুসারে নিষিদ্ধ :

এই নীতি কার্য্যকরী ও সফল করতে গিয়ে নারী ও পুরুষের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেরূপ স্বাধীন মতামত, ইচ্ছা থাকা প্রয়োজন এবং দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত, অন্যান্য ধারাগুলি আলোচনা করলেই তার পূর্ণ সমর্থন দেখা যাবে।

বিবাহ বন্ধনের সূত্রগুলিতে ঘোষণা করা হয়েছে—দুই পক্ষের পূর্ণ সম্মতি থাকা চাই; এক পক্ষ অন্য পক্ষের উপর কোন জোর করতে পারবে না; তৃতীয় কোন ব্যক্তির কোনরূপ হস্তক্ষেপ চলবে না; বরের বয়স অন্ততঃ ২০ বৎসর এবং কনের বয়স অন্ততঃ ১৮ বৎসর হওয়া চাই; যে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে বংশানুক্রমিক রক্ত সম্বন্ধ থাকবে তাদের বিয়ে হতে পারবে না; ভাই বোনের মধ্যে বিযে হতে পারবে না; অর্দ্ধ ভাই বোনের (সৎপিতা কিংবা সৎমার পুত্র কিংবা কন্যা) মধ্যে বিবাহ হতে পারবে না; পাঁচ পুরুষের কম ব্যবধান হলে আত্মীয় ছেলে মেয়ের মধ্যে বিয়ে হবে না; কোন পক্ষ শারীরিক পঙ্গুতাগ্রস্ত কিংবা ক্লীব হলে, কোন পক্ষ যৌন-ব্যধিতে ভুগলে, মানষিক বিকৃতিগ্রস্ত হলে কিংবা ঐরূপ কোন রোগগ্রস্ত হলে বিবাহ বন্ধন হতে পারবে না।

দেখা যাচ্ছে যে যেরূপ অন্যের মুরুব্বিয়ানা চলবে না, তেমনি অল্প বয়সের যৌনচাঞ্চল্য কিংবা সান্নিধ্য-সুযোগের যৌনক্ষুধাই যাতে বিয়ের ইচ্ছে উদ্রেক না করে তার জন্য বৈজ্ঞানিক বিবেচনা প্রসূত মঙ্গলকর বাধা নিষেধ রয়েছে। যে সব দোষ এবং রোগ থাকা সত্ত্বেও পুরুষ সহজে স্ত্রী গ্রহণ ও বর্জ্জন করতে পারে তার পথেও বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে।

স্বামী ও স্ত্রীর অধিকার ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এই আইনে ঘোষণা করা হয়েছে—স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের সঙ্গী ও বন্ধু হিসাবে একত্রে বসবাস করবে; পরস্পরকে ভালবাসা, শ্রদ্ধা করা, সাহায্য করা, পরস্পরের সুখ সুবিধা দেখা, মনের মিল বজায় রাখা, দেশের কোন না কোন উৎপাদন ও গঠনশীল কার্যে লিপ্ত থাকা, সন্তানদের যুক্তভাবে তদারক করা, পরিবারের মঙ্গলের জন্য একত্র হয়ে চেষ্টা করা এবং এইরূপে নতুন সমাজ গড়ে তোলার কাজ করা প্রতিটি দম্পতির অবশ্য কর্ত্তব্য। স্বামী ও স্ত্রী নিজের ইচ্ছামত জীবিকা অর্জ্জনের কাজ করতে পারবে; একজনের ইচ্ছা বা অমত অন্যের উপর চাপান চলবে না; দেশের জন্য সমাজ গঠনের জন্যও নিজের ইচ্ছা দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে পারবে; পরিবারের যে সব সম্পত্তি থাকবে তার অধিকার ও ব্যবস্থাপনায় স্বামী ও স্ত্রীর সমান অধিকার থাকবে। স্বামী ও স্ত্রী তার নিজের খুসীমত পূর্ব্বের নাম ও উপাধি গ্রহণ করতে পারেন। স্বামী ও স্ত্রী একজনের অবর্ত্তমানে অন্যে তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারবে।

এই আইনগুলি দ্বারা স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধের এক বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনে সাহায্য করছে। যৌন লালসার তাগিদ, কিংবা নারীকে সুন্দরী উপভোগ্য বস্তুর মত ভোগ করার যে প্রবৃত্তি অসম সমাজ ব্যবস্থায় ও বিবাহ পদ্ধতিতে রয়েছে—এই আইন দ্বারা তার মূলে কুঠারাঘাত করা হয়েছে। পরস্পরকে শ্রদ্ধা করা, সাহায্য করা, ভালবাসা, স্বাধীন কর্ম্মজীবন গ্রহণ করা—এটা যে শুধু মৌলিক নীতিকথা নয়—তা প্রমাণিত হয়েছে দুই বৎসরের চীনের নারী জগতে।

পিতামাতা ও সন্তানের সম্পর্ক সম্বন্ধে এই বিবাহ আইনে রয়েছে—সন্তান লালন পালন করা, তাদের শিক্ষা দেওয়া পিতামাতার অবশ্য কর্ত্তব্য; সন্তানরাও তাদের পিতামাতার মঙ্গলামঙ্গল দেখবে, তাদের সাহায্য করবে; পিতামাতা কিংবা সন্তান কেউ কারুর প্রতি অন্যায় ব্যবহার বা নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করবে না কিংবা কেউ কাউকে পরিত্যাগ করবে না। সৎ-পিতা, সৎ-মাতা কিংবা সৎ-সন্তানদের বেলাতেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। ডুবিয়ে শিশু হত্যা কিংবা অন্য কোন প্রকারে সন্তান হত্যা মস্ত অপরাধ বলে গ্রাহ্য হবে এবং সেই অনুপাতে শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। পিতামাতা কিংবা সন্তান এক পক্ষের অবর্ত্তমানে অন্যপক্ষ তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বলে গণ্য হবে। কুমারী মায়ের সন্তান বিবাহ বন্ধন জাত সন্তানের মতই সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে। এই সব সন্তানদের হত্যা করা কিংবা অন্য প্রকারে তাদের ক্ষতি সাধন করার প্রচেষ্টা কঠোর ভাবে শায়েস্তা করা হবে। কুমারী মায়ের সন্তানের পিতাকে নির্ণয় করার সব রকম প্রচেষ্টা সরকারী

তত্ত্বাবধানে পরিচালনা করার পর পিতার সন্ধান পাওয়া গেলে সেই পিতা সন্তানের শিক্ষা ও জীবিকার উপযুক্ত অংশ প্রদানে বাধ্য হবে। এই ব্যবস্থা অন্তত সন্তানের ১৮ বৎসর বয়স না হওয়া পর্য্যন্ত চলবে। স্বামী কিংবা স্ত্রীর পুনর্ব্বিবাহের পর আগের বিবাহ প্রসূত সন্তানকে কোনরূপ তাচ্ছিল্য করা কিংবা তার প্রতি অন্যায় ব্যবহার চলবে না।

পিতামাতার সন্তান বাৎসল্য খুবই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। এই মধুর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আরো মধুর হয় যখন সুখী পরস্পরের প্রেমমুগ্ধ দম্পতির সন্তান জন্মে। আজকের চীনে এইরূপ দম্পতির সংখ্যাই বেড়ে চলেছে—তবু পূর্ব্বের জের এবং অশোভন মানসিক পরিচয়ও বিলীয়মান হলেও বিরল নয়। তাই আইনের এই সব ধারাগুলির প্রয়োগে পরিবারের এতটুকু অসুখী প্রভাব কেটে যায়। সন্তানের প্রতি নিস্পৃহতা আসে দুটি কারণে—প্রধানতঃ দারিদ্র্য ও সামাজিক গ্লানির মধ্যে সন্তানের প্রতি স্নেহ মমতা থাকা সত্বে পিতামাতার কর্ত্তব্য পালন করা যায় না, চীনের নর-নারীর জীবনে অর্থনৈতক স্বাধীনতা এবং প্রশস্ত কর্ম্মক্ষেত্র উন্মুক্ত; তাই পিতামাতার অর্থনৈতিক কষ্ট আজকাল তেমন সমস্যা নয়। উপরোক্ত আইনের ধারাগুলি তাই বেশী প্রয়োগের ঘটনা ঘটে না; ভবিষ্যতে আরো কমে যাবে। তথাকথিত গ্লানি নিয়ে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে তার জন্য সমাজের সহজ সরল পথ খোলা থাকবে। এর জন্য সমাজের কুসংস্কার এবং পূর্ব্ব প্রচলিত অন্তঃসারশূন্য নীতিবোধের জের এখন বেশ খানিকটা রয়েছে। অবশ্য এই জেরও অতিক্রত কেটে যাচ্ছে এবং দেশে শিক্ষা সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসারে তাও দুরীভূত হবে। অন্য দিকে নারী পুরুষে মর্য্যাদা বোধ এবং অর্থনৈতিক সামঞ্জস্য সুপ্রতিষ্ঠিত হলে অশোভন ভাবে কোন সন্তান জন্মগ্রহণের ঘটনাও বিরল হবে। এই ভাবে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা অনুসরণ করে এই সমস্যাগুলি সমাধানের অভাব হলে দেশের নৈতিক চরিত্র, মানবতা বোধ যে অত্যন্ত নিম্নস্তরে নেমে যায়—বর্ত্তমান ভারতে তার প্রমাণ যেখানে সেখানে ভুরি ভুরি রয়েছে।

চীনের নতুন বিবাহ আইনে বিবাহ বিচ্ছেদের সুযোগ রয়েছে। পূর্ব্বে এই অধিকার স্ত্রী কিংবা পুরুষের কারুর ছিল না। কিন্তু পুরুষের অন্য যে সব সুবিধা ছিল তাতে বিবাহ বিচ্ছেদ না করেও তাদের ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারত। নারীরাই বিবাহ বিচ্ছেদ না হবার জন্য বিভিন্ন প্রকারের অমানুষিক অত্যাচারের শিকার হত। বিবাহ বিচ্ছেদ করাতে গিয়ে যে সব আইন পালন করতে হবে তা হচ্ছে—সহজভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ করাতে হলে স্বামী ও স্ত্রীর উভয়েরই সুচিন্তিত মত চাই। স্বামী কিংবা স্ত্রী কেউ একা বিবাহ বিচ্ছেদের দাবী জানালে প্রথমে জিলার অধীনস্থ কিংবা জিলার সদর সরকারী বিবাহ সংক্রান্ত অফিস হতে চেষ্টা করে যাবে যাতে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ দুরীভূত করে বিচ্ছেদ রহিত করা যায় কি না। যদি বিশেষ চেষ্টা করার পর কোন মীমাংসা না করা যায় তবেই কেবল বিচ্ছেদের অনুমতি দেওয়া হয়। স্বামী ও স্ত্রী উভয়ই যদি বিচ্ছেদ কামনা করে তবে প্রথমে তাদের জিলার নিম্ন অফিসে, দুই পক্ষই বিচ্ছেদের অনুমতি পত্রের জন্য আবেদন জানাবে। সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ প্রথমে তদন্ত করবে সত্যিই উভয় পক্ষ রাজী কি না—; তারপর লক্ষ্য করা হয় তাদের সম্পত্তি এবং সন্তানদের সম্বন্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা করা হয়েছে কি না। এইসব যদি যথারীতি ঠিক থাকে তখন অনতিবিলম্বে বিচ্ছেদের অনুমতি পত্র দেওয়া হয়।

যদি একপক্ষ বিচ্ছেদ কামনা করে তখন জিলার নিম্ন অফিস হতে প্রথমে চেষ্টা করা হবে—মীমাংসার জন্য; যদি সে চেষ্টা ব্যর্থ হয় তখন শীঘ্রই জিলা অফিসে এই সম্বন্ধে রিপোর্ট পাঠান হবে; অথবা প্রয়োজন মত আদালতেও পাঠান যেতে পারে। ইচ্ছা করলে বিচ্ছেদ কামনাকারী পক্ষ নিজেরাও উচ্চতর অফিসে আবেদন জানাতে পারে। উচ্চতর অফিস কিংবা আদালতও প্রথম চেষ্টা করে মীমাংসার জন্য; প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে তখন আইনানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। একবার বিচ্ছেদের পর যদি তারা পুনরায় স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বসবাস করতে চায় তবে তাদের পুনর্ব্বিবাহের জন্য আবেদন করতে হবে। বিবাহ-অফিস থেকে যথাশীঘ্র সম্ভব পুনর্ব্বিবাহের অনুমতি পত্র দিবে।

স্ত্রী গর্ভবতী অবস্থায় কোন স্বামী বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করতে পারবে না; সন্তান জন্মের এক বৎসর পরে স্বামী বিচ্ছেদের জন্য আবেদন জানাতে পারবে। অবশ্য গর্ভবতী স্ত্রীর এই আবেদনের জন্য এইরূপ বাধ্যবাধকতা নেই। যে স্বামীর স্ত্রী, বা স্ত্রীর স্বামী সৈন্য বাহিনীতে কাজ করেন এবং বাড়ীতে তার স্ত্রী কিংবা স্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন তিনি সৈন্যবিভাগস্থ স্ত্রী বা স্বামীর অনুমতি ব্যতীত বিচ্ছেদ দাবী করতে পারবেন না। যদি দুই বৎসর ধরে সৈন্যবিভাগস্থ স্বামী বা স্ত্রী কোন যোগাযোগ না রাখেন তবে বাড়ীতে অবস্থিত স্ত্রী বা স্বামী বিচ্ছেদ দাবী ক'রে অনুমতি পেতে পারেন।

পিতামাতার বিচ্ছেদ হলেও পিতা কিংবা মাতার সঙ্গে সন্তানের রক্ত সম্বন্ধ মুছে যাবে না। অবস্থানুযায়ী সন্তান পিতা কিংবা মাতা যার তত্ত্বাবধানেই থাকুক না কেন তার পিতা ও মাতা ঠিকই থাকবে। পিতা ও মাতা উভয়েই বিচ্ছেদের পর সন্তানের লালন পালন ও শিক্ষার ভার গ্রহণ করবে। দুগ্ধ পোষ্য সন্তানের পিতা ও মাতার বিচ্ছেদ ঘটলে সন্তান মাতার তত্ত্বাবধানেই থাকবে। বয়স হলে যদি সন্তানের তত্ত্বাবধায়কত্ব নিয়ে প্রশ্ন ওঠে তবে প্রথমে মীমাংসার চেষ্টা করা হবে; চেষ্টা সফল না হলে সন্তানের মঙ্গল বিবেচনা করেই পিতা কিংবা মাতার তত্ত্বাবধায়কত্ব স্বীকার করা হবে। সন্তান পালন ও শিক্ষার জন্য খরচাখরচ বহন স্বেচ্ছায় একপক্ষ গ্রহণ করলে অন্য পক্ষ রেহাই পেতে পারে; কিন্তু পিতা ও মাতা উভয়েই এই দায়িত্ব গ্রহণ করবে—এটাই বাঞ্ছনীয়। যদি উভয় পক্ষ নিজেরা এই সম্বন্ধে কোন মীমাংসায় না পৌঁছুতে পারে, তবে আদালতের নির্দেশ তারা অবশ্যই পালন করবে। সন্তানের জন্য এই খরচের অংশ নগদ টাকায়, বা জিনিষপত্র মারফৎ অথবা ছেলের জন্য নির্দিষ্ট জমিতে চাষবাসের মারফৎ দেওয়া যেতে পারে। সন্তানের জন্য নির্দিষ্ট খরচের পরিমাণ প্রয়োজন বোধে বাড়াবার জন্য সন্তান নিজেই পিতা মাতার কাছে অনুরোধ জানাতে পারে। এ ব্যাপারেও আলোচনা কিংবা আদালতের সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে।

সৎ-পিতা যদি তার স্ত্রীর পূর্ব্ব-স্বামীর ঔরসজাত সন্তানের ভরণপোষণ ও শিক্ষার ভার নেয়, তবে পূর্ব্ব স্বামীকে তার অংশ দেবার হাত থেকে আংশিক কিংবা পূর্ণভাবে অব্যাহতি দেওয়া যেতে পারে।

বিবাহবিচ্ছেদের পর স্ত্রী তার নিজস্ব বিবাহপূর্ব্ব নিজের সম্পত্তি পুরাপুরিই ফেরৎ পাবে। অন্যান্য সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারা উভয় পক্ষ নিজেরা আলোচনা করে ঠিক করে নেবে। প্রয়োজন বোধে আদালত অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করেন এবং সর্ত্ত পূরণের ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হন, তবে অনুমতি দেবেন। বিশেষ করে এই ব্যাপারে দৃষ্টি দেওয়া হবে সন্তানের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের উপর এবং দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির তাগিদের উপর। স্ত্রী কিংবা সন্তানের যথোপযুক্ত অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ থাকলে স্বামীকে অনেক সময় খরচ বহনের দায়িত্ব থেকে মুক্ত করা যেতে পারে—অবশ্য বাস্তব অবস্থার সুবিবেচনা এই ব্যাপারে হবে মুখ্য।

বিবাহ বিচ্ছেদের আগে যদি স্বামী-স্ত্রীর কোন ঋণ থাকে তবে তাদের দাম্পত্য জীবন কালীন সম্পত্তির সাহায্যে ঋণ পরিশোধ করা হবে। যদি ঋণ পরিশোধের মত সম্পত্তি না থাকে তবে স্বামীকেই এই ঋণের দায় বহন করতে হবে। স্বামী কিংবা স্ত্রী ব্যক্তিগত ভাবে কোন ঋণ করলে বিচ্ছেদের পর তা স্বামী কিংবা স্ত্রীর নিজস্ব ঋণ পরিগণিত হবে—এবং এই ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব নিজ নিজ পক্ষের বহন করতে হবে। বিচ্ছেদের পর স্বামী কিংবা স্ত্রী কোন পক্ষ ভরণপোষণের অসুবিধায় পড়লে অন্য পক্ষ অন্তত একটা নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত সেই পক্ষকে সাহায্য করবে। প্রথমে নিজেদের আলোচনা, নয়ত আদালতের নির্দেশ এ ব্যাপারে প্রযোজ্য।

এই বিবাহ সম্বন্ধীয় আইন কেহ অমান্য করলে কিংবা সেই কারণে কোন গুরুতর অপরাধ করলে আইনের মারফৎ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। বহু জাতির সমন্বয়ে গঠিত বিরাট চীন দেশের জনতা বিভিন্ন বিষয়ে কিছু কিছু তফাৎ জাতিতে জাতিতে বা আঞ্চলিক ভিত্তিতে আছে। রীতিনীতিগতও ব্যবধান বিদ্যমান। তাই এই আইনের ধারাগুলির মূল বক্তব্য এবং উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ণ রেখে সাধারণ বিষয়ে কিছু অদল বদল করা যেতে পারে।

দাম্পত্য জীবনে বিচ্ছেদ আসুক তা কারুর কাম্য হতে পারে না। যদিও আইনে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার রয়েছে তবু ছোটখাট কারণে যাতে এইরূপ একটা গুরুত্ব-পূর্ণ ঘটনা কারুর দাম্পত্য জীবনে না ঘটে তারই জন্য বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে এত কড়াকড়ি। বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থায় বিবাহ বিচ্ছেদের সুযোগ এবং সমাজ-তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজন বোধে বিচ্ছেদের অধিকার ঠিক এক নয়। বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থায় কোন কোন দেশে আইনত হয়ত বিবাহ বিচ্ছেদের সুযোগ নেই, কিন্তু কার্য্যত সেই সুযোগের অপেক্ষা না রেখে স্বামী কিংবা স্ত্রী ব্যভিচারী জীবন যাপনের সুযোগ পায়। অবশ্য পুরুষদের সুবিধাটা বেশী। মূলতঃ স্বামী স্ত্রী সম্পর্কে বুর্জোয়া ধারণায় সম্পত্তি মাঝামাঝিগত—তাই অত্যন্ত নগণ্য ছোটখাট কারণে বিবাদ ঘটলে যে দেশে বিচ্ছেদের সুযোগ আছে সে দেশে অধিকারের অপব্যবহার করা হয়। কুকুর বিড়াল উপলক্ষ্যে স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া, পোষাক পরিচ্ছদ অলঙ্কার উপলক্ষ্যে ঝগড়া তাই বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থায় বিচ্ছেদের কারণ হয়ে ওঠে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুরুষের যথেচ্ছ সুযোগ থাকলেও স্ত্রীর কোন অধিকার ছিল না।

নয়াচীনের সমাজব্যবস্থায় বিবাহ বিচ্ছেদের প্রতি অহেতুক দরদ না দেখালেও বিচ্ছেদের অধিকার আছে। আর এই অধিকার অর্জ্জন করতে শুধু স্বামী কিংবা স্ত্রীর তুচ্ছ খেয়ালীপনার কোন সুযোগ নেই। সত্যিই যদি দাম্পত্যজীবন দুর্ব্বিবহ এবং অসুখী হয়ে ওঠে—কোন মূলগত কারণে তবে জোর করে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখে জীবন আরো বিড়ম্বিত করারও কোন মানে হয় না। সেখানে বিচ্ছেদের অধিকার দেওয়া হয়—তাও বিশেষ আলোচনা দ্বারা মীমাংসার সুযোগ দিয়ে। যেহেতু তুচ্ছ কারণে বিচ্ছেদের সুযোগ নেই—তাই যদিও বিবাহ বিচ্ছেদের যুক্তিযুক্ত অধিকার আছে, তবুও দেখা গেছে বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা খুবই কম। প্রথমদিকে কিছু আবেদন বেশী এসেছিল—তারও উপযুক্ত কারণ রয়েছে। এই আইন পাশ হবার আগে যেসব অযৌক্তিক ও অশোভন ও বৈষম্যমূলক বিবাহ হয়েছিল নতুন আইনের সুযোগে তাদের অনেকেই দুর্ব্বিষহ জীবনযাত্রার হাত থেকে অব্যাহতি পাবার সুবিধা নিয়েছে এবং ঠিকই করেছে। যতদিন যাচ্ছে ততই বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন কমে আসছে। বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার বিষয় যে এই আইন প্রবর্ত্তিত হবার পর যে সকল বিবাহ সংঘটিত হয়েছে তাদের ততটা বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন প্রায় আসেনি বললেই চলে।

বিবাহ বিচ্ছেদ সংক্রান্ত একটি ধারা বিশেষ লক্ষ্যণীয়। সৈন্যবাহিনীর স্বামী কিংবা স্ত্রীর বিচ্ছেদ-অধিকার সংক্রান্ত ধারাটি উপলব্ধি করতে হবে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে। চীনের মুক্তিফৌজে যে সব নরনারী যোগদান করেছেন তাদের শুধু দারিদ্র্যই প্রধান কারণ ছিল না। সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য, বিদেশ আক্রমণের জন্য যে সব দেশ সৈন্যবাহিনী রাখে তাদের সঙ্গে এই সৈন্যবাহিনীর মূলগত পার্থক্য আছে। সাম্রাজ্যবাদী কিংবা পররাজ্য আক্রমণ সৈন্য বাহিনীর লোকদের অন্যায় ও অত্যাচার করার জন্য তৈরী করতে অমানুষ করে তোলে। ফলে তাদের নৈতিক অধঃপতন, মানবিকবৃত্তির সৌকর্য নষ্ট হয়ে যায়—তাদের পারিবারিক জীবনের প্রতি নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা কিংবা বিশ্বাস থাকে না। যেখানে যখন এই সৈন্যরা যায় সেখানে যথেচ্ছাচার করতে তাদের এতটুকু বাধে না। দুশোবৎসর পরাধীন থেকে ভারতবাসী হাড়ে হাড়ে তা বুঝেছে—বিশেষ করে গত মহাযুদ্ধের সময় ভারতের বুকে যে সাম্রাজ্যবাদী সৈন্য পদচারণা করেছে—তাদের বহুকীর্ত্তির কুফল আজও ভারতের সমাজ-জীবনে ঢুকে রয়েছে এবং ক্রমান্বয়ে মহামারীর আকারে বিস্তৃতি লাভ করছে।

কিন্তু চীনের মুক্তিফৌজের সৈন্যরা প্রধানত দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছে। বিদেশী শাসন শোষণ বিলোপ করা, দেশী শোষকদের উচ্ছেদ সাধন, চীনের জনতার মুক্তি এই আদর্শ সামনে রেখে তারা সৈন্য বাহিনীতে এসেছে—এবং দীর্ঘ সংগ্রামে অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার দ্বারা তাদের কর্ত্তব্য করেছে। তাদের আদর্শ অম্লান রাখতে কঠোর আত্মসংযমের প্রয়োজন ছিল, নৈতিক মান উন্নত করা অপরিহার্য্য ছিল; সাধারণ মানুষের প্রতি দরদ ও ভালবাসা অপরিসীম ছিল। এই সব মানবিক

বৃত্তির সৌকর্য্য যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তার জন্ত মুক্তি-ফৌজে বিশেষ ধরণের শিক্ষাদিক্ষা ব্যবস্থা ছিল—তাই চীনের মুক্তিফৌজের সৈন্তেরা নিজেদের পরিবারবর্গের সঙ্গে সর্ব্বদাই সম্পর্ক রেখেছে, তাদের সুখ দুঃখের অংশীদার হয়েছে। যদি কখনো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে—তা হল শত্রুপক্ষের আক্রমণে সাময়িক পিছুহটে বা পালিয়ে থাকার জন্ত। যে মুহূর্ত্তে সুযোগ এসেছে আবার তারা সম্পর্ক স্থাপন করেছে। বর্ত্তমানে মুক্তি-ফৌজের অনেকে সৈন্তবাহিনী হতে গ্রামে ফিরে ক্ষেত-খামারি কলে-কারখানায় কাজ করছে—স্বাভাবিক সাংসারিক জীবন যাপন করছে। এই মুক্তিফৌজের দৌলতে চীন আজ মুক্ত এবং নতুন জয়যাত্রার পথে অগ্রসর; চীনের নারী সমাজ আজ স্বাধীন হতে পেরেছে। তাই চীনের নারীরা মুক্তি-ফৌজের সৈন্তদের ঘৃণা বা ভয় করে না; সম্মান করে, শ্রদ্ধা করে। মুক্তি-ফৌজের বীর সৈনিককে স্বামী হিসাবে লাভ করতে গৌর বেবাধ করে। সুতরাং সৈন্ত বিভাগের জন্ত বিবাহ-বিচ্ছেদ সংক্রান্ত সুযোগ আছে বটে, কিন্তু ঐ সুযোগ গ্রহণের মত অবাঞ্ছনীয় ঘটনা ঘটে খুবই কম।

চীনের এই বিবাহ আইন প্রবর্ত্তন হওয়াতে স্বভাবতঃই চীনের তরুণতরুণীরা সব চেয়ে আনন্দিত হয়েছে। কার্য্য ক্ষেত্রে এই আইনানুযায়ী কাজ করতে অনেক বাঁধা এসেছে, পুরান রীতিনীতির প্রতি অন্ধ আকর্ষণ অনেক ক্ষেত্রে বাঁধা সৃষ্টি করছে—কিন্তু অত্যন্ত ধৈর্য্য সহকারে এই আইনের তাৎপর্য্য প্রচার করা এবং স্থানীয় সরকারী কর্তৃপক্ষ অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে কাজ করে এবং শিক্ষা দিয়ে এই বাঁধা অতিক্রম করেছে।

ভারতীয় প্রতিনিধিরা চীনের নারী সমাজের অগ্রগতি দেখে এসেছেন এবং এদেশে তার কথা প্রচার করে বিশেষ উপকার করেছেন, তার জন্ত তাদের ধন্তবাদ জানিয়ে অনুরোধ জানাব—চীনের নারী জাতির অগ্রগতির মূল কারণগুলি আজ এ দেশের লোকের কাছে তুলে ধরা বিশেষ প্রয়োজন। বিশেষ করে নারী সমাজের মধ্যে এই চেতনা পৌঁছে দেবার একান্ত প্রয়োজন আছে। কেননা নারীপ্রগতি-বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এদেশে কম প্রবল নয়। হিন্দুকোড বিলের মত অতি সামান্ত প্রগতিশীল একটি আইনের ব্যাপার নিয়ে এদেশে কম জল ঘোলা হয়নি। এখনো তার জের চলছে। সীতা সাবিত্রীর দোহাই দিয়ে এদেশী নারী সমাজকে অনগ্রসর রাখার বিভিন্ন প্রকার প্রচেষ্টা দৈনন্দিনই চলছে। অথচ বৃহত্তর ভারতীয় নারী সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সমাজনৈতিক, নীতিগত সংকট চরম আকার ধারণ করছে। বিভিন্ন সমস্তাসংকুল ভারতের দুঃখ-কষ্টের সব চেয়ে বড় অংশীদার হচ্ছে ভারতের মেয়েরা। তাদের সত্যিকারের মুক্তির পথের সন্ধান দিয়ে তাদের সংগঠিত করে এগিয়ে নিয়ে যাওয় প্রতিটি নারী—বিশেষ করে প্রতিটি প্রগতিশীল পুরুষের অবশ্য কর্ত্তব্য। শুধু পুরুষরা আজ সংগ্রাম করে কোন সমস্তার সমাধান করতে পারবেন না।

বিশেষ আনন্দের কথা ভারতের নারীজাতিও যুগোপযোগী চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এপথে এগিয়ে আসছে। যেসব প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার গণতান্ত্রিক ভাবে স্বীকার করে সেই সব প্রতিষ্ঠানের দিকে নারী সমাজ সাগ্রহে এগিয়ে এসেছে। ভারতের গত নির্ব্বাচনেও দেখা গেছে নির্ব্বাচনী সংগ্রামে ভারতের মেয়েরা বিশেষ অংশ নিয়েছে, কোন স্থলে পুরুষের চেয়ে তাদের আগ্রহই বেশী প্রকাশ পেয়েছে। ভারতীয় কেন্দ্রীয় আইন সভায় ও বিভিন্ন রাজ্য সভায় বেশ কিছু মহিলা প্রতিনিধি নির্ব্বাচিতও হয়েছেন। এই বিষয়ে বামপন্থী প্রগতিশীল কয়েকজন নারী প্রতিনিধির যোগ্য সদস্ত বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। বিভিন্ন আইন সভায় তাদের কাজের প্রতি ভারতের নারীরা সাগ্রহে লক্ষ্য করবে এবং সমালোচনা কিংবা সমর্থন জানাবে। চীনে প্রথম নারী প্রগতির সাফল্য দেখে বিস্মিত সরকারী প্রতিনিধিদলের নেত্রীও বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্ত, তাঁর এই প্রশংসা কতখানি মৌখিক না আন্তরিক তারও প্রমাণ মিলবে।

ভারতের সত্যিকারের মুক্তি সংগ্রামে ভারতীয় নারী সমাজ তাদের যথাযোগ্য ভূমিকা গ্রহণে দ্বিধা করবে না; এবং এই সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে মুক্ত চীনের নারী-প্রগতির প্রাণবন্ত অভিজ্ঞতা হবে অপরিহার্য্য।

প্রভাত দেব সরকার

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

ভেঙে-পড়া মনকে শক্ত করে নিভা কঠিন বজ্র হ'য়ে দাঁড়িয়ে দরজার কড়া ধরে নাড়া দেয়। সামনে পিছনে পাহাড়ে কড়া নাড়ার প্রতিধ্বনি ফিরে আসে। ভিতর থেকে কোন সাড়া আসে না। মনে হয়, একটা অস্ফুট, চাপা না-না শব্দ বিলম্বিত তালে উচ্চারিত হয়, সুদূর সুউচ্চ গিরিশ্রেণীর ওপার থেকে কে যেন তার সঙ্গে নিষ্ঠুর কৌতুক করছে।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে দরজাটা খুলে গিয়ে ভিতর থেকে কেউ যদি বেরিয়ে না এসে তাকে প্রশ্ন করতো—কে? তা হ'লে বোধ হয় নিভা অকূলসাগরে পড়ার মত কেঁদে ভাসিয়ে দিত। তোমার আমার কাছে সে কান্নার মানে কিছু না থাকলেও বেদনার ভারে মানুষের সুখদুঃখের ইতিহাসে তা অবিস্মরণীয়।

চোখ-ছল্-ছল্ বিস্ময়ে নিভা বললে, আমি। কলকাতার বিনয় কাকার বাসা থেকে আসচি।

ভিতর থেকে এগিয়ে এসে যিনি চৌকাঠে দাঁড়ালেন তিনিঠিক নিভার কথা বুঝতে পারলেন বলে মনে হলো না। স্তিমিত চোখ দুটো কেবল কুঞ্চিত করে নিভার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন। অনেক কষ্টে নিভা অশ্রু সংবরণ ক'রলে।

উনিই বোধ হয় অমলের বিধবা মা। হেঁট হয়ে নিভা তাড়াতাড়ি পা-ছুঁয়ে প্রণাম ক'রতে এগিয়ে এল। দু'পা পিছিয়ে গিয়ে প্রশ্নকারিণী বল্লেন, থাক্।

মাথা তুলে নিভা চেয়ে দেখলে প্রশ্নকারিণী তেমনি সন্দিহান। নিভা অস্ফুটে বললে, ভবানীপুরের ৺সন্তোষ বাবুর মেয়ে আমি—আমার বাবা মারা যাবার পর আমি বিনয় কাকার কাছে—

হাত নেড়ে তিনি থামতে বললেন। নিভারও মনে হলো সে অরণ্যে রোদন করছে। কাকে শোনাচ্ছে তার পরিচয়—হয়তো উনি বাঙলাই বোঝেন না, বাঙলা দেশ জ্ঞান হ'য়ে অবধি কখনো দেখেননি, আত্মীয় স্বজন তো দূরের কথা।

যাই হোক তিনি ভিতরে আসবার অনুমতি দিলেন, এস, ভেতরে এস।

একটু বোধ হয় ইতস্তত ক'রলে নিভা, তারপর পিছন ফিরবার সময় বার কয়েক নিজের তোরঙ্গটার দিকে চাইলে। এত বড় সম্পত্তি ফেলে সে এক্-একা ভিতরে যায় কি করে! অথচ এঁর সামনে মুখ ফুটে বলা যায় না সে কথা—কে বলতে পারে যেটুকু অভ্যর্থনা শেষ-বেশ জুটেছে তাও না হ'য়ে যেতে পারে। মুখের ওপর দরজা যদি বন্ধ করে দেন উনি!

পশ্চিমের জল হাওয়ায় সারা জীবনটা কাটিয়ে দিলেও মানুষটাকে বাঙলা দেশের যে কোন নিষ্ঠাবতী বিধবার মতই দেখতে লাগে। তেমনি বৈধব্যের তপশ্চরণের দরুণ দেহটা ক্ষীণ, বর্ণ তাম্র-গৌর, নাসিকা তীক্ষ্ণ, মাথার চুল ছোট-ছোট করে ছাঁটা।

কিন্তু প্রবাসিনী বিধবাদের জন্যে পশ্চিমে, মধ্য প্রদেশের এই গ্রামাঞ্চলেও কি কঠোর শাস্ত্রীয় অনুশাসন আছে? না উনি বাঙলা দেশের ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন?

বয়স কালে উনি যে সুন্দরী ছিলেন এ বিষয়ে নিভা নিঃসন্দেহ। এখনও ওঁকে বেশ সুন্দরই দেখাচ্ছে। কিন্তু সেই সৌন্দর্য্যের মধ্যে কোথায় যেন একটা কাঠিন্য রয়ে গেছে। কৃচ্ছ্র সাধনের নির্মোক।

"সরবতী বাই! সরবতী বাই!! জলদি!" উনি হাঁক দিলেন।

নিভা সভয়ে তোরঙ্গের মায়া ত্যাগ করে গুটি গুটি পায়ে ভিতরে ঢোকে। কে জানে এরপর তার জন্যে কি প্রতীক্ষা করে আছে!

নিভার মনে হয়েছিল সাত পা এক সঙ্গে হাঁটার পর উনি আত্মীয়তা করবেন। অন্ততঃ পরিচয়টা ভাল করে জেনে নেবেন—এমনি হুট্‌ করে চলে আসার কারণ জিগ্যেস করবেন।

না, তিনি কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না। নিভার পিছনে পিছনে একটা দূরত্ব বজায় রেখে এসে বললেন, ঐ কলঘর, স্নাও রেলের কাপড় চোপড়গুলো কেচে এস।

নিভা ইতস্তত ক'রতে তিনি আবার বললেন, যদি স্নান ক'রতে চাও তো ঐ সঙ্গে সেরে নিও, ওখানে সবই পাবে। ওঁর নির্দ্দেশ থেমে গেলে হঠাৎ নিভার মনে হয়, বাড়ীটা আবার নিজের মৌন ধ্যানে ডুবে গেছে—নূতন অতিথি আগমনে তার চারিভিতে এতটুকু চাঞ্চল্য নেই, একটা নির্লিপ্ত সুদূরতা সে বজায় রেখেছে।

কলতলায় দাঁড়ালে খানিকটা আকাশ আর কেবল পাহাড়। দৃষ্টির পীড়ায় নভপট চক্ষুহীন, পাহাড়ের খোঁচায় সারা। এখানে দাঁড়িয়ে একটুও মনে হবে না এরপর পৃথিবী আছে, মানুষজন আছে, প্রাত্যহিক জীবনের কলরোলও আছে। যে টাঙ্গাটায় করে নিভা এসেছিল সেটা যেন এখন গল্প কথা। এখানে কাক ডাকে না।

স্নান সেরে এলো চুল পিঠের ওপর ছড়িয়ে নতমুখে নিভা সামনে এসে দাঁড়াতে তিনি এক পাত্র মিছরীর পানা এগিয়ে দিলেন। বললেন, খেয়ে নাও, দু'রাত জেগেছো—ঠাণ্ডা হ'বে।

মিছরীর সরবৎ হাতে করে কেমন অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ে নিভা, বোধ হয় দু'ফোঁটা অশ্রুও চোখের কোণে টল্‌ টল্‌ করে। লক্ষ্য করে উনি বলেন, খেয়ে নাও। গিয়ে মাঝের ঘরে বিছানা করা আছে শুয়ে পড়গে। দু'দিনের ক্লান্তি কম নয়।

এখন একটু ঘুমোতে পারলে শুধু শরীরের পক্ষে কেন, মনের পক্ষেও ভাল। কেবল পথের কষ্ট নয়, কলকাতা ছাড়া থেকে মানসিক কষ্টও সে ভোগ করেনি কম। অনেক, অদেখা আশ্রয়ে তার ভাগ্য আবার কি ভাবে পরিবর্ত্তিত হ'বে কে জানে। আবার সেই ভাল লাগা, মন্দ লাগা। আদর, অনাদর, ভালবাসা, ঘৃণা! একটি অরক্ষণীয়া, অনভিভাবিক যুবতী মেয়ের জীবনে আর কিছু কি পাবার নেই। কামনা করবার আর কিছু?

আসা মাত্র শুতে যাওয়াটা কেমন কেমন দেখায় যেন। তা ছাড়া এই সকালে ঘুমনোটা উনিশ কুড়ি বছরের মেয়ের পক্ষে অশোভনও। নিভা অস্ফুটে বললে, এখন আর শোব না।

—না, না, বুঝতে পারছো না, বড্ড শরীর খারাপ হ'বে, একটু শুয়ে নাও। ঘণ্টা খানেক অন্ততঃ—ওঁর কণ্ঠস্বর ঠিক দূরের শোনায় না, পরিচিত আত্মীয়তার সুর উপলব্ধি করা যায়।

কিন্তু যে-মানুষটি এতক্ষণ সে কে—কি—বৃত্তান্ত কিছুই জানতে চাননি, মুখের কোন ভাবেই যাঁর এতটুকু পরিচয়ের সূত্র ধরা পড়েনি, তাঁর বাড়ী-চড়াও এই হতভাগিনীর জন্যে উদ্বেগ কেন। অমল তা হ'লে তার চিঠি পেয়ে আগে থেকে মার সঙ্গে পরামর্শ করে গেছে। এগিয়ে নিয়ে আসতে নাই যাক, তার স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি নজর রেখেছে, আর কি চায় নিভা? মিছরীর সরবৎ, আরাম শয্যা, নিশ্চিন্ত আশ্রয়!

নিভার ঘুম যখন ভাঙল, সূর্য্য তখন মাথার উপর উঠে গেছে। রোদ ঘরের ভেতরেও হানা দিয়েছে, পাহাড় পোড়া তেজ তার—চোখ চাইলে মাথার ভেতর ঝা-ঝা করে, অন্ধকার মনে হয় সব।

চেতনার পট যেন শূন্যই হ'য়ে গেছে নিভার। মুহূর্ত্তের জন্যে পূর্ব্বাপরের সব স্মৃতি ভুলে যেতে হয়—

নিজের পরিচয় শুদ্ধ। একটা দুঃস্বপ্নের ভারে বুকটা যেন এখনো ভার হ'য়ে আছে।

দরজাটা খোলাই ছিল। ঘুমের মধ্যে যেন মনে হ'য়েছিল, কে বার কয়েক ঘরের মধ্যে এসেছে, গেছে নিঃশব্দে, নিশ্চুপে। এত ঘুম পেয়েছিল যে, নিভা চেয়ে দেখতে পারেনি, তবু জাগেনি। ঘুম ভেঙ্গে যেতে এখন অদ্ভুত মনে হ'চ্ছে, সেই ঘুমঘোরে কারো আনাগোনা।

বাইরে এসে নিভা চেয়ে দেখলে, আকাশে আর এতটুকু মেঘ নেই, পাহাড়ের ছায়ায় আর বিদগ্ধ রৌদ্রে নীলিমা সুগভীর।

সরবতী বাই সামনে এসে দাঁড়াল। নিভার আপাদ-মস্তক সন্দেহের কটাক্ষে দেখে বললে, খানা বানায়া, মাইজী বোলায়া।

সম্ভ্রান্ত বাড়ীর ঝি। ছেলে-খেলার পুতুলকে কাপড় পরানর মত অদ্ভুত একরকম করে কাপড় পরেছে। চাঁদির বিচিত্র গয়নায় হাত-পা-কান-নাক ভারাক্রান্ত।

চাবির রিং-এ পর পর চাবি গাঁথার মত ক্ষত বিকৃত কান, ছুটোর রূপোর কেয়ুর-কুণ্ডল-পাশা এবং বালায় গ্রথিত। মধ্য প্রদেশের নারী কুলের কানের শক্তি বোধ হয় অপরিমিত। তুলনায় মুখটি ছোট এবং চোয়াল ভাঙা বসন্তের দাগে বিকৃত।

নিভা বিস্মিত চোখে চেয়ে দেখতে সরবতী বাই কি ভেবে হাসলে। নিভার বুক দুর দুর করে উঠলো। আতঙ্কে। প্রহরণের মত হাতের অলঙ্কার উদ্যত।

খাবার ঘরে মা, ছেলে অপেক্ষা করছিলেন। খাবার জিনিষ পত্তর সামনে রেখে সামনাসামনি দুটো আসন পেতে জলের গেলাস সাজিয়ে মা বসে আছেন।

মা নিভাকে দেখে চোখ তুলে বলুলেন, এস, এস। আগে থেকে অমল একটা আসন দখল করে বসেছিল, সুতরাং কোন্ আসনে বসতে হবে নিভা বুঝতে পারে। কিন্তু এমনি সামনাসামনি। মুখোমুখি। এ যে অসম্ভব।

অপ্রস্তুত নিভা স্বাভাবিক জাতীয় নীচু স্বরে বললে, আমি পরে খাব মাসীমা।

সে কি। কেন? মাসীমা বললেন।

আপনার সঙ্গে খাব। অত্যধিক লাজুকতায় স্বরটা নিভার বিকৃত শোনাল।

মাসীমা পেড়াপিড়ি করলেন, না, না—বস, কদিন খাওয়া হয়নি, আর দেরী নয়।

মুখ ফুটে নিভা বলতে পারলে না যে, যে-সংসারে সে ছিল সেখানে যুবতী মেয়েদের বাড়ীর যুবা পুরুষদের সঙ্গে একত্রে আহারের চলন নেই, আর যে সংসারে আছে তাঁরা মাটিতে বসে আসন পিঁড়ি হ'য়ে অন্ন গ্রহণ করেন না। খাঁটি বাঙ্গালী হিন্দুয়ানায় ও জিনিষ এখনো চল হয়নি।

তা ছাড়া অতঃপর উনি যে অন্নদাতা, ওঁর সামনে কোন্ বেহায়াপানায় সে অন্নগ্রহণ করবে। অপরাধ হবে না? উনি কিছু মনে করবেন না, তার শালীনতায় বাধবে না।

শেষে বাধ্য হয়ে এসে নিভাকে আসনে বসতে হয়। যত না লজ্জা তার চেয়ে বেশী সঙ্কোচে মনটা তার নুয়ে পড়ে। অন্য ঘরে তার খাবার ব্যবস্থা করলে ভাল হ'তো, এখন ভাতের গ্রাস গলায় বিঁধবে যে।

কোন মতে সঙ্কোচ বাঁচিয়ে ডালের সঙ্গে ভাত মাখতে মাখতে কি ভেবে চোখের কোন দিয়ে নিভা চেয়ে দেখলে, অমল দিব্যি নিশ্চিন্তে, নীরবে, আহারে মনোনিবেশ করছে—কোন কিছুতে তার এখন খেয়াল নেই। মাসীমার হাতে পরিবেশনের হাতাটা ওর দিকে বাড়ান আছে।

লোকটা কি, এই সুযোগে সে নিভাকে অভ্যর্থনা করতে পারতো না—আসুন, বসুন। তা নয়, নিজেই গোগ্রাসে গিলছে।

লোকটার একটুও ভদ্রতা জ্ঞান নেই না, ইচ্ছে নেই বলেই সে কোন সাড়া করেনি? কে তো কে।

ভাত মাখতে মাখতে নিভার হাতটা থেমে গেল।

চুল ছিঁড়ে মাথা কুটে বোধ হয় এ অভিসারে সান্ত্বনা নেই। স্পষ্ট অমল তার উপযাচক আগমনে সুখী হয়নি, অনুমোদনও করেনি। বুঝিতে নিভার বাকি নেই, থাকতে এসেছে বলে অমলের ঐ মনোভাব, কেবল কুটুমের মেয়ে বলে সারদা দেবী যা কিছু আপ্যায়ন করছেন, না হলে

মা-ছেলের এই নিরুপদ্রব শান্ত জীবনযাত্রায় সে এক উপদ্রব। কার ভাল লাগে।

এই একটা দিনে যতটুকু বোঝা গেছে তাতে মনে হচ্ছে নকে থেকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করলে অমল গায়ে পড়ে কোন আত্মীয়তা করবে না। নিভার মনটা তার কাছে কোন জিজ্ঞাসার নয়। ভাবটা, এসেছো যখন, থাক, কি যাও য খুসী। কোন ভাবনাই নেই তার।

এখানে আসার আগে অমলকে যে চিঠি লিখেছিল তাতে কি ঐ মনোভাবের অবকাশ দিয়েছে নিভা? যেন জলে পড়েছে সে। কে জানে কি লিখেছিল সে, কতখানি ছোট করেছিল সে নিজেকে। বিপদে পড়ে আশ্রয় চেয়েছিল? বলেছিল, আমার আর কোথাও দাঁড়াবার জায়গা নেই। আপনার চরণে স্থান দিবেন কি?

ছি ছি, না না, ওসব কথা সে কখনো লেখে নি। অত দীন সে নয়। যতই বিপদে পড়ুক সে নিজেকে অত ছোট করেনি। অমলের সঙ্গে সম্পর্ক তার যে অমন করে পাতেনি। রেণু কাকীমার আশ্রয়ে ন'মাসে ছ'মাসে দর্শন পাওয়া ঐ একটি মাত্র মানুষকে তার আত্মীয় বলে মনে হয়েছে—ঐ একটিমাত্র লোকের মনে চাওয়া পাওয়ার অনুসরণ সে প্রত্যাশা করে আছে। আর যাই করুক কোন অবস্থায় অমলের কাছে ভিক্ষার্থী হ'য়ে দাঁড়াবে না নিভা। এতদূরে অসমসাহসে সে শুধু আশ্রয় ভিক্ষার জন্যে ছুটে আসেনি, চেষ্টা করলে এখন মাথা গোঁজার স্থান কলকাতাতেই মিলতো। শুধু অমলের আশাতেই সে—

কিন্তু কি এমন চিঠি সে লিখেছিল যার জন্যে তার এত বড় একটা ভরসার স্থল মিথ্যা প্রবঞ্চনায় পরিণত হবে? আগাগোড়াই সে ভুল করেছে, শুধু ভুলই নয় নিজেকে ছোটও করেছে। একটা অবজ্ঞা অনাদর, অপমান থেকে পরিত্রাণ পেতে এমন জায়গায় ছুটে এসেছে যেখানে ওগুলোর একটিরও অসদভাব নেই। প্রত্যক্ষ না হোক অনুভূত। বরং এর চেয়ে রেণুকাকীমারা ঢের সদয় ব্যবহার করতেন। মন্দ হোক, সে মন্দর তবু একটা সংগা ছিল, বোঝা যেত। আর এঁরা—

সব কথা এখন ঠিক ঠিক মনে না হলে নিভার মোটা-মুটি মনে আছে—চিঠিটা কি ভাবে সে লিখেছিল। বিপদে পড়ে জাত মান খোয়ার ভয়ে মানুষ যেভাবে স্বজন বন্ধুর কাছে চিঠি লেখে। মনে মনে চিঠির ভাষাটা মনে করতে চেষ্টা করে নিভা—সত্যি কি দোষের সত্যি কি অপরাধের ছিল তাতে? আত্মীয় বলে না হোক; বন্ধু বলে না হোক, কেবল পরিচিত বলে বিপদের কথাটা জানান কি এমন মারাত্মক, অমার্জ্জনীয় অপরাধ? এত ছোট কি অমলের মন?

অভিমানটা যেন অন্য কারণে—আশ্রয় চেয়ে না পাওয়ার জন্যে নয়, আশ্রয় চেয়ে স্বাধিকারে তা প্রতিষ্ঠা করতে না পারার জন্যে। অধিকার নিভার দুনিয়ার কারো ওপর নেই, অমলের সম্বন্ধে এতদূর ভাবাটাই তার অনুচিত হয়েছে। রেণু কাকীমার দূর সম্পর্কে বোনপো, তার সঙ্গে সম্পর্কটা কি? লোকে শুনলে কি বলবে? অতিবড় লজ্জাহীনাও বোধ করি ঐ সম্পর্ক ধরে এতখানি দাবী কোনদিন করবে না।

এর চেয়ে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলে ভাল ছিল। মুখে বললে বরং ভাল হ'তো, রেণুমাসী যাকে আশ্রয় দিতে পারেনি তাকে আমরা স্থান দিতে পারি না—আর দিলেও তা প্রকারান্তরে তাঁদেরই অপমান করা। তুমি ফিরে যাও নিভা। তোমার চেয়ে ঢের বেশী আপনার রেণুমাসীমা আমাদের কাছে।

এ যেন উদ্দেশ্য নিয়ে মতলব করে আশ্রয় দেওয়া—মুখে কিছু বলবো না, কিন্তু ব্যবহারে এমন ভাব দেখাব যাতে আশ্রয়প্রার্থীর কাছে মনোগত ভাবটা জলের মত পরিষ্কার হ'য়ে যায়। এক অপমানের ভয়ে আর এক অপমান কুড়ান। যেচে মান, কেঁদে সোহাগ।

এ বাড়ীর তিনটি মানুষ, তিনটি জন, তিনটি লোক। তিন জনেরই ভাব তিন রকম, মা, ছেলে আর দাসী। খুব ভোরে ঘুম ভেঙে জড়িত চোখ দুটো যখন আলোর সন্ধানে নিভা জানালার বাইরে ফেরায়; তখন আকাশ আর পাহাড়ে দিকচক্রবাল একাকার—ধোঁয়াটে। ঠিক সেই সময় মনে হয়, কে যেন একটা চাদর মুড়ি দিয়ে বাড়ীটার চারিদিকে নিঃশব্দে প্রদক্ষিণ করছে, এত অস্পষ্ট সে পরিক্রমণ। ঘুমের ঘোরে হাঁটার মত। তারপর এক সময় শয্যা ত্যাগ করে, বাইরে এসে নিভা দেখে; অদূরে

গিরিমালা আলো ঝল্মল্, আকাশ তীব্র নীল, বাড়ীটা ছবি-ছবি। সারদা দেবীর স্নান, পূজা-আহ্নিক সব সারা—তিনি তখন মুখে গুণ গুণ করে স্তব উচ্চারণ করতে করতে অমলের ঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। হয়তো চোখা-চোখি হয় নিভার সঙ্গে মুহূর্ত্তের জন্যে। কিন্তু প্রভাতী কোন শুভেচ্ছাই প্রকাশ পায় না তাতে। পাথরের মত স্থির সে চাহনি। হু'পা এগিয়ে ঘেরা বারান্দাটা পেরিয়ে কলতলার কাছে এলে নিভা দেখতে পায়, শুকনো টিউব ওয়েলটার কাছে কাপড়-চোপড়ে আর বাসন-কোসনে একশা হয়ে সরবতীয়া শিলাসনে আসনপিড়ি হয়ে বসেছে। তার পর্য্যাপ্ত মলিন গাত্রাবাস, অলঙ্কার আর এঁটো বাসনের ব্যঞ্জনা অদ্ভুত। তাকে দেখে সরবতীয়া বাঈও বোধ হয় হাসে না।

সকালে কল ঘর থেকে ভিজে কাপড়ে বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গে একটা সাইকেলের ঘণ্টার শব্দ নিভার কানে আসে, ওদিকে অমলের ঘরের দরজা-জানালা সব খোলা হ'য়ে যায়।

সারদা দেবী নিজে চা খান না, কিন্তু সব কাজের আগে কলকাতার মেয়েটির জন্যে চা-খাবারের ব্যবস্থা তিনি নিজে হাতে করেন। ভাল না দেখালেও নিভা ভয়ে এগিয়ে যেতে পারে না। কি জানি উনি আবার কি মনে করবেন। যতদিন চলছে চলুক, জানেই তো সংসারে তার জন্যে কোন ব্যবস্থাই কায়েমী, চিরস্থায়ী নয়। লজ্জা করলে উপায় কি?

সকালে অমল বাড়ী থাকে না, সরবতীয়া চলেছে সহরে বাবুর দোকান আছে। রোজ একই সময় সাইকেলের শব্দটা তা হ'লে অমলের কাজে বেরুন'র নির্দ্দেশ। সেই দুপুরে বোধ হয় ফিরবে ভাত খেতে। দেখা হলেও হতে পারে, না হলেও কিছু যাবে আসবে না। খেয়ে দেয়ে আবার কখন বেরুবে সে, নিভা একটু চেষ্টা করলেই জানতে পারে, কিন্তু আর তেমন আগ্রহ বোধ করে না। কি দরকার তার, অহেতুক কৌতূহলে।

শুধু কৌতূহল নয়, বোধ হয় অন্যায়ও। এই নির্বান্ধব নির্জ্জন পুরীতে ভাবলেশহীন জীবন-যাত্রায় কারো প্রতি কোন কৌতূহল বা চিন্তার অবসর নেই—শুধু থাকাটাই এখানে বড় কথা। নিজের কথা বাদ দিলেও মা-ছেলেকে নিভা একবারও সুখ দুঃখের আলোচনা করতে দেখলো না। অথচ আশ্চর্য্য নিয়মানুবর্ত্তীতায় সংসারটা চলছে, মা রয়েছেন তাঁর বার-ব্রতপালনী তপশ্চরণ নিয়ে আর ছেলে রয়েছে সহরে ব্যবসা নিয়ে—পরস্পরের সম্বন্ধ না জানলে বোঝা যাবে না এঁদের একত্র বাসের যোগসূত্রটা কোথায়। সরবতীয়া বাঈ আর অমলে প্রভেদ কি এ বাড়ীর সম্পর্কে?

কুড়িটা বছর যে জীবনে অভ্যস্ত সে, এ তা থেকে শুধু পৃথকই নয়, বিপরীত। আর যেখানে সুখদুঃখ, ভালবাসা-ঘৃণা, হিংসা-দ্বেষ যে ভাবে ব্যক্ত দেখেছে নিভা, এখানে তার যেন কোন ভাবই নেই—পাথরের দেশে সব যেন পাথর হ'য়ে গেছে।

রেণু কাকীমা মনের কোন ভাবই গোপন রাখতেন না। রাগ, ভালবাসা, হিংসা, দ্বেষ সমান উচ্চ কণ্ঠে প্রকাশ করতেন।—তাঁর মনের বিরক্তি টের পেতে কোনদিন এতটুকু সময় লাগেনি নিভার। নিজের স্বার্থে 'দূর হও' বলতেও তাঁর এতটুকু দেরী হয়নি।

দুঃখ হ'লেও, ব্যথা পেলেও, মর্ম্মান্তিক আঘাতে হৃদয় দীর্ণ হ'লেও সেই যেন ভাল ছিল নিভার পক্ষে। অতো হানাহানি, কটাক্ষ, কটুভাষণে পরস্পরকে তবু চেনা যেত, বোঝা যেত, কোথায় যেন একটা অনাবিষ্কৃত যোগ ছিল। আর এখানে?—

ক'দিনে নিভা স্থির বুঝেছে, আর যাই এখানে সে পাক, ঐ যোগটা সে হয়তো কোনদিন খুঁজে পাবে না।

কত ভুলও মানুষ করে! অমলকে নিভা কি ভুলটাই না বুঝেছিল। হৃদয়ের কত অনুরাগ না নিভৃতে সঞ্চয় করে রেখেছিল, কত দুঃখ-রাত্রির সান্ত্বনা না পেয়েছিল, কত অনাদরে নিপীড়নে নিজেকে না মহীয়সী ভেবেছিল ঐ একটি মানুষের মুখ চেয়ে! যেদিন সময় আসবে সেদিন নিয়েই যাবে। সব দুঃখের সব অপমানের সব গ্লানির শেষ হ'বে। নিভা লজ্জা করবে না, দ্বিধা করবে না, কোন দোলায়মান চিত্তে সে সুযোগ হারাবে না।

কিন্তু একি! সমস্ত শরীরটা নিভার নিজের প্রতি ধিক্কারে সঙ্কুচিত হ'য়ে ওঠে। না না, এখানে সে থাকতে

আসেনি, এখানে সে থাকতে পারবে না কিছুতেই। নিজেকে আর এভাবে সে অপমান করবে না। ছোট হওয়ারও সীমা আছে। বরং রেণু কাকীমাদের পায়ে হাতে ধ'রে বিবাদ ভুলে যাবে, কাদায় গুণ ফেলে উদ্ধত যৌবনকে শাসন করবে, 'তবু এখানে আর না।' আজই বলবে ফিরে যাবার কথাটা হয় মা, নয় ছেলেকে। এসেছে বলে' ফিরে যাবার তো তার কোন বাধা নেই।

আলস্যে, চিন্তায় আর নিষ্ক্রিয়তায় দুপুরটা নিভার সুদূর নির্বাসনের মত মনে হয়। তার জন্যে নির্দিষ্ট পশ্চিমের এই প্রশস্ত ঘরটা সুরু-অপরাহ্নে তাকে যেন আরো অন্তর্মুখী ক'রে দিয়েছে। যে ভবিষ্যতের কথা এতদিন সে ভাববার অবকাশ পায়নি আজ যেন তা নানা বিভীষিকায় তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। শুধু কি আশ্রয়, আরো কত কি যে সে চিন্তা করছে! অনেক দুঃখে নিভার মুখ দিয়ে অস্ফুটে বেরিয়ে আসে, ভগবান, আর ভাবতে পারি না! দয়া করে আমার ভাবনার শেষ ক'রে দাও দয়াময়। উঃ মাগো!

বাইরে গেট খোলার শব্দ হ'লো—ক্লিচ্-ক্লিচ্—ক্যাঁচ-চ্-চ্! মুখ বাড়িয়ে না দেখলেও নিভা বুঝতে পারে খাওয়া দাওয়ার পর দুপুরে বিশ্রাম সেরে অমল সহরের দোকানে বেরুচ্ছে। ফিরবে আবার সেই রাত আটটা নয়টায়। ইচ্ছে করলেও নিভা নিজেকে দমন করে রেখেছে—কি দোকান, কেমন সে দোকান, কিসের ব্যবসা করে অমল? এখান থেকে সহরই বা কতদূর।

কই সাইকেলের ঘণ্টা তো আজ এখনো বাজলো না? নিভা হয়তো উঠতে গিয়ে জানালার কাছে দাঁড়াতো—আজকের ব্যতিক্রমটা অনুধাবন করতো, বিনা আওয়াজে অমল সত্যি সত্যি চলে গেল কি না।

পরের মেয়ের পরাশ্রয়ে এধরণের কৌতুহল শোভা পায় কি না ভাববার আগেই নিভা তার দরজার কাছে পায়ের শব্দ পেয়ে ফিরে তাকালে।

বিনা কৈফিয়তে অমল তার ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। কলকাতায় কখন কখন কাজে কর্ম্মে বেড়াতে যাওয়া সেই প্রবাসী যুবকটি—নিঃসঙ্গী সাদাসিদে, দেখলে মনে হবে না, যুবকটির সংহবৎ সম্বন্ধে কিছুমাত্র জ্ঞান আছে।

বরং নিভাই সঙ্কোচ বোধ করে। এ ক'দিনের মনস্তাপটা দরবিগলিত অশ্রু রেখায় চোখের কোনে জমে ওঠে, কে বলবে এ আনন্দ নয়, আর কিছু!

অমল হয়তো কিছু লক্ষ্যই করে না। ব্যস্তভাবে সে কাজের কথাটা আরম্ভ করে: কোলকাতার রেণুমাসীর ওখান থেকে একটা চিঠি এসেছে—

হঠাৎ তীক্ষ্ণ কিছু একটা শরীরে ভেদ করে যাওয়ার মত নিভা শিউরে ওঠে। মনে হয় আর বুঝি তার কোন সাড়া নেই, নিস্পলক চোখ দুটো স্থির, শূন্য দৃষ্টি। হৃদস্পন্দন স্তব্ধ।

—'মাসী তোমার নামে নানা অভিযোগ করেছেন তিনি ঠিক জানেন না তুমি এখানে এসেচো কি না, তবে এলে যেন কোন মতেই আমরা স্থান না দিই!'—কথাটা উড়িয়ে দেওয়ার মত করে অমল হেসে ওঠে।

দৃষ্টিটা নিভার আরো শূন্য হয়ে যায়। মুখে অমল হাসলেও তার প্রতি রেণুকাকীমার অভিযোগটা ওঁরা নিশ্চয়ই মনে মনে বিশ্বাস করেছেন। আর কেনইবা-না বিশ্বাস করবেন, রেণুকাকীমা ওঁদের আপনার লোক। নিভার চোখের অশ্রুটা কখন শুকিয়ে গেল।

মাসী কায়দা করে মাকেই চিঠিটা লিখেছিলেন, মা আমাকে দিয়েছেন আজ। উত্তর একটা দিতে হয় বলে অমল চিঠিটা বার করলে।

না দেখেই নিভা বলতে পারে রেণুকাকীমা তার সম্বন্ধে এঁদের কাছে কি লিখেছেন। দেখবার বা শোনবার আর কিছু নেই, এখন তৃতীয় পক্ষ কি বিচার করেন, তারই অপেক্ষা কেবল। এ পর্য্যন্ত সে যত লাঞ্ছিত হয়েছে, এর চেয়ে বড় লাঞ্ছনা বোধ হয় তাকে জীবনে আর কোনদিন ভোগ করতে হয়নি—নারীত্ব নিয়ে এমন খেলা বোধ হয় আর কোথাও কখনো হয়নি। নিজেকে নিভা শত ধিক্কার দেয়, বেছে বেছে এমন একটা জায়গায় আশ্রয় নেয়ার জন্যে। ওঁরা বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, নিজের প্রতি নিভা-সমস্ত বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। অভিযোগ সত্যি হোক মিথ্যে হোক তার মর্য্যাদা আর কিছু রইল না এখানে।

অমল বললে, তোমার চিঠি পেয়েই বুঝেছিলুম একটা কিছু হয়েচে—

নিভার মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ অমল থেমে যায়। মানুষের মুখের রং যে অমন বর্ণহীন হ'তে পারে তার ধারণাতীত। কিছু হ'লো নাকি?

নিভা নিজেকে সামলে নিলে। সলজ্জ ঔৎসুক্যে অমলের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি বিনিময় করলে।

অমল হেসে জিজ্ঞেস করলে, ব্যাপার কি?

কেন জানি না নিভার মনে হ'লো, অমল তার সঙ্গে চাতুরী করছে, যা জানবার উনি সব জেনেছেন, এখন ইচ্ছে করে ভালমানুষ সাজছেন। রেণুকাকীমাদের সঙ্গে এঁদের কোথায় যেন যোগসাযোগ আছে।

অস্ফুটে নিভা বললে, কেন উনি তো লিখেচেন সব।

অমল তেমনি হেসে বললে, তা হ'লেই হয়েচে! আসল ব্যাপারটা কি! একতরফা অভিযোগে ওটা থাকে না।

তবু নিভার বিশ্বাস হয় না। কণ্ঠস্বরটা যেন অনেকটা তিক্ত হ'য়ে ওঠে তার: জানিনা। লোকে যা বোঝে তাই।

অমলের মুখের হাসিটা মিলিয়ে যায়। নিভার মনোভাবটা সে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। সেতো খোট্টার দেশে মানুষ ছেলেটি কিন্তু হঠাৎ বলে ফেলে: বুঝতে পারিনি বলেই তো জিজ্ঞেস করছি। যদি অপরাধ হ'য়ে থাকে ক্ষমা চাইচি।

এর চেয়ে পায়ের তলার মাটিটা যদি দু'ফাঁক হয়ে যেত নিভা লজ্জা ঢাকবার জায়গা পেত।—ছি ছি, কি অহেতুক উষ্মা সে প্রকাশ করেছে। এখনো মান অভিমানের ছেলেমানষী তার যায় নি।

ঘর থেকে বেড়িয়ে যেতে যেতে অমল বললে, ভাল না মনে করেন বলবেন না। তবে জানলে রেণুমাসীকে খোলাখুলি লিখে দিতে পারতুম।

ভগ্নস্বরে অপরাধ স্বীকারের মত নিভা বললে, বিশ্বাস করুন কিছু হয় নি।

মুহূর্তের জন্যে ঘুরে দাঁড়িয়ে অমল একবার কি যেন দেখে নিলে, তার পর পিছন ফিরে বললে: আচ্ছা।

নিভা তেমনি ভগ্নস্বরে বললে, বিশ্বাস করুন, থাকতে এখানে আমি আসিনি। কালই চলে যাব।

ততক্ষণে অমল বেরিয়ে গেছে। হয়তো নিভার কথাগুলো সে শুনতে পায়নি। আর শুনলেও তার বলবার কি আছে উত্তরে! আসবার অনুমতি যখন সে দেয়নি তখন গেলে সে আর কি করতে পারে।

সাইকেলের আওয়াজটা এবার পাওয়া গেল—দূরে মিলিয়ে গেল শব্দটা। রাস্তার দিকে জানালাটা খুলে চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে রইল নিভা, যা বলতে মানুষ চায় না, অথচ অবস্থাগতিকে বলে ফেলে নিজের ওপর সমস্ত বিশ্বাস আধিপত্য হারিয়ে। বিমূঢ় স্তব্ধ হয়ে যায়, তেমনিভাবে নিভা দাঁড়িয়ে রইল। মনে হয়, সামান্য ঠেলা খেলে মানুষটা পড়ে যাবে হুমড়ি খেয়ে। এ কি করলে, এ কি বললে সে—এতদূর তা হলে কিসের আশায় ছুটে এসেছে সে?

[ক্রমশঃ

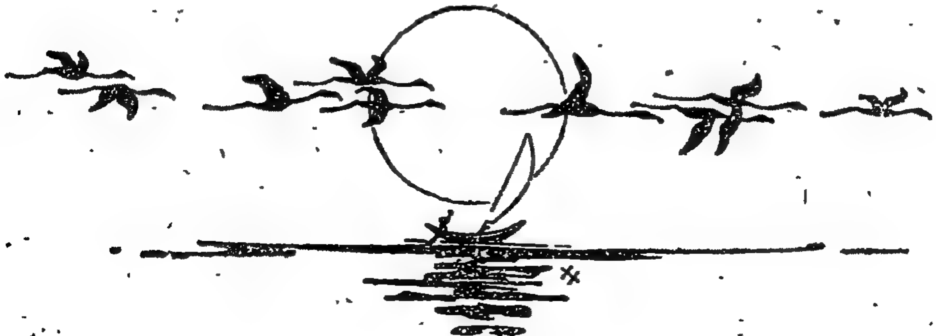

শরৎচন্দ্র

বিনয় কুমার রায়

রবীন্দ্রনাথের অমিত প্রতিভায় সারা বাঙলা তথা ভারত যখন উদ্ভাসিত এমন সময়ে এক অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে দেখা দিলেন শরৎচন্দ্র। রবি-রশ্মিজাল ভেদ করে অলৌকিক প্রতিভা-দ্যুতি বিচ্ছুরণে শরৎচন্দ্রের অবির্ভাব ঘটে বাংলার সাহিত্যগগনে। রবীন্দ্রযুগে জন্মেও শরৎ-চন্দ্রের প্রচেষ্টা হ'ল, সাহিত্যজগতে অভিনব অবদান রেখে যাবেন। শরৎচন্দ্রের মৌলিকত্ব দেখাতে গিয়ে আমি যে কথা বলেছি তাতে কেউ, যেন মনে না করেন যে রবীন্দ্র-নাথের ছাপ অণুমাত্রও তাঁর উপরে পড়ে নি। আমার বক্তব্য এই যে, যে যুগে রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে সমগ্র সাহিত্যিক সৌরজগত গড়ে উঠেছিল এবং যে সময়ে উদিত রবির প্রচণ্ড কিরণ শুধু সাহিত্যিক সমাজকে কেবল মাত্র আলোক বিতরণ করে ক্ষান্ত হয়নি, এই সব তারকা-বৃন্দকে একটা দুর্নিবার আকর্ষণের জোরে নূতন অজানা অনাবিষ্কৃত পথে পরিচালিত করছিল, সেই সময়ে সেই সৌরপিতার আওতা থেকে মুক্ত থেকে স্বেচ্ছায় সাবলীল-ভাবে সাহিত্য-গগনে বিচরণ করবার সাফল্যজনক প্রচেষ্টা দেখান শরৎচন্দ্র। ছেলেবেলায় যে তিনি রবীন্দ্রনাথকে সামনে রেখে চলেছিলেন তার প্রমাণ শরৎচন্দ্র নিজেই দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি, শরৎচন্দ্রের নিজের কথায়, শৈশবকালে তাঁর বড় প্রিয় ছিল। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে "হরিদাসের গুপ্তকথা", "ভবানী পাঠক" নামক তথাকথিত অকালপক্ক ছেলেদের উপভোগ্য বইও তিনি সমান আনন্দের সঙ্গে পড়েছেন।

তাঁর ছেলেবেলার কথা, যা তিনি উত্তরকালে আত্ম-কথা হিসাবে লিপিবদ্ধ করেছেন তাতে তিনি বলেছেন যে বোধোদয় আর চারুপাঠের সঙ্গে সঙ্গে যতরাজ্যের অখ্যাত কুখ্যাত বটতলা উপন্যাস কোনটাই তিনি বাদ দেননি পড়তে। জ্ঞানের প্রতি তাঁর ছিল একটা দুর্নিবার আকর্ষণ এবং জ্ঞানবৃক্ষের ফল আস্বাদনের জন্য তিনি সব কিছু করতে প্রস্তুত ছিলেন। প্রয়োজন হ'লে সাধারণ লোকে যাকে খারাপ বলে, সামাজিক বিধিনিষেধের মাপকাঠিতে যা দুশ্চরিত্রতা এবং অশিষ্টাচারের লক্ষণ তাও তিনি অবলীলাক্রমে জানবার পক্ষপাতি ছিলেন। ভালমন্দ সব জিনিষের মধ্যেই আছে। মন্দকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে অবিমিশ্র ভালকে কে কবে লাভ করতে পেরেছে! তাই তথাকথিত অসত্যের মধ্যেও সত্যের সন্ধান ছিল তাঁর কর্তব্য।—"যেখানে বড় জিনিষ আছে তাকে সম্মান করতে হ'বে, জ্ঞান যদি প্রয়োজন হয় খারাপ জিনিষের মধ্যেও তাকে খুঁজতে হ'বে,—ক্ষতির ভয় থাকলেও খুঁজতে হ'বে। তাছাড়া জানতে গেলে যে আকৃষ্ট হ'তে হ'বে তার কি কোন মানে আছে?" শরৎচন্দ্রের সে সত্য যেমনি কঠোর তেমনি উলঙ্গ তার প্রকাশ। এই সত্যের জন্য তিনি কোন কিছুতেই পিছপা হতে চাইতেন না। সত্যের অভিযানে তিনি এমনি নিষ্ঠাপরায়ণ ছিলেন যে অত্যন্ত পূজনীয় ব্যক্তিকেও তাঁর বিচারে যা মিথ্যা ভাষণ তার থেকে রেহাই দিতেন না। তাই তাঁর অতি শ্রদ্ধার পাত্র রবীন্দ্রনাথ যখন কোন প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "এ কথা মানতেই হ'বে যে আজকের দিনে পৃথিবীতে পশ্চিমের লোক জয়ী

হয়েছে। পৃথিবীকে তারা কামধেনুর মত দোহন করেছে, তাদের পাত্র ছাপিয়ে গেল·········অধিকার ওরা কেন পেয়েছে? নিশ্চয়ই সে কোন একটা সত্যের জোরে।” তখন শরৎচন্দ্রের সত্যানুরাগী অন্তর এতদূর বিক্ষুব্ধ হ'য়েছিল যে তৎক্ষণাৎ সেই জগদ্বরেণ্য কবিকে এর উচিত প্রত্যুত্তর দিতে তিনি পিছপা হ'ন নি। শরৎচন্দ্রের সেই প্রগল্ভ প্রতিবাদ তার “স্বদেশ ও সাহিত্য” নামক বিখ্যাত প্রবন্ধ-পুস্তকের মধ্যে রক্ষিত আছে।

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই মনে পড়ে তাঁর অসামান্য সহানুভূতিপ্রবণ দরদী অন্তরের কথা। বস্তুতঃ বাংলা এবং বাঙালীকে তিনি সত্যই ভালবেসেছিলেন। তাই এ দু'য়ের অতি বিশ্বস্ত নিপুণ চিত্র তিনি নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন তাঁর রচনায়। শরৎচন্দ্র জীবনকে উপলব্ধি করেছিলেন সমগ্ররূপে, খণ্ড খণ্ড বা বিচ্ছিন্নভাবে নয়। সামাজিক পরিবেশের এবং মানুষের অতি পরিচিত আবেষ্টনীর মধ্যে তিনি সেই জীবন-দর্শনেরই প্রতিচ্ছবি দেখেছেন। এই অভিনব দৃষ্টিভঙ্গীতে মানুষের প্রতি যে অপরিসীম দরদ বোধ করেছেন তাই তাঁর জীবন-দর্শনকে গড়ে তুলেছে। সুসমালোচক মোহিত লাল মজুমদার শরৎচন্দ্রের এই মানবপ্রীতি সম্পর্কে বলেছেন—“মানুষকে কোন তত্ত্ব নয়, ধর্ম্ম নয়, নীতি সংস্কার দ্বারা নয়—কেবলমাত্র নিজ হৃদয়ে আলিঙ্গন করিয়া, তাহার প্রাণের আকুতিকেই আর সকল সত্য অপেক্ষা বড় বলিয়া ঘোষণা করার যে মানবতা, বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান।” শরৎচন্দ্র মানুষকে সত্যিকারের সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখেছেন, তার যা ভাল তাকে তিনি অকপটে প্রকাশ করেছেন। যা' মন্দ তাকে তিনি সমর্থন করেননি,কিন্তু তাই বলে নিরন্তর খোঁচা দিয়ে তাকে আরও বড় করে তোলেননি। মানুষের ত্রুটি বিচ্যুতি, ভুলচুক্ সেতো আছেই, তাকে নিয়ে রঙ ফলানোয় বিশেষ যায় আসে না। অন্তরের অন্তস্থলে যে ভাব সঙ্কোচে সরমে অস্ফুট, সামাজিক নীতি বিচারের গণ্ডি পেরিয়ে যাকে সে সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করতে ভরসা পায়নি, তাকেই তিনি অপূর্ব্ব কথা শিল্পনৈপুণ্যে নবরূপ দান করেছেন। সেই দিক থেকে শরৎচন্দ্রকে সত্যই অসাধারণ বলা যায়—একজন সুগভীর অনুভূতিসম্পন্ন লেখক তিনি। হৃদয়-বৃত্তির সঙ্গে কবিশক্তির এমন অভিনব সংমিশ্রণ বড় একটা দেখা যায় না। ইংরেজ কবি শেলীকে যেমন কবির কবি বলা হয়, তেমনি যথার্থভাবেই শরৎচন্দ্রকে কথাশিল্পীদের মধ্যে অতি উচ্চ আসন দেওয়া যেতে পারে। মানুষের অন্তরের বেদনাকে তিনি রূপ দিয়েছেন তাঁর অপূর্ব্ব বর্ণনাভঙ্গীমায়। এটা সম্ভব হয়েছে কেন না তিনি ব্যথার কাব্যকার। শরৎচন্দ্র মানুষের প্রতি যে কত বড় দরদী তা তাঁর নিজের স্বীকোরোক্তির মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে—

“নানা অবস্থা বিপর্য্যয়ে একদিন নানা ব্যক্তির সংশ্রবে আসতে হয়েছিল। তাতে ক্ষতি যে কিছু পৌঁছয়নি তা নয়; কিন্তু সেদিন দেখা যাদের পেয়েছিলুম তারা সকল ক্ষতিই পূরণ করে দিয়েছে। তারা মনের মধ্যে এই উপলব্ধিটুকু রেখে গেছে—ত্রুটি বিচ্যুতি অপরাধ অধর্ম্মই মানুষের সবটুকু নয়। তার মাঝখানে যে বস্তুটি আসল মানুষ—তাকে আত্মা বলাও যেতে পারে—সে তার সকল অপরাধ সকল অভাবের চেয়ে বড়। আমার সাহিত্য রচনায় তাকে যেন অপমান না করি। হেতু যত বড়ই হোক. মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা জন্মে যায়, আমার লেখা কোনোদিন যেন না এত বড় প্রশ্রয় পায়। কিন্তু অনেকেই তা' আমার অপরাধ বলে গণ্য করেছেন এবং যে অপরাধে আমি সব চেয়ে লাঞ্ছনা পেয়েছি, সে আমার এই অপরাধ। পাপীর চিত্র আমার তুলিতে মনোহর হয়ে উঠেছে, আমার বিরুদ্ধে তাঁদের সবচেয়ে বড় এই অভিযোগ।” মানুষের প্রতি কত গভীর দরদ এবং সমব্যথা তিনি অন্তরে অনুভব করতেন তা উপরোক্ত কথা ক'টি থেকে উপলব্ধি করা যায়। তাঁর এই প্রগাঢ় সহানুভূতিই তাঁকে মানব-হৃদয়ে অক্ষয় আসন দান করেছে। মানুষের প্রতি এতদূর নির্ভর এবং প্রীতিবোধ ছিল বলেই শরৎচন্দ্র বুঝেছিলেন যে কোন একটা ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য ব্যক্তিকে গঞ্জনা দেওয়া বা তাকেই তার অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য করলে মারাত্মক ভুল করা হ'বে। তিনি যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন যে মানুষের মনটা একটা অত্যাশ্চার্য্য বস্তু, এর কোন সীমা পরিসীমা নেই—অসাধারণ শক্তির অধিকারী। পাপের পঙ্কে আকণ্ঠ

নিমগ্ন যে ব্যক্তি তারও অন্তরে একটা বিপরীতগামী ধারা প্রবাহিত—সেটারও কার্য্যকারিতা কোনক্রমেই কম নয়। To err is human—ভুল প্রত্যেকেই করে, কেউ কম, কেউ বেশী। জীবনে পথ চলতে গিয়ে পা হড়কে পড়ে যাওয়াটা কিছু বিচিত্র নয়। তাই বলে সেই দোষের ঘোল আনাটাই যে পথচারীর; পথের বন্ধুরতা, কিংবা পথ চলার অতি স্বাভাবিক বিপর্য্যয় যে কিছু নয় এতো জোর করে বলা যায় না। পথ দীর্ঘ, তার কোথাও কাদা, কোথাও পিছল, কোথাও বন্ধুর, পদস্খলন হওয়াটা খুব আশ্চর্য্যের নয়। শরৎচন্দ্র জীবন-পথে চলতে মানুষকে স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হ'তে হয় তা' উপলব্ধি করেছিলেন বলে তুচ্ছ ত্রুটি পদস্খলনে অধীর হয়ে ওঠেননি।

মানবের প্রতি সুগভীর সহানুভূতি এবং প্রগাঢ় করুণা-বোধ তাঁর সাহিত্যকে অপূর্ব্বরসে সিঞ্চিত করে অভিনব বর্ণসম্পাতে আলোকিত করেছে। এরই চরম পরিণতি ঘটেছে তাঁর নারী চরিত্রগুলিতে। নারীর প্রতি অপরিসীম সহানুভূতি এবং সমবেদনা শরৎ সাহিত্যের বৈশিষ্ট। সমাজের বিধিনিষেধ ও আচার অনুষ্ঠানের গণ্ডীজালে আবদ্ধ নারীর দুঃখকষ্ট-বেদনা তিনি যে ভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছেন তেমন আর কেউ পারেননি। নারীর দোষত্রুটি স্খলন বিচ্যুতি সব কিছুর উপরে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত যে মাতৃরসের স্রোত প্রবাহিত তাকে তিনি বিভিন্ন উপন্যাস এবং ছোট গল্পে প্রকাশ করেছেন। নারীর বাহিরের যে রূপ সাধারণতঃ চোখে পড়ে তাকেই তিনি তার সত্তার এক বৃহৎ অংশ বলে স্বীকার করতে চাননি। অন্তরের অন্তস্থলে দৃষ্টির অগোচরে পরম রহস্য মণ্ডিত যে অভিব্যক্তি তাকে চিনে নিতে ভুল তিনি করেন নি। তাই সমাজের বিবেচনায় দুশ্চরিত্রা এবং কলঙ্কিনী যে নারী তারই কথা উল্লেখ করে মানুষের সহজাত আমিত্ব ও দম্ভকে আঘাত করে তিনি বলেছেন—"সংসারে অন্নদা দিদিও যখন থাকে, তখন বুদ্ধির অহঙ্কারে পরকে মন্দ ভাবিয়া বুদ্ধিমান হওয়ার চেয়ে, ভাল ভাবিয়া নির্ব্বোধ হওয়াতেও যে মোটের উপর বুদ্ধির দামটা বেশীই পাওয়া যায়, সেকথা তাহাকে স্বীকার করিতে হয়।" কুলত্যাগিনী নারীর প্রতি সহানুভূতির এর চেয়ে বড় পরিচয় হ'তে পারে! বাস্তবিক সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরেও শরৎচন্দ্রের এই বিশ্বাস সুদৃঢ় ছিল যে নারীর কলঙ্ক নিয়ে মাথাঘামানটা কোন বড় কথা নয়; তার কলঙ্কে অবিশ্বাস করে যদি ঠকতে হয় সেও শ্রেয়; তবু বিশ্বাস করে পাপের ভাগী হ'তে তিনি চাননি। হয়ত এ তাঁর একটা বিচিত্র ধারণা মাত্র, হতে পারে। কিন্তু তবু এ ধারণা তাঁর জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর যে প্রতিষ্ঠিত নয় সে কথা কোনমতেই বলা যায় না। পুরুষ মানুষের যে সমস্ত দোষ ত্রুটি স্খলন পতন ক্ষমার্হ, মেয়ে মানুষের বেলায় তাই অমার্জ্জনীয় অপরাধ, একথা তিনি মানতে চাইতেন না। অজ্ঞানে অভাবের তাড়নায় একান্ত প্রতিকূল অবস্থায় তাকে যা' করতে হয়েছে তাইতে তার সব নয়, এর পশ্চাতেও যে একটা বিরাট সুমহান দিক রয়েছে—যেটা দৃষ্টি বিভ্রম হেতু সাধারণ মানুষের চক্ষুর অগোচরে, তার যে কোন মূল্য নেই—একথা তো বলা যায় না। অস্ফুট, অপ্রকাশ্য অজ্ঞাত রন্ধ্রে যে বিচিত্র অভিব্যক্তি বর্ত্তমান, কে বলতে পারে তার গুরুত্ব কতটুকু? কি গভীর সমবেদনা এবং সহানুভূতির দৃষ্টিতে শরৎচন্দ্র নারীকে দেখেছিলেন তা' তাঁর নিজের কথা থেকে দেখান যেতে পারে,—"দেখ জীবনের সত্যকে যত বড় কবিই হোক লঙ্ঘন করিতে পারেন না; নারীর সম্বন্ধে যে ধারণা আমাদের সমাজে সংস্কারের মত বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহা কত মিথ্যা, তাহা আমি জানি বলিয়াই কোন কবি, বিশেষ করিয়া যিনি খুব বড় বলিয়া সম্মান পাইয়া থাকেন, তাঁহার লেখায় দায়িত্বহীন কল্পনার অবিচার আমি সহ্য করিতে পারি না। ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্রের অনুরোধে মানুষের প্রাণকে ছোট করিয়া দেখিতে হইবে—নারীর জীবনের যেটা সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি, তাহাকেই একটা কুৎসিত কলঙ্করূপে প্রকাশ করিতে হইবে, ইহাতে কবি-প্রাণের মহত্ত্ব কিংবা কবি-কল্পনার গৌরব কোথায়? আমাদের সমাজে যে নিদারুণ অবিচার প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে, সাহিত্যে যদি তাহারই পুনরাবৃত্তি দেখি,—তবে মানুষ হিসাবে মানুষের মূল্য স্বীকার করা সম্বন্ধে হতাশ হইতে হয়।" নারীর উপর অপরিসীম দরদ ছিল বলে

যেখানে তিনি তার স্বাভাবিক অধিকার অণুমাত্র ক্ষুণ্ণ হতে দেখেছেন সেখানেই তাকে ঠিক ততটা পরিমাণে সামাজিক অবনতির পরিচয় বলে ধরে নিয়েছেন। আর এই জন্যই তাঁর নারী-চরিত্রগুলি এত বলিষ্ঠ, মর্ম্মস্পর্শী এবং প্রাণরসে পরিপূর্ণ। বস্তুতঃ শরৎসাহিত্যের সার্থকতা তাঁর একাধিক গৌরবোজ্জ্বল নারী-চরিত্রের মধ্য দিয়ে ঘটেছে।

শরৎচন্দ্র বাঙালী—বাঙলার সমাজ-জীবনকেই তিনি তাঁর সাহিত্যে রূপ দিয়েছেন। বাঙালী-জীবনের ভালমন্দ দোষ ত্রুটি, অভাব অভিযোগ, দুঃখকষ্ট যাবতীয় ভাব অভিব্যক্তিকে তিনি তাঁর অপূর্ব্ব লেখনীস্পর্শে বিচিত্র ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনের জ্বালাযন্ত্রণা, সুখ দুঃখ এদেরই অভিনব চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে শরৎসাহিত্যে। দারিদ্র্যপ্রপীড়িত, নানা ঝঞ্ঝা-বিগ্রহে অবসন্ন ঘরছাড়া দিকহারা বঙ্গসন্তানের জীবনযাত্রার অতি নিপুণ চিত্র অঙ্কন করেছেন তিনি। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর ধর্ম্মসংস্কৃতির মধ্যে যে দ্বিধারা প্রবাহিত—প্রাচীন শাক্ত এবং প্রাগাধুনিক বৈষ্ণব সাধনা এই দুইয়ের সংমিশ্রণে যে কৃষ্টি সংগঠিত, তাকেই একটি বিচিত্র 'রসরূপ' দান করেছেন শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে। নিশ্চিত ভাঙনের মুখে বাঙালী সমাজের একটি মূর্ত্ত-চিত্র তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর সাহিত্যে। দেশব্যাপী যুগ-সঙ্কটের ছায়ায় বাঙালী-জীবনের অপরূপ ছবি ফুটে উঠেছে শরৎচন্দ্রের রচনাগুলির মধ্যে। বাঙালীর প্রতি অপরিসীম সহানুভূতির কথা উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন······"শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালীর হৃদয়-রহস্যে। সুখদুঃখে মিলনে বিচ্ছেদে সংঘটিত বিচিত্র সৃষ্টির তিনি এমনি করে পরিচয় দিয়েছেন বাঙালী যা'তে আপনাকে প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছে।"

★

অবগুণ্ঠন খোল

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

অবগুণ্ঠন খোল !
আমার মনের গহন আকাশ তলে
লক্ষ আশার কনক দীপালি জ্বলে।
মুখোমুখি চাও তাদের মুখের পানে,
—আঁখিপল্লব তোল।
জলহারা মেঘগুলি,
উতল বাতাসে ওই দেখ ভেসে যায়
শাল পিয়ালের বনবীথি সীমানায়।
পাণ্ডুর চাঁদ হেলিয়া পড়িল ধীরে ;
—বাতায়ন দাও খুলি।
কম্প্র ওষ্ঠপুটে
যে ভাষা তোমার সলজ্জ জড়িমায়,
পেয়েছিল রূপ, বাণী তব পায় নাই।
আধো ছায়া আর আধো জ্যোছনার রাতে
উঠুক আজি তা ফুটে।
মৃত্যুরে কর জয়।
ওদের পেয়ালা ভরেছে গরলে হায়,
ক্রুদ্ধ নয়নে তুষানল জ্বলে তাই !
রুদ্ধ লালসা-মদির-অনল দাহে
ওরা পুড়ে হোক ক্ষয় !
তুমি আর আমি আজ
কহিব না কথা : বসি হেথা নিরজনে,
ছড়াইব স্মৃতি কেতকী কুঞ্জবনে।
ওদের আকাশে ঘনাবে রাত্রি যবে,
ফুরাবে মোদের কাজ।
ওরা যাচে হলাহল।
পেশির পেষণে ফেনিল মরণ হানে,
ইস্পাত আর বারুদ বজ্র বাণে :
নন্দন বনে, শোন তাই ওঠে ওই
মৃত্যুর কোলাহল।
চাহিওনা ফিরে :
তোমার তনুর কোমল পরশ লাগি
মরু সাহারায় কুসুম উঠুক জাগি।
মহাজীবনের কলকল্লোল ধ্বনি
উঠুক হৃদয় তীরে।

সমীক্ষা

উমারঞ্জন চক্রবর্ত্তী

কলিকাতা ফাটকাবাজারের মুকুটহীন সম্রাট শ্রীঠাকুরদাস মাধবভাই ঘুঘনিওয়ালা ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিশাল বাড়ীর সর্ব্বোচ্চতলার খাসকামরা হইতে বারান্দায় আসিয়া নীচের দিকে তাকাইলেন। এক পাশে লায়ন্স রেঞ্জে সরকারী দপ্তরখানার প্রবেশদ্বার প্রায় রুদ্ধ করিয়া সারি সারি তকতকে ঝকঝকে গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে, অল্প দূরে নেতাজী সুভাষ রোডে অগণিত পিঁপড়ার সারির মত চলমান জনস্রোতকে সচকিত করিয়া ফেরীওয়ালাদের সমস্বরে চীৎকারকে হজম করিয়া সশব্দে ছুটিতেছে সরকারী বেসরকারী গাড়ী, রিক্সাওয়ালা বহনসাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা লইয়া ঠুন ঠুন আওয়াজ তুলিয়া মন্থরগমনে চলাফেরা করিতেছে, কেহবা সোয়ারীর অভাবে রিক্সায় বসিয়া খৈনি টিপিতে টিপিতে অপরের সঙ্গে সুখ দুঃখের আলাপে রত। ক্রিং ক্রিং করিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া ছুটাছুটি করিতেছে সাইকেল আরোহারা, লরী জীপ মোটর সাইকেলের আনাগোনার বিরাম নাই, দূর হইতে বাসের হর্ণের আওয়াজও হঠাৎ হঠাৎ ছিটকাইয়া আসিয়া কানে পৌঁছিতেছে। নীচে রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেসে পথের উপর এক সুবিশাল জনতা ইষ্ট বেঙ্গল মোহনবাগানের মধ্যে চ্যারিটি খেলার মাঠের ভিড় এবং উত্তেজনাকেও ম্লান করিয়া দিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কেহবা তর্জ্জনী উঁচাইয়া কেহবা গলা বাড়াইয়া, কেহবা শিরদাঁড়া টান করিয়া, কেহব ধনুর মত বক্র হইয়া তারস্বরে দুর্ব্বোধ্য ভাষায় চীৎকার করিতেছে, আনাড়ী লোক মনে করিবে ইহারা বোধ হয় হিষ্টিরিয়া রোগাক্রান্ত।

ঘুঘনিওয়ালাজী বারান্দায় পায়চারী করিতে লাগিলেন, তাঁহার মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল, মনে পড়িল তিনিও একাদিক্রমে বহু বৎসর ঐ হিষ্টিরিয়ার রোগীদের মধ্যে দাঁড়াইয়া তর্জ্জনী উঁচাইয়া অনুরূপভাবে গলাবাজি করিয়াছেন। আর আজ—আজ তাঁহার অঙ্গুলি হেলনে সোহার বাজারে আগুন ধরিয়া যায়, পাটের বাজারে মন্দা নামিয়া আসে; তেজী মন্দীর এই ভেল্‌কী খেলার তিনি এখন একচ্ছত্র যাদুকর। তিনি আজ ক্রোড়পতি। একুশ বৎসর বয়সে তিনি মেসার্স ম্যাথিসন হপকিনসন কোম্পানীতে ঢুকিয়াছিলেন শিক্ষানবীশ হইয়া আর আজ তাঁহার বয়স আটান্ন। সুদীর্ঘ সাঁইত্রিশ বৎসর অক্লান্তভাবে ফাটকা বাজারের সেবা করিয়া আজ তিনি সৌভাগ্যের চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছেন। আজ তিনি চারটি কাপড়ের কল, তিনটি চিনির কল, সাতটি চট কল, নয়টি চা-বাগানের, দুইটি কয়লার খনির মালিক···

ঘুঘনিওয়ালাজীর মনে একটা দিনের ঘটনা চলচ্চিত্রের মত ভাসিয়া উঠিল। তিনি সেদিন মেসার্স ম্যাথিসন হপকিনসন কোম্পানীতে সামান্য কেরাণী পদের উমেদার হইয়া ইণ্টারভিউ দিতে ঢুকিয়াছেন। ইণ্টারভিউ গ্রহণকারী সাহেব তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "তোমার স্মরণশক্তি খুব তীক্ষ্ণ আশা করতে পারি?"

তিনি জবাবে একগাল হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "হুজুরকা মেহেরবানসে থোড়া থোড়া।"

সাহেব প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "ফাটকা বাজারের দৈনিক দরের ওঠানামার সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে?"

তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "হুজুর পরখ করে দেখুন।"

সাহেব চোখ বুজিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত বসিয়াছিলেন, বোধ হয় ষ্টক্ এক্সচেঞ্জের গোটা তালিকাটা মনে মনে আওড়াইয়া লইয়াছিল। পরে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "সাউথ করণ পুরার দাম কত?"

ঘুঘনিওয়ালাজী উত্তরে বলিয়াছিলেন, "ছাব্বিশ টাকা ছ' আনা।"

—"বড় মহাজন?"

—"চা-বাগানের কথা বলছেন? আঠারো টাকা বারো আনা থেকে তেরো টাকা এক আনা।"

—"কানপুর টেকসটাইল ?"

—"এগারো টাকা।"

—"ক্রিশ্চিয়ান মাইকা ?"

—"বারো টাকা চৌদ্দ আনা থেকে তেরো টাকা আট আনা।"

সাহেব মুখে কিছু না বলিলেও সে যে উত্তরে খুশী হইয়াছে তিনি তাহা ঘুঘনিওয়ালাজী কিছুক্ষণ বাদেই বুঝিতে পারিলেন। সাহেব তাহাকে বসিতে বলিয়া ভিতরের কামরায় চলিয়া গেলেন এবং আধ ঘণ্টাটাক বাদে একজন বেয়ারা আসিয়া তাঁহাকে ভিতরের কামরায় ডাকিয়া লইয়া গেল। সাহেব ঘরে একাই বসিয়াছিলেন, তিনি শ্রীঘুঘনিওয়ালার হাতে একখানি নিয়োগ পত্র তুলিয়া দিয়া বেয়ারাকে কি বলিলেন এবং পরক্ষণেই র‍্যাক হইতে টুপিটা টানিয়া লইয়া শিষ দিতে দিতে বাহির হইয়া গেলেন। ঘুঘনিওয়ালাজী রুদ্ধনিঃশ্বাসে চিঠিখানি খাম হইতে খুলিয়া পড়িলেন—কোম্পানী তাঁহাকে পঁচাত্তর টাকা মাহিনায় শিক্ষানবীশ হিসাবে নিয়োগ করিয়া সুখ অনুভব করিতেছেন। মূল বেতন ছাড়াও আপাতত তিনি ট্রামের একখানি 'অল-সেক্‌সন' মাসকাবারি টিকিট পাইবেন।···সে আজ হইতে সাঁইত্রিশ বৎসর আগের কথা।

কামরার অভ্যন্তরে একটা ফোন ক্রিং ক্রিং করিয়া উঠিতেই ঘুঘনিওয়ালাজী ভিতরে ঢুকিয়া ফোন তুলিয়া ধরিলেন, "হ্যালো, সাতপুরীয়া টি এষ্টেট ?···কৌন ? গাঙ্গী-সুজন। হাঁ্যা হাঁ্যা বাতাও। কেয়া বড় গিয়া ? হেঁ হেঁ হেঁ ···কেতনা ? হাঁ্যা···বাইশ রুপেয়া চৌদ আনা। ঠিক হ্যায়। আভি ছোড়ো মৎ···নেহি···নেহি, হাঁ্যা হাঁ্যা··· নমস্তে···হাঁ্যা হাঁ্যা নমস্তে···

তিনি ফোন রাখিয়া সবেমাত্র চেয়ারে আরাম করিয়া বসিয়াছেন, হন্তদন্তভাবে কামরায় প্রবেশ করিলেন তাঁহার একজন সেক্রেটারী, হাস্যবিগলিত কণ্ঠে বলিলেন, 'সাত পুরিয়া চা বাগানের ডেফার্ড শেয়ারের দাম বাড়ছে হুজুর।'

শ্রীঘুঘুনিওয়ালা নির্লিপ্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কত বেড়েছে বাবু ?'

সেক্রেটারী টেবিলের উপরে সাজানো একগাদা ফোন হইতে একটা তুলিয়া লইলেন—'এক্ষণে কত উঠেছে জেনে বলছি।'

শ্রীঘুঘনিওয়ালার মুখ বিকৃত হইয়া উঠিল, তিনি অনুচ্চ কণ্ঠে বলিলেন, 'বেএকুফ', পরে প্রকাশ্যে বলিলেন, পুঁছনেকা জরুর নেহি, ছোড় দেও।'

বিস্ময়ে সেক্রেটারীর মুখ আকর্ণবিস্তৃত হইয়া উঠিল, ছোড় দেগা ? আভি ? নেহি নেহি—

শ্রীঘুঘনিওয়ালা গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, 'হাম বাতাতা হায়, ছোড় দেও, হাঁ্যা, আভি ?'

সেক্রেটারী হাত কচলাইতে কচলাইতে বলিলেন—লেকিন—

ঘুঘনিওয়ালাজীর চেয়ারখানা যেন অসহ্য ক্রোধে বোঁ করিয়া ঘুরিয়া গেল, সেক্রেটারী শশব্যস্তে জি···জি করিতে করিতে কামরা হইতে বাহির হইয়া গেলেন। মুহূর্ত্তকাল বাদেই নীচের জনতার মধ্যে হিষ্টিরিয়া রোগটা হঠাৎ থামিয়া গিয়া আবার প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করিল—ডেফার্ড শেয়ার, ডেফার্ড শেয়ার, ঘুঘনিওয়ালা ছোড় দেতা ঘুঘনিওয়ালা ছোড়···

উহাদের চীৎকার ঘুঘনিওয়ালাজীর কানে মধু বর্ষণ করিল। তিনি হাসিয়া একটা ফোন তুলিয়া লইলেন। মুহূর্ত্তে সংবাদটা কলিকাতার ব্যবসায়ী মহলে ছড়াইয়া পড়িল, ফাটকা বাজারীরা ফোন লইয়া কামড়াকামড়ি সুরু করিয়া দিল। সকলের মুখে এক প্রশ্ন—কেতনা ভাও, কেতনা ভাও ? তাদের অত্যুৎসাহে এই তেজী মন্দীর উত্তেজনা শুধু কলিকাতা বাজারেই সীমাবদ্ধ রহিল না, আধ ঘণ্টা বাদেই বোম্বাই, আমেদাবাদ, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কানপুর হইতে অবিরত ট্রাঙ্ক কল আসিতে লাগিল, পাঁচ লাখ টাকার ডেফার্ড শেয়ারের কোটেশন জানিবার আগ্রহে পঁচিশ লাখ বাহির হইতে চলিল।

শ্রীঘুঘনিওয়ালা আর অফিসে বসিয়া থাকার কোন সার্থকতা দেখিতে পাইলেন না, তিনি টেবিলের উপর হইতে হলুদ রঙের পাগড়িটা তুলিয়া লইয়া মাথায় পড়িতে পড়িতে অভ্যাসমত লিফটের দিকে অগ্রসর হইলেন।

তিনি বাহিরে আসিতেই একখানা কালো রঙের ঝকঝকে গাড়ী আসিয়া তাঁহার সামনে দাঁড়াইল এবং ঝলমলে পোষাক পরা শোফার গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিয়া প্রভুর অভ্যন্তরে প্রবেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ফুটপাতের চীৎকাররত দালালদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে দেখিয়া ছুটিয়া আসিল, 'সুক্কিয়া ঘুঘনিওয়ালাজী, ডেকার্ড শেয়ার ছোড় দেতা, কেয়া মতলব?' কেহ বলিল, "ইসকে জ্যাদা বিজনেস হোগা, পঁচিশ লাখ পিটেগা জরুর।"

যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া প্রশ্নের ঝড় বহিয়া গেল, তিনি কিন্তু কাহারও কথার কোন জবাব দিলেন না, সাংখ্যদর্শনের পুরুষের মত নির্ব্বিকার চিত্তে গাড়ীতে চড়িয়া বসিলেন। গাড়ীখানি গুরুভারে একবার ক্যাঁচ করিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া বড়বাজার অভিমুখে ছুটিল।

চিৎপুর বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে একখানি প্রাসাদোপম ভবনের সামনে আসিয়া গাড়ী থামিলে শ্রীঘুঘনিওয়ালা নামিয়া লিফটে চড়িয়া তেতলায় উঠিয়া গেলেন, ধরাচুড়া না ছাড়িয়াই ফোন করিলেন তাঁহার প্রধান সাব-ব্রোকারকে। ঘরে তখন জনপ্রাণীর অস্তিত্ব ছিল না, তবু তিনি মুখের একপাশে হাত রাখিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা বলিতে লাগিলেন। ফাটকাবাজারের গুরুদেব ত্রিকমদাস নাথুভাই তাঁহাকে উপদেশ দিতেন, 'এ ব্যাপারে খুব হুসিয়ার হওয়া চাই কিন্তু। ঘরের দেয়ালের ইটকাঠেরও কান আছে জানবে।' ঘুঘনিওয়ালাজী গুরুর উপদেশ চিরকাল অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া আসিতেছেন।

খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তা বলার পর তাঁহার মুখ প্রসন্ন হাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, তিনি ফোন রাখিয়া দিয়া মাথার পাগড়িটা খুলিয়া লইয়া কেশবিরল মস্তকে আঙুল চালাইতে চালাইতে দেয়ালে টাঙানো একটা বৃহৎ তৈলচিত্রের মুখোমুখী দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখে চোখে একটা গর্ব্বভরা বিদ্রূপ উপচিয়া পড়িল, তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'কমলা বাঈ, বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করে কয়েক হাজার টাকা খোরপোষ আদায় করেছো বটে, কিন্তু ওটাকায় তো আর জীবন কাটবে না। থাকো তুমি কানপুরের ভাঙ্গা বাড়ীতে, আজই আমি মুক্তাবেনের জন্যে দেড়লাখ টাকার গয়না কিনে আনছি।'

প্রথম পক্ষের স্ত্রী কমলা বাঈ দেয়ালের গায়ে নিশ্চল অবস্থায় বিরাজ করিতে লাগিল, মুক্তাবেনের সৌভাগ্যে তাহার মুখে চোখে সপত্নীবিদ্বেষের কোন ভাববৈলক্ষণ্যই ফুটিয়া উঠিল না। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর কথাটাও শ্রীঘুঘনিওয়ালার মানসপটে ভাসিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু কড়িকাঠে ঝুলিয়া মরা স্ত্রীর বীভৎস স্মৃতিটা মন হইতে সবলে ঝাড়িয়া ফেলিবার জন্য তিনি খাতা পেনসিল লইয়া ডেকার্ড শেয়ারের দাম কষিতে লাগিলেন, খাতার গুণনের অঙ্কে শূন্যের সংখ্যা যত বাড়িতে লাগিল ততই তিনি মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতে লাগিলেন। শেষে কোন এক সময়ে অঙ্কশাস্ত্রের আলোচনা তাঁহার মন হইতে দ্বিতীয় স্ত্রীর গ্লানিকর স্মৃতিটা চাপা দিয়া দিয়াছে, তাহা তিনি জানিতেও পারিলেন না।

মনে কি ভাবের উদয় হইল কে জানে, বহুকাল পড়ে ঘুঘনিওয়ালাজী হঠাৎ সন্ধ্যার দিকে ইডেন গার্ডেনে বেড়াইতে যাইবেন স্থির করিয়া বাহির হইলেন। গঙ্গার ধার ঘুরিয়া গাড়ীখানি ইডেন গার্ডেনের সামনে আসিলে তিনি চমকিয়া উঠিলেন। উদ্যানের সেই শ্যামশোভা কই? সমস্ত উদ্যানের চারিপাশ হইতে গাদাগাদা আলকাতরা মাখানো টিন খুলিয়া এখানে সেখানে জড়ো করা হইতেছে। একপাশে কয়েকটা বিরাট লম্বা ঘরে সিভিল সাপ্লাইয়ের গুদাম, স্থানে অস্থানে ভাঙ্গা ঘর দুয়ারে অস্তিত্ব ঝোপ জঙ্গলের মধ্য হইতে উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। একটা ঝোপের পাশ দিয়া যাইবার সময়ে হঠাৎ একটা সাপ ফোঁস করিয়া উঠিল, ঘুঘনিওয়ালাজী ভুঁড়ি সর্ব্বস্ব দেহটিকে সাপের ছোবল হইতে বাঁচাইতে গিয়া কি একটা বস্তুতে হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেলেন। কিন্তু সাপটা সবেমাত্র খোলস ছাড়িয়াছে, সে আঁকিয়া বাঁকিয়া পাশ কাটাইয়া অন্য ঝোপের দিকে অগ্রসর হইল। ঘুঘনিওয়ালাজী হোঁচট খাওয়া বস্তুটির গায়ে কি সব দুর্ব্বোধ্য অক্ষর খোদাই রহিয়াছে দেখিলেন। কয়েক বছর আগে এখানে যে একটা জাতীয় প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে, বস্তুটি যে

কোন বিদেশী কোম্পানীর ষ্টলের ভগ্নাবশেষ তাহা তাঁহার ধারণাতেও আসিল না।

প্যাগোডার দিকে অগ্রসর হইতে গিয়া তিনি বাধা পাইলেন, এক পাল গরু ছাগল সেখানে স্থায়ী আস্তানা গাড়ীয়াছে। দেখিয়া তিনি বুঝিলেন দীর্ঘকাল ইডেন উদ্যানে মানুষের যাতায়াত নাই। তিনি যেদিকে তাকান সেই দিকেই বিলুপ্ত শোভার ছড়াছড়ি। ঘুঘনিওয়ালাজীর মনে পড়িল, দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর তিনি এদিকের ছায়া মাড়ান নাই, এর মধ্যে এখানে কোন ভৌতিক উপদ্রব ঘটিয়া গিয়াছে। একটা বিজাতীয় ভীতিবিহ্বলতা তাঁহাকে পাইয়া বসিল, তিনি কনুইয়ে বাঁধা তাবিজ কবজ সজোরে চাপিয়া ধরিয়া ছুটিয়া আসিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। শোফার প্রভুর বিহ্বলতা দেখিয়া কোথায় যাইতে হইবে জিজ্ঞাসা করিল না, গাড়ীখানি কার্জ্জন পার্কের দিকে লইয়া চলিল।

অনেক রাতে ঘুঘনিওয়ালাজী ঘরে ফিরিলেন। বিভিন্ন জুয়েলারী দোকান ঘুরিয়া তিনি কয়েক লাখ টাকার গয়না কিনিয়া লইয়াছেন। কার্জ্জন পার্কের উতলা হাওয়া হঠাৎ তাহার স্থবির মনে রঙীন পরশ বুলাইয়া দিয়াছে, পার্কে সুবেশা তরুণ তরুণীদের জোড়ায় জোড়ায় ফিরিতে দেখিয়া, তাহাদের দুই একটা ছিটকে আশা কথা শুনিয়া তাঁহার মন বিভ্রান্ত হইয়া গিয়াছে। যৌবনে পদার্পণের গোড়া হইতেই অর্থের নেশায় মাতাল হইয়াছিলেন, জীবনের এই রূপটি দেখিবার সুযোগ তাঁহার হয় নাই। পার্কে বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি বুঝিতে পারিলেন, কেন কমলা বাঈ তাঁহাকে ছাড়িয়া দূরে সরিয়া গিয়াছে, কেন শান্তা গলায় ফাঁসি পড়িয়াছে। ষোড়শী স্ত্রী মুক্তাবেনের কথাও তাঁহার মনে উদয় হইল। অকস্মাৎ উপলব্ধি করিলেন তাহাকেও তিনি দামী শাড়ী গয়না যথেষ্ট দিতেছেন বটে কিন্তু কখনও ভাল বাসিতে পারেন নাই।

মুক্তাবেনের শুইবার ঘরের দরজা এমনিতেই ভেজানো ছিল, ঘুঘনীওয়ালাজী অপরাধীর মত সন্তর্পণে ঘরে ঢুকিলেন, দেখিলেন মুক্তাবেনে অঘোরে ঘুমাইতেছে। সন্তর্পণে তিনি খাটের বাজু ধরিয়া আরো কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। বিবাহের পরে এই তাঁহার প্রথম নজরে পড়িল দামী শাড়ী গয়নায় সুসজ্জিতা এই ষোড়শী নারীর মুখে ঘুমের ঘোরেও কি একটা অতৃপ্তির ছায়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে। বিছানার পাশে ছোট্ট একটা টেবিলে একটা বই খোলা পড়িয়াছিল, তাহা দেখিয়া তিনি হাসিয়া ফেলিলেন, আপন মনেই বলিলেন, 'তুমভি কিতাব পড়তে হেঁ? ভাল', বহুত ভালা কাম'। তিনি ঝুঁকিয়া পড়িয়া বইয়ের একখানা ছবি দেখিতে যাইতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার কোটের বুকপকেট হইতে একটা ভেলভেটের বাক্স টুক করিয়া মেঝের উপর পড়িয়া গেলে সেই শব্দে মুক্তাবেনের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে চাহিয়া ঘরে পুরুষ মানুষ দেখিয়া চীৎকার করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল, 'কৌন? কৌন?' পরক্ষণেই ঘুঘুনিওয়ালাজীকে দেখিয়া আবার বিছানায় গা এলাইয়া দিল, তাহার মুখ হইতে একটা তাচ্ছিল্য ঝড়িয়া পড়া আওয়াজ বাহির হইল, 'ও তুম?'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ মুক্তা, ম্যয়'—বলিতে বলিতে ঘুঘনিওয়ালাজী খাটের এক প্রান্তে বসিয়া পড়িলেন, বিভিন্ন পকেট হইতে হরেক রকমের গয়নার বাক্স বাহির করিতে করিতে বলিলেন, 'সব তুমহারে লিয়ে মুক্তা, দেখো জেবরকে জেল্লা দেখো'!

কথা কয়টা একদমে বলিয়া ফেলিয়া তিনি গয়নাগুলি একটার পর একটা বাক্স হইতে বাহির করিতে লাগিলেন উজ্জ্বল বিজলী বাতির আলো হীরক চুনি পান্না খচিত স্বর্ণাভরণে পড়িয়া কামরার দেয়ালে, মুক্তাবেনের মুখে প্রতিফলিত হইল। কিছুক্ষণ গয়নাগুলি নাড়াচাড়া করিয়া হঠাৎ তিনি মুক্তাবেনের হাত ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'আমি তোমার জীবন বরবাদ করে দিয়েছি মুক্তা। চিরকাল শুধু টাকা কামাইয়ের ধান্ধায় ঘুরেছি, তোমাদের দিকে কখনো তাকাইনি। প্রথম হাজার টাকা ব্যাঙ্কে জমা দেবার বেলায় ভেবেছিলুম, ব্যাঙ্কে দশ হাজার জমলেই আমি তোমাদের নিয়ে জীবনের সমস্ত আনন্দ নিরুপদ্রব নিশ্চিন্তে উপভোগ করবো, কিন্তু টাকার চিন্তাই চিরকাল আমাকে ঠকিয়ে এসেছে। দশ হাজারকে কি করে দশ লাখ করা যায়, দশ লাখ কি করে

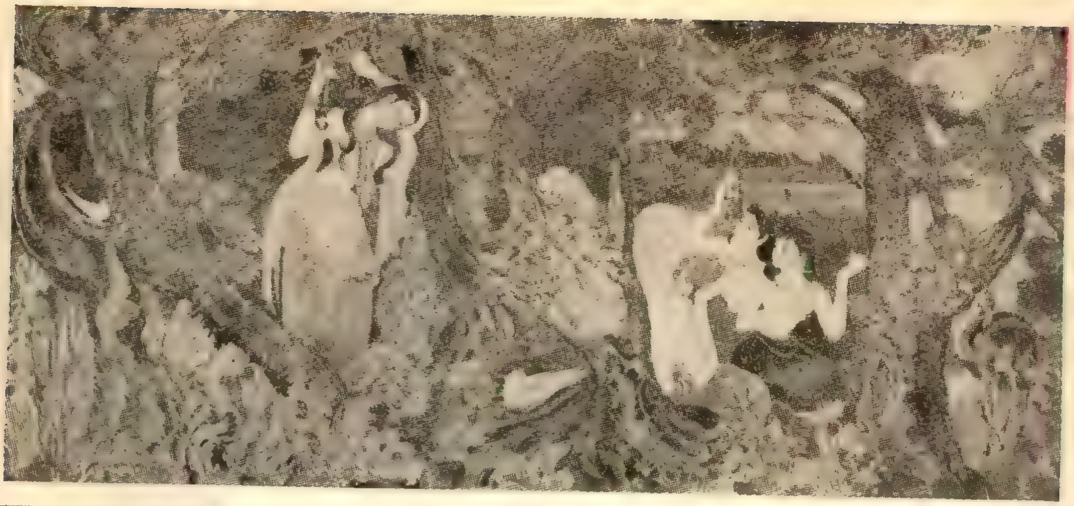

কোটি টাকা হয় এই চিন্তাই আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো। কি করে যে দিনের পর দিন কাপড়ের কল গড়ে উঠেছে, চিনির কল থেকে কি করে লাখ লাখ টাকা মুনাফা আসছে সে যেন আমার কাছেও বিস্ময়। কিন্তু আজ হঠাৎ আমি নিজেকে জানতে পেরেছি। এবার আমি দাম্পত্য জীবনের কর্ত্তব্য ষোল আনা পালন করবো। কাল বিকেলে আমরা দু'জন কার্জন পার্কে বেড়াতে যাবো—কেমন ?'

মুক্তাবেন ম্লান হাসিয়া মাথা নাড়িল। সে টেবিলের উপরে বইখানা খোলা দেখিয়া একটু হতচকিত হইয়া পড়িল। সে বইখানি তুলিয়া লইয়া বালিশের তলায় গুজিতে যাইতেছিল, হঠাৎ ঘুঘনিওয়ালাজী আব্দারের ভঙ্গীতে বইখানা তাঁহার হাত হইতে ছিনাইয়া লইলেন, বলিলেন, 'তুমি কিতাব পড়তে ভালবাসো ? আচ্ছা কাল বেরিয়ে আসবার পথে দোকান থেকে তোমার পছন্দমত যত খুশী বই কিনে দেবো। হামারে একঠো কিতাব থা, রূপকিশোরজীকা 'ফাটকা বাজারকা হালচাল।' পড় লিয়া তুম ? আচ্ছা কিতাব হ্যায় না ?'

ঘুঘনিওয়ালাজী বইখানি হাতে লইয়া কথা বলিতেছিলেন, হঠাৎ বইয়ের মধ্য হইতে একটা চিঠি টুক করিয়া মেঝের উপর পড়িয়া যাইতেই মুক্তাবেন একটা আর্ত্ত চীৎকার করিয়া খাট হইতে নীচে ঝুঁকিয়া পড়িল, কিন্তু ঘুঘনিওয়ালাজী তার আগেই চিঠিখানি পা দিয়া চাপিয়া ধরিলেন। মুক্তাবেন চিঠিখানির এক কোন ধরিয়াছিল, সে টানিতে টানিতে বলিতে লাগিল 'ছোরো, ছোরো।' ঘুঘনিওয়ালাজী হাসিয়া স্ত্রীর গালে একটা ছোট্ট টোকা মারিয়া বলিলেন, "কভি নেহি, পহলে একঠো আচ্ছা কিতাবকা নাম বাতাওতো।'

মুক্তাবেন কোন কথা না বলিয়া আগের মতই চিঠির কোন ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। ঘুঘনিওয়ালাজী পায়ের তলা হইতে চিঠিখানি তুলিয়া লইলেন, টানাটানিতে কিছুটা অংশ মুক্তাবেনের হাতে রহিয়া গেল।

—'তুম লিখনাভি জানতা ? আচ্ছা আচ্ছা—" বলিতে বলিতে তিনি চিঠিখানি খুলিতে যাইতেছিলেন, মুক্তাবেন তাঁহার হাত ধরিয়া পাগলের মত বলিতে লাগিল, "সীতা মাইকে কিরিয়া, মহাবীরজীকে কিরিয়া, চিঠ্‌ঠি মৎ খোলো, মৎ খোলো…'

ঘুঘনিওয়ালাজীর তখন নূতন প্রেমের নেশাটা জমিয়া আসিয়াছে, তিনি স্ত্রীর বারণ মানিলেন না, চিঠিখানার ভাঁজ খুলিয়া চোখের সামনে মেলিয়া ধরিলেন, কিন্তু প্রথম সম্বোধনটি পড়িয়াই তিনি শিহরিয়া উঠিলেন…প্যারে রমেশ…আর বাদবাকী তিনি পড়িতে পারিলেন না, তাঁহার মনে হইল কতগুলি কেউটে সাপ যেন হরফের আকারে চিঠির মধ্য হইতে তাঁহাকে ছোঁবল দিতে উদ্যত।

মুহূর্ত্তমাত্র। পরক্ষণেই ঘুঘনিওয়ালাজী হাতের কাগজখানা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া 'রেণ্ডী, রমেশ তুমহারে জার

হায় না' বলিতে বলিতে তিনি সবলে স্ত্রীর গলা চাপিয়া ধরিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার খাস কামরায় একটা ফোন ক্রিং ক্রিং করিয়া বাজিয়া উঠিতেই তিনি তাড়াতাড়ি মুক্তাবেনকে ছাড়িয়া দিয়া পাশের কামরায় হাটিয়া গিয়া ফোন ধরিলেন, "হ্যালো, কেয়া, ম্যয় ঘুঘনিওয়ালা বাতাতা? কোন? ইণ্ডিয়ান আয়রণ? কেতনা ভাও···কেতনা ভাও···?"

ইণ্ডিয়ান আয়রণের দাম বাড়িয়া গিয়াছে শুনিয়া ঘুঘনিওয়ালাজী ফোন ধরিয়াই লাফ ঝাঁপ করিতে লাগিলেন, ওদিকে পাশের কামরায় পুরোহিত তান্ত্রিক যুগের রচিত বাৎস্যায়নের কামসূত্রের সচিত্র হিন্দী অনুবাদখানা মেজের উপর হাঁ করিয়া ধনতান্ত্রিক যুগের দাম্পত্য-প্রণয়ের গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করিতে লাগিল।

★

পাপমুক্তি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

পাপেই জীবিকা নির্ব্বাহ করে যারা,
পাপ আশ্রয়ি' বাঁচে,
নহে আশাহীন, বিরাট সম্ভাবনা—
আছে তাহাদেরো আছে।
দস্যু হইয়া রয়েছে রত্নাকর,
আজ ভীমরুল,—কাল হবে মধুকর,
সুমধুর রাম নামের ধ্বনি যে
আগায়ে আসিছে কাছে।

২

প্রাণী বধ করা নিত্য যাদের কাজ,
ঘৃণা লাজ নাহি মানে,
ব্যাধের বিবেকে বাধেনাক কোনো কিছু,
পতিত নিজেরে জানে।
তা'রি হত মৃগ শোণিত বিন্দুচয়
মহাকাল ভালে কেন চন্দন হয়?
পদস্খলিত বিল্বপত্রে
কৃপাধারা কিসে টানে?

৩

পাপে পুণ্যের বীজাণু লুকায়ে রয়,
সহসা সুদিন আসে,
পাপীকে সাধুতে রূপান্তরিত করে
আঁধারেতে চাঁদ হাসে।
কতই বিল্বমঙ্গলে ভেঙে গড়ে,
জগাই মাধাই অনুতাপে কেঁদে মরে,
হরিপদতলে লুটাইতে শির
'গয়াসুর' ভালবাসে।

৪

সব প্রেয় বেশী আঘাত হরিকে
পাপীরাই করে দান,
তাহারাই দেয় শ্রেষ্ঠ ভক্তি
অতি বড় সম্মান।
'একবার হরিনামে সব পাপ হরে,'
মনে প্রাণে শুধু তারা বিশ্বাস করে
তীর্থের ফল তাহারাই লভে
করে মুক্তিস্নান।

৫

অতো আকুলতা অতো ব্যাকুলতা
ও মিনতি করে কারা?
তাদের তীর্থ সর্ব্বকৃত্য
নামেতেই হয় হারা।
শুক্তির ক্ষতে মুক্তা ফলান যিনি—
তাদের সর্ব্বশেষ সম্বল তিনি,
তাহারাই পায় সবাকার আগে
তাঁর নূপুরের সাড়া।

৬

পতিত, তাপিত, জাগো ওঠো ওগো,—
শোনো বংশীর রব।
এলো যে তোমার ভগ্ন কুটীরে
সুধার মহোৎসব।
হীরকের দানা বাঁধিতেছে অঙ্গারে
গরুড় পক্ষী ডাকত কি করে ধারে,
পাবে বিষ-কীট-দষ্ট কুসুম
পারিজাত গৌরব।

—

অয়েল

আপ্টন সিন্‌ক্লেয়ার ★ অনুবাদক ঃ যতীশ বেদজ্ঞ

[আমেরিকার জনগণের লেখক আপ্টন সিন্‌ক্লেয়ার তাঁহার 'অয়েল' উপন্যাসখানি রচনা করিয়া বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছেন। সাধারণ উপন্যাসের ন্যায় 'অয়েল' গল্পধর্মী উপন্যাস নয়। ইহার মধ্যে আমেরিকার সমাজ-জীবনের নানা সমস্যা বস্তুমুখর হইয়া উঠিয়াছে। বিদগ্ধ পাঠকমাত্রেই গ্রন্থখানির সঙ্গে পরিচিত। ইতিপূর্বে এ উপন্যাস বাংলাভাষায় অনূদিত হয় নাই। প্রথম এই উপন্যাসের বঙ্গানুবাদে অগ্রসর হন শ্রীযতীশ বেদজ্ঞ। সহজ ভাষায় এবং ততোধিক সহজতম বর্ণ-বিন্যাসে তিনি বঙ্গশ্রীর ১৩৫৬ সালের শ্রাবণ সংখ্যা হইতে 'অয়েল' গ্রন্থের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ আরম্ভ করেন। দুঃখের বিষয়, উক্ত সালের চৈত্র সংখ্যা পর্যন্ত ধারাবাহিক প্রকাশিত হইয়া অনিবার্যকারণে উহার পরবর্তী অংশের প্রকাশ বন্ধ থাকে। বঙ্গশ্রীর নিয়মিত পাঠকবর্গ অবশ্যই 'অয়েলে'র পূর্ব প্রকাশিত অংশের সঙ্গে পরিচিত। বর্তমান সংখ্যা হইতে পুনরায় উহার বঙ্গানুবাদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল।—সম্পাদক ঃ বঙ্গশ্রী]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[তিন]

তার ঐ ব্যবহারের জন্য সত্যিই কি পল ওয়াটকিন্স্‌কে পাগল বলা যেতে পারে? তাহলে সে পাগলামীর ছিটে-ফোঁটা তো বান্নীর মধ্যেও রয়েছে, না হলে পলকে ওর ভালই বা লাগবে কেন আর তার কথা এতো চিন্তাই বা করবে কেন। বান্নী মনস্থ করেছে ও আর মিথ্যে কথা বলবে না, তা সে যত ছোটই হোক ; এক দিক দিয়ে সেটা বেশ্য সৌখীনতারই সামিল, আবার অন্য দিক দিয়ে দেখতে গেলে এ ছাড়া আর কোন্ ভাবেই বা ও পলকে শ্রদ্ধা দেখাতে পারে! পলের সাথে ওর সাক্ষাতের ফলে ও যেন হঠাৎই বুঝতে পেরেছে জীবনটা ওর কত সহজভাবে বয়ে চলেছে। পরের দিন ভোরে হোটেলের পুরু নরম গদী, ধবধবে মোলায়েম চাদর স্ট্রবেরী রংয়ের ডোরাকাটা গরম কম্বলের স্বচ্ছন্দ আরামের মধ্যে ঘুম ভাঙ্‌তেই ওর প্রথম চিন্তা হলো, আশ্রয় আর আচ্ছাদনহীন পলের কি করে কাটলো সে রাতটা? সে কি তবে মাটিতেই শুয়েছিল? ওর মনে পড়লো ঠাকুমার কথা যিনি ওকে মাটিতে একটু বসতে দেখলেও আর্তনাদ করে ওঠেন 'মরবে তুমি ঠান্ডা লেগে!' হোটেলের নীচের তলার প্রশস্ত খাবার ঘরে বসে পল হয়তো কিছুই খেতে পায়নি ভেবে বরফ দেওয়া আঙ্গুরের রস, মাখন দেওয়া বাদাম পেস্তা, ডিম, মাংস, চাপাটি সব কিছুই যেন এক নিমেষে ওর কাছে হয়ে উঠলো বিস্বাদ। পল হয়তো ক্ষুধার্তই থেকে যাবে, কারণ নিজের উপার্জিত খাবার না হলে সে তো তা কিছুতেই খাবে না ; অজস্র প্রাচুর্যের মধ্যেও একথা ভেবে কেনই যেন বান্নীর মন হাহাকার করে উঠলো সেই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর জন্য যে কিনা দেহের দাবীও মানতে রাজী নয়।

মিসেস্ গ্রোর্তির বাড়ীতে ওদের সাক্ষাতের পরদিন সারা সকালটাই বান্নী বসে রইলো ওদের হোটেলের সামনের একটা কুল গাছের তলায়, ওর আশা হয়তো বা পল এসেও পড়তে পারে সেই রাস্তায়। কিন্তু সে এলো না। তার পরিবর্তে এলেন মিসেস্ গ্রোর্তি আর তাঁর স্বামী আর তাঁদের সঙ্গে নিয়ে এলেন মিঃ ডাম্পারি, মিসেস্ ব্রমলি আর তাঁদের সাময়িক বন্ধু ইহুদী দরজী দুজনকে। মাঝারি জমিগুলোর মালিকদের পক্ষ থেকে তাঁরা জানাতে এসেছেন, রাত একটা পর্যন্ত আলোচনা চালিয়ে তাঁরা নাকি সবাই মিলে একসাথে চুক্তি করার পরিবর্তে প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে চুক্তি করারই সিদ্ধান্ত করেছেন ; তাঁরা এখন চাইছেন ড্যাড্ যাতে তাঁদের জমিগুলো লীজ নেয়। বান্নী তাঁদেরকে জানালো, ড্যাড্ তার ভূতাত্ত্বিককে সাথে নিয়ে বাইরে গেছে জমিগুলো দেখতে, কাজেই তাদের অপেক্ষা করতে হবে, কিন্তু ও জানে পাশের জমি থেকে তেল টেনে নেওয়ার সম্ভাবনা সম্বন্ধে ড্যাড্ কত হুঁসিয়ার, কাজেই ছোট জমিগুলো লীজ নেওয়ার তার কোন ইচ্ছেই নেই।

ও গিয়ে বসে পড়লো বেঞ্চিটার পরে মিসেস্ গ্রোর্তির পাশ ঘেঁসে, ওর উদ্দেশ্য কথায় কথায় জেনে নেওয়া পল তাঁর কাছে আত্মপ্রকাশ করেছে কিনা। বান্নী তাকে বললো, আগের দিন সন্ধ্যায় সে নাকি একটা অন্যায় করে ফেলেছে, বারান্দা থেকে বাইরের শোভা দেখতে দেখতে রান্নাঘরটা

বন্ধ করার কথাটা নাকি একদমই ভুলে গিয়েছিল। তারপর ওর সত্যকথা বলার সংকল্পের কথা মনে করে যোগ করে দিলঃ একজন লোক নাকি রান্নাঘরে ঢুকে কিছু খাবার খেয়ে নিয়েছে, বান্নী তাকে কথা দিয়েছে, কাজেই তার নাম ও বলতে পারবে না, তবে একথা ঠিকই যে সে খুবই ক্ষুধার্ত ছিল আর বান্নী তাকে দয়া না দেখিয়ে পারে নি। যদি মিসেস্ গ্রোর্তি কিছু মনে না করেন—বলতে বলতে ও টেনে বের করলো ওর ছোট্ট থলেটি।

সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলেটির এই বিবেচনা বোধ দেখে মিসেস্ গ্রোর্তির আনন্দ আর ধরে না; এই ক্ষুদে বিদেশীটিকে তিনি যেন ভালই বেসে ফেললেন, ওর সুন্দর চেহারা, লাল টুকটুকে মেয়েলি ঠোঁটদুটো আর সিনেমায় দেখা বয়স্ক মার্কুইস্‌দের মত ব্যবহার তাঁকে মুগ্ধ করে ফেললো। ওর টাকা তিনি কিছুতেই নিতে রাজী হলেন না, আর সেই সঙ্গে তাঁর দুঃখ হলো কেন তিনি আরও আগে বড়লোক হতে পারেন নি; তাহলে তিনিও তো পারতেন তাঁর ছেলেমেয়েদেরকে এমনি সুন্দর জামাকাপড় পরাতে আর এমনি বনেদি চালে কথাবার্তা বলতে শেখাতে!

এরই দু'তিন দিন পরে তেলের জমিটার পাশ দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে বান্নী এসে পড়লো গ্রোর্তিদের বাড়ীর কাছে। মিসেস্ গ্রোর্তি তখন দানা খাওয়াচ্ছিলেন তাঁর খরগোসগুলোকে। বান্নীকে দেখতে পেয়ে তিনি ডাকলেন, 'ও খোকা শোন!' তারপর ও কাছে যেতেই বললেন, 'পল আমাকে একখানা চিঠি লিখেছে।'

উত্তেজনা চেপে রাখতে না পেরে বান্নী চীৎকার করে উঠলো, 'কোথায় আছে সে?'

'চিঠিখানা তো ডাকে দেওয়া হয়েছে স্যান্ পলো থেকে। কিন্তু ও লিখেছে ওর খোঁজ না করতে, কারণ কাজ কর্ম নাকি এখনও কিছু জোগাড় করে উঠতে পারে নি, কাজেই ওখানেও ও থাকছে না।'

'কেমন আছে সে?'

'লিখেছে তো ভালই আছে আর কোন চিন্তা না করতে। হতভাগা ছেলে আবার দু' ডলারের টিকিট পাঠিয়েছে আমাকে সেই খাবারের জন্য! লিখেছে ওটা নাকি ও নিজেই উপার্জন করেছে—ভগবান ওর মঙ্গল করুন! বলতে বলতে চোখের জল নেমে এলো তাঁর বড় বড় গালদুটো বেয়ে; আর বান্নী অবাক হয়ে গেল মানুষের চরিত্রের দুর্বোধ্য জটিলতা দেখে, একসময় যিনি হায়েনার মত হিংস্র আর লোভী অন্য সময় তিনিই আবার মমতাময়ী মাতৃমূর্তি।

একটা খরগোসের খাঁচার পরে বসে ওরা দুজনে অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা বললো। বান্নী সব কিছু মিসেস্ গ্রোর্তিকে বলে ওর মনের বোঝাটা হাল্কা করে নিল। আর মিসেস্ গ্রোর্তিও ওকে খুলে বললেন ওয়াটকিন্স্ পরিবারের সব কথাঃ তাঁরা নাকি প্রথমে ছিলেন আরকান্‌সাসে, সেখান থেকে পুরনো আমলের ঠেলাগাড়ী করে তাঁরা যখন বেরিয়ে পড়েন অন্য জায়গার উদ্দেশ্যে তখন মিসেস্ গ্রোর্তি নেহাৎই ছেলেমানুষ, তারও আগে যখন তিনি সবে কোলের শিশু তখন তাঁরা থাকতেন টেনেসিতে। প্যারাডাইসে ওদের ছিল একটা ছাগল চরাবার খামার, আর ছোট্ট একটা উপত্যকার মধ্যে একটা পাহাড়ী ঝর্ণা; চাষ আবাদ করবার মত জমি ছিল মাত্র একর দুয়েক আর তাতে জলসেচ করবার জন্য ছিল একটা হাতপাম্প। দেশটা নাকি নেহাৎই মরুভূমি, কাজেই পল কাজ না করলে তাদের দিন চলাই হয়ে পড়বে দুষ্কর; তিনি অবশ্য তাঁর তেলের টাকাটা পেলে তা থেকে তাদেরকে কিছু পাঠিয়ে দেবেন কিন্তু তাঁর ভাই অর্থাৎ কিনা পলের বাবা আবার তা নিতে রাজি হবেন কিনা সেও এক সমস্যা, ধর্ম সম্বন্ধে তিনি নাকি এমনি গোঁড়া।

বান্নী জানতে চাইলো, চিরকালই তিনি অমনি বাড়াবাড়ি করতেন কিনা। তার উত্তরে তিনি জানালেন, না, তা নয়, মাত্র কয়েক বছর আগেই নাকি কি করে ওটা তাঁর মাথায় ঢুকেছে। মিসেস্ গ্রোর্তি অবশ্য তিন বছর আগে তাঁর বর্তমান স্বামীকে বিয়ে করার পর থেকেই তাঁর সত্যিকারের ধর্ম বেছে নিয়েছেন আর সেটাই নাকি চিরকালের সনাতন ধর্ম, যার মধ্যে কিনা না আছে কোন দলাদলি আর না আছে কোন নিত্যনূতন মতবাদের সম্ভাবনা। বীচ্‌সিটীতে তাঁদের সুন্দর একটি গীর্জা আছে, আর সেখানে আছেন তাঁদের ফাদার প্যাট্রিক, ভারী দয়ালু লোক আর গলাটিও দিব্যি গমগমে আর চমৎকার—বান্নী কি কখনো কোন ক্যাথলিকদের প্রার্থনা সভায় যোগ দিয়েছে? বান্নী জানালো, না, তা সে দেয় নি; আর মিসেস্ গ্রোর্তিও হয়তো আর একটু হলেই পেয়ে যেতেন একটি দিব্যি সুন্দর ধনী শিষ্য যদি না তাঁর মনটা তখন ব্যাপৃত থাকতো নেহাৎই পার্থিব বিষয়ের চিন্তায়।

হ্যাঁ—শয়তানই তাঁকে ওখানে এনে বসিয়ে দিয়েছে ঐ খরগোসের খাঁচাটার পরে, আর তাঁর চোখের সামনে তুলে ধরেছে পার্থিব ঐশ্বর্যের মোহ। রাস্তাটার ঠিক ওপারেই, লস্ রোবলস্ বোলভার্ডের ৫৭৪৩ নম্বরের জমিটার পরে কোচ্ সিণ্ডিকেটের তাঁবু পড়েছে আর তাদের লাল রংয়ের পলেস্তারা করা চিহ্নটা দেখে মোটরে করে দলে দলে লোক

এসে ভীড় জমাচ্ছে দিনরাত ধরে দশটাকার সব শেয়ার কিনতে। মিসেস্ গ্রোর্তি ওকে জানালেন তাঁরা, মাঝারি জমিগুলোর মালিকরা, নাকি এখনও লীজ দেন নি তাঁদের জমিগুলো ; কয়েক জায়গা থেকেই অবশ্য তাঁরা প্রস্তাব পেয়েছেন আর তাঁদের মধ্যে সব চাইতে ভাল প্রস্তাবটা এসেছে স্লিপার এ্যান্ড উইলকিন্স কম্পানীর কাছ থেকে, বান্নী কি এদের সম্বন্ধে কিছু জানে? আর ড্যাডের কি সত্যিই ধারণা যে উত্তর দিককার জমিগুলোতেই বেশী তেল পাবার সম্ভাবনা? মিসেস্ গ্রোর্তি আর তাঁর স্বামী নাকি তাঁদের খাজনার টাকাটা পেলেই সেটা খাটাবেন ইউরেকা পেট্রোলিয়াম কোম্পানীর শেয়ারে, তারা নাকি খুব তাড়াতাড়িই সুরু করে দেবেন উত্তর দিককার জমিগুলোতে কুঁয়ো বসাতে। শুনতে শুনতে বান্নীর মনে পড়ে গেল ড্যাডের সেই হুঁসিয়ারির কথাঃ দেখ খোকা, কেউ যেন আবার তোমায় তেলের কুঁয়ো ভেবে সব পাম্প করে বের করে না নেয়।

চার

মিঃ বেনজিঞ্জার দু' লরী মেক্সিকান পাঠিয়ে রাস্তাগুলো ঠিক করে দিয়েছেন আর মিঃ এ্যাস্‌কটও তাঁর কথানুযায়ী কুঁয়ো বসাবার কাঠ পাঠিয়ে দিয়েছেন ঠিকমত ; ড্যাডের প্রধান ছুতোর মিস্ত্রী তার দলবল জোগাড় করে নিয়ে এসে লেগে গেছে ভিতের কাঠের গুঁড়িগুলোকে ছেঁদা করে বল্টু আঁটতে আর এমনি করে দেখতে দেখতে মাথা তুলে দাঁড়ালো কুঁয়ো বসাবার বিরাট যন্ত্রটা, ১২২ ফিট্ উঁচু, সোজা, নিরেট আর মজবুত। মাঝ বরাবর একটা মাচা আর তাতে উঠবার একটা মই আর সকলের উঁচুতে একটা দাঁড়াবার জায়গা ; সব কিছুই দিব্যি সুন্দর নূতন আর পরিষ্কার আর ড্যাডের মত নিয়ে উপরে উঠে গিয়ে স্বচ্ছন্দে দেখেও আসা যায় দূরের দৃশ্যগুলি, গাছ আর বাড়ীগুলোর ওপারে যেখানে এসে পৌঁছেছে প্রশান্ত মহাসাগরের নীল জল—উঃ! সত্যি চমৎকার সে দৃশ্য! এর পরই এসে হাজির হলো মোটর লরীর ঝাঁক, সূর্যাস্তের আলো-আঁধারে চারদিক কঁাপিয়ে পথের ধুলোকাদা মেখে আর হর্ণের শব্দে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বুঝি বা তারা অভিনন্দন জানালো জে· আরণল্ড আর তার ছেলেকে। পাথরের টুকরো দিয়ে ভরাট করে ফেলা রাস্তার পাশের খানাডোবার উপর দিয়ে তারা গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো মাঠের পরে এক এক সারে বারটা করে।

তেল তুলবার যন্ত্রটার পরে জ্বলে উঠেছে অজস্র বিজলী আলো আর তাদের খাকী সার্টের আস্তিন গুটিয়ে অপেক্ষা করছে শ্রমিকরা। সবাই তারা কাজ করছে উৎসাহের সাথে, কারণ তারা জানে সেই বুড়োর চোখ রয়েছে তাদের পরে, যার হাত দিয়ে তারা পাবে তাদের বেতন আর নির্ধারিত হবে তাদের অদৃষ্ট। তারা সবাই শ্রদ্ধা করে সেই বুড়োকে, কারণ সে জানে তার কাজ, আর কারো পক্ষেই সম্ভব নয় তাকে ফাঁকি দেওয়া। তারা ওকে ভালও বাসে, কারণ কঠোরতার সাথে তার দয়াও আছে দরকার মত ; সহজ আর অনাড়ম্বর প্রকৃতির লোক সে, কাজের চাপ থাকলে তাদের খাবার জায়গায় তাদের সাথে দাঁড়িয়ে কড়াইসুঁটি চিবোতেও আটকায় না। একদিকে যেমন সত্যিকারের কাজের লোক অন্যদিকে আবার লাখ লাখ ডলারের মালিক সে। হ্যাঁ, তেল তার মেলাই আছে, অসংখ্য পিপে ভর্তি, আর যে লোকের ডজন দুয়েক তেল তুলবার যন্ত্র আছে, আছে ডজন দুয়েক মাইল জুড়ে ইস্পাতের পাইপ, চৌবাচ্চা আর মোটর লরীর ঝাঁক আর সেই সাথে আছে সেগুলোকে চালিয়ে আনবার রাস্তা, কোথায় লাগে তার কাছে যাদুকরের যাদুবিদ্যা?

বাচ্চাটাকেও তাদের ভাল লাগে ; ড্যাডের মতই সে অনাড়ম্বর আর তার চেয়েও আমুদে আর সেই সাথে আছে সব কিছুতেই আগ্রহ। প্রশ্ন করে বুঝমানের মত আর তার উত্তরগুলোও মনে করে রাখে হুবহু। হ্যাঁ, ওরকম ছেলে যে ব্যবসা শিখবে আর তা চালিয়ে নিয়ে যাবে সে তো জানা কথা ; বুড়ো ওকে ঠিক শিক্ষাই দিচ্ছে। মজুরদের সকলের নামই ওর মুখস্থ, আর তাদের ঠাট্টা বিদ্রূপেও যোগ দেয় হাসিমুখে আর পরেও আসে তাদের মতই তেলচিটে পোষাক আর তাই নিয়ে কাজে লেগে যায় ওর ছোট্ট হাতদুটোতে যতটা কুলোয়।

কিন্তু ঠাট্টা বিদ্রূপের সময় নয় এটা, ; সবাই তৈরী হয়ে রয়েছে কঠোর পরিশ্রমের জন্য। ইঞ্জিনটাকে বসাবার জন্য তৈরী করা হয়েছে মস্ত একটা সিমেন্টের বেদী, তার পরে রয়েছে একটা কাঠের বেদী যাতে করে ওটা না কাঁপতে পারে ; ইঞ্জিনটাকে নিয়ে লরীটা গিয়ে দাঁড়ালো যথাস্থানে —আর সেটাকে নামিয়ে দেওয়া হলো বেদীটার পরে, তারপর চারদিকে কাঠের গুঁড়ি দিয়ে সেটাকে নিয়ে একমুহূর্তে বসিয়ে দেওয়া হলো তার জায়গায়, এখন কাজ সুরু করলেই হয়। অন্যদিকে আর একদল লোক লেগে গেছে বাষ্পের বয়লারটাকে তৈরী রাখবার কাজে। হাতের কাছেই রাখা হয়েছে এক চৌবাচ্চা ভর্তি জ্বালানী তেল আর সেটা তৈরী রয়েছে বাষ্প তৈরী করার উপযোগী হয়ে। ইতিমধ্যে এর

পরের লরীটাকেও পিছিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো তার যথা-স্থানে আর টানাগুলোর তলায় গুঁজে দেওয়া হলো বড় বড় সব কাঠের গুঁড়ি। পরদিন ভোরে বান্নী এসে দেখলো বিরাট চৌবাচ্চাটাকে বল্টু এঁটে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে তার যথা-স্থানে আর দড়িগুলোকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে তেল তুলবার যন্ত্রটা থেকে, অর্থাৎ কিনা এবার নামানো হচ্ছে মাটি কাটবার যন্ত্রটাকে। ভারী নলগুলোর তিনটার সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে একটা ইস্পাতের শিকল আর একটা কপিকলের সাথে আঙ্টা লাগিয়ে সেটাকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে শিকলটাকে ধরে থাকবার জন্য ; ইঞ্জিনটা ঠকাস্ ঠক্ করে চলবার সঙ্গে সঙ্গেই শিকল আর ইস্পাতের দড়িটায় পড়বে টান, আর নলটা গড়িয়ে নেমে আসবে লরীটা থেকে। এই পাইপগুলোর এক একটা লম্বা হচ্ছে বিশ ফিট্ আর তার এক এক ফুটের ওজন হচ্ছে উনিশ পাউন্ড আর কুঁয়োটা এক মাইল গভীর হলে হিসাব করলেই দেখা যাবে মোট পাইপগুলোর ওজন দাঁড়িয়েছে পঞ্চাশ টন আর তার তারের দড়িগুলোকে টেনে তুলতে হবে সেই ওজন আর লক্ষ্য রাখতে হবে যেন চৌবাচ্চা আর ইঞ্জিনটা সহ্য করতে পারে সেই ওজনের চাপ। লোকে হৈ চৈ করে পেট্রোলের চড়া দামের জন্য—কিন্তু মাটি কাটবার যন্ত্র আর ইস্পাতের পাইপগুলোর দামের কথা তো একবার ভেবে দেখবার চেষ্টা করে না!

হাজার বার করে শোনা আছে বান্নীর এই সব কথা ; কিন্তু তবু যেন ড্যাডের বিরাম নেই সেই সব বলবার।

ছেলেটা তার পাশে থেকে সব কিছু না শিখলে সে যেন শান্তি পায় না। বিশেষজ্ঞ দিয়ে এসব কাজ করানো চলে বলে মনে করলে ভুল করা হবে ; কারণ কে বিশেষজ্ঞ তা বুঝতে হলেও যে চাই বিশেষজ্ঞ হওয়া। একদিন হয়তো দেখা গেল তোমার প্রধান মিস্ত্রী গেছে মরে না হয়তো অন্য কেউ কিনে নিয়েছে তাকে তোমার কাছ থেকে, তখন তোমার উপায় কি হবে? তাই ড্যাড্ বলে, চেষ্টা ক'রো যেন নিজের বিশেষজ্ঞ নিজেই হতে পার।

যে যন্ত্রটা ঘুরপাক খাচ্ছে ওটাকে বলা হয় 'ঘূর্ণি-চাকা' ; ইঞ্জিনটার সাথে ওটার যোগ করে দেওয়া হয়েছে একটা ইস্পাতের শিকল দিয়ে যেটা কিনা ঠিক সাইকেলের চেনের মত, তবে তার এক একটা গাঁট ঠিক হাতের মুঠোর মত বড় এই যা তফাৎ। 'ঘূর্ণিচাকাটার' ঠিক মাঝখানটাতেই একটা গর্ত—আর শীঘ্রই দেখা যাবে মাটির পরেও ওরকম আরেকটা! 'ঘূরণ চাকিটা'র মাঝের গর্তটা হচ্ছে চৌকো আকারের আর মাটিকাটার যন্ত্রটার বাঁটটাও ঠিক তেমনি চৌকো যাতে করে ওটাকে নামিয়ে আনার সাথে সাথে ওটা এসে গর্তটার মাঝে বসে যাবে খাপে খাপে, কিন্তু তার আগেই ওটার মুখে লাগিয়ে নিতে হবে লোহার দাঁত আর তার ঢাকনা যেটার কাজ হচ্ছে কিনা সত্যিকারের মাটিকাটা। প্রথমে ওরা অবশ্য সুরু করবে একটা চ্যাপ্টা আকারের দাঁত দিয়ে, খাবার থালার মত বড় দুখানা চাকতিকে লাগানো হবে একটাকে আর একটার বিপরীত দিকে আর উপরের চাপে সেটা গিয়ে ঢুকতে থাকবে মাটি কেটে, প্রত্যেকখানা থালাই আঠারো ইঞ্চি চওড়া আর ঘুরতে ঘুরতে তারা যে গর্ত কেটে চলবে সেটা হবে দু ফিট চওড়া।

দেখতে দেখতে ওরা শেষ যন্ত্রটা লাগিয়ে নিয়ে শেষ বল্টুটা এঁটে ফেললো আর কুঁয়ো বসাবার যন্ত্রটা তৈরী হয়ে গেল মাটির বুকে তার দীর্ঘ যাত্রা সুরু করতে। জাহাজ জলে ভাসানো কিম্বা কোন সাধারণতন্ত্রের প্রথম সভাপতির অভিষেকের মতই এটা একটা উৎসব বিশেষ। বন্ধু বান্ধবরা এসে জড়ো হবে, জড়ো হবে এসে আশে-পাশের খনিগুলোর সব মজুররা আর অজস্র দর্শক। এই মুহূর্তটির জন্যই যেন গত তিন সপ্তাহ ধরে মজুররা সব খেটে এসেছে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, আর এই মুহূর্তে সেখানে এসে জড়ো হয়েছে দিনরাত দু' শিফটেরই মজুররা, তাদের চোখে ফুটে উঠেছে তাদের অতীত পরিশ্রমের গৌরব আর ভবিষ্যতের আশার স্বপ্ন। ইঞ্জিনচালক ধরে রয়েছে ইঞ্জিনটা আর তাকিয়ে আছে ড্যাডের দিকে ; ড্যাড্ মাথা হেলাবার সাথে সাথেই ও টিপে দিলে কলটা আর সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিনটা সুরু করলো চলতে, শিকলে টান লেগে চাকাগুলো করে উঠলো আর্তনাদ, দাঁতটা গিয়ে কামড়িয়ে বসলো মাটির বুকে—আর শব্দ সুরু হলো—'ফটা-ফট্!' অন্তত অমনি বলেই মনে হয় শব্দটাকে, আর সেজন্যই ওটাকে ওরা সবাই বলে 'ফটফট'। প্রধান মিস্ত্রী গেয়ে উঠলো, 'চলো ভাই, চীনে যাই।' আর যাদের যাদের হাত পরিষ্কার ছিল তারা গিয়ে করমর্দন করলো ড্যাডের সাথে আর সেই সাথে মিষ্টার, মিসেস্ ব্যাঙ্কসাইড আর তাদের গোটা পরিবারের সাথে যাদের জমিতে কিনা ওরা বসাচ্ছে ওদের কুঁয়োটা। ড্যাড্ আর বান্নীকে ওরা কাঁধে করে নিয়ে গেল তাদের বাড়ীতে আর সেখানে গিয়ে ওরা খুলে বসলো এক একটা স্যাম্পেনের বোতল আর তা থেকে গলায় ঢালতে ঢালতে ওরা স্বাস্থ্য কামনা করলো রস-ব্যাঙ্কসাইডের এক নম্বরের কুঁয়োটার যেটা কিনা ততক্ষণে ঢুকে পড়েছে ফুট ছয়েক মাটির নীচে। [ক্রমশঃ

জনকল্যাণে সৌরশক্তি

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত

ঊনবিংশ শতাব্দীতে কোন দেশের শ্রীবৃদ্ধির পরিমাপ করা হোত সেই দেশের মজুত কয়লা থেকে এবং সেই দেশ কতটা বাষ্পীয় শক্তিকে কাজে লাগায় তার উপরে। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীতে—অন্ততঃ আজ পর্যন্ত—বাষ্পীয় শক্তির পরিবর্তে মানুষ গ্রহণ করেছে বৈদ্যুতিক শক্তি এবং এই বৈদ্যুতিক শক্তিই বিংশ শতাব্দীর ব্যবসা-বাণিজ্যে এনেছে এক আলোড়ন এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে করেছে প্রভাবান্বিত। বাস্তবিক পক্ষে, গড়ে প্রতি মানুষ কতখানি বৈদ্যুতিক শক্তি খরচ করে এইটাই এখন যে কোন দেশের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির পরিমাপক। কিন্তু এই বৈদ্যুতিক শক্তি পেতে গেলে যেসব জিনিষের উপর দেশকে নির্ভর করতে হয় তা মোটামুটি হচ্ছে নিম্নরূপঃ—কয়লা, পেট্রল, জল, হাওয়া ইত্যাদি। কিন্তু এদের ভেতর সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ও সহজপ্রাপ্য শক্তিসৃষ্টিকারী উৎস হচ্ছে কয়লা। এই কয়লা থেকে উদ্ভূত শক্তিদ্বারাই চলছে মিল-ফ্যাক্টরী, বৈদ্যুতিক যন্ত্র, চলছে ট্রেণ প্রভৃতি যানবাহনের ইঞ্জিনসমূহ, আবাসগৃহ হচ্ছে আলোকিত। এক কথায় বর্তমান সভ্য-জগত প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে কয়লা থেকে উদ্ভূত শক্তির উপরে নির্ভরশীল। কিন্তু এই কয়লার পরিমাণ এমন নয় যে পৃথিবীর সবশক্তি চিরকাল সে জোগাতে সমর্থ হবে। আন্তর্জাতিক ভূবিদ্যা কংগ্রেস বলেছেন যে, সমস্ত পৃথিবীতে প্রতি বছর ১৬০০ মিলিয়ন টন কয়লা খরচ হয় এবং এইভাবে খরচ হতে থাকলে যে পরিমাণ কয়লা পৃথিবীতে আছে তাতে মাত্র ৫০০০ বছরের কাজ চলতে পারবে। কাজেই নতুন ধরণের শক্তিসৃষ্টিকারী উৎসের সন্ধান যে একান্ত প্রয়োজনীয় একথা বুঝতে বিজ্ঞানীদের বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ হয়নি। তাঁদের চেষ্টার ফলে আর এক অভিনব ও প্রচণ্ড শক্তিসৃষ্টিকারী উৎসের সন্ধান পাওয়া গেছে এবং সেটা হচ্ছে পারমাণবিক শক্তি। পদার্থগঠনকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণুর ভিতর যে এত বিপুল শক্তি লুকানো ছিল সে কথা জানতে পেরে বিজ্ঞানীরা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়েছিলেন। গত মহাযুদ্ধের সময় এই পারমাণবিক গবেষণা এত বিস্তৃতিলাভ করেছিল যে এই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিস্ফোরক বোমার সৃষ্টি হয়েছিল। তখন থেকেই বিজ্ঞানীরা মনে মনে এই আশা পোষণ করছেন যে একদা এই বিপুল পরমাণু-শক্তিকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারলে কয়লার অভাব দূর হবে। তাই ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে—এমন কি আমাদের দেশেও এই পারমাণবিক গবেষণার বিস্তৃতির জন্য সরকার থেকে ব্যাপক চেষ্টা করা হচ্ছে।

কিন্তু এই পারমাণবিক শক্তি ছাড়া আর এক প্রকারের শক্তি বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সে হচ্ছে সৌর-শক্তি। সকল শক্তির মূল হচ্ছে সূর্যরশ্মি। কারণ আমাদের পরিচিত প্রায় যে কোন শক্তির কথা চিন্তা করি না কেন, তার মূলাধার খুঁজতে গেলে দেখা যাবে ঐ সৌরশক্তি। এই সৌরশক্তি যে কত প্রচণ্ড তা সহজে অনুমান করা যায় না। সূর্যদেহের কেন্দ্রে এ তেজের পরিমাণ কুড়ি মিলিয়ন ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড এবং সূর্যদেহের বহির্ভাগ—যেটা আমাদের দৃষ্টি-গোচর—তার তেজ প্রায় আট হাজার ডিগ্রী। প্রতি সেকেণ্ডে সূর্য বহির্বিশ্বে যে পরিমাণ শক্তি বিকীরণ করে তা প্রায় পাঁচ হাজার মিলিয়ন আণবিক বোমার সমকক্ষ এবং এ প্রচণ্ড তেজ সূর্য বিকীরণ করছে দু' একদিন নয়—কোটি কোটি বছর ধরে! কাজেই সৌরতেজের প্রচণ্ডতা যে কত ভীষণ তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। এই অপর্যাপ্ত শক্তিকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারলে যে অনেক সুবিধা আছে সে কথা বলাই বাহুল্য। তাই, সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা এবিষয়ে খুব গভীর গবেষণায় রত আছেন।

এই সৌরশক্তি যে আগেও বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি, এমন কথা বলা যায় না। উপকথায় শোনা যায় যখন রোমান নৌবাহিনী Syracuse আক্রমণ করে তখন বিখ্যাত বিজ্ঞানী আর্কিমিডিস এক বিরাট Concave আয়না দ্বারা সৌরশক্তি কেন্দ্রীভূত করে সমস্ত রোমান সৈন্য ভস্মীভূত করেছিলেন। অবশ্য এ গল্প কতটা সত্যি তা সঠিক বলা যায় না, কিন্তু এ সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে পরবর্তী কালের বিজ্ঞানীরা এই ধরণের 'আয়না' সম্বন্ধে যথেষ্ট আগ্রহশীল হয়েছিলেন। এই ধরণের আয়নাকে বলা হত 'Live Mirrors'। প্যারিস অবজারভেটরীর মিউ-জিয়ামে চতুর্দশ লুইয়ের সময়কার এই ধরণের একটি 'Live Mirror' রক্ষিত আছে। এই আয়নাটি কয়েকটি ধাতুর সংমিশ্রণে তৈরী এবং ১·১৪ মিটার ব্যাসযুক্ত। এই

আয়না দ্বারা সূর্যরশ্মি কেন্দ্রীভূত করে ১০০০° ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেডেরও বেশী তাপমাত্রা সৃষ্টি করা যেতে পারে। বিশিষ্ট রসায়নবিদ্ ল্যাভ'য়াসিয়র এই 'Live Mirror' সম্বন্ধে খুব কৌতূহলী ছিলেন। তিনি একটি 'লেন্স' তৈরী করেছিলেন যার ব্যাস ১·৩ মিটার এবং সেটি এ্যালকোহল্ দ্বারা পূর্ণ। এই লেন্সদ্বারা সৌরশক্তি কেন্দ্রীভূত করে তিনি ১৭৭৩° ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেডের তাপমাত্রা সৃষ্টি করেছিলেন। ল্যাভয়সিয়রের পর ১৮৬৯ সাল পর্যন্ত এই সম্বন্ধে আর কোন কাজ হয়নি। ১৮৬৯ সালে Mouchot নামে এক স্কুলশিক্ষক সৌরশক্তি সম্বন্ধে আগ্রহশীল হয়ে কিছু গবেষণা করেছিলেন। তিনি একটি বিরাট Concave আয়না তৈরী করে তার দ্বারা সূর্যরশ্মি কেন্দ্রীভূত করে রান্নার কাজ করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ঐভাবে তৈরী খাবার মোটেই সুস্বাদু হয়নি এবং তা থেকে একটা দুর্গন্ধ নির্গত হয়েছিল। Mouchot-এর স্ত্রী খাদ্য বিষাক্ত হয়েছে এই ভয় করে তাঁর স্বামীকে আর কখন রান্নাঘরে ঢুকতে দেননি! Mouchot বলেছিলেন যে সূর্যরশ্মির ভিতর এমন কোন রাসায়নিক পদার্থ আছে যার সংমিশ্রণে খাদ্যদ্রব্য পচে যায় এবং তাথেকে দুর্গন্ধ নির্গত হয়। এর পরে ১৮৭৯ সালে Mouchot সূর্যরশ্মির আর একটি ব্যবহারিক প্রয়োগ আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম সৌরশক্তি পরিচালিত বাষ্পীয় ইঞ্জিন তৈরী করেছিলেন এবং ১৮৭৯ সালে এক প্রদর্শনীতে ঐ এঞ্জিন দেখান হয়। এই ইঞ্জিনে একটি Concave আয়নার সাহায্যে সূর্যরশ্মি ফেলে একটি বয়লার পরিচালনার ব্যবস্থা ছিল এবং এর সাহায্যে যে শক্তি উৎপাদিত হয়েছিল তার পরিমাণ ছিল এক হর্স পাওয়ার। কাজেই, এই সমস্ত ঘটনা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, বহুযুগ আগেকার বিজ্ঞানীরাও সৌরশক্তির ব্যবহার সম্পর্কে আগ্রহশীল হয়েছিলেন।

সম্প্রতি এই সৌরশক্তিকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবার জন্য বিজ্ঞানীরা আবার উৎসুক হয়েছেন। অবশ্য একথা বলা বাহুল্য যে সৌরশক্তির দ্বারাই আমরা আমাদের খাদ্য উৎপাদন করছি বা যে সমস্ত জ্বালানী আমরা ব্যবহার করি—তাও সৌরশক্তি উদ্ভূত। কিন্তু এসব হচ্ছে পরোক্ষভাবে সৌরশক্তির ব্যবহার। প্রত্যক্ষভাবে সৌরশক্তিকে ব্যবহারোপযোগী করবার কিছু অসুবিধা আছে। কারণ সৌরশক্তি প্রধানতঃ মুক্ত (free) শক্তি। এই শক্তিকে সরাসরি তাপশক্তিরূপে ব্যবহার করা ঠিক নয় বরং এমন একটি উপায় নির্ধারণ করা উচিত যদ্দ্বারা এই শক্তিকে এমন আর একটি মুক্তশক্তিতে রূপান্তরিত করা যেতে পারে যেটা আমাদের কাজে লাগতে পারে।

ইংলণ্ডে সৌরশক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্বন্ধে যে গবেষণা হচ্ছে তাতে বিজ্ঞানীরা সূর্যরশ্মিদ্বারা আবাসগৃহ ঠাণ্ডা রখবার এক পন্থা আবিষ্কার করেছেন। এই উপায়দ্বারা বাসগৃহের ছাদ হতে সূর্যরশ্মি সংগ্রহ করে সেই তাপজনিত শক্তিকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র, রেফ্রিজারেটার প্রভৃতি চালু রাখা যাবে। এই যন্ত্র গরমের ও রৌদ্রের দিনে যখন এটা একান্ত দরকার—তখন চালু থাকবে এবং রাত্রিতে বা ঠাণ্ডার দিনে আপনা-থেকে বন্ধ হয়ে যাবে, কারণ তখন যন্ত্রটিকে চালু রাখবার মত সূর্যরশ্মি থাকবে না। এই নতুন আবিষ্কার সম্বন্ধে পর্যালোচনা ও সৌরশক্তিকে অন্যান্যভাবে প্রয়োগ করবার উপায় নির্ধারণের জন্য ইংলণ্ডে একটি বৈজ্ঞানিক কমিটি গঠিত হয়েছে। সৌরশক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্বন্ধে এই কমিটির অন্যান্য পরিকল্পনার ভিতর একটি অন্যতম পরিকল্পনা হচ্ছে জলহীন জমিতে জলসেচনের উপযোগী এক ষ্টিম ইঞ্জিনের নির্মাণ চেষ্টা।

ভারতবর্ষের সর্বত্র বছরের সব সময়েই প্রচুর পরিমাণ সূর্যরশ্মি পাওয়া যায়। কাজেই ভারতবর্ষের পক্ষে এই প্রাকৃতিক শক্তিকে কাজে লাগাতে পারলে দেশের খুব উপকার হবে। এটা খুব আনন্দের কথা যে দিল্লীর জাতীয় পদার্থবিদ্যা গবেষণাগার সৌরশক্তিকে রন্ধনকার্যে নিয়োগ করবার মত একটি সূর্যরশ্মি কুকার উদ্ভাবন করেছেন। সূর্যরশ্মি কুকারগুলি এক প্রকারের ছোট যন্ত্র। সাধারণতঃ দর্পণ বা কাঁচের সাহায্যে সূর্যরশ্মি সংগ্রহ করে রন্ধনপ্রকোষ্ঠে প্রেরণ করা হয়। ভারতবর্ষের ন্যায় অনেক গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জ্বালানীর একান্ত অভাব এবং সাধারতঃ গোময় জ্বালানীরূপে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু গোময় একটি উৎকৃষ্ট সারবস্তু একথা সকলেরই জানা আছে এবং গোময়কে জমির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করলে দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং সূর্যরশ্মির সাহায্যে রন্ধনের ব্যবস্থা হলে গোময় সঞ্চিত হবে ও দেশের জমির উন্নতি হবে। উপরন্তু রন্ধনকার্যে কয়লা ব্যবহৃত না হলে কয়লার খরচও কমে যাবে। বৃটিশ জাতীয় পদার্থবিদ্যা গবেষণাগারের পরিচালক ডাঃ এডোয়ার্ড বুলার্ড ভারতে তৈরী এই সূর্যরশ্মি কুকার সম্বন্ধে খুব কৌতূহল প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন যে, সূর্যরশ্মি কুকার প্রস্তুতের ও গ্রীষ্মপ্রধান দেশে উহা রপ্তানীর প্রচুর সুবিধা রয়েছে। ডাঃ বুলার্ড বলেন যে, সূর্যরশ্মির কুকার ভারতে তৈরী হয়েছে তা তিনি দেখেছেন। এরূপ কুকার রপ্তানীযোগ্য এবং এই কুকার যদি তিন চার পাউন্ড মূল্যের মধ্যে প্রস্তুত

করা যায় তাহলে সত্যিই এটা খুব কাজে লাগবে। ডাঃ বুলার্ডের মতে বৃটেনে সূর্যরশ্মির প্রয়োগ করে জ্বালানীর অভাব মিটান যাবে না। গরমের দিনে ছাদে যন্ত্র রেখে নীচে স্নানের জল গরম করা যাবে। কিন্তু রাত্রে ও শীতের দিনে আর জল গরম করা যাবে না। তার জন্যে স্বাভাবিক উত্তাপক যন্ত্র প্রয়োজন হবে।

অবশ্য এ সকলই অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিসরের ভিতর সৌরশক্তিকে প্রয়োগ করার পন্থা। বৃহৎ পরিসরে বা অধুনা আমরা বিদ্যুৎশক্তি প্রভৃতি অন্যান্য যে সব শক্তি নিত্য ব্যবহার করি তার পরিবর্তে সৌরশক্তিকে প্রয়োগ করতে হলে আরো গবেষণার প্রয়োজন। তবে একথা সত্যি যে আধুনিক যুগে শক্তির চাহিদা অসম্ভব বৃদ্ধি পাওয়াতে বিজ্ঞানীরা সৌরশক্তির দিকে নজর দিয়েছেন এবং যেদিন তাঁরা এই শক্তিকে জনকল্যাণে প্রয়োগ করতে পারবেন সেদিন বিজ্ঞান-জগতে এক নতুন অধ্যায় রচিত হবে। শোনা গেছে, আমেরিকাতে আণবিক গবেষণার পরেই সৌরশক্তির গবেষণাকে স্থান দেওয়া হয়েছে।

★

উদ্বোধন

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

সত্যই রয়েছ যদি—অস্তিত্বের দাও পরিচয়!
উদাসীন দ্রষ্টা সম চিররাত্রিদিন
তব বিশ্বলীলা প্রভু, দেখ যদি চাহি,—
মানুষের কি আশ্বাস—কোথায় সান্ত্বনা?
আদিম প্রভাতে তুমি ছিলে শুধু একা
এ সৃষ্টির লূতাজাল করি' সংহরণ
ঊর্ণনাভসম বসি' আপনার মাঝে;
লীলাচ্ছলে একদিন করিলে বহুধা
অকস্মাৎ আপনারে। তারপর কোন্ অন্ধযবনিকাতলে
লুকায়ে রয়েছ তুমি—
মন-বুদ্ধি অগোচর!
কোথা তুমি জ্যোতির্ময়,—কোন্ সান্দ্র তমিস্রার পারে?
গির্জায়-মস্‌জিদ-মঠে তাই নিরন্তর
তোমারে খুঁজিছে সবে।
তাদের আহ্বান—
কাংস্যঘণ্টাকলরোল—পবিত্র 'আজান',—
ইথারের স্তর ভেদি' তোমার দুয়ারে
হয়নি ধ্বনিত ধ্মাত?
এই অশ্রু-উতরোল চিরদুঃখালয়
অশাশ্বত এ অনন্ত অখিল সংসার,—
কি যে তার প্রয়োজন তুমি জানো শুধু!
অসহায় ক্ষুদ্র মানবক,—
তোমারো অস্তিত্বে যা'র অপার সংশয়;
দেহ-কারাগারে বন্দী—
তবু যার দেহাতীতসনে পরিচয়;
অর্ধেক দেবতা তবু—অর্ধেক যে আজো আছে পশু;
অমৃতপিয়াসী তবু মৃত্যু যার চিরসহচর—
সে অক্ষম অপূর্ণেরে আনিলে ধরায়
কি উদ্দেশ্য সাধিবার লাগি'?
অথবা কি ক্ষুদ্র তার নশ্বর জীবন
প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের মত আকস্মিক, উদ্দেশ্যবিহীন
এ সংসার মহাকাব্যমাঝে?
ধাবমান লক্ষকোটি সৌরজগতের গতিস্রোতে
সে কি হায়, একগুচ্ছ অসহায় তৃণ
চলিয়াছে ভেসে ভেসে?
তার আশাতৃষ্ণা যত—দুঃখ সুখ তার
মহাকালসিন্ধুজলে তোলে নাকি একটি কল্লোল?
সে কি শুধু নিশিদিন তব কৃপা লাগি'
ঊর্ধ্বে তুলি যুক্তকর—
করিতেছে নিশিদিন আত্মপ্রবঞ্চনা?
তার তন্ত্রমন্ত্ররাশি—ব্যাকুল প্রার্থনা
অর্থহীন সে কি শুধু উন্মত্ত প্রলাপ—
রয়েছে গ্রথিত বেদ-বাইবেল-কোরাণে?
উদাসীন অন্ধশক্তি যদি তুমি নহ,—
দাও তার পূর্ণ পরিচয়!
কেহ বলে তুমি নাই—কেহ বলে আছো!
আঁধারের জীব আমি—কোথা পাব আলো!
হায় স্রষ্টা, চিরমূক, কথা কও তুমি,—
রহস্যের যবনিকা করি' দাও দূর—
বিশ্বলোক আছে তব আশা পথ চাহি।

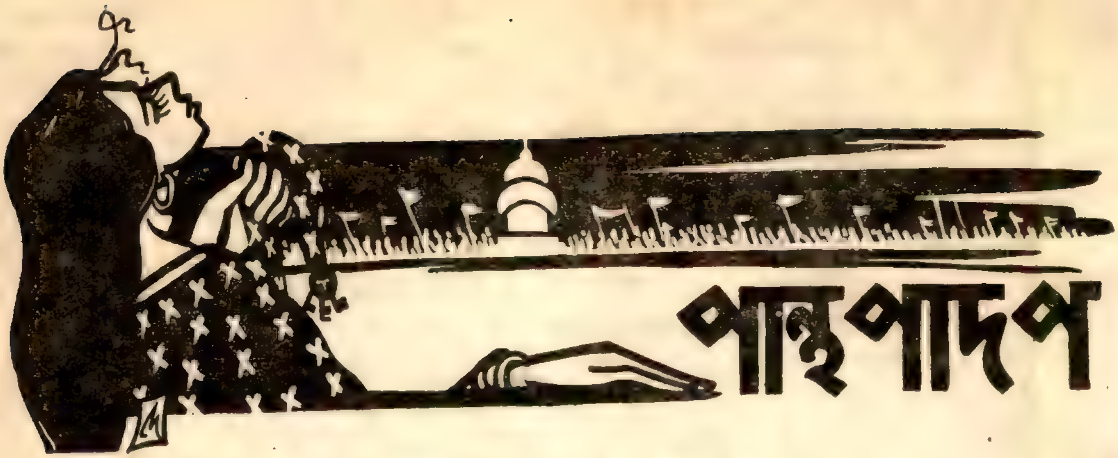

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(২১)

"বাধা দাও—তোমরা ঝাঁপিয়ে পড় ওদের উপরে, তাড়িয়ে দাও ওদের—"

গ্রাম্য মণ্ডল মহেন্দ্র বিস্ফারিত চোখে তাকায় ভারতীর পানে, বোবার মত মুখ তার, একটি শব্দও সে উচ্চারণ করতে পারেনি।

ঘৃণায় ভারতীর সারা অন্তরটা ভরে উঠেছিল, মনে হয়েছিল মহেন্দ্রের দুই গণ্ডে দুই পাটি জুতা বুলিয়ে দেয়।

সূর্য সেদিন হঠাৎ এসে পড়েছিল। সে কলকাতায় থাকে, এখানে রতন দত্তের কাজ সে আর করে না, সে এখন অন্য চাকরী করে।

মহেন্দ্র আস্তে আস্তে বার হয়ে গেলে সূর্য বলেছিল, "ওদের তুমি বিশ্বাস কোর না দিদিমণি, ওরা এখনি গিয়ে সাহেবকে জানাবে তুমি সাহেবদের বিরুদ্ধে ওদের দাঁড়াতে মন্ত্রণা দিচ্ছো।"

ভারতী হেসেছিল, অত্যন্ত ক্লান্ত হাসি ; সে বলেছিল, "কিন্তু আমি তো মিছে কথা বলিনি সূর্যদা। মানুষ হয়ে মানুষের এতখানি অবহেলা পাওয়া যায় কি?"

সূর্য বলেছিল, "এরা যদি মানুষ হতো—সইতো না। চিরদিন লাঞ্ছনা পদাঘাত সয়ে সয়ে ওদের মন এমনই জড় হয়ে পড়েছে, মাথা তোলাও ওদের পক্ষে দুঃসাধ্য।"

ভারতী সংশয়পূর্ণ কণ্ঠে বলেছিল, "কিন্তু এরাই তো একদিন এগিয়েছিল সূর্যদা—"

সূর্য উত্তর দিলে, "সেটা একটা সাময়িক উত্তেজনা। আসল কথা—তখন ওদের জমিজমা সব খাসে চলে যাওয়ায় ওরা যে দুর্দশায় পড়েছিল, সে সময় সেই অভাব ঘুচানোর জন্যই ওরা জীবনপণ করেছিল। আজ সে সময় নয়, কোম্পানী ওদের কাজ দেবে, ওদের থাকার জায়গা দেবে এসব কথাবার্তা হয়ে গেছে। ওরা স্বেচ্ছায় কেন আর আগুনে হাত দিতে যাবে?"

মাত্র দুইমাস ব্যবধান,—এর মধ্যে এখানে মিশনারী সম্প্রদায় অনেক কাজ করেছে। পদ্মদহের তীরে উপস্থিত সাময়িকভাবে খড় দিয়ে গির্জাঘর তৈরী হয়েছে, এর মধ্যে বহুলোক খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে।

অপরাধ এদের নাই। খেতে না পাওয়ার যে কষ্ট তা' এরা যেমন হৃদয়ঙ্গম করেছে, এমন আর কেউ করতে পারেনি। জমি নাই, কাজ নাই, কাজেই পয়সা, আহার্য কিছুই না পেয়ে এরা ক্ষেপে উঠেছে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের মত হয়তো আর দুদিন বাদে মানুষে মানুষ খাবে। কি করে ঠেকাবে ভারতী, কি করে ঠেকাবেন রতন দত্ত।

এই সব লোক সহজেই ধর্মত্যাগ করছে। এরা সার বুঝেছে আগে প্রাণ, তারপর আর সব। তাদের উদরে অন্ন নাই, পরণে কাপড় নাই, দেহ তাদের জীর্ণশীর্ণ, কোনরকমে তারা বেঁচে আছে এই মাত্র। ভগবানকে ডেকে তারা পরম শান্তি পায় এই তাদের একমাত্র সহায়।

এই তো সেদিন নবীন স্পষ্টই বলে ফেললে, "যে ধর্ম আমাদের বাঁচাতে পারলে না দিদিমণি, সে ধর্মের জন্যে আমরাই বা মরি কেন? খৃষ্টান হলে আমরা খেতে পরতে পাব, লেখাপড়া শিখবে আমাদের ছেলেরা, আমাদের কল-কারখানায় ওরা কাজ দেবে, আমাদের হিন্দুধর্ম আঁকড়ে থেকে মরবার কোন দরকার নেই।"

এদের তবু ক্ষমা করা যায়, ক্ষমা করা যায় না

সুদনকে—। অভাবে পড়ে ধার্মিকও হয় নাস্তিক, হয় চোর, ডাকাত, খুনী, কিন্তু সুদন?

বহুদিন হল—রতন দত্তের অবস্থা বিপর্যয়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সে উন্নতির আশায় এখানকার কাজ ছেড়ে কলকাতায় চলে গেছে। মাঝে মাঝে সে আসতো, শোনা গেছে কলোনীতে কণ্ট্রাক্টরের কাজ করছে। গাছকাটার পর এসে একদিন এই গ্রামে কাটিয়ে সে চলে গেছে—।

হঠাৎ এরই মধ্যে কথাটা কানে এসে পৌঁছাল। মধুসূদন এ অঞ্চলে সকলের প্রথম ধর্মত্যাগ করে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে সাহেবদের কাছে ধন্যবাদার্হ হয়েছে। তার নাম এখন ডেভিড মধুসূদন।

ভারতীর মুখখানা কালো হয়ে যায়, রতন দত্ত শুধু হেসে ওঠেন।

"দেখলি ভারতী, দেখ, সুযোগ ও সুবিধা সবাই চায় মানুষ হওয়ার। আমার কোন দুঃখ নেই রে, কৃতজ্ঞতার বদলে কৃতঘ্নতা অনেক পেয়েছি সুদনের কাছ হতে, তবু ওর ধর্মত্যাগটা যেন আচমকা একটা ঘা দিচ্ছে বুকের মধ্যে।"

ভারতী উত্তর দেয় না।

শোনা যায় নূতন নগর পত্তনের কণ্ট্রাক্ট নিয়েছে সুদন, সেজন্য তাকে এখন এখানেই সাহেবদের বাংলোয় থাকতে হয়েছে।

সেদিন হঠাৎ তার সঙ্গে পথেই ভারতীর দেখা হয়েছিল।

এ বাড়ীতে তার আসার পথ বন্ধ, মুখ দেখানোর কোন উপায় নাই। আত্মোন্নতির জন্যই সে নিজের অন্নদাতা প্রতিপালকের বিরুদ্ধে একদিন কোর্টে সাক্ষ্য দিয়েছিল, এবং বিশেষ করে তার সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করেই বিচার হয়েছিল। গ্লানি তার যত হোক না হোক, চক্ষুলজ্জা বা ভয়ে সে এদিক দিয়ে কোনদিন যায়নি। সেদিন দুপুরে বাইকে করে ওদিককার জেলেপাড়ার ছোট রাস্তা দিয়ে সাঁ করে যাওয়ার মুহূর্তে যে ভারতীর সামনে পড়তে হবে, স্বপ্নেও সুদন তা ভাবেনি।

জেলেপাড়ার পূজা—। মস্ত বড় বট গাছের তলায় সিঁদুরচর্চিত একখানি পাথর, কি ঠাকুর কে জানে। যে যা নামকরণ করে, কেউ কালী, কেউ মহাদেব, কেউ বা হরিঠাকুর, আবার কেউ কেউ লক্ষ্মীও বলে। যে ঠাকুরই হোক, মোটের উপর প্রতি শনিবারে জেলেপাড়ার মেয়েরা সিঁদুর দিয়ে যায়, আর প্রতি বৎসর এই সময় একদিন চাঁদা তুলে বিরাটভাবে পূজা হয়ে থাকে। আজকের দিনটাই যে সেই বার্ষিক পূজার দিন, সুদনের তা মনে ছিল না।

সামিয়ানা একটা জেলেপাড়ার লোকেরা খাটিয়েছে ঠিক পথের উপরে, দুচারজন ঢুলি আছে, পাড়ার যত ছেলেপুলে সব আছে।

ভারতী যে এই উৎসবে যোগ দিতে আসবে তা সুদন জানে না। শেষবার দেশের যাবতীয় উৎসবে যোগ দিচ্ছে সে,—তাই একবার খবর পাওয়া মাত্র এসেছে এবং দশটা টাকা প্রণামীও দিয়েছে।

শীতের দিকে বনশিউলীর গাছগুলো মরে গিয়েছিল। চৈত্রের শেষে বৃষ্টি পড়বার সঙ্গে সঙ্গে আবার নূতন জন্ম নিয়েছে, এর মধ্যে বেশ বড় হয়েও উঠেছে। বনশিউলীর বন দেখতে ভারতীর বড় ভালো লাগে—সে তাই প্রায়ই এদের আশপাশে ঘুরে বেড়ায়।

দুপুর রোদ, সূর্য ঠিক মাথার উপরে, বৈশাখের আকাশ এত উজ্জ্বল—তার দিকে তাকানো যায় না।

পথের উপর সামিয়ানা—ছেলেমেয়েতে জায়গাটা পরিপূর্ণ, সেইজন্যই বাইক হতে নামতে হল সুদনকে।

টকটকে লালপাড় সাদা গরদের শাড়ীটিতে ভারতীকে আজ চমৎকার দেখাচ্ছে, মাথাভরা কালো চুল প্রায় হাঁটুর নিচে লুটিয়ে পড়েছে।

সকৌতুকে ভারতী তার পা হতে মাথা পর্যন্ত দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে, তারপর মৃদু হেসে বললে, "তোমায় কিন্তু চমৎকার মানিয়েছে সুদনদা। বাঃ, সাহেবদের পোষাক পরলে তোমায় যে একেবারে খাঁটি সাহেব দেখায় একথা একেবারে সত্যি। তুমি ধুতি পাঞ্জাবী ছেড়ে হ্যাট কোট প্যাণ্ট পরে একেবারে নূতন জগতের অধিবাসীই শুধু নয় —নূতন জীবনও পেয়েছো। আমি দেখছি কথামালার সে গল্পটা তোমায় দিয়েই অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়ে গেল—সেই ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাক—পড়েছো নিশ্চয়—"

সুদনের কালো মুখ লাল হল না, বেগুনি হয়ে গেল।

ভারতী হাসি চেপে জিজ্ঞাসা করে, "যাই হোক বেঁচেছো —বেঁচেছো সুদনদা। এই মান্ধাতার আমলের পচা হিন্দুধর্ম, যার মধ্যে ছত্রিশ কোটি দেবতা, প্রণাম করতে করতে কপাল ফুলে যায়। এই দেখ না, সিঁদুর ঢেলে এই এক পাথরের মূর্তি খাড়া করেছে, এই নাকি ওদের দেবতা। যাই হোক, ধর্মান্তর গ্রহণ করে তুমি এসব কুসংস্কারের হাত হতে বেঁচেছো।"

সুদনের মুখখানা ভয়াতুর হয়ে ওঠে—সে কি বলতে চায়, কিন্তু তাকে থামিয়ে দেয় ভারতী—

"খবরদার, খবরদার, হিন্দুর দেবতাকে আজও মনে মনে প্রণাম করো একথা শুনলেই সাহেবরা তোমায় তাড়িয়ে দেবে

সুদনদা। স্রেফ কুসংস্কার এসব, এগুলোর মাথা নেই, মুণ্ডও নেই। মুখে এক মনে আর এক, এ কিন্তু মোটেই ভালো নয় সুদন দা, ওতে তোমার সব ঠাকুরই খাপ্পা হয়ে উঠবেন। যাক, আসল কথাটা জিজ্ঞাসা করি, সাহেবরা তাদের ডিনার পার্টিতে পাশে বসে খেতে দেয় তো, না কি খাওয়ার পরে ডিসে যা পড়ে থাকে, তাই খেতে পাও?"

সুদন ভিতরে ভিতরে অনেকটা উষ্ণ হয়ে ওঠে, শক্ত কণ্ঠে বললে, "অতটা ভুল বুঝো না দিদিমণি, যাই বল— জেনে রেখো সাহেবরা আমাদের চেয়ে অনেক বড়,—তারা যে কোন লোকের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করতে জানে। রাজা তারা এমনই হয়নি, তাদের অনেক গুণ আছে বলেই হয়েছে।"

ভারতী হেসে ওঠে, "ঠিক বলেছো সুদন দা, অনেক গুণ আছে সাহেবদের, দু'একটা গুণের নাম করতে পারো কি—বল না শুনি?"

অত্যন্ত বিব্রত হয়ে ওঠে সুদন,—বললে, "আমার অনেক কাজ আছে দিদিমণি, এখনও স্নানাহার হয়নি—"

ভারতী উদার কণ্ঠে বললে, "তা না হোক, আমারও এখনও খাওয়া হয়নি, এইটুকু সময়ে আর মরে যাবে না। বল, তোমার নূতন জীবনের কথাটা একটু শুনি,—কতখানি দিলে আর কতখানি পেলে—"

সুদন বাধা দেয়—"সবই তো জান দিদিমণি, আমায় ছেড়ে দাও, আমার অনেক কাজ আছে।"

ভারতীর মুখে এতটুকু হাসির রেখা ফুটে উঠে তখনই মিলিয়ে গেল, সে শক্তকণ্ঠে বললে, "না জানলেও আন্দাজে অনেক বুঝেছি সুদনদা। তুমি রাগ করো না, কিন্তু আমি বলে রাখছি একদিন তুমি বুঝবে কত বড় ভুল করেছো, সেদিন হয়তো এ ভুল শুধরাবার কোন উপায় পাবে না। আমাদের ধর্মশাস্ত্রে কথা আছে নিজের ধর্মে মরণও ভালো, সে কথাটা বোধ হয় ভুলে যাওনি। আমি জানি—সাহেবরা কোনদিনই তোমাদের সমান চোখে দেখবে না, মাঝখানে ঠিক ব্যবধান থাকবেই—হাজার হোক—রাজার জাত তো। তোমাদের সামনে ওরা তোমাদের প্রচুর প্রশংসা করবে, আড়ালে হাসবে, তোমাদের খেলতে দিয়ে তারা মজা উপভোগ করবে, হাততালি দিয়ে হাসবে। আর তোমরা—নির্বোধ তোমরা মনে করবে যে—"

"থাক—থাক—"

সুদন আর অপেক্ষা করে না, এক লাফ দিয়ে বাইকে উঠে পড়ে—

"আজ থাক দিদিমণি, আবার হয় তো, কোনদিন তোমার সুদনদা তোমারই কাছে ফিরে আসবে, সেদিন তাকে আশ্রয় দিয়ো—এটুকু আমার মিনতি রইলো—"

বাইক ঘুরিয়ে সে সাঁ করে বাঁকের মুখে মিলিয়ে গেল।

(২২)

দীর্ঘ দুইটি বৎসর কোথা দিয়ে কেটে গেছে।

রতনমণি দত্ত কলকাতাবাসী। এই দুই বৎসর গ্রামের সঙ্গে তাঁর কোন সম্বন্ধ নাই।

জমিদারীর খানিকটা অংশ কুন্দনমল শেঠিয়ার কাছে দশ বৎসরের জন্য মর্টগেজ দেওয়া আছে। দশ বৎসর গত হলে এই অংশটা তিনি ফিরে পাবেন। গভর্ণমেণ্ট যে অংশটা নিয়েছে, সে অংশ ফিরে পাওয়ার জন্য ভারতী নিজে অ্যাপ্লিকেশান দিয়েছে।

পৈত্রিক ভিটা কুন্দনমল শেঠিয়ার অধিকারে আছে। একখানি ঘর মাত্র রতন দত্তের জন্য আছে, যদি তিনি কোনদিন যান, এই ঘরে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবেন।

ঠাকুরবাড়ীর পূজা প্রভৃতির ভার কুন্দনমলের হাতে, নিজে তিনি এ ভার নিয়েছেন।

ভারতী সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ছে,—

সেদিন নিতান্ত আকস্মিকভাবেই দেখা হয়ে গেল জয়ন্তের সঙ্গে—। যে ট্রামে ভারতী কলেজ হতে ফিরছিল সেই ট্রামেই উঠেছিল জয়ন্ত।

ভিড়ের মধ্যে ভারতীর উপর দৃষ্টি পড়লেও জয়ন্ত তাকে চিনতে পারেনি, ভারতী তাকে ঠিক চিনেছিল। হাতীবাগানের মোড়ে নামবার সময় সে জয়ন্তের পাশ দিয়ে চলবার সময় বলে গেল, "সময় মত একবার আমাদের বাড়ীতে আসবেন জয়ন্ত বাবু, এই আমার ঠিকানা—"

ঠিকানা লেখা কাগজখানা জয়ন্তের হাতের মধ্যে দিয়ে সে নেমে গেল।

এর পরেও দু তিন দিন কেটে গেলেও জয়ন্ত এলো না। ভারতী বুঝলো—সে আসবে না।

মনে যে একটু আঘাত লাগেনি তা বলা যায় না,— ঘটনাটাকে তুচ্ছ মনে করতে চায় সে, কিন্তু তা হয় না। সেই একরাত্রের দু এক ঘণ্টার ছবিটাই সারা অন্তর জুড়ে থাকে।

একদিন নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই এসে দাঁড়ালো জয়ন্ত।

ভারতী কেবলমাত্র বার হচ্ছিল কলেজে যাওয়ার জন্য— সমানে জয়ন্তকে দেখে থমকে দাঁড়াল, আন্তরিকভাবেই তাকে অভ্যর্থনা করলে—"আসুন—"

কলেজে যাওয়া স্থগিত রেখে সে জয়ন্তকে এনে বসালে।

"আমি কিন্তু সে দিন হতে রোজই ভাবছি—আপনি নিশ্চয়ই আসবেন—"

জয়ন্ত বিস্মিতকণ্ঠে বললে, "আমি তো আপনাকে কথা দেইনি ভারতী দেবী—"

ভারতী বললে, "কথা না দিন, তবু আমি ভেবেছিলুম।"

জয়ন্ত এবার হাসে—"ও রকম আশা আর কোনদিন করবেন না ভারতী দেবী। আমি যে কি তা আপনি বেশই জানেন, এটাও জানেন আমার মত লোকের পক্ষে স্বচ্ছন্দভাবে যাতায়াতের জন্যে কোন পথই তৈরী হয়নি। আজও দ্বীপান্তরের কয়েদীর জন্যে লোক ঘুরছে, দুইটি হাজার টাকা তো মুখের কথা নয়,—আপনিও এখনই আমায় এ ঘরে বন্ধ করে পুলিশকে খবর দিতে পারেন, সঙ্গে সঙ্গে দুইটি হাজার—"

বলতে বলতে সে হেসে ওঠে।

ভারতীর মুখখানা গম্ভীর হয়ে ওঠে, পরিহাসের ভাবে সে কথাটা নিতে পারে না। শুষ্ক কণ্ঠে সে বললে, "জানি —আজ আমাদের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছে জেনেই আপনি একথা বলতে সাহস পেলেন জয়ন্ত বাবু। আজ আপনি পলাশডাঙ্গার বিখ্যাত শুধু নয়, মহাপরাক্রান্ত রতনমণি দত্তের মেয়ের সঙ্গে যে কথা বলছেন না এটা আপনিও যেমন বোঝেন, জানেন, আমিও তেমনি বুঝি আর জানি। দুই হাজার টাকার লোভ আমি সামলাতে পারব কিনা—"

জয়ন্ত সামনের টেবলের উপর প্রচণ্ড একটা চড় মারে, সঙ্গে সঙ্গে ভারতীর কথা শেষ হয়ে যায়—

"আপনি কি বলছেন বলুন তো ভারতী দেবী, আপনি যা তা বলতে সুরু করেছেন যে দেখছি—"

জয়ন্ত গর্জন করে,—

"হয় তো আসতুম না,—হয়তো কেন—নিশ্চয়ই আসতুম না, যদি আপনাকে বন্ধু বলে সেদিন না গ্রহণ করতুম ভারতী দেবী।"

ভারতী স্নিগ্ধকণ্ঠে বললে, "মাপ করবেন জয়ন্ত বাবু, মানুষের কাছ হতে আঘাত পেয়ে পেয়ে আমার মনের অবস্থা ঠিক এই স্তরেই গিয়ে পৌঁচেছে—উপহাসকে আমি সত্য বলেই মনে করে ফেলি।"

জয়ন্ত হাসে—।

আশ্চর্য মানুষ, এককথায় যেমন অতি ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে, এককথায় তেমনই জল হয়ে যেতে পারে।

ভারতীকে লক্ষ্য করে সে বললে, "কিন্তু বড় অসময়ে এসে পড়েছি ভারতী দেবী, আপনি কলেজে যাচ্ছিলেন, যাওয়া হল না। আজকের দিনটাই আপনার মাটি হয়ে গেল আমার জন্যে।"

ভারতী বললে, "কিন্তু আমি সত্যই আনন্দ পেয়েছি জয়ন্ত বাবু। আমাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করলেন, কিন্তু কোনও কাজের নির্দেশ আমি পেলুম না। মনে স্বতঃই জেগে উঠলো আপনার সঙ্গে যোগ দিয়ে কাজ করবার অধিকার আমাদের দিতে আপনারা আজও ইতস্ততঃ করছেন। আজও আপনার ধারণা বদলায় নি—আপনি মুখে যাই বলুন সে সব—সে সব—"

সে সব মিথ্যা—এ কথাটা সে মুখে আনতে পারে না।

জয়ন্ত সামনের টেবলের উপর কনুই দুটি রেখে দুই করতলের মধ্যে মুখখানা রক্ষা করে; পলকহীন চোখে সে খানিকক্ষণ ভারতীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর আস্তে আস্তে বললে, "আপনি বলতে পারেন এ কথা, কিন্তু ব্যাপারটা কি ঘটেছিল তা শুনলে আমায় দোষ দিতে পারবেন না। আমাদের একটা বিরাট ষড়যন্ত্র ফেঁসে গেছে, আমরা যত সহজে কাজ করব ভেবেছিলুম তা করা সম্ভব হয় নি, লাভ হতে আমাদের দলের যে কয়জন লোক ধরা পড়েছে তার মধ্যে ছিলেন আপনার দাদু, আমাদের প্রাচীন নেতা কিশোর বাবু—"

"সর্বনাশ—"

ভারতী প্রায় চীৎকার করে ওঠে—।

জয়ন্ত ধমক দেয়—"থামুন, চেঁচাবেন না। এই সদর রাস্তার উপরকার ঘরে চীৎকার শুনলেই আমার পিছনে যারা ঘুরছে তারা যে আগেই উপস্থিত হবে তাতে এতটুকু ভুল নেই। আপনাকে মিনতি করছি ভারতী দেবী, আপনি অন্ততঃপক্ষে চুপ করে আমার কথা শুনবেন।"

ভারতী একেবারে চুপ করে যায়।

জয়ন্ত বললে, "আমরা এখন ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছি, কে কোথায় আছে আজও আমি তাদের খোঁজ পাইনি। কাল সন্ধ্যা হতে আমি তাদের খুঁজে ফিরছি, একমাত্র দেখা পেয়েছি সুখেন্দুর, তাকে বিকাশের সন্ধানে পাঠিয়ে আমি এখানে এসেছি।"

ভারতী জিজ্ঞাসা করলে, "পুলিশ আপনার সন্ধান পায় নি?"

জয়ন্ত সহাস্যমুখে বললে, "তারা খোঁজ করছে আমাকে বিহারে,—এখানে এ পর্যন্ত কেউ জানে না আমি চলে এসেছি।"

ভারতী বিস্মিত চোখে জয়ন্তের পানে তাকায়, জিজ্ঞাসা

করে, "যাকে ধরে দিতে পারলে দুই হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা আছে,—এতখানি পথ ট্রেণে আসতে তাকে কেউ চিনতে পারলে না এ কথা বিশ্বাস করাও যে শক্ত মিঃ রায়।"

জয়ন্ত শুধু হাসলো,—খানিক চুপ করে থেকে বললে, "আমাদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয় ভারতী দেবী। আমি আপনাকে বলছি—আমি ওদেরই একজন অফিসারের সঙ্গে এক কামরায় গোরখপুর হতে কলকাতা এসে পোঁচেছি,—কথাটা কি বিশ্বাস করা শক্ত?"

ভারতী মাথা নাড়ে, অর্থাৎ শক্ত নয়।

জয়ন্ত খুসী হয়ে ওঠে, বললে, "হ্যাঁ, আমি একেবারে খাস ইউরোপীয়ান বনে গিয়েছিলুম ভারতী দেবী। তখনকার সে বেশ আর সে কথাবার্তা শুনলে আপনিও আমায় চিনতে পারতেন না, এ কথা আমি শপথ করে বলতে পারি।"

"ভারতী—"

ও ঘর হতে রতন দত্তের আহবান কানে আসে। সকাল বেলার দিকে খানিকটা ভ্রমণ করে এসে চা পান করে তিনি সংবাদপত্র পড়তে বসেন—আজও তাই পড়ছিলেন। এতক্ষণ পরে কাগজ পড়া তাঁর শেষ হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে ভারতীর কণ্ঠস্বরে তিনি জানতে পেরেছেন সে কলেজে যায়নি।

ভারতী উঠে পড়ে—।

"আপনাকে বাবার সঙ্গে আজ আলাপ করিয়ে দেব জয়ন্ত বাবু। যাবেন না যেন, একটু বসুন—"

বলতে বলতে সে অগ্রসর হয়।

জয়ন্ত স্মিত হাসি হেসে বললে, "কি,—বিপ্লবী নেতা বলে—?"

ভারতী উত্তর দিলে, "দেশের সুসন্তান বলে, মাতৃপূজার পুরোহিত বলে, এ ছাড়া আপনার অন্য পরিচয় তো নেই জয়ন্ত বাবু—"

সে বার হয়ে গেল।

এতক্ষণে জয়ন্ত লক্ষ্য করলে, "ঘরে প্রবেশ করেই ভারতী পথের দিককার জানালা কয়টি বন্ধ করে দিয়েছে। ভারতীর এ ঘরটি ঠিক পথের উপরেই পড়ে, জানালায় পর্দা থাকলেও পথ হতে ঘরের কিছু কিছু দেখা যায়।

খুসি মনে টেবলের উপর পা দুখানা তুলে দেয় জয়ন্ত —চেয়ারে হেলান দিয়ে সে চোখ মুদে।

একটা শব্দ পেয়ে সে চোখ মেলে দেখলে ভারতী তার সামনে টেবলের ওপাশে দাঁড়িয়ে কি একখানা বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছে। অপ্রস্তুতভাবে পা দুখানা নিচে নামিয়ে জয়ন্ত বললে, "চলুন আপনার বাবার কাছে।"

সদ্য তন্দ্রামুক্ত তার চোখ দুইটিতে তখন ঘুমের আমেজ লেগে আছে।

বেচারা,—হয়তো কাল রাত্রে ঘুমাতেও পায় নি। এদের জীবনে বিশ্রাম নাই, তাই এতটুকু বিশ্রামের সময় পেলে ঘুম আসে দু চোখ ভরে। হয় তো খাওয়াও হয় নি,—কে জানে।

জয়ন্ত উঠে দাঁড়াল।

ভারতী স্নিগ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, "কাল রাত্রে ঘুমান নি বুঝি—?"

"ঘুম—?"

জয়ন্ত হেসে ওঠে—"ঘুমিয়েছিলুম বই কি। হেদোর ধারে বসতে বসতে তিন রাতের ঘুম এসেছিল চোখ ভরে। কতক্ষণ পরে কে জানে—কার একটা গুঁতো খেয়ে জেগে উঠে দেখি—এক মহাপুরুষ লাল পাগড়ীধারীর রুলের গুঁতো, সঙ্গে সঙ্গে গালাগালি, "শালে, মাতোয়ালা হুয়া থা, উঠ জলদি, থানামে চল"।

ভারতীর মুখখানা বেদনায় করুণ হয়ে ওঠে, সে বললে, "আর আপনাকে ওখানে থাকতে দিলে না তো?"

জয়ন্ত গম্ভীর মুখে বললে, "বুঝছেন না—সে চেনে না আমিই সেই দুর্দান্ত জয়ন্ত রায়,—তাহলে সঙ্গে সঙ্গে করকরে দুইটি হাজার টাকা তার হস্তগত হতো, সে বেচারাকে আর কনষ্টেবলের চাকরী করতে হতো না। আমার কিন্তু ওই হল মস্ত সুযোগ, সঙ্গে সঙ্গে মাতোয়ালা বনে গিয়ে ভেউ ভেউ করে কেঁদে তার পা জড়িয়ে ধরলুম। জানেনই তো—পা ধরতেও আমাদের আত্মসম্মানে বাধে না। ওই যে আপনাদের মধ্যে কি একটা কথা আছে—

লাজ সংকোচ ভয়
তিনটি কর জয়।

সেই জন্যেই না বলছি, মেয়েদের পক্ষে বিপ্লবী জীবন বরণ করা বড় শক্ত। আপনারা আবার ওই তিনটি উপাদানে তৈরী কিনা—"

সে হেসে ওঠে—

ভারতী হাসে না, গম্ভীর হয়ে যায়।

বললে, "আমাদের সম্বন্ধে মন্তব্য এখন থাক, সেটা আমি পরে প্রমাণ করব যখন আপনি আমায় কাজ দেবেন। যাই হোক, এখানে যখন এসেছেন তখন বোঝা যাচ্ছে কনষ্টেবল সাহেব আপনাকে থানায় নিয়ে যায় নি—"

চোখ বিস্ফারিত করে জয়ন্ত বললে, "থানায়? তা হলে কি এতক্ষণ আপনাদের খবরের কাগজগুলো চুপ করে থাকতো? টেলিগ্রাফে টেলিগ্রাফে সারা কলকাতা ভরে যেত

যে, হাজার হাজার লোক ছুটতো দেখতেন আপনার এই পথ দিয়ে—"

তারপরই সে গম্ভীর হয়ে বলে, "দেখুন, উদরে অন্ন থাক আর নাই থাক, পরণে কাপড় নাই জুটুক, তবু বাজারে নাম তো যা হোক আছে। লোকে সেই নামের খাতিরেই সোরগোল করবে, মানুষের খাতিরে নাই করুক।"

ভারতী চলতে চলতে পিছন ফিরে বললে, "তারপর আপনাকে ছেড়ে দিলে—?"

জয়ন্ত বললে, "ছাড়লে বই কি। অনেক কাকুতি মিনতি করতে তখন নরমসুরে বলে, পয়সা নিকালো, আভি ছোড় দেগা। হায়রে পয়সা—পয়সাও কি আছে ট্যাঁকে, ট্যাঁক যে ঘুসুরীর মাঠ দিলদরিয়া পড়ে আছে। অনেক খুঁজে পেলুম একটা দুয়ানী, সেইটাই তুলে দিলুম তার হাতে, তবে তো ছেড়ে দিয়ে গেল।"

ভারতী থমকে দাঁড়ালো—"খাওয়া হয়নি আপনার?"

"খাওয়া—"

জয়ন্ত হাসে—"দেখুন, বারবার ওই খাওয়ার কথাটা বলবেন না। একবার হ্যাংলার মত আপনার মুখের ভাত খেয়েছিলুম বলে আজও যে চাইব তা নয়। সুখেন্দু গেছে বিকাশের সন্ধানে, আমার এখানকার ক্যাশিয়ার সে, ফিরে এলেই খাওয়া জুটবে।"

ভারতী আর একটি কথা বলে না।

[ক্রমশঃ

★

স্বদেশ

রণজিৎ কুমার সেন

সারা পৃথিবীর ভূগোল-রেখায় দেশ আমার সম্প্রসারিত।
আমার কোনো বিশেষ দেশ নেইঃ
কোনো বিশেষ দেশের নই আমি;
সর্বকালের সর্বদেশের মানুষকে আমার আত্মীয় জেনেছি,—
ভাইয়ের মতো বোনের মতো বন্ধুর মতো আত্মজধর্মে
তারা মিলে গেছে আমার মর্মের মর্মকোষে।
বাংলা থেকে আরাকান, আরাকান থেকে ভূমধ্যমণ্ডলঃ
প্রাচ্য-প্রতীচ্য-দিগন্ত-সীমার পারে দাঁড়িয়ে
আমি কালোত্তীর্ণ পথিকের মতো
হাঁক দিয়ে ফিরি সবা'কে।

আমেরিকার বণিক থেকে রাশিয়ার শ্রমিক,
চীনের বার্তাজীবী থেকে লণ্ডনের ফেরিওয়ালা,
বাংলার ভিখারী থেকে পারস্যের বাদ্‌শাঃ
সবা'কে মিলিয়ে আমার মহাস্বপ্ন সার্থক।

বান্দা আর বাদ্‌শার বাৎস্যায়ন যদি এক,
তবে মানুষ কেন থাক্‌বে মানুষের কাছে পদানত?
সাম্য আর শান্তির একই বিজয়ধ্বজা স্কন্ধে তুলে নিয়ে
মানুষ জয় ক'রে নেবে দেবতার আসন।

সুন্দর হবে এ পৃথিবী, সত্য-পথের পথিক হবে মানুষ,
ধনলিপ্সার মদগর্বে কোথাও হিরোসিমার ধ্বংস হবে না,
দারিদ্র্যের কষাঘাতে দুর্ভিক্ষের দ্বারে ব'সে
কুকুরের সাথে অন্নের ভাগ বসাবে না কেউ।

ভগবান তথাগতের পৃথিবীঃ
যিশু-চৈতন্য-মহম্মদ আর কন্‌ফুসিয়াসের পৃথিবীঃ
এ তোমার পৃথিবী, আমার পৃথিবী,
সারা পৃথিবীর সমস্ত ভূগোল-রেখাই আমার স্বদেশ।

সাহিত্য-সাধক ব্রজেন্দ্রনাথ

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

প্রবাসীর সম্পাদকীয় বিভাগের কাজে যোগ দেবার প্রায় ৯।১০ বছর আগে থেকেই শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয়। সংবাদপত্রে সেকালের কথার গ্রন্থকাররূপে তখন তিনি বাংলা সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। আমি কিন্তু মুগ্ধ হয়েছিলাম তাঁর 'রণ-ডঙ্কা', 'রাজা-বাদশা' আর 'কেল্লাফতে' মোগল-পাঠান আমলের ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে ছোটদের জন্য লিখিত এই তিনখানি গল্পের বই পড়ে। সত্যকে অবিকৃত রেখে ইতিহাসের কঙ্কালে যিনি এমনভাবে প্রাণসঞ্চার করতে পারেন, তাঁকে দেখবার জন্যে মনে মনে একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা অনুভব করছিলাম। তখন থাকতাম সিলেটে। কর্মব্যস্ত জীবনের ফাঁকে ফাঁকে কায়ক্লেশে সময় করে নিয়ে সবে একটি প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়ে দিলাম 'প্রবাসী'তে। সাত দিন পরেই সুরু হল রোজ পিওন আসবার সময়টিতে দুরু দুরু কম্পিত বক্ষে উদ্বেগাকুল প্রতীক্ষা। দু'মাস পরে রিপ্লাই কার্ডের জবাব এল—প্রবন্ধটি সম্পাদক মহাশয়ের 'বিচারাধীন'। দু'ছত্র লেখার নীচে সহঃ সম্পাদক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাক্ষর। তারপর ঘন ঘন পত্রাঘাত করতে করতে সহঃ সম্পাদক মশায়ের জীবনকে দুঃসহ করে তুলে এগারো মাস পরে জানতে পারলাম যে রচনাটি মনোনীত হয়েছে এবং প্রবাসীতে প্রকাশিত হবে। এমনিভাবে দু'তিনবার ধৈর্যের কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অবশেষে ব্রজেন্দ্রনাথের কাছ থেকে যে-ভাবে উৎসাহলাভ করেছিলাম তা আমার মনকে আশায় উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল। সুদূর মফঃস্বলের এক নগণ্য লেখকের তরুণ বয়সের রচনা যে তাঁর মত লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিল এটাকে পরম সৌভাগ্য বলে মনে করি এবং তাঁর উৎসাহ-বাক্য যে আমার সাহিত্যিক জীবনে চলার পথে কতখানি প্রেরণা জুগিয়েছিল সেকথাও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

যতদূর স্মরণ হয়, ১৩৪১ সালের শীতকালে প্রবাসী আপিসে প্রথম ব্রজেন্দ্রনাথের সঙ্গে আমি দেখা করি। প্রথম দৃষ্টিতেই তাঁকে একজন তেজস্বী ও অত্যন্ত শক্ত মেরুদণ্ড বিশিষ্ট লোক বলে মনে হয়েছিল। বড় বড় দুই চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টি আমার মুখের পানে নিক্ষেপ করে প্রশ্ন করলেন "কাকে চান?" মনে হল লোকটি বড়ই কাটখোট্টা

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এবং রসকস বর্জ্জিত। পরে অবশ্য এ ধারণার পরিবর্তন হয়েছিল।

তখন পুরনো সংবাদপত্রের অনুসন্ধান বোধ করি তাঁর একটা নেশার মত দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমার সঙ্গেও তাই নিয়ে দু'চারটে কথা বললেন, প্রশ্ন করলেন—"আপনাদের সিলেটের হেমেন্দ্রনাথ দাসের লাইব্রেরিতে নাকি পুরনো সংবাদপত্রের ফাইল আছে, কি কি সংবাদপত্র আছে দেখেছেন? আমি 'ও রসে বঞ্চিত' দাস গোবিন্দ' সুতরাং তাঁর কৌতূহল চরিতার্থ করতে পারলাম না।

এর পর কলকাতায় যতবারই এসেছি ব্রজেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা না করে যাই নি। নয়ানচাঁদ দত্ত স্ট্রীটের বাসা, যতীন্দ্র ম্যানসন, প্রবাসী আপিস, সাহিত্য পরিষদ যখন যেখানেই দেখা করতে গিয়েছি তখনই তাঁকে দেখেছি কর্মরত অবস্থায়। হয় পড়ছেন, নয় লিখছেন—নয়তো প্রুফ দেখছেন। বাস্তবিক তিনি ছিলেন কর্মবীর—কি অফুরন্ত কর্মশক্তি নিয়েই না তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন!

১৩৫০-এর ফাল্গুন মাসে প্রবাসীর সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান করার পর ব্রজেন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে এসে অচিরেই কতকগুলি ছোটখাটো ব্যাপারে তাঁর দরদী কোমল হৃদয়ের পরিচয় পাই এবং শুধু বাইরেটা দেখে এই রূঢ়ভাষী মানুষটির সম্বন্ধে মনে মনে যে কি ভুল ধারণা পোষণ করেছিলাম তা বুঝতে পারি। একটি ঘটনার কথা বলছি। আমার প্রবাসীতে যোগ দেওয়ার দিন পনের পরের কথা। তখন

আমি থাকতাম মেসে। একদিন টিফিনের ছুটির সময়, আমাকে একান্তে ডেকে নিয়ে বললেন—"নিন সার নলিনী-রঞ্জন (খোশ-মেজাজে থাকলে আমাকে ঐ নামেই আখ্যায়িত এবং আপ্যায়িত করতেন) কিঞ্চিৎ কুটীরশিল্পের নিদর্শন গ্রহণ করুন।" বলেই একটা টিনের কৌটোর ঢাকনা খুলে কিছু হালুয়া ও লুচি আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন,—"আত্মীয় পরিজনের সঙ্গ ছাড়া হয়ে পড়ে আছেন মেসে, টিফিনের ছুটি হবামাত্র ছোটেন রেস্টুরেন্টে—কিন্তু ঘরে তৈরি খাবার ছাড়া কি মনের তৃপ্তি হয়।" কথাগুলোর মধ্যে যেন একটুখানি প্রচ্ছন্ন স্নেহের আমেজ। এর পর থেকে তাঁর পীড়াপীড়িতে এই "কুটীর শিল্প" থেকে প্রায়ই আমাকে ভাগ নিতে হত।

আমি 'প্রবাসী'তে এসেই দেখি ব্রজেন্দ্রনাথ এক বিরাট কাজে হাত দিয়েছেন—কাজটি হচ্ছে একেবারে প্রথম সংখ্যা থেকে ১৩৫০ সাল পর্য্যন্ত এই ৪২ বৎসরের প্রবাসীর সূচী লেখা। আমাকেও তিনি এই কাজে লাগিয়ে দিলেন। দুজনে দুখানি বাঁধানো ভলুম নিয়ে লিখতে বসতাম। মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখতাম তাঁর হাতে লেখনী চলেছে যান্ত্রিক দ্রুততায়—ঝড়ের বেগে কলম চালিয়ে যাচ্ছেন অথচ অক্ষরগুলি ঠিক যেন মুক্তোর মত। তাঁর দ্রুত লিখনশক্তি আমার বিস্ময়ের উদ্রেক করত।

এক ভলুমে লেখা শেষ করে যখন তিনি কলমকে বিশ্রাম দিয়েছেন আমার তখন হয় তো মাত্র আর্দ্ধেকটা লেখা হয়েছে। মাঝে মাঝে ধৈর্যচ্যুতিও ঘটত, ভাবতাম এ কি আর শেষ হবে। কিন্তু তখনো জানতাম না যে ব্রজেনবাবু যে বিষয়ে গোঁ ধরেন তা শেষ না করে ক্ষান্ত হন না। বাস্তবিকই কয়েক মাসের মধ্যে এই মহাসূচীপর্ব শেষ হল, তার পর এগুলো বর্ণানু-ক্রমিক ভাবে গুছোনোর পালা। সে যে কি প্রাণান্তকর পরি-শ্রম ও অনন্ত ধৈর্যের ব্যাপার। আমি অস্থির ও অধৈর্য হয়ে পড়তাম, কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ দেখতাম নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় স্থিরভাবে বসে সূচী গুছিয়ে চলেছেন। গুছানো শেষ হলে পর সযত্নে বাক্সবন্দী করা হল। এগুলো ছাপা হলে পর সাধারণ পাঠক সাহিত্যিক এবং গবেষক সকলেরই কত যে উপকার হবে তা বলে শেষ করা যায় না।

(২)

দীর্ঘ নয় বৎসরকাল ব্রজেন্দ্রনাথের একসঙ্গে কাজ করেছি। ছোট বড় নানা ব্যাপারের ভিতর দিয়ে তাঁর সঙ্গে স্থাপিত হয়েছে অন্তরের যোগাযোগ। মজলিশী লোক ছিলেন তিনি, আসর জমাবার এক আশ্চর্য ক্ষমতা তাঁর ছিল। তাঁর রসিকতাও ছিল পরম উপভোগ্য। প্রবাসীর সম্পাদকীয় বিভাগের ক্ষুদ্র কক্ষটিতে তাঁর হাস্যে, রসালো গল্পে, রসি-কতায় আনন্দের ফোয়ারা যেন সহস্রধারায় উৎসারিত হয়ে উঠত।

সাহিত্য-সাধনায় ব্রজেন্দ্রনাথের একাগ্র নিষ্ঠা দেখে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে। রোজই দেখতাম তিনি কিছু না কিছু লিখছেন। ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারলাম, "Not a day without a line" এইটে হচ্ছে তাঁর লেখক জীবনের মূল মন্ত্র। আমাকে একবার বলেছিলেন—"আমি রোজ কিছু না কিছু না লিখে থাকতে পারি না। যেদিন কিছু লেখা হয় না, মনে হয় সেইদিনটা বৃথাই গেল।"

কোনো বিষয়ে লেখবার সঙ্কল্প মনে উদিত হবামাত্রই তিনি কলম নিয়ে লিখতে বসতেন না। প্রথমে সম্ভব অসম্ভব নানা জায়গায় খুঁজে পেতে সে সম্বন্ধে ক্রমাগত উপকরণ সংগ্রহ করতেন। তার পর চলত পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে সেগুলো অধ্যয়ন ও স্বীকরণের (assimilation) পালা। মনের মধ্যে বিষয়বস্তুর হক সুস্পষ্টরূপে আঁকা না হওয়া পর্যন্ত তিনি রচনায় প্রবৃত্ত হতেন না। ব্রজেন্দ্র-নাথ প্রায়ই বলতেন—"আমি সাহিত্যিক নই—আমার imagination নেই, সাহিত্যিক বলে আমার কোনো অভি-মানও নেই। নানা জায়গায় উপকরণ ছড়িয়ে আছে। আমি সেগুলোকে একত্র সংগ্রহ করে দিই। আমার কাজ হচ্ছে মালা গাঁথা।"

এই মালা গাঁথার কাজটি ব্রজেন্দ্রনাথ সুষ্ঠুভাবে, একে-বারে নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করে গেছেন। নানা স্থান থেকে আহৃত প্রসূনরাজি দ্বারা মাল্য রচনা পূর্বক তিনি বঙ্গ-ভারতীর কণ্ঠে দুলিয়ে দিয়ে গেছেন। কিন্তু একাজের জন্যে তাঁকে যে কি অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছে তার খোঁজ কজনে রাখেন? কোনো কাজই আধাখেচড়া ভাবে সম্পন্ন করবার ধাত তাঁর ছিল না। কোনো বিষয়ে লিখবেন তো অজস্র উপকরণ সংগ্রহ করেই ক্ষান্ত নন, যত উপায়ে সম্ভব সেগুলো সত্য এবং নির্ভরযোগ্য কিনা তা যাচাই করে নিচ্ছেন। উপকরণ হয়ে উঠছে স্তূপাকার—নোটবইয়ে ক্রমা-গত নোট করছেন—এতে শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই। তার পর সেই উপচীয়মান উপকরণ ভাণ্ডার থেকে ছাঁটাই এবং বাছাই করা প্রয়োজনীয় জিনিষ ছেঁকে নেওয়া সেও বড় সহজ কাজ ছিল না। এ বিষয়ে তাঁর মাত্রাজ্ঞান ছিল অসা-ধারণ। শ্রেষ্ঠ শিল্পীর মত কতটুকু গ্রহণ এবং কতটুকু বর্জন করলে পরে রসিক পাঠকদের পক্ষে উপভোগ্য হয় এ সম্বন্ধে ছিল তাঁর সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি। তিনি বলতেন,

'এ জিনিষটা সহজে হয় না, অল্প বয়সে তো হয়ই না। লেখক যতটুকু উপকরণ সংগ্রহ করেন তার সবটুকুই ঠেসে দেন তাঁর রচনার মধ্যে, কিন্তু তাতে পাঠকের যে বিরক্তির উদ্রেক হয় সে খেয়ালই তাঁর থাকে না।"

লেখা শেষ করার পরই সঙ্গে সঙ্গে ছাপাতে দেওয়া ছিল তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। এ বিষয়ে তিনি লেখকদের প্রতি প্রদত্ত বঙ্কিমচন্দ্রের উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতেন। কোনো রচনা সমাপ্ত হওয়ার পর তিনি আমাদের সেটি আগাগোড়া পাঠ করে শুনাতেন—শ্রোতা আমরা তিনজন—যোগেশবাবু, শৈলেনবাবু আর আমি। রচনা সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যাদি তিনি গভীর মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতেন, তথ্যের সম্রাট তিনি।" এ সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করা ছিল আমার সাধ্যাতীত। ভাষাগত কোনো পরিবর্তনের কথা বললে, যদি যুক্তিযুক্ত মনে হ'ত তো তিনি তা মেনে নিতেন—"বলতেন এ সম্বন্ধে আমার কোনো vanity নেই। যে রচনা দশজনের নিকট পরিবেশন করব তা যাতে নিখুঁত ও সর্বাঙ্গসুন্দর হয় সে চেষ্টা করা লেখকমাত্রেরই পক্ষে সমীচীন। "Right word in the right place" রচনার উৎকর্ষসাধনের এই মূল নীতিটি তাঁর অজানা ছিল না। সেইজন্যে ভাষারও তিনি ক্রমাগত পরিবর্তন করতেন। তিনি নিজে মানুষটি যেমন ছিলেন সর্ববিধ বাহুল্যবর্জিত তেমনি তাঁর রচনাও নিরলঙ্কৃত। কিন্তু নিজের বক্তব্য গুছিয়ে বলবার আশ্চর্য ক্ষমতা তাঁর ছিল।

ব্রজেন্দ্রনাথ ইতিহাস চর্চা করে জীবন পাত করে গেছেন, শিক্ষিত সাধারণের নিকট তিনি শুষ্ক ঐতিহাসিক এবং গবেষকরূপেই পরিচিত, কিন্তু তাঁর অন্তরঙ্গেরা জানেন যে, তিনি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের একজন সমঝদার ছিলেন। পাশ্চাত্য লেখকদের মধ্যে তিনি ছিলেন ইবসেন ও আলেকজান্দার ডুমার ভক্ত। বাঙালী কবিদের মধ্যে তিনি অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন, এবং করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন। করুণানিধানের কোনো কোনো কবিতা তাঁর আগাগোড়া মুখস্থ ছিল। শেষ জীবনে তিনি পূর্ববঙ্গের কবি গোবিন্দদাসের কবিতার এবং শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের বিশেষ অনুরাগী হয়ে উঠেন। সাহিত্যের প্রসঙ্গ উঠলে মাঝে মাঝে শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্রসমূহ সম্বন্ধে তিনি যে সকল মন্তব্য করতেন তাতে তাঁর সুপরিণত রসবোধের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হতাম। অনেকেই জানেন না যে ব্রজেন্দ্রনাথ ক্লাসিক্যাল ঢঙের সঙ্গীতের প্রতি আসক্ত ছিলেন। তানসেন চিত্রনাট্যের "বরখ রে" গানটি তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। তিনি বলতেন—"গান বাজনা সম্বন্ধে আমার acquired taste আছে।"

আপিসে কাজ করতে করতে বেলা আড়াইটা নাগাদ আমরা উভয়েই "হাই-মাইণ্ডেড" হয়ে যেতাম। কথাটার মধ্যে একটু রহস্য আছে। রোজই বেলা আড়াইটার সময় প্রবাসীর কাজ সেরে ব্রজেন্দ্রনাথ চলে যেতেন পরিষদে। আমার তখন রেস্টুরেন্টে গিয়ে চা খাবার সময়। ব্রজেন্দ্রনাথ চেয়ার থেকে গাত্রোত্থান করেই বলতেন—নলিনীবাবু হাই উঠছেনা? এখনো হাইমাইণ্ডেড হন নি, চলুন, চলুন নীচে, চা-ই সত্য আর সব অনিত্য। হিজ হাইনেস দি আগে খান কখন চলে গেছেন, আর আপনি এখনো বসে আছেন।" আমাদের সহকর্মী বিজয়েন্দ্র শীল রোজই টিফিনের সময় আমাদের সবার আগে নীচে গিয়ে চা-পর্ব শেষ করেন, সেইজন্যেই তাঁর এই নামকরণ।

ব্রজেনবাবুর স্মৃতিতর্পণ করতে গিয়ে আজ মনের মাঝে কত কথাই যে ভিড় করে আসছে তার আর অন্ত নেই। দীর্ঘ নয় বৎসরকাল তাঁর নিরন্তর সাহচর্য লাভ করেছি, তিনি যেন আমাদের সত্তার মধ্যে ওতপ্রোত হয়ে আছেন। সাহিত্যসাধনায় তাঁর নিষ্ঠা দেখে নূতন প্রেরণা লাভ করেছি। চোখে তাঁর ছানি পড়েছে—একটা চোখে একদম দেখতে পান না, তবু চলেছে বিরামহীন রচনার পালা, প্রকাশিত হচ্ছে এক এক জন সাহিত্য-সাধকের চরিত-কথা। তার পর দু'চোখেরই দৃষ্টিশক্তি যখন প্রায় লুপ্ত হল তখন এই জ্ঞানতাপস মাঝে মাঝে দুঃখ করে বলতেন—"না নলিনীবাবু, লেখা পড়া একদম করতে পারছি না। লাইফ ইজ নট ওয়ার্থ লিভিং"। তার পর চোখ অপারেশন হ'ল। কয়দিন হাসপাতালে থেকে 'চক্ষুষ্মান' হয়ে আবার এসে তিনি কাজে যোগ দিলেন। এক ফাঁড়া যদি বা কাটল, তো দেখা দিলে আর এক নূতন বিপর্যয়—তাঁর জীবনসঙ্গিনী মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত হাসপাতালে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। কান্নার চেয়ে করুণ হাসি হেসে ব্রজেন্দ্রনাথ যেদিন এ দুঃসংবাদ আমাদের দেন সেদিন কত বড় ঝড় যে তাঁর বুকে উঠেছিল তা বুঝতে পারিনি। পরের দিনই কিন্তু দেখলাম আপিসে এসে নিবিষ্টচিত্তে রচনা করে চলেছেন একটা নূতন প্রবন্ধ। মুখে গভীর প্রশান্তি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই অনন্যসাধারণ মানসিক দৃঢ়তাসম্পন্ন মানুষটিকেও বিচলিত এবং বেদনায় মুহ্যমান হতে দেখলাম একদিন। গৃহপ্রত্যাগত পত্নীর পীড়ার বাড়াবাড়ি হওয়াতে কয়দিনের ছুটি নিয়েছিলেন, সরস্বতী পূজার প্রতিমা নিরঞ্জনের পরদিন আপিসে এলেন, চেহারা বিপর্যস্ত,

বয়স যেন দশ বৎসর বেড়ে গেছে, মনে হল প্রচণ্ড আঘাতে যেন একেবারে ভেঙে পড়েছেন। আবেগরুদ্ধ স্বরে বললেন—"তারও নাম বীণাপাণি, এবার সরস্বতী প্রতিমা নিরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে তাকেও বিসর্জন দিলাম।" বলতে বলতে চোখ দুটো চক্ চক্ করে উঠল, দু'ফোটা অশ্রুও গড়িয়ে পড়ল দু'গণ্ড বেয়ে। যে বেদনায় এত বড় শক্তিমান পুরুষের চোখদুটিও অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠে, সে যে কি গভীর, কি অতল-স্পর্শ তা মর্মে মর্মে অনুভব করলাম, বুকের ভেতরটা যেন নিবিড় ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠল। বৃথা সান্ত্বনা দেবার প্রয়াস না করে বললাম, "এবারকার আঘাত যদি কাটিয়ে উঠতে পারেন তা হলে বুঝব বাস্তবিকই আপনি পুরুষ-সিংহ।" তিনি কিছু না বলে একবার আমার মুখের পানে তাকালেন মাত্র।

দিনকতক ব্রজেন্দ্রনাথ যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন-মানুষ হয়ে রইলেন। আপিসে এসে চুপ করে বসে থাকেন। মুখখানি আষাঢ়ের আকাশের মত থমথমে, অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর—শুকিয়ে গেছে যেন হাসি গল্প রসিকতার উৎস। কিন্তু সপ্তাহখানেক পরে দেখি ধীরে ধীরে মেঘ কেটে গিয়ে মুখে ফিরে আসছে পূর্বেকার প্রশান্তি। —আপিসের আলমারি থেকে পুরনো প্রবাসীগুলো টেবিলের উপর এনে একমনে বইয়ের বিজ্ঞাপন পড়ছেন—এই বিজ্ঞাপন পাঠ ছিল তাঁর অন্যতম নেশা।

সেদিন ট্রামে উঠবার আগে সার্কুলার রোডের ফুটপাথের উপর দাঁড়িয়ে বললেন "কেমন কাটিয়ে উঠেছি তো।"

বললাম—"আপনি বাস্তবিকই পুরুষ-সিংহ। আপনি আমার প্রণম্য।"

তখন কিন্তু ভাবতেও পারিনি যে, এহ বাহ্য—অলক্ষ্যে ভগবান তাঁর উপর চরম আঘাত হানবার আয়োজন করছেন। গত শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি সময়কার কথা, অসুস্থতার জন্যে তিনি আপিসে কয়দিন অনুপস্থিত। একদিন সকালবেলা তাঁর বাড়ীতে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা। সজনীবাবুর মুখে শুনলাম করোনারি থ্রম্বসিসের প্রথম এবং মারাত্মক আক্রমণ—ডাঃ সুশীল চ্যাটার্জির চেষ্টায় এবারকার মত বেঁচে গেছেন।

পুজার ছুটির কিছুদিন আগে চিঠি পেলাম—লিখেছেন—গৃহিণী ফিরে এসেছেন, দেখি তার সেবা যত্নে যদি শীঘ্র সেরে উঠতে পারি। আপনাকে দেখতে বড় ইচ্ছা হচ্ছে—অবশ্য আসবেন।

সপ্তমী পুজার দিন অপরাহ্ণকালে তাঁর বাড়ীতে গেলাম সঙ্গে ছয় বৎসরের পুত্র দীপঙ্কর। কয়েকদিন আগে সদ্য প্রকাশিত 'মোগল পাঠান' বইখানা তাকে লোক মারফত উপহার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু নাম লিখে দেন নি। তাই, বইখানা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে তাঁকে দিয়ে নাম লিখিয়ে নেবে বলে।

ব্রজেন্দ্রনাথ ইজি-চেয়ারে শায়িত। শ্রীমান তাঁর সামনে বইখানা ধরে দিয়ে বলছে—"আমার নাম লিখে দিন।" তিনি লেখা সুরু করবামাত্রই ধীরে ধীরে বানান সুরু করলে দ'য় দীর্ঘ ই কার প।...ব্রজেন্দ্রনাথ বাধা দিয়ে মৃদু হেসে বললেন—"বাবা, তোমার মত বিদ্বান না হলেও আমিও কান চর্ দিয়ে লেখা পড়া শিখি নি। আমিই চেষ্টা করে দেখি, ভুল হলে না হয় শুধরে দিও।"

টেবিলের উপর সাহিত্য পরিষদের জন্য সদক্রীত দুই-খণ্ড বাঁধানো সংবাদ প্রভাকর। বললেন, মাঝে মাঝে এগুলো একটু আধটু নাড়াচাড় করে দেখি। পুরনো সংবাদপত্র ঘাঁটলে কিছু না কিছু নূতন তথ্য পাওয়া যাবেই" বলে নোটবুকে দু'একটা কি নূতন তথ্য টুকে রেখেছেন দেখালেন।

শরীরের হাল দেখে মনে হল এ অবস্থায় মানসিক পরিশ্রম আদৌ সমীচীন নয়, পরিপূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন ডাক্তাররাও নাকি তাই বলেছেন।

বললাম—"এ সব নিয়ে তো সারাজীবনই ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন—কিছুদিন নূতন তথ্য নাই বা পেলেন।"

একটু বেপরোয়া গোছের হাসি হেসে বললেন—"আপত্তি যেমন। স্ট্রেন যাতে হয় তেমন কিছুই করি না। এই একটু নেড়েচেড়ে দেখা মাত্র। এই কয়দিনে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারটা শেষ করেছি। (অবাক হয়ে তাঁর মুখের পানে তাকালাম) আরো কয়েকটা বই অবিলম্বে শেষ করে ফেলা দরকার। নিরুপমা সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটা লিখেছি তাতে শরৎচন্দ্রের কথা বড় বেশী প্রাধান্য পেয়েছে, ওটা ঠিক হয়নি, প্রমীলা নাগ সম্বন্ধে প্রবন্ধটিতে তাঁর কবিতার কোনো নিদর্শন দেওয়া হয়নি। বই আকারে বেরোবার সময় এগুলো ঠিক করে দিতে হবে।"

খানিকক্ষণ চিন্তামগ্ন থেকে বললেন—এবার যমকে খুব ফাঁকি দেওয়া গেল। আরো কতকগুলো সাহিত্যসাধক শেষ করে ফেলা দরকার, ব্রহ্ম বান্ধব, গিরীশচন্দ্র, অবনীন্দ্রনাথ। এগুলোর অনেক উপকরণ আমার হাতে আছে। যদি আর বছরখানেক বাঁচি তা হলে শেষ করে যেতে পারব।"

হঠাৎ রেডিওতে নাটকের অভিনয় সুরু হওয়াতে কথার স্রোতে বাধা পড়ল। রেডিও শুনছি হঠাৎ তিনি উঠে গিয়ে আলমারি খুলে হাতে করে কি কতকগুলো নিয়ে এসে বললেন—"হাঁ করুন।"

তিনি নাছোড়বান্দা, অগত্যা বদন ব্যাদান করতে হল। তিনি সেই ব্যাদিত মুখ-গহ্বরের মধ্যে অনেকগুলো লজেন্স পুরে দিয়ে বললেন—"ডাঃ বলেছে যদি কিছুদিন বাঁচতে চাও তো ধূমপান একেবারে ছেড়ে দিতে হবে। ডাক্তারের কথামত সিগার টানা ছেড়ে দিয়ে তাই লজেন্স চালাচ্ছি।"

নাটকের অভিনয় শেষ হলে পর বিদায় নিয়ে চলে এলাম। ট্রামে বসে শুধু এই কথাই ভাবতে লাগলাম যে, কি অফুরন্ত প্রাণশক্তির অধিকারী এই মানুষটি। আর সাহিত্যের প্রতি এই যে সাধকোচিত নিষ্ঠা যা মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পেয়েও অবিচলিত থাকে—তার কি তুলনা আছে।

মহাষ্টমীর দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে আবার গেলাম ইন্দ্র বিশ্বাস রোডের বাড়ীতে। সজনীবাবু উপস্থিত। বললেন, আজ সকালে আবার এ্যাটাক হয়েছিল—সেও সাংঘাতিক ব্যাপার।

সজনীবাবু চলে গেলে বললেন—"নলিনীবাবু, মনে হচ্ছে এ জীবনে আর যেন কর্মক্ষম হব না।" কণ্ঠে-হতাশার সুর। একটু থেমে আবার বললেন—"কিন্তু অনেক কাজ যে বাকী।" আরো কতকগুলো সাহিত্য সাধকের সংস্করণ হচ্ছে সেগুলো ঢেলে সাজতে হবে।"

মৃত্যু নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে, কিন্তু তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। মাথায় শুধু এক চিন্তা সাহিত্য সাধক, মুখে ঐ একই কথা।

নানা প্রসঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কাটল। বিদায় নেবার প্রাক্কালে বললেন—"দেখুন, আপনি অনেক দূরে থাকেন, বুঝি আপনার আসতে অসুবিধা হয়, কিন্তু বেশী দিন রোগশয্যায় পড়ে থাকলে মানুষ বোধ করি স্বার্থপর হয়ে উঠে,—যাদের ভালোবাসি তাদের কাছে পাবার ভারি ইচ্ছে হয়। আপনি সময় পেলেই আসবেন।"

"প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আসব।"

কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি আর রক্ষা করা হল না। ভেবেছিলাম ফাঁড়া কাটিয়ে উঠেছেন, আরো অন্ততঃ কিছুকাল তাঁকে ধরে রাখতে পারব। সুতরাং তাড়াহুড়োর কি দরকার। ঝামেলা কমলে একদিন গিয়ে আড্ডা জমানো যাবে।"

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, বিধাতা করেন আর।

একটি তারা

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সন্ধ্যার স্বপ্নের ছায়াতে,
কার কণ-কিঙ্কিনী বাজলো,
শিঞ্জিনী-ধ্বনি চিনি আমি তার
নীল অঞ্চলখানি দুলছে।

দুলছে সে অঞ্চল জীবনে,
ঘন গিরি-সঙ্কট সমুখে,
একা একা চুপ্‌চাপ্ চলেছিই
চলবারো পথ নির্দিষ্ট।

ক্লান্ত নীরব মন নিঝঝুমে
অনেক দূরের গান গায় কে?
সব তার ছিঁড়ে গেলে একলাই
—হানতেই হবে ফের ঝংকার?

হায় সুরকার! তুমি পলাতক
রঙীন দিনের বেলা অবসান,
এর পরে আর কোথা স্বপ্ন?
আসবারো আশা নিশ্চিহ্ন!

তীক্ষ্ণ মরুর ঝড় উঠেছে
দুধারে বালুরা উৎক্ষিপ্ত;
সাম্‌নে প্রখর মধ্যাহ্ন
—পিছনে কোথায় ঊষা লুপ্ত!

তারপর সব চুপ্ গম্ভীর।
সাম্‌নে মরণ আছে বিছানো,
তারপরে আলোহীন্ যাত্রায়
অন্ধকারের গান বাজানো।

অন্ধকারের গান বাজানো,
ভাগ্যলিপিরই যদি নির্দেশ,
একটি তারার ছোট কাহিনী
এমন করেই কেন পাঠালে?

যে গান হয়নি গাওয়া কখনো,
সে-গানের সেই রাজ-সভাতে
—একটি জলের ফোঁটা দেখেছি,
—একটি চোখের নীল ছায়াতে!!

ক্যাপ্টেন উসুফ হাসান ঃ শঙ্খচূড়

সমর চট্টোপাধ্যায়

ওস্তাদ, আগুন লেগে জতুগৃহ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা তোদের শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। সেই জতুগৃহ তৈরী হয়েছিল জগতের যাবতীয় দাহ্য পদার্থের কিছুটা নিয়ে। আমার জীবনটাও ছিল তাই ওস্তাদ—জন্মেই আমি স্থান করে নিয়েছিলাম আগ্নেয়গিরির ঠিক মুখেরই ধারে। বাবা ছিলেন ধূমায়মান প্রলয়—মা তুষার শীতল ঝরণা। দুয়ের মাঝে আমি ছিলাম অতি আবশ্যক অবলিক্। টিকে ছিলাম কোন রকমে শুধু মার আর আমার পরস্পরের প্রয়োজনে।

এমনি সময় আমার মা—আমার জীবনের একমাত্র আশ্রয় চলে গেলেন। অপমানে, অবহেলায় মা শুকিয়ে যাচ্ছিলেন, তবু ভাবিনি যে এমন একদিন আসবে যেদিন সুকিয়া স্ট্রিটের কালো পাঁশুটে রং-এর বাড়ীটা একেবারেই কালো হয়ে যাবে। একদিন সন্ধ্যে বেলায় হকি খেলে বাড়ী ফিরেছি; মা ডেকে পাঠালেন। খেলার পোষাকেই মার ঘরে গেলাম। সেই জানালার ধারের বিছানা, যেখান থেকে মা তোর মার সাথে কথা বলতেন, সেইখানেই এক রাশ বালিশ পিঠে রেখে মা শুয়ে আছেন—চোখে একটা অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য—আমায় কোলের কাছে টেনে নিয়ে মা তার সেই মিষ্টি অস্ফুট কণ্ঠে আস্তে আস্তে বললেন, "উসুফ্ বাবা—আমি তো চল্লাম—তোর আর কেউ রইল না।" আমি ডুকরে কেঁদে উঠলাম—বুকের ভিতরটা কি রকম করে উঠল—যাব এ রকম কথা পূর্বেও শুনেছি কিন্তু আজকের মত আশু বিচ্ছেদের কথা আমার কখনো মনে জাগেনি। শীতল পাংশু হাতে আমার কোঁকড়ান চুলে হাত বুলোতে বুলোতে মা আবার বললেনঃ

"কাঁদছিস—পাগলা ছেলে—মা কি কারু চিরকাল বেঁচে থাকে রে? তুই মরদ না? মুছে ফেল চোখ, দেখছিস্ না আমি তো কাঁদছি না—আমার যে বিরাট মুক্তি! হ্যাঁরে বেটা তোরও মুক্তি।" আশ্চর্য রকম শান্ত কণ্ঠে মা বললেন, "খাটের নীচে তোরংটা খোল—একেবারে কাপড়ের নীচে আছে একখানা কাঁথা—দিনের পর দিন ওটা আমি বুনে চলেছি—কত ঠাট্টাই না তোর বাবা করেছে—হাকিমের জরু তার আবার কাঁথা শেলাই কেন?" মার ঠোঁটের কোণে মলিন হাসি ফুটে উঠল—

"কাঁথাখানা খুলে আন বাবা—এনেছিস—দেখি এবার শেলাই আমার শেষ হয়েছে—আঠারো বছরের ঘরকন্নাও শেষ হল—আবার কাঁদছিস?" মার সেই বাঁশীর মত কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ মৃদুতর হয়ে আসছিল, হাতের কাঁথাখানাও ঠিক ভাইব্রেটারের মত কাঁপছিল।

"বাবা উসুফ, এই কাঁথাখানা যত্ন করে রাখ—এর ভাঁজে ভাঁজে বোনা আছে নোট কত জানিনা—আমি যখন আর থাকবো না—তখন তোরও এখানে থাকা চলবে না—বাপ যে তোর মানুষ নয়—সে যে উন্মাদ—"

কথা বলতে বলতেই মা ক্লান্তিতে চোখ বুজলেন। পরদিন ভোরবেলা উঠে দেখলাম মেলাই লোক—জানলাতে তোর মা দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলছিলেন—ফুলে ফুলে মার ক্লিষ্ট দেহকে ঢেকে নিয়ে ওরা চলে গেল। বাবা তখন মফঃস্বলে।

মা বাবাকে চিনতেন—তাঁর সারাজীবনের মর্মন্তুদ কাহিনী আমার অজানা ছিল না—এক ছেলে হলেও বাবার স্নেহস্পর্শ আমি পাইনি। ওস্তাদ ছেলেবেলার ঝাপসা স্মৃতির আড়াল থেকে এখনো তার দানবীয় মূর্তি স্মরণ করে কেঁপে উঠি। তাঁকে জানতেন, তাই মার সেই বিচিত্র কাঁথা বোনা। কিন্তু মার মৃত্যুর পরই বাবা আশ্চর্য রকম বদলে গেলেন; তার সমস্ত উষ্মতা লোপ পেয়ে গেল। আর্দালী, খানসামা, খিদমদ্গার চমকে গেল তাঁর নূতন রূপ দেখে—আগ্নেয়গিরি ঘুমিয়ে পড়ল। আমার নিরুদ্দেশ যাত্রা রইল স্থগিত। সেই অপরূপ কাঁথাখানাও আমার কেতাবের বাক্সে তুলে রাখলাম।

অকস্মাৎ এলো নূতন মা। ওস্তাদ, যেখানে ছিল স্নেহশীতল করুণার উৎস, সেখানে এসে দেখা দিল সর্বগ্রাসী উদ্দাম, খরস্রোতা মারাত্মক বেণোজল। ওদিককার ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি উঠল জেগে। Neutralise করবে কে? অতি অল্প সময়েই আমি হয়ে পড়লাম ফালতু। অকারণে তিরস্কার, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অবহেলা আমাকে সইতে হোতো। কিন্তু একদিন সেই ডাইনী আমার মৃতা মাকে উদ্দেশ করে অকথ্য ভাষায় গালি বর্ষণ করে চলল—

"ওঃ! বাঁদীর বাচ্চার লম্বা চওড়া কথা কানরে?

নেমকহারাম—যেমন মা তেমনি ছেলে হবে ত—থাক্‌তো সেই মাগি বেঁচে ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দিতাম না—"

সংযত হয়েই বল্‌লাম, "আমাকে যা গাল দেও সইব খবরদার আমার মাকে গাল দেবে না।"

"একশোবার দেবো—হাজারবার দেবো! বাঁদীর বাচ্চার হিম্মত দেখো না!"

"কি কি বল্‌লি—"

আমার শরীরের ভেতর যেন একটা বিপ্লব বয়ে গেল, এতদিনের সঞ্চিত আক্রোশ ফেটে পড়ল ওই কটি কথা শুনে। সেদিনও ছিল হকি স্টিক্। বেশ মনে আছে সেদিন আমি Championদের হয়ে Hat Trick করেছি। পলকে সেই হকি নিয়ে আঘাত করলাম ওই ডাইনীর কোমরে। চীৎকার করে সে লুটিয়ে পড়ল। সে ইতিহাস, ওস্তাদ তুই জানিস। বহুদিনের পুরোনো আর্দালী রহিম আমাকে নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলো। বাইরে তখন বাবার মোটর এসে থেমেছে। এক কাপড়ে নিঃস্বম্বল আমি গিয়ে আশ্রয় নিলাম রহিম আর্দালীর ভাইয়ের কুঁড়েতে। কাঁথাখানা কেতাবের বাক্সেই পড়ে রইল।

তিনমাস কাটল রহিমের ভাই আবদুল লস্করের ঘরে। না ওস্তাদ না—আমার বাবা আমার কোন খোঁজই করেননি! তুই ভাবছিস কাগজে বিজ্ঞাপন বেরবে "বাছা আমার ফিরে আয়—" হা হা হা জহুর আমেদ সে লোকই নয়। সাচ্চা আদমি ছিল বটে রহিম। কেতাব আর কাঁথা সমেত আমার ছোট্ট তোরং একদিন সে পৌঁছে দিয়ে গেল। সৎমা হাসপাতালে—বাড়ী ফেরার প্রশ্নই ওঠে না—তাই একদিন আবদুলকে হাত করে লস্কর সেজে এক ডাচ্ জাহাজে চেপে বস্‌লাম।

একবার বুক কেঁপে উঠল। কোথায় চলেছি আমি! মনে পড়ল মার কথাঃ

"বাপজান্, এখানে তোর ঠাঁই হবে না—ভাবনা কি? মরদ তুই; পৃথিবী জুড়ে তোর স্থান রয়েছে—তোর জায়গা খুঁজে নিস্।" মনে পড়ল তোর কথা; কেলো গুণ্ডার কথা যার হাত তুই প্যাকাটির মত ভেঙ্গে দিয়েছিলি—সেই অব্যর্থ ছুরি চালানো, যুযুৎসু! সরু কোমরে তোরই দেওয়া লিক্‌লিকে ইস্পাৎ লতার মত শুয়েছিল। নাঃ ভয় কি? তবুও মনটা হুহু করে কেঁদে উঠল—জাহাজের এক ধারে বসে মনুমেণ্টের দিকে তাকিয়ে রইলাম—বায়স্কোপের ছবির মত আমার জীবনের সমস্ত ঘটনা ওই চলমান দৃশ্যপটের সাথে মিশে এক অপূর্ব অনুভূতির সৃষ্টি করেছিল। আজ ভাবি তার দামও কম নয়। ভোঁ ভোঁ সাইরেন বাজিয়ে ওলন্দাজ জাহাজ গঙ্গার ঘাট থেকে নোঙর তুলল—কয়েক ঘন্টা পরেই পড়ল দরিয়ায়।

পরের সাত বছরের ইতিহাস—সাত সাগরের ইতিহাস। Stow-away থেকে Cabin boy, Cook, Watchman, তারপর ওলন্দাজ কাপ্তেনের খাস বেয়ারা, হ্যাঁ ওস্তাদ তারপর থার্ড মেট্। সে বিচিত্র কাহিনী একদিন শোনাব, আজ নয়।

বন্দরে বন্দরে নোঙর ফেলা, নোঙর তোলা দেশবিদেশের সবচেয়ে অমানুষদের সঙ্গে মিশে আমি ক্যাপ্টেন উসুফ হাসান অপূর্ব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলাম। কিন্তু আগাগোড়াই এড়িয়ে চলেছিলাম এই কোল্‌কাতা বন্দর। কাপ্তেন জোসেফ্ ক্রাফ্‌ট্ আমাকে কলকাতা একবারও আনতে পারেনি। বাংলা উপসাগরের স্মৃতিও আমায় উদ্‌ভ্রান্ত করে তুল্‌ত।

এমনি হয়ত চল্‌ত আরো কিছুদিন; কিন্তু হঠাৎ দুনিয়ার পশ্চিম আকাশে উঠল রক্তিম লড়ায়ের ঝড়। সাতসাগর মারাত্মক সাবমেরিণ বাহিনীতে কিলবিল করতে লাগল। সে এক ভীষণ রাত্রি; আমার জাহাজ উইল্‌হেম্ ফাউস্ট্ তীরের মত যখন এগিয়ে যাচ্ছিল মালয়ের উপকূলের দিকে, সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ জলরাশি ভেদ করে উঠল এক জাপানী সাবমেরিণের কনিং টাওয়ার। পর পর দুটি টরপেডো উইল্‌হেম্ ফাউস্টকে দ্বিধা বিভক্ত করে ফেলল। ৭২ জন অফিসার ও নাবিককে নিয়ে সেই রঙ্গীণ ফানেলওলা আমার দ্বিতীয় আশ্রয় ওলন্দাজ জাহাজ তলিয়ে গেল।

তিনদিন ভাঙ্গা ভেলায় আমরা ছ'টি প্রাণী ভাসতে ভাসতে এক রাত্রির শেষ প্রহরে মালয়ের উপকূলে এসে পৌঁছলাম—তার ভিতর তিনজনই মৃত। অতি কষ্টে আমরা তিনজনই মৃতপ্রায় দেহকে তীরে এনে ফেললাম।

তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল। আউলিং বালুর চড়ায় পড়ে গোঙাতে গোঙাতে বলল—"জল-জল দাও উসুফ্!" আবদুলের অবস্থাও শোচনীয়। সেই আধাজঙ্গল ঘেরা বালুতটে, তারা শুয়ে পড়ে আকুলি বিকুলি করতে লাগল। সারাদেহে ব্লিস্টার, পরিধানে শতচ্ছিন্ন পাজামা, শেষরাত্তিরের চাঁদের আলোয় আধমরা দেহটাকে টান্‌তে টান্‌তে জলের সন্ধানে এগিয়ে গেলাম। কোথাও আলো নেই—সর্বত্র ব্ল্যাক আউট! বেলাভূমি ছাড়িয়েই জঙ্গল—জনমানবের সাড়া নেই—বন যতটা গভীর ভেবেছিলাম ততটা নয়। এখানে সেখানে মানুষের স্পর্শ ছিল—পায়ে চলা পথ জানিয়ে দিল মানুষের বসতি কাছেই। স্থানে স্থানে Tinned Ration-এর খালি টিন পড়েছিল—বৃষ্টিতে তার

ভেতর কোথাও কোথাও জল জমে ছিল। পাগলের মত সেই তিত, বিস্বাদ জল পান করে তৃষ্ণা মেটালাম। তখন ভোর হয়ে এসেছে। সমুদ্রের ধারে তখনও পড়ে রয়েছে আউলিং ও আবদুল। একটা খালি বড় টিনে ওই বৃষ্টির জল সংগ্রহ করে সঙ্গীদের খোঁজে যাচ্ছি; সমস্ত দেহ আমার অবসাদে ভেঙ্গে আসছে, চোখ বুজে আসছে; কিন্তু আমায় ওদের কাছে পৌঁছুতেই হবে। ওস্তাদ আমি প্রাণপণ করছি জঙ্গল পার হয়ে সমুদ্রের ধারে পৌঁছুতে—হঠাৎ একটা গাছের আড়াল থেকেই সমস্ত সমুদ্রতট আমার চোখে পড়ল। থমকে দাঁড়ালাম। ওরা কারা? আটদশজন সশস্ত্র গুর্খা সৈনিক আউলিংকে আর আবদুলকে বেঁধে দাঁড় করিয়েছে; হাবভাবে বুঝলাম প্রশ্ন চলছে। বন্দুকের বাটের আঘাত খেয়েও জবাব মিলছে না—মৃতপ্রায় সঙ্গীদের মাথা সামনে ঝুঁকে পড়েছে—আর এক ব্রিটিশ অফিসার ওদের মুখে পিঠে অনবরত ছড়ি চালাচ্ছে—রাগে আমার সমস্ত দেহ জ্বলে উঠল। চীৎকার করে এগুতে যাচ্ছি হঠাৎ কাণে এল অফিসারের পরিষ্কার কম্যাণ্ড—

"খেম বাহাদুর এই কুত্তা দুটোকে গাউরুমে নিয়ে যাও—সঙ্গে পাঁচজন লোক নাও—Rest come with me!"

হতভাগ্য আউলিং ও আবদুলকে টান্তে টান্তে ওরা সমুদ্রের তীর ধরে বোধ হয় ছাউনীর দিকেই অগ্রসর হল। মানুষ, মরা কুকুরকেও ও ভাবে ভাগাড়ে নেয় না ওস্তাদ; আমি গোঁয়ারের রাজা ক্যাপ্টেন উস্ফ হাসান স্থাণুর মত একটা প্রকাণ্ড বেতের ঝাড়ের আড়াল থেকে তাই দেখলাম। চমক ভাংল যখন দেখি অফিসার খোলা রিভলভার হাতে আমারই পায়ের চিহ্ন ধরে জঙ্গলের দিকে এগিয়ে আসছে; তিনজন সৈনিক রাইফেলে সঙ্গীণ চড়িয়ে চারিদিকে সতর্ক ভাবে নজর রেখে তার অনুসরণ করছে;

"দিরগুলাল ই আদমি জাপানি Fifth Column অছে, একে ধরতেই হবে—খুব হুশিয়ার—" উত্তরে সৈনিকদের একজন বলল্ "জি!"

চকিতে সমস্ত জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল—মূর্খ ব্রিটন আমাদের জাপানী গুপ্তচর ভেবেছে। বুঝলাম ওলন্দাজ জাহাজ মারা পড়ার সংবাদ ওরা পায়নি। কিন্তু সে-সব ভাবনা নিয়ে থাকতে গেলেই মৃত্যু। গুর্খারা দেখতে পেলেই গুলি করবে। আগে হত্যা পরে প্রশ্ন! চারিদিকে তাকিয়ে বুঝলাম এ জঙ্গলে আত্মগোপন করা দুঃসাধ্য! ওরা তখনো প্রায় দুশো গজ দূরে—জলের টিনটা মাটিতে ফেলে প্রায় নিঃশ্বাস রুদ্ধ করেই আমি পেছুতে লাগলাম; ভোরের আলো তখন ইতঃস্তত ছড়িয়ে পড়েছে; পায়ে চলা রাস্তা ছেড়ে দিয়ে যে দিকটা বেশী ঘন সমাকীর্ণ বেতবন ও আগাছায় আচ্ছন্ন সেই দিকে প্রায় বুকে হেঁটে এগিয়ে যেতে লাগলাম—হাত পা বুক ছড়ে গিয়ে রক্ত পড়তে লাগল।

হঠাৎ চোখে পড়ল একটা পুরোনো ভাঙ্গা পচমান শালতি উবু হয়ে পড়ে আছে। দুর্বল দেহে কোথা থেকে শক্তি এসেছিল জানি না, সেই প্রায় আঠারো ফুট শালতির একধার উঁচু করে তারই নীচে লুকিয়ে রইলাম। আমার অনুসরণকারীরা ততক্ষণ বনে ঢুকে পড়েছে।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে তাদের ভারী বুটের শব্দ শুনছি আর আল্লার নাম নিচ্ছি—সমস্ত জঙ্গল ওরা তোলপাড় করে তুলেছে—কাছাকাছি কোথাও দাঁড়িয়ে সেই অফিসার হুকুম দিচ্ছে। একজোড়া বুটের আওয়াজ ক্রমেই শালতির দিকে এগিয়ে এল—তারপরেই কে মারল সঙ্গীণ দিয়ে পচা কাঠের নৌকোয় খোঁচা; তার খানিকটা কাঠ ফুঁড়ে আমার উরু ছুঁয়ে গেল—দাঁতে দাঁত চেপে আমি অনড় হয়ে রইলাম; এবার আর রক্ষা নেই!

অকস্মাৎ রেলের এঞ্জিনের বাষ্প নিঃসরণের মত একটা দুরন্ত হিস্ হিস্ শব্দ প্রায় আমার পায়ের কাছ থেকেই এল না? পরক্ষণেই 'বপ্‌স্' বলে গুর্খা চেঁচিয়ে উঠল—দ্রুত বুটের আওয়াজে বুঝলাম সে পালাচ্ছে। দুম্ দুম করে রাইফেল গরজে উঠল।

'সাব্, প্রকাণ্ড গোখরো সাপ পালাও'—বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল! কি সর্বনাশ কেউটের বাসায় শুয়ে আছি নাকি? মড়ার মত পড়ে রইলাম। অপ্রত্যাশিতভাবে কেউটের উপস্থিতিতে ওদের মানুষ শিকারের উৎসাহে ভাঁটা পড়ল। প্রায় আধঘণ্টা বাদে বাইরে থেকে আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না—তবুও নড়তে ভরসা পাচ্ছি না কি জানি যদি সাপে কাটে!

ওস্তাদ—ভাবতে প্যারিস এ রকম পরিস্থিতি। ইংরেজীতে কথা আছে Frying Pan to Fire' আমার বেলায় একটার পর একটা অগ্নিশোধন চলেছে— জাহাজ ডুবি, যদিও বা বাঁচলাম—হাতে পড়লাম এক বন্ধু সৈনি-কের, পালাতে গিয়ে ঠাঁই নিলাম কেউটের বাসায় এখন প্রশ্ন, শালতির তলা থেকে বেরুতে গেলে যদি সাপ ছুবলে দেয়। কতক্ষণ পরে জানি না—আমার কাছে তা এক যুগ —আল্লার নাম নিয়ে সন্তর্পণে শালতি তুলে বেরিয়ে এলাম বন্ধু গোক্ষুরাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে। চারদিকে তাকিয়ে হঠাৎ নজরে পড়ল 'ওঃ বাবা' প্রকাণ্ড এক সাপের খোলস্ ঠিক শালতির গলুইয়ের দিকেই; বেশ কিছু-

দিনের পুরোণো খোলস বলেই মনে হল; সন্দেহ রইল না যে আমি আজ অহিরাজের নিবাসেই অতিথি হয়েছিলাম।

সাময়িকভাবে বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে জঙ্গল ছাড়িয়ে লোকালয়ের দিকে এগুচ্ছি; গাছপালার আড়াল থেকে ঘর বাড়ী দেখা যাচ্ছে—মেলাই-সামরিক ছাউনী; অতি সাবধানে যেখানে সবচেয়ে বেশী ঘনবসতি সেই দিকে চলতে চলতে একেবারে রাজপথে এসে দাঁড়ালাম; তখন বেশ লোক চলাচল সুরু হয়েছে; নানা জাতীয় মানুষ অর্থাৎ চীনে, ভারতীয়, মালয়ী, বর্মী, ফিরিঙ্গি খুবই-ব্যস্ত হয়ে চলাফেরা করছে। সবার মুখেই থমথমে ভাব। নাবিকের ছেঁড়া পোষাক, অসংযত চুল, নিস্প্রভ কোটরগত চোখ সব নিয়ে আমাকে পাগল বা ভিখারীর মতই দেখাচ্ছিল বোধ হয়, তাই একজন পথিক আমাকে দুটো কলা আর খানিকটা বাসী রুটি ছুঁড়ে দিল—ভাষা মালয়ী।

মুহূর্তে কর্তব্য স্থির করে ফেললাম। সারাদিন বাজারেই ভিক্ষের ছল করে কাটাব। I was after a chance to think for myself!

হাঃ হাঃ হাঃ! ওস্তাদ ভেবে দেখ আমি উসক্কে হাসান ম্যাজিস্ট্রেটের ছেলে Professional ভিখারী সেজে খাবার কুড়োচ্ছি! হাঃ হাঃ হাঃ! আমার মাথায় তখন রাজ্যের Plan চলেছে—মুক্তির ও প্রতিহিংসার Plan! হঠাৎ কানে এল দুই ফিরিঙ্গির কথাবার্তাঃ

"আরে শুনছো—আজও দুটো জাপানী গুপ্তচর ধরা পড়েছে—শুনলাম সাবমেরিন থেকে নাবিয়ে দিয়ে গেছে ওদের—"

"হ্যাঁ ওরা বলছে কোন জাহাজের লস্কর—Torpedo লেগে জাহাজ ডুবে গেছে—"

"সব বাজে কথা, ও বেটারা সব পারে। এক বেটা শুনছি চীনে—আরেকটা Indian Nigger! তিনের নম্বর পালিয়েছে—তাকে ধরবার জন্য সোরগোল পড়ে গেছে—বেটা নাকি আজাদী দলের নেতা।"

"নাঃ আর এখানে থাকা চলল না! পাঁচমিশেলী জাত —সব বর্ণচোরা—Look! বেটা কুলী ভিখারী কি রকম কপ্ত গিলছে শোন—"

চকিতে নিজেকে সামলে নিলাম—একটু হাবার হাসি হেসে দু আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দিলাম একটা সিগ্রেট চাই—।

"বেটা সৌখীন আছে" বলে তার অর্ধদগ্ধ সিগ্রেটটা ছুঁড়ে দিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল। নানারকম কথার টুকরো শুনে বুঝলাম জাপানী অভিযানের অগ্রবর্তী দল ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। সর্বত্র পঞ্চম বাহিনী! কেউ কাউকেই বিশ্বাস করছে না। দিনভোর দিশি-বিলাতী ফৌজের কুচকাওয়াজ চলেছে। মিলিটারী ও Secret পুলিশ গিজ্‌গিজ্ করছে। দু'একজন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমাকেও দেখে গেল—। বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করছে তবু মুখে বোবার হাসি টেনে এনে আমি মূক ভিখারীর অভিনয় করে যাচ্ছি।

প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এল—কোথায় রাত কাটাব ভাবছি এমনি সময় বাংলা কথা শুনে চমকে উঠলাম! দুটি ১০।১২ বছরের ছেলের সাথে কথা কইতে কইতে এক ভদ্রমহিলা বাজার থেকে বেরুলেন। হাতে কিছু সওদা। ছোট ছেলেটি বলছে—

"মা, আমরা কবে কলকাতা ফিরব?"

ছোট্ট করে কি জবাব তিনি দিলেন শোনা গেল না। কিন্তু চোখ আমার উজ্জ্বল হয়ে উঠল—ওস্তাদ! আমি যেন অকূলে কূল পেলাম। হঠাৎ আব্‌ছা আঁধারে দেখলাম সেই ফিরিঙ্গি আমার দিকে তাকাতে ক্যান্টনমেন্টের দিকে যাচ্ছে। রাস্তার মোড় ফিরতেই আমি উঠে সেই মহিলার অনুসরণ করলাম—বাজার আর আমার নিরাপদ নয়।

সহরের ঘনবসতি ছাড়িয়ে তাঁরা অপেক্ষাকৃত ছিম্‌ছাম পল্লীর ভেতর প্রবেশ করলেন। সোজা সরল রাস্তা। উভয় পাশে ছবির মত ছোট্ট বাড়ীর সার—তকতকে বাগান—পশ্চাতে গোয়ালঘর, কোথাও বা গ্যারেজ। এমনি একটি বাড়ীতে মহিলাটি প্রবেশ করলেন, রাস্তায় লোকজন কম, বাইরে আলো দেখবার উপায় নেই—ব্ল্যাকআউট। সকলের অলক্ষ্যে নিঃশব্দে বাড়ীর বেড়ার গা ঘেঁসে ঘেঁসে পেছনের আউটহাউসের অন্ধকার কোণায় আশ্রয় নিলাম।

মন স্থির করেছি, এদের কাছে আত্মসমর্পণ করে ভবিষ্যৎ-প্ল্যান ঠিক করব। মা ও ছেলেদের কথা কানে আসছে; রান্নার সুঘ্রাণ আমার ক্ষুধার্ত দেহকে, পাগল করে তুলেছে; অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করলাম—এখনো সময় হয়নি! আবার ভাবছি যদি এরা আমায় বিশ্বাস না করে; যদি আমায় ধরিয়ে দেয়?

যেখানে আমি গা ঢাকা দিয়ে বসেছিলাম, সেখান থেকে বাড়ীর রান্নঘর ও খাবার-ঘর দেখা যাচ্ছিল; অনেক রাত্তিরে গৃহস্বামী এলেন—জামা কাপড় ছেড়ে ক্লান্তভাবেই খাবার টেবিলে এসে বসলেন—গৃহিণী খাবার এগিয়ে দিতেই খানিকটা খাবার মুখে দিয়ে বললেন—

"নাঃ, ভাবিয়ে তুলেছে শা—রা। এবার তোমাদের দেশে পাঠাতেই হবে।"

"আর তুমি? তোমাকে রেখে আমি যাব না, বরং ছেলে-মেয়েদের পাঠিয়ে দাও।"

"আমার যাওয়া অসম্ভব—বাঙ্গালী বলে আমার অবস্থা নজরবন্দীর সামিল—সব বঙ্গালী লোকই নাকি এনার্কিস্ট—বেটাদের নেতাজী Phobia পাগল করে তুলল—কথায় কথায় বাঙ্গালী Traitor, বাঙ্গালী Unreliable—নাঃ সুলতা তোমরা যাও—Next Mail-এ যায়গা পেয়েছি। এরকম দেশজোড়া ওলটপালটের মধ্যে—"

"না না আমার যাওয়া হবে না—ছেলেমেয়েদের সত্য-বাবুর স্ত্রীর সাথে কলকাতা পাঠিয়ে দাও।"

"ছেলেমানুষি করনা সুলতা। আজ একজন চীনে ও ভারতীয় মোছলমানকে বেটারা গুলী করে মেরেছে—তার নাকি Spy—সন্দেহ হলেই ধরছে আর সঙ্গে সঙ্গে Firing Squad। একটা নাকি ভিখারী সেজে সহরেই আছে—হন্যে হয়ে খুঁজছে তাকে—না, তোমরা যাও—দরকার হয় আমি কাজে Resign দিয়ে পরে আসছি—"

বজ্রাহতের মত বসে রইলাম। আউলিং আবদুল নাই সমস্ত শরীর আমার রুদ্ধ ক্রোধে স্ফীত হয়ে উঠল। আমার দুর্দিনের বন্ধু আবদুল, সদাপ্রফুল্ল নিরপরাধ আউলিং নিহত! চোখ বয়ে আমার অজস্রধারে জল পড়তে লাগল নিজের হাত নিজে কামড়াতে লাগলাম।

গৃহস্বামীর ঘরের ঘড়িতে ঢং ঢং করে এগারোটা বাজলো।— সমস্ত সহর নিস্তব্ধ—শুধু জানলার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল গৃহিণীর প্রশান্ত মুখ—দুহাতে উল বুনে চলেছেন। সেই মুখচ্ছবির আড়ালে দেখতে পাচ্ছিলাম একটা নিবিড় চিন্তার ঘনমলিন ছায়া। ওস্তাদ, ও জাতের মেয়েরা কপাল কুঁচকে চিন্তা করে না।

বাংলো আর বহির্বাটির মধ্যে একটুকরো খোলা প্রাঙ্গন। সংকল্প স্থির করে নিঃশব্দে প্রাঙ্গনে পা দিলাম—শুকনো পাতা একটুখানি মড় মড় করে উঠল—। কতটুকুই বা আওয়াজ—উল বোনা হাত নিশ্চল হয়ে গেল, গৃহিণী স্তব্ধ হয়ে রইলেন ক্ষণেকের জন্য। মাথা নাড়লেন আপনার মনেই। আবার হাত চল্‌লো, যেন বুনটের পর বুনট দিয়ে চিন্তার জাল বুনে চলেছেন। হামাগুড়ি দিয়ে Corridor পার হয়ে যে ঘরে গৃহিণী বসেছিলেন, সেই ঘরের দরজায় এসে মৃদু করাঘাত করে কম্পিত কণ্ঠে ডাকলাম "মা"।

উল বোনা বোধ হয় স্তব্ধ হয়ে গেল—! খুট্‌ করে একটুকু শব্দ, তারপর আবার অসহ্য নীরবতা। ক্ষয়িষ্ণু দেহকে যথাসাধ্য সহজ করে আবার কান্নার মত করে ডাকলাম—

"মা, মা, দরজা খোল, আমি আশ্রয় চাই।" ঠিক সেই মুহূর্তে আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় মন দিয়ে আমি অনুভব করছিলাম যেন আমি আমার হারানো মাকেই আকুল হয়ে ডাকছি। সর্বত্র লাঞ্ছিত হয়ে আমি যেন মায়ের কাছে আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছি। স্থান, কাল, পাত্র তখন আমার অনুভূতির বাইরে।

গৃহের অভ্যন্তরে কে চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। পাশের ঘরে গৃহস্বামীর নাকডাকার আওয়াজ আসছে। দরজার ঘুলঘুলির কাছে ভেতর থেকে অত্যন্ত চাপা গলায় প্রশ্ন হল—

"কে-কে তুমি? এত রাত্রে কি চাই তোমার?"

"বাঁচাও মা—আমি ভীষণ বিপদে পড়ে আশ্রয় চাইছি—আমি বাঙ্গালী।"

প্রায় কান্নার মত গলার স্বর—নিজের কাছেই মনে হল যেন মুমূর্ষুর গোঙানী। ধীরে অতি ধীরে দরজা খুল্‌ল। কষ্টে বহু চোট খাওয়া দেহটাকে ঘরের ভিতর টেনে নিয়েই জ্ঞান হারালাম। কতক্ষণ অচৈতন্য ছিলুম জানিনা। একটু সম্বিত পেতেই দেখি মাথার কাছেই কল্যাণী মাতৃমূর্তি—হাতে একবাটি গরম দুধ। ইঙ্গিতেই বল্‌লেন, "দুধ খেয়ে নাও।" নিঃশব্দে বুভুক্ষুর মত দুধ একনিঃশ্বাসে পান করলাম। এবার নীরব আদেশ "আমার সাথে এস"

অতি কষ্টে উঠে দাঁড়ালম—দেহ প্রায় অচল। তবুও টলতে টলতে তাঁকে অনুসরণ করে একটি অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করলাম। বোধ হয় ভাঁড়ার ঘর—এক পাশে খানিকটা স্বল্প পরিসর মাচাং; দেখলাম জ্বালানী কাঠের স্তূপ। অত্যন্ত শান্তকণ্ঠে তিনি বল্‌লেন, "তুমি কে জানি না—ওই মাচাং-এর ওপাশে শোবার জায়গা করে নাও! খুব সাবধান! আমার সংকেত না পেলে একটুও নড়বে না।" একটু থেমে আবার বললেন, "তুমিও বুঝি সেই পলাতক! আবার বাঙ্গালী—তুমিই সেই বটে!" তিক্ত হাসি হেসে বল্‌লেন, "বাঙ্গালী উমিচাঁদও আছে আবার মোহনলালও আছে—নফর চাকুরীসর্বস্ব আছে আবার নেতাজীও আছেন। তুমি যাই হও, মনে রেখো তোমাকে যদি ওরা এখানে পায়, তবে আমার স্বামী, আমার ছেলেমেয়ে কেউ ২৪ ঘণ্টাও জ্যান্ত থাক্‌বে না।" নীরবে ঘাড় নেড়ে জানালাম—'মনে রাখবো।' মই বেয়ে ওপরে উঠলাম—বেতের সিঁড়ি মচ্‌মচ্‌ করে উঠল। একটু চম্‌কে উঠলেন গৃহস্বামিণী—তারপর

চলে গেলেন—আশ্চর্য ওস্তাদ, দরজাটিও বন্ধ করলেন না তিনি।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানিনা। চোখ চেয়ে দেখি বেশ বেলা হয়েছে। হাতের কাছেই একখানা আয়না, দাড়ী কামাবার যন্ত্রপাতি, পাজামা, ফতুয়া, খানিকটা তুলো, মলম গোছানো রয়েছে। আস্তে আস্তে উঠে বসলাম—সমস্ত শরীরে বিষম বেদনা—কি করে শরীর টি'কে ছিল নিজেই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। আয়নাতে নিজের চেহারা দেখে চমকে গেলাম। বহুদিনের খোঁচা খোঁচা দাড়ী, সিন্দুরের মত লাল দুটো চোখ, জটপাকানো চুল, সর্বাঙ্গে অসংখ্য ছোট বড় ক্ষত—এ যেন উসুফ হাসানের প্রেত! অবাক লাগল, এ উন্মাদও আশ্রয় পায়! হলফ্ করে বলতে পারি ওস্তাদ্ যে, কোন সাধারণ বঙ্গকন্যা আমার ও মূর্তি দেখে মূর্চ্ছা যেত।

দাড়ী কামাতে কামাতে শুনতে পেলাম—গৃহস্বামীর কথাবার্তা—বোধ হয় বাজার থেকে ফিরছেন—

"হ্যাঁগা! শুনছো—সারা সহরে এক ভিখিরির খোঁজ পড়েছে—বেটা নাকি বাজারের ধারে বসেছিল। ওই রড্-রিগ্ সন্দেহ করে মিলিটারী পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ এসে নাগাল পায়নি—দুহাতেই উল্‌কি আছে।"

চমকে হাতের দিকে তাকালাম ; ওই কটা ফিরিঙ্গিই তবে রড্‌রিগ্!

ভদ্রলোক তখনও বলছেন—

সাবধানে থেকো—আজে বাজে লোক যেন কম্পাউণ্ডে না ঢোকে।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, তুমি এখন নেয়ে খেয়ে আপিস যাও—সব তাতেই ভয়।"

"না, ভয় কি? শুধু পেছন থেকে ছুরি খাওয়া—আমি আজই Passage book কচ্ছি—একি! ভাঁড়ার ঘরে তালা কেন? বাজার রাখবো কোথায়?"

"এই বল্‌ছো খুব সাবধান—আবার বলছো ভাঁড়ারে তালা কেন? বাজার বারান্দায় রাখো। তারপর চান করতে যাও।"

খোকা, বুরু কোথায়?"

"আজ ওরা সত্য বাবুর বাড়ী থাকবে—সকালেই চলে গেছে।"

গজ্‌গজ্ করতে করতে কর্তা চান খাওয়া সেরে দপ্তরে চলে গেলেন। মাথার চুলের জট ছাড়িয়ে, দাড়ি কামিয়ে পোষাক বদলে কাঠের দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছি, এমনি সময় তালা খুলে গেল।

"নেমে এসো।" অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে আদেশ হল। স

বেয়ে নামলাম। এই তাঁকে দিনের আলোয় প্রথম দেখল

ওস্তাদ ; চওড়া লাল পেড়ে সাদা শাড়ী, গলায় একছ

হার, হাতে দুগাছা রুলী ও শাঁখা। কি করে তাঁর বর্ণ

দেবো ওস্তাদ? তোরা প্রতিমা পুজো করিস—মৃন্ম

প্রতিমা—আমি দেখেছিলাম সেদিন মূর্তিময়ী জগদ্ধাত্রী

আমার প্রাণদাত্রী। একমাত্র বাঙ্গালী জননীই সেই র

ধারণ করতে পারেন।

আমার দুচোখ দিয়ে অশ্রুর বন্যা বয়ে গেল। আ

কাপ্তেন উসুফ হাসান—শিশুর মত অস্থির হয়ে গেলাম

"তুমি মুসলমান?"

বললাম, "হ্যাঁ মা।"

যাও বাথরুমে চান করে নাও বাছা। আর তোমার

পুরোনো ছেঁড়া কাপড়ের পুটুলিটা আমায় দাও। কি

ভয় নেই তোমার।"

সেই ভাঁড়ার ঘরে খেতে খেতে আমার জীবনের সম

কথা খুটিয়ে খুটিয়ে শুনে নিলেন। মার কথা, সেই কাঁ

খানার কথা, আমার অনাদৃত জীবনের মর্মকথা আমি উজ

করে দিলাম সেই মহিমময়ীর কাছে। হতভাগ্য আউ

আর আবদুল—আমার চোখ জ্বলতে লাগল—দাঁতে দ

ঘষে পুনঃপুনঃ বলতে লাগলাম, "এর প্রতিশোধ নেব—আ

উসুফ হাসান এর প্রতিশোধ নেবো।"

খাওয়া নাওয়া শেষ করে আবার উঠে বস্‌লাম মাচ

ওপরে। আমার সেই নতুন মা উল বুনেই চলেছে

কাঁচাপাকা ২।১টি চুল কপালে এসে পড়েছে।

তিনদিন তিনরাত্রি চলল আমার অজ্ঞাতবাস।

তিনদিনে ছোটখাট বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল আম

প্রাণদাত্রীকে। তারপর এক ঘোর রাত্রিতে ভীষণ দুর্যো

মধ্যে আমার ঘরের দরজা খুলে গেল। মা ছোট্ট ক

ডাক্‌লেন, "উসুফ।" প্রস্তুত ছিলাম। নেমে এলা

শরীর তখন আমার সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে এসেছে। মা আব

ডাকলেন, "নিশিবাবু—"

"এই যে দিদি"— বলেই ঘরে ঢুকলেন এক ভদ্রলো

হাতে একটি সুটকেশ ও Torch। সৈনিকেরই পোষ

গায়ে ম্যাকিনটশ্, তা থেকে টপ্ টপ্ করে জল ঝরছে

চোখের চশমার আড়াল থেকেও বিদ্যুৎ ঠিক্‌রে পড়ছে।

"নিশিবাবু—এই আমার উসুফ। আগুনে ধোয়া ছে

—একে ঝালিয়ে নিন্ ঠক্‌বেন না—" আমার দিকে তাকি

ধীরে ধীরে আবার বললেন—

"জানিনা কোন দৈব তোমাকে এ বাড়ীতে পাঠিয়ে

আশ্রয় নিতে। প্রমাণ পেয়েছি তোমার সাহসের অভাব নেই—তোমার সুহৃদ আউলিং আর রহিম নয়—সভ্যতার নামে ওরা যে বর্বরতার পরিচয়, এমন কি এ ছোট্ট বন্দরেও, দিচ্ছে, তার তুলনা নেই। তারই বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার ক্ষমতা রাখে এমনি পুরুষ আমরা খুঁজছি বাবা—নৃশংসতাকে সময় সময় নৃশংসতা দিয়েই জয় করতে হয়, কিন্তু ইমান ঠিক রেখ—”

অন্ধকারেও মার চোখ যেন জ্বলে উঠল—বাইরে তখন হাওয়া, বৃষ্টি আর বিদ্যুতের মাতামাতি চলেছে। সুটকেশ খুলে নিশিবাবু এক সেট মিলিটারী পোষাক বার করে দিলেন। নির্দেশমত পরে নিলাম। তার ওপর বর্ষাতি। যেন শরীরের মাপ নিয়েই সেই পোষাক তৈরী হয়েছিল—এখন বুঝলাম কেন আমার নাবিকের ছেঁড়া পোষাক মা চেয়ে নিয়েছিলেন।

নিঃশব্দে নিশিবাবু আমার হাতে গুঁজে দিলেন ছ'নলা রিভলভার আর তার মশলা।

নিশিবাবু প্রশ্ন করলেন, “কর্তা?”

রহস্যের মৃদু হাসি হেসে উনি বল্লেন, “ঘুমুচ্ছেন—আজকাল ঘুম প্রায়ই হয়না, তাই মাঝে মাঝে Sleeping Tablets দেওয়া হয়।” তারপরই আদেশ হল তীক্ষ্ণকণ্ঠে “এবার তোমরা এস—জয় হিন্দ্।”

নিশিবাবুও চাপা গলায় জবাব দিলেন, “জয় হিন্দ্।”

সমুদ্রতীরের ঝড় আর বৃষ্টি দেখেছিস্ কি ওস্তাদ? নাবিক আমি, জল ঝড় চিরকাল যুঝে এসেছি—কিন্তু সে রাত্তিরের দুর্যোগ যেন একটা নূতন রূপ নিয়ে আমার কাছে দেখা দিল; একাধারে মুক্তি ও বজ্রভেরী! আমার বক্ষে তখন অযুত হস্তীর বল; সহস্র তড়িৎপাত আমি হাতের মুঠোয় অবহেলায় ধরতে পারি। একটা বিপুল উচ্ছ্বাস, সর্বনেশে উল্লাস উসুফ হাসানকে পেয়ে বসল। চীৎকার করে আমার ভিতরকার আন্দোলনকে প্রকাশ করতে যাচ্ছি—মুখে হাত দিয়ে নিশিদাদা বললেন—

“তোমার নাম হাবিলদার বিমলদাস, তুমি কুয়ালালাম-পুর থেকে আসছ—পথে Ambushed হয়েছিলে, অতি কষ্টে পালিয়ে এসেছ, Identity Card হারিয়েছে—কিছু ভয় নেই—অন্য সৈনিক তোমায় Identify করবে—M. P. বা আর কেউ প্রশ্ন করলেই নিকটস্থ Rest Camp-এ যাওয়ার Direction চাইবে। Clear?”

সমস্তটা পুনরুক্তি করলাম। স্বল্পভাষী নিশিদাদা খুসী হয়ে বললেন, “ঠিক্ হায়।” হঠাৎ পিছন ফিরে তাকালাম—ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে; তারই তীব্র আলোয় ঝল্‌মল্ করে উঠ্‌ছে একখানি ছোট্ট বাংলো। তারই একটি ঘরে সিঙ্গাপুরী বেতের আরামী চেয়ারে বসে অবিশ্রান্ত উল বুনে চলেছেন একটি বাঙ্গালী নারী। প্রশস্ত ললাটে সিঁদুররেখা এ অন্ধকারেও আমি দেখতে পাচ্ছি; জ্বল-জ্বল করছে ঠিক রক্তাভ সন্ধানী আলোর মত; দুর্গত অসহায়, বিতাড়িত মানুষের আশার আলোকনীড়! হোঁচট খেয়ে পড়তেই নিশিদা ধরে ফেল্লেন।

“কি ভাব্‌লো? সুলতাদির কথা? Gold all through—ও মানবী নয় উসুফ—ও ইন্দ্রাণী, একটা সাম্রাজ্য চালাতে পারেন সুলতাদি!”

কড়কড় করে আবার বাজ পড়ল—নিশিদা হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন—হাত ধরে আমায় থামিয়ে দিলেন। বিদ্যুতের আলোয় দেখলাম একটি প্রকাণ্ড সাপ এঁকে বেঁকে রাস্তা Cross করে চলেছে। নিশিদা Torch ফেলতেই মাথা উঁচু করে একবার আমাদের দিকে তাকাল, তারপর সর্পিল বক্রগতিতে পাশের জঙ্গলে ঢুকে পড়ল।

“শঙ্খচূড়? উসুফ্ আজকে আমাদের পুনর্জন্ম।” চকিতে মনে পড়ল, চারদিন আগের কথা। এই তো সেই জঙ্গ—সেই ভাঙা Tin-এর স্তূপ। ক্ষুধু গোক্ষুর তার শালতির আড়ালে নিজ গৃহে ফিরে চলেছে। নিশিদার হাত ছাড়িয়ে নতজানু হয়ে তাকে উদ্দেশ্য করে বারংবার কুর্ণিশ করলাম। বিস্মিত নিশিদা প্রশ্ন করলেন, “কি হল?” উঠে দাঁড়িয়ে চল্‌তে চল্‌তে বললাম, “না, কিছু নয়, চলুন।”

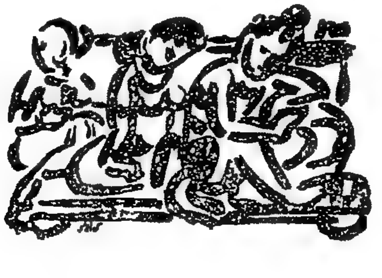

শ্যামা নৃত্যনাট্য

শ্রীজয়দেব রায়

শ্যামা রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠতম গীতিনাট্য। কাহিনীর পরিকল্পনায় এবং পরিবেশে এখানি অতুলনীয়। দুঃখানুভূতির মধ্য দিয়া প্রেম পরিকল্পনা সাহিত্যের একটি সৌন্দর্য সম্পদ, প্রিয়জনের জন্য আত্মবিসর্জন লৌকিক প্রেমকে অমর্ত্য লোকে লইয়া যায়। প্রেমের জন্য ত্যাগ, আত্মনিগ্রহ যুগে যুগে নর-নারীর দৈহিক আকর্ষণকে ভাবলোকে লইয়া গিয়াছে, নব নব কাব্যের রসের জোগান দিয়াছে।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত The Sanskrit Budhist Literature of Nepal নামক নেপালী বৌদ্ধ কাহিনীর মহাবস্ত্বাবদান অংশ হইতে শ্যামার কাহিনী সংগৃহীত। কাহিনীটি মোটামুটি এই—তক্ষশিলা নিবাসী বজ্রসেন নামক প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠীপুত্র একদা বারাণসীর কোন মেলায় ব্যবসা উপলক্ষে আসিয়া কালক্রমে দস্যু কর্তৃক লুণ্ঠিত এবং আহত হয়। অপরিচিত বিদেশী শ্রেষ্ঠীপুত্র আশ্রয়ের জন্য কোন ভগ্ন দেব-মন্দিরে আসিলে নগরপাল তাহাকে চোর বলিয়া ধরে এবং বিচারে তাহার প্রাণদণ্ড হয়। ইত্যবসারে শ্যামা নামে নগরীর রূপসী নটী বজ্রসেনের রূপে মুগ্ধ হয়। বারাণসীর জনৈক বণিকপুত্র শ্যামার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী ছিল। শ্যামা এবং তাহার সহচরিগণের চক্রান্তে উক্ত প্রেমিক বজ্রসেনের পরিবর্তে মৃত্যুদণ্ড লাভ করে এবং শ্রেষ্ঠীপুত্র মুক্তি পায়। শ্যামার প্রণয়ে বজ্রসেন তাহার পর মোহিত হইয়া তাহারই আশ্রয়ে বসবাস করিতে থাকে। একদা হঠাৎ তাহার মুক্তির যথার্থ কারণ জানিতে পারিয়া বজ্রসেনের মনে ক্ষোভ হয় এবং অনুশোচনার উদয় হয় এবং সুন্দরী শ্যামার বীভৎস লালসার কলুষ এবং হতভাগ্য প্রেমিকবধজনিত পাপ তাহাকে দগ্ধ করিতে থাকে। বজ্রসেন কোন এক সুযোগে শ্যামাকে অচেতন করিয়া পরিত্যাগপূর্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া চলিয়া যায়।

এই মূল কাহিনী অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'কথা ও কাহিনীর' "পরিশোধ" কবিতা লেখেন—

"রাজকোষ হতে চুরি। ধরে আন চোর,
নহিলে নগরপাল, রক্ষা নাহি তোর,
মুণ্ড রহিবে না দেহে।" রাজার শাসনে
রক্ষীদল পথে পথে ভবনে ভবনে
চোর খুঁজে খুঁজে ফিরে। নগর বাহিরে
ছিল শুয়ে বজ্রসেন বিদীর্ণ মন্দিরে
বিদেশী পথিকপান্থ তক্ষশিলাবাসী।..

এই গাথাকাহিনী অবলম্বনে রচিত হয় 'পরিশোধ গীতিনাট্য' (১৩৪৩)। পরিশোধেরই রূপান্তরিত এবং সংস্কৃত রূপ 'শ্যামা'। নাটকীয়তা সৃষ্টির জন্য মূল কাহিনীর অবশ্য অনেক জায়গায় ব্যতিক্রম করা হইয়াছে। প্রেমিক উত্তীয় স্বেচ্ছায় আত্মবলিদান দিয়াছে—কাব্যসৌন্দর্যের পক্ষে এইটাই সুন্দরতর।

বালক কিশোর,
উত্তীয় তাহার নাম, ব্যর্থ প্রেমে মোর
উন্মত্ত অধীর। সে আমার অনুনয়ে
তব চুরি অপবাদ নিজ স্কন্ধে লয়ে
দিয়েছে আপন প্রাণ।

উত্তীয় জানে সে শ্যামার প্রণয় কোনদিনই পাইবে না। কিন্তু চিরকালের জন্য শ্যামার স্মরণীয় হইয়া থাকিতে সে পারে—

প্রিয় যে তোমার বাঁচাব যারে
নেবে মোর প্রাণ ঋণ,
তাহারি সঙ্গে তোমারি বক্ষে
বাঁধা রবো চিরদিন
মরণ ডোরে।

রবীন্দ্রনাথ বজ্রসেন এবং শ্যামার মনে মানসিক সংঘাত (action) আনিয়া কাহিনীর নাটকীয়তা সৃষ্টি করিয়াছেন। বজ্রসেন শ্যামার প্রণয়ে অধীর, কিন্তু কিছুতেই তাহার অপরাধ মার্জনা করিতে পারিতেছে না। যখনই সে শ্যামার জন্য ব্যাকুল হইতেছে, তখনই অদেখা প্রেমিকের ম্লান মুখচ্ছবি তাহাকে নীরবে পীড়ন করিতেছে, তখনই কিশোর উত্তীয়ের তাহারই জীবনরক্ষার জন্য আত্মবলিদান তাহাকে লজ্জা দিতেছে। নিজের ক্ষমাহীনতা বজ্রসেনকে দুঃখ দিতেছে—

ক্ষমিতে পারিলাম না যে
ক্ষমো হে মম দীনতা
পাপীজন শরণ প্রভু।
মরিছে তাপে মরিছে লাজে
প্রেমের বলহীনতা॥

প্রিয়ারে নিতে পারিনি বুকে
প্রেমেরে আমি হেনেছি,
পাপীরে দিতে শাস্তি শুধু
পাপেরে ডেকে এনেছি,
জানি গো তুমি ক্ষমিবে তারে,
যে অভাগিনী পাপের ভারে
চরণে তব বিনতা।
ক্ষমিবে না ক্ষমিবে না
আমার ক্ষমাহীনতা,
পাপীজন শরণ প্রভু॥

শ্যামার মানসিক দ্বন্দ্বও সুপরিস্ফুট। সে বজ্রসেনকে ভালোবাসিয়াছিল। প্রেমের জন্য সে সাংঘাতিক পাপ করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। যে হতভাগ্য প্রসাদ ভিক্ষুককে বলিদান দিয়া সে বজ্রসেনকে লাভ করিয়াছিল, সেই ব্যর্থ-প্রেমিকের ছলছল আঁখি অহরহঃই তাহার মনে পড়িত। জীবন্ত উত্তীয়কে তাহার আঙিনায় ঠাঁই না দিলেও মৃত উত্তীয় তাহার মনের অন্দরে আসন গ্রহণ করিয়াছিল, সেখানে সঙ্গোপনে তাহার পূজা চলিতেছিল। চরম মূল্যে কেনা প্রেমও অসার্থক হইবে?

তোমার কাছে দোষ করি নাই দোষ করি নাই।
দোষী আমি বিধাতার পায়ে;
তিনি করিবেন রোষ—সহিব নীরবে॥
তুমি যদি না করো দয়া, স'বে না, স'বে না,
স'বে না।

চার্লস ডিকেন্সের লেখা 'এ টেল অব টু সীটিজ' (A Tale of Two Cities) উপন্যাসের কাহিনীর সঙ্গে শ্যামার গল্পের অদ্ভুত সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। এই গল্পটিতেও একজন প্রেমিক তাহার প্রিয়তমার সুখের জন্য তাহার প্রণয়াস্পদের দণ্ড হাসিমুখে গ্রহণ করে। গল্পটি মোটামুটি এই—

সিড্‌নী কার্টেন নামে একজন ডক্টর আলেকজান্দার ম্যানেটের মেয়ে লুসীকে মনে মনে ভালোবাসিত। লুসীর স্বামী চার্লসের গিলোটিনের হুকুম হয়। সিড্‌নী কার্টেনের সঙ্গে চার্লসের চেহারার বেশ মিল ছিল। লুসীর সুখের জন্য সিড্‌নী আত্মত্যাগ করিতে চাহিল। জেলখানায় সে চার্লসের সঙ্গে বেশ পরিবর্তন করিয়া নিজে স্বেচ্ছায় বন্দী-দশা গ্রহণ করিল এবং তাহার পলায়নের সুযোগ করিয়া দিল। পরদিন সকালে সিড্‌নী যখন হাসিমুখে ফাঁসি-কাঠে উঠিল, লুসী তখন চার্লসের সঙ্গে ভারাক্রান্ত মনে তাহারই কথা ভাবিতে ভাবিতে প্যারিস ছাড়িয়া নীড় বাঁধিতে লণ্ডনে চলিতেছে।

'এ টেল অব টু সীটিজ'এর সিড্‌নী কার্টেন এবং 'শ্যামা'র উত্তীয় চরিত্র একই পরিকল্পনায় রচিত; সিড্‌নীর সঙ্গে চার্লসের চেহারার সাদৃশ্য ডিকেন্সের গল্পকে আরো বাস্তব করিয়া তুলিয়াছে।

এই নাটকের climax সৃষ্টিতে কবির কৃতিত্ব আছে। প্রথম দৃশ্যে বজ্রসেন তাহার ইন্দ্রমণির হার ভাবী মানসীকে উপহার দেবার সঙ্কল্প জানাইতেছে—

এ তো হাটে বিকোবার নয় হার — না না না।
কণ্ঠে আমি দিব তারি — যারে বিনামূল্যে নিতে পারি,
ওগো আছে সে কোথায়, — আজো তারে হয় নাই চেনা।

বন্ধুর কথায় কিন্তু বজ্রসেনের লাঞ্ছনায় একটি পূর্ব পরি-কল্পিত ষড়যন্ত্রের আভাস পাওয়া যায়—

তুমি ইন্দ্রমণির হার এনেছ সুবর্ণ-দ্বীপ থেকে—
রাজমহিষীর কানে যে তার খবর দিয়েছে কে।
জানো নাকি পিছনে তোমার রয়েছে রাজার চর।

কোটাল তাড়া করিলে বজ্রসেন পালাইল।

দ্বিতীয় দৃশ্যে শ্যামার সভাগৃহে সখিগণের কাছে উত্তীয় তাহার প্রেমের ব্যর্থতার দুঃখ জ্ঞাপন করিতেছে—

থাক্ থাক্ নিজ মনে দূরেতে
আমি শুধু বাঁশরীর সুরেতে
পরশ করিব ওর প্রাণ মন, অকারণ

বজ্রসেনকে কোটাল এই সময়ে তাড়া করিয়া পথ দিয়া যাইতেছিল। শ্যামা তাহার রূপে বিমুগ্ধ হইল—

আহা মরি মরি
মহেন্দ্রনিন্দিত কান্তি উন্নতদর্শন
কারে বন্দী করে আনে
চোরের মতন কঠিন শৃঙ্খলে।

শ্যামা জানাইল বজ্রসেনের নির্যাতনে—

তব অপমানে মোর
অন্তরাত্মা আজি অপমান মানে।

উত্তীয় জানাইল সে নিজের জীবন দিয়া বজ্রসেনকে বাঁচাইবে। শ্যামা বোধহয় এই সর্বপ্রথম উত্তীয়ের দিকে দৃষ্টি দিল—

এতদিন তুমি সখা চাহনি কিছু
নীরবে ছিলে করি নয়ন নিচু।
রাজঅঙ্গুরী মম করিলাম দান,
তোমারে দিলাম মোর শেষ সম্মান।

উত্তীয়ের স্বপ্ন আজ সার্থক হইল, জীবন আজ তাহার ধন্য

হইল, চরণে মধুর মরণে পূর্ণ করিয়া প্রাণ সঁপিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। উত্তীয় প্রহরীর কাছে দোষ স্বীকার করিয়া আত্মসমর্পণ করিল, সখীরা শ্যামাকে ধিক্কার দিয়া উঠিল, শ্যামারও চেতনা হইল, কিন্তু তখন সব শেষ হইয়া গিয়াছে, প্রেম স্বর্গীয় হইয়া উঠিয়াছে।

কোন অপরূপ স্বর্গের আলো
দেখা দিল রে প্রলয় রাত্রি ভেদি
দুর্দিন দুর্যোগে,
মরণ মহিমা ভীষণের বাজাল বাঁশি।

তৃতীয় দৃশ্যে শ্যামার মনে উত্তীয়ের মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেম প্রভাবপাত করিয়াছে। বজ্রসেনের সঙ্গসুখের আনন্দের মধ্যেও সে মাঝে মাঝে উন্মনা হইয়া পড়িতেছে।

চতুর্থ দৃশ্যে বজ্রসেন জানিতে চাহিল—

কহ কহ মোরে প্রিয়ে
আমারে করেছ মুক্ত
কী সম্পদ দিয়ে।

সহচরী সতর্ক করিয়া দিল—

নীরবে থাকিস সখী ও তুই নীরবে থাকিস।।
তোর প্রেমেতে আছে যে কাঁটা
তারে আপন বুকে বিঁধিয়ে রাখিস।

শ্যামা অন্তর বাহিরের দ্বন্দ্বে আর থাকিতে পারিল না। সে দোষ স্বীকার করিল, ক্ষমা চাইল। বজ্রসেন তাহাকে আঘাত করিয়া চলিয়া গেল। উত্তীয়ের আত্মবলিদানের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল।

কবি দেখাইতে চাহিয়াছেন প্রেম সর্বজয়ী। কেবল উত্তীয়ের মধ্যেই নয়, শ্যামা এবং বজ্রসেনের চরিত্রের মধ্য দিয়াও তাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন। প্রেম তাহার দয়িতকে রক্ষার জন্য সমস্ত নীতিধর্মকে তুচ্ছ করিতে পারে, ঘোরতর অন্যায়কেও প্রশ্রয় দিতে পারে। শ্যামার উত্তীয় বলিদান তাহার বজ্রসেনের প্রতি গভীর আকর্ষণেরই পরিচায়ক। বজ্রসেনও প্রেমিক তাই সে উত্তীয়ের প্রেমের অপমান সহ্য করিতে পারিল না।

'পরিশোধ' গীতিনাট্য শ্যামার পূর্ব সংস্করণ। মূল অংশ এক থাকিলেও শ্যামায় তাহার অনেক রূপান্তর দেখা যায়। এই গানগুলি শ্যামা নৃত্যনাট্যে বর্জিত হইয়াছে—(১) এখনো কেন সময় নাহি হলো, (২) চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে, (৩) এবার ভাসিয়ে দিতে হবে, (৪) ঐ রে তরী দিল খুলে, (৫) কঠিন বেদনার তাপস দোঁহে—প্রভৃতি। 'পরিশোধের' অপেক্ষা শ্যামায় নাটকীয় রস অনেক জমাট এবং জটিল। সখীগণ, কোটাল প্রভৃতি ইহাতে নাই এবং স্বয়ং উত্তীয় এখানে নেপথ্যে রহিয়াছে।

উত্তীয়ের প্রেম নিবেদন এবং তাহার আত্মত্যাগ অলক্ষ্যে ঘটায় পরিশোধ নাটকের নাট্যরসের অঙ্গহানি হইয়াছে, তাহার প্রেম মাধুর্যের কোনই ইঙ্গিত ইহাতে নাই। 'পরিশোধের' বাচন ভাষণ শ্যামায় কিভাবে মার্জিত হইয়াছে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল—বজ্রসেনের শেষ উক্তি পরিশোধ নাটকে—

ধিক্ ধিক্ ওরে মুগ্ধ কেন চাস্ ফিরে ফিরে।
এ যে দূষিত নিষ্ঠুর স্বপ্ন,
এ যে মোহবাষ্পঘন কুজ্ঝটিকা—
দীর্ণ করিবি না কি রে।
অশুচি প্রেমের উচ্ছিষ্টে নিদারুণ বিষ
লোভ না রাখিস
প্রেতবাস তোর ভগ্নমন্দিরে।
নির্মম বিচ্ছেদ সাধনায়
পাপ ক্ষালন হোক্,
না কোরো মিথ্যা শোক,
দুঃখের তপস্বী রে—
স্মৃতিশৃঙ্খল করো ছিন্ন
আয় বাহিরে আয় বাহিরে।

শ্যামায় তাহার পরিবর্তে আছে বজ্রসেনের বেদনাময় গান 'ক্ষমিতে পারিলাম না যে ক্ষমো হে মম দীনতা।'

'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যের মতন 'শ্যামা' অথবা 'পরিশোধ'ও প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সুরে বাঁধা; চিত্রাঙ্গদায় তবু দুই এক স্থানে আবৃত্তি রহিয়াছে, এই নাটকের কোন অংশই সুরবিহীন নয়। ভূমিকায় কবি পাঠককে সেজন্য সতর্ক করিয়া দিয়াছেন—

"কথা ও কাহিনীতে প্রকাশিত 'পরিশোধ' নামক পদ্য কাহিনীটিকে নৃত্যাভিনয় উপলক্ষ্যে নাট্যীকৃত করা হয়েছে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এর সমস্তই সুরে বসানো। বলা বাহুল্য, ছাপার অক্ষরে সুরের সঙ্গ দেওয়া অসম্ভব বলে কথাগুলির শ্রীহীন বৈধব্য অপরিহার্য।"

কেবল সুর নয় আগাগোড়া নৃত্যের ছন্দের উপর শ্যামার গানগুলি রচিত। তিনটি পৃথক নৃত্যধারা মণিপুরী, কথাকলি এবং কথক নৃত্যপদ্ধতি এই নাটকে অনুসৃত হইয়াছে। পৃথক পৃথক চরিত্রের জন্য তাহাদের উপযোগী পৃথক পৃথক নৃত্যপদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে। নায়ক বজ্রসেনের অভিনয় কথাকলির ধারায়, দুই একটা গানে ভারতনাট্যম্‌ও গ্রহণ করা হইয়াছে। নায়িকা শ্যামার চরিত্রে আগাগোড়া

মণিপুরী ঢঙ, উত্তীয়ের করুণ জীবন ফুটিয়াছে কথক ভঙ্গীতে। অন্যান্য চরিত্রগুলির নাচ কথাকলি ভঙ্গীতেই ফুটিয়াছে।

শ্যামা রীতিমতো ট্রাজিক ড্রামা। কেবল উত্তীয়ের বলিদানই নয়, আগাগোড়া শ্যামার একটি ট্রাজিডির সুর বাজিয়াছে। কবি বোধহয় বলিতে চান পাপের দ্বারা লব্ধ প্রেম সার্থক নয়। পরাজিত শ্যামার প্রতি আমাদের সমবেদনা থাকিলেও তাহার কৃতকর্মের জন্য সে ক্ষমা পায় নাই। তাহার মানসিক বিপ্লব সংঘাতের খবর সুরের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

দুই একটি দৃশ্য রীতিমতো লোমহর্ষক! বিশেষতঃ উত্তীয়ের হত্যাদৃশ্যটি (দ্বিতীয় অঙ্ক) একটি সুন্দর এবং সার্থক চিত্র। তবে রবীন্দ্রনাথের ন্যায় শান্তরসের সাধক যে কি করিয়া অমন বীভৎস চিত্র আঁকিলেন, ভাবিতে আশ্চর্য লাগে! অভিনয়ের সময় দ্রুত লয়ে প্রচণ্ড বাজনার দ্বারা এই অংশের climax ফোটান হয়।

চতুর্থ দৃশ্যে বজ্রসেনের শ্যামাকে আঘাত এবং তাহার পতন আর একটি বৈচিত্র্যময় চিত্র।

শ্যামার গানগুলির অধিকাংশ করুণার সুরে বাঁধা, বেদনার রসে ভরা। মৃদু লয়ে লঘু সুরে বিরহী মনের পরিচয় গানগুলি বহন করিতেছে। (১) হে বিরহী হায় চঞ্চল হিয়া তব, (২) ফিরে যাও কেন ফিরে ফিরে যাও, (৩) মায়াবন বিহারিণী হরিণী, (৪) জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা, (৫) এতদিন তুমি সখা চাহনি কিছু, (৬) আমার জীবন পাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান, (৭) হায় হায়রে হায় পরবাসী, (৮) নীরবে থাকিস সখী ও তুই, (৯) সব কিছু কেন নিল না, নিল না—প্রভৃতির সুরের মধ্যে গভীর বেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বেহাগের সুরে 'হে বিরহী হায় চঞ্চল হিয়া তব' গানে এই বেদনা ফুটিয়াছে; শঙ্করার সুরে 'কাঁদিতে হবে রে পাপিষ্ঠা' গানে ক্রোধ এবং রোষ ফুটিয়াছে; ভৈরবীতে 'তোমার কাছে দোষ করি নাই' গানে অনুনয় ফুটিয়াছে।

'ধরা সে যে দেয় নাই দেয় নাই' গানটি পূর্বতন 'যায় দিন শ্রাবণ দিন যায়' গানের সুরে ছন্দে রচিত—

যায় দিন শ্রাবণ দিন যায়।
আঁধারিল মন মোর আশঙ্কায়,
মিলনের বৃথা প্রত্যাশায়
মায়াবিনী এই সন্ধ্যা ছলিছে॥
আসন্ন নির্জন রাতি,
হায়, মম পথ চাওয়া বাতি
ব্যাকুলিছে শূন্যেরে কোন্ প্রশ্নে—
দিকে দিকে কোথাও নাহি সাড়া,
ফিরে খ্যাপা হাওয়া গৃহছাড়া।
নিবিড় তমিস্র বিলুপ্ত আশা,
ব্যথিতা যামিনী খোঁজে ভাষা
বৃষ্টি মুখরিত মর্মর ছন্দে,
মালতী মঞ্জরী গন্ধে॥
ধরা সে যে দেয় নাই দেয় নাই,
যারে আমি আপনারে সঁপিতে চাই—
কোথা সে যে আছে সংগোপনে,
প্রতিদিন শত তুচ্ছের আড়ালে আড়ালে।
এসো মম সার্থক স্বপ্ন
করো মোর যৌবন সুন্দর
দক্ষিণ বায়ু আনো পুষ্পবনে
ঘুচাও বিষাদের কুহেলিকা
নব প্রাণমন্ত্রের আনো বাণী॥
পিপাসিত জীবনের ক্ষুব্ধ আশা
আঁধারে আঁধারে খোঁজে ভাষা,
শূন্যে পথহারা পবনের ছন্দে,
ঝরে-পড়া বকুলের গন্ধে॥

শ্যামার নৃত্যপরিকল্পনায় এবং অভিনয়ে স্বর্গীয়া সেবা মিত্রের বিশেষ দান আছে। স্বয়ং কবিগুরু শ্রীমতীকে এজন্য আশীর্বাদ জানাইয়াছিলেন।

প্রতিবিম্ব

[চতুর্থ পরিচ্ছেদ]

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

কলিকাতা—তন্মধ্যে আবার আলিপুর, বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জ, রিজেন্ট পার্ক অবস্থিত—সহরের সম্ভ্রান্ত ও সৌখীন সমাজমধ্যে বাটারফ্লাই ইউনিট্ বা প্রজাপতি পরিষদ বিশেষ পরিচিত ও খ্যাতিবন্ত। 'প্রজাপতি পরিষদ' উভয়লিঙ্গ—যুবতী নর নারী লইয়া গঠিত। পরিষদের পার্ষদগণ সকলেই পদস্থ, বিত্তবান ও প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত। কেহ রেলে, কেহ গভর্ণমেণ্টে, কেহ সওদাগরী অফিসে, কেহ বা নিজ কণ্ট্রাক্টরী-সাপ্লাই ফার্মে কর্ম করেন ; কেহই বেকার নহেন। পক্ষান্তরে স্ত্রীপ্রজাপতিগণ কোনও না কোন সরকারী অথবা বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে, বৈতনিক বা অবৈতনিকভাবে সমাজ ও লোকহিতকর কার্যে নিয়োজিত থাকিয়া ভারতবর্ষীয় সংবিধানের সমাধিকার, সমসুযোগ সম্ভোগ বিধির চরিতার্থতা সপ্রমাণ করিতেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কলিকাতা সহরে যখন জাপানবিরোধী সৈন্যবাহিনীর প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল এবং লক্ষ লক্ষ সাদা কালো বেগুনে জর্দা রঙের সৈন্যসামন্তে কলিকাতা মহানগরীর অগণিত ছাউনী ইন্দ্রধনুবর্ণে বিরঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল তখন এই প্রজাপতি পরিষদের স্ত্রী-বাহিনী স্বদেশপ্রেম ও দেশসেবার যে মহোচ্চ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এদেশের ইতিহাসে তাহার তুলনা মেলা কঠিন। আহা, স্বদেশ ও স্বজন হইতে বহু দূরে দূরান্তরে বিদেশে বিদেশীয়দের মধ্যে পড়িয়া যে সকল 'বালক' চার্চিল সাহেবের মতে ভারতবর্ষ রক্ষার্থে আত্মপ্রাণ বলি দিতে আসিয়া কতই না অসুবিধা, কতই না কষ্ট, কতই না বঞ্চনা ভোগ করিতেছিল—কে তাহাদের দুঃখ হৃদয় দিয়া অনুভব করিয়াছিল? তাহাদের গভর্ণমেণ্ট মাসে মাসে মাহিনা ও দিনের দিন র‍্যাসন ফেলিয়া দিয়াই কর্তব্য সমাপন করিলেন ; ছাউনী-পরিচালকগণ না-হয় দুই দশটা বোতল হুইস্কী ব্র্যাণ্ডি বিয়ারই পাঠাইয়া দিলেন; কিন্তু হায়! এই বিদেশ বিভুঁয়ে প্রিয়জন পরিজনশূন্য নির্বান্ধব ও আইন কানুনদ্বারা নিষ্ঠুর কঠোর নিগড়বদ্ধ মরুভূমে মানুষের কাম্য, বাঞ্ছনীয়, আকাঙ্ক্ষিত বস্তু কি আর কিছুই ছিল না? হায়, সে কথা কি কেহ ভ্রমেও চিন্তা করিয়াছিল? একটি স্নেহের ললিত বাণী, একটি কোমল সান্ত্বনার স্পর্শ, ক্ষণকালের জন্য একটু মধুর সঙ্গ, হায় হায়, হতভাগ্যগণ কি তাহাও প্রত্যাশা করিতে পারে না? হয়ত জীবনের যবনিকা পতনের দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে, হয়ত কর্তব্যের আহ্বানে বহু দূরস্থিত প্রিয়তমা—যাহাকে ছাড়িয়া আসিয়াছে, দূরে ফেলিয়া আসিয়া তাহার একখানি ফটো তপ্ত বক্ষোপরি রক্ষা করিয়া দিবসশর্বরী উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসে অতিবাহিত করিয়াছে, আর তাহাকে দেখিতে পাইবে না, জনমের মত চিরবিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, হয়ত এ জীবনে আর সে প্রেমমধুর স্বর শুনিবে না, পরের দেশ, পরের জীবন রক্ষা করিতে আসিয়া কত উজ্জ্বল ভবিষ্যসম্ভাবনাপূর্ণ জীবন উৎসর্গ করিয়া শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিবে, তাহাদের ব্যথাভরা বেদনাব্যথিত ব্যাকুল অন্তরের আকুল আবেদন কান পাতিয়া কেহ শুনিয়াছিল কি? কাহার দায় পড়িয়া গিয়াছে? জগতের মানুষ স্বার্থপর, স্ব স্ব স্বার্থ লইয়াই ব্যতিব্যস্ত, পরার্থে, পরধন পরদেশ পরের প্রার্থনারক্ষার্থে প্রাণ উৎসর্গ কে করিল-না করিল চিন্তা করিবার ফুরসৎ কোথায়? সে উদারতা অথবা সে হৃদয়ালুতা থাকিলে সেনানিবাসে কি একবার কেহ উঁকিও মারিত না? উঁকি মারা দূরে থাকুক, ছাউনীর পাশ দিয়া চলিবার সময় ঘৃণাভরেই যেন চরণের গতিবেগ বৃদ্ধি করিত। মরে মরুক, মরিবার জন্যই ত সৈনিক হইয়াছে। তাহার জন্য চিন্তা করিবার কি কারণ থাকিতে পারে? মানুষ কি স্বার্থপর! সে দিন, এই প্রমীলা প্রজাপতিগণই ভারতের মুখ রক্ষা করিয়াছিলেন। সৈনিক সান্ত্বনা কমিটি গঠন করিয়া তাঁহারাই শিবিরে শিবিরে সৈনিকদিগের অবসর বিনোদনের আসর বসাইয়াছিলেন। তাঁহারাই তাহাদের বিরহ সন্তাপিত মরু-হৃদয়ে সুশীতল সুবাসিত বারি সিঞ্চিত করিয়াছিলেন। ক্রীড়ায় কৌতুকে রঙ্গে ভঙ্গে আমোদে প্রমোদে অভাগাদের ব্যথা চম্পকাঙ্গুলিতে তুলিয়া

লইয়াছিলেন। উত্তপ্ত নিঃশ্বাসগুলিকে সার্বজনীন প্রেমের মেসিনে চড়াইয়া সুস্বাদু আইসক্রীমে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন।

দেখ, দর্পণ নহিলে যেমন প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয় না, প্রাণ না থাকিলে তেমনই প্রাণের স্পর্শ অনুভূত হয় না। ঐ যুদ্ধের সময়ই দেখ না কেন, প্রাণহীন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান প্রমীলা সম্ শুধু অর্থ উপার্জনই করিল—দোকানে বাজারে হাটে ঘাটে মাঠে প্রান্তরে ছিপে গাঁথা জেওল মাছের মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল বটে ; কিন্তু প্রাণের পরিচয় দিতে পারিল কই? তাহাদের ত

ফেল কড়ি, মাখ তেল,
তুমি কি আমার পর?

আরে মূল্য গ্রহণ করিয়া যাহাই কেন দাও না, তাহাকে দান বলা হয় না। সে ত ব্যবসায়মাত্র। কিন্তু, কলিকাতার প্রমীলা প্রজাপতি পরিষদ বিনামূল্যে দানের যে মহামূল্য ইতিহাস রচনা করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা যে কেবল দেশ-বিদেশের সেনানীদিগের অন্তরেই চিরদিন সুখস্বপ্ন সৃজন করিবে এমন নহে, ভারতের ত্যাগের ইতিহাসে একটি অভিনব অধ্যায়ই অনন্তকালের জন্য সংযোজিত করিয়া রাখিয়াছে। একজন লাটসাহেব আবেদন করিয়াছিলেন, যাহারা অবহেলে প্রাণ দিতে যাইতেছে, তাহাদিগকে অদেয় কিছুই থাকা উচিত নহে। এই আবেদনে প্রমীলাবৃন্দ যেমন সাড়া দিয়াছিলেন, এমন আর কেহই নহে। দধীচি শুষ্ক, কাষ্ঠবৎ অস্থিই দান করিয়াছিলেন, আর ইঁহারা?

প্রজাপতি সমাজে প্রচলিত প্রথানুসারে সন্ধ্যাকালে যুগলে যুগলে 'দর্শন' বিনিময় করিতে হয়। এক জোড়া প্রজাপতি আজ সরকার সদনে, কাল গুপ্ত গৃহে, পরশু ঘোষাবাসে, পরদিন রায় রাজ্যে এইরূপে পরিচিত প্রজাপতি যুগলগুলিকে ধন্য করিলেন। সরকার গুপ্ত ঘোষ রায়ও যথারীতি রিটার্ণ ভিজিট দিয়া ঋণ পরিশোধ করিতেছেন। মাসভোর, বৎসরভোর ইহাই চলিতেছে। এই সময় পুরুষ প্রজাপতিদিগের যেমন তেমন কিন্তু স্ত্রীপ্রজাতিগণের সাজ সজ্জার বৈচিত্র্য কেবল দর্শনীয় নহে, বিশেষভাবে স্মরণীয়। বাসুজায়া আজ যে শাড়ী ব্লাউজে ব্যানার্জি আবাসে দর্শন দিয়াছেন, আগামী কল্য গুহ গৃহে তাহা দৃষ্ট হইবে না তো বটেই, মাসান্তে—রোটেসনে আবার যেদিন বাসু মেম সাহেব ব্যানার্জি দম্পতীকে বাধিত করিতে যাইবেন, রিপিটেসনের দৈন্য কখনই স্বীকার করিবেন না। বলিয়া রাখা ভাল, প্রজাপতি সমাজে ইহাই নিয়ম, অলঙ্ঘনীয় ও অবশ্য পালনীয়। প্রজাপতির বর্ণের ঐশ্বর্য। আর প্রমীলাসমাজের বস্ত্রের আভিজাত্য।

প্রজাপতি সমাজে অলঙ্কার বহুল্য বড় নাই। না থাকিবারই কথা। তাঁহারা নিজেরাই অলঙ্কার; তাঁহাদের রূপ বর্ধন, শোভা বর্ধনের জন্য অলঙ্কারের দরকার নাই। অলঙ্কার ঘরে থাকিলেও তাঁহারা উহা পরিধান করেন না। মণিবন্ধে একটি হাতঘড়ি, তাহাতেই কি বাহার। অধিকন্তু ন দোষায়ঃ একটি শান্তিনিকেতনী ঝুলি (হাত ব্যাগ এখন সেকেলে হইয়া পড়িতেছে) হইলে আর কথাই নাই।

প্রজাপতি সম্মিলনে কি হয়? বলা কঠিন; ইহা বলা চলে যে, হয় না এমন কথা অভিধানে নাই, এমন কাজ ক্রিয়া-কর্মকাণ্ডবারিধি মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না যাহা তথায় অনুষ্ঠিত না হয়। আমাদের ঠাকুরমা-দিদিমারা পুকুরঘাটে যে সকল সুস্বাদু প্রসঙ্গাদি আলোচনা করিতেন; অপিচ আমাদের ঠাকুরদা দাদামশাইরা চণ্ডীমণ্ডপাদিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া যে সকল অত্যাবশ্যকীয় কর্ম অনুষ্ঠিত করিতেন, অধুনা প্রজাপতি সম্মিলনে সে সকলের একত্র সমাবেশ। সিংহের সিংহিনী কবে একদিন মধ্যাহ্নে সিংহের অগোচরে জো দাশের সহিত বরাকরের ডাক বাঙলোর নির্জন বিহার করিয়া আসিয়াছে, প্রমীলা পরিষদে তাহা রেজেষ্ট্রিকৃত হইয়া আছে। সুরভি সুর যে স্বামী সুহৃদ সুরের বিরুদ্ধে ব্যাভিচার ও নিষ্ঠুরতার নালিশ হাইকোর্টে করিয়াছে, তাহার সাক্ষী সাবুদ এই স্থান হইতেই সংগৃহীত হইতেছে। বাসবী ব্যানার্জি তাহার তৃতীয় পাণি-প্রার্থীকে বাতিল করায়, চতুর্থের সন্ধান প্রজাপতি সম্মিলনকেই করিতে হইবে। ঈশ্বর মজুমদার একমাত্র পুত্র অনিরুদ্ধ মজুমদারের দুর্বল স্কন্ধে প্রায় বিশ ত্রিশ লক্ষ টাকার গুরুভার চাপাইয়া দিয়া চট্ করিয়া চক্ষু মুদিয়াছে। বেচারী ভারবাহী অনিরুদ্ধকে যথাসাধ্য অব্যাহতি দিবার উদ্দেশ্যে প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় প্রতি শাখা সম্মিলনেই নানাবিধ উপায় উদ্ভাবিত ও আলোচিত হইয়া এক্ষণে সুফলের সম্ভাবনাও পরিলক্ষিত হইতেছে। ইতিমধ্যে অনিরুদ্ধ দুই রাত্রি ফোর হাণ্ড্রেড ক্লাবে হাজিরা দিয়াছে; মন্দাকিনীর জন্মদিনে নিজ ব্যয়ে হুইচ ক্লাবে কক্‌টেল পার্টি ডাকিয়াছে, অলিঙ্করার বিবাহ উপলক্ষে "বাকল্যাণ্ড" স্টীমারে অষ্টম প্রহর সংকীর্তন বসাইয়াছে; পরাশর চ্যাটার্জির ফিঁয়াসীকে নিজের সাদা প্যাকার্ডে তুলিয়া কুক-কেলভী, ব্রেসেকের বাড়ী ঘড়ি বাছিতে তিনদিন তিন দুপুর ঘুরিয়াছে শুনা যাইতেছে লিনিকে একখানা নূতন স্টীমলাইন্ড ফোর্ড কার ওয়েডিং প্রেজেন্ট করিবে। জটে বোসের রেলের জেনারেল ম্যানেজারের লেজিটিমেট্

"ক্লেম" বাণচাল হইবার উপক্রম হইয়াছিল, প্রজাপতি পরিষদ স্বর্গ-মর্ত-পাতাল একাকার—বেঙ্গল মিনিষ্ট্রি, দিল্লী ক্যাবিনেট, রাষ্ট্রপতি-ভবন তোলপাড় করিয়াছিল, কাল কমিউনাল্কে বাহির হইয়াছে, জটে জি-এম্। বিনিময়ে জটে পান্ডা প্রজাপতিদিগকে সেলুনে ভারত ভ্রমণ করাইবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

প্রজাপতি পরিষদের ডেইলী রাউন্ডে খানার সম্পর্ক বিরল বা ব্যতিক্রম হইলেও পিনার আয়োজন প্রাত্যহিক, ইহা নিঃসংশয়ে বলা চলে। এ বিষয়ে প্রজাপতি পরিষদ কবি ডি, এল, রায়ের অনুগামী।

বিকেলটা যদিও হায়
সবরৎ খেয়ে কেটে যায়।
সন্ধ্যের একটু হুইস্কী ভিন্ন
প্রাণটা আর বাঁচে কৈ।।

দুই চারিটা বেরসিক বাড়ী যে নাই, এমন নহে। তাহারা বেলের জলো-সরবৎ, অচিনি লেবুর নির্যাস, কাঁচা আম-পোড়া পানীয় দ্বারাই প্রজাপতি অতিথি সৎকার করিতে অভ্যস্ত। মধুহীন কুসুমে মক্ষিকা সমাগমের ন্যায় তাঁহাদের গৃহে প্রজাপতি সম্মিলন বসে বটে তবে ব্যবধান প্রায়শঃ দীর্ঘ ও সম্ভ্রমযুক্ত।

নরেশ বোস দম্পতী প্রজাপতি পরিষদের নিয়মিত সদস্য হইলেও গত পক্ষকাল তাঁহাদিগকে কুঠিতেই আবদ্ধ থাকিয়া অবর্ণনীয় কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে। বোস সাহেবের নিজস্ব দপ্তর—বিষম ভারী ও গুরু দায়িত্বপূর্ণ দপ্তর তো ছিলই উপরন্তু সদ্য সুপারসিডেড জেলা বোর্ড তাঁহার ঘাড়ে চাপিয়াছে; বোস সাহেবের নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় নাই। বোস সাহেব ঠিক বলিয়াছেন গভর্ণমেণ্টের কেরামতিই এই। যে ব্যক্তি কাজ করবে, তারই ঘাড়ে রাজ্যের কাজ চাপাবে। আর যারা ফাঁকি দিয়ে গায়ে ফু দিয়ে বেড়াতে পারে, তারা দিব্যি বেড়াচ্ছে। এগারটায় আসছে, একটা না বাজতে লাঞ্চ খেতে বেরুলো, সাতিনটে সাড়ে তিনটেয় আর একবার শুভাগমন করলে, সঙ্গে সঙ্গে রুমেই টি-ক্লাব, ঘড়িতে পাঁচটা বেজেছে কি বাজে নি, একদম ষ্টিয়ারিঙে। বেড়ে আছে তারা।

সুতরাং বোস সাহেব "বেড়ে" নাই। বেলা ন'টা না বাজিতে আফিস যান্, রাত্রি ৮টার আগে বাড়ী ঢুকিতে পান না। মাঝে ঐ ঘন্টাখানেক—কিম্বা একটু বেশীও হইতে পারে, গোপেনের নভেলটি হাউসে একটু চা খাইতে যাওয়া। সেখানে যে একটু বিশ্রাম পাইবেন, তাহারও সম্ভাবনা ঘুচিয়াছে। বোর্ডের ফাইলস্তূপ সেইখানে বসিয়া সাফ করিতে হয়। সব সারা হইয়া উঠে না, বাণ্ডিল বাঁধিয়া বাড়ীতে বহিয়া লইয়া যাইতে হয়। বাড়ীতে, রাত্রিটুকু যদ্যপি তাঁহার নিজস্ব হইত, তাহা হইলেও যা-হয় কথা ছিল। বোর্ডের নালিশ—দরবার শুনিতে শুনিতে এক একদিন রাত্রি ১১টা বাজিয়া যায়।

বিপদের উপর বিপদ, প্রজাপতি পরিষদের মূর্ত্তিগুলি যুগলে যুগলে বাড়ীতে আসিয়া রোজই ক্রিমিনেল নেগলেক্টের দায়ে দায়রা সোপরদ্দ করিয়া যাইতেছেন। প্রজাপতিকুল বলেন, কি বাবা বড় পায়া হয়েছে ব'লে কি আমাদের ত্যজ্যপুত্তুর করলে বাপ্।

প্রমীলা-প্রজাপতিরা বলেন, চার পা হয়েছ, ভালই। আমার দেওরটা, ভায়ের মেয়েটা, দাদার ছেলেটা ব'সে রয়েছে, কাজকর্ম নেই, ব্যবসাটাবসা বন্ধ, একটু দেখো দিকিন।

কাজেই বলিতে হয়, নিশ্চয়, নিশ্চয়, শ্লিপ দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন, নিশ্চয় দেখবো।

কোথায় পাঠাবো? বোর্ডের আফিসে? কখন?...

না, না, এইখানেই পাঠাবেন।

বাড়ীতে পাঠাবো—তারপর কোথায় হারিয়ে ফেলবে কাগজ টাগজ, আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তার চেয়ে বরং বোর্ড আফিসে তুমি যে সময় থাকো, সেই সময় পাঠাবো।

আমি এখনও বোর্ড আফিসে যেয়ে উঠতে পারছি নি কিনা, বাড়ীতে ব'সেই কাজ করছি।...তাই তো বলছিলুম, খাটতে খাটতে প্রাণান্ত হবার যোগাড়। এই আপনাদের বিদায় করেই ঐ ঘরে ঢুকতে হবে; অন্ততঃ পাঁচ সাতটি প্রাণী গাড়ীখানেক ফাইল নিয়ে ব'সে আছে, তাদের নিয়ে পড়বো।

একটি স্ত্রী-প্রজাপতি অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিলেন, আমাদের আর বিদেয় করতে হবে না ভাই, আমরা নিজেরাই বিদেয় হচ্ছি, চলো গো চলো, বলিয়া স্বীয় স্বামীটির বাহু আকর্ষণ করিলেন।

নরেশ যুক্তকরে কাতরস্বরে কহিলেন, ও-নো ও-নো, আমি তা বলি নি। আমি বলছি, আপনাদের গুডনাইট ক'রে বোর্ড নিয়ে পড়তে হবে।

বেশ ভাই, বেশ, আমরা যাচ্ছি; কিন্তু তোমার মিসেসটি গেলেন কোথায়, ক'দিন ধ'রে তাঁরও তো দর্শন পাওয়া যায় না। তাঁরও কি, তোমার মত, ডবল আপিস হোল না কি?

তিনি তো এ্যাজ ইউজুয়্যাল ডেইলী রাউন্ডে বেরিয়েছেন। আমি বাড়ী ফিরতেই গাড়ী নিয়ে—

ওমা! এই যে নাম করতেই খেঁদিদি। তোমার কথাই

হচ্ছিল ভাই খেঁদি দি। —ধরসুদ্ধ, মায় স্বামী সকলে দণ্ডায়মান হইলেন।

কেবল প্রজাপতি সমাজেই নহে, বিশ্বাস ও দেশদেশ ব্যাপ্ত সভ্য সমাজ মাত্রেই নারীর আগমনে নরগণের "ফল্ ইন্" প্রথা—প্রথা না বলিয়া আইন বলাই সঙ্গত—প্রচলিত আছে। আমাদের দেশের প্রাচীন ব্যবস্থায় গৃহিণী গৃহ-মুচ্যতে পর্যন্ত প্রমোশন পাইয়াছিলেন, তদধিক নহে। বরং তাঁহারা ছিলেন স্বামীগণের ছায়ারূপিণী, পদাঙ্কানুসারিণী ও আজ্ঞাবাহিনী। কর্ণ বৃষকেতুকে কাটিবেন, স্বামীর আদেশে বাৎসল্য, স্নেহ ও বিবেকাদি মূল্যবান পদার্থসমূহ বিসর্জন করিয়া পদ্মাবতী করাতের অন্যদিকটা ধরিলেন। প্রজারা কি একটা কথা কাণাঘুষা করিয়াছে, সীতা পতি-দেবতার আদেশ শিরোধার্য করিয়া চোখে জল ও বক্ষে শ্রীরামচন্দ্রপদারবিন্দ লইয়া গহন বনে চলিলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অতুল্য ধর্মপ্রাণতার কথা কে না জানে? পাশা-খেলায় বাজি ধরিয়া হারিতে হারিতে যখন দেখিলেন নিজের বলিতে একটা কানাকড়িও নাই তখন মহারাজ্ঞী দ্রৌপদীকেই বাজি ধরিয়া বসিলেন। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস সভ্য সমাজ আজ সেই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন। আপিসে, বড় সাহেব ছোট সাহেবের ঘরে ঢুকিলে তাঁহারা চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া না উঠিলেও চলে; স্কুলে মাস্টার প্রবেশ করিলে ছাত্ররা না দাঁড়াইয়াও পার পায় কিন্তু লেডীর আগমনে লর্ড মহোদয়গণের স্ট্যাণ্ড আপ অন্ দি বেঞ্চ অপরিহার্য। "সেকালের দেবদেবীরা সুখী হইয়া তপস্যারত খ্যাতিবানকে "বর নে রে" করেন, লেডীজরাও তেমনি প্রসন্নাননে "বসুন বসুন" রবে বসিবার বর দান করেন।

এবমুহূর্তে মাপ করো শৈল।—বলিয়া মিসেস বোস স্বামীর পানে চাহিয়া—অতিথিগণকে আসন পরিগ্রহের ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন, নরেশ, সুসতা সরকারের কেসটার অর্ডার কি এখনও দাও নি?

প্রজাপতি সমাজের নারী ও নর পরস্পরের নাম ধরিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন। এবিষয়ে তাঁহারা বৈদিক মত, রামায়ণ-মহাভারতের কালের সংস্কৃতি মান্য করেন, ইহা বোধ করি বলা বাহুল্য। কাব্য নাটকাদিতে নায়ক-নায়িকারা যদ্যপি পরস্পরের নাম ধরিয়া ডাকিতে বাধা প্রাপ্ত হইতেন, তাহা হইলে কাব্যাদি গ্রন্থসমূহ যে বহুলাংশে বিরস, বিস্বাদ হইত, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সীতা যদি অশোক কাননে বসিয়া হা রাম, যো শ্রীরাম, হায় রঘুপতিরাঘব অহো হো রামচন্দ্র রবে বিলাপ করিতে না পারিতেন, তাহা হইলে রামায়ণ মহাকাব্যের করুণ রস যে গাঁজিয়া যাইত, তাহাও কি আবার বলিতে হইবে?

মিনিট দুই গম্ভীরভাবে চিন্তা করিয়া লইয়া নরেশ-সাহেব কহিলেন, ফাইল এসেছে বোধহয়, দেখছি।

আমাকে আজও জিজ্ঞাসা করছিলেন।

বোস সাহেব সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিলেন, মেম সাহেব বারেকমাত্র ঊর্ধ্বদিকে চক্ষু তুলিয়া চোখের ভাষাতেই উত্তর দিলেন এবং সাহেব সঙ্গে সঙ্গে সন্ত্রস্ত হইয়া কহিলেন, এখনই দেখছি।

কে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তাঁহার নামটা অনুচ্চারিত অপরিজ্ঞাত রহিয়া গেল বটে কিন্তু সেই যে আঁখি পল্লবটি পলকমাত্র সময়ের জন্য ঊর্ধ্বগামী হইয়াছিল, তাহাতেই সেই অদৃশ্য অথচ মাননীয় ব্যক্তির অস্তিত্ব জ্ঞানী ও গুণীগণের নিকট স্বপ্রকাশ হইয়া গেল। প্রজাপতি বাহিনী মুচকিয়া হাসিলেন।

হ্যাঁ ভাই খেঁদি দি, মিনিস্ট্রি নাকি রি-সাফ্ল হবে?

খেঁদি দি ওরফে মিসেস বোস্ গম্ভীরভাবে কহিলেন, আমি তো কিছু শুনিনি।

তাহলে ও গুজব। তুমি যখন শোননি, তখন নিশ্চয়ই বাজে কথা।—বলা উচিত, প্রজাপতিদিগের মধ্যে পড় প্রজাপতি থাকাই সম্ভব।

অতঃপর গৃহস্বামিনী অতিথিবৃন্দের উদ্দেশে প্রশ্ন করিলেন, তোমাদের কিছু দিয়েছে?—তাঁহাদিগকে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া খেঁদি দি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, আচ্ছা নরেশ, তুমিও তো বেশ। বয়কে ডেকে ড্রিঙ্ক দিতে বলতে পারনি?

আজ থাক ভাই, আজ আমরা চলছি।—বলিয়া তাঁহারা চলিতে আরম্ভ করিলেন। ড্রিংক কোন এক অদৃশ্য ভবিষ্যতের জন্য রিম্যাণ্ডেড হইল। বাধ্য হইয়া ইঁহাদিগকেও দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত যাইতে হইল।

ফিরিয়া আসিয়া বসিয়াছেন মাত্র, বয় কাফি ট্রে লইয়া কক্ষে দর্শন দিল প্রথমে মেম সাহেবের সম্মুখে ট্রে ধরিতেই মেমসাহেব তপ্ততৈলকটাহে কৈ মাছের মত ছিটকাইয়া উঠিয়া কহিলেন, কেৎনা চিনি নিকাল দিয় হৈ?

হাম না নিকাল করা মেমসাব। আয়া বাহার ক'রে মুজকা দিয়া।—বেচারা বাঙ্গলাদেশের বাঙ্গালী মুসলমান, হিন্দী মিন্দি জানে না; কিন্তু "সাহেব" বাড়িতে রাষ্ট্রভাষা ভিন্ন অপর ভাষায় কথা কহিলে চাকরী আধ-বেলাও টিঁকবে না প্রাণপণ যত্নে তাই এ পণ্ডশ্রম। সাহেব মেমেরা কিছুকাল পূর্বেও পুত্র কন্যার সহিত মাঝে মিশিলে, ইংরাজীর ফাঁকে

ফাঁকে একটু আধটু মাতৃভাষায় কথাবার্তা কহিতেন, হিন্দী আসিয়া গলাধাক্কা দিয়া তাহাকে বাড়ী ছাড়া করিয়াছে। তাই বলিয়া বাঙ্গলার প্রতি বিদ্বেষ অনুমান করিবারও কোন কারণ নাই। প্রজাপতি পরিষদ সদস্যগণের ড্রয়িংরুমের শো-কেসে রবীন্দ্র গ্রন্থাবলীই তাঁহাদের মাতৃভাষার প্রতি প্রকৃষ্ট নিদর্শনস্বরূপ বিরাজিত থাকিতে দেখা যাইবে।

মেম সাহেব স্বামীর উদ্দেশে কহিলেন, আহলাদী প্যাটার্ণ আয়াটার নবাবী চাল বেড়েই চলেছে দেখছি। তারপর বয়ের পানে চাহিয়া কহিলেন, সুবে ঔর চিনি মৎ নিকালো। ইস্‌সেই হো যায়গা।

জী হুজুর বলিয়া লোকটা দু'পেয়ালা কফি দু'জনের হাতে তুলিয়া দিতে পারিলে বাঁচে।

মেম সাহেব কহিলেন, সুলতার অর্ডারটা কালই আবার জানিয়ে দিতে হবে।

সাহেব স্ত্রীর পানে গভীর অর্থসূচক দৃষ্টিতে চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করিতেই মেম সাহেব ঢলিয়া কাঁধে কাঁধ হইয়া কৃত্রিম কোপভরে কহিলেন, ডোণ্ট্-ই বি সিলি, নরেশ।

ও নো, ও নো, কিন্তু ব্যাপারটা কি?

যাও না জিজ্ঞাসা করো গে না, বলিয়া আর একবার রসিয়া গলিয়া ঢলিয়া পড়িলেন; পুনরায় কাঁধে কাঁধে মিলন।

কাফির কাপ খালি হইবামাত্র মেম সাহেব পুনরায় সাহেবের বাটি পূর্ণ করিতে উদ্যত হইলে নরেশ বলিলেন, হাফ্ (কাপ্) প্লিজ।—বলিয়া সাহেব সিগ্রেট ধরাইয়া কৌটা এবং দেশলাই মেম সাহেবের দিকে অগ্রসর করিয়া দিলেন। মেম সাহেবও ধরাইলেন এবং ফুৎ ফুৎ করিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিলেন, তুমি চেষ্টা করবে তো? তা, বেশী দেরী ক'রো না যেন, কুনাল রায়েদের ওখানে ডিনার য়্যাক্‌সেপ্ট করেছি মনে আছে তো?

মনে আছে কিন্তু—

কিন্তু কি আবার? দেরী হবে? না, না, দেরী করা চলবে না, তোমাদের দু'জন মিনিস্টারও আসছেন, সতী দুপুরে ফোন করছিল, আমাকে একটু আগে যেতে ব'লে-ছিল, টেবিল-টেবিল সাজানো টাজানো দেখে দেবার জন্যে বলছিল। করেনি তো কোনদিন, জানে না।

তা দেখ খেঁদি, তুমি গাড়ী নিয়ে চলেই যাও না-হয়— তুমি?

আমার যেতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে না। তা ছাড়া একগাদা কাজ রয়েছে—

কাজ আজ থাক্; কিন্তু ইচ্ছে হচ্ছে না কেন, শুনি?

সেদিন বললুম তো, ভুলে মেরে দিয়েছ বুঝি?

কি বললে? ওহ, কুনাল এসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারীর জন্যে চেষ্টা করছে, এই তো?

সাহেব বলিলেন, হ্যাঁ কিন্তু ওর হবে না।

মেম সাহেব সোহাগভরে কহিলেন, আহা, দাও না, বাবা, ক'রে?

ওর সিনিয়র লোক রয়েছে, এ দফায় ওর কোন আশা নেই।

তবু দেখ না, যদি হয় সতী খুব খুশী হবে।

পরে দেখা যাবে, বলিয়া সাহেব আফিস ঘরের উদ্দেশে যাইতেছিলেন, মেম সাহেব বলিলেন, আধঘণ্টার বেশী দেরী করা চলবে না। বুঝলে?

দেখি, বলিয়া সাহেব প্রস্থান করিলেন।

সাহেবের অনিচ্ছা যত প্রগাঢ় হোক, মেম সাহেবের ইচ্ছার তলে তাহা সমাধিস্থ হইল এবং নির্ধারিত সময়ে মেম সম-ভিব্যহারে সাহেব গাড়ীতে উঠিয়া মিস্টার কুনাল রায়ের বাড়ীর ঠিকানা নির্দেশ করিলেন।

গাড়ীতে মেম সাহেব জিজ্ঞাসিলেন, সুলতা সরকারের ফাইল দেখলে?

সাহেব বলিলেন, সময় পেলাম কৈ? ঘরে ঢুকেই দেখি বোর্ডের ইঞ্জিনীয়ার ব্যানার্জি ব'সে। ভাইস চেয়ারম্যান তাকে অপমান করেছে, ব্যানার্জি রেজিগনেসন দিতে এসেছিল।

মেম সাহেব নীরব। সাহেব বলিতে লাগিলেন, তোমার বোনাই—সুধাকরটি একটি ওয়ার্থলেস্। গোলমালটা সেই-খান থেকে মিটিয়ে দিলেই পারতো, তা নয়, দিয়েছে আমার কাছে ঠেলে। একেবারে ট্যাক্টলেস্।

মেম সাহেব বলিলেন, কাল সকালেই সুলতা সরকারের যা হয় একটা অর্ডার দিও; আমাকে আবার ফোন ক'রে জানাতে হবে।

যা-হয় একটা অর্ডার হোলে তো এখনই পারি; কিন্তু তা যে হবার নয়। মাগীটাকে তুমি চেন নাকি? কি রকম কিছু জান? একবার ডেকে দেখবো নাকি? কি রকম দেখতে টেখতে—

অত রসে আর কাজ নেই।

কেন? সন্দেহ হয় নাকি?

গুণে ঘাট আছে না কি? দেখতে ভাল, আমি দেখেছি।

কোথায়? কোথায় দেখলে?

আজই দেখেছি। কোথায়—নাই বা শুনলে।

ওঃ, বুঝেছি—ওখানে।

এই "ওখানে"টা ওখানেই রহিয়া গেল, পরিস্ফুট করি-

বার কোনই প্রয়োজন কেহই অনুভব করিলেন না। কাশী গিয়াছিলাম বলিলে যেমন আর বিশ্বেশ্বর দর্শন করিয়াছি না বলিলেও চলে, সরকারী মহলে "ওখানে" অর্থও তদ্রূপ।

মন্ত্রীমহোদয়দ্বয় নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, আসিবেন অঙ্গীকারও করিয়াছিলেন কিন্তু যথাকালে অনাগমন। বারংবার ফোন করিয়া তাঁহাদের অথবা তাঁহাদের অবস্থিতির হদিস মিলিল না। কুনাল ও কুনালপত্নী সতীর মনোকষ্টের অবধি রহিল না সত্য কিন্তু দুঃখভারের উপরেও দুঃখ এই যে, কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া এবং মুখে মিষ্ট ভাষার প্রলেপ মাখাইয়া অন্যান্য অতিথি সৎকারে প্রবৃত্ত থাকিতে হইল। হতাশা কিরূপ গভীর, তাহা কুনালের একটি কথাতেই প্রকাশ।

এইচ এম্ ফিনান্স আমাদের এইচ এম্‌কে আমার জন্যে বলবেন বলেছিলেন এবং কিভাবে বলবেন আপনার সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্যেই আজকের ডিনার। এলেন না দেখে বোধ হচ্ছে, বলবেন না।

নরেশ হাঁ না কোন কথাই কহিলেন না। মনস্তাপই ভাগ্যলিপি যাহার, অধিক সন্তাপিত করা কেন আর?

কিন্তু, কুনাল ছাড়িবার পাত্র নহে। বলিল, কাল আর একটা য়্যাটেম্পট্ করি, কি বলেন?

খেঁদি দি বলিলেন, কেন করবে না? নিশ্চয় করা উচিত।

কুনাল মিনতি করিয়া বলিল, এইচ এম্ কাল যদি আসেন, আপনাদের ফ্রি আছে তো?

খেঁদি দি'র বদান্যতার তুলনা নাই; বলিলেন, সে আমি ফ্রি করে নোব, তার জন্যে তুমি ভাবছো কেন! তুমি মন্ত্রীদের ধরো গে যাও।—অর্ধমুহূর্ত থামিয়া পুনরায় কহিলেন, তুমি তোমার নিজের এইচ এম্‌কে পাকাতে পারলে না কুনাল, তা হ'লে আর দেখতে হতো না!

কুনালের উত্তর বোধ করি প্রজ্ঞাবলেই খেঁদি দিদির পতিদেবতার জানা ছিল। তিনি যে মুহূর্তে বলিলেন, চলো খেঁদি, অনেক রাত হোল—ঠিক তখনই কুনাল কাকুতি করিয়া কহিল, আমাদের এইচ এম্ তো দাদার কথায় ওঠেন, দাদার কথায় বসেন।

নরেশ সাহেব তৎক্ষণে চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বৈদ্যুতিক পাখাখানার ঠিক তলদেশে দাঁড়াইয়া চুরুটিকায় অগ্নি সংযোগের চেষ্টা করিতেছেন, পুনঃ পুনঃ দেশলাই কাঠি নিভিয়া যাইতেছে, কাজেই অধিকতর অধ্যবসায় ও মনোনিবেশের প্রয়োজন হইয়াছিল, অন্য কথা কাণে ঢুকিবার তখন উপায় ছিল না। সিগ্রেট প্রজ্বলিত হইবামাত্র পাইপ সমেত সেটাকে এক কোণে দাঁতে দাঁতে চাপিয়া ধরিয়া খেঁদি দি'কে বলিলেন, এসো।

খেঁদি দি বলিলেন, কুনাল কি বলছে শুনলে তো?

কুনাল বলিল, আমার এইচ এম্ তো দাদার হাতের—

কথাটা সম্পূর্ণ হইতে পারিল না। এক রাশ ধোঁয়ার সঙ্গে অস্বীকৃতিটা কুনালকে যেন ধাক্কা দিয়া থামাইয়া দিল। নরেশ সাহেব যাহা বলিলেন, তাহা এই—Don't you think so.—বলিতে বলিতে দ্বারের অপরদিকে এবং আরও কয়েকপদ দ্রুত চলিয়া মোটরের দ্বার খুলিয়া ড্রাইভারের পার্শ্বে দণ্ডায়মান।

খেঁদি দি অগ্রে, সাহেব তৎপশ্চাতে গাড়ীতে বসিয়া সস্ত্রীক কুনালকে বারংবার ধন্যবাদ ও শুভরাত্রি বিজ্ঞাপিত করিয়া নিতাইকে বলিলেন, চলো। কুনালরা করুণ দৃষ্টিতে আদ্যাশক্তি মহাশক্তির উপর ভারার্পণ করিয়া স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইল। খেঁদি দি মুখ বাড়াইয়া অভয়ার অভয় বাণী স্বরূপ বলিলেন, আমাকে ফোনে জানিও।

গাড়ীতে, হোর মিলার কোম্পানীর "কিন্নরী" স্টীমারের মত দুটা চোঙ্গা হইতেই মধ্যে মধ্যে হুস্ হুস্ শব্দ ও ঘন ঘন ধূমোদ্গীরণ হইতেছে, অন্যথা নিঃশব্দ। নিতাই ড্রাইভারই সর্বপ্রথম সে স্তব্ধতা ভগ্ন করিয়া কহিল, কুনাল মেম সাহেব এক ফাঁকে আমাদেরও খাইয়ে দিয়েছেন, স্যার।

সংবাদটি খেঁদি মেম সাহেবের নিকট স্বাদু বা হৃদ্য নহে; পরন্তু ইহাকে বদ ও ব্যয়বহুল দৃষ্টান্ত বলিয়া বোধ হইল। অন্ধকারে চক্ষুর ভ্রূকুটি দৃষ্ট হইল না, তবে কুনুই ভক্ষণ করিয়া সাহেব খেঁদির আপত্তির গুরুত্ব বুঝিতে পারিলেন এবং অন্ধকারেও ঘাড় নাড়িয়া ও মনে মনে খেঁদিকে সমর্থনও করিলেন।

নিতাইচন্দ্রের সন্তোষ ও আনন্দ যেন উথলিয়া পড়িতেছিল, নীরবতা—ড্রাইভার জাতির সর্বপ্রধান গুণ যে নীরবতা, আজ আর সে বরদাস্ত করিতে পারিতেছিল না; অতীব প্রফুল্ল কণ্ঠে কহিল, ও'রা সাহেব মেম দু'জনেই বড় ভাল লোক, স্যার। দেখা হ'লেই কেমন আছি, বাড়ীর সকলে কেমন আছে, ছেলেপুলেরা কেমন আছে সব খবর নেন্।

পশ্চাদ্দিক হইতে শব্দ সাড়া আসিল না। কিন্তু তাহার উৎসাহ স্রোত তাহাতে ব্যাহত হইবার নহে। পূর্ববৎ কহিল, স্যার, কুনাল সাহেব এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী হবেন তো?

সাহেব উত্তর দিলেন না। মেম সাহেব আর একবার কুনুই করিলেন।

নিতাই আবার বলিল, সাহেব ইচ্ছে করলেই পারেন; সবাই জানে ওটা সাহেবের হাতেই। ওনারা বড় উঁচু দরের লোক, স্যার, ও'র কাজটি হ'লে গরীব দুঃখীদের অনেক উপকার হবে।

নির্বোধ মোটর ড্রাইভার—মাত্রাজ্ঞান আদৌ নাই। বড় সাহেবের নিকট বড় সাহেব ভিন্ন অন্য লোককে স্বর্গে তোলার অপরাধ যে কত বড়, সে বোধটুকুও গো-মূর্খটার নাই। অন্ধকার না হইলে সামনের দর্পণে ভ্রূকুটি লক্ষ্য করিয়া হতভাগার হাতপাগুলা পেটের মধ্যে ঢুকিয়া যাইত। সিগ্রেটে টান যে ক্রমশঃ সজোর ও মুহুর্মুহু হইতেছে কেন, এটুকু বুঝিতে পারাও তাহার উচিত ছিল। "ডেঞ্জার সিগন্যাল" দৃষ্টে বাক্যস্রোত থামাইতেও পারিত; কিন্তু গাড়োয়ান তো, কতটুকুই বা বুদ্ধির দৌড়!

সে বলিতে লাগিল, তবে সাহেব মেম সাহেব যে এসেছেন, ডিনার খেয়েছেন, তাইতেই আমার মন বলছে কুনাল সাহেব গদী পেয়ে গেছেন। নইলে, তাঁরা আসতেনই না। খেতেনও না।

আর সহ্য হইল না। বেশ হাসিয়া হাসিয়া রসিয়া রসিয়া সাহেব কহিলেন, না হে না, তোমরা জান না। আমরা খাই-ও বটে, ডোবাই-ও বটে!

নিতাইচন্দ্রের মনে হইল, তাহার স্টিয়ারিঙে জ্যাম হইয়া গিয়াছে; অথবা তাহার হাতেই পক্ষাঘাত হইয়াছে, গাড়ী বুঝি অচল হইল। সদ্যশ্রুত শব্দ কয়টি পরিপাক করিতে গিয়া দেখিল বদ বো—চোঁয়া ঢেঁকুর উঠিতেছে। হতভম্ব হইয়া ভাবিতে লাগিল—খাই-ও বটে, ডোবাইও বটে! এরা কেমন মানুষ গা? চক্ষু লজ্জাটাও কি টেমস নদীতটে পিতৃতর্পণে উচ্ছুগ্‌গু দিয়া আসিয়াছে? খায়-ও, ডোবায়-ও! তবে বুঝি ইহারা আলুনী খায়! গাড়োয়ানের বুদ্ধি, কত আর ভাল হইবে? [ক্রমশ

★

বর্ত্তমান ও অতীত

শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

গরবে গম্ভীরভাবে কহে বর্ত্তমান:
"হেরগো সকলে করে মোর জয়গান।
নির্লজ্জ! কেন যে তবে রয়েছ দাঁড়ায়ে
মলিনতা কাতরতা চৌদিকে বাড়ায়ে!"

হাসিয়া অতীত কহে, : ওহে বর্ত্তমান
আমার বিহনে তব কোথায় সম্মান?
ভাণ্ডার সঞ্চিত মোর সুধাময়ী স্মৃতি।
প্রতিপল তব করিছে মধুর নিতি॥"

তেইশে জানুয়ারী

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

বছর দুয়েক আগে লণ্ডন-প্রবাসী বাঙালীদের ঘরে ঘরে হঠাৎ যেন বিদ্যুৎ-শিহরণ খেলে গেল। কোনো সাময়িক দৈনিক পত্রিকায় নাকি প্রকাশিত হয়েছে যে অমুক দিন বেতারে উত্তর চীন থেকে সুভাষচন্দ্র বক্তৃতা করবেন।

লোকে কাজ ভুললো, কর্তব্যে অবহেলা করলো, নিজেদের সুখ-দুঃখ ভুলে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগলো সেই নির্দিষ্ট দিনটির বিশেষ সময়ের জন্যে।

খবর শুনেছো হে?

হ্যাঁ, তোমার রেডিওটা ঠিক আছে তো?

দেখা যাক—অনেকদিন পর আবার সেই গলা—দেখ না কি হয় এবার—

এমনি আলোচনা চলতে লাগলো চারপাশে। আর এই কয়েক লাইনের সংক্ষিপ্ত সংবাদে লণ্ডনের সমগ্র ভারতীয় মহলের রূপ যেন নিমেষে বদলে গেল।

এ সংবাদ লণ্ডনের সাময়িক দৈনিক পত্রিকায় সত্যি প্রকাশিত হ'য়েছিলো কিনা এবং সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠস্বর উত্তর চীন থেকে নির্দিষ্ট দিনের বিশেষ সময়ে বেতারে ভেসে এসেছিলো কিনা—সেকথার উল্লেখ বর্তমান আলোচনার গণ্ডীতে অবান্তর।

কিন্তু কেন এই কৌতূহল? এই উত্তেজনা? এই শিশুসুলভ চাঞ্চল্য? শুধুমাত্র নেতাজী বসুর নাম উল্লেখে কেন সমস্ত শরীরে ব'য়ে যায় শিহরণের ঝড়?

যিনি জন্মগ্রহণ করেছেন ভারতবর্ষে, বেড়ে উঠেছেন এই দেশে, উপলব্ধি করেছেন ভারতীয় দর্শনের মূল সূত্র—তিনি যখন যেখানে যে অবস্থায় থাকুন না কেন—সু-ভা-ষ-চ-ন্দ্র—এই কয়টি অক্ষর তাঁকে ক্ষণকালের জন্যে দিশাহারা করবেই।

অথচ ভারতমাতা দেশপ্রেমিক সৃষ্টির কাজে কোনোদিনও কার্পণ্য করেননি। আমরা ধ্যান করেছি মহাত্মা গান্ধীকে, প্রণাম করেছি দেশবন্ধুকে, শ্রদ্ধা ঢেলেছি জহরলালকে কিন্তু ভালোবেসেছি সুভাষচন্দ্রকে। কিসের প্রভাবে এতো অল্প বয়সে এতো সহজে তিনি সমগ্র দেশবাসীর হৃদয় জয় করে নিলেন? বুকভরা স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসা কেন আমরা তাঁকে এমনি ক'রে দিতে পারলাম? কোথায় তার উৎস?

আসলে ভারতবাসীমাত্রেই সন্ন্যাসী। ভারতের জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ছড়ানো রয়েছে সন্ন্যাসের বীজ। আমাদের মনের চেতনে কিংবা অবচেতনে নিঃশব্দে কখন ঝ'রে পড়েছে সে-বীজ। সংসারের রূঢ় প্রয়োজনে আর বাস্তবের কঠিন আঘাতে সর্বক্ষণ আমরা আত্মবিস্মৃত। কিন্তু কোনোদিন শ্রাবণের বর্ষণমুখর রাত্রে কিংবা জীবনের কোনো নিঃসঙ্গ অলস মুহূর্তে সহসা একসময় যেন আমাদের ঘুম ভেঙে যায় আর ক্ষণিকের জন্যও উপলব্ধি করি, ভারতের ঐতিহ্য অজ্ঞাতে আমাদের দীক্ষিত করেছে ত্যাগের মন্ত্রে আর মনে হয় আমরাও যেন হেলায় সমস্ত ছেড়ে যেতে পারি মহাজীবনের সন্ধানে।

ভারতবাসীর আত্মোপলব্ধির সেই দুর্লভ সোনার মুহূর্ত যেন মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছিলো সুভাষচন্দ্রের দেহের অপূর্ব জ্যোতিতে। আর তার মধ্যে আমরা দেখেছিলাম ভারতবর্ষের সংস্কৃতির পরিপূর্ণ প্রকাশ।

বস্তুত, সুভাষচন্দ্র সন্ন্যাসী। তাঁর দেশপ্রেম—তাঁর রাজনীতি—এসবের অনেক ঊর্ধ্বে তাঁর জীবন। আমাদের মধ্যে এমন অনেক মানুষ আছেন সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক মতামতের সঙ্গে যাঁদের আগাগোড়া অমিল। তবু তারা তাঁকে ভাল না বেসে পারেন না, কারণ তাঁরা ভারতীয় আর সুভাষচন্দ্র ভারতীয় ঐতিহ্যের মূর্ত প্রতীক।

ভারতের ভূমিতে তাঁর মতো মানুষের আবির্ভাব তো

নতুন নয়। ইতিহাসের প্রথম থেকে এমন অনেক সন্ন্যাসী মহত্তর জীবনের সন্ধানে সংসারের সব বন্ধন ক্ষয় করেছেন। সেই নমস্য মহামানবেরা আমাদের মনের অভ্যন্তরে সগৌরবে বিরাজ করছেন। তাই সুভাষচন্দ্র আমাদের বড়ো পরিচিত—এতো কাছের মানুষ।

কর্মজীবনের সুরু থেকেই দেশবাসী বুঝেছিল সুভাষচন্দ্র ভারতের মুক্তি সাধনায় কঠোর সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন। সংসারে তাঁর কোনো বন্ধন ছিলো না, কারুর প্রতি তাঁর কোনো দায় ছিলো না, কারাগারে কেটেছিলো তাঁর যৌবনের উজ্জ্বল দিনগুলি। অথচ এই মুক্তি সাধনার কঠোর সন্ন্যাস তাঁর মধুর ব্যক্তিত্বে খুলে ফেলেছিলো কাঠিন্যের আবরণ। লোকালয় ছেড়ে তাঁকে নির্জনে সাধনার জন্য যেতে হয়নি—সর্বক্ষণ মনের কাছে থেকে তিনি অনুপ্রাণিত করেছিলেন সকল মানুষকে। তাই তিনি যেন আমাদের আত্মার আত্মীয়—ঘরের মানুষ—একান্ত আপনার জন।

বিংশ শতাব্দীর প্রায় সুরুতেই যখন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শিকড় ভারতের ভূমিতে আরও দৃঢ় হ'য়ে উঠেছে, আমাদের শিক্ষা সংস্কৃতি—এমন কি আমাদের মনুষ্যত্ব আচ্ছন্ন হ'য়ে গেছে বণিক-সভ্যতার উগ্র তেজে—যখন আমরা ভুলেছি, ছেড়েছি, হারিয়েছি আমাদের সকল কিছু—তখন সুভাষচন্দ্র তাঁর প্রতি পদক্ষেপে দেশবাসীর ঘোর কাটিয়ে দিলেন—সন্ন্যাসের জ্যোতিতে ম্লান ক'রে দিলেন আমাদের অন্যান্য আকর্ষণ। ভারতবর্ষের সেই যুগ-সন্ধিক্ষণে, দেশের মৃতপ্রায় সংস্কৃতির মাঝে তিনি যেন আমাদের চোখ ফুটিয়ে দিলেন নতুন ক'রে কানে দিলেন ভারতবর্ষের সেই আদিম মন্ত্র, মানুষের মুক্তি ভোগে নয়—ত্যাগে। সুভাষচন্দ্রের জীবন ত্যাগের, ধ্যানের, উৎসর্গের। এমন জীবন যাপন করতে একমাত্র তিনিই পারেন যিনি আদর্শ ভারতীয়। আর সুভাষচন্দ্র আদর্শ ভারতীয় বলেই ভারতবাসী মাত্রেই তাঁকে ভালোবাসে।

আবার তেইশে জানুয়ারী এলো! সুভাষচন্দ্রের জন্মের প্রথম শুভক্ষণ। এই অষ্টম গর্ভের সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার আগের রাত্রে জননীকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে কোনো দেবতা নাকি ব'লেছিলেন, আমি এসেছি তোমার গর্ভে, আমার কোনো কাজে কোনোদিনও তুমি বাধা দিও না—

সেই সন্ন্যাসীকে—সেই দেবতাকে সর্বান্তকরণে আমরা স্মরণ করি—

ধুপচন্দনের গন্ধে চারপাশ ভ'রে যাক—শঙ্খে বাজুক আহ্বান—ঘরে ঘরে অনুরণন রেখে যা'ক মহাওঙ্কার ধ্বনি—

"হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে!"

★

সুভাষচন্দ্র, তোমার রাষ্ট্রিক সাধনার আরম্ভক্ষণে তোমাকে দূর থেকে দেখেছি। সেই আলো আঁধারের অস্পষ্ট লগ্নে তোমার সম্বন্ধে কঠিন সন্দেহ জেগেছে মনে, তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে দ্বিধা অনুভব করেছি, কখনো কখনো দেখেছি তোমার ভ্রম, তোমার দুর্বলতা, তা নিয়ে মন পীড়িত হয়েছে। আজ তুমি যে আলোকে প্রকাশিত, তাতে সংশয়ের আবিলতা আর নেই, মধ্য-দিনে তোমার পরিচয় সুস্পষ্ট। বহু অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করেছে তোমার জীবন, কর্তব্যক্ষেত্রে দেখলুম তোমার যে পরিণতি তার থেকে পেয়েছি তোমার প্রবল জীবনীশক্তির প্রমাণ। এই শক্তির কঠিন পরীক্ষা হয়েছে কারাদুঃখে, নির্বাসনে, দুঃসাধ্য রোগের আক্রমণে, কিছুতে তোমাকে অভিভূত করে নি, তোমার চিত্তকে করেছে প্রসারিত, তোমার দৃষ্টিকে নিয়ে গেছে দেশের সীমা অতিক্রম ক'রে ইতিহাসের দূরবিস্তৃত ক্ষেত্রে। দুঃখকে তুমি ক'রে তুলেছ সুযোগ, বিঘ্নকে করেছে সোপান। সে সম্ভব হয়েছে, যেহেতু কোনো পরাভবকে তুমি একান্ত সত্য ব'লে মানোনি। তোমার এই চারিত্র শক্তিকেই বাংলাদেশের অন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত ক'রে দেবার প্রয়োজন সকলের চেয়ে গুরুতর। —রবীন্দ্রনাথ

মনের মানুষ

শ্রীজনরঞ্জন রায়

সেবার ঝুলনে গিয়া নবদ্বীপে আটকাইয়া পড়ি পুরো তিন দিন।

কেন?...তাহাই বলিতেছি:

শোনা গেল একটা জিয়ন্ত নাটক-অভিনয় শুরু হইয়াছে সেখানকার সহজিয়া পাড়ায়, এমনই ঘটনাটা যে, আমাদের নড়িতে দিল না যবনিকা না-পড়া পর্যন্ত।

এই সহজিয়াদের আস্তানা বাউল ডাঙ্গায়। ন'দের লোক তাদের বলেন সমাজের জঞ্জাল। তাঁরা ছায়া মাড়ান না এদের।

অভিনয়টা দেখিয়া মনে হইল একটা অগ্নি-প্রলুব্ধ পতঙ্গ পুড়িয়া মরিতেছে...নারীর মোহের ক্ষণিকতায় আত্ম-বিলুপ্তি। প্রেম নিয়া মরা-বাঁচার এরূপ অভিনয় তো কত-ভাবে কত জায়গায় হইতেছে। তা'তে নূতনত্ব কী আছে? —এরূপ কথাও মনে যে আসে নাই তা' নয়। কিন্তু দেখা-মাত্র আমরা-তো-আমরা, আমাদের তর্কবাগীশ অধ্যাপক বন্ধু সঞ্জয় পর্যন্ত বেশ আবিষ্ট হইয়া গেল। যদিও বলিতে লাগিল—প্রেম বস্তুটা মানুষের দুর্বল মুহূর্তে একটা ধোঁকা ...তা' নিয়ে বাড়াবাড়ি কোরে প্রাণ খোয়ানো শুধু কাগজে-কলমেই সত্যি...সুস্থ মাথার লোক তা' করে না...কিন্তু এই লোকটার কাণ্ড দেখে সে ধারণা বদলে যায় বুঝি!

আমি বলিলাম—এদের সাধনার অঙ্গ বোধ হয় এইভাবে আত্মবিলুপ্তি।

সঞ্জয় বলিল—উদ্দাম বিলাসের রাত কেটে গেলে পড়ে থাকে শুধু ভাঙা দেহমন...তখন খোঁয়ারি ভাঙে...এও তো তাই...একে সাধনা বলতে চাও...বলো তোমরা সব ভক্ত-বিটলে আর সাহিত্যিকরা...আমার মনে হয় মাথা খারাপ এই লোকটার।

আমরা শুনিতে পাইয়াছিলাম একটা সহজিয়া কেবল তার পিঠে চাবুক মারিতেছে আর গান গাহিয়া ডাকিতেছে তার অবিশ্বাসী সঙ্গিনীকে। কাজেই আমরা তিন জনে বাউল ডাঙ্গায় চলিলাম। শ্মশানঘাটের কাছে এই বাউল-ডাঙ্গা। লোক জুটিয়াছে একটা দোচালার কাছে। মাথায় ঝুঁটী ফর্সা রোগা একটা লোক। বয়স বত্রিশ-তেত্রিশ বছর। সে গান ধরিয়াছে—

মনের মানুষ পালিয়ে গেল কার দোষে?
তোর দোষে রে—তোর দোষে...
ওরে আউলে সর্বনেশে
ওরে বেহুঁশ, তোর দোষে।
তোরে চাবুক মারি কশে।
যে আপন ধনে রাখতে নারে
সে মানুষ হ'ল কিসে?
তারে মারো চাবুক কশে।।

সে এইভাবে গান গাহিতেছে, আর দুই হাতে দুইটা কঞ্চি লইয়া নিজের পিঠে মারিতেছে। তাহার পিঠ ফাটিয়া রক্তারক্তি হইয়াছে। সে পিঠের জ্বালায় লাফাইতেছে, আর সেই দোচালাটার সম্মুখে ছোটাছুটি করিতেছে রাস্তার উপর দিয়া। ঘণ্টাখানেক এই দৃশ্য দেখিলাম। প্রথমটা কৌতুক হইতেছিল। উপভোগ করিতেছিলাম গাঁজারু বাউলের কাণ্ড মনে করিয়া। শেষে ভাবিলাম এই আত্ম-নির্যাতন হয়তো হাসিয়া উড়াইয়া দিবার মতো নয়, লোকটা মনে খুব আঘাত পাইয়াছে নিশ্চয়।

সে পায়চারি করিতেছিল যে চালাঘরটার সামনে, লোকে বলিল ছুঁড়ীটা ঐখানে লুকাইয়াছে। লোক ঝুঁকিল সেই দোচালার দিকে। উঁচু দাওয়া। একটা সহজিয়ার আখড়া, আখড়াধারী মোহন বাউল। বেশ বড় আখড়া। আলখিল্লা-পরা নোংরা সহজিয়ার দল গাঁজার ধোঁয়ায় অন্ধকার করিয়াছে চালাটা। রঙিন আলখিল্লাপরা নধরকান্তি দাড়িওয়ালা মোহন বাউল একটা উঁচু বেদীতে বসিয়া গাঁজায় দম দিতেছে। একটু দূরে ডাহিনে আর একটা উঁচু বেদীতে বসিয়া আছে পরিষ্কার আলখিল্লাপরা বেশ সুন্দরী একটি স্ত্রীলোক। তার বয়স চব্বিশ-পঁচিশের বেশি হইবে না। লোকে বলিল —ঐ মেয়েটাই তো বেড়াতো হরিদাস বাউলের সঙ্গে...আজ পালিয়ে এসেছে এখানে মোহনের আখড়ায়। শোনা গেল মোহনের তিনটা সেবাদাসী ক্রমে-ক্রমে পলাইয়াছে, এইটি চতুর্থ, মোহন গাঁজার কলকেটা একজন ভক্তের হাতে দিয়া গান ধরিল—

কা'র মনের মানুষ কেড়ে নিলাম
তা' তো জানি না!
আমার মধ্যে মানুষ আছে—

লালশশী জেগে আছে,
যার পিরীত আছে হে'থায় আসে
কারও আসার নাই মানা।
প্রেম পেলে প্রাণ আসে সেথায়
পিরীতের এই কারখানা।।

দেখা গেল স্ত্রীলোকটার দৃষ্টি সম্মুখের দিকে...মুখে একটা দারুণ দৃঢ়তা...তার ঠোঁট দুইটা কাঁপিতেছে।

অস্তাচলের গোধূলি পশ্চিম আকাশের আলোটাকে যেন প্রেতের ডানা দিয়া ঢাকিয়া দিল। আমাদের প্রাণেও একটা আলো-আঁধারি নামিয়া আসিল। কেবল ভাবিতেছি—এই নারীটা এক জায়গায় হাহাকার তুলিল...আর এক জায়গায় হাসি ফুটাইল!

ফিরিবার পথে শুনিলাম এই বাউলডাঙ্গায় এরূপ বিসদৃশ ঘটনা রোজ ঘটিতেছে, তবে এমন ঘটা করিয়া কেহ জানায় না যেমন জানাইতেছে এই হতাশপ্রেমিক সহজিয়াটা। একজন বলিল—ওদের সব খবর আমি জানি...আমি ডাক পিওন...ঐ পুরুষটা নাম নিয়েছে বটে হরিদাস বাউল, কিন্তু ডাকঘরে জানিয়ে রেখেছে তার নাম হরেন ঘোষ...স্ত্রীলোকটা জানিয়েছে তার নাম রমা দে।...বেশ লেখাপড়া জানে দুজনে। ...হয়তো স্কুল কলেজ থেকে পালিয়ে এসেছে...এসে এই চক্করে পড়েছে।...মাসে মাসে এদের মনি-অর্ডার আসে। এক জন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলিলেন—জানেন তো আপনারা চক্কর... জানেন বৈ' কি...দখিণে লোক আপনারা ভূকৈলেশের দৌলতে বেশ জানেন চক্কর।...কর্ত্তাভজার দল মশাই...এখানে ওদের ধাড়ি হচ্ছে ঐ মোহনখেপা মোহন বাউল।...নেশা আর মেয়েছেলের—বাছবিচার নেই।...আবার কথায় কথায় দেহতত্ত্বের গান বাঁধে। কোন ভদ্রলোক নেই এ পাড়ায়।...আমরা ব্যাপারী...পাশের গাঁ থেকে যাতায়াত করি এই পথ দিয়ে।

এতো সব শুনিয়াও হরিদাস বাউলের উপর মমতা কমিল না আমাদের।

একটা সরাই বাড়িতে উঠিয়াছিলাম। রাত্রে কয়েক জায়গায় ঝুলন দেখিলাম। সকালে উঠিয়াই সকলে বাউলডাঙ্গায় ছুটিলাম। হরিদাস গান ধরিয়াছে—

তোর ভালবাসার বস্তুটারে চিনলি কিরে?
ও মন, বেঁধে তারে রাখতে কে পারে—
পালিয়ে যায় সে বারে বারে।
তোর সব কিছু তায় দিতে হবে
তাতেও সে না খুশি হবে,
তাকে মাথায় ক্রোরে নাচতে হবে—সহস্রারে।।

গঙ্গায় স্নানার্থিনী মহিলারা মুখ টিপিয়া হাসিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। একটি অল্পবয়সী মহিলা বলিতে বলিতে চলিয়াছেন—ছুঁড়ীটার আক্কেল দেখে বাঁচিনে... লোকটা বিনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদছে, একবার চোখেও দেখে না ...তবে একত্তরে ঘর বেঁধেছিলি কেন? একজন সমবয়সী তরুণী তাহাকে বলিলেন—তোর দরদ হয়ে থাকে তো রমার গদি তুই-ই নে-না!

যতই দিন বাড়িতেছে, ভিড়ও বাড়িতেছে। গত রাত্রের দেখা সেই প্রৌঢ় ব্যাপারী বলিলেন—দুপুর রাতে বাড়ি ফিরছি দোকান সেরে, দেখি হরিদাসের ছুঁড়ীটা ঠোঁঙা নিয়ে সাধাসাধি করছে...তবে কিছুই খাওয়াতে পারেনি বোধ হয় ...ঐ তো জলের করঙ্গটা ভরাই রয়েছে।

আমাদের কৌতুহল বাড়িল। স্ত্রীলোকটা মোহন খেপার আখড়ায় আছে কি-না দেখিতে গেলাম। শুনিলাম সে পলাইয়াছে।

রহস্য জটিল হইয়া উঠিল। কেন সে হরিদাসকে ছাড়িয়া মোহন খেপার আখড়ায় গেল। কেনই বা রাত্রে আসিয়া হরিদাসকে খাওয়াইতে চেষ্টা করিল। এখন আবার পলাইলই বা কেন? লোকলজ্জা যে ইহাদের আছে তাহা তো বোধ হয় না।

আজও রাত্রে ঝুলন দেখিতে বাহির হইয়াছি। জগবন্ধু না-কে-একজন গোস্বামীর বাড়িতে ঝুলন পূর্ণিমায় খুব ধুম হয় শুনিলাম। তিনি খুব ভদ্রলোক। যে দেখিতে যায় তাহাকে পূর্ণিমার রাত্রে ছানা-মালপো ভোগ খাওয়ান। —আমরা তাঁর বাড়িতে চলিলাম। যাইতে যাইতে আমাদের অধ্যাপক বন্ধু সঞ্জয় বলিল—দেখ, এখন যে যুগ চলেছে তাতে এইসব নেশাখোর ভ্রষ্ট সহুজেরা বাঁচতে পারে না... শিক্ষা সংস্কৃতি তার উঁচু পীঠ থেকে নেমে এলেই তা সহজ হয় না...কোন সহজ সৌন্দর্য থাকে না তার সেখানে...তার অসংস্কৃত প্রবৃত্তি জীবনের উচ্ছ্বাসকে শুধু কাদামাখা করে ...যা করছে হরিদাস আর রমার জীবনকে...তোমরা তাদের নাটুকে কীর্তি নিয়ে মাতামাতি করো—আমি তোবা দিলাম ...কাল ভোরেই কলকাতায় ফিরতে চাই। আমাদের দলের সর্দার কবি-সাহিত্যিক শ্যামধন বলিল—রেখে দাও তোমার কলেজে পড়ানো দর্শনের লেকচার...সে সব ভুয়ো দর্শন...এটা হোলো আসল দর্শন, জীবনদর্শন...এমন জিনিসটার শেষ না দেখে কারো কোথাও যাওয়া চল্‌বে না। শ্যামধনের হুকুম মানিয়া আমরা চলি যেখানেই ছুটিতে যখন যাই... কাজেই সঞ্জয় চুপ করিয়া গেল।

গোস্বামীর বাড়িতে ঝুলন দেখিতেছি...হাল ফ্যাসানের আলো-বাতি সাজ-সজ্জা...মনে হইল ঠিক শান্তিপুরের

মদনগোপাল। বিদেশী দেখিয়া গোস্বামী আমাদের খুব প্রীতির সঙ্গে অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহাদের মধ্যেও হরিদাস বাউলের কথা হইতেছিল। গোস্বামী বলিলেন—দেখ, দরবেশরা বলেন—

যথা রস তথা বশ সমস্ত ভুবন,
সকল রসের মূল পিরীতি ভজন।

এটা সাধনতত্ত্বের কথা...হালকা জিনিস নয়...সহজিয়ারা মনের-মানুষ খোঁজে...বৈষ্ণবরা তাকেই বলেন প্রেমধন। তিনি আমাদের বলিলেন—হরিদাসকেও চিনি, রমাকেও চিনি... ঝুলনের কাজে ফাঁক পাইনি তাদের দেখতে যেতে...আজ অবসর হোলো...চলুন একটু প্রসাদ পেয়ে-নিয়ে সবাই আমরা হরিদাসকে দেখতে যাই।

আমরা বাহির হইবার সময় গোস্বামীর দলের একজন বলিলেন—মদনগোপালের একটু চরণামৃত নিয়ে যাই কি বলেন প্রভু...হরিদাস তো কিছুই মুখে দিচ্ছে না শুনেছি... একটু চরণামৃত তার মুখে দিয়ে দেবেন। তারপর নিজেই বলিতে লাগিলেন—প্রেমে পড়ে কলেজ ছাড়া কোরে আনলে হরেনকে রমা মেয়েটা...কিন্তু সুখ পেলে না সহুজেদের সঙ্গে মিশে।

গোস্বামী ইংরেজী-পড়া লোক হইলেও ইংরেজীনবিস নন, শাস্ত্রকথায় দখল আছে। আমাদেরই বয়সী, ত্রিশ বত্রিশ বয়স হইবে। রোগা, সুন্দরকান্তি, বৈষ্ণবের স্বভাব। কিন্তু তাঁর যে দুটি সঙ্গী চলিয়াছেন আমাদের সঙ্গে দুইজনেই বেশ ওজন ভারি। যিনি মদনগোপালের চরণামৃত লইয়া চলিয়াছেন তিনি গৃহী বৈষ্ণব। তিনি আমাদের তালে পা ফেলিয়া চলিতে পারিতেছেন না। তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া গোস্বামীর অন্য সঙ্গীটি বলিলেন—কি ব্রজতোষদা' পা চলে না কেন?...মাত্র চারখানা মালপো খেয়েই অচল হয়ে গেলে কোরন্দ বাবাজী...আর আমি বারোখানা মালপো আর সেরট্যাক ছানা উদরসাৎ কোরেও যে হরীশ চক্কোত্তী ছিলাম সেই হরীশ চক্কোত্তী...আরও দাও আরও নাদায় ফেলে দেবো। —এই বলিয়া হরীশ চক্কোত্তী তাঁর পেট বাজাইতে লাগিলেন। তখন ব্রজতোষ বৈরাগী বলিলেন—যাচ্ছ কোথায় জান তো ...রমার আখড়ায়...সেবার পিঠ বাঁচিয়ে এসেছিলে কোনো রকমে...এবার মালপো বোঝাই নাদাটা ফাটিয়ে না-দেয়! কথাটা শুনিয়া চক্রবর্তীর হাসি-মস্করা উবিয়া গেল, মুখটা তোলো হাঁড়ির মতো হইয়া গেল। গোস্বামী বলিলেন— হাঁ রমা মেয়েটি ভারি শক্ত...চক্কোত্তী একদিন তাকে ঠাট্টা করতে গিয়ে ভারি ঠকেছিলেন। তাই তো আমি ভাবছি রমার মোহন বাউলের আখড়ায় যাওয়া একটা অভিনয় নয়... কি জানি হরিদাসের প্রেমের গভীরতা বাড়াতে এমন করেছে হয়তো...ওদের সহজ-সাধন ঠিক তো বুঝিনা। তারপর শিষ্য ব্রজতোষের দিকে চাহিয়া বলিলেন—মদনগোপালের চরণামৃত মাথায় কোরে আনছ বুঝি...তা' দাও আমার হাতে ...কষ্ট হচ্ছে তোমার। দেখা গেল বাবাজীটির বেশ জল-দোষ আছে, তাহাতেই তাঁর গতি এতোটা মন্থর।

আমরা ক্রমে বাউলডাঙ্গায় পেঁৗছিলাম। হরিদাস বাউলের গান শোনা যাইতেছে। আওয়াজ বেশ ক্ষীণ। সে গাহিতেছে—

ওগো পরাণ প্রিয় আছ প্রাণে
কোথায় যাবে কার ঘরে,
আমি বাউল হলাম তোমার প্রেমে
এ দুনিয়ার সব ছেড়ে।
নাগাড়ের তম্বির কেউ পারে না এড়াতে,
আমার বিধি কি করিল দেখ তা' সাক্ষাতে।
তুমি নও তো পুরুষ, নও নারী
গুণের তোমার বলিহারি!
তুমি আমার প্রাণে নৌকা চালাও
শুধু হাল ঠেলা পাল গুণ দাঁড়ে।।

হরিদাস পথের উপর পড়িয়া আছে। গোস্বামীকে দেখিয়া একটু হাসিল। গোস্বামী বলিলেন—খুব উঁচু স্তরে উঠেছেন হরিদাস...সাধনার শেষ কথা বলছেন 'আমি পুরুষ নই...তুমি নারী নও'...প্রেমের বিহারে ভরে' গেছে অন্তর! তাঁর কাছে মূর্তি নিয়ে এসেছেন তাঁর প্রেমধন। তারপর হরিদাসের আরও কাছে গিয়া বলিতে লাগিলেন— হে পরম বাউল তুমি তোমার প্রেম-দেবতাকে বুকের মধ্যে পেয়েছ...আর তো কিছু বাকী নেই তোমার এই মাটির সংসারে পাবার।...বুঝছি তুমি এই সিন্ধ দেহ ছেড়ে চলে যাবে...এসো রাধামদনগোপালের চরণামৃত দিই দু'ফোঁটা তোমার মুখে।

গোস্বামী হরিদাসের পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িলেন। ...আমরাও দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না।

আমরা কলিকাতায় ফিরিয়াও হরিদাস বাউলের কথা ভুলিতে পারি নাই। লোকমুখে শুনিলাম বাউলডাঙ্গায় ঐ গোস্বামীর চেষ্টায় হরিদাসের একটি 'সমাজ' উঠিয়াছে। একদিন তাহা দেখিতে যাইতে হইবে ঠিক করা হইয়াছিল। বৈকালে আফিস থেকে উঠিব, দেখি সঞ্জয়কে নিয়া আমাদের বেড়ানোর গাইড শ্যামধন বাবু আসিয়া উপস্থিত। সঞ্জয় বলিল—শ্যামধন আমায় কলেজ থেকে টেনে আনছে...কাল পরশু ছুটি আছে, নবদ্বীপ যেতে হবে...তুমি পারবে তো

যেতে? শ্যামধন আমার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বলিল —নিশ্চয় যাবে...আজ রাত্রের কিউল প্যাসেঞ্জারে...গোঁসাই-জীর ওখানে উঠবো।

রাত্রে গোঁসাইজীর বাড়িতে আসিতেই তিনি বলিলেন—বেশ হয়েছে...যাবার সঙ্গী পাইনে...শুনি না'কি অতি বেশি রাতে রোজই কি গান গায় রমা হরিদাসের সমাজের পাশে বসে'...আপনাদের নিয়ে আজ তা' শুনতে যাব চলুন।

আহার সারিতে অনেক রাত হইয়া গেল, আমাদের আসার কথা বলা ছিল না। গোস্বামী বলিলেন—আলো লাঠি নিয়ে যেতে হবে যে পাড়া...তার ওপর হরিদাসের সমাজ হয়েছে অতি নিভৃতে রমার অনুরোধ মতো...রমা আমার সঙ্গে কথা কয় না...খুব নিঃশব্দে সেখানে যেতে হবে...দোর বন্ধ করে' গান গায়...আজ গাইবে কি-না কে জানে?

লণ্ঠনটা কমাইয়া দিয়া আমরা ছোট চালাঘরটার কাছে একটা তেঁতুলতলায় বসিলাম। শ্মশানের কয়েকটা কুকুর পাছু লইয়াছিল। আস্তে আস্তে তারা সরিয়া পড়িল। কয়েকটা শিয়াল ছুটিয়া পলাইল। গাছের উপর দু'-একটা বাদুড় ঝটপট করিয়া ডানা নাড়িল। রুদ্ধদ্বার চালাঘর হইতে মৃদু-মধুর রমার গান শোনা যাইতেছে—

তুই ভোলামন মনের মানুষ চিনতে পারলি নে—
দুনিয়াদারির তখ্‌তে বসে' করলি তল্লাসে
তারে দেখেও দেখতে পেলি নে।
আমি আপন হতে কোন মতে বুদ্ধিমন্ত নই
শশীলাল চোখের ঠুলি খুলে দিয়ে দেখিয়ে দিল ঐ।
যা হারিয়ে ছিলাম বত্তে গেলাম নিয়ে তারে নির্জ্জনে
দেখছি শয়ন স্বপনে
আমার প্রাণের দর্পণে।

গান শেষ হইল। ভোরের পাখী ডাকিয়া উঠিয়াছে। আমরা ফিরিয়া চলিয়াছি। গোস্বামী বলিলেন—রমারও আর বেশি দিন নেই...সেও পেয়ে গেছে মনের মানুষ...আর সে থাকবে না।

কিছুদিন না-যাইতেই শোনা গেল, রমা আর নাই, হরিদাসের সমাজও আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। শুধু থাকিয়া গেল আমাদের মনে মনের মানুষের ছবিটা চিরদিনের মতো।

★

সুদূরের গান

শ্রীসুস্নাত গঙ্গোপাধ্যায়

তুমি তো অনেক দূরে, জানার অবসর
পাবার আগে হারিয়ে গেলে, আমার ভালবাসা
ঝরলো মিছে, তোমায় কাছে পাবার যতো আশা
উধাও করে উড়িয়ে নিলো চকিত কোনো ঝড়।

আমার আজ ঘন তিমির। তোমার হাতছানি
এ-পারী ঢেউয়ে আসছে ভেসে, মধ্যে হায় দূর
এ-পারী ঢেউয়ে আসছে ভেসে, মধ্যে হায় দূর
আকাশ-ছোঁয়া লহর তোলা বাধার কালাপানি।

মনে কি পড়ে, সেদিন ঝড়ে পেছনে ফেলে ঘর
আমার হাতে রাখ্‌লে হাত, তোমার মন পেলো
আমার মন। হঠাৎ তারা হাওয়ায় এলোমেলো
হারিয়ে গেলো, কাঁদলো শুধু ব্যথার বালুচর।

আমার মতো দূরের থেকে আজকে রাতে তুমি
ভাবছো সেই বিমনা রাত, হাওয়ার গান, ঝড়;
ঝাউয়ের শাখে কাঁপছে সেই রাতের স্মৃতি-স্বর,
কাঁপছে ঝরা পাতায় ভরা মনের বনভূমি।

তুমি তো আজ হারিয়ে গেছো, বিমনা মোর প্রাণ
তোমায় কাছে পেলো না, তবু এ পার থেকে হায়
ঢেউয়ের চূড়ে ব্যথিত সুর গানের ভরা না'য়
ভাসিয়ে দেবো, দূরের থেকে শুনবে তুমি গান।

সম্পাদকীয়

সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা দিবস

আর একবার ভারত তাহার বিস্মৃত বিপ্লবী যৌবন-সত্তাকে অনুভব করিবার অবকাশ পাইল। ২৬শে জানুয়ারীর সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাদিবসের মধ্যেই সেই অনুভবের অঙ্কুরটি নিহিত। ২৬শে জানুয়ারী প্রথম দেখা দেয় স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে তারপর ১৯৪৭ সাল হইতে ১৫ই আগষ্টকে ভারত স্বাধীনতাদিবসরূপে গণ্য করিয়া ২৬শে জানুয়ারীকে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা দিবসরূপে পালন করিতে আরম্ভ করে। সাধারণতঃ শুদ্ধাচার সূত্রযজ্ঞ অনুষ্ঠান ও সঙ্কল্পবাক্য উচ্চারণকেই এই দিনটিতে কর্তব্যকর্ম হিসাবে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী এই জাতীয়-কর্তব্যের প্রথম প্রতিষ্ঠা। সেদিন যে স্বাধীনতার সংকল্পবাক্য গ্রহণ করা হয়, এই প্রসঙ্গে তাহা স্মরণীয়। সংকল্পবাক্যে বলা হয়ঃ

'আমরা বিশ্বাস করি যে, আত্মবিকাশের পূর্ণ সুযোগলাভের জন্য অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের ন্যায় ভারতবাসীদেরও স্বাধীনতা লাভ করিবার, স্বীয় শ্রমার্জিত বিত্ত ভোগ করিবার এবং জীবনধারণের উপযোগী উপকরণ পাইবার অবিচ্ছেদ্য অধিকার আছে। আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, যদি কোনো গভর্নমেণ্ট কোনো জাতিকে এই সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত করে এবং তাহাকে নির্যাতন করে, তবে সেই গভর্নমেণ্টকে পরিবর্তন বা ধ্বংস করার অধিকারও সেই জাতির আছে। ভারতে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতবাসীদিগকে শুধু স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত রাখিয়াই বিরত হয় নাই, অধিকন্তু জনসাধারণের শোষণের উপরেই আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতবর্ষকে অর্থনীতি, রাজনীতি, সভ্যতা ও ধর্মনীতির দিক দিয়া ধ্বংস করিয়াছে। সুতরাং ভারতবর্ষের পক্ষে বৃটিশ সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া পূর্ণ স্বরাজ অর্থাৎ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই—ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

'অর্থনীতির দিক হইতে ভারতের সর্বনাশ সাধন করা হইয়াছে। আয়ের তুলনায় অত্যধিক পরিমিত রাজস্ব আমাদের দেশের লোকদের নিকট হইতে আদায় করা হয়। আমাদের দৈনিক গড়ে আয় মাত্র সাত পয়সা। আমরা যে গুরু করভার বহন করিতে বাধ্য হই, তাহার শতকরা ২০্ টাকা কৃষকদের নিকট হইতে ভূমিকর স্বরূপ এবং শতকরা ৩্ টাকা লবণের শুল্ক বাবদ আদায় করা হয়। এই শুল্কভারে দরিদ্র জনসাধারণ অত্যন্ত পীড়িত হইতেছে। সুতাকাটা প্রভৃতি গ্রাম্যশিল্পের ধ্বংস সাধন করিয়া তাহার পরিবর্তে অন্যান্য দেশের ন্যায় কোনও নূতন শিল্পের প্রবর্তন করা হয় নাই—ফলে দেশের কৃষক সম্প্রদায়কে বৎসরে অন্ততঃ চারি মাসকাল অলসভাবে সময় কাটাইতে হইতেছে এবং কুটির-শিল্পের অভাবে তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তিও খর্ব হইতেছে।

'বাণিজ্য-শুল্ক এবং মুদ্রানীতি এরূপ চতুরতার সহিত পরিচালিত করা হইতেছে যে, তাহার ফলে কৃষকদের বোঝা আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। আমাদের দেশে আমদানী দ্রব্যের মধ্যে অধিকাংশই ইংলণ্ডে প্রস্তুত। বাণিজ্য-শুল্ক ধার্য করিবার পদ্ধতি বৃটিশ শিল্পের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট—ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় এবং উক্ত শুল্কলব্ধ রাজস্ব দরিদ্রের দুঃখ নিরাকরণে ব্যয়িত না হইয়া একটা ব্যয়বহুল শাসনতন্ত্র পরিচালনার জন্য ব্যয়িত হয়। মুদ্রা বিনিময় নীতি আরও অধিক যথেচ্ছচারিতার পরিচায়ক, ইহার ফলে কোটি কোটি টাকা দেশ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে।

'সভ্যতার দিক দিয়া বিদেশী শিক্ষাপদ্ধতি আমাদিগকে আমাদের বিশিষ্ট ভাবধারা হইতে বিচ্যুত করিয়াছে। ফলে যে শৃঙ্খল আমাদিগকে দাসত্বের বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, সেই শৃঙ্খলকেই আমরা আদর করিতে শিখিয়াছি। মনুষ্যত্বের দিক হইতে বাধ্যতামূলক নিরস্ত্রীকরণ আমাদিগকে নির্বীর্য্য করিয়াছে।

'যে শাসনপদ্ধতি আমাদের দেশের এই চতুর্বিধ সর্বনাশ সাধন করিয়াছে, সেই শাসনপদ্ধতির অধীনে আর মুহূর্তকালও বাস করা আমরা মনুষ্যত্ব ও ধর্মের দিক হইতে অপরাধ বলিয়া মনে করি। একথা আমরা অবশ্যই স্বীকার করি যে, হিংসাই স্বাধীনতা অর্জনের প্রকৃষ্টতম পন্থা নহে। সুতরাং আমরা বৃটিশের সহিত সর্বপ্রকার স্বেচ্ছাকৃত সহ-

যোগিতা যথাসাধ্য বর্জন করিবার জন্য প্রস্তুত হইব এবং কর প্রদান বন্ধ এবং অন্যান্য উপায়ে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ নীতি অবলম্বন করিবার জন্য প্রস্তুত হইব। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, উত্তেজনার কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আমরা যদি হিংসার পথ অবলম্বন না করিয়া স্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতা বর্জন করিতে পারি এবং কর প্রদানে বিরত হই, তবে এই অমানুষিক শাসনতন্ত্রের অবসান সুনিশ্চিত। অতএব এতদ্বারা আমরা দৃঢ়সংকল্প করিতেছি যে, পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য কংগ্রেস যখন যেরূপ নির্দেশ দিবেন, আমরা সেই নির্দেশ ঐকান্তিকভাবে পালন করিব।'

১৯৪৭-এর ১৫ই আগষ্ট সেই স্বাধিকারে সুপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে বটে ভারত, কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতা এখনও অর্জিত হয় নাই। পরাধীন ভারতের ন্যায় আজকের ভারতেও সেই একই দুঃখ-দারিদ্র্য, অভাব-অনটন আর হাহাকার। পূর্বে ইহা লইয়া বৃটিশকে তিরস্কার করা যাইত, আজ নিজের চড় নিজেরই গালে আসিয়া লাগে। যেদিন এদেশের স্বাস্থ্য সম্পদ ফিরিয়া আসিবে, নিরক্ষরতা পূর্ণরূপে দূর হইবে, কোনো একটি মানুষেরও অভাব অনটন বলিয়া আর কিছু থাকিবে না, সমাজ, শ্রেণী ও অবস্থা নির্বিশেষে মানুষ মাত্রেই মানুষের সহযোগি হইবে—কেবল সেদিনই বলা চলেঃ দেশ স্বাধীনতার স্পর্শ লাভ করিয়াছে, দেশ স্বাধীন হইয়াছে। গত ২২ বৎসরের স্বাধীনতার সংকল্প-বাক্যে বড় একটা পার্থক্য নাই। এবারও থাকিবার কারণ ঘটিবে না। ইহা দুঃখের এবং নৈরাশ্যের সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্ধকারের মধ্য দিয়াই তো আলোর প্রত্যাশা! আগামী বৎসর হইতে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাদিবস মিথ্যা স্বপ্নমায়ায় বিজড়িত থাকিয়া আর কোনোদিন ব্যর্থতার গ্লানি বহন করিয়া চলিবে না—এই আশা লইয়াই এবারের ২৬শে জানুয়ারীর শুচি-শুভ্র ললাটে আমরা চন্দন-টিপ আঁকিয়া দিলাম।
—বন্দেমাতরম।

জয়তু নেতাজী

১৮৯৭ সালের ২৩শে জানুয়ারী। সেদিন কি দেব-বিভায়মণ্ডিত নবজাতকের আবির্ভাবে কল্পনা করা গিয়াছিল যে, একদিন এই শিশুই ভারতের পরাধীনতার শৃঙ্খলকে ভাঙিয়া ফেলিতে এতবড় হিমালয়সদৃশ শক্তি লইয়া বৃটিশ-সিংহাসনকে টলাইয়া দিবে! উত্তরকালে সমগ্র পৃথিবীর মানুষ অবাক বিস্ময়ে ইহাই লক্ষ্য করিয়া চমকিত হইল। দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র, ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা সুভাষচন্দ্র—তাঁহার চিত্তের সুবাসে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত করিয়া ভারতবাসীর হৃদয়ে পরমাত্মীয়ের মতো আপন আসন রচনা করিয়া বসিলেন। নেতৃ-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি সকলের ঈর্ষার পাত্র হইয়া দাঁড়াইলেন, এমন কি জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত তাঁহার সম্পর্কে বিচলিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু অদম্য শক্তি ও অনন্য প্রতিভার অধিকারী সুভাষচন্দ্র কোথাও কোনো ক্ষেত্রেই মাথা নত করিতে শিখেন নাই। স্বামী বিবেকানন্দ আর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের উত্তরসাধক সুভাষচন্দ্র চিরকাল আপন আদর্শের পথ ধরিয়াই বিজয় অভিযান চালাইয়াছেন। ইংরেজের বুলেট সেখানে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে, কারাগার পুষ্পোদ্যানের মতই তাঁহাকে প্রীতির সম্পর্কে সম্ভাষণ জানাইয়াছে। স্বধর্মচ্যুত হইয়া তিনি কোনোদিন লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই। দেশমাতৃকার চরণে এমন প্রণতপ্রাণ পৃথিবীর ইতিহাসে একেবারেই দুর্লভ বৈ কি! তাঁহার প্রধান সংকল্পই ছিলঃ 'আমরা মানুষ হবো; নির্ভীক মুক্ত খাঁটি মানুষ হবো। নূতন স্বাধীন ভারত আমরা ত্যাগ, সাধনা ও প্রচেষ্টার বলে গ'ড়ে তুল্‌বো। আমাদের ভারতমাতা আবার রাজরাজেশ্বরী হবেন; তাঁর গৌরবে আমরা গৌরবান্বিত হবো। কোনও বাধা আমরা মান্‌বো না; কোনও ভয়ে আমরা ভীত হবো না। আমরা নূতনের সন্ধানে অজানার পশ্চাতে চ'ল্‌ব। জাতির উদ্ধারের দায়িত্ব আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে বিনয়ের সঙ্গে গ্রহণ ক'রবো। ভারতবর্ষকে আবার বিশ্বের দরবারে সম্মানের আসনে বসাবো। শ্রদ্ধাবনত মস্তকে গললগ্নীকৃতবাসে মাতৃচরণে সমবেত হইয়া করজোড়ে বলিঃ পূজার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ, অতএব জননি! জাগ্রহি।'

প্রাণে প্রাণে এই সংকল্প গ্রহণ করিয়াই সুভাষচন্দ্র আপন লক্ষ্যপথ ধরিয়া ক্রমাগত অগ্রসর হইয়াছেন। যখন দেখিলেন—দেশের অভ্যন্তরে থাকিয়া বৃটিশ শক্তিকে পরাভূত করা দ্রুত সম্ভব নয়, তখনই তিনি ছদ্মবেশে দেশান্তরিত হইয়া গড়িয়া তুলিলেন আজাদ হিন্দ্‌ দল—আজাদ হিন্দ্‌ গবর্ণমেণ্ট। নেতাজী সুভাষচন্দ্র দিল্লীর দূরপ্রান্তর দেখাইয়া বলিলেনঃ 'দূরে বহুদূরে, ঐ নদী, অরণ্যপূর্ণ ভূখণ্ড ছাড়াইয়া, পাহাড়-পর্বত ছাড়াইয়া আমাদের দেশ—সে দেশে আমরা জন্মেছি। আবার আমরা ফিরে যাচ্ছি আমাদের দেশের মৃত্তিকায়। —ঐ শোন! স্বদেশ আমাদের আহ্বান ক'রছে—ভারতের রাজধানী দিল্লী আমাদের ডাক্‌ছে—আটত্রিশ কোটী আশী লক্ষ দেশবাসী আমাদের জানাচ্ছে তাদের সাদর আহ্বান—পরিজনের ডাক ভেসে আস্‌ছে পরিজনদের কানে। ওঠ, নষ্ট ক'রবার মতো সময়

আর নেই—তোমাদের জাগ্‌তে হবে—হাতে নিতে হবে অস্ত্র। সম্মুখে প'ড়ে আছে প্রদর্শিত পথ—সে পথ ধ'রে যেতে হবে এগিয়ে। বিদেশী শত্রুকে পর্যুদস্ত ক'রে আমরা অগ্রগামী হবো জয়যাত্রার পথে। সে পথে যদি নেমে আসে মৃত্যুর বিধান, শহীদের ন্যায় তাকে আমরা নেবো বরণ ক'রে। যে পথে আমাদের বিজয়বাহিনী দিল্লীতে উপনীত হবে, মৃত্যুর আগে সেই পথের ধূলায় এ'কে দিব শেষ চুম্বনরেখা। দিল্লীর পথই আমাদের মুক্তির পথ... এগিয়ে চলো দিল্লীর পথে।'

চারিদিকে অম্‌নি বিউগ্‌ল্‌ বাজিয়া উঠিল, সহস্র সহস্র পদসঞ্চারে রাঙা হইয়া উঠিল পথের ধূলি, তরঙ্গিত হইয়া উঠিল সমুদ্রের লবণাক্ত জল, সঙ্গীত ধ্বনিয়া উঠিল সহস্র কণ্ঠে—

...'চলো দিল্লী পুকারকে
কোমী নিশান সামালকে
লাল কিল্লে গাড়কে
লহরায়ে যা লহরায়ে যা।
কদম কদম বাড়ায়ে যা॥'

শেষ পর্যন্ত আজাদ হিন্দ্‌ পূর্ণমাত্রায় কৃতকার্য না হইলেও বৃটিশ শক্তিকে পর্যুদস্ত করার পক্ষে দুঃখ-স্বীকৃতির মধ্য দিয়া যে কাজ করিয়া গেল—তাহারই সুকীর্তির উপর দ্রুত নামিয়া আসিল ভারতের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার উৎসবের দিন। নেতাজীকে দেশ আর ফিরিয়া পাইল না বটে, কিন্তু তাঁহার আশীর্বাদ অহর্নিশি ঝরিয়া পড়িতেছে প্রত্যেকটি ভারতবাসীর শিরে। ২৩শে জানুয়ারী সেই সর্বত্যাগী দধিচী নেতাজী সুভাসচন্দ্রের পুণ্য আবির্ভাব দিবস। প্রতি বৎসর জাতির জীবনে এই দিনটি আশা আনন্দের বাণী বহিয়া আনে, প্রতি বৎসরই এই দিনটি নতুন করিয়া বলিয়া দেয়—'হে ভারতবাসি, আত্মস্থ হও, শুচিশুদ্ধ হও, জাগ্রত হও।' স্মরণ করাইয়া দেয়—'আশা উৎসাহ ত্যাগ ও বীর্য লইয়া আমরা আসিয়াছি। আমরা সৃষ্টি করিতে আসিয়াছি, কারণ সৃষ্টির মধ্যেই আনন্দ। তনু-মন-প্রাণ-বুদ্ধি ঢালিয়া দিয়া আমরা সৃষ্টি করিব। নিজের মধ্যে যাহা সত্য, যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু শিব আছে, তাহা আমরা সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিব। আত্মদানের মধ্যে যে আনন্দ, সে আনন্দে আমরা বিভোর হইব। সেই আনন্দের আস্বাদ লইয়া পৃথিবীও ধন্য হইবে।'

আমরা যেন ২৩শে জানুয়ারীর শুভ প্রভাতে এই সংকল্প গ্রহণ করিয়াই নেতাজীর আদর্শকে আমাদের জীবনে সার্থক করিয়া তুলিতে পারি। তবেই আমাদের জীবনে নেতাজীর আবির্ভাব সার্থক হইবে। সেই সুপ্রভাতের উদ্দেশে আমরা সমবেতভাবে বলিঃ জয়তু নেতাজী, জয়তু ২৩শে জানুয়ারী।

ভারতীয় শিক্ষাদর্শ ও ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ

যে শিক্ষা আত্মাকে উন্নত করে না, যে শিক্ষায় আত্মার বাণী উচ্চারিত হয় না, তাহাকে আর যে-নামেই আখ্যায়িত করা হউক্‌ না কেন, শিক্ষা নামে অভিহিত করা চলে না। পুরাকালে শিশুকে পঞ্চবর্ষ পর্যন্ত লালন করিয়া তাহার জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত শিক্ষার সুযোগ দিয়া গুরুগৃহে পাঠানো হইত। গুরুর কাছ হইতে সে জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া সমাজজীবনে ফিরিয়া আসিয়া সামাজিক কল্যাণে আত্মনিয়োগ করিত। এইভাবে তাহার ব্যক্তিগত উৎকর্ষতার সঙ্গে সমাজগত ঔৎকর্ষ সমন্বিত হইয়া একই সঙ্গে গৃহ ও দেশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। কিন্তু কালোত্তীর্ণের সঙ্গে সঙ্গে কখন্‌ হইতে কিভাবে যে তাহা ধীরে ধীরে দেশের বুক হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল —সেদিকে কাহারও দৃষ্টি যায় নাই। ক্রমে ভারত হইতে ভারতীয় আদর্শগত শিক্ষার স্থলে আসিয়া স্থান করিয়া লইল বৈদেশিক পাঠ্যতালিকার স্তূপ। ভারতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলির উৎপত্তি হইতে সুরু করিয়া উহাদের ক্রমিক শিক্ষা-নীতির ধারাগুলির মধ্যে এই উদাহরণই নিহিত রহিয়াছে। ভারতীয় বেদ ও উপনিষদ ভারতবাসীকে আত্মস্থ হইয়া আত্মাকেই সর্বাগ্রে জানিতে বলিয়াছিলঃ 'আত্মানং বিদ্ধি।' বলিয়াছিল—'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম', অর্থাৎ একত্রে চলো, একত্রে বলো, একত্রে মননশীলতার মধ্যে বিহার করো। বলিয়াছিল—'অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যুর্মামৃতংগময়', অর্থাৎ—অসত্য হইতে আমাকে সত্যতে নিয়া চলো, অন্ধ-কার হইতে আমাকে আলোকে নিয়া চলো, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতলোকে নিয়া চলো। বলিয়াছিল—'আত্ম-দীপ হও, আপন আলোকে আপন পথ চলো।'

কিন্তু ক্রমবর্ধমান যুগে ভারত সেই আদর্শের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পরদীপশিখার উজ্জ্বল আলোকে পুড়িয়া মরিতে বসিল। এদেশের শিক্ষানীতি, অর্থনীতি, জাতিত্ব, দর্শন—সব কিছু পরানুকরণপ্রিয়তার মোহে মোহমুগ্ধ হইয়া আপন ভুলিয়া পরকেই মধুর বলিয়া গ্রহণ করিল। ইহার কিছু বা রাজনীতির চাপে, কিছু বা প্রাণধর্মের উচ্ছ্বাসে। ভারত হইল পরাধীন। পরাধীনতার শৃংখলে

সে বাঁধা পড়িল। ইহারই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কবি গোবিন্দ রায়ের গান—

'কতকাল পরে বল ভারত রে,
দুঃখসাগর সাঁতারি পার হবে!
... ...
পর দীপশিখা নগরে নগরে
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।'

দুঃখবাদের মধ্য হইতে আশার আলোকের উজ্জ্বল শিখাকে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিবার জন্য বাঙালী তথা ভারতীয় কবিদের অনুরূপ আকুতি জাগ্রত হইতে বিলম্ব হয় নাই, কিন্তু একবার যে আত্মগত সাধনার পথ হইতে ভারত নীতিভ্রষ্ট হইল, সে-পথ অন্ধকারেই আচ্ছন্ন রহিয়া গেল। ভারতীয় শিক্ষাকে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি গ্রহণ করিতে পারিল না। তাহার জন্য যদিও বা প্রাণের আকুতি ছিল, সন্দেহ নাই, কিন্তু উদ্যম ছিল না। সেই উদ্যমহীনতাই এদেশের সাম্প্রতিক শিক্ষানীতিকে কৃত্রিম উপভোগ্য করিয়া মানুষকে মনুষ্যত্বের উচ্চশীর্ষে আরোহণ করিতে দেয় নাই। ইহার জন্য কালগত সমাজব্যবস্থাই দায়ী।

পৃথিবীতে এমন এক একটা মহাকালের অচল অবস্থা আসা অসম্ভব কিছু নয়। সেই অচল অবস্থায় দেশ তমসাচ্ছন্ন থাকে; আবার মুহূর্ত আসিলেই সে আত্মমর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের পক্ষে ১৯৪৭-এর স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্যে নিশ্চয়ই সেই মুহূর্তের জন্ম হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু দেখা গেল—স্বাধীনতা তাহার মধ্যে আত্মসমাহিতের বিজয়বৈজয়ন্তী ঘোষণা করিল না।—যে পরানুকরণপ্রিয়তায় একবার সে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, তাহারই মোহ এখনও তাহাকে পাইয়া বসিয়া আছে। বিশ্ববিদ্যালয়-কমিশন গঠিত হইয়া নতুন নতুন নানা প্রকার শিক্ষানীতির প্রয়াস দেখা দিলেও কার্যতঃ তাহা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতে পারিল না। ফলে জ্ঞানের একই আবর্জনা সারা মস্তিষ্কে বহন করিয়া প্রতি বৎসর দলে দলে ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার উল্লঙ্ঘন করিয়া আসিলেও জীবন-সমুদ্রে তাহারা হালের বৈঠার নাগাল পায় না। এইভাবেই প্রতি বৎসর আগামী বৎসরের মধ্যে গড়াইয়া চলিয়াছে। সমাবর্তন উৎসবগুলিও অসার বক্তৃতাভারে ভারাক্রান্ত হইয়া 'দুধের স্বাদ ঘোলে মিটানোর' অবস্থার মধ্যেই সমস্ত প্রয়াস শেষ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকিয়া যাইতে বাধ্য হইতেছে।

সুখের বিষয় যে, এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ভারতীয় সাংস্কৃতিক চেতনার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই ভারতীয় শিক্ষার চিরন্তন আদর্শের পথ সম্পর্কে ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি তাঁহার বাংলাভাষায় লিখিত ভাষণে বলেনঃ

'আমাদের ইহা জানা উচিত যে, যতক্ষণ আমাদের দৃষ্টি আত্মতত্ত্বের দিকে যাইবে না আর যতদিন ইহা প্রাপ্তির জন্য

আমরা যত্নশীল হইব না, ততদিন সমাজের বিশৃঙ্খলতা এবং দুনিয়ার অরাজকতা দূর হইবে না। আমরা শুনি যে, এখন এই দেশে জনসাধারণের এবং শিক্ষিতবর্গের চরিত্র যত উন্নত আর উদাত্ত হওয়া উচিত, তাহা নাই; ইহার কারণ আমাদের পরাবিদ্যার প্রতি উপেক্ষা আর তজ্জন্য শিক্ষাসংস্থায় পরাবিদ্যাশিক্ষা এবং অভ্যাসের সাধনার অভাব। ইহার জন্য আমি চাই যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এই পরিস্থিতি দূর করিবার জন্য চেষ্টা করুক, কেননা ইহার আবশ্যকতা কেবল ভারতের জন্য নহে, সমস্ত

সংসারের জন্য আছে। মহাত্মা গান্ধী এই কথাকেই সত্য অহিংসা নাম দিয়াছেন, আর সকলেই ইহার আবশ্যকতা অনুভব করিতেছেন, কিন্তু ইহার হ্রাসও সকলে বসিয়া দেখিতেছেন।...আজিকার শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে আমার মনোভাব সন্তোষজনক নহে। আজ বহুসহস্র যুবক-যুবতী কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতে এই রকম ছুটিয়া যায়, তাহার কারণ এই যে, তাহাদের জীবনবৃত্তি লাভ করিবার অন্য কোনো পথ নাই। আর যে প্রতিষ্ঠান প্রকৃত উচ্চশিক্ষার মৌলিক চিন্তার কেন্দ্র হইতে পারে এবং হওয়া দরকার, তাহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাকুরীর আবেদনকারীদের এক কারখানা মাত্র হইয়া পড়ে। আমি চাই যে, সকল শিক্ষাদাতা এবং যাঁহাদের শিক্ষার সহিত সম্বন্ধ আছে, এই বিষয়ে তাঁহারা গভীরভাবে গবেষণা করেন এবং শিক্ষাক্রম আবশ্যকমতো পরিবর্তন করেন। আজিকার শিক্ষাক্রমে চরিত্রগঠনের কোনো মহত্ত্ব নাই আর স্থানও নাই।'

এই মহত্ত্বের ভিত্তিকে পাকা করিয়া যতক্ষণ না সেই স্থানকে যথোপযোগী ক্ষেত্রে নির্মিত করা যাইতেছে—ততক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা দেশবাসীর কোনো উপকারেই আসিবে না। আলোচনাসূত্রে এখানে ডাঃ প্রসাদের মূল বক্তব্যের আসল বিষয়বস্তুটিকে তুলিয়া ধরা যাইতে পারে। তিনি বলেনঃ 'আপনারা দেখিতে পাইতেছেন কি স্কুল-কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত যুবক যুবতীর সংখ্যা কত বাড়িয়া গিয়াছে আর প্রতি বৎসর কত করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে। এই সংখ্যাবৃদ্ধি সন্তোষের কারণ বটে, কিন্তু ইহা চিন্তারও কারণ। যদি আমাদের শিক্ষার পদ্ধতি এই রকম হইত, যাহাতে শিক্ষিত কয়েকটি বিষয়ের জ্ঞানলাভ এবং সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রেরও উন্নতি হইত, আর বিদ্যার্থিগণ এইরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন হইত—যাহাতে স্বাবলম্বী হইয়া নিজের দেহের আর মস্তিষ্কের শক্তির দ্বারা জীবন নির্বাহ সাধন করিতে পারিত ; দেশ এবং সমাজের জন্য ইহার অপেক্ষা অধিক মঙ্গলকারী আর কিছুই হইতে পারিত না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই পদ্ধতির মৌলিক ত্রুটির পরিচায়ক ইহাই হইয়াছে যে, শিক্ষিতবর্গের অধিকাংশ লোক কেবল আপিসে ছোটখাটো কাজ করিবার যোগ্যতা প্রাপ্ত হন, আর সেই যোগ্যতা সকল সময়ে উচ্চশ্রেণীর যোগ্যতা নহে, আর অধিকাংশ অন্য প্রকারের স্বাবলম্বী জীবন লাভ করিবার যোগ্যতাও হারাইয়া ফেলেন। সুতরাং এই বিস্তার এবং প্রসারের এই এক ফল দৃষ্টিগোচর হইতেছে যে, দিন-প্রতিদিন এইরকম লোকের সংখ্যাই বাড়িয়া যাইতেছে, যাঁহারা আপিসে চাকুরী খুঁজিতে থাকেন, আর চাকুরী পান না। আর তাহা ছাড়া তাঁহাদের অশিক্ষিত পিতা-পিতামহ যে কাজ করিয়া জীবন নির্বাহ করিতেন, তাঁহারা সে কাজেরও অযোগ্য হইয়া পড়েন। ইহা বিচার্য প্রশ্ন হইয়া উঠিয়াছে যে, এই প্রকারের কতদূর কলেজ, ইউনিভার্সিটি ও স্কুলের বৃদ্ধি দেশের পক্ষে লাভজনক। যতদিন এই পদ্ধতির মৌলিক পরিবর্তন করা যাইবে না, এই সব প্রতিষ্ঠান বাস্তবিক এমনই লোকের সংখ্যা বাড়াইবে যাহারা জীবন, সমাজ এবং সরকার ও সকলের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকিবে। —যদি এই শিক্ষার দ্বারা কয়েকটি বিষয়ে কিম্বা কেবল এক বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞানলাভ সম্ভবপর হইত, তাহা হইলেও কিছু সন্তোষের বিষয় হইত। কিন্তু আজ চারিদিক হইতে যাঁহারা এ বিষয়ে জানেন এবং এই সম্বন্ধে কিছু অধিকারযুক্ত কথা বলিতে পারেন, তাঁহাদের কাছে শোনা যায় যে, আগে শিক্ষা এবং জ্ঞানের যে স্তর ছিল, তাহা অনেক নিম্নে নামিয়া গিয়াছে এবং দিন-প্রতিদিন আরও নামিয়া যাইতেছে। এইরকম হওয়া একপ্রকার স্বাভাবিক। যে দ্রুতগতির সঙ্গে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাড়িয়াছে, তাহাতে আশা করা অসম্ভব যে, বিস্তার-অনুরূপ গভীরতাও তাহার মধ্যে আসিবে। শিক্ষা সম্বন্ধে ব্যয় অনেক বাড়িয়া গিয়াছে এবং তৎসম্বন্ধে সাধন যথা পুস্তকালয়, প্রয়োগশালা যন্ত্র আদি যথেষ্ঠ বাড়িয়াছে, তথাপি যে প্রমাণে বিদ্যার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে, সেই প্রমাণে তাঁহাদের বৃদ্ধি হয় নাই। যোগ্য এবং অনুভবী শিক্ষক পাওয়া বরাবরই কঠিন আর যখন একসঙ্গেই তাঁহাদের প্রয়োজন বাড়িয়া যায়, তাহাদের স্তরের অধোগতি হওয়া স্বাভাবিক। যে প্রমাণে আমরা শিক্ষার বিস্তার চাই, সেই প্রমাণে তাহার গভীরতাও চাই। হইতে পারে যে, পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অদূরভবিষ্যতে ইহার উন্নতি দেখা দিবে। কিন্তু আমার ধারণা, যতক্ষণ শিক্ষাবিষয়ের এবং শিক্ষাক্রমের মৌলিক পরিবর্তন না হইবে এবং তার দৃষ্টিকোণ একেবারে বদলাইয়া দেওয়া না যাইবে, ততক্ষণ যত গভীরতা এবং কার্যকুশলতা আমরা চাই, তাহা আসিতে পারিবে না। তার এক বিশেষ কারণ আছে। প্রত্যেক কাজের জন্য প্রথা দাঁড়াইয়াছে যে, চাকুরীপ্রার্থী হয় ডিগ্রীধারী হইবে অথবা কলেজি শিক্ষা পাইয়া থাকিবে। এমন কি যেখানে একবিষয়ে জ্ঞানের অপেক্ষা ব্যবহারিকতা ও কার্যকুশলতা বেশী আবশ্যক, সেখানেও ইউনিভার্সিটির ডিগ্রীর মহত্ত্ব বেশী দেওয়া যায়। যতক্ষণ ব্যবহারিকতা এবং সত্যকার কর্মের অনুভব যথোচিত স্থান না পাইবে, ততক্ষণ এই ত্রুটি দূর হইতে পারিবে না।—আমাদের প্রাচীন

সংস্কৃতিতে গুরু এবং শিষ্যের মধ্যে অত্যন্ত সুন্দর এবং প্রীতির সম্বন্ধ ছিল। ইহার কারণ ছিল; দুইজনের পরস্পর বিশ্বাস থাকিত। গুরু শিষ্যকে পুত্রের ন্যায় দেখিতেন আর স্নেহ করিতেন। শিষ্য গুরুকে পিতার তুল্য পূজনীয় এবং বিশ্বাসযোগ্য মনে করিতেন। শিষ্যের জীবনের উপরে গুরুর গভীর প্রভাব পড়িত, আর গুরু এবং শিষ্যের মধ্যে কেবল পয়সার বদলে পুস্তক পড়াইয়া দেওয়ার ব্যাপারিক সম্বন্ধ হইত না। একসঙ্গে বসবাসের ফলে এক প্রকারের ঘনিষ্ঠ আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ ঘটিত। আজকাল আমরা প্রায়ই শুনিতে পাই যে, এক এক স্থানে বিদ্যার্থিগণ শিক্ষকের বিরুদ্ধে হরতাল করিয়াছে আর এক স্থানে শিক্ষকদের মধ্যেই দলাদলি হইয়াছে আর কিছু বিদ্যার্থী এক দলের সঙ্গে আর কিছু বিদ্যার্থী অপর দলের সঙ্গে মিলিত হইয়া জটিল অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। কোথাও শিক্ষক পরীক্ষা সম্বন্ধে কিছু কঠিন প্রশ্ন করিলেন, তাহার জন্য কতক বিদ্যার্থী অসন্তুষ্ট হইয়া শিক্ষককে আক্রমণ করিল অথবা তাহার প্রাণনাশ করিল। ইহাও শোনা যায়—যদি বাহিরের লোক বিদ্যার্থীদের কোনো অন্যায় কাজে বাধা দেন কিম্বা নিন্দা করেন, বিদ্যার্থীরা তাঁহাদের উদ্দেশ্য না বুঝিয়া সংঘট ঘটান। যখন সমস্ত স্কুল এবং কলেজের বিদ্যার্থিগণ একদল হইয়া ব্যাপক ধর্মঘট বা সংঘটে যোগদান করেন, তখন সত্যই বড় চিন্তার কারণ হইয়া যায়। আমি যতদূর বুঝিতে পারি, ইহার মূল কারণ চরিত্রগঠনের উপেক্ষা এবং ছাত্রদের উপর শিক্ষক সম্প্রদায়ের নৈতিক প্রভাবের হ্রাস। আমি যাহা বলিলাম—তাহা কেবল প্রদেশবিশেষ লক্ষ্য করিয়া নহে, সাধারণভাবে ইহা এক সারাদেশের সমস্যা।—আজ মানবসমাজের বহু শক্তি পরস্পর বিরোধ বাড়াইবার জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। বিজ্ঞান মানুষের জন্য দেবী-বরদান না হইয়া অসুরীয় অভিশাপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান এবং বৈজ্ঞানিকদের মানসিক শক্তি এবং তপস্যা ভীষণাতিভীষণ ঘাতকশস্ত্র এবং যন্ত্র আবিষ্কারে লাগিয়াছে, আর আজ কেহ নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাইতে পারে না। মানুষ দৈবশক্তি পাইয়াছে, কিন্তু তাহাকে সকলের উপকার এবং কল্যাণের জন্য উপযোগ করিতে শেখে নাই। আমাদের মস্তিষ্ক আকাশের দিকে প্রসারিত হইতেছে, কিন্তু হৃদয় ক্ষুদ্র এবং সংকুচিত হইয়া পড়িতেছে। আমি মনে করি যে, মানব শরীরে পোষক রক্ত সঞ্চার করিবার শক্তি হৃদয়ে থাকে, মস্তিষ্কে নহে। আর নিজের ভরণপোষণের জন্য মস্তিষ্ককেও হৃদয়ের উপর নির্ভর করিতে হয়। আমরা সেই হৃদয়কে উপেক্ষা করিয়া কেবল মস্তিষ্কের দ্বারা নিজেকে কিম্বা অন্য কাহাকেও সুখী করিতে পারি না। মনুষ্য-সমাজের কাছে আজ এক বিরাট প্রশ্ন এই যে, হৃদয়কে কি প্রকারে বলবান ও মহান করা যায়। আমি মস্তিষ্কের উন্নতির নিন্দা করি না। আমি তাহার প্রগতির অবরোধ করিতে চাহি না। বিজ্ঞানকে অবাধরূপে নিজের কাজ করিতে দেওয়া শ্রেয়স্কর কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়কে বল দিবার জন্য কি করা দরকার, তাহা আমাদেরই স্থির করিতে হইবে।—যতদিন আমরা জাতীয় চরিত্র গঠনের উপর দৃষ্টি না দিব, বুদ্ধি বিকাশের চেষ্টা করিয়া অবিদ্যা কিছু কিছু পার করিয়া বিদ্যালাভ করিলেও ঘোর অন্ধকারে জাতি পড়িয়া থাকিবে। এই আত্মবিদ্যা ভারতের সমস্ত সংসারকে সর্বাধিক মহত্বপূর্ণ দান হইতে পারে, আর ভারত যতক্ষণ স্বয়ং সেই দান প্রাপ্ত না হইবে, ততক্ষণ তাহা অন্যকে দিতে পারিবে না।'

বিবৃতিদ্বারা শিক্ষা সম্বন্ধে মাত্র কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন তুলিয়াই ডাঃ প্রসাদ নিবৃত্ত হন নাই, শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয় চরিত্রগঠনের উপর বিশেষ জোর দিয়া দেশকে হৃদয়ের পথে মহৎ হইতে তিনি নির্দেশ দিয়াছেন। তাঁহার বিবৃতিতে কোথাও ত্রুটি নাই, বরং তাহা বিশেষ প্রাণধর্মী হইয়াই উঠিয়াছে। ত্রুটি আমাদের জাতীয় চরিত্রে, ত্রুটি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও বিদ্যালয় সংশিলষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে। দেশ আজ স্বাধীন। স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিককে আজ নানাভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে। তাহার মূলে রহিয়াছে আত্মিক শিক্ষা আর নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ বিধান। সেই বিধানকে যাহাতে জয়যুক্ত করিয়া তোলা যায়, তজ্জন্য বিশ্ববিদ্যালয় তথা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের গুরুদায়িত্বকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। এ সম্পর্কে ভারত সরকারের দায়িত্বও সমধিক।

নিখিল ভারত চিকিৎসক সম্মেলন

গত ২৬শে ডিসেম্বর কলিকাতা প্রিন্স্ অব্ ওয়েলস্ মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে নিখিল ভারত চিকিৎসক সম্মেলন আরম্ভ হয়। ডাঃ বি ভি মূলে সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে যে সমস্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সম্মেলনে যোগদান করেন, তাঁহাদের মধ্যে ডাঃ টি এন মুখার্জি, ডাঃ ত্রিমূর্তি, ক্যাপ্টেন পি বি মুখার্জি, ডাঃ টি ব্যানার্জি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। সভাপতি ডাঃ বি ভি মূলে অভিভাষণ প্রসঙ্গে বলেনঃ 'প্রতি ক্ষেত্রে জাতিগঠনের জন্য বহু পরিকল্পনা করা হইয়াছে। সেই

পরিকল্পনাগুলিকে এখন কার্যে রূপ দিতে হইবে। কিন্তু পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করিতে হইলে মানুষের শক্তি অত্যাবশ্যক। কিন্তু মানুষ যদি উপযুক্ত স্বাস্থ্যের অধিকারী না হয়, তাহা হইলে জাতির পক্ষে তাহা দুর্বহ ভারস্বরূপ হইয়া ওঠে। সুতরাং স্বাস্থ্যকে কিছুতেই অবজ্ঞা করা যাইতে পারে না। কারণ এই পুনর্জন্মপ্রাপ্ত জাতির পুনর্যৌবন লাভের সঙ্গে স্বাস্থ্যের প্রশ্ন বিশেষভাবে জড়িত। ভারত সরকার তাঁহাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জনসাধারণের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত শিক্ষাকেও অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু 'আপনার স্বাস্থ্য' নামে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে একটি সাময়িকপত্র নিয়মিত প্রকাশ করিয়া ভারতীয় চিকিৎসক সমিতি ইতিপূর্বেই জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পরিবেশন করিতেছেন। কিন্তু ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, গত দীর্ঘ ৩০ বৎসরকাল ভারতীয় হাসপাতালগুলির পরিচালনা এবং চিকিৎসাবিদ্যায় উচ্চ শিক্ষাদানের ভার দেশীয় চিকিৎসকদের উপর ন্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও বিদেশী হাসপাতালগুলির মতো উন্নত মান এখনো আমাদের দেশ লাভ করিতে পারে নাই।'

কতদিনে যে তাহা সাধ্যায়ত্ত হইবে, তাহারও কোনো নিশ্চয়তা নাই। ডাঃ মুলে বলিয়াছেনঃ 'এই পুনর্জন্মপ্রাপ্ত জাতির পুনর্যৌবন লাভের সঙ্গে স্বাস্থ্যের প্রশ্ন বিশেষভাবে জড়িত; কিন্তু জাতীয় স্বাস্থ্যের উন্নত মানের পক্ষে যাহা-কিছু করণীয় আমাদের জাতীয় সরকার তাহা অদ্যাপি করিয়া উঠিতে পারেন নাই। আমাদের গত সংখ্যায় আমরা শিশু-মৃত্যুর হার সম্পর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গেই তৎসম্বন্ধে আংশিক আলোচনা করিয়াছি। একটা সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক দেশে কোনো মানুষ যাহাতে অত্যধিক রোগাক্রান্ত হইয়া না পড়েন, তৎপ্রতি দৃষ্টি দেওয়া যেমন সেই দেশের চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের কর্তব্য, তেমনি সেই গণতান্ত্রিক সরকারের কর্তব্য—এই ভাবের বশবর্তী হইয়া চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সম্প্রসারতা বাড়ানো। দুঃখের বিষয়, ভারতের পক্ষে তাহা কল্পনা করাও অদ্যাবধি দুঃসাধ্য। কিন্তু দুঃসাধ্য হইলেও দুরতিক্রম্য কিছু নয়। ভারত যদি সেইপথে আশু সচেতন হইয়া কার্যকরী অংশ গ্রহণ না করে, তবে ক্রমেই যে দেশের মাটি ব্যাধির আকড় হইয়া দাঁড়াইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এদেশে ম্যালেরিয়া যেমন মহামারী রূপে দেখা দিয়াছে, তেমনি কলেরা, বসন্ত, যক্ষ্মা, যৌনব্যাধি, বেরিবেরি, ক্যান্‌সার প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধির সংখ্যাও দিনদিনই বাড়্‌তির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। এই ব্যাধিগুলি সম্পর্কে গবেষণার কাজ যে কিছু কিছু না চলিয়াছে, এমন নয়। তাহাকে আরও ব্যাপক করিয়া তুলিতে হইবে। আগে জাতির স্বাস্থ্য, তবে তার শিক্ষা ও আদর্শ। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী রাজকুমারী অমৃত কাউর এতদ্‌সম্পর্কে অনবহিত নহেন। বাংলার স্বাস্থ্য অন্যান্য প্রদেশাপেক্ষা অত্যন্ত নিম্নগামী। এতদ্‌সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কিছু কার্যকরী পথের উল্লেখ করিলে আশ্বস্ত হইবার কারণ থাকিত।

ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেস অধিবেশন

সম্প্রতি লক্ষ্ণৌ সহরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের চত্বারিংশত্তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করিয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরু বলেনঃ 'ভারত আজ বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন। জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা। দেশের বাস্তব সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য আমরা বৈজ্ঞানিকদের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।' ভারতে জনসাধারণের সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি এবং বৈজ্ঞানিক মনোভাব গড়িয়া তুলিবার প্রচেষ্টাতেও তিনি বৈজ্ঞানিকদের আত্মনিয়োগ করিতে আহ্বান জানান। মূল সভাপতি ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু তাঁহার ভাষণ প্রসঙ্গে বলেনঃ পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক ভাবধারার প্রভাবে বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষায় ক্রমশঃ বহু পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। এই পরিবর্তনের ফল বর্তমান সভ্যসমাজে গভীর আগ্রহের সৃষ্টি করিবে। বর্তমানে আমাদের বিশেষ বিবেচ্য বিষয় এই যে, পরীক্ষামূলকভাবে আমাদের দ্বারা গৃহীত পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও কারিগরী পদ্ধতি এবং রাজনৈতিক ভাবধারার সাহায্যে বর্তমান আভ্যন্তরীণ ক্রমবর্ধমান আর্থিক অনটন ও বাহিরের প্রতিযোগিতা এবং সম্ভাব্য বৈদেশিক প্রভাবের চাপের মধ্যে আমাদের পুঞ্জীভূত অনড় প্রথা ও সংস্কারমুক্ত হইয়া ক্রমবর্ধমান জটিলতা ও অসুবিধার মধ্যে আমাদের সভ্যতাকে বিশ্বসভায় আসন লাভের উপযোগী করিয়া নূতন রূপ দেওয়া সম্ভব কিনা!'

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্য লইলেও অদ্যাবধি জাগতিক সভ্যতার ইতিহাসে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যে মানব কল্যাণের মহত্তর কার্যে আত্মনিয়োগের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, একথা ভুলিলে চলিবে না। বিশ্বের পর-পর দুইটি মহাযুদ্ধ এবং অন্যান্য খণ্ডযুদ্ধগুলির মধ্যেই তাহার পরিচয় নিহিত রহিয়াছে। অন্যান্য বিভাগীয় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দ্বারা বিজ্ঞানের উন্নতি হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই উন্নতির সঙ্গে মানবজাতির উন্নতি সম্ভব হয় নাই।

তাহার মূল কারণই হইতেছে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞান আদর্শভ্রষ্ট হইয়াছে। অন্ধকার যুগের বিলুপ্তির মধ্যে ভারতীয় বিজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেও ভারতীয় বিজ্ঞানের আদর্শ কিন্তু সংকীর্ণ ছিল না। বৈদেশিক পরবশতার যুগে সে আদর্শ তাহার ডুবিয়া গিয়াছিল। স্বাধিকারের নবীন ঊষালগ্ন হইতে পুনরায় তাহাকে তাহার বিস্মৃত আদর্শের দিকে দৃষ্টি ফিরাইতে হইয়াছে। আজ ভারতীয় জীবনে সমস্যার অন্ত নাই। এখানে গণজীবনের ভয়াবহ দারিদ্র্য, তাহাদের নিরক্ষরতা, জাতির জীবনে মৃত্যুহার, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস, খাদ্যাভাব, জমির উৎপাদন শক্তি হ্রাস, রাস্তাঘাট, যানবাহন চলাচলের অভাব প্রভৃতি—জাতীয় দৈন্যেরই পরিচয় বহন করে। কোন্ শক্তির প্রক্রিয়ায় এবং কোন্ মন্ত্রবলে এই গুরু সমস্যাবলীর সমাধান হইবে? সেই সমাধানের পথের সন্ধান দিতে পারেন একমাত্র বৈজ্ঞানিকেরা। ভারতের ভবিষ্যৎ তাহার বৈজ্ঞানিক গবেষণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। শস্যের উৎপাদন এবং জমির উর্বরতাবৃদ্ধি—ইহাই একটা জাতির বাঁচিয়া থাকিবার সমস্যার সঙ্গে প্রধানতঃ সংশ্লিষ্ট। এখানে মরুভূমি এবং ঐ ধরণের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে যাহাতে নূতন ধরণের শস্য উৎপাদন করা যায়, তজ্জন্য গবেষণার প্রয়োজন। জমির উর্বরতা শক্তির সঙ্গে কোন্ কোন্ প্রাকৃতিক বস্তুর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তৎসম্পর্কিত গবেষণারও প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। শুধু এই শস্যোৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি নয়, যাহাতে এই সব শস্যের পুষ্টিকারিতা বৃদ্ধি পায় এবং জমির উৎপাদিকা শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহার জন্য কশ্মিক্ রশ্মি ও সৌরশক্তির নিয়ন্ত্রণে কোনো আশু ফললাভ সম্ভব কিনা—তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিবার প্রয়োজন।

অধিবেশনে শ্রীযুক্ত কে এম্ মুন্সী এসব সম্পর্কে অবশ্য আলোচনা করিয়া সকলের চেতনার উদ্রেক করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। এতদ্ব্যতীতও চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের বৃহত্তর প্রয়োগশক্তির বিভিন্ন দিক্ রহিয়াছে। জনসাধারণের জীবনের মান উন্নয়নের পক্ষে বিজ্ঞানের যত রকম কল্যাণকর দিক রহিয়াছে—তৎসম্বন্ধে আকুতি এবং আলোচনা আজ নানাদিকেই মুখর হইয়া উঠিয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু আলোচনার মুখরতাই ব্যবহারিক প্রয়োগশীলতার শেষ কথা নয়। আলোচনা উন্মাদনা মাত্র। এখন আর কালবিলম্বের সময় নাই। স্বাধিকার অর্জনের পর আজ দীর্ঘ পাঁচ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গেল। এখন আর বিবৃতি দান বা স্কীম তৈরীর সময় নাই। এখন কেবল কাজ, কাজের দ্বারা ফলপ্রসূতা অর্জন। অধিবেশনে এইরূপ কিছু মন্তব্যের পরিচয় পাইলে আমরা আশ্বস্ত হইতাম। আশা করিব—ভবিষ্যতের অধিবেশনগুলি যেন কেবল বিবৃতিভারাক্রান্ত না হইয়া কর্মপ্রসূতার পরিচয়ের মধ্যে শ্রীমণ্ডিত হইয়া ওঠে।

নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব

গত ২৪, ২৫ ও ২৬শে ডিসেম্বর কটকে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের গত পৌষ সংখ্যায় এ সম্পর্কে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। সম্মেলনে পূর্ববঙ্গের আশ্রয়চ্যুত উদ্বাস্তু অধিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা করিবার জন্য কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারদের নিকট দাবী জানাইয়া এবং ভারতের সর্বত্র অধিবাসীদিগকে, বিশেষতঃ বিভিন্ন প্রদেশের বাঙালীদিগকে তাঁহাদের এই সকল ছিন্নমূল ভ্রাতাভগিনীদিগকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিবার জন্য আবেদন জানাইয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। অপর একটি প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তর এবং রাজ্য সরকারগুলিকে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে মাতৃভাষাকে ছাত্রদের শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ করিবার জন্য এবং ঐ একই ভাষার মাধ্যমে ছাত্রদের পরীক্ষা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান হয়। দেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে ভাবের সহজ আদানপ্রদানের জন্য ছাত্রদিগকে মাতৃভাষা ব্যতীত অপর একটি ভারতীয় ভাষা শিক্ষা দিবার ব্যাপারে সাহায্য ও উৎসাহ দিবার নিমিত্ত কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলিকে অনুরোধ জানাইয়াও সম্মেলনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। অপর একটি প্রস্তাবে ডক্টর বিজনবিহারী ভট্টাচার্য কর্তৃক সাফল্যের সহিত প্রদর্শিত তারবার্তা প্রেরণ পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া ভারতের সর্বত্র বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় তারবার্তা প্রেরণের ব্যবস্থা করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে আবেদন জানান হয়।

পরবর্তী অধিবেশন বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া প্রস্তাব করা হয়। আগামী বৎসরের জন্য নিম্নোক্ত সদস্যগণ সম্মেলনের কর্মকর্তৃবৃন্দ নির্বাচিত হনঃ

সভাপতি—শ্রীদেবেশচন্দ্র দাস, আই-সি-এস, সহ-সভাপতি—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ কর (এলাহাবাদ), শ্রীরাসবিহারী সেন (নয়াদিল্লী), শ্রীমোহন দাশগুপ্ত (কটক) এবং শ্রীশিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (বোম্বাই); সম্পাদক—শ্রীঅজিত চক্রবর্তী

(নয়াদিল্লী); কোষাধ্যক্ষ—শ্রীমহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য; পরীক্ষা বিভাগের প্রধান কর্তা—শ্রীকিরণ সিংহ (এলাহাবাদ); সম্মেলনের মুখপত্রের সম্পাদক—শ্রীদীপেন সরকার (পাটনা); সদস্যগণ—শ্রী কে পি গোস্বামী (এলাহাবাদ), শ্রীঅমিয় দত্ত (আগ্রা), শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ (কলিকাতা), শ্রীঅমিয় সেন (কটক), শ্রীঅনিল মৈত্র এবং শ্রীগোবিন্দ চৌধুরী।

এশিয়া ও দূরপ্রাচ্য কমিশন

কলিকাতা বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স ভবনে আন্তর্জাতিক চেম্বার অব কমার্সের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এশিয়া ও দূরপ্রাচ্য শিল্প-বাণিজ্যিক কমিশনের অধিবেশনটি সাম্প্রতিক ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন শ্রীশান্তিপ্রসাদ জৈন এবং উদ্বোধন করেন শ্রী টি টি কৃষ্ণমাচারী।

এশিয়া ও দূর প্রাচ্যের দেশসমূহের শিল্প-বাণিজ্যিক সমস্যাসমূহের পর্যালোচনা এবং ইকাফের (এশিয়া ও দূর প্রাচ্যের অর্থনৈতিক কমিশন) সভায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে ১৯৫২ সালের এপ্রিল মাসে এই 'এশিয়া ও দূরপ্রাচ্য কমিশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। আলোচ্য অধিবেশনে জাপান, ভারত, সিংহল, সিঙ্গাপুর, যুক্তরাজ্য, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানী, নেদারল্যাণ্ডস্, অষ্ট্রিয়া এবং এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যের অর্থনৈতিক কমিশনের বহুসংখ্যক প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষকগণ যোগদান করিয়া পারস্পরিক নানা বিষয়ক আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। ভাষণপ্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত জৈন বলেনঃ 'এশিয়ার প্রতিটি বৃহৎ রাষ্ট্রেই দ্রুত সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন হইয়াছে। নূতন রাষ্ট্রের পত্তন ও নূতন সরকার গঠিত হইয়াছে। কিন্তু মাত্র রাজনৈতিক মুক্তির ফলেই অর্থনৈতিক পরিবর্তনসাধন সম্ভব নয়। দেশের সম্পদ ও আয় সমভাবে বণ্টন ও সকলের সমান সুযোগ লাভের উপর এখন সকল সভ্যদেশই জোর দিতেছে। এই মানসিক পরিবর্তন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এশিয়ার জনসংখ্যা পৃথিবীর জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশী। অথচ সারা বিশ্বের উৎপাদনের মাত্র এক-দশমাংশ এখানে উৎপন্ন হয়। অন্যদিকে উত্তর আমেরিকার লোকসংখ্যা পৃথিবীর লোকসংখ্যার এক-দশমাংশেরও কম। অথচ পৃথিবীর উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৪৫ ভাগ তথায় উৎপন্ন হইতেছে। প্রাকৃতিক সম্পদ সকল দেশের সমান না হওয়া এই অসামঞ্জস্যের একটি কারণ।'...শ্রীকৃষ্ণমাচারী বলেনঃ 'শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এই প্রকার গুরুতর অসাম্যের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন—ইহা শুভ লক্ষণ।' এই উপলব্ধিই সময়ে অসাম্য দূরীভূত করিতে সহায়তা করিবে বলিয়া তিনি আশা করেন।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অর্থ হইতেছে পারস্পরিক আদান-প্রদানের অধিকারের স্বীকৃতি। ইহা স্বীকার করিয়া লইলে বিকাশমান জাতীয়তা কখনও অর্থনৈতিক স্বার্থপরতাকে প্রশ্রয় দিতে পারে না। দারিদ্র্য হইতেই অসাম্যের উদ্ভব হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত দরিদ্র জাতিসমূহকে সমৃদ্ধশালী জাতিসমূহের তুলনায় ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ করিতে দেওয়ার ব্যাপারে কিছুটা পৃথকভাবে ব্যবহার করা কি কমিশনের পক্ষে সম্ভব হইবে? ইহা কিরূপে করা সম্ভব হইবে—রক্ষাকবচের প্রাচীর কি উপায়ে ধ্বংস করা সম্ভব হইবে—এই সকল সমস্যা সম্পর্কে কমিশনকে বিবেচনা করিতে হইবে।—যথোপযোগি সিদ্ধান্তের দ্বারা পরিচালিত হইয়া কমিশন সুচারু কর্মপ্রসূতার পরিচয় দিতে না পারিলে বলিতে হইবে, সূচীবদ্ধ অনুষ্ঠানের মধ্যেই মাত্র ইহা সীমাবদ্ধ, ইহার বাহিরে গঠনশীলধর্মে অগ্রসর হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। অনুন্নত দেশ হিসাবে কেবল ভারতবর্ষের দিক হইতেই বোধ করি—এ প্রশ্ন তোলা অসমীচীন হইবে না যে, কমিশন অতঃপর যথার্থই কি আকার ধারণ করিবে?

নিরাপত্তা পরিষদে ঈঙ্গ-মার্কিন কাশ্মীর প্রস্তাব

গত ২৩শে ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদ পূর্বঘোষিত কাশ্মীর সংক্রান্ত ইঙ্গ-মার্কিন প্রস্তাবটি ৯-০ ভোটে অনুমোদন করেন। ভোটদানের ব্যাপারে সোভিয়েট ইউনিয়ন বিরত থাকেন। প্রস্তাবটিতে কাশ্মীর হইতে সৈন্যাপসরণের পরে যুদ্ধবিরতি সীমারেখার উভয় পার্শ্বে সুনির্দিষ্ট সৈন্যসংখ্যা কত থাকিবে, তৎসম্পর্কে মীমাংসায় পৌঁছিবার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের কাশ্মীর প্রতিনিধি ডাঃ ফ্রাঙ্ক গ্রাহামের নেতৃত্বাধীনে অবিলম্বে আলোচনা আরম্ভ করিতে ভারত ও পাকিস্থান সরকারকে অনুরোধ জানানো হয়। ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেত্রী শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত নিরাপত্তা পরিষদকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানান যে, ইঙ্গ-মার্কিন প্রস্তাবের ভিত্তিতে ভারত কাশ্মীর বিরোধ সম্পর্কে পাকিস্থানের সহিত কোনোরূপ আলাপ-আলোচনা চালাইবে না। প্রস্তাব সম্পর্কে ত্রিবান্দ্রমের এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরু বলেন যে, উক্ত প্রস্তাবের নির্দেশের চাপে ভারত কোনো কাজ করিবে না।

শ্রীনেহের্ বলেনঃ কাশ্মীর সম্পর্কে মূল সমস্যা, অর্থাৎ আমাদের মূল অভিযোগে যাহা উত্থাপিত হইয়াছিল, নিরাপত্তা পরিষদ ক্রমান্বয়ে তাহা এড়াইয়া চলিতেছেন। ইহা আমার নিকট অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। পাকিস্থানই কাশ্মীর আক্রমণ করিয়াছে, ইহার ইঙ্গিত করিতে যাইয়া কাশ্মীর কমিশনও পরোক্ষভাবে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদ মূল সমস্যা বিচারের মধ্যে না আনিলেই কাশ্মীর সমস্যার আলোচনা করিতেছেন। নিরাপত্তা পরিষদের গত অধিবেশনে জনৈক সদস্য সুস্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছেন যে, তাঁহারা অতীত সম্পর্কে অথবা কিরূপে সমস্যার উদ্ভব হইল, তৎসম্পর্কে বিবেচনা করিবেন না। একটি দায়িত্বশীল প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এইরূপ মনোভাব একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার বলিয়া আমার মনে হয়।—কাশ্মীর সম্পর্কে আমাদের মনোভাব কতিপয় মূলনীতি এবং প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। যদি আমাদের এই মূলনীতি এবং প্রতিশ্রুতি বর্জন করিতে বলা হয়, আমরা তাহা পারিব না। কারণ ইহা একটা বিশেষ কোনো অঞ্চল বা আমাদের সুবিধা অসুবিধার প্রশ্ন মাত্র নয়, ইহা সমগ্র ভারত সম্পর্কে আমাদের কতিপয় নীতি মানিয়া চলার প্রশ্ন। এই নীতি বর্জন করিলে সমগ্র ভারতের ক্ষতি হইবে এবং তাহার ফল হইবে অত্যন্ত মারাত্মক। যাহারা আমাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তাহাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা আত্মমর্যাদাসম্পন্ন যে কোনো দেশের পক্ষে অত্যন্ত হীনতার পরিচায়ক হইবে।

একটা উক্তির মতো উক্তি বটে। ইহার উপর নতুন করিয়া কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করি না।

শোক-সংবাদ

কবি-দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

সম্প্রতি কবি-দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের আকস্মিক মৃত্যু বাংলা সাংস্কৃতির ইতিহাসে একটি মর্মান্তিক ঘটনা। তিনি একাধারে কবি, দার্শনিক, সমালোচক, কাহিনীকার ও অধ্যাপক ছিলেন। জীবনকে নানাদিকে ফলবান করিয়া তুলিয়া বিশ্ব-চেতনার সঙ্গে আত্ম-চেতনার সমন্বয়ে এক নবতম সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিবার সাধনায় তিনি সারা জীবন রত ছিলেন। কবিশেখরের ভাষায় বলা যায়ঃ 'ভারতীয় অধ্যাত্মবিদ্যার গভীর জ্ঞানের যে পরিণতি প্রত্যাশিত, তাঁহার জীবনে তাহা ঘটে নাই। ইউরোপীয় দর্শন তিনি ভারতীয় দর্শনের মতই অভিনিবেশের সহিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি ইংলণ্ডীয় ভক্ত ছিলেন কাণ্ট্, হেগেল, সোপেনহায়ার প্রভৃতি দার্শনিকদের। ইউরোপীয় দর্শন তাঁর জীবনযাত্রায় সাত্ত্বিকতার পরিপন্থী হয় নাই। তিনি ইউরোপীয় বিজ্ঞানের বিবিধ শাখার গ্রন্থাদিও যত্নের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন। বিজ্ঞান

পাঠের ফল ও ইউরোপীয় সভ্যতার পরিবেশের প্রভাব তাঁহার জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। তাঁহার দার্শনিক মতবাদের সঙ্গে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের সর্বত্র মিল ছিল না। তিনি সমাজধর্ম মানিয়া চলিতেন, কিন্তু হিন্দুর দেবদেবীবাদ, পৌত্তলিকতা, জন্মান্তরবাদ, পরলোকবাদ—এ সমস্ত মানিতেন না। ভারতের অধ্যাত্মবিদ্যার জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে অধিগত করিয়া তিনি বিশ্বের বিদ্বৎসমাজে বিতরণ করিয়াছেন। তাহাতে ভারতের প্রাচীন সভ্যতার গৌরব তাঁহার দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে।'

সুরেন্দ্রনাথের ইংরেজি ও বাংলাভাষায় রচিত গ্রন্থসংখ্যাও কম নয়। তন্মধ্যে ইংরেজিতে A history of Indian Philosophy 5vols ; A study of Patanjali ;

Yoga Philosophy in relation to other systems of Indian thought; Yoga as Philosophy and Religion; Hindu mysticism; Indian Idealism; A history of Sanskrit (classical period) এবং বাংলায়—দার্শনিকী, রবি-দীপিতা, সাহিত্য-পরিচয়, কাব্য-বিচার, তত্ত্বকথা, আয়ুর্বেদ, ক্ষণলেখা, নিবেদন, বিজয়িনী, চারণী, চারণ, সৌন্দর্যতত্ত্ব, ভারতীয় দর্শনের ভূমিক, প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলা, অধ্যাপক (উপন্যাস) প্রভৃতি প্রধান। এতদ্ব্যতীত তাঁহার বহু রচনা বহু পত্রে ছড়াইয়া আছে। সেগুলিকে সংগ্রহ করিয়া ভবিষ্যতে কোনো উৎসাহী প্রকাশক গ্রন্থ প্রকাশ করিলে সুখের কারণ হইবে।

সুরেন্দ্রনাথের আদি নিবাস বরিশাল জেলার গৈলা গ্রামে। ১৮৮৫ সালে নদীয়া জেলার কুষ্ঠিয়া মহকুমায় তাঁহার জন্ম। পিতা কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত তখন কুষ্ঠিয়ায় কানুনগোর কাজ করিতেন। কার্যব্যপদেশে তাঁহাকে নানা-স্থলে ঘুরিতে হইত। সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথেরও স্থান পরি-বর্তন ঘটিত। এই কারণে প্রথম জীবনে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে থাকিয়া কোনো নির্দিষ্ট বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। এতদ্সত্ত্বেও শিশুকাল হই-তেই তাঁহার মধ্যে অসাধারণ প্রতিভার লক্ষণ সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে এবং এমন কি সপ্তম অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রাবস্থাতেই নানারূপ দার্শনিক আলোচনা ও তর্কের দ্বারা তিনি বহু চিন্তাশীল ব্যক্তিকে চমকিত ও বিস্মিত করেন। ১৯০০ সালে কৃষ্ণনগরে থাকাকালে সুরেন্দ্রনাথ প্রথম ডিভিশনে এন্‌ট্রান্স পাশ করেন। অতঃপর কিছুকাল গৈলায় থাকিয়া তাঁহার প্রপিতামহ-প্রতিষ্ঠিত টোলে (কবীন্দ্র কলেজ) যোগ-দানের পর পুনরায় কৃষ্ণনগরে আসিয়া এফ্‌-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং নির্দিষ্টকালে বি-এ পাশ করিয়া কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে আসিয়া এম্‌-এ ক্লাসে ভর্তি হন। তৎকালে বি-এ ক্লাসে বিজ্ঞানও অবশ্য-পাঠ্য ছিল; কেমিষ্ট্রি প্রভৃতি গ্রন্থ সুরেন্দ্রনাথের একরূপ কণ্ঠস্থই হইয়া গিয়াছিল। এম্‌-এ পড়িবার পূর্বে কিছুকাল তিনি বাড়ীর টোল লইয়া কাটান। পরে ১৯১০ সালে ইংরেজি দর্শনে এম্‌-এ পাশ করিয়া কর্মজীবনে অবতীর্ণ হন। প্রথমতঃ কিছুকাল তিনি অস্থায়ীভাবে রাজসাহী কলেজ ও ব্রজমোহন কলেজে অধ্যা-পনা করেন, পরে ১৯১১ সাল হইতে ১৯২০ পর্যন্ত চট্টগ্রাম গভর্ণমেন্ট কলেজে সংস্কৃত ও বাংলার সিনিয়র প্রফেসার-রূপে কাজ করেন এবং ১৯২২ সালে তিনি ভাইস-প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন। ইহার দুই বৎসর পর ১৯২৪ সালে সুরেন্দ্রনাথ আই-ই-এস উপাধি লইয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরেজি দর্শনের প্রধান অধ্যাপক ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রের লেকচারার পদ লাভ করেন। অতঃপর ১৯৩১ সালে তিনি সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হন এবং ১৯৪২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের নীতিবিজ্ঞান অধ্যাপকের পদলাভ করেন ও ১৯৪৫ সালে অধ্যাপনা পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯২০ সালে সুরেন্দ্রনাথ ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের গবেষণায় কলি-কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ-ডি ও ১৯২২ সালে ইংরেজি দর্শনের গবেষণায় কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-ফিল হন এবং ১৯৩৯ সালে রয়াল ইউনিভারসিটি অব রোম তাঁহাকে ডি-লিট্ উপাধিতে ভূষিত করেন। প্রতীচ্যে তিনি ছিলেন প্রাচ্য-দর্শনের পরিবাহক। অবসর গ্রহণ করিয়া শেষ বয়সে সুরেন্দ্রনাথ লক্ষ্ণৌয়ে বাস করিতেছিলেন। ইউনিভারসিটির ভিতরেই তাঁহার বাসা ছিল। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার A History of Indian Philosophy-র ৫ম খণ্ড লিখিতে ছিলেন। কিন্তু তাহা সমাপ্ত হইবার পূর্বেই গত ১৮ই ডিসেম্বর অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া তিনি লোকান্তর যাত্রা করেন। বাংলার সংস্কৃতি-সঙ্কটের দিনে এমন একটি বিরাট মনীষার অবসান বাঙালী জাতির কাছে যে কি নিদারুণ শোকাবহ—তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

পশ্চিম ইউরোপ ভ্রমণ। ভূপর্যটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাস প্রণীত। পর্যটক প্রকাশনা ভবন, কলিকাতা। মূল্য—২৲ টাকা মাত্র।

আলোচ্য গ্রন্থে প্রধানতঃ লেখকের হল্যাণ্ড এবং বেলজিয়াম ভ্রমণের বিস্ময়কর কাহিনী রূপায়িত হইয়াছে। লেখক পর্যটক হিসাবে শুধু বাংলাদেশেই নয়, পৃথিবীর বহু দেশেই পরিচিত। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তকে এইরূপ এক একখানি গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি জনসাধারণের চিত্তে দেশ-বিদেশ সম্পর্কে কৌতূহল ও বিস্ময়ের সঞ্চার করিয়াছেন। যাঁহারা বিদেশে যাইয়া নানা দেশের নানা রোমাঞ্চকর কাহিনী ও ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হইতে পারেন নাই, রামনাথ বাবুর কাহিনী তাঁহাদিগকে চিরকালই ভ্রমণের আনন্দ পরিবেশন করিয়া আসিতেছে। আলোচ্য গ্রন্থে হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের যে বিপ্লবী প্রাণশক্তি ও ঐতিহ্যময় ঐতিহাসিক তত্ত্ব সুললিত ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে, পাঠকমাত্রকেই তাহা আনন্দে, বীর্যে এবং কাহিনীর চমৎকারিত্বে মুগ্ধ ও উদ্বুদ্ধ করিবে। মনোরম প্রচ্ছদপটে গ্রন্থখানির শোভা সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কণ্ট্রোলের অভিশাপ। শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ প্রণীত। মূল্য—২৲ টাকা মাত্র।

গ্রন্থের নাম হইতেই ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কে পাঠক অবহিত হইতে পারেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে দেশের খাদ্যশস্য ও পরিধেয়র ঘাটতি রোধ করিয়া উহাকে সুনিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারী ব্যবস্থায় যে কণ্ট্রোল প্রথা গড়িয়া ওঠে—তাহাকে কেন্দ্র করিয়া ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ভিত্তিতে লেখক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বহু নিবন্ধ প্রকাশ করেন। আলোচ্য গ্রন্থে সেই বিভিন্ন নিবন্ধগুলিই সূচীবদ্ধভাবে স্থান পাইয়াছে। দেশে যেমন কণ্ট্রোলের সৃষ্টি হইয়াছে, তেমনি উহার অপব্যবহারও হইয়াছে। এই উভয় দিককেই লেখক তাঁহার বিভিন্ন নিবন্ধে সমভাবে বিচার করিয়াছেন। অর্থনীতির ছাত্রদের পক্ষে গ্রন্থখানি বিশেষ উপকারে আসিবে এবং জনসাধারণ কণ্ট্রোল প্রথার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত হইয়া ইহার ভালোমন্দ উভয় দিক সম্বন্ধেই কার্যকরী সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবেন।

উত্তরাপথঃ গল্পগ্রন্থ। সমীর ঘোষ। স্টারলাইট পাব্লিকেশন, কলিকাতা। দাম—২৲ টাকা মাত্র।

রসবস্তুকে যাহারা চিন্তাবস্তুতে টানিয়া লইয়া চিত্তপটে একটা গভীরতর দাগ আঁকিয়া যায়, অথচ অযথা বিবৃতি দ্বারা মনকে ভারগ্রস্ত করিয়া তোলে না, সমীর বাবু হইতেছেন সেই শ্রেণীর লেখক। ছোট ছোট কথায় বৃহত্তর ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করিয়া আবহ পরিবেশের মধ্যে তিনি তাঁহার ভাবসৃষ্ট নায়ক-নায়িকাকে এমন একটি স্বচ্ছন্দ গতিপথ দেওয়ার প্রয়াসী, যাহা তাঁহার ন্যায় বহু স্বল্পখ্যাত লেখকের পক্ষেই সম্ভব নয়। উত্তরাপথের গল্পগুলির মধ্যে এই পরিচয়ই প্রধান। অন্যূন ছোটবড় নয়টি গল্পে উত্তরাপথ সম্পূর্ণ। প্রায় প্রত্যেকটি গল্পেই বাঙালী-জীবনের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার ঘটনাবহুল চিত্র রেখায়িত হইয়া উঠিয়াছে। ছোটগল্পের অল্প-পরিচয়ের মধ্যে কোথাও কোথাও বিশেষ এক একটি টাইপের সন্ধানও অতি সহজেই পাওয়া যায়। ইহা লেখকের কৃতিত্বের পরিচায়ক। তবে কাহিনী হিসাবে প্রত্যেকটি গল্পই যে অভিনবত্বের দাবী রাখে, এ কথা বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে। তাই বলিয়া কোনো একটি চিত্রই মামুলি কাহিনীর কাঙালপনায় বিকৃত হইয়া ওঠে নাই। রসবস্তুর আতিশয্যে তাহা পাঠকমনকে অতি সহজেই আশ্রয় করিয়া দাঁড়ায়। সাম্প্রতিককালের গল্প-সাহিত্যের অতল সমুদ্রে আকস্মিক কোনো দমকা হাওয়ায় ডুবিয়া না গেলে ভবিষ্যৎ বাংলা কথাসাহিত্যে সমীর বাবু অনেক কিছু দিতে পারিবেন বলিয়াই আশা রাখি।

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস্ লিমিটেড
৯০, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-১৪ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তীর-তরঙ্গিনী [ফোটো—গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

বিংশ বর্ষ ফাল্গুন—১৩৫৯ ২য় খণ্ড—৩য় সংখ্যা

সাহিত্যের দান

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

Thou shalt love thy neighbour as thyself অর্থাৎ প্রতিবেশীকে আত্মবৎ ভালোবাসবে—এই বাণী সমস্ত উন্নতির পথপ্রদর্শক। কিন্তু সমস্ত মানুষই আমার প্রতিবেশী—এই পরমসত্যের উপলব্ধি অজ্ঞতার বন্ধনকে ছেদন করার পথেই কেবল সম্ভব। মানুষের সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানের পরিধি যতক্ষণ সঙ্কীর্ণ হয়ে আছে ততক্ষণই শুধু একজন আর একজনকে শত্রু ভাবতে পারে। যে মুহূর্তে মানুষ বুঝতে পারে আর একজন মানুষও তারই মতো একই সুখ দুঃখ অনুভব করে, একই অমঙ্গলের ভয়ে ভীত হয়, একই ভাবাবেগে এবং কামনায় অভিভূত হ'য়ে পড়ে সেই মুহূর্তে সে তার সুখ-দুঃখের, আশা-আকাঙ্ক্ষার শরীক হ'য়ে যায়। তখন তার বুকের মধ্যে জাগে সমবেদনার অনুভূতি। মানুষ যখনই মানুষকে গভীরভাবে জানে তখনই সেই চৈতন্যের আলোয় একজনের মনের চেহারা আর একজনের কাছে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। মানুষ তখন মানুষের কাছে পরমাত্মীয় হ'য়ে দেখা দেয়, দূর হয় নিকটবন্ধু, পর হ'য়ে যায় ভাই। যে বক্রদৃষ্টিতে ছিলো সংশয় আর ঘৃণা তার মধ্যে আসে প্রেমের করুণ-কোমলত্ব। যাকে মনে হচ্ছিল শত্রু সে তো শত্রু নয়। যে-দুঃখ আমার বুকে সে দুঃখে সেও কাতর; যে-আনন্দে আমি উৎফুল্ল হই সেই আনন্দের তরঙ্গোচ্ছ্বাস তারও ধমনীর রক্তধারায়। একজন মানুষ আর একজন মানুষকে যখন এইরকম ক'রে দেখে তখনই সে তাকে ভালোবাসতে পারে। আর এমন মানুষ পৃথিবীতে কে আছে যাকে আমরা ভালোবাসতে পারিনে? কারণ যাকে আমার প্রতিবেশী বলছি তার সত্য পরিচয় তো তার মাংসপিণ্ডের দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে এবং ওজনে নয়; স্থূল কর্ম্মের মধ্যেও তার সত্তা সীমাবদ্ধ নয়। বাহিরের সমস্ত আচরণকে সে অতিক্রম ক'রে আছে। তার সমস্ত কর্ম্মের পিছনে রয়েছে তার ব্যক্তিত্ব—The man within the man. মানুষের ভিতরকার এই মানুষটীকে যতক্ষণ আবিষ্কার করতে না পারছি ততক্ষণ তার সঙ্গে ব্যবহারে প্রকাশ পাবে কঠিন ঔদাসীন্য। রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওয়ালা গল্পে মিনির

বিবাহের প্রভাতে রহমত এসে যখন সেলাম দিয়ে দাঁড়ালো তখন শুভদিনে খুনীকে প্রত্যক্ষ দেখে কন্যার পিতার অন্তঃকরণ যেন সঙ্কুচিত হ'য়ে গেল। তাঁর মনে হোলো, শুভদিনে লোকটা বাড়ী থেকে গেলেই ভালো হয়। রহমতের প্রতি এই মনোভাবের মধ্যে প্রেমের নামগন্ধ নেই, আছে নিষ্ঠুর অবহেলা। কেন এই অবহেলা? কারণ রহমতের আসল পরিচয় তখনও কন্যার পিতার কাছে উদ্ঘাটিত হয়নি। রহমত ছুরি মেরে জেল খেটেছে—এইটুকু বললেই তার সম্পর্কে সব কথা বলা হোলো না। The man is more than his actions. পরস্পরের সম্পর্কে পরস্পরের মনে যতক্ষণ জ্ঞানের স্বল্পতা ততক্ষণ একের প্রতি অন্যের ভালোবাসা সম্ভব নয়। এর পরেই যে ঘটনাটি ঘটলো তার বাতায়নপথে কন্যার পিতা দেখতে পেলেন রহমতের অন্তরের মানুষটিকে। মস্ত ঢিলা জামাটার ভিতর হাত চালিয়ে দিয়ে বুকের কাছে কোথা থেকে সে বার করলে এক টুকরো ময়লা কাগজ। সেই কাগজের উপরে রহমতের পর্বতগৃহবাসিনী ক্ষুদ্র কন্যার হাতের ছাপ। কন্যার এই স্মরণচিহ্নটুকু বুকের কাছে নিয়ে রহমত প্রতি বৎসর কলিকাতার রাস্তায় মেওয়া বেচতে আসে। এক নিমেষে কন্যার পিতার চোখের সামনে থেকে পর্দা স'রে গেল। খুনী রহমতের ভিতরে এ আর এক কোন্ রহমত? মেওয়াওয়ালা কাবুলির পিছনে দাঁড়িয়ে আছে স্নেহপ্রবণ যে চিরন্তন মানুষটি তার চোখে উছলে পড়ছে পিতার প্রেম। গল্পের এই জায়গাটিতে আছেঃ

> "...দেখিয়া আমার চোখ ছলছল করিয়া আসিল। তখন সে যে একজন কাবুলি মেওয়াওয়ালা, আর আমি যে একজন বাঙালী সম্ভ্রান্তবংশীয় তাহা ভুলিয়া গেলাম। তখন বুঝিতে পারিলাম, সে-ও যে আমিও সে; সে-ও পিতা আমিও পিতা। তাহার পর্বতগৃহবাসিনী ক্ষুদ্র পার্বতীর সেই হস্তচিহ্ন আমারই মিনিকে স্মরণ করাইয়া দিল।"

রহমতের প্রতি মিনির পিতার মনোভাবের এই যে আকস্মিক পরিবর্তন—এই পরিবর্তনের মূলে নূতনতর দৃষ্টিভঙ্গিমা। মিনির পিতা যেই বুঝতে পারলেন, বাহিরের কাজকর্মে, বেশভূষায় কাবুলি মেওয়াওয়ালার সঙ্গে তাঁর যতই পার্থক্য থাকুক উভয়ের মনের চেহারায় আছে একটা মৌলিক ঐক্য তখনই সমবেদনায় চোখ তাঁর ছলছল ক'রে এলো; যেখানে ছিলো নির্মম ঔদাসীন্য সেখানে জাগ্‌লো সহানুভূতি।

প্রতিবেশীকে আপনার মতো ভালোবাসা—এই মহান বাক্য অতি সুন্দর, অতি উদার। কিন্তু মানুষের চিত্তে মানুষের প্রতি ভালোবাসা জাগানোর পক্ষে এই মহাজনবাক্য যথেষ্ট নয়। মানবচিত্তকে অনুদারতার বন্ধন থেকে মুক্ত করতে হ'লে দরকার তার জ্ঞানের পরিধিকে বাড়ানো। অজ্ঞানের অন্ধকার অপসারিত হোলেই নূতনতর চৈতন্যের আলোয় মানুষ দেখতে পাবে—সমুদ্রপারের কেবল বিদেশী নয়, উলঙ্গ নরখাদক বর্বর পর্যন্ত সবাই তারই মতো মানুষ, সকলের মনেই একই সুখের, একই দুঃখের, একই কামনার, একই উদ্বেগের তরঙ্গদোলা। এই দৃষ্টি এলেই আসবে প্রেম, এই জ্ঞান এলেই জাগবে সহানুভূতি। মেটার্লিঙ্ক (Maeterlinck) ঠিকই বলেছেনঃ To learn to love, one must first learn to see.

যার দৃষ্টি আছে সেই কেবল ভালোবাসতে পারে। মানুষের অন্তরের গভীরে যে একটি চিরশুভ্র নির্মলতা রয়েছে তাকে ভালোবাস্‌তে না পারলে ভালোবাসা কখনও সত্য হয় না। আর মানুষের মধ্যে যে-দেবতা রয়েছে তাকে আবিষ্কার করতে হ'লে দৃষ্টি চাই। এই দৃষ্টি যেখানে নেই সেখানে ভালোবাসা নেই আর যেখানে ভালোবাসা নেই, হৃদয়ের জীবন্ত অনুভূতি নেই, নিজেকে উজাড় ক'রে সঁপে দেওয়া নেই সেখানে শুষ্ক কর্তব্যবোধে সেবারই বা কি মূল্য আর বদান্যতারই বা কি দাম? মেটার্লিঙ্ক ঠিকই লিখেছেনঃ

> We may possibly be neither good, nor noble, nor beautiful, even in the midst of the greatest sacrifice; and the sister of charity who dies by the bedside of a typhoid patient may per chance have a mean, rancorous, miserable soul.

অর্থাৎ

পরম ত্যাগের মধ্যেও আমরা উদার, মহৎ এবং সুন্দর নাও হতে পারি। সর্বত্যাগিনী যে সেবিকা টাইফয়েড রোগীর শয্যাপার্শ্বে জীবন বলি দিলো—কে জানে তারও আত্মায় উদারতার এবং মহত্ত্বের অভাব থাকতে পারে।

আসল কথা হোলো দৃষ্টি। দৃষ্টি থাকলে তবেই উপলব্ধি করা যায়—যাকে ফণী মনে হচ্ছে তারও মাথায় মণি আছে, যাকে মনে হচ্ছে নিশ্চিত প্রতিদ্বন্দ্বী এবং সম্ভবতঃ শত্রু আসলে সে আমারই মতো মানুষ—যে ঠিক আমারই মতো সুখ-দুঃখ অনুভব করে, আমারই মতো দুঃখে কাতর হয়, অমঙ্গল এড়াতে চায়, লোভে চঞ্চল এবং অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে ওঠে, সুন্দরকে ভালোবাসে, সুখের স্বপ্ন দেখে। ঐক্যের এই উপলব্ধি থেকেই আসে মানুষের জন্য মানুষের

সহানুভূতি। সাহিত্যের প্রকাণ্ড সার্থকতা হচ্ছে—সাহিত্য মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগের পথকে প্রশস্ত করে। পৃথিবীর সেরা সাহিত্যিক যাঁরা তাঁদের রচনা মানুষের কাছে মানুষের সত্য পরিচয়কে উদ্ঘাটিত ক'রে দেয়, মানুষে মানুষে যে একটি মৌলিক মিল রয়েছে সেই মিলের দিকটাকে আমাদের দৃষ্টির সামনে জাগিয়ে তোলে। বর্তমান জগতে বিজ্ঞান যেমন একদিকে হিংসার বাহন হয়ে মানব-সভ্যতাকে ধ্বংস করবার উপক্রম করছে আর একদিকে তেমনি মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগের পথে যে-সকল বাধা ছিল সেগুলোকে সরিয়ে দিচ্ছে। যাকে আমরা বলি প্রগতি বা Progress তার সর্বাপেক্ষা মৌলিক সর্ত হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগ। মানুষের সঙ্গে মানুষের, জাতির সঙ্গে জাতির জানাশোনার পথ যত প্রশস্ত হবে সভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের আশা হবে তত উজ্জ্বল। আর এতে কোন ভুল নেই যে মানুষকে মানুষের এবং জাতিকে জাতির কাছে আনবার পথে আমরা সবচেয়ে বেশী সাহায্য পেয়েছি মুদ্রাযন্ত্রের কাছ থেকে। মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের ফলে মানুষের বই পড়বার অভ্যাস অনেক বেড়ে গিয়েছে, লেখায় যা' মানুষ ব্যক্ত করতে চেয়েছে তা দিক থেকে দিগন্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। এইখানেই আসে সাহিত্যের কথা। আজ ইউরোপ আমেরিকা থেকে সাহিত্যের কত বই আমাদের দেশে আমদানী হচ্ছে। এইসব বইকে আশ্রয় করে পাশ্চাত্যের মনীষীরা তাঁদের জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতা আমাদের কাছে পরিবেশন করছেন। তাঁদের সাহিত্যে তাঁদের অভিজ্ঞতারই সরস বর্ণনা।

পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ে আমরা সবচেয়ে লাভবান হয়েছি কোন্ দিক থেকে? লাভবান হয়েছি—সব মানুষই যে মূলতঃ এক, বিরাট সত্যের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হ'য়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা এখানে একজন নাম-করা সাহিত্যিকের একখানি বিখ্যাত উপন্যাসের উল্লেখ করছি। ফরাসী সাহিত্যিক রোম্যা রল্যাঁর (Romain Rolland) Jean Christopher বা জাঁ ক্রিস্তফ্। উপন্যাসের নায়ক ক্রিস্তফ্ প্রতিভাশালী সুরশিল্পী। মা আর ছেলে—এই নিয়ে সংসার। মা গৃহকার্যে ব্যস্ত থাকে—ছেলে গানের শিক্ষক। ছেলের মন জার্মাণীর ছোট শহরটির একঘেয়ে এবং প্রতিকূল আবেষ্টনীর মধ্যে হাঁপিয়ে উঠেছে। সে দেখতে চায় বৃহৎ জগৎ, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে চায় 'মহামানবের সাগরতীরে', চারদিক থেকে আহরণ করতে চায় নব নব অভিজ্ঞতা, ঢেলে দিতে চায় আপনাকে সকলের মধ্যে। কিন্তু মায়ের মনে কোন কৌতূহল নেই ছেলের প্রতিভাকে জানবার। ছেলেকে মা বোঝে না, বুঝতে চায়ও না। মা মনে করে ছেলে সারাজীবন মায়ের কাছে কাছেই ঘুরে বেড়াবে। ছেলে শহরের কোন ধনীর কন্যাকে বিয়ে ক'রে ঘরে এনেছে, রবিবারে রবিবারে গীর্জায় অর্গ্যান বাজায়, নয়নের মণি হ'য়ে কাছে কাছে আছে—এই কল্পনাই মাকে আনন্দ দেয়। ক্রিস্তফ্ এখনও যেন সেই বারো বছরের ছেলেটি আছে। খোকা হ'য়েই বা সে থাকবে না কেন? কেন সে সংসার ক'রে সুখী হবে না?

ঠিক যেন আমাদের দেশেরই মা—জার্মাণ মা ব'লে মনেই হয় না। উপন্যাসের নায়ক জার্মাণ একথা বলতে ভুলে গেছি। আমাদের বাঙালী মায়েরাও ক্রিস্তফের মায়ের মতোই ছেলেদের রাখতে চায় আঁচলে ঘিরে খোপাটি ক'রে। ছেলে ধনীর ঘর থেকে একটি রাঙা টুকটুকে বউ এনে দিয়েছে মাকে, চোখের কখনও আড়াল হয় না, চাকরি করে, খায় দায়, মায়ের কোলের কাছটিতে ঘুর ঘুর করে। ছেলে মাকে ছেড়ে দূর দেশে চ'লে যাবে—বিয়ে থাওয়া ক'রে সংসারী হবে না—একথা ভাবতে মার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। জাঁ ক্রিস্তফে নায়কের স্নেহময়ী জননীর ছবি যেখানে আঁকা হয়েছে সেখানটিতে এসে বারে বারেই মনে হয়ঃ জার্মাণ মা যা, বাঙালী মাও তো তাই। এক সুখ, এক দুঃখ, এক স্বপ্ন, এক ভয়। একই ভাবাবেগে স্পন্দিত হচ্ছে দু'জনের হৃৎপিণ্ড। সমুদ্রপর্বতের ব্যবধান কিছু নয়। বেশভূষার, আচার ব্যবহারের তফাৎও কিছু নয়। সব কিছু ব্যবধানকে ছাড়িয়ে আছে একটি মৌলিক ঐক্য।

ক্রিস্তফ্ ঠিক করে ফেলেছে—সে চলেই যাবে। মা একথা জানে। দু'জনের মুখে কোন কথা নেই। আসন্ন বিচ্ছেদের ছায়ায় বাড়ীর আবহাওয়া কেমন থমথমে। অনেক রাত্রে মা হঠাৎ দরজা খুলে ছেলের ঘরে উপস্থিত। আর্তকণ্ঠে মা ছেলেকে জড়িয়ে কাঁদেঃ

"যাস্‌নে বাবা, আমাকে ছেড়ে যাস্‌নে। তুই চলে গেলে আমি ম'রে যাবো। মরণকালে তুই কাছে থাকবি নে? দাঁড়া, আমাকে আগে মরতে দে। তারপর যেখানে খুসী চলে যাস্।"

মৃদুকণ্ঠে ছেলে বলে—'যাবো না মা, তুমি শুতে যাও।'

পাশ্চাত্য সাহিত্যের একখানি জগদ্বিখ্যাত উপন্যাসে মায়ের আর ছেলের এই যে ছবিখানি আঁকা হয়েছে—এই ছবি আমাদিগকে সচেতন ক'রে দেয় পৃথিবীর একটি গভীরতম সত্য সম্পর্কে। এই সত্যটি হোলো:

Pain is pain, joy is joy, everywhere, even as in thee. এক দুঃখ, এক সুখ সর্ব্বত্র। যে দুঃখ জার্মাণ মাকে কাতর করে সেই দুঃখে বাঙালী মাও কাতর হয়। মায়ের প্রতি যে-সহানুভূতি জার্মাণ যুবকের কঠিন সঙ্কল্পকে টলিয়ে দেয় সেই সহানুভূতি বাঙালী যুবককেও ঘরে বেঁধে রাখে। কেন আমরা মনে করি—আমার দুঃখের তীব্রতার অনুপাতে পড়শীর দুঃখের তীব্রতা অল্প? কেন মনে করি, যে বেদনায় আমি ভেঙে পড়ি সে বেদনা আমার প্রতিবেশীকে তেমন অভিভূত করে না? যে-সুখে আমি উল্লসিত হ'য়ে উঠি সেই সুখ আমার প্রতিবেশীর চিত্তে তেমন দোলা দেয় না? তার জীবনের শিখা কি আমার জীবনের শিখার তুলনায় ম্লান? তার দুঃখসুখের অনুভূতি কি আমারই অনুভূতির মতো তীব্র নয়?

সমস্ত বড়ো সাহিত্যই মানুষের চোখের পিচুটি ধুইয়ে দেয়, তাকে দান করে নূতনতর দৃষ্টি, তাকে নিয়ে যায় অজ্ঞানের তমসার পারে। যখনই আমরা বুঝতে পারি যে দুঃখে আমি কাতর সেই দুঃখে আমার প্রতিবেশীও কাতর, আমি যতখানি কাতর সেও ঠিক ততখানি কাতর, যে সুখ আমার মধ্যে সেই সুখ তারও মধ্যে তখনই শুধু প্রতিবেশীর প্রতি অন্তরে সহানুভূতির উদ্রেক সম্ভব। আর প্রতিবেশীকে আপনার মতো ভালোবাসার চাইতে বড়ো ধর্ম্ম কি আছে?

★

সূর্য্যাস্ত

শ্রীকরুণাময় বসু

এখানে এই উঁচু টিলায় দাঁড়ালে
অনেক দূরে পর্যন্ত দেখা যায়,—
জীবনের অনেক দূরের পথ;
আর দেখা যায় মানুষের মন,
যে মন নেমে চলেছে অধঃপতনের
শেষ পঙ্ককুণ্ডের অতল কর্দমে।
মানুষকে ঠকিয়ে, তাকে প্রবঞ্চনা করে
নিজের প্রাসাদের চূড়ো আকাশস্পর্শী করা,
আজকালকার জীবনে এই হ'ল আর্ট, এই হ'ল সত্যকার সাধনা।

তবু দেখি শালবনের ওধারে সূর্য অস্ত যাচ্ছে,
রক্তবর্ণ আকাশের প্রতিচ্ছায়া দূরে শৈলশিরে এসে পড়ল,
পড়ল ক্ষীণস্রোতা স্রোতস্বিনীর স্বচ্ছ জলে;
নির্জন বনে কেউ কোথাও নেই,
ময়ূরের দল অসঙ্কোচে বেড়িয়ে বেড়ায়
পাতাঝরা মহুয়ার বনে।
কী ভাগ্যি বন্দুক ঘাড়ে হিংস্র মানুষের পায়ের চিহ্ন পড়েনি এখানে;
মানুষকে যতো ভয়, হিংস্র জানোয়ারও ততো ভয়ংকর নয়।
মানুষ ছোড়ে বোমা যে বোমার আঘাতে
লক্ষ লক্ষ তাজা মানুষ কর্পূরের মতো উবে গেল;
বোমা তৈরির প্রতিযোগিতা মানুষকে আজ নেশার মতো পেয়ে বসেছে,
সভ্যতার দুর্দিন এল ঘনিয়ে।

তবু দেখি গায়ে এসে লাগল দক্ষিণা বাতাসের আচমকা ঝলক,
শির শির করে উঠল বন্যলতার কচি কচি পাতাগুলো,
মৃদু গন্ধে মন্থর হয়ে ওঠে চারিদিক;
সন্ধ্যা মেঘের গায়ে রক্তকুমুদের রঙ।
এরা কাউকে ঠকায় না, মানুষকে দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দিয়ে
গড়ে তোলে না ঐশ্বর্য্যের অভ্রভেদী মিনার;
তবু এরা আসে দিনের পর দিন,
জ্যোৎস্না আলোয় হেসে মাথা নাড়ে,
আপন মনে ফুল ফোটায়, ঝরিয়ে দেয় আপন মনে।
ছিন্ন মৃণাল সূত্র মুখে নিয়ে হংস-বলাকা
মেঘের নিচে পাখা উড়িয়ে চলে যায় কতোদূর দেশ দেশান্তরে।

দূত

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

পায়রা নাকি শান্তির দূত, কিন্তু লোকনাথের সংসারে অশান্তি বাঁধলো ওই পায়রা নিয়েই।

রামকমল সরকার লেনের বাঁ হাতি লালচে দোতলা। চুণশুরকীর প্রলেপ পড়েনি বছর বিশেক। ইঁটের পাঁজরই শুধু নয়, দু এক জায়গায় ইঁট খসে খসে দগদগে ঘায়ের মতন। লোকনাথ বসাক বাড়ীওয়ালা নয় ভাড়াটে, কিন্তু প্রায় বাড়ীওয়ালার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ীর একতলায় আস্তানা গেড়েছে, ঠাঁই বদলের দরকার হয় নি।

বাড়ীওয়ালা তারাচরণবাবু সজ্জন লোক। কোন বেসরকারী অফিসের বড়বাবু ছিলেন, বছর দুই হ'লো চাকরীর মেয়াদ ফুরিয়েছে, কিন্তু কাজের মেয়াদ ফুরোয় নি। খুব ভোরে উঠে ফুল মোজা এঁটে পার্কে চক্কর, দশটা নাগাদ বাড়ী ফেরা, তারপর দিবানিদ্রার আগে পর্যন্ত খুঁটিনাটি কাজ। কাজ করা তো নয়, কাজ বাড়ানো। বৌ আর মেয়ে চীৎকার করে কূল পায় না। এখানের জিনিস ওখানে, আর ওখানকার জিনিষ যে কোথায়, তিনদিন ধ'রে পাত্তা পাওয়া ভার।

ভাড়াটে লোকনাথ বসাক কিন্তু একেবারে অন্য ধরণের। পোষ্ট-অফিসের মণিঅর্ডার সেকশনের ইনচার্জ। আঠারো টাকায় চাকরীর শুরু, এখন মাস গেলে শ দুয়েক হাতে আসছে, অবশ্য বছর ত্রিশ চাকরীর পরে। সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। বাড়ীতে তৃতীয় পক্ষ ভরসা, অফিসে সব পক্ষই সমান। একটি মাত্র ছেলে। ভয় তাকেও কম নয়। কখন কি খেয়াল হয় ঠিক নেই, তাল সামলাতে ওই লোকনাথ বসাক।

বাড়ীওয়ালার জোয়ান ছেলে দুটি বাইরে। একটি বুঝি আগ্রা, আর একটি গয়া। বাকি একটি মেয়ে। বৌ তৃতীয় পক্ষ নয়, কিন্তু তারও বাড়া। নথের যুগ নয়, তাই নথ ঘোরানো হয় না বটে, কিন্তু চোখ ঘোরানোতেই কর্তা কাহিল। মাজা দুমড়ে ইজিচেয়ারে কাত। কথাটি বলার সাহস থাকে না।

শুধু এ বাড়ীতেই ওপর নিচেয় নয়, বোমার ভয়ে সহর ছেড়েও একঘাটিতে ছুটেছিলেন দুজন। সেখানে ওপর নিচেয় নয়। একেবারে পাশাপাশি। কাজেই ভাবটা বেশ জমাট। হাজার গোলমালে সামান্য চিড় খেয়েছে বড় জোর, ফুটি ফাটা হয়নি।

কিন্তু এবারের কাণ্ডটায় ফুটিফাটা শুধু নয় আটচির হবার জোগাড়।

গলির মোড়ে পুরোনো এক ধানকল। যোগজীবন সাহার 'দি মুন রাইস মিল্‌'। সাহামশায় চোখ বোঁজবার পর, সম্পত্তি নিয়ে মামলা। এখনও জের মেটেনি, হাইকোর্ট অবধি গড়িয়েছে। ধানকল যখন চালু ছিলো তখন ধান-চালের লোভে গোটা ছবেক পায়রা এসে কার্ণিশের কোণে বাসা বেঁধেছিলো, বছর ঘোরার সংগে সংগে ছটি ছত্রিশে গিয়ে দাঁড়ালো। চালের কল উবে গেলো, কিন্তু এক'টি পায়রা উড়লো না। চাটাই পেতে আর ধান শুকোতে দেওয়া হয় না, চালের ভাঙা দানা এদিক ওদিক পড়ে থাকে না, কিন্তু পায়রার দল বেপরোয়া। লোকনাথ বসাকের মতন আস্তানা আঁকড়ে রইলো। বাসা ছাড়লো না।

পায়রার দল অবশ্য অনেক দিনই রয়েছে, লোকনাথের ছেলে ভূতনাথও কম দিন নেই এ পাড়ায়, কিন্তু যোগাযোগ হলো এতদিন পরে।

পাড়ার ছেলেদের সংগে ধানকলের ভিতর চোরপুলিশ খেলা চলছিলো। খেলা যখন খুব জমে উঠেছে, তখন এই কেলেংকারী। চোর ভূতনাথ হাজতে স্বেচ্ছায় ধরা দেবার জন্য এগিয়ে আসছে এমন সময় ঠিক তার সামনে ঝপ করে এক শব্দ। ওপর থেকে পায়রার একটা ছানা মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। সবে চোখ ফুটেছে, পালক গজায়নি ভালো করে। পড়েই কচি ডানা ছড়িয়ে ওড়বার চেষ্টা করলো, কিন্তু তার আগেই ভূতনাথ চেপে ধরেছে আলতো হাতে। কিচ কিচ শব্দ, পা ছুঁড়ে পালাবার চেষ্টা কিন্তু ভূতনাথের ধরবার কায়দাই আলাদা। পালানোই হলো।

নানা মুনির নানা মত। কেউ বললো ছেড়ে দিতে, কেউ বললো, কাছেই বাজার, নিয়ে চল যা হয়, কিন্তু ভূতনাথ অটল। গম্ভীর গলায় বললো, 'এ আমি পুষবো।'

সংগীরা অবাক। বাঘের বাচ্চা পোষার কথা যার, সে পুষবে পায়রার বাচ্চা। পাপ কানে এও শুনতে হলো।

শুধু শুনতে নয়, দেখতেও হলো সংগীদের।

ভাঙা পেরেকখসা প্যাকিং বাক্স। আধ আঁটি খড়।

মিনিট পনেরোর মেহনৎ। ভূতনাথ চমৎকার এক আস্তানা গড়ে তুললো। সাবধানে পায়রার বাচ্ছাটাকে ভিতরে চালান দিয়ে সংগীদের দিকে ফিরে বললো, 'এরা কি খায় বল্ দিকিনি?'

কি খায় অবশ্য সবাই জানে। ভূতনাথেরও অজানা নয়। কিন্তু কন্ট্রোলের বাজারে সোনা যোগাড় করা গেলেও চালের দানা মেলা সহজ নয়। উত্তর দিয়ে ফ্যাসাদে পড়তে কেউ রাজী নয়। যার পুষ্যি সে যোগাড় করুক খোরাক। বাইরের লোকের ভারি দায়।

দানারও বন্দোবস্ত হলো, মার মাপা চালের ওপর বাটপাড়ি।

মাস তিন চারের মধ্যে পায়রার বাচ্ছা-ধাতস্থ হলো। প্রথমে উঠোনে ঘুরপাক, তারপর পাখা মেলে একেবারে দোতলার কার্ণিশে। মিষ্টি ডাক, তার চেয়েও মিষ্টি পাখনার আওয়াজ। ভূতনাথের কানে চাকভাঙা মধু ঝরতে লাগলো।

কিন্তু মানুষের কপালে সুখ আর কদিনের।

ভূতনাথের সামনে পরীক্ষা। স্কুলে যাবার বালাই নেই। দাওয়ায় বসে বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে। আচমকা বিকট চীৎকার। প্রথমটা ভূমিকম্প ভেবে ভূতনাথ লাফিয়ে উঠোনে পড়েছিলো, তারপরই ভুল বুঝতে পারলো। ভূমিকম্প নয়, ওপরের গিন্নির বাঁজখাই আওয়াজ।

'আহা-হা, আমার এত সাধের মুসুর ডালের বড়িগুলো রে, অনামুখো পায়রা সব শেষ করে ফেললে। কোথা থেকে এ আপদ এসে জুটলো। ও বিশু, হাঁ করে দেখছিস কি? মুড়ো ঝাঁটাগাছটা নিয়ে আয় শীগ্গির। এত কষ্টের জিনিসগুলো, ভেঙে ছড়িয়ে কি কান্ড করলে গো।'

ঝাঁটার একটা আওয়াজও যেন শোনা গেলো, সংগে সংগে ভূতনাথের গর্জন, 'খবরদার, আমার পায়রার যদি একটি পালক কেউ ছোঁয়, খুনোখুনি হয়ে যাবে বলে রাখছি' কাছাকাছি কোন অস্ত্রের অভাবে হাতের জ্যামিতির বইটেই আয়ুধ হয়ে দাঁড়ালো।

'ওঃ, ছোঁবে না, বিল্বপত্তর দিয়ে পা পুজো করবে। মানুষের জিনিষ ভেঙে তচনচ করবে আর হাতজোড় করে বসে থাকতে হবে তার সামনে। মার নয়, মেয়ের গলা, কিন্তু আরো চাঁছা, আরো তীব্র।

মেয়ের তরফ থেকে এমন একটা আক্রমণের জন্য ভূতনাথ তৈরী ছিল না। দু এক মিনিট একটু থতমত, তারপরেই সামলে নিলো। খাদে নামানো গলার স্বর, 'অবোধ প্রাণী, ওর যদি অত বুদ্ধি থাকবে তবে আর—'

কথা শেষ হলো না। ওপরের গিন্নী হুমড়ী খেয়ে পড়লেন বারান্দায়, 'বলি প্রাণীটা না হয় অবোধ, তা বলে যারা সোহাগ করে পুষেছে তারা তো কেউ অবোধ নয়। এসব মানুষকে জব্দ করা, তা কি আর আমরা বুঝি না। পেয়েছে নরম মাটি, বেড়ালে তো আঁচড়াবেই।'

ভূতনাথের মার ঘুমটা একটু আগেই ভেঙেছিলো। বিছানায় বসে দোক্তা গালে পুরে ব্যাপারটা একটু বোঝবার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু ওপরের গিন্নীর কথাগুলো কানে যেতেই আর বসে থাকতে পারলেন না। ঘোমটা একটু টেনে দিয়ে উঠোনে ছেলের পাশে এসে দাঁড়ালেন। কথা বলতে গিয়েই প্রথমটা আটকালো, পানের রসে মুখ টই-টুম্বুর। পানের পিচ থামের গায়ে ফেলে গলা ছাড়লেন, 'বলি ব্যাপারটা কি, পাড়া যে একেবারে মাথায় করেছো মা মেয়েতে। কাকচিল বসবার উপায় নেই।'

কাকচিল কেন, পায়রার উপায় নেই বসবার। পাশের সিংহদের বাড়ীর চিলেকোঠায় গিয়ে বসেছে। ঠোঁট দিয়ে ডানা খুঁটে খুঁটে আয়েস করছে রোদে।

ওপরের গিন্নী মুখ খোলার আগেই বসাক গিন্নী হাঁক পাড়লেন, 'বলি বেড়ালটা কে হলো শুনি, ভুতো না ভুতোর বাপ। কি একেবারে চুপ করে রইলে যে? আমি বেড়ালের মা, না পরিবার, স্বকর্ণে সেইটেই শুনে যাই?'

ব্যাপারটা আরো কতক্ষণ চলতো ঠিক নেই। বরাত পড়শীদের ঠিক এই সময়ে দরজা ঠেলে বাড়ীওয়ালা ঢুকতেই সব ফরসা। কেউ কোথাও নেই। কর্তা পোষ্ট অফিসে গিয়েছিলেন, খাম আর পোষ্টকার্ড হাতে উঠোনে পা দিলেন।

আশে পাশে আলতো নজর। রাস্তা থেকে আওয়াজ কাণে গিয়েছিলো কিন্তু ভিতরে সব এমন চুপচাপ যে সন্দেহই হয়। তারাচরণবাবু সিঁড়ির মাঝ বরাবর উঠেই হাঁক পাড়লেন, 'ব্যাপারখানা কি? আধ মাইল দূর থেকে আওয়াজ কানে আসছিলো, ঢোকামাত্র সব নিঃঝুম?

গিন্নী আবার ফাটলেন, 'আমাদের গলার আওয়াজই তো কেবল কানে যাবে তোমার, পরের দোষ তো আর চোখে কানে দেখতে পাও না।' শেষের কথাগুলো কান্নার মিশেল।

তারাচরণবাবু আর ওপরে উঠলেন না। সিঁড়ির চাতালেই আসনপিঁড়ি। মেয়ের দিকে মুখ ফেরালেন হ্যাঁরে বিশু, ঘটনাটা কি আমায় বল দিকিনি?'

বিশু কথা বাড়ালো না। কাজের মেয়ে। হাতে করে গোটা তিনেক ভাঙা বড়ির টুকরো নিয়ে এসে বাপের সামনে রাখলো, তারপর আঙুল দিয়ে দেখালো সিংহদের চিলে-

কোঠায়। পায়রাটি দুটো পাখাই মেলে দিয়েছে। নিচু ঘরে এমন খটখটে রোদ পাওয়াই দায়।

তারাচরণবাবু অতো চৌখোস নন মেয়ের মতন। কাজেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবই বলতে হলো। রসের যোগান দিয়ে, ইনিয়ে বিনিয়ে।

রোদে এতটা রাস্তা হেঁটে আসার জন্য কিছুটা শরীর গরম তো ছিলোই, তার ওপর মেয়ের বুলি আর মেয়ের মার ফোঁসফোঁসানিতে একেবারে তেতে লাল। ছুটে বারান্দার রেলিংয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু ভূতনাথ উধাও। উঠোনও ফাঁকা। তবু ছাড়বার পাত্র নন তারাচরণবাবু।

'একেই বলে বুকে বসে দাড়ি ওপড়ানো। এই মাগ্গি গণ্ডার বাজারে দিব্যি বসে বসে আট টাকা মণের বালাম চাল খাচ্ছে সব। আজকাল এই রকম চারখানা ঘর কম করেও আড়াইশো টাকা। অথচ মাস গেলে পঞ্চাশটি টাকা হাতে ঠেকিয়ে কর্তব্য শেষ!'

আরো অনেক কথা বলার ছিলো তারাচরণবাবুর, কিন্তু জমলো না। যাদের উদ্দেশ করে বলা তারাই নিখোঁজ। মা-বেটায় ঘরের মধ্যে সেঁদিয়ে পড়েছে।

আরো কিছুক্ষণ চেঁচামেচি করে তারাচরণবাবু ইজি-চেয়ারে ছাড়লেন নিজেকে।

সারা বিকেল চুপচাপ। ব্যাপারটা দানা বাঁধলো সন্ধ্যার ঝোঁকে। অফিস ফেরৎ লোকনাথ বসাক বাড়ী ফিরে মুখ হাত ধুয়ে পরবার কাপড় চাইতেই গিন্নী কাপড় এগিয়ে দিলেন। আধো অন্ধকারে প্রথমে অতটা খেয়াল হয়নি, কিন্তু টকটকে চওড়া লাল পাড় অন্ধকারেও জ্বলছে।

ঘরের মধ্যে ঢুকে লোকনাথবাবুর সন্দেহ হল, 'কি আশ্চর্য, শাড়ী দিলে কেন? শাড়ী কি আমি পরি?'

'আজ থেকে পরবে' তৃতীয়পক্ষ গর্জন করে উঠলেন, 'যার ছেলে পরিবারকে রাস্তার লোক অকথা কুকথা বলে যায় ইচ্ছামত, তার শাড়ী পরে ঘোমটা দেওয়াই উচিত। মেনি-মুখো বেটাছেলের ওই ঠিক পোষাক!'

ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো না। ভুরু কুঁচকে লোকনাথ বসাক ঘরের মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে রইলেন। হাত বাড়িয়ে আলনা থেকে কেবল আধময়লা ধুতি একটা টেনে নিয়ে অঙ্গে জড়ালেন। অভিযোগ যাই হোক, পুরুষত্বের খোলষটা অন্ততঃ থাক শরীরে।

ব্যাপারটা পরিষ্কার হতে দেরী হলো না। বসাকগিন্নীই রসিয়ে রসিয়ে বললেন। নাক ঝাড়ার ফাঁকে ফাঁকে। লোক-নাথ বসাক চুপচাপ। না রাম, না গঙ্গা। যেন লক্ষ্মীর পাঁচালী শুনছেন এমনি ভাব চোখ মুখের। অন্যায়টা আর কি। উটকো পাখী যদি ঘরের জিনিষ ফেলে ছড়িয়ে একাকার করে, তা হলে রাগ হয় বই কি মানুষের। কিন্তু সব সময় মনের কথা মুখের কথা হতে পারে কখনও। হাতা-হাতি হয়ে যাবে তা হলে। যা মেজাজ, বলা যায় না, পরণের শাড়ী জড়িয়ে আড়কাঠেই ঝুলে পড়বে হয় তো। এ বয়সে আবার চতুর্থ পক্ষ,—তার চেয়ে লোকনাথ বসাক গরম হয়ে উঠলেন, 'আলবৎ, পায়রা চরাবো, আমার খুসী যার দরকার সে জানলা দরজায় জাল টাঙিয়ে রাখুক।' পায়রা চরাবো বললেন যেন ঘুঘু চরানোর ভংগীতে, কিন্তু হিংসেবী লোক গলা চড়ালেন না। ওপরের লোক চুলোয় যাক, বাইরের ঘরে কান পেতে থাকা ভূতনাথের কাছ অবধি গেলো না।

না যাক, তাতেই কাজ হলো। তৃতীয় পক্ষ চোখ মুছে হাসির ঝিলিক ছিটোলেন। বিশ পাওয়ারের বাতি হাসির ছটায় ত্রিশ পাওয়ার। ফাঁড়া কেটে যাওয়ার সংকেত।

দিন পনেরো, তারপরেই এক কেলেংকারী।

ছুটির দিন। তারাচরণবাবু রোদে পিঠ দিয়ে খেতে বসবেন তাই বারান্দায় ঠাঁই করা হয়েছে। আসনে বসতে যাবার মুখেই বিপত্তি। পায়রাটি আসন জুড়েই শুধু বসে নেই, ঠোঁট দিয়ে ভাত তরকারী ছড়িয়ে একাকার। তারা-চরণবাবুর শরীরের রক্ত মাথায় চড়ে গেলো। গটগট করে খড়ম পায়ে নিচে নেমে চীৎকার, 'লোকনাথবাবু, লোকনাথ-বাবু!'

উত্তরে নাকের গর্জন শোনা গেলো। খবরের কাগজ মুখে চাপা। লোকনাথ বসাকের সাড়া নেই। গিন্নী ছেলেকে নিয়ে বোনের বাড়ী। কাজেই শব্দ করে তারাচরণবাবুকে আবার ওপরেই উঠে আসতে হলো। উঠেই বিশুকে গালা-গাল। ধিঙ্গী মেয়ে ভাত একটু আগলালে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়? দিনরাত নভেল নিয়ে বসে থাকা। এ বাড়ীর কারুর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নেই!

ইংগিত ব্যর্থ হলো না। বিশুর মা ব্যাপারটা সবই দেখেছিলেন, এবার এগিয়ে এলেন কোমর হাত দিয়ে, 'বলি বিশু করবে কি? দিনরাত বসে বসে পরের পশুপক্ষী সামলাবে। তার চেয়ে আমি বলছি শোন, যেখান থেকে পারো আজ বিকালেই একটা বেড়াল ধরে আনবে। তোমার মতন নির্জীব নয়, বেশ তাজা গোছের। পায়রা পোষার কাজ আমি বের করছি।' গিন্নী নিজে বসলেন আসনের পাশে। কাছে ঘেঁসবে এমন পায়রা এ তল্লাটে জন্মায়নি।

সন্ধ্যের ঝোঁকে র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে তারাচরণবাবু বাড়ী ফিরলেন। দুটো হাত দিয়ে জন্তুটার মুখ সজোরে টিপে

ধরেছেন। একটু শব্দ না হয়, তা হলে সাবধান হয়ে যাবে সবাই। যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল না হলে হয় কখনও।

দু পরিবারে মুখ দেখাদেখি বন্ধ অনেকদিন। এক বাড়ীর গিন্নী বড়ি দিলে, অন্য বাড়ীর গিন্নী চোখ বুজে ভগবানকে ডাকেন, 'ঠাকুর মুখ তুলে চাও, তোমার কাছে আবার সময় অসময়, দাও এক পশলা নামিয়ে। বড়ি খাওয়ার শখ ঘুচুক।'

তেমনি আবার ওপরের বাড়ীতে লোকজনের নেমন্তন্ন থাকলে, নিচের গিন্নী ঢিপ ঢিপ করে মাথা ঠোকেন তুলসীতলায়, 'নারায়ণ, তুমি সর্বশক্তিমান। একবার ওপরের লাইনটা ফিউজ করে দাও দেবতা। হাহা হিহি হাসির হুল্লোড় বন্ধ হোক।'

অবশ্য যাকে নিয়ে ঝগড়ার সূত্রপাত সেও সাবধান হয়ে গিয়েছে। ছাদের কার্ণিশে কিংবা বারান্দার রেলিংয়ে পায়চারী, নিচে নামার চেষ্টা নয়।

সেদিন ভোরের দিকে তাজ্জব ব্যাপার।

তারাচরণবাবু ভোর ভোর ঘুমচোখে দুর্গানাম জপ করতে করতে বারান্দায় পা দিয়েই আঁৎকে উঠলেন। চোখদুটো রগড়ে নিলেন বার কয়েক। কিন্তু দৃশ্য বদলালো না।

বেড়ালটি রেলিংয়ের ধারে হাত পা ছড়িয়ে আয়েস করছে। আগের রাতে খাওয়া একটু চাপই হয়েছিলো। আর ঠিক এক বিঘৎ তফাতে ভাড়াটেদের পায়রা ঘুর ঘুর করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভয় নেই, ডর নেই, আবার আনন্দের তাল সামলাতে না পেরে মাঝে মাঝে গলা ফুলিয়ে ডাকছেও বক বকম করে।

এক মিনিটের মধ্যে তারাচরণবাবু সিদ্ধান্ত স্থির করে ফেললেন। বিভীষণ বাড়ীতে রাখা কোনদিনই যুক্তিযুক্ত নয়। কোন দিন গৃহস্থের সর্বনাশ করে বসবে। আলতো পায়ে পিছনে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন বেড়ালটার ওপর। পায়রা উড়লো, কিন্তু বেড়াল র‍্যাশনব্যাগে বন্দী। মুখচোখ না ধুয়েই তারাচরণবাবু শত্রু পার করে দিয়ে এলেন। রেললাইনের ওধারে ধোপাদের বস্তিরও ওপারে।

আপদের শান্তি। কিন্তু পায়রার দৌরাত্ম্য আবার বাড়লো। বারান্দার কোনে মাটির টবে বিশু লঙ্কাচারা লাগিয়েছিলো। গোটা ছয়েকের মধ্যে গোটা চারেকেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। চকচকে সবুজ পাতা। জল ঢেলে ঢেলে বিশুর দুটো হাতই টাটিয়ে উঠলো।

দুপুরের ঝোঁকে টবের কাছ বরাবর এসেই বিশুর চক্ষুস্থির।

চারটের মধ্যে তিনটে একেবারে সাবাড়। বাকিটারও ডাঁটি সম্বল, পাতা কটা নিখোঁজ। বিশুর দুটো চোখ জলে ভরে এলো। উঃ, এত সাধের গাছগুলো।

তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে একেবারে নিচেয়। ভূতনাথ দেয়ালে হেলান দিয়ে পড়া আওড়ে যাচ্ছিলো, একেবারে তার সামনাসামনি।

'তোমরা ভেবেছো কি মনে শুনি?'

ভূতনাথ কিছুই ভাবেনি। অন্য একজন বাবর সম্বন্ধে ভেবে চিন্তে যা লিখে গিয়েছিলো, সেগুলোই মুখস্থ করছিলো। বিশুর আচমকা চীৎকারে থতমত খেয়ে গেলো।

'পায়রা বিদেয় করবে কিনা, এক কথা বলো?' বিশু শাড়ীর বাড়তি আঁচলটুকু কোমরে জড়িয়ে নিলো। মারমূর্তি। নেমেছে যখন তখন এসপার কিংবা ওসপার করে তবে ছাড়বে।

ভূতনাথ বেশ একটু মুস্কিলেই পড়ে গেলো। বাড়ীতে বাপ মা কেউ নেই। কোথায় নিমন্ত্রণ রাখতে গেছে। ভূতনাথও যেতো, কিন্তু আজ বাদে কাল পরীক্ষা। খাওয়া দাওয়ার অনিয়মে পাছে অসুখ বিসুখে পড়ে তাই বাড়ী আগলাবার ভার নিয়েছে। কিন্তু এমন কান্ড হবে জানলে, একলা বাড়ীতে কিছুতেই থাকতো না। মাথায় থাক পরীক্ষা, প্রাণে বাঁচলে হয়।

'কি উত্তর দিচ্ছো না যে?' বিশুর গলার সুর সপ্তমে। উত্তর অবশ্য ভূতনাথ এবারেও দিলো না, কিন্তু মুখ তুলেই অবাক। গলার আওয়াজের সংগে বিশুর দৃষ্টির কোন মিল নেই। লোভে চকচক করছে দুটো চোখ।

'হ্যা, ভুতোদা, এ জিনিষ মাসীমা কবে তৈরী করলেন, বিশু হঠাৎ গলার আওয়াজ খাদে নামালো।

কি জিনিষ। ভূতনাথ ঘাড় ফিরিয়েই বুঝতে পারলো। কাঁচের জার ভর্তি কুলের আচার। ঠিক ভূতনাথের পিছনেই। মাকে তৈরী করতে কদিন ধরেই সে দেখেছে, কিন্তু আমল দেয়নি। আমল দিলেও লাভ হতো না। সরস্বতী পুজোর আগে ও জিনিষ ছোঁয়া নিষিদ্ধ। অবশ্য বাবা মা কেউ বাড়ী নেই। জার খুলে ভূতনাথ অনায়াসেই চাখতে পারতো কিছুটা, কিন্তু পরীক্ষা সামনে, এমন অনাচার করার সাধ্য ওর নেই।

ভূতনাথ নির্লিপ্ত গলায় বললো, 'দিন দুয়েক হলো করেছে বোধ হয়। আমার আজ বাদে কাল পরীক্ষা, কোথায়

কে কি তৈরী করছে, সে সব দেখার সময় আমার আছে কি না?'

'সে কি গো? তুমি একটু মুখেও দাও নি' বিশু অবাক। লঙ্কাচারার শোক অনেকটা কম। বেশ মনে আছে, ওই অনামুখো পায়রাটা আসার আগে কি ভাবই ছিল দুজনের। গুরুজনদের নজর বাঁচিয়ে কামরাঙা আর তেঁতুল থেকে সুরু করে এক এক শিশি আচার ভাগাভাগি করে শেষ করেছে। ভুতোদা তো আচার খাবার যম। আর কোলের ওপর ভর্তি আচারের শিশি নিয়ে চুপচাপ বসে আছে লোকটা, কিচ্ছু মুখে দেয়নি, এ-আবার বিশ্বাস হয়।

ভূতনাথ খুব আস্তে আস্তে বললো, পৃথিবীর সব কিছুই মায়া, এমন এক নিরাসক্ত ভঙ্গীতে, 'দূর, যেমন চেহারা, তেমনি বুদ্ধি তোর। পরীক্ষার আগে কুল খেতে আছে কখনও।'

চেহারা সম্বন্ধে বক্রোক্তি বিশু কানেও তুললো না। সব সময়ে সব কথা কানে তুললে মানুষের চলে না। গালে হাত ঠেকিয়ে কেবল বললো, 'ওমা তাওতো ঠিক। এত আচার তা হলে খাবে কে ভুতোদা।'

ভূতনাথ সামনে খুলে ধরা বইয়ের পাতায় চোখ রেখে বললো, 'কেন, আমিই খাবো। পরীক্ষা হয়ে গেলেই খেতে পারবো।'

দু এক মিনিট বিশু চুপচাপ। হাত দিয়ে নাকটা খুঁটলো, তারপরই এক মতলব মাথায় এসে গেলো, 'হ্যা, ভুতোদা, অন্য আচার তো খেতে পারো তুমি?'

'তা পারবো না কেন?' ভূতনাথের চোখ তখনও মোগল সাম্রাজ্যের বিস্তারের পাতায়।

'ব্যস, ঠিক আছে' প্যাঁচটা কোমরে জড়িয়ে বিশু উধাও।

মিনিট দশও নয়। বিশু তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসলো। আঁচলের তলায় ছোট একটা বাটি। জলপাইয়ের আচারে ঠাসবোঝাই।

'নাও ভুতোদা, পরীক্ষার আগে জলপাইয়ের আচার তো খেতে আছে,' বিশু বাটিটা ভূতনাথের সামনে রেখে দিলো।

নধর জলপাই, তার ওপর বিশুর মার আচার তৈরীর পাকা হাত। জিভের পড়ো পড়ো জল ভূতনাথ সড়াৎ করে টেনে নিলো।

ততক্ষণে বিশু কাজ গুছিয়ে নিয়েছে। কাঁচের জার পেড়ে বের করে নিয়েছে কুলের আচার। গোটা কয়েক মুখে ফেলে একটু ধাতস্থ হয়ে বললো, 'বেশ জিনিষ করেন কিন্তু মাসীমা। অল্প খেয়ে সুখ হয় না।'

জলপাইয়ের আচার চাখতে চাখতে ভূতনাথ চোখ ফিরিয়ে বিশুর অল্প খাওয়ার বহরটা দেখে নিলো। এ রকম ভাবে চললে, শিশি অর্ধেক খালি হতে আর মিনিট খানেকও লাগবে না।

একটু পরেই ভূতনাথের খেয়াল হলো, 'কিন্তু মা এসে শিশির এ-অবস্থা দেখলে, কি বলবো? আমি খেয়েছি তাও তো বলবার উপায় নেই।'

আঙুলের ফাঁকে গড়িয়ে আসা আচারের রসটা জিভ দিয়ে টেনে নিতে নিতে বিশু নিশ্চিন্ত গলায় বললে, 'কেউ খেয়েছে বলবার দরকার কি?' কি ভেবে একটু চুপ করে থেকে বললো, 'মাসীমা নেহাৎ পীড়াপীড়ি করলে বলো পায়রায় খেয়েছে।'

'পায়রায় আচার খায়' ভূতনাথ বিস্মিত হলো।

'খায় না আবার। জলপাইয়ের আচার রোদে দেবার যো ছিলো তোমার সখের পায়রার জন্য' লঙ্কাচারার শোকে বিশুর গলা ভিজে ভিজে ঠেকলো, 'অমন অনাসৃষ্টি পাখী পোষার কি যে সখ তোমার ভুতোদা। যদি পুষতেই চাও তো কাকাতুয়া পুষলেই পারো। কেমন সভ্য পাখী। দাঁড় ছেড়ে এদিক ওদিক যায় না।'

হাতে আচার সামনে কিশোরীর চোখে জলের ছিটে, ভূতনাথ মরীয়া হয়ে উঠলো, 'আজই দূর করে দেবো পায়রাটা। আপদ। খাচ্ছেন দাচ্ছেন আর উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছেন। গেরস্থর কোন কাজে নেই।'

দুজনে বাইরে এসেই অবাক। খোপের ভিতর সযত্নে পাতা কাঠির টুকরোগুলো একটা একটা করে মুখে নিয়ে পায়রাটা উড়ে উড়ে সিংহদের ছাদের কার্ণিশের খোপে গিয়ে বসছে। প্রায় শেষ করে এনেছে। আর বার পাঁচ ছয় আনাগোনা করলেই পুরনো বাসার সব কাঠিগুলো নতুন বাসায় নিয়ে যেতে পারবে। শুধু নতুন বাসাই নয়, পাশে পাশুটে রংয়ের নতুন ঘরণীও জুটিয়ে ফেলেছে। গলা ফুলিয়ে মনের আনন্দে দুজনে বক বকম করে চলেছে।

সব ভুলে বিশুর হাত থেকে কুল একটা তুলে নিয়ে ভূতনাথ নিজের গালে ফেলে দিলো, তারপর রস চুষতে চুষতে বললো, 'বিশ্বাসঘাতক কোথাকার!' অদৃশ্য পায়রার উদ্দেশে।

হিন্দুস্থানে হাফিজ

নরেন্দ্র দেব

খৃষ্টিয় চতুর্দশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ শুরু হয়েছে। দিল্লীর সিংহাসনে তখন গিয়াসউদ্দীন তুঘ্লুকের পুত্র ইতিহাসবিশ্রুত খেয়ালী সুলতান মহম্মদ বিন্ তুঘ্লুক সমাসীন। মহম্মদ তুঘ্লুক ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত এবং সমরে সুদক্ষ সৈনিক। ইসলাম ধর্মের প্রতি এঁর অবিচলিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি। ধর্মের সমস্ত আচার ও নিয়ম ইনি সযত্নে পালন করতেন। পুণ্যগ্রন্থ কোরাণের আদেশ মেনে মদ্যপানে বিরত ছিলেন। তাঁর দানশীলতাও রাজ্যে সুবিদিত ছিল।

কিন্তু হ'লে কি হবে? সুলতানের মাথার কোথায় যেন একটু গোলমাল ছিল। তিনি সিংহাসনে বসবার পর খেয়াল খুশি মতো এমন কতকগুলি অবিবেচকের ন্যায় কাজ করলেন যে তার ফলে বিশাল সাম্রাজ্য দেখতে দেখতে তাঁর ছাব্বিশ বছরের শাসনকালের মধ্যেই ছারখার হয়ে গেল। পারশ্য জয় করবার জন্য তিনি বহু সৈন্য সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত পারশ্য অভিযানে যাত্রা করা সম্ভব হ'ল না। রাজকোষে অর্থাভাব হওয়ায় তাঁর সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ হ'য়ে গেল। আর একবার হিমালয় অতিক্রম ক'রে চীন জয় করবার জন্য তিনি এক বিরাট অভিযান শুরু করেছিলেন, কিন্তু হিমালয়ের হিমশীতল ক্রোড়ে তাঁর বহু সৈন্য ক্ষয় হওয়ায় তিনি ফিরে আসতে বাধ্য হন।

এই সময় দাক্ষিণাত্যে মধ্যে মধ্যে গোলযোগ হচ্ছে জেনে তিনি স্থির করলেন, দিল্লী থেকে সুদূর দাক্ষিণাত্য প্রদেশ শাসন করা কঠিন। অতএব, দাক্ষিণাত্যের দেবগিরি নগরে রাজধানী তুলে নিয়ে যাওয়া দরকার। সঙ্গে সঙ্গে হুকুম হয়ে গেল তল্পি-তল্পা গুটিয়ে নিয়ে চলো সব দিল্লী ছেড়ে দৌলতাবাদ। দেবগিরির নাম পরিবর্তন করে তিনি 'দৌলতাবাদ' রেখেছিলেন।

দিল্লীর দুর্ভাগা অধিবাসিগণ বহু কষ্ট সহ্য করে এবং ক্ষতি স্বীকার করে সুলতানের আদেশে সাতশো মাইল দূরবর্তী দক্ষিণের দৌলতাবাদে চলে এল। তাদের মধ্যে অনেকেই পথের মধ্যে রোগে, শ্রমে ও অনাহারে প্রাণ হারাল। কিন্তু, খেয়ালী সুলতানের কিছুদিনের মধ্যেই আবার মত পরিবর্তিত হ'ল। দাক্ষিণাত্যের সৌন্দর্য সম্পদ তাঁকে দিল্লীর আকর্ষণ থেকে টেনে রাখতে পারলো না। হুকুম হল 'দিল্লী চলো।' রাজধানী আবার দিল্লীতে ফিরিয়ে আনা হল।

কিন্তু রাজকোষ যে শূন্য। কি করা যায়? মহম্মদ জানতেন চীন দেশে ধাতুনির্মিত মুদ্রার স্থলে কাগজের নোট চলে। তিনি কাগজ না করে স্বর্ণ রৌপ্যের মুদ্রার পরিবর্তে সেই মূল্যে তাম্রমুদ্রা চালাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু বিদেশী বণিকেরা রজতমুদ্রার বিনিময়মূল্যে তাম্রখণ্ড গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। ওদিকে অসাধু প্রজারা মনেকে এই তামার টাকা জাল করে বাজার ছেয়ে দিলে। ফলে বাণিজ্যের ক্ষতি ও রাজকোষ নিঃশেষ হয়ে গেল।

মহম্মদ তখন নিরুপায় হয়ে প্রজাদের করভার বৃদ্ধি করে দিলেন। প্রজারাও প্রায় নিঃস্ব। তারা করভারে পীড়িত হয়ে ঘরবাড়ী ছেড়ে চাষবাস পরিত্যাগ ক'রে বনে জংগলে গিয়ে আশ্রয় নিলে। দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। রাজ্যের এই দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে একাধিক দেশ দিল্লীর শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করল। বাংলা দেশ তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম। তারপরই, দাক্ষিণাত্যের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়লো। হিন্দুরা সেখানে স্বাধীন 'বিজয়নগর' রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন। কিছুদিন পরে মুসলমানেরাও স্বাধীন 'বাহ্মনী রাজ্য' স্থাপন করলেন। অর্থ ও লোকবলের অভাবে মহম্মদ এই বিদ্রোহ দমন করতে না-পেরে ক্রোধে ক্ষোভে ও আত্মগ্লানিতে ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করলেন।

দাক্ষিণাত্যের এই 'বাহ্মনী' রাজ্য যে ওমরাহগণ মিলিত হয়ে স্থাপন করেন তাঁদের নেতা ছিলেন দুঃসাহসী জাফর খাঁ। এঁর প্রকৃত নাম 'হাসান'। ইনি বলতেন যে পারশ্যের বাহমন্ শাহ্ নামে এক নৃপতির তিনি বংশধর। সর্দারের দেহে রাজরক্ত আছে জেনে ওমরাহগণ তাঁকেই সিংহাসন গ্রহণের জন্য অনুরোধ করলেন। এই নবরাজ্য 'বাহ্মনী রাজ্য' নামেই পরিচিত হল। দাক্ষিণাত্যের এই অঞ্চলের 'গুলবর্গা' নগরে তিনি রাজধানী স্থাপন করলেন। এ হ'ল অনুমান ১৩৪৭ খৃঃ অব্দের কথা।

হাসান বা জাফর খাঁ নিজেকে সুলতান আলাউদ্দীন বাহ্মনশাহ বলে ঘোষণা করলেন। অতি সুযোগ্য ও শক্তিমান শাসনকর্তা হয়ে উঠেছিলেন তিনি। অল্পদিনের মধ্যেই

বাহ্‌মনী রাজ্যকে বল বীর্য বৈভব ও বাণিজ্যে দাক্ষিণাত্যের একটি শ্রেষ্ঠ রাজ্য করে গড়ে তুললেন। এই রাজ্য এত দ্রুত বিস্তৃত ও বৃহৎ হয়ে উঠলো যে এর প্রতিপত্তি সেই পশ্চিমে কোংকানের কূল ও পূর্বে বারঙ্গল পর্যন্ত এবং উত্তরে বেরার ও দক্ষিণে কৃষ্ণা নদীর সীমানা পর্যন্ত গিয়ে পোঁচেছিল।

এঁরা কিন্তু প্রতিবেশী হিন্দু রাজ্য বিজয়নগরের সঙ্গে বরাবর নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন। বিজয়নগরের বিজয়লক্ষ্মীকে কখনো হিন্দুদের কাছে কখনো বা মোসলেমদের কাছে যাতায়াত করতে দেখা যাচ্ছিল।

এই বাহ্‌মনী বংশের সুলতানরা পর পর চৌদ্দজন প্রায় একশ আশী বৎসর ধ'রে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা ছিলেন। ইতিহাস বলে, এঁরা সকলেই আদর্শ-চরিত্র নৃপতি ছিলেন না। সুরা ও নারীর প্রতি অত্যধিক আসক্তিবশতঃ এবং নিরবচ্ছিন্ন উচ্ছৃংখল জীবন যাপন করার ফলে অনেকেরই অল্পবয়সে অকালমৃত্যু ঘটেছিল। রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্র ও রাজপরিবারের গুপ্ত দলাদলির ফলে অন্ততঃ চারজন সুলতানের অপঘাত মৃত্যু ঘটে। দুজন সিংহাসনচ্যুতও হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন সুলতান ফিরোজ শাহ বাহ্‌মনী। ইনি যেমনি বিদ্বান ও ন্যায়বান ছিলেন তেমনি সুচরিত্র ও দুঃসাহসী বীর ছিলেন। বহু ভাষাবিদ বলে এঁর খ্যাতি ছিল। বিজয়নগরের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি বারবার দুবার তাদের পরাস্ত করে শেষে স্থায়ী শান্তি ও সন্ধির সর্তস্বরূপ বিজয়নগরের এক রাজকুমারীকে বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু, তৃতীয়বারের যুদ্ধে নিজেই পরাজিত হয়েছিলেন। এঁর রাজত্বকালে বাহ্‌মনী রাজ্যের চরম উন্নতি হয়েছিল। রাজধানী গুলবার্গ ভাল ভাল রাস্তাঘাট, দোকান পাট ও স্থাপত্যকলার উৎকৃষ্ট নিদর্শনস্বরূপ বহু সুন্দর অট্টালিকায় সুশোভিত হয়ে দিল্লীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা শুরু করেছিল। এই দাক্ষিণাত্যসূর্য সুলতান ফিরোজ শাহ বাহ্‌মনীরই এক পূর্বপুরুষ সুলতান তৃতীয় মহম্মদ শাহ বাহ্‌মনী একজন সাহিত্যরসিক ও কলাকুশল পুরুষ ছিলেন। শিক্ষিত ও বহুভাষাবিদ্ বলে তাঁরও খ্যাতি ছিল। বিশেষ করে আরব্য ও পারশ্যভাষায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। কবি ও কথাশিল্পীদের তিনি ছিলেন একজন উদার পৃষ্ঠপোষক। সুরশিল্পীদের তিনি ছিলেন বন্ধু ও ইয়ার। তিনি একটু অতিরিক্ত পানাসক্ত ছিলেন ব'লে সঙ্গীতের মজ্‌লিশে একটু বেতর হয়ে উঠতেন। এঁর দরবারে দেশবিদেশের কবি ও সাহিত্যিকেরা এসে তাঁদের রচনা সুলতানকে শুনিয়ে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক এবং অন্যান্য নানা উপহার ও উপঢৌকন পেয়ে হাসিমুখে বাড়ী ফিরতেন। সুদূর আরব ও পারশ্য দেশ থেকেও গুণীরা আসতেন এঁর দরবারে তাঁদের এলেম দেখাতে। একজন উঁচুদরের সমঝদার বলেও সুলতান মামুদ শাহ বাহ্‌মনীর খ্যাতি দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। নিজে গুণী ছিলেন বলে গুণীর সমাদর করতে শিখেছিলেন।

হাফিজের কানে এ খবর এসে পৌছতে তাঁর ইচ্ছা হ'ল একবার হিন্দুস্থানের এই গুণানুরাগী সুলতানের দরবারে গিয়ে তিনিও একটা কবিতা শুনিয়ে আসবেন। কিন্তু হাফিজ তখন সর্বত্যাগী ফকীর—একেবারে সম্পূর্ণ নিঃস্ব। সুদূর পারশ্য থেকে হিন্দুস্থানে আসবার মতো তাঁর অর্থসঙ্গতি ছিল না। লোকমুখে হাফিজের এ অভিলাষের কথা শোনবামাত্র সুলতান মহম্মদ শাহ বাহ্‌মনীর সুযোগ্য উজীর মীর ফজলুল্লা আনজু তাঁর কাছে পাথেয়স্বরূপ যথেষ্ট অর্থ পাঠিয়ে দিয়ে কবিকে সসম্মানে আহ্বান করে পাঠালেন সুলতানের দরবারে অনুগ্রহ করে পদধূলি দেবার জন্য।

হাফিজ সানন্দে এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। পাথেয়স্বরূপ প্রাপ্ত প্রচুর অর্থের কিয়দংশ তিনি তাঁর সমস্ত উত্তমর্ণের ঋণ পরিশোধে ব্যয় করলেন। কিয়দংশ তাঁর স্নেহের ভগ্নীর প্রিয় পুত্রকন্যাদের দান করলেন। অবশিষ্ট অংশ নিজের ব্যয় নির্বাহের জন্য সঙ্গে নিয়ে ভারতাভিমুখে যাত্রা করলেন।

বহুকষ্ট স্বীকার ক'রে পথশ্রমে ক্লান্ত কবি যখন পাঞ্জাবে পৌঁছে লাহোর শহরে এসে বিশ্রাম করছিলেন তখন হঠাৎ সেখানে তাঁর এক পরিচিত বন্ধুর সঙ্গে দেখা হ'ল। দস্যুরা বন্ধুর যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করে নেওয়াতে তিনি এই দূরবিদেশে অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়েছেন। এ সংবাদ শোনবামাত্র হাফিজ তাঁর সঙ্গের সমস্ত অর্থ নিঃশেষে বন্ধুকে দান করে দিলেন বন্ধু হাফিজের কাছে এই অপ্রত্যাশিত অর্থ সাহায্য পেয়ে প্রভূত উপকৃত হলেন এবং সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে বন্ধুকে অজস্র ধন্যবাদ জানিয়ে হিন্দুস্থান থেকে ইরাণে ফিরে গেলেন।

কিন্তু হাফিজ পড়লেন বিপদে। লাহোর থেকে তিনি আর দাক্ষিণাত্যের দিকে অগ্রসর হ'তে পারলেন না। কপর্দকশূন্য অবস্থা তাঁর। সৌভাগ্যক্রমে সেই সময় পারশ্যের দুজন ধনী বণিক হিন্দুস্থানে তাঁদের বেচাকেনা শেষ করে দেশে ফিরছিলেন। তাঁরা হাফিজের পরিচয় পেয়ে এবং তাঁর বিপন্ন অবস্থা জেনে তাঁকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার সমস্ত

ব্যয়ভার বহন করতে রাজী হলেন। অবশ্য, এই ভুবনবিদিত কবির দুর্লভ সংগলাভের লোভেই তাঁরা হাফিজের দেশে ফেরার খরচটা দিতে চেয়েছিলেন।

তাঁদের সঙ্গে পরমানন্দে কবি ইরাণে ফিরে চললেন। পারশ্যোপসাগরের হরমুজ বন্দরে উপস্থিত হ'য়ে শুনলেন যে দাক্ষিণাত্যের সুলতানের প্রেরিত জাহাজ কবিকে হিন্দুস্থানে নিয়ে যাবার জন্য বহুদিন থেকে অপেক্ষা করছে। হাফিজ ছিলেন অতি ভদ্র। এ সংবাদ শুনেই তিনি তৎক্ষণাৎ আবার সেই জাহাজে উঠে দাক্ষিণাত্যে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

কিন্তু, জাহাজ ছাড়বার ঠিক অব্যবহিত পূর্বে ভীষণ ঝড় উঠলো। সেই প্রচণ্ড ঝড়ের প্রবল বেগে জাহাজখানি সমুদ্রকূলে নোঙর ফেলে থাকা সত্ত্বেও বিপুল ঢেউ তুফানের ঘনঘন ধাক্কায় ভীষণ তেলাপাড় হ'তে লাগলো। হাফিজের জীবনে সেই প্রথম সমুদ্রযাত্রা। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সাগরের সেই ফেনিল উত্তাল ভয়াল রূপ দেখে তিনি এমনি ভড়কে গেলেন যে দাক্ষিণাত্যে যাবার সংকল্প বর্জন করে তিনি ঝড় থামবামাত্র জাহাজ থেকে বন্দরে নেমে গেলেন এবং আর জাহাজে ফিরলেন না।

কিন্তু জাহাজ তো তাঁকে না নিয়ে ফিরে যাবে না। সুলতানের হুকুম! হাফিজ মহামুস্কিলে পড়লেন। শেষে, তাঁর এক বন্ধুর হাতে উজীর মীর ফজলুল্লাকে কবিতায় একখানি পত্র লিখে পাঠিয়ে দিলেন। পত্রখানিতে তিনি লিখেছিলেন—

'দুঃখের মাঝে মুহূর্তবাস—বিশ্ব পেলেও কে বলো চায়?
ধর্মের ছেঁড়া পোষাক কি দামী? বেচে দেয় জেনো, সুরা যে পায়!
অর্থের লোভে সমুদ্রপাড়ি, ভেবেছিল লোভী অনেক সোজা,
সাগরের কাছে রত্নমাণিক তুচ্ছ কতো যে যায়নি বোঝা।
সম্রাট শিরে স্বর্ণমুকুট সম্ভ্রমসনে জাগায় ভয়,
মূল্য মানি সে রাজমুকুটের; জীবন তা ব'লে তুচ্ছ নয়।'

এই ব্যাপার থেকে কবিশ্রেষ্ঠ হাফিজের চিত্তের ও চরিত্রের সুন্দর একটি পরিচয় পাওয়া যায়।

কবির সেই ছন্দোবদ্ধ লিপিখানি উজীর মীর ফজলুল্লা সাহেব পাবামাত্র সুলতান মহম্মদ শাহ্ বাহ্মনীকে কবিতাটি শুনিয়ে তাঁর কাছে সকল ঘটনা সবিস্তারে জানালেন। সুলতান কবির কাণ্ডকারখানা শুনে অত্যন্ত খুশী হ'য়ে হাফিজকে তৎক্ষণাৎ আরও এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পাঠাবার আদেশ দিলেন এবং কবি যে অনুগ্রহ ক'রে সুলতানের আমন্ত্রণ রক্ষা করবর জন্য এত কষ্ট স্বীকার করে হিন্দুস্থানে এসেছিলেন এবং লাহোর পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন, এজন্য তাঁকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ ও সুলতানের আদাব জানালেন। ['ফেরিস্তা' দ্রষ্টব্য]

১৩৫৯ খৃঃ অব্দে বাংলার নবাব গিয়াসুদ্দীন পূরবী হাফিজকে বংলা দেশে পদার্পণ করবার জন্য সদর আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন। কিন্তু হাফিজ তাঁর এ নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে অক্ষম বলে পত্র লিখে তাঁকে জানিয়েছিলেন। একটি গজলের মধ্যে তিনি বাংলার এই নিমন্ত্রণের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। এখানে তার কিয়দংশ তুলে দিয়ে এ প্রবন্ধ শেষ করছি।

'হিন্দুস্থানের তোতাপাখীরা সব আমার গানের সুধা পান করে
জনে জনে আজ মধুকণ্ঠ হয়ে উঠেছে দেখছি!
পারশ্যের এই মিঠাই তাই বাংলায় চলেছে আজ।
কাব্যের স্বচ্ছন্দ পথে, দেখ, স্থান কালের ব্যবধান বলে কিছু নেই!
এই যে অমার রচনা, যা, একরাত্রের একটি শিশুমাত্র,
চলেছে সে আজ বৎসরের পথ অতিক্রম করে বাংলা দেশে!'

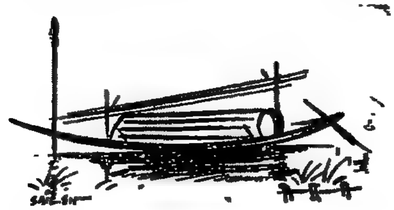

প্রভাত দেব সরকার

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

রেণু কাকীমার চিঠি নিয়ে অমল আর কোন কথা জিগ্যেস করেনি সারদা দেবীও কিছু বলেননি। বেশ বোঝা যায় রেণু কাকীম সম্বন্ধে এ'দের ধারণা তেমন উঁচু নয়। কে জানে, তার সম্বন্ধে রেণু কাকীমা কি লিখেছিলেন ?

নিভার আশ্চর্য বোধ হয়, কত সহজে এ'রা তাকে মেনে নিয়েছেন। কতটুকুই বা জানাশোনা, কতখানিই বা আত্মীয়তা। অমল কিছুটা জানে, কিন্তু সারদা দেবী আর কি জানেন—নামও হয়তো শোনেননি কোনদিনঃ ছেলের কথাতে মা রাজী হয়েছেন, মেনে নিয়েছেন, ঘরে স্থান দিয়েছেন। একটা অনাথার বোঝা ঘাড়ে নিলেন।

নতুন আশ্রয়দতাদের প্রতি শ্রদ্ধা, বিস্ময় এবং কৃতজ্ঞতায় নিভার মন ভরে উঠলেও মাঝে মাঝে তার কেমন ভয় হয়, এখানেও তার স্থান স্থায়ী নয়। —আবার আর কোথাও কখন হয়তো তাকে ভেসে যেতে হবে। খুঁজে বেড়াতে হ'বে এক আশ্রয় থেকে আর এক আশ্রয়। অভিভাবকহীনা কুমারী জীবনে এই বোধ হয় তার চিরকালের ভাবনা কামনা হ'য়ে থাকবে।

চলে যাবার কথা অবশ্য নিভা একদিন তুলেছিল। সারদা দেবীও শুনেছিলেন, যতখানি শোনা দরকার মনে করেছিলেন। সেদিন কোন জবাব দেননি। তার পরের দিন কি একটা কাজে নিভা রান্নাঘরে আসতে তিনি হঠাৎ ফরমাস করে বস্‌লেন, বাটনার জায়গাটা এগিয়ে দাও তো মা।

এ বাড়ীতে এসে এই বোধ হয় প্রথম নিভা কাজ করবার সুযোগ পেলে। কিন্তু তার যে বিশ্বাস হয় না, ঐ শুচিবায়ুগ্রস্তা হঠাৎ তার শুচিতায় নির্ভর করলেন কি করে। কোলকাতায় ম্লেচ্ছ মেয়েদের সে তো একজন। যারা বাসিমুখে চা খায়, জুতো পরে রান্নাঘরে ঢোকে এড়া কাপড়ে শোবার ঘরে যায়, এ'টো হাতে চারদিক করে।

নিভাকে ইতস্তত করতে দেখে সারদা দেবী ফের বললেন, দাও মা দাও, আমি বলছি।

দুজনেই দুজনের মনোভাব বুঝতে পেরে হাসে। সবেমাত্র স্নান সেরে পিঠের ওপর এলো চুল ছড়িয়ে মুখমার্জনা করে শুচিশুভ্র হ'য়ে এসেছে নিভা।

নিভার মুখের দিকে চেয়ে সারদা দেবী বললেন, অনেকদিন থেকে আমার একটি মেয়ের সখ। বুড়ো হয়েছি, আর কি সব পারি নিজের হাতে, একটি দোসর চাই। অমল তো রাজী হয় না—

একটুখানি থেমে সারদা দেবী বললেন, তুই চলে যাসনি মা। যে কটা দিন বাঁচি না হয় বুড়িটাকে একটু দেখলি।

কম্পিত হাতে বাটনার জায়গাটা সারদা দেবীর সামনে রেখে নিভার সব যেন কেমন গোলমাল হ'য়ে যায়। শ্রুতি, স্মৃতি চিন্তা কেমন যেন জড়িয়ে গেল, গাটা থরথর করে কাঁপিতে লাগল। একি আনন্দ না, বেদনা না, ভয় ?

সামলাতে নিভার বোধ হয় দেরীই হয়। আশ্চর্য, অমন কঠিনা, তপশ্চারিণী কেমন দ্রব হ'য়ে গেছেন শুষ্ককাষ্ঠে কিভাবে কখন যে রসসঞ্চার হয় কে জানে।

হেঁট হয়ে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে সজল চোখে সারদা দেবী বললেন, কথা দে তুই এখানেই থাকবি—

কি জানি কার কথা মনে পড়ে নিভার। এমন স্বরে আর কে কবে তার অভিমান ভেঙেছিল। তার মুল্যই বা এমন করে আর কে বুঝেছিল।

সারদা দেবী আর কিছু বললেন না। পিছন ফিরে উনুনে চাপান তরকারীটার তদ্বির করতে লাগলেন। নিভার যেন কোন সাড়া নেই, কেমন যেন সে হ'য়ে গেছে—অপরিসর রান্নাঘরটার এত আলো যে তার চোখ ধাঁধিয়ে যায়। তার সজল চোখের ওপর সারদা দেবীর ঐ শুভ্র বেশ, কঠিন-ক্ষীণ কর্মরতা দেহটা পদ্মকোরকের মত নড়ছে কেবল। বৈধব্য সাধনার রূপ বোধ-হয় এমনিই সুন্দর।

এমনি নিভার মনে হয়, দৃশ্যটা যদি উল্টে যেত। সে ঐ পিঁড়ির ওপর বসে এমনি করে একনিবিষ্টা হ'য়ে রাঁধত্রে আর সারদা দেবী এসে দেখতেন। তা হ'লে তাতে তাদের সম্পর্কের একটা সহজ যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যেত। মেয়ের সম্পর্ক, মায়ের সম্পর্ক।

বেণু কাকীমার সংসারে রান্নার কাজটা তার শরীরে কায়িক পরিশ্রমের শক্তি সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে নিতে হয়েছিল। বিনয় কাকার ওখানে হে'সেল মানে নিভা। কি ভাবে যে কাজটা তার ঘাড়ে চাপান হয়েছিল আজ সঠিক মনে না পড়লেও প্রথম দিনের কাজটা প্রথম পাঠের মত নিভার মনে আছেঃ দালানে বসে সে, গৌরী, ভোলা পড়ছিল। সামনে বসে রেণুকাকীমা বোধ হয় উল আর কাঁটা নিয়ে কি বুনছিলেন। হঠাৎ রেণুকাকীমা বললেন, দেখে আয় তো নিভা ভাতের হাঁড়িতে জল আছে কি না। একদম ভুলেই গিয়েছিলুম, যা যা—

ক্ষুন্নমনে পড়া ছেড়ে উঠে সবে দু'পা নিভা গেছে, রেণুকাকীমা বললেন, টিপে দেখিস্ ভাত হ'য়েছে কিনা, যদি হয় আমাকে ডাকিস—

বেশ মনে আছে নিভার। নীচে গিয়েই বুক-চর-চর ভাতের হাঁড়িতে সে হুড়-হুড় করে জল ঢেলে দিয়েছিল—খন্তির ওপর দু'চারটে ভাত তুলে সজোরে টিপে দেখেছিল, তার পর রেগে ভাতের হাঁড়িটার কানা ধরে নামিয়ে দিয়েছিল। হয়তো হাঁড়িটায় টোলই পড়ে গিয়েছিল খানিকটা।

হাঁড়িটা উপুড় করে ফেন গলাতে যেতেই পিছন থেকে রেণু কাকীমার গলা পেলে সপ্রশংসেঃ বাঃ বেশ তো তুই ভাতের হাঁড়ি নামাতে পারিস্!

কথাটা প্রশংসার হ'লেও নিভার শিশু মন কিন্তু সেদিন উল্লসিত হয়নি। ভাতের হাঁড়িটা ছেড়ে এক পাশে গুম হ'য়ে এসে গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল সে। কিন্তু কাজটা যে সত্যি বাহাদুরীর একটা দশ বছরের মেয়ের পক্ষে তা বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা কোন পক্ষ থেকে কোনদিন হয়নি। তারপর অমন ভাতের হাঁড়ি নামাতে পড়া ছেড়ে নিভাকে প্রায় রোজই আসতে হ'তো। শেষে একদিন বইপত্তরগুলো ভাতে-ভাত করে নিভা এসে রান্নাঘরে ঢোকে। তা ছাড়া রেণু কাকীমাও আর পারছিলেন না—বছর বছর বিয়োন, মাথাধরা, বুক ধড়-ফড় করা, কোমর-পিঠ কন্-কন্ করা আরো কত উপসর্গ দেখা দিল তাঁর। সুতরাং বিনয়কাকার সংসারের মুখ চাওয়া এখন তারই কর্তব্য—দ্বিতীয় যখন কেউ নেই।

শক্ত, সমর্থ মেয়ের সাহায্য পাবার সুযোগ এমন করে কেউ হারায় না। সারদা দেবী শুধু থাকবার অনুরোধ করলেন, কিন্তু সংসারের কুটি ভেঙে দুখানা করতে দিলেন না নিভাকে। মনে মনে সম্পর্ক পাতা হ'য়ে গেলেও দৃশ্যতঃ কোন ভারই পড়ল না নিভার ওপর। সারদা দেবী নিজের হাতেই রান্নাবাড়া, ঝাড়-পোছ সবই করতে লাগলেন পূর্বের মত।

এ যেন আরো অস্বস্তি নিভার পক্ষে। শুধু হৃদয়ে স্থান পেতে সে এখানে আসেনি। সবার সঙ্গে সমান দায়িত্ব নেবার জন্যে সে এসেছে। পাঁচজনের একজন।

কাজের কথা নিভা একদিন বললে মুখ ফুটেঃ মাসীমা আমাকে কিছু করতে দেবেন না, খাব-দাব আর ঘুমব কেবল?

হেসে সারদা দেবী বললেন, কেন, কাজ খুঁজে পাসনি—মেয়ের কথা শোন! আমি বলে হাঁপিয়ে যাচ্ছি আর তুই কাজ পাসনি। যা দিকি ছাদের ওপর থেকে কাপড়গুলো তুলে নিয়ে আয়।

নিভা নড়ে না। মানে, কথা কাটাবার এ এক অছিলা সারদা দেবীর। আর কখানাই বা কাপড় ছাদে মেলে দেওয়া আছে—বড় জোর দুখানা, তার আর সারদা দেবীর। অমল তো কাপড়ই পরে না—পাজামা, ট্রাউজারস্।

তেমনি হেসে সারদা দেবী বললেন, কি মন উঠলো না। তবে এক কাজ কর, কাল লক্ষ্মীপুজো মায়ের ঘরে আলপনা দিয়ে আয়। সরবতীকে বল সে সব জোগাড় করে দেবে।

তবু নিভা নড়ে না, তেমনি অপ্রসন্ন মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। সারদা দেবী মেয়ের অভিমান টের পেয়ে বলেন, তাহ'লে কি করতে চাস? কি কাজ তোর পছন্দ? আশ্চর্য মেয়ে বাবা, মুখ দেখনা বুজে গেছে। বল তোমার কি খুশী?

নিভা কাচুমাচু স্বরে বলে, আমাকে দেখিয়ে না দিলে কি করে' আলপনা দেব!

সারদা দেবী অবাক হ'য়ে নিভার করুণ ব্যথিত মুখখানার দিকে তাকান। হিন্দুঘরের এতবড় মেয়ে আলপনা দিতে জানে না!

সরাদা দেবী জিগ্যেস করেন, কেন, শেখনি? অতবড় মেয়ে তা হ'লে কি শিখেছো। রেণু এ্যাদ্দিন কি শিখিয়েছে তাহ'লে!

চোখ দিয়ে নিভার ঝর্ ঝর্ করে অশ্রু ঝরে পড়ে। এ তো গঞ্জনা নয়!

সরাদা দেবী আর কিছু বললেন না। হাত ধুয়ে দরজায় শিকল তুলে দিয়ে বল্লেন, চল দুজনে মিলে দিগে যাই। শিখতে আর মানুষের কদিন লাগে।

সংসারে ভাতের হাঁড়ি ঠেলা ছাড়াও যে আরো অনেক কাজ শেখবার আছে নিভা ক্রমে ক্রমে জানতে পারে। সকাল, দুপুর সন্ধ্যে আশ্চর্য কর্মতালিকায় তার পূর্ণ হ'য়ে ওঠে। ভোরে উঠে স্নান সেরে সারদা দেবীর পূজাপাঠের আয়োজন করা, চায়ের যোগাড় করা, তারপর সমস্ত ঘর দোরের দরজা জানালা খুলে দিয়ে বিছানা-মাদুর ঝাড়-মোছ করা। সকালের রোদ্দুরের মত কি আনন্দ, কি খুশী এই কাজে! দুপুরে সেলাই নিয়ে বসা, কত সেলাই-ফোঁড়াই যে জানেন সারদা দেবী তার শেষ নেই। প্রথম যেদিন নিভা সেলাই-এর কল চালিয়ে সেলাই করলে সে কি আনন্দ! নিজেকে সম্যক উপলব্ধির সে কি উল্লাস! একটা অবজ্ঞাত, বীত-প্রশ্ন জীবনকে কে যেন তুলে ধরেছে। এত মাদকতা প্রথম দিনের সেই স্পর্শে বোধ হয় ছিল না।

সন্ধ্যাবেলার কথা মনে পড়ে নিভার। কত গল্প করতেন সারদা দেবী, কি করে কি ভাবে তাঁরা দেশ ছেড়ে এখানে এসে বসবাস আরম্ভ করলেন। দেশের ওপর আজও তাঁর কত মায়া আছে, কেন তিনি ফিরে যেতে পারেন না। আরো কত গল্প।

অমলকে নিয়ে আজ তিনি বিশ বছরের ওপর বিধবা হয়েছেন। এই বিশ বছর তিনি এই পান্ডববর্জিত দেশে একলা-একলা বাস করছেন। সহায়হীনা, আত্মীয়স্বজনহীনা। ঐ সরবতীয়া তখন এতটুকু মেয়ে, উনি কোথা থেকে কুড়িয়ে এনেছিলেন। অমলকে কোলে কাঁকে করে মানুষ করেছে। এখন নিজের ঘর সংসার হ'য়েছে। তবে এক সময় ও আমার অনেক করেছে, অমল যখন ছোট তখন ওর ভরসায় এই এত বড় বাড়ীতে বুকে বল নিয়ে বাস করেছি—চোর, ডাকাত, খুনে কত কিসের যে ভয় ছিল!

রুদ্ধশ্বাসে নিভা শোনে সে-সব কথা। সারদা দেবীর একলা

বাসের কাহিনী তাকে কোথায় যেন নাড়া দেয়—শুধু সাহস নয়, এই মানুষটির কাছে ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে অনেক কিছু শেখবার আছে। মেয়েছেলে হয়েও বিপদে পড়ে তিনি হাত-পা হারিয়ে ফেলেননি। আরো আগে যদি এঁর আশ্রয়ে আসতো নিভা!

সারদা দেবী সব সময় একটা না একটা কাজ নিয়ে থাকেন। মুখে গল্প বলে যান; কিন্তু হাত দুটো তাঁর ঠিক কাজ করে। আগামী শীতের জন্যে নানা প্যাটার্নের পুলওভার তিনি বোনেন নানা মাপের। এ সবই উপঢৌকনের কাজে লাগবে। বাঙলা দেশে স্বামীর এবং নিজের সম্পর্কে যে-সব আত্মীয়-স্বজন আছেন যাঁরা আজও চিঠিপত্রে খোঁজখবর নেন, তাঁদের ছেলেমেয়েদের জন্যে সারদা দেবী এগুলো পাঠান।

রেণুকাকীমার ওখানে থাকবার সময় নিভা প্রায় প্রতি বছরই দেখতো, হাতে-বোনা উলের নতুন নতুন সোয়েটার, পুলওভার, মাফলার, মোজা অমল নিয়ে গেছে। রেণুকাকীমার ছেলেমেয়েদের নাম করে' করে' জিনিষ পাঠাতেন সারদা দেবী—ভুল হতো না, এমন কি সদ্যজাত শিশুটার জন্যে গরমের কিছু না কিছু যেত। নিভার অহেতুক অভিমান হ'তো বৈকি, সারদা দেবী তার জন্যে কিছু পাঠাতেন না কেন। বিনয়কাকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে কি সে একজন নয়? এত একচোখোমি কেন! নিজের কাছে স্বীকার করতে দোষ নেই, কতদিন লুব্ধ দৃষ্টিতে গৌরী, ভোলার গায়ে উলের সুন্দর, সুছাঁদ জামাগুলো দেখে নিজের ভাগ্যকে আর ওদের উপহারদাত্রীকে শাপান্ত করেছে নিভা। তিনি যেই হোন, বড় নিষ্ঠুর, নির্দয়! এতগুলো তিনি পাঠাতে পারেন, আর তার জন্যে একটা পাঠাতে পারেন না? রেণুকাকীমার চেয়ে কিসে তিনি কম! একজনকে কাঁদিয়ে আর একজনকে খুশী করতে মানুষে পারে নাকি!

কিন্তু ভুল বুঝেছিল নিভা সেদিন দূর থেকে। জানলে সারদা দেবী কখনো অমন কাজ করতেন না, শুধু আত্মীয় নয় যেখানে যে আছে তার জন্যে তিনি হাতে বোনা জামা পাঠান, কেবল একটু সংবাদের অপেক্ষা। কত ধৈর্য আর পরিশ্রম করে প্রত্যেকের নাম মনে করে করে এসব জিনিষ পাঠাতে তাঁর কি আগ্রহ নিভা চাক্ষুস দেখেছে! নামের লিস্ট করা আছে? রেণুকাকীমা নিশ্চয়ই কখনো তার নাম করেননি সারদা দেবীর কাছে। না হ'লে—

এতদূরে এসে এদেশের জলহাওয়ার সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিলেও বাঙলাদেশের নাড়ীর সঙ্গে যোগ রাখবার এর চেয়ে বড় সূত্র বোধ হয় সারদাদেবী আর কিছু খুঁজে পাননি। প্রতিদিন হাত ঘুরিয়ে পশম বোনা মানে ইষ্টনাম জপের মালা ফেরান—জন্মভূমিকে স্মরণ করা। এ পর্যন্ত যত পশম তিনি বুনেছেন তার দৈর্ঘে বোধ হয় চারবার বাঙলা দেশের সঙ্গে এই দেশকে জড়ান যায়। কিভাবে কোথায় যে কখন যোগসূত্র গড়ে ওঠে কে জানে।

একদিন না-বুঝে না-জেনে মানুষটার ওপর যে অশ্রদ্ধা পোষণ করেছিল আজ তার জন্যে মনে মনে নিভা ক্ষমা চেয়ে নেয়। দেশকে সে হয়তো অমন নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসতে পারবে না। মনে রাখার এই অদ্ভুত সহিষ্ণুতা সে কোথায় পাবে!

পড়াশোনায়ও সারদা দেবীর ঝোঁক খুব। নিয়মিত তিনি রামায়ণ-মহাভারত পড়েন, কলকাতা থেকে প্রকাশিত কয়েকখানা সাময়িক পত্রের গ্রাহিকাও তিনি। হিন্দী কাগজও দু'একখানা রাখেন।

মুস্কিল হ'লো যেদিন তিনি নিভাকে রামায়ণ পড়ে শোনাতে বল্লেন। বেচারী অপ্রস্তুতের একশেষ—ঢুখিয়ে ঢুখিয়ে আমতা আমতা করে সব সময়ও কেটে গেল। সারদা দেবীর হাতের সেলাই থেমে গেল, ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হ'য়ে উঠলো। বোধ হয় বিরক্তও হ'লেন তিনি।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেন বল্লেন, অত বড় মেয়ে রামায়ণ পড়তে জানিস্ না! রেণু কিছু শেখায়নি!

চোখের জলে রাম-মাহাত্ম্য ভিজে ঢোল হ'য়ে গেল। নিজের ওপর ধিক্কারে নিভা মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাইলে। পড়াশোনায় যেটুকু আগ্রহ তার ছিল তাও একদিন সে রেণুকাকীমার ওপর রাগ করে শেষ করে দিয়েছে। সেই আত্মঘাতী রাগের লজ্জা আজ সুদসমেত উসুল হচ্ছে।

কিছুক্ষণ পরে পিঠে হাত রেখে স্নেহার্দ্রকণ্ঠে সারদা দেবী বল্লেন, এতে কান্নার কি আছে! আমি শিখিয়ে দেবো। নে পড়ঃ আমার সঙ্গে এস......

নিভা কেঁদে আকুল হ'লো। যদি বোঝাতে পারতো যে কেন তার লজ্জা! কেন সে সামান্য কথাগুলো ঠিক ঠিক পাঠ করতে পারে না। বেদনা সে সারদা দেবীর কথায় পায়নি, ক্ষত পেয়েছে নিজের অক্ষমতার জন্যে।

সারদা দেবী কিন্তু সুর করে পড়ে যেতে লাগলেন। ধীরে ধীরে নিভার কান্নাও থেমে এল। বাইরে সাইকেলের শব্দ হ'তে সারদা দেবী উঠে পড়লেন।...

এদিক থেকে কোন সাড়া-শব্দ না পেলেও রেণুকাকীমার আগ্রহ কিন্তু তিলমাত্র কমেনি। তিনি প্রতি সপ্তাহে নিভার সম্বন্ধে সাতখানা করে চিঠি লিখতে লাগলেন সারদা দেবীকে। সারদা দেবী কোনদিন ভুলেও নিভাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করেননি। নিভারও জানবার কোন সুযোগ হয়নি।

একদিন সারদা দেবীর বিছানাপত্তর ঝাড়তে ঝাড়তে রেণুকাকীমার একখানা চিঠি নিভার হাতে পড়ল। খোলা চিঠি, খামটা কবে যেন ছেঁড়া হ'য়েছে, চিঠির পৃষ্ঠাগুলোও এলোমেলো, মোড়া—দুষ্টবোর মধ্যে কেবল রেণুকাকীমারই নামের স্বাক্ষরঃ ইতি, স্নেহের রেণু। রেণুকাকীমারই হাতের লেখা মনে হয়।

চিঠিটায় হাত না দিয়ে 'স্নেহের রেণু' কথাটায় নিভা বড় কৌতুক বোধ করেছিল। আট ছেলে-মেয়ের বৃহৎ সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী কিনা এখনো অপরের স্নেহের পাত্রী! দেখতে দেখতে গৌরীরও বিয়ে হ'য়েছে আজ দুবছর। মনে মনে হেসেওছিল নিভা।

সারদা দেবীকে লেখা চিঠি এভাবে লুকিয়ে পড়া ঠিক হবে কিনা ভাবতে যেন নিভার অনেকটা সময় যায়। আড়ালে পরের চিঠি না-পড়ার নিষেধটা তাকে বাধা দেয়। তা ছাড়া—

তবু নিভা শেষ পর্যন্ত না পড়ে থাকতে পারেনি। কিছু করুক আর নাই করুক তার মনে হয়েছিল ওতে রেণুকাকীমা তার

সম্বন্ধে অনেক কথা লিখেছেন। এই প্রথম নয়। সারদা দেবী কিছু না বললেও তার সাবধান হয়ে যাওয়া উচিত।

চিঠিটা বেশীদূর আর নিভাকে পড়তে হয় না। ক্ষোভে, ক্রোধে মাথাটা তার ঝিম্ ঝিম্ ক'রতে থাকে। নীচতারও একটা সীমা আছে, কিন্তু রেণুকাকীমা তাও গ্রাহ্য করেননি। লিখেছেন "...ওকে ঘরে স্থান দিলে তোমার সর্বনাশ হবে...এতবড় নির্লজ্জ, বেহায়া, দুশ্চরিত্রা মেয়ে যদি ভূভারতে দুটো থাকে...এখানে কি যে কেলেঙ্কারী করে গেছে তা যদি তোমাকে লিখতে পারতুম তা হ'লে বুঝতে...ও মেয়ে যে ঘরে যাবে সে ঘর জ্বালিয়ে ছাড়বে...তোমার সমর্থ ছেলে আছে বুঝতে পারবে...সময় থাকতে বিদেয় করে দাও...

থর থর করে নিভার হাতটা কাঁপতে থাকে। চোখমুখ জ্বালা করে, চিঠিটা কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেললেও রাগ যাবে না। হঠাৎ চোখের সামনে সমস্ত আলো তার নিভে যায়।

শুধু ক্ষোভ নয়, নিজেকে নিভা প্রতারণাকারিণীর দুরপনেয় কলঙ্ক থেকে মুক্ত করতে পারে না। সত্যি হোক মিথ্যে হোক, 'তার আগমন কোন গৃহে সুখ আনবে না—তার স্বভাব চরিত্র ভাল নয়!' বার বার কথাগুলো বললে মানুষে কতক্ষণ আর বিশ্বাস না করে থাকতে পারে। আর বিশ্বাস না-করবার মত আপনার তো সে এ'দের নয়!

কারো চরিত্রের এত বড় দলিল আর কখনো হ'য়েছে কিনা নিভার জানা নেই। হ'লেও সে কি করেছে নিভা বলতে পারে না। চোখের জলে, পালিয়ে এ অপবাদের নিস্তার নেই। সারদা দেবীর বিশ্বাসে এ আশ্রয় তার বিষাক্ত হ'য়ে যাবে। এখানে কোন মুখে সে থাকবে! তার অনুক্ত কেলেঙ্কারীর কথাটা মানুষের স্বাভাবিক কৌতূহলে বার বার ঘা দিয়ে তার প্রতি কেবল সন্দেহের অবিশ্বাসের অবকাশ ঘটাবে। আশ্রয় পেলেও সে সম্মান পাবে না সারদা দেবীর কাছে। সর্বনাশকে মানুষের বড় ভয়। বিশেষ করে অবিবাহিতা তরুণ-তরুণীর সম্পর্ক নিয়ে।

নিভার বিশ্বাস হয়, সারদা দেবী চিঠিটা অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস না করলেও কিছুটা সারমর্ম গ্রহণ করেছেন। রেণুকাকীমার ওখানে নিভা এমন একটা কিছু করে এসেছে যার ফল এই সুদূরে প্রবাসেও ফলতে পারে। সুতরাং তিনি সাবধানই হ'বেন।

যদি সারদা দেবী নিজে থেকে কিছু জিজ্ঞেস করতেন তাহ'লে বোধ হয় এতটা বিচলিত নিভা হ'তো না। উনি চুপ করে যাচ্ছেন মানেই উনি বিশ্বাস করেছেন—না তো তাকে সন্দেহের চোখে পর্যবেক্ষণ করছেন। ভালমন্দের প্রমাণ তিনি নিজেই যাচাই করে নেবেন।

নিজের প্রতি নিজেরও যেন আর বিশ্বাস থাকে না নিভার। কলঙ্কিনী সে সত্যিই, তার সংস্পর্শ প্রকৃতই সর্বনাশ ডেকে আনবে। সে অবজ্ঞণীয়া, অনাদরনীয়া। তাকে কারো আশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।

স্বপক্ষে যেন তার বলবার কিছু নেই। শক্ত করে ধরা হাতের মুঠোটা আলগা হ'য়ে গেছে। মানে মানে সরে পড়াই এখন উচিত।

চিঠিটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে চোরের মত ঘর থেকে পালিয়ে আসে নিভা। অপরাধ শুধু গোপনে পরের চিঠি পড়ায় নয়, আরো কিছু।

নিজের ঘরে এসে নিভা জানালার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। দূরে পাহাড় শ্রেণীর ছায়া—গাঢ় ধূম্র দিকচক্রবালে কি যেন কাঁপে। আকাশ ব্যেপে বাক্যহীন নির্লিপ্ততা সুদূরে। বাণবিদ্ধ পক্ষী-শাবকের আশ্রয় কোথায়—নিষাদের রসনা তৃপ্তিতে না, পঞ্চভূতের স্বাভাবিক' আশ্রয়ে?

কার প্রতি কি দোষ করেছে সে, যে এত বড় পৃথিবীতে এতটুকু থাকবার ঠাঁই তার হবে না? শান্তিতে, তৃপ্তিতে, ভালবাসায় তার অতীত জীবনের ক্ষত ভাল হবে না? রেণুকাকীমার এমন কি ক্ষতি সে করেছে যার জন্যে এত বড় কথা তিনি রটাচ্ছেন, তার আশ্রয়দাতার কান ভারি করছেন? বরং তাঁদের সংসারে শান্তি বজায় রাখবার জন্যেই সে পালিয়ে এসেছে। নিজেকে মুক্তি দিতে গিয়ে সে তাঁদেরই মুক্তি দিয়েছে, বোঝা বহার অব্যাহতি।

পরে সারদা দেবী কি বুঝবেন? তাঁর সমর্থ ছেলের সঙ্গে কি হিসাবে রেণুকাকীমা তাকে জড়াতে চাইছেন? কি কলঙ্ক কাহিনী তিনি প্রকাশ ক'রতে চান তার সম্বন্ধে? এ ইঙ্গিত কিসের?

মনে জ্ঞানে নিভার পাপ নেই। সারদা দেবীর পা ছুঁয়ে সে শপথ করতে পারে। তাঁর কোন সর্বনাশ করবার জন্যে সে এখানে আশ্রয় নেয়নি। ব্যাধের তাড়া খেয়ে শশকশিশু যেমন বনমধ্যে মুখটুকু ঢেকে ফেলে সেও তেমনি সারদাদেবীর আশ্রয়ে নিজেকে ঢেকে রাখতে চেয়েছে। শুধু আশ্রয় আর কিছু নয়। নিজের কোন কিছুই সে গোপন করবে না। তার দ্বারা কোন ক্ষতিই তাঁদের হবে না।

অপরাধ নিরপরাধের নিষ্ঠুর দ্বন্দ্বে নিভার কাছে জীবনের সব অর্থই মিথ্যে হ'য়ে যায়। বেঁচে থাকার এত বড় ভার বোধ হয় আর কখনো সে বোধ করেনি। কি মানে হয় শুধু বেঁচে থাকার জন্যে এই কলঙ্ক বহন করার? হয় সে মরবে, নয় তো নিজমুখে অকপটে সারদা দেবীর কাছে ব্যক্ত করবে তার জীবনের সব চেয়ে মর্মান্তিক কাহিনী। যার নাম, নারী-পুরুষের সম্পর্কে কলঙ্ক—যার জন্যে রেণুকাকীমার এত দুশ্চিন্তা।

রেণুকাকীমার চিঠির জবাবে নিজেকে নিভা যতই প্রস্তুত করে রাখুক, মনে মনে কিন্তু বড় অসহায় বোধ করতে লাগল। চিঠিতে রেণুকাকীমা যা বলেছেন হয়তো সব সত্যি, তার মত সাংঘাতিক সর্বনাশা মেয়ে ভূভারতে কোথাও নেই—স্বভাব চরিত্র তার কোন মতেই বিশ্বাসযোগ্য নয়! আর কোথাও তাকে মানালেও পরের ঘরে মানাবে না, কি বলতে কি হয়ে যাবে!

যতই কেননা চোরের মত চিঠিটার কাছ থেকে নিভা পালিয়ে থাকুক ততই চিঠিটার গতি-বিধি জানবার জন্যে সে উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকে। আছে আছে এসে সারদা দেবীর বিছানা তুলে দেখে চিঠিটা যথাস্থানে আছে কিনা। চিঠিটা নিয়ে সারদা দেবী কিছু করলেন কিনা। না, চিঠিটা তেমনি ভাবে একই জায়গায় রাখা আছে। পত্র-প্রেরিকা এ দিয়ে যতই মাথা ঘামান না কেন প্রথম পাঠিকার এ নিয়ে কোনই মাথা ব্যথা নেই।

তবু নিভা দিনে অন্ততঃ পাঁচবার চিঠিটার খোঁজ নিয়ে যায় চুপি চুপি। যেন চিঠিটার একটু এদিক-ওদিক তার পক্ষে অমঙ্গলের আশঙ্কার হবে। কলঙ্কটা আর কিছুতে ঘোচান যাবে না।

তার চেয়ে চিঠিটা একেবারে সরিয়ে ফেলে নিশ্চিন্ত হওয়া কি ভাল নয়? রোজ রোজ ও নিয়ে অত ভাবনায় থাকা কেন? আর চিঠিটা যখন পড়াই হয়ে গেছে তখন মিছে ওর কার্যকারিতা নিয়ে মাথা-ব্যথা কেন? যা হবার তা হয়েছে, হবেও।

তবু মন মানে না। বারে বারে চিঠিটার কথা নিভার মনে পড়ে যায়। চুপি চুপি এসে দেখা ছাড়া তার করবার কিছু নেই।

কতদিন কেটে গেল। চিঠিটা নিয়ে আর কোথাও কোন আলোড়ন উঠেছে বলে মনে হয় না। সারদা দেবী বা অমলের ব্যবহারের কোন তারতম্য বোঝা যায় না।

কিন্তু আশ্চর্য নিভার মনে নানা সন্দেহের উত্থান-পতন ভাঙা-গড়া চলতে থাকে। সারদা দেবী যেন তার থেকে নিজেকে অনেকটা সরিয়ে নিয়েছেন, এই ক'দিন আগের মত হৃদ্যতাও তাঁর নেই। যেটুকু আমল তিনি নিভাকে দিয়েছিলেন তাও যেন সঙ্কুচিত করে নিয়েছেন এই কদিনে। নিভার মনে হয়, এ রেণুকাকীমার চিঠির ফল। মুখে কিছু বলতে পারছেন না, কাজে বলছেন। অমলের কথা অবশ্য আলাদা। তার ব্যবহারের ইতরবিশেষ নিভা বুঝতে পারে না। তবে সে যে সহৃদয় নয় এটা নিভা বুঝতে পারে। কে বলতে পারে অমন সরল লোকটার মনে তার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ না জেগেছে। মা-ছেলেতে গোপনে কিছু এ নিয়ে কথা হয়েছে কিনা তার ঠিক কি।

দু একদিন মনকে বুঝিয়ে দৃঢ় করে স্বচ্ছন্দে চলতে চেষ্টা করে নিভা, আবার কেমন যেন সব ঢিলে-ঢালা হয়ে যায়। এমন করে বাস করা যায় না সন্দেহ দোলায়। রেণুকাকীমা যা বলেছেন তার একটা বোঝাপড়া হওয়া উচিত এখনি। মরতে যখন পারবে না সে তখন অকপটে বলবে সারদা দেবীর কাছে নিভা কেন বিনয়কাকার আশ্রয় ত্যাগ করে এসেছে। তাতে যদি তার ফলাফল এ'দের কাছে প্রকট হয় হোক—তবু সান্ত্বনা সাধ্যমত চেষ্টা সে করেছে নিজের দোষ-গুণ আশ্রয়দাতার কাছে তুলে ধরতে।

কিন্তু কি করে বলা যায়। আর কি দোষের ভাগীই বা সে? নিজে থেকে কিছু বলা কি তার উচিত হবে?

রাত্রির অন্ধকারে পাহাড়-ঘুমান নীরবতা গভীর হয়ে এলে সারদা দেবীর সামনে বই খাতা নিয়ে পাঠাভ্যাস করতে করতে নিভা কেমন বিমনা হয়ে পড়ে। সারদা দেবীর অস্থির সীবনরতা মূর্তিটির দিকে শূন্য দৃষ্টিতে সে চেয়ে থাকে। সব সঙ্কল্প তার ভেসে যায়। রেণু-কাকীমার চিঠির কোন কথাই সে এ-সময় তুলতে পারবে না মরে গেলেও। যত গুরুতর অভিযোগই তার সম্বন্ধে এ'দের কাণে এসে থাকুক না কেন।

একদিন সারদা দেবী নিজে থেকে বললেন, আমার হয়ে একখানা চিঠি লেখ তো রেণুকে। বেচারী দু তিনখানা চিঠি দিয়েছে, এক-খানারও জবাব দেওয়া হয়নি। ভাববে বোনের কি টান।

হঠাৎ আগুনে ছ্যাঁকা লাগলেও বোধ হয় মানুষ অমন শিউরে ওঠে না। নিভার মাথার চুল থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত কেঁপে উঠল—বই-এর অক্ষরগুলো মুছে গেল।

অদূরে বসে সারদা দেবী বোধ হয় লক্ষ্য করেননি। বললেন, কই কাগজ নিয়েছিস? লেখ, সাবিত্রীসমানেষু—

নিভা নিজেকে সংযত করে নিলে। বই মুড়ে কাগজ পেনসিল ধরলে। ফাঁসির আসামীর মত তার বুকের ভেতর ঢেঁকির পাড় পড়তে লাগল। যদি সম্ভব হতো বুকের খাঁচাটা ভেদ করে হৃদপিণ্ডটা বেরিয়ে আসতো।

সারদা দেবী বলতে লাগলেন: তোমার তিনখানা চিঠিই পেয়েছি, কিন্তু সময় অভাবে উত্তর দিতে দেরী হয়ে গেল—কিছু মনে করো না। বিনয়বাবু, ছেলেপুলেরা কে কেমন আছে বা আছেন? অমল ভাল আছে। আমার শরীরটা কদিন ভাল যাচ্ছে না। এখানে বেশ শীত পড়েছে।

সারদা দেবী থামলেন। খানিক কি যেন ভাবলেন নিভা ঘাড় গুঁজে শ্রুতিলিখন করতে লাগল। মনে হলো সারদা দেবীর মুখে অস্পষ্ট হাসির রেখা।

নিভা মুখ তুলতে সারদা দেবী বললেন, হ্যাঁ, নিভার সম্বন্ধে তোমার ভাববার কোন দরকার নেই। আমরা যখন তার নিয়েছি তখন আমরা বিবেচনা মত ব্যবস্থা করব। সে এখানে বেশ ভাল আছে, সংসারের কাজ কর্মে আমার অনেক সাহায্য হচ্ছে। তুমি কোন দুশ্চিন্তা কোরো না। তোমরা আমার স্নেহ-ভালবাসা এবং শুভাশীষ জানিও। গুরুজন পদে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম দিও। ইতি,

হঠাৎ জল জমে বরফ হয়ে গেলে যে অবস্থা হয় নিভা তেমনি হয়ে গেল, নির্বাক, নিশ্চল, কঠিন। একি ক্ষমা না, সহানুভূতি না, আর কিছু?

মুহূর্তের জন্যে মাথা গুঁজে কি যেন ভাবলে নিভা তারপর আছাড় খেয়ে সারদা দেবীর পায়ের ওপর পড়ে ফুঁপিয়ে বললে আমি সত্যি কিছু করিনি...আমার কোন দোষ নেই।

সারদা দেবী পা সরিয়ে নিলেন না, নিভার মাথার ওপর হাত রেখে স্তব্ধ হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তাঁর কোলের ওপর মুখ গুঁজে তেমনি বিচলিত কণ্ঠে নিভা বলতে লাগল, আপনাকে সব কথা বলবো... আমার কোন দোষ ছিল না.. ও'দের কোন ক্ষতি আমি করিনি।

সারদা দেবী দুহাত দিয়ে নিভার মুখটা তুলে ধরে বললেন, থাক, আমি জানি। তুই আর কি ক্ষতি করবি।

তবু নিভা থামলো না, রুদ্ধ বাষ্পোচ্ছ্বাসে বলতে লাগল: বরং ও'দের ভয়ে আমি পালিয়ে এসেছি। গৌরীর বরকে নিয়ে রেণু-কাকীমা আমার নামে যা-তা রটাচ্ছিলেন, আমি নষ্ট। কুলটা।

সারদা দেবী চুপ করে বসে রইলেন। তাঁর কিছু বলবার নেই। এ মেয়ের সম্বন্ধে ও দোষারোপ করা যায় কিনা তিনি বোধ হয় ভাবতে লাগলেন। কি জানি রেণুকাকীমার ইঙ্গিতের মর্মার্থ তিনি হৃদয়ঙ্গম করছেন কিনা।

নিভা বলতে লাগল, গৌরীর সঙ্গে গোড়া থেকেই তার বরের বনি-বনাও হয় না, রেণুকাকীমা মনে করেন আমি তার জন্যে—অথচ আমি কোন কথার মধ্যে ছিলুম না।

সারদা দেবী হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, প্রকাশ কি তোকে বেশী পছন্দ করতো শ্বশুর বাড়ীর আর সকলের চেয়ে?

নিভা থতমত খেয়ে যায় উত্তরে কি বলবে সে?

অস্ফুটে নিভা বললে, তাতো জানি না। নতুন জামাইকে যেমন খাতির-যত্ন করা দরকার তেমনি করতুম। এতে পছন্দ অপছন্দের কি আছে বুঝতে পারিনি।

সারদা দেবী বোধ হয় হাসলেন। নিভার সরলতায় তিনি মনে মনে কৌতুক বোধ করলেন। এতবড় মেয়ে পর-পুরুষের পছন্দ-অপছন্দ বোঝে না! এও কি সম্ভব?

নিভা বললে, ইদানিং জামাই এলে রেণুকাকীমা আমাকে ঘর থেকে বেরুতে দিতেন না। যে কাজটা আমি বরাবর করতুম, রান্না সেটা তিনিই করতেন—কাছে গেলে বলতেন, থাক তোমাকে আর ঘুর ঘুর করতে হবে না। ওদিকে গৌরী পথ আগলে থাকতো, এখানে কেন নিজের ঘরে যাও। অথচ কি যে দোষ করেচি বুঝতে পারতুম না। সব সময় মনে হতো চারটে চোখ আমার চারপাশে পাহারা দিচ্ছে। সুবিধে হলে প্রকাশবাবুকে একদিন জিজ্ঞেস করতুম, আমি কি অন্যায় করেচি তাঁর কাছে।

সারদা দেবী বললেন, প্রকাশের সঙ্গে তুই কি একেবারে মিশিস্‌নি কোনদিন?

আবার নিভা থমকে ওঠে। কম্পিত কণ্ঠে বলে, প্রথম প্রথম খুবই মেলামেশা ছিল, থিয়েটার-বায়স্কোপ-বেড়ান সবাই মিলে দল বেঁধে প্রকাশবাবুর সঙ্গে যেতুম। তিনি পছন্দ করতেন, রেণুকাকীমাও বলতেন যেতে।

সারদা দেবী চুপ করে গেলেন। বিষ কোথায় তিনি যেন বুঝতে পেরেছেন। নিভাকে নিয়ে মা-মেয়ের কেন এই সন্দেহ। অবধা বোকা মেয়েটার কি খোয়ার!

নিভাও চুপ করে গেল। আত্মপক্ষ সমর্থনে এসব কথা তার পক্ষে বলা বোধ হয় শোভন নয়। যা চুকে গেছে তা নিয়ে আর কথা বাড়ান উচিত নয়। তা ছাড়া সারদা দেবীর ধারণাও বিপরীত হতে পারে।

আর মিথ্যে কথা বলছে না তো সে? সত্যিই কি তার কোন দোষ ছিল না—মা-মেয়ের, সন্দেহটা অমূলক? গৌরীর স্বামী তার প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখায়নি দৃষ্টি-কটু রকমে? সারদা দেবীর কাছে সে সত্য গোপন করছে। ছি, ছি। মেলামেশার অর্থে সারদা দেবী কি জানতে চেয়েছিলেন সে কি বুঝতে পারেনি। প্রকাশের সঙ্গে সত্যিকারের তার কোন মেলামেশা হয়নি? তার দেহ, মন পবিত্র আছে?

আলোর সামনে মাথা নীচু করে নিভা বসে থাকে। সব মিথ্যে, সব প্রবঞ্চনা, নিজেকে সমর্থন করার এই চাতুরী একদিন ধরা পড়বে। তুমি সাবধান নিভা!

সারদা দেবী রেণুকাকীমাকে লেখা চিঠিখানা নিয়ে খামে ভরে লিখলেন, সাবিত্রীসমানেষু

শ্রীমতী রেণুকণা বসু

C/o শ্রীবিনয়ভূষণ বসু,

থেমে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোদের ঠিকানাটা কিরে?

নিভা যেন কথাটা বুঝতে পারে না। সারদা দেবীর মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল করে চেয়ে থাকে। তার আর কি ঠিকানা!

সারদা দেবী কলম তুলে বললেন, ঠিকানাটাও জানিস না! কি মেয়েরে তুই!

দোরগোড়ায় শব্দ হলো: কার ঠিকানা মা?

নিভা মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখলে, অমল কৌতুককরতায় উজ্জ্বল।

সারদা দেবী বললেন, রেণুর।

অমল বললে, ১১৫, রামধন পালিত রো, কলিকাতা।

নিভার মনে হলো, ঠিকানাটা অমল নেহাৎ তাচ্ছিল্য স্বরে উচ্চারণ করছে। তাকে লক্ষ্য করে কি যেন বোঝাতে চাইছে সেই বিকৃত সুরে।

তা হলে ঠিকানাটা কি ঠিক নয়? এতদিন তার ঠিকানা কি ভুল ছিল? না, তার নতুন ঠিকানা হয়েছে বলে অমল অমন করে উচ্চারণ করলে। সব যেন কেমন গণ্ডগোল হয়ে যায় নিভার—কে জানে কি তার ঠিকানা ছিল, এ'রা কি তাকে জিজ্ঞেস করছেন?

শুনতে শুনতে নিভার কেন জানি না মনে হয়, তার ঠিকানাটা অমলের মুখেই লেখা হয়ে গেছে—তাই সে কৌতুকে হাসছে। মনে মনে নিভা কেমন যেন লজ্জা পায়। সঙ্কোচও বোধ করে অহেতুক।

[ক্রমশঃ

তোমায় চিনেছি

অনিলেন্দু চক্রবর্তী

তবু ভালো যন্ত্রণার জীবন্ত জগৎ
কাম্য নয় শান্তিসুখ তব মরুদ্যানে
জ্বলন্ত বালুর বুকে মেঘ-মরীচিকা
শ্রান্তির স্বপন যেন কভু নাহি আনে।

সর্পের দংশনে মোর সর্বাঙ্গে দাহন,—
ভুলিতে পারি কি আফিম ফুলের ঘোরে,
বুভুক্ষু রাত্রির মতো জ্বলন্ত প্রহর
হবে না শান্ত ক্লান্তি-ঘুমের ভোরে।

বিশাল ব্যাদান মেলা দারিদ্র্যের মাঝে
ক্ষণিক দাক্ষিণ্য-কণা পিষ্ট হ'ক পদে,
শ্মশান-শিয়রে ঠেলি মুখে গঙ্গাজল
দাও তুমি ঘাটে ঘাটে ছদ্ম-পরিচ্ছদে!

আমাদের রক্তে-গড়া মধুচক্র হ'তে
মধু চুষে শুষে মেলো শূন্য কোষ;
শান্তির বুলিতে ঢাকো ছদ্ম অন্তরাগ,
—তোমারে চিনেছি তাই সমুদ্যত রোষ।

মোহিতলাল মজুমদারের কথা

হরপ্রসাদ মিত্র

'সতের বৎসর রাজত্বের পরে ১৯৫২-র ২৬-এ জুলাই বেলা দ্বিপ্রহরে মিশরের রাজা ফারুক সিংহাসন ত্যাগ করলেন।

'তেহরাণের শাহের প্রাসাদে ইরাণের প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার মোসাদেকের নতুন মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করলেন।

'নেপালের প্রধান মন্ত্রী এবং অন্যান্য দুজনকে নেপালী কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্যপদ থেকে অপসারিত করা হলো।

'গুজরাটে ভয়াবহ ঝড়ের ফলে আমেদাবাদে, বরোদায়, সুরাটে রেল এবং বিমান পথের সংযোগ বিকল হয়ে গেছে।' দুনিয়ার এইসব বড়ো বড়ো খবরের সঙ্গে বাংলা খবর-কাগজের প্রথম পাতাতেই দেখা গেল আর একটি খবর—২৭-এ জুলাইয়ের কাগজে ২৬-এ জুলাইয়ের খবরঃ—

> 'বাঙ্গলার অন্যতম বিশিষ্ট কবি ও প্রখ্যাতনামা সমালোচক শ্রীমোহিতলাল মজুমদার শনিবার রাত্রি সাড়ে নয়টায় কলিকাতা প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি গত পনেরো দিন যাবৎ হৃদ্‌পিণ্ড হইতে রক্তক্ষরণ রোগে ভুগিতেছিলেন। মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স চৌষট্টি বৎসর হইয়াছিল।...'

বিশের শতকের বাংলা কবিতা এবং সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে মোহিতলাল মজুমদারের অস্তিত্বের খবরটি শতবর্ষের ব্যবধানের পরে উত্তরকালের সাহিত্য-পাঠকের মনে কেমন ভাবে গৃহীত হবে, কে জানে! আর, তাঁর মৃত্যু! প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালের শেষ শয্যায় তিনি যে শেষ কথাটি বলেছিলেন, সে হলো 'মজাসে চল্ রহে'।

"মৃত্যুকে ভাবিতে পারা যায় না;"—মোহিতলাল-ই লিখেছিলেন,—"আর সব-কিছু মানুষের জ্ঞানগম্য—পরোক্ষ অনুভূতির বিষয়, কিন্তু মৃত্যুকে সাক্ষাৎ করিতে না পারিলে তাহার পরিচয় করা হয় না; এবং সাক্ষাৎ করিলে আর কিছু বলিবার থাকে না। অস্তিত্বের বিলয়-মুহূর্তে যে অপরোক্ষ অনুভূতি ঘটে, তারা বজ্রাঘাতের মত; নিমেষের মধ্যে মহা-শূন্য জাগিয়া উঠে—তাহাতে দিক্‌-কাল নাই, অগ্রপশ্চাৎ নাই, স্মৃতি-বিস্মৃতি নাই; সেই মহানির্বাণের পূর্বমুহূর্তে কি অনুভব হয়, তাহা কেহ কাহাকে জানাইতে পারে না।"১

১। মৃত্যু-দর্শন।

জীবনের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে মোহিতলাল অধ্যাপক হরিনাথ বাবুর মুখ দিয়ে বলেছিলেন,—"যে দেশে যে-কালে যেমনই সভ্যতা বৃদ্ধি হোক, মানুষের প্রাণটা যেমন তেমনই আছে। প্রাণধর্মী মানুষই সত্যকার সনাতন মানুষ—এই দেহই সেই প্রাণের প্রতিষ্ঠা-বেদী।"২

১৩৫১ থেকে '৫৭-র মধ্যে রচিত মোহিতলালের কতকগুলি ভাব-কণিকার মধ্যে 'পাত্র ও পানীয়' নামে একটি ষট্‌পদী ছাপা হয়েছে তাঁর 'জীবন-জিজ্ঞাসা'য়। কবিতাটি এই সূত্রে মনে পড়লোঃ—

আমারে করেছ পাষাণ-পাত্র—মসৃণ, মনোহর,
তোমার সভায় সুধা-পানে তাই তার এত সমাদর!
ওষ্ঠে সবার তুলিয়া ধরি যে পরম পিপাসা বারি—
কণাটিও তার আপন অঙ্গে আমি যে শুষিতে নারি!
হায়, প্রভু, হায়! এ কি গৌরব, একি মোর সম্মান!
পাত্র হইয়া র'ব চিরদিন—কভু না করিব পান!

২। জীবন-কাব্য।

২৬-এ জুলাইয়ের নানা খবরের মধ্যে মোহিতলালের তিরোধানের খবরটি মনের বিশেষ আকর্ষণীর আগ্রহে বাঁধা পড়লো,—এবং সেই সঙ্গে মনে পড়লো তাঁর বসবার ভঙ্গি, বলবার ঢঙ্, ক্রোধের প্রকৃতি, শ্রদ্ধার আকুতি!

তাঁর মৃত্যুর অল্পকাল আগের কয়েকটি অপরাহ্ণ স্মৃতি-লোকে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। মনে পড়লো ১৯৫২ সালের মে মাসের খর মধ্যাহ্নের কলকাতা। শহর নয়,—শহরের উপকণ্ঠে থাকতেন মোহিতলাল। চৌরঙ্গি থেকে বড়িশার কৈলাস ঘোষের বাগান বেশ দূর পথ।

কাঁঠালী চাঁপার গাঢ় সবুজ তোরণ পেরিয়ে, লাল সিমেন্টের চটা-ওঠা পুরোনো সিঁড়ি পেরিয়ে একতলার বৈঠকখানার বন্ধ দরজায় আঘাত করেছিলাম। দরজা খোলা হলে ঘরে ঢুকে ডানদিকের চৌকিতে বসে হাতপাখা নাড়তে নাড়তে শুনতে পেলাম তাঁর চটিজুতোর শব্দ। দোতলা থেকে একতলায় নামলেন মোহিতলাল। দেয়ালে টাঙানো মোহিতলালের পুরোনো ছবির সঙ্গে প্রৌঢ় মোহিতলালের মিল ক্রমশঃ ঝাপসা হয়ে আসছে। কপালের শিরা ফুলে উঠেছে, পা ফুলেছে, হাতের মণিবন্ধের সবটাই বেশ স্ফীত। মনে পড়লো, কয়েক বছর আগে ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অভয়ের কথা' সম্পাদনা করে ভূমিকায় মোহিতলাল লিখে-ছিলেনঃ—

'আমি একালের মানুষ, আমি মানুষকে—মানুষের দেহ-বন্ধ জীবনটাকে, জীবনেরই দিক দিয়া না দেখিয়া, দেহ-বর্জিত কোন অধ্যাত্ম-তত্ত্বের দিক দিয়া দেখিতে পারি না; একালের মানুষের পক্ষে তাহা সম্ভব নয়।...

'...মানুষের...স্নেহ-প্রেম-প্রীতির নিষ্ফল কাতরতা, ক্ষুধা ও ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুর নিত্য-নির্য্যাতনের কোন প্রতিকার আছে?'

প্রতিকার নেই। মানুষের স্বভাব অপরিবর্তনীয়। মোহিতলালের সাহিত্য-স্বভাব ব্যাধির তাড়না সত্ত্বেও অটুট ছিল। বললেনঃ 'রিক্সাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছ কেন?'

আমার জবাবের প্রতীক্ষা না করেই নিজে চীৎকার করে রিক্সাওয়ালাকে বিদায় করলেন।

সন্ত্রস্ত বোধ করলাম তাঁর শরীরের জন্য। বললাম, 'আপনার শরীর ভালো নয়, জোরে কথা বলবেন না'। চৌকি থেকে নেমে রিক্সাওয়ালাকে ঘণ্টা চারেক পরে ফিরতে বললাম।

মোহিতলাল দোতলা থেকে একতলায় যখন প্রসন্ন মনে নেমে আসেন তখন তাঁর আর ফুরসতের অভাব থাকে না।

চশমার কাঁচ মুছে নিয়ে চোখে লাগিয়ে দৃষ্টি সংহত করে নিলেন বিশেষ যেন কোনও লক্ষ্যে,—মুখোমুখি তাকিয়ে বললেন, 'মন দিয়ে জীবনকে দেখো। জীবন মনকে গ্রাহ্য করে না।'

—অর্থাৎ?

—শিশির ভাদুড়ী আমাকে বলতেন, 'মোহিতবাবু, আপনার পড়া বেশি হয়ে গেছে।' মানে বুঝলে? আরও শোনো—কেদার বাঁড়ুজ্জেকে আমিই প্রথম বরণ করেছিলাম। 'অলকা'-কাগজে চিঠি লিখে জানলুম, 'গদ্য কাঁচা বটে তবু ভালো।' কেদার বাঁড়ুজ্জে লিখলেন, 'ভায়া হে, আমার বয়স ষাট।'...শোনো, আরও শোনো—বাইশ বছর বয়সে আমিই প্রথম বাংলায় 'মানসী'-কাগজে 'ওমর খৈয়ামে'র আলোচনা করি। Fitzerald-এর লেখায় যে serious, pensive undertone আছে, 'ওমর খৈয়ামের' বাংলা অনুবাদের কোথাও তা দেখতে পাইনি।

কথাগুলি ভালো লাগে, কিন্তু কেমন যেন অসংলগ্ন মনে হয়। ১৯৪৪-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ছেড়ে দিয়ে মোহিতলাল যখন কলকাতায় ফিরলেন, সে সময়ে তাঁর কথা শুনে এমন মনে হতো না। ভাবনার বিস্তারে পরম্পরা-ক্রমে সাজানো যুক্তিগুলো সহজে বোঝা যেত। উত্তম পুরুষের সর্বনামের কর্তৃত্ব অবিশ্যি তাঁর প্রতি বাক্যেই লক্ষ্য করা গেছে। আগেও বলতেন, পরেও বলেছেন। শোপেন-হাবারের উদ্দেশে লেখা তাঁর 'পান্থ' কবিতাটি প্রথম ছাপা হয়েছিল ১৩৩২-এর ভাদ্র-সংখ্যার 'কল্লোলে'। 'কল্লোল যুগের' অচিন্ত্যকুমার সে কবিতার কয়েক স্তবক তাঁর বইয়ে ছেপে দিয়েছেন। 'পান্থ' কবিতায় মোহিতলাল লিখে-ছিলেনঃ—

সুন্দরী সে প্রকৃতিরে জানি আমি—মিথ্যা সনাতনী!
সত্যেরে চাহিনা তবু, সুন্দরের করি আরাধনা—
কটাক্ষ ঈক্ষণ তার—হৃদয়ের বিশল্যকরণী!
স্বপনের মণিহারে হেরি তার সীমন্ত-রচনা!
নিপুণা নটিনী নাচে, অঙ্গে অঙ্গে অপূর্ব লাবণি!
স্বর্ণপাত্রে সুধারস, না সে বিষ?—কে করে শোচনা!
পান করি সুনির্ভয়ে, মুচকিয়া হাসে যবে ললিত-
লোচনা!

কল্লোল-যুগের মোহিতলাল কেমন ছিলেন? অচিন্ত্য-কুমার লিখেছিলেন—'ফুটপাথের উপর গ্যাসপোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে তিনি যখন আমাদেরকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কবিতা পড়িয়ে শোনাতেন তখন আবৃত্তির বিহ্বলতায় তাঁর দুই চোখ বুজে যেত। আমরা কে শুনছি বা না শুনছি, বুঝছি বা না বুঝছি, এটা রাস্তা না বাড়ি, সে-সব সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক ছিল। তিনি যে তন্গতচিত্তে আবৃত্তি করতে

পারছেন সেইটেই তাঁর বড় কথা। কিন্তু যদি মুহূর্তমাত্র চোখ মেলে দেখতেন সামনে, দেখতে পেতেন আমাদের মুখে লেশমাত্র বিরক্তি নেই। বরং ভক্তির নম্রতায় সমস্ত মুখচোখ গদগদ হয়ে উঠেছে।'

১৩৩২-এ প্রবাসী বাঙালীর সাহিত্যচেতনার মূর্ত প্রতীক 'উত্তরা' মাসিকপত্র বেরিয়েছিল। তার বছর দুয়েক আগে ১৩৩০-এর বৈশাখে 'কল্লোলে'র প্রথম সংখ্যা ছাপা হয়। মোহিতলাল 'কল্লোলে'র-ও বন্ধু ছিলেন, 'উত্তরা'র-ও সহায়ক ছিলেন। পরে অবশ্য এই দু'দলের সঙ্গেই তাঁর যোগ ছিঁড়ে গিয়েছিল। সে আর-এক প্রসঙ্গ। 'কল্লোল'-দলীয়ের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন অচিন্ত্যকুমারঃ—

'মোহিতলালকে আমরা আধুনিকতার পুরোধা মনে করতাম। এক কথায়, তিনিই ছিলেন আধুনিকোত্তম। মনে হয়, বর্জন-বাজনের পাঠ আমরা তাঁর কাছ থেকেই প্রথম নিয়েছিলাম। আধুনিকতা যে অর্থে বলিষ্ঠতা, সত্যভাষিতা বা সংস্কাররাহিত্য তা আমরা খুঁজে পেয়েছিলাম তাঁর কবিতায়।'

নজরুল ইসলামকে মোহিতলালই প্রথম দেখেছিলেন সম্ভাবনাময় নতুন যুগের কবি-ভগীরথ চেহারায়।

সেদিন বিকেলে কৈলাস ঘোষের বাগানবাড়ির খোলা দরজার দিকে চোখ রেখে কি-জানি কি-কারণে প্রৌঢ় মোহিতলালের সেই অতীত কীর্তির কথা মনে পড়লো। বললেন, —নজরুলের কবিতা বেরিয়েছিল 'মোসলেম ভারতে'। আমিই প্রথম তাকে আবিষ্কার করি। 'মোসলেম ভারতে' এক চিঠি লিখেছিলাম। সে চিঠি দেখেছ তো?

পড়ে শোনালেন সেই চিঠির অংশঃ—

"...কাজী সাহেবের কবিতায় কি দেখিলাম বলিব? বাঙ্গলা কাব্যের যে অধুনাতন ছন্দঝঙ্কার ও ধ্বনিবৈচিত্র্যে এককালে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু অবশেষে নিরতিশয় পীড়িত হইয়া যে সুন্দরী মিথ্যারূপিণীর উপর বিরক্ত হইয়াছি, কাজী সাহেবের কবিতা পড়িয়া সেই ছন্দঝঙ্কারে আবার আস্থা হইয়াছে। যে ছন্দ কবিতায় শব্দার্থময়ী কণ্ঠভারতীর ভূষণ না হইয়া, প্রাণের আকুতি ও হৃদয়সুন্দরের সহচর না হইয়া ইদানীং কেবলমাত্র শ্রবণপ্রীতিকর প্রাণহীন চারু চাতুরীতে পর্যবসিত হইয়াছে, সেই ছন্দ এই নবীন কবির কবিতায় তাঁহার হৃদয়নিহিত ভাবের সহিত সুর মিলাইয়া মানবকণ্ঠের স্বরসপ্তকের সেবক হইয়াছে।..."

পড়া শেষ করে পাঠক চোখ ফেরালেন খোলা দরজার বাইরে,—ভাঙা মন্দিরের গা বেয়ে ওঠা বুনো গাছের পত্রাচ্ছাদনের পরপারবর্তী শূন্যের দিকে।

সামনে চৌকির ওপর পড়ে রইলো সুচিত্রিত মলাট-শোভিত ১৩২৭-এর ভাদ্র সংখ্যার 'মোসলেম ভারত'। কাগজটি নেড়েচেড়ে দেখা গেল—৩ নম্বর কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা থেকে এম্, আফজল হক কর্তৃক প্রকাশিত। ঐ সংখ্যাতেই কুমুদরঞ্জন মল্লিকের দুটি কবিতা ছাপা হয়েছিল, —একটির নাম 'কাঁচা পাকা' অন্যটির নাম 'মেঘলা দিনে'। সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী লিখেছিলেন 'অন্দরকারের না', নজরুলের পত্রোপন্যাস 'বাঁধনহারা' ছাপা হচ্ছিল; কালিদাস রায় লিখেছিলেন 'প্রিয়ার লিপি'। আরও একটি লেখা চোখে পড়লো —কান্তিচন্দ্র ঘোষের 'মোগলবধূ'।

ভাঙা মন্দিরের দৃশ্য থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে মোহিতলাল চোখ বুজলেন। বইয়ের জীর্ণতা থেকে ভেতরের স্মৃতিময়তায় যেন ফিরে এলেন। মিনিটখানেক মৌনী থেকে বললেন, 'বাঙালী মুসলমান যে খাঁটি বাঙালী, সে সময়ে বাংলার মুসলমান সাহিত্যিকরা সেকথা বুঝেছিলেন। ফার্শী শব্দ সে সময়ে বহু পরিমাণে চালানো গেছে। আমার নিজের লেখায় নজরুলের সঙ্গে দেখা হবার আগেই আমি বহু ফার্শী শব্দ ব্যবহার করেছি।'

হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলামের অনেক গুণ ছিল —ছিল না কবিতার প্রসাধনের দিকে ঝোঁক। মজা-ঘষা তাঁর ধাতে ছিল না। আমি যখন দেখলাম সে তার কবিতায় 'রিমঝিমিয়ে'-র সঙ্গে 'শিঞ্জিনীতে'-র মিল দিয়েছে, তখন চমকে উঠলাম। 'মোসলেম ভারতে' তার কবিতা সম্পর্কে আমার চিঠি ছাপা হলে নজরুল আমার কাছে ছুটে এলো। সে এক অধ্যায়,—আর, 'কল্লোলে' সে যখন 'সর্বনাশের ঘণ্টা' লেখে তখন আর এক অধ্যায়! পণ্ডিচেরীর নলিনীকান্ত সরকার সে সময়ে আমার কাছে আসতেন আর আসতেন পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। অচিন্ত্য ঠিকই বলেছে—পবিত্র ছিল 'সর্বত্রগামী'। আমি তখন 'ভারতী'র দলে ছিলাম। তারপর, অশোক, যোগানন্দ, সজনী—এরা 'শনিবারের চিঠি' বের করলো। আমি 'প্রবাসী' আপিসে যেতাম। সেখানে ওদের সঙ্গে অনেকদিন অনেক আলাপ-আলোচনা হয়েছে। আমার 'নাদির শাহ' 'ভারতী'তে ছাপা হয়েছিল। নজরুল তখন মেসোপোটেমিয়ায়। উর্দু-ফার্সী মিলিয়ে বাংলা কবিতা লেখার উৎসাহ নজরুল আমার ঐ 'নাদির শাহ' পড়েই পেয়েছিল। তারপর, নজরুলকে কাছে পেয়ে আমি তাকে Byron-এর কবিতা পড়িয়েছি, কালিদাসের 'মেঘদূত' শুনিয়েছি। এইসব ঘটনার পরে 'দ্রোণগুরু' নাম দিয়ে আমি যে কবিতা লিখেছিলাম, সেটা ছাপা হয় 'শনিবারের চিঠি'র ক্রোড়পত্রে। সে হলো ১৩৩১-এর কথা। ঐ সালের

কার্তিকের 'কল্লোলে' নজরুল লিখলো 'সর্বনাশের ঘণ্টা'। আমাকে 'দ্রোণাচার্য' বলে সম্ভাষণ জানিয়ে লিখলো,—

উঠ গুরু উঠ, লহগো প্রণাম বেঁধে দাও হাতে রাখী,
ঐ হের শিরে চক্কর মারে বিপ্লব-বাজপাখী।
অন্ধ হয়ো না, বেত্র ছাড়িয়া নেত্র মেলিয়া চাহ
ঘনায় আকাশে অসন্তোষের বিদ্রোহ-বারিবাহ।'

এই চারটি চরণ আবৃত্তি করে মোহিতলাল মজুমদার চুপ করলেন।

আমি বললাম,—'সত্যসুন্দর দাসের' কথা বলুন।

জবাব দিলেন—'সে আর-একদিন শুনো।' বঙ্গশ্রীতে ১৩৩৯-এর পৌষ সংখ্যায় 'সত্যসুন্দর' নাম দিয়ে 'সাহিত্যে অশ্লীলতা' সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলাম। নজরুল ঐ 'সর্বনাশের ঘণ্টা' কবিতায় লিখেছিল—

তুমি পাও কোন সুখ
দগ্ধমুখ সে রাম-সেনাদলে নাচিয়া হে সেনাপতি,
শিবসুন্দর সত্য তোমার লভিল এ কি এ গতি?

—'আমি শিব-সুন্দর-সত্যকে ভুলিনি, কখনোই ভুলিনি। ঢাকাতে ষোল বছর কাটিয়েছি—য়ুনিভার্সিটির মস্তো লাইব্রেরি ছিল—সে যেন জ্ঞানসমুদ্রের তীর। অনেক পড়েছি, অনেক লিখেছি, অনেক দেখেছি। সত্যকে ভুলিনি, শিবকে ভুলিনি, সুন্দরকে ভুলিনি। দেখেছি ঘটনার মালা-গাঁথা জীবনের বিস্তার। এই যে আমি আছি, তুমি আছ, কতো-কী আছে—এইসব মিলিয়ে মস্তো একটা থাকার মধ্যে দেহ-মন-আত্মার এক বিস্ময়কর ঐক্যের মধ্য দিয়ে আমার চেয়ে অনেক অনেক বড়ো এক অস্তিত্বকে দেখেছি। যেদিন এই দেহটা-মনটা শেষ হবে সেদিন কি হবে?'

মোহিতলাল আবার চুপ করলেন। মে-মাসের সূর্যাস্ত-গোধূলির প্রায়ান্ধকার স্তব্ধ ঘরের দরজা পেরিয়ে সংস্কার-হীন পুরোনো মন্দিরটার দিকে তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত হলো।

বোধ হয় চোখে জল এসেছিল। চোখ মুছে নিয়ে বললেনঃ—'মন দিয়ে জীবনকে দেখো। জীবন মনকে গ্রাহ্য করে না।'

মুক্তি স্বাক্ষর

অসীম সোম

নিবিড় নিরেট বৃন্তে মুক্তি কোথা পাব
এযে শুধু জীবনের ঊর্ণ আবেষ্টনে পথ-পরিক্রমা,
আভাস দিতেছে বুঝি অনিবার্য রাত্রির আঁধার;
বোঝ নাকি, আহা, তিমিরের নিশ্ছিদ্র প্রহরায়
হালভাংগা নাবিকের মত হারাব যে দিশা
কালোয় কালোয় তবে সঞ্চয়ের ডালি পূর্ণ হ'বে।

তার চেয়ে চলো যাই ছুটে
উন্মুক্ত মহান্ উদ্দামতার হাওয়া নিয়ে বুকে,
চাঁদের আলোর ভেলায় রাত্রির কল্লোল
যেথা পৃথিবীকে হাতছানি দেয়। হে সুকন্যা চূড়ালা!
চলো যাই, হীরক-প্রোজ্জ্বল হিয়া লয়ে
স্বর্পিল জীবনের ঊর্মিল সাগর-সৈকতে।
মালিন্যের সব বাধা সীমানা পেরিয়ে,

সম্বল সঞ্চয় যত পথে ঘাটে কুড়িয়ে ছড়িয়ে,
তমসার দেশ থেকে সবিতার সমুদ্র-বিস্তারে—
রামধনু-আকাশের সাম্রাজ্য যেথায়
অন্তহীন নিঃসীম। হে তন্বি সুকল্যাণি, চলো যাব
অতলান্ত সমুদ্রের নীল মুক্তিস্নানে—
যেখানে ঊর্মি, কলরোল অসীমের আতিথ্য আসে
প্রাণের নির্মাল্যে। জীবন মুখর সেই শুভ্রশান্ত
রসের ভেলায় রঙের ফোয়ারা মাঝে
খেলাঘর বাঁধি এসো প্রেয়সী আমার।

সমস্ত বেদনা যন্ত্রণা যাক মরে—
আমি চাই, আরো আলো, আরো দীপ্ত আলো,
আলোর আবেশ লেগে বোঝ নাকি, হবো
মুক্ত প্রাণ আনন্দের প্রেমিক যুগল।

হার

সন্তোষকুমার অধিকারী

হাজার পাঁচেক টাকা নিয়ে বিপদে পড়েছে লক্ষ্মীকান্ত। বাড়ী দখল করে তার সেলামী দিয়েছে ইম্প্রুভমেন্ট্ ট্রাস্ট্। ভাগের টাকা ভাগ হ'য়ে পাঁচ হাজারে এসে ঠেকেছে। এখনই আর একটি বাড়ী কিনে ফেলতে পারলে নিশ্চিন্ত হ'তো সে। কিন্তু পাঁচ হাজারে বাড়ী ত' দূরের কথা জমীই পাওয়া যায় না কলকাতায়।

বন্ধুরা কেউ কেউ বললো—টাকা ব্যাঙ্কে রাখো। যখন খুসী তুলে নেবে। না তুললে সুদ বাড়বে টাকার। নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে।

কিন্তু ব্যাঙ্কে বিশ্বাস নেই লক্ষ্মীকান্ত'র। সে পাল্টা জবাব দিলো—ব্যাঙ্কে টাকা রাখলে ফেরত পাওয়া যাবে ত?

—তার মানে?

প্রশ্ন করলো গোপেশ্বর সেন। প্রায় প্রৌঢ় এই ভদ্রলোকটি কোন এক নামকরা ব্যাঙ্কে চাকরী করেন। কাজেই ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা গ্রাহ্য হওয়া উচিত। লক্ষ্মীকান্ত কিন্তু অবজ্ঞার সঙ্গেই বললো—মানে, ব্যাঙ্কগুলোকে বিশ্বাস হয় না আমার। হয়ত একদিন সকালে উঠে শুনবো, ব্যাঙ্ক দরজা বন্ধ করেছে। তখন? তাছাড়া শুনতে ত পাই, কত রকমের ফ্রড্ ত' ব্যাঙ্কে হ'য়ে থাকে।

গোপেশ্বর একটু হাসলো—হ্যাঁ ত' হয় বটে। টাকা বেরিয়ে যায় পার্টি'র এ্যাকাউন্ট্ থেকে। সিকিউরিটি হাওয়া হ'য়ে উড়ে যায়। কিন্তু তাতে আপনার কি? পার্টি'র টাকা ত' মারা যায় না। কিন্তু মারা যায় হয়ত এমন একটি কর্মচারী যে নিরীহ শুধু নয়, নির্বোধ। হয়ত সামান্য একটুখানি ভুলে একটু অন্যমনস্কতায়... তাহ'লে শোনো। তোমাদের বলি একটা গল্প। অবশ্য এটাকে গল্প বলেই মনে কোরো। আর ব্যাঙ্কের নাম বা লোকের নাম সবই আমাকে গোপন রাখতে হ'বে। কাজেই পারো ত' এ গল্প মাসিকপত্রেও ছাপতে দিতে পারো। কিন্তু এ গল্প শুনলেই বুঝতে পারবে—সামান্য একটু ভুলের পেছনে কি মর্মান্তিক মৃত্যুই না লুকিয়ে থাকে; কি নিদারুণ ব্যর্থতা।

ব্যাঙ্কের নাম থাক। মনে করো সেটা কলকাতার একটি জনপ্রিয় ব্যাঙ্ক আর তার ম্যানেজার হ'চ্ছে...ধরো, নামটা ত্রিদিবনাথ মজুমদার।

বালিগঞ্জের এই ব্রাঞ্চ আপিসটির একটি বিশেষত্ব ছিলো। এখানে সেভিংস্ এ্যাকাউন্ট্ বেশী'র ভাগই ছিলো মেয়েদের নামে। আর মেয়েরাই ব্যাঙ্কে আসা-যাওয়া করতো। স্বামীদের লুকিয়ে টাকা জমানো মেয়েদের স্বভাব, আর স্বামীরা আপিস গেলে মেয়েদের বাইরে বেরোনো—একটা ফ্যাশান। কাজেই ত্রিদিবনাথের আপিসে গেলেই দেখা যেতো একটা না একটি মেয়ে তার টেবিল জুড়ে বসে রয়েছে।

ত্রিদিবের চেহারাটা মন্দ ছিলো না। সেই সুযোগ নিয়ে বন্ধুরা তাকে ঠাট্টা করতে ছাড়তো না। কিন্তু তার জীবনের গোপন যেটুকু অংশ সে শুধু আমারই জানা ছিলো। আর সেইজন্যেই আমি আজো জোর দিয়ে বলতে পারি—এতখানি চরিত্রবান ও সৎ ছেলে বাংলাদেশে খুব কমই দেখা যায়। তাই ত্রিদিব যে শেষ পর্যন্ত একটা দুঃখাত্মক গল্পের নায়ক হ'য়ে পড়বে এ' অন্ততঃ আমি কল্পনা করিনি।

যাই হোক, গল্পটা বলে যাই। এ'র প্রথম দিকটা ত্রিদিবের কাছে শোনা। সে শেষ পর্যন্ত তার জীবনের প্রত্যেকটি কথা—যা' তখনও অলিখিত ছিলো—তা শুধু আমাকেই খুলে বলেছিলো। তার চিঠিও আমার কাছে আছে। কিন্তু সে কথা পরে। আগে গল্পটা বলে নিই।

একদিন যথারীতি পোনে দশটায় অফিসে এসে দেখলো ত্রিদিব—তার চেম্বারে একটি তরুণী নারী। বেয়ারার হাতে কোট খুলে দিয়ে আগে সে ক্যাস খুলতে গেলো। ক্যাস বার করে দিয়ে ফিরে এলো তার চেম্বারে। তারপর চেয়ারে বসে তরুণীটির দিকে চাইলো—কি দরকার আপনার?

এতক্ষণ সে শুধু তরুণীটির অস্তিত্বই লক্ষ্য করেছে; তার বেশী কিছু নয়। কিন্তু অপরপক্ষ যে কি উদগ্র দৃষ্টি নিয়ে তাকে নিরীক্ষণ করছিলো তাকি সে বুঝতে পেরেছিলো? তার প্রশ্নের উত্তরে মেয়েটি সবশেষে যেন বললো—ওঃ! তুমি ত্রিদিবদা, সত্যিই ত্রিদিবদা?

এবার চমকানোর পালা তার। অপরিচিতার মুখে

নিজের নামকে ওভাবে সম্বোধিত হ'তে দেখে সেও চোখ তুলে তাকালো আর সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ে তার দুচোখ বিস্ফারিত হ'লো। মৃদুস্বরে সেও বললো—কি আশ্চর্য তুমি সুলতা?

মাঝে মাঝে এমনি আশ্চর্য ঘটনাই ঘটে। পরিণামে যার আরও অঘটন কিছু ঘটে যায়। আর...

গোপেশ্বর চোখ তুলে তাকালেন—এত ভালো ছেলে ত্রিদিবনাথ সে যে আজও অবিবাহিত কেন এ' কথা কি চাপা থাকে। তবু আজ সাতবছর পরে হঠাৎ সুলতাকে দেখে কি চঞ্চল হ'য়ে পড়বে ত্রিদিব? একদিন সে যে সুলতার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলো যে জীবনে দ্বিতীয় কোন মেয়েকে সে মনে স্থান দেবে না—সে কথাই যে সে আজও পালন করে চলেছে তাই বা কে জানবে? কিন্তু কোন অভিযোগ পুষে রাখেনি ত্রিদিব। কেন যে সুলতা হঠাৎ বিশ্বাস ভঙ্গ করলো সে কথাও জানতে চায়নি। শুধু তার নীরব বেদনা ও এক অকৃত্রিম ভালোবাসাকে বহন করে চলেছে অত্যন্ত গোপনে। সে কথা শুধু আমিই জানতুম। সাত বছরের ব্যবধানে সুলতাকে হঠাৎ এভাবে দেখে যতখানি চঞ্চল হ'লো ত্রিদিব তার ব্যবহারে কিন্তু ততখানি প্রকাশ পেলো না। সে শুধু স্তিমিতসুরে দুচোখভরা বিস্ময়ে বললো—তুমি সুলতা?

সুলতার মুখের ভাবে অপরিসীম উদ্বেগ। ধীরে ধীরে সে উদ্বেগের পাশাপাশি জেগে উঠলো কিছুটা লজ্জা কিছুটা আশ্বাস। সুলতা বললো—তুমি এখানে আছো আমি একটুও জানতাম না। কি আশ্চর্য বলো ত?

—হ্যাঁ; কিন্তু তোমাকে দেখে যে আমাকেও অবাক হ'তে হয়, আমিও হঠাৎ চমকে উঠি—এই কি কম আশ্চর্য সুলতা?

সুলতা মাথা নীচু করলো। ত্রিদিব কথা অত্যন্ত কম বলে। এখানেও সে আর এগোল না। শুধু কিছুটা অনুযোগের সুরে বললো—তারপর? কি খবর বলো দেখি।

—খবর আর কি? সেই চিরদিনের ইতিকথা। আপাততঃ উদ্বাস্তু। আমার স্বামী অসুস্থ। তার চিকিৎসা চালাতে হ'চ্ছে আমাকেই।

—সে কি? তোমাকে মানে? তুমি কি চাকরী করছো?

—এখনও আরম্ভ করিনি। কিন্তু এবারে করতে হ'বে। না করলে যে চলবে না আর।

ত্রিদিবের মনটা হঠাৎ যেন হু হু করে উঠলো। কে জানে আত্মতাপের কোন গ্লানি তার মধ্যে জেগে উঠলো কিনা। কিন্তু সুলতার দিকে চেয়ে তার মনে হ'লো সুলতা আজো তেমনি সুন্দর রয়েছে; আর অম্লান রয়েছে তার নিজের হৃদয়। প্রেম যে সময়জয়ী।

এক মুহূর্তে ঠিক করে ফেললো ত্রিদিব যে দরকার হ'লে সুলতার জন্যে যা কিছু করার সে নিজেই করবে।

সুলতা এতক্ষণ মাথা নীচু করে বসেছিলো। এবারে তার কাপড়ের আড়ালে থেকে ছোট্ট একটি হাতবাক্স বার করলো। তারপর কুণ্ঠার সঙ্গে বললো—তোমরা ব্যাঙ্ক থেকে সোনা রেখে টাকা ধার দাও না?

—হ্যাঁ, দিই বই কি! কিন্তু কতটাকা তোমার দরকার সু?

—শ' পাঁচেক।

ত্রিদিব হয়ত ভেবেছিলো—বিশ ত্রিশ টাকা; তাহ'লে সেই সংগ্রহ করে দেবে। কিন্তু শ' পাঁচেক টাকা তার কাছে অনেক। আর ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হ'লে কি হবে? বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক তার ব্রাঞ্চ ম্যানেজারকে যে মাইনে দেয়, তা শুনলে বাইরের লোকে হাসবে।

ত্রিদিব বললো—তোমার হাতের বাক্সটা কিসের?

—একটা হার আছে ত্রিদিবদা। অন্ততঃ এক হাজার টাকা বিক্রীর দাম। শ' পাঁচেক টাকা দেবে না তোমরা?

—দেখি।

সন্তর্পণে হাত বাড়ালো ত্রিদিব। বাক্সটা একবার খুলেই আবার বন্ধ করলো সে। একটা নেকলেস...যার ওজন সে নিজেই যাচাই করেছে একদিন। পুরো পাঁচ-ভরি সোনা। পেনডেন্ট্‌টার মাঝখানের হীরেটার দাম সোনার দামের চেয়ে কম নয়।

বাক্সটা নিজের টানায় রেখে চাবি বন্ধ করলো ত্রিদিব। তারপর নিজের হাতেই একটা ভাউচার করে সই করলো তাতে। পেছনে সুলতার সই নিয়ে ক্যাসে পাঠালো সেটাকে। তারপর ফিরে বললো—তোমার বাসাটা কোথায় বলবে?

—এই ত' এস-আর-দাস রোডে। যাবে ত্রিদিবদা?

—হ্যাঁ যাবো।

সুলতার মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। অনেকক্ষণ ধরে একটা কথা বলবার ইচ্ছে হচ্ছিলো তার। এবারে বললো—শুনেছি, তুমি এখনও বিয়ে করোনি? এখানে আর কে আছে?

—মা আছেন। আমার দিদিও আছেন।

—তুমি আগে এসো; কেমন। তোমার সঙ্গে গিয়ে আমি মাসিমাকে প্রণাম করে আসবো।

বেয়ারার হাতে টাকা এলো। টাকাটা সুলতাকে গুণে দিয়ে নীচে পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এলো ত্রিদিব। বললো —সাবধানে যেয়ো।

ফিরে এসে চেম্বারে বসলো বটে, কিন্তু মোটেই সুস্থির হ'তে পারলো না ত্রিদিব। টানা খুলে বাক্সটাকে আবার বার করলো সে। তারপর নেকলেশটি তার হাতে তুলে ধরলো।

সুলতার বাবাই এই গয়নাটি গড়িয়েছিলেন। আর স্বামীকে লুকিয়ে তার মা ত্রিদিবকে দিয়েছিলেন সোনা ঠিক আছে কিনা দেখতে। আজ মা বাবা কেউই নেই সুলতার। কিন্তু সে আছে। যাকে একদিন হৃদয়ের সবচেয়ে কাছে টেনে নিয়েছিলো ত্রিদিব তার সেই হৃদয়েশ্বরী সু...আজ বিপন্ন হ'য়ে এসেছে তারই কাছে।

কিন্তু কয়েক মুহূর্তের জন্যেই শুধু এ আত্মবিস্মৃতি। একটা ব্যাঙ্কের ম্যানেজার সে। চুপ করে বসে থাকবার মত সময় কোথায় হাতে? সেই মুহূর্তেই এলো একগাদা ক্লিয়ারিং চেক। সবগুলিকে মিলিবে সই করে দশ মিনিটের মধ্যেই ছাড়তে হবে। কয়েকখানা চেকে সই করতে না করতে জড়ো হলো খান দুই এ্যাকাউন্ট খোলার আবেদন পত্র, পার্টির ক্যাস চেক দশ হাজার টাকার, গোটাতিনেক টেলিফোন, আর নালিশ জানাতে এলেন অন্ততঃ তিনচারজন ভদ্রলোক।

যাঁরা আসেন তাঁদেরকে অপেক্ষা করানো যায় না। ব্যাঙ্কে এলেই দশ টাকা জমার লোকও দশ লাখ টাকার মেজাজ হেঁকে বসে। বেলা আড়াইটে পর্যন্ত এমনিধারা ব্যস্ততা। তার মধ্যে এক মুহূর্ত সময় মেলে না অন্যকথা ভাববার। আর আপিসের কাজ চুকিয়ে বার হ'তে রোজই সন্ধ্যে সাতটা বাজে।

ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে আসার পর একবার সুলতার বাসায় যাবে কিনা—এমনি একটি ভাবনা অনেকক্ষণ ধরে তার মাথায় খেলতে লাগলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেমন একটা সঙ্কোচ এলো মনে। যে বাড়ীতে সুলতা গৃহিণী ও মা সেখানে ত্রিদিবকে সে কিভাবে সম্বর্ধনা করতে পারবে সে বিষয়ে তার সন্দেহ আছে। তার চেয়ে যেদিন সুলতা নিজে এসে নিয়ে যাবে সেইদিন বরং যাওয়া যাবে।

দিন তিনেকের মধ্যে কেউ এলো না। কিন্তু চতুর্থ দিনে একটি ছেলে একখানি চিঠি নিয়ে গেলো ত্রিদিবনাথকে।

ত্রিদিবদা,

তুমি ত এলে না? রোজ তোমার জন্যে অপেক্ষা করি যে। আজ আপিস থেকে সোজা চলে আসবে। আমি পথ চেয়ে থাকবো কিন্তু

তোমার সু।

...তোমার সু। আজও সেই একটি অক্ষরের ডাকটিকে ব্যবহার করতে অনুমতি দিচ্ছে সুলতা। লিখেছে তোমার সু...। ত্রিদিব চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লো। অনেকদিন আগেকার একটা চাঞ্চল্যকর অনুভূতি—এতদিন যা বেদনার স্তূপে চাপা পড়েছিলো—এখন আবার যেন নতুন সূর্যালোকে জেগে উঠ্‌লো। নিজের কৈশোরকে নতুন করে মনের মধ্যে অনুভব করতে লাগলো ত্রিদিব।

কিন্তু সুলতার বাসায় এসে ওর মনের রোমান্স করুণায় পরিবর্তিত হয়ে গেলো। ওর স্বামী হেমন্ত সত্যিই শয্যাশায়ী। উঠবার শক্তি নেই। কি যেন একটা অসুখ—ডাক্তারে যার সঠিক নামকরণ করে না, শুধু একদিন অন্তর ইন্‌জেকসন আর নিয়মিত ওষুধ ও টনিকে গুরুভার। তারও পর আছে একগাদা পথ্যের রকমারি। সুলতার পাঁচ বছরের একটিমাত্র ছেলে; সেও রুগ্ন।

সুলতা আনন্দে খুসীতে ভরে উঠলো ওকে পেয়ে। স্বামীর বিছানায় ঝুঁকে পড়লো উল্লাসে।—ওগো দেখছো, ত্রিদিবদা এসেছে।

হেমন্ত তার অলস দৃষ্টি মেলে তাকালো। মৃদুহাসিতে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললে—কথা বলতেও বারণ ভাই। বুকের মধ্যেই নাকি অসুখ। কখন যে এ্যাটাক্ করে কিছু ঠিক নেই।

আদরের ত্রুটি নেই সুলতার। কিন্তু তার শয্যাশায়ী স্বামী আর রুগ্ন পুত্রটির দিকে চেয়ে মনে ব্যথা পেলো ত্রিদিব। এতদিন যে ঈর্ষার জ্বালায় খচখচ করতো এখন সেটা অনুকম্পায় পরিণত হ'লো।

কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের ইতিহাস বলে লাভ নেই। তবে ডাক্তারের কাছে যখন শুনলো ত্রিদিবনাথ যে হেমন্তর অসুখটা হচ্ছে করোনারি থ্রম্বোসিস্ জাতীয়—অর্থাৎ বেশীদিন আর তার বেঁচে থাকবার হুকুম নেই, তখন সুলতার একান্ত অসহায় অবস্থার কথাও ভাবলো সে। আর সুলতা ও তার ছেলের ভার যেন মনের অজ্ঞাতসারেই গ্রহণ করলো।

মাস দুই কেটে গিয়েছে। সুলতার অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। বরং তার টাকার প্রয়োজন আরও বেড়েছে। নিজের কিছু সঞ্চয় ত্রিদিবের ছিলো না। নিজের নামেও সে ব্যাঙ্ক থেকে কিছু ধার করলো। তার

পর হঠাৎ যেদিন হেমন্তর অবস্থা আবার খারাপ হয়ে পড়লো তখন সুলতা এসে বললো তাকে—আমার হারটা বিক্রী করে দাও ত্রিদিবদা। ব্যাঙ্কের দেনাটা শোধ হোক; আমার হাতেও কিছু টাকা আসুক। নইলে আর চলে না।

ত্রিদিবও এই কথাটিই ভাবছিলো। সুলতা নিজের থেকে বলাতে সেও স্বচ্ছন্দ বোধ করলো। নেকলেশটাকে বিক্রীই করে দেবে সে।

ব্যাঙ্কে ঢুকবার আগে পর্যন্ত তার সংকল্প স্থির থাকে। কিন্তু আপিসের মধ্যে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে অন্য মানুষ। তখন তার মনে থাকে না সুলতার কথা—সমস্ত বিশ্ব জগৎ লুপ্ত হয়ে যায় তার কাছ থেকে। একটি আপিসের নাভিকেন্দ্রে তার স্থিতি। প্রত্যেকটি লেনদেন হচ্ছে তারই দায়িত্বে। প্রত্যেকটি জমা তারই স্বাক্ষরে গৃহীত হচ্ছে। চেয়ারে বসেই তাকে ধরতে হয় হেড আপিসের টেলিফোন। কড়া নোট আসছে কেন ষ্টেট্‌মেণ্ট্‌ রেডি নেই। পার্টি চিৎকার করছে পাশবই পেতে এত দেরী কেন? কর্মচারীরা ক্ষিপ্ত—লোক না বাড়ালে কাজ চলবে না। এই সহস্র বিশৃঙ্খলা মানিয়ে নিয়ে তাকে চলতে হবে। কিন্তু তার মধ্যে থাকবে না কোন বেনিয়ম।

বিকেলের দিকে হঠাৎ এলো ইন্‌স্পেক্টর। হেড আপিস থেকে মাঝে মাঝে তিনি আসেন শাখা আপিসগুলির হিসাব ও কাজের গরমিল্‌ ধরতে। তাদের বুদ্ধির দৌড় বেশী না থাকলেও রিপোর্টকে শাণিত ও বিরূপ করে তুলতে তাঁরা পোক্ত।

সারাদিন ধরে ইন্‌স্পেকসন চললো। আপিসের চেম্বারে বসে বসে ত্রিদিব ভাবছে আজই সুলতার কিছু টাকার দরকার। হারটাকে বিক্রী করে দেওয়ার কথা ছিলো। বড্ড দেরী হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আজই এসেছে ইন্‌স্পেক্টর।

ইন্‌স্পেক্টর পাল এসে হাজির হ'লেন তার কক্ষে। সহাস্যে বললেন—পাল, আপনার এখানে আসা নেহাত রুটিন না মানা কাজ। নইলে আপনার কাজ ভারী পরিচ্ছন্ন। একবার সিকিউরিটিগুলো দেখলেই আমার কাজ চুকে যায়।

পাঁচটা বেজে গেছে। অনিচ্ছার সঙ্গে উঠলো ত্রিদিব। সংক্ষেপে একবার করে নজর দিয়েই পাল তাঁর দেখা শেষ করছিলেন। সবই শেষ হ'লো দেখা। তখন শুধু বাকী একটি বাক্স। ত্রিদিব এতক্ষণে সেটিকে হাতে তুললো—সুলতার জড়োয়া হারের বাক্স। আস্তে আস্তে ডালাটিকে খুলে ধরলো সে। কিন্তু পলকের মধ্যে মুখ তার বিবর্ণ হয়ে গেলো। কেমন বিমূঢ়ভাবে বাক্সটিকে খুলে আচ্ছন্ন-দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো সে। খালি বাক্সে দেখবার মত কিছুই ছিলো না।

ইন্‌স্পেক্টর ও অন্য জন দুই অফিসার—যাঁরা এতক্ষণ বসেছিলেন তাঁরাও ঝুঁকে পড়লেন—কি হ'লো?

—হার? হীরের নেকলেশ?...

কথা আট্‌কে গেলো ত্রিদিবের গলায়।

কে একজন একটু ফাঁক পেয়েই প্রশ্ন করলো গোপেশ্বরকে—চুরি ত?

—কেমন করে চুরি হবে? চাবি ত ত্রিদিবেরই হাতে। অন্য কারো হাতে আলমারীর চাবি দিতে ত' পারে না সে।

—তবে কি সে নিজেই সরিয়েছে?

গোপেশ্বর আর উত্তর দিলো না এ' প্রশ্নের। সে ততক্ষণে বলে চলেছে তার গল্প—

...তারপর খোঁজাখুঁজি সুরু হ'য়ে গেলো। পাগলের মত সমস্ত আলমারী হাট্‌কালো ত্রিদিব। তার চোখের সামনে পৃথিবীটাই শুধু অন্ধকারে ভরে উঠলো। হার পাওয়া গেলো না।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ-ম্যানেজার তার কক্ষে একা বসে রইলো। শেষ হ'য়ে গেলো তার কেরিয়ার। কালই অর্ডার আসবে হেডঅফিস থেকে। ত্রিদিব মজুমদার চাকরী থেকে সাসপেণ্ডেড্‌। তারপর এন্‌কোয়ারি হবে। জানাজানি হবে চারিদিকে। ঘটনা পল্লবিত হ'য়ে উঠ্‌বে নবনবভাবে। কুটিল হাসি হেসে বলবে সকলে—হ্যাঁ, আমরা জানতুম। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলেই হবে বিস্মিত—ত্রিদিব করলে এ' কাজ? আর সুলতা...?

কিন্তু কেমন করে হারালো তার হার? সুলতাও কি ভাব্‌বে ত্রিদিবদা চোর? ফাঁকি দিয়েছে তাকে?

দুহাতে মুখ ঢেকে নিঃসাড় হয়ে পড়ে রইলো ত্রিদিব।

বাঁচতে হবে অপমানের হাত থেকে, পুলিশের হাত থেকে। লজ্জার হাত থেকে। কাল সকাল হওয়ার আগেই করতে হবে উপায় নির্ধারণ। ধিক্কারে দেয়ালের গায়ে মাথা ঠুকতে লাগলো ত্রিদিব।

..বিশ্বাস করো সুলতা, তোমার হার আমি সরাই নি।

অনেক রাত্রে ফুটপাথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ী পৌঁছলো ত্রিদিব। সোজা এসে ঢুকলো শোওয়ার ঘরে। খাওয়ার প্রবৃত্তি নেই। শরীরে যেন অসহ্য জ্বালা। বিছানার ওপর বসে বসে দুহাতে নিজের টুঁটি চেপে ধরলো সে।

একটু ঘুমোলে হয়ত জ্বালা কম্‌তো। কিন্তু সারারাত ঘরে পায়চারী করতে করতে একসময়ে তার মাথা ঝিম ঝিম

করতে সুরু করলো। ঘষে ঘষে দুচোখে জ্বালা বেড়ে উঠ্‌লো। ঘুম চাই। নিরন্ধ্র নিশ্ছিদ্র ঘুম। পাগলের মত হয়ে সে দেয়াল আলমারীর টানা খুলে ফেল্‌লো। ঘুম ...ঘুম। ব্রোমাইড্‌ খেলে হয়ত ঘুম আসবে। একটু... আরও একটু...তবু ঘুম নেই। খাবার জলের গেলাসে শিশিটা উপুড় করে দিলো সে।

গোপেশ্বর সেন এইখানেই থাম্‌লো। শ্রোতারা এতক্ষণ নির্বাক হ'য়ে শুন্‌ছিলো তার গল্প। এবার সকলে প্রায় একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—তারপর?

গোপেশ্বর নির্বিকারভাবে বললো—হারটাকে অবশ্য পরের দিনই পাওয়া গেলো। ব্যাঙ্ক্‌ থেকে সুলতাকে খবর দেওয়া হ'য়েছিলো, সেই এসে বার করলো। নেকলেশের বাক্সটার মধ্যে ভেলভেটের নীল গদিটার তলায় ঢুকেছিলো পাশের একটা খাঁজ দিয়ে। ওপর থেকে কিছুই বোঝা যায় না। কিন্তু সুলতা ত' জানতো যে বাক্সটা ভাঙ্গা।

—আর দ্বিজেন?

—খবরের কাগজ প'ড়ে থাক্‌লেই জানতে পারবেন। অতখানি ব্রোমাইড্‌ খেলে কেউ বাঁচে? কিন্তু আর কথা নয়। আমার বড্ড কাজ আছে।

যেন কিছুই হয়নি এমনিভাবে উঠে গেলো গোপেশ্বর সেন। আর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে লক্ষ্মীকান্ত এক-সময়ে বলে উঠলো—দূর! বাজে গল্প। স্রেফ্‌ বানানো।

বাকী সকলেই তাই বিশ্বাস করলো।

★

চাষার আশা

প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়

বৃষ্টি হবে বলে আকাশ
কালো মেঘে ভরা
মোরা শুধু ভাবছি বসে
ডুবুবে বুঝি ধরা।
ভেসে চলে আকাশ জুড়ে
কালো মেঘের দল
ওরা কোথায় যাচ্ছে উড়ে
জানিস যদি বল।
যাচ্ছে কোথায় কে জানে তা
কোন সে রাজার দেশ
হবে তাদের সেইখানেতেই
চলার পথের শেষ।
আসছে তেড়ে বৃষ্টি ওরে
ভীষণ জোরে হায়
সামলান আজ পৃথ্বীটারে
হোল ভীষণ দায়।

বর্ষাতে ভাই ভরসা পেয়ে
নামছে চাষীর দল
লাঙল কাঁধে তাড়িয়ে বলদ
করছে কোলাহল।
চাষীদের আজ মনের কোণে
স্ফূর্তি নাহি ধরে
বৃষ্টি হলে ফলবে ফসল
তুলবে ঘরে ঘরে।
সেই ফসলে ভরাবে ভাই
ধরার যত মুখ
তাতেই যেন পাবে তারা
অন্তবিহীন সুখ।
যাঁর দয়াতে ভুবনে এই
বর্ষা আসে ভাই
প্রণাম মোরা তাঁরে জানাই
বারে বারে ভাই।

ত্রিনাথের পাঁচালী

রণজিৎ কুমার সেন

ত্রিনাথের পাঁচালী প্রধানতঃ ত্রিনাথের পূজো ও তৎ-সংশ্লিষ্ট মেলাকে কেন্দ্র ক'রে রচিত। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের একত্র সমন্বয়ে গঠিত এই ত্রিনাথ ঠাকুর। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের প্রমূর্ত বিগ্রহ তিনি, এইভাবেই তাঁকে কল্পনা ক'রে নেওয়া হ'য়েছে। ব্রহ্মাকে, বিষ্ণুকে কিম্বা মহেশ্বরকে তাঁদের স্ব স্ব লীলাকেন্দ্রে স্বতন্ত্র ক'রে পূজোর মধ্য দিয়ে আত্মমুক্তির সাধনা অপেক্ষা ত্রিনাথ-পন্থীরা উক্ত তিন দেবতাকে একই অখণ্ড শক্তিতে কল্পনা ক'রে সাধনমার্গের পথে যাত্রা ক'রেছেন। প্রধানতঃ পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে এই ত্রিনাথপন্থীদের আধিক্য দেখা গেলেও পশ্চিমবঙ্গেও নিতান্ত বিরল নয়। Pantheism বা একেশ্বরতন্ত্রই এ'দের মূলমন্ত্র—উপনিষদে যাঁকে বলা হ'য়েছেঃ 'তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গদেবস্য ধীমহি' —'The superior and infinite knowledge, energy, splendour, glory and holiness of the Supreme being Who has given birth to, created and menifested the Earth, the Sky and the Heaven, *i.e.*, the whole universe, who is omnipotent, omnipresent, omniscient—who alone controls all His creations.' এই একই বহু হ'লেনঃ 'একমেব বহুশ্যাম' এবং বহুর মধ্যেই তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। এই অদ্বিতীয়তা থেকেই অদ্বৈতবাদ বা Pantheism-এর সৃষ্টি। যিনি ব্রহ্মা, তিনিই বিষ্ণু এবং তিনিই মহেশ্বর ; তাঁকেই পরম ব্রহ্ম ব'লে একেশ্বরবাদীরা ধ্যান করেন এবং ত্রিনাথ-পন্থীরা তাঁকেই মনের মতো ক'রে ত্রিনাথ-ঠাকুরে রূপান্তরিত ক'রে নিয়েছেন। আসলে একের মধ্যেই বহু এবং বহুর মধ্যেই একের লীলা। এই লীলা-পুরুষই বিভিন্ন সাধক-গোষ্ঠীর জীবনে বিভিন্ন রূপে ধরা দিয়েছেন।

ত্রিনাথ-পন্থীরাও যে সর্বত্রই একই নিয়মে এই ত্রিশক্তির সংযুক্ত পূজোর মাধ্যমে নিজেদের অনুষ্ঠান সম্পন্ন ক'রে থাকেন, এমন নিদর্শন বিরল। পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের একাধিক অঞ্চলে এই অনুষ্ঠানকে আমরা প্রধানতঃ শৈব-ধর্মী অনুষ্ঠানরূপেই দেখেছি। সাধারণতঃ অশিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীকে কেন্দ্র ক'রেই এই ত্রিনাথ-পন্থীরা গ'ড়ে উঠেছেন। পূজোর প্রধান অঙ্গ এক পয়সার গাঁজা, এক পয়সার পান ও এক পয়সার স'রষের তেল। সর্বসাকুল্যে ব্যয় মোট তিন পয়সা। গম্ভীরা বা গাজনের মতই বৎসরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে এই পূজোর আয়োজন হয়। ত্রিনাথ-পন্থীরা একত্রে জড়ো হ'য়ে সিদ্ধি-যোগে সিদ্ধাইমন্ত্রে উজ্জীবিত হ'য়ে গেয়ে ওঠেনঃ

'দিন গেলে ত্রিনাথের নাম লইও রে গুরুভাই,
ত্রিনাথ বিনা দীনের কেহ নাই।'...

কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই গানের সঙ্গে ঢোল, করতাল ও সিঙ্গা জাতীয় বাদ্যযন্ত্রের আধিক্যও লক্ষিত হ'য়েছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বা তারও বালাই নেই। এই উপ-লক্ষে কোনো কোনো অঞ্চলে ছোটখাটো আড়ং বা মেলাও বস্'তে দেখা গিয়েছেঃ 'ত্রিনাথের মেলা'। তাকে চৈত্র-সংক্রান্তির গাজনের মেলার এক-শতাংশ রূপ বলা যায়। ভূত-প্রেতের নানা জাতীয় মুখোসে সং সেজে নর্তন-কুর্দনের আধিক্য অবশ্য এক্ষেত্রে কম। গাজনের মেলায় তা পুরোপুরিই লক্ষিত হয়। তবে সম্প্রদায় হিসেবে ত্রিনাথ-পন্থীরা সংখ্যায় এত নগণ্য যে, বাংলার উৎসব-ক্ষেত্রে এ'রা প্রায় পিছনের দুয়োরেই প'ড়ে আছেন। এর প্রধান কারণ বোধ করি অনুষ্ঠানের কিছু অনার্যসুলভতা। অনুষ্ঠানে যে রীতি গোড়া থেকেই প্রবর্তিত হ'য়ে আস্'চে, তা অনেকাংশে সভ্যরুচিসম্পন্ন আর্যসুলভ নয় ব'লেই খুব সম্ভবতঃ হিন্দুর লৌকিক ধর্মের ক্ষেত্রে ত্রিনাথ-পন্থীদের এই আংশিক অপাংক্তেয়তা!

এ যদি হ'য়ে থাকে, তবে তাকে খুব বেশী দোষ দেওয়া চলে না। খরচের দিক থেকে মাত্র তিন পয়সা হ'লেও গাঁজা, পান আর স'রষের তেলের মাধ্যমে ঘট বসিয়ে যে-পূজা-নুষ্ঠানের রীতি আগাগোড়া চ'লে আস্'চে এবং পূজার্চনার সমস্ত কিছুকে কেন্দ্র ক'রে যে-ভাবতীর্থে সেবাইৎবৃন্দ আরোহণ ক'রে আস্'চেন, সেটা হ'চ্ছে আসুরিক বা 'সিদ্ধি'-ভাব—গাঁজা যার প্রধান উপকরণ। মহেশ্বরের মহৎ কল্যাণের আশ্রয়ে থাকবার অভীপ্সায় ধুতুরাসেবী গঞ্জিকা-পিয়াসী মহাদেব-চরিত্রটিই তাঁদের কাছে সুপরিজ্ঞাত, বিভূতি-আচ্ছাদিত সর্বত্যাগী শঙ্কর-চরিত্রের স্পর্শ তাঁরা লাভ করেননি। তার মূলে র'য়েছে তাঁদের অশিক্ষা বা

স্বল্পশিক্ষাজনিত স্বভাবের বৈগুণ্য। অথচ তিনিই হ'চ্ছেন মঙ্গলের আধার, 'শান্তম্, শিবম্, সুন্দরম্'।—তাঁকেই ভগ্নী নিবেদিতা ব'লেছেনঃ 'As the moon shines above the mountains, so He bears on His forehead the new moon.—Like the true ascetic, begging food at the householder's door, He is pleased with very simple gifts.—Fresh water, a few grains of rice and two or three green bel-leaves are His whole offering, in the daily worship'.—এ পাঠ কিন্তু শৈবাবলম্বী ত্রিনাথ-পন্থীদের একেবারেই অনধিগম্য। যেখানে ভাববন্যার পূর্ণ বিকাশ সম্পূর্ণভাবেই ব্যাহত, সেখানে যতবড় নিষ্ঠাই থাক্‌না কেন, বলিষ্ঠ ভিত্তির উপর ভর ক'রে বিশেষ কোনো সাংস্কৃতিক জাগৃতি দাঁড়াতে পারে না।

আর-একদল সেবাইৎ র'য়েছেন—যাঁদের কাছে ত্রিনাথ ঠাকুরের বিষ্ণুরূপই প্রাধান্যলাভ ক'রেছে। 'পদ্মনাভ গদাধর, মুকুন্দমাধব নারায়ণই' যে একমাত্র ত্রিকালজ্ঞ অধীশ্বর—এই বিশ্বাস থেকেই তাঁদের এই পূজা-রীতি। যিনি দেবতাশ্রেষ্ঠ নারায়ণ, অনন্ত গুণসম্পন্ন গুণাধার, যিনি অব্যক্ত অথচ সর্বব্যাপী—তাঁকে ধ্যান করা ভিন্ন মুক্তি নেই, মোক্ষ নেই। তাঁকেই বন্দনা ক'রতে গিয়ে একদিন শঙ্করাচার্য ব'লেছিলেন—

'স্তোষেৎ ভক্ত্যা বিষ্ণুমনাদিং জগদাদিং,
যস্মিন্নেতৎ সংসৃতিচক্রং ভ্রমতীত্থম্।
যস্মিন্ দৃষ্টে নশ্যাতিতৎ সংসৃতিচক্রং,
তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে।'...

অর্থাৎ'জগতের আদি অনাদি বিষ্ণুকে ভক্তিসহকারে স্তব করিতেছি—যাঁহাতে এই সংসারচক্র পরিভ্রমণ করিতেছে, যাঁহার দর্শনে সংসারচক্র বিনষ্ট হয়, আমি সেই সংসার-তমোনাশী হরিকে স্তব করি।'

এই স্তবের একটি নতুন রূপ ফুটে উঠ্‌তে দেখা গেল ত্রিনাথপন্থীদের মধ্যে। এ'রা হচ্ছেন বিষ্ণুধর্মী ত্রিনাথ-পন্থী। তেমনি কোথাও কোথাও বা ব্রহ্মবাদী ত্রিনাথপন্থীও যে না রয়েছেন, এমন নয়। তা নিয়ে এপর্যন্ত কোথাও কোনো আলোচনা মুখর হয়ে ওঠেনি। সম্প্রতি একটি পুস্তিকা সংগৃহীত হয়েছে। তাতে বিষ্ণুধর্মী ত্রিনাথপন্থাই মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। পুস্তিকাটির নাম 'ত্রিনাথের পাঁচালী' 'মহেশচন্দ্র দাস কর্তৃক বিরচিত এবং বিদ্যারত্নোপাধিক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক সংশোধিত। পুস্তিকাখানির প্রকাশক কলিকাতা টাউন লাইব্রেরীর শ্রীকার্তিকচন্দ্র ধর।

ত্রিনাথের পাঁচালী

৺মহেশচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক
পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত

বিদ্যারত্নোপাধিক
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
সংশোধিত

প্রকাশক—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ধর
কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী
১, গরাণহাটা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

পাঁচালীর মূল প্রচ্ছদপট

যেভাবে উত্তর ও পূর্ব এবং পশ্চিমবঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে আমরা ত্রিনাথের পূজো লক্ষ্য করেছি, তার সঙ্গে এই পুস্তিকাটির সর্বত্র মিল না থাকলেও বিষয়টির মোটামুটি সুশৃঙ্খলভাবে গুছিয়ে সুমার্জিত ভাষায় নানা আলঙ্কারিক শব্দবিন্যাসে সুরুচিসম্পন্ন করে একটি পরিমার্জিত রূপ দেওয়া হয়েছে। এখানে বিষয়টির গবেষণার চইতে ভাবাতিশয্যই অধিক। পুস্তিকাটিতে প্রথমতঃ দ্বিপদী ছন্দে বিষ্ণুর বন্দনা করা হয়েছে, পরে পয়ার ও ত্রিপদীর মিশ্রনে বিবেকধর্মী আতিশয্যে ত্রিনাথের পূজো-প্রচলনের মূল কাহিনীটিকে রূপ দেওয়া হয়েছে। ঢংটি ঠিক কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত বা কৃষ্ণদাস কবিরাজ-বিরচিত চৈতন্য চরিতামৃতের ঢং। বর্ণন এত সহজ ও প্রাঞ্জল যে, তা নিয়ে ব্যাখ্যাসহকারে বিস্তৃতভাবে আলোচনার প্রয়োজন হয় না। পাঠক মূল পাঁচালীখানি পড়লেই এর সারবত্তা উপলব্ধি করতে পারবেন। এজন্য সম্পূর্ণ পাঁচালীখানি নিম্নে হুবহু উদ্ধৃত করা গেল। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে এই যে, এখানেও সেই এক পয়সার গাঁজা, এক পয়সার

পান ও এক পয়সার সরষের তেলের প্রাধান্য। পূজোর প্রধান অঙ্গই এই তিনটি। জনৈক ব্রাহ্মণ বিষ্ণু-কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে কিভাবে তাঁর হারানো গাভীর দর্শন পান এবং কিভাবে উক্ত তিন পয়সার তিন দ্রব্য সংগ্রহের মধ্য দিয়ে ঘরে ঘরে শ্রীহরি নারায়ণের পূজো প্রচলন করতে সক্ষম হন, সেই কাহিনীই এখানে বিশেষভাবে প্রাধান্যলাভ করেছে। এখানেও সেই আসুরিক বা 'সিদ্ধি' ভাব—বৈষ্ণব-রীতির পক্ষে যা মোটামুটি পরিপন্থী। এখানে বিষ্ণুকে মূল কেন্দ্রানুগ করেও ত্রিনাথ-পন্থীদের এই বিশেষ শ্রেণীটি বৈষ্ণব হয়ে উঠতে পারেননি। তাই তাঁদের এই ভাব বা স্বভাবকে বলা হয়েছে আসুরিক বা 'সিদ্ধি'ভাব। এ'দের অধিকাংশই মনে প্রাণে শাক্ত। বৈষ্ণবে-শাক্তে মূলগত পার্থক্যটা ইদানিং অনেকখানিই ঘুচে গেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সার্ধশতাব্দী পূর্বেও এ পার্থক্য স্বভাবতঃই দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। তা নিয়ে আজ অবশ্য কোনো বাদানুবাদের প্রশ্ন ওঠে না। একটা কথা খাঁটি যে, বাংলার সংস্কৃতি প্রধানতঃ গড়ে ওঠে এই জাতীয় লৌকিক ধর্মানুষ্ঠানগুলির মধ্য দিয়েই। তাতে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি বা বিপরীত ভাবের বন্যা এসে আশ্রয় করলেও তা থেকে এমন কতকগুলো মধুর পদ্মকোরকের সৃষ্টি হয়েছে—যার উর্ধমুখ একমাত্র সূর্যের দিকেই ন্যস্ত। সূর্যের দীপ্ত-রশ্মিতে তার সমস্ত মালিন্য সমস্ত ত্রুটি ঢাকা পড়ে গেছে। সেই পদ্ম-কোরকের রেণু থেকেই বাংলা তথা বাঙালী সংস্কৃতির জন্ম—যার মূল সুরটি পুরোপুরিই ভারতীয়। সেই সুরেরই একটি বিশেষ ধারা হচ্ছে—'ত্রিনাথের পাঁচালী'। আলোচ্য পাঁচালীখানি এইরূপঃ

ত্রিনাথের পাঁচালী।

বিষ্ণুর বন্দনা

ত্রিপদী

ত্রিনাথ কেশবত্তম, তুমি হে পুরুষোত্তম, চতুর্ভূজ গরুড়-বাহন। জলদ বরণ ঘটা হৃদয়ে কৌস্তুভ ছটা, বনমালা আদি আভরণ॥ কৃপা কর কমললোচন। জগন্নাথ মুরহর, পদ্মনাভ গদাধর, মুকুন্দ মাধব নারায়ণ॥ রামকৃষ্ণ জনার্দন, লক্ষ্মীকান্ত সনাতন, হৃষীকেশ বৈকুণ্ঠ বামন। শ্রীনিবাস দামোদর, জগন্নাথ যজ্ঞেশ্বর, বাসুদেব শ্রীবৎস লাঞ্ছন॥ শঙ্খ চক্র গদাম্বুজ, সুশোভন চারিভুজ, মনোহর মুকুট মাথায়। কিবা মনোহর পদ, নিরুপম কোকনদ, রতন নূপুর বাজে তায়॥ পরিধান পীতাম্বর, অধর বান্ধুলি* বর, মুখ সুধাকরে সুধাহাস। সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী, নাভীপদ্মে প্রজাপতি, রূপে ত্রিভুবন পরকাশ॥ ইন্দ্র আদি সুর সব, চারিদিকে করে স্তব, নারদাদি ঋষি যত জন। মুনির বীণার তানে, মোহিত যে গুণ গানে, পঞ্চমুখে গান পঞ্চানন॥ কদম্বের কুঞ্জবনে, বিহর আনন্দ মনে, শীতল সুগন্ধি মন্দবায়। ষড়ঋতু সহচর, বসন্ত লইয়া শর, নিরবধি সেবে নিজ পায়॥ ভৃঙ্গের গুণ গুণ রব, কুহরে কোকিল সব, পূর্ণচন্দ্র শারদ-যামিনী। বীণা বাঁশী আদি যন্ত্রে, গান করে তাল তন্ত্রে, ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী॥ উর প্রভু শ্রীনিবাস দাসের পুরাহ আশ, এই মোর সদা আকিঞ্চন। করি এই নিবেদন, দিও অন্তে শ্রীচরণ, ত্রিনাথের আর নাহি কোন জন॥

পয়ার

কলির আরম্ভ কালে দেব নারায়ণ। নবদ্বীপে গৌরাঙ্গরূপ করেন ধারণ॥ দ্বারে দ্বারে ঘরে ঘরে হরিসংকীর্তন। হরিবোল বিনা আর নাহিক বচন॥ তবু নাহি কলির নরের পাপ যায়। দেখিয়া কি করি হরি ভাবেন উপায়॥ নবদ্বীপে ত্রিনাথ রূপ করেন ধারণ। কেমনেতে জগজ্জন করিবে পূজন॥ কেমনে হইবে এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রচার। তার পরিচয় শুন সবে সুবিস্তার॥ সেই গ্রামে থাকে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ। অতি সে দরিদ্র দ্বিজ না মিলে ওদন॥ গাভী চরাইয়া ফিরে ময়দান উপর। দৈবাৎ হইল হারা সে গাভী তৎপর॥ অন্বেষণ করি দ্বিজ ভ্রমে স্থানে স্থান। কোথাও না পায় দ্বিজ গাভীর সন্ধান॥ আকুল হইয়া বিপ্র করিছে রোদন। মনে মনে ভাবিতেছে দেব নারায়ণ॥ হেনকালে দেখিল সে এক সরোবর। মরিব ইহাতে মনে ভাবে দ্বিজবর॥ আচম্বিতে দৈব বাণী দিলা নারায়ণ। "ত্রিনাথে করহ পূজা অবোধ ব্রাহ্মণ॥ গাভীর কারণে কেন জীবন ত্যজিবে। পুনর্বার রত্নধন গাভী আর পাবে॥ তটিনীর তট গিয়া করহ খনন। তিনপাই প্রাপ্ত হবে শুনহ ব্রাহ্মণ॥ একপাই গাঞ্জা আর একপাই পান। তেল লবে এক পাই শুন মতিমান॥ বিলম্ব না কর দ্বিজ শুনহে বচন। ত্বরা গিয়া তিন দ্রব্য কর আনয়ন॥" এত শুনি দ্বিজবর গমন করিল। নদীর তীরেতে আসি মৃত্তিকা খুদিল॥ সেইখানে তিন পাই দেখিতে পাইল। আনন্দে আটখানা দ্বিজ তখন হইল॥ ভাবে কোন দেব ইনি না জানি কারণ। কখন তাঁহার সঙ্গে নাহি দরশন॥ যে হউক সে হউক তাঁয় করি নমস্কার। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ যেন হয় সে আমার॥ এত ভাবি দোকানেতে গমন করিল। মৃদুস্বরে দোকানীরে কহিতে

* বান্ধুলি—রক্তপুষ্প বিশেষ। রক্তক, বন্ধুক ও জীবক শব্দে বান্ধুলী—(বাদুল, বানরী)।

লাগিল॥ শুন শুন দোকানদার লহ তিন পাই। তিন পাই ভিতরেতে তিন দ্রব্য চাই॥ তৈল গাঞ্জা দেহ আর এক পাই পান। বিলম্ব সহিতে নারি করিব প্রস্থান॥ দোকানি বলিছে শুন অবোধ ব্রাহ্মণ। কিসেতে লইবে তৈল বলহ বচন॥ তৈল পাত্র কিছু নাহি আনিলে সঙ্গেতে। কিসেতে লইবে তৈল বলহ ত্বরিতে॥ ব্রাহ্মণ বলেন শুন দোকানদার ভাই। কিসেতে লইব তৈল ঠাকুরে সুধাই॥ এত বলি দ্রুতগতি করিল গমন। দেখেন সেখানে আর নাহি কোনজন॥ দেখিয়া ত দ্বিজবর করেন রোদন। বলে প্রভু কোথাকারে করিলা গমন॥ কান্দিতে লাগিল দ্বিজ ভাবিয়া না পায়। হেনকালে দৈববাণী হইল তথায়॥ "তৈল আন বস্ত্র মধ্যে করিয়া বন্ধন। আমার বচন কভু নহিবে লঙ্ঘন॥" এত শুনি দ্বিজবর গমন করিল। দোকানদারে গিয়া তবে ব্রাহ্মণ কহিল॥ কোঁচার কাপড়ে তৈল বান্ধি দেও মোরে। কি কার্য পাত্রেতে মোর কহিনু তোমারে॥ এত শুনি দোকানদার ভাবে মনে মন। নিশ্চয় উন্মাদ এই ব্রাহ্মণ নন্দন॥ ঠকাইয়া দেয় তৈল বিপ্রের কুমারে। দেখিয়া কুপিত হইলেন গদাধরে॥ তৈলের কলসী দেব করিল হরণ। দেখিয়া বিস্ময় মুদি হইল তখন॥ দোকানদার ভাবে মনে ব্রাহ্মণ এ নয়। বুঝিনু দেবতা ইনি হবেন নিশ্চয়॥ ব্রাহ্মণের পদ মুদি করিয়া ধারণ। বলে প্রভু ক্ষম মোরে আমি অভাজন॥ ঠকায়ে দিয়েছি তৈল তোমারে আপনি। সে দোষ ক্ষমহে মোরে শুন দ্বিজমণি॥ ব্রাহ্মণ বলেন বাছা কিছু জানি নাই। ইহার তদন্ত জানেন ত্রিনাথ গোসাঞি॥ মানহ তাঁহার পূজা পুন তৈল পাবে। তোমার মনের বাঞ্ছা তিনি পুরাইবে॥ মুদি বলে কোথা তিনি বলগো আমায়। তোমার চরণে ধরি করি গো বিনয়॥ আদি অন্ত কথা সব ব্রাহ্মণ কহিল। শ্রবণ করিয়া মুদি অবাক হইল॥ মনে মনে মানস করিয়া ততক্ষণ। মুদি দুরাচার পূজা করিল মানন॥ পুনর্বার তৈল কুম্ভ মুদি যে পাইল। হরষিত হয়ে মনে নিজ গৃহে আইল॥ কবিবর কহে শুন শুন ভক্তগণ। ত্রিনাথ প্রকাশ করেন আপন পূজন॥

ত্রিপদী

ঘরেতে আসি ব্রাহ্মণ, আনন্দিত হয়ে মন, ত্রিনাথের করেন পূজন। আনি নানা উপহার, তবে ব্রাহ্মণ কুমার, পূজা করে দেব নারায়ণ॥ ঘটের স্থাপনা করি, ত্রিনাথের নাম স্মরি, বলে প্রভু দেহ পদছায়া। আমি অতি মূঢ়মতি, কি জানি তোমার স্তুতি, আমায় করহ প্রভু দয়া॥ ওহে হরি দীনবন্ধু, অনাথ জনার বন্ধু, ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি মহেশ্বর। তিন দেব একত্তরে, পূজা প্রকাশের তরে, ত্রিনাথ হইয়া তদন্তর॥ এতেক করি স্তবন পূজা করিছে ব্রাহ্মণ, গুরু তার আইলা হেনকালে। শিষ্যে ডাকি ততক্ষণে, বলে কি কর এখানে, বিশেষ করিয়া কহ মোরে॥ ধ্যানেতে শিষ্য আছিল, কথা তখন না কহিল, দেখিয়া কুপিত গুরু তার। লাথি মারি ঘটপরে, ফেলিল ধরণীপরে, তবু শিষ্যের বাক্য নাহি আর॥ তল্পিদারে ক্রোধে কন, তল্পি তোল এইক্ষণ, দুরাচারের ঘরে নাহি রব। শিষ্য হ'তে গুরু প্রতি, অমান্য করিল অতি, এইক্ষণে গৃহে চলি যাব॥ এত বলি ক্রোধানলে, আপনার গৃহে চলে, হেনকালে শুন বিবরণ। অমান্য করি ত্রিনাথে, ফেলি ঘট পদাঘাতে, স্ত্রী পুত্রাদির হয়েছে মরণ॥ রোদনের ধ্বনি শুনে, তল্পিদার কহে ব্রাহ্মণে, শুন প্রভু করি নিবেদন। বুঝি রোদন করে, শুনি তোমার মন্দিরে, শুনি গুরু করে আগমন॥ গৃহে আসি ততক্ষণ, দেখিল শূন্য ভবন, স্ত্রী পুত্র মরেছে তিনজন। শুনি গুরু এই কথা, হৃদয়ে পাইল ব্যথা, ভূমে পড়ে হ'য়ে অচেতন॥ বলে পুত্র গেলি কোথা, খাইয়া আমার মাথা, একবার দেখা দেরে মোরে। তোমার লাগিয়া বাপ, হৃদয়েতে পাই তাপ, কেমনে রহিব একা ঘরে॥ আর নাহি গৃহে যাব, জলে ডুবিয়া মরিব, এত বলি আইসে জলাশয়। জলেতে নামি যেমন, দেহ করিবে পতন, অমনি আকাশবাণী হয়॥ শুন ওহে দ্বিজবর, নাহি ত্যজ কলেবর, নারী আর পাইবে তনয়। তব শিষ্য দ্বিজবর, গিয়াছিলে তার ঘর, বসিয়া সে ত্রিনাথ পূজায়॥ তব সহ সম্ভাষণ, না করিল সেই জন, দেখি ক্রোধ হৈলে তুমি তার। ঘট পদেতে ফেলিলে, তেঁই এত দুঃখ পেলে, স্ত্রী পুত্র হে মরিল তোমার॥ এবে এক কার্য কর, ত্বরা যাহ তার ঘর, আদ্য অন্ত কহ গিয়া তায়। তব নারী পুত্রগণ, পাবে প্রাণ এইক্ষণ, কবিবর রচিলা ভাষায়॥

পয়ার

শুনিয়া আকাশবাণী ব্রাহ্মণ তখন। হরষিতে শিষ্যগৃহে করেন গমন॥ আদ্য অন্ত কথা যত শিষ্যের কহিল। শ্রবণে ব্রাহ্মণ তবে বিস্ময় হইল॥ ব্রাহ্মণ বলেন ভক্ত তুমি বাছাধন। না জানিয়া তোমা প্রতি কহি কুবচন॥ এখন করহ তুমি মম প্রতিকার। তোমার কল্যাণে পাই পুত্র পরিবার॥ ব্রাহ্মণ বলেন গুরু শুনহ বচন। বিধিমত কর তুমি ত্রিনাথ পূজন॥ শুনি ত্রিনাথের পূজা মানস করিল। কোল্কে পোড়া ভস্ম শিষ্য গুরু

হস্তে দিল॥ এই ভস্ম লয়ে যাও ত্বরায় করিয়া। তাহাদের অঙ্গে তুমি দিবে মাখাইয়া॥ এত বলি কল্কে পোড়া ভস্ম করি দিল। হরষিত মনে গুরু গৃহেতে আইল॥ স্ত্রী পুত্রের অঙ্গে মাখায় করিয়া যতন। সকলে পাইয়া প্রাণ উঠিল তখন॥ আনন্দে ত্রিনাথ ধ্বনি করেন ব্রাহ্মণ। ত্রিনাথের করে পূজা আনন্দিত মন॥ ঘট স্থাপনা করি পূজা আরম্ভিল। ধন পুত্র লক্ষ্মীলাভ ক্রমেতে হইল॥ মেলা হইল তথা ত্রিনাথের পূজায়। প্রত্যাবধি লক্ষ লক্ষ লোক আইসে যায়॥ অন্ধ খঞ্জ দোঁহে আছে পথেতে বসিয়া। জিজ্ঞাসা করিল খঞ্জ লোকেরে চাহিয়া॥ কহ কহ মহাশয় কহ বিবরণ। বলহ করিছ সবে কোথায় গমন॥ একজন কহে যাই ত্রিনাথ দেখিতে। বর মাগি লব মোরা তাঁহার পদেতে॥ অন্ধে পায় চক্ষু দান দরিদ্রের ধন। মানস করিলে পায় খঞ্জেতে চরণ॥ শুনি দোঁহে মানস করিল যতনেতে। অন্ধ পায় চক্ষু, পদ পাইল খঞ্জেতে॥ সামনেতে নৃত্য করে তুলি দুই হাত। ধন্য ধন্য মহাপ্রভু ধন্য হে ত্রিনাথ॥ ত্রিনাথ করেন কৃপা সবাকার তরে। দুই বাহু তুলি নৃত্য করে প্রেম ভরে॥ হরি হরি বল সবে যত বন্ধুগণ॥ মহেশচন্দ্র দাসে ভণে শুন ভক্তগণ॥

ইতি ত্রিনাথের পালা সমাপ্ত।

এতদ্ব্যতীত 'ত্রিনাথ'-সম্পর্কিত বহু গান ও ছড়া নানাদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। সেগুলিকে সংগ্রহ করে একখানি মনোরম গ্রন্থ রচিত হতে পারে।

প্রবন্ধের মূল বিষয় সম্পর্কে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে সিটি কলেজের অধ্যাপক বন্ধুবর পঞ্চানন চক্রবর্তী আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।—লেখক।

★

মৃত্যুই অমৃত করে দান

শ্রীকালীপদ চক্রবর্তী

ভয়ার্ত রাত্রির বুকে নিঃসীম মৃত্যুর প্রেতছায়া,
লোলিহ রসনা মেলি, আজিও জাগিছে নিশাচর।
মাটীর শিশুরা কাঁদে আঁধার বিবর্ণ ধরাতলে
জীবনের প্রাণ কাঁপে দুঃসহ ব্যথায় থরো থর।

রক্তাক্ত মাটীতে হায় আজিও অসংখ্য রক্তবীজ
হিংসার অংকুরে ডানা মেলে। আজিও অনেক-ঝড়ে
সবুজের স্বপ্ন ভাঙে। পৃথিবীর প্রাণের ফসল
সোনা হয়ে ওঠে নাতো,—পুড়ে যায়, যায় শুধু ঝরে।

অনেক শতাব্দী শেষে আজো মোরা তেমনি মানুষ
সূর্যের কামনা সয়ে জাগি। আজো মোরা ভেসে যাই
রক্তাক্ত বন্যার স্রোতে মৃত্যুর গহ্বরে। আজো হায়
বিদীর্ণ ব্যথিত কণ্ঠে ডেকে বলি—'অমৃত কি নাই'?

অনেক মৃত্যুরে মোরা পারায়ে এলাম। শুধু জানি
মৃত্যুই অমৃত করে দান। অমৃতের আশীর্বাদ
নেমে আসে মহান মৃত্যুর রূপ ধরি। মৃত্যু নাই—
জীবনের রূপায়ণে দুর্লভ সে রুদ্রের প্রসাদ।

শেষ কবিতা

সনৎকুমার মিত্র

সমস্ত রাত তোমায় ডেকে,—চোখের জলে ভিজে,—
আমার ব্যথার দাগ এঁকেছি হাজার কবিতাতে;
কেঁদে যখন ক্লান্ত এ মন—তখন আঁখিপাতে,
সত্য জানি স্বপ্নমাঝে আসবে তুমি নিজে।

যে চোখ মেলে পৃথ্বী খুঁজেও পাইনি তোমায় আমি,
সে চোখ যখন অশ্রুভারে অন্ধ হ'য়ে আসে,—
তখনি সে চোখের পাতায় তোমার ছবি ভাসে;
তাই বুঝি চায় আমার দু'চোখ কাঁদতে দিনযামী।

আমার মন সাজিয়ে ডালা হাজার ফুলে ফুলে,
পথের ধারে তোমায় ডেকে গাইবে শুধু গান;
ক্লান্ত হলেও,—ব্যথায় মলিন দিনের অবসান
আনলে তোমায়,—আনন্দ গান গাইবো দুলে দুলে।

না পাই তোমায়—নাইকো ক্ষতি—কাঁদবো তবু একা,
কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে যখন দিনের শেষে—
ঘুমের ছোঁয়া বুলিয়ে দেবে—ঘুমের মেয়ে এসে;
সত্য জানি স্বপ্নে তোমার পাবোই পাবো দেখা।

পান্থপাদপ

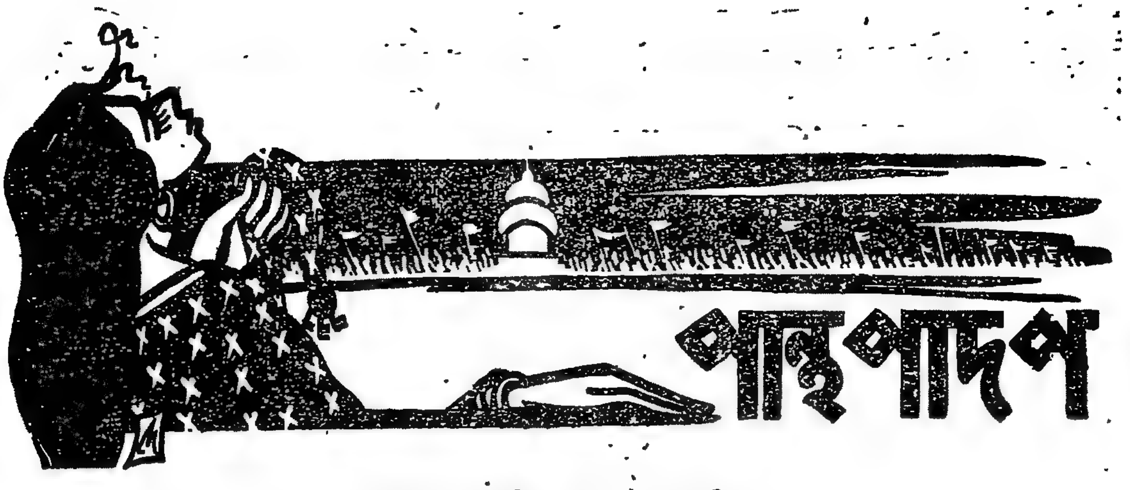

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(২৩)

রতন দত্ত জয়ন্তের সঙ্গে আলাপ করে সত্যই অত্যন্ত খুশি হয়ে ওঠেন।

আশ্চর্য তার পাণ্ডিত্য, কত অগাধ তার জ্ঞান। দেশ বিদেশের সব খবর রাখে সে, রাজনীতি ধর্মনীতি এমন কি সমাজনীতিতেও তার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি।

চমৎকৃত রতন দত্ত জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার মনে হয় তুমি কেবল পড়েই এত জ্ঞান অর্জন করনি, নিশ্চয় অনেক দেশ বেড়িয়েছো, অনেকের সঙ্গে মিশেছো ?"

জয়ন্ত স্বীকার করে, বলে, "হ্যাঁ, আমি সমস্ত ইউরোপ বেড়িয়েছি, তা ছাড়া রাশিয়াতেও আমার কিছুদিন কেটেছে। বছর দেড় আগে জাপানে গিয়েছিলুম, সেখান হতে কিছুদিন হল ফিরে এসেছি।" এ কথা আপনি ঠিকই বলেছেন কেবল পড়ে বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি বা ধর্মনীতি কিছুই বোঝা যায় না। কোন জাতির সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে জানতে হলে তাদের সঙ্গে বিশেষ অন্তরঙ্গ হয়ে মিশতে হয়। যে কোন কারণে আর যে কোন রকমেই হোক পৃথিবীর অনেকগুলো দেশের অনেকগুলো স্বাধীন জাতির সঙ্গে মিলবার এবং মিশবার সুযোগ আমার হয়েছে—যা অনেকেরই হয় না, যাতে আমি জানতে পেরেছি তারা কি ভাবে জীবনযাপন করে আর আমরা—এই পরাধীন ভারতের অধিবাসীরা বা কি ভাবে জীবন যাপন করি।"

মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে সে আবার বলে যায়, "জানিনে জন্মান্তর আছে কিনা, যদি থাকে, আমি সর্বান্তঃকরণে কামনা করছি আমি যেন স্বাধীন দেশের বুকে জন্মাতে পারি যেখানে কাজ করবার, কথা বলবার অধিকার থাকবে, দেশের উন্নতি, জাতির উন্নতি করবার প্রচেষ্টা যেখানে অপরাধ বলে গণ্য হবে না। আমি আন্তরিক অভিশাপ দেই ভারতবর্ষের ক্লীব জনগণকে, ধ্বংস হোক তারা, ধ্বংস হোক এই সহস্র বন্ধনে পেষিত জর্জরিত ভারতবর্ষ, সেই ধ্বংসের উপর স্বাধীনতার মন্দির গড়ে উঠবে, আসবে নব পূজারীর দল। আমি যেন সেই দিনে জন্মগ্রহণ করি, স্বাধীন ভারতের সন্তানরূপে ভারতের জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন করতে পারি।"

স্তব্ধ হয়ে থাকেন রতনমণি দত্ত, আশ্চর্য চোখের দৃষ্টি শুধু বুলিয়ে যান দীর্ঘ রূপবান তরুণটীর সমস্ত দেহের উপর।

কতই বা বয়স তার ছাব্বিশ সাতাশ বড় জোর হবে। এই বয়সে সে প্রাচ্য প্রতীচ্যের জীবনের ধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিত হয়েছে, কেবল মাত্র ইউনিভার্সিটীর ডিগ্রিটাকেই চরম ও পরম বলে গ্রহণ করে খুশি হতে পারেনি। সে গিয়েছে ইউরোপ, গিয়েছে জাপান, রাশিয়া এবং প্রত্যেক স্বাধীন দেশের জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সে পরিচিত হয়েছে, কেবল ইতিহাস পড়েই সে খুশি হয়নি, প্রত্যেকের সঙ্গে মিশেছে—প্রত্যেককে দেখেছে।

নিজের অতীত জীবনের পানে ফিরে তাকান রতন দত্ত।

কি করেছেন তিনি তাঁর অতীত যৌবনে, শুধু খেলা করেই কাটিয়েছেন, তাঁর নিজের জন্য সঞ্চয় করলেন কি ? মোটামুটি একটু লেখাপড়া শিখেছেন, তাতে পৃথিবীর জনগণের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায় না।

হায়রে যৌবন, এমন করেও ফাঁকি দিয়ে চলে গেলে তুমি। নিজের সেই অতীত কালের পানে তাকিয়ে রতন দত্ত আজ সঙ্কুচিত হয়ে ওঠেন।

সে দিনে সত্যকার মানুষ চিনবার ক্ষমতা পর্যন্ত তাঁর ছিল না তাই না কিশোরকে নিষ্ঠুর কথায় দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। সেদিনে তিনি যদি অগ্রসর হয়ে যেতেন, মহেশ্বরী দেবী গৃহত্যাগ করতেন না।

তাঁর অতীত সুখময় নয়, তাঁর অতীত পরম দুঃখময়, পরম বেদনাদায়ক। বিবর্ণ মুখে রতন দত্ত ফিরে তাকান বর্তমানের দিকে, ফিরে তাকান জয়ন্তের পানে।

দৃপ্ত যৌবনের তেজে উজ্জ্বল জয়ন্ত রায়, গাত্রবর্ণে সে ইউরোপীয়দের সমপর্যায়ে, কিন্তু মনে সে খাঁটী বাঙ্গালী, খাঁটী বিপ্লবী। সে দেশের সেবক, এইমাত্র তার পরিচয় আর কিছু নয়

কথার মোড় ফিরে যায়।

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করে, "আপনি কেন ওখান হতে চলে এলেন ?

শুনেছি আপনি এখানে এই জন কোলাহলের মধ্যে থাকতে পারেননি কোন দিন, এই দুই বৎসর কি করে আছেন?”

রতন দত্ত বিবর্ণ হাসি হাসেন।

আস্তে আস্তে উত্তর দেন,“বোধ হয় এও শুনেছো—আমার জমিদারীর অর্দ্ধেক গবর্ণমেণ্ট খাস করেছেন—আর অর্দ্ধেক বন্ধক দেওয়া আছে, কিন্তু তাও যে পাব সে আশা আমার নেই। ওখানে থেকে কিই বা করব আমি—আমার করবার তো আর কিছুই নেই।”

জয়ন্ত দৃঢ়কণ্ঠে বললে, “যথেষ্ট আছে, নেই বললেই কি হয়? ধরলেন প্রজারা আপনাকে চায়নি, কিন্তু তাদের এ ভুল দুদিন পরেই হয় তো ভেঙ্গেছে, তখন তারা কার উপর নির্ভর করে দাঁড়াবে বলুন তো?”

রতন দত্ত আবার হাসলেন, বললেন, “নিজের জিদ আমি ছাড়িনি জয়ন্ত। ভগবানকে ধন্যবাদ আমি সম্মানের সঙ্গে চলে আসতে সমর্থ হয়েছি। নিজের জিদ নিয়ে আরও কিছুদিন থাকলে আমায় হয় তো ধূলো হয়ে ধূলোর সঙ্গে মিলিয়ে যেতে হতো। বড় বেদনা পেয়েছিলুম জানো জয়ন্ত—যখন দেখলুম যাদের দুঃখ-বেদনা দূর করতে আমি দাঁড়িয়েছিলুম, যে এতটুকু বেলা হতে আমার কাছে মানুষ হল সে—সবাই আমার বিরুদ্ধে কোর্টে দাঁড়ালো সাক্ষী দিতে, সেই মুহূর্তে আমার সমস্ত ভুল ভেঙ্গে গেল, আমার চোখ ফুটলো। নিজেকে আমি গুটিয়ে আনলুম আবার নিজের গন্ডীর মধ্যে,—সে জন্যে আজ আমায় কেউই অপরাধী করতে পারে না, তুমিও পারো না জয়ন্ত।”

তিনি চুপ করে যান।

জয়ন্তও খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে, তার পর বললে, “আমি আপনাদের সম্বন্ধে সব কিছুই শুনেছি কাকাবাবুর কাছে। আমার কাকাবাবু শুধু নন, তিনি আমাদের সকলের কাকাবাবু, তিনি আমাদের উপদেষ্টা, আমাদেব সকলের গুরু। তিনি আপনার বিশেষ আত্মীয়, তাঁর দিদি ছিলেন আপনার মা—”

আত্মবিস্মৃত রতন দত্ত চেঁচিয়ে ওঠেন—“কিশোর?”

জয়ন্ত হাত তোলে, “থামুন, চেঁচাবেন না—। হ্যাঁ, তিনিই আমাদের কাকাবাবু, তিনিই আমায় আপনাদের কালের পরিচয় দিয়েছেন, আমায় আপনাদের কাছেও পাঠিয়েছিলেন।”

রুদ্ধশ্বাসে রতন দত্ত জিজ্ঞাসা করেন, “সে কোথায়?”

জয়ন্ত উপর দিকে হাত তোলে,—“স্বর্গে। হ্যাঁ, দেশ-সেবকের জন্য আছে স্বর্গ—তিনি সেখানেই গেলেন। অবশ্য স্বর্গ নরক আমরা জানি না, পাপ পুণ্য আমরা মানি দেশসেবা আর দেশের অনিষ্ট করার দিক দিয়ে, আপনাদের মত নেতি নেতি বিচার করে নয়। আপনাদের মতে, যদি পুণ্যের পুরস্কার স্বর্গলাভ হয় তবে আমাদের কাকাবাবু সেই স্বর্গেই স্থান পেয়েছেন।”

তার বড় বড় চোখ দুইটী ধক ধক করে জ্বলে—জোরে জোরে সে নিঃশ্বাস ফেলে।

বেশী সে কিছু না বললেও কয়েকটা দিন আগে যে কাহিনীটা সংবাদপত্রে প্রকাশ হয়েছিল সেই কাহিনী রতন দত্ত ও ভারতীর মনে পড়ে যায়।

বাংলায় ধরপাকড় বড় বেশী রকমই চলছে। গুপ্তচরের সংখ্যাও বড় কম নয়। এই সব লোকেরা খেতাব ও অর্থ প্রাপ্তির আশায় অনেক সন্ধান সংগ্রহ করতো। এদেরই খবরপ্রাপ্ত দেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশে বাংলার পুলিস গ্রামকে গ্রাম ঘিরে ফেলে চালিয়েছে গ্রামবাসীর উপর অসহনীয় অত্যাচার। সম্পর্কীয় কেউ বিপ্লবে যোগ দিয়েছে খবরটা কোনরকমে সংগ্রহ করতে পারলে বিপ্লবীর সম্পর্কে যে যেখানেই থাক তার সর্বনাশ সেদিনকার নির্দিষ্ট কাজের মধ্যে ছিল।

অত্যাচারে বিপর্যস্ত জনকত বাঙ্গালী ছেলে চলে গিয়েছিল বিহারে এক পর্বতময় স্থানে—সেখানে কোন এক পর্বতের গুহা তাদের অস্ত্রতৈয়ারীর কারখানারূপে পরিগণিত হয়েছিল। এখান হতে প্রস্তুত দ্রব্য তারা ভারতের বিভিন্ন স্থানে কি ভাবে প্রেরণ করতো তা তারাই জানে।

এই দলেরই কোন ছেলে অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করার দুর্বল মুহূর্তে এই গুপ্ত কথা ব্যক্ত করে ফেলেছিল—পুলিসও অকস্মাৎ নিতান্ত অতর্কিতভাবে সেখানে হানা দিয়েছিল। এই দলের অধিনায়ক ছিলেন কিশোর। যতদূর পেরেছিলেন তিনি জনকয়েক ছেলেকে একে একে গুপ্ত পথে বার করে দিয়েছিলেন, কিন্তু নিজে ও আর দু একজন বার হওয়ার সময় আক্রান্ত হন। পুলিস যেমন গুলি চালিয়েছিল, বিপ্লবী দলও তেমনই নিরস্ত ছিল না। এই গুলিতে যারা নিহত হয় তাদের মধ্যে পুলিসের লোক তো ছিলই, কিশোরও জীবিত ছিলেন না।

সেখানে চলেছিল রীতিমত একটা খণ্ডযুদ্ধ। একা কিশোর বিপ্লবী ছেলেদের পশ্চাদ্ধাবনকারী পুলিসদলকে সঙ্কীর্ণ গিরিপথে বাধা দিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। জীবনের প্রতি মায়া মোহ তাঁর কোনদিনই ছিল না, ছেলেদের বিপদমুক্ত করে হাসিমুখে তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন, তবু পরাজয় স্বীকার করেননি আত্মসমর্পণ করে।

সেদিনকার তরুণ কিশোর—সাধারণে তাঁকে অন্য নামে চিনেছে, রতন দত্ত তাঁকে কিশোর নামেই জানেন। সংবাদপত্রে নাম দেখে তাই তিনি চিনতে পারেননি—এ তাঁরই মাতুল বীরাঙ্গণা মহেশ্বরী দেবীর সহোদর কিশোর।

বার্দ্ধক্যে উপনীত হয়েছিলেন তিনি, মাথার চুল সাদা হয়ে গেছে, চোখের দৃষ্টি তবু ছিল অতি উজ্জ্বল, দেহে শক্তি ছিল প্রচুর, মনে শক্তি ছিল তার চেয়েও অনেক বেশী। যে বয়সে লোকে সংসারধর্ম ত্যাগ করে জরাজীর্ণ দেহে ভগবানের নাম করে, সেই বয়সে তিনি দু হাতে রিভলভার নিয়ে যুদ্ধ করেছেন, দলের প্রত্যেক ছেলেটীকে রক্ষা করেছেন।

রতনমণি দত্ত স্তব্ধ ভাবে বসে থাকেন, ভারতী মুখ ফিরিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে দেয়ালস্থ একটা মাকড়সার গতিবিধি নিরীক্ষণ করে।

রতন দত্তের জীবনটা যেন কেমন খাপছাড়া হয়ে গেছে, আঘাতের পর আঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন তিনি, তাঁর বিবর্ণ মলিন মুখ দেখেই তা বোঝা যায়।

মনে হয় একটা দেয়াশলাইয়ের কাঠির মত মুহূর্তের জন্য জ্বলে উঠেই তিনি নিভে গেছেন।

কথাটা বোধ হয় মুখ দিয়ে বার হয়েও যায়।

জয়ন্ত হাসে—“ভুল করছেন, ও কথা মনে করাই ভুল। দাহিকাশক্তি আপনার ফুরায়নি। মনে করুন আপনি কাঠে বড় আগুন দেননি—যার স্থায়ীত্ব অল্পক্ষণেরই মাত্র; আপনি আগুন দিয়েছেন তুঁষের গাদায়, গুমে গুমে ও আগুন দিনের পর দিন মাসের পর মাস বিস্তৃতি লাভ করবে, অথচ উপর হতে দেখে এর ভয়াবহতা কেউ বুঝতে পারবে

না। আত্মচেতনা যাদের মধ্যে জাগিয়েছিস, নিজেদের মর্য্যাদা সম্বন্ধে তারা অবহিত হয়েছে, সহজে তাদের হাতের মুঠোর মধ্যে পাওয়া দুঃসাধ্য হবে। তারা এখন যা হোক বিচার করতে শিখেছে, না হোক সূক্ষ্ম ভাতেও দুঃখ নেই। তারা যে আত্মমর্য্যাদা, নিজেদের পাওনা-গণ্ডা বুঝতে শিখেছে এইটাই যে আমাদের পরম লাভ। আপনি এমনভাবে মৃত্যু বরণ করবেন না, বেঁচে থাকুন,—আপনার বাঁচার মধ্যেই নিজের দাহিকাশক্তি ফিরে পাবেন।"

রতন দত্ত ম্লান হাসি হাসেন।

সন্ধ্যার সময় বিদায় নেয় জয়ন্ত।

সারা দিনমানটা কেটে যায় আলাপ আলোচনার মধ্যে, রতন দত্তের অতিথিরূপে আহার এবং চা পর্বটাও প্রচুরভাবে এখানে জুটে যায়।

সুখেন্দুকে সে এ বাড়ীর ঠিকানা দিয়েছিল, সারাদিনের মধ্যে সে ফিরলো না।

উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিল জয়ন্ত—তার মুখ দেখেই তা বুঝা যায়।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামবার পর সে বিদায় নিলে, বলে গেল—আবার আসব বন্ধু, তোমার কাজ ঠিক করে এনে দিয়ে যাব।"

(২৪)

নিজের ঘরে বসে নিবিষ্ট মনে ভারতী কতকগুলো কাগজপত্র দেখছিল।

সত্যই দারিত্বপূর্ণ কাজের বোঝা জয়ন্ত তার মাথায় চাপিয়েছে। তাদের সমিতির সভ্য হতে হয়েছে ভারতীকে, শপথ গ্রহণ করতে হয়েছে। জয়ন্ত কলকাতার সমিতির সেক্রেটারী পদে তাকে নিযুক্ত করেছে, নিজে দু একদিন থেকে তাকে কাজ বুঝিয়ে দিয়েছে, তারপর আজই সে চট্টগ্রামে চলে গেছে কোন বিশেষ কাজের ভার নিয়ে।

ভারতীকে সাহায্য করবার জন্য সে রেখে গেছে দুটি তরুণ কিশোরকে, মনোরঞ্জন ও সুধন্বা। কতই বা বয়স তাদের, ভারতীর চেয়ে বয়সে ছোট এই দুটি ছেলের বুদ্ধি জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে ভারতী বিস্মিত হয়ে যায় বড় কম নয়।

একটু আগেই এসেছিল সুধন্বা—মাত্র সতেরো বৎসরের একটী ছেলে। এখনো তার মুখ হতে বালকোচিত সারল্য মিলায়নি, তার চোখে এখনও শিশুর চাঞ্চল্য দেখা যায়।

পরিচয় তার পাওয়া যায়। মেদিনীপুরের কোন একটা গ্রামে তাদের বাড়ী, মা নাই, বাড়ীতে বিমাতার প্রভাব বড় বেশী। মাত্র তের বৎসর বয়সে সুধন্বা গৃহকে ধিক্কার দিয়ে গৃহ ত্যাগ করে এসেছে,—আর সে ফেরেনি। এখানে কোন রকমে এসে পড়েছিল, কিশোর দাদু এই হতভাগ্য বালকটীর ভার নিয়েছিলেন।

তাঁরই হাতে গড়া ছেলে সুধন্বা, বয়সে বালক হলেও মনে সে ইস্পাত—খাঁটি ইস্পাত।

প্রথম দর্শনে ভারতী আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল—"এইটুকু বয়সে তুমি এ সব কাজ পারবে ভাই—?"

কথাটা কেমন বেফাঁসে তার মুখ দিয়ে বার হয়েছিল।

সুধন্বা হেসেছিল, বলেছিল, "অনেক দিন ধরেই এ কাজ করে আসছি দিদি, আজ তো তবু পাকাপোক্ত হয়েছি, তের বছর বয়সে যখন এসেছিলুম তখন বললে হয় তো ঘাবড়ে যেতুম, কিন্তু আজ কেউ এ কথা বললে আমার কি মনে হয় জানো দিদিভাই ?"

সহাস্য মুখে ভারতী জিজ্ঞাসা করেছিল—"গালে চড় বসিয়ে দিতে ?

সুধন্বা উত্তর দিয়েছিল—"না, অতটা সাহস হওয়ার বয়স তো তখন হয়নি—এখন হলেও মনে করি আমায় ঠাট্টা করছে, এ ছাড়া আর কিছু নয়।"

ভারতী সস্নেহ চোখে তার পানে তাকিয়েছিল।

এই কাগজপত্রগুলো দেখতে দেখতে ভারতী শুধু ভাবছিল—এ সব ছেলেরা কি, কি ব্রত এরা নিয়েছে। শাসকের নির্দয় শাসনরজ্জু ছিঁড়বার জন্য এরা অস্থির হয়ে উঠেছে—অধীর হয়ে উঠছে, ভালো-মন্দ কিছুই এরা বিবেচনা করবে না, স্বার্থের পানে তাকাবে না; এরা সামনের দিকে তাকিয়ে শুধু চলেছে, পিছন পানে তাকায় না।

জয়ন্তের উদাত্ত বাণী সে এখনও শুনতে পাচ্ছে, আমরা জানিনে ভারতী যে স্বাধীনতা আমরা চাইতে চাচ্ছি তা আমরা কবে পাব। পাব এই আশা নিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি,—জানি যখন যে দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে—বিপ্লবের দ্বারাই তা সম্ভবপর হয়েছে। বিনা বিপ্লবে বিনা রক্তপাতে কোন দেশ দাঁড়াতে পারে নি, এ দেশের বুকেও তাই ঘটবে। আমরা শুধু জানি আমরা অন্যায় করছিনে, আমরা আজ যা করছি, যে কোন দেশের পরাধীন জনগণ স্বাধীনতা লাভের জন্য ঠিক এই রকমই করেছে। আমরা চাই মুক্তি, চাই এই নাগপাশের বন্ধন ছেদন করতে। এর মধ্যে যে ভুল ভ্রান্তি নেই তা নয়, হয় তো অনেক ভুল অনেক ত্রুটি আছে। এর পর সেই স্বাধীন ভারতের যে ইতিহাস রচিত হবে হয় তো আমাদের ভুল ত্রুটির কথাও তাতে লেখা থাকবে। তা থাক, সেইটাই থাকুক চিরকাল জেগে, ভাবী উত্তর-বংশীয়েরা সেই ত্রুটি লক্ষ্য করে নিজেরা সাবধান হতে পারবে।"

ভারতীর হাতে বিপ্লবের ইতিহাস, সে নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে পড়ে যাচ্ছে।

স্বাধীনতার সংগ্রাম চালিয়েছে ভারতের ছেলেরা, এরা হাসি মুখে সইছে নির্য্যাতন, অত্যাচার, লাঞ্ছনা, যাচ্ছে জেলে সেখানে তিলে তিলে মৃত্যু বরণ করছে। যাচ্ছে সমুদ্র বেষ্টিত দ্বীপ আন্দামানে, যেখান-কার জল হাওয়া তাদের স্বাস্থ্যের উপযোগী নয়, তিলে তিলে সেখানে তাদের জীবনশক্তি ক্ষয় হচ্ছে। দুলছে ফাঁসির দড়িতে, তাও প্রকাশ্য স্থলে নয়, প্রাচীর ঘেরা জেলখানার মধ্যে নির্বিঘ্নে এই হত্যাকাণ্ড সমাধা হয়ে যাচ্ছে।

গেছে সত্যেন, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল,—গেছে কানাই, যতীন, মনো-রঞ্জন; আরও কত—কত ছেলে আত্মাহুতি দিয়েছে এই মরণ যজ্ঞে,—হাসতে হাসতে প্রাণ দিয়ে তারা শহিদ নাম নিয়েছে।

এমনই করে যাবে জয়ন্ত রায়, যাবে সুধন্বা, প্রদ্যুম্ন, সত্যকাম, যাবে মনীশ, আফজল, যাবে বসুধা ভারতী, সুমিত্রা—।

কিন্তু দেশের জন্য যে প্রাণ দেয় সে বীর।

ক্ষুদিরামের গানটা আজও শোনা যায় অন্ধ ভিক্ষুক বিহারী আজও সকালে একতারা বাজিয়ে গেয়েছে—

"একবার বিদায় দাও মা, ঘুরে আসি।"

শুনতে শুনতে আত্মবিস্মৃত হয়ে যায় ভারতী, বর্তমান ছাড়িয়ে

সে চলে যায় অতীত সেই দিনের মধ্যে, সে আর কয় বৎসরের কথাই বা—এই তো সেদিনকার ঘটনা—

ভারতী টেবলের পরে ঝুঁকে পড়ে—

যাবে জয়ন্ত রায়—

হ্যাঁ, জয়ন্ত রায় যাবে।

ভারতীর মুদিত চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই ছবিটা—যেমন ভাবে তার দাদু গেছে। জয়ন্ত তার দলের প্রত্যেককে বড় ভালোবাসে,—তাদের বাঁচাতে সে তার সমস্ত শক্তি দান করবে।

"ভারতী—দিদিমণি, তুমি বাড়ী আছ— ?"

দরজাটা ভেজানো ছিল, বাইরে হতে কে সবলে কড়া নাড়ে।

ক্ষিপ্র হস্তে কাগজপত্র নক্সা সব গুটিয়ে ড্রয়ারের মধ্যে ফেলতে ফেলতে ভারতী জিজ্ঞাসা করে—"কে ?"

"আমি দিদিমণি—"

সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলে যেতে যাকে সামনে দেখা যায়, তাকে দেখে ভারতী আশ্চর্য হয়ে যায় বড় কম নয়,—ডেভিস মধুসূদন এসেছে।

"তুমি—তুমি সুদন দা—"

ভারতী উঠে দাঁড়ায়।

সুদনের পরণে আজ ইউরোপীয়ান পোষাক নাই, যে ধুতি সার্ট তার পরণে আগে থাকতো ঠিক সেই ধুতি সার্ট পরেই এসেছে সে। চেহারা তার অত্যন্ত শীর্ণ, মাথার চুলগুলো রুক্ষ, বিশৃঙ্খল।

অত্যন্ত ম্লান হাসি হাসে সে—

ক্লান্ত কণ্ঠে সে বললে, "হ্যাঁ, তোমার কাছেই ফিরে এলুম দিদিমণি—কথা দেওয়া ছিল তাই। একটু বসতে দেবে দিদিমণি— ?"

"নিশ্চয় নিশ্চয়—"

ভারতী তাড়াতাড়ি একখানা চেয়ার এগিয়ে দিলে, সুদন বসে পড়লো। সে হাঁপাচ্ছিল, দেখে বেশ বুঝা যায় সে বড় ক্লান্ত।

ভারতী জিজ্ঞাসু নেত্রে তার পানে তাকালো, জিজ্ঞাসা করলে, "ব্যাপার কি সুদন দা, এমন সময় তুমি যে ?"

সুদন একটা নিশ্বাস ফেললে, তারপর বললে, "তোমায় সাবধান করতে এসেছি দিদিমণি। অন্ততঃ পক্ষে আমায় এটুকু আজ বিশ্বাস কোর,—আমি সত্যই তোমায় সাবধান করতে চাই।"

ভারতীর মুখখানা কঠিন হয়ে ওঠে—

সে বললে, "কি এমন বিপদ ঘটেছে আমার যে জন্যে তুমি সেই পলাশডাঙ্গা হতে কলকাতায় এসেছো আমায় বাঁচাতে ?"

সুদন মুহূর্তমাত্র চুপ করে থাকে, তারপর ক্লান্ত কণ্ঠে বললে, "সত্যই তোমার বিপদ দিদিমণি। তুমি নাকি কোন একটা গুপ্ত সমিতির সম্পাদিকা হয়েছো, সেখানে আজ সন্ধ্যায় নাকি জোর মিটিং আছে। পুলিস আগেই সন্ধান পেয়েছে, আজ সন্ধ্যায় সেখানে হানা দিয়ে তোমাদের সকলকে গ্রেপ্তার করবে তারা ঠিক করেছে।"

"পুলিস হানা দেবে—"

ভারতী হাসলো—"ভয়ানক কর্মতৎপর হয়ে উঠেছে তো বাংলার পুলিস— ?"

সুদন অধীর হয়ে ওঠে—"না না, বিপদের গুরুত্ব তুমি বুঝছো না দিদিমণি, তাই হেসে উড়িয়ে দিতে চাচ্ছো। আজকাল যা কাণ্ড চলছে চারদিকে, বিশ্বাস কাউকেই তো নেই।"

স্থির কণ্ঠে ভারতী জিজ্ঞাসা করলে, "কিন্তু তুমি এসব কথা কি করে জানতে পারলে সুদনদা ? বর্তমানের পুলিসবাহিনী এমন গোপনীয় খবর সংগ্রহ করে তা যেমন কেউ জানতে পারে না, তেমনই তারা যে হঠাৎ কোথায় কখন অতর্কিত আক্রমণ চালাবে তাও জনমানব জানতে পারে না। আমি তাই ভাবছি সুদন দা, কণ্ট্রাক্টার হয়ে তুমি পুলিসের গোপন খবর সংগ্রহ করলে কি করে? এ দেশের পুলিসের ওপর বায় এমন লোক তো আজও আমার চোখে পড়েনি তাই না অবাক হয়ে যাচ্ছি।"

সুদন হাসে—সেই ক্লান্ত হাসি।

বললে, "যে করেই হোক আমি জানতে পেরেছি দিদিমণি। যদি তোমার নামটা না শুনতে পেতুম তাহলে আমার এ রকম দেহ নিয়ে এ রকম ভাবে ছুটে আসবার কোন কারণ ছিল না। জানি নে—কিসের ছলনায় একবারই ভুলেছিলুম, বিশ্বাসঘাতকতাও করেছি, কিন্তু আজ, বিশ্বাস কর দিদিমণি তার কঠোর প্রায়শ্চিত্ত সুরু হয়েছে; যে কদিন দিন বাঁচব আমায় এই প্রায়শ্চিত্ত করে যেতেই হবে। সে কথা এখন থাক, মোট কথাটাই বলি, তোমাকে এই ব্যাপারের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে দেখে, আমি চলে এসেছি। আজ আমি কায়মনে প্রার্থনা করি তুমি তোমার বাবা যেখানেই থাক যেন স্বচ্ছন্দে শান্তিতে থাকতে পাও।"

ভারতী আস্তে আস্তে তার চেয়ারের পাশে এসে দাঁড়ায়, স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে, "আমি তা জানি সুদনদা, তুমি একদিন যত দোষই করে থাকো, তুমি সেদিনও যেমন আমায় স্নেহ করতে, ভালোবাসতে, আজও তেমনই কর। মনে কর আমি কতদিন তোমায় বিদ্রূপ করেছি, তুমি হাসিমুখে সব কিছুই উপেক্ষা করে গেছ। আজ তুমি ধর্মত্যাগ কর, প্রচুর উন্নতি লাভ কর—তবু আমাদের সত্যই কোন অনিষ্ট হোক, এ কামনা করতে পারো না। আজ তোমার ছোটবোনের মতই তোমায় একটিমাত্র কথা জিজ্ঞাসা করি সুদনদা, আমি যে এখানকার বিপ্লবী দলের সেক্রেটারী হয়েছি, ওদের সমস্ত কাজের ভার আমি নিয়েছি, আজ আমাদের গোপনীয় অধিবেশন হবে, এ সব খবর তুমি পেলে কোথায়, কে তোমাকে এ কথা বললে—শুধু সেই কথাটা আমায় বল।"

সুদন বোবা চোখ মেলে কেবল ভারতীর দিকে তাকায়, কথা বলতে পারে না।

ভারতী তার হাতের উপর হাত রাখে, সে স্পর্শে সুদনের সমস্ত দেহখানা একবার কেঁপে ওঠে, তার মুখখানা বিবর্ণ হয়ে যায়, ইচ্ছা সত্ত্বেও সে হাতখানা টেনে নিতে পারে না।

মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে ভারতী ডাকে—"বল সুদনদা—"

চৈতন্য ফিরে আসে সুদনের, হাতখানাকে টেনে নিলে, বললে, "আমি সে কথা বলতে পারবো না দিদি—"

দুই হাতে মাথাটা চেপে ধরে সে নিঝুম হয়ে কতক্ষণ বসে থাকে—

"এক গ্লাস জল দিতে পারো দিদিমণি, বড় পিপাসা—"

ভারতী নিজের গ্লাসে জল এনে টেবলের উপর রাখলে।

তৃষ্ণার্ত সুদন এক নিশ্বাসে সব জলটুকু খেয়ে ফেললে।

ভারতী জিজ্ঞাসা করলে, "আর জল দেব— ?"

সুদন উত্তর দিলে—"না—। কিন্তু তুমি একি করলে দিদিমণি, আমি খৃষ্টান জেনেও এই গ্লাসে আমায় জল খেতে দিলে, তোমাদের গোঁড়ামীতে বাধবে যে।"

ভারতী হাসলো—এই হাসিই সুদনের কথার উত্তর দিলে, সুদন সঙ্কুচিত হয়ে উঠলো।

প্লাসটা সরিয়ে রেখে ভারতী বললে, "যদি সে কথা মনে করে থাকো সুদনদা; জেনো—মস্ত বড় ভুল করেছো। আসল কথা—ধর্মটাই একটা সংস্কার, জাতি যদি বলতে হয়—বলব মানুষ একটা জাতি, তা ছাড়া হিন্দু খৃষ্টান মুসলমান সব এই একটারই অন্তর্ভুক্ত। সংস্কার বশে আমরা এক একটা আবরণ টেনে নেই গায়ের উপরে সেই সংস্কার বশেই নিয়ম মেনে চলি।"

সন্দিগ্ধ সুদন বললে, "কিন্তু একদিন এই ধর্মান্তর গ্রহণ নিয়েই যা আমায় বিদ্রূপ করেছো দিদিমণি—

ভারতী উত্তর দিলে "করেছি কারণ সত্যি তুমি সে ধর্ম গ্রহণ করনি সুদন দা, স্বার্থের জন্যেই ওই খোলসটা টেনে পরেছো। আমি আর একদিন বলেছিলুম—আজও বলছি মনে প্রাণে তুমি ধর্মত্যাগী নও সুদন দা, মন তোমার আজও ঘুরে মরছে আমাদেরই আশেপাশে, আজও সংস্কার বশে মনটা তোমার নুয়ে পড়ে আমাদেরই মন্দিরের দরজায়—বল, আমার কথা ঠিক কিনা।"

আবার সেই বোবার মত চোখ মেলে সুদন ভারতীর পানে তাকিয়ে থাকে।

(২৫)

ভারতী কথার মোড় ফিরায়—

"তোমার কি অসুখ হয়েছে সুদন দা, বিশ্রী চেহারা হয়ে গেছে, দেখে হঠাৎ চেনা যায় না।"

"অসুখ—"

সুদন এবার হাসে, সেই টেনে আনা ক্লান্ত হাসি। "অসুখ নয় দিদিমণি, মার খেয়ে এখানে হাঁসপাতালে পড়ে ছিলুম, এখনও সম্পূর্ণ ভালো হতে পারিনি। আমি পলাশডাঙ্গা হতে আসিনি, এসেছি এখানকার মেডিকেল কলেজ হতে। আগামী কাল আমার মুক্তিলাভের দিন, আমি আজই পালিয়ে এসেছি।

বিস্মিত হয়ে ভারতী জিজ্ঞাসা করলে "মার খেয়ে হাঁসপাতালে গিয়েছিলে, কে মারলে—কেন মারলে?

সুদন বলে যায় তার কাহিনী—

রতনমণি দত্ত চলে আসবার পর কিছুদিন পর্যন্ত গ্রামের লোকেরা শান্তভাবেই দিন কাটিয়েছে, কলে তারা কাজ করেছে। কারখানায় প্রচুর জিনিস উৎপাদন করেছে। কিন্তু হঠাৎ একদিন জ্বলে উঠলো বিদ্রোহের আগুন। সাহেবরা তাদের মজুরীর আবেদন গ্রাহ্য করেন নি, দু একজনকে তাঁরা বরখাস্তও করেছেন, মারধরও চলেছে। যারা ছিল কৃষক তারা শ্রমিক হলেও তারা যে মানুষ সেটা ভুলে যায়নি। একদিন তারা কারখানায় দিল আগুন লাগিয়ে, তেলের গুদামে দিলে আগুন, সাহেবদের বাংলো পুড়ে ছাই হয়ে গেল। তারা স্পষ্টই বললে তারা যা পাওয়ার জন্য পিতৃপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করে খৃষ্টান হয়েছিল তার কিছুই পেলে না, উপরন্তু সাহেবরা তাদের সঙ্গে পোষা কুকুরের মত ব্যবহার করছে। তারা ক্ষেপে উঠলো, আইন কানুন তারা বুঝলো না, মানলো না। তাদের সকল ভুল ভেঙ্গে গেছে, তারা যে ভিখারী সেই ভিখারীই থেকে গেছে। উপরন্তু তারা ধর্মও হারালো—জাত গেল মান গেল, অথচ পেটও তাদের ভরলো না। তাদের আত্মীয় স্বজনেরা তাদের ঘৃণা করে, তাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় পর্যন্ত করে না।

তারা দল বেঁধে ফাদারের কাছে গিয়েছিল, কিন্তু গেটের শান্ত্রী সঙ্গীন উঁচু করে তাদের তাড়িয়েছে।

উত্তেজিত জনতা চালিয়েছে আক্রমণ—

ডেভিডস মধুসুদন সাহেবদের আদেশে জনতাকে শান্ত করতে গিয়েছিল, কিন্তু জনতা তাকে দেখেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল, তাদের লাঠির আঘাতে সে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিল। জ্ঞান হয়ে সে দেখেছে সে মেডিকেল কলেজে পড়ে আছে। সে শুনেছে শেষ পর্যন্ত পুলিস এসে জনতা ছত্রভঙ্গ করেছে, গুলি পর্যন্ত চলেছে এবং তাতে অনেক লোক হতাহত হয়েছে। অনেক লোক গ্রেপ্তার হয়েছে এবং আরও বহু লোক গ্রেপ্তার হওয়ার ভয়ে গ্রাম হতে পালিয়েছে।

কেবল একখানা গ্রামের লোকই নয়, আশপাশের অনেক গ্রামের অধিবাসী আক্রমণকারীদের সংখ্যা বাড়িয়েছিল।

সুদন সব শেষে বলে, "অন্যায় যে এরা বিশেষ রকম করেছে তা নয়। সত্যই তাদের যা দেবার কথা ছিল তার কিছুই তাদের দেওয়া হয়নি, খেপে ওঠাটা তাদের পক্ষে আশ্চর্য নয়, বরং না ক্ষেপাটাই হতো অস্বাভাবিক।"

ভারতী অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে, তার সেই গম্ভীর মুখের পানে তাকিয়ে সুদন কথা বলতে সাহস পায় না।

অনেকক্ষণ পরে ভারতী সুদনের পানে তাকায়—

"কাল তুমি ছাড়া পাবে, আজ পালালে কেন সুদন দা?"

সুদন উত্তর দিলে, "মামলা চলছে যে—সাহেবরা জোর মামলা ঠুকেছেন। তাঁদের গবর্ণমেন্ট আছে, টাকা আছে, উকিল ব্যারিস্টার প্রচুর পাবেন, অনেক সাক্ষীও মিলবে, কিন্তু যারা আজ হাজতে পচে মরছে তাদের কেউ নেই। টাকা পয়সা নেই কাজেই পাবে না উকিল ব্যারিস্টার, পাবে না সাক্ষী সাবুদ। আমি আবার গবর্ণমেন্ট পক্ষের জোরালো সাক্ষী কিনা, তাই আমাকেই বিশেষ দরকার যে। কাল সাহেব নিজে আসবেন আমায় নিয়ে যেতে। বল কি, আমি ওদের নিজের সাক্ষী, হাঁসপাতাল কর্তৃপক্ষ আদরে জামাই আদরে রেখেছিল যে—কর্তার হাতে হাতে সমর্পণ করে দিয়ে তবে না হতো ওদের ছুটি।"

সে হাঁসতে থাকে।

ভারতী শুষ্ক কণ্ঠে কেবল বললে, "বুঝেছি।"

সুদন বললে, "না, কিছুই বোঝনি দিদিমণি, শুধু বোঝার ভানই করছো মাত্র। তুমি জানো না, এই উপলক্ষ্য করে পুরানো যা ভাবার খুঁচিয়ে তুলছে কোম্পানীর লোকেরা,—তোমাদের ধরে আবার টানাটানি করবার ইচ্ছা তাদের। তোমার বাবা এই সব প্রজাদের পক্ষে দাঁড়িয়ে বার বার গবর্ণমেন্টকে উত্যক্ত করেছেন—সমস্ত ছেড়ে আজ ভিখারীর মত এখানে চলে এলেও ওদের সতর্ক দৃষ্টি হতে তোমরা আজও মুক্ত নও। আজও যেখানে যাই হোক, তোমার বাবাকে তারা সন্দেহ করে। তোমাদের সম্পত্তির যে অংশ গবর্ণমেন্ট বাজেয়াপ্ত করেছিল—"

ভারতী বললে, "সে অংশ ওরা ফিরে দেয়নি সুদন দা। শুনেছি ওটা বিক্রয় হয়ে যাবে, ওর দরুণ টাকা আমাদের দেওয়া হবে।"

সুদন হাসে—"হ্যাঁ, জোর যার মুল্লুক তার। কিন্তু অপেক্ষা কর দিদিমণি, তোমার সম্পত্তি আবার তোমাকেই ফিরে দিতে হবে,

ও সম্পত্তি কেউ কিনতে পারবে না—সবাই জানে যে নেবে তার মাথা থাকবে না। যাক এবার তোমাদের কথাই বলি। জানো না বোধ হয় আমাদের ওখানকার রামময় বোসের ছেলে সমীর বোসকে এই এনকোয়ারীর ভার দেওয়া হয়েছে, আর সে অনেক কিছু প্রমাণও সংগ্রহ করেছে তোমার বিরুদ্ধে।"

ভারতী এবার হাসলো,—বললে, "কি আবল তাবল বকছো সুদন দা, দেখছি তোমার মাথা আজও ঠিক হয়নি।"

সুদন দৃঢ়কণ্ঠে বললে, "মাথা ঠিকই আছে দিদি, ঠিক কথাই বলছি, তবে গুছিয়ে বলতে পারছি নে এই যা দুঃখ। মোটের উপর একথা বলছি পুলিস এবার তোমাদের বিশেষভাবে দমন করবার চেষ্টা করছে, সমীর বোস এ ভার নিয়েছে, আর তোমার সম্পর্কে অনেক খবর সে পেয়েছে। জয়ন্ত রায় তোমাদের লিডার, সে তোমাদের পরিচালনা করছে, তাকেই ধরবার উপলক্ষ্য হবে তোমরা।"

বলতে বলতে সে পকেট হতে একখানা ছোট আকারের নোটবুক বার করলে, বললে, "এই দেখ, সমীর বোসের এই নোটবুকখানা কি করে আমার বেডে পড়ে গিয়েছিল, সে প্রত্যহ আমার দেখতে আসতো কিনা। আগেই বলেছি তো, হাসপাতালে আমার খাতির ছিল কত—অর্থাৎ আমি যেন বেঁচে অন্ততঃপক্ষে মামলা চলা পর্যন্ত ওদেরই হাতে থাকি। আমি এখানা পড়ে সব জানার পর সে আজ সকালে খোঁজ নিতে এসেছিল—অসাবধানতায় তার কিছু এখানে পড়ে গেছে কিনা। আজও সে যাবে কিন্তু তার যাওয়ার আগেই আমি সরে পড়েছি তোমায় অন্ততঃপক্ষে সাবধান করে দেওয়ার জন্যে। এই নোটবুকখানা তুমি পড়ে দেখ, সব জানতে পারবে।"

ব্যগ্রভাবে ভারতী নোটবুকখানা নিলে।

পাতার পর পাতা সে চোখ বুলিয়ে যায়।

হ্যাঁ, অনেক কিছু খবর সংগ্রহ করেছে সমীর বোস, সমিতির কবে কোথায় কোন অধিবেশন হয়েছে তার উল্লেখও এতে পাওয়া যায়। প্রত্যেকের নাম সে জানে, বাড়ীর খবরও রাখে।"

ভারতী যখন মুখ তুললো, তার মুখখানা তখন এমন বিবর্ণ হয়ে গেছে যা আর কখনও দেখা যায়নি।

"এখানা আমায় দাও সুদন—"

অনুনয়ের কণ্ঠ ভারতীর।

সুদন বললে, "তোমায় দেখানোর জন্যই এনেছি। সমীর বোসের মুখের অবস্থা যা দেখলাম—হয়তো তাকেই ফিরিয়ে দিতুম, কিন্তু তোমার নাম দেখে আমি দেইনি। কিন্তু—সত্যই কি তুমি রাজদ্রোহী সন্ত্রাসবাদীর দলে যোগ দিয়েছো দিদিমণি?"

ভারতী শুষ্ক হাসি হাসে—"তুমি বিশ্বাস কর?"

সুদন বললে, "ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি নে।"

ভারতী বললে, "কিন্তু ঠিকই বিশ্বাস কর আমি ওদের দলে যোগ দিয়েছি। কেন দিয়েছি তা না বললেও তুমি নিশ্চয়ই বুঝবে সুদন দা।" ভারতী হাসতে থাকে।

সুদন মুখখানা নত করে খানিকক্ষণ বসে থাকে, তারপর মুখ তোলে,—বললে, "কিন্তু আজকাল ওরা যা দমননীতি চালিয়েছে তাতে রীতিমত ভয়ই হয় দিদিমণি। যাক, অন্ততঃ পক্ষে আজকের অভিযান ওদের ব্যর্থ করে দাও, তোমাদের সম্মেলনটা না হয় স্থগিতই থাক।"

ভারতী মাথা নাড়ে—"তা হয় না সুদন দা,—"

সুদন শক্ত হয়ে ওঠে, বললে, "কেন হবে না? জেনে শুনে কতগুলি ছেলেকে তুমি নিশ্চিত বিপদের মুখে ঠেলে দেবে তা জানো? কি দরকার এমন করে ধরা পড়ে গুলিতে মরে সমস্ত শক্তি ক্ষয় করবার—এ সাধনার ফল দশ বছর পেছিয়ে দেওয়ার? বুদ্ধি তোমার মোটেই নেই দিদিমণি, জেনে রেখো—মরাটাই মানুষের শেষ নয়, মরলেই তো পেছিয়ে গেল, পরাজয় ওইখানেই হয়ে গেল। তোমরা যাই বল—স্বেচ্ছামৃত্যুকে আমি কোনদিন কাম্য বলে নেব না, জয়ের সম্মানও তাদের দেব না যারা এমনই ভাবে দেশের জাতীয় উন্নতির পথ বন্ধ করবে।"

বিস্মিত হয়ে যায় ভারতী, কুইসলিং সুদনের মুখে আজ এ কথা শুনে সত্যই সে আশ্চর্য হয়ে যায়। এ যেন ভূতের মুখে রাম নাম। একদিন যে বৃটিশ শক্তির আড়ালে থেকে মহা গর্বে বুক ফুলিয়ে চলেছে, সে আজ সে ইংরাজেরই বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, এও কি সত্য?

ভারতী নিজেকে সামলে নিলে—

"ঠিক কথা বলেছো সুদন দা, এখানকার ভার আমার পরে, জেনে শুনে এতগুলি ছেলেকে আমি পুলিসের হাতে দেব না। তুমি বসো, এখানেই থাকো, আমি দরজায় চাবি দিয়ে এক ঘন্টার জন্যে বাইরে যাচ্ছি, অন্য লোক দূরে থাক, বাবাও তোমার আসার কথা জানতে পারবেন না।"

সে উঠলো। ক্রমশ

'কৃষ্ণচরিত্রের' গোড়ার কথা

শ্রীকালিদাস রায়

ইউরোপীয় তর্কশাস্ত্র, সমাজতত্ত্ব, দর্শন ও নীতিশাস্ত্র পাঠের ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গলার শিক্ষিত সমাজে একটা Rationalism-এর তরঙ্গ আসিয়াছিল। অন্ধ-বিশ্বাস, গতানুগতিকতা, আপ্তবাক্যে গভীর প্রত্যয় ইত্যাদিতে এই তরঙ্গ ঘোরতর আঘাত দান করে। তাহার ফলে স্বদেশের শাস্ত্র, সংস্কার, লোকাচার, পুরাণ, সাহিত্য, ধর্ম সমস্তই যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া লইবার একটা চেষ্টা দেখা যায়। যাহারা অধীর অশান্ত অসহিষ্ণু প্রকৃতির লোক তাহারা দেশের এ সমস্ত বর্জন করিয়া বিদ্রোহী হইল। যাঁহারা অপেক্ষাকৃত শান্ত প্রকৃতির লোক তাঁহারা ঐ সমস্তের যতটুকু যুক্তিসহ—যতটুকু ইউরোপীয় ন্যায়সত্যাদর্শের সঙ্গে সুসঙ্গত তাহাই লইয়া স্বতন্ত্র বিশ্বৎ সমাজ গঠন করিলেন। স্বদেশের সর্বাঙ্গীণ সংস্কৃতি লইয়া তাঁহারা মাথা ঘামাইলেন না। আর এক শ্রেণীর শিক্ষিত লোক যাঁহাদের স্বধর্মনিষ্ঠা গভীর, স্বদেশপ্রীতি অসামান্য, জাতীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য উৎকণ্ঠা অতিপ্রখর—তাঁহারা আরও ধীরতা, সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়ের সহিত আমাদের সংস্কৃতির সর্বাঙ্গীণ আলোচনা করিয়া তন্নতন্ন সন্ধান করিয়া দেখিলেন কোথায় কোথায় সার্বজনীন সত্য ও জাতীয় সম্পদ যুগ-বিপর্যয়ের ফলে সঞ্চিত জঞ্জাল জালের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। ইঁহারাও ইউরোপীয় মনীষীদের শিষ্য, ইঁহাদেরও আয়ুধ ও উপকরণ যুক্তিবিচার ও সংস্কারমুক্ত বুদ্ধির প্রয়োগ। ইঁহারা মনে করেন নাই—যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু শ্রদ্ধেয় যাহা কিছু অনুকরণীয় সবই ইউরোপের পণ্ডিতদের একচেটিয়া—আমাদের দেশের ঋষি, জ্ঞানী, স্রষ্টা ও মনীষীরা কিছুই দিতে পারেন নাই। ইঁহারা স্বদেশভক্ত ও স্বধর্মনিষ্ঠ বলিয়া কঠোর শ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে আমাদের দেশের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে সত্যের সন্ধান করিয়াছেন। ইঁহাদের অগ্রগণ্য ছিলেন ভূদেবের পর বঙ্কিমচন্দ্র। এই কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থখানি তাঁহার সেই সাধনার একটি অবদান।

কৃষ্ণচরিত্র রচনার অনেকগুলি কারণ আছে। একটি কারণ, তাঁহার মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে—মানবজাতির আদর্শ মহাপুরুষ কে? ইউরোপীয় গুরুদের প্রদত্ত সন্ধানসূত্র ধরিয়াই তিনি অগ্রসর হইয়াছেন আদর্শ মহাপুরুষের আবিষ্কারে। একে একে জগতের সকল মহাপুরুষের জীবন আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন—মানব সমাজের স্বাভাবিক বিচিত্র বহু শাখা জীবনের সর্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ হইতে পারে এমন মহাপুরুষ তাঁহারা কেহই নহেন। তাঁহারা মানব-জীবনের এক একটি ধারার আদর্শ মাত্র। তিনি শেষে মহাভারত পাঠ করিয়া দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র মহাপুরুষ যিনি সর্বদেশের সর্বযুগের সর্বস্তরের মানবজীবনের অনু-করণীয় আদর্শ হইতে পারেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের জীবন অবলম্বন করিয়া বহুকাল ধরিয়া এত অলীক কল্পনা-জল্পনা, এত গল্প উপন্যাস রচিত হইয়া আমাদের বিবিধ পুরাণ গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত সংযোজিত ও অনুস্যূত হইয়াছে যে আসল কৃষ্ণ কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। বঙ্কিম সেই আসল শ্রীকৃষ্ণকে সর্ববিধ কল্পনাজাল ও জল্পনা জাল তাঁহার অমোঘ শাণিত যুক্তির আয়ুধে ছিন্ন করিয়া তাঁহার স্বকীয় আদর্শ রূপে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন এই গ্রন্থে।

বঙ্কিম শ্রীকৃষ্ণকে কেবল সর্বাঙ্গসুন্দর অদ্বিতীয় মহা-মানব বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই। তিনি তাঁহাকে ভগবানের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন—ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যদি ভগবানের মানবরূপ উপাস্য হয়—তবে তিনিই মানুষের উপাস্য। বঙ্কিমচন্দ্র এদেশে গীতাপ্রবক্তা শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা পদ্ধতির প্রবর্তক।

এখন দেখা যাক তিনি যে ধর্মের প্রবর্তক তাহা এদেশে চলিয়াছে কিনা। বঙ্কিমের প্রবর্তিত ধর্ম এদেশে চলে নাই। গীতা যে হিন্দুদের প্রধান ধর্মশাস্ত্র—তাহা শিক্ষিত হিন্দুরা স্বীকার করিয়া লইয়াছে—ইহাতে বঙ্কিমের কৃতিত্ব বিশেষ কিছু নাই। শিক্ষিত হিন্দুর পক্ষে বেদ ধর্মশাস্ত্র নয়। উপনিষদ্, বেদান্ত ও গীতাকেই ধর্মশাস্ত্র বলিয়া সে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। এই গীতা মহাভারতের অন্তর্গত, ব্যাস-দেবের রচিত বলিয়াই অনেকে মনে করেন। আবার অনেকেই শ্রীকৃষ্ণেরই বাণী ব্যাসদেবের দ্বারা ব্যাখ্যাত বলিয়া মনে করেন। শিক্ষিত হিন্দু গীতাকে শিরোধার্য করিয়াছে—গীতার শ্রীকৃষ্ণকে মহামানব বলিয়া স্বীকার করিয়াছে—ভগবানের অবতারও মনে করে—কিন্তু এই শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করে না। গীতার বাণী বা শ্রীকৃষ্ণের জীবনাদর্শ অনুসারে তাহারা জাতীয় জীবন গঠন করিতেও চেষ্টা করে নাই। বৃন্দাবনের যে দ্বিভুজ মুরলীধর গোপীজন বল্লভকে বঙ্কিম

বিদায় দিয়াছেন—বহু বাঙ্গালী আজিও তাঁহারই উপাসক। এমনকি এই দ্বিভুজ মুরলীধরের অবতার বলিয়া বাঙ্গালী যাঁহাকে মনে করে আজিও বাঙ্গালী সেই শ্রীচৈন্যেরই উপাসনা করে। না বুঝিয়া বহুলোক প্রত্যহ গীতাপাঠ করে—গীতাগ্রন্থেরও পূজা করে কিন্তু গীতার প্রবক্তার পূজন করে না। গীতা শিখদের গ্রন্থসাহেবের মতই পূজ্য। নির্গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণ যেন এযুগে গ্রন্থরূপ ধরিয়াছেন।

বর্তমান যুগে নৈতিক আদর্শেরও পরিবর্তন হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কোন মানুষ-সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক না হইলে মহামানব বলিয়া গণ্য হইতেন না। বর্তমান যুগে মানুষের বিচারে তাঁহার মানবিক দুর্বলতাগুলিকে উপেক্ষা করা হয়—এমনকি মহামানবের চরিত্রেও মানবিক দুর্বলতা থাকিলেও তাঁহার মহামানবত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না। যুগন্ধররা বলেন—ভগবানও যদি মানব দেহ ধারণ করেন—তবু তাঁহার রক্ত-মাংসগত অপূর্ণতা থাকিবেই। মানুষ হওয়ার অর্থই মানুষের সবলতা দুর্বলতা দুই-এরই অধিকারী হওয়া। ইঁহারা বলিবেন—"বঙ্কিমচন্দ্রের এত শ্রমস্বীকারের প্রয়োজন ছিল না—মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত (?) চ্যুতিগুটী ভুল ভ্রান্তি থাকা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণ মহামানব ভগবান নহেন। তাঁহার উপাসনা করি বা না করি একথা স্বীকার করিতে আমাদের দ্বিধা নাই। গীতা যদি ধর্মজগতের চরম কথা হয়—তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ যে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রচারক একথা মানিতে আমাদের দ্বিধা নাই। মহাপুরুষের জীবনের প্রভাব বেশীদিন স্থায়ী হয় না—তাঁহার বাণীই চিরস্থায়ী।"

বঙ্কিম যাঁহাকে মহাভারতের দ্বিতীয় স্তরের লেখক বলিয়াছেন—এ-যুগের শিক্ষিত লোকদের সঙ্গে তাঁহার কোন মত বিরোধ নাই। ইঁহারা বলিবেন—শঠে শাঠ্যং ত ধর্ম। অতিপ্রাকৃত ব্যাপারগুলো যে কাব্যের অলঙ্কার মাত্র—সেগুলো যে অলীক কল্পনা মাত্র তাহা বুঝাইবার জন্য কোন যুক্তির প্রয়োজন নাই।

মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণের মুখে একস্থানে আছে—শত্রুসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে তাহাদিগকে কূটযুদ্ধে বিনাশ করিবে। মহাত্মা সুরগণ কূটযুদ্ধের অনুষ্ঠান করিয়াই অসুরগণকে নিহত করিয়াছিলেন—তাঁহাদের অনুকরণ করা সকলের কর্তব্য। একালের লোকে বলিবে শ্রীকৃষ্ণ তো ঠিকই বলিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র একথাকে কৃষ্ণদ্বেষী লেখকদের দ্বারা প্রক্ষিপ্তই বলিয়াছেন কেন?

বঙ্কিম বলিয়াছেন মনের ত্রিবিধ বৃত্তির সমভাবে উৎকর্ষই মহাপুরুষত্বের লক্ষণ। তিনি তাঁহার গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের মুখের কথা উৎকলন করিয়াছেন একস্থলে—"শরীরের ন্যায় আত্মারও তিনটি গুণ আছে। ঐ তিন গুণের নাম সত্ত্ব রজঃ তমঃ, ঐ গুণত্রয়ের সমভাবে অবস্থান ঘটিলে আত্মার স্বাস্থ্য লাভ হয়।" এই কথারই পোষকতা করিবেন ইঁহারা।

ধর্মরাজ্য স্থাপনের কথাটায় এ-যুগের লোকের প্রতীতি জন্মে না। দুরাচার রাজন্যবৃন্দ নিহত হইল—সেই সঙ্গে নিরীহ সদাচারী লোকেও তো নিহত হইল। পাণ্ডব পক্ষেও তো কেহ বাঁচিল না—তাহারা ধর্মপক্ষে যোগ দিয়াছিল—তাহারা নিশ্চয়ই দুরাচার নয়। তাহা ছাড়া লক্ষ লক্ষ সৈনিক—কেহ হয়ত রাজভয়ে কেহ পেটের দায়ে উভয় পক্ষে যোগ দিয়াছিল—তাহারাও ধ্বংস পাইল। দেশের ক্ষাত্রশক্তির সমূলে ধ্বংস সাধনই কি ধর্মরাজ্য স্থাপন? দুর্বৃত্তরা ধ্বংস পাইল—তাহাতে পাপ কি দেশ হইতে বিদূরিত হইল? কবিবর নবীনচন্দ্র একটা কাল্পনিক ধর্মরাজ্যের খুব জয়গান করিয়াছেন কিন্তু এই ধর্মরাজ্যের পরিচয় কোন পুরাণে কোন ইতিহাসে আমরা পাইব? বরং আমাদের মনে করিবার কারণ আছে দেশের ক্ষাত্রশক্তি ধ্বংস পাওয়ায় অনার্যগণ, বর্বরগণ ও বিদেশীয় আক্রমণকারীরা সহজে ভারতবর্ষে অধিকার লাভ করিল? ইহাই কি ধর্মরাজ্য?

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—কেবল ধার্মিককে রাজা করিলেই ধর্মরাজ্য সংস্থাপিত হইল না। আজ ধার্মিক যুধিষ্ঠির রাজা ধর্মাত্মা—কাল তাঁহার উত্তরাধিকারী পাপাত্মা হইতে পারেন। এইজন্য ধর্মরাজ্য সংস্থাপন করিয়া তাহার রক্ষার জন্য ধর্মানুমত ব্যবস্থা বিধিবন্ধ করাও চাই। রণজয় রাজ্য স্থাপনের প্রথম কার্য মাত্র। তাহার শাসন জন্য বিধিব্যবস্থাই প্রধানকার্য। কৃষ্ণ সেই কার্যে ভীষ্মকে নিযুক্ত করিলেন। অর্থাৎ তিনি বলিতে চাহিয়াছেন—শান্তি পর্বই ধর্ম রাজ্যের বিধিব্যবস্থা। ইহা ছাড়া, ধর্মানুশাসনের জন্য গীতা আগেই প্রচারিত হইয়াছে। বঙ্কিমের মতে শান্তি পর্ব ও গীতাই ধর্মরাজ্যের প্রধান ভিত্তি। এই ভিত্তির উপর কখনও কোন আদর্শ রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল কিনা আমরা জানি না। অথবা ঐ ভিত্তিস্থাপন পর্যন্তই হইল—ভবিষ্যতে একদিন গড়িয়া উঠিবে এই ভরসা লইয়া শ্রীকৃষ্ণ বিদায় লইলেন। যদি সত্যই ধর্মরাজ্য স্থাপিত হইয়া থাকে—তবে তাহার ভৌগোলিক পরিধি কতদূর এবং কতদিন তাহা স্থায়ী হইয়াছিল—এ-যুগের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এ প্রশ্ন করিবেই।

মুখোস

শিবদাস চক্রবর্তী

ছুটির দিন। মূল্যবান অবসরের ঘণ্টা দেড়েক ধরে রেশনের দোকানে ধর্ণা দিয়ে আধ-পেটা বরাদ্দের খাদ্য দুটো থলেয় ভরে সুনীল আপন মনে বাড়ী ফিরছিলো। পা যতটুকু চলে, মন চলে তার চেয়ে জোরে। মাথায় একটা গল্পের প্লট এসেছে; তাকে এক্ষুণি ভাষার বাঁধনে বেঁধে রাখতে হবে। নইলে পালিয়ে যেতে পারে। তা' ছাড়া কয়েকটি গল্প পত্রিকায় পাঠানো দরকার; প্রকাশ হলে দু' এক জায়গা থেকে কিছু সম্মানী মিললেও মিলতে পারে।

আগেও তার দু' একটি গল্প কাগজে বেরিয়েছে। স্বনামধন্য পত্রিকায় বছর খানেক বিচারাধীন থেকে ফেরৎ এলেও সে নিরস্ত হয়নি; অধ্যবসায় অবশ্য তাকে খানিকটা জয় এনেও দিয়েছে। তবে টাকা? মেলে ভালো, না মিললেও নিরাশ হবার কারণ নেই। কারণ সাহিত্যের মূল্য বিচার প্যারিশ্রমিকের অনুপাতে নয়, মহাকালের হাতে।

বাড়ী এসে হাতের বোঝা নামিয়ে সুনীল খাতাকলম নিয়ে বসলো। এবার একটা কড়া গল্প লিখতে হবে। মামুলী প্রেমের গল্পও নয়, বস্তি-জীবনের কৃত্রিম রূপায়ণও নয়। সমাজের দেহের মাঝে যে ভদ্রবেশী বর্বরতা প্রশ্রয় পেয়ে পুষ্ট হয়ে উঠেছে তার মুখোস খুলে দিতে হবে লোকচক্ষুর সামনে। এই কঠিন কর্তব্য আজ আহ্বান জানাচ্ছে সাহিত্যিকদের।

সহসা দরজার কড়াটা নড়ে উঠলো। সুনীলের মনে বিরক্তি জাগে। এমন দুর্লভ অবসরটুকু আবার কে নষ্ট করতে এলো।

আবার কড়া নাড়ার শব্দ। বাধ্য হয়ে উঠে এসে সুনীলকে দরজা কবাট খুলতে হোলো।

—নমস্কার।

—নমস্কার।

—কাকে চান আপনারা?

—সুনীলবাবু এখানে থাকেন? সাহিত্যিক সুনীল দত্ত?

—আজ্ঞে হাঁ।

—অনুগ্রহ করে যদি একটু তাঁকে ডেকে দেন।

সুনীলের মনের কোণে একটু অহমিকার তাপ জমে ওঠে। তা হলে তার নামটা সাধারণের কাছে পরিচিত হয়ে উঠেছে।

—আজ্ঞে, আমার নামই সুনীল দত্ত। সবিনয়ে সুনীল জবাব দিলো।

—ওঃ! সরি, নমস্কার। দেখুন, আমরা আপনার কাছেই এসেছি।

সুনীল সসম্ভ্রমে আগন্তুকদের ঘরের মাঝে এনে বসালো।

—আমরা কয়েকজন তরুণ লেখক মিলে একটা মাসিক পত্রিকা বের করছি। প্রথম সংখ্যা বেরিয়েছে। আপনি একজন উদীয়মান সাহিত্যিক। আপনার লেখা আমরা পড়েছি; আপনার লেখার আমরা য়্যাডমায়ারার। সেইজন্যে আশা করি আপনিও লেখা দিয়ে আমাদের সহযোগিতা করবেন।

—ইনিই হচ্ছেন আমাদের সম্পাদক। আগন্তুকদের একজন আরেকজনকে পরিচিত করে দিলেন।

প্রথম সংখ্যার একখণ্ড পত্রিকা সুনীলের হাতে দিয়ে সম্পাদক বললেন—আমাদের পত্রিকার উদ্দেশ্যটা একবার পড়ে দেখুন দয়া করে।

—যদি অনুমতি করেন তো একটু চা আনি? সুনীল সৌজন্যসূচক অনুরোধ জানালো।

—থ্যাঙ্কস্; চা আমরা এই খেয়ে আসছি। আর তা ছাড়া আমরা একটু ব্যস্ত আছি; আরও দু' একজন লেখকের কাছে যেতে হবে। সম্পাদক দু' জন খ্যাতিমান সাহিত্যিকের নাম করলেন।

শুনে সুনীলের মনে আনন্দ ধরে না। খ্যাতিমান লেখকের লেখার পাশে একই সঙ্গে তার লেখা বেরুবে।

মনোযোগের সঙ্গে সুনীল সম্পাদকীয় বক্তব্যটা পড়ে দেখতে লাগলো......বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান। 'আর্ট ফর আর্টস সেক' নীতি আজ অচল।.....সমস্যা-সঙ্কুল বর্তমান যুগে বাস করেও যাঁরা বাস্তবকে এড়িয়ে চলতে চান, অবাস্তব কল্পনার পর ভর দিয়ে 'ইউটোপিয়া' সৃষ্টি করেই খুশী, ভবেন না সমাজ তা' থেকে কী পাবে, তাঁরা 'এস্কেপিস্ট'। 'এস্কে-পিজম'কে আমরা 'ইনটেলেকচুয়াল ক্রাইম' বলে মনে করি। আমরা সাহিত্যে চাই প্রগতি......

আজ সারা দুনিয়া জুড়ে পুঁজিবাদী শোষণ চলছে, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তার মূল প্রসারিত হয়েছে.... মাসিক

পত্রিকা বেশীর ভাগই চলে পুঁজিবাদীর টাকায়। নতুন লেখকের লেখা তারা নিতে চায় না, নিলেও পারিশ্রমিক চাইলে বলে, নতুন লেখকের লেখা ছাপা হয়েছে এই তো যথেষ্ট......একখানা পত্রিকার কাছ থেকে কাগজের দোকানদার, ছাপাখানা, ডাকঘর, বাঁধাইকার, চিত্রকর, এমনকি ফেরীওয়ালাও কিছু কিছু পায়; পায়না শুধু হতভাগ্য লেখক। এমনিভাবে বহু লেখকের শ্রমফল অপহরণ করে পুঁজিবাদী মাসিক পত্রিকার মালিকের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স ফেঁপে ওঠে...... এ হচ্ছে 'ইনটেলেকচুয়াল এক্সপ্লইটেশন'......সাহিত্যিকরাও শ্রমিক......পুঁজিবাদী মাসিক পত্রিকার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হলে সাহিত্যিকদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইউনিয়ন গড়ে তুলতে হবে। সেইদিন আজ এসেছে।......সমাজে, রাষ্ট্রে, সর্বত্র ভণ্ডামী প্রশ্রয় পেয়ে চলেছে। আমরা এই ভণ্ডামীর মুখোস খুলে দেবো। তাই আমরা এই পত্রিকার নাম দিয়েছি 'মুখোস'।

পড়তে পড়তে সুনীল মুগ্ধ হয়ে যায়। এ ধরণের কথা তো আর কোনো পত্রিকার কণ্ঠে শোনেনি। প্রগতি কে না চায়? কিন্তু প্রকাশ্য প্রতিজ্ঞা, বিশেষ করে দরিদ্র সাহিত্যিকদের কল্যাণের কথা আর কারো মুখে তো শোনেনি। সে ভাবলো পত্রিকাটি দাঁড়িয়ে যাবে। বলিষ্ঠ প্রাণের পরিচয় রয়েছে ওর দেহে মনে।

—কেমন লাগলো আপনার?

—কথাগুলি ভালোই লাগলো। সবিনয় হাসি দিয়ে সুনীল সায় দেয়।

—আপনার একটা লেখা দয়া করে......?

—নিশ্চয়ই দেবো। সুনীল সযত্নে নিজের লেখা একটি গল্প এনে সম্পাদকের হাতে দিলো। সম্পাদক নিজে এসেছেন নতুন লেখকের বাড়ীতে লেখা নেবার জন্যে।

চাকরী ও টুইশনিতে যা আয়, বাসা ভাড়াতেই বেরিয়ে যায় তার একটা বড়ো অংশ। তারপর মা, ভাই নিজে—তিনটি প্রাণীর দুবেলাকার গ্রাসাচ্ছাদন। ছোটো ভাইটা প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে টাইফয়েডে ভুগছে। তার চিকিৎসা ও পথ্যের জন্যে কিছু দেনাও হয়ে গেছে।

মাসের সাতদিন যেতে না যেতে এবার হাতের টাকা নিঃশেষ হয়ে গেল। মাথায় মাথায় দুর্ভাবনা। ভাইটার রোগ সেরে গেছে বটে কিন্তু পুষ্টিকর পথ্যের ব্যবস্থা বহাল না রাখতে পারলে হারানো স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনা যাবে না।

রাত্রি নয়টার পরে টুইসনি সেরে বাসায় ফিরে এসে সুনীল লিখতে বসেছিলো। প্লট আসে-আসে, আসে না। যা মনে আসে তাও গুছিয়ে লেখা হয়ে ওঠে না। সংসারের বীভৎস আর্থিক রূপ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ব্যক্তি-আমি যার আক্রান্ত, বিশ্ব-আমির নাগাল পাওয়া তার পক্ষে মুস্কিল।

কলম রেখে সুনীল ভাবতে লাগলো কী করা যায়। সহসা মনে পড়ে গেলো 'মুখোস' পত্রিকায় তার গল্পটি বেরিয়ে গেছে তো। কাল সকালেই সে সম্পাদকের কাছে যাবে। যা হোক কিছু পেলে এই দুঃসময়ে খুব কাজে লাগবে।

নমস্কার দিয়ে দাঁড়াতেই সম্পাদক মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলেন—বলুন কী চাই আপনার?

—আজ্ঞে আমার একটা লেখা......

—ওঃ! আপনি আমাদের পত্রিকার একজন লেখক, না? বসুন, বসুন। মুখটা চেনা-চেনা মনে হচ্ছিলো, ঠিক মনে করে উঠতে পারছিলাম না। মানে, অনেক লেখক নিয়ে আমাদের কারবার করতে হয় কি না!

সুনীল একটু ম্লান হাসি হাসলো।

—কিছু মনে করবেন না ভাই, আপনার নামটা কী যেন?

—সুনীল দত্ত।

—ঠিক, মনে পড়েছে। আপনার গল্পটা ভালোই হয়েছে। লিখে যান, লিখতে লিখতে আরো ভালো হবে।

সুনীলকে নীরব দেখে সম্পাদক বললেন—আর একটা এনেছেন নাকি? রেখে যান, দেখবো। এখন একটু ব্যস্ত আছি ভাই।

—আজ্ঞে, সেজন্যে না। আমার যে গল্পটা বেরিয়েছে তার পারিশ্রমিকটা এখন পেলে বড়ো উপকার হতো। সাত পাঁচ ভেবে লজ্জা ত্যাগ করে সুনীল বলেই ফেললো।

সম্পাদক হেসে উঠে বললেন—আপনি লেখক, দাবী করতে পারেন বৈকি, নিশ্চয়ই পারেন। কিন্তু বুঝতে পারছেন তো নতুন পত্রিকা, বিজ্ঞাপন যা পাওয়া যাচ্ছে তাতে ছাপা খরচাও ওঠে না। নাম-করা দু একজন লেখককে সামান্য কিছু কিছু দিতে হয়েছে; নতুন কাউকেই কিছু দিয়ে উঠতে পারিনি। আপনি লেখা দিয়ে সাহায্য করুন; পত্রিকা বাঁচলে আপনারা আয়ের ন্যায্য অংশ পাবেন বৈকি। এ তো আর পুঁজিবাদীর টাকায় চলা পত্রিকা নয়।

দুঃখে ও নৈরাশ্যে অবাক হয়ে সুনীল চাইলো সম্পাদকের পানে। অতীত স্মৃতি মথিত হয়ে তার চোখের সামনে আর একবার ভেসে উঠলো 'মুখোস'-এর প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় প্রতিজ্ঞাগুলি।

অয়েল

আপটন সিন্‌ক্লেয়ার ★ অনুবাদক ঃ যতীশ বেদজ্ঞ

[৫]

গ্রীষ্মকালে সমুদ্রতীরটা ঠাণ্ডা থাকলেও লোবস রিভার জায়গাটা কিন্তু হয়ে ওঠে আগুনের মতই গরম। কাজেই ওরা ব্যবস্থা করলো ওখান থেকে সরে পড়বার। বাজে সময় নষ্ট করবার লোক নয় জ্যাড্; সোজা গিয়ে সে হাজির হলো এক বাড়ীর দালালের অফিসে, তারপর সেখান থেকে সহরের সবচেয়ে সুন্দর করে সাজানো বাড়ীটার খোঁজ নিয়ে গাড়ী হাঁকিয়ে গিয়ে উপস্থিত হলো সাগর-পারের ছোটখাটো একটা রাজপ্রাসাদে। বেশ খানিকক্ষণ ঘুরে ফিরে দেখে নিয়ে সোজাই আবার ফিরে এলো অফিসে, আর পাঁচিশ শ' ডলার ভাড়ার সই করে ফেললো ছ' মাসের লিজের দলিলে।

বাইরের দিকটায় ঢালাই লোহা কিম্বা ওরকমই একটা কিছুর পরে পলেস্তারা করা বাড়ীটার; কিন্তু ভিতরটা ঠিক মিসেস্ গ্রোর্তির ঘরখানার মতই চকচকে, তবে নকল ওক কাঠের বদলে এটা হচ্ছে নকল মেহগণি কাঠ দিয়ে তৈরী—এই যা তফাৎ। ঢুকবার মুখেই মস্ত বড় একটা হলঘর, তারই একপাশে ড্রইং রুম আর খাবার ঘর, আর তার সবগুলোতেই আধুনিক সব খোদাই কাজ করা। এরই সাথে বাড়ীর মালিক সংগ্রহ করেছেন প্রচুর আসবাবপত্র; আর তা করতে কার্পণ্য করেন নি অর্থ কিম্বা সময় কোনটারই। ফরাসী কায়দার পায়াওয়ালা চেয়ার-টেবিলগুলো, ফুল আঁকা সব রেশমী-ঢাকনা দিয়ে মোড়া, কালো রংয়ের চীনদেশী টীক কাঠের তৈরী মধ্যযুগীয় আমেরিকান কায়দার দেয়ালগিরিগুলোতে সব ফুল, কুঁড়ি অর ড্রাগন খোদাই করা; আর এরই মাঝে মাঝে অদ্ভুত রকমের চকচকে ন্যাংটো মেয়ে, আর গীর্জার পোষাক-পরা পাদ্রীদের মূর্তি।

দোতালায় ছখানা শোবার ঘরই সাজানো সহরের সেরা সাজ-সজ্জার দোকানের এক মহিলার পরিকল্পনা মত আলাদা রংয়ের আসবাব পত্রে। কারো কারো হয়তো জায়গাটাকে মনে হতে পারে বাড়ীর স্বাভাবিক সাচ্ছন্দহীন বলে, বানীর কিন্তু তা মনে করবার কোন কারণই নেই, হোটেলে থেকে থেকে হোটেলী ধরণের ঘর-দোরই এখন ওর লাগে ভাল। যতদূর ওর মনে পড়ে বাড়ী বলতে ও বুঝে এসেছে কেন ভাড়া বাড়ী না হয়তো এমন কোন বাড়ী যা কিনা কেনা হয়েছে পরে আবার চড়া দামে বিক্রী করবার উদ্দেশ্যে। হাডসন উপসাগরের তীরের ইণ্ডিয়ানরা যেমন শীতকালে একটা তিমি মেরে সেইটের কাছেই গিয়ে বাঁধে তাদের বাসা, জ্যাডও তেমনি এক একটা কুয়োকে কেন্দ্র করে ঘুরে বেড়ায় এক বাসা থেকে আর এক বাসায়।

প্রথমেই আসেন বানীর গৃহশিক্ষক মিঃ ইটন; ভদ্রলোকের অভ্যেস হয়ে গেছে ওরকম টেলিফোন পাওয়া। তাঁকে শুধু জানিয়ে দেওয়া হয় তিমির দেহটা কোথায় পাওয়া যাবে, সুটকেস দুটে আর ট্রাঙ্কটা ভর্তি করে নিয়ে তিনিও অমনি এসে হাজির হন তাঁর ছাত্রের কাছে, ট্রেন না হয়তো বাসে চেপে। অল্প বয়সের রোগাটে চেহারার মানুষটী নেহাৎই নিরালা প্রকৃতির, ফিকে নীল রংয়ের একজোড়া চোখ, আর বই রাখেন বলে বেখাপ্পা ধরণের ফুলো ফুলো সব পকেট। রাখবার সময়ই তাঁকে বলে দেওয়া হয়েছে সাহিত্যের চেয়ে তেলের দামই বেশী। যার মানে, ছাত্রকে তিনি শুধু তখনই শেখাতে পারবেন যখন কিনা জ্যাড্ করছে না সে কাজটা। বইয়ের বিদ্যে সম্বন্ধে জ্যাডের ধারণাটা যেন কেমন স্পষ্ট নয়; এক এক সময় সে বলে ওগুলো নাকি সব "ফাঁকা বুলি", আবার অন্য সময় হয়তো কুণ্ঠিত প্রশংসাও শুনতে পাওয়া যায় তার মুখ থেকে। হ্যাঁ, সত্যিই তো সে নিজে একটা 'মুখ্যু', বানীর তার চেয়ে আরও অনেক কিছু বেশী জানা দরকার বই কি। তবু যেন কেমন একটা সন্দেহ তার ও বস্তুটাকে, কেমন যেন একটা আশঙ্কা, সত্যিই হয়তো ওটা এমন একটা কিছু যা কিনা ঠিক তার মনমত নয়। আর সে ধারণাটাও তার কিছু নিছক নয়, না হলে মিঃ ইটন কি তার অমন নির্লজ্জের মত বানীকে বলতে পারতো যে তেলের চেয়েও নাকি পৃথিবীতে অনেক দরকারী জিনিষ আছে!

তারপরই আসে ওদের লাইমোসিন গাড়ীটা ঠাকুরমা আর এম্মা খুড়ীকে নিয়ে, আর রুডলফই চালিয়ে আনে সেটাকে। মস্ত্রী আর সোফার দুইয়েরই কাজ করে এই রুডলফ, আবার আনন্দ উৎসবের দিনে আচকান চাপিয়ে বাটলারের কাজ করতেও সে ওস্তাদ। সামনের সীটে তারই পাশে বসে আসে চীনে বাবুর্চি সিন্; ওটি একটী দুর্লভ বস্তু, কোন মতেই যাকে কিনা বিশ্বাস করে ছেড়ে দেওয়া চলে না বাসে কিম্বা ট্রেনে। বাড়ীর ঝি নেলির জায়গায় অবশ্য সহজেই অন্য লোক জুটবে, কাজেই সে আসে নিজেই নিজেকে নিয়ে। এরপর ট্রাক বোঝাই হয়ে আসে বাক্স-পেঁটরা আর খুঁটিনাটি সব আসবাবপত্র আর সেই সাথে আসে বানীর সাইকেল, এম্মা খুড়ীর টুপীর বাক্স আর ঠাকুরমার দুর্লভ সব চিত্র শিল্প।

বুড়ী মিসেস রসের বয়েস হয়েছে পচাত্তর, গোলাবাড়ীর মেয়ে মজুরের কাজ করেই কেটেছে তাঁর বেশীর ভাগ সময়, সেও কি আর আজকের কথা? না ছিল তখন মোটর কিম্বা টেলিফোন, আর না ছিল এত সব যন্ত্রপাতির ছড়াছড়ি। কঠোর দারিদ্রের মধ্যে ক্রীতদাসীর মত কেটেছে তার জীবন আর তারই মধ্যে তিনি গড়ে তুলেছেন তাঁর সংসার। এক মেয়েকে মরতে দেখেছেন প্রসব করতে গিয়ে, ছেলেদেরও একজন মরেছে টাইফয়েডে, একজন স্পেনের যুদ্ধে আর একজন শুধু মদ গিলে। এখন 'জিম'ই হচ্ছে তাঁর 'সবে ধন নীলমণি'; আর এই জিমই মস্ত বড়লোক হয়ে তাঁর শেষের দিনকটাতে এনে দিয়েছে কিছু বিশ্রাম আর সাচ্ছন্দ্য। কষ্টলব্ধ এই অবসরটুকু কি করে তিনি সদ্ব্যবহার করবেন এই নিয়ে যখন জল্পনা-কল্পনা চলছিল সকলের মধ্যে ঠিক সেই সময়টাতেই বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত তিনি ঘোষণা করলেন তাঁর চিত্রকর হবার বাসনা। জানা গেল এই আকাঙ্ক্ষাটাই নাকি তিনি

পোষণ করে এসেছেন গত ষাট বছর ধরে। থালাবাসন মাজা, ছেলেমেয়ে মানুষ করা, কিসমিস বাদাম পেস্তা শুকনো আর এমনি হাজারো সব-ঝামেলার মাঝেও কখন ছাড়েন নি সেই আশা।

সেদিন থেকে যখনই যেখানে কেন থাকুক না ওরা, বাড়তি ঘর কিন্তু একটা চাই-ই চাই ঠাকুরমার, তাঁর ষ্টুডিওর জন্য। কোন এক ভ্রাম্যমান শিল্পী তাঁকে শিখিয়ে গেছেন কাঁচা আর চটকদার রংয়ের ব্যবহার। মরুভূমির সূর্যাস্ত আর ক্যালিফোর্ণিয়ার পাহাড় পর্বতময় উপকূলের ছবি আঁকা আছে এই শিল্পীর। মিসেস রস কিন্তু কিছুতেই আঁকবেন না তাঁর দেখা কোনও কিছুর ছবি। তাঁর ঝোঁক হলো সভ্যতার পরে; পার্ক, ঘাসের ক্ষেত আর গাছের ছায়ায় ঢাকা আবছা পথ—এই সব নিয়েই তাঁর কারবার; এরই সাথে থাকা চাই মাটীতে লোটানো স্কার্ট-পরা ভদ্রঘরের মেয়ে আর ঢিলে ট্রাউজার পরা সব ভদ্রলোক। পুরোপুরি ছ'ফিট লম্বা আর চার ফিট পাশে তাঁর সেরা ছবিখানাকে সব সময়ই টাঙিয়ে রাখা হয় খাবার ঘরে। ছবিখানা আঁকা হয়েছে সুন্দর একটা দোতালা বাড়ীকে কেন্দ্র করে; সব কিছুই বেশ স্পষ্ট, এমন কি উপর তলার থামের কার্ণিশগুলো পর্যন্ত। বাড়ীটার সামনেই একটা ঘোরানো পথ, মাথা বরাবর জল ছিটকে উঠছে একটা ফোয়ারা থেকে, আর সেই পথ দিয়ে একটা নিগ্রো টেনে নিয়ে চলেছে ভিক্টোরীয়া, ল্যান্ডো কি বায়ুশ জাতীয় কোন গাড়ী যাতে কিনা বসে রয়েছেন এক ভদ্রলোক আর এক ভদ্রমহিলা। পিছু পিছু ছুটে চলেছে একটা কুকুর, পাশের ঘাসের ক্ষেতে খেলা করছে একটি ছেলে আর তারই পাশে দাঁড়িয়ে ছোট্ট একটি মেয়ে, হাতে তার একটী খেলনা। এ ছাড়া লোহার হরিণও রয়েছে অনেকগুলো সেই বাগানটার মধ্যে। এক কথায় কিছুতেই যেন পুরনো হতে চায় না ছবিখানা, প্রতিবারেই চোখে পড়ে কিছু না কিছু একটা নূতন। বাইরের কেউ এলে ছবিখানা দেখিয়ে ড্যাড্ বলে, "ওটা আমার মায়ের আঁকা, প'চাত্তর বছরের এক বৃদ্ধার পক্ষে চমৎকারই বলতে হবে, কি বলেন?" আর আসেও ড্যাডের কাছে অনেকেই; নিজের প্রস্তাব নিয়ে আসে দালালরা, দলিলপত্র নিয়ে আসে উকীলরা আর হুকুম জানতে আসে প্রধান মিস্ত্রীরা; ছবিখানা তারা সবাই দেখে বেশ ভাল করে, আর কেউই তারা দ্বিমত হয় না ড্যাডের সাথে।

যে ছেলে তাঁর মারা গেছে মদ খেয়ে তারই বিধবা স্ত্রী হচ্ছেন এম্মা খুড়ী; তাঁর জীবনেও সুখ-সম্পদ এসেছে খুব দেরী করেই। ড্যাড্ অবশ্য অভাব রাখেনি তাদের কোন কিছুরই, মুখ ফুটে শুধু একবার বললেই হলো, তা সে যাই কেন হোক না, চাই কি দরকার হলে ড্যাডের ব্যাঙ্কের পরেও তাঁরা কাটতে পারেন চেক। সহরের সেরা দোকান থেকেই এসে থাকে এম্মা খুড়ীর পোষাকপরিচ্ছদ আর যখন যে সহরে ওরা থাকে সেখানকার সামাজিক কাজকর্ম্মও তিনিই করে থাকেন রস্ পরিবারের প্রতিনিধি। মহিলাদের ক্লাবগুলোর প্রায় সব অনুষ্ঠানেই তিনি গিয়ে শুনে আসেন হোমরা চোমরা সব ব্যক্তির বক্তৃতা, যাঁরা কিনা দাঁড়িয়ে উঠে প্রথমেই বলেন, 'ম্যাডাম চেয়ারম্যান', তারপর বক্তৃতা দেন 'সেকস্পীয়রের নাটকের স্ত্রী চরিত্র, 'আশাবাদের স্বাস্থ্যকর প্রভাব' আর না হয়তো 'যৌবন রাখতে হলে আমাদের কি করা উচিৎ' এমনি সব বিষয় নিয়ে। শ্বাশুড়ী বৌ-এ মিলে মাসে অন্তত একবার তাঁরা আয়োজন করেন চায়ের মজলিশের। ড্যাড অবশ্য সেদিনটা কাটিয়ে আসে বাইরে থেকে, নূতন কূয়ো বসানো না হয়তো চলতি কোন কূয়োর মুখ বন্ধ করবার অজুহাত দেখিয়ে।

এম্মাখুড়ী বিশেষ খাতির করেন সেই সব দোকানগুলোকে যেগুলোতে কিনা বিক্রী হয়ে থাকে নানারকমের প্রসাধন দ্রব্য। সেগুলোতে যাতায়াত করে এমন প্রায় সব আধুনিকা তরুণীর সাথেই তাঁর পরিচয়, আর তাদের ব্যবহৃত অতি-আধুনিক দ্রব্যগুলির আজগুবি সব নামও তিনি বলে যেতে পারেন তাদেরই মত অশুদ্ধ আমেরিকান ভাষায়। না হলে তো দোকানের মেয়েরাই বুঝতে পারবে না কি তিনি চাইছেন। ছোট ছোট সব অজস্র বাক্স আর শিশিতে ভর্তি তাঁর টেবিল, কোনটায় রং, কোনটায় পাউডার, কোনটায় সেন্ট, কোনটায় লাবণ্য বর্দ্ধক প্রলেপ, এমনি সব হরেক রকমের দ্রব্য সামগ্রী যা কিনা কেবল তাঁরই শুধু জানা। ছোটবেলার কথা ভাবলেই বামীর মনে পড়ে ওর এই এম্মাখুড়ীর কথা। চেয়ারটা জুড়ে তিনি বসে আছেন যেন একটা সাদা মাংসের স্তূপ, শরীরের আধেকটা যে খোলা সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপই নেই, আর থাকবেই বা কেন, ও তো তখন একেবারেই বাচ্চা। মনযোগ দিয়ে ও দেখতো কেমন কৌশলে তিনি নিজেকে বেঁধে ফেলতেন নানারকমের সব দড়াদড়ি কষে। তারপর সোজা হয়ে বসে গম্ভীরমুখে সুরু করতেন গালে আর ভ্রূতে এটা ওটা সব লাগিয়ে গোলাপী কিম্বা সাদ পাউডার বুলতে। আর সেই সঙ্গে ওকে বলে যেতেন বহুকালগত-স্বামীর কথা—শুধু ঐ একটা ভীষণ দুর্বলতা, মদ খাওয়া, না হলে কতগুণই না তাঁর ছিল, মনটা ছিল ভারী কোমল আর স্বভাবটীও তেমনি মিষ্টি, "হ্যাঁ, তিনি ছিলেন যাকে বলে "লক্ষ্মীছেলে"; কোথায় যে তিনি এখন কি করছেন সেই হলো আমার দুশ্চিন্তা।" পরক্ষণেই আবার উঠে পড়ে লেগে যেতেন চোখের জলে ভেজা গালদুটোকে পাউডার বুলিয়ে লাল করে তুলতে।

[৬]

ব্যাঙ্কসাইড-রসের এক নম্বর খনির অনেক অনেক দূর নীচে মস্ত এক টুকরো লোহার পাত ঘুরে চলেছে অবিশ্রান্ত। তলার উখার মত অনেকগুলো ভোঁতা দাঁত, উপরে হাজার দুই ফিট লম্বা লোহার পাইপ আর তারই বিশটন ওজনের চাপে খনন যন্ত্রটা গিয়ে ঢুকে পড়ছে মাটীর বুকে আর ঘুরতে ঘুরতে চূর্ণ বিচূর্ণ করে পিষে ফেলছে পথের যত নিরেট পাথরের টুকরোগুলোকে। কাদামাটীর নালাটার মধ্যে অবিশ্রান্ত ঘুরে চলেছে যন্ত্রটা, আর কাদাগুলো গিয়ে ঢুকে পড়ছে পাইপটার মধ্যে, তারপর আবার আপনা থেকেই বেরিয়ে আসছে মাটী আর পাইপটার মাঝ দিয়ে পথ করে। কাদামাটীর এই নালাটির কাজ হচ্ছে তিনটে: খনন যন্ত্র আর পাইপটাকে গরম হতে না দেওয়া; গুঁড়ো পাথরগুলোকে উপরে তুলে ফেলা; আর বেরিয়ে আসবার পথে পাইপটার চারপাশের মাটীতে লেপ্টে গিয়ে পলেস্তারার কাজ করা যাতে করে গর্ত্তের দেয়ালটা এসে কোথাও না চেপে পড়তে পারে পাইপটার গায়ে। নালাটার মধ্যে রয়েছে কাদা আর জল, একটা যন্ত্র ঘুরছে সে দুটোকে মেশাবার জন্য, কয়েকটা পাম্প অনবরত চলেছে ফোঁস ফোঁস করে, তাদের কাজ হচ্ছে প্রতি স্কোয়ার ইঞ্চিতে আড়াই শ' পাউন্ড চাপ দিয়ে কাদামাটীগুলোকে ঠেলে দেওয়া পাইপটার মধ্যে। রাজ্যের নোংরা এই কূয়ো বসানোর কাজটা, শেষ না হওয়া পর্যন্ত চলবে কাদামাটীর ছড়াছড়ি, আর তার পরই দিতে হবে তেলে গড়াগড়ি।

তাছাড়া খরচও পড়ে মেলাই। বিশ টন ওজনের ঐ লোহার পাইপটার দৈর্ঘ্যের সাথে সাথে ভারও যাচ্ছে বেড়ে, আর স্বীকার করতেই হবে ওটাকে ঘুরোতে ক্ষমতাও চাই অনেক। বিরাট স্টীম ইঞ্জিনটা টেনে ধরে শিকলটাকে আর সঙ্গে সঙ্গে ইস্পাতের গিয়ারগুলোও ওঠে আর্তনাদ করে, কান খাড়া করে শুনে বান্নী লাফিয়ে ওঠে আনন্দে। হ্যাঁ, ইঞ্জিন বটে একটা, পঞ্চাশটা ঘোড়ার শক্তি রাখে ও একা! অন্তত ওর ড্রাইভার তো বলে তাই। ভাবতেও অবাক লাগে বান্নীর। একটা সেকেলে ধরণের চাকা আর একটা লোহার শিক, ঠিক যেমনটি দিয়ে কুয়ো থেকে জল তুলতেন আমাদের পূর্বপুরুষেরা আর না হয়তো মাড়াই করতেন তাদের ফসল, আর তাতেই কিনা জুড়ে দেওয়া হয়েছে পঞ্চাশটা ঘোড়ার শক্তি!

হ্যাঁ, ক্যালিফোর্ণিয়ায় তেলের কুয়ো বসাতে টাকা লাগে বই কি। পুব দেশের মত ছোটখাটো সব গর্তের ব্যাপার হলে না হয় যন্ত্রটাকে বার কয়েক ওঠা নামা করলেই শেষ হয়ে যেত কুয়ো বসানোর কাজ। এখানে কিন্তু তৈরী থাকতে হবে কমসে কম হাজার ছ' সাতেক ফিট ভেতরে যাবার জন্য আর তার মানে হচ্ছে মাটীতে বসাতে হবে তিন শ' থেকে তিন শ' পঞ্চাশ টুকরো লোহার পাইপ, আর তাদের সবগুলোকেই আবার ঢেকে দিতে হবে আলাদা একটা আবরণ দিয়ে, খোলা তো আর ফেলে রাখা চলে না এমন একটা দামী গর্তকে। যেতে যেতে পাইপটা গিয়ে পৌঁছুবে নরম বালিমাটীতে যেখানে বইছে রীতিমত জলের স্রোত আর তখন দরকার হবে স্টোভের পাইপের মত লম্বা লম্বা সব ঢালাই লোহার পিপে। সেগুলোকে নামিয়ে দিতে হবে একটার পর একটা, আর সেগুলোকে জুড়ে দিতে হবে পরস্পরের সাথে, খুব সাবধানে, যেন না জল ঢুকতে পারে এক ফোঁটাও। এরপর সব কিছুই দিতে হবে সিমেন্ট দিয়ে গেঁথে আর কাজ চালাতে হবে ইঞ্চি চোদ্দ ব্যাসের ছোট একটা খনন যন্ত্র দিয়ে, যাতে করে আবরণটা শক্ত হয়ে আটকে থাকে উপরের মাটীর খাপে। এমনি করে সরু হতে হতে পাইপটা গিয়ে পৌঁছবে তেলের মাটীতে, আর তখন গর্তটার ব্যাসটা কমে গিয়ে হয়ে দাঁড়াবে পাঁচ কি ছ' ইঞ্চি পরিমাণ। ড্যাডের মত সাবধানী লোক হলে অবশ্য আবরণটাকে নিয়ে আসা হবে গর্তটার উপর পর্যন্তই আর ফলে একটার মধ্যে আর একটা এমনি করে উপরের দিকটার আবরণটার পাল্লা থাকবে পুরোপুরি চারটে।

সমস্ত দিন আর সমস্ত রাত ধরে চলতে থাকে ইঞ্জিনটা, মোটা শিকলটায় টান পড়ার সাথে সাথে ঘুরপাক খেতে থাকে "ঘূর্ণিচাকিটা" আর পাইপের মুখের লোহাটা গিয়ে কেটে কেটে বসতে থাকে কঠিন পাথরের বুকে। লোক রাখতে হয় দু' শিফটের জন্য, বারো ঘণ্টার শিফট্, আর যে হেতু এই তাড়াহুড়োর মধ্যে শোবার জায়গার নেহাৎই অভাব তাই তারা এক বিছানাকেই গরম রাখে দিন রাত ধরে পালা করে। একদল না একদলকে সব সময়ই হাজির থাকতে হয় কাজের জায়গায়, কান খাড়া করে শুনতে হয় প্রতিটী শব্দ, সজাগ চোখে লক্ষ্য রাখতে হয় প্রতিটী খুঁটিনাটীর পরে। ইঞ্জিনটাতে জোগাতে হয় যথেষ্ট পরিমাণ তেল, জল আর গ্যাস; পাম্পগুলোকে রাখতে হয় চালু, নালাটার কাদাজলের আবর্তনে যেন না ঘটে কোন ব্যাঘাত, মেশাবার যন্ত্রটার ছলাৎ ছলাৎ শব্দ যেন না আসে থেমে, আর মাটিকাটাবার যন্ত্রটা যেন ক্রমশই ঢুকে যেতে থাকে গভীর থেকে গভীরতর প্রদেশে। গোলমাল হয়ে যেতে পারে হাজারো জিনিষের, যাদের কতগুলোর দাম অনেক টাকা, আর অন্যগুলোর আরও অনেক। রাতের যে কোন সময়ই জাগানো হয় ড্যাডকে আর সে এসে হুকুম করে চলে টেলিফোনে আর না হয়তো চটপট পোষাকটা গলিয়ে নিয়ে গাড়ী হাঁকিয়ে এসে হাজির হয় খনির কাছে। তারপর পরদিন ভোরের খাবার টেবিলে বসে বান্নীকে শোনায় সেই সব গল্প। ঐ ব্যাটা রাতের মিস্ত্রী ড্যান্ রোসিঙ্গারটা আস্ত একটা বেয়াড়া খচ্চর, সন্নেহই নাকি কুসোন্ন না ওর। তাড়া দিতেই বললো, "বেশ, কিন্তু পাইপ বেঁকে গেলে যেন দোষ দেবেন না আমায়।" ড্যাড্ বলেছিল, "বাঁকুক আর নাই বাঁকুক আমি চাই ঠিক সময়ে কাজ।" ব্যস্, অমনি দেখতে দেখতে বেঁকে গেল মাটি কাটবার যন্ত্রটা। ড্যাড্ দিব্যি গেলে বলতে পারে ওটা ঐ ড্যান্ বেটারই কীর্তি, ইচ্ছে করেই ও তা করেছে। মেলাই আছে ও রকম বদ মতলবের লোক, আর এমন কিছু কঠিনও তো নয় কাজটা, শুধু ইঞ্জিনটাকে একটু জোরে চালিয়ে দিলেই হলো—ব্যাস্।

তা সে যাই হোক, আসল কথা হচ্ছে বেঁকে তো গেল। এখন টেনে তোল ঐ দু' হাজার ফিট পাইপের আগাগোড়া সবটুকু! আর সে কি কম ঝামেলার ব্যাপার! চার চার গাঁট করে এক সাথে তুলে এনে খুলে রাখতে হবে সার করে। মজুররা একে বলে "ভেঙ্গে ফেলা" আর এই ভেঙ্গে ফেলার যেন আর বিরাম নেই, চলছে তো চলছেই, কেউ-ই জানে না কোথায় পাইপটা গেছে সত্যি সত্যি ভেঙ্গে, আর কখন তুলে ফেলা যাবে সেই টুকরো অংশটাকে। এই টুকরোটাকে তোলাই হচ্ছে আসল কাজ, আর যে যন্ত্র দিয়ে তা করা হয় তাকে বলে "বঁড়শী"। মোটা একটা তারের দড়িতে করে যন্ত্রটাকে নামিয়ে দিতে হবে গর্তটার মধ্যে, আর ভাঙ্গা পাইপটার উপর দিয়ে নেমে গিয়ে সেটা আটকে যাবে কোন না কোন একটা গাঁটে, অনেকটা ঠিক বরফওয়ালার চিমটের মত। কিন্তু প্রথমবারেই যে আটকে যাবে তেমন কোন কথা নেই, না আটকাতেও পারে, আর তা হলে তখন বেশ কিছুক্ষণ ধরে চালিয়ে যেতে হবে অক্লান্ত চেষ্টা, যতক্ষণ পর্যন্ত না ওটা সত্যি আটকে যাচ্ছে ভালভাবে আর টেনে তুলে আনছে ভাঙ্গা পাইপের টুকরোটাকে। তারপর নূতন আর একটা টুকরো লাগিয়ে সবগুলো পাইপকেই আবার একে একে নামিয়ে দিতে হবে গর্তটার মধ্যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আবার সুরু করা যাচ্ছে কাজ। কিন্তু এবার তা করতে হবে ড্যান্ রোসিঙ্গারেরই পরামর্শমত, বকা চলবে না তাকে একবার ভেঙ্গে ফেলেছে বলে।

আর এ সবের মধ্যেই ড্যাড্ গিয়ে দিন কাটিয়ে আসবে তার ছোট্ট অফিসটাতে, সহরের যে দিকটায় ব্যবসা বাণিজ্য চলে সেই অঞ্চলে। সেখানে আছে একজন স্টেনোগ্রাফার আর একজন কেরাণী, আর আছে তার খনিগুলো সংক্রান্ত নানা দলিল পত্র। তা ছাড়া লোকজনও আসে মেলাই; কেউ আসে নূতন লীজের প্রস্তাব নিয়ে, কেউ বা দেখাতে চায় নূতন কোন যন্ত্র কিম্বা বোঝাতে চায় পেটা লোহার চেয়ে ঢালাই লোহার আবরণের অধিক কার্যকারিতা, আর না হয় তো ব্যাখ্যা করতে বসে নূতন কায়দার কোন খনন যন্ত্রের, যা কিনা অদ্ভুত ফল দেখাচ্ছে প্যালোমার কোম্পানীর খনিগুলোতে। ড্যাড্ দেখা করে তাদের সবার সাথেই, বলা তো যায় না, থাকলেও থাকতে পারে তাদের কারো কাছে তার দরকারী কোন কিছু। কিন্তু কারোরই রক্ষা নেই হিসেবে ভুল হলে, কারণ সব খুঁটীনাটীই লেখা আছে ড্যাডের খাতায়, এক্ষুনি খাতাখানা টেনে নিয়ে দালাল বেচারাকে দেখিয়ে দেবে স্টার

ফিসটেল কোম্পানীর সাত নম্বরের যন্ত্রটায় কি কি ফল পাওয়া গেছে তার লোবস রিভারের খনিতে।

তারপরে পিয়ন আসবে খনিগুলোর সব সংবাদ নিয়ে; আর ড্যার্ড বলে যাবে তার স্টেনোগ্রাফারকে চিঠি আর টেলিগ্রামগুলোর কি উত্তর হবে। না হয় তো বেজে উঠবে টেলিফোন, অনেক দূর থেকে কে যেন চাইছে মিঃ রসকে, আর ড্যাড্ বাড়ী ফিরবে লাঞ্চ খেতে রাগে গজগজ করতে করতে, "এ্যাণ্টিলোপের ঐ ব্যাটা ইস্পেটা, ঠ্যাং ভেঙ্গে ফেলেছে পাইপ ফেলে দিয়ে—ঐ যে সেই কালো গোঁফওয়ালা লোকটা, মনে আছে?" বাম্বী বলে, হ্যাঁ তার মনে আছে, সেই যাকে সেদিন বকেছিল ড্যাড্; "আমি তো ওকে তাড়িয়েই দিয়েছিলাম," ড্যাড আবার গজগজ করতে থাকে, "তার পর ওর স্ত্রী আর কাচ্চাবাচ্চার কথা ভেবেই তো শেষে আবার রাখলাম। গিয়ে দেখি বসে আছে হাঁটু গেড়ে, মাথাটা চাকা আর শিকলটার মাঝখানে রেখে—কেন বাপু, তোর তো জানাই ছিল ইঞ্জিনটায় আমাদের বিপদ বন্ধ করবার কোন ব্যবস্থা নেই। তা বলে কিনা গিয়েছিল একটা দড়ি খুলে আনতে—এখন বোঝ, গেল তো আঙুলগুলো সব কেটে। নাঃ, এসব লোকের মাথা তো দূরের কথা, আঙুলকটা বাঁচাবারও বুদ্ধি নেই, এদের জন্য কিছু করতে যাওয়াই বৃথা। ভগবানের দিব্যি, এরা যে গোঁফ গজানো পর্যন্ত বেঁচে থাকে কি করে তাই তো আমি বুঝতে পারি না।" ড্যাডের ভাল লাগে তার লোকজনদের নির্বুদ্ধিতার কথা নিয়ে আলোচনা করত, তা ছাড়া একটা উদ্দেশ্যও থাকে এ সব বলার পেছনে। মুখে যাই বলুক, মনে মনে সে বেশ ভাল করেই জানে কুয়ো বসানো কাজটা কি ভীষণ বিপজ্জনক, কাজেই সে চায় কুয়ো বসাবার যন্ত্রগুলোর কাছ দিয়ে চলাফেরা কববার সময় বাম্বীও যেন মনে রাখে সেই কথাটা।

এমনি সময় টেলিগ্রাম এলো লোবস্ রিভার থেকে; সেখানকার দু নম্বর খনিটার কাজ নাকি গেছে বন্ধ হয়ে। প্রথমে নাকি ওরা হারিয়ে ফেলে গর্তটার মধ্যের এক প্রস্থ যন্ত্রপাতি—তার পর পাইপগুলো তুলে ফেলে ওরা চেষ্টা করছে বড়শী নামাবার, এমনি সময় কে এক ব্যাটা গুণ্ডা নাকি গর্তটার মধ্যে ফেলে দিয়েছে বড় একটা লোহার রড। ওদের পাইপটা গিয়ে তখন পৌঁছেছে চার হাজার ফিট মাটীর নীচে আর মেলাই খরচের ব্যাপার অত নীচুতে "মাছ ধরা"। তা ছাড়া মনে হচ্ছে যেন কোথাও একটা ফাটলও দেখা দিয়েছে গর্তটার গায়ে, মাটী খসে তিন তিন বারই গর্তটা গেছে বন্ধ হয়ে ফলে ওদের নির্দিষ্ট সময় থেকে ওরা পিছিয়ে পড়েছে পুরো ছটী সপ্তাহ। ড্যাড্ উঠলো ব্যস্ত হয়ে, আর ফোন করে চললো প্রতি দু ঘণ্টা অন্তর। কিন্তু ফল হলো না কিছুই। এটা ওটা নানা রকম চেষ্টাই ওরা করে চললো, ড্যাডও ফোন করে বললো একটা উপায়। কিন্তু সবই হলো বৃথা, গর্ত ভেঙ্গে পড়তে লাগলো বার বার, আর ওরাও বার বার তা পরিষ্কার করে নিয়ে চেষ্টা করে চললো "মাছ ধরবার"। শেষ পর্যন্ত অবশ্য খোঁজ পাওয়া গেল যন্ত্রগুলোর আর সেগুলোকে টেনেও তোলা হলো "বড়শী" দিয়ে, কিন্তু লোহার রডটা তখনও আটকে রইলো শক্ত হয়ে গর্তটার নীচে।

তিন দিনের দিন সন্ধ্যায় ড্যাড্ বললো তাকে নাকি একবার দৌড়তে হবে লোবস রিভারে, আর যেমন করেই হোক যোগাড় করতে হবে নূতন এক প্রস্থ আবরণ। তাছাড়া সিমেণ্টওয়ালাদেব সাথেও একবার দরকার হবে দেখা করবার। লাফিয়ে উঠে বাম্বী বললো, "আমাকেও নিয়ে চলো, ড্যাড্!" অভয় দিয়ে ড্যাড্ বললো, "নিশ্চয়ই"। অভ্যাস মাফিক ঠাকুমা মনে করিয়ে দিলেন বাম্বীর লেখাপড়া চুলোয় যাবার কথা; আর অভ্যাস মাফিক ড্যাডও উত্তর দিল, গোটাজীবনই নাকি বাম্বী সময় পাবে কবিতা আর ইতিহাস জানবার, কিন্তু তেল সম্বন্ধে জানবার সুযোগ মিলবে তার শুধু সেই কদিনই, যে কদিন কিনা তার বাপ আছে জীবিত। এম্মাখুড়ী চেষ্টা করলেন মিঃ ইটন যাতে দু এক কথা বলেন কবিতা আর ইতিহাসের পক্ষ নিয়ে; কিন্তু মাস্টারমশায় মনে করলেন চেপে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ, তিনি জানেন পরিবারের কার হাতে রয়েছে টাকার থলিটা। আর বাম্বীও জানে এতে কিছু মনে করবেন না মিঃ ইটন, তিনি এখন ব্যস্ত রয়েছেন তাঁর এম-এ ডিগ্রীর প্রবন্ধটা নিয়ে, কাজেই অবসর সময়টা বেশ খুসী মনেই কাটিয়ে দেবেন এ্যালিজাবেথের আগের যুগের নাট্যকারদের স্ত্রী চরিত্রগুলির পরিণতি নিয়ে গবেষণা করে।

★

এইতো

সুজিতকুমার নাগ

এইতো বেশ, নাইতো শেষ, তোমার কথা মোর প্রাণে
নাইতো লাজ, থাকনা কাজ, থাকো বসে এইখানে।
বসতে দাও এইখানে,
খানিক হাসি এই প্রাণেঃ
বইয়ে দাও, দুলিয়ে দাও, আজকে মোর এই প্রাণে
ঝরিয়ে যাওয়া, ফিরিয়ে পাওয়া কোনখানে গো কোনখানে?

তোমার প্রাণে বাজাও বীণ
ঝরছে যেন মায়া রঙ্গীনঃ
থাকনা কাজ, নাইতো লাজ, চুপ করে আজ এইখানে
বীণার তান, উঠুক গান, বাজাও বীণা এই প্রাণে—
হারিয়ে যাও মোর প্রাণে,
বইয়ে দাও মোর গানেঃ

হারানো দিন, মায়া রঙ্গীন, বাজুক আজি মোর প্রাণে—
ক্ষণেক তরে চাওগো ফিরে বাজাও বীণা এই গানে।

শিল্পী-সাহিত্যিক সতীন্দ্রনাথ লাহা

রাণা বসু

লক্ষ্মী সরস্বতীর আশীর্বাদে ধন্য কলকাতার প্রসিদ্ধ লাহা পরিবারের নাম আজ দেশবাসীর কাছে বিশেষভাবে পরিচিত। এরকম একসংগে লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর কৃপা ও আশীর্বাদ খুব কম পরিবারের ভাগ্যেই জুটেছে। লাহা পরিবারে এক ডক্টরেট ডিগ্রিধারীই তিনজন আছেন—এম-বি, এম-এ, বি-এল'র তো কথাই নেই। শিল্পী সতীন্দ্রনাথ লাহা এই পরিবারেরই এক সন্তান—স্বর্গীয় শশিভূষণ লাহা

বাগ্দেবী

মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। সুদক্ষ শিল্পী হিসেবে সতীনবাবু এর মধ্যেই শিল্পী সমাজে নিজের আসন কোরে নিয়েছেন, কিন্তু শিক্ষিত জনগণ ও সমগ্র দেশবাসীর কাছে তাঁর পরিচয় এখনও বিশেষভাবে ছড়িয়ে পড়ে নি। সেইজন্যে আমরা এখানে তাঁর এক সংক্ষিপ্ত শিল্পী-জীবন এবং সেই সঙ্গে তাঁর আঁকা কয়েকখানা ছবির প্রতিলিপিও প্রকাশ করলুম।

শিল্পী সতীন্দ্রনাথ লাহা প্রখ্যাত শিল্পী ভবানীচরণ লাহা মহাশয়ের নিকট আত্মীয়। মেট্রোপলিটান স্কুলে পড়ার সময় থেকেই তাঁর শিল্প সাধনা সুরু হয়। পড়ার বই-এ বিশেষ কোরে ইতিহাসের পাতায় নানা বীর, রাজারাণীর ছবি দেখতে দেখতে তাঁর মনে ছবি আঁকার ইচ্ছে জাগে। অন্তরের তাগিদে আপন খেয়ালে তুলির স্পর্শে কিশোর

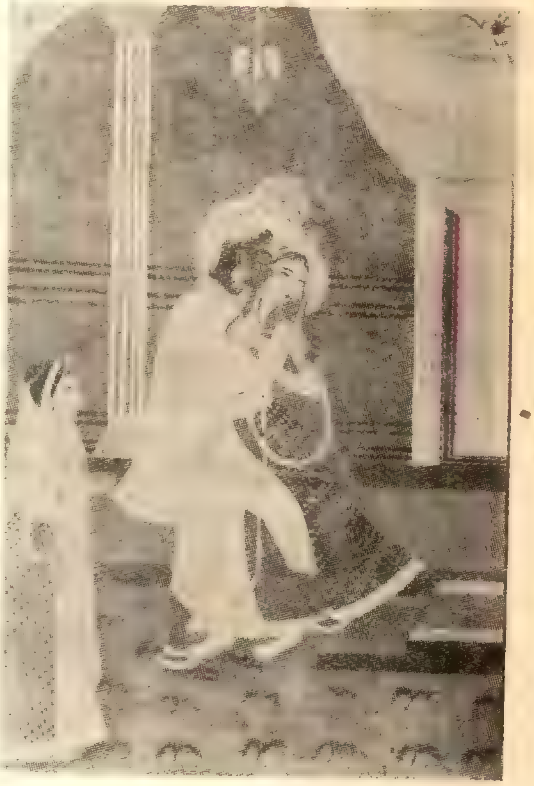

রাসযাত্রায় রাধা-কৃষ্ণ

শিল্পী এঁকে চলেন নানান ধরণের রকমারী ছবি। ছবি আঁকলেও ভবানী বাবুর কাছে অজ্ঞাত থেকে যায় বাড়ির ছেলের শিল্পসাধনার কথা—শুধু ভবানীবাবুই নয় তখন আত্মীয়স্বজন বা বাড়ির বাইরের খুব কম লোকই জানতেন তাঁর শিল্প-প্রতিভার কথা। সুযোগ পেলেই সতীন বাবু ভবানী বাবুর স্টুডিও-তে ঢুকে একমনে দেখে চলতেন

সেখানে রাখা নানা পদ্ধতির রকমারী ছবি। মনে জাগতো ঐ ধরণের ছবি তিনিও আঁকবেন। ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত তিনি কারুর সাহায্য ছাড়াই নিজেই নিজের শিল্প-সাধনা করেন; তবে একটা কথা' এই সময় পর্যন্ত তিনি ছিলেন ভবানী বাবুর শিল্পের একান্ত অনুরাগী।

বিরহিনী রাধা

ছবি আঁকতেন শিল্পী, কিন্তু সে ছবি নিজের কাছে ছাড়া অন্য দশ জনের কাছে, একেবারে অজ্ঞাত ছিল। শিল্পীর শিল্প-সাধনা প্রথম প্রকাশ পেলো বিদ্যাসাগর কলেজ ম্যাগাজিনের পাতায়—সে এক স্মরণীয় তারিখ—শিল্পী তখন প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। এরপর তাঁর দ্বিতীয় চিত্র প্রকাশিত হয় অমূল্য বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত সে সময়ের বিশেষ চলতি 'পঞ্চপুষ্প' পত্রিকায়। বিদ্যাসাগর কলেজে পড়বার সময়েই একবার উক্ত কলেজে এক শিল্প-প্রদর্শনী হয়। সে শিল্প-প্রদর্শনীতে শিল্পীর আঁকা জল ও তেল রঙা ছবি প্রথম পুরস্কার পায় এবং সাধারণ্যে বেশ সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। বলা যেতে পারে ত্রিশের যুগে প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং Flower Study-তে তাঁর জুড়ি খুব কম শিল্পী ছিলেন। ১৯৩৫ সালে একাডেমী অব ফাইন আর্টসের প্রদর্শনীতে তাঁর আঁকা Flower Study উচ্চ সুখ্যাতি পায় এবং হায়দরাবাদের নিজাম তাঁর 'Magnolia Study' অনেক দামে কিনে নেন। ১৯৩৭ সালে ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটের প্রদর্শনীতে তিনি চার বিভাগে (জলরঙ, তেলরঙ, প্যাস্টেল এবং ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট) প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং 'রণেন্দ্রমোহন ঠাকুর স্বর্ণপদকটি' সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী হিসাবে পুরস্কার পান। ১৯৩৯ গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে যুদ্ধ তহবিল প্রদর্শনীতে বর্ধমানের মহারাজা এ'র চারখানা flower study উচ্চ মূল্যে কিনে নেন—এরপর নানা প্রদর্শনীতে ভারতের বিভিন্ন ধনপতিরা তাঁর কত যে ছবি কিনেছেন তার হিসেব দেবার সুযোগ কৈ? তবে তাঁর আঁকা দু' চারখানা বিখ্যাত চিত্র যা বিক্রী হয়েছে তার উল্লেখ করছি। একাডেমী অব ফাইন আর্টস থেকে শ্রী কে কে বিড়লা ক্রীত 'তুলির লিখন' ও শ্রীহনুমানদাস পোদ্দার ক্রীত 'শকুন্তলার বিদায় প্রসাধন' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শিল্পীর শিল্প সাধনার যুগকে আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি—(১) স্কুলে পাঠ্য অবস্থা থেকে ১৯৩৯; (২) ১৯৩৯ পর থেকে অধুনা। ১৯৩৯ পর্যন্ত শিল্পী Flower Study এবং Life Study বা স্থির-জীবন ও প্রাকৃতিক চিত্রাঙ্কন-ই করতেন। এ সময় কম্পোজিসন ও ভারতীয় পদ্ধতিতে আঁকা তাঁর খুব কম ছবিই ছিল। ১৯৩৯ পরই শিল্পী ভারতীয় পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কন সুরু করেন। সেই থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর তুলির স্পর্শে প্রায় দুশোর বেশী ছবি বের হয়েছে। শিল্পীর প্রতিটি ছবিই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। শিল্প রসিকেরা লক্ষ্য করলে দেখবেন তাঁর ছবিতে এমন একটা নিখুত পারিপাট্য ও মাত্রাজ্ঞান আছে যা খুব পাকা হাতেও সব সময় দেখা যায় না। অসংকোচে তাঁর ছবিকে আমরা বহু বিশিষ্ট ভারতীয় শিল্পীদের রচনার পাশে স্থান দিতে পারি।

১৯৩৯ গভর্ণমেণ্ট আর্ট ইস্কুল যুদ্ধ তহবিল প্রদর্শনীতে চিত্র দেবার পর এবং বর্ধমানের মহারাজা তাঁর ছবি কেনার পর থেকেই আত্মীয় ভবানীবাবু ও শিল্প-রসিকেরা তাঁর শিল্প প্রতিভার কথা জানতে পারেন। চিত্র শিল্পে শিল্পীর অসাধারণ নৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়ে শিল্পী ভবানীচরণ তাঁকে প্রেরণা দিতে থাকেন, কিন্তু সতীনবাবু ভবানীবাবুর কাছে হাতে কলমে কোন শিক্ষাই পাননি। শিল্পী যখন জানতে পারলেন যে তাঁর চিত্র যা-তা নয় রসিক জগত তাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে গ্রহণ কোরেছেন তখন তিনি এদিকেই মন ঢেলে দিলেন। শিল্পী ভালোভাবেই এম-এ

বৃক্ষদেবতা

পাশ কোরেছিলেন। কাজ খুঁজলে কাজের কোন অভাবই ঘটতো না, কিন্তু বাণী যাঁকে শিল্পের সাধনায় নিয়োজিত করবেন তাঁর অন্যপথ কোথায়!

'শকুন্তলা' সিরিজের ছবিগুলোকেই শিল্পীর সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও প্রিয় রচনা বলে আমার মনে হয়। 'শকুন্তলা' সিরিজে তাঁর মোট কুড়িখানা ছবি আছে। ছবিগুলের অধিকাংশই বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকা ও তাঁর স্বরচিত 'শকুন্তলা' গ্রন্থের মাঝেও স্থান পেয়েছে। তাঁর বহু ছবি বহুবার একাডেমী অব ফাইন আর্টস, অল ইণ্ডিয়া ফাইন আর্টস এণ্ড ক্র্যাপ্টস সোসাইটী, দিল্লী, ট্রেভলিং আর্ট একজিবিসন প্রভৃতিতে প্রদর্শিত হয়ে কলারসিকের প্রশংসা ও সাধুবাদে ধন্য হয়েছে।

Orient, ভারতবর্ষ, বঙ্গশ্রী, প্রবাসী, ললিতা, পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা শারদীয়া সংখ্যা, দ্বন্দ্ব, বর্তমান, মৌচাক প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকাগুলোর পাতায় তাঁর ছবি বহন কোরে জনসমাজে সুখ্যাতি লাভ করেছে। গত বছর উত্তর কলিকাতা শিল্পী সঙ্ঘ সতীন্দ্র বাবু নির্মিত সরস্বতী মূর্তি অর্চনা কোরেছেন। ১৩৫৮ নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলনের উদ্যোক্তারা তাঁকে শিল্প নির্দেশক বা আর্ট ডাইরেক্টর নিযুক্ত কোরে শিল্পীর শিল্প প্রতিভার যথার্থ মর্যাদা দিয়েছেন। সম্মেলনের যাবতীয় শিল্প পরিকল্পনা ও আলপনা, নিমন্ত্রণপত্র, পোস্টার প্রভৃতি শিল্পী নিজেই রচনা করেন। 'বর্তমানে' প্রকাশিত 'আধুনিক শিল্প ধারার ক্রমবিকাশ', 'পথপ্রান্তরে' প্রকাশিত অবণীন্দ্রনাথের শিল্পে স্বাদেশীকতা প্রভৃতি শিল্প সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলো শিল্প সাহিত্যে অমূল্য দান। এ ছাড়া ছদ্মনামে তাঁর বহু প্রবন্ধ ও শিল্প সমালোচনা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

সমালোচক

রামেন্দ্রসুন্দর

শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তী

ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর যুগসন্ধিক্ষণে যেসকল বাঙালী স্রষ্টা-পুরুষ আকাশস্পর্শী ব্যক্তিত্বের বলে সমগ্র বাঙ্‌লাদেশ ও বাঙালী জাতিকে গৌরবের উচ্চতম আসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তন্মধ্যে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী অন্যতম। রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন সর্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী। তাঁহার অনন্যসদৃশ মনস্বীতা, সুদুর্লভ চরিত্রবল, অপূর্ব কর্মনিষ্ঠা এবং অবিচলিত আদর্শবাদিতা তাঁহাকে এক অলোকসামান্য মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছে। বস্তুতঃ রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনব্যাপী সাধনা একটি সুসমঞ্জস সৌন্দর্যের সাধনা, সর্বলোকহৃদয় রঞ্জিত মাধুর্যের প্রতীক। তাঁহার জ্ঞান-প্রেম কর্ম, তাঁহার শিক্ষা দীক্ষাধর্ম, তাঁহার দানত্যাগ অর্ঘ, তাঁহার ধ্যানজপমন্ত্র সর্বকিছুই প্রভাতসূর্যের আলোকরশ্মিচ্ছটা, পুষ্পের বর্ণসৌরভ ও পরিপক্ব ফলের সুমিষ্ট রসের মত অতিশয় স্বাভাবিক-ভাবে বিকশিত হইয়াছে। এমন একজন ব্যক্তিপুরুষের সমগ্র কৃতির পরিচয় করা যে সহজসাধ্য নয়, তাহা বলাই বাহুল্য। অধিকন্তু যে পরিমাণ রসবুদ্ধি ও চিত্তোৎকর্ষ লাভ করিলে উহার মর্মার্থ উপলব্ধি করা যায়, তাহা বর্তমানকালে অতি অল্প কয়েকজনের মধ্যে দৃষ্ট হয়। কারণ রামেন্দ্রসুন্দরের প্রধান পরিচয় এই—তিনি বৈজ্ঞানিক, তিনি দার্শনিক, তিনি সাহিত্যিক, তিনি শিক্ষাবিদ্ তিনি সনাতন হিন্দু-ধর্মের অন্যতম ব্যাখ্যাতা এবং দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ পূজারী।

আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা তাঁহার সৃজনী শক্তির সম্যক পরিচয় প্রদান না করিয়া কেবলমাত্র অংশবিশেষের প্রতি মনোনিবেশ করিব। অর্থাৎ অনন্ত নিরাকারকে ধ্যান করিবার নিষ্ফল চেষ্টা না করিয়া শান্ত সাকার বিগ্রহকে ধারণা করিব বা কল্পনার আধারে বিরাটের স্বরূপকে বিধৃত করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিব।

রামেন্দ্রসুন্দর আগাগোড়াই সাহিত্যিক। কিন্তু সাধারণ অর্থে সাহিত্যিক বলিলে যাহা বুঝায় তিনি আদৌ তাহা ছিলেন না। অর্থাৎ তাঁহার জীবনে রসসৃষ্টি বা সুকুমার সাহিত্য রচনা অপেক্ষা অন্য একটি গভীর প্রেরণা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। তাঁহার নিকট সাহিত্য শুধু রসময়ী, ভাবময়ী ও লাবণ্যময়ী রচনাই নয়—উহা শব্দশক্তির সহিত চিন্তাশক্তির সংযোগ এবং শ্রুতির সহিত স্মৃতির মিলনও বটে। প্রকৃতপক্ষে যাহা দেশকালাতীত সত্যের নিদর্শন, মানুষের মনুষ্যত্বের উদ্বোধনে যাহা সহায়তা করে তাহাকেই তিনি সাহিত্যের মর্যাদা দান করিয়াছেন। সেই কারণে রামেন্দ্র-সুন্দরের সাহিত্য আংশিক আলোচনামাত্র নয়—তাহা পূর্ণাংগ গবেষণা। তাঁহার সাহিত্য জীবনসত্যের প্রতিভাস নয়—উহার প্রত্যক্ষ অনুশীলন এবং অপরোক্ষ অনুভূতি। রসের স্ফুরণ না থাকিলেও তাহাতে রুচির প্রমাণ এবং চিত্তের কর্ষণা নিশ্চয়ই রহিয়াছে। এই প্রসংগে একজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকের একটি মূল্যবান উক্তি প্রণিধান-যোগ্য: 'সাহিত্য-জগতেই ত্রিবেদী মহাশয়ের কৃতিত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক। বংগসাহিত্যে রামেন্দ্রবাবুর স্থান অতি উচ্চ, একথা বলিলে কিছুই বলা হয় না। কোনও কোনও বিষয়ে বংগসাহিত্য বলিতে ত্রিবেদী মহাশয়কেই বুঝায়। ত্রিবেদী মহাশয় সে সকল বিষয়ের প্রাণ। মেটারলিংককে বাদ দিয়া আধুনিক রোমাণ্টিক সাহিত্য যেরূপ হয়, গেরার্ড হাউপ্টমানকে ছাড়িয়া Realistic drama যেরূপ দাঁড়ায়, বাংগলা সাহিত্যের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বিভাগে এবং কতকপরিমাণে ইতিহাস বিভাগে, রামেন্দ্রসুন্দরকে বাদ দিলেও ঠিক সেইরূপ হয়।' (আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—ডক্টর শিশির-কুমার মৈত্র—সাহিত্য ১৩২৬ শ্রাবণ)

শৈশবকালেই সাহিত্যের প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক অনুরাগ জন্মিয়াছিল। তখন হইতেই তিনি সাহিত্যের সেবা ও সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার বয়স যখন আট বৎসর সেই সময় বঙ্কিমচন্দ্রের 'বংগদর্শন' প্রথম প্রকাশিত হয় (১২৭৯ সাল)। বংগদর্শনে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি তাঁহার বালকমনের সম্মুখে চিন্তার নূতন ও প্রশস্ত রাজপথ উন্মুক্ত করিয়া দিল। অতঃপর 'আর্যদর্শন' ও 'বান্ধবের' যুগ অতিক্রম করিয়া তিনি 'নবজীবনের' সাক্ষাৎলাভ করিলেন। ঐ 'নবজীবন' হইতেই তাঁহার সাহিত্যিক জীবনেরও সূচনা দেখা যায়। 'নবজীবনের' সম্পাদক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা প্রিয় ব্যক্তি এবং 'বংগদর্শন' পরিমণ্ডলের অন্যতম শক্তিশালী লেখক শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার। ইনি তৎকালীন যুগে সমালোচনা সাহিত্যের ক্ষেত্রে একজন দিক্‌পাল। আজ আমাদের দেশে ব্যংগ ও বক্রোক্তিমূলক রচনার অভাব কেউ বোধ করেন না, কিন্তু এই রীতির প্রবর্তক কে তাহা অনেকেই জানেন না। মধুসূদনের প্রহসন বা বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত যেমন এক-দিকে আমাদের সমাজের নানা ব্যাধির প্রতি অংগুলি প্রদর্শন করিয়া উহার বিষময় পরিণাম হইতে সাবধান করিয়া দিয়াছে, তেমনি অপরদিকে অক্ষয় সরকারের 'নবজীবন' ও 'সাধারণীতে' প্রকাশিত 'শুধুই রহস্য', 'নূতন মতে নূতন পঞ্জিকা', 'চণকচূর্ণ বা চানাচুর', 'শুক-সারী সংবাদ', 'নববোধদয়', 'ভাই-হাততালি' প্রভৃতি লেখা-গুলির তীক্ষ্ণ ব্যংগ ও বক্রোক্তি সমাজের ত্রুটিবিচ্যুতির মূলে কুঠারা-ঘাত করিয়াছে। রামেন্দ্রসুন্দর অক্ষয় সরকারের রচনার প্রতি এরূপ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, অক্ষয়চন্দ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেন। বস্তুতঃ রামেন্দ্রসুন্দরের রচনায় যে বক্রোক্তি পাঠকের দৃষ্টি এড়াইয়া যায় না তাহার মূলে আছে অক্ষয়চন্দ্রের পরোক্ষ প্রভাব। কিন্তু একথা যাক। যাহা বলিতেছিলাম, তাহা এই যে 'নবজীবন' হইতেই রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্যকর্ম আরম্ভ হয়। এ বিষয়ে তিনি বলিয়াছেন: 'নবজীবনের প্রথম বর্ষেই হঠাৎ এক-দিন মাসিক পত্রিকার লেখক হইয়া পড়িলাম। একটা প্রবন্ধ লিখিয়া ফেলিলাম। যে পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার, লেখক স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র, তাহাতে স্বনামে প্রবন্ধ পাঠাইতে সাহসী হইলাম না;

বেনামীতে পাঠাইলাম। কিন্তু পত্রিকার চতুর সম্পাদক কিরূপে প্রবন্ধ লেখককে ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। নিজনামেই প্রবন্ধটি বাহির হইল।' (ভারতী বৈশাখ, ১৩২৩)

১২৯১ সালের পৌষ সংখ্যা 'নবজীবন'-এ প্রকাশিত 'মহাশক্তি' প্রবন্ধটি তাঁহার প্রথম রচনা। ইহার পর তিনি 'বিবর্তন' 'মহাতরঙ্গ', 'সৃষ্টিতত্ত্ব' ইত্যাদি কতকগুলি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। অতঃপর সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর হইলে তিনি 'সাধনা', 'ভারতী', 'সাহিত্য', 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা' প্রভৃতি হইতে আহূত হইয়া নিয়মিত প্রবন্ধ রচনা করিয়া চলিলেন।

বাংলাদেশের প্রবন্ধ সাহিত্যের বর্তমান দৈন্যের -যুগে রামেন্দ্রসুন্দরের চিন্তাশীল রচনাগুলির মর্ম ও সার্থকতা উপলব্ধি করা সহজসাধ্য নয়। তিনি যে বাংলার প্রবন্ধ সাহিত্যকে কিরূপ সমৃদ্ধ করিয়াছেন সে বিষয়েও অনেকে অবগত নন। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়া কেহ যদি পরবর্তী দুইজন শক্তিশালী প্রবন্ধকারের অনুসন্ধান করেন তাহা হইলে যে দুইজনের নাম সর্বাগ্রেই দেখিতে পাইবেন তাঁহারা হইলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। দুইজনের মধ্যে কিছু বৈসাদৃশ্য থাকিলেও মূলতঃ সাদৃশ্য অনেক। দুইজনের সাদৃশ্য এই যে উভয়েই স্বাধ্যায়শীল ব্রাহ্মণ, ধর্মাশ্রয়ী, আদর্শবাদী ও স্বদেশানুরাগী। আর বৈসাদৃশ্য এই যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রত্নতাত্ত্বিক এবং পুরাবৃত্তানুরাগী আর রামেন্দ্রসুন্দর বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও তত্ত্বানুরাগী। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কেবলমাত্র পশ্চাতের দিকে তাকাইয়া ঐতিহ্য সংস্কারের কথা চিন্তা করিয়াছেন আর রামেন্দ্রসুন্দর সম্মুখপানে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া সত্যের নবতন রূপ উদ্ঘাটিত করিয়া বর্তমানের সহিত ভবিষ্যতের সেতুবন্ধ ঘটাইয়াছেন। বৈজ্ঞানিক রামেন্দ্রসুন্দর 'প্রকৃতি', 'জিজ্ঞাসা', 'বিচিত্র জগত' ও 'জগৎ কথা' গ্রন্থে যেমন শক্তির পরিচয় দিয়াছেন তেমনি 'ব্রতলক্ষ্মীর কথা' 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ', 'যজ্ঞকথা', 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' তাঁহার অনন্যসাধারণ মননশীলতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক রামেন্দ্রসুন্দরকে স্মরণ করিব না—সাহিত্যসাধক রামেন্দ্রসুন্দরের সহিত পরিচয় করিব এবং তাহাও তাঁহার বিচারমূলক সাহিত্যিককৃতির আলোকে। দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তুর অবলম্বনে রচিত তাঁহার প্রবন্ধ বাঙ্লাসাহিত্যের অতিশয় মূল্যবান সম্পদ এবং সে বিষয়ে তাঁহার ন্যায় কৃতিত্ব তৎকালীন যুগে আর কেহই প্রদর্শন করিতে সক্ষম হন নাই। যদিও পরবর্তীকালে শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের নাম আমরা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ না করিয়া পারি না। রামেন্দ্রসুন্দরের ন্যায় তিনিও বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত এবং দার্শনিকতায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তথাপি এক হিসাবে রামেন্দ্রসুন্দরের মনীষা মৌলিকতায় উজ্জ্বল। তিনি বিজ্ঞানের সহিত দর্শনের যেরূপ সার্থক সমন্বয়-সাধন করিয়াছেন তাহা আমাদের দেশে ত ইতিপূর্বে কখনও কেহই পারে নাই, এমন কি পাশ্চাত্য দেশেও বহু পূর্বেকার জন ষ্টুয়ার্ট মিলের পর সাম্প্রতিক কালের এইচ জি ওয়েলস আইনস্টাইন, বা বার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রমুখ মুষ্টিমেয় প্রতিভাবান ব্যক্তিদের দ্বারা সম্ভবপর হইয়াছে।

রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধগুলির সংখ্যা অধিক নয়। তাঁহার ঐ স্বল্পরিমাণ প্রবন্ধগুলিতে বিচারকের সমদৃষ্টি বা

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

বিশ্লেষণী শক্তির প্রমাণ না থাকিলেও স্বকীয় চিন্তার যে একটি সুস্পষ্ট ছাপ রহিয়াছে তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। বস্তুতঃ দুরূহ তত্ত্বের চাপে পিষ্ট হইয়া তাঁহার তথ্যের অপমৃত্যু হয় নাই। তাঁহার প্রবন্ধগুলি তথ্যসমাবেশে এবং প্রকাশভঙ্গীর নবত্বে অনবদ্য। তাঁহার মননশীল দৃষ্টিভঙ্গী সাহিত্যের মূলগত সত্যের সন্ধানে বাহির হইয়া উহার রহস্যের আবরণ উন্মোচিত করিয়া দেখিয়াছে। 'সাহিত্য কথা' ও 'মহাকাব্যের লক্ষণ' এই দুইটি প্রবন্ধে তিনি তাঁহার সাধনলব্ধ সত্যকে সকল সাহিত্যানুরাগীর নয়নগোচর করিয়া দিয়াছেন। প্রবন্ধ দুইটি তাঁহার 'নানাকথা' নামক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের বিভিন্ন আলোচনায় 'নানাকথা' সমুজ্জ্বল। তন্মধ্যে আবার এই দুইটি আলোচনা মৌলিক চিন্তাপ্রসূত ও অপ্রতিবাদ্য। যে দৃঢ়তা ও যুক্তিনিষ্ঠা ইহাদের সর্বজন বোধগম্য করিয়া দিয়াছে, তাহাই ইহাদের সার্থকতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

বিশুদ্ধ কাব্যের প্রধান লক্ষণ উহার রসোত্তীর্ণতা। কাব্যের সহিত তত্ত্বের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। কোনও রসিক ব্যক্তি কাব্যের রসসুধা পান করিবার সময় উহার অভ্যন্তরস্থ তত্ত্বের সন্ধান করেন না। রামেন্দ্রসুন্দর কবি কালিদাসের কাব্য হইতে দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া এই কথা প্রমাণিত করিয়া দিয়াছেন। 'অন্য কবি হইতে কালিদাসের বিভেদ তাঁহার সৌন্দর্য দৃষ্টিশক্তি বিষয়ে, উহার সৌন্দর্য

অনুভূতির তীক্ষ্ণতায় ও তীব্রতায়, তাঁহার সৌন্দর্যসৃষ্টি সামর্থ্যে।' কালিদাসের কবিদৃষ্টি বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরালে যে সৌন্দর্যময়ী প্রতিমাকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহাকেই ভাষা ও ছন্দের সাহায্যে বাস্তবরূপে অভিব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। রামেন্দ্রসুন্দর বলিয়াছেনঃ 'অপর সাধারণে যেখানে সৌন্দর্য দেখেনা, কালিদাস সেখানে সৌন্দর্য দেখিতেন। অপরের নিকট যাহা শাদা, কালো অথবা বর্ণহীন, তাঁহার নিকট তাহা রূপবান ও রঞ্জিত। ...মদস্রাবী হাতীর মত্তগতিতে, অথবা বৃষভের খুরস্ফালনে, অথবা হিমগিরি গহ্বর প্রান্তস্থ কীচকের দূরাগত ধ্বনিতে অন্যে যে পুলক পায় না, কালিদাস তাহা পাইতেন। সায়ংকালে বল্কল পরিহিতা বনসুন্দরীগণ আলবালে জলসেচন আরম্ভ করিলে কেমন সুন্দর দেখায়, সুন্দরীর বদনকমলে কমলভ্রমে মধুকর আসিয়া দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিলে তাহাকে লীলাকমলাঘাতে তাড়নার জন্য মৃণালবাহু সঞ্চালিত করিলে কেমন দেখায় এবং চন্দ্রকর-ধৌত শুভ্র স্ফটিক প্রান্তরে দিব্যকুমারীগণ মুক্তা ছড়াইয়া ক্রীড়মানা হইলে কিরূপ সৌন্দর্যের স্ফূর্তি হয়, তাহা আমরা তাঁহার প্রসাদে কতকটা অনুভব করিতে পারি।" কবি শব্দের যথার্থ সংজ্ঞা লইয়া এ পর্যন্ত যথেষ্ট বাদানুবাদ হইয়াছে। তথাপি কোন সংজ্ঞাই সর্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হয় নাই। কেহ বলেন যে, স্বভাবকে যিনি সুন্দর করিয়া দেখেন এবং দেখান, তিনি সত্যকার কবি। এবং এই সংজ্ঞা অনুসারে কালিদাস অবিসম্বাদীরূপে কবি। আবার কেহ বলেন যে, যিনি জগতের একখানা যথাযথ চিত্রপট আঁকিয়া দিতে পারেন, তিনিই যথার্থ কবি। "নীতিপ্রচারক, শাস্ত্রকার ও সমাজ বিধাতার দলে যে কথাটা গোপন করিয়া মনুষ্যসমাজের চোখে ধূলি-মুষ্টি নিক্ষেপ করিতে চাহেন, মহাকবিগণ সেই কথাটাই খুলিয়া বলেন এবং সত্যবাদিতা যদি প্রশংসনীয় হয়, তবে সেই প্রশংসাই এই শ্রেণীর মহাকবিগণের প্রাপ্য।'

অতঃপর 'মহাকাব্যের লক্ষণ' শীর্ষক প্রবন্ধের আলোচনা করা যাক। রামেন্দ্রসুন্দরের এই প্রবন্ধটি সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন সুপরি-চিত এমন আর কোনটি নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তকে ইহা সংকলিত হইলেও সমালোচনা হিসাবে ইহার মূল্য আদৌ নগণ্য নয়। লেখক এখানে বিজ্ঞানীর দার্শনিকতার দ্বারা বিষয়টির বিচার করিয়াছেন। আমাদের সাহিত্যে মধুসূদন হইতে যোগীন্দ্রনাথ বসু পর্যন্ত যে সকল মহাকবি মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন পাশ্চাত্যদেশের আদর্শ ও লক্ষণ অনুযায়ী তাহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ চলিতে পারে না, কিন্তু রামায়ণ, মহাভারতের বেলায় বিচারের মাপকাঠি আমাদের পরিবর্তন করিতে হয়। কেননা প্রথমতঃ এই দুই গ্রন্থ অলংকারশাস্ত্রের নিয়মাবলী অত্যন্ত উৎকটরূপে লঙ্ঘন করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ মহাকাব্য বলিলে উহাদের গৌরবহানির সম্ভাবনা জন্মে। পাশ্চাত্যদেশে মহাকবি বলিয়া যদি কাহাকেও আখ্যাত করিতে হয় তাহা হইলে হোমার ব্যতীত আর কাহারও নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে না। রামেন্দ্রসুন্দর এই প্রসঙ্গে একটি গভীর চিন্তাপূর্ণ তত্ত্বকে আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেনঃ 'সভ্যতা কবিত্বের মস্তক চর্বণ করিতে পারে, কিন্তু মহাকাব্যকে বোধ করি সশরীরে গ্রাস করিয়া ফেলে।' তাঁহার এই উক্তির অর্থ এই যে বর্তমানের প্রতিকূল পরিবেশই বর্তমানের মহাকাব্যের অভাবের প্রধান লক্ষণ। সভ্যতার অগ্রগতি মহাকাব্য সৃষ্টির অন্ত-রায়। 'মহাকাব্যের মধ্যে একটা উন্মুক্ত অকৃত্রিম স্বাভাবিকতা আছে, তাহা বোধ করি আর কখনও ফিরিয়া আসিবে না।...মহাভারতের ঘটনা প্রাচীন ভারত সমাজের একদেশে সংঘটিত হইলেও, ইহাকে আমরা সমগ্র মনুষ্য সমাজের একটা মহাবিপ্লবের চিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।...হয়তো কোন ক্ষুদ্র প্রাদেশিক ঘটনার স্মৃতিমাত্র অবলম্বন করিয়া মহাকবি আপনার চিত্তবৃত্তির সমাধিকালে মানব-সমাজের মহাবিপ্লবের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন ; এবং সেই স্বপ্নদৃষ্ট ধ্যানলব্ধ মহাবিপ্লবের ধর্মের সহিত অধর্মের মহাসমরের চিত্র ভবিষ্যত যুগের লোকশিক্ষার জন্য অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।'

এই কারণে মহাকাব্যের আর একটি লক্ষণ এই যে তাহা অধ্যয়নের অপেক্ষা না রাখিয়া জাতির হৃদয়ে আসন পাতিয়া বসে। কোন্ স্মরণাতীত কাল হইতে রামায়ণের বা মহাভারতের কাহিনী আমাদের অশিক্ষিত জনসাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে এবং তাহাদের দৈনন্দিন জীবনকে সুপথে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে তাহা বর্ণনাতীত। বস্তুতঃ এখানেই মহাকাব্যের মহিমা বা তাহার সৃষ্টির সার্থকতা।

অতঃপর আমরা রামেন্দ্রসুন্দরের অন্যান্য আলোচনায় মনোনিবেশ করিতেছি। ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্যিক প্রবন্ধাবলীর সংখ্যা অল্প। যে কয়েকটি আছে তন্মধ্যে কতকগুলি ব্যতীত আর সব সাধারণ আলোচনা, তাহাতে তাঁহার চিন্তার সুস্পষ্ট ছাপ থাকিলেও বিশ্লেষণী বিচার দৃষ্টির পরিচয় নাই। আমরা ঐ শেষোক্ত প্রবন্ধগুলি এই আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করিব না। তবে প্রসঙ্গক্রমে যে প্রবন্ধটি আসিয়া যাইবে তাহাকে অগ্রাহ্য করিব না। যেমন তাঁহার 'বিদ্যাসাগর' নামক প্রবন্ধটি। বিদ্যাসাগর ছিলেন পুরুষসিংহ। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আজিও বাঙালীর সম্মানের মূলে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব কতখানি তাহার পরিমাপ হইবে না। অতএব এই ব্যক্তির চরিত্র চিত্রটি যদি কেহ অঙ্কিত করিয়া শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে জনসাধরণকে প্রদর্শন করান তবে তিনি জাতীয় কর্তব্য পালন করিবেন। বিদ্যাসাগর এক হিসাবে বাংলা গদ্যের জনক। তাঁহার 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' গদ্যের পথপ্রদর্শক ধ্রুবতারা। এতদ্ব্যতীত তাঁহার 'বাঙ্গলার ইতিহাস', 'জীবন চরিত' বাংলা সাহিত্যের ইতি-হাসে অবিস্মরণীয়। এই বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর বলিয়া-ছেনঃ 'বিদ্যাসাগর যে সামর্থ্য ও আত্মনির্ভর শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সাধারণ বাঙ্গালীচরিত্রে তাহার তুলনা মেলে না।...যে পুরুষকারে পুরুষের পৌরুষ, সাধারণ ইউরোপীয়ের চরিত্রে যাহা বর্তমান, সাধারণ বাঙালীর চরিত্রে যাহার প্রভাব, বিদ্যাসাগরের চরিত্রে তাহা প্রচুর পরিমাণে ছিল।...বিদ্যাসাগরের লোকহিতৈষিতা সম্পূর্ণ প্রাচ্য ব্যাপার। ইহা কোনরূপ নীতিশাস্ত্রের, ধর্মশাস্ত্রের, অর্থশাস্ত্রের বা সমাজশাস্ত্রের অপেক্ষা করিত না।' পরিশেষে রামেন্দ্র-সুন্দর বলিয়াছেনঃ বঙ্গদেশের মধ্যে ছোট বড় এমন ব্যক্তি অল্পই আছেন, যিনি কোন না কোন প্রকারে বিদ্যাসাগরের নিকট ঋণগ্রস্ত নহেন।

ইহার পরেই উল্লেখযোগ্য আলোচনা 'বঙ্কিমচন্দ্র'। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার চারিখানি উপন্যাসে মনুষ্যের গোড়ায় গলদের কথা বলিয়া-ছেন। ঐ চারিখানি উপন্যাসের নাম—বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, রজনী, কৃষ্ণকান্তের উইল। মানবজীবনের গোড়ার কথা আর কিছুই নয়,

উহা পূর্বাপর একটা সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা। একদিকে উদ্দাম প্রবৃত্তির মোহ অপরদিকে অন্তরের ধর্মচেতনা এই দুই পরস্পর-বিরোধী শক্তির কবলে পড়িয়া মানুষ কিরূপ অসহায় কৃপার পাত্র হয় তাহাই এই চারিটি গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। ইহা লক্ষ্য করিয়াই রামেন্দ্রসুন্দর বলিয়াছেন ঃ 'এই চারিখানি গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় এক। প্রতাপ ও নগেন্দ্রনাথ, অমরনাথ ও গোবিন্দলাল, সকলেই কুসুমসায়কের লক্ষ্য হইয়াছিলেন, ধর্মবুদ্ধির দৃঢ়তা ও প্রবৃত্তির তীব্রতার তারতম্যানুসারে কেহ বা জয়লাভ করিয়াছিলেন, কেহ বা পারেন নাই। বীর্যবান্ত প্রতাপ সারা জীবন প্রবৃত্তির সহিত যুদ্ধ করিয়া সম্পূর্ণ জয়লাভ করিয়াছিলেন। মোহমুগ্ধ অমরনাথ আপনার পিঠের উপর আকস্মিক পদস্খলনের স্থায়ী চিহ্ন ধারণ করিয়া তাঁহার স্বাভাবিক দম্ভের বলে পরবর্তী জীবনে সন্ন্যাসী সাজিয়া বেড়াইয়াছিলেন ; পত্নীবৎসল নগেন্দ্রনাথ আপনার আত্মাকে ছিন্নভিন্ন বিদীর্ণ করিয়া অনাথা পিতৃহীনা বালিকার প্রতি দয়াপ্রকাশের ফলভোগ করিয়াছিলেন ; আর সর্বাপেক্ষা কৃপাপাত্র গোবিন্দলাল সর্বতোভাবে আপনার অনধীন ঘটনাচক্রের নিষ্ঠুর পেষণে নিষ্পিষ্ট হইয়া আপনাকে কলঙ্কহ্রদে নিমগ্ন করিয়া অবশেষে অপমৃত্যুদ্বারা শান্তিলাভে বাধ্য হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র মানবজীবনের ও জগদ্বিধানের এই সমস্যা—এই গোড়ার কথা অতি সুন্দর চিত্রে চিত্রিত করিয়াছেন এবং এইজন্য তিনি উচ্চ শ্রেণীর কবি। বঙ্কিমচন্দ্র কতদিক দিয়া আমাদের জাতীয় জীবনের উন্নতি বিধান করিয়া গিয়াছেন তাহা অল্পকথায় বিবৃত করা যায় না। তিনি আদর্শ মাসিকপত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া উহার রচনারীতি ও সংকলন রীতি নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। পাশ্চাত্যশিক্ষার মোহবন্ধন হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিয়া আত্মসম্বিৎ ফিরাইয়া দিয়াছেন। আমাদের সর্বশাস্ত্রসার শ্রীমদ্ভাগবত গীতার অবিস্মরণীয় উক্তি 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মোভয়াবহঃ'-এর তাৎপর্য আমাদের চিন্তা, কর্ম ও জ্ঞানে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন এবং ধর্মের অনুশীলনের অর্থ যে সমুদয় বৃত্তির সর্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্য সাধন তাহাও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছেন। বাঙলা-সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কর্ম কি তাহার উত্তরে রামেন্দ্রসুন্দর বলিয়াছেন ঃ 'তিনি সাহিত্য উপলক্ষ করিয়া আমাদিগকে আপনঘরে ফিরিতে বলিয়াছেন এবং সে বিষয়ে তিনি যেমন কৃতকার্য হইয়াছেন, অন্য কেহই সেরূপ হন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙলা ভাষাকে সংস্কৃত করিয়া উহাকে সাহিত্যসৃষ্টির উপযোগী করিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র উহাকে পুনঃ সংস্কৃত করিয়া বাঙলা সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।...বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম আমাদিগের নিকট যুগধর্মের আবশ্যতা নির্দেশ করিয়াছিলেন এবং যুগধর্মের সংস্থাপনের জন্য যিনি যুগে যুগে সম্ভূত হন, তাঁহার মহৈশ্বর্যমণ্ডিত মূর্তি আমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।'

রামেন্দ্রসুন্দরের 'চরিত কথা' গ্রন্থখানি প্রধানতঃ বাংলা দেশের মনীষী ও সুধীবৃন্দের জীবনগাথা অবলম্বনে রচিত। কিন্তু তাহার মধ্যে এমন কতকগুলি তথ্য ও সাহিত্যিক মতামত রহিয়াছে যাহা হইতে অনুরাগী ব্যক্তির তাঁহাদের সাহিত্যিক চিন্তার সহিত পরিচিত হইতে বিলম্ব হইবে না। পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের অভিমত ব্যক্ত করা হইয়াছে। এক্ষণে অন্যান্য মনীষীদের সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা দ্রষ্টব্য।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হইতে ঠাকুর পরিবারের সৃজনী শক্তি স্ফূর্তি লাভ করে। বাঙলা সাহিত্যে তাঁহার দান নগণ্য নয়। রামেন্দ্রসুন্দরও বলিয়াছেন ঃ 'সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মহর্ষিকে বঙ্গসাহিত্যের সেবকরূপে প্রতিপন্ন করিতে গেলে তাঁহাকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করিতে হইবে।...ভগীরথের ন্যায় শঙ্খধ্বনিপূর্বক তিনি যে অভিনব সাহিত্যের ভাগীরথী বঙ্গভূমিতে প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন, স্বাতন্ত্র্যের সহিত সংযমকেই তাহার প্রধান লক্ষণরূপে দেখিতে পাই।'

উমেশচন্দ্র বটব্যাল ও রজনীকান্ত গুপ্ত সম্বন্ধেও তাঁহার দুটি মনোজ্ঞ রচনা আছে। উমেশচন্দ্র 'সাহিত্য' পত্রিকার একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। 'বৈদিককালে গোহত্যা' তাঁহার প্রথম সাহিত্যিক প্রয়াস। অতঃপর তিনি 'সাধনা' পত্রিকায় সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্যা প্রকাশিত করেন। উমেশচন্দ্র প্রধানতঃ স্বদেশের পুরাবৃত্ত উদ্ধারে ব্যাপৃত ছিলেন। 'উমেশচন্দ্রের বৈদিক প্রবন্ধসমূহ আমার নিকট অয়স্কান্তের কাজ করিত। তিনি পাশ্চাত্য পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া দেশের প্রাচীন অবস্থার আলোচনা করিতেন। কিন্তু কেবল বৈদেশিক মতের অনুসরণ করিয়া যাইতেন না স্বাধীনভাবে চলিতে চাহিতেন। উমেশচন্দ্রের দার্শনিক মত তাঁহার সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি সাংখ্য মতানুবর্তী দ্বৈতবাদী ছিলেন। সমাজ-ধর্ম পালনে তিনি চতুর্বর্ণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বেদমূলক শাস্ত্রানুমোদিত সামাজিক ব্যবহারের অনুরাগী ছিলেন।'

রজনীকান্ত গুপ্ত আমাদের সাহিত্যাকাশে একটি জ্যোতিষ্কের সমান। তিনি প্রথমে 'জয়দেব চরিত' (১২৮০) নামে একটি জীবন-চরিত রচনা করেন। অতঃপর গোল্ড ষ্টুকারের পাণিনি অবলম্বন করিয়া তিনিও 'পাণিনি' পুস্তক প্রকাশ করেন। তিনি ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পত্রিকা 'এডুকেশন গেজেট' ও 'বঙ্গবাসী' সংবাদপত্রের নিয়মিত লেখক ছিলেন। তাঁহার 'আর্যকীর্তি' নামক গ্রন্থ স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি অনুরাগে পূর্ণ। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রজনীকান্তের স্থান কোথায় তাহার উত্তরে রামেন্দ্রসুন্দর বলিয়াছেন ঃ স্বাধীনভাবে ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাস আলোচনায় তিনিই পথপ্রদর্শক। তৎপূর্বে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু রামদাস সেন প্রভৃতি ভারতের পুরাতত্ত্বের স্বাধীন আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। যখন 'বেঙ্গল এ্যাকাডেমী অফ লিটারেচার' বিজাতীয় বেশ পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রূপান্তরিত হয়, রজনীবাবু তদবধি উহার সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার' তিনি প্রথম সম্পাদক। প্রথম দুই বৎসর তিনি দক্ষতার সহিত পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন।'

রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্যিক অনুসন্ধিৎসা কেবলমাত্র কতকগুলি প্রবন্ধ রচনার পর ক্ষান্ত হইয়া যায় নাই। তাহা বিভিন্ন দিকে বিকশিত হইয়াছে। তিনি একাধিক গ্রন্থের যে সকল ভূমিকা লিখিয়াছেন, বিভিন্ন সভাসমিতিতে যে সকল ভাষণ দিয়াছেন এবং প্রাচীন পুঁথি উদ্ধার করিয়া সেই সম্বন্ধে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহাতে এই কথাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, তিনি একজন যুগনায়ক সাহিত্যিক ও রসপ্রমতা। গ্রন্থাবলীর ভূমিকাগুলির মধ্যে তাঁহার বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলীর, অভয়ের কথার ও বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত চণ্ডীদাসের অমর কাব্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' ভূমিকা সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে আবার বলেন্দ্র গ্রন্থাবলীর

ভূমিকাটি লেখকের প্রতি মমতা ও গুণগ্রাহীতার পরিচায়ক। বলেন্দ্রনাথ ছিলেন প্রতিভাশালী লেখক। অতিশয় স্বল্পায়ু জীবনে তিনি যে সকল গভীর চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। রামেন্দ্রসুন্দরও বলিয়াছেনঃ 'বালক বলেন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছেন, অনেক বয়োবৃদ্ধেরও তাহাতে শিখিবার আছে। বলেন্দ্রনাথের কোনও রচনা সুপাঠ্য বই অপাঠ্য বা ক্লেশপাঠ্য নহে। এই রচনাভঙ্গীই আমাকে প্রথমে আকর্ষণ করিয়াছিল ; এমন সযত্নে গাঁথা শব্দের মালা তার পূর্বে আমি দেখি নাই।... বলেন্দ্রনাথের আলোচ্য বিষয় অনেক ছিলঃ কাব্য ও কলাবিদ্যা, মানবসমাজ ও গৃহস্থগৃহ, মানবের চিত্ত ও মানবের জীবন। কিন্তু কেবল বিশ্লেষকের মত দোষ দর্শন ও হীনতার আবিষ্কার তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না; সৌন্দর্য আবিষ্কারই তাঁহার প্রধান কার্য ছিল। কাজেই বাঙ্গালীর অন্তঃপুরে, বাঙ্গালীর গৃহস্থালীতে, সামাজিক প্রথার ও দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্ম যাহা সত্য আছে যাহা সুন্দর আছে, যাহা শিব আছে তাহা সহসা আবিষ্কৃত করিয়া বলেন্দ্রনাথ অন্ধকে দৃষ্টিদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।"

বলেন্দ্র গ্রন্থাবলীর ভূমিকার ন্যায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' মুখবন্ধটিও তাঁহার একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' কর্তৃক প্রকাশিত শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত এবং তাঁহারই আবিষ্কৃত পুঁথি কবি চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' বাংলাসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। ইহার রসসুধা পান করিয়া কাব্যামোদী বাঙালী জাতি যুগে যুগে পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে। বসন্তবাবুর পূর্বে চণ্ডীদাসের পদাবলীর প্রামাণ্যতা সম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদ হইয়াছে ; কিন্তু তাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুঁথিখানি আবিষ্কৃত হওয়ার পর সকল সন্দেহের নিরসন হইয়াছে। তাঁহার পুঁথির ন্যায় অবিকৃত গ্রন্থ আর নাই। ইহা চতুর্দশ শতাব্দীর পশ্চিমবঙ্গের ভাষার নমুনার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের একটি উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

'চণ্ডীদাসের এই লুপ্ত গ্রন্থ হইতে, বাঙ্গলাভাষার ও বাঙ্গলা সাহিত্যের সম্পর্কে নানা সমস্যার সমাধান হইবে। বাঙ্গলা লিপির ইতিহাস, বাংলা উচ্চারণের ইতিহাস, বানানের ইতিহাস, বাঙ্গলা ভাষার ইতিহাস, বাঙ্গলা ছন্দের ইতিহাস, বাঙ্গলা পদসাহিত্যের ইতিহাস, ইত্যাদি ইত্যাদি নানা ইতিহাসের নানা প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে।...চণ্ডীদাসের নামের ছাপ যে কবিতার উপরে আছে তাহা তখনই তাহার প্রাদেশিকতা হারাইয়া মানবসাহিত্যের কোঠায় গিয়া পেঁাছে—বাঙ্গলাসাহিত্যকে তখনই তাহা নিম্ন হইতে অতি ঊর্ধ্বে তুলিয়া দেয়। ...কালিন্দী নদীর কূলে, গোকুলের গোঠে, অবিরত যে বংশীধ্বনি হইতেছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তাহা গোলক অভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে। বড়ু চণ্ডীদাস বাঙ্গালীজাতিকে তার দূরাগত প্রতিধ্বনি শুনাইয়া গিয়াছেন ; সেই বাঁশীর স্বরের নিকটে সকল তত্ত্বকথা ও শাস্ত্রকথা মিলাইয়া যায়।"

রামেন্দ্রসুন্দরের গবেষণামূলক আলোচনার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'গৌরীমঙ্গল' (সা-প-পত্রিকা, ১৩০৩)। মুর্শিদাবাদ জেলার জেমোর রাজবাটীতে তিনি ঐ পুঁথিখানি দেখিয়া অত্যন্ত উৎসাহিত হন এবং তাহার অব্যবহিত পরেই এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত করেন। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্যের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, কালিকামঙ্গল জাতীয় মঙ্গলকাব্যের ন্যায় গৌরীমঙ্গল রচনার প্রধান উদ্দেশ্য উহার গীতি-প্রচার। ১২১৬ সালে পাকুড়ের রাজা বৈদ্যনাথ ত্রিবেদীর পুত্র রাজা পৃথ্বীচন্দ্র এই কাব্যটি রচনা করেন। ইহার সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর বলিয়াছেনঃ "শুনিতে পাই রাজা পৃথ্বীচন্দ্র শক্তির ভক্ত ছিলেন; শক্তিতত্ত্ব নিরূপণের জন্য গৌরীমঙ্গল লিখিত হয়, সমগ্র গ্রন্থ শক্তির মাহাত্ম্য বর্ণনে পরিপূর্ণ। সংস্কৃত পুরাণের অনুকরণে উহা রচিত হইয়াছে এবং প্রসঙ্গক্রমে দেবদেবী মাহাত্ম্য, তীর্থ-মাহাত্ম্য, উপাসনা পদ্ধতি প্রভৃতির সহিত রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী ও কৃষ্ণলীলা প্রভৃতি বিবিধ বিষয় গ্রন্থমধ্যে স্থান পাইয়াছে। সমগ্র গ্রন্থে ৪১৯টি অধ্যায় আছে এবং গ্রন্থটি পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত।

এই জাতীয় প্রবন্ধ, যাহা সাহিত্যের অনাবিষ্কৃত তথ্যকে আবিষ্কার করে, রামেন্দ্রসুন্দরের আরও কয়েকটি আছে—যেমন, 'কাশীরাম দাসের বংশ-পরিচয় ও কাল-নির্ণয় (সা-প-প—১৩০৬), 'রঘুবংশ ও পদ্মপুরাণ' (বঙ্গদর্শন, ১৩১২) ইত্যাদি।

রামেন্দ্রসুন্দর যে বিশেষত্বের গুণে বাঙ্গালীর হৃদয় জয় করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার দেশাত্মবোধ। তিনি ছিলেন ডিরোজিও প্রবর্তিত যুগের প্রতিক্রিয়ার মূর্ত প্রতীক। তাঁহার সম্বন্ধে বিখ্যাত সমালোচক সুরেশ সমাজপতি বলিয়াছেনঃ 'দর্শনের গঙ্গা, বিজ্ঞানের সরস্বতী ও সাহিত্যের যমুনা—মানবচিন্তার এই ত্রিধারা রামেন্দ্র-সংগমে যুক্তবেণীতে পরিণত হইয়াছিল। রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষা অতুলনীয়। তাঁহার সহজ, প্রাঞ্জল, সরসভাষা, তাঁহার নিপুণ রচনা-রীতি বহুকাল বাঙালী লেখকের লোভনীয় হইয়া থাকিবে।' (সাহিত্য—আশ্বিন, ১৩২৬)

তিনি বাঙ্গলাদেশ, বাঙ্গালী জাতি ও তাহার সাহিত্য সম্বন্ধে কিরূপ উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন তাহার নিদর্শনস্বরূপ তাঁহারই একটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। উক্তিটি ১৩১৪ সালে কাশিমবাজারে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে তাঁহার পঠিত একটি রচনার অংশবিশেষ। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করাইয়া দিই যে, রবীন্দ্রনাথ ঐ সভায় সভাপতির পদে বৃত হন।

..."বাঙ্গলা দেশের বাঙ্গালী জাতির ধারাবাহিক ইতিহাস নাই ; কিন্তু বাঙ্গলা দেশের অতি পুরাতন সাহিত্য আছে। সেই সাহিত্য বাঙ্গালীর পক্ষে অগৌরবের নহে। এমনকি সেই সাহিত্যই বাঙ্গালীর পক্ষে একমাত্র গৌরবের ধন। চণ্ডীদাস মধুর রসের সুধার ধারা ঢালিয়া যে সাহিত্যকে আর্দ্র করিয়াছেন, রামপ্রসাদ তাঁহার মায়ের চরণে আপনাকে নৈবেদ্যস্বরূপে অর্পণ করিয়া যে সাহিত্যে ভক্তি-রসের স্নেহ সেচন করিয়াছেন, সেই সাহিত্য শিরে ধরিয়া, ভবের বাজারে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার অধিকারে আমাদিগকে বাধা দিতে কেহ সাহস করিবে না।"

রামেন্দ্রসুন্দরের এই অভয়বাণী, বলিষ্ঠ আশাবাদ ও ঋষি দৃষ্টি আমাদের ভবিষ্যতের যাত্রাপথে আশীর্বাদ-পাথেয় হউক।

প্রতিবিম্ব

[পঞ্চম পরিচ্ছেদ]

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

কয়েকদিন পরে।

যথাসময়ে সাহেব গাড়ীতে উঠিলেন। গড়ের মাঠের ফাঁকা রাস্তায় পড়িয়া নিতাই বলিল, সুধাকর সাহেব রেজিগনেস্‌ন দিলেন, স্যার?

রেজিগনেসন? তুমি পাগল, না ক্ষ্যাপা, কি হে নিতাই তোমার মাথা খারাপ?

নীচের লোক তাঁর গালে থাপ্পড় মেরে বেরিয়ে গেলো, এ অপমান সয়ে মানী লোক চাকরী করবেন, সে তো মনে নেয় না, স্যার।

কে কাকে থাপ্পড় মারলে হে? তোমার হেঁয়ালী বুঝতে পারি এতো বিদ্যে আমার নেই হে নিতাই। কি বলতে চাও খোলসা করে বলো দেখি।

নিতাই বলিল, মিসেস সরকার—

সাহেব সহাস্য অথচ কঠিন কণ্ঠে কহিলেন, ডেপুটী এডুকেসন অফিসারের কথা বলছো নাকি হে? তিনি মিসেস সরকার নয়; মিস সুলতা সরকার।

আমরা মুখ্যু মানুষ, আমাদের কাছে ও দুইই সমান।

বেশ, বেশ, তাই হোল না-হয়।

তিনি তো খালাস পেয়েছেন?

যদি পেয়ে থাকেন, তা'তে কি!

রাগ করবেন না হুজুর। যেমন শুনিছি তেমনই বলছি। কালো সাদা হয়ে গেলো। দুপুর রাতকে দিনমান করা হোয়ে গেল।

তুমি বড্ড হেঁয়ালী কর হে নিতাই।

না, তাই বলছি। সুধাকর সাহেবই তো মিসেস সরকারকে সাসপেণ্ড করেছিলেন; আজ তিনি গাল পেতে চড় খেলেন তো! দাদার সাথে চালাকি!

লোয়ার কোর্টের রায় হাইকোর্ট হামেসা উল্টে দিচ্ছে। তাতে কি লোয়ার কোর্টের গালে চড় বাজে? তোমার সুধাকর সাহেব সসপেণ্ড করে এতো দিন ফেলে রেখে দিলেন কেন? যদি তাকে দোষী বুঝেছিলেন, ডিস্‌চার্জ করলেই পারতেন।

তর্কে নিতাইকে হারাইবার জো নাই। বলিল, সে ক্ষমতা তাঁর থাকলে যেদিন ঐ মাগীটে বড়লোকের ছেলের বাগানে হাতে নাতে ধরা পড়েছিল, সেই দণ্ডেই ডিস্‌মিস্‌ করতেন। সাঁইত্রিশ ভূতের বোর্ড, তাই পারেন নি।

তুমি যে সুধাকর সাহেবের মস্ত ভক্ত দেখছি হে!

তাঁকে আজও চোখে দেখি নি, স্যার।

শুধু বাঁশী শুনেছ? কি বলো হে!

চাট্‌জ্যে সাহেবেরই জয় জয়কার। সুধাকর সাহেব বিদেয় হোলে তাঁরই তো রামরাজত্ব। আর তাঁকে পায় কে?

কিছু ভয় নেই নিতাই। কেউ বিদেয় হবে না, নিশ্চিন্ত থাকো।

নিতাই আর মুখ খুলিল না। তবে সে-যে সন্তুষ্ট হইল না, তাহার মুখ দেখিয়া সাহেবের তাহা অজানা রহিল না।

সাহেব বলিতে লাগিলেন, এত বড় পলিটিসিয়ান হয়ে এটা বুঝতে পারলে না হে নিতাইচন্দ্র, ভদ্রমহিলা বোর্ডের দলাদলিতে পড়ে মারা যাচ্ছিলেন। এক দল মেম্বার ষড়যন্ত্র করে ওঁকে তাড়িয়ে তাদের পেয়ারের কোন লোককে বসাবার জন্যে ভদ্রমহিলার বিরুদ্ধে কেস সাজিয়ে ঐ অপদস্থটা করেছিল। অন্যদল সেটা ধরে ফেলে; তারাই এনকোয়ারী কমিটি বসায়। আগের বেটারা এমনই বেয়াড়া যে, এনকোয়ারী কমিটিতে কিছুতেই কোরাম হতে দেয় না। চেয়ারম্যান যেদিনই মিটিং ডেকেছে সেদিনই তাদের দলের চারজনই এ্যাবসেণ্ট, এ দলের তিন জন হাঁ করে বসে বসে চলে গেছে, মিটিং হয়নি। চারজনে কোরাম, একটা মিটিঙেও কোরাম করতে দেয়নি।

সাহেব এত কথা, এমন বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিলেন এবং নানা রকম ভাবে—আড়চোখে, বাঁকা চোখে, সোজা চোখে নিতাইচন্দ্রের মুখভাব নিরীক্ষণ করিতে চেষ্টা করিলেন; তবু না পারিলেন দেখিতে, আর নিতাইও না বলিল হাঁ-বা-না একটি শব্দ। অনেকটা পথ—বাকী পথটাও সাহেব বক্‌ বক্‌ করিয়া তাহাকে কনভিন্স করিতে যথাশক্তি প্রয়াস করিলেন, নিতাই নির্বাক। বোর্ডের অফিসে পৌঁছিয়া সাহেব যখন নামিতে যাইবেন, মিটমিটে ডাইনের মত, হাতজোড় করিয়া ভাল মানুষটি হইয়া বলিল, স্বাধীন দেশে সত্যিও, স্যার, মিথ্যে না হয়, দেখবেন।

বোর্ড আফিসের দরওয়ান গাড়ীর দ্বার ধরিয়া দণ্ডায়মান, কাজেই জবাবটা সাহেবকে চাপিয়া যাইতে হইল।

বাড়ীর পথে নিতাইচন্দ্র আবার সেই স্বাধীন দেশের দুর্ভাগ্যের জন্য ক্ষোভ প্রকাশে প্রবৃত্ত হইল। নানা অলঙ্কারে সাজাইয়া বলিল, যে সব বাপের মেয়েদের ইন্দ্রের সভায় নাচাতে নিয়ে যাওয়া হোত, তারাই যখন জানতে পেরেও মাগীর হাড় এক ঠাঁই মাস এক ঠাঁই করে নি, গঙ্গাজল ছিটিয়ে তাদের বাছাদের শুদ্ধ করে ঘরে নিয়ে গেল, তখন ঐ মাগীকে সাজা দিয়েই আর কি হবে স্যার! স্বাধীন দেশ—সবই সম্ভব।

সাহেবের আপাদমস্তক জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল কিন্তু থামাইবার ভাষা খুঁজিয়া না পাইয়া প্রদাহ সহ্য করা ছাড়া উপায় ছিল না। কোন্‌ সুদূর অতীতে আস্কারা দিয়া মাথায় তুলিয়াছিলেন সেই অভিশপ্ত দিনটিকে মুহুর্মুহু অভিসম্পাত করিতেছিলেন।

নিতাই মনের খেদে বলিয়া চলিল, আহা, অনেকদিন অনেক মনঃকষ্ট পেয়েছেন, এইবার একটা প্রোমোশন হলেই সবদিকে দেখতে শুনতে ভাল হয়। "দাদা" যখন তাঁর গার্জেন, তখন সে না হয়ে আর যায় না সে আমরা জানি।

সাহেব নীরব। নিতাইয়ের বুকের কপাট খুলিয়া গিয়াছিল, গ্রামোফোনের রেকর্ডের মত কথাগুলো গল্‌ গল্‌ করিয়া বাহির হইয়া

আসিতে লাগিল, এম্‌প্লয়িজ এসোসিয়েসন ওর প্রোমোসনের জন্যে ডেপুটেসানে যাবে শুনছি।

ইহা যে প্রকারান্তরে ভয় দেখানো, সাহেবের বুঝিতে বাকী রহিল না, রুষ্ট রোষে কহিলেন, এমপ্লয়িজ এসোসিয়েসনের আস্পর্ধাটা খুব বেড়ে গেছে মনে হচ্ছে।

এবার নিতাই নিঃশব্দ। সাহেব বলিলেন, তুমি এসোসিয়েসনেরও পাণ্ডা নাকি হে!

না স্যার, একবার দাঁড়িয়েছিলুম, ভোটে হেরে ঢোল। মিছিমিছি দশ পনেরোটা টাকা জল। ওপথে আবার যাই?

ভাল, বলিয়া সাহেব গাড়ী হইতে নামিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাত্রি তখনও প্রত্যুষ হয় নাই, আকাশের গায়ে রং ধরে নাই, ঊষা তখনও সুপ্তিমগ্ন, মোরগেরও ঘুম ভাঙ্গে নাই, পথের ধারের আলোগুলো তখন প্রভাহীন পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করে নাই। কলিকাতা সহরের পূর্বাঞ্চলের একটা বড় রাস্তা ধরিয়া দুইজন লোক দ্রুতপদে চলিয়া সরু গলিটার নিকটে আসিয়া মুহূর্তের জন্য থমকিয়া দাঁড়াইয়া দেয়াল ঘেঁসিয়া ঘেঁসিয়া গলিটার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। গলির ওপাশের বাড়ীর রোয়াকে পুলিস কনেষ্টবল কর্মাবসানের ক্রোড়কে নিদ্রাগত ছিলেন। যদুবাবু তাঁহার সামনে পড়িতে চাহেন না।

একটা গৃহের জানালার কাঠের উপর মৃদু মৃদু অঙ্গুলির আঘাত করিবামাত্র জানালার অর্ধাংশ খুলিয়া গেল।

সত্য দা, ওঠো, ভারি দরকার।

উঠিছি, আয়।

সত্যশরণ সদর দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিতেছিল, যদু বলিল, এক বেটা লাল পাগড়ী মোড়ের মাথার রোয়াকে শুয়ে আছে, বাইরে কথা কইবার সুবিধে হবে না।

সত্য বলিল, আয়, ভিতরে আয়।

ভিতরে হাত দশ বারো লম্বা ও হাত চারেক চওড়া একটা চলনগলি।

তাহার একদিকে সত্যর একখানা ঘর, বামদিকে অন্য এক ভাড়াটিয়ার ঘর। সত্য তাহার ঘরের দরজাটা চাপিয়া বন্ধ করিয়া দিল—তাহার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে ঘুমাইতেছে। তাহারা সদর দরজা সন্নিধানে গুটিসুটি হইয়া বসিয়া কথাবার্তা সুরু করিবামাত্র দ্বিতলের ভাড়াটিয়ার অতি বৃদ্ধা ঝিটি—যে সেই গলিতেই শয়ন করিত—ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া মনে মনে (নিশ্চয়ই) সুখনিদ্রাবিঘ্নকারী দগ্ধ বদনদিগের বিনাশে বিলম্ব হয় কেন তাহাই চিন্তা করিতে করিতে প্রস্থান করিল। সত্য এক ছেঁড়া মাদুর আনিয়া বিছাইল; যদু ও নৃপতি বসিল, সত্য চৌকাঠ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সত্য বলিতেছিল, খবর খাঁটি তো?

যদু বলিল, খাঁটি, ডিপার্টমেন্টের একজন লোক আমাকে চুপি চুপি বলেছে।

অর্ডার বেরিয়ে গেছে?

না বোধ হয়।

আজ বের হবে?

তা'ও না বোধ হয়। ঐ ইস্যুতেই চেয়ারম্যান সুধাকর সাহেব রেজিগনেসন দিয়েছে—

ঠিক যানিস—দিয়েছে?

সেই লোকই বললে।

নিতাই ড্রাইভারটাকে পাকড়াও করলি নে কেন? সাত ঘাটের কানাকড়ি, ঠিক ঠিক খবর রাখে।

তা রাখে; কিন্তু মুখ খোলে না। রাত এগারটার সময় খবর পাই, বারোটার একটু পরেই নিতাইয়ের বাসায়। দেখা করলে না, বললে বড় জ্বর। তবে ব্যাটা ঘরের ভেতরে যে-রকম ধ্রুপদ কাওয়ালীতে কোঁৎ পাড়ছিলো, তা'তে খবর সত্যি বলেই মনে হোল।

ধ্রুপদ কাওয়ালীতে কোঁৎ কি রকম?

শুনাব কি রকম? শোন তবে—উঁউঁ বড় জ্বর, বড় জ্বর, এখন এলো, বড় কষ্ট, সকালে আর থাকবে না। উঁউঁ ভারি পিপাসা যদুদা তুমি যাও, নইলে এ জ্বর আমার কিছুতেই ছাড়বে ন। বিকারে দাঁড়াবে; আবার যদি সত্য দা'কে খবর দাও, তাহলে সান্নিপাতিক বাতশ্লেষ্মা বিকার!" বলেই বেটা রামপ্রসাদী গান জুড়ে দিলে—

মন, মিছে তোর ভাবনা কেনে হায়!

রাজার নন্দিনী প্যারী যা করে তাই শোভা পায়।

সত্য হাসিয়া কহিল, ওটা ভারি দুষ্টু, তবে মনটা ভাল। আর ভেতরে ভেতরে খুব ইউনিয়ন-মাইণ্ডেড।

যদু চটিয়া উঠিয়া বলিল, ঘোড়ার ডিম মাইণ্ডেড। কত সাধ্য সাধনা করলুম, বললেও না, দরজাও খুললে না!

নৃপতি কৃত্রিম ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া কহিল, আবার কি বলবে? বলা তো হয়ে গেছে। ঐ তো বললে—"যা করে তাই শোভা পায়"—ওর মানে কি?

আরে, শোন সবটা আগে। বেটা রামপ্রসাদী ছেড়ে কান্ত-কবি আওড়াতে লাগল। গাইলে—"বলো না আমারে, কথা কহিতে বোল না।" আমি যত বলি, নিতাই, তুমি তো এবার ইউনিয়নে ভাইস-প্রেসিডেণ্ট হবে। আমরা কি আর তোমাকে ফাঁসাতে পারি? ওমা, এই না শুনেই একেবারে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। খাম্বার ভুপালীতে ধরলে—"সম্মুখে শান্তির পারাবার।"

সত্য হাসিল; বলিল, আচ্ছা দুষ্টু তো!

যদু বলিল, কিন্তু খবরটা না জানলে কিছু করা যাচ্ছে না তো?

সত্য বলিল, চল্ না সুধাকর সাহেবের কাছে যাই।

বলবে?

আমার মনে হচ্ছে বলবে না, সুধাকর সাহেবই তো মিস্ সরকারের ডিসমিসাল রেকমেণ্ড করেছিলেন। কমিশনার "দাদা"র পাল্লায় পড়ে তার রেকমেণ্ডেসান উল্টে দিলে অপমান তো তাঁরই হোল। চল্ যাই। কি বল সত্য দা?

সত্য কথা বলিবার পূর্বেই নৃপতি কহিল, এই শালা "দাদা"র কিছু করা যায় নাই, ঐ শালা যত নষ্টের গুরুঠাকুর।

সত্য কথা কহিল না। নৃপতি কিছুক্ষণ তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, সত্য দা, তুমি চেঞ্জ চাইলে কিন্তু দেখো এরা হিটলারী শাসন চালাবে। আগের ওরা কথা শুনুক আর নাই শুনুক, ডেকে কথা বলতো, দে'তো হাসি হাসতো, এরা ড্যাম্ কেয়ার করবে।

সত্য এখনও কথা বলিল না।

নৃপতি বলিল, এই সময় আমাদের এসোসিয়েসনের কাগজখানা থাকতো যদি—

সত্য সহাস্যে কহিল, যা নেই, তার জন্য দুঃখ করে লাভ কি রে ভাই!

নৃপতি বলিল, দুঃখু টুঃখু আমি বুঝিনে, সত্য দা', বাগান চাই। যে করে হোক "দুন্দুভি" আবার বার করতেই হবে। হাতে কাগজ না থাকলে চলে কখনও? চলো তো রবি মিত্তিরের বাড়ী—যে করে হোক এই শনিবারেই "দুন্দুভি" বার করবো—চলো।

সত্য হাসিয়া বলিল, যাবে—চলো। —বলিয়া জামাটা আনিতে ঘরে ঢুকিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে উৎসাহ অনলে কলসী কলসী জল পড়িয়া গেল।

দেখিল, তাহার স্ত্রী করবী বড় ছেলেটির মাথায় নেকড়ার জলপটি দিয়া নতমুখে বাতাস করিতেছে। করবী মুখ তুলিয়া চাহিল, কোন কথা বলিল না। সত্য তাহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া বলিল, আবার জ্বর বাড়লো না কি?

রাত দু'টো থেকে জ্বর খুব হয়েছে, একটা দুইটা ভুল বকছে।

দু'টো থেকে? আমায় ডাক নি কেন?

ছেলেটি এই সময়ে একবার চক্ষু চাহিল—সে দু'টা করমচা'র মত রাংগা আর লক্ষ্যহীন, নিরুদ্দেশ। দেখিলে ভয় হয়। ছেলেটি বার-বার মাতা ও পিতার পানে চাহিয়াও যেন চিনিতে পারিল না। রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, আমি বাড়ী যাব না।

করবী মুখ তুলিয়া চাইতে গেল, পারিল না। ছেলের মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ডাকিল, সতু, সতু, কি বলছ বাবা?

সতু বিকারের ঝোঁকে বলিয়া উঠিল, বলছি না আমি যাব না! কেন যাব? তোদের কথায় যাব? বাঃ, যাব না, যা পারিস, কর্ গে যা।

কোথায় যাবে বাবা আমার! বলিতে বলিতে করবী ছেলের উপর উবুড় হইয়া পড়িল। তাহার চোখের জল সতুর মুখ চোখ গলা ভাসাইয়া ছেঁড়া বালিশের উপর দিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

সত্য বলিল, চারু বাবুকে খবর দিই, কি বলো?

করবী মুখ তুলিতে পারিল না, কথাও বলিল না; যেমন উবুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছিল, তেমনই কাঁদিতে লাগিল।

সতু দু হাতে সজোরে মাকে ঠেলিয়া দিয়া অত্যন্ত জোরের সহিত বলিল, আচ্ছা, আচ্ছা, যাব, যা। হোল তো? বিকেলে আসিস, যাব?

করবী ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল—ধন আমার মাণিক আমার, কোথায় যাবে বাবা? আমি তোমায় যেতে দেব কেন বাবা?

আমার খুশী আমি যাব, বলিয়া একটা বিকট শব্দ করিয়া লাফা-ইতে গিয়া তাহারই পরিশ্রমে অবসন্নের মত বিছানায় লুটাইয়া পড়িল এবং ক্ষণতরে চোখ দু'টা যেন ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহিল।

সত্য অত্যন্ত বিচলিত বিব্রত হইয়া কহিল, আমি দৌড়ে চারু বাবুকে ডেকে আনি।

করবী ত্রস্তে বলিয়া উঠিল, ওগো, হোমোপ্যাথিকে হবে না।

সত্যশরণের অন্তরও যেন ঐ কথাই বলিতে চাহিতেছিল; কিন্তু —এই কিন্তুটা ভাবিতে তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। ঘরে দুইটি বই টাকা নাই; করবীর গায়ে এক কুচা সোনা নাই; দশটা টাকা কর্জ পাই-বারও উপায় নাই—একে একে সমস্ত পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে—কোনই উপায় নাই। চারু মুখুজ্জে হোমিওপ্যাথিক বটে, কিন্তু বিচক্ষণ চিকিৎসক এবং পাড়ায় তিনি ভিজিট না নিলেও রোগীর যত্ন নইতে ত্রুটী করেন না। কালও দুইবার আসিয়াছিলেন এবং বিনামূল্যে ঔষধও দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আর তো হয় না, করবীর যদি বিশ্বাস গেল, তবে সতুর আরোগ্যের আশা কোথায়? হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাটা কতকটা ভগবানের দয়ার মত, বিশ্বাসই পনেরো আনা। করবীর কথায় সত্যর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিন্তু ছেলেটার যে অবস্থা, তাহাতে বিনা চিকিৎসায় আর তো ফেলিয়া রাখা যায় না। পিতার অন্তরাত্মা তাহার সমস্ত বিচার বিবেচনাকে পরাভূত করিয়া ঠেলিয়া উঠিয়া বলিতেছে, উচিত নয়, জল পড়ার ভরসায় আর এক দণ্ড ফেলিয়া রাখা উচিত নয়। উচিত নয়, কথাটা মারাত্মক; মনে হইবা-মাত্র মন্দ মিনসের চোখেও জল আসিয়া পড়িল। সংসারের প্রতি স্ত্রীর প্রতি, সন্তান সন্ততির প্রতি কতটুকু উচিত কাজ করিতে সক্ষম হইয়াছে? আজ তেরো দিন শ্লোকালীন জ্বর এই কঠিন অবস্থা ধারণ করিয়াছে, চারু ডাক্তার বারংবার সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন টিনের বিলিতি বার্লির জল ছাড়া অন্য কিছু যেন কিছুতেই দেওয়া না হয়। কিন্তু জন্মদাতা পিতার এমনই কর্তব্য পালন যে, মুদির দোকানের চার পয়সার বার্লির উপরে উঠিবার সাধ্য হয় নাই। এলো-প্যাথিক ডাক্তারের কেবল ভিজিট তো নয়, ঔষধ আসিবে কোথা হইতে? যে কথাটা সত্যশরণের মত অবস্থার লোকের একশ' জনের একশ' জনই নিরন্তর চিন্তা করে ও বলে, সত্যশরণ তাহাই করিল; বলিল, সংসারধর্ম করিয়া কি মহাপাপেই লিপ্ত হইয়াছিলাম!

দেখি, যদু কোন উপায় করিতে পারে যদি! ভাবিয়া সত্য সতুর শয্যাপার্শ্ব হইতে উঠিতে যাইবে, করবী অশ্রুভাংগা কণ্ঠে কহিল, আমার একটি কথা রাখবে? বাবাকে একবার খবর দেবে?

তাই দিই। কিন্তু—

করবী বলিল, সে আমিও জানি। বাছা আমার বিনা চিকিৎসায়—কথাটা শেষ করিতে পারিল না; অশ্রুর উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়া তাঁহার কণ্ঠ ও দৃষ্টি রোধ করিয়া ফেলিল।

একটু সামলাইয়া লইয়া করবী আবার বলিল, সতু আমার সেরে উঠুক, ভাল হোক, খেটে তুমি বাবার দেনা শুধে দিও।

শুধবো যা, তা ভগবানই জানেন! গেল বছর অসুখের সময় ষাট সত্তর টাকা তিনি খরচ করেছিলেন, দেড় বছর হয়ে গেল, একটি পয়সাও দিতে পারিনি।

করবী বলিল, ওগো আমি জানি; কিন্তু কি করবো বল? ভগবান যে বিপদের পর বিপদ দিচ্ছেন। একটুও কি সামলাতে পারছি?

ম'রে সামলাবো, বলিয়া দড়ির আলনা হইতে জামাটা টানিয়া লইয়া কাঁধে ফেলিয়া বাহির হইতেছিল, করবী বলিল, বাবাকে খবর দিতে ভুলো না যেন। আর, আজ একটু শীগগির করে ফিরতে যদি পারো—বাকীটা স্বতঃই মুখে বাধিয়া গেল।

না, না, দেরী করবো না, আসবো, বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

সচরাচর বাড়ীর বাহির হইলে বাড়ীর কথা ভুলিতে সত্যশরণের বেশী সময় লাগে না। এক ঘণ্টা বলিয়া দশ ঘণ্টা পরে বাড়ী ঢুকিবার উদাহরণ এতই সুবিদিত যে, ব্যতিক্রমেই লোকে বিস্ময়াপন্ন হয়। হঠাৎ কোনদিন যদি সকাল সকাল—অর্থাৎ অসময়ে—বাড়ী আসে, বাড়ীর লোকই আশ্চর্যে জিজ্ঞাসা করে: এত তাড়াতাড়ি বাড়ী এলে, শরীর ভাল নেই বুঝি! কিন্তু আজ আর ভুল হইল না। পকেট হইতে বোর্ডের ডায়েরীর একখানা পাতা ছিঁড়িয়া কয় ছত্রে পত্রের

কঠিন পীড়া ও তাহার জননীর অনুরোধ ব্যক্ত করিয়া একখানি পত্রী যদুর হাতে দিয়া শ্বশুর মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিয়া নৃপতি সমভিব্যহারে সে সুধাকর সাহেবের কুঠির দিকে পদচালনা করিল।

অনেক তর্ক বিতর্ক, কথা কাটাকাটি, ধস্তাধস্তি করিয়াও কোন ফল হইল না। তিনি "এক কথার মানুষ", এক কথাই বহাল রাখিলেন। শীঘ্রই প্রেস কনফারেন্স আহ্বান করিয়া পৃথিবীকে চমৎকৃত করিবেন। একটু অপেক্ষা।

নৃপতি বুঝাইতে চেষ্টা করিল, আপনি আমাদিগের বড় সাহেব। আপনার অসম্মান আমাদের অসম্মান। গভর্নমেণ্টই আসুন অথবা কুইন এলিজাবেথের হয়ে ম্যাজেস্টিস্ পার্লামেণ্টই আসুক, আমরা আপনাকে ভিন্ন অন্য কোন অথরিটিকে স্বীকার করি না। যাহারা ষড়যন্ত্র করিয়া আপনার মর্যাদার লাঘব করিয়াছে, তাহারা যত বড়, যত শক্তিশালী হোক, আমরা কেয়ার করি না। আমরা তাহাদিগকে ভাল রূপ শিক্ষা দিব তবে ছাড়িব।

সাহেবের সেই একই কথা। "ইউ ওয়েট্ ফর এ ফিউ ডেজ, সবই জানিবেন।

সত্যশরণ এতক্ষণ প্রায় চুপ করিয়াই ছিল, এইবার দাঁড়াইয়া উঠিয়া সম্ভ্রম সহকারে কহিল, স্যার, আপনার পোজিসনটা কি সত্যিই আপনি আমাদের বলতে পারেন না? আমাদের ভুল হতে পারে কিন্তু যা শুনেছি তা'তে মনে হচ্ছে আপনাকে ছলে-বলে বা কৌশলে বোর্ড থেকে সরাবার বন্দোবস্ত পাকা হয়ে আছে। সত্যি যদি তাই হয়, আমাদেরও কর্তব্য আছে তো! ট্রেড ইউনিয়ন রুলসে আমরা প্রতিবাদ করতে বাধ্য। দরকার হলে আমরা ডেপুটেসনে যাবো—

নৃপতি ও যদু বলিল, তার আগে এমন একটা ডিমন্সট্রেসন করতে চাই যে, বাছাধনদের আক্কেল গুড়ুম না হয় তো থুড়ি থাক্।

সুধাকর সাহেব সন্ত্রস্ত হইয়া কহিলেন, না না, গোলমালে দরকার নেই। লোকে মনে করবে আমি করাচ্ছি। আর, আপনাদের ডিমন্সট্রেসনে উপরওলারা ভয় পাবেন, এ আপনারা কেমন করে ধারণা করলেন?

নৃপতি লাফাইয়া উঠিল এবং যদুপতি সদম্ভে কহিল, বোর্ড প্যারালাইজ করতে পারি কি-না দেখতে চান?

নো, থ্যাঙ্কস, কিছুই দেখতে চাই না আমি।

শুনুন, স্যার, আমাদেরও একটা কর্তব্য আছে, আমরা মনে করি—শান্ত সংযত ভাবে সত্য কহিতে লাগিল—কিছু মনে করবেন না, স্যার, আপনার কাছে প্রোটেকসান বা কো-অপারেসন পেয়েছি তা বলতে পারি নে; বরং অনেক সময়েই আপনি নেগলেক্ট করেছেন, সন্দেহও দেখিয়েছেন; বহুবার এসোসিয়েসনকে তার জন্য হিউমিলিয়েটেড হতে হয়েছিল। কিন্তু এসোসিয়েসনের হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় আপনার সাহায্য আমরা চিরদিন কৃতজ্ঞতার সংগে স্মরণ করি, পরেও করবো।

মেনি থ্যাঙ্কস্। আমি কর্তব্য করেছিলুম

আমরাও কর্তব্যই করতে চাই। আপনাকে—বোর্ডের সর্বপ্রধান কর্মকর্তাকে বিনা কারণে, ষড়যন্ত্র করে সরাবার বিরুদ্ধে আমরা যদি প্রতিবাদ না করি, এর পরে যে যথেচ্ছাচার চলতে থাকবে; চাকরীর সিকিউরিটি বলে কিছু আর থাকবে না। আমাদের ভবিষ্যতের জন্যই কিছু করার বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছে। আপনাকে যদি এক কথায় দূর হ' করতে পারে, তাহলে অন্যের অবস্থা কি হতে পারে সে তো আপনি সহজেই বুঝতে পারছেন। এর পরে যাকে খুশী, নখে টিপে মারতে থাকবে।

সুধাকর সাহেব বলিলেন, আমার পরামর্শ হবে আপনারা ভালভাবে কাজ করবেন, তাহলে খুঁত ধরবার যো থাকবে না—

সত্য সবিনয়ে কহিল, আপনি কি খুঁত রেখে কাজ করতেন, স্যার?

সাহেব কহিলেন, আমার কথা আপনারা ছেড়ে দিন। ও নিয়ে মাথা আপনারা ঘামাবেন না।

"মাথা ঘামাবেন না" শুনিয়াই নৃপতি ও যদুপতি খাড়া হইয়া উঠিল কিন্তু তাহাদের মুখ হইতে উগ্র শব্দ বাহির হইবার পূর্বেই ইঙ্গিতে নিরস্ত করিয়া সত্য কহিল, আমাদের আপনি ক্ষমা করবেন, স্যার। আপনার চাকরীর জন্যে মাথা ঘামাতে আমরা আসিনি। কিন্তু, বোর্ডের সাড়ে তিন হাজার দরিদ্র অসহায় কর্মচারীদের অন্ধকার ভবিষ্যৎ ভেবে মাথা না ঘামিয়ে পারি কি করে, আপনিই বলুন? তবে একথাও আপনাকে বলা দরকার মনে করি, স্যার, যে ট্রেড ইউনিয়ন আইনের সীমা লঙ্ঘন করে গণ্ডগোলের সৃষ্টি আগেও করিনি, এখনও করছি না এবং পরেও করবো না। সেটা আপনারও অজানা থাকবার কথা নয়। নমস্কার স্যার।

সুধাকর সাহেবের মনে হইল তিনি যেন ঐ সামান্য কর্মচারীটার তুলনায় অনেক ছোট হইয়া পড়িলেন। মুখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিতেও আর পারিতেছেন না। লোকটার কর্তব্যনিষ্ঠা, শুচিতা ও শুদ্ধ অন্তঃকরণের পরিচয় বহুবার, বহু রকমে পাইয়াছিলেন আজ তাহার সমবেদনা ও সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়ের যে চিত্র ফুটিয়া উঠিল তাহার সম্মুখে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবার শক্তিটুকু যেন তৈলহীন প্রদীপের মত নিমিষে নিবিয়া গেল। সুধাকর তাহার নিকটে আসিয়া তাহাকে টানিয়া একটু দূরে লইয়া গিয়া বলিলেন, সত্যবাবু, আপনার শুভ ইচ্ছায় (good wishes for me) আমি যথেষ্ট আপ্যায়িত, কিন্তু বিশেষ কারণে কয়েকটা দিন আমাকে মুখ বন্ধ করে থাকতেই হবে।

সত্য বলিল, এর পরে বলবার আমার আর কিছুই নেই।

যদু চিঠি দিয়া আসিয়া এখানে মিলিত হইয়াছিল। সে বলিল, মনে হচ্ছে, স্যার, আপনি নাকি ওদের সংগে মিটিয়ে ফেলছেন? শুনলুম আপনার শাশুড়ী ঠাকরুণ নাকি এল এস্ জি মিনিস্টারের সংগে দেখা করতে গেছেন?

না, না, কম্প্রমাইজ কিসের? আমাদের মধ্যে কোন ঝগড়া তো নেই; নো, নো, ও সব বাজে কথা, কেন শোনেন?

একজন ভাল লোক একটু আগে বললেন আমায়।

সাহেব ব্যস্তভাবে আসন ত্যাগ করিলেন—যেন রেলগাড়ী ফেল হইবার আশঙ্কা ঘটিয়াছে। বলিলেন, আপনাদের আমি খবর পাঠাবো, তখন সব জানতে পারবেন।

যদু বলিল, যোগীন মুন্সী ওভারশিয়ারকে কাল রাত্রে নাকি য়্যারেস্ট করিয়ে দিয়েছে?

সে তার প্রাপ্যই পেয়েছে। থরোলি ডিস্অনেষ্ট।

সত্য তাহার বন্ধুকে জিজ্ঞাসিল, তুই কখন শুনলি?

এইমাত্র। রাস্তায় মুন্সির ভায়ের সংগে দেখা, উকীল নিয়ে থানায় যাচ্ছে জামিন দিতে। শুনলুম, "দাদাই" ফাঁদ পেতে ধরিয়ে দিয়েছে।

নৃপতি গর্জিয়া উঠিল, তা দেবে বৈকি! কমিশনারের সুয়ো হতে হবে তো। দু চারটে গরীবকে না ফাঁসালে চলবে কেন উঃ ওটা কি মানুষ! গীতা দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করতে বলেছে। ওর গীতা উল্টো বলে, শিষ্টের দমন, দুষ্টের দুধকলা দিয়ে পালন, ওর মটো।

সাহেব বলিলেন—সাহেবের সে ক্ষণপূর্বের চাঞ্চল্য, ব্যস্ততা আর নাই, বসিয়া পড়িয়াছেন, সত্যকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—কিন্তু সত্য বাবু, মুন্সীর রেকর্ড একটুও ভাল নয়। মুন্সী অনেক বার ধরা পড়েছে; মাস কয়েক পূর্বে আমিও ওয়ার্নিং দিয়েছি একবার।

গরীবদের—আমাদের রেকর্ড ভাল হবে কোত্থেকে স্যার? ১৯৪০ সাল থেকে একশ' আশী টাকা—ম্যাক্সিমাম—মাইনে পাচ্ছি, তিনশ' চারশ' গুণ বাজার চড়ে গেছে, জিনিষপত্তর মাগ্গি হয়েছে, না একটি টাকা মাইনে বাড়লো, না এক পয়সা এ্যালাওয়েন্স দিলেন আপনারা। স্যার, আমরা সংসার চালাই কি করে বলুন দেখি?—নৃপতি বলিল। সত্য দলপতি বটে তবে কথাবার্তা সে কম কয়, তাহার সাকরেদগণ প্রত্যেকেই সুবক্তা।

ও নো নো, সংসার চলে না বলে চুরী করতে হবে? ওটা বদ্ যুক্তি বলতেই হবে। না, সত্যবাবু, অসাধুতার শাস্তি হওয়াই উচিত।

এবারও নৃপতিই উত্তর দিল, বলিল, স্যার, শাস্তি হওয়া উচিত, তা আমরাও স্বীকার করি; কিন্তু, সুরেশ মিত্তির, স্যার, ঐ "দাদা"র 'পেটু'; চুরী বলুন, জোচ্চুরী বলুন, বাটপাড়ি বলুন, না করেছে কি? কাশীর তিল ভাণ্ডেশ্বরের মতো ভুঁড়িটি দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে কিন্তু কৈ, তার বিরুদ্ধে একটি কথা বলতেও তো শোনা যায় না; বরং "দাদা" সাহেব তো তাঁকে কক্ষপুটে আগলে আগলে একেবারে কালভৈরব বানিয়ে তুলেছেন। আর, "দাদা" যখন সুরেশ মিত্তিরের আশ্রয়দাতা—

আপনাদের দাদা কে, আমি তো বুঝতে পারছি না।

সে কি স্যার? চাটুয্যে সাহেব যে বোর্ডের সার্বজনীন দাদা, আপনি জানেন না?

সাহেব হাসিয়া ফেলিলেন, তাই নাকি? তাই নাকি?

নৃপতি ছাড়িল না, সে বলিল, দাদার হট পেট সুরেশ মিত্তির ফুড কন্ট্রোলার। অডিট যে নগদ সত্তর হাজার টাকার চুরী ধরলে, মিত্তিরের কি হোল, স্যার? নীচের তিনটে কেরাণী, দুটো ওয়েমেণ্ট ক্লার্ক ও তিনটে দরোয়ান বরখাস্ত হোল, কিন্তু মিত্তির "মেলিন্স ফুড"—আনটাচড্ বাই হ্যাণ্ড, কি করে হোল, স্যার?

যদু বলিল, কিছু হওয়া দূরে থাক্, মিত্তিরের পার্সোনাল এলাওয়েন্স আরও পঞ্চাশ টাকা বেড়ে গেল। আড়াইশ' ছিল, তিনশ' হোল। আপনি তো সবই জানেন স্যার, আপনাকে আমাদের বলতে হবে কেন?

তাহলে আমি যাই, একটু বেরোব কি-না! আচ্ছা নমস্কার, নমস্কার। বিশেষ একটু দরকার আছে।

নৃপতি বলিল, স্যার, মুন্সীর জন্যে আপনাকে একটা ফাইট দিতেই হবে, স্যার! মুন্সীর আটটি ন'টি ছেলেমেয়ে, দু' দুটো বিধবা বোন ওর ঘাড়ে, বুড়ী মা, তার ওপর একটা বেকার ভাই। এতগুলো প্রাণী না খেতে পেয়ে প্রাণে মারা যাবে, স্যার। ভেরি ব্যাড টাইমস, স্যার। আই এ্যাম্ সরী, নৃপতি বাবু, চোরের প্রশ্রয় আমি দিতে পারবো না। গুড বাই।

সুধাকর সাহেব উঠিয়া চলিতে আরম্ভ করিবামাত্র ইহারাও তাঁহার সহিত চলিতে চলিতে বলিল, আচ্ছা স্যার, তা না করেন, না করবেন, সুরেশ মিত্তিরের কেসটা রি-ওপন করিয়ে দিন। সেটা তো আপনি ইচ্ছে করলেই পারেন। এক যাত্রায় পৃথক ফল হয় কেন, স্যার?

কিন্তু তাতে আপনাদের সান্ত্বনা কি হবে?

সান্ত্বনা হবে, স্যার। মনকে আমরা বোঝাতে পারবো যে, জস্টিশ ফর অল করা হয়েছে। মিত্তিরের মুরুব্বীর জোর আছে বলে চুরী করে পর্দা ফাঁক করেও তার প্রোমোশন আর মুন্সী—যেহেতু তার "দাদা" নেই, হাজত—পরে হয়ত ডিসমিস—এটার, স্যার, কোনও লজিক নেই।

লজিক! লজিকের কথা বলছেন? লজিক কলেজ ক্লাসে—সাহেব মোটা পর্দা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

কিন্তু তাহারা দুজনেই তাহাদের লীডারের উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। সত্যশরণ কেন যে ইদানীং পরাজিতের মনোভাব অবলম্বন করিয়াছে, ইহা তাহাদের বুদ্ধি ও ধারণার অতীত। একদিন রাইটার্স বিল্ডিঙের ইংরাজ রাজাধিরাজ পর্যন্ত যাহার সংকল্পের দৃঢ়তায়, কর্তব্যের সাহসিকতায় প্রতি পদে পরাস্ত হইয়া নতি স্বীকারে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহার এ পতন যে বড়ই অপমানকর। এই সুধাকর সাহেবই প্রতি-হাত, প্রতিবাদ বিসম্বাদ, প্রতিটি জটিল ও সংকট অবস্থা সম্মুখে ঐ লোকটির পরামর্শ নির্ভর হইয়া চলিয়াছেন, আজ সেই তাহাকেই দিব্য এড়াইয়া গেলেন; আর সত্যও অবনতমস্তকে তাহাই মানিয়া লইয়া চলিয়া আসিল। একটা তীব্র প্রতিবাদের ভাষাও কি সে হারাইয়া ফেলিয়াছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া এই অমীমাংসিত সমস্যার সমাধানে নিশ্চল দাঁড়াইয়া ভাবিতেছে, সত্য অগ্রসর হইয়া কহিল, চল রে ভাই, এবার কোথায় যাবি, চল্।

ইহারা কয়েক মিনিট বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া, আস্তে আস্তে গন্তব্য পথ ধরিয়া চলিল। পথে যদু বলিল, আরে দূর! সুধাকর সাহেব করবে সুরেশ মিত্তিরের কেস রি-ওপন, তুইও যেমন। ওটা একটা আস্ত পিসিমা। নিজের স্বার্থটি ছাড়া এক পা চলে নি কোনদিন।

জানি, জানি, সবই জানি।—নৃপতি একটা গাছতলায় দাঁড়াইয়া পড়িল। সত্য, যদুও দাঁড়াইল।

হ্যাঁরে ভাই শ্বশুর মশাইকে খবর দিয়েছিস? সত্য জিজ্ঞাসা করিল।

নিশ্চয়, তিনি এতোক্ষণ তোমার বাসায় পৌঁছে গেছেন।

সত্য যেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। নৃপতি কি ভাবিয়া লইল, একটু পরে বলিল, একটা ইমারজেণ্ট মিটিং তো ডাকতে হয়। সুরেশ মিত্তিরকে "ইস্যু" করা যাক, কি বলিস?

যদু বলিল, মুন্সীর টাও জুড়ে দেওয়া যাবে। কখন ডাকবি?

নৃপতি ফোঁস করিয়া উঠিল, দূর গাধা। চুরী করে ধরা পড়েছে, পুলিশে কেস টেক আপ করেছে, তার হয়ে কোন কথা বললে পাবলিক মনে করবে সব শালারা চোর! আমাদের স্ট্যাণ্ড উইক হয়ে পড়বে যে।

[ক্রমশ

সাহিত্যে কল্পনা ও বাস্তব

শ্রীরাইহরণ চক্রবর্ত্তী

নাটকে উপন্যাসে আমরা বহু আশ্চর্য ঘটনা বা বিষয়ের সম্মুখীন হই। কবি বা সাহিত্যিকগণ পূর্বকালে অতি প্রাকৃত বিষয় লইয়া গল্প বা কবিতা রচনা করিতেন—যেমন আরব্যোপন্যাস ইত্যাদি; ইহা আমাদের কৌতূহল সচকিত করিয়া তোলে; কিন্তু প্রকৃত পরিতৃপ্তি দেয় না। বর্তমান কবি বা সাহিত্যিকগণ বাস্তবের সুখ দুঃখ লইয়া কল্পনার সাহায্যে সাহিত্য রচনা করেন। এই কল্পিত সত্য সকল আমাদের অন্তরে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। আমরা ইহা পাঠ করিয়া কখনও বা অশ্রুপাত করি, আবার কখনও বা হাসিয়া অস্থির হই। কিন্তু হাসি অশ্রুর উৎস স্বরূপ এই যে কাল্পনিক সত্য—ইহা অপেক্ষা বাস্তব অনেক সময় অধিক আশ্চর্যজনক হইয়া থাকে। বাস্তব কল্পনাকে হার মানায়।

নাটক উপন্যাসে আমরা যে সকল বিপর্যয় দেখিতে পাই তদপেক্ষা জীবন অধিক বৈচিত্র্যময়। কারণ কবি-কল্পনায় নাটকে বা উপন্যাসে যে চরিত্র অঙ্কিত হয়, তাহার অদৃষ্ট-নিয়ন্তা অনেক সময় কবি নিজে, কিন্তু মানবের ভাগ্যনিয়ন্তা অদৃশ্য থাকিয়া যে চক্র পরিচালিত করিতেছেন, তাহা অধিক আশ্চর্যজনক।

"দেবী চৌধুরানী" পাঠ করিয়া দেখিতেছি কবির কল্পনা বড় সরস,—বড় মধুর। দেবী চরিত্র শান্ত গম্ভীর, মধুর অথচ আনন্দময়। প্রফুল্ল সহায় সম্পদহীনা বিধবার কন্যা—সমাজের নির্মম আঘাতে স্বামী ও শ্বশুর কর্তৃক পরিত্যক্তা, স্বামীগৃহে পুনরায় স্থান পাইবার আশায় সে দাসীবৃত্তি করিতেও প্রস্তুত, স্বামী সন্দর্শন তাহার নিকট তীর্থ করার ন্যায়। স্বামীর পদসেবা করিতে পারা তাহার নিকট স্বর্গসুখ। সেই গৃহ হইতে তাহাকে যখন আমরা তাড়িত হইতে দেখি, তখন অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি না। বাঙ্গালীঘরের বহু বাস্তব চরিত্র আমাদের চক্ষের উপর ভাসিয়া উঠে। কিন্তু ইহার পরেই কবি তাঁহার অপূর্ব কল্পনা বলে প্রফুল্লকে এই দুঃখের সমুদ্রে কূল দিলেন, ভবানী পাঠক আসিল, তাহার শিক্ষা আরম্ভ হইল, অর্থ আসিল, অবশেষে রানীগিরি পর্যন্ত। ইহা কি সাধারণ বাঙ্গালী ঘরের লাঞ্ছিতা কন্যার পক্ষে সম্ভব? যদিও কবি দেখাইয়াছেন সাধনাই বল।

'জনা' হৃদয়ের ক্ষাত্রতেজ এই পত্রিকার ছত্রে ছত্রে অগ্নি স্ফুলিঙ্গের ন্যায় বিচ্ছুরিত।

> "তব সিংহাসনে
> বসেছে পুত্রহারিপু—মিত্রোত্তম এবে।
> সেবিছ যতনে তুমি অতিথি রতনে!
> কেমন তুমি মিত্র ভাবে—
> পরশ সে কর, যাহা প্রাচীরের লোহে
> লোহিত? ক্ষত্রিয় ধর্ম এই কি নৃমণি?"...

বীরাঙ্গনা কাব্য মধুসূদনের প্রতিভা বিকাশের ঊর্দ্ধ্বতম সীমাস্বরূপ। ভাষার লালিত্যে বীরাঙ্গনা কাব্য মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত গ্রন্থের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। শব্দের জটিলতা দুরূহার্থতা, ক্লিষ্টতা, মতিভঙ্গি প্রভৃতি দোষগুলি এই কাব্যে দৃষ্টিগোচর হয় না। বীরাঙ্গনার ভাষা মধুর অথচ ওজস্বী, প্রাঞ্জল অথচ গম্ভীর এবং কবির কল্পনা তরঙ্গের সঙ্গে উত্থান ও পতনশীল। এই ছন্দের ও ওজস্বিনী ভাষার সহিত সংস্কৃত সাহিত্যের অলঙ্কার ও রূপক সম্মিলিত হওয়ায় এই কাব্যের সৌন্দর্য বর্ধিত হইয়াছে। যথা—

> "আইস ভ্রমর রূপে, না, যোগায় যদি,
> মধু এই যৌবন কুল, যাইও উড়িয়া
> মলয় ভ্রমর, দেব, আমি সাধে দোঁহে
> বৃন্তসনে মালতীরে............" ইত্যাদি।

এই পত্রাবলীর নামকরণ কবি বিদেশী আদর্শে করিয়াছেন। বীরাঙ্গনা শব্দের সাধারণতঃ দুইটী অর্থ করা যায়—বীরের অঙ্গনা অথবা বীর যে অঙ্গনা। কিন্তু এই দুইটি অর্থের কোন্‌টি এখানে যথার্থ মর্যাদা দান করিতেছে? ইহা কি কল্পনার অপেক্ষা অধিক ভয়াবহ নহে?

জাহ্নবীর প্রত্যাখ্যান পত্রিকাখানি দেবীজনোচিত গাম্ভীর্য, মহত্ব ও পবিত্রতায় পরিপূর্ণ। কিন্তু মানবীর প্রাণের স্পর্শ ও কোমলতার লেশমাত্র ইহাতে নাই। মানবী হইলে শান্তনুকে ত্যাগ করিয়া যাইতে অন্ততঃ দুই বিন্দু অশ্রু তাহার করুণ কপোল সিক্ত করিত। কৈকেয়ী ও জনার অনুযোগ পত্রিকা দুইখানি অতি স্বাভাবিক হইয়াছে। অনেকের মতে অনুযোগ পত্রিকাই কবির বীরাঙ্গনা কাব্যের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। কৈকেয়ী ও জনা উভয়েই স্বামীর

ব্যবহারে মর্মপীড়িতা হইয়া অনুযোগ পত্রিকা প্রেরণ করিয়াছে সত্য, কিন্তু উভয়ের মধ্যে বৈষম্য অনেক। সপত্নী ও সপত্নী পুত্রের সৌভাগ্যের সূচনা আভাসে জানিতে পারিয়া কৈকেয়ীর হিংসা স্বামীর প্রতি কঠোর ও বিদ্রূপাত্মক বাক্যের মধ্য দিয়া প্রকাশ লাভ করিয়াছে। "এত যে বয়স তবু লজ্জাহীনা তুমি—" কৈকেয়ীর এই বাক্য যখন আমরা পাঠ করি, তখন মনে হয় যেন ক্রুদ্ধা ও অভিমানিনী নারী স্বামীর প্রতি বাস্তবিকই এই উক্তি করিতেছে।

কিন্তু জনার অনুযোগ হিংসা প্রসূত নহে, তাহা মর্মভেদী। তাই তাহার পত্রিকার ছত্রে ছত্রে তিরস্কার ও অনুযোগের ভিতর দিয়া পুত্রহারা মাতৃহৃদয়ের বিলাপধ্বনি যেন আত্মপ্রকাশ করিতেছে। জনা বীর নারীর প্রতিমূর্তি। একদিকে কাপুরুষ স্বামীকে তিরস্কার অপরদিকে পাণ্ডবগণের প্রতি মর্মান্তিক ব্যঙ্গ—ইহার মধ্যে আমরা তেজস্বিনী জনাকে দেখিতে পাই। বীর নারীর এই তেজস্বিতার সহিত হৃদয়ভেদী করুণ বিলাপ সম্মিলিত হওয়াতে জনা পত্রিকা এরূপ হৃদয়গ্রাহিনী হইয়াছে।

আমরা সেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ নাটকের মধ্যে ম্যাকবেথের কৃতঘ্নতা দেখিয়া শিহরিয়া উঠি, টলস্টয়ের অ্যানা ক্যারেনিনার অ্যানার আত্মহত্যা দেখিয়া চমকিয়া উঠি। বঙ্কিমের প্রফুল্লের পতি-প্রেমের শেষ পরিণতি ও রোহিনীর শোচনীয় অধোগতি ও নিষ্ঠুর হত্যা দেখিয়া বিস্মিত হই আর শরতের পারুল ও কিরন্ময়ীর কল্পনাবিচিত্র বাস্তব মধুর চিত্র দেখিয়া মুগ্ধ ও মূঢ় হই। সত্য যেন বাস্তবের নিকট হার মানিয়া রসপূর্ণ হইয়াছে। ম্যাকবেথের নিষ্ঠুরতা ও কৃতঘ্নতা এমন ভাবে কি সম্ভবপর? —এত বিশ্বাস, এত মর্যাদা, এই একান্ত আত্মীয়জ্ঞানে হত্যাকাণ্ড—ইহার কি কোনই মূল্য নাই? হীন ষড়যন্ত্র ও নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড দেখিয়া ভাবি—ইহা কবির কল্পনা মাত্র, বাস্তবে ইহা সম্ভবপর নহে। কিন্তু জগতের দিকে চাহিয়া দেখি ইহা অপেক্ষা শতগুণে কৃতঘ্নতা—নির্মমতার চিত্র বর্তমান। ম্যাকবেথ রাজ্য লাভের জন্য বিবেক বুদ্ধি জলাঞ্জলি দিয়াছিল, অথচ হৃদয়ের গভীর কোণে সেই কোমল পরশ মানবতার জাগরণ ছিল, তাহাই নিষ্ঠুর হত্যার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের বিদ্বেষ বা ঘৃণা না জন্মাইয়া করুণাপূর্ণ সহানুভূতির আবেদন সৃষ্টি করিয়াছে—সত্যের চিত্রের সীমার উপরে আছে বাস্তব চিত্রের মধুর আভাস ও মাধুর্যপূর্ণ শিল্পনৈপুণ্য। কত শত পুত্র সামান্য অর্থের জন্য আজন্ম স্নেহময় পিতার বক্ষে ছুরিকাঘাত করিতেছে, ভ্রাতায় ভ্রাতায় রক্তারক্তি হইতেছে, পিতা কন্যার স্বাস্থ্যধন অপহরণ করিতেছে; কোন আশ্রিত বিশ্বাসী ব্যক্তি অর্থের লোভে দীর্ঘদিনের প্রতি-পালককে সপরিবারে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিয়া বিশ্বাসের উপযুক্ত মর্যাদাকে ক্ষতবিক্ষত করিতেছে—কিন্তু লেডি ম্যাকবেথের নিদ্রাজাগরণ প্রসূত শব্দহীন বিলাপ আর ম্যাকবেথের প্রতি হত্যাকাণ্ডের অন্তরে "লাইফ ইজ ফুল অব সাউণ্ড এণ্ড ফিউরী, সিগ্‌নীফাইং নাথিং" দৃশ্যটি পূর্ণ বিকশিত দেখিতে পাই—ইহা যে কল্পনার চেয়ে কত ভয়াবহ।

পল্লী সমাজে রমা শরতের আলোকে আলোকিত হইয়া আমাদের অন্তরে অতি কোমল অনুভূতিকে স্পর্শ করে। রমার দুঃখে আমরা দুঃখিত হই, অশ্রুপাত করি আবার জ্যাঠাইমার সুপ্তিতন্দ্রাভঙ্গা হৃদয়ের গভীর বাক্যে অন্ধকারে আলোক পাই। যেখানে মানুষ নাই, যেখানে উপ-

কারীকে কারারুদ্ধ করিয়া বেণীর মত লোক উপহাস করে, বাহবা লয়, সেইখানেই রমেশের প্রয়োজন। রমেশ লাখে লাখে মিলিলে সাহিত্য হয় না, সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় না এবং শিল্পের চাতুর্য থাকে না। রমার দুঃখের চেয়ে আর অধিক দুঃখ হইতে পারে না। —কিন্তু বাস্তবের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাই যে সমাজের চক্রতলে, এমনই শত শত বাল-বিধবার দল পিষ্ট হইতেছে। রমাকে যখন সমস্তদিন অভুক্ত অবস্থায় পূজা বাড়ীতে খাওয়ার আয়োজন করিতে দেখি, তখন আমাদের অন্তর ব্যথা-মিশ্রিত গভীর শ্রদ্ধায় অবনত হইয়া পড়ে—মনে হয় ধন্য নিষ্ঠা ধন্য আত্মসংযম। কিন্তু আমাদের গৃহে গৃহে এমনই শিশু, যুবতী, মধ্য-বয়স্কী, ও বৃদ্ধা নানাবস্থায় বিধবার দল নিরম্বু একাদশী করিয়া সংসারের যাবতীয় গৃহকর্ম করিতেছে; ভোগীর সমস্ত ভোগের উপাদান জোগাইয়া দিতেছে, কোথায়ও বা কার্যের ত্রুটি হইলে নিষ্ঠুর বাক্য যন্ত্রণা, পুরস্কাররূপে লাভ করিতেছে—তাহার জন্য 'আহা' বলিবার কেহ নাই। এই যে সকল দুঃখ, এখানে মানুষের সান্ত্বনা প্রবেশ করে নাই। ইহাদের প্রাণ আছে একথা সকলে ভুলিয়া গিয়াছে। রমার দুঃখ কম নহে, তাহার অন্তর ও বাহির তখনই লোকলোচনের অন্তর্বর্তী হইয়া আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করে। এই-ভাবেই আমরা "পথের পাঁচালী"র কুলীন কন্যা ইন্দির ঠাকরুণের জন্য ব্যথা অনুভব করি, কিন্তু বাস্তবের "ইন্দির ঠাকরুণ" সকলের অলক্ষিতে, অনাহারে, অত্যাচারে প্রাণত্যাগ করেন, কাহারও ফিরিয়া দেখিবার অবকাশ হয় না। এখানেও দেখি বাস্তব কল্পনাকে অতিক্রম করিয়াছে;—কাল্পনিক দুঃখ অপেক্ষা বাস্তব দুঃখের গভীরতা কম নয়।

আমরা "প্রফুল্লের পতিপ্রেম" চরিত্রের গাম্ভীর্য ও আত্মস্থভাব দেখিয়া মুগ্ধ হই—ভাবি "আহা, ইহা কেবল কবি কল্পনায়ই সম্ভবে; বাস্তব যদি এইরূপ সত্য হইত।" কিন্তু বাস্তবে কি 'সত্য প্রফুল্ল' আমাদের দৃষ্টি গোচর হয় না? এমন আত্মস্থা, এমন নিষ্কাম নারী বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে রহিয়াছে। ব্রজেশ্বর আর যাহাই হউক পাপিষ্ঠ নহে; কিন্তু বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে লম্পট, অত্যাচারী স্বামীকেও দেবতার ন্যায় পূজা লাভ করিতে দেখিতে পাই। কোথাও দেখি অত্যাচার যেন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া স্বামী শ্বশ্রু প্রভৃতির মধ্য দিয়া প্রকাশলাভ করিতেছে, কিন্তু বধূ সেখানে বাক্যহীনা, সেবাপরায়ণা, সাধনানিরতা। তাহার ধৈর্য দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হই। এই ক্ষেত্রে বাস্তবের নিকট কল্পনা ও সত্য হার মানিয়াছে।

আমরা শরৎচন্দ্রের "বামুনের মেয়ে", "চন্দ্রনাথ" ও "স্বামী" পড়িয়া ভাবি বাস্তব কোথায় কল্পনাকে গ্রহণ করে ও বিসর্জন করে, আবার কল্পসত্যের সীমা অতিক্রম করিয়াও বাস্তবকে ধারণ করে ও মূর্ত করে। চিত্রশিল্পী শরৎচন্দ্র যথার্থই বলিয়াছেন—সাহিত্যে অসম্ভবকে অসম্ভব বলিয়া মানা বা বাস্তবকেও অসম্ভব বলিয়া মানা সত্যকে ও বাস্তবকে অস্বীকার করা।"

"There are more things in heaven and earth than we dream of in our Philosophy," Horatio. এই কথাটি কল্পনা ও বাস্তবের সাহিত্যকে জীবন-সাহিত্যের রস মাধুর্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। "বামুনের মেয়ে" পাঠ করিয়া আমরা সমাজে কৌলিন্যের নিষ্ঠুর অত্যাচার দেখিতে পাই। ইহা একান্তই অসহ্য। কিন্তু বাস্তবের দিকে তাকাইলে দেখিতে পাই ইহা অপেক্ষা শতগুণ বেশী অত্যা-চার কৌলিন্যের নামে সমাজের উপর অত্যাচার চলিতেছে। "সন্ধ্যা" সমাজের বুকে আশ্রয় না পাইলেও পিতার আশ্রয় পাইয়াছিল, আর কৌলিন্যের যূপকাষ্ঠে যে শত শত কিশোরী-যুবতী-বৃদ্ধা বলি পড়িতেছে—ইহাদের বলির প্রধান উদ্যোক্তা পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন? পিতা কন্যাকে স্বামীর ঘরে পাঠাইয়া পুত্রের জন্য টাকার ছিনিমিনি খেলি-তেছে অথচ অভুক্তা ও অসহায়া কন্যার সাহায্যে সামান্য অর্থ দান করিতেছে না। চোখের সামনে কন্যা ও কন্যার স্বামী লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করিয়া সামান্য অর্থের অভাবে যমালয়ে যাইতেছে। সপ্ততি বা অশীতি বর্ষীয় বৃদ্ধের হাতে যুবতী কন্যাকে সমর্পণ করিয়া পিতা স্বর্গের পথ পরিষ্কার করিতে ব্যস্ত। কন্যার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভাবি-বার অবসরটুকু নাই। কৈশোরের শত মাধুর্য, যৌবনের সুখ-স্বপ্ন, বার্ধক্যের স্নেহাশ্রয়ের আশা—এই হতভাগিনীদের জীবনে আকাশ-কুসুমে পরিণত হয়। তাহাদের কথা ভাবি-বার কেহই নাই; তাহাদের কথা বলিবার কেহই নাই,—যদি কোন হৃদয়বান লেখক ইহাদের দুঃখময় জীবন কাহিনীর অতি সামান্য অংশও কল্পনার তুলিকায় চিত্রিত করেন, তবে সে কল্পনার দাম হয় অনেক বেশী; বাস্তবকেও হার মানায়।

লেখনী

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

লো লেখনি! লেখকের মসীমুখী প্রিয়া
তোমার অধর-পরে অন্তর মথিয়া
সমর্পিল সুধাসিন্ধু, যবে আদিকবি
ক্রৌঞ্চ-মিথুনের দুঃখে পরিম্লান ছবি,
তবে তব চঞ্চুপুটে লভি নব ভাষা
হ'লে তাঁরি সাধের সারিকা।
তারপরে,
ধরিত্রীর বক্ষোপরে যুগ-যুগ ধ'রে,
বেদব্যাস-উশনাস-ভাস-কালিদাস-
ভবভূতি-বাণভট্ট-করে কর বাস
লীলাশুক জয়দেব গোস্বামী ষট্‌পদ
গৌড়ে গৌর-গাথা গাহি, প্রেম-কোকনদ-
মকরন্দ বিলাইল, হইল অমর
তোমার অমৃত-পানে আজো নারীনর
আহ্লাদে আস্বাদে তা'রে।
কত নব আশা
কল্পনার উত্তেজনে কত ভালবাসা
দিল ঢালি কণ্ঠে তব। মিটাতে পিপাসা
কত কাব্য, কত নাট্য, কত অনুরাগ
রঞ্জিত কপোলে তব ফাল্গুনের ফাগ
আঁকিল সোহাগে। লো সুন্দরী! বক্ষে তব
ঊর্মিমালা রত্নাকর সম, চক্ষে নব
রঙ্গলীলা অপাঙ্গের ইঙ্গিত-বিলাস
বহু পরিচর্যা লভি মিটে নাই আশ
কেমনে মিটাবে কবি? ওলো শশিমুখী!
অসীম দুঃখের ভারে কবি চিরদুখী
সহ তার দুঃখ-ভার, ওলো লাজময়ী!
তোলো মৌন মুখখানি, মুখর-বাঙ্ময়ী
হও নিজ কলঙ্ক-ভঞ্জনে।
তুমি হ'বে
ধরিত্রীর শ্রেষ্ঠ অস্ত্র, শস্ত্র ছাড়ি সবে
পরপক্ষ-নিরসনে তোমারেই ল'বে,
বৈরীর নিধনে নহে, বৈরি-পরাভবে
অখণ্ড যুক্তির বলে।

'হলা পিয় সহি'!
তোমার পরশ বিনা হৃদয় বিরহী
নিরীহ মরণে মরে দিনে দশবার
শূন্য-কুম্ভ বাঁধি জলে ডুবি! অয়ি প্রিয়া
তিমিরে-তিমির-হরা শ্যামারে স্মরিয়া
কালিতে ঘুচিবে কালি, হেন মনে লয়,
ব্যাধি-বিষ হরে বিষ, বিষে বিষক্ষয়
তাহারি উপমা তুমি। নিখাদ স্বর্ণের
লাবণ্যের দ্রবময়ী এ অধমর্ণের
বর্ণের কলঙ্কে কালো। অয়ি বরাননে!
কৃশতনু, স্থূল-মধ্য-দেহা, অকারণে
খেদ নাহি কর; দরিদ্রা দোহদবতী
যদি কোন সুখ-সাধ না মিটে সম্প্রতি
অদূর-ভবিষ্যে তবু রত্ন-প্রসবিণী
বহু রত্ন প্রসবিয়া রত্নাকরে জিনি
বহু রত্ন ফল-ভারে হবে মুখ নত
সুজনের সুখে দুঃখ পাইবে সে তত
যত বা পাইলে!

তব দুঃখ-সুখ-ভার
আলোকের পাশে কালো ছায়া-সম-তা'র
রহে সাথে সাথে, যেন মলিন বসনে
টানিয়া গুণ্ঠন কুণ্ঠিত পুলকে। মনে,
মনের নিভৃত-কুঞ্জে অতি সঙ্গোপনে,
ঊষর-অন্তরে মোর কল্পনা-রোপণ
যে-লতা ফুটিতে চায় অন্তর্যামী প্রিয়া
আলবালে স্নেহরস স্বহস্তে সেঁচিয়া
ফুটাইয়া তোলো তুমি,—লো পরশমণি!
তোমার পরশে মসী সুবর্ণের খনি।
তব মুখে ছন্দ-গান দিয়া কবিগুরু
করিলেন আশীর্বাদ, বক্ষ দুরু-দুরু
ভীতপক্ষিসম শান্ত হইল অমনি
শান্তিনিকেতনচ্ছায়।

আপনা আপনি
কেন পুনঃ নীড়খানি অধম কবির
বাঁধিলে বক্ষের মাঝে, করিলে অধীর
কূজনে গুঞ্জনে গানে?

হায় সে-অবধি
অন্তরে অনন্ত-অশ্রু-ভারাতুর নদী
বহিবারে বারম্বার চাহে কহিবারে
কুলু কুলু প্রবাহের ভাষা, নাহি পারে

গাহিবারে কেঁদে মরে আশা! তব রাগ,
লাজারুণ চুম্বনের প্রথম সোহাগ
বিম্বাধরে চিবুকের পরে মনোমত
মৃদু-চিহ্ন পরশের পুষ্পশর-ক্ষত
কিশোর সুন্দর শুভ্র কপোল-রঞ্জন
বক্ষে মোর দিল প্রেম চক্ষে রসাঞ্জন
অন্তরে অপূর্ব স্বপ্ন স্বর্গ-সুখরাশি
সকল দুঃখেরে ভুলাইল ভালবাসি।
খুলি 'মন্দিরের চাবি', পূজার মন্দিরে
'সাঁঝের প্রদীপ' জ্বালি, মৃন্ময়ী মূর্ত্তিরে
চিনিনু চিন্ময়ী বলি। একান্ত যতনে
দরিদ্রের দূর্বাদল সহ ধান্য সনে,
সঁপিলাম অর্ঘ্যভার উপচার মম
'ধূপ' 'দীপ' দগ্ধ করি 'আরাত্রিক' সম
স্মৃতির সমাধি-সৌধ এ-তাজমহলে
সাঁঝের প্রদীপখানি মুখ দেখে জলে
কাকচক্ষু-যমুনায়। দীর্ঘ বিরহের
অভিশপ্ত নিদ্রাহীন তপ্ত নয়নের
অশ্রুসিক্ত তৃপ্তিহীন ক্লিষ্ট দৃষ্টিখানি,
প্রগল্‌ভ-পাগল-চিত্ত, প্রকাশের বাণী
পাইল তোমার মুখে।
'শেষের গানে'র
অন্তিম করুণ সুর সর্বস্ব-দানের
গাহিলে গদ্গদ কণ্ঠে।
'দিশারি কপোত',
ক্ষীণ-পক্ষে ভর করি, নিয়ে গেলে পোত
অনুকূল বায়ুপথে, দাবদগ্ধ-হিয়া
যেথা বাতায়ন-পথে পথ চাহি প্রিয়া
রহে উদ্‌ভ্রান্ত ধরি। দিবা-বিভাবরী,
আমিও চাহিব পথে চক্ষেরে প্রহরী
কর্ণেরে উৎকর্ণ করি।
আমিও গাহিব
অমূল্য 'ছন্দের মূল্য' মূল্য না চাহিব
ছন্দের মহিমা-গাথা, ছন্দে বিরচিয়া,
যা'র তুল্য নাহি হয় শুল্ক মূল্য দিয়া
তাহাই গাহিয়া যাবো, স্তুতি-মূল্যে নহে
শ্রুতি-মূল্যে, শুধু তাহা মর্মে যেন রহে
প্রবেশি কর্ণের পথে প্রতিধ্বনি তা'র
পাঠকের চিত্তে যেন আনন্দ-সঞ্চার
করায় স্মরণ মাত্রে।
আমিও রহিব,
অনাগত অতিথিরে আসিলে অর্পিব,
তোমার দক্ষিণ হস্তে রত্নে গাঁথা হেম
যত্নে গাঁথা একাবলী-মালা-সহ প্রেম
স্মরণের চিন্তামণি, কবি-কল্পলতা
সঞ্চারিও চিত্তে তার তপ্ত মধুরতা।

★

বসন্তের কুহু

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

নিভৃত নিকুঞ্জ হতে, কি ধ্বনি ধ্বনিল
পঞ্চমের স্বরে ওঠে, অরণ্য মর্মরি;
গোকুলের কানু বুঝি, বাঁশিতে ডাকিল
"কে যাবিগো যমুনায়, ভরিতে গাগরি?"
ত্রিদিব-বিচ্যুত একি, একখণ্ড সুর
নন্দন-সেবিত বায়, এনেছে বহিয়া?
তাহা নহে এযে কোন, বিরহ-বিধুর
গেয়ে চলে অবিরাম "ওগো ওগো প্রিয়া।"
প্রিয়া বুঝি বসে আছে অজানার দেশে,
ধরণীর এইপার কিম্বা পর-পার;
এ সুর কি সেথা আর, যায় না কি ভেসে,
হয় নাকি তার হৃদে, করুণা-সঞ্চার?
নহে কেন বসন্তের ও "কুহু-ঝঙ্কার"।
মানসে জাগায় মুখ, 'প্রিয়-প্রতিমার'॥

গুরু নানক

জ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশে গুরু নানকের জন্মদিন উপলক্ষ্যে শিখেরা যে আড়ম্বরপূর্ণ উৎসব করেন তাহাতে অন্য সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরাও যোগদান করিয়া থাকেন। গত কয়েক বৎসর কলিকাতায় এই উৎসবে অন্য সম্প্রদায়ের কোন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির আমন্ত্রণ হইতেছে। বাঙালী দুর্দ্দিনেও উৎসবপ্রিয়, বিশেষতঃ যদি তাহাতে ধর্ম্ম ও সাধু সন্তের সংস্পর্শ থাকে। বাংলার শ্রীচৈতন্য (ইং ১৪৮৬—১৫৩৪) ও পাঞ্জাবের গুরু নানক (ইং ১৪৬৯—১৫৩৮) সমসাময়িক বলিলেই চলে। দুইজনের কয়েকটা আশ্চর্য্য মিল আছে—ধ্বংসোন্মুখ জাতির সামাজিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবনতির যুগে উভয়ের আবির্ভাব। উভয়েই কবি, দার্শনিক ও ঈশ্বরানুগৃহীত। সঙ্গীত ও সমবেত-কীর্ত্তনাদির মাধ্যমে উভয়েরই ধর্ম্ম-প্রচার; "নাম"-মাহাত্ম্যের উপর উভয়েরই প্রতিষ্ঠা। স্বজাতি-প্রেমে উভয়েই বিগলিত, মানসিক তেজে উভয়েই অনতিক্রম্য; বিবাহিত জীবন ত্যাগ করিয়া উভয়েই প্রেমধর্ম্ম প্রচারে আত্মভোলা। দুইজনেই ধর্ম্মপ্রাণ কবি-শিষ্য সৃষ্ট করিয়া গিয়াছেন।

দুই জনের পার্থক্যও বৈশিষ্ট্যময়। শ্রীচৈতন্য জাতি-ভেদ অস্বীকার করিলেও ব্রাহ্মণ বা বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযান করেন নাই—সাম্যের প্রচার করিলেও তথা-কথিত উচ্চশ্রেণীকে আক্রমণ করেন নাই; শ্মশানচারী তান্ত্রিক বা অবধূতকে অহেতুক রূঢ়কথা বলেন নাই—নিজ প্রচারিত ভক্তিধর্ম্মের তরঙ্গে তদানীন্তন কঠোর মায়াবাদ ও রুক্ষতাকে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। গুরু নানক ছুৎ-মার্গকে প্রচণ্ড আক্রমণ করিয়া, ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব, শ্মশান-পন্থী তান্ত্রিকের যোগাচার, উচ্চবর্ণের প্রাধান্য, বর্ণাশ্রমীর মন্ত্রপ্রীতি ইত্যাদিকে ঈশ্বরের নিয়মের ব্যতিক্রম বলিয়া-ছিলেন। উদার সাম্যবাদ, মানুষে মানুষে প্রভেদহীনতা ও জগদীশ্বরে একনিষ্ঠ বিশ্বাস ও ভক্তি—এই ছিল তাঁহার বেদ—কিন্তু ভক্তির সহিত যুক্তি ও "বিবেক-বুদ্ধির" সংমিশ্রণ ঈশ্বরানুভূতির প্রকৃষ্ট উপায়—এই ছিল তাঁহার প্রচার।

বৈষ্ণব কবিদের পদাবলীর মর্ম্মধ্বনি তাঁহার রচিত কবিতায় পরিস্ফুট। ইংরাজী অনুবাদে মূলের ছন্দ বা ভাবলীলা ব্যাহত হওয়া সত্ত্বেও বুঝা যায়, শ্রাবণ বরিষণে নানকের কবিচিত্তকে বিরহের সুর দোলা দিয়াছে। কেকা-নৃত্যের সহিত বর্ষার নূপুর ধ্বনি মিশিয়া তাঁহাকে প্রিয় দর্শনকাতর করিয়াছে; বলিতেছেন—তুমি এস, হে পরাণ প্রিয়, তোমার গরবে আমি গরবিনী; তুমি ছাড়া আমি শূণ্যময়—ধূলি ধূলি—ভস্মসমাচ্ছন্ন। তুমি ছাড়া আর কেহ নাহি মোর, গৃহ আমার গৃহ নহে—শয্যা শয্যা নহে—প্রিয় তুমি আসিলে না—শয্যা আমার শূন্য হইয়া রহিল। পালঙ্কের মণিময় আস্তরণে আমার জবাকুসুমসঙ্কাশ অলঙ্কারগুলি চূর্ণ করিয়া রাখিব। হায়, বৃথা তাহাদিগকে অঙ্গে ধারণ করিয়াছিলাম—তোমার মধুরোজ্জ্বল নয়ন-দীধিতে তাহারা ধন্য হইল না।

এই নিষ্ফল জাগরণে তোমায় আমি পাইলাম না: নিদ্রার বিরামে স্বপ্নের জড়িমায় হয়ত তোমাকে দেখিব।

ভাদ্রের বরষায় পরিপূর্ণ লাবণ্য—ভুবনভরি ঝরিখন্তির:—মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকি···প্রিয় বিনে কেমনে কাটে রাতিয়া—নানক! চল অভিসারে তোমার প্রভুর কাছে চল সেই সন্ধানে পরম প্রভুর নিকেতনে।

বহু সাদৃশ্য সত্ত্বেও, বৈষ্ণব পদাবলীর সহিত নানকের পদাবলীর পার্থক্য প্রচুর। নানকের রচনায় দেহ লইয়া মাতামাতি নাই—দেহাতীত লইয়াই বন্দনা।

প্রকৃতির বন্দনায় বৈষ্ণব কবিরা মুখর নহেন নানক কিন্তু প্রকৃতির পূজারী; বৈষ্ণব কবি বর্ষেতর ঋতুর মহিমা কীর্ত্তন করেন নাই—নানকের Round of Indian Months—"the Baramanh" শিখসাহিত্যের অলঙ্কার।

অস্যুজ (আশ্বিন), কাতিক (কার্ত্তিক), মাঘর (মাঘ), পো (পৌষ) ইত্যাদির প্রকার ভেদ ও ঋতুবিবর্ত্তনে পরমেশ্বরের অর্চ্চনার বৈশিষ্ট্য প্রেমিকার ভাবোন্মাদ—মাধুবীব বৈচিত্র্যের সহিত চিত্রিত হইয়াছে। পঞ্চনদের এই ভক্ত সন্তান প্রকৃতির লীলাভূমি এই পৃথিবীকে ঈশ্বরের পাদপীঠরূপে কল্পনা করিয়াছেন।

গুরু নানকের ঐতিহাসিক প্রতিভার পরিচয় তাঁহার "বাবরওষানি" সঙ্গীতে। ইহা অসহায়, আগ্নেয়াস্ত্র-অনভিজ্ঞ শান্তপ্রকৃতি ভারতীয় নরনারীর উপর বাবরের ভীষণ ধ্বংসযজ্ঞ, হত্যা লুণ্ঠন, নারীধর্ষণ, পৈশাচিক আচরণ প্রভৃতির করুণ অথচ জ্বালাময় কাহিনী। হিন্দু পাঠান নির্ব্বিশেষে এই হৃদয়হীন মুঘল বিজেতার অত্যাচারে জর্জ্জরিত। এমিনাবাদ নিবাসী লোবো নামক তাঁহার সর্ব্বপ্রথম শিষ্যকে গুরু নানক এই সঙ্গীত শুনাইয়াছিলেন। সঙ্গীতের মধ্যে বিদ্রোহী সন্তানের ন্যায় পরমপিতাকে পক্ষপাতিত্বের দোষ দিয়া কহিয়াছেন—

"খুরাসান খাসমানা কিয়া, হিন্দুস্থান দরিয়া"
(Thou befriendest khurasan the home of the Moghuls, why not India ?"—Ref: "Guru Nanak" by Sardar Sher Singh, M. Sc. of Kashmir)

এই ঘোর দুর্দ্দশার জন্য নানক ভারতবাসীকেই প্রধানতঃ দায়ী করিয়াছেন—তাহাদের আলস্য, ইন্দ্রিয়ভক্তি, শ্রম-বিমুখতা, কুসংস্কার, কুপ্রথা, ধর্ম্মের নামে কদাচার, ঈর্ষ্যা, স্বজাতিবিদ্বেষ, একতাহীনতা, নৈতিক অধোগতি, শরীর-চর্চ্চার অভাব ও মানসিক স্থবিরতার সুযোগ লইয়া লোভাতুর বলিষ্ঠ আক্রমণকারী চমূ উন্নত অস্ত্রসাহায্যে অতর্কিতভাবে বিপর্য্যস্ত করিতে সমর্থ হইযাছিল।

মায়াবাদীর মতো দেশের এই ভাগ্যবিপর্য্যয়কে "অদৃষ্টের" দোহাই দিয়া নানক ধ্যানমগ্ন হন নাই—প্রতীকারের পথনির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এই পবিত্র দেশ-প্রেমিক মৃত্যুকালে নিজ পুত্রের পরিবর্ত্তে সাহসী সংসার-অনাসক্ত দেশগতপ্রাণ শিষ্য অঙ্গদকে তঁাহার উত্তরাধিকার দান করিয়া দ্বিতীয় শিখগুরু মনোনীত করেন।

টাইমুরের দিল্লি প্রবেশের ফলে দিল্লির সুলতান শাসন শিথিল হওয়ায় উত্তর প্রদেশের জৌনপুরে একটি ক্ষুদ্র মুসলমান সংস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল; ইহাই ক্রমশঃ সংস্কৃতি শিল্প ও হিন্দুমুসলানধর্ম্মের ঐক্যমূলক আলোচনার কেন্দ্র হইয়া হিন্দী ভাষার মধ্যেমে সমন্বয়ের চেষ্টার সূত্রপাত করে। নূতন চিন্তাধারা তখন শুধু জৌনপুরে নহে, দক্ষিণে রামানন্দ এবং তাঁহার প্রখ্যাত শিষ্য কবীর, কাশ্মীরে রাজা জৈনুদ্দিন এবং পাঞ্জাবে গুরু নানককেও প্রভাবিত করে। এই সকল উদার-হৃদয় দৃঢ়চেতা সংস্কারকগণ স্ব স্ব ধর্ম্মাচারের গণ্ডীর মধ্যে দৃষ্টিকে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া পরস্পরের মতকে শ্রদ্ধা ও অনুশীলন করিতে আরম্ভ করেন। সুফী মতবাদ, শিখধর্ম্ম প্রভৃতি এই প্রকার সহনশীলতার বিশিষ্ট পরিচয়। শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্ম এই অনুভূতির চরম বিকাশ।

গুরু নানকের ধর্ম্মমত এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আলোচনার বস্তু নহে। শিক্ষিত শিখনেতা ও বিদগ্ধমণ্ডলী তাঁহার মত বিশ্লেষণ ও প্রচারে আগ্রহশীল। "দি বেঙ্গল শিখ মিশনারী অ্যাসোসিয়েশন্" বিনামূল্যে অথবা নামমাত্র মূল্যে উক্ত উদ্দেশ্যে কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। বাংলা ভাষায় গুরুনানকের জীবনী তন্মধ্যে অন্যতম। শিখদর্শন সম্বন্ধে ইংরাজীতে শ্রীযুক্ত শের শিং জ্ঞানি M. A. Ph. D রচিত পুস্তকখানি এবং শ্রীযুক্ত পরাণ শিং রচিত Book of Ten Masters গুরুনানক ও শিখধর্ম্ম বিষয়ে প্রচুর আলোকপাত করে। শ্রীফটিক চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এই বিষয়ে উত্তম আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের সহিত তুলনামূলক সমালোচনা ও তাঁহার নিজের মন্তব্য কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, অধুনা গুরুনানক শিখধর্ম্মের আলোচনা যে যুগোপযোগী, তাহাতে সন্দেহ নাই।

নানক বিশ্বাস করিতেন এই জীবনেই মানুষ অনুশীলন ও সত্যচর্চ্চার দ্বারা পরিপূর্ণতা ও সার্থকতা লাভ করিতে পারে; ধাতব, উদ্ভিদ্ ও বহুপশুজন্মের বিবর্ত্তনের পর এই দুর্লভ মনুষ্যজন্ম সম্ভব হইয়াছে। মহাসমুদ্রের সহিত ঊর্ম্মিমালার, সূর্য্যকেন্দ্রের সহিত রশ্মিজালের এবং অগ্নি-কুণ্ডের সহিত স্ফুলিঙ্গরাশির যে সম্বন্ধ—সর্ব্বশক্তিমানের সহিত জীবাত্মার সেই সম্বন্ধ নিবিড়ভাবে বর্ত্তমান। ইহা গুরুনানক অনুপম ভাবে দৃঢ় অনুভূতির সহিত প্রকাশ করিয়াছেন।

ঘটক

শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

অনেক খোঁজাখুঁজির পর ঠিক খাল পুলটার পাশেই পাওয়া গেল নম্বরটা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভালো করে বাড়ীটা দেখলো হরিচরণ। নম্বরটাও মিলিয়ে নিল আর একবার। তারপর চাইলো আকাশের দিকে। থমথম করছে সারাটা আকাশ। ঘূর্ণি হাওয়ার তোড় আর নেই। এখুনি বুঝি ঝড় উঠবে। মুহূর্ত্তে ওলট পালট করে দেবে সারা সহরের তন্ত্রী। ঈশানকোণে গাঢ় কালো মেঘে রক্তের ছটা মিশে ঘোলাটে হয়ে উঠেছে। তবু লাল— অস্বাভাবিক লাল।

মুখ নামিয়ে একমুহূর্ত্ত দাঁড়িয়ে কোঁচাটা ঝেড়ে, পাঞ্জাবীটা একবার আটশাট করে টেনে দিয়ে হাত বাড়িয়ে নাড়লো দরজার কড়া।

বার কয়েক ঝন্‌ঝন্ করে নাড়াব পর দরজা খুলে বেরিয়ে এলো এক ভদ্রলোক। রোগা ঢ্যাঙা চেহারা, খালি পায়ে পৈতাটা যেন সাপের মত জড়িয়ে রয়েছে। মাথার সামনের দিকটায় চরের মত খানিকটা টাক। নাকটা অসম্ভব মোটা। বড় চোখে লাগে। কোটরে বসা চোখ দু'টো স্তিমিত, গাল দু'টো যেন চড়িয়ে নামানো হয়েছে। একটু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন তিনি, "কাকে চান?"

"নমস্কার।" সন্ত্রস্ত হয়ে নিজেকে সামলে নিল হরিচরণ। বগলের মোটা লম্বা তেজারতি খাতাটা একটু তুলে নম্র কণ্ঠে বললো, "এটা কি কৃতান্ত মুখুজ্জ্যের বাড়ী?"

আজ্ঞে হ্যাঁ। কোথা থেকে আসা হচ্ছে মহাশয়ের? সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মুখ তুললেন ভদ্রলোক। অনেকটা বিস্মিত কৌতূহলী হয়ে।—

আপনিই? নমস্কার! সহসা যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠলো হরিচরণের চোখ দু'টো। আপনার কাছেই আসছি আমি। আপনি নিশ্চয় বগলাকিশোর বাবুকে চেনেন? হ্যাঁ, তার কাছথেকেই।—আমি ঘটক।

ও! তা—আসুন—ভেতরে আসুন।

খানিক ইতস্তত করে, একটু সঙ্কোচ নিয়েই এক সময় ভিতরে ঢুকলো হরিচরণ। তেজারতি খাতাটা বগলে আলতোভাবে চেপে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো উপরে। ঘরে ঢুকে, এধার ওধার দেখলো কয়েকবার, তারপর সামনের খাটটার ওপর নজর রেখেই বসে পড়লো খাটের একপাশে। ক্যাঁচ করে একবার শব্দ করে নড়ে উঠলো খাটটা। মনে হোলো আর্ত্তনাদ করে উঠলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সঙ্কোচের ভাবটা কেটে এলো কৃতান্তবাবুর মধুর অমায়িক ব্যবহারে। নড়েচড়ে বসলো হরিচরণ। এতক্ষণে যেন সে ঘটকী স্বভাবটা ফিরে পেলো। অতি সহজেই জমে উঠলো দু'জনে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিল হরিচরণ কৃতান্তবাবুর বাপ-পিতামহের নামধাম থেকে বর্ত্তমান জীবিকার তথ্যটি পর্য্যন্ত। তারপর একসময় কথাটা পাড়লো, "বগলাবাবুর মুখে প্রায় সবটাই শুনেছি। ত একবার নিজের চোখে—মানে, আপনার মেয়েটিকে একবার দেখে যেতে চাই। একটি ভালো পাত্র আছে আমার হাতে।"

কৃতান্তবাবুর মুখ চোখ অকস্মাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো খুসীতে। ভাবছিলেন এক ফাঁকে নিজেই কথাটা পাড়বেন। শুধু সুযোগ হচ্ছিল না। কতদিন থেকে কত আঘাটায় চড়ে বেড়িয়েছেন মেয়েটাকে পার করবার জন্যে। বয়সও তো হচ্ছে! যত দিন যাচ্ছে বয়স তো কাটছে না, মনে হচ্ছে দিন দিন ধিঙ্গী হচ্ছে মেয়েটা। হালে আবার রাত্রের ঘুমটুকুও যেতে বসেছে স্বামী-স্ত্রীর। তাই শশব্যস্তে যথাসম্ভব মনের চপলতাকে ঢেকে নিয়ে বললেন, "বিলক্ষণ, এ তো সৌভাগ্য।"

তারপর একসময় সত্যি সত্যি সাজিয়ে-গুছিয়ে মেয়েকে এনে দাঁড় করালেন কৃতান্তবাবু।

হঠাৎ সিধে হয়ে বসলো হরিচরণ ঘটক। চোখে যেন

রঙের ছোঁয়া লেগে গেল মুহূর্তে। গভীর দৃষ্টিতে তাকাতে মনে হোলো চেনা মুখ, কোথায় যেন দেখেছে মেয়েটিকে ইতিপূর্বে। অথচ সঠিক মনেও পড়ছে না কোন সূত্রে, কোথায় এবং কখন দেখা। কিন্তু স্পষ্ট মনে পড়ছে ওমুখটা তার চেনা। বড় চেনা।—অনেক ভেবেচিন্তেও মনে করতে পারলে না হরিচরণ। তবু নানাভাবে খুঁটিয়ে দেখে, হাঁটিয়ে, চুলের বাড়ন্ত মেপে, হাতের লেখা নিয়ে, স্বর পরীক্ষা করে শেষপর্য্যন্ত পছন্দই হোলো মেয়েটিকে। হাসবার চেষ্টা করে বললে, "বাঃ বেশ মেয়ে, খাসা মেয়ে, লক্ষ্মীশ্রী আছে।"

আর কিছু বলা হোলো না। কেমন যেন সব গুলিয়ে গেছে। বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে ঘটকী চালের ওজন করা মতামতগুলি। অথচ এমনটি বড় একটা হয়ও না তার।

একসময় কুষ্টির নকল আর জন্ম-সন, তারিখ থেকে রাশি-নক্ষত্রের খাতিয়ান কষে, আদ্যোপান্ত মেয়ের বর্ণনা ছকে ফেলে—জলযোগান্তে উঠে দাঁড়ালো হরিচরণ। কথা দিল, যত শীঘ্র সম্ভব এর ব্যবস্থা তিনি অবশ্যই করবেন। মনে হচ্ছে এখানেই কাজটা হবে। ছেলের মেয়ে দেখা পর্য্যন্ত অপেক্ষা—এই যা। তারপর এগিয়ে গেল দরজার দিকে। জানালা গলিয়ে একবার আকাশের দিকে তাকালো। আরো—আরো বেশী গুমোট আকাশ। ভেঙে নামলো বলে বৃষ্টি। বৃষ্টি তো নয়, মেঘের সাজ দেখে মনে হচ্ছে, বুঝি বন্যার তোড়ে ভাসিয়েই নেবে আজ সমস্ত চরাচর। মনে মনে একবার আফসোস করলো ছাতাটা না আনার জন্যে। এমন ভুলতো বড় একটা হয় না তার! নিত্য সঙ্গী ছাতাটা। কোন ক্ষণে, কোন অবস্থাতেই তার হাতছাড়া থাকেনা সেটা। অথচ আজ—কি আশ্চর্য্য!

মুখ নামিয়ে চিন্তিত হয়ে পা বাড়ালো সিঁড়ির দিকে হরিচরণ। হঠাৎ আবার পেছন থেকে ডাক পড়লো। থমকে ফিরে দাঁড়াতেই, একগাল হাসিতে মুখটা বিকৃত করে সামনে এসে দাঁড়ালেন কৃতান্তবাবু। বললেন, "একটু উপরে যেতে হবে।"

আমাকে? অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো হরিচরণ।

আজ্ঞে হ্যাঁ। বিনীত, নম্র কণ্ঠে উত্তর দিলেন কৃতান্তবাবু। আমার স্ত্রী ডাকছেন আপনাকে? মানে—

আপনার স্ত্রী! আমাকে? সহসা যেন বিশ্বাস হোলো না কথাটা হরিচরণের। একটু চুপ করে থেকে বললো, "তা—আচ্ছা চলুন।"

খুব খানিকটা উৎকণ্ঠা আর ঔৎসুক্য নিয়েই ওপরে উঠলো সে। এবার আর বাইরের ঘরে নয়, ভেতরের ঘরে ডেকে নিলেন তাকে কৃতান্তবাবু। বললেন, "চলে আসুন। না, না, লজ্জার কি আছে। মনে করুন এটা আপনার নিজেরই বাড়ী।

পর্দ্দাটা তুলে ভেতরে ঢুকতেই যেন মনে হোলো ত্বরিতে একটি মুখ আড়াল হয়ে গেল একপাশে। দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছে, লম্বা ঘোমটা ফাঁক করে সামনে এসে দাঁড়ালো বৌটি। হেসে বললে "বসুন, আপনার সাথে গুটি কয় কথা ছিল। ওকি, দাঁড়িয়ে রইলেন যে!

মেয়েটা প্রথম থেকেই শুয়ে ছিল। এবার ঘরে টেঁকাই দায় হোলো। তাই ত্রস্তে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। কৃতান্ত বাবুও খানিক ইতস্তত করে এক সময় বেরিয়ে গেলেন বাইরে।

হরিচরণের কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে সব। বসা আর হোলো না। বেকুবের মত ঠায় দাঁড়িয়েই রইলো।

কৈ বসুন? এবার আর ঘোমটার আড়ালে নয়, স্পষ্ট তুলে ধরলে মুখ বৌটি। হেসে বললে, "আপনি তো আমার কুটুম। লজ্জাব কি আছে।"

থতমত খেয়ে একবার হাসবার চেষ্টা করলো হরিচরণ, তারপর ঝুপ করে বসে পড়লো একটা জলচৌকির ওপর।

আমায় আপনি চেনেন নি, কিন্তু আপনাকে আমি প্রথমেই চিনতে পেরেছিলুম। হরিচরণের টুলের পাশে এসে দাঁড়িয়ে একবার হাসলো বৌটি। ভারি আশ্চর্য্য হয়েছি কিন্তু।

আচমকা কথাটা শুনে বেশ খানিকটা বিস্মিত হোলো হরিচরণ। দেহটা একবার এপাশ ওপাশ দুলিয়ে বললে "আমায় চেনেন আপনি?"

হ্যাঁ। খুব ভালো করেই চিনি। মেয়ের জাত কি অত সহজে সব ভুলে যায়? আপনি বেলতলীর গাঙ্গুলী বাড়ীর ছেলে তো?

হ্যাঁ—। কিন্তু—ঢোঁক গিলে অসমাপ্ত কথার রেশ টেনে নিজেকে প্রকৃতিস্থ করবার চেষ্টা করলে হরিচরণ।

আপনার নামটিও কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে আমার। হেসে মুখ নাড়ালো বৌটি। চুপ করে থেকে আবার বললো—আজ তো আর নাম নিতে দোষ নেই। হরিচরণ চাটুজ্জ্যে তো?

হু বহু মিলে যাচ্ছে মেয়েটির সব কথা। গাঙ্গুলী বংশের মেয়েব তবফের ছেলেই বটে সে। কিন্তু আজ আবার সে সব পুরোণো কথার জের কেন। মনে মনে ভাবলো হরিচরণ। সে পরিচয়টুকু তো আজ আর কোন সুযোগেই স্মরণে আনবার চেষ্টা করে না সে, করে না—করার মত কারণ ঘটে না বলেই। একটু চুপ করে থেকে বললে "কিন্তু আপনি আমায় চিনলেন কি করে।"

চিনলাম—চেনা লোক বলেই। ওঃ, ভালো কথা—সহসা কথার মোড় ফিরিয়ে বললে বৌটি—এ বেলা কিন্তু এখানেই চারটি খেয়ে যেতে হবে। না—কোন কথাই শুনছি না।

উঠে পড়লো বৌটি। ত্রস্তে পেছনের দরজার সামনে গিয়ে ডাকলো "রুমু রুমু।" সাড়া দিয়ে কাছে এসে দাঁড়ালো মেয়েটি। কিন্তু একদম ভেতরে এলো না। লক্ষ্য করলো হরিচরণ। না—সত্যি মেয়েটা লাজুক। তেমনি পেয়েছে রূপ। ভাবতে গিয়ে আবার অবাক হোলো। কত চেনা—কত বেশী করে দেখা মেয়েটি। কিন্তু—কি আশ্চর্য্য, মনে আসছে না কিছুতেই।

মিনিটখানেক পরেই ফিরে এলো বৌটি। হেসে পাশে বসে পড়ে বললে, "কত দিন পরে দেখা প্রায় এক যুগ বললেই চলে।

গর্‌গর্ করে কত কথা বলে গেল বৌটি নিঃসঙ্কোচে। জানা-অজানা। কিন্তু হরিচরণ এখন কোন সূত্র পেলো না, যা থেকে এর অন্তর্নিহিত রহস্যটুকু ধরা ছোঁয় সম্ভব। অথচ এক বিন্দুও ওর মিথ্যে নয়। এক কণাও এতে অতিরঞ্জিত বা অপরিচয়ের ছাপ নেই। হুবহু মিলে যাচ্ছে বৌটির কথা। বংশের কথা, গ্রামের কথা, ভাঙন উৎপত্তির কথা।

এক ঝলক তাজা নিঃশ্বাস চেপে তাকালো হরিচরণ বৌটির দিকে। বেশ হাসিখুসী মাতৃ স্বভাবা, সহজ কারুণ্যে ভরা মুখখানা। সিঁদুরের দগদগে লাল ফোঁটা যেন বড় বেশী উজ্জ্বল, বিকশিত মনে হোলো। লাবণ্যের একটা সূক্ষ্ম রেখা ছুঁই-ছুঁই করছে মুখের আনাচে কানাচে। খুব গভীর দৃষ্টিতে ধরা পড়ে সেটা। কিন্তু বেমানান নয়—বরং মনে হোলো, সৌন্দর্য্য আর লালিত্যটুকু যেন তাতে একটু বেশী স্পষ্ট হয়েই ধরা দিয়েছে। এককালে সুন্দরী ছিল সন্দেহ নেই। মুখ চোখের গড়ন আজো তার সাক্ষী দিচ্ছে।

মুখ নামালে হরিচরণ। মনে মনে একবার পরম তৃপ্তি অনুভব করলো বৌটির মধুর সরল ব্যবহারে।

কি করছেন আজকাল? ডাগর ভাসা ভাসা চোখ দু'টি তুলে প্রশ্ন করলো আবার বৌটি। এই ঘটকগিরিই, না—

—হ্যাঁঃ, আপাতত এই পেশা, জীবিকাও বলতে পারেন। বললে হরিচরণ। নিজেকে যেন এবার একটু সহজই মনে হোলো।

—কবে থেকে করছেন একাজ।

প্রশ্নটা স্বাভাবিক। কিন্তু অবাক না হয়ে পারলো না হরিচরণ। তবু মনের ভাবটা গোপন করে হেসে বললে, "বেশীদিন নয়—বছর পাঁচ-ছয় বড়জোর।"

—তার আগে?

মুখ তুলে চাইলো হরিচরণ। বেশ গম্ভীরভাবে দেখবার চেষ্টা করলো বৌটিকে। তারপর অস্ফুটে বললো, "সে অনেক কথা। না শোনাই ভাল।"

—কিন্তু আপনাদের তো তেমন অবস্থা নয়। তেজারতি কারবার রয়েছে, বিস্তর জমিজমা রয়েছে, তারপর আছে ব্রাহ্মণোত্তর যজমানী। সে সব ফেলে এবি মতিভ্রম আপনার?

গোটা দৃষ্টিটা তুলে ধরলো এবার হরিচরণ। অনেকক্ষণ বোবার মত চেয়ে থেকে, এক সময় মুখ নামিয়ে বললে, "বলতে ইচ্ছে করছে সব কথাই। কিন্তু—"

কিন্তু কেন—শুনতেই তো চাইছি। ভয় নেই, মনে ব্যথা পাবেন না। আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি। মেয়ের মা'র সম্পর্ক নিয়ে নয়—এ সম্পর্ক বহুদিনকার। বলুন!

হাসলে হরিচরণ। নিজেকে যেন একটু একটু করে অন্য লোক বলে ভ্রম হচ্ছে। ঘটকী মনটা রূপান্তরিত হচ্ছে একটি খাঁটি অসহায় মানুষে। হেসেই বললে, "সেই যে যৌবনকালে কি পাগলামো চাপলো মাথায়—একদিন চুপি চুপি বেরিয়ে পড়লুম বাড়ী থেকে। এলাম সহরে। হ্যাঁ, এই কোলকাতা সহরে। রাগ করে এলাম তো বটে, কিন্তু করবো কি? বিদ্যা তো ব্রহ্মপুত্তুর পর্য্যন্ত। বুদ্ধিও তথৈবচ। একেবারে চর পড়া। বহুদিন ঘুরে বেড়ালুম, কিন্তু হোলোনা কিছুই। শেষে এক দেহাতী বাবাকে ধরে ব'নে গেলাম চ্যালা। বহুদিন—প্রায় গোটা দু'টো বছর ঘুরলাম সারাটা দেশ—ছাই নেংটি আর চিমটে ধারণ করে। শেষ পর্য্যন্ত তাও আর বরদাস্ত হোলো না। গয়ায় এসেই সটকে পড়লাম কাশীতে। ভোল পাল্টে ব'নে গেলাম দশাশ্বমেধ ঘাটের কোঁটা তিলক কাটা পুরুত। সুবিধেই ছিল। জাতও ছিল, পৈতাটাও গচ্ছিত ছিল কোমড়ে। খয়ের মাটি দিয়ে ছাই-ভস্মগুলো তুলে, এক বাঙালী বুড়ীকে 'মা' ডেকে দুগ্‌গা বলে একদিন বসে গেলাম। দু'পয়সা আসতেও লাগলো। তখনই কুষ্টি আর হস্তরেখা দেখতে শিখি।

একটু চুপ করলে হরিচরণ। দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললে, "কিন্তু একদিন তাও ভেস্তে গেল। বাঙালী আর অবাঙালী পাণ্ডার দাঙ্গায় পালিয়ে এলাম কোলকাতায়।...কিন্তু চুপ করে পা ঢাকা দিলাম না। তাক্ বুঝে একদিন খাতায় নাম লিখিয়ে বসে পড়লাম কালীঘাটে। কিন্তু সুবিধে হোলো না বড়। দাঙ্গা নেই বটে, কিন্তু পাণ্ডা আর পুরুত ঠাকুরদের বড়যন্ত্রের ঠ্যালায় তল্পি গোটাতে হোলো বাধ্য হয়েই। ভাগ্যিস ক'টা পয়সা তখনো পকেটে ছিল। সেই থেকে দু'টি বৎসর পড়লাম জ্যোতিষ শাস্ত্র নিয়ে। তাতেও সুবিধে হোলো না। তাই শেষ পর্য্যন্ত—

বেশ খানিকটা দম নিয়ে চুপ করলো হরিচরণ। হঠাৎ যেন তাকে কথায় পেয়েছিল। চোখ তুলে একবার চেয়েই অপ্রস্তুতের হাসি মুখে টেনে বললে, "তারপর থেকেই এই ব্যবসা। আজকাল অবশ্য পয়সা নেই এতে, তবু একটা মানুষের চলে যায় কোন ক্রমে। আবার একটু হাসলো সে। "পুরোণো দিনের কথা বলতে আনন্দ পাই—আবার ব্যথাও আসে।"

কোন কথা বললো না বৌটি। বার কয়েক কোলের ওপর হাতের আঙুলগুলো নেড়ে, এক সময় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বিমূঢ়ের মত বসে রইলো হরিচরণ। পুরোণো দিনের স্মৃতিগুলি যেন তারও দেহ মন অবশ, ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। চোখ ফেরালো বাইরে। কখন বেশ ঘন করে এক পসলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে টেরই পায়নি সে। গাছের পাতায় পাতায় টলমল করছে, ঝিকমিক করছে বৃষ্টির জল। অনেকটা শিশিরবিন্দুর মতই। ক্ষীণ, সূক্ষ্ম আলোর প্রতিচ্ছবিতে সেখান থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে। নিচে—ঘরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো সে। গ্যাস আর ইলেকট্রিক বাতিগুলির স্তিমিত আলোয় জলছে পথে জমা জল। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ছলুকে ঝিলিক দিয়ে উঠছে সাদা সাদা আলোর ফুলকি। পথে মানুষের বড় একটা আনাগোনা নেই, কচ্চিৎ দু'একটা গাড়ীছাড়া।

চোখ তুললে হরিচরণ। তুললে একেবারে আকাশের ওপারে।—আবার থরে থরে মেঘ জমেছে। কালো—ভয়ানক কালো মেঘ।—তা' হলে এখনও বর্ষণে ক্ষান্ত পড়েনি। আর কিছু—বহু কিছু হবার সম্ভাবনা আছে। ভাবলে হরিচরণ।

তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলে ভেতরে—একেবারে নিজের ঘটকী হিসেবের খাতাটার ওপর।

সে রাত্রে খেতেই হোলো হরিচরণ ঘটককে। কোন ওজর আপত্তিই টিকলো না। শেষ পর্য্যন্ত বসতে হোলো, হাতের তৈরী শাড়ীর পাড় দিয়ে বুনোনো আসনের ওপর, অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে। বসতে হোলো একাই। কৃতান্ত বাবু বসেন নি। তার একাদশী। কিন্তু সামনেও রইলেন না বেশীক্ষণ। ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে এক নজর স্ত্রীর প্রতি

চেয়ে বেশ একটু উৎসাহ নিয়েই বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে, কাজের কথা পেড়ে।

মেয়েটাও সেই যে আড়াল হয়েছে, আর দেখাটি নেই। অথচ আছে পাশেই। কেমন যেন একটা সসঙ্কোচ লজ্জা তাকে আড়ালে আড়ালে লুকিয়ে রেখেছে।

একসময় হাত পাখা নিয়ে সামনে এসে বসলো বৌটি। একথা সেকথার পর, হঠাৎ প্রশ্ন করলো, "বিয়ে করেছিলেন?"

—বিয়ে? অকস্মাৎ ধমক খেয়ে থেমে গেল হরিচরণের মুখে ভাত তোলা হাতখানা। হাতের গরাসটা হাতেই রইলো; ফাঁকা ঠোঁটের কোণে অজস্র বিস্ময় আর উৎকণ্ঠা নিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইলো বৌটির মুখের প্রতি।

কি দেখছেন অত—চিনতে কিন্তু কষ্ট হবে। অপ্রস্তুতের হাসি ফুটে উঠলো বৌটির ঠোঁটের কোণে।

লজ্জিত হয়ে মুখ নামালো হরিচরণ। খানিক সময় থালার ভাতগুলি নাড়াচাড়া করে বললো, "নাঃ—কৈ আর বিয়ে হোলো। সে সুযোগই এলোনা জীবনে। সারাটা কালতো কাটালুম মুসাফিরি করেই।"

—সত্যি? মনে হোলো মুখ টিপে একটু হাসলে বৌটি। তারপর সহসা নিজেকে সামলে নিয়ে নিচু গলায় বললে, সত্যি বিয়ে করেন নি? আচ্ছা পাগল লোক তো। মনের দুঃখে বুঝি?

—দুঃখ? মুখ তুলে চাইলো হরিচরণ। চোখের তারায় যেন একটা সূক্ষ্ম পরদা পড়েছে মনে হোলো। মাথাটা একবার ঝাঁকিয়ে নিয়ে বললো, "নাঃ দুঃখ আর কি। সুযোগই ঘটেনি।—তারপর মুখটা নিচু করে চেয়ে রইলো থালার ভাতগুলির ওপর। হ্যাঁ, সত্যি চোখ দু'টো ভারি হয়ে এসেছে।

হাসলে বৌটি। বললে, "কথাটা কিন্তু সত্যি নয়। আমি জানি—সত্যি নয়।"

ভয়ানক একটা দমক খেয়ে থেমে গেল হরিচরণের চিন্তা-স্রোত। বললে, "তার মানে?"

—ইছাপুরের দীনু ভট্টচাজ্জিকে চিনতেন? হ্যাঁ, আমি তারই বড় মেয়ে। যাকে মাত্র একবার দেখেই ভালো লেগেছিল আপনার।

হঠাৎ যেন চাবুক খেয়ে সিধে হয়ে বসলো হরিচরণ। সহসা খুঁজে পেলে না কোন কথা।

কিন্তু—সে বিয়েটা কায়দা করে আপনার মামাই ভেঙে দিয়েছিল,—আপনার মামীর পরামর্শে। ইচ্ছে—তার ভাইয়ের সাথেই কাজটা হোক্। হোলোও তাই। একটু চুপ করে থেকে আবার অস্ফুটে বললে, "তাই সেদিন আপনার পছন্দের মর্য্যাদা দিতে পারিনি। কি করি বলুন—জন্মেছি মেয়ে হয়ে। সংসারে আমাদের হাত পা বাঁধা। কিন্তু দুঃখ কি সেদিন আমিই কম পেয়েছিলাম?"

টলমল করে উঠলো বৌটির চোখ দু'টো। বুঝি এখুনি ফেটে পড়বে। খাওয়া হোলো না আর হরিচরণের। ত্রস্তে উঠে দাঁড়ালো আসনের ওপর।

বাধা দিয়ে হা হা করে উঠলো বৌটি। বললে, "সবই যে পড়ে রইল।"

অনেক—অনেক হয়েছে। অস্ফুট কথার রেশ মিলোবার আগেই বারান্দার দিকে পা চালালো হরিচরণ। কোন প্রকারে হাত দুটো ধুয়ে—ভদ্রতা সেরে ক্ষিপ্র পদক্ষেপে সিঁড়ি ক'টা ভেঙে এসে দাঁড়ালো পথে। তারপর হাঁটতে শুরু করে দিল বাস রাস্তার দিকে। হাঁটছে না তো, যেন দৌড়ুচ্ছে।

মাথার ভেতরটা ঝাঁ ঝাঁ করে পুড়ে যাচ্ছে। চোখের তারা ভেদ করে এবার নামলো আষাঢ়ের বন্যা নেমে এলো। টস্‌টস্ করে গড়িয়ে পড়লো কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু, দু'গাল বেয়ে। চোখের সামনে ভেসে উঠলো বৌটির শেষের দৃষ্টিটুকু। বড় অসহায়, দুরন্ত কান্নায় ছাপা মুখটা যেন এবার জুড়ে জুড়ে অন্য মূর্ত্তিতে এসে ধরা দিল তার কাছে।

মেয়ের কথাটা মনে পড়লো অকস্মাৎ। হুবহু সেই এক মুখ। সেই পুরোনো মেয়েটার মতই। মিনু—হ্যাঁ মিনুই যেন ছিল ওর সামনে।

অনেকদিনের কথাটা মনে পড়তেই আবার নতুন করে ব্যথায় টনটন্ করে উঠলো বুকের ভেতরটা। দীর্ঘশ্বাস পতনের সঙ্গে একবার কেঁপে উঠলো তার লম্বা, রোগাটে

দেহটা। সেদিনের স্মৃতি যেন আজো মুখর, আজো যেন মূর্ত্ত—বড় স্পষ্ট।

ভালোই লেগেছিল মেয়েটিকে সেদিন। শুধু পছন্দই নয়, মনে-একটুকুরো প্রতিজ্ঞাও দানা বেঁধেছিল।—কিন্তু কি থেকে কি হয়ে গেল। সামান্ত পণের টাকা নিয়ে ঝড়ের মত ভেঙে গেল আশীর্ব্বাদ, চুকোনো বিয়েটা। প্রতিজ্ঞা রক্ষা হোলো না। কিন্তু ভঙ্গও হোলো না। বরং তার জের মেটাতে গাঙ্গুলী বাড়ীর মেয়ের বংশ থেকে খসে পড়লো একটি লোক।

আজো মনে পড়ছে—স্পষ্ট মনে পড়ছে সে সব কথা। প্রায় কুড়িটা বছর পেরুনো ইতিহাস, তবু কি আশ্চর্য্য উজ্জ্বল, ব্যথায় রাঙা সে দিনগুলি। চোখের তারায় যেন আজো চেপে লেপ্‌টে বসে আছে তারা।

কচি মেয়েটার মুখখানা আবার ভেসে উঠলো চোখের সামনে। হ্যাঁ তেমনি পুরোণো, তেমনি লাজুক ও মুখ। কোন তফাৎ নেই, কোন ব্যতিক্রম নেই।

একমুহূর্ত্ত থমকে দাঁড়িয়ে, কোঁচাটা তুলে, বগলের তেজারতি খাতাটা আঁটশাট করে, আকাশের দিকে একবার চেয়ে, আরো—আরো দ্বিগুণ বেগে পা চালালো হরিচরণ।

★

হে রুদ্র ভয়াল জাগো!

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

তোমারে আহ্বান করি—ওঠ, জাগো হে রুদ্র ভয়াল।
জাগো ভীম পরাক্রমে, নহ তুমি কভু শক্তিহীন।
কর দীর্ণ ছিন্ন ভিন্ন মোহ আর আলস্যের জাল,
হস্তের শৃঙ্খল ভাঙো—হোক্ যত কুলিশ-কঠিন।

বাজাও বিষাণ তব, মহারবে কাঁপুক্ অম্বর,
কাঁপুক্ সমুদ্র-গিরি সীমাহীন তোমার প্রতাপে।
ক্ষুদ্রতার পরিমাপে আর কত বাঁধিবে অন্তর,
মথিবে হৃদয় তব আর কত করুণ-বিলাপে?

তোমারি শক্তিতে গড়া এই বিশ্বে সকল বৈভব—
নহ তুমি অধিকারী—তুমি শুধু বাহক তাহার।
জীবন করেছ পাত, জীবনের পাওনি গৌরব,
লভিয়াছ বারে বারে অপমান-দুঃখ হাহাকার।

নিস্বঃ তুমি, দীন তুমি, অবজ্ঞাত তুমি এজগতে,
তবু তব মাঝে আছে ভয়হীন সিংহের বিক্রম।
আজো তুমি জাগিবে না উদ্‌যাপিতে জীবনের ব্রতে,
লাঞ্ছনার প্রতিবাদে নাহি হ'বে নিষ্ঠুর নির্ম্মম?

প্রতীকার লগ্ন কত দ্বার হ'তে চ'লে গেছে ফিরে,
তুমি ত' ওঠনি জেগে, দাওনিক' সাড়া কোন দিন!
দুর্ভাগ্যের অভিশাপ বহিয়াছ নিত্য নত-শিরে,
নিজেরে ভুলিয়া গেছ, জড়তায় হয়েছ বিলীন।

অন্তরের আলো তব আজো দেখ আছে অনির্ব্বাণ,
সেই শিখা তুলে ধর ঊর্দ্ধ পানে মশালের মত!
আঁধারের গাঢ় মায়া অতর্কিতে হয়ে যাবে ম্লান,
জীবনের রূপ তব তা'রি মাঝে হ'বে সমুদ্ধত।

গভীর রাত্রির পথে থাক্ বাধা, থাক্ শত ভয়,
থাক্ দুঃখ নিদারুণ, নাহি থাক্ আলোকের শিখা,
লক্ষ্য পানে চল তবু—নাহি হবে তব পরাজয়,
দূরীভূত হ'য়ে যাবে তিমিরের মিথ্যা বিভীষিকা!

———

উনিশ শতকে বাংলার গণ-আন্দোলন

অংশুরঞ্জন সেন

উনবিংশ শতাব্দী বাংলার বুকে নিয়ে এসেছিল এক অভূতপূর্ব প্রাণস্পন্দন। অর্থহীন আচারের স্বপ্নজালে জড়িত আমাদের দেশ সেদিন মুক্তি পেল তার অগৌরবের কালিমা থেকে। জ্ঞানের অবরুদ্ধ গতি হোল চলমান আর নিশ্চল আচারপুঞ্জের দ্বার গেল ভেঙে। ঘুমন্ত, অচেতন মানুষ হয়ে উঠল সচেতন। জীবনের সংকীর্ণ গণ্ডী পেরিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ হয়ে উঠল গভীর। সেই প্রবাহ চিন্তার ক্ষেত্রকে পরিপূর্ণ করে তুলল নব নব সফলতায়। তাই জেগে উঠল বাংলার বিখ্যাত রেনেশাঁস আন্দোলন রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে। গঠনধর্মী এই আন্দোলন মানুষের জাতীয় চেতনাকে তুলল জাগিয়ে। আবার তার পাশে দেখা দিল ডিরোজিওর নেতৃত্বে যুব-সমাজের নব্যবঙ্গ আন্দোলন, যার ফলে প্রবল হয়ে উঠল জাতির দুর্বার স্বাধীনতা স্পৃহা। এইভাবে নতুন গণ-তান্ত্রিক জীবন-ধর্মে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠল বাংলার মানুষ। তাই সেদিনকার রাজনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি বিভিন্ন মুখী অগ্রগতির কথা স্মরণীয় হয়ে আছে ইতিহাসের পাতায়।

কিন্তু উনিশ শতকে বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা আলোচনা করতে গিয়ে সর্বপ্রথম আমাদের চোখে পড়ে এর ক্রমবর্দ্ধমান গণ-আন্দোলনগুলো। বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদের প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থা ও শোষণনীতি জর্জ্জরিত করে তুলছিল বাংলার সাধারণ মানুষকে। তাই এই আন্দোলনগুলো ছিল সংক্ষুব্ধ মানুষের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ। এগুলোতে হিন্দু-মুসলমান-কৃষক, তাঁতী, কামার একসঙ্গে সংগ্রাম চালিয়েছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে বৃটিশদের উদ্দেশ্য ছিল এই দু'জাতের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে আন্দোলনগুলোকে দুর্বল করে দেওয়া। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছিল। সমস্ত ভেদ-বিভেদকে তুচ্ছ করে সাধারণ হিন্দু-মুসলমান এগিয়ে গেল সংগ্রামের পথে, কারণ ঐক্যতাই ছিল সেদিনের জীবনে বৃহত্তর সত্য। তাই বাংলার সাঁওতাল, নীল ও ওহাবী আন্দোলনে ব্যাপকভাবে দেখা দিল হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সংগ্রাম।

যাই হোক্, ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের মধ্যে এই বহুমুখী আন্দোলন পরিপূর্ণতা লাভ করল। ১৮৫৫ সাম্রাজ্যবাদ প্রবর্তিত ভূমি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সাঁওতালদের বিদ্রোহ সুরু হয়। ক্রমে ক্রমে এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ল বীরভূম, ভাগলপুর প্রভৃতি জেলাগুলোতে। ইংরেজ সরকারের প্রবল অত্যাচার ও অকথ্য জুলুমই নিরীহ সাঁওতালদের টেনে নিয়ে এলো বিদ্রোহের পথে। আবার বৃটিশ সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাংলার জমিদার, গোমস্তা, পুলিশ আর আমলার দলও তাদের ওপর অত্যাচার চালাত সমভাবে। নিরীহ এই সাঁওতালদের সম্পত্তি জোর করে বাজেয়াপ্ত করা একটা নিত্যনৈমিত্তিক নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল কোম্পানী শাসনের। কিন্তু অপরদিকে সাঁওতালদের দাবী ছিল নিতান্ত যৎসামান্য। তারা চেয়েছিল মহিষ আর গরুর লাঙ্গলের ওপর খাজানার পরিমাণটা যথাক্রমে দু'আনা আর দু'পয়সা করা হোক্। কিন্তু কোম্পানী তাদের এই ন্যূনতম দাবীটুকুও মেনে নিতে রাজী হোল না। ফলে তাদের বিদ্রোহ সুরু হোল আর এই বিদ্রোহে তারা চুমোর, কামার আর মোমিন প্রভৃতি নীচু জাতের সমর্থন পেল এই বিক্ষোভ এত ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করল যার ফলে বৃটিশ শাসকরা রীতিমত আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তাঁরা এই বিদ্রোহকে দমন করবার জন্য জমিদার ও অভিজাত শ্রেণীর সাহায্য প্রার্থনা করলেন। কিন্তু সামান্য অর্থের বিনিময়ে অগণিত শোষিত মানুষের বিদ্রোহকে থামানো যায় না। তাই অভিজাত শ্রেণীর সাহায্যলাভ সত্ত্বেও বৃটিশ সরকার ব্যর্থ হোল এই আন্দোলনকে দমন করতে।

উপরন্তু, ইংরেজ সৈন্যরা বহু জায়গায় পরাজয় স্বীকার করল সাঁওতালদের কাছে। এইভাবে সাঁওতালদের দাবী জয়যুক্ত হোল।

কিন্তু এদেশে বৃটিশ আধিপত্য বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে ঘনিয়ে আসতে লাগল দুর্য্যোগের মেঘ। খালি সাঁওতালরাই নয়, বাংলার কৃষক জীবনের ওপরও বর্ষিত হয়েছিল ইংরেজ-শাসনের অভিশাপ। বাংলার কৃষকের একমাত্র অবলম্বন ছিল তার সোনার ধান। কিন্তু যেদিন থেকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তার নিজস্ব নীলের আবাদ ছেড়ে দিল ইউরোপীয় বণিকদের হাতে, সেদিন থেকে দরিদ্র কৃষকদের ভাগ্যে নেমে এলো ব্যর্থতার অন্ধকার। বাংলার পল্লীগুলোতে কুঠিয়াল সাহেবরা নিযুক্ত হবার পর থেকে সুরু হোল নিরন্ন চাষীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার। জোর করে তাদের নীলচাষ করতে বাধ্য করা হোত। আর এই কাজের পক্ষে সাহেবদের প্রধান অস্ত্র ছিল "দাদন।" একবার এই দাদন নিলে চাষীরা চিরদিনের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হয়ে কুঠিয়ালদের অধীন হয়ে পড়ত। আর যারা দাদন নিতে অস্বীকার করত তাদের বে-আইনীভাবে আটক রেখে "শ্যামচাঁদ" নামে চামড়া দিয়ে মোড়া একপ্রকার লাঠির সাহায্যে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করা হোত। ফলে অনেক সময় তাদের মৃত্যু পর্য্যন্ত হোত। কুঠিয়াল সাহেবদের এই অত্যাচারের কথা রূপায়িত হয়ে উঠেছে সমসাময়িক নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ" নাটকের পাতায় পাতায়। এই পুঞ্জীভূত অসন্তোষই শেষে রূপ নিল বিদ্রোহের বহ্নিশিখায়। ১৮৬০ সালে জেগে উঠল ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নীল-আন্দোলন যশোহর, নদীয়া, পাবনা প্রভৃতি জেলাগুলোতে। নদীয়ার বিষ্ণুচরণ ও দিগম্বর বিশ্বাস নামে দুই ভাই সরকারী চাকরী-পরিত্যাগ করে নীল-আন্দোলনে যোগদান করলেন। আবার অপরদিকে ওহাবী দলভুক্ত রফিক মণ্ডল ও বিদ্রোহী কৃষকদের সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। দলগত আদর্শ ভিন্ন হলেও নিরন্ন, লাঞ্ছিত কৃষকদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল অসীম। তাই কৃষাণ বন্ধু হিসেবে এই তিনজনের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে। যাই হোক, বিদ্রোহের এই দুর্ব্বার গতি ইংরেজ সরকারকে করে তুলল আতঙ্কিত। তাই বাধ্য হয়ে ১৮৬০ সালে তাঁরা "ইণ্ডিগো কমিশন" নিযুক্ত করলেন এ সম্বন্ধে তদন্ত কার্য্য চালাবার জন্য। ফলে আন্দোলনের গতি এলো কমে আর নীলকর সাহেবদের প্রভাব-প্রতিপত্তিরও হোল অবসান। কৃষক শ্রেণীর এই বিজয় উনিশ শতকের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে একটি গৌরবময় অধ্যায়।

নীল-আন্দোলনের পর ওহাবী আন্দোলনেরও প্রভাব এসে পড়েছিল বাংলার কৃষকশ্রেণীর ওপর। কিন্তু এই দেশে এটি "ফেরাজী" আন্দোলন নামেই পরিচিত। মুসলিম কৃষক, জোলা, মৌলবীদের বিক্ষোভ রূপ পেল এই আন্দোলনে। তারা তিব্র প্রতিবাদ জানালো সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে। বিক্ষুব্ধ জনগণের আশা ও আতংকের কেন্দ্র গড়ে ওঠার ফলেই এই আন্দোলন পেয়েছিল প্রচুর গণ-সমর্থন, যা-বিচলিত করে তুলেছিল বৃটিশ শাসকদের। স্বাতন্ত্র্যবোধ থাকা সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলমান কৃষক পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সংগ্রাম চালিয়েছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। এইভাবে সকল শ্রেণীর স্বার্থ রূপায়িত হয়ে উঠেছিল এই আন্দোলনে। সেদিনের ইতিহাসও তাই সাক্ষ্য দেয়। ফরিদপুরের দিদু মিঞা আর ২৪–পরগণার তিতু মিঞা শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে যুদ্ধ করেছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, কিন্তু মাথা নত করেনি কোনদিন। তাই এই দুজন কৃষক নেতার কথা ভোলেনি বাংলার সাধারণ মানুষ, ভোলেনি ইতিহাস। কিন্তু ওহাবী আন্দোলন তার ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল না। ওহাবীরা চেয়েছিলেন বৃটিশ আমলের ভারতবর্ষকে সপ্তম শতাব্দীর আরব্য সমাজে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। কিন্তু পরিবর্ত্তনশীল, ইতিহাস তাকে স্বীকার করে না। কারণ, সমাজ এগিয়ে যায় প্রগতির দিকে, পিছনের দিকে ফিরে তাকানোর অভ্যেস তার নেই। তাই ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এই আন্দোলন এগিয়ে গেল ব্যর্থতার দিকে। কিন্তু, বাংলার সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক অস্বচ্ছলতার দরুণ এই আন্দোলনের মোড় ঘুরল অন্য পথে। তাই এখানে হিন্দু-মুসলমানের

মিলিত সংগ্রাম বৃটিশ শাসনের ভিত্তিকে দিল একেবারে নড়িয়ে।

এই বিপুল গণজাগরণ বাঙালী মধ্যবিত্তের সঙ্কীর্ণ পৃথিবীকেও স্পর্শ করেছিল। প্রথমে তার তীব্র আলোয় বিভ্রান্ত তাঁরা স্বভাবতঃই নিষ্ক্রিয় ছিলেন, হারিয়ে ফেলেছিলেন দৃষ্টি ও বিচারের স্বচ্ছতা। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত শিক্ষিত মনের মানবতাবোধ ও সহানুভূতি নিয়েই তাঁরা স্বীকার করলেন একে—যা জাগালো প্রভাতের প্রত্যাশা। দুঃসহ দমননীতির বিরুদ্ধে মধ্যবিত্তের প্রতিবাদের মধ্য দিয়েই সুরু হোল এই নতুন অধ্যায়। হরিশ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় "হিন্দু পেট্রিয়ট" আন্তরিকভাবেই সিপাহী বিদ্রোহের ও প্রজাবিদ্রোহের বিচার করল। তবুও এই বিদ্রোহের জন্য তিনি ইংরেজের নির্য্যাতন নীতিকে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে অভিযুক্ত করেছিলেন। বাংলার বুকে নীলকরদের বীভৎস তাণ্ডবের কথা প্রাণময়ী ভাষায় প্রকাশিত হোল অক্ষয়কুমার দত্তের "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকায়। এইভাবে মানবতাবোধের অনুবোধে সহরের মধ্যবিত্তের সঙ্গে গ্রামীণ কৃষকের নিবিড় সংযোগ ও মিলিত সংগ্রামের মিলনসেতু রচিত হোল। সংস্কৃতির ক্ষেত্র থেকে সচেতন মধ্যবিত্তের এই বিক্ষোভ সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসুর প্রচেষ্টায় "ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশান" বা "ভারত সভার" উত্থানের ভিতর দিয়ে রাজনীতিক রূপ নিল। বিদ্রোহের বন্ধুর পথে নয়, শাসনতান্ত্রিক পথে বৃটিশ বণিকতন্ত্রের উদারপন্থী বিপক্ষতাই ছিল এই নেতৃত্বের নীতির বৈশিষ্ট্য। এই উদারপন্থী মনোভাবের আহ্বানেই তাঁরা গ্রামের কৃষকের সুগভীর অভাব ও তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের দিকে আকৃষ্ট হন্। এরই অনুপ্রেরণায় ভারত-সভার চেষ্টায় বাংলার পল্লীতে পল্লীতে "রায়ত-সভার" উদ্ভব হয়। এই নতুন প্রয়াসের উদ্দেশ্য ছিল নিঃসহায় নিরন্ন নির্য্যাতিত চাষীর ওপর যে জমিদারী পেষণ চলেছে তাকে প্রতিহত করা, চাষীর স্বার্থরক্ষা করা মানবচেতনা ও সুশাসনের নামে, সভ্যতা ও কৃষ্টির নামে। ভারত-সভার এই বিরাট প্রচেষ্টা দরিদ্র কৃষক ও মধ্যবিত্তের সংবেদনশীল মুখপত্র "ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়নের" বিপুল অভিনন্দন লাভ করেছিল। মধ্যবিত্ত মনীষার এই চরম প্রখরতার মধ্যেই উনিশ শতকের গণবিক্ষোভের ধারাটির প্রকৃত পূর্ণতা ঘটে।

এই হোল উনিশ শতকের গণ-আন্দোলনের মুখরতা, এই তার সমাপ্তি। ইতিহাসের প্রাণহীন আবর্জ্জনায় হয়েছিল তার স্বপ্নজগতের আর ভূমি ব্যবস্থার সাময়িক ও ক্ষণিক পরিধিতেই তার প্রয়াস ছিল সঙ্কীর্ণ। তবুও তার নিদারুণ সংঘাতে মুমূর্ষ সামন্ত সমাজের ভিত্তি শিথিলতর হয়েছিল—আর বিস্তীর্ণ বিক্ষোভের আশংকা ও শিক্ষিত শ্রেণীর রাষ্ট্রীক আন্দোলন ইংরেজ সরকারকেও "প্রজাস্বত্ব আইন" রচনায় বাধ্য করেছিল। প্রজাবিদ্রোহের পথরোধ ও শিক্ষিত শ্রেণীর সমর্থন লাভই যে এই আইনের মূল লক্ষ্য ছিল সে কথা স্বীকার করতে বৃটিশ ঐতিহাসিক ওমালীও কুণ্ঠিত হন্নি কিন্তু "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের" অভিশাপের কঠিন বন্ধন থেকে কৃষি ও রায়তের মুক্তি এ আনেনি। উনিশ শতকের এই গণ-আন্দোলন সত্যিই এই শতাব্দীর রাত্রির তপস্যায় উজ্জ্বল দীপশিখার মতো— এরই ব্যর্থতার আলোকে আধুনিক যুগের ভবধারা দীপ্যমান হয়ে দেখা দিয়েছে। শীর্ণ প্রচ্ছন্ন জাতীয়তাবাদকে এই আন্দোলনই সযত্নে কৈশোরে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে। বিংশ শতাব্দীর ক্ষমাহীন স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসই তার অমলিন সাক্ষ্য।

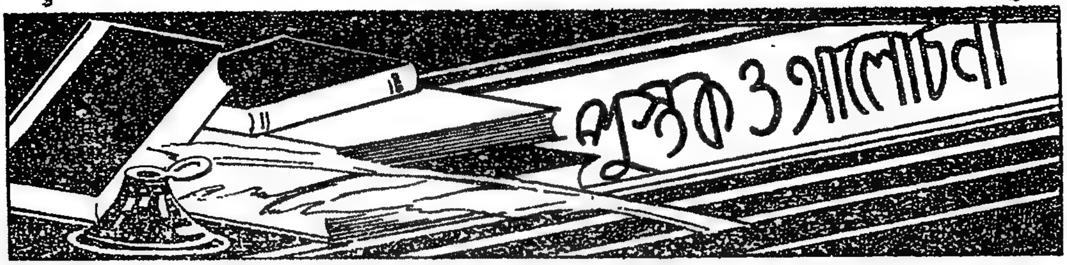

(ক) বাংলা সাহিত্যের গল্প। শ্রীঅনিলেন্দু চক্রবর্তী, এম্‌-এ
(খ) চির নতুন কাহিনী। শ্রীঅনিলেন্দু চক্রবর্তী এম্‌-এ।
মোহন লাইব্রেরীঃ ৩৫।এ, মির্জাপুর স্ট্রীট, কলিকাতা।
মূল্য যথাক্রমে ১৸০ আনা ও ১৷০ আনা মাত্র।

উভয় গ্রন্থেরই যথাক্রমে দ্বিতীয় সংস্করণ চলিতেছে। অতএব জনপ্রিয়তার দিক হইতে উভয় গ্রন্থের মূল্যই যে সমধিক, তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিদ্যালয়সমূহের দ্রুতপঠনের উপযোগি করিয়া গ্রন্থ দুইখানি রচিত। অনিলেন্দুবাবু নিজে কৃতি অধ্যাপক; ছাত্রশিক্ষার মানদণ্ড তাঁহার অধিগম্য। সেই মানদণ্ডের ভিত্তিতেই তিনি বাংলা-সাহিত্য ও ধর্মীয় উপাখ্যানসমূহকে সংক্ষিপ্তাকারে বিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজের উপযোগি করিয়া সুললিত ভাষায় পরিবেশন করিয়াছেন। বাঙালী কৃষ্টির দিকে যাহাতে বাঙালী ছাত্রসমাজের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইতে পারে এবং পাঠ-অধ্যয়নের মধ্য দিয়া যাহাতে সেই কৃষ্টিকে তাহারা দূর-প্রসারি করিয়া তুলিতে পারে, এইরূপ একটি মহৎ সংকল্পেই গ্রন্থ দুইখানিতে বিশেষভাবে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এই জাতীয় গ্রন্থের যত বেশী সংস্করণ হয়, ততই মঙ্গল।

রৌদ্র-জ্যোৎস্নাঃ কাব্যগ্রন্থ। সুশীলকুমার গুপ্ত। রাইটার্স কর্ণারঃ ১০৪।১৪, গোপাললাল ঠাকুর রোড, কলিকাতা-৩৬। মূল্যঃ এক টাকা মাত্র।

সুশীলকুমার সেই শ্রেণীর কবি—যাঁহার মধ্যে অত্যাধুনিকতার উগ্রতা নাই, অথচ যিনি প্রাচীনতাকেও প্রায় পুরাপুরীই অস্বীকার করিয়াছেন। প্রাচীন ও অতি-নবীনের সেতুবন্ধন ঘটিয়াছে সুশীলকুমারের কাব্যে। 'রৌদ্র-জ্যোৎস্নায়' ছোটবড় ৩২টি কবিতা স্থান পাইয়াছে। অধিকাংশ কবিতাই আশাবাদের উজ্জ্বল আলোকে ভাস্বর। কাব্যের আধুনিক ধর্ম বলিতে এই আশাবাদের হিরন্ময়তাকেই বুঝায়। 'কালান্তর', 'মহাচীন', 'ভারত', 'একটি শান্তির কবিতা', 'চাঁদ', 'নির্ণয়' প্রভৃতি কবিতায় কবির শক্তি ও প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বর্তমান।

'দিগন্ত আগুনে জ্বলে, দিকে দিকে ছায়ার মিছিল,
তবু মৃত্যুনীল চোখে খুঁজি ভোর আকাশের নীল।'
—(কালান্তর)

এই জাতীয় পংক্তিগুলি বর্তমানের কুটিল কুশ্রীতা হইতে মানুষের মনকে অতুল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের এক স্বপ্নময় মাধুর্যের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। কাব্যের জীবনী-শক্তি এইখানেই। যাহা বর্তমান হইতে ভবিষ্যতের ইঙ্গিতকে সার্থকভাবে রূপায়িত করিতে পারে, তাহাই তো সাহিত্যের জীবনীশক্তি! সুখের বিষয়, 'রৌদ্র-জ্যোৎস্নায়' সেই শক্তির স্বাক্ষর দেখিয়া কবির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমরা আশান্বিত হইলাম।

গোধূলী-সূর্যঃ কাব্যনাট্য। সন্তোষকুমার অধিকারী। প্রাপ্তিস্থানঃ অশোক লাইব্রেরীঃ ১৫।৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্যঃ আট আনা মাত্র।

সন্তোষকুমার অধিকারী মূলতঃ কবি হইলেও গল্প ও প্রবন্ধ-সাহিত্যেও তিনি যথেষ্ঠ লেখনী সঞ্চালন করিয়াছেন। ইতিপূর্বে তাঁহার গান্ধী-অভিযানের ভিত্তিতে রচিত 'একলা চলো রে' শীর্ষক কাব্যগাথা পড়িয়া আমরা খুশী হইয়াছি। 'গোধূলি-সূর্যও' গান্ধীজীকে কেন্দ্র করিয়াই রচিত। গান্ধীজীর জীবন-স্বপ্ন ও সেই স্বপ্নের সার্থকতার পথে তাঁহার অনিবার্য আত্মাহুতিকে অবলম্বন করিয়া এই কাব্য-নাটিকাটি গড়িয়া উঠিয়াছে। নাটিকাটি রূপকধর্মী হওয়ায় রূঢ় বাস্তবতার স্পর্শে ইহার মূল ভাববস্তু কোথাও গ্রাহ্যাত্মক তর্কের সৃষ্টি করে নাই, অথচ ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ভিত্তিতে ইহার সম্পূর্ণ কাহিনীটিই দাঁড়াইয়া আছে। নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টির পিছনেও কবি-নাট্যকারের যথেষ্ঠ মুন্সীয়ানা রহিয়াছে। সন্তোষবাবু অতঃপর নাটক-রচনায় অগ্রসর হইলে তাঁহার খ্যাতির ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

সম্পাদকীয়

ভারতীয় কংগ্রেসের হায়দ্রাবাদ অধিবেশন

গত ১৭ই ও ১৮ই জানুয়ারী হায়দ্রাবাদের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গোলকুণ্ডা দুর্গের সম্মুখস্থ বিশাল প্রান্তরে (নানল নগরে) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অষ্টপঞ্চাশত্তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বৈচিত্র্যের মধ্যে হায়দ্রাবাদের নিজামী পরিবেশ ভিন্ন অন্য কিছু লক্ষ্য করা না গেলেও সমসাময়িককালের গুরুত্বের দিক হইতে এই অধিবেশনের একটা বৈশিষ্ট্য স্বতঃই উপলব্ধি করা যায়। সভাপতি শ্রীজওহরলাল নেহেরু প্রজাতান্ত্রিক নবভারত সংগঠনে বিশ্বাস ও শুদ্ধ অন্তঃকরণ লইয়া আরও সচেতনভাবে এবং সুপরিকল্পিত উপায়ে অগ্রসর হইবার জন্য ভারতের জনগণের উদ্দেশে আহ্বান জানান। ভারতের বিভিন্ন সমস্যা এবং স্বাধীনতা লাভের পর হইতে দেশে যে সকল সাফল্যজনক প্রচেষ্টা হইয়াছে, তাহার পর্যালোচনা করিয়া শ্রীনেহেরু পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রূপায়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেনঃ 'এই পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য এক্ষণে আমাদিগকে সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে এবং এই প্রচেষ্টা সার্থক হইয়া উঠিলে আমরা অধিকতর শক্তিতে বলীয়ান হইয়া অন্যান্য সমস্যার সমাধানের পথে অগ্রসর হইতে পারিব। এ-বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নাই যে, এই পরিকল্পনার রূপায়নে যদি আমরা সফল হই, তাহা হইলে অগ্রগতির পথে আমাদের অভিযান আরও দ্রুত হইয়া উঠিবে।' ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন সম্পর্কে তিনি বলেনঃ 'আমাদের শক্তি ও সম্পদ যেন আমরা অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা ব্যতীত অন্য কোনো কারণে অপচয় না করি। অন্ধ্র-রাজ্য গঠনের পর উহার ফলাফল জানিবার জন্য আমাদের অপেক্ষা করিতে হইবে এবং তাহার পর আমরা অন্যান্য স্থানের অনুরূপ সমস্যা সম্পর্কে বিবেচনা করিব।'

রাজ্য পুনর্গঠনের প্রস্তাব সম্পর্কে বিষয় নির্বাচনী সমিতির অধিবেশনে শ্রীনেহেরু বলেনঃ 'ভারতের প্রদেশসমূহে পুনর্গঠন সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু পুনর্গঠন করিতে হইবে—ভাষাগত, শাসনপরিচালনগত, আর্থিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। ঐ সমস্ত বিবেচ্য বিষয়ের মধ্যে ভাষা একটি বিষয়মাত্র।' ভাষাভিত্তিক প্রদেশ সংক্রান্ত প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর শ্রীনেহেরু বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেনঃ 'এই প্রস্তাব কিছু করার বা না করার প্রস্তাব নহে,

শ্রীজওহরলাল নেহেরু

ইহা নীতিসংক্রান্ত প্রস্তাব এবং ইহার শিরোনামা 'রাজ্য-সমূহের পুনর্গঠন'। আপনারা কোনো নীতি সম্পর্কে কর্মব্যবস্থা অবলম্বনের কালে সাময়িক ভাবপ্রবণতার বশে কোনো রাজ্যসংশ্লিষ্ট জটিল বিষয়সমূহ সম্বন্ধে বিশেষভাবে কোনোরূপ কর্মব্যবস্থা অবলম্বন করেন না। আমাদিগকে এ সম্বন্ধে প্রত্যেকটি বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। প্রস্তাবটির দ্বারা একটি নীতিকে রূপদান করা হইয়াছে এবং এই নীতির পরিপ্রেক্ষিতে আমাদিগকে বিষয়টি শীঘ্রই হউক

বা বিলম্বেই হউক, বিবেচনা করিতে হইবে। অবশ্য বিষয়টি যত সত্বর বিবেচনা করা যায়, ততই ভাল। ঐক্যবন্ধনের সূত্রস্বরূপ সাধারণ ভাষা ও সেই সাধারণ ভাষা হইতে উদ্ভূত সাংস্কৃতিক বিষয়সমূহের উপর কাহারও জোর দেওয়ার প্রয়োজন নাই।'

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্বামী রামানন্দ তীর্থ ভাষণ প্রসংগে বলেনঃ 'বিভিন্ন রাজ্যের কৃত্রিম সীমারেখা একদিন অবশ্যই বিলুপ্ত হইবে এবং কংগ্রেসকে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন সমস্যার পূর্ণ সমাধান করিতে হইবে। যদিও সতর্কতার সংগেই এই নীতি প্রয়োগ করিতে হইবে, তবুও প্রয়োজন অনুযায়ী এই সম্পর্কে এক নির্দিষ্ট কর্মপন্থা অবলম্বন করাও দরকার। বিভিন্ন ভাষাভাষি এলাকা লইয়া হায়দ্রাবাদ রাজ্য গঠিত হওয়ার অদূর ভবিষ্যতে যে সকল ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠিত হইবে, তাহাদের সংগেই হায়দ্রাবাদের ভাগ্য গ্রথিত এবং ইহার জাতীয় গুরুত্বও আছে।... প্রসংগতঃ তিনি বলেনঃ 'ঐক্য ও সংহতি যে কোনো রাজনৈতিক দলেরই মূলমন্ত্র। কিন্তু সেই ঐক্যের আদর্শ বারংবার ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। জাতিভেদ মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে এবং জাতিবর্ণের ভিত্তিতে কংগ্রেসের উচ্চপদ প্রদত্ত হইতেছে। প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনে দুর্নীতি অবলম্বনের নীতি চালু হইয়াছে এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অর্থব্যয়ও করা হইতেছে। ইহার ফলে দীর্ঘকালের নিষ্ঠাবান সরল কংগ্রেসকর্মিগণ নির্বাচনে পরাজিত হইতেছেন। কারণ তাঁহারা দুর্নীতি অবলম্বন করিতে পারেন না অথবা প্রতিষ্ঠানে পদাধিকার লাভ করিবার জন্য অর্থব্যয় করা তাঁহাদের আদর্শে বাধে। ফলে কংগ্রেস বহু সৎ ও প্রকৃত কর্মীকে হারাইয়াছেন এবং হারাইতেছেন। এই অবস্থা যদি চলিতে থাকে, তাহা হইলে আমার আশঙ্কা হয়, কংগ্রেস খুবই দুর্বল হইয়া পড়িবে।'

কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ অবস্থার পর্যালোচনা প্রসংগে স্বামী রামানন্দ তীর্থের এই আশঙ্কা অমূলক তো নয়ই, বরং অধিকতর খাঁটি। আজ যে ভাঙনের মুখে কংগ্রেস আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা নিতান্তই নেতিবাচক নয়। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীজওহরলাল নেহেরু অবধি তৎসম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। তাই তিনিও এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষ জোরের সংগে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেনঃ 'এই দুর্নীতি সম্পর্কে আমাদের অত্যন্ত সতর্ক থাকিতে হইবে, নতুবা ইহা কংগ্রেসকে দুর্বল করিয়া ফেলিবে। দেশের বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমাদিগকে কাজ করিতে হইবে।'

এই কাজ করিয়া যাইবার কথা বহুবারই অবশ্য উত্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু আজ আর বৃথা বক্তৃতা বা ভাষণের অবকাশ নাই। জাগতিক পরিস্থিতি আজ ক্রমেই যেরূপ জটিল হইতে জটিলতর আকার ধারণ করিতেছে, তাহাতে অবিলম্বে কংগ্রেস কর্মীরা আত্মশুদ্ধি দ্বারা পরিশোধিত না হইলে অদূর ভবিষ্যতে যে কংগ্রেসের অস্তিত্ব বজায় রাখাই বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। স্বামী রামানন্দ তীর্থ তাই আলোচ্য অধিবেশনে এই দিকটিকে বড় করিয়া দেখাইয়া দিয়া জাতির কৃতজ্ঞতাভাজনই হইয়াছেন।

অধিবেশনে তিন সহস্রাধিক প্রতিনিধি ও বহু সংখ্যক দর্শকের সমাগম হয়। অধিবেশনের ১৩ ঘণ্টাকাল আলোচনায় মোট ১০টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। যথা—পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও সরকারী পররাষ্ট্র নীতি সমর্থিত হয়, যে-কোনোরূপ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আপোষহীন মনোভাব অবলম্বন করা হইবে বলিয়া পুনরায় ঘোষণা করা হয় এবং ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন সংক্রান্ত দাবীর ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ভূমিহীনদের ভূমিদানের ব্যাপারে আচার্য বিনোবা ভাবের ভূদান যজ্ঞের প্রশংসা করা হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাথমিক অধিকার লাভের জন্য সত্যাগ্রাহিগণ যে অহিংস সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছেন, কংগ্রেস তাহার প্রশংসা করে। এতদ্ব্যতীত, ভারতীয়দের নাগরিক অধিকার সম্পর্কে সিংহল সরকারের অবলম্বিত নীতির সমালোচনা করা হয়। অপর একটি প্রস্তাবে পাকিস্তান-কারাগারে গত ৫ বৎসরকাল বন্দী ভারতীয় মুক্তি-সংগ্রামের অন্যতম নায়ক খাঁ আবদুল গফ্ফর খাঁর প্রতি কংগ্রেস শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। কংগ্রেসের গঠনবিধি সংশোধন সংক্রান্ত প্রস্তাবে সাম্প্রতিক নির্বাচনে যেসব দুর্নীতি ধরা পড়িয়াছে, সে সম্পর্কে তদন্ত করা হইবে বলিয়া আশ্বাস দেওয়া হয়। অন্য একটি প্রস্তাবে ২৯ জন বিশিষ্ট ভারতীয়ের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করা হয়।

উপসংহার ভাষণে শ্রীনেহেরু বলেনঃ 'প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ নির্বাচকমণ্ডলীতে ফিরিয়া যাইতেছেন, আপনারা যে বিরাট দায়িত্বভার গ্রহণ করিলেন, তাহা যেন ভুলিয়া যাইবেন না। কংগ্রেসের এই অধিবেশনের নির্দেশ হইল—'কঠোর শ্রম করুন, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করুন, সাম্প্রদায়িকতা ও সঙ্কীর্ণতা উচ্ছেদ করুন, আপনাদের ভবিষ্যৎ গৌরবময় হইবে।...বিশ্বের ঘটনাচক্র অতি দ্রুত আবর্তিত হইতেছে, উহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলা কঠিন। বর্তমান বৈপ্লবিক বিশ্বে মুহুর্মুহু গুরুত্বপূর্ণ

পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া জটিল সমস্যাসমূহের সৃষ্টি করিতেছে।' মনে হয় উহার সমাধান কঠিন—অসম্ভব, তথাপি আমাদিগকে উহার সমাধানে দৃঢ় সঙ্কল্প ও যত্নপর থাকিতে হইবে।'

এতদ্ব্যতীত পাকিস্থানের সহিত ভারতের সম্পর্ক সম্বন্ধে উভয় দিনের অধিবেশনেই বিশেষ আলোচনা হয়। ভারতের পররাষ্ট্রনীতির আর এক দফা ফিরিস্তির পরিবেশনও সেখানে অচল অবরোধে আবদ্ধ থাকে নাই। কিন্তু এবারের অধিবেশনের সব চাইতে অধিক আলোচ্য বিষয় হইতেছে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। পরিকল্পনা প্রকাশের পর ইহার নানাদিক সম্পর্কিত পর্যালোচনা ইতিমধ্যে শ্রীনেহেরুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে; তিনি তাই এই পরিকল্পনাকে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে গ্রহণ করিয়া জাতিকে কৃতকার্যতার পথে অগ্রসর হইতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য কোনোদিক সম্পর্কেই এবারে নতুন কোনো কথা আলোচ্য অধিবেশনে শোনা যায় নাই। নানল নগরে সমাগত ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যেও বড় একটা প্রাণস্ফূর্তি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে নাই। ইহা কি বিরাট একটা নবজাগৃতীর পূর্বে কিছু একটা প্রস্তুতিসূচক অনুভূতিপ্রবণতার প্রকাশ, না ব্যর্থতার একটা সকরুণ নৈঃশব্দের অভিব্যক্তি? ইহার প্রকৃত জবাব কে দিবে?

কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির নবতম সদস্য

কংগ্রেস সভাপতি শ্রীজওহরলাল নেহেরু সম্প্রতি নয়াদিল্লী হইতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মোট ২১ জন সদস্যের মধ্যে ১৯ জন সদস্য নির্বাচন করিয়া তাঁহাদের নাম প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ৭ জন নূতন সদস্য রহিয়াছেন। উক্ত ১৯ জন সদস্য হইলেন—

(১) শ্রীজওহরলাল নেহেরু, (২) মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, (৩) শ্রী সি রাজাগোপালাচারী, (৪) পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ, (৫) ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, (৬) জগজীবন রাম, (৭) শ্রীরফি আমেদ কিদোয়াই, (৮) শ্রীনবকৃষ্ণ চৌধুরী, (৯) শ্রীখান্দুভাই দেশাই, (১০) শ্রীমাণিকলাল বর্মা, (১১) শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি, (১২) শ্রীমতী এ কুট্টিমলু আম্মা, (১৩) শ্রী কে পি জি মাধবন নায়ার, (১৪) শ্রীদেবকীনন্দন নারায়ণ, (১৫) জ্ঞানী গুরুমুখ সিং মুসাফির, (১৬) শ্রীমোরারজী দেশাই, (১৭) শ্রী ইউ এস্ মালিয়া, (১৮) শ্রীবলবন্তরায় মেটা, এবং (১৯) শ্রীশ্রীমন-নারায়ণ আগরওয়াল।

পরবর্তী দুইজনের নাম পরে ঘোষণা করা হইবে বলিয়া জানানো হইয়াছে।

ভারতে শিক্ষার মাধ্যমরূপে ইংরেজি ভাষার ভবিষ্যৎ

ভারতের ভবিষ্যৎ নীতিতে ইংরেজি শিক্ষার অবস্থা কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে এবং নূতন শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরেজিভাষার স্থান কিরূপ হইবে—এতৎসম্পর্কিত আলোচনার জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্প্রতি দিল্লীতে একটি ইংরেজি-অধ্যাপক সম্মেলন আহূত হয়। ২৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে অধ্যাপক প্রতিনিধিগণ ইহাতে সাগ্রহে যোগদান করেন। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন শিক্ষা দপ্তরের অতিরিক্ত সেক্রেটারী অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর। ভাষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেনঃ 'অনেকে মনে করেন হিন্দী ও ইংরেজি ভাষার মধ্যে যে কোনো একটিকে রাখিতে হইবে এবং একটির উন্নয়নের অর্থই হইবে অপরটির অবনতি। কিন্তু আমি এই দুইটি ভাষার মধ্যে এই বিরোধ আছে বলিয়া মনে করি না। পূর্বে ইংরেজিভাষা মাতৃভাষাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। শুধু ইংরেজি ভাষা শিখিতেই অত্যধিক সময় লাগিত বলিয়া বুদ্ধিবৃত্তির পূর্ণ বিকাশের পথে তাহা অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বস্তুতঃ ইহাকে জ্ঞান আহরণের উপায় মনে না করিয়া ইংরেজিভাষা শিক্ষাকেই একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া মনে করা হইত। আমি আশা করি, সর্বকালেই একদল পণ্ডিত থাকিবেন—যাঁহারা ইংরেজিভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিবেন। কিন্তু দেশের বর্তমান পরিবর্তিত অবস্থায় ইংরেজিভাষা আর পূর্বের মতো গৌরবের আসন দখল করিয়া থাকিতে পাবে না। ইংরেজিভাষা পাশ্চাত্য বিষয়ে জ্ঞান আহরণ ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ রক্ষার মূল্যবান যোগসূত্র হইয়া থাকিবেই। এখন প্রধান সমস্যা হইল, পরিবর্তিত অবস্থানুযায়ী পাঠক্রম নির্ধারণ করা। বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি শিক্ষার উদ্দেশ্যের সংজ্ঞা নূতনভাবে নির্ণয় করিতে হইবে এবং অল্প প্রচেষ্টায় কি করিয়া সুফল পাওয়া যাইতে পারে, তাহা উদ্ভাবন করিতে হইবে। যুদ্ধের সময় বিদেশীভাষা শিক্ষার যে নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছিল, ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে তাহা গ্রহণ করা যায় কিনা, তাহা সকলকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে।'

ডাঃ সি ভি রমণ মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের নিকট ভবিষ্যৎ শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে স্বীয় অভিমত জ্ঞাপন করিতে গিয়া বলেন—ভাবাবেগে পরিচালিত হইয়া ইংরেজি ভাষার ন্যায় একটি আন্তর্জাতিক ভাষার প্রতি যদি উপেক্ষার ভাব

পোষণ করা হয়, তবে—তাহা দেশের পক্ষে এক গুরুতর বিপর্যয়ের কারণ হইবে।

পর্যায়ক্রমিক বক্তৃতার পর সম্মেলন সিদ্ধান্ত করেন যে, মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে উচ্চ বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রদিগকে ৬ বৎসর অবশ্যই ইংরেজি শিক্ষা দিতে হইবে। পাঠ ও পরীক্ষা-গ্রহণের উৎকর্ষসাধনের দ্বারা ইংরেজি শিক্ষার উন্নতির জন্য সম্মেলন পরামর্শ দেন। তবে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি শিক্ষা সম্পর্কে সম্মেলন কোনো নির্দিষ্ট অভিমত প্রকাশ করা হইতে ক্ষান্ত থাকেন। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন্ ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হইবে—তাহা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সমবেত সিদ্ধান্তের উপরই নির্ভর করিবে। সম্মেলন এ সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন অভিমত ব্যক্ত না করিলেও আলোচনার সূত্র হইতে একথা স্পষ্টই উপলব্ধি হইয়াছে যে, কলেজের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যমরূপে ইংরেজিই সমর্থন লাভ করিয়াছে। এ ব্যাপারে ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় একই পদ্ধতির অনুসরণ না করিলে শিক্ষার ক্ষেত্রে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বেই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ও পূর্বতন ভাইস-চ্যান্সেলারগণ কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রণালয়কে পত্রদ্বারা জানাইয়াছিলেন। সেই পত্রে তাঁহারা এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যমরূপে ইংরেজি যদি কখনও পরিত্যক্ত হয়, তখনও উচ্চ শিক্ষার জন্য যথেষ্ট ইংরেজি-শিক্ষার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। অতএব সর্বকেন্দ্রিক আলোচনা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আরও অন্ততঃ দীর্ঘকালের জন্য ভারতীয় শিক্ষার বাহনরূপে ইংরেজি-ভাষার স্থায়িত্ব অবশ্যম্ভাবী। ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডাঃ রাধাকৃষ্ণণও এই অভিমতই ব্যক্ত করেন।

সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ইংরেজি-ভাষা যদি যথার্থই স্থিরীকৃত হয়, তবে মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রকেও এমন ভাবে গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজন হইবে যাহাতে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে কলেজে উঠিয়া শিক্ষালাভের ব্যাপারে অগাধ জলে পড়িতে না হয়। সম্মেলনের আলোচনায় অধ্যাপক শ্রীনির্মল সিদ্ধান্ত এ-সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলেন যে, মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে ছাত্রগণকে দুইভাগে ভাগ করিয়া লওয়া হইবে—(১) যাহারা মাধ্যমিক শিক্ষার সমাপ্তির সহিত শিক্ষাজীবন শেষ করিতে চাহে, এবং (২) যাহারা তাহার পর কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে চাহে। —যদি এইরূপ ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হয়, তবে প্রথম-শ্রেণীর ছাত্রদিগকে ততবেশী ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ না করিলেও চলিবে—ততবেশী গ্রহণ করিতে হইবে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদিগকে। উচ্চতর ইংরেজি শিক্ষার ক্ষেত্রে এইরূপ ব্যবস্থাও অচল হইবার কথা নয়। রাশিয়ার ন্যায় গণতান্ত্রিক দেশেও অনুরূপ ব্যবস্থাকে কার্যকরী করা হইয়াছে।

সম্প্রতি ভারতের প্রায় সর্বত্রই মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারের উদ্যোগ চলিতেছে এবং সেই উদ্যোগ এক লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন। শিক্ষাবিদবৃন্দের অনুরূপ সিদ্ধান্ত তাঁহাদের কাজের সহায়ক হইবে বলিয়াই আশা করা যায়। এ ক্ষেত্রে একটি মাত্র উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, ব্যবস্থা ভিৎ যাহাতে কাঁচা না হয়, এবং কোনো অবস্থাতেই ছাত্রগণ যাহাতে বিড়ম্বিত না হয়, সেই দিকে দৃষ্টি রাখাই হইবে কমিশনের কার্যক্রমের অন্যতম কর্তব্য।

স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার নূতন পাঠ্যক্রম

গত ১৭ই জানুয়ারী পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের সাধারণ সভায় স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার পাঠ্য বিষয়সমূহের নবতম পাঠক্রম গৃহীত হয়। সভায় গৃহীত পাঠ্য বিষয়সমূহ অনুযায়ী ১৯৫৬ সালে যাহাতে প্রথম পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইতে পারে, তজ্জন্য পরিষদ সিলেবাস কমিটিকে পাঠ্য বিষয়সমূহের তালিকা প্রস্তুত করিতে নির্দেশ দেন। সভায় ইহাও স্থির হয় যে, চারি বৎসর পরে সংস্কৃত প্রশ্নপত্রের উত্তর দেবনাগরী হরফে দিতে হইবে। পরীক্ষা গ্রহণের বিষয়গুলি, যথাঃ (ক) আবশ্যিক বিষয়সমূহ (১) নিম্নলিখিত প্রধান ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে একটি—বাংলা, উর্দু, হিন্দী, নেপালী—একটি তিনঘণ্টার প্রশ্নপত্র ১০০ নম্বর এবং একটি দুই ঘণ্টার প্রশ্নপত্র ৫০ নম্বর, অথবা (ক) বিকল্প বাংলা একটি দুই ঘণ্টার প্রশ্নপত্র ৫০ নম্বর এবং (খ) নিম্নলিখিত ভাষাগুলির মধ্যে একটি (একটি তিন ঘণ্টার প্রশ্নপত্র ১০০ নম্বর)—অসমীয়া, উড়িয়া, তেলেগু, তামিল, মালয়ালম, মারাঠী, গুজরাটি, গুরমুখী, আধুনিক তিব্বতী, সাঁওতালী, বিকল্প হিন্দী, বিকল্প উর্দু, বিকল্প নেপালী, বিকল্প ইংরাজী। (২) ইংরাজি—একটি তিন ঘণ্টার প্রশ্নপত্র ১০০ নম্বর; এবং একটি দুই ঘণ্টার প্রশ্নপত্র ৫০ নম্বর; (৩) গণিত—তিন ঘণ্টার প্রশ্নপত্র ১০০ নম্বর; (৪) ভারতের ইতিহাস ও ভারতের শাসনব্যবস্থা—তিন ঘণ্টার প্রশ্নপত্র; ১০০ নম্বর; (৫) ভূগোল—দুই ঘণ্টার প্রশ্নপত্র ৫০ নম্বর; (৬) সাধারণ বিজ্ঞান—দুই ঘণ্টার প্রশ্নপত্র ৫০

নম্বর; (৭) একটি প্রাচীন ভাষা (তিন ঘণ্টার প্রশ্নপত্র ১০০ নম্বর)—সংস্কৃত, আরবি, পালী, প্রাশী, গ্রীক, ল্যাটিন, প্রাচীন তিব্বতী, প্রাচীন আর্মেনীয়, হিব্রু। যে সকল ছাত্রী বিশেষ কোর্স অথবা যে সকল ছাত্রছাত্রী কারিগরী, কৃষি অথবা বাণিজ্য সম্বন্ধীয় বিষয় গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদিগকে প্রাচীন ভাষা আবশ্যিক পাঠ্য হিসাবে পড়িতে হইবে না। এতদ্ব্যতীত যাঁহারা উর্দু অথবা হিন্দী অথবা নেপালী লইয়াছেন, তাঁহারা হয় প্রাচীন ভাষা অথবা বাংলা লইতে পারেন।

(খ) **নির্বাচনমূলক বিষয়সমূহ।** পরীক্ষার্থীদিগকে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের অন্ততঃ একটি কিন্তু অনূর্ধ্ব দুইটি নির্বাচনমূলক বিষয়সমূহ গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাদের মধ্যে একটিকে অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। প্রত্যেকটি বিষয়ে তিনঘণ্টার প্রশ্নপত্র হইবে এবং ১০০ নম্বর থাকিবেঃ (১) একটি আধুনিক বিদেশী ভাষা (ফরাসী অথবা জার্মান অথবা ইতালীয় অথবা পর্তুগীজ অথবা চৈনিক অথবা স্প্যানিস অথবা জাপানি অথবা রুশীয় অথবা কার্যনির্বাহক পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত অপর কোনো ভাষা, (২) মাতৃভাষা ব্যতীত যে কোনো আধুনিক ভারতীয় ভাষা, (৩) বিশেষ ইংরাজি (আবশ্যিক বিষয় হিসাবে গ্রহণ করা না হইলে), (৪) বিশেষ বাংলা (আবশ্যিক বিষয় হিসাবে গ্রহণ করা না হইলে), (৫) বিশেষ হিন্দী (আবশ্যিক হিসাবে গ্রহণ করা না হইলে) (৬) বিশেষ প্রাচীন ভাষা, (৭) অতিরিক্ত গণিত, (৮) মেকানিক্স্, (৯) শারীরতত্ত্ব ও স্বাস্থ্য, (১০) জীবতত্ত্ব, (১১) পদার্থ ও রসায়ণ বিজ্ঞান, (১২) অতিরিক্ত ভূগোল এবং ভূতত্ত্ব, (১৩) মোটামুটি ইংরাজি ইতিহাসসহ বিশ্বের ইতিহাসের প্রাথমিক জ্ঞান, (১৪) প্রাথমিক অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান, (১৫) সেলাই ও সূচীবিদ্যা, (১৬) সঙ্গীত, (১৭) চিত্রাঙ্কন ও রেখাঙ্কন, (১৮) ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং এবং (১৯) চলতি ঘটনাবলী।

(গ) যে সকল পরীক্ষার্থী কারিগরী, কৃষি অথবা বাণিজ্য বিষয়ক কোর্স এবং যে সকল ছাত্রী বিশেষ কোর্স গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদিগকে পূর্বোক্ত ১নং হইতে ৬নং পর্যন্ত আবশ্যিক বিষয় ব্যতীত ও নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের যে কোনো একটি শ্রেণী হইতে অন্ততঃপক্ষে দুইটি কিন্তু অনূর্ধ্ব তিনটি বিষয় নির্বাচন করিতে হইবে। ইহাদের মধ্যে একটি অতিরিক্ত বিষয় বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে —(ক) **কারিগরী কোর্স**—৩ ঘণ্টার প্রশ্নপত্র (১০০ নম্বর); (১) ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং আবশ্যিক। (২) সাধারণ ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান; (৩) কাঠের কাজ; (৪) গৃহনির্মাণের উপকরণ ও গৃহনির্মাণ; (৫) মেকানিক্স্; (৬) পদার্থ ও রসায়ণ বিজ্ঞান। (খ) **কৃষি-বিষয়ক কোর্স**—৩ ঘণ্টার প্রশ্নপত্র (১০০ নম্বর); (১) কৃষি ও সব্জীবাগ সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান (আবশ্যিক); (২) মাছের চাষ; (৩) পশুপালন (হাঁস-মুরগী পালনসহ); (৪) গ্রাম্য অর্থনীতি সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান (প্রধান প্রধান ফসল সম্পর্কে পাঠসহ)। (৫) জীববিজ্ঞান। (গ) **বাণিজ্যিক কোর্স**—৩ ঘণ্টার প্রশ্নপত্র (১০০ নম্বর); (১) হিসাব রক্ষা (আবশ্যিক); (২) বাণিজ্যের পদ্ধতি ও পত্রলিখন; (৩) সর্টহ্যান্ড টাইপরাইটিং; (৪) বাণিজ্য ভূগোল; (৫) অতিরিক্ত গণিত। (ঘ) **ছাত্রীদের জন্য বিশেষ কোর্স**—৩ ঘণ্টার প্রশ্নপত্র (১০০ নম্বর)ঃ (১) গৃহ শুশ্রূষাসহ গার্হস্থ্য বিজ্ঞান; (২) জীববিজ্ঞান, (৩) সেলাই ও সূচীশিল্প; (৪) চিত্রাঙ্কন ও রেখাঙ্কন; (৫) সঙ্গীত; (৬) শারীরতত্ত্ব ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান।

সকল শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর ক্ষেত্রে আবশ্যিক বিষয়সমূহের জন্য ৬০০ নম্বর এবং নির্বাচনমূলক ২টি বিষয়ের জন্য ২০০ নম্বর; মোট ৮০০ নম্বর থাকিবে। এতদ্ব্যতীত যাহারা অতিরিক্ত বিষয় লইবে, তাহাদের ক্ষেত্রে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় আরও ১০০ নম্বরসহ মোট ৯০০ নম্বর থাকিবে।

প্রাচীন ভাষাকে আবশ্যিক পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করার প্রশ্ন সম্পর্কে সদস্যদের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ মহিলা সদস্য সংস্কৃতকে আংশিক পাঠ হিসাবে প্রবর্তনের বিরোধিতা করেন। এই সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরে সভাপতি শ্রী এ কে চন্দ জানান যে, বিভিন্ন মহিলা শিক্ষা সমিতি প্রাচীন ভাষাকে আবশ্যিক পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করার অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়াছেন। অধিকাংশের ভোটে প্রাচীন ভাষা (সংস্কৃত, পালী আরবী, পার্শী, গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু, তিব্বতী এবং আর্মেণীয় ভাষা) আবশ্যিক ভাষারূপে গৃহীত হয়। সাধারণ বিজ্ঞানে তিন ঘণ্টার পূর্ণ প্রশ্নপত্র প্রবর্তনের প্রশ্ন সম্পর্কেও সদস্যদের মধ্যে মতভেদ হয়। অধিকাংশের ভোটে ঐ বিষয়ে অর্ধ প্রশ্নপত্র ধার্য করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরিষদের কার্যনির্বাহক পরিষদও অনুরূপ সুপারিশ করেন।

কলিকাতা বেলভেডিয়ার প্রাসাদে জাতীয় গ্রন্থাগারের উদ্বোধন

বিগত ১লা ফেব্রুয়ারী জাতীয় গ্রন্থাগারের সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে ভারতের শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বেলভেডিয়ার প্রাসাদে স্থাপিত জাতীয় গ্রন্থাগারের সুদৃশ্য ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি। দীর্ঘ যুগের পরে বৃটিশ আমলের শক্তিদম্ভের এই প্রাচীন দুর্গটি বিদ্যামন্দিরে রূপান্তরিত হইয়া জ্ঞানপিপাসুগণের তীর্থে পরিণত হইবার সুযোগ লাভ করিল। জাতীয় কৃষ্টির পক্ষে ইহা গৌরবের বিষয়। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁহার ভাষণ প্রসঙ্গে বলেনঃ 'যে সময়ে লর্ড কার্জন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর উদ্বোধন করেন, প্রায় সেই সময়ে তিনি কলিকাতার অন্ধকূপে তথাকথিত মৃত ব্যক্তিদের স্মৃতিরক্ষার্থ নির্মিত একটি স্মৃতি-স্তম্ভের আবরণ-উন্মোচন করেন। ইতিহাস ব্যক্তিবিশেষকে খাতির করে না। সেইজন্যই তিনি যে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর উদ্বোধন করিয়াছেন, তাহা আজও বর্তমান আছে এবং উন্নতি লাভ করিয়া জাতীয় গ্রন্থাগারে পরিণত হইয়াছে; আর এক কল্পিত কাহিনী অমর করিয়া রাখিবার জন্য তিনি যে স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন, কালক্রমে তাহা বিলীন হইয়া গিয়াছে।' মৌলানা আজাদ বলেনঃ লাইব্রেরীর উন্নতির জন্য ভারত সরকার চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না। ইতিমধ্যেই এই লাইব্রেরীর জন্য অর্থসাহায্য বাড়ানো হইয়াছে। এই গ্রন্থাগারের জন্য চীন দেশের উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্যাদির একটি মূল্যবান সংগ্রহ এবং বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় সাহিত্য পুস্তিকাদির সংগ্রহ ক্রয় করিবার ব্যবস্থা ভারত সরকার ইতিমধ্যেই করিয়াছেন। এই গ্রন্থাগারে যাঁহারা অমূল্য পুস্তক সংগ্রহ দান করিয়াছেন, এই উপলক্ষে আমি তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই আমার মনে আসে বুহারের মুন্সী সদরুদ্দিনের নাম। তিনি মীরজাফরের মীর মুন্সী ছিলেন; শাহ আলমের অধীনেও তিনি একটি দায়িত্ব-পূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার রাজনৈতিক পদের জন্য নহে, তাঁহার বিদ্যানুরাগের জন্যই তাঁহার স্মৃতি প্রিয় হইয়া থাকিবে। তিনি বর্ধমানে বুহার লাইব্রেরীর পত্তন করেন এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মূল্যবান পুঁথি সংগ্রহ করেন। তাঁহার সংগ্রহ এখন এই গ্রন্থাগারে অন্যতম মূল্যবান সম্পদ। ইহার মধ্যে আলবেরুণীর আল্‌কানুন গ্রন্থের দ্বাদশ শতাব্দীর পাণ্ডুলিপি আছে। ইহাতে ফজিল খানের মোহর আছে। ফজিল খাঁন ছিলেন শাহজাহানের বিখ্যাত আমীর। পরে তিনি আওরংজেবের উজিরে আজম হন। ফজিল খাঁন শুধু যে প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিদ ছিলেন, তাহা নহে, তিনি বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারও ছিলেন। সম্প্রতি যাঁহারা এই গ্রন্থাগারের অমূল্য পুস্তক-সংগ্রহ প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে পরলোকগত আশুতোষ মুখার্জির পুত্রদের নাম সর্বাগ্রে করা উচিত। মানুষের জ্ঞানরাজ্যের সকল শাখার প্রায় ৭৫ হাজার পুস্তকের সমগ্র সংগ্রহটি তাঁহারা এই গ্রন্থাগারে দান করিয়াছেন। অন্যান্য ধনী বিদ্যানুরাগীরাও এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবেন বলিয়া আমি আশা করি। বৃটিশ মিউজিয়াম পরিদর্শনকালে আমি উহার রিডিং রুমটি দেখিয়া বিশেষ প্রীত হই। একটি বিরাট পাঠকক্ষে অসংখ্য নরনারী জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করিতেছে। শান্ত গম্ভীর পরিবেশটি বিশিষ্ট বিদ্যা-মন্দিরের দ্যোতকই বটে। কেহ কথা বলিতে চাহিলে অতি নিম্নস্বরে কথা বলে—যাহাতে অন্যান্য পাঠকদের কোনও প্রকার বিঘ্ন না হয়। আমাদের গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষসমূহেও অনুরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে। শক্তিদম্ভের প্রাচীন দুর্গটির বিদ্যামন্দিরে রূপান্তরণ—কলিকাতার প্রাচীন অধিবাসীরা নিশ্চয়ই স্বাগত করিবেন। পূর্বে এই প্রাসাদটি ছিল রাজপুরুষ ও সরকারী মহাপাত্রদের সংরক্ষিত ভবন; আজ যে কোনও জ্ঞানপিপাসু এখানে প্রবেশ করিতে পারে। পূর্বে লোকসাধারণের ইচ্ছা ও প্রয়োজনের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া এখান হইতে সরকারী সিদ্ধান্ত তাহাদের উপর চাপান হইত; আর আজ ইহা একটি জ্ঞানভাণ্ডার—জাতি তাহার ইচ্ছা ও প্রয়োজন অনুসারে যাহা ইচ্ছা এখান হইতে সংগ্রহ করিতে পারে। যে বিরাট ভবন ও উদ্যানটিতে পূর্বে কেবলমাত্র শাসকদের একচ্ছত্র অধিকার ছিল, আজ সেখানে দীনতম দীন জ্ঞানান্বেষণের জন্য প্রবেশ করিতে পারে।

রাজ্যপাল ডাঃ মুখার্জি জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা ও ক্রমোন্নতির ইতিহাস বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেন যে, এই গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠার পর হইতে বিভিন্ন সময় বিদ্যানুরাগী ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণের সহযোগিতা ও দানে এবং সরকারী সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় বর্তমান গৌরবে উন্নীত হইয়াছে এবং জাতীয় সম্পদে পরিণত হইয়াছে। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উত্তরাধিকারিগণ আশুতোষ লাইব্রেরীর সমস্ত পুস্তক জাতীয় গ্রন্থাগারে দান করিয়াছেন। স্যার আশুতোষ, রামদাস সেন ও বুহারের উত্তরাধিকারিগণ

জাতীয় গ্রন্থাগারে গ্রন্থরাজি দান করিয়া যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন, দেশবাসী উহা অনুসরণ করিয়া এই গ্রন্থাগার সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবেন বলিয়াই তিনি আশা করেন।

এই উৎসব উপলক্ষে গ্রন্থাগারের কয়েকজন পুরাতন কর্মীকে কর্মানুরাগ ও নিষ্ঠার জন্য জাতীয় গ্রন্থাগারের পক্ষ হইতে উপহার দেওয়া হয়। এই উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের চিত্রাবলীর একটি চিত্তাকর্ষক প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়।

জন-নিরাপত্তার দায়

সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি দুঃসাহসিক ঘটনার প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া থাকিবে। গত ৮ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি প্রায় ৯ ঘটিকার সময় বিবেকানন্দ রোড্ ও কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলের নিকটে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ একটি অলঙ্কারের দোকানে এক দুঃসাহসিক ও চাঞ্চল্যকর সশস্ত্র ডাকাতিতে প্রায় এক লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণালঙ্কার লুণ্ঠিত হয়। ষ্টেনগান ও রিভলবার সজ্জিত দস্যুদল ঘটনাস্থলে গুলীবর্ষণ করে এবং উহার ফলে চারি ব্যক্তি আহত হয়। আহতদের মধ্যে দুইজন দোকানের মালিক এবং দুইজন পথচারী বলিয়া জানা যায়।

এইরূপ ঘটনা ইহাই নতুন নয়। ইতিপূর্বে বৌবাজার প্রভৃতি অঞ্চলেও প্রায় অনুরূপ একাধিক ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। প্রতিক্ষেত্রেই পুলিশের উপস্থিতিতে দুঃসাহসিকতা আংশিক অবদমিত হইয়াছে; কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই ইহার মূলোৎপাটিত হয় নাই। কিন্তু কেন হয় নাই এবং কেনই বা এইরূপ চাঞ্চল্যকর দুঃসাহসিকতার প্রয়াস, ইহাই প্রশ্ন।

ধরিয়া লওয়া যায়, ইহার পিছনে একদল মানুষের দারিদ্র্যের তাড়না আছে এবং সেই তাড়নাই তাহাদিগকে এইরূপ ডাকাতিবৃত্তিতে উদ্বুদ্ধ করে; কারণ অন্য কোনো সহজতর পথের আশ্রয় লইয়া তাহাদের দারিদ্র্য নিবারিত হয় না। কিন্তু তাহাই কি? যে উত্তেজনার বশে তাহারা ডাকাতি করিতে প্রবৃত্ত, সেই উত্তেজনার বশে তাহারা দেশের বৃহত্তর মহত্তর কার্যও সাধন করিতে পারে—যদি সুনিয়ন্ত্রণের পথে দারিদ্র্যের গ্লানি কখনও তাহাদিগকে কালিমালিপ্ত না করে। কিন্তু কে নিয়ন্ত্রণ করিবে তাহাদিগকে? গভর্ণমেন্ট? গভর্ণমেন্ট অবশ্যই সে সম্পর্কে উদাসীন কিম্বা অযোগ্য। উদাসীনতার কারণ প্রত্যক্ষ, আর অযোগ্যতার কারণ পরোক্ষ। যদি ইহাই শেষ সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে, তবে বলিতে হয়—অনুরূপ দুঃসাহসিক ডাকাতির প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত গভর্ণমেন্ট। কারণ গভর্ণমেন্ট দেশের দারিদ্র্য মোচন করিয়া অপামর জনগণকে উপযুক্ত গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহের সুশৃঙ্খল পথ প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন নাই। অতএব ডাকাতি করিলে তাহার প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র ছিল সরকারী টাঁকশাল,—অলঙ্কার বা এইজাতীয় অন্য কোনো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান নয়। দোকানদারকে যদি ক্যাপিটালিষ্ট মনে করিয়া তাহার ঘরে হানা দিয়া জিনিষপত্র লুঠ এবং প্রাণনাশ করাই লক্ষ্য হইয়া থাকে, তবে বলিব—উহা ভুল লক্ষ্য। কারণ যে ব্যক্তি এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিয়া থাকেন, তিনি অর্থবান হইতে পারেন, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁহাদের কেহ কুবের নন। তিনিও দেশের সুখ দুঃখ বিজড়িত মানুষ, ব্যবসা হইলেও দেশের শিল্প প্রসারের বৃদ্ধি করাই তাঁহার লক্ষ্য। অতএব এই জাতীয় কোনো প্রতিষ্ঠানের ঘরে ডাকাতি করার অর্থ হইল প্রতিষ্ঠানের মালিক ও কর্মচারীর জীবন এবং ব্যবসায়কে বিপর্যস্ত করিয়া তোলা। অথচ অনুরূপ কোনো প্রতিষ্ঠান-মালিকের হাতে দেশের দারিদ্র্য মোচনের উপযুক্ত হাতিয়ার নাই। আছে গভর্ণমেন্টের হাতে।

অতএব বিষয়টি শেষ পর্যন্ত গভর্ণমেন্টের স্কন্ধে গিয়াই চাপিয়া বসে। কোনো সুনিয়ন্ত্রিত গভর্ণমেন্টই অনুরূপ কোনো কার্যকে প্রশ্রয় দিতে পারে না। শুধু পারাই নয়, অনুরূপ কোনো উত্তেজনা যাহাতে কখনও কোনো শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই দেখা না দেয়—তাহাও গভর্ণমেন্টেরই লক্ষ্যবস্তু। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশ গণতান্ত্রিক গভর্ণমেন্ট-শাসিত হইয়াও অদ্যাবধি দেশের এই জাতীয় অকল্যাণের পথগুলি বন্ধ হইল না। কুপ্রবৃত্তিগুলি নষ্ট হইয়া মানুষের জীবনে যাহাতে কল্যাণ ও সেবাব্রত জাগ্রত হইতে পারে, তজ্জন্য সমাজের অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করার দায়িত্ব একমাত্র গভর্ণমেন্টেরই। অবশ্য একথাও স্বীকৃত যে, সমাজে যদি ব্যক্তি কখনও সুশৃঙ্খল না হয়, তবে গভর্ণমেন্ট শুধু আইন ও শাসনের দ্বারা কোনো মহৎকার্যই সাধন করিতে পারেন না। কিন্তু সামাজিক উন্নতির মানদণ্ড সর্বদা গভর্ণমেন্টই স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া থাকেন, আমাদের দেশের ক্ষেত্রে তাহা বরং আরও এক ডিগ্রী বেশী।

অতএব দোষ কাহার? যাহারা ডাকাতি বা ঐ জাতীয় কোনো অপরাধমূলক কার্য করিল, তাহাদের—না, তাহাদের চিত্তে ডাকাতি প্রবৃত্তি জাগ্রত হইবার মতো অনুকূল

পরিবেশের পরিবর্তন করিতে যাঁহারা পারিলেন না, তাঁহাদের?

আসলে আমাদের বর্তমান সমাজ তথা রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় অনুরূপ দুর্ঘটনাগুলি ঘটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। সমাজ তথা রাষ্ট্র-ব্যবস্থার একটা আমূল পরিবর্তন ভিন্ন বর্তমান প্রতিবেশে ইহা চলিতে থাকিবেই, আর অনুরূপ কোনো চাঞ্চল্যকর ঘটনার বহিঃপ্রকাশে বিস্ময়েরও বিশেষ কোনো কারণ থাকিবে না। যতদিন সমাজ তথা রাষ্ট্রের অনুরূপ পরিবর্তন এদেশে সম্ভব না হইতেছে, ততদিন আমাদের প্রচলিত গভর্ণমেণ্টের কর্তব্য হইবে জননিরাপত্তাকে সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করিয়া চলা। যদি তাহা গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভব না হয়, তবে বুঝিতে হইবে গভর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণভাবেই তাঁহাদের কর্তব্যকার্যে অনুপযুক্ত। আমরা আশা করিব, ভবিষ্যতে যাহাতে এইরূপ দুর্ঘটনাগুলি আর না ঘটিতে পারে—তজ্জন্য গভর্ণমেণ্ট যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা বিল

ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়ায় পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের অধিবেশন সুরু হইলে সরকার পক্ষ হইতে যথারীতি নিরাপত্তা বিল উত্থাপিত হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ উক্ত বিলের ধারাগুলি গণ-স্বাধীনতার বিরোধী বলিয়া যে আন্দোলন সুরু করেন, তাহারই স্পষ্ট অভিব্যক্তি গত ৯ই ফেব্রুয়ারী হইতে বিশেষভাবে মূর্ত হইয়া ওঠে। বামপন্থীদের সমবায়ে গঠিত নিরাপত্তা বিল প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে ছাত্র, কর্মী ও জনসাধারণ সহস্র প্রহরী-বেষ্টিত বিধান সভা ভবনের সম্মুখে পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা (সংশোধন) বিলের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বিক্ষোভকারিগণ নিজ নিজ দলের পতাকাসহ ময়দান হইতে শোভাযাত্রা করিয়া বিবিধ ধ্বনি করিতে করিতে বিভিন্ন পথ পরিভ্রমণের পর বিধান সভা ভবনের সম্মুখে উপনীত হন এবং তিনভাগে বিভক্ত হইয়া বিধান সভা ভবনের প্রাঙ্গণের উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রবেশদ্বারের সম্মুখে সমবেত হইয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে থাকেন। ক্রমাগত চারি দিবস একইভাবে এই বিক্ষোভ চলিতে থাকে। ফলে ক্রমাগতই বিল গৃহীত হওয়ায় বাধা উপস্থিত হয়। সভাকক্ষের অভ্যন্তরে সরকারবিরুদ্ধ পক্ষ বিলের ধারাগত আলোচনার প্রতি পদক্ষেপে বাধা দান করিতে থাকেন। তাঁহারা বিভিন্ন ধারা ও সংশোধন প্রস্তাবগুলির উপর সাত-সাতবার ভোট গণনার দাবী উপস্থিত করেন এবং বিলে নিরাপত্তা আইনের মেয়াদ আরও তিন বৎসর বৃদ্ধি করিবার সরকারী প্রস্তাবের সংশোধনে বিরোধীপক্ষ সরকার কর্তৃক জনমতের সম্মান দিয়া ঐ মেয়াদ হ্রাস করিবার প্রস্তাব করেন। অন্তরীণ ও বহিষ্কারের আদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে উপদেষ্টা বোর্ডের নিকট তাহার বিষয় পুনর্বিবেচনা করিবার জন্য আবেদন দাখিলের সময় হ্রাস করিবার জন্য বিলে যে বিধান করা হইয়াছে, তাহা কিছুটা বৃদ্ধি করিবার জন্যও বিরোধী পক্ষ পুনঃ পুনঃ আবেদন জানান। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের অনমনীয় মনোভাবে সরকারপক্ষীয় কংগ্রেসী দলের বিরোধিতায় উহার সবই অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

উভয় দলের তর্কে বিধান সভার আবহাওয়া যেরূপ উত্যক্তকর হইয়া ওঠে, তাহা যে সভ্যরুচিবহির্ভূত তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রতিবারের অধিবেশনেই অনুরূপ রুচির পরিচয় স্পষ্ট হইয়া উঠিতে দেখা যায়। যুক্তি ও তথ্যের তুলনায় উষ্মা প্রবল হইয়া দাঁড়াইলে এইরূপ হইতে বাধ্য। তখন আর নিয়মানুবর্তিতা বা শৃঙ্খলা বলিয়া কিছু থাকে না; নগ্ন শিশুর উন্মত্ত নৃত্যের ন্যায় উভয় দলের তর্ক-নৃত্যে সমগ্র সভাকক্ষ কাঁপিয়া ওঠে। সেই কাঁপুনি এবারও স্পষ্টই দেখা গেল। কিন্তু জনগণের চিত্ত হইতে সংশয় ও অবিশ্বাস নিরসনের কোনো পরিচয়ই সরকার পক্ষ হইতে পাওয়া গেল না। বিনা বিচারে রাষ্ট্রের কোনো নাগরিককে আটক করিয়া রাখিবার বিশেষ ক্ষমতা সরকারকে প্রদান করিবার জন্য পরিকল্পিত যে কোনো আইন অথবা ব্যবস্থা তীব্র আলোচনার বিষয় হইবে, ইহা স্বাভাবিক; কিন্তু ইহাও যে যুক্তি এবং তথ্যের উপরেই ভিত্তিশীল, এ কথা ভুলিলে চলিবে না। নিবারক নিরোধের আবশ্যকতা সম্পর্কে উভয়তঃই সচেতন হওয়া বিধেয়। বিরোধী পক্ষও এমন বহু ক্ষেত্রেই আইনের ধারাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। দস্যুতা, চোরাবাজার, বৈদেশিক রাষ্ট্রের স্বার্থে জাতীয় নিরাপত্তার হানিকর গোপন চরবৃত্তি, সাম্প্রদায়িক অশান্তি এবং নাশকতামূলক ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি গর্হিত কার্যের জন্য সরকার ইতিপূর্বে যে সকল ব্যক্তিকে আটক করিয়াছিলেন এবং যাহারা অদ্যাবধি বিনা বিচারে বন্দী আছে, তাহাদের ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রশ্ন তুলিয়া বিরোধী দল অবশ্যই ধৃষ্টতার পরিচয় দিবেন না, দেনও নাই। তবে যেখানে প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলের সংহতি ও জনসাধারণের ব্যক্তিস্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করিয়া সরকার পক্ষ আত্মসুবিধামূলক কতকগুলি আইন বিধান সভায় পাশ করাইয়া

লইবার জন্য উদ্যত, সেখানে বিরোধী পক্ষ নিতান্তই নীরবে চক্ষু বুজিয়া যাইতে পারেন না, এক্ষেত্রেও পারেন নাই। পারিলে এত বিরোধ বা তর্কের কোনো কারণই ঘটিত না। সরকার পক্ষ তাঁহাদের নিজেদের কার্যাবলীর প্রশংসামূলক ধ্বনি তুলিয়া যেখানে অতিরিক্ত স-রব, সেখানে বিরোধী পক্ষ যথোচিত যুক্তি ও তথ্য দর্শাইয়া কার্য হাসিল করিতে পারিলে কথা ছিল না, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা সম্ভব হয় নাই। হইলে তাঁহাদের প্রতিবাদ যথোচিত রাজনৈতিক গুরুত্ব অর্জন করিতে পারিত। ফলে তাঁহাদের সমগ্র আলোচনাই শেষ পর্যন্ত গভীরতর উষ্মা ও উত্তেজনার আধিক্যে দুর্বল হইয়া পড়িল; অন্যদিকে সরকার পক্ষ সংখ্যাপ্রাধান্যের দাপটে বিরোধী পক্ষের সমস্ত বক্তব্যকেই তুচ্ছ করিয়া দিলেন। বিরোধী পক্ষ বিলটিকে বিবেচনার্থে সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণের দাবী জানানো সত্ত্বেও সেই দাবীকে প্রকারান্তরে দমাইয়া দেওয়াই হইয়াছে। ইহার দ্বারা সরকার পক্ষ কি মহত্ত্ব ও গৌরব অর্জন করিবেন জানি না, কিন্তু সভাকক্ষে তাঁহাদের আচরণ যে অনেক মধুর হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল, একথা ধ্রুব।

আমরা সাতেও নাই, পাঁচেও নাই। আমরা ন্যায়ের পথকে আশ্রয় করিয়া যাহা সত্য তাহাই অকপটে ব্যক্ত করিতে চাই। সেই সত্য হইতেছে এই যে, নিরাপত্তার নামে অতিরিক্ত সুযোগ গ্রহণ করিয়া পুলিশি শাসনকে অধিকতর ক্ষুরধার করিয়া গভর্ণমেণ্ট যেমন দেশের চিত্ত অধিকার করিতে পারে না, তেমনি ব্যক্তিস্বাধীনতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া জনসাধারণও যথেচ্ছ আচরণ দ্বারা দেশ ও জাতিকে বড় করিয়া তুলিতে পারে না। উভয় দিকের মধ্যে একটা সমাঞ্জস্য একান্ত আবশ্যক। সেই সামঞ্জস্যের দিকেই আমরা আইনকারী ও আইন-বিরোধী উভয় পক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

বিশ্বের ত্রাস দূরীকরণের আশ্বাসে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেণ্ট ডুইট আইসেনহাওয়ার ক্ষমতা লাভের পর যে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন, তাহা লইয়া ইতিমধ্যেই বিশ্বর রাষ্ট্রিয় মহলে নানা আলোচনা সুরু হইয়াছে। ডুইট আইসেনহাওয়ার এই বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন যে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের ত্রাস ও অবিশ্বাস দূরীকরণের সাধু প্রচেষ্টায় তিনি সকলের সহিতই সহযোগিতা করিবেন, তবে ভূয়া কথাদ্বারা কোনো আক্রমণকারীর সহিত তিনি কখনও আপোষরফা করিবেন না। নিরাপত্তা ও জনকল্যাণসাধনে স্বাধীনতার প্রকৃত সমর্থকদেরই তিনি সাহায্য করিবেন। হোয়াইট হাউস হইতে প্রেসিডেণ্ট হিসাবে ডুইট আইসেনহাওয়ার তাঁহার প্রথম ভাষণে বলেন যে, পশ্চিম ইউরোপের ঐক্যকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য তিনি সচেষ্ট হইবেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র গভর্ণমেণ্ট উৎপাদন বৃদ্ধি ও লাভজনক ব্যবসায়ের সুযোগসুবিধা দিবার চেষ্টা করিবেন এবং কোনো রাষ্ট্রবিশেষের দারিদ্র্য যে অপর সকল

ডুইট আইসেনহাওয়ার

রাষ্ট্রের উন্নতির পরিপন্থী—ইহা মানিয়া লইয়াই গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের সকল নীতি পরিচালনা করিবেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি বলেনঃ 'আমরা যে আদর্শ অনুসরণ করিতেছি, তাহা একমাত্র আমাদেরই আদর্শ নহে, উহা সমগ্র স্বাধীন বিশ্বের আদর্শ। পৃথিবীর সকল দেশের লোকই আজ এই সাধারণ সূত্রে আবদ্ধ। ইন্দোচীনে যে ফরাসী সৈনিক প্রাণ হারাইয়াছে, অথবা মালয়ে নিহত বৃটিশ সৈন্য অথবা কোরিয়ায় আত্মবিসর্জনকারী আমেরিকান ইহাদের সকলকেই সমান মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে।

পৃথিবীর চতুর্দিক হইতে আজ ক্রমাগত যে চ্যালেঞ্জের ধ্বনি উঠিয়াছে, তৎসম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় সচেতন থাকিয়া ডুইট আইসেনহাওয়ার নয়টি সুনির্দিষ্ট নীতির কথা উল্লেখ করেন, যথাঃ

(১) যুদ্ধ ঘৃণা করি বলিয়া আমরা এইরূপ অভিমত পোষণ করি যে, আক্রমণকারী শক্তিসমূহকে প্রতিরোধের জন্য শক্তিসঞ্চয়ের চেষ্টা করা প্রত্যেক রাজনীতিবিদের কর্তব্য। জাতিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক ভয় ও অবিশ্বাস দূর করিয়া অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ যাহাতে অধিকমাত্রায় হ্রাস করা সম্ভব হইতে পারে তজ্জন্য আমরা অপর যে কোনো শক্তি বা সকল শক্তির সহিত সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা করিতে রাজি হইয়াছি।—উহার জন্য এই দরকার যে, ঐ প্রচেষ্টা যুক্তিসঙ্গত ও আন্তরিকভাবে শান্তি সুনিশ্চিত করার কাজে নিয়োজিত হইবে এবং প্রত্যেক জাতির সদিচ্ছার প্রমাণ পাওয়ার উপযোগী পন্থাও উহাতে থাকা চাই।

(২) আমরা একথা অনুধাবন করি যে, সাধারণ বুদ্ধি ও শালীনতাবোধ তোষণ-নীতির সার্থকতা স্বীকার করেন। কাজেই আমরা সম্মান ও নিরাপত্তার বিনিময়ে কখনও কোনও আক্রমণকারীর সহিত আপোষ করিব না।

(৩) আমরা জানি যে, যুক্তরাষ্ট্র শক্তিশালী ও প্রভূত উৎপাদনক্ষম হইলেই কেবলমাত্র বর্তমান বিশ্বে স্বাধীনতাকে রক্ষা করিতে পারে। এইজন্য আমরা মনে করি যে, আমাদের জাতির শক্তি ও নিরাপত্তার উপরই বিশ্বের সর্বস্থানের মানুষের আশা নির্ভর করিয়া আছে। আমাদের দেশের বা যে কোনো দেশের স্বাধীন মানুষের স্বীয় স্বাচ্ছন্দ্যের উপরে দেশের স্বার্থকে স্থান দেওয়া কর্তব্য হইবে।

(৪) আমরা নিজেদের রাজনৈতিক ও আর্থিক ব্যবস্থাকে অপর কোনো জাতির উপর বলপূর্বক চাপাইয়া দিবার চেষ্টা করিব না।

(৫) স্বাধীনতার প্রকৃত সমর্থকদিগকে আমরা তাহাদের নিরাপত্তা রক্ষা ও জনকল্যাণ সাধনে সর্বপ্রকার সাহায্য করিব এবং 'সাধারণ স্বাধীনতা রক্ষার' ব্যাপারে আমরা তাহাদের নিকট হইতেও পূর্ণ সহযোগিতা আশা করি।

(৬) সামরিক শক্তি ও স্বাধীন বিশ্বের শান্তির পক্ষে উন্নততর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যে অপরিহার্য, ইহা আমরা স্বীকার করি এবং এই কারণে উৎপাদনবৃদ্ধি ও লাভজনক ব্যবসায়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আমরা আমাদের সকল নীতি পরিচালিত করিব। আমরা ইহাও স্বীকার করি যে, কোনো রাষ্ট্রবিশেষের দারিদ্র্য অপর সকল রাষ্ট্রের উন্নতির পরিপন্থী।

(৭) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আশা করে যে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত স্বাধীন রাষ্ট্রের আঞ্চলিক সংস্থাগুলিকে সে শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিবে।—ইউরোপে আমরা চাই যে, পাশ্চাত্য জগতের প্রাজ্ঞ ও উদ্যমী নেতৃবৃন্দ তথাকার অধিবাসীদের ঐক্যকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য নূতনভাবে চেষ্টায় ব্রতী হউন।

(৮) স্বাধীন অবিভাজ্য বিবেচনা করিয়া আমরা সমস্ত মহাদেশ এবং সকল মানুষকে সমান শ্রদ্ধা ও সম্মানের চক্ষে দেখি। কোনও বর্ণ বা কোনও জাতি অপর কোনও বর্ণ বা জাতির তুলনায় হীন বা যুদ্ধের আহুতি হিসাবে কোনও জাতিকে নিয়োজিত করিলে কিছু যায় আসে না, এইরূপ মতবাদ আমরা পোষণ করি না।

(৯) রাষ্ট্রসঙ্ঘকে শান্তিকামী সমগ্র মানবের জীবন্ত প্রতীকরূপে গ্রহণ করিয়া আমরা কেবল উহাকে প্রতীক হিসাবেই সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিব না, পরন্তু উহাকে শক্তিশালী করিয়া তুলিব এবং শান্তির সন্ধানে আমরা কোনোপ্রকার আপোষও করিব না, আবার কখনও ক্লান্ত বা ক্ষান্তও হইব না।

এই নীতি সম্পর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গে ডুইট আইসেনহাওয়ার বলেনঃ 'আমাদের আচরণ সম্পর্কিত এই সকল নীতি দ্বারাই বিশ্ববাসীদিগের নিকট পরিচিত হইতে চাই। এই সকল নীতি অনুসরণে বিশ্ব-শান্তি স্বপ্নের রাজ্য হইতে বাস্তবে নামিয়া আসিতে পারে। অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত বোঝাপড়ার ব্যাপারে আমরা ঈশ্বরের নির্দেশ কামনা করি। আমরা অতীতের সমস্ত অভিজ্ঞতা কাজে লাগাইব এবং ভবিষ্যতের কোনো সম্ভাবনাই উপেক্ষা করিব না। এই প্রশ্নের সম্মুখীন হইবার জন্য সকল বুদ্ধি প্রয়োগ করিব। আমরা দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ। অন্ধকার হইতে আলোকের পথে মানুষ কতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছে? আমরা কি আলোক—তথা সমস্ত মানুষের শান্তি ও স্বাধীনতার নিকটবর্তী হইয়াছি? না আরেকটি অমানিশার ঘনান্ধকার নিকটবর্তী হইতেছে?—এই প্রশ্ন সকল মানুষের। ইহাই ক্রমশঃ জটিলতর হইয়া মানুষের দৈনন্দিন সমস্যায় পরিণত হয়। পৃথিবী এমন সময় সমস্যা কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছে, যখন মানুষের ভালো করার শক্তি পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। অথচ জীবনকে যাহারা সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে, তাহারাই নূতন বিপদের সূচনা করিতেছে। জাতির ধনসম্পদ স্তূপীকৃত হয়, আর একমুষ্টি অন্নের জন্য শ্রমিকদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতে হয়। ফলে তাহারা যে কেবল পাহাড় কাটিয়া সমভূমি করিতে চায়, তাহা নহে, শহরগুলিকেও ভাঙিয়া চুরিয়া সমান করিয়া দিতে চায়।—বিজ্ঞান জগৎ হইতে মানুষকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য শেষ অস্ত্র হানিতে উদ্যত। এই সময়ই

মানুষকে নূতনভাবে ঘোষণা করিতে হইবে যে, চিরন্তন নৈতিক ও স্বাভাবিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত মানুষ অমরত্বের অধিকারী। এই বিশ্বাসই নিঃসন্দেহে স্রষ্টার দানের প্রমাণ দিতেছে। স্রষ্টার দানই মানুষের চিরন্তন অধিকার এবং এখানে কোনো বৈষম্য নাই। স্রষ্টার চোখে উচ্চ-নীচ নাই। এই সমানাধিকারের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে দেখা যায়, সত্যানুরাগ এবং কর্মক্ষমতাই জীবনের অমূল্য সম্পদ। বড় এবং ছোট, সকলের নিকটই এই সম্পদ অমূল্য। এই বিশ্বাস যাহাদের নাই, তাহারা ভগবান মানে না, বল-প্রয়োগে বিশ্বাসবান। তাহারা মানুষকে ষড়যন্ত্রপরায়ণ করিয়া তোলে ও তাহারা অন্যকে উপবাসী রাখিয়া নিজেরা প্রচুর খায় যাহারা তাহাদের মানে না, তাহারা উৎপীড়িত হয়। বিশেষতঃ সত্য তাহাদের চরম নিগ্রহের বস্তু। গীর্জা হইতে আমরা যে আধ্যাত্মিকতা শিক্ষা করিয়াছি এবং স্বাধীন শ্রমিক ও পুঁজিপতিরা উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে চমক সৃষ্টি করিতে পারে, উভয়ই পরিশ্রমলব্ধ। শুধু এক মহৎ আদর্শের স্বর্ণসূত্রে আমেরিকা সকল স্বাধীন জাতির সহিত আবদ্ধ নয়। উভয়ের মধ্যে এক অতি সাধারণ লেনদেনেরও সম্পর্ক বিদ্যমান। আমেরিকার অর্থনৈতিক কাঠামো যতই সুদৃঢ় হউক না কেন, আমেরিকার উদ্বৃত্ত কৃষিজাত, শিল্পজাত ও কাঁচামালের জন্য বাহিরের বাজার আবশ্যক। অন্যান্য দেশের কারখানা-গুলিকে চালু রাখার জন্য বাজার চাই।—সুতরাং আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, সৎ ঐক্যের মধ্যে সকল স্বাধীন জাতির শক্তি নিহিত, বিভেদই বিপদ। আমেরিকানরা বিশ্ব-নেতৃত্ব ও সাম্রাজ্যবাদ, দৃঢ়তা ও বর্বরতার মধ্যে প্রভেদ কি, তাহা বুঝিতে পারে। আমরা যে শান্তি চাই, তাহা আমাদের বিশ্বাসের বাস্তব রূপায়ণ ছাড়া আর কিছু নয়। ইহা যুদ্ধের ক্লেশ নিবারণ অপেক্ষা অনেক উঁচুদরের জিনিষ। ইহা মৃত্যুঞ্জয়ী, নূতন জীবনের পথ-প্রদর্শক। অভাগার স্বর্গ, সাহসীর সান্ত্বনা।—এই আশায় আমরা সমস্যাকণ্টকিত শতাব্দীতে বসবাস করিতেছি। এই কাজ আমাদের জন্য পড়িয়াই আছে ; সকলের সহিত ইহা সম্পাদন করিতে হইবে এবং ঈশ্বরের উপর নিষ্ঠা রাখিতে হইবে।'

উপরোক্ত নয়টি মূল নীতিপ্রযুক্ত ভাষণপ্রসঙ্গে প্রেসি-ডেণ্ট্ আইসেনহাওয়ার বিশ্বশান্তির যে চমকপ্রদ ও চিত্ত-মনোহর অতুল প্রাসাদের নক্সাটি পৃথিবীর সামনে মেলিয়া ধরিয়া বৈদান্তিক মননশীলতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার সত্যাধর্মী আশ্রয় সম্পর্কে সমগ্র পৃথিবী যদি কিছু সন্দিগ্ধতার পরিচয় দেয়, তবে বোধ করি খুব বেশী অপরাধের হইবে না। সারা জীবন যে ব্যক্তি রণক্ষেত্রে থাকিয়া রণহুঙ্কারে মেদিনী প্রকম্পিত করিয়াছেন, জীবনের অপরাহ্ণবেলায় অকস্মাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধীশ্বর হইয়া তিনি যদি সত্য, প্রেম ও অহিংসার বাণী উচ্চারণ করিয়া মানবজাতির কাছে বাণী দেন—তবে বিশ্বমানবের পক্ষে সেই বাণী শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা হঠাৎই কিছু জাগ্রত হইয়া উঠিতে পারে না। জাগৃতি সম্পর্কে অভ্যস্থতার প্রয়োজন। যে ধনবৈষম্য ও ধনবৈষম্যজনিত বিশ্বপরিস্থিতির কথা তিনি উচ্চারণ করিয়াছেন—অনুসন্ধান করিলে তিনি স্পষ্টই দেখিতে পারিবেন যে, সেই ধনবৈষম্যের প্রথম ও প্রধান উৎস তাঁহারই স্বভূমি মার্কিনের মাটি। গান্ধীজী মানুষকে যে উপদেশ দিতেন, তাহা তিনি নিজের জীবন দ্বারা আচরণ ও অভ্যাস করিতেন। 'আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখাও' —এই শাস্ত্রভাষ্যের রূপকার ছিলেন গান্ধীজী। অনুরূপ রূপকার হইতে পারিলেই তবে কোনো ব্যক্তির ললিত ভাষা দ্বারা ব্যক্তি ও বিশ্ব প্রভাবিত হয়। ইহা প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের অজ্ঞাত নয়। তিনি যদি যথার্থই বিশ্বশান্তিকে সার্থক করিয়া তুলিয়া মনুষ্যসমাজ হইতে বিভেদের দেওয়াল চিরদিনের জন্য উৎপাটিত করার প্রয়াসী হন, তবে তাঁহাকে সেই কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ আচরণ গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহার সাধু সংকল্প ও মহৎ প্রয়াসের জন্য বিশ্ববাসী অবশ্যই তাঁহাকে বিজয়মাল্যে ভূষিত করিবে। তবে—শুধু রুচিকর বক্তৃতা ও বক্তৃতার মাধ্যমে ক্ষমতার সিংহাসনকে অধিকতর অটুট করিবার প্রয়াস কোনো শতাব্দীর কোনো ইতিহাসেই দীর্ঘকালের জন্য স্থায়িত্বলাভ করে নাই।

নয়া সঙ্কট

টোকিও হইতে ৯ই ফেব্রুয়ারীর এক সংবাদে প্রকাশ—জাতীয়তাবাদী চীনা সৈন্যদল দক্ষিণ চীনের অময়ে অব-তরণ করিয়াছে এবং চীনা জাতীয়তাবাদী নারী-গেরিলারা চীনের চোকিয়াং প্রদেশের উপকূলবর্তী দরিয়া দখল করিয়াছে। যদিও উভয়তঃই এই সংবাদ গুজব বলিয়া প্রচারিত হয়, তবু ইহাকে নিতান্ত গুজবের আশ্রয়ে ছাড়িয়া দিয়াই নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। ফরমোজা দরিয়া হইতে মার্কিন সপ্তম নৌবহরকে সরাইয়া লইবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার ঘোষণা করি-বার ঠিক এক সপ্তাহ পরেই জাতীয়তাবাদী চীনা বাহিনীর

এই আক্রমণের প্রয়াস। চিয়াং কাইশেকের নৌবাহিনীর অধিনায়ক ভাইস্ এডমিরাল মা চি চুয়াং নিউইয়র্কে বলেন যে, চীনের মূল ভূখণ্ডে অভিযান চালাইবার জন্য ফরমোজায় ৬ লক্ষ সৈন্যের নিরবচ্ছিন্ন প্রস্তুতি চলিতেছে। তাইপের সংবাদে বলা হইয়াছে যে, ওয়াকিবহাল জাতীয়তাবাদী মহলের সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতীয়তাবাদী চীনা বিমান বাহিনীর জন্য দুইমাস কালের মধ্যে এক স্কোয়াড্রন জেট জঙ্গী বিমান প্রেরণ করিবে।

ইহারই ঠিক দুইদিন পূর্বের সংবাদঃ ফরমোজাস্থিত জাতীয়তাবাদী চীনা মহলের ধারণা, মার্কিন বৈদেশিক সাহায্যদান দপ্তরের অধিকর্তা মেজর জেনারেল জর্জ ওলমস্টেড্ জাতীয়তাবাদী চীনা এবং মার্কিন সামরিক নেতৃবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎকারের সময় ফরমোজাকে আরও সামরিক সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

গণ-চীনের তরফ হইতে এ পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো কথা উত্থাপিত হয় নাই। খুব সম্ভব, এই নীরবতার কারণ স্বতন্ত্র কোনো সমস্যার উদ্ভব করিতে পারে, ইহা বিবেচনা করিয়াই গণ-চীনের চেয়ারম্যান মাও-সে-তুং চৈনিক গণ-রাজনৈতিক আলোচনা-পরিষদের সর্বোচ্চ জাতীয় কমিটির ৪র্থ অধিবেশনে কোরিয়া-যুদ্ধের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উল্লেখ করিয়া বলেনঃ 'যতদিন পর্যন্ত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ঔদ্ধত্যপূর্ণ মনোভাব এবং বিস্তৃততর ক্ষেত্রে আক্রমণ পরিচালনের পরিকল্পনা ও অযৌক্তিক দাবী পরিহার না করিতেছে, ততদিন কোরিয়াবাসীদের সহিত একসঙ্গে সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়াই হইবে চীনাদের একমাত্র সংকল্প। চীনা এবং কোরিয়াবাসীদের পূর্ণ বিজয়লাভ না ঘটা পর্যন্ত এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তাহাদের তল্পী না গুটানো পর্যন্ত আমরা সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত।' প্রসঙ্গতঃ তিনি বলেনঃ 'আমরা যুদ্ধ চাহি, এরূপ নহে। আমরা অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করিতে চাই। কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধ বন্ধ করিতে না চাহিলে আমরা যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে প্রস্তুত আছি।'

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি এই চ্যালেঞ্জের অর্থ নিশ্চয়ই কাহারও নিকট দুর্বোধ্য নয়। একদিকে কোরিয়া, অন্যদিকে ফরমোজাকে কেন্দ্র করিয়া চীনভূমি। এই উভয়দিকে যে সমস্যা আজ অকস্মাৎ তীব্র হইয়া উঠিয়াছে, অবিলম্বে তাহা নিবৃত্ত না হইলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পথ যে অচিরেই উন্মুক্ত হইয়া যাইবে, এ আশঙ্কা বোধ করি অযৌক্তিক নয়। সম্প্রতি বিশ্বশান্তির নয় দফা নীতি প্রকাশ করিয়া প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার যে বিবৃতি দিয়াছেন—তাহার সঙ্গে আকস্মিক উত্থিত এই জটিল সমস্যার কোথাও মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই অমিলের উপরই কি তবে নানা নীতি সম্পৃক্ত বিবৃতির পথে শান্তি জয়যুক্ত হইবে, না প্রকৃত নিরস্ত্রীকরণের মাধ্যমে উহার চরম মূল্য নির্ধারিত হইবে—ইহা বুঝিয়া দেখিবার মতো আজ সময় আসিয়াছে। পৃথিবী আজ চরম সংকটের সম্মুখীন। সর্বদিকে আজ শান্তি প্রতিষ্ঠার বিরাট আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছে। গত দুইটি মহাযুদ্ধ পৃথিবীকে স্পষ্টই বুঝাইয়া দিয়াছে—মানুষের অস্তিত্ব কিভাবে বিলুপ্ত হইতে পারে। দুইটি মহাযুদ্ধের পরিণতির উপরেই তাই আজ বিশ্বশান্তির জয়নিনাদ উচ্চকিত হইয়া উঠিয়াছে। মানুষকে যদি নিরাপত্তার সঙ্গে বাঁচিতে হয়, তবে জীবন সর্বস্ব পণ করিয়াও এই শান্তি আন্দোলন জয়যুক্ত করিয়া তুলিতে হইবে। সুতরাং এ পথে যদি সাম্রাজ্যবাদী ঔদ্ধত্য মাথা চাড়া দিয়া ওঠে, তাহা অবদমনের জন্য অবশ্যই বিভিন্ন জাতির সংযুক্ত শক্তি ব্যয় করিতে হইবে। 'পৃথিবী যে কোনো প্রকারের যুদ্ধকেই পরিহার করিয়াছে'—এই বাণীই হইবে শেষ বাণী। অন্যথায় যে পৃথিবী ডুবিবে—একথা আর একবার সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি।

★ ★

পরলোকে শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার

গত ২৫শে জানুয়ারী রবিবার সায়াহ্নে ভারতের খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদ শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার তাঁহার কলিকাতাস্থ 'রঞ্জনী' ভবনে পরলোকগমন করেন। ঐদিন দ্বিপ্রহরে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনস্যুরেন্স কোম্পানি ভবনে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল তাঁহার মর্মরমূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। মৃত্যুকালে নলিনীরঞ্জনের সত্তর বৎসর বয়স পূর্ণ হইয়া একাত্তর বৎসর চলিতে থাকে। আত্মজীবনী লিখিতে গিয়া এক সময় তিনি নিজের সম্বন্ধে বলেনঃ 'জনসেবার ক্ষেত্রে আমি সব সময়ই কথা ও কাজের সমন্বয় করার চেষ্টা করেছি এবং কখনই মিথ্যা বঞ্চনার দ্বারা লোকের বাহবা পাবার চেষ্টা করিনি। আমার নিজের বিচার বিবেচনা ছাড়া আমি কোনো ব্যাপারেই সায় দিইনি এবং তার জন্য আমি আদৌ অসুখী নই।...অনেকে আমাকে পুঁজিবাদী বলে। আমি সেকথা স্বীকার করি না, যদিও আমি পুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্যে কাজ করে থাকি। উন্নতিকামী জাতির পক্ষে পুঁজির দরকার যে কতবেশী, তা আমি জানি। যে পুঁজিবাদীরা দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধিতে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন, তাঁদের একেবারে উড়িয়ে দেবার অবাস্তব পরিকল্পনাকে আমি কোনোদিনই সমর্থন করতে পারিনি।...'

আসলে নলিনীরঞ্জন ছিলেন দরিদ্র পরিবারের ছেলে। ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মহকুমায় ১৮৮৩ সালে তিনি এক সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা চন্দ্রনাথ সরকারের তিনিই ছিলেন জ্যেষ্ঠ পুত্র। গ্রামের বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষার পর তিনি ময়মনসিংহ শহরে আসিয়া মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তারও পরে উচ্চতর শিক্ষার জন্য কিছুকাল ঢাকায় বাস করিয়াছিলেন। কিছুদিন তিনি সিটি কলেজেও পড়িয়াছেন; উক্ত সময় তিনি বর্তমান রাজ্যপালের ছাত্র ছিলেন। ১৯০৬ সালে স্বদেশী আন্দোলনের সময় নলিনীরঞ্জন প্রথম রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। ইহার মূলে তৎকালীন নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের প্রভাব ছিল। অসহযোগ আন্দোলনের সময় নলিনীরঞ্জন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের প্রধান সহযোগিরূপে কাজ করেন এবং কয়েক বৎসর প্রাদেশিক লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে স্বরাজ্যদলের চীপ হুইপরূপে কাজ করেন। এই সময় হইতে ক্রমাগত তিনি উন্নতির উচ্চশিখরে উঠিতে থাকেন, যেমন,—১৯৪১-৪২ সালে বড়লাটের শাসন পরিষদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি বিভাগসমূহের এবং পরে বাণিজ্য শিল্প ও খাদ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য; ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পদত্যাগ, বাংলা সরকারের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী; ১৯৩৫ সালে ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্স এ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীর সভাপতি; ১৯৪২-৪৩ সালে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোচ্যান্সেলার; ১৯৩৪-৩৫ সালে কলিকাতার মেয়র; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ফেলো; ১৯৩৩-৩৪ সালে ইণ্ডিয়ান লাইফ অফিসেস এসোসিয়েসনের সভাপতি; কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারি কমিটির সভ্য, ১৯৪৫ সালে ভারতীয় শিল্প-কমিশনের সভ্য হিসাবে যুক্তরাজ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন, ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত নিখিল ভারত কারিগরী শিক্ষা-পরিষদের চেয়ারম্যান, হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনস্যুরেন্স সোসাইটি লিমিটেডের সভাপতি এবং কলিকাতার ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের সভাপতি।

আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

পরলোকে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী এন্. গোপালস্বামী আয়েঙ্গার

ভারতের প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী শ্রী এন্. গোপালস্বামী আয়েঙ্গারের আকস্মিক মৃত্যুতে জাতির জীবনে শোকের ছায়া সঞ্চারিত হইয়াছে। ৯ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি তিন ঘটিকায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১০ই ফেব্রুয়ারী সংবাদ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সরকারী ভবন ও সংসদ ভবনে পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয় এবং রাজধানীর সমস্ত সরকারী অফিস বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। শ্রীআয়েঙ্গারের মৃত্যুতে ভারতের একজন সুদক্ষ শক্তিমান ব্যক্তির অভাব ঘটিল, সন্দেহ নাই। ১৮৮২ সালের ৩১শে মার্চ শ্রীআয়েঙ্গার জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাদ্রাজের ওয়েস্লেস্লী প্রেসিডেন্সী ও ল কলেজে অধ্যয়ন করেন। ১৯০৪ সালে পাণিয়াপ্পার কলেজ তাঁহাকে সহকারী অধ্যাপক রূপে কাজে বহাল করেন। অতঃপর ১৯০৫ সালে তিনি মাদ্রাজ সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন এবং উক্ত সাল হইতেই ১৯১৯ সাল পর্যন্ত ডেপুটি কালেক্টারের পদে এবং ১৯২০ সালে ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যে নিযুক্ত হন।

১৯২৭ সালে শ্রীআয়েঙ্গার ভারতীয় আইন সভার সদস্য হন। ১৯২৮ সাল হইতে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত তিনি অনন্তপুরের কালেক্টর ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন এবং

শ্রী এন্, গোপালস্বামী আয়েঙ্গার

১৯৩২ হইতে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের পূর্ত বিভাগের সেক্রেটারী ছিলেন। ১৯৩৫-৩৭ সালে শ্রীআয়েঙ্গার ইণ্ডিয়ান অফিসার্স এসোসিয়েসনের সভাপতি হন। এতদ্ব্যতীত উক্ত সাল পর্যন্ত তিনি মাদ্রাজ রাজস্ব বোর্ডের সদস্য এবং ১৯৩৭-৪৩ সাল পর্যন্ত কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ভারতীয় গণ-পরিষদের তিনি সদস্য ছিলেন এবং ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জে কাশ্মীর সমস্যা আলোচনায় ভারতীয় দলের নেতৃত্ব করেন। ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতেই তিনি ভারত সরকারের পরিবহন ও রেলওয়ে-মন্ত্রী ছিলেন এবং ১৯৪৭ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর হইতে ভারত সরকারের দপ্তরহীন-মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে সর্দার প্যাটেলের মৃত্যুর পর তিনি ভারত সরকারের দেশীয় রাজ্য-দপ্তরের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৫২ সালে ভারতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা পুনর্গঠিত হইলে শ্রীআয়েঙ্গারের উপর প্রতিরক্ষা-দপ্তরের ভার অর্পণ করা হয়। এতদ্ব্যতীত ১৯৫২ সালের মে মাসে তিনি রাজ্য পরিষদে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টির ডেপুটি লীডার নির্বাচিত হন এবং ঐ একই বৎসরে সেপ্টেম্বর মাসে তিনি জেনেভায় সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের বৈঠকে কাশ্মীর সম্পর্কিত আলোচনায় ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন। বহু শক্তি ও অসামান্য প্রতিভার মানুষ ছিলেন শ্রীআয়েঙ্গার। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতীয় রাষ্ট্রশক্তির একটা অঙ্গ যে নিঃসন্দেহে পঙ্গু হইয়া গেল, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা শ্রীআয়েঙ্গারের পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা করি এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস্ লিমিটেড
৯০, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-১৪ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কন্যা কুমারিকা

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY

বিংশ বর্ষ চৈত্র—১৩৫৯ ২য় খণ্ড—৪র্থ সংখ্যা

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

সাধকমণ্ডলীর মধ্যে রামপ্রসাদ যে অতি উচ্চস্থানের অধিকারী ইহা সর্ব্বজন-স্বীকৃত সত্য, বাঙ্গলা সাহিত্যেও তাঁহার কীর্ত্তি কল্পান্তস্থায়িনী।

রামপ্রসাদ শাক্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তান্ত্রিক আচারানুবায়ী শক্তিসাধনার দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি সাধনার দ্বারা যে স্তরে উন্নতি-লাভ করিয়াছিলেন তাহা সাম্প্রদায়িকতার বহু ঊর্দ্ধে, সেখানে শ্যাম ও শ্যামার বিভেদ থাকে না, তাই তিনি লিখিয়াছিলেন—

"কালি হলি মা রাসবিহারী। নটবর বেশে বৃন্দাবনে॥
পৃথক প্রণব নানা লীলা তব, কে বুঝে একথা বিষম ভারী॥
নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা, আপনি পুরুষ আপনি নারী॥
ছিল বিবসন কটী, এবে পীতধটি, এলো চুল চূড়া বংশী-ধারী॥
আগেতে কুটীল নয়ন অপাঙ্গে, মোহিত করেছ ত্রিপুরারী।
এবে নিজে কাল, তনু রেখে ভাল, ভুলালে নাগরী নয়ন ঠারি॥
ছিল ঘন ঘন হাস, ত্রিভুবন ত্রাস, এবে মৃদু হাস, ভুলে ব্রজকুমারী।
পূর্ব্বে শোণিত সাগরে নেবেছিলে শ্যামা, এবে প্রিয় তব যমুন বারি॥
প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাসিছে, বুঝেছি জননী মনে বিচারি।
মহাকাল কানু, শ্যাম শ্যামা তনু, একই সকল বুঝিতে নারি॥"

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ লিখিয়াছেন, রামপ্রসাদের বৈষ্ণব প্রভাব স্পষ্টই লক্ষিত হয়, কিন্তু ভাবে ও প্রকাশে, রূপে ও সুরে রামপ্রসাদ অভিনব, অনুপম, অদ্বিতীয়।

কবিবর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন:—কবিরা

নিসর্গরূপে ধর্মের পুরোহিত। তাঁহারা জাতীয়স্বরূপ কার্যের ক্রম প্রদর্শন পূর্বক তৎকর্তার সত্তা সংস্থাপন করেন। তাঁহারা মনুষ্যের নিকট ঐশিক ক্রিয়া প্রণালীর যাথার্থ্য নিরূপণ করিয়া দেন। কবিরা নীরস অস্থিসার তত্ত্বশাস্ত্রের শরীরে আত্মার সঞ্চার করত তাহাকে স্বর্গীয় সৌন্দর্যে শোভিত করেন।

রামপ্রসাদ এইরূপ কবি,—এইরূপ ধর্মের পুরোহিত ছিলেন। সুপণ্ডিত রমেশ দত্ত তাঁহার বিরচিত বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসে লিখিয়াছেনঃ—

"It is possible to be a true poet without being a great poet, and Ram Prasad Sen is a true poet, every inch of him. In his life and acts, no less than in his songs, the poet predominates over the man."

অর্থাৎ, উচ্চ শ্রেণীর কবি না হইয়াও প্রকৃত কবি হওয়া সম্ভব, এবং রামপ্রসাদ, যেদিক দিয়াই দেখা যাউক না কেন, প্রকৃত কবি ছিলেন। তাঁহার জীবনে, তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্যে, তাঁহার গানে, মানুষ রামপ্রসাদকে ছাপাইয়া কবি রামপ্রসাদ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।'

রামপ্রসাদের গানের অকৃত্রিম সরলতা, অপরিসীম মাধুর্য, তেজস্বিনী বন্দনা ও অনির্বচনীয় সৌন্দর্য অনুভব করিবার জন্য টীকাকারের প্রয়োজন হয় না। দত্ত মহাশয় উচ্চশ্রেণীর কবি ও প্রকৃত কবির মধ্যে যে পার্থক্য করিয়াছেন তাহার স্বরূপ আমরা ঠিক উপলব্ধি করিতে পারি না। আলঙ্কারিকদের মনে বা বৈদেশিক সমালোচনা পদ্ধতির বিচারে তাঁহার কবিতার কিরূপ মূল্য নির্ধারিত হইবে তাহা জানি না। তাঁহার অনবদ্য সঙ্গীতগুলির ভাব বৈদেশিক ভাষায় যথাযথভাবে প্রকাশ করা অসাধ্য, এবং প্রতীচ্য পণ্ডিতগণের প্রশংসাপত্র না অর্জন করিতে পারিলে যদি কবিশ্রেষ্ঠ বা উচ্চশ্রেণীর কবির সিংহাসন লাভের অযোগ্য বলিয়া তিনি বিবেচিত হন, তাহা হইলে হয়ত রামপ্রসাদ তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর কবির আসন লাভ করিতে পারিবেন না। কিন্তু আমাদেরই একজন মনস্বী কবি ও সমালোচক, দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিয়াছেন,—

"গানের সঙ্গে নাইক প্রাণ যার
তাহার সে গান গানই নয়।
... ...
কাব্য নয়ক ছন্দোবন্ধ, মিষ্ট শব্দের কথার হার ;
কাব্যে কবির হৃদয় নাই যার, তাহার কাব্য শব্দ-সার।
যেথায় ভাস্বর, যেথায় মূর্ত, ঝঙ্কারিত কবির প্রাণ;
উৎসারিত মহাপ্রীতি ;—তাহাই কাব্য তাহাই গান।"

এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া বিচার করিলে, রামপ্রসাদের স্থান বোধ হয় সর্বোচ্চে ; কারণ, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী ভিন্ন আর কাহারও গানে কবির প্রাণ এমনভাবে ঝঙ্কারিত হইয়া উঠিয়াছে কিনা সন্দেহ। রামপ্রসাদ প্রাণ দিয়া হৃদয়ের সাধনালব্ধ সত্য অনুভূতিকে যেভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গলার নরনারীর হৃদয়তন্ত্রীতে চিরদিন ঝঙ্কৃত হইবে। কুহেলিকা সমাচ্ছন্ন রাবীন্দ্রিক ও রবীন্দ্রোত্তর যুগের গীতি যখন রমণী নৃত্য ও হাবভাবসম্বলিত অঙ্গভঙ্গীসহকারে ব্যাখ্যাত হইয়াও হৃদয়ে বহুক্ষণস্থায়ী রেখাপাত করিতে অসমর্থ হয়, তখন রামপ্রসাদের সরল, অনাড়ম্বর, প্রাণস্পর্শী গীতি কিরূপে আমাদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে গভীর ঝঙ্কার তুলে এবং আমাদিগকে মুহূর্তমধ্যে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করিয়া লইয়া যায় তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। ব্রাহ্মসমাজের প্রধান স্তম্ভ, পৌত্তলিকতার ঘোর বিরোধী, সত্যপ্রিয় রাজনারায়ণ বসু রামপ্রসাদের শ্যামাবিষয়ক অতুলনীয় গানের প্রসঙ্গে তদীয় বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতায় বলিয়াছেনঃ

—"যখন কলিকাতায় রাত্রিতে রাতভিখারীদের মুখে তাঁহার রচিত গান শ্রবণ করা যায়, তখন চিত্তের অত্যন্ত ঔদাস্য জন্মে এবং সেই সকল গান মনকে পৃথিবীর এত উপরে লইয়া যায় যে তাহা বলা যায় না।"

রাজনারায়ণ বসু আরও লিখিয়াছেনঃ

"রামপ্রসাদ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট হইতে 'কবিরঞ্জন' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি তদপেক্ষা আর একটী সহস্রগুণে গৌরবাস্পদ উপাধি প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত, সে উপাধি 'সাধুরঞ্জন'। 'কবি' শব্দ 'সাধু' শব্দের প্রতিশব্দ হওয়া কর্তব্য; কিন্তু মানববর্গের দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হয় নাই।"

বাঙ্গলা দেশ কলিকাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। কলিকাতায় অধুনা রামপ্রসাদী সঙ্গীতের আদর কিরূপ তাহা জানি না, হয়ত, সিনেমায় চিত্রনাট্যগুলির অন্তর্গত সঙ্গীতগুলি আধুনিক যুবকগণের সর্বাপেক্ষা প্রিয়, হয়ত, সেগুলি কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতগুলি অপেক্ষা প্রিয়তর। কিন্তু কলিকাতার বাহিরেও কি সেই অবস্থা? আমার আশা এই যে, বাঙ্গালার পল্লীগ্রাম—প্রকৃত বাঙ্গালাদেশ এখনও এতদূর অধঃপতিত হয় নাই।

বাঙ্গালা সাহিত্যের পরম অনুরাগী, বাঁকুড়া কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ এবং পরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা সাহিত্যের অধ্যাপক এডওয়ার্ড টমসন কিছুকাল পূর্বে আর্থার মার্শম্যান স্পেনসারের সহযোগিতায় Heritage of India Series নামক গ্রন্থমালায় অন্তর্ভুক্ত করিয়া "Bengali Religious Lyrics, Sakta," নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। উহাতে তিনি রামপ্রসাদের ৬০।৭০টী এবং তাঁহার পরবর্তী কয়েকজন শ্যামাসঙ্গীত রচয়িতৃর কতকগুলি সঙ্গীত ইংরাজীতে অনুবাদিত করিয়া প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের সুলিখিত ভূমিকায় তিনি একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা কতিপয় বৎসর পূর্বে পল্লীগ্রামে রামপ্রসাদ কতদূর জনপ্রিয় ছিলেন, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার ভূমিকা হইতে কিয়দংশ অনুবাদিত করিয়া দিতেছি:—

"এই সকল শাক্ত সঙ্গীত লোকের হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে যেরূপ ঝঙ্কার তুলে, অতি অল্প কবির গানেই সেরূপ ঝঙ্কার তুলিতে পারে।—'নিতান্ত যাবে দিন এ দিন যাবে, কেবল ঘোষণা রবে গো। কেবল তারা নামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো।'—প্রভৃতি সুন্দর গান আমি রাস্তার মুটে বা ধানক্ষেতের চাষার মুখে শুনিয়াছি, নদীতীরে সূর্য্যাস্তকালে যখন বলাকারা নীড়ে প্রত্যাগমন করে কিম্বা হাট হইতে গ্রামবাসীরা পারঘাটায় পার হয়। একবার আমি মফঃস্বলের একটী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদিগকে রবীন্দ্রনাথের একটী গান লিখিয়া দিতে বলি, চল্লিশজন ছাত্রের মধ্যে দুইজন মাত্র লিখিতে সমর্থ হইয়াছিল—দেশে তাঁহার গানের ইহাই প্রকৃত প্রসার বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু যখন আমি রামপ্রসাদের একটী সঙ্গীত লিখিতে বলিলাম, দুইজন ব্যতীত সকল ছাত্রই উহা লিখিতে সমর্থ হইয়াছিল। যে কবির নাম এবং কবিতা ১৪ হইতে ১৮ বৎসর বয়স্ক ছাত্রদের মধ্যে এতদূর পরিচিত, তিনি যথার্থই একজন জাতীয় কবি। কলিকাতার পথে রবীন্দ্রনাথের গান শুনা যায় এবং ছাত্রসম্প্রদায় ও ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা কলিকাতায় তাহার প্রচারও খুব বেশী, কিন্তু বাঙ্গালার সুদূর পল্লীতে তাহা অপরিচিত, পক্ষান্তরে, রামপ্রসাদের সঙ্গীত সর্বত্র সুপরিচিত। কৃষক ও পণ্ডিত সকলেই তাঁহার গান সমভাবে উপভোগ করেন। নিরাশায় বেদনা দূর করিতে, এমন কি অন্তিমকালেও, এই সকল গানে তাহারা শান্তি পায়। গঙ্গাযাত্রার সময়েও মুমূর্ষু ব্যক্তি তাহার সঙ্গীগণকে রামপ্রসাদের গান গাহিতে অনুরোধ করে।"

রামপ্রসাদ যথার্থই আমাদের জাতীয় কবি। বাঙ্গালায় আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁহার গান শুনিয়া আনন্দলাভ করে, শান্তিলাভ করে, উপকৃত হয়। আমাদের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে মনেরও অনেক পরিবর্তন ঘটে; যাহা বাল্যকালে ভাল লাগে, কৈশোরে তাহা ভাল না লাগিতেও পারে; কৈশোরে যাহা ভাল লাগে, যৌবনে তাহা না ভাল লাগিতে পারে, যৌবনে যাহা প্রিয় বোধ হয় প্রৌঢ়ে তাহা পরিত্যক্ত হইতে পারে, প্রৌঢ়ে যাহা প্রিয় মনে হয় বার্দ্ধক্যে তাহা প্রীতিপ্রদ না হইতে পারে। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত জীবনে যাহা অনুভব করিয়াছি, হয়ত আপনারাও অনেকে তাহা অনুভব করিয়াছেন যে, রামপ্রসাদের সঙ্গীত কি বাল্যে কি কৈশোরে, কি যৌবনে, কি প্রৌঢ়ে, কি বার্দ্ধক্যে সকল সময়েই আমাদের প্রাণকে অভূতপূর্ব ভাবে স্পর্শ করিয়াছে, আমাদের মনকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করিয়াছে, এবং আমার স্থিরবিশ্বাস এই যে যখন 'পরিহরি ভবসুখদুঃখ' 'শায়িত অন্তিম শয়নে' তখনও রামপ্রসাদের সঙ্গীত আমাকে মৃত্যুযন্ত্রণা ভুলাইয়া পরম শান্তিতে মায়ের শান্তিময় কোলে তুলিয়া দিতে সমর্থ হইবে।

য়ুরোপীয় সাহিত্যের সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের রুচি, ভাবধারা ও চিন্তা প্রণালীর যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, তথাপি যতদিন বাঙ্গালী আপনার সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্য হারাইয়া সম্পূর্ণভাবে ফিরিঙ্গীভাবাপন্ন না হইতেছে, ততদিন রামপ্রসাদী সঙ্গীতের ন্যায় খাঁটী বাঙ্গালা সঙ্গীত বাঙ্গালীর প্রাণ যেভাবে স্পর্শ করিবে, আলোড়িত করিবে, নানা বৈচিত্র্যময় ছন্দে গ্রথিত, শব্দৈশ্বর্যময়ী ভাষায় নিবদ্ধ কৃত্রিমতাপূর্ণ আধুনিক সঙ্গীত সেভাবে মর্ম স্পর্শ করিতে পারিবে না।

মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, প্রভৃতি প্রতীচ্যপ্রভাবে প্রভাবিত কবিগণের গুণ-পক্ষপাতী সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও তাই এইরূপ খাঁটী বাঙ্গালা গানের প্রসঙ্গে একসময়ে লিখিয়াছিলেন:—

"একদিন বর্ষাকালে গঙ্গাতীরস্থ কোন ভবনে বসিয়াছিলাম। প্রদোষকাল—প্রস্ফুটিত চন্দ্রালোকে বিশাল বিস্তীর্ণ ভাগীরথী লক্ষবীচিবিক্ষেপশালিনী—মৃদু হিল্লোলে তরঙ্গভঙ্গচঞ্চল চন্দ্রকরমালা লক্ষ তারকার মত ফুটিতেছিল ও নিবিতেছিল। যে বারেণ্ডায় বসিয়াছিলাম তাহার নীচে দিয়া বর্ষার তীব্রগামী বারিরাশি মৃদুরব করিয়া ছুটিতেছিল। আকাশে নক্ষত্র, নদীবক্ষে নৌকার আলো, তরঙ্গে চন্দ্ররশ্মি। কাব্যের রাজ্য উপস্থিত হইল। মনে করিলাম, কবিতা পড়িয়া মনের তৃপ্তি সাধন করি। ইংরেজি

কবিতায় তাহা হইল না—ইংরেজির সঙ্গে এ ভাগীরথীর ত কিছুই মিলে না। কালিদাস ভবভূতিও অনেক দূরে।

মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র কাহাতেও তৃপ্তি হইল না। চুপ করিয়া রহিলাম। এমন সময়ে গঙ্গাবক্ষ হইতে মধুর সঙ্গীতধ্বনি শুনা গেল। জেলে জাল বাহিতে বাহিতে গায়িতেছে—

"সাধো আছে মা মনে,
দুর্গা বলে প্রাণ ত্যজিব
জাহ্নবী-জীবনে।"

তখন প্রাণ জুড়াইল,—মনের সুর মিলিল,—বাঙ্গালা ভাষায় —বাঙ্গালীর মনের আশা শুনিতে পাইলাম, এ জাহ্নবী জীবন দুর্গা বলিয়া প্রাণ ত্যজিবারই বটে, তাহা বুঝিলাম। তখন সেই শোভাময়ী জাহ্নবী, সেই সৌন্দর্যময়ী জগৎ, সকলই আপনার বলিয়া বোধ হইল,—এতক্ষণ পরের বলিয়া বোধ হইতেছিল।"

রামপ্রসাদ অশিক্ষিত গ্রাম্য কবি ছিলেন না। অনুমান ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে শিক্ষিত বৈদ্য বংশে যে গঙ্গাতীরবর্তী কুমারহট্ট (হালিসহর) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তাহা তৎকালে বহু প্রসিদ্ধ সাধু ও পণ্ডিতগণের বাসস্থান ছিল।

"ধরাতলে ধন্য সেই কুমারহট্ট গ্রাম,
তত্র মধ্যে সিদ্ধপীঠ রামকৃষ্ণ ধাম।
শ্রীমণ্ডপে জাগ্রত শৈলেশপুত্রী যথা,
নিশাকালে চরিতার্থ শ্রীরঞ্জন তথা।"

এই গ্রামে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মন্ত্রগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী বাস করিতেন, মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর শ্রীরাম পণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত, শিবানন্দ সেন প্রভৃতি তাঁহার বহু শিষ্য কুমারহট্ট ও নিকটবর্তী কাঁচড়াপাড়া গ্রামে বাস করিতেন। কুমারহট্ট গ্রামের নাম সম্বন্ধে একটি কৌতুকাবহ গল্প প্রচলিত আছে। প্রায় পাঁচ শত ঘর কুম্ভকার অধ্যুষিত এই গ্রামের ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের পাণ্ডিত্যের এরূপ খ্যাতি হইয়াছিল যে একদা নবদ্বীপের কয়েকজন পণ্ডিত তাঁহাদের সহিত বিচার করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে আসিয়াছিলেন। কুমারহট্টের পণ্ডিতেরা চক্রান্ত করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে বিচার করিবেন না স্থির করত একজন সুচতুর কুম্ভকারকে তাঁহাদের কার্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে বলেন। নবদ্বীপের ব্রাহ্মণগণ শজিনা ফলে দাইল রন্ধন করিয়া আহার করিতে বসিলেন। শজিনা ফলের এক এক খণ্ড একাধিকবার মুখে দিতে দেখিয়া সেই কুম্ভকার বলিল, "ছি ছি, আপনারা পণ্ডিত হইয়া উচ্ছিষ্ট ভোজন করেন। আপনাদের সঙ্গে আমাদের পণ্ডিতগণ আবার বিচার করিবেন কি?" এইরূপ কুম্ভকার কর্তৃক অপদস্থ হইয়া তাহারা নীরবে প্রস্থান করেন। কুমার দ্বারা পণ্ডিতগণ হটিয়া গেলেন বলিয়া স্থানের নাম কুমারহট্ট হয়।

রামপ্রসাদ যে সম্ভ্রান্ত ও বিদ্বানের বংশে জন্মগ্রহণ করেন তাহা তৎপ্রণীত বিদ্যাসুন্দরের শেষভাগে লিখিত আছে:—

"ধনহেতু মহাকুল, পূর্বাপর শুদ্ধমূল, কীর্তিবাসতুল্য
কীর্তি কই।
দানশীল দয়াবন্ত, শিষ্টশান্ত গুণবন্ত, প্রসন্নাকালিকা
কৃপামই॥
সেই বংশে সমুদ্ভব, পুরুষার্থ কত কব, দিলা কত কত
মহাশয়।
অনাচির দিনান্তর, জন্মিলেন রামেশ্বর, দেবীপুত্র সরল-
হৃদয়॥
তদঙ্গজ রামরাম, মহাকবি গুণধাম, সদা যারে সদয়া অভয়া।
তদঙ্গজ এ প্রসাদে, কহে কালিকার পদে, কৃপাময়ি ময়ি
কুরু দয়া॥"

গ্রামস্থ পাঠশালায় ও চতুষ্পাঠীতে রামপ্রসাদ অধ্যয়ন করিয়া অল্প বয়সেই বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায়, কাব্য ও দর্শন শাস্ত্রাদিতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তৎকালীন অর্থকরী বিদ্যা, —হিন্দী ও পারস্য ভাষাও তিনি সুযোগ্য মৌলবীর নিকট অল্পদিনেই আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তৎপ্রণীত বিদ্যাসুন্দরের নানা স্থানে তাঁহার হিন্দী ও পারস্য ভাষার জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

১৬।১৭ বৎসর বয়সে পিতৃ বিয়োগ ঘটিলে রামপ্রসাদ সংসার প্রতিপালনের জন্য কলিকাতায় চাকুরী করিতে আসেন। যে জমিদারের (কেহ কেহ বলেন ভূকৈলাসের গোলকচন্দ্র ঘোষাল, কাহারও মতে দুর্গাচরণ মিত্র) সেরেস্তায় তিনি মুহুরীগিরি চাকুরী পান তিনি খুব ধর্মাত্মা ব্যক্তি ছিলেন। কৈশোরাবধি রামপ্রসাদ কাব্যানুরক্ত ও শ্যামাভক্ত ছিলেন, টাকা কড়ির হিসাব লেখায় তাঁহার মন বসিত না, তাই তিনি হিসাবের খাতায় প্রত্যেক পৃষ্ঠায় অবশিষ্ট স্থানে ভক্তিরসপরিপূরিত শ্যামাসঙ্গীতে পূর্ণ করিয়া রাখিতেন। একদিন তাঁহার উপরিস্থ কর্মচারী তাঁহার কীর্তি দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া প্রভুকে খাতা দেখাইতে লইয়া গেলেন। কি বিস্ময়, কি অনির্বচনীয় আনন্দের সহিত প্রভু পাঠ করিলেন:

"আমায় দাও মা তবিলদারী।
আমি নিমক্‌হারাম নই শঙ্করী॥

পদরত্নভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি॥
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারী॥
শিব আশুতোষ স্বভাব দাতা, তবু জিম্মা রাখ তাঁরি॥
অর্ধ অঙ্গ জায়গির, তবু শিবের মাইনে ভারি।
আমি বিনা মাইনের চাকর, কেবল চরণধূলার অধিকারী॥
যদি তোমার বাপের ধারা ধর তবে বটে আমি হারি।
যদি আমার বাপের ধারা ধর, তবে তো মা পেতে পারি॥
প্রসাদ বলে এমন পদের, বালাই লয়ে আমি মরি।
ও পদের মত পদ পাইলে, সে পদ লয়ে বিপদ সারি॥'

প্রভু গুণগ্রাহী ছিলেন, তিনি বুঝিতে পারিলেন মহাজনী খাতা লিখিবার জন্য রামপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন নাই, তাঁহার অলৌকিকী প্রতিভা উচ্চতর কার্য্যের উপযোগী। তিনি রামপ্রসাদের সাংসারিক অবস্থার কথা শ্রবণান্তে যথোচিত মাসিক বৃত্তি নির্ধারিত করিয়া তাঁহার বাঞ্ছিত সাধনার ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করিবার সুযোগ প্রদান করিলেন।

বৈষয়িক কর্ম হইতে মুক্তি পাইয়া রামপ্রসাদ স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিলেন এবং তন্ত্রোক্ত পঞ্চমুণ্ডী আসন সংস্থাপন করিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই সাধনায় যে তিনি অচিরে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন তিনি যে অসংখ্য শ্যামা-সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, তিনি যে "লাখো উকীল খাড়া" করিয়াছেন, তাহা নিঃসংশয়ভাবে প্রমাণিত করিতেছে। সঙ্গীত শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল এবং তিনি যে অনির্বচনীয় অমৃতময় সুর উদ্ভাবিত করিয়া গিয়াছেন তাহা তাহার সাক্ষ্য দিবে। কৃষ্ণনগরের অধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার গুণবত্তায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে তাঁহার রাজ-সভায় লইয়া যাইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন কিন্তু রামপ্রসাদ কাহারও অধীনতা স্বীকার করিয়া প্রভুকে ভয় করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। "ভয় করিলে যাঁরে না থাকে অন্যের ভয়" সেই অভয়ার চরণই শরণ করিয়াছিলেন। মহারাজ যখন হালিসহরে তাঁহার ধর্মাধিকরণে বা বায়ুসেবনালয়ে আসিতেন তখন রামপ্রসাদের সঙ্গীত শ্রবণ ও তাঁহার সহিত ধর্মালোচনা করিতেন। বৈষ্ণব কবি আজু গোঁসাই-এর সহিত শাক্ত কবি রামপ্রসাদের কবিতা যুদ্ধও সেই রসগ্রাহী মহারাজ মহানন্দে উপভোগ করিতেন। মহারাজ রাম-প্রসাদকে ১০০ বিঘা নিষ্কর জমি এবং 'কবিরঞ্জন' উপাধি দিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। কথিত আছে নবাব সিরাজউদ্দৌলাও রামপ্রসাদের সঙ্গীত শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

রামপ্রসাদ তাঁহার অতুলনীয় শ্যামা সঙ্গীত ব্যতীত কালীকীর্তন, কৃষ্ণ কীর্তন, সীতা বিলাপ ও বিদ্যাসুন্দর নামক একখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

বিদ্যাসুন্দর কাব্য, (কাহারও কাহারও অনুমান) মহা-রাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে রচিত হইয়াছিল, কিন্তু রামপ্রসাদ যে কাহারও আদেশে এই গ্রন্থ রচনা করিবেন ইহা অনেকে অবিশ্বাস করেন। উক্ত কাব্যে কালী বন্দনা হইতে প্রতীত হয় যে তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্মিনীকে স্বপ্নে জগজ্জননী প্রত্যাদেশ করিয়াছিলেন—

"অখিল জননি, তব চরিত্র এমন।
হেদে গো করুণাময়ী এ ভার কেমন॥
ধন্যা দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ এবে
আমি কি অধম এত বিমুখ আমারে॥
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব,
কহিবার কথা নয়, বিশেষ কি কব॥"

তুলনায় সমালোচনা করিয়া অনেকেই ভারতচন্দ্রের বিদ্যা-সুন্দর কাব্যকে রামপ্রসাদের গ্রন্থাপেক্ষা উচ্চতর আসন দিয়া থাকেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা উচিত যে রামপ্রসাদের গ্রন্থ ভারতচন্দ্রের পূর্বে রচিত হইয়াছিল এবং পরবর্তীরা প্রায়ই পূর্ববর্তী কবি অপেক্ষা অনেক সুবিধা পান। বররুচি প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থ অবলম্বনে বাঙ্গালায় অনেক কবিই বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়াছিলেন। জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে যে সর্বপ্রথম শ্রীকবিবল্লভ, তৎপরে প্রাণারাম চক্রবর্তী, তাঁহার পর কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদ ও সর্বশেষে ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়াছিলেন। অর একটী কথ এই যে গ্রন্থ লিখিয়া রাজ-সভায় যশোলাভ করা কখনও রাম-প্রসাদের লক্ষ্য ছিল না, সঙ্গীতের দ্বারা তিনি জগজ্জননীর ভজনা ও সাধনা করিতেই ভালবাসিতেন, তাই তিনি বলিয়াছেন—

"গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি গানে হব মত্ত।"

এবং তাঁহার এই সঙ্গীতের তুলনা বিশ্বসাহিত্যে নাই

রামপ্রসাদের জীবন চরিতে অনেক অলৌকিক ঘটনার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। জগজ্জননী তাঁহার কন্যারূপ ধারণ করিয়া তাঁহার গৃহের বেড়া বাঁধিতে সাহায্য করিয়া-ছিলেন কিনা, স্বয়ং অন্নপূর্ণা তাঁহার অপার্থিব সঙ্গীত শ্রবণ করিবার জন্য সামান্য রমণীর বেশে গৃহে আগমন করিয়াছিলেন কি না, বিশ্বাস না করিতে পারেন কিন্তু এ কথা কিছুতেই অবিশ্বাস করা যায় না যে তিনি ভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংসের ন্যায় জননীকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং কন্যার মধ্যে জগজ্জননীকে, সাধারণ রমনীর মধ্যে অন্ন-পূর্ণাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ পরমহংস বলিয়া-

ছিলেন যাকে তিনি শুধু দেখেন নাই, তিনি তাঁহার সঙ্গে কথা কহেন। রামপ্রসাদও সিদ্ধপুরুষ ছিলেন এবং শিশু যেমন মা'র নিকট আবদার করে, অভিমান করে, কখনও কখনও কলহ করে, কখন কখনও গালি দেয় তিনিও নির্ভয়ে জগজ্জননীর সঙ্গে তাহা করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গীতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

ভগিনী নিবেদিতা লিখিয়াছেনঃ

"The great burden of his verses is the Mother. And in calling upon her he becomes the ideal child. It is curious to reflect how a century and a half ago, almost a hundred years before the birth of childhood into European art, a great Indian singer and saint should have been deep in observation of little ones—studying them and sharing every feeling almost without knowing it himself.

তিনি তাঁহার মনকে জ্ঞানী বলে হৃদিরত্নাকরের অগাধ জলে ডুবাইয়া দিয়া শক্তিরূপা মুক্তা কুড়াইয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি সগর্বে বলিতে পারিয়াছিলেন "আমি ভক্তির জোরে কিনতে পারি ব্রহ্মময়ীর জমিদারী।" তাঁহার ন্যায় সাধকের পক্ষে তীর্থ ভ্রমণ অনাবশ্যক ছিলঃ

"আর কাজ কি আমার কাশী
মায়ের পদতলে পড়ে আছে, গয়া গঙ্গা বারাণসী।
হৃৎকমলে ধ্যানকালে, আনন্দ সাগরে ভাসি;
ওরে কালীর পদ কোকনদ তীর্থ রাশি রাশি॥"

তাঁহার সঙ্গীতগুলি অতীব সরল হইলেও উহার মধ্যে এক সাহসিকতা ও নির্ভীকতা আছে। আর কোন জাতীয় ধর্ম-সঙ্গীতে মৃত্যুর প্রতি নির্ভর ভাব—এরূপ সুন্দর সরল ওজস্বিনী ভাষায় পরিব্যক্ত হয় নাই। তিনি সাধনার বলে মৃত্যুকে সর্বত্র তুচ্ছজ্ঞান করিয়াছেন,—

"মন কেনরে ভাবিস এত
যেমন মাতৃহীন বালকের মত॥
ভবে এসে ভাবছো ব'সে, কালের ভয়ে হয়ে ভীত।
ওরে কালের কাল মহাকাল, সে কাল মায়ের পদানত॥
ফণী হয়ে ভেকের ভয়, এযে বড় অদ্ভুত।
ওরে তুই করিস কি কালের ভয়, হয়ে ব্রহ্মময়ী-সুত॥"

আর একটা গানে আছে,—

"তুই যারে কি করিবি শমন, শ্যামা মাকে কয়েদ করেছি।
মন বেড়ী তাঁর পায়ে দিয়ে, হৃদ্-গারদে বসায়েছি॥
হৃদিপদ্ম প্রকাশিয়ে, সহস্রারে মন রেখেছি।
কুলকুণ্ডলিনী শক্তির পদে আমি প্রাণ সঁপেছি॥ ইত্যাদি"—

পুনশ্চ,—

"অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি।
আমি আর কি শমন-ভয় রেখেছি॥
কালীনাম কল্পতরু, হৃদয়ে রোপণ করেছি।
আমি দেহ বেচে ভবের হাটে, দুর্গানাম কিনে এনেছি।"
ইত্যাদি—

পূর্বেই বলিয়াছি রামপ্রসাদ অশিক্ষিত ছিলেন না। তাঁহার কোন কোন সরল কবিতায় হিন্দু দর্শনের বা তন্ত্রশাস্ত্রের গভীরতম তথ্য নিহিত আছে। যথা—

"বল দেখি ভাই কি হয় মলে, এই বাদানুবাদ করে সকলে।
কেহ বলে ভূত প্রেত হবি, কেহ বলে তুই স্বর্গে যাবি,
কেহ বলে সালোক্য পাবি, কেহ বলে সাযুজ্য মেলে।
বেদের আভাস তুই ঘটাকাশ ঘটের নাশকে মরণ বলে
ওরে শূন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য, মান্য করে সব খেয়ালে।
এক ঘরেতে বাস করিছে পঞ্চজনে মিলেজুলে।
সে যে সময় হ'লে আপনা আপনি যে যেখানে যাবে চলে॥
প্রসাদ বলে যা ছিল ভাই তাই হবি রে নিদান কালে।
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, লয় হয়ে মিশায় জলে॥"

বাহুল্য ভয়ে তাঁহার আর কোন সঙ্গীত উদ্ধৃত করিব না, সেগুলি সকলের নিকটই সুপরিচিত। আজ অশান্তিপূর্ণ বিশ্বে আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজন সুখের আশা ত্যাগ করিয়া মায়ের অভয় পদে শরণ লওয়া, শক্তি সঞ্চয় করা, নিজেকে ব্রহ্ম-ময়ী-সুত বলিয়া উপলব্ধি করা, মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করিয়া মুক্তকেশীর শক্ত বেড়ার মধ্যে আশ্রয় লওয়া 'যেখানেতে যম ঘেঁষে না'। রামপ্রসাদের সঙ্গীতের অধিকতর প্রচার ও আলোচনা এই কার্যে সহায়তা করিবে। আজ দেশের এই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবনতির যুগে রত্নপ্রসবিনী বাঙ্গালার সুসন্তান, আমাদের চিরগৌরবের আধার ভক্তিসাধনার মূর্ত প্রতীক রামপ্রসাদই ধ্রুব নক্ষত্রের মত পথভ্রষ্ট দিশাহারা দেশ-বাসীকে যাত্রাপথ নির্দেশ করিয়া দিতে পারেন—তাহাদিগকে উচ্চস্তরে উন্নীত করিতে পারেন। শ্রদ্ধানত চিত্তে আজ আমরা সেইরূপ প্রার্থনাই করিতেছি।

ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের গতি প্রকৃতি

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিধা-বিভক্ত হইবার পর এবং মুদ্রা মূল্যাবনয়নের পশ্চাতে, বিশীর্ণ ভারতের বহির্বাণিজ্যে গুরু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। হিন্দুস্থানের অংগ হইতে পাকিস্থান বিচ্ছিন্ন হইয়া, নব ভারত রাষ্ট্রের বিবিধ বনজ, জলজ, খনিজ এবং শিল্পজ সম্পদের উৎপাদন হ্রাস করিয়াছে। ফলে, আমদানী-রপ্তানীর বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সে আলোচনা আমরা যথাসময়ে পূর্বে করিয়াছি। মুদ্রামূল্যাবনয়নের পশ্চাতে, আমদানীর তুলনায় রপ্তানী বৃদ্ধির ফলে, বহির্বাণিজ্য জমাখরচে জমারঅঙ্ক আমাদের অনুকূল হইয়াছিল। কিন্তু এই জাতীয় আর্থিক স্বচ্ছলতা দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। কয়েক মাসের মধ্যেই আমাদের রপ্তানী বাণিজ্যের উপার্জন অধোগামী হইয়াছিল। ফলে, আন্তর্জাতিক জমাখরচে আমাদের আয়ের অঙ্কের তুলনায়, ব্যয়ের অঙ্ক বৃদ্ধি হেতু, ঘাট্‌তি ঘটিতে আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের রপ্তানী বাণিজ্যের আয় হ্রাস পাইয়াছে। পক্ষান্তরে আমদানী বাণিজ্যে খাদ্য সামগ্রী এবং কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি প্রভৃতি অত্যাবশ্যক শিল্প-সম্প্রসারণ-সরঞ্জাম সংগ্রহার্থ আমাদের ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ বিষয়টি বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। তথাপি, ১৯৫০-৫১ খৃষ্টাব্দের আন্তর্জাতিক জমাখরচে, জমার ঘরে ২১.৪২ কোটি টকা উদ্বৃত্তের তুলনায়, ১৯৫১-৫২ খৃষ্টাব্দের আন্তর্জাতিক জমাখরচে ১৫৬.০৮ কোটি টাকা ঘাট্‌তি, সহজে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। সম্প্রতি যে পরিসংখ্যান প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, গত বর্ষে সর্ববিধ পথে পরিবাহিত বৈদেশিক বাণিজ্য-ক্ষেত্রে ভারতের ঘাট্‌তির পরিমাণ হইয়াছিল ২৩২.৭৬ কোটি টাকা। আমদানী বাণিজ্যের মূল্য হইয়াছিল, ৯৬৫.৪০ কোটি টাকা; এবং রপ্তানী বাণিজ্যের মূল্য হইয়াছিল, মাত্র ৭৩২.৬৪ কোটি টাকা। আমাদের প্রতিবেশী ইরাণ, আফগানিস্থান, বর্মা এবং পাকিস্থানের সহিত স্থলপথে বাণিজ্যে আমাদের ঘাট্‌তির পরিমাণ ঘটিয়াছিল ৭৮.২৭ কোটি টাকা। তন্মধ্যে ৭৬.১৬ কোটি টাকা হইতেছে, পাকিস্তানের সহিত আদান-প্রদানের ঘাট্‌তি! পাকিস্তানে প্রেরিত রপ্তানীর মূল্য হইয়াছিল,—মাত্র ২৬.২৬ কোটি টাকা। পরন্তু, পাকিস্তান হইতে আমদানীর মূল্য হইয়াছিল, ১০২.৪২ কোটি টাকা! আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে রপ্তানী বৃদ্ধি দ্বারা জাতীয় অর্থনীতির স্বাস্থ্যকর পরিপুষ্টি হেতু কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি আমদানী ও রপ্তানী নীতির যথোপযুক্ত পরিবর্তন ও সংশোধন সাধন করিয়াছেন। গত দুই বৎসরে ভারতের একুন রপ্তানী ৬০৬.৮৪ কোটি হইতে ৭১৫.৩৩ কোটিতে উন্নীত হইয়াছে।

বিগত কয়েক বৎসরে আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যে বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, যুদ্ধ-পূর্ব এবং যুদ্ধোত্তরকালে আমরা বিদেশ হইতে যে সকল শিল্পজাত পণ্য আমদানী করিতাম, স্বদেশে পরিচালিত শিল্পজাত পণ্য অধিকাংশ স্থলে তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। পণ্যবিশেষে অত্যধিক আমদানী নিবারণ, কিংবা স্বদেশে ঐ পণ্যের উপযুক্ত উৎপাদন-সংঘটন হেতু আমদানী-পণ্যনিয়ন্ত্রণের সমীচীন ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। আমদানী বাণিজ্যে-নিযুক্ত ব্যবসায়ী মহলের মতে, এই পণ্যনিয়ন্ত্রণ ক্রেতা ও শিল্প, এই উভয়ের স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছে ডলার এলাকা হইতে আমদানী সম্পূর্ণ নিরোধ না করিয়া, কেন্দ্রীয় সরকার ডলার এলাকা হইতে ক্রীত পণ্যের অধিকাংশ এখন সহজলভ্য বিনিময় মুদ্রা এলাকা (Soft currency areas) হইতে সংগ্রহ করিতেছে। এই ব্যবস্থার ফলে, দেশাভ্যন্তরীণ দ্রব্য-মূল্যের স্থায়িত্ব সম্পাদিত হইতেছে। পূর্বে আমদানী পণ্যের এবম্বিধ সাময়িক ও সমীচীন নিয়ন্ত্রণ কূট স্বার্থ প্ররোচিত বলিয়া বিবেচিত হইত। অধুনা, ইহা জাতীয় স্বার্থের অনুকূল বিবেচিত হইবে। তিনটি কারণে ডলার এলাকা হইতে আমাদের অত্যধিক পরিমাণে পণ্য আমদানী করিতে হইতেছিল। প্রথম, আমাদের খাদ্যদানার আশু প্রচুর প্রয়োজন; দ্বিতীয়, কতকগুলি অতি-প্রয়োজনীয় শিল্প-সম্পর্কিত কাঁচামালের অভাব-অনটন পরিপূরণ; এবং তৃতীয় শিল্প-সম্প্রসারণার্থ বহুবিধ যন্ত্রপাতি, কলকব্জা ও সাজসরঞ্জামের অপরিহার্য আমদানীকরণ। তিনটি ক্ষেত্রেই কোন অজুহাতে কালক্ষেপ করিবার অবকাশ ছিল না। অধুনা, আমরা যে সকল পণ্য স্বদেশে উৎপাদন করিতেছি এবং যে সকল পণ্যে আমাদের প্রাচুর্যের অভাব নাই, তাহার আমদানী বন্ধ করিয়া, বিদে-

শিক বাণিজ্য জমাখরচে ঘাট্‌তির যথাসম্ভব সঙ্কোচ-সাধন অবশ্য প্রয়োজন। কিন্তু, কোন পণ্যের আমদানী প্রতিরোধ করিলে, তাহার ফলে দেশাভ্যন্তরে ঐ দ্রব্যের মূল্য যাহাতে অযথা বৃদ্ধি না পায়, তাহার উপায় অবলম্বনও একটি কঠিন সমস্যা। তথাপি, আমদানীকৃত পণ্যের মূল্য যোগাইবার সামর্থ্য আমাদের কিরূপ, তাহাও বিশেষ বিবেচ্য। কোন কোন সময়ে, দেশাভ্যন্তরে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিবারণ কল্পে, আমদানী পণ্যের প্রসার বৃদ্ধি করিতে হয়। আমাদের অবরুদ্ধ স্টার্লিং-সংস্থিতি হইতে অধিকতর পরিমাণে স্টার্লিং মুদ্রা প্রাপ্তির প্রয়োজনেও কখন কখন প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক পণ্য আমদানী করিবার প্রয়োজন হয়। কারণ, এই উপায় ব্যতীত অবরুদ্ধ সংস্থিতি হইতে যথোপযুক্ত পরিমাণে স্টার্লিং মুদ্রা লাভ করা যায় না। মুদ্রা মূল্যাবনয়নের পরে, এই হেতু আমাদের আমদানী-বাণিজ্য নীতি যথেষ্ট পরিমাণে উদার করিতে হইয়াছিল। অধুনা, এরূপ প্রয়োজনের অবসান ঘটিয়াছে। কিছুদিন পূর্বে যে আমদানী পরামর্শদাতা সভার (Import Advisory Council) অধিবেশন ঘটিয়াছিল, তাহাতে এই সকল সমস্যার সবিশেষ আলোচনা হইয়াছিল।

১৯৫০ খৃষ্টাব্দে, বিশেষতঃ ইহার শেষার্ধে, ভারতের রপ্তানী-বাণিজ্য বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছিল। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আমাদের ক্রমবর্ধমান ঘাট্‌তি বিদূরণার্থ, কেন্দ্রীয় সরকার সূতি বস্ত্র এবং জনসাধারণের অনতিপ্রয়োজনীয় ব্যবহার্য দ্রব্যের আমদানী কঠোরভাবে হ্রাস করিয়াছিল; এবং যে পর্যন্ত খাদ্যশস্য-ফসলের স্বল্পতা প্রকট না হইয়াছিল, ততদিন খাদ্যদানার আমদানীও হ্রাস করিতে হইয়াছিল। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের তুলনায় যন্ত্রপাতি কলকব্জা এবং কলকারখানার সাজসরঞ্জামের আমদানীও হ্রাস পাইয়াছিল। মূলধনাত্মক প্রধান প্রধান পণ্যের (Capital goods) আমদানীও হ্রাস পাইয়াছিল। ইতিমধ্যে, অবশ্য, এই শ্রেণীর পণ্যের উৎপাদনও আমাদের দেশে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। জাতীয় উৎপাদন এবং আয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও, পণ্যদ্রব্যের কাট্‌তি (consumption) কিঞ্চিৎ কম হইয়াছিল; এবং ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের প্রথমার্ধে এইরূপ চাহিদার অভাব অধিকতর প্রকট হইয়াছিল। যোগানের অপ্রাচুর্যই এই চাহিদা-হ্রাসের হেতু। কারণ, ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে খাদ্যসামগ্রীর, এবং ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের প্রথমার্ধে সূতিবস্ত্রের অভাব অনটন তীক্ষ্ণ ও তীব্র রূপ ধারণ করিয়াছিল। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে আমাদের আমদানীর পরিমাণ হইয়াছিল, ৮৫০ কোটি টাকা; এবং রপ্তানী বাণিজ্যের মোট মূল্য হইয়াছিল, ৭৫০ কোটি টাকা; সুতরাং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য জমাখরচে আমাদের ঘাট্‌তির পরিমাণ হইয়াছিল,—১০০ কোটি টাকা। আমদানী পণ্যের প্রকৃষ্টাংশ ছিল, খাদ্য দানা ও খাদ্য সামগ্রী,—১৮০ কোটি টাকা, পাট ও কার্পাস ১৮০ কোটি টাকা, যন্ত্রপাতি ৮০ হইতে ৯০ কোটি টাকা; এবং পেট্রোলিয়াম সংক্রান্ত দ্রব্যাদি ৭০ কোটি টাকা। ১৯৫০-৫১ খৃষ্টাব্দের বৈদেশিক বাণিজ্যে আমাদের ঘাট্‌তির পরিমাণ ছিল ৯৪.৪৮ কোটি টাকা। পূর্ব বৎসরের তুলনায়, ১৯৫০-৫১ খৃষ্টাব্দের ঘাট্‌তির স্বল্পতা ঘটিয়াছিল, অধিকতর পরিমাণে সূতি বস্ত্র, তৈল, চা, ধূনা, লাক্ষা, পশম এবং পশম-নির্মিত দ্রব্যাদি, তামাক, ফল এবং শাকসব্‌জীর রপ্তানী বৃদ্ধি হেতু। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে ভারতের আন্তর্জাতিক কারকারবারে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বিষয় ছিল এই যে, রপ্তানী ও আমদানী উভয়ের মূল্য-সমষ্টি অচিন্ত্যপূর্ব রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। রপ্তানী-বাণিজ্যের একুন-মূল্য দাঁড়াইয়াছিল, ৭৩০.৫ কোটি টাকা; এবং আমদানী-বাণিজ্যের মোট মূল্য হইয়াছিল, ৮৭০.২ কোটি টাকা। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে এই উভয় অঙ্কের পরিমাণ ছিল, যথাক্রমে ৫৮৭.১ কোটি এবং ৫৫৯.০ কোটি টাকা। ফলে, বাণিজ্য জমাখরচের ২৮.১ কোটি উদ্বৃত্ত জমার অঙ্ক, ১৩৯.৭ কোটি ঘাট্‌তিতে পরিণত হইয়াছিল! কিন্তু, ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে, ভারতের চল্‌তি কারবারের দায়-দেনা পরিশোধ করিয়া, ৬৭.৫ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত দাঁড়াইয়াছিল। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে আমাদের চল্‌তি কারবারের দায়-দেনা পরিশোধ করিতে ৯৩.৫ কোটি টাকা ঘাট্‌তি দাঁড়াইয়াছিল। সুতরাং, চল্‌তি হিসাবে (Current account) মোট ঘাট্‌তির পরিমাণ হইয়াছিল, ১৫১ কোটি টাকা। অবশ্য, এই দুইটি বৎসর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে গুরু পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। কোরিয়ার যুদ্ধই এই পরিবর্তনের জন্য দায়ী ছিল। ইহা অবশ্যই স্বীকার্য যে, ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের উদ্বৃত্ত অঙ্ক যে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ছিল; তাহা নহে। পরন্তু মূলধনাত্মক, অর্থাৎ যন্ত্রপাতি প্রভৃতি দ্রব্যাদির আমদানীর খর্ব করিয়া, এই উদ্বৃত্ত লভ্য হইয়াছিল। এই হেতু ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় সরকারকে আমদানী নিয়ন্ত্রণ নিয়ম-কানুনের কঠোরতা শিথিল করিতে হইয়াছিল। তাহার ফলে বাণিজ্য-জমাখরচের অঙ্ক আমাদের প্রতিকূল হইয়াছিল। এই স্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে

আমাদের দুই মিলিয়ন টন খাদ্যদানা আমদানী করিতে হইয়াছিল। ইহা স্বাভাবিক বাৎসরিক তিন মিলিয়ন টন খাদ্যদানা আমদানীর তুলনায় কম ছিল। কিন্তু, ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে, আমাদিগকে খাদ্যদানা আমদানী করিতে হইয়াছিল,—২০০ কোটি টাকা মূল্যে ৪.৭ মিলিয়ন টন। পরিমাণ ও মূল্য উভয়ই ছিল, অত্যুচ্চ। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে, আমাদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ঘাটতি ঘটিয়াছিল,—স্টার্লিং এলাকা বহির্ভূত দেশসমূহের সহিত আদান-প্রদানে। ষ্টার্লিং এলাকার অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের সহিত বাণিজ্যে, আমাদের অনুকূল উদ্বৃত্ত জমার অঙ্ক হইয়াছিল, তৎপূর্ব বৎসর অপেক্ষা অধিকতর,—যদিও, ঐ বৎসর ষ্টার্লিং এলাকার অন্তর্ভুক্ত পাকিস্তানের সহিত কারবারে,—১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ২ কোটি টাকা ঘাটতির তুলনায়, ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে আমাদের প্রতিকূল ঘাটতির পরিমাণ হইয়াছিল, প্রায় ৪৭ কোটি টাকা। পাকিস্তানের অঙ্ক না ধরিলে, ভারতের অনুকূল উদ্বৃত্ত, ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের অঙ্ক, ৬১.৩ কোটি টাকার তুলনায় দাঁড়াইয়াছিল ১১২ কোটি টাকা।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, এরূপ ক্ষেত্রে ভারতের পক্ষে ষ্টার্লিং এলাকার অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকিবার ফল কি? তাহার প্রত্যুত্তর এই যে, ষ্টার্লিং এলাকার তুলনায়, ডলার এলাকাতে (Hard currency countries) আমাদের প্রতিকূল পরিবর্তন আরও গুরুতর। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে এই এলাকার সহিত চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত (Current account surplus) ছিল ২৩.২ কোটি টাকা। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে এই উদ্বৃত্ত রূপান্তরিত হইয়া ৫৬.৭ কোটি টাকা ঘাটতিতে দাঁড়াইয়াছিল। অন্যান্য এলাকার সহিত কারবারে, ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে, ভারতের বাণিজ্য-ঘাটতির পরিমাণ ছিল, ২৫ কোটি টাকা। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে, এই অঙ্ক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া, ৮২.৪ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। বিবিধ পণ্যদ্রব্যের রপ্তানী বাণিজ্যের সংখ্যা সঙ্কলন হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ২৮৩,৫০০ টনের তুলনায়, ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে ডলার এলাকা আমাদের নিকট হইতে ২৫০,০০০ টন পাট প্রস্তুত দ্রব্যাদি লইয়াছিল। চা এবং ম্যাঙ্গানীজ মল ধাতুর (Ore) রপ্তানী ও ঐ দুই বৎসর ডলার এলাকায় কম হইয়াছিল। গোলমরিচ, অভ্র, লাক্ষা, কাঁচা কার্পাস এবং চীনাবাদামের তৈল প্রভৃতি অন্যান্য পণ্যের কাটতি ঐ অঞ্চলে, ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের তুলনায় অধিক হইয়াছিল। পক্ষান্তরে, সূতিবস্ত্রের চাহিদা বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে মাত্র ১১ মিলিয়ন গজের পরিবর্তে, ডলার-এলাকা, ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে লইয়াছিল ৮৫ মিলিয়ন গজ। ভারত হইতে আমদানী-কৃত পণ্যের মধ্যে সূতি-বস্ত্র একটি নূতন জিনিষ। একথাও এখানে বলা কর্ত্তব্য যে, ডলার-এলাকায় পাট প্রস্তুত দ্রব্যের রপ্তানীর ঘাটতি, অন্যান্য এলাকায় অধিক-তর রপ্তানী দ্বারা পরিপূরণ হইয়াছিল। ডলার-এলাকা ৩৩,০০০ টন কম পাট প্রস্তুত দ্রব্যাদি লইয়াছিল; কিন্তু অন্যান্য এলাকা ঐ বৎসর ১২৭,০০ টন মাল অধিক লইয়াছিল। চা-এর ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে ডলার-এলাকা ম্যাঙ্গানীজ-মলধাতু কম লইয়াছিল; তাহার কারণ তৎপূর্ব বৎসর তাহারা ঐ পণ্য প্রচুর পরিমাণে আমদানী করিয়াছিল। বৈদেশিক বাণিজ্যের বর্তমান সংখ্যা-সঙ্কলন হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, চলতি হিসাবের দেনা-পাওনার ক্ষেত্রে, ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের শেষার্ধে, ষ্টার্লিং এলাকার সহিত কারবারে, আমাদের উদ্বৃত্ত জমার পরিমাণ হইয়াছিল, ৩৬.৯ কোটি টাকা; কিন্তু, অন্যান্য এলাকার সহিত কারবারে ঐ ষণ্মাসে আমাদের ঘাটতির পরিমাণ হইয়াছিল—আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক-প্রদত্ত ঋণ এবং মার্কিণ-প্রদত্ত গম-ঋণের ব্যবহৃত অংশের সুযোগ-সুবিধা সত্ত্বেও, ৭৯.২ কোটি টাকা। সুতরাং, আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা কল্পে, ষ্টার্লিং-এলাকার অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকি-বার এখনও বিলক্ষণ প্রয়োজন আছে বৃটেনের সহিত আমাদের বহুদিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। স্বাধীনতার পূর্বে পর্যন্ত আমাদের রৌপ্যমুদ্রার মূল্য ও মান নির্ণীত হইত ষ্টার্লিং মুদ্রামূল্য-মানের নিরিখে। আমাদের আদান-প্রদান তদানীন্তন শাসক জাতির সহিতই অধিক ছিল। ব্যবসার ক্ষেত্রে বৃটেনের সততা এবং বৃটিশ পণ্যের উৎকর্ষ চিরদিন অবিসম্বাদিত। আমাদের সর্ববিধ শিক্ষাদীক্ষা বৃটেনের পরিচালনাধীন ছিল। সুতরাং, এ সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করা আমাদের জাতীয় স্বার্থের অনুকূল নহে। বৃটেনের সহিত মৈত্রী আমাদের দৃঢ় প্রয়োজন। এখনও আমাদের লেনদেন এবং কারকারবার বৃটেনের সহিত সমধিক; এবং অপরিহার্য। বৃটিশ-প্রবর্তিত রাষ্ট্র-সাধারণতন্ত্রের সহিতও আমাদের কারকারবার প্রচুর। গত খৃষ্টাব্দে এই কার-কারবার বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে সাধারণ-তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহ হইতে আমরা ৪৫৫ মিলিয়ন পাউণ্ড অর্থাৎ ৬০৬ কোটি টাকার পণ্য আমদানী করিয়া-ছিলাম। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে, এই অঙ্ক, ৬৪৭ মিলিয়ন

পাউণ্ডে, অর্থাৎ ৮৬২ কোটি টাকায় উন্নীত হইয়াছিল। আমাদের রপ্তানী, ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ৩৪৫ মিলিয়ন পাউণ্ডের অর্থাৎ ৪৬০ কোটি টাকার তুলনায়, ৫৬৮ মিলিয়ন পাউণ্ডে, অর্থাৎ ৭৫৭ কোটি টাকায় উন্নতি লাভ করিয়াছিল। সুতরাং, বৃটিশ প্রভাবান্বিত হইলেও, রাষ্ট্র-সাধারণতন্ত্রের সহিত ঘনিষ্ঠতা আমাদের অতীব প্রয়োজন।

স্বাধীনতা অর্জনের পর হইতে, আমাদের বাণিজ্য-নীতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়াছে। তথাপি ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দ হইতে বৃটিশ পণ্যের শ্রেষ্ঠ ক্রেতৃবর্গের মধ্যে, আমরা তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছি; এবং বৃটেন যে-সকল দেশ হইতে পণ্য ক্রয় করে, তাহাদের মধ্যে, ভারতের স্থান চতুর্থ; এবং এই আদান-প্রদানের পরিমাণ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে, বৃটেন কর্তৃক ভারতে প্রেরিত পণ্যের মোট মূল্য হইয়াছিল, ১১৫ মিলিয়ন পাউণ্ড, অর্থাৎ ১৫৩ কোটি টাকা। ঐ বৎসর বৃটেন, অষ্ট্রেলিয়ায় পাঠাইয়াছিল, ৩২৪ মিলিয়ন পাউণ্ড মূল্যের পণ্য; দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠাইয়াছিল, ১৬৫ মিলিয়ন পাউণ্ড মূল্যের পণ্য; এবং ক্যানাডায় পাঠাইয়াছিল, ১৩৭ মিলিয়ন পাউণ্ড মূল্যের পণ্য। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে বৃটেন ভারত হইতে লইয়াছিল ১৫৩ মিলিয়ন পাউণ্ড, অর্থাৎ ২০৪ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য; ক্যানাডা হইতে আমদানী করিয়াছিল, ২৬১ মিলিয়ন পাউণ্ড মূল্যের দ্রব্যাদি; অষ্ট্রেলিয়া হইতে লইয়াছিল, ২৫২ মিলিয়ন পাউণ্ড মূল্যের দ্রব্যসামগ্রী; এবং নিউ-জীল্যাণ্ড হইতে ক্রয় করিয়াছিল, ১৬৫ মিলিয়ন পাউণ্ড মূল্যের পণ্য। উপনিবেশগুলির সহিত বৃটেনের বাণিজ্যের পরিসর অবশ্য আরও অধিক। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ৪৮ মিলিয়ন পাউণ্ড মূল্যের পণ্যের তুলনায়, ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে, বৃটেন উপনিবেশগুলিতে প্রেরণ করিয়াছিল, ৩৫৮ মিলিয়ন পাউণ্ড মূল্যের পণ্য; এবং, ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে, উপনিবেশগুলি হইতে ক্রীত ৫৭ মিলিয়ন পাউণ্ড মূল্যের পণ্যের তুলনায়, ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে, উপনিবেশগুলি হইতে বৃটেন ক্রয় করিয়াছিল, ৫৭২ মিলিয়ন পাউণ্ড মূল্যের পণ্য। ভারতের অধিকার বিচ্যুতির পর, উপনিবেশগুলি হইতেছে বৃটেনের কাঁচামাল সংগ্রহের এবং বৃটিশ পণ্য-বিক্রয়ের প্রশস্ত ক্ষেত্র।

স্বাধীনতা অর্জনের পর, আমেরিকার সহিত আমাদের কারকারবার বাড়িতেছে,—বিশেষতঃ খাদ্য দানা, এবং যন্ত্রপাতি আমদনীর নিমিত্ত। বৃটেনের আর্থিক অস্বচ্ছলতার নিমিত্ত আমরা বৃটেনের করায়ত্ত আমাদের ষ্টার্লিং-সংস্থিতি হইতে আমাদের প্রয়োজনের উপযোগী অর্থ পাইতেছি না; পাইলে, ষ্টার্লিং-এর বিনিময়ে ডলার সংগ্রহ করিয়া, আমরা মার্কিণ হইতে অধিকতর পরিমাণে যন্ত্রপাতি এবং আমাদের দেশে পাওয়া যায় না এমন কাঁচামাল সংগ্রহ করিয়া, আমাদের দেশের পুরাতন ও নূতন উভয়বিধ শিল্পের প্রসার বৃদ্ধি করিতে পারিতাম। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ আমাদের ষ্টার্লিং সংস্থিতির পরিমাণ ছিল ৭২৩ কোটি টাকা। এই টাকার উপর আমরা শতকরা ১½ হইতে ২½ অংশ সুদ পাই। জুন, ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত, এই সুদের পরিমাণ হইয়াছিল, ৫৩.৭ কোটি টাকা। এই সংস্থিতি হইতে আমরা প্রতি বৎসর ৮০ কোটি টাকা পাইতে পারি। প্রধানতঃ খাদ্য দানা এবং যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতেই এই অর্থ ব্যয় হইতেছে।

১৯৫১ খৃষ্টাব্দে আমরা, তৎপূর্ব বৎসরের ২৫৯.১ মিলিয়ন ডলারের (প্রতি ডলার=৪৸৹ আনা) তুলনায়, ২৯৬.৫ মিলিয়ন ডলার মূল্যের পণ্য আমেরিকায় প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং ঐ বৎসর আমরা তৎপূর্ব বৎসরের ২১২.৫ মিলিয়ন ডলারের তুলনায় ৪৬৪.৩ মিলিয়ন ডলার মূল্যের দ্রব্যাদি আনয়ন করিয়াছিলাম। আমদানী পণ্যের মধ্যে গমই শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল; ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের তিন মিলিয়ন বুশেলের (প্রতি বুশেল=৵৯৷৷ সের) তুলনায় ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের ৮৪ মিলিয়ন বুশেল; টাকার অঙ্কে ৬ মিলিয়ন ডলার হইতে ১৭৭ মিলিয়ন ডলার। আমদানী পণ্যে কাঁচা কার্পাস দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল;—১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ৭৪ মিলিয়ন ডলারের তুলনায় ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে ১২৭ মিলিয়ন ডলার। রপ্তানী পণ্যে, কাঁচা পাট শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ৭৬.৬ মিলিয়ন ডলারের তুলনায় ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে ৯০.৫ মিলিয়ন ডলার। মরিচ ও চা-এর রপ্তানী হইয়াছিল কম। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ৩৬.৮ মিলিয়ন ডলার মূল্যের মরিচের তুলনায়, ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে আমরা আমেরিকাতে পাঠাইয়াছিলাম ৩৪.২ মিলিয়ন ডলার মূল্যের মরিচ। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ১৯.৮ মিলিয়ন ডলার মূল্যের চা-এর তুলনায়, ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে আমরা আমেরিকায় পাঠাইয়াছিলাম মাত্র ১৫.৭ মিলিয়ন ডলার মূল্যের চা। অভ্রের রপ্তানী ও অধোগতি লাভ করিয়াছিল। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ২০.৬ মিলিয়ন ডলারের তুলনায়, গত খৃষ্টাব্দে আমরা আমেরিকায় পাঠাইয়াছিলাম,

৯৭.৫ মিলিয়ন ডলার মূল্যের অভ্র। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উভয়-বিধ চর্মের ক্ষেত্রে, আমাদের রপ্তানী কিছু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল : ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ১২.১ মিলিয়ন ডলারের তুলনায় গত খৃষ্টাব্দে আমরা পাঠাইয়াছিলাম, ১৬ মিলিয়ন ডলার মূল্যের মাল। ভারত হইতে প্রেরিত অন্যান্য রপ্তানীর মধ্যে ছিল,—ম্যাঙ্গানীজ, বাদাম, লাক্ষা এবং পাতগালা। সাধারণতঃ আমরা মরিচ, আদা, এলাচি, বেনাঘাস (Lemon grass) এবং কেশুদানা (Cashew) বিক্রয় করিয়া ডলার মুদ্রা অর্জন করি। আমাদের বর্তমান প্রয়োজন সাধনার্থ ষ্টার্লিং-এর তুলনায় ডলার মুদ্রারই আমাদের তীব্রতর অভাব-অনটন।

অনেকের ধারণা আছে যে, বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনে, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি কোন-কোন দেশের অসঙ্গত প্রভাবের অধীন। এ ধারণা অতীব ভ্রমাত্মক। যে-কোন অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি নিরপেক্ষভাবে আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের সংখ্যা-সঙ্কলন আলোচনা করিলে এবং বিশেষতঃ পোলাণ্ড ও জেকোস্লোভাকিয়া দেশদ্বয়ের সহিত আমাদের আদান-প্রদানের অঙ্ক বিচার-বিবেচনা করিলে দেখিতে পাইবেন যে, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার সর্বদেশের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যের অবাধ পরিচালনের প্রচেষ্টায় প্রযত্নশীল। স্বাধীনতা অর্জনের পর ভারতই আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক এবং আন্তর্জাতিক ধন-ভাণ্ডারদ্বয়কে য়ুরোপে প্রাচ্য-প্রতীচ্য বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অবহিত করিয়াছিল। ইহা ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারত কোন ইতরবিশেষমূলক (Discriminatory) নীতির প্রশ্রয় দেয় নাই। পোলাণ্ড এবং জেকোস্লোভাকিয়ার সহিত ভারতের কয়েকটি বাণিজ্য-চুক্তি আছে; এবং যে-কোন-দেশ ভারতের সহিত বাণিজ্য করিতে ইচ্ছুক, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার সেই সেই দেশের সহিতই বাণিজ্য-সম্বন্ধ সংস্থাপনে প্রস্তুত। তাঁহারা কোন দেশকেই আমাদের বাণিজ্য-স্বাধীনতা খর্ব করিতে দিতে প্রস্তুত নহেন। যে-কোন দেশের সহিত ইচ্ছা, তাঁহারা বাণিজ্য করিতে কৃতসঙ্কল্প ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, দ্বন্দ্ব-বিরোধ সত্ত্বেও, বাণিজ্য-ক্ষেত্রে, ভারত পাকিস্তানের সহিত চুক্তির পর চুক্তি করিয়া আমাদের সদ্ভাব ও সদ্ব্যবহারের অবিসম্বাদিত পরিচয় দিতেছে। রাশিয়ার সহিতও ভারত বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপনে প্রস্তুত। সম্ভবতঃ ভারতের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করিবার উপযুক্ত উদ্বৃত্ত পণ্য রাশিয়ার নাই। বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর রাশিয়া নিজেই মুস্কিলে পড়িয়াছিল; এবং আমরা সকলেই জানি, রাশিয়া কিরূপ দৃঢ়তার সহিত তাহার পুনর্গঠন প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিল। রাশিয়ায় বাণিজ্য রাষ্ট্র পরিচালিত, ভারতে রাষ্ট্র-পরিচালিত বাণিজ্য (State trading) নাই। ভারতে রাশিয়ার একজন বাণিজ্য-প্রতিভূ আছেন। কিন্তু রাশিয়াতে ভারতের কোন বাণিজ্য-প্রতিনিধি নাই। তাহার দুইটি কারণ। রাশিয়ার রাষ্ট্র-পরিচালিত বাণিজ্য-সম্প্রসারণ হেতু ভারতের বণিক-সম্প্রদায়ের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্রব রাশিয়ার একান্ত প্রয়োজন; নতুবা, ভারতের রপ্তানী-পণ্যের পরিমাণ এবং প্রকার-ভেদ তথ্য যথাযথরূপে অবগত হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। রাশিয়াতে বাণিজ্য-দূত পোষণ ভারতের পক্ষে ব্যয়সাধ্য ব্যাপার; এবং সে ব্যয়ের কোন সার্থকতা নাই। যে-সকল দেশে ভারতের দূতাবাস আছে, তাহার সর্বত্র ভারতের বাণিজ্য-প্রতিনিধি নাই। সেই সকল দেশে রাষ্ট্র-দূতই তথাকার পণ্য প্রকরণের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। উপযুক্ত পরিমাণে বাণিজ্যের আদান-প্রদান সম্ভাবনা আশাপ্রদ না হইলে, কোথাও বাণিজ্য-দূত রাখিবার সার্থকতা নাই। আমাদের দেশে অবশ্য রাশিয়ার সহিত বাণিজ্যের উপর কোন নিষেধাজ্ঞা (Embargo) নাই। সম্প্রতি আমরা ৫০০০ মেট্রিক টন চা-এর বিনিময়ে ১০,০০০ টন গম রাশিয়া হইতে পাইয়াছিলাম। বস্তুতঃ রাশিয়ার সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যে ভারতের কোন বাধা বা নিষেধ নাই সম্প্রতি বোম্বাই নগরে একটি প্রদর্শনীতে ২২ লক্ষ মুদ্রা মূল্যের রাশিয়া দেশোৎপন্ন পণ্য বিক্রয় হইয়াছিল। এই অর্থ রাশিয়ায় প্রেরিত হইয়াছিল কিংবা অন্য কোথাও ব্যয়িত হইয়াছিল, তাহা অবশ্য আমাদের অজ্ঞাত। ১৯৪৮-৪৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৫১-৫২ খৃষ্টাব্দ,—এই চারি বৎসরে, একমাত্র ১৯৪৯-৫০ খৃষ্টাব্দ ব্যতীত, রাশিয়ার সহিত বাণিজ্যে ভারতের উদ্বৃত্ত জমাই প্রবল ছিল। ১৯৪৯-৫০ খৃষ্টাব্দে, বাণিজ্য জমাখরচে ভারতের ঘাটতির পরিমাণ হইয়াছিল ১২.৯৪ লক্ষ টাকা। ১৯৫১-৫২ খৃষ্টাব্দে, জমার ঘরে ভারতের উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল, ৫.৫৬ লক্ষ টাকা।

এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, মহাচীন কর্তৃক তিব্বৎদেশ অধিকৃত হইবার ফলে, উক্ত দেশের সহিত আমাদের রপ্তানী বাণিজ্য কি পরিমাণে অভিভূত হইবে, তাহা বলা দুঃসাধ্য। আপাতত আমরা দেখিতেছি যে, তিব্বৎ, সিকিম ও ভুটান—এই তিন সীমান্ত দেশে আমাদের রপ্তানী পণ্যের পরিমাণ ১৯৫০-৫১ খৃষ্টাব্দের ১৫৬,৩০৯ মণের

তুলনায়, ১৯৫১-৫২ খৃষ্টাব্দে ১২২,৬৭৭ মণে অধোগতি লাভ করিয়াছিল। অবশ্য এই সকল রাজ্যের সহিত ব্যবসায় সম্পর্ক দৃঢ়তর করিবার নিমিত্ত কেন্দ্রীয় সরকার প্রযত্নশীল রহিয়াছেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ভারতবর্ষই ছিল একমাত্র দেশ, যাহা নিট বৈদেশিক আর্থিক সাহায্য (Net financial assistance) লয় নাই। অবশ্য ভারত ইজারা-ঋণ (Land-lease) পরিকল্পনা হইতে কিছু সাহায্য পাইয়াছিল। সুতরাং, ভারত যে নিট বৈদেশিক অর্থ সাহায্য লয় নাই, ইহা ভারতের পক্ষে গৌরবের বিষয়। অধুনা, অবশ্য, ভারত তাহার উন্নয়ন-পরিকল্পনা সম্পর্কে বৈদেশিক অর্থ-সাহায্য লইতেছে। এবং যে-কোন মৈত্রী-সম্পন্ন দেশ (Friendly country) হইতে ভারত এখন সাহায্য লইতে প্রস্তুত। যে-কোন পরদেশ এখন ভারতকে সাহায্য প্রদান করিতে পারে। যে-কোন পরদেশের নিকট হইতে ভারত আর্থিক এবং শিল্প-বিদ্যাবিষয়ক, অর্থাৎ শিল্পের উৎপাদন-বৃদ্ধি-কৌশল বিষয়ক সাহায্য (Technical and "know-how" assistance) লইতে সমুৎসুক। কিন্তু জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কোন প্রকার সাহায্যই কেন্দ্রীয় সরকার লইতে প্রস্তুত নহে। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, বৈদেশিক অর্থ সাহায্য দ্বারা উন্নয়ন কিংবা অন্য কোন পরিকল্পনা পরিপুষ্ট করিতে আমাদের স্বাধীন স্বাবলম্বন বৃত্তির কিছু হানি ঘটে, কিন্তু, যেখানে আমাদের শক্তি সামর্থ প্রয়োজনানুরূপ দ্রুতগতি দ্বারা সম্পাদন সম্ভবপর নহে, সেখানে পরদেশী সাহায্য লওয়াই অতীব কর্তব্য ও সমীচীন। আমাদের দেশ সম্পূর্ণরূপে আত্মশক্তি ও সামর্থ্য বিনিয়োগ করিয়া দেশের ও দশের উন্নতি ও কল্যাণ সাধনে দৃঢ়ব্রতী—এই বিশ্বাস স্থাপিত হইলে, পরদেশী ধনিক ও বণিকগণ এদেশে মূলধন বিনিয়োজনে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইবে। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে স্বাধীনতা ঘোষণা হইতে ভারতে বৈদেশিক ধন-বিনিয়োজনের একুন মূল্য হইতেছে,—১০·৯৬ কোটি টাকা। তন্মধ্যে ৯.৭৯ কোটি টাকা আসিয়াছে বৃটেন হইতে। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে আমাদের মূলধন বিনিয়োজন শাসক (Controller of Capital Issues) ১৫.০৮ কোটি পরিমাণ বৈদেশিক মূলধন ভারতে বিনিয়োজনের অনুমতি দিয়াছিল। ঐ বৎসর ৫৯·৫৫ কোটি পরিমাণ ভারতীয় মূলধন-ও স্বদেশ-পরিচালিত কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যে নিয়োজিত হইবার অনুমতি লাভ করিয়াছিল। ভারতে বৈদেশিক মূলধন-বিনিয়োজনের দুইটি প্রধান সর্ত আছে। প্রথম, লভ্যাংশ বিদেশে প্রেরণের কোন বাধা থাকিবে না। দ্বিতীয়, স্টার্লিং-এলাকা হইতে বিনিযুক্ত মূলধন স্ব স্ব দেশে পুনঃ প্রেরণের (Repatriation) কোন বাধা থাকিবে না। কিন্তু স্টার্লিং-এলাকা-বহির্ভূত-দেশ-নিয়োজিত ধনসম্পদের আদিম-মূলধন মাত্র নিয়োগকর্তার স্বদেশে পুনঃ প্রেরণের জন্য সরকার সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিবেন; কিন্তু তদতিরিক্ত ধনসম্পদের ভারত হইতে অপসরণ নির্ভর করিবে, আমাদের আয়ত্তাধীন-বিনিময়োপযোগী বৈদেশিক-মুদ্রা-প্রকরণ-সংস্থানের উপর (Availability of Foreingn Exchange Resources)। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাস হইতে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দেরডিসেম্বর পর্যন্ত, ৫২·৬ কোটি পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ভারত হইতে বিনিয়োজনকারীর স্বদেশে পুনঃ প্রেরিত হইয়াছে। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুন, ৩২০·৪২ কোটি পরিমিত বৈদেশিক মূলধন ভারতে বিনিযুক্ত ছিল। তন্মধ্যে, ২৯২.৬৯ কোটি টাকা নিযুক্ত ছিল—সরকারী খৎ-তমসুকে। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারতে নিয়োজিত বৈদেশিক মূলধনের যে পরিসংখ্যান করিয়াছিল, তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, যৌথ কারবারের আদায়-কৃত মূলধনের ভিত্তিতে, চা-শিল্পে নিযুক্ত বৈদেশিক মূলধনের পরিমাণ, শতকরা ৭৪·৭ অংশ; পাট-শিল্পে নিযুক্ত বৈদেশিক মূলধনের পরিমাণ, শতকরা ২৪.২ অংশ; এবং পাথুরিয়া কয়লা-শিল্পে নিযুক্ত বৈদেশিক মূলধনের পরিমাণ, শতকরা ১৩·১ অংশ। এই প্রসঙ্গে শিল্প-বাণিজ্যে অনুরক্ত ব্যক্তি-বর্গের অবগতির নিমিত্ত আমাদের লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন যে পরদেশে বিনিযুক্ত ভারতীয় মূলধনের পরিমাণ ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুন তারিখে ছিল, ৩৮·৭৭ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে পাকিস্থানে বিনিযুক্ত ছিল, ১৩.৮৮ লক্ষ টাকা; যুক্ত রাজ্যে নিবদ্ধ ছিল, ৯·২৫ লক্ষ টাকা; বর্মায় নিযুক্ত ছিল, ৫·৯৫ লক্ষ টাকা; সিংহলে প্রযুক্ত ছিল, ২.৮৩ লক্ষ টাকা; এবং ফরাসী ইন্দো-চীনে খাটিতে ছিল, ২·০৩ লক্ষ টাকা। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে, আমাদের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ছিল, ৯৯·৫৫ কোটি টাকা। এই অঙ্কের ৭৭ কোটি ছিল, যুক্তরাষ্ট্র হইতে গম ক্রয় করিবার নিমিত্ত গৃহীত ৯০ কোটি ঋণের অংশ; ২১·৫ কোটি ছিল, পুনর্গঠন এবং রেলপথ ও কৃষিকার্য উন্নয়ন এবং দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা প্রভৃতির নিমিত্ত আন্তর্জাতিক ধন প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত অর্থের অংশ এবং ১.৩৫ কোটি ছিল,—আমাদের স্টার্লিং-ঋণের বক্রী।

যদিও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে, ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ন্যায়, আমাদের অনুকূল হয় নাই; তথাপি ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে

আমাদের পণ্য-উৎপাদন প্রায় সর্বক্ষেত্রে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, পূর্ব বৎসরের তুলনায়, শতকরা ১০ অংশ অধিক পরিমাণে। কাঁচামালের রপ্তানী কমাইয়া, পাকামাল, অর্থাৎ পরিণত পণ্যের (Manufactured goods) রপ্তানী বৃদ্ধি দ্বারা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য জমা-খরচে আমাদের উদ্বৃত্ত জমার অঙ্ক বৃদ্ধি করাণই আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতির মূল সূত্র। উভয়ক্ষেত্রেই আমাদের উৎপাদন বৃদ্ধি করিলে, বেকার সমস্যার সমাধান হইবে; এবং কৃষি-শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে আমাদের প্রসার-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইবে। দেশ দ্বিধা-বিভক্ত করিয়া স্বাধীনতা অর্জনের পশ্চাতে, ইহাই আমাদের একমাত্র কাম্য ও কর্তব্য। অর্থনীতি ক্ষেত্রে উন্নতি ব্যতীত, রাজনীতি ক্ষেত্রে অভ্যুদয় অসম্ভব। রাজনীতি অর্থনীতির সমানুপাতে প্রগতিশীল।

★

বোনচে সোয়েগ

ইসাক্ লোয়েব পার্জ : অনুবাদ—অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

[১৮৫২-১৯১৫—কলম ধরবার পূর্বে লেখক একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। পোল্যাণ্ডে থাকার সময় ইহুদী সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁদের মর্মকথা তুলে ধরবার জন্য লেখনী চালনা করেন। "Hasidim" সমাজ এবং জীবনের জীবন্ত আলেক্ষ্য ছোট গল্পের সাহায্যে যা পরিবেশন করে গেছেন তা যেমন জীবন্ত তেমনি বলিষ্ঠ। বিশ্বের যে কোন সাহিত্যে তা গৌরবের সামগ্রী। বহু ভাষায় তাঁর এই গল্প-গুলি অনূদিত হয়েছে]

ট্রামের ঘোড়ার যদি পড়ে গিয়ে মৃত্যু হ'ত, বোধ হয় এর চেয়ে ঢের বেশী চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'ত।

কিন্তু বোনচে সোয়েগের মৃত্যু এই পরিবর্তনশীল জগতে কোন দাগই রেখে যেতে পারল না।

যে কোন লোককে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, যে এই বোনচে সোয়েগ কে ছিল, কি করত, কি ভাবে তার মৃত্যু ঘটল, হৃদয়যন্ত্র বিকল হয়ে, না তিলে তিলে নিজের জীবনী-শক্তি ক্ষয় করে, না এই জগতে ভার বহন করতে না পেরে, তো, বোধ হয় কেউই সঠিক উত্তর দিতে পারবে না।

আমরা জানি। ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে তার মৃত্যু ঘটেছে। আহা। বেচারী বোনচে সোয়েগ!

বোনচে সোয়েগ এ সংসারে একা অজ্ঞাতবাস করে লোকের অগোচরে, উপেক্ষিত হয়ে, অজানা ভাবেই এ জগত থেকে বিদায় নিল। সমুদ্র তীরের অসংখ্য বালুকনার মতই সে এসেছিল এবং সমুদ্র-ঝোড়ো-হাওয়ার বালুকনার মতই সে অদৃশ্য হ'ল। তার মৃত্যুর পর কোন রকমে একটু গর্ত খুঁড়ে তাকে শোয়ান হ'ল কিন্তু বাতাসের সঞ্চিত ধুলোর পাতায় তার কবরের চিহ্ন যে কোথায় মিলিয়ে গেল কেউ বুঝতে পারলে না।

যেন একটি ছায়া। কোন রকম চিহ্ন না রেখে অন্ধকারেই মিলিয়ে গেল। সংসারে যদি চাঞ্চল্যের অভাব থাকত, হয়তো কেউ বলতে পারত যে ভার বহনের চাপে তার মেরুদণ্ড বেঁকে গিয়েচে। যদি জগতে লোক একটু কম ব্যস্ত থাকত তো বলতে পারত যে তোবড়ান গাল আর কোটরগত চক্ষু নিয়ে সে ঘুরে বেড়াত এমন কি যখন তার স্কন্ধে ভার থাকত না তখনও সে যেন ভারে নুয়ে পড়েচে। তাকে দেখে মনে হ'ত সে যেন মৃত্যুর জন্য হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

হাসপাতালে যখন বোনচেকে নিয়ে যাওয়া হ'ল দেখা গেল তার মত সহস্র সহস্র অজ্ঞাত মুমূর্ষু একটু খালি জায়গার জন্য অপেক্ষা করচে। যখন তার দেহ মর্গে স্থানান্তরিত হ'ল, সেখানে ক্ষত বিক্ষত অসংখ্য দেহ পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করচে। তার পর যখন কবর দেবার জন্য নিয়ে যাওয়া হ'ল, সেখানেও সহস্র সহস্র মৃত সামান্য মাটী পাবার প্রত্যাশা। মৃত্যুর পরও যেন শান্তি নেই।

একটি নীরব জন্ম। নীরব জীবন। নীরব মৃত্যু এর তার চেয়েও নীরব তার সৎকার।

কিন্তু মৃত্যুর পরে পরলোকে ঠিক তার বিপরীত। আশ্চর্য! যেখানে তার মৃত্যু এক অভূতপূর্ব অচিন্তনীয় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল।

স্বর্গে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠল। দেবদূত জানল যে বোনচে পৃথিবী ছেড়েচে। স্বর্গের দেবদূতগণ ডানা

মেলে উড়ে ঘোষণা করল যে বোনচে স্বর্গের শ্রেষ্ঠস্থানে আসন লাভ করেচে। নন্দন কাননে হর্ষধ্বনি আর জয়ধ্বনি। বোনচে আসচে। স্বয়ং পিতা আবরাহাম স্বর্গের তোরণ-দ্বারে দাঁড়িয়ে আছেন। মুখে একটা প্রশান্ত হাসি। তিনি বোনচেকে স্বয়ং অভ্যর্থনা করবেন।

স্বর্গের মধ্যে ঘড় ঘড় করে চাকার শব্দ। কিসের জন্য? নন্দনকাননে বোনচে সোয়েগের জন্য। সোনার তৈরী সিংহাসন দেবদূতগণ নিয়ে যাচ্ছে।

স্বর্গের ঋষিগণের মুখে একটু হিংসার প্রশ্ন—স্বর্গীয় দরবার রায় দেবার আগেই?

দূতেরা উত্তর দিল—ওটা, একটা আনুষ্ঠানিক আর লৌকিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। যাকে বলে একটা নিয়ম রক্ষা। স্বয়ং বিচারপতিও বোনচের বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারবেন না। এ বিচার পাঁচ মিনিটও টিঁকবে না।

বোনচে সোয়েগের অভ্যর্থনা! এক বিরাট পর্ব। স্বর্গীয় পরীগণ সুরেলা কণ্ঠে গান করচে। দেবদূতগণ যন্ত্রসংগীতে ঐক্যতান ধরেচে। স্বয়ং আবরাহাম তাকে আশীর্বাদ করচেন। নন্দনকাননে তার জন্য স্বর্ণসিংহাসন। হীরের মুকুট তার মস্তকে শোভা পাবে। স্বর্গীয় দরবারে তার মামলা পাঁচ মিনিটও টিঁকবে না। বোনচে সোয়েগ ব্যাপার শুনে ঘাবড়ে গেল। তার বুক অজানা ভয়ে কেঁপে উঠল। পৃথিবীতে সে যেমন কথা কইতে ভয় পেত এখানেও ঠিক তেমনি হ'ল। এ স্বপ্ন না সত্যি। বোধ হয় অন্য কোন মহাপুরুষের সঙ্গে তাকে ভুল করেচে।

পৃথিবীতে বহুবার বোনচে স্বপ্ন দেখেচে। সুরম্য রাজপ্রাসাদে সে গদীর ওপর নিদ্রা যাচ্ছে। সমস্ত ঘর টাকার ঝন ঝন শব্দে মুখরিত। নিদ্রা ভাঙ্গলে বোনচে দেখে সে যে তিমিরে সেই তিমিরে। দারিদ্র্য, অর্থকষ্ট, উপেক্ষা, সমস্ত যেন তাকে গ্রাস করচে।

বোনচে নির্বাক! বিস্ময়ে অভিভূত! চোখ মেলে সে চাইচে না। যদি তার স্বপ্ন মিলিয়ে যায়। তার মনে হচ্ছে—

"স্বপন যদি মধুর এমন, হ'ক সে মিছে কল্পনা" আমায় জাগিও না।

পিতা আবরাহামের অভিনন্দের প্রত্যুত্তরে সে চুপ করে আছে। স্বর্গীয় বিচারালয়ে দাঁড়িয়ে সে নমস্কার করতে ভুলে যায়।

স্বর্গীয় বিচারালয়। প্রধান বিচারক বিশেষ আসনে আসীন। উকীল, মুহুরী এবং দেবদূতে আদালত গম গম করচে। বোনচে দেখে যে, সে যেখানে দণ্ডায়মান তা হীরকমুক্তার তৈরী। সমস্ত দেহ তার অসাড়। প্রধান বিচারপতি বল্লেন—

বোনচে সোয়েগের বিচার আরম্ভ কর।

তখন তার কথা কানে যায় না।

স্বর্গীয় বিচারালয়ের উকীল আরম্ভ করেন—

বোনচে সোয়েগের সম্বন্ধে সব চেয়ে বড় কথা এই যে, সে, জীবনে নিজের অবস্থা সম্বন্ধে কি ভগবান, কি মানুষ, কারু কাছে অভিযোগ বা অনুযোগ করেনি। তার চোখে কখনও ঘৃণা বা হিংসা ফুটে ওঠেনি। সে নীরবে সব সহ্য করেচে।

প্রতিপক্ষ প্রশ্ন করেন—যথা, উদাহরণ দিন।

উকীল বলেন—তার মার মৃত্যুর পর বিমাতার সঙ্গে ঘর করে। বিমাতা তো নয় যেন কেউটে। বোনচেকে খেতে না দিয়ে তিলে তিলে মৃত্যু যন্ত্রণা দিয়েচে। অত্যাচারে জর্জ্জরিত করেচে। প্রচণ্ড শীতে খালি গায়ে তাকে গিয়ে জঙ্গলে ঘাস কাটতে হয়েচে। শীতে তার হাত পা ফেটে রক্ত ঝরেচে, ক্ষুধার তাড়নায় সে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করেচে কিন্তু কোন প্রতিবাদ সে করেনি। এমন কি তার পিতার কাছেও নয়।

দুর্দান্ত পিতা। মাতাল, বদরাগী স্ত্রৈণ। স্কুলে সে শিক্ষা পায়নি। তার কোনও বন্ধু ছিল না। সে একা। মদের ঝোঁকে বোনচের পিতা প্রহার করে একদিন তাকে বাড়ী থেকে তাড়ালেন।

শীতের রাত্রি। চারিদিক বরফে ঢাকা। বোনচে নীরবে একা চলচে। দুটি পা তাকে যেখানে নিয়ে যায়। গায়ে জামা নেই। পেটে ভাত নেই। গ্রাম ছাড়িয়ে সে সহরে এল। যখন ঘুম ভাঙ্গল দেখে সে হাজতে। পুলিস কোন উত্তর না পেয়ে তাকে ছেড়ে দেয়। করুণ দুটি চোখ নিয়ে সে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়। কেউ সহানুভূতি জানাল না। একটা কাজ সে পায়। বোঝা বইবার। মালিক তার পিঠে অজস্র বোঝা চাপিয়ে দেয়। কিন্তু বোনচে সব সহ্য করে।

উকীল থামলেই বোনচে মনে মনে ভাবে এরা তো দেখচি আমার সম্বন্ধেই বলাবলি করচে।

একটু থেমে গলা ঝেড়ে নিয়ে উকীল ফের আরম্ভ করলেন—জীবনে এল পরিবর্তন। একদিন এক ধনী ইহুদীকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে বোনচে। ধনী ইহুদীর ঘোড়া ক্ষেপে যায়। রাস্তা ছেড়ে ফুটপাতে ওঠে। কোচ-ম্যান পড়ে মারা যায়। ছুটে এসে ঘোড়াকে ধরে বোনচে ইহুদীকে রক্ষা করে।

ইহুদী অকৃতজ্ঞ ছিলেন না। তিনি বোনচেকে কোচ-ম্যানের কাজ দিলেন। দুবেলা খাওয়া পরা এবং কিছু

টাকা। শুধু তাই নয়। সে স্ত্রী পেলো এবং একদিন পিতাও হ'ল। যেদিন বোনচের মনিব ব্যবসায় দেউলিয়া হলেন এবং মাইনে না দিয়ে বোনচেকে তাড়ালেন সেদিনও বোনচে চুপ করেই রইল। প্রতিবাদটি পর্যন্ত করল না।

তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে বোনচের স্ত্রী ছোট শিশুকে রেখে যেদিন বোনচের গৃহ ত্যাগ করে চলে গেল সেদিনও বোনচে শুধু চুপ করে রইল। শুধু এখানেই শেষ নয় দীর্ঘ পনেরো বৎসর বাদে যখন তার ছেলে বলিষ্ঠ যুবক হয়ে পিতাকে গৃহ থেকে বিতাড়িত করলে সে দিনও বোনচে চুপ করে সহ্য করল।

এতক্ষণে বোনচের সাহস এল। না, এরা আমার সম্বন্ধেই আলোচনা করচে।

স্বর্গীয় দেবদূত উকীল মিষ্টি সহানুভূতির সুরে এবং করুণভাবে বল্লেন—

যেদিন সেই দেউলিয়া ইহুদী ফের ধনী হ'ল এবং সমস্ত ঋণ শোধ করলে সেদিন কিন্তু বোনচেকে এক পয়সাও দিলে না, শুধু তাই নয় তাঁর গাড়ীতেই একদিন বোনচে নির্মমভাবে চাপা পড়ল। সেদিনও বোনচে কোন অভিযোগ করলে না। বোনচে নীরবে সহ্য করল। পুলিসের উত্তরে কোন নালিশই কারুর বিরুদ্ধে করল না।

বোনচে হাঁসপাতালে তীব্র যন্ত্রণার বিরুদ্ধে কোন চিৎকার করল না। হাঁসপাতালে যখন ডাক্তার তাকে রাস্তার ভিখিরির মত উপেক্ষা করলে নার্সরা টাকা না পেয়ে তাকে সেবা থেকে বঞ্চিত করল তখনও বোনচে কর্তৃপক্ষের নিকট কোন নালিশই করলে না।

মৃত্যুযন্ত্রণাতেও সে চুপ করে ছিল। মৃত্যু তাকে চিরদিনের জন্য নীরব করে দিল। কোন অভিযোগ নেই তার— ভগবানের বা মানুষের কারুর বিরুদ্ধেই।

বিপক্ষের উকীল উঠে দাঁড়ালেন। আজ তাঁর স্বরও করুণ। সহানুভূতিপূর্ণ। তিনি করুণকণ্ঠে বলে উঠেন—

ভদ্রমহোদয়গণ, বোনচে চিরদিন চুপ করে গেছে। আমিও নীরব হলাম।

পিতা আব্রাহামের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হ'ল। যেন সুরেন্দ্র বীণা বাজচে। "বৎস, বোনচে"।

এমন করুণ মিষ্টি কণ্ঠস্বর বোনচে কখনও শোনেনি। তাকে এমনভাবে কেউ ডাকেনি।

বিচারপতি বল্লেন—বৎস, জীবনভোর তুমি কষ্ট পেয়েচ। তোমার শরীরে এমন কোন যায়গা নেই যেখানে ঘায়ের দাগ বা অত্যাচারের চিহ্ন নেই। কিন্তু তুমি সব সহ্য করেচ। কখনও মুখ ফুটে কারুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করোনি। অন্যায়ের অভিযোগ করনি অন্যায়পূর্ণ পংকিল পৃথিবীতে তোমার নীরবতার তোমার সহ্যের আদর হয়নি কিন্তু সত্যের এই স্বর্গাশ্রমে তোমার নীরবতার তোমার সহ্যসীমার পুরস্কার তুমি লাভ কর। এই স্বর্গতে, যা তোমার ইচ্ছা তুমি নিতে পার। সব তোমার।

বোনচে এই প্রথম পরিস্কার ভাবে তাকিয়ে দেখলে। চারিদিকে হর্ষধ্বনি। সমস্ত স্বর্গ যেন শান্ত আনন্দ-নির্মল শোভায় পরিপূর্ণ।

কম্পিত স্বরে বোনচে জিজ্ঞাসা করে—সত্যি, একি সত্যি?

পিতা আব্রাহাম স্নেহস্বরে বলেন—সত্যি বৎস, সমস্ত তোমার। আজ এই স্বর্গ সত্যিই তোমার অজ্ঞাত অলৌকিক সহ্য ক্ষমতার জন্যই পবিত্র নির্মল আশ্রম হয়ে উঠেচে। তোমার জিনিষ তুমিই নেবে বৎস এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

বোনচে ধীরে শান্ত কণ্ঠে বলে—যদি তাই হয়, আমাকে প্রতিদিন যেন টোস্ট্ মাখন আর একটু করে টাটকা দুধ দেওয়া হয়।

পিতা আব্রাহাম লজ্জিত। দেবদূতগণ কুণ্ঠিত। বিচারপতি অপ্রস্তুত।

সমস্ত নন্দনকাননে করুণ সুর ধ্বনিত হ'ল।

জয়দেব-মেলা

জামালউদ্দিন আমেদ

প্রায় সাত শো বছর আগে বীরভূমের রাঙা মাটিতে এসেছিলেন রাঙা বরণ নিয়ে জয়দেব। তিনি যেমন অমর হোয়ে আছেন তাঁর গীতগোবিন্দ আর পদাবলীর মধ্যে, তাঁর জন্মপীঠ তাঁকে বুকে ধরে তেমনি অমর। জয়দেব-কেঁদুলী— ছোট্ট গাঁখানা— আর তাঁকে সকলে বলে 'জয়দেব'।

আজিমগঞ্জ-আসানসোল গাড়িতে চাপলুম সিউড়িতে। প্রথমে নজর পড়ে নি, কিন্তু গাড়ি ছেড়ে দেওয়ার পর কানে এসে লাগলো বিনা একতারায় মেয়েলি গলার সুর। মিলেনো গলার সুর গাড়ির দুপাশে ছড়িয়ে পড়ছে। আমার গাড়ির পরের গাড়িতে তারা বসেছিলো। একটা ষ্টেশনে গাড়ি দাঁড়ালে আমি তাতে ঢুকবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু পারলুম না—গাড়ি একেবারে বোঝাই। নিজের কামরা থেকেই কান খাড়া কোরে সেই গান শুনতে লাগলুম। দুবরাজপুরের এক ষ্টেশন পেছনে তারা সব নেবে গেলো। গাড়ি ছেড়ে দেওয়ার পরও কিন্তু কানে বাজতে লাগলো তাদের গলার সুর :

আমরা ফিরি আশে আশে
তোমার দেখা পাবো শেষে।…

দুবরাজপুর নামলুম। শুনেছিলুম বাস পাওয়া যাবে। কিন্তু দেখলুম, না। এখন অনেক দেরী। মানে সিউড়ি থেকেই আসবে। ছি ছি, বড় ভুল করলুম। কি করি? অগত্যা দুবরাজপুরে এক বন্ধুর বাড়ি খুঁজে বের করলুম। তারই সাইকেল নিয়ে বিকেল নাগাদ বেরিয়ে পড়লুম। কিছুক্ষণের মধ্যে হেতমপুর পেরিয়ে রাঙা সরানে পড়লুম।

"বীরভূমের আচার ভালো, মোরব্বা ভালো তার
হার্লিশহরের দোকা বেগুন পোড়া মজেদার।"

—কবি ভোলানাথ থেকে ভূগোলে অবধি এই গুণগান আমাদের বীরভূমের। কিন্তু এখানকার ফাঁকা মাঠের বুকে সিঁথির মতো রাঙা পথগুলো তাদের পাশঘেঁসা তাল আর খেজুর গাছের সারিগুলোর বাতাসে কাঁপা বাউলের একতারার সুরে "যাবার আগে রাঙিয়ে দিয়ে যাও" বলে যে গান গায়, তা এখানে বেশ ভালো ভাবে বুঝতে পারা যায় নিজেদের জামা কাপড়ের অবস্থা দেখে।

রোদ ঢলে এসেছে। দিগন্ত-রেখায় রাঙা লালিমা চোখে মায়া বুলোতে লাগলো। ঝিকিমিকি সাঁঝের বেলায় এসে পড়লুম—ক্ষীণধারা শাল নদীর পাড়ে। তার বুকের পাতলা জলের ওপর পশ্চিমের রক্ত-আবিরের আলপনা-রেখা ভাসছে। পাড়ের ওপর চিতার ছাই আর কাশের ঝাড়।

হেতমপুরের রাঙা-ধূলো পেরিয়ে এবার মেঠো সরান। মাঠভাঙা মাটির সাদা-ধূলোয় ভরা সরানের দুপাশে—বাবলা, সাঁইবাবলা, আম, বাঁশঝাড় আরও সব ঝোপঝাপ ঘন হোয়ে কুণ্ডলীপাকা শীতকে কোলে নিয়ে খুশিতে মেতেছে।

পেছনে আসা কটা ট্রাক আমাকে পেছনে ফেলে গেল এগিয়ে। গরুগাড়ির সার আরম্ভ হোয়ে গিয়েছে। ঠাণ্ডা হাওয়া কেটে এগিয়ে চলেছি। দুবরাজপুর, বোলপুর, জয়দেব—এই তিন রাস্তার সংগমে হাজির হলুম। সেখানে একটা চায়ের দোকান খুলেছে। যাত্রিদের সুবিধে হচ্ছে খুব। আমার কিন্তু ওখানেই অসুবিধের আরম্ভ। সাইকেলের দিকে নজর পড়তেই পিলে চমকে উঠলো। পাম্প নেই। দেখলুম লিক করেছে। জিজ্ঞেস কোরতে বললো—মেলা ওখান থেকে ছ মাইল। সাঁঝ উৎরে গেছে। অন্ধকার চারধার, ভয় কোরতে আরম্ভ কোরেছে। কি করবো ভাবছি। এমন সময় বোলপুরের রাস্তা থেকে একটা আলো এসে লাগলো আমার গায়ে। যেন আশা-বাণী আর কি! হর্ণের কর্কশ আওয়াজ বাঁশীর সুরের মতো কানে লাগলো। কাছে আসতেই হাতের

ইসারায় দাঁড় করালুম। বললুম, দাদা সাইকেলটা লিক কোরেছে, দয়া ক'রে আমাকে সঙ্গে নিন না। কিন্তু শুনলো না। গাড়ী ছেড়ে দিলে। মনের ক্ষোভে জোরেই চেঁচিয়ে উঠলাম, অসভ্য, খানিকটু উপকার কোরতে জানে না, নির্মম। তারপরেই দেখছি গাড়িটা ঘুরে দাঁড়ালো। যাক্, আমার কম বয়স দেখে তাহলে মায়া হোয়েছে তাদের। কাছে যেতেই আমাদের গাড়িতে তুলে নিলে। মানে আমার সাইকেলটাকেও।

মেলায় যখন পৌঁছলুম তখন রাত আটটা। রাস্তা শেষ কোরে দক্ষিণ মুখে মেঠো রাস্তায় নামলুম। এখান থেকেই মেলার আরম্ভ। ডানদিকে কপাট, চৌকাঠ, খাট, চাকা, চৌকি, লাঙল—সব কাঠের জিনিষ। পাশে লোহার হুন ইত্যাদি। বাঁয়ে গাঁয়ের ঘরের পাশের উঁচুনিচু জমিতে গোরু-গাড়ির আড্ডাখানা।

অনেক দোকানই খোলে নি। সামনে চট রাঁধি সব নামিয়ে দিয়ে ভেতরে পসারের মাল তৈরী হচ্ছে। রাস্তাটা শেষ কোরে সদর রাস্তায় ঢোকবার আগেই নাকে টাটকা মিষ্টি তৈরীর গন্ধ লাগলো। বড় রাস্তা যেটা পূব পশ্চিমে দৌড়েছে তার দুপাশে দোকান আর দোকান। পান, বিড়ি, চা আর মিষ্টির দোকান। মিষ্টির দোকানের বড় বড় ঝকঝকে থালার ওপর বসানো মিষ্টি-গুলো যাত্রিদের দিকে তাকিয়ে আছে লোলুপ নয়নে তাদের হাতে নিজেদের সঁপে দেবার জন্যে। শেষদিকে ইয়া বড় বড় সাদা সাদা 'খাজার' চূড়। আর তার মধ্যিখানে দোকানের মালিক নিজেও একটা থাক হয়ে বসে। এই রাস্তাটা পেরিয়ে পূবদিকে দশবারো ঘর পেরিয়ে উত্তর দক্ষিণে মেলার পাতা-দোকান আরম্ভ।

রাস্তার ধারে পড়ে রয়েছে সার দিয়ে অনেক দূরের যাত্রী আর ভিখিরীরা। কেউ কেউবা পুটুলির মত বসে কাপড় মুড়ি দিয়ে। মনে হচ্ছে কলার কাঁদ এলোমেলো কোরে কাপড় ঢেকে রেখে দিয়েছে সব। মাঝে মাঝে খড়ের গাদায় আগুন দিয়ে চারধারে লোক জমেছে আগুন পোহাতে।

মেলার পশ্চিম প্রান্তে মন্দিরগুলোর পেছনে জমেছে বাউলের দল। গাছের ডালে আলো ঝুলিয়ে তলায় জমেছে বাউলের আসর। তাদের চারধারে ঘিরে শ্রোতার দল। মেয়েদের একদিকে বসবার জায়গা। মাঝে কাঠ জ্বালিয়ে ধুনি জ্বালান হয়েছে। এই আসরে জমেছে সারা বাংলার বাউল সম্প্রদায়। আসরে লোকে জমেছে ঠেলে ঠেসে। বসবার জায়গা পেলুম না। একটা গাছের ডাল ধরে দাঁড়ালুম। আসরের মাঝখানে উঠে দাঁড়ালো একজন বাউল হাতে একতারা নিয়ে। পায়ে ঘুঙুর বাঁধা। একপাক ঝুনঝুন কোরে পায়ের ঘুঙুরের সাথে একতারাটি বাজিয়ে বাজিয়ে ঘুরলো। তারপর সুর তুলে গান ধরলো :

হায়, আমার জীবন গেলো
কিছুই হোল না রে,
এ জনম বিফল গেলো গো
আমারি কিছুই হোল না।
ভজতে এলাম হরি বলে,
ভজন বাদে
কিছুই হোল না
কে বা দিলে কে বা নিলে
অগম্য অসম্ভব নীরে।
গুরু মানবরূপে চেতন দিলে
দীক্ষা শিক্ষার নিশানা,
এজনম বিফল গেলো
কিছুই হোল না।
যে তোমার পারাপার ভবে
ভেবে দেখলি না যে তারে
কামিনী কাঞ্চন লভে,
সদাই মিথ্যা প্রবঞ্চনা।
এজনম বিফল গেলো
কিছুই হোল না।
নীলকণ্ঠ বসে অষ্ট পাশে,
পাপমুক্তি তুই হবি কিসে
হরি বল, কৃষ্ণ বল
এ জনম আর হবে না।
জনম বিফলে গেল
আমার কিছুই হোল না রে।

গানটা ধরলাম। কিন্তু সুরটাতো হোল না। যেটা তার প্রাণ। তার গলাটাও খুব পরিষ্কার সুন্দর। ও বসে পড়লো। আর একজন উঠে গান ধরলো :

আমি এবার ভালো বেসেছি
এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি
ভাবের ঘরে অনুরাগের কাঠি
(ওরে) এই রাধার প্রেমে প্রাণ পেলো এই ধরার মাটি।
এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি
আমি এবার ভালো বেসেছি।

আর একজন উঠলো। এও আসর মাত করলো :

আয়রে ভাই প্রাণের সুবল
ভরিয়া নয়ন যুগল
যাই ভাই দুজনায়
চল যমুনায় যাই।
সঙ্গে নাই সজনী
একাকিনী রজনী
মনে হয় এখনই অমৃতে মিশাই।
আর এই পথে গেছে হেঁটে
কদম্বতলার ঘাটে
মনে হয় এই পথের মাটিতে লুটাই।
শূন্য কলসী ভারে
মাজা হেলিয়ে পড়ে
কঠিন পুরুষ তিনি
জল আনিতে পাঠায় ধনী
তার কি শরীরে মায়া দয়া নাই।
আয়রে ভাই প্রাণের সুবল
ভরিয়া নয়ন যুগল।
যাই ভাই দুজনায়
চল যমুনায় যাই।

ক'জায়গাতেই এই রকম আসর বসেছিলো। অন্য একটা আসরে জমলুম। এ আসরটা অপরগুলোর চেয়ে বেশ বড়ো। মেয়েদের ভীড়ও এখানে বেশ দেখা গেলো। একজন উঠলো। বিশাল দেহ। যুবক। বেশ একপাক নেচে একতারাতে সুর ধরে গাইতে আরম্ভ করলো। আর সেই সেদিন সমস্ত জয়দেব-মেলার আসর মাৎ করেছিলো।

কালো যদি না হতে শ্যাম
আমার মনের আশা মিটাতাম।
শ্যাম, তুমি নাকের নল হতে,
রাস্তায় বেতাম গৌর করে আপনি দুলিতে
ও সে অনুরাগে আমি আড়-নয়নে
হেরিতাম।
কালো যদি না হতে শ্যাম
আমি মনের আশা মিটাতাম।
শ্যাম, তুমি যদি হতে গজমতি হার
আমি একবার খুলতাম; একবার পরতাম
দেখতাম শতবার
আমি নাসার গন্ধে আড়-নয়নে
হেরিতাম।
শ্যাম কানের কুণ্ডল হতে
আমি আড়-নয়নে হেরিতাম
কালো যদি না হতে শ্যাম।
আমি মনের আশা মিটাতাম।

আর একজন উঠলো। বয়স্ক মনে হোল। সেও গান ধরলো। সাথে সাথে একতারা :

এ দুনিয়ায় ঘর বাড়ী কারে দিয়ে যাও,
কারে দিয়ে যাওরে ভাই···
ভাই কাঁদে, বন্ধু কাঁদে ও ঘরের রমণী কাঁদে
শিয়রে বসিয়া কাঁদে তোমার অভাগিনী মা
এ দুনিয়ায় ঘর বাড়ি কারে দিয়ে যাও।
টাকা পয়সা জমিদারী
তায় লয়ে রে মন বলো কি করি।
এখন ক্যেনে মন-ব্যাপারী
শুধু হাতে তোমার এ দুনিয়ায়
ঘর বাড়ি কারে দিয়ে যাও?
চকিছে আর চেন ঘড়ি
কোথায় মন তোমার বাবুগিরী
এখন ক্যানে সোনার অঙ্গ
ধুলায় লুটায় অভাগী
এ দুনিয়ায় ঘর বাড়ি কারে দিয়ে যাওরে মন···

আবার উঠে দাঁড়ালো একজন। এর গলাটা

কিন্তু ভারী সুরেলা। একতারার সাথে সাথে গেয়ে চলেছে :

হায়, আমার হরি বোলে মন মাতালে
কে রে মাধাই
হায়, আমার হরিবোলে মন মাতালে
কে রে মাধাই।
যারে মাধাই জেনে
আশ্রয়ে কে যায়
এমন দয়াল কে আছেরে
বিজনে নিতাই।
হরি বোলে মন মাতালে কেরে মাধাই।
হরি নামে বিকাইব মোরা দুটি ভাই,
হরি বোলে মন মাতালে কেরে মাধাই।
যদি নিতাই দয়া করে
রাঙাচরণ দেয় পাসরে
বক্ষে বাঁধে ভেলা করে—
ভব-পারে যাই,
হায়, আমার হরি বোলে মন মাতালে
কেরে মাধাই।

আসর ছেড়ে বাইরে বেরোলুম। কিন্তু একতারার বাজনা, বাউলের সুরের রেশ ঝংকার তুলেই চলেছে। মন্দিরের দরজার সামনে একটা বিরাট বটগাছ। রাতের আঁধারকে একেবারে ঢেকে রেখেছে। নীচে গাদাগাদি ঠাসাঠাসি কোরে ছেলেমেয়ে আছে ঘুমিয়ে। মন্দিরের দরজার সামনে বসলুম। মন্দিরের পশ্চিম দিকে খঞ্জনী নিয়ে গান ধরেছে একজন :

নিশ্চিন্ত নিদ্রার কোলে করিয়া শয়ন
নিশি শেষে জয়দেব দেখেন স্বপন।
সম্মুখে দাঁড়ায়ে তার আছে একজন
মরি মরি কি সোন্দর রূপ ভুবন মোহন।
রূপে আলোকিত গৃহ ঝলমল করে
মুখে মৃদু হাসি যেন সুধা ক্ষরে।
পুলকে শিহরি কবি মূর্তি তুলি নিল।
ভক্তিগদগদ ভাবে হৃদয়ে ধরিল।

শ্রোতারা সবই মহিলা। তাঁরাও ভক্তিগদগদ হয়ে আহা বলে উঠলেন। কজন গাইয়ে বেশ দূরেই কাপড় মুড়ি দিয়ে শুনছিলেন। একজন কাপড়ের খুঁট থেকে খুলে আমায় বললেন, দিয়ে দিয়োতো বাবা। আশ্চর্য্য হলুম। লজ্জা হতে লাগলো, দেবো কি কোরে? মাত্র একটি ফুটো পয়সা! আরও জনকয়েক ডবল আনি দিলেন : 'বলো বাবা বলো'। খুচরো পয়সা কুটি পকেটে পুরে খঞ্জনী বাজিয়ে আরম্ভ করলো আবার গান :

কেন্দুলীর সাংগ করি-লীলা মনোহর
বৃন্দাবন দেখিবারে কান্দিল অন্তর
ভক্ত কবি জয়দেব ভাবে মনে মনে
শ্রীরাধামাধবে সংগে যাইবে কেমনে।
কার কাছে রেখে যাবে প্রাণের বিগ্রহ
কে তারে করিবে সেবা ঘটিবে নিগ্রহ।
উপায় না দেখি কবি ভাসে অশ্রুজলে
প্রাণের দেবতা তার কোথা যাবে ফেলে।
ভক্তাধীন অশ্রু হেরি ভক্তের নয়নে
সদয় হলেন তার কামনা পূরণে।
পরদিন জয়দেব আসি দেব গৃহে
বিস্মিত হলেন তথা না হেরি বিগ্রহে।
সহসা পড়িল দৃষ্টি তাম্র-পাত্র মাঝে
শালগ্রাম শিলা এক তথায় বিরাজে।

আর থাকতে পারলুম না। পৌষের হিমেলীরাতের উত্তরে বাতাস অজয়ের উপর বইছে। আর ধাক্কা মারছে যাত্রীদের। জয়দেবের পেছনেও একখানা গাঁ। সেখানে থাকবার যোগাড় হয়েছিলো আমার। তখনও খানবাটা মাঠের ওপর, সবানের ওপর যাত্রীদের যাওয়া আনার ভিড়।

গোরুগাড়ির একটানা প্রশেসন। মনে হচ্ছে একটার পেছনে আর একটা একেবারে বাঁধা। ফাঁক নেই কোথাও, তার ভেতরে সব লেপমুড়ি দিয়ে গল্প কোরতে কোরতে এগোচ্ছে। কুয়াশার ফাঁকে ফাঁকে জলে মেলার দোকানের আলোকশিখা আর যাত্রীদের আগুন পোহানোর আলো। দূরের আকাশের বাসিন্দারাও জয়দেবের আলোর আগুন পোহাতে পোহাতে বাউল শুনছে। বাতাসে বাতাস কাঁপতে থাকে বাউল গানের রেশ।

সকালে আবার জয়দেব রওনা হলুম। সরানের ধারে পিঠে-পিঠে দাঁড়িয়ে রয়েছে সব কাঁচা বাড়ি। ঘরে ঘরে সজনে গাছ পাঁচিল ছাপিয়ে উঠেছে। ঝুলছে তাতে পাতার ঝালর। তারমধ্যে ফুটন্ত ফুলের খোলা খোলা পাখা—যেন এক একটি প্রজাপতি। জায়গায় জায়গায় রয়েছে শিরিষ, শেয়াল, সাঁই বাবলা। আর তাদের ওপর ঝুলছে আলোক-লতা। হলুদে রঙের আলোক-লতাগুলো ঠিক যেন বরের টোপরের ঝালর! রাস্তায় তখনো একনাগারে গরুগাড়ির সার।

"পৌষের সংক্রান্তি প্রাতে, কেন্দুবিল্ব অজয়েতে
নদী স্নানে মহাপুণ্য হয়
ভক্তের ভক্তিতে ভুলি সুরধনী কুতূহলী
অজয়েতে তরতর বয় ॥
কদম্বখণ্ডির ঘাটে কিংবা শিবা ঘাটে
এর মধ্যে যথা অভিরুচি
করিলে তর্পণ স্নান গংগা পূজা স্তোত্র গান
পাপ মুক্ত দেহ হয় শুচি ॥"

এপারে বীরভূম, ওপারে বর্দ্ধমান আর মাঝখানে অজয়। বারো আনা তার বালু, বাকীটা জল। জয়দেবের পা ঘেঁসে হাটুভর জল আঁকা বাঁকা ভাবে আলপনা এঁকে বইছে ভাঙা ভাঙা ভাবে। অজয়ের বুকের ছোট ছোট তিরতিরে ঢেউ নাড়ানো বিছেনো-বালির বুকের ওপর বর্দ্ধমানের যাত্রীরা সব পায়ের ছোট বড় ছাপ এঁকে এগিয়ে আসে জয়দেবের দিকে। পুরুষদের মাথায় ছোট বড় পুটুলী। মেয়েদের কাঁখে কারো ছোটছেলে কারো বা অন্যকিছু। অজয়ের বুক থেকে জয়দেবের দিকে তাকালে দেখতে পাওয়া যায় জয়দেবের তীরে-তালগাছের সারি। আর মন্দিরের চূড়া গাছের পাতার ভেতর থেকে তাকিয়ে ডাকছে যাত্রীদের। যাত্রীরা সবাই তাই আগে দূর থেকেই মন্দিরের উদ্দেশ্যে জানায় প্রণাম।

জয়দেবের পা ঘেঁসে ঘিরে রেখেছে বিরাট বিরাট বটগাছের ঝোঁটা। আর তার থেকে ঝুলে ঝুলে সব অসংখ্য নামাল-ঝুড়ি। মা-বোনদের চান কোরবার ফাঁকে ফাঁকে ছেলেরা সব ঝুলে-পড়া ঝুটি ধরে আরম্ভ করে দেয় দুলতে।

শুধু কদম্ব ঘাটে বা শিবা ঘাটে নয়—সমস্ত পাড় জুড়ে লোকের মহারণ্য। জনসমুদ্র যেন এই অজয়ের জয়দেবের ঘাটে এসে দাঁড়িয়ে গেছে। মেয়ে পুরুষ নির্ব্বিশেষে জমা হয়েছে নদীর পাড়ে পাড়ে। অঠেল অগুণতি লোক-সমাগম! চেনা লোককে চার হাত দূরে হারিয়ে ফেলতে হবে। পাড়ে শুকোচ্ছে সব শাড়ী কাপড়। এক হাটু কি তার আরও কম জলে সব শুয়ে শুয়ে দিচ্ছে ডুব। অজয়ের বুকে ঘাট থেকে দূরে দূরে গরুর গাড়ীও জমেছে ঢের। তার শুকনো মরুভূমির মতো বুকে ভাসছে অদৃশ্য ঢেউ ঠিক স্বচ্ছ জলের মতো। গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দেয়।

ধপধপে ধোয়া ধোয়া শাড়ী কাপড় প'রে মেয়েরা চুলের গোছা খুলে পিঠে বিছিয়ে দিয়ে পুণ্য মনে উঠে আসে উপর দিকে। হাতে চাল বা খুচরো পয়সা থাকে। রাস্তায় দু'পাসারি ভিখিরীরা বসে থাকে। তা'দিকে দান কোরতে কোরতে মেয়ে-পুরুষরা এগিয়ে যায় শ্রীরাধাবিনোদ মন্দিরের দিকে। ঘাটে উঠতেই দু'পাশে অনেকে বসে আছে বুদ্ধ, কালী, রাধাকৃষ্ণ—আরও সব অনেক রকম মূর্ত্তি নিয়ে। কানা-খোঁড়া ভিখিরীরাও এখানে সংখ্যায় কম নয়।

শ্রীরাধা-বিনোদ মন্দিরে এসে আমার একটা স্কুলের কথা মনে পড়লো। কেননা, এ মন্দির ক্যামেরাতে শুধু ধরতে পারা যাবে। বর্ণনা করবার ক্ষমতা নেই।

খাবার দোকান সবখানেই। তেলে ভাজা দোকান প্রায় পাঁচ ছ' হাত তফাৎ তফাৎ। পানবিড়ি, মনিহারীর দোকান, লোহালটকনের দোকানও অনেক। উত্তর-দক্ষিণ মুখো রাস্তার পশ্চিম পাড়ে পাথর বাটি, এলোমুনিয়ম আর মাটির তৈরী জিনিষের সব দোকান পাতা। আলু, কুল, তরীতরকারীও জমেছে ফাঁকে ফাঁকে। কলার তো একটা আলাদা রাজত্বি। কলা-বাজারে কলার দোকানের সামনে সামনে বড় বড় মাটির ঢিপি। ভেতরে তার কাঁচা কলা রেখে পাকতে দিয়েছে। কলাও খুব সস্তা। দুটো সার্কাস পার্টি, দুটো ম্যাজিক এসেছে। এদের ঢুকবার পথে মাচ্যর ওপর অনবরত বাজছে ব্যাণ্ড। লোক

জমেছে বিস্তর। গাঁয়ের লাজুক বধুরা অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে ঘোমটার ফাঁকে টানা টানা চোখ মেলে। বইয়ের দোকানও ক'খানা। একটা পাখিওয়ালার দোকানে দেখলুম ছোট ছেলেদের ভীড়। খাঁচার ভেতরকার পাখীরা ছাতুছোলা খায় আর মিটি মিটি কোরে তাকায় সেই ছেলেদের দিকে। এরই পেছনে হাঁড়ি হোলার দোকান। কুলো, চৌকা, খাঁচি সব নিয়ে বসে থাকে লোকগুলো। আর তাদের পাশে বসে ভাবে জলের ছিটে, পাতিতে রঙ লেপে মেয়েরা। দস্তার বজু, বাঁক, হাঁসুলি, ঝুমকো, সুতোর রাঙা বেণী এইসব সাওতালদের গহনাপাতা থাকে থাকে থাকে। কামাররা বসে জাঁতি, বাঁটালি, মেয়েদের মাথার কাঁটা, বেলকুঁড়ি ইত্যাদি নিয়ে।

মেলার চারধার ঘিরে আবার গরুর গাড়ীর মেলা। আর এক একটি গোরুগাড়ী এক একটি সংসারের ছোট সংস্করণ। তাতে শীল নোড়া থেকে বিয়ের ঢাকাই শাড়ী অবধি আছে।

আর একটা কথা—এখানে কিন্তু সব জাতের লোকই দেখতে পেলুম।

আর একটা জিনিষ ভুলবো না। সেই মেলার ভিড়ে ভিড়ে ছেলেদের রাধাকৃষ্ণ সাজ। যাত্রাদলের সুন্দর সুন্দর ঝকঝকে পোষাক তাদের গায়ে। কৃষ্ণের মুখে চাঁদির মুরলি আর রাধার রাঙা হাতে পেতলের থাল। তাতে যাত্রীরা দেয় সব চকল পয়সা।

হু'দিনের ক্লান্ত দেহ আর মনে বাউলের সুর নিয়ে ফিরবার ব্যবস্থা করলুম। সাঁঝের নাগাদ আবার শাল নদীতে হাজির হলুম। তেমনি কাশগাছের ঝোপ আর ফাঁকে ফাঁকে চিতার ছাই ভস্ম। কানে একটা হৃদয় কান্নার আওয়াজ এসে লাগলো। মেলার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল একজন বাউল। গান ধরেছে সে :

ওরে সাংগ হোল জীবন খেলা
ভাঙলরে ভাই ভবের মেলা
ওরে ভবের মানুষ চলরে ফিরে চ—।

মেলার খেলা সাংগ ক'রে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসবার সমস্ত পথে শুধু কানে বাজতে লাগলো আল-খাল্লাপরা বাউলদের বাউল কলি আর একতারাটি।

★

স্বপ্ন-সমাধি

জগদিন্দ্র চন্দ্র বসু

কাল রজনীতে স্বপ্ন দেখেছি সত্যি অতুলনীয়,
ক্ষণিকের স্মৃতি...জীবনে আমার তবু তা' যে স্মরণীয়
দেখেছি স্বর্গ আসিয়াছে যেন সৃষ্টির মাঝে নামি'—
অন্ধকারের ছায়ার নৃত্য সে আলোতে গেছে থামি।

অসাম্য নাই, অবিচার নাই, মুক্ত স্বদেশবাসী ;
ঘরে ঘরে নাই ক্রন্দন আছে পবিত্রতম হাসি।
দুর্বল বাহু কাঁদিয়া মরে না—অক্ষম আবেদনে,
স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ যেন সকলেরই মনে মনে।

স্বপ্নের মাঝে হাসিতে হাসিতে ভেঙেছে নিদ্রা মোর,
স্বপ্নিল চোখে চেয়ে দেখি সেই রাত্রি হয়েছে ভোর।
কোথা' সে আমার প্রাসাদশীর্ষ মানস স্বর্গটির..
বাস্তব দেখি চাবুকে চাবুক করে মোরে অস্থির।

দেখিতে চাহিনা এমন স্বপ্ন, সত্য যাহাতে নাই—
কল্পনা নিয়ে ঘর বাঁধা আজ জানিলাম মিথ্যাই।
স্বপ্ন আমার ব্যর্থই হল প্রকাশ পেল না রূপ..
নিভন্ত দীপ জ্বলিতে জ্বলিতে দগ্ধই হ'ল ধূপ।

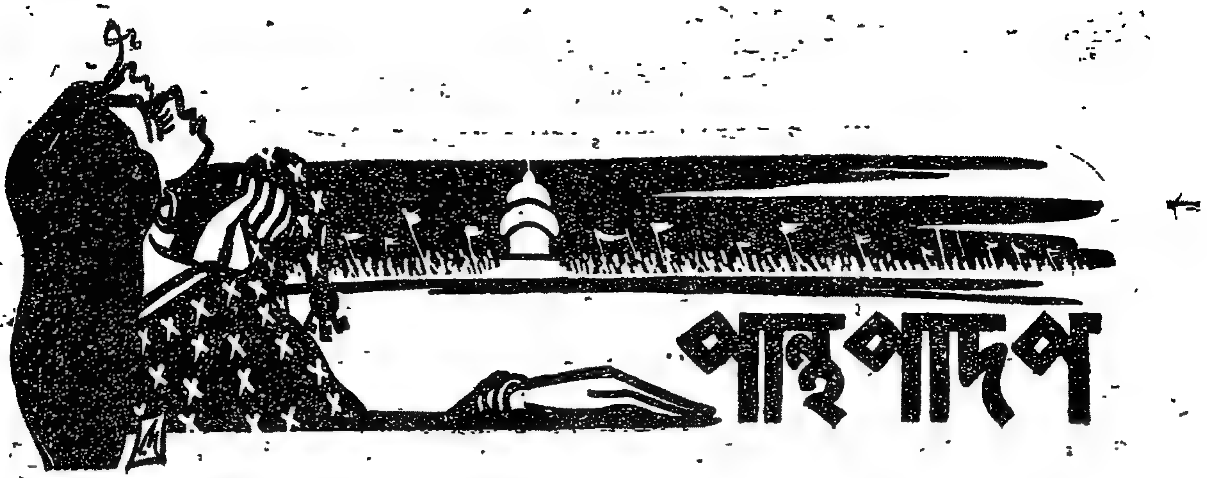

পান্থপাদপ

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(২৬)

পলাশডাঙ্গার জমিদার রতনমণি দত্ত।

জমিদারি না থাক, নামটা আজও আছে, খ্যাতি আজও মিলায়নি।

তবু—

কেঁদে এসে পড়লো পলাশডাঙ্গার মোহন বিহারী ও ধর্মদাস, তারা আজ রিক্ত, পথের ভিখারী। তাদের আজ কেউ নাই কে তাদের দেখবে।

কেবল পলাশডাঙ্গা নয়, রামপুর আলতাপোল, নলহাটি, কই-গাছা প্রভৃতি গ্রামগুলির উপর পুলিস মাথা পিছু ট্যাক্স বসিয়েছে। চলেছে নিদারুণ অত্যাচার যাতে জর্জরিত হয়েছে গ্রামের লোকেরা। কত লোককে তারা জেলে নিয়ে গেছে, কত লোক উৎপীড়নের ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে;—কত ঘর জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, কত অসহায় নারী ও শিশু পথে দাঁড়িয়েছে।

জ্বলে ওঠো—জ্বলে ওঠো রতনমণি দত্ত,—অন্ততঃপক্ষে তোমার সমস্ত শক্তি শেষ বারের জন্য জেগে উঠুক, জানতে পারুক যে অত্যাচার করছে সে, জানতে পারুক অসহায় অনাথারা—জমিদার রতনমণি দত্ত শেষ হয়ে যাননি, তিনি আজও আছেন।

রতনমণি দত্ত একবার সামনের আকাশের পানে তাকালেন—সেই স্বল্প পরিসর আকাশটুকুর মধ্যে তিনি কি আশার আলো দেখলেন তিনিই জানেন।

ভারতীকে ডেকে তিনি বললেন, "আমার যে একবার পলাশ-ডাঙ্গায় যেতে হচ্ছে ভারতী—ওরা আমায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে এসেছে। ওখানে ভয়ানক অত্যাচার সুরু হয়েছে কিনা, একবার গিয়ে না দাঁড়ালে চলছে না।"

ভারতী মুহূর্ত চুপ করে থাকে, তারপর বললে, "কিন্তু তোমায় তো আমি একা ছেড়ে দিতে পারিনে বাবা—"

রতন দত্ত বিস্মিত চোখে তার মুখের পানে খানিক তাকিয়ে থাকেন, তারপর হঠাৎ হো হো করে হেসে ওঠেন,—

"কেন, তোর বাপ কি একেবারে ছেলেমানুষ নাকি, না একেবারে অথর্ব হয়ে পড়েছে যে তার খবরদারী করতে তোকে যেতে হবে?"

গম্ভীর মুখে ভারতী বললে, "অথর্ব না হও, বুড়ো তো হয়েছো বাবা—তা ছাড়া শুনেছি সমীর বোস সেখানে গেছে,—ও লোকটাকে আমি এতটুকু বিশ্বাস করিনে বাবা; নয়কে হয় আর হয়কে নয় সে অনায়াসে করতে পারে।"

রতন দত্ত দীপ্ত কণ্ঠে বললেন, "কোন ভয় নেই মা, তোর বাবার একগাছি মাথার চুল কেউ খসাতে পারবে না। আজও রতন দত্তের এ শক্তি এ সাহস আছে একথা জোর করে বলতে পারি।"

মুহূর্ত চুপ করে থেকে তিনি বললেন, "আমার নিজের ঘর আছে, থাকার জায়গার অভাব হবে না, ঠাকুর বাড়ী আছে, ঠাকুরের প্রসাদ যথেষ্ট জুটবে। অনেকদিন পলাশডাঙ্গায় যাইনি ভারতী, আমার প্রজারা আজও আমার কাছে তাদের দুঃখ জানাতে এসেছে, আমি গিয়ে তবু তো ওদের সান্ত্বনাটাও দিতে পারব।"

বিষণ্ণ কণ্ঠে ভারতী বললে, "কিন্তু সে সান্ত্বনার কি মূল্য আছে বাবা, মুখের সান্ত্বনায় কি ফল হবে?"

রতন দত্ত উত্তর দিলেন, "হয় তো নেই—হয় তো আছে। ওরা জানবে আমি সব ছেড়ে চলে এলেও আজও তাদের ভুলিনি, তাদের সুখ দুঃখে আজও আমার সহানুভূতি আছে। তারা জানে—আমি আজ সব কিছুর বাইরে, তবু তারা এসেছে আমার কাছে, আমায় তাদের ডাকে যেতেই হবে ভারতী।"

ভারতী পিতার পিছনে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে তাঁর পাকা চুলে হাত বুলিয়ে দেয়।

সব চুলগুলি সাদা হয়ে গেছে—এ বয়সে এত সাদা হওয়ার কথা নয়। ভারতী অনেক বইয়ে পড়েছে—রাতারাতি মানুষের চুল সাদা হয়ে যায়,—রতন দত্তের চুল সাদা হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়।

সুদন আজ কয়দিন এখানেই আছে। বড় রুগ্ন, বড় দুর্বল হয়ে পড়েছে সুদন। প্রকাশ্যভাবে ডাক্তার ডেকে দেখানোর সাহস কারও নাই। সমিতির ছেলে বাদল অবস্থা বলে তাদেরই দলের এক ডাক্তারের কাছ হতে ঔষধ আনে, শুশ্রূষার ভারও সে নিয়েছে।

বর্তমানের সুদনকে রতন দত্ত আন্তরিক ভাবে ক্ষমা করেছেন। অতীতের সে সুদন দেহে মনে মরে গেছে, সুদন নূতন করে জন্ম গ্রহণ করেছে।

ঘরের মধ্যে অস্ফুটকণ্ঠে সুদন কবিতা আবৃত্তি করে—

আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রি ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে।
আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে,
কি যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে;

কণ্ঠ তার রুদ্ধ হয়ে আসে—মনে হয় সে ফুলে ফুলে কাঁদছে, তার কণ্ঠস্বর আর শোনা যায় না।

কান পেতে থাকে ভারতী—

আবার শোনা যায় সুদনের কণ্ঠস্বর—

কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে বাঁশী সঙ্গীত হারা;
অমাবশ্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে—;
তাই তো তোমায় সুধাই অশ্রুজলে—
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ? তুমি কি বেসেছ ভালো?

রতন দত্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন, আপন মনে বলেন—

"লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে—"

বার বার এই একটী লাইনই তিনি আবৃত্তি করেন—।

সুদনের জন্য তাঁরও উৎকণ্ঠা কম হয়নি। কিছুদিন আগে হলে তিনি তাকে ক্ষমা করতে পারতেন না, আজ তাকেই বাঁচাতে তিনি চান।

বিদায় নিয়ে যান রতন দত্ত—

যাওয়ার সময় বলে যান—"আমি যত তাড়াতাড়ি পারব ফিরে আসব ভারতী, এ কয়দিন একটু সাবধানে চলাফেরা করিস মা, যেন কিছুর মধ্যে জড়িয়ে পড়িস নে।"

রতন দত্ত চলে যাওয়ার পরদিনের কথা—

যে লোকটী এসে দরজায় দাঁড়ালো তার পানে তাকিয়ে ভারতী বিস্মিত হয়ে যায়,—"একি, আপনি নাকি পলাশডাঙ্গায় রয়েছেন?"

সমীর বোস মৃদু হাসে, উত্তর দিলে—"কলকাতায় বসে আপনি আমার গতিবিধি সম্বন্ধে যে এতটা খবর রাখেন, তাতে সত্যই আমার বড় আনন্দ হল ভারতী দেবী। এই মুহূর্তে আমি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করছি কারণ আপনি আমার কথা সর্বদাই ভাবছেন।"

"আপনার কথা সর্বদা ভাবছি—"

অপমানে ভারতী লাল হয়ে যায়—"আপনি কি বলছেন সমীর বাবু,—আশা করছি বুঝে সুঝে কথা বলবেন।"

সমীর বোস শান্তভাবে মাথা কাত করে, "বুঝে কথা বলছি ভারতী দেবী। আমাদের আপনারা মোটেই পছন্দ করেন না বলে যাই কিছু বলি বাঁকা ভাবে ধরেন। যাক, পুলিসের লোক বলে ভুলে যাননি এই আমার সৌভাগ্য—এই কথাটাই বলতে চেয়েছিলুম, আনন্দের আতিশয্যে হয় তো অন্য ভাবে প্রকাশ করে ফেলেছি। যাক, আমি ক্ষমা চাচ্ছি ভারতী দেবী, দয়া করে ক্ষমা করুন।"

ভারতী উত্তর দিলে না।

সমীর বোস নিজেই একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো,—বললে, "আপনি বসুন ভারতী দেবী। অনেক কাল পরে আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে,—আপনার স্মৃতিশক্তির আমি এ মুহূর্তে তারিফ করছি যে আপনি আমায় ঠিক মনে করে রেখেছেন।"

ভারতী টেবলের অন্য দিকে একখানা চেয়ারে ভর দিয়ে দাঁড়ালো, শুষ্ককণ্ঠে বললে, "মনে আমার যথেষ্ট আছে। আপনাকে আজ হঠাৎ আসতে দেখে এও বুঝেছি আপনি বিনা প্রয়োজনে এখানে আসেননি, আপনার মত লোক সামাজিকতা রক্ষা করতে আসবেন এ আশাও করা যায় না। নিশ্চয়ই বিশেষ কোন কাজে এসেছেন, দরকারটা জানতে পারলে সত্যই সুখী হব।"

"দরকার—"

বাঁ চোখটা আধখানা বন্ধ করে সমীর বোস ভারতীর দিকে চাইলো —"হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন ভারতী দেবী, বিনা দরকারে আমি যে হঠাৎ আপনার এখানে আসিনি এ কথা খুবই সত্য। আমি এসেছি ডেভিস মধুসুদনের খোঁজে—সে আজ কয়দিন হস্পিটাল হতে পালিয়েছে,—"

ভারতী ভিতরে ভিতরে শুকিয়ে উঠলেও মুখে বললে, "কিন্তু তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি বলতে পারেন সমীর বাবু?"

সমীর বোস বললে, "শুনেছি সে আর কোথাও যায়নি এখানে চলে এসেছে এবং আপনি তাকে রেখেছেন—"

ভারতী হেসে উঠলো, প্রচুর হাসি তার ঝরে পড়লো—"বেশ কথা বলেছেন। আপনি পুলিসের বড় অফিসার, ইচ্ছে করলে আপনি এই মুহূর্তে আমাদের বাড়ী অনুসন্ধান করতে পারেন সমীর বাবু, আমার তাতে একটী আপত্তিও টিকবে না। কিন্তু আমার একটী কথা— আপনি কি করে আপনার স্পাইয়ের মুখে শুনে এ কথা এমন সহজে মেনে নিলেন আমি সেই লোকটীকে এ বাড়ীতে লুকিয়ে রাখব; প্রথম কথা জানেন—সে আমাদের বন্ধু নয়, আমার বাবা বিশেষ করে তার সাক্ষীতেই জেলে গিয়েছিলেন?"

একেবারে দমে যায় সমীর বোস,—আস্তে আস্তে সে বললে "আমি তা জানি।"

সুযোগ পেয়ে ভারতী রুষ্টকণ্ঠে বললেন, "আপনি জানেন পলাশডাঙ্গা হারাতে হয়েছে আজ তারই জন্যে,—আমার বাবা আজ পথের ভিখারীও হয়েছেন তার জন্য? আমার গ্রামবাসী বহু লোক ধর্মান্তরিত হয়েছে, আমার দেশের সর্বনাশ হচ্ছে—এ সবের মূলে আছে সে এ কথাও নিশ্চয় জানেন? এ সব জেনেও আপনি বলতে চান তাকে আমি এখানে লুকিয়ে রেখেছি—"

নিজের কথা সংশোধন করতে সমীর বোস সসঙ্কোচে বললে, "আমি অবশ্য সরকারী ভাবে আসিনি ভারতী দেবী। কথাটা বিশ্বাস করতে পারিনি বলে অত্যন্ত সাধারণভাবে আপনাদের বন্ধুভাবে এসেছি আর সেই রকম ভাবেই কথাটা জিজ্ঞাসা করেছি। আমি আবার ক্ষমা চাচ্ছি ভারতী দেবী, আশা করছি এবারও আমায় ক্ষমা করবেন।"

ভারতী বললে, "ক্ষমা আমি আপনার চাইবার আগেই করেছি সমীর বাবু।"

সমীর বোস বললে, "এই লোকটা আমাদের প্রধান সাক্ষী, অথচ হাঁসপাতাল হতে যেদিন মুক্তি পাওয়ার তার আগের দিনে সকলের চোখে ধূলো দিয়ে কি করে যে পালালো আমি শুধু তাই ভাবছি। তাকে না পেলে আমাদের এ কেস কাঁচা হয়ে যাবে পুলিসের এ কলঙ্ক কোনদিনই ঘুচবে না। মনে করুন গভর্ণমেন্ট নিজে লড়তে নেমেছেন—"

সঙ্গে সঙ্গে ভারতী বললে, "নিশ্চয়ই গভর্ণমেন্টের প্রধান সাক্ষী

সে, একমাত্র তার কথাতেই গভর্নমেণ্টের হার জিত নির্ভর করছে, এটা বোঝা তার উচিত ছিল—।"

অকস্মাৎ সমীর বোস যেন সচকিত হয়ে ওঠে—"তার মানে—আপনি কি বলছেন ভারতী দেবী ?"

ভারতী হাসিমুখে বললে, "বিন্দুমাত্র খারাপ নয় সমীর বাবু। আজ ডেভিস গভর্নমেণ্টের প্রধান সাক্ষী রূপে যা পুরস্কার পাবে সেটা সে ভাবতে পারলে না এমনই মূর্খ সে। আজীবন হয় তো তাকে আর কাজ করতে হতো না, পায়ের উপর পা দিয়ে বসে নবাবের হালে দিন কাটাতে পারতো সে। নেহাৎ দুর্ভাগ্য তার, আর তার সে দুর্ভাগ্যে আমি সত্যই দুঃখিত সমীর বাবু। না না, আপনি পরিহাস মনে করবেন না সমীর বাবু, এতে আপনারও যে কত বড় ক্ষতি হয়ে গেল সেটাও আমি বুঝেছি। এই বৎসরেই আপনি একটা মস্ত বড় খেতাব পেতে পারতেন হয় তো, আপনার পদোন্নতিও হয়ে যেত। চাই কি—আই জি, অন্ততঃ পক্ষে ডি আই জির পদ আপনার মারতো কে ?"

ভারতী আজ প্রগল্‌ভা—হাস্যময়ী, জীবনে সে অনর্থক মিথ্যা কথা বলেনি, আজ অসঙ্কোচে অনর্গল মিথ্যাকথাও সে বলে যাচ্ছে।

সমীর বোসও একটু সচকিত হয়ে উঠেছে। মনে পড়ে কতকাল আগে সে ভারতীকে দেখেছে, সে ভারতী কথা বলতে পারেনি, তার পানে চোখ তুলে কোনদিন তাকায়নি। নিতান্ত অপরিচিতের মতই রতনমণি দত্তের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে সে এ বাড়ীতে এসেছে, নিতান্ত পরিচিতের মতই তার সম্বর্দ্ধনা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। কেবল সম্বর্দ্ধনাই নয়, ভারতীর প্রগল্‌ভতা তাকে অত্যন্ত বিস্মিত করে দিয়েছিল।

কিন্তু ভারতীর পরিচয়পত্র সে অনেক আগেই সংগ্রহ করেছে, তাই সে সাবধানতা গ্রহণ করে।

ভারতীর কথার কোন উত্তর না দিয়ে সমীর বোস বিনীত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, "একটু চা পেতে পারি ভারতী দেবী, বড় ক্লান্তি বোধ করছি।"

ভারতী প্রশান্ত মুখে বললে, "নিশ্চয়ই পাবেন, বসুন, আনতে বলছি।"

সে বার হয়ে গেল।

(২৭)

নিশ্চিন্ত হয়ে চেয়ারে বসে সমীর বোস একটা সিগারেট ধরালে।

টেবিলের উপর পড়ে আছে ভারতীর বই খাতা পত্রগুলো, অন্যমনস্কভাবে সমীর বোস সেইগুলো নাড়াচাড়া করে।

একখানা খাতার মধ্য হতে বার হয়ে পড়ে একখানা পত্র, আসছে চট্টগ্রাম হতে এবং সম্প্রতিই সেখানা এসেছে। ক্ষিপ্র হস্তে সমীর বোস পত্রখানা খুলে ফেলে।

চোখ তার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—

জয়ন্ত রায়ের পত্র—পলাতক আসামী জয়ন্ত রায়, চট্টগ্রামে রয়েছে সে ?

জয়ন্ত রায়—জয়ন্ত রায়—

সমীর বোস প্রসন্ন মুখে পত্রখানা অতি সাবধানে পকেটস্থ করে, তার পর নিশ্চিন্ত মনে পা দুখানা টেবলের উপর তুলে দিয়ে সিগারেট টানতে সুরু করে।

মিনিট পাঁচেক পরেই ভারতী ফিরলো—

তার সঙ্গে সঙ্গে এলো বালক ভৃত্য চায়ের কাপ ও বিস্কুট নিয়ে, সেগুলো সমীর বোসের সামনে সে সসম্ভ্রমে রেখে দিয়ে দাঁড়ায়।

স্মিত হাসি হেসে সমীর বোস বললে, "ধন্যবাদ, তবে বিস্কুটের দরকার নেই, কেবল চা পেলেই আমার যথেষ্ট হবে।"

চায়ের কাপে সে আস্তে আস্তে চুমুক দেয়—

"আমায় চা দেওয়ার প্রবৃত্তি আপনার হল ভারতী দেবী ?"

ভারতী বিস্মিত চোখের দৃষ্টি তার মুখের উপর তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করলে, "কেন বলুন তো ?"

সমীর বোস বললে, "আমরা এখন যে জায়গায় এসেছি তাতে খাদ্য খাদক সম্পর্কই বলা চলে; আপনার কাছে আমার চা চেয়ে খাওয়া যেমন অদ্ভুত, আপনার চা দেওয়াটাও তেমনই আশ্চর্যজনক।"

ভারতী বিবর্ণ মুখে একটু হাসে—

"কিন্তু সেই সঙ্গে আপনি এ কথাটা ভাবলে আশ্চর্য হতেন না সমীর বাবু, ভারতীয়েরা চিরদিনই অতিথিপরায়ণ। আমি হয় তো জানি, আপনি যে কোন মুহূর্তে আমার সর্বনাশ করতে পারেন, তবু আমার বাড়ীতে আপনি অতিথিরূপে যখন এসেছেন তখন আমি আপনার সেবা করতে বাধ্য। অতি বড় শত্রুকেও আমরা কোনদিন ফিরাইনি সমীর বাবু, সে দিক দিয়ে আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন।"

সমীর বোস শূন্য চায়ের কাপ টেবলে রাখলে; রুমালে মুখ মুছে সে বললে, "অশেষ ধন্যবাদ। আমি যে জন্য এসেছিলুম সে কাজ আমার হয়ে গেছে, এবার আমি ফিরতে পারি ভারতী দেবী। আপনাকে হয় তো শক্ত কথাও কিছু কিছু বলেছি, সে জন্যে আমায় মাপ করবেন।"

সে উঠে দাঁড়াল—

ভারতী শান্ত মুখে বললে, "আগেই বলেছি আপনার দোষ আমি কিছু পাইনি—কাজেই আপনি সেদিক দিয়েও নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।"

সমীরের মুখে ঈষৎ হাসির রেখা জেগে সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায়, একটা নমস্কার করে বললে, "আজ যখন বন্ধুভাবে আমায় গ্রহণ করলেন, আশা করছি মাঝে মাঝে এসে এরকমভাবে উত্যক্ত করলেও আপনি বিরক্ত হবেন না।"

তার সঙ্গে সঙ্গে চলতে চলতে ভারতী বললে, "কিন্তু আপনি আর না এলেই আমি বিশেষ খুশি হব সমীর বাবু।"

সমীর ফিরে দাঁড়ায়—"কেন ?"

ভারতী উত্তর দিলে, "আপনি পুলিসের লোক, যে-কোন লোক আপনাদের ঘনিষ্ঠতা সহ্য করতে পারে না। কথা আছে "বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা—" আপনাদের সম্বন্ধেও সেই প্রবাদ বাক্যটা আজও চলে আসছে সেটা বোধ হয় জানেন ?"

সমীর হেসে ওঠে—

"ভুল ধারণাটা আজও আপনার মনে বদ্ধমূল হয়ে আছে ভারতী দেবী। আচ্ছা, দিন আসুক, আমি আপনাকে প্রকৃষ্ট প্রমাণ দেব, পুলিসের লোক সবাই সমান নয়।"

সে বিদায় নিলে।

খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে ভারতী তার চলার পথের পানে তাকিয়ে থাকে; যখন তাকে আর দেখা গেল না তখন দরজাটা নিজের হাতেই বন্ধ করে দিয়ে সে নিজের ঘরে ফিরলো।

বিশ্বাস করতে পারে না সে সমীর বোসকে। সে যতই হাসি খুসির সঙ্গে কথা বলুক, তার তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল দুটি চোখের দৃষ্টি বড় অন্তর্ভেদী সে দৃষ্টি যেন অনেক কিছু জানতে চায়।

অকস্মাৎ ভারতী চমকে ওঠে—

কাল জয়ন্ত রায়ের একখানা পত্র এসেছে,—পলাতক জয়ন্ত রায়। চট্টগ্রাম হতে সে পালিয়েছে, তাদের ষড়যন্ত্র সেখানে ব্যর্থ হয়ে গেছে। সে সাঙ্কেতিক অক্ষরে পত্র দিয়েছে, তাদের সমিতির প্রত্যেকে এই সাঙ্কেতিক ভাষা জানে।

সে পত্রখানা ঠিক আছে কি?

ভারতী বিবর্ণ মুখে খাতা বই উল্টায়, এক একখানি করে পাতা দেখে। তার বেশ মনে পড়ছে গতকাল সন্ধ্যায় পত্রখানা এসেছে এবং সেখানা পড়ে সে এই খাতা বা বইয়ের মধ্যেই রেখেছে।

এত জোরে ভারতী অধর দংশন করে যে রক্ত বার হয়। অনেকক্ষণ বৃথাই খুঁজে বই খাতাগুলি মেঝেয় আছাড় দিয়ে ফেলে সে, দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে ভাবে।

না, তার উপর সমিতির দায়িত্ব অর্পণ করাই জয়ন্ত রায়ের ভুল হয়েছে, সে তার কাজ করতে অশক্ত। এতটুকু ভুলে সে কত বড় সর্বনাশ ডেকে আনলে, তার নিজের, জয়ন্ত রায়ের, তাদের সমিতির—

দরজার পরদা সরিয়ে সুদন একবার উঁকি দে—

তার সাড়া পেয়ে ভারতী সোজা হয়ে বসে—"এসো সুদনদা, তিনি চলে গেছেন—।"

সুদন আস্তে আস্তে প্রবেশ করলে—একখানা চেয়ার ধরে দাঁড়াল।

"আমি সব শুনেছি দিদিমণি।"

সুদনের কণ্ঠস্বর কাঁপছিল, "কিন্তু কেন—কেন তুমি ওই লোকটার সঙ্গে অভিনয় করতে গেলে দিদিমণি, কেন তুমি আমায় ওই লোকটার হাতে দিলে না?"

ভারতীর মুখে বড় বেদনার হাসি ফুটে ওঠে,—"কিন্তু তুমি যে আমাদের আশ্রিত সুদনদা—।"

"আশ্রিত—আশ্রিত—"

সুদনের মুখখানা কঠিন হয়ে ওঠে—"কিন্তু নিজে তুমি কতখানি নেমে গেলে দিদিমণি। আমি যে কোনদিন ধারণাও করতে পারিনি তুমি মিথ্যে কথা বলতে পারো, অত কথা বলতে পারো—অমনভাবে হাসতে পারো। কি করলে দিদিমণি,—কেন তুমি এরকম করলে, ওই লোকটার সামনে নিজেকে এত ছোট করলে?"

ভারতী স্থির-দৃষ্টি তার মুখের উপর রাখলে—করতে হয় সুদনদা, যা আমি নই তাও আমায় করতে হবে। কত বড় দায়িত্ব আমার উপরে তা তো তুমি জানো সুদন দা,—আমায় যে সব দিক বাঁচিয়ে চলতে হবে। আজও তুমি বড় অসুস্থ, এই কয়দিনের মধ্যে আগে ভালো হয়ে ওঠো তার পর দেখা যাবে কি করা উচিত।"

সুদন খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে, তারপরে বললে, "হ্যাঁ, আমি যা করব তা আমি জানি দিদিমণি, সেদিন আমি যা করব তা তুমিও দেখো।"

ভারতী নিস্তব্ধে থাকে; তার চিন্তাকুল মুখের পানে তাকিয়ে সুদন বললে, "আমার সম্পর্কে আর তেমন কোন ভাবনার কথা নেই দিদিমণি, তবু তোমায় দেখে মনে হচ্ছে আরও কি হয়েছে যা তোমায় বড় বেশী রকম ভাবিয়ে তুলেছে।"

ভারতী একটু হাসে, বললে, "সত্যিই তাই সুদনদা, আমি বড় ভাবনায় পড়েছি। আমার একটা জরুরী পত্র হারিয়েছে দেখছি, কাল সন্ধ্যায় সেখানা পেয়েছি।"

"পত্র হারিয়েছে—"

সুদনের দুই চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে।

আস্তে আস্তে ভারতী বললে, "হ্যাঁ, জয়ন্ত রায়ের পত্র সুদনদা, সে পত্রও নিতান্ত সহজ ছিল না—"

"বুঝেছি—"

সুদন উত্তেজিত হয়ে ওঠে—"কেবল আমার জন্যেই সমীর বোস আসেনি দিদিমণি, সে এসেছিল এই পত্রখানার জন্যেই। আমি ওঘর হতে সব কথা শুনেছি, যাওয়ার সময় তাই বলে গেল—আমি যে জন্যে এসেছিলুম, আমার সে কাজ শেষ হয়েছে তখন আমিও বুঝতে পারিনি, সে কেন এ কথা বললে—"

যে বিপদ মাথার উপর এসে দাঁড়িয়েছে তার গুরুত্ব ভারতী যেমন বোঝে, সুদনও তেমনই জানে।

কথা বলবার শক্তি তাই দুজনেরই থাকে না, তারা জানে অদূর ভবিষ্যতের কথা।

অনেকক্ষণ পর ভারতী মুখ তোলে—

ক্লান্ত হাসি হেসে বললে "যাক, যা হবার তা হয়ে গেছে, এখন আমাদের খুব সাবধানে থাকতে হবে কি বল সুদনদা? কিন্তু তুমি বোঝ সুদনদা, বৃটীশ রাজত্ব পাকা হয়েছে এই সব লোকের দ্বারাই, অথচ এদের এতে একমাত্র অর্থনৈতিক উন্নতি ছাড়া আর কোন লাভ নেই।"

সুদন গম্ভীর মুখে বললে "আর তুমিও বুঝতে ভুল করো না দিদিমণি—মানুষের কামাই হচ্ছে তাই। এককাল ছিল—অবশ্য কিছুটা প্রমাণ তার ছেলেবেলায় পেয়েছি—লোকে যখন এতটা স্বার্থপর হয়নি, পরের জন্য অন্ততঃপক্ষে কিছু দান করতো। আজকের দিনের সঙ্গে সে দিন মিলাতে যাব না দিদিমণি—সেইজন্যেই বলব সমীর বোসের মত লোকেরা চিরদিন এ রকম কাজ করে যাবে, দেশের সর্বনাশ করে ওরা আত্মোন্নতি করবেই।"

ভারতী উঠলো—

"আমি একবার ঘুরে আসি সুদনদা, আমাদের সমিতির কাউকে খবরটা দিয়ে আসি। কে জানে, সমীর বোস পত্রখানার মর্মোদ্ধার করে এখনই ওদের ওখানে গিয়ে হানা দেবে কিনা,—সেইজন্যেই ওদের সতর্ক করা দরকার—"

অত্যন্ত তাড়াতাড়ি সে বার হয়ে গেল।

(২৮)

পলাশডাঙ্গার বাড়ীতে নয়—ঠাকুরবাড়ীতে এসে উঠলেন রতন দত্ত।

মাত্র একদিনের জন্য তিনি এসেছেন, আগামীকাল তিনি চলে যাবেন।

ঐন্দ্রজালিকের মায়াকাঠির স্পর্শে সমস্ত পলাশডাঙ্গা শুধু নয়, আশপাশেরও একেবারে পরিবর্তন হয়ে গেছে, রতন দত্ত নিজের দেশকে দেখে চিনতে পারেন না। পদ্মদহ থাকায় মিল ফ্যাক্টরীর প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে—পদ্মদহের চারিদিকে বাঁধ পড়েছে, চারিধার ঘিরে প্রকাণ্ড একটি জনময় সহরের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এইসব কলকারখানার জন্য এসেছে হাজার হাজার লোক, তাদের জন্য তৈরী হয়েছে কত বস্তী, কত বাড়ী, কত ঘর—লোকজনে চারিদিক গম গম করছে।

কলের বাঁশি বাজে,

কারখানায় কাজ চলে—ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাজার শ্রমিক ঊর্দ্ধশ্বাসে ছোটে,—সন্ধ্যার আগে শ্রান্ত দেহে, ক্লান্ত মনে তারা নিজের নিজের ঘরে ফিরে আসে।

জীবনের স্বাধীনতা, চলাফেরার স্বাধীনতা, কথা বলার স্বাধীনতা তারা হারিয়েছে, পরাধীনতার নাগপাশে বাঁধা পড়ে তারা হারিয়েছে আশা, আনন্দ, তারা হারিয়েছে মনখোলা গানের ভাষা-সুর।

রতন দত্ত নিস্তব্ধে তাকিয়ে থাকেন—

সবুজের কোমলতা ঘুচে গেছে, ধূসর রুক্ষতায় চারিদিক ভরে গেছে। নীল আকাশের সৌন্দর্য ব্যাহত হয়েছে চিমনির ধোঁয়াতে,—ফুল আর ফোটে না, পাখী তার গান হারিয়ে ফেলেছে। একমুষ্ঠি অন্নের জন্য, একখানা কাপড়ের জন্য মানুষের এমন লোলুপতা তো ছিল না। সভ্য সমাজের আওতায় পড়ে তাদের অভাব শত গুণ বেড়ে গেছে, সে অভাব যত না মিটাতে পারছে ততই বাড়ছে চুরি ডাকাতি জুয়াচুরি প্রভৃতি, অর্থাৎ যে কোন রকমে পয়সা সংগ্রহ।

এই তো কয়েকটা বৎসর আগেকার কথা,—এখানকার এই সব লোকেরা পয়সাকে এত বড় করে চিনতে পারেনি, এরাই ছিল সরল ও স্বাভাবিক, সামান্য আয়ে সংসার চালিয়ে তারা ছিল অত্যন্ত সুখী। প্রায় প্রত্যেকেরই ছিল কিছু কিছু জমিজমা, বৎসরের ভাত কাপড়ের অভাব তাদের ছিল না। নগদ টাকা এবং কল ও কারখানায় কাজ করার প্রতিশ্রুতি পেয়ে প্রায় সকলেই সে সব জমি বিক্রয় করে ফেলেছে, আজকের দিনের কল্পনাও সেদিন কেউ করেনি। আজ তাদের ঘরে অন্ন নাই, গোয়ালে গরু না ;—দেহ যেমন ভেঙ্গেছে, মন তার চেয়েও শক্তিহীন হয়ে পড়েছে।

শ্যামলা পৃথিবী, শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা—

রতন দত্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

কলকারখানার চিমনিপথে অজস্র ধূম উঠছে, আকাশের নীল রং বদলে গেছে। এ অঞ্চলে কোন পাখী আর সকাল সন্ধ্যায় গান করে না,—বাগান ভরে আর ফুল ফোটে না।

বাগানবাড়ী আজও আছে—সেখানে রয়েছে কুন্দনময়ের ম্যানেজার সুন্দর সিং।

রতন দত্তের আসার সংবাদ পেয়ে তিনি ছুটে এলেন, সবিনয়ে বললেন, "আপনি এখানে কেন, বাড়ী চলুন।"

"বাড়ী—"

রতনমণি দত্তের মুখে হাসি ফুটে ওঠে, বললেন, "ধন্যবাদ সিংজী, কিন্তু যে বাড়ী বন্ধক রয়েছে, সে বাড়ীতে আমি উঠতে পারি নি। আপনার প্রাপ্য টাকাটা সংগ্রহ করছি, যত তাড়াতাড়ি পারি দিয়ে তবে আমি ও বাড়ীতে প্রবেশ করব।"

রতনমণি দত্ত ঠাকুরবাড়ীতেই থেকে গেলেন।

এলো সনাতন, মহেশ, বনমালি, এলো মোহন, বিহারী, ধর্মদাস প্রভৃতি। সে কালের প্রাচীন লোক এরা, কলকারখানায় কাজ করার সামর্থ্য এদের নাই, মনও নাই। এরা আজও নিজেদের এসব সম্পর্শ হতে তফাতে সরিয়ে রেখেছে। সনাতনের বাড়ীতে আজও এদের মজলিশ বসে, সেখানে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখবার আলোচনা হবে। এক মাস এরা কীর্ত্তনগান দেবে বলে ধর্মপুর হতে নারাণদাস বাবাজিকে নিয়ে এসেছে। মাত্র পাঁচ সাতদিন কীর্ত্তন হয়েছিল, এর মধ্যে মিশনারী সাহেবদের লোক এসে নোটিশ দিয়ে গান বন্ধ করে গেছে।

আশপাশে যতদূর দৃষ্টি যায়—সবটাই এখন ম্যাকিন্টাস সাহেবের জমিদারি, এখানকার সম্রাট তাঁকে বলা চলে। বৃটীশের আইন কানুনের উপর তিনি তাঁর অধিকৃত অঞ্চলের জন্য আরও কয়েকটি নূতন আইন তৈরী করে নিয়েছেন।

এ দেশের নিয়ম, আইন কানুন তিনি কিছু জানেন না, মানুষ বলে কাউকে তিনি গ্রাহ্য করেন না। অনেককাল আফ্রিকা জঙ্গলে থেকে কালো মানুষদের সম্বন্ধে তাঁর মনে যে ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে, সে ধারণা তাঁর সম্পূর্ণ অটুট রয়েছে।

কে যেন তাঁর কানে তুলে দিয়েছে—এই সব লোকেরা কীর্ত্তন গেয়ে লোকের কর্মশক্তি নষ্ট করছে, বৈরাগ্যময় ধর্মকে বাঁচাতে চায় এরা। তা ছাড়া সঙ্কীর্ত্তনের এই তুমুল কোলাহলে সাহেবেরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠছেন, আর দুচারদিন এ রকম চললে তাঁদের এখান হতে ছুটে পালাতে হবে।

সনাতনের দল মর্মাহত হয়েছে বড় কম নয়। তারা এইজন্যই গিয়েছিল রতনমণি দত্তের কাছে, তাঁকে এখানে তারা জোর করে নিয়ে এসেছে।

রতনমণি দত্ত তাদের আশ্বাস দিলেন, তিনি আজই বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করে এ সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করবেন।

সাহেব এখানে ফাদার নামে বিখ্যাত, তাঁর নামের খোঁজ কেউ নেয় না।

সেদিন ছিল রবিবার—

নূতন গঠিত ম্যাকিন্টাস সাহেবের নগরে প্রবেশ করে রতন দত্তের চোখে ধাঁধা লাগে।

পদ্মদহ আজও আছে, কিন্তু তার উচ্ছল স্রোত আর তীর ছাপিয়ে যায় না। তাকে ঘিরে উঠেছে কলকারখানা বস্তি বাজার দোকান। পিচঢালা চওড়া পথ এ দিক দিয়ে ওদিকে এঁকে বেঁকে চলে গেছে,—পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ঝরঝরে নগর।

রতনমণি দত্ত পিচঢালা চওড়া পথে হাঁটতে হাঁটতে যান।

আজ হারিয়ে গেছে রামজলার মাঠ, যার এদিকে দাঁড়িয়ে ওদিককার শেষ দেখা যেত না। চোখ মুদে আজও রতন দত্ত দেখতে পান—সবুজ রংয়ের ধান গাছগুলি বাতাসে নুইয়ে পড়ছে,—তাদের উপর ঢেউ দিয়ে বাতাস চলে যায়—কত দূর পর্যন্ত ছিল তার গতিবিধি। অত বড় পদ্মদহ হয়তো সঙ্কীর্ণ হতে সঙ্কীর্ণতর হতে হতে কোনদিন যাবে অতীতে মিশে,—ঐতিহাসিক কোন-

দিন ইতিহাসের পাতায় শুধু সেই কথাটি গেঁথে রাখবে—পদ্মদহের পূর্বতন এবং বর্তমানের এই কথাগুলি।

আজ রবিবার—

কলকারখানা সব বন্ধ। পথের ধারে ধারে বসেছে জলের কল, মেয়েরা সেখানে ভিড় লাগিয়েছে—গালাগালি ঠেলাঠেলি, অবশেষে মারামারিও যে না বাধছে তা নয়। এদেরই মধ্যে আছে অতীত দিনের কত লজ্জাশীলা বধূ,—আজ তাদের সে লজ্জা নাই, অসঙ্কোচে তাদের মধ্যে অনেকে—ওই সব পুরুষদের সংগে মিশে কলে কাজ করতেও যায়।

এই নূতন নগরের মাঝখানে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে ম্যাকিণ্টাস সাহেবের গির্জা; মিশনারী সাহেবেরা এখানে রীতিমত উপাসনা করেন, এখানে যারা খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছে সেই সব কালা আদমিরাও উপাসনায় যোগদান করে। এখানে থাকলে এতে তাদের যোগ দিতেই হবে, এ এখানকার একটি আইন। বড়দিনের সময়, গুডফ্রাইডের সময় এখানে বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, মিশনের সাহেবেরা ছোট ছেলেমেয়েদের কমলা লেবু, বিস্কুট, লজেঞ্চুস বিতরণ করেন, গরীব খৃষ্টানেরা এখানে সে সময় খেতেও পায়। তারা আরও পায়,—কম্বল, কাপড় প্রভৃতিও সাহেবরা অকৃপণ হস্তে দান করে থাকেন।

গির্জার সামনে দেখা গেল গোমেশ কৃষ্ণ বসাককে, সে দরজায় দাঁড়িয়েছিল—সম্ভব অভ্যাগতদের সম্বর্ধনা করবার জন্যই।

রতনমণি দত্তের মাসিক বারো টাকা বেতনের গোমস্তা রামহরির পুত্র কৃষ্ণ বসাক—খৃষ্টান হওয়ার সংগে সংগে তার খৃষ্টানি নাম গোমেশ নামের আগে যুক্ত হয়েছে।

আবলুসের মত কালো রং, সাদা ধবধবে পোষাক সে পরেছে—সত্যই তাকে মনোরম দেখাচ্ছে। লেখাপড়া শিখবার সুযোগ সে মধুগুরুর পাঠশালায় পেয়েছিল; চেটাই বিছিয়ে বসে খাকের কলমে তালপাতার উপর সেও একদিন অ আ ক খ লিখেছে, কিন্তু আজ সেকথা সে একেবারে অস্বীকার করে, ফাউণ্টেন পেন দিয়ে সে আঁকাবাঁকা ইংরাজী অক্ষরে নিজে নাম সাইন করতে পারে,—দু একটা ইংরাজী কথাও বলতে শিখেছে। একান্ত অনুগত পোষা কুকুরের মত সে সাহেবদের পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়ায়, হরকে নর এবং নরকে হর করে। একমাত্র তার কথাই সত্য বলে সাহেবরা মেনে নেন, কিন্তু বিশ্বাস করেন কিনা সে কথা কেউ জানে না।

পূর্বতন মনিবকে দেখে মাথার টুপি খুলে দুই পাটি শ্বেত শুভ্র দাঁত বার করে গোমেশ একবার মাথাটা নোয়ালো, বর্তমান যুগে সভ্যতাসূচক অভিবাদনের প্রকৃষ্ট পরিচয়—গোমেশ সভ্যতার কায়দাকানুন সব মুখস্থ করেছে।

কয়েক বৎসর আগেকার কথা মনে পড়ে যায়। গোমেশ তখন কেবলমাত্র কেষ্ট বসাক, মনিবকে দেখে সসম্ভ্রমে দশহাত পেছিয়ে নবাবী আমলের কুর্ণিশ চালাতো। আজকের দিনে সেই কেষ্ট বসাকের অসম্ভব উন্নতি হয়েছে স্বীকার করতেই হবে।

রতনমণি দত্ত তার পানে ফিরেও তাকালেন না। তাঁর মনে হচ্ছিল—স্বধর্মে নিধনও শ্রেয়তর, পরের ধর্ম সত্যই ভয়াবহ। এই গোমেশকে ধুতি পরলেই মানাতো, বিলাতি স্যুট তার যাকেই মানাক, একে মানাবে না।

গির্জার মস্ত বড় হলে চলছিল উপাসনা। সমস্ত হলটি লোকে ভরে গেছে, সাদামুখের সংখ্যা তাতে খুব কম, কালোমুখের সংখ্যাই বেশী।

এরা সবাই উপাসনায় যোগ দিয়েছে।

কিসের আশায় এই লোকগুলি স্বধর্ম ত্যাগ করেছে? নিছক ধর্মের অনুপ্রেরণায় নিশ্চয়ই নয়, রাজধর্মের প্রতি একটা আকর্ষণ, একটা উন্মাদনা নিশ্চয়ই আছে, সেই আকর্ষণেই এরা এসে পড়েছে।

রতনমণি দত্ত ইতিহাসের পাতা কোনদিনই উল্টান নি, অতীত যুগের ইতিহাস মূর্ত হয়েছে তাঁর শিক্ষিতা মেয়ের কাছে মেয়ের কাছে শোনা ইতিহাসই মনে মনে আলোচনা করেন তিনি। মুসলমান রাজত্বেও রাজধর্ম অনেককে আকর্ষণ করেছিল এবং সেই সব ধর্মান্তরিত লোকগুলিই করেছিল দেশের, জাতির এবং সমাজের সর্বনাশ, তার নিদর্শন আজও পাওয়া যায় হাজার জায়গায়।

এরা ঘরভেদী বিভীষণ, এরাই ঘরের সন্ধান দিয়ে এসেছে পরকে, এরা স্বার্থমোহে অন্ধ হয়ে জানে নি তাদের আত্মদানের ফলে কি হবে, নিজেরা তখন কোথায় দাঁড়াবে। রতন দত্ত কৃষ্ণ বসাকের নাম কলকাতায় থাকতে শুনেছেন, এখানে এসেও শুনেছেন। ডেভিস মধুসূদন দুয়ে কাজ শেষ করে সরে পড়েছে, ডেভিস মরেছে, বেঁচে রয়েছে এখন মধুসূদন, গোমেশের পথ পরিষ্কার হয়ে গেছে, তার উন্নতি অপরিহার্য।

ইংরেজ এদের চেনে, এদেশের লোকের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদের তারা হস্তগত করেছে কেবল মুখের কথা দিয়ে, এদের এতটুকু মাত্র প্রসাদ দিলে এরা খুসি হয় তা ইংরেজ জানে। এদের তারা বিশ্বাস করে নি কোনদিন, আজও করে না, ভবিষ্যতেও কোনদিন করবে না।

উপাসনা শেষে কৃষ্ণাঙ্গেরা একপথ দিয়ে বার হয়ে গেল, শ্বেতাঙ্গেরা অন্যপথে বার হয়ে এলেন। সমধর্মী হলেও কৃষ্ণাঙ্গদের তাঁরা তফাতে রেখেছেন, পাশে বসবার অধিকার দিলেও শ্বেতাঙ্গের মর্যাদা রক্ষায় তাঁরা সর্বদা সজাগ।

রতনমণি দত্তকে দেখে ফাদার ম্যাকিণ্টস যে খুসি হতে পারেন নি তা বোঝা গেল তাঁর মুখ দেখে, তবু আতিথেয়তা রক্ষা করতে তিনি ভুললেন না। সসম্ভ্রমে ভূতপূর্ব জমিদারকে চেয়ারে বসালেন, তাঁর কুশল জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—"কোন খবর না দিয়ে হঠাৎ আপনি এসেছেন মিঃ দত্ত—কোন দরকার ছিল নিশ্চয়ই ?"

রতন দত্ত একটু হেসে উত্তর দিলেন "দরকার নিশ্চয়ই আছে, সে কথা ঠিক, আর সেই দরকারেই এসেছি।"

ফাদার বললেন, "দরকারটা কি আমারই কাছে মিঃ দত্ত ?"

রতন দত্ত বললেন, "হ্যাঁ, আপনারই কাছে মিঃ ম্যাকিণ্টাস? আজ আপনাদের এই উপাসনা মুহূর্তে আমি এসে পড়ে ভাবছি ভালো করেছি না মন্দ করেছি। হয়তো এ সময়টায় না এলেই ভালো হতো।"

চতুর ম্যাকিণ্টাস বুঝতে পেরেছিলেন, তবু বললেন "আপনার কথা আমি বুঝতে পারছিনে মিঃ দত্ত।"

রতন দত্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "বুঝতে নিশ্চয়ই পারছেন মিঃ ম্যাকিন্টাস, তবু আমি বলছি—সত্যই আপনার ধর্মপ্রচারের ক্ষমতা অতুলনীয়, আর এ জন্যে আমি আপনাকে তারিফ করছি। আজ বুঝছি কেবল একদিকেই নয়, সবদিকেই আপনাদের দৃষ্টি আছে আর ক্ষমতাও আপনাদের আছে যে কোন রকমে—ছলে বলে কৌশলে মানুষকে করায়ত্ত করবার। আমি কেবল আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই মিঃ ম্যাকিন্টাস—আপনি লোকের ধর্মবিশ্বাস নষ্ট করতে যাচ্ছেন শুনলুম, এখানকার লোকেরা কীর্তনের আয়োজন করেছিল, আপনি জোর করে কেন তা বন্ধ করে দিলেন?"

"ও মাই গড—"

সাহেব হেসে ওঠেন—"ও, সেই সামান্য ব্যাপারটা এত বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে যাতে আপনাকে কলকাতা হতে এখানে টেনে এনেছে মিঃ দত্ত? আমি এজন্য অত্যন্ত দুঃখিত কিন্তু কোন উপায়ই নেই। আপনি ভুল বুঝেছেন মিঃ দত্ত, একমুখে শুনে বিশ্বাস করবেন না এ বিশ্বাস আমার আছে। আপনি জানেন—কতকগুলি লোক প্রায়ই এখানে গোলমাল বাধাবার চেষ্টা করছে, এদের উস্কানিতে প্রায় আমার কলে স্ট্রাইক হতে সুরু করেছে। অবশেষে কিছুতেই না পেরে এখানে দল বেঁধে কীর্তন লাগিয়ে এমন অতিষ্ঠ করে তুলেছে, যা বলা যায় না। গোমেশের কাছে শুনবেন —যারা খৃষ্টান হয়েছে তাদের উপর আপনার এই হিন্দুরা কি ভীষণ অত্যাচার, নির্যাতন করছে। আপনি জানেন না—যারা এখানে উপাসনায় যোগ দিতে আসে, তাদের পথ হতে ধরে নিয়ে গিয়ে জোর করে কীর্তনে যোগ দিতে বাধ্য করে। বিশেষ করে এই সব কারণেই আমিও বাধ্য হয়ে ওদের কীর্তন বন্ধ করে দিয়েছি। এই সব কালা লোকেরা আস্কারা পেয়ে মাথায় উঠেছে, তারা ভুলে গেছে আমরা ইংরেজ—আমরা রাজার জাত, ওদের শাসন করতে আমাদের বেশীক্ষণ যায় না।"

রতন দত্তের কান পর্যন্ত লাল হয়ে যায়।

কিন্তু আজ তিনি নামেই জমিদার—সেই সম্মানটুকুই তিনি পেয়েছেন, আর কিছু নয়। হয়তো আর কয়টা বৎসর পরে তিনি তাঁর জমিদারি ফিরে পাবেন, কিন্তু এ কোম্পানিকে উচ্ছেদ করা আর চলবে না, এরা স্থায়ীভাবেই এখানে বসেছে।

ম্যাকিন্টাস রতন দত্তকে সম্পূর্ণ সন্দেহ করেছেন—তাঁর কথার ভাবেই এটা বুঝা যায়।

রতন দত্ত যখন ফিরলেন তখন তাঁর পা টলছিল, মুখের স্বাভাবিকতা ছিল না।

আজ যারা এখানে ধর্মপ্রচার করতে, সঙ্গে সঙ্গে দুস্থ লোকদের অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করতে যারা এসেছে, তারা যে কতখানি বুদ্ধিমান সে কথা বলাই বাহুল্য। ধর্মপ্রচার তাদের একটা আবরণ মাত্র। ভবিষ্যতের ইতিহাসে লেখা থাকবে বর্বর ভারতবাসীদের জন্য ইংরাজ ধর্মযাজকদের অতুলনীয় আত্মত্যাগের কাহিনী, এই সব মূঢ় লোকদের মানুষ করবার জন্য তারা কত না কষ্ট স্বীকার করেছেন।

কিন্তু আসল কথা যে তা নয়, সে কথা কোনদিন প্রমাণ হবে কি? দেশ যদি কোনদিন স্বাধীন হয়, দেশবাসী গড়বে তখন তাদের ইতিহাস, সেই ইতিহাসে লেখা থাকবে এই ধর্মপ্রচারের প্রীতিটি কাহিনী। নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য হলেও কৌশলে এরা যা করেছে, সেদিনকার স্বাধীনতার ইতিহাসে সেকথা জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা থাকবে।

(২৭)

জয়ন্ত রায়ের খবর এসে দিয়েছে সুজিত।

পুলিশ তাদের দলের সন্ধান পেয়ে ধরতে এসেছিল, পুলিশের সঙ্গে তাদের প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ হয়েছিল এবং এই যুদ্ধে হত হয়েছে কয়েকটি তরুণ, তারা মরেছে তবু ধরা দেয় নি। কয়েকজন আহত হয়েছে, তাদের মধ্যে জয়ন্ত রায় একজন। এক অখ্যাত গ্রামে অতি সঙ্গোপনে সে রয়েছে,—যে পর্যন্ত না সুস্থ হয় সে ফিরতে পারবে না।

জয়ন্তের অবর্তমানে রজত সেন এখানকার কাজ চালাচ্ছিল, তার কাছে জয়ন্তের সমস্ত খবর জানা গেল। জয়ন্তের অবস্থা সাংঘাতিক, বাঁচবে কি না তা ঠিক বলা যায় না।

অধীর ভারতী বলে, "আমি একবার সেখানে যাব মিঃ সেন, আপনি যদি অনুমতি দেন, আমি আজই যেতে পারি।"

নেতা রজত সেন মাথা নাড়ে—"ক্ষেপেছেন মিস দত্ত, সেখানে যাওয়া যে কতখানি বিপজ্জনক সেটা একবার ভেবে দেখুন মনস্থির করে। মনকে প্রবোধ দিন, ও রকম অব্যবস্থচিত্ত নিয়ে আমাদের সমিতিতে কাজ করা চলে না মনে রাখবেন। মিঃ রায়ের সংস্রবে যে কেউ আছে, পুলিশ তাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে, কত নির্দোষ লোকও এর জন্যে উৎপীড়িত হচ্ছে তা তো জানেন না। আপনি সেখানে দেখতে বা সেবাশুশ্রূষা করতে যাবেন, সেটা যে শুধু আপনার পক্ষেই বিপজ্জনক হবে তা নয়, তাঁর পক্ষেও হবে। শিকারী কুকুরের মত গন্ধ শুঁকে পুলিশ সেখানে হাজির হবে, তারপরকার ঘটনাটা মনে করুন একবার—।"

ভারতীর মুখখানা অত্যন্ত বিবর্ণ হয়ে যায়, সে আস্তে আস্তে বাড়ীতে ফিরে আসে।

সুদন কতকটা সুস্থ হয়েছে। ভারতীর নিষেধ সত্ত্বেও সে আজ কোর্টে উপস্থিত হয়েছে এবং সাক্ষীর স্থানে দাঁড়িয়ে সে সাহেবদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে এসেছে। সত্য কথা বলতে সে সঙ্কুচিত হয়নি, অকুণ্ঠভাবে কোনদিকে না তাকিয়ে সে সব কথা বলে এসেছে।

তাকে যখন ডেভিস মধুসূদন নামে ডাকা হয়, সে স্পষ্টই প্রতিবাদ করেছে সে এখন ডেভিস নয়—শুধু মধুসূদন। তার খৃষ্টধর্ম গ্রহণের কথায় সে সজল চোখে করজোড়ে জানিয়েছে—সে বাস্তবিক পক্ষে হিন্দু, মিশনারী সাহেবরা তাকে অনেক প্রলোভনে ভুলিয়ে খৃষ্টান করেছিলেন, নিজের ভুল বুঝতে পেরে সে আবার হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছে।

বাপ পিতামহের ধর্ম সে যে মুহূর্তের মোহে ভুলে ত্যাগ করেছিল, সে জন্য সে যে এখন ভীষণ অনুতপ্ত হয়েছে তা তার কথায় স্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

সে বেশ জানে—যতদিন না রতন দত্ত নিজের জমিদারি ফিরে

পান, সে আর পলাশডাঙ্গায় ফিরবে না, নির্ভয়ে সে সাহেবদের বিরুদ্ধে যা খুসি তাই বলে যেতে দ্বিধাবোধ করলে না।

বাড়ীতে ফিরে ভারতীর মুখখানা দেখে সে আশ্চর্য হয়ে গেল। মহানন্দে সে বাড়ী ফিরেছে—। গিয়েই ভারতীকে জানাবে এককথায় পাশা উল্টে দিয়ে এসেছে, একমাত্র তার সাক্ষ্যেই বাজিমাত হয়ে গেছে।

রতনমণি দত্ত দুইদিনের জন্য পলাশডাঙ্গায় গিয়ে সাতদিন রয়ে গেছেন সেখানে, হয়তো সেখানে কিছু অঘটন ঘটনাও ঘটে গেছে, সুদন তাই ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে—"কি হয়েছে দিদিমণি, পলাশডাঙ্গার কোন খবর এসেছে নাকি?"

ভারতী মাথা নাড়ে—"না সুদনদা, বাবা সেখানে ভালোই আছেন, আজ খবর পেয়েছি।"

"তবে—"

সুদন প্রশ্ন করে—"জয়ন্ত রায়ের খবর পাওয়া গেছে?"

ভারতী ভেঙ্গে পড়ে—সত্যই ভেঙ্গে পড়ে সে। নিঃশব্দে তার দু চোখ ছাপিয়ে অশ্রুর বন্যা ছুটে আসে, গোপনে তা মুছলেও সুদনের চোখ এড়ায় না।

গম্ভীর মুখে সুদন বসে থাকে—ভারতীর মুখেই সে সব কথা শুনেছে প্রায়।

শান্ত কণ্ঠে সে বললে, "না দিদিমণি, ওখানে তোমার যাওয়া সত্যই উচিত হবে না। আমায় তুমি হুকুম দাও, আমি বরং চট করে একবার ঘুরে আসি সে দেশটা। অনেককাল ধরে ওখানকার চন্দ্রনাথ আর এদিকে কামাক্ষ্যা, ভুবনেশ্বরী দেখবার ইচ্ছা আছে, হিন্দু হয়েছি—এখন অনায়াসে পুজোটা দিয়ে আসতে পারব কি বল? আমি তো ভবঘুরে লোক, কেউ আমার দিকে নজর দেবে না, সন্দেহও করতে পারবে না, সেই জন্যেই আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব। জয়ন্ত রায় কোথায় আছে—কার বাড়ীতে—সেই খবরটা তুমি শুধু ঠিক জেনে আমায় জানিয়ে দিয়ো, আমি গিয়ে তাঁকে দেখে আসি।"

উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে ভারতী—"তুমি যাবে সুদনদা—তুমি?"

পরমুহূর্তে সে বিমর্ষ হয়ে পড়ে—

"নাঃ, তা হতে পারে না সুদনদা। জয়ন্ত রায় ফাঁসির আসামী—কোন সূত্রে তার সন্ধান পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসির দড়িটাই এগিয়ে আসবে।"

সুদন মলিন হাসি হাসে—বললে, "আমি তা জানি দিদিমণি। কিন্তু তবু তোমায় ভরসা দিচ্ছি—তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, তাঁর সেবার ভার আমি নিয়েছি এ খবর তুমি পাবে। আমায় তুমি এটুকু বিশ্বাস কর দিদিমণি, তোমাদের জন্যে আমি সব করতে পারব, তোমাদের কাজে আমার জীবনও যদি যায় তাতেও আমার এতটুকু কষ্ট হবে না দিদিমণি।"

ভারতী অকস্মাৎ সচকিত হয়ে ওঠে—

আজই যেন সে সুদনকে চিনতে পারে—আজই সে প্রথম ভাবে এই লোকটি নির্বাকে তার সমস্ত আদেশ কিরকমভাবে প্রতিপালন করে গেছে, তার দুনিয়া একদিকে আর ভারতী একদিকে—।

কিন্তু সুদন—ভারতীর সুদন দা—

নিঃশব্দে কখন চলে গেছে সুদন, একটা ছোট সুটকেসে সামান্য দুই একখানা কাপড়জামা নিয়ে সে যাত্রা করেছে চট্টগ্রামের নাম না জানা এক পল্লীর উদ্দেশ্যে।

স্থির হয়ে বসে থাকে ভারতী—

সুদনকে সে চিনতে পারেনি।

পিতাকে সে পত্র দেয়—যত সত্বর পারেন তিনি যেন চলে আসেন। সুদন কোথায় চলে গেছে, একা ভারতী বাড়ীতে থাকতে পারে না। অকারণেই তার চোখে জল আসে।

সে বেশ জানে—সুদন আর ফিরবে না। আজও সে বড় দুর্বল, তার স্বাস্থ্য আজও ফেরেনি; আজও সে ঔষধ খায়, অল্প অল্প হাঁটে। বার বার সে নিজেকে প্রশ্ন করে—এই অসহায় লোকটিকে সে কেন যেতে দিল, কেন তাকে জোর করে ধরে রাখলে না? ভারতীর চোখের জল সুদনকে ব্যাকুল করে তুলেছিল, ভারতীকে সান্ত্বনা দিতে ভারতীর প্রিয় জয়ন্ত রায়ের কাছে গেছে সে।

বিশেষ করে আজ তার কথাটাই ভারতীর মনে জাগে—

(৩০)

"আমি ঘরে আসতে পারি—?"

অকস্মাৎ চমকে ওঠে ভারতী।

প্রশ্ন করবার সঙ্গে সঙ্গে দরজার পরদা সরিয়ে ঘরে প্রবেশ করলে সমীর বোস,—স্মিতহাস্যে তার সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত।

"নমস্কার মিস দত্ত, ভালো তো—?"

অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবেই সে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে, অনুমতি পাওয়ার অপেক্ষাও করে না।

স্পর্ধা পেয়ে এই লোকটি কতখানি অগ্রসর হয়ে এসেছে ভারতী তার পরিচয় জানে বলেই কোনদিন কিছুর প্রতিবাদ করতে পারে নি—পিতা ও জয়ন্তের জন্য সে অনেক কিছু সহ্য করে চলেছে।

তবু আজ সে সইতে পারলো না। তার শয়নকক্ষে সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কীয় একটি যুবকের এমনভাবে প্রবেশ করা সে সহ্য করতে পারে না।

স্খলিত অঞ্চলখানা তাড়াতাড়ি গায়ে তুলে দিয়ে ভারতী উঠে দাঁড়াল, বিরক্তিপূর্ণ মুখে সমীর বোসের পানে তাকিয়ে রুষ্টকণ্ঠে সে বললে, "আশা করছি আপনি বৈঠকখানায় বসবেন—আমি সেখানে যাচ্ছি।"

নির্লজ্জভাবে সমীর বোস হাসে—

"আপনি আজ রাগ করতে পারেন না মিস দত্ত, কেন খবর না দিয়ে কেবলমাত্র বন্ধুত্বের খাতিরে আমি একা আপনার এ ঘরে প্রবেশ করলেও নিতান্ত একা নই, পুলিশে আপনাদের বাড়ী ঘিরে ফেলেছে। ওদের আমি নেহাৎ ভদ্রতা রক্ষার জন্যই ভিতরে ঢুকতে দেই নি—আমি একাই এসেছি। আপনার বিশ্বাস না হয়, নিজে দেখতেও পারেন আমার কথা সত্য কিনা।"

"পুলিশে বাড়ী ঘিরেছে—তার মানে—"

ভারতী হাঁফিয়ে ওঠে—"আপনি কি বলতে চান সমীরবাবু—আপনি—আপনি—"

সমীর বোস পকেট হতে একখানা কাগজ বার করে ভারতীর চোখের সামনে ধরলো, বললে, "দেখুন, সার্চ করবার অনুমতি না নিয়ে পুলিশ আসে নি। আর যাই হোক, পুলিশ অমন বেআইনী কাজ করে না ভারতী দেবী, পুলিশকে আপনি এটুকু বিশ্বাস করতে পারেন। জরুরী অবস্থা বিবেচনা করে এই মুহূর্তে আপনাদের বাড়ী সার্চ করবার কথা, শুধু তাই নয়—আপনাকে গ্রেপ্তার করবার হুকুমও আমার উপর এসেছে।

ভারতীর মুখখানা সাদা হয়ে যায়, মুহূর্তের জন্য সে বিহ্বল হয়ে পড়ে—

পরমুহূর্তে সে কঠিন হয়ে ওঠে, শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, "কিন্তু কি অপরাধে তা জিজ্ঞাসা করতে পারি?"

সমীর বোস শান্ত হাসি হেসে বললে, "অপরাধ যে কি সেটা আমার চেয়েও আপনি বেশী জানেন ভারতী দেবী; অপরাধ রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, অপরাধ বিপ্লবী দলে মিশে অপানার কার্যাবলী। কিন্তু এ জন্যে আমায় যেন অপরাধী করবেন না—আমি গভর্ণমেণ্টের চাকর মাত্র, ওদের হুকুম তামিল করতে আমি বাধ্য। চাকরের স্বাধীনতা থাকে না, অন্যায় জেনেও যে কোন হুকুম মেনে চলতে সে বাধ্য হয়—"

বলতে বলতে সে থামে, একটা দম নিয়ে সে বললে, "এ সম্বন্ধে আপনার সেদিনকার কথা মানতে আমি বাধ্য, পোষা কুকুরের চেয়েও আমরা অধম,—কারণ কুকুরেরও স্বাধীনতা থাকে, আমাদের তা নেই। যাক, আসল কথায় এবার আসি—আপনার অপরাধটা কি ত বলে দেই, অপরাধ আপনি বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছেন, পলাতক নেতা জয়ন্ত রায়ের আপনি দক্ষিণ হস্ত। আপনার মত সুন্দরী ও শিক্ষিতা মেয়েকে দলে নিয়ে তার লাভ হয়েছে বই ক্ষতি হয় নি, কিন্তু আপনি—"

"কে বললে—কে বললে আপনাকে—এ সব মিথ্যা কথা—"

ভারতী একখানা চেয়ারে ভর দেয়—।

দৃঢ়কণ্ঠে সমীর বোস বললে, "না, মিথ্যে কথা নয়। আপনি কি জানেন ভারতী দেবী, জয়ন্ত রায় পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে, সে অসুস্থ হলেও পুলিশ তাকে এখানে নিয়ে আসবার জন্য রওনা হয়েছে? তার কাছে আপনার ফটো আর কতকগুলো চিঠিপত্র পাওয়া গেছে যাতে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় আপনি তাদের দলের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করেছেন।"

"ধরা পড়েছে—জয়ন্ত রায় ধরা পড়েছে—"

এই মুহূর্তে তার সমস্ত দৃঢ়তা হারিয়ে ফেলে ভারতী, দুই হাতে মুখ ঢেকে সে একখানা চেয়ারে বসে পড়ে।

সমীর বোস বলে চলে, "হ্যাঁ, ধরা পড়েছে জয়ন্ত রায়; এক গ্রামে এক মুসলমান কৃষকের বাড়ীতে সে আশ্রয় নিয়েছিল, আপনি মধুসূদনকে তার কাছে পাঠিয়েছিলেন, সে ফলমূল নিয়ে গিয়েছিল। আপনার কাছে মিথ্যাকথা বলব না, আর কেউ না চিনলেও আমি মধুসূদনকে চিনেছিলুম, আর তার অনুসরণ করেই আমি জয়ন্ত রায়কে ধরতে পেরেছি।"

"উঃ—"

একটা মাত্র শব্দ বার হয় ভারতীর মুখ হতে; কিন্তু সে মুহূর্তমাত্র, তারপরেই সে সামলে নেয় নিজেকে—।

"ধন্য আপনাদের অনুসন্ধিৎসাশক্তি; আপনাদের মত লোক আজও আছেন বলেই বৃটিশ সাম্রাজ্য আজও টিঁকে রয়েছে। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—সুদনদাকেও গ্রেপ্তার করেছেন নিশ্চয়ই—?"

বিকৃতমুখে সমীর বোস বললে, "ওঃ, আপনার সুদনদার কথা আর বলবেন না, একখানা ভেল্কি দেখিয়ে গেল লোকটা। এত বড় ব্যারাম হতে উঠে তার হাতে যে এত শক্তি থাকতে পারে আমরা কেউই তা বিশ্বাস করিনি। আমাদের নেলসন সাহেব তার এক গুলীতে ভবলীলা সাঙ্গ করলেন, আর পাঁচ সাতজনকে ঘায়েল করে শেষ গুলীটা নিজের বুকে বিঁধলে লোকটা—শেষ একটা কথা বলে গেল—"আমার কাজ শেষ হয়েছে বলবেন।" কিন্তু কাকে যে বলব সেই কথাটাই শুধু বলে গেল না—।"

"সুদন দা—হতভাগ্য সুদনদা—"

দুইহাতে মুখ ঢেকে ক্ষুদ্র বালিকার মতই ফুলে ফুলে ভারতী কাঁদে।

কাকে বলে গেছে সে কথা আর কেউ না জানুক—সে জানে। হায় হতভাগ্য সুদন দা—

সমীর বোস নিস্তব্ধে তার পানে তাকিয়ে থাকে—তারপর আস্তে আস্তে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে, "কাঁদবেন না ভারতী দেবী,—বরং ভগবানের কাছে তাঁর পতিত আত্মার মুক্তির জন্যে প্রার্থনা করুন—"

"থামুন—থামুন—"

ভারতী মুখের হাত নামাবার সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে—"আর যে কেউ হোক ভগবানের নাম নিক, আপনি নেবেন না—হ্যাঁ, আপনি ও নাম মুখে আনবেন না বলে দিচ্ছি। আর যে কোন লোককে প্রতারণা করুন, ভগবানকে করতে যাবেন না—তিনি সবই দেখছেন। ক্ষমা সকলেই পাবে, আপনি যে পাবেন সে আশা ভ্রমেও করবেন না।"

সমীর বোস যেন অকস্মাৎ চাবুক খেয়ে বিবর্ণ হয়ে যায়, হঠাৎ আর কথা বলতে পারেনি।

ভারতী রুক্ষ কণ্ঠেই বলে যায়—"সুদন দার আত্মা পতিত, কোন সাহসে আপনি একথা বলতে চান সমীর বাবু? একদিন সে যে ভুল করেছিল সমস্ত দেহ মন দিয়ে এতদিন ধরে সে প্রায়শ্চিত্ত করেছে, শেষকালে সে নিজের জীবন পর্যন্ত আহুতি দিয়েছে, একে আপনি পতিত বলতে চান, পাপী বলতে চান? নিজের বুকে হাত দিন সমীর বাবু, কান দিয়ে নিজের বুকের বাণী শুনুন— শুনুন আপনার বিবেক কি বলছে।"

সমীর বোস হেসে ওঠে—"ধন্যবাদ, কিন্তু আমি পাপীই হই আর পতিতই হই তাতে কারও কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নেই ভারতী দেবী। যাক, বলুন, আমি ওদের ভিতরে আসবার কথা বলি, অনেকক্ষণ ওরা অপেক্ষা করছে। হ্যাঁ, তার আগে আর একটা জিনিস দেখাই আপনাকে—

পকেট হতে একখানা পত্র বার করে সে—

"নিজের নির্দোষীতা প্রমাণের চেষ্টা করবেন না, ভারতী দেবী, এই পত্রখানাই প্রমাণ দিচ্ছে—জয়ন্ত রায়ের সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এই পত্রে আপনাকে কতকগুলি কাজ করবার নির্দেশ দেওয়া আছে কিনা তা আপনিই বলুন।"

"দেখি—দেখি—"

ভারতী হাত বাড়ায়—।

সমীর বোস পত্রখানা ভাঁজ করে আবার পকেটে রাখে, শান্ত কণ্ঠে বলে, "আমি এমন বোকা নই যে আপনি চাইতেই এমন জীবন্ত প্রমাণটা আপনার হাতে দেব। এ প্রমাণ রইলো আমার কাছে, সময় বুঝে এ প্রমাণ দাখিল করব মিস দত্ত—।"

ভারতী একান্ত অসহায়ের মত হাত দুখানা কচলায় মাত্র, কোন কথাই সে আর বলে না।

সমীর বোস বলে চলে, "আপনার বাবার বিরুদ্ধেও অনেক প্রমাণ আমরা সংগ্রহ করেছি যাতে তাঁকে অনায়াসে দশ বছর না হোক, সাত বছরের জন্যেও জেলে বাস করতে হবে—"

"সয়তান—"

ভারতী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে—"বন্ধুবেশে, ভাবে এই সব প্রমাণ সংগ্রহ করতে আপনি এতদিন ধরে এসেছেন?"

সমীর বোস গম্ভীর মুখে বললে, "কিন্তু ভুল করবেন না ভারতী দেবী, আমি আই বি ডিপার্টমেন্টের একজন কর্মচারী এবং আমার কাজই হচ্ছে এই। ছলে বলে কৌশলে, বন্ধুভাবে শত্রুভাবে লোকের সঙ্গে মিশে প্রমাণ সংগ্রহ করাই আমার কাজ।"

ভারতী জলন্ত চোখে সমীর বোসের পানে তাকিয়ে থাকে, তারপর চোখ ফিরায়, ধীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, "কিন্তু আমার বাবার অপরাধটা কি—কি প্রমাণ আপনি সংগ্রহ করেছেন?"

সমীর বোস উত্তর দিলে, "রত্নমণি দত্তের জীবনে অপরাধপ্রবণতা এত বেশী যা আঙ্গুলে গুণে বলা চলে না ভারতী দেবী। তিনি দীক্ষা নিয়েছিলেন যাদের কাছে সেই মা আর মামা—"

অধৈর্য ভাবে ভারতী মুখে আঙ্গুল তোলে, "চুপ, আপনার ও মুখে তাঁদের নাম উচ্চারণ করবেন না, সাবধান করে দিচ্ছি। সমীর বোস গম্ভীর মুখে বলে চললেন—আমরা প্রমাণ পেয়েছি বিপ্লবী নেতা কিশোর মিত্রের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন তিনি, ভিতরে ভিতরে তিনি অনেক কাজ করে গেছেন, আজও করছেন। আমি যদি বলি—আপনাদের এই বাড়ী বিপ্লবীদের মিলবার পরামর্শ করবার একটা প্রধান কেন্দ্র, আপনি কি তা জোর করে অস্বীকার করতে পারেন ভারতী দেবী?"

ভারতী কি বলতে গিয়ে চুপ করে যায়।

সমীর বোস বলে চলে, "আমি প্রমাণ করব আপনার এই বাড়ীতে আপত্তিজনক অনেক কিছু আছে—যার জন্যেও আপনারা গ্রেপ্তার হতে বাধ্য। বিপ্লবীরা অত্যন্ত নিরাপদে এখানে তাদের কাগজপত্র, এমন কি অস্ত্রশস্ত্র—যেমন বোম, রিভলভার, ছোরা প্রভৃতি রেখে যায়—আপনি পারেন এ কথা অস্বীকার করতে?"

দুই হাতের মধ্যে মুখখানা রেখে ভারতী স্থির ভাবে বসে থাকে, মনে হয় যেন তার নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে গেছে

শুকতারা সম যে ফুল তোমার বুকের আঁচলে ঢাকা

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

কত কল্পন লতায়ে লতায়ে ভরেছ আমার শাখা,
কবির মতন বিহ্বল হয়ে একদা বিজন রাতেঃ
শুকতারা সম যে ফুল তোমার বুকের আঁচলে ঢাকা
তারা কি শুকায়ে এলো অনুরাধা! কালের দৃষ্টিপাতে?
মনবাতায়ন ভেঙে পড়ে তব হৃদিবিতানের বুকে,
আশার সৌধ যুগকম্পনে চিহ্নবিহীন হোলো।
তোমার কাঁকণ ছন্দে বাজে না আমার সারেঙ্-সুখে,
অনুরাধা! আজ প্রেমের কথাটী ভোলো।

আকাশে যে চাঁদ উঠেছিল তব অভিসার তিথিক্ষণে,
মরে গেছে সে কি? মরে গেছে-তার কবিতার মধুরিমা!
মাধবী রাতের তারার সভায় আলোর উদ্বোধনে
সে কি ফিরে পাবে জীবনপথের সীমা?
যে বনে দুজনে দুলেছিনু বসে দোলনচাঁপার কাছে
যৌবন দিনে যমুনার উপকূলে,
জ্যোছনা ধারায় নাহন করিবা লতাগুল্মের মাঝে
সে বনে আগুন লেগেছে দেখেছ? বনস্পতির মূলে
দেখেছ হাজার প্রাণীদের মৃতদেহ,
গাঁয়ের মানুষ আছে কি জীবিত কেহ?

সূর্যপ্রণাম করেছি যেথায় ভোরের বাত্রস মেখে
সেথায় শ্মশান কঙ্কালে ঢাকা রয়।
পাখীরা কুলায় বসে নাক,—দূরে উড়ে উড়ে যায় ডেকে
মোর কাছে বিস্ময়!
বাসনা আমার বকুলের মত পথে হের ঝরে যায়
যুগদেবতার রথের চাকায় দলিত মথিত সে যে,
তোমার খোঁপায় মিছে তারে তুলে রেখে দিলে মমতায়,
সৌরভ তার কোথাও আছে কি বেঁচে?

কোম্পানীর আমলে সরকারী প্রাসাদ ও ইমারত বাটী

শ্রীসোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পলাশীর যুদ্ধে দৈব-দুর্ব্বিপাকে ইংরাজদিগের জয় ও বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার পরাজয় ঘটিলে কোম্পানী বাহাদুর অতঃপর ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের অভ্যন্তরে তাঁহাদের কুঠি সংরক্ষিত রাখিবার কোনও আবশ্যকতা অনুভব করিলেন না। ব্যবসা-বাণিজ্যের অবাধ প্রসার হওয়াতে এখন হইতে কলিকাতা সহরের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভব হইল। দলে-দলে য়ুরোপীয় বণিকগণ পল্লীর বিভিন্নাংশে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন। প্রথমে, বহুবাজার ও চৌরঙ্গী হইতে ধর্ম্মতলা এবং জানবাজার পর্য্যন্ত যে পথ দুইটি গিয়াছে তাহার উভয় পার্শ্বে কোম্পানী বাহাদুরের উদ্যোগে একাধিক অট্টালিকা ও বিশাল হর্ম্ম্য গাঁথিয়া তোলা হইল। এই সুদীর্ঘ নির্ম্মিত পথদ্বয়ের মাঝামাঝি বিস্তৃত স্থানগুলি তখন অসংখ্য গ্রাম, মাঠ, হ্রদ ও নালা নর্দ্দমা দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিত, কিন্তু সহরের আয়তন বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক্ষণে সরকার ঐগুলি বিনষ্ট বা সংস্কার করিতে প্রয়াস পাইলেন। কালক্রমে ঐসকল গ্রাম বা জনপদের কেবল মাত্র নাম ভিন্ন অপর কোনও অবশিষ্ট চিহ্ন রহিল না।

কলিকাতা পুনরুদ্ধারের পর ক্লাইভ যে অট্টালিকাখানি দখল করেন, তাহা পরে তাঁহার স্থায়ী বাসগৃহে পরিণত হয়। ডাঃ বাষ্টিডের মতানুসারে, ঐ প্রাসাদোপম বাটী—বর্ত্তমান Royal Exchange এর নিকটবর্ত্তী "The Play House" নামক একটী—বিশাল রঙ্গালয়ের পশ্চাদভাগে—কোনও অংশে অবস্থিত ছিল। ঐ রঙ্গালয়টী ফিলিপ ফ্রান্সিস স্বয়ং ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে মাসিক ১০০ পাউণ্ড হারে ভাড়া করেন। এই বাড়ীখানির (ক্লাইভের) নামানুসারেই 'ক্লাইভ ষ্ট্রীটের' ঐরূপ নাম হয় বলিয়া প্রকাশ। পক্ষান্তরে, ১৭৯৫ খৃঃ অব্দের কোন অজ্ঞাত গৃহনির্ম্মাতার রোজনামা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ক্লাইভ Lyons Range এ বাস করিতেন। আনুমানিক বিশ বৎসর পূর্ব্বে (১৭৭৫) ফ্রান্সিস এই বাটীখানিও ভাড়া করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে, সমসাময়িক কলিকাতায় তখন নাকি ঐরূপ উৎকৃষ্ট বাসভবন আর একখানিও দৃষ্ট হইতনা। ১৭৪২ খ্রীঃ অব্দে Upjohn নামক কোনও ব্যক্তিরদ্বারা অঙ্কিত কলিকাতার একখানি নক্সায় দেখা যায়, শ্রীযুক্ত আয়ারের বাসবাটী সেণ্ট অ্যান গীর্জ্জার উত্তরাংশে অবস্থিত ছিল। অজ্ঞাত diary লেখক Writers' Buildings-এর পশ্চাদ্ভাগেই উহার স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন।[১] Upjohn এর নিজস্ব নক্সাখানির (১৭৯২-৩) প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে পাঠক দেখিতে পাইবেন—, থিয়েটার ষ্ট্রীটের নূতন নাট্যশালাটীর পূর্ব্বভাগে আয়ার-ভবন স্থিত; থিয়েটার ষ্ট্রীট উহাদের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান নয়া চীনাবাজারের নিকটস্থ কোনও স্থানে নাট্যশালাটী দণ্ডায়মান ছিল বলিয়া জানা যায়। Lyons Range হইতে উহার দূরত্ব অধিক নহে।

সুদীর্ঘকাল অবরুদ্ধ থাকার ফলে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের প্রভূত ক্ষতি হয়।[২] গভর্ণর বাহাদুর স্বয়ং উহার অভ্যন্তরে বাস করিতেন। কামানের গোলার আঘাতে তাঁহার আবাসগৃহ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া গেলে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া দুর্গ প্রাচীরের বাহিরেই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ১৭৬৭ খৃঃ অব্দে গভর্ণর ভবনখানি মেরামত করিবার প্রস্তাব হয়। দুর্গ অবরোধকালে গভর্ণর এই প্রাসাদে একদিন মাত্র বাস করিয়াছিলেন। লং বলেন, কালক্রমে উহা স্থায়ী Government House এ পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু এস্থলে বলিয়া রাখা ভাল যে, এই

১। ২৮শে অক্টোবর, ১৭৩৫ ও ৩০শে অক্টোবর, '৩৫ এর entry বা লিখিত জায়।

২। সত্য। কিন্তু গভর্ণর বাহাদুর উহা আদৌ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ বর্ত্তমান।

দি ওল্ড্ কোর্ট হাউস্ (আনুমানিক ১৭৮৪)

বাটীখানির identification সমস্যা লইয়া যে অনিশ্চয়তার উদ্ভব হইয়াছে অদ্যাপিও তাহার মীমাংসা হয় নাই। কোর্ট অব ডাইরেক্টরসকে উদ্দেশ করিয়া লিখিত, ৩১ ডিসেম্বর ১৭৫৮ তারিখের একখানি পত্রে দেখা যায়, কলিকাতা কৌন্সিল ১২,০০০৲ টাকার বিনিময়ে শ্রীযুক্ত ড্রেকের বসতবাটীখানি ক্রয় করিয়াছিলেন। পুরাতন দুর্গের অপ্রয়োজনীয় অংশাদি (ইট, কাঠ, লৌহ) প্রতিবন্ধকী-ভূত সামগ্রী হিসাবে তখন বাহিরে সরাইয়া ফেলা হইতে-ছিল। কোম্পানী মহোদয় স্থির করিলেন ড্রেকের বাটী-খানি ঐ সকল মালমশলা রাখিবার গুদাম এবং পরিষ্কৃত ও নবীভূত দুর্গটাকে সামরিক সেনানিবাসে পরিণত করা হইবে। নূতন দুর্গের নির্ম্মাণ সমাপ্ত হইলে অতঃপর উহার আবশ্যক রহিল না। নানাকারণে ইহাই অধিকতর সম্ভাব্য বলিয়া মনে হয় যে, পরবর্ত্তী কালের বাঙ্কশাল হাউস ও উপরোক্ত গভর্ণরভবন অভিন্ন ছিল। ১৮১২ খৃঃ অব্দে বাড়ীখানি ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। তখন উহা সংস্কারের শেষ দশায় উপনীত হইয়াছিল। বর্ত্তমান Small Cause Court যেস্থানে অবস্থিত, পুরাতন বাঙ্কশাল যে সেইস্থানেই নির্ম্মিত হইয়াছিল এমত প্রমাণের অভাব নাই। সমসাময়িক মানচিত্র ও নক্সাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া লেখক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ইমারতটী গঙ্গানদীর তীরে দণ্ডায়মান ছিল। ১৮৯০ খৃঃ অব্দে আদালতের পশ্চিমদিকস্থ সীমানার প্রসারণকালে, কয়েক মাইল ব্যাপিয়া খননকার্য্য চালানো হয়। তাহার ফলে ভূগর্ভস্থ একটী বিরাট প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ লোকসমক্ষে আত্ম-প্রকাশ করে। একশত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত বাঙ্কশাল প্রাসাদের পার্শ্ববর্ত্তী লাগাউ "নূতন ডকের" দক্ষিণাংশের প্রাচীর বলিয়া ইহা প্রমাণিত হইয়াছে (১৭৯০ খৃঃ অব্দে ইহার নির্ম্মাণ সুরু ও ১৮০৮ খৃঃ অব্দে সমাপ্ত হয়)।

গভর্ণমেণ্ট ভবনটী যে ঠিক কোথায় অবস্থিত ছিল, তাহা এক্ষণে আর জানা যায় না। মঁসিয়ে গ্রাঁপ্রে নামক জনৈক উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ লিখিত Voyage in the Indian ocean and to Bengal" গ্রন্থের (১৭৮৯ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত) এক পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে, বড়লাট বাহাদুর স্বয়ং এস্প্লানেডের নিকট একটী "সুদৃশ্য অট্টালিকায় বাস করিতেন, যদিচ উহা তাঁহার ন্যায় ক্ষমতাবান ও পদস্থ ব্যক্তির বাসের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী ছিল।"৩ ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে বেলির অঙ্কিত একখানি রঙ্গীণ তক্ষণচিত্রে দেখা যায় এই প্রাসাদটী Government Place East ও এস্প্লা-

৩। ফরাসী দেশীয় ভদ্রলোক বঙ্গদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন সম্বন্ধে যারপরনাই অভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

নেডের সঙ্গম-স্থলে দণ্ডায়মান ছিল। এস্‌প্লানেড বলিতে তখন ধর্ম্মতলা হইতে বরাবর যে পথটী গঙ্গা অবধি চলিয়া গিয়াছে তাহাকেই বুঝাইত।

ইহার পশ্চিমে অনতিদূরেই Council Houseএর ইমারত দুইটী নির্ম্মাণ করা হয়। বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট প্রাসাদের জমির উপর ইহাদের ভিত্তি সংস্থাপিত ছিল। জুন ২২, ১৭৫৮ তারিখে মন্ত্রণা-রিপোর্ট পাঠে অবগত হওয়া যায় যে আনুমানিক প্রায় এক বৎসরের কাছাকাছি কোম্পানীর কোনও নিজস্ব পরামর্শ কক্ষ অথবা (Council Room) মন্ত্রী (Secratary) ও সরকারী হিসাব নবিসদিগের ব্যবহারের জন্য সভাগৃহ (বা উপযুক্ত মিলন স্থান) ছিল না। ইহার জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে সময় সময় অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। কাজে কাজেই তাঁহারা স্থির করিলেন যে অতঃপর স্বর্গতঃ শ্রীযুক্ত রিচার্ড কোর্টের বাসগৃহটী তাঁহারা ক্রয় করিয়া লইবেন এবং ঐ উদ্দেশ্যে উহা যথাবিহিতরূপে ব্যবহার করিবেন। ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে কোম্পানীর নূতন কৌন্সিল-ভবন নির্ম্মিত হইলে উক্ত শ্রীশ্রীকোর্টের বসতবাটীখানির আর কোন প্রয়োজন রহিল না।৪ এস্‌প্লানেডের মধ্যস্থলে নূতন কৌন্সিল হাউস হইতে "বড়দীঘি" (আধুনিক লাল দীঘি) পর্য্যন্ত যে রাস্তাটী গিয়াছে কেবল মাত্র সেটী ও তৎসলগ্ন কয়েক বিঘা জমিকেই ঐ নাম (অর্থাৎ এস্‌প্লানেড) দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া আমাদের জানা আছে।

সরকারী সমাধি ভূমির নিকট আর একখানি সুবৃহৎ অট্টালিকা অবস্থিত ছিল বলিয়া প্রকাশ। কোম্পানীর আমলে উহা হাসপাতালরূপে ব্যবহৃত হইত। অতি অল্প দিনের মধ্যেই বাড়ীখানি পরিত্যক্ত হয় ও দীর্ঘকাল সংস্কার অভাবে দ্রুত ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইতে থাকে। প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে ঝড়বৃষ্টির আশু আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া একাধিক পথচারী এই স্থানে প্রাণ হারাইত এমন বহু গুজবেরও অভাব নাই। যতদূর মনে হয় ভগ্নপ্রায় অট্টালিকার কোনও ইট কাঠ অথবা লৌহ প্রস্তর হঠাৎ স্থানচ্যুত হইয়া পথিকের প্রাণহানি ঘটাইয়া থাকিবে। কোম্পানীর তখন হাসপাতালের জন্য একটী পৃথক বড়ীর অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। কিন্তু পছন্দ মত বাড়ী সংগ্রহ করা ততটা সহজ হয় নাই। অবশেষে ১৭৬৮ খৃঃ অব্দে জনৈক দেশীয় ভদ্রলোকের নিকট হইতে একখানি বাড়ী ক্রয় করা হইল। এস্‌প্লানেডের দক্ষিণাংশে সুবিস্তীর্ণ ময়দানের উপর উক্ত বাটীখানি অবস্থিত ছিল। ১৭৯৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত সর্ব্বসাধারণ উহাকেই Presidency General Hospital বলিয়া জানিতেন। এই সুদীর্ঘ ২৭ বৎসরের মধ্যে উহার বহুপ্রকার সংস্কার করা হয়, কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে কোম্পানী মহোদয় শীঘ্রই এই বাড়ীখানিও ভাঙ্গিয়া ফেলিতে আদেশ দিলেন। শুনা যায়, ঐ স্থলে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত প্রথায় নাকি পরে একটী সুদৃশ্য হাসপাতালবাটী তৈয়ার করা হইয়াছিল।

জনসাধারণের স্বাস্থ্যের নিরাপত্তার জন্য অপেক্ষাকৃত অবারিত উন্মুক্ত বায়ুপূর্ণস্থানে নূতন হাসপাতালের ভিত্তিস্থাপনা করা হইল। কিন্তু নিকটেই সমাধিভূমি ছিল। অতএব সরকার ইহা বন্ধ করিয়া দিলেন। বর্ষা-ঋতুর সমাগমের বহুপূর্ব্বেই দক্ষিণ পার্ক ষ্ট্রীটের নূতন গোরস্থানটীর নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইয়াছিল। ১৭৬৭ খৃঃঅব্দের ২৫শে আগষ্ট কোম্পানীর যে পরামর্শ-সভার অধিবেশন হয় তাহার রিপোর্টে এই মর্ম্মে উল্লেখ আছে: সভাপতির বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, নূতন সমাধিভূমি অতঃপর সাধারণের ব্যবহারের নিমিত্ত সরকারীভাবে উদ্‌ঘাটিত করা হইল। শ্রীযুক্ত ভান্‌সিটার্টের উদ্যানবাটীর নিকট উহা অবস্থিত। সভাপতি পাদ্রী মহোদয়কে অনুরোধ জানাইতেছেন যে তিনি যেন অবিলম্বে উহা পূজা-অর্চ্চনাদির দ্বারা পূত করিয়া লন। মহামারীর সময় আসন্ন প্রায়।"

বর্ত্তমান ফ্রীস্কুলষ্ট্রীটের ঐ নামের পশ্চাতেও কিঞ্চিৎ ইতিহাস আছে। কিয়ের্ণাণ্ডের নামক জনৈক প্রটেষ্টাণ্ট যাজক আনুমানিক ১৭৮৭ খৃঃ অব্দে ঐস্থানে একটী দাতব্য বিদ্যালয়, একটী গীর্জ্জা ও তৎসংলগ্ন একটী সমাধিভূমির ভিত্তিস্থাপনা করেন। কিন্তু ঋণের দায়ে অতি অল্পকালের মধ্যেই ঐগুলি সরকারে ক্রোক্‌ করা হয়। সৌভাগ্যবশতঃ শ্রীযুক্ত চার্লস গ্র্যাণ্ট নামক Mission Church সঙ্গত সভার এক সভ্যের চেষ্টায় ঐগুলি রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু কিয়ের্ণাণ্ডের মহাশয়ের উহাতে আর কোমও সত্ত্ব রহিল

৪। শ্রীশ্রীকোর্ট রিচার্ডকোর্ট।

না। ১৭২৫ খৃঃ অব্দে চুঁচুড়ার ওলন্দাজ কর্ত্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে কিয়ের্ণাণ্ডের সপরিবারে তথায় গমন করেন। অতঃপর কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলে উক্ত বিদ্যালয় পরিচালনার ভার তাঁহারই হস্তে অর্পণ করা হয়। কিয়ের্ণাণ্ডের আনুমানিক বিশবৎসর ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮০০ খৃঃ অব্দে তিনি পদত্যাগ করেন ও কলিকাতা দাতব্য বিদ্যালয় নামে স্কুলটী যৌথভাবে অন্যান্য দুই একটী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্মিলিত হয়।৫ রিচার্ড বুর্সিয়ের নামক কলিকাতা কৌন্সিলের জনৈক সদস্য এবং Master Attendant এই বিদ্যালয়ের পত্তন করিয়াছিলেন। কালক্রমে ইনি বোম্বাই প্রদেশের শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত হন। কলিকাতায় Mayor's Court স্থাপিত হইলে বুর্সিয়ের কোর্টের কর্ম্মচারীগণের জন্য একটি Court House বা আদালতবাটী নির্ম্মাণ করান। সরকার উহা ব্যবহার করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, বুর্সিয়ের কোন প্রকার মূল্য বা ক্ষতিপূরণ না লইয়াই বাটীখানি হস্তান্তর করেন। কিন্তু সর্ত্ত থাকে এই যে, প্রতিবৎসর ৪০০ শত পাউণ্ড ভাড়া হিসাবে কোম্পানী দাতব্য চিকিৎসালয়ের তহবিলে প্রেরণ করিবেন। সেণ্ট্ আনড্রু গীর্জ্জা যেখানে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার অনতিদূরে আদালতবাটীখানি অবস্থিত ছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। প্রায় ষাটবৎসর-কাল বাড়ীখানি অক্ষত অবস্থায় থাকে; কলিকাতা অবরোধকালে Mayor's Court এর সভ্যবৃন্দ এই অট্টালিকার একাংশে বাস করিতেন, অন্যান্য মহলগুলি সরকারের বিভিন্ন কার্য্যে ব্যবহৃত হইত। ১৭৬২ খৃঃ অব্দে Court House এর আয়তন আরও বৃদ্ধি করা হয়। কর্ত্তৃপক্ষ বাটীর দক্ষিণাংশে, প্রথম ও দ্বিতীয় তলার সহিত ২৫ ফুট প্রশস্ত দুইটী বারান্দা, একটী পান-প্রকোষ্ঠ ও উহার দুই পার্শ্বে একাধিক বক্রাকার খিলান সমন্বিত দুইটী কক্ষ সংযোগ করিয়াছেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল বাড়ী খানিকে একাধারে বণিকদিগের সঙ্ঘ (Exchange) ডাক ঘর (Post office), ত্রৈমাসিক ফৌজদারী আদালত (Quarter-Sessions office), সাধারণের প্রমোদ গৃহ (Public entertainment) ও সভাগৃহে (Assembly room) পরিণত করেন। বাটীখানির ভাড়া বাৎসরিক দুই সহস্র টাকায় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে উহার কলেবর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাড়ার হারও-উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত করার প্রয়োজন বোধ হইল। ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে বাটীখানির মাসিক ভাড়ার পরিমাণ ছিল আটশত সিক্কা রৌপ্যমুদ্রা। পুরাতন আদালতবাটীর 'সুখের কাল' অধিকদিন স্থায়ী হয় নাই। Mayor's Court কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই উঠিয়া গিয়াছিল। আধুনিক ক্লাব, থিয়েটার সভাগৃহের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার উহার সাধ্য ছিল না। অবশেষে নর্ত্তন-কক্ষের মেঝেগুলিও জীর্ণ হইয়া পড়িলে উহা ভাঙ্গিয়া ফেলা ভিন্ন গত্যন্তর রহিল না। ১৭৯২ খৃঃ অব্দে Old Court House ধূলিসাৎ হইলে রহিল শুধু তাহার নাম। প্রায় বিশ বৎসরেরও অধিককাল জায়গাটী শূন্য পড়িয়াছিল। ১৮১৫ খৃঃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট ঐস্থানে স্কটল্যাণ্ড দেশীয় পুরোহিত সম্প্রদায়কে একটী গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিতে অনুমতি প্রদান করেন।

এই সময় লোকালয় হইতে বহুদূরে, পৃথকভাবে অবস্থিত হেষ্টিংস নামক ক্ষুদ্র সহর-তলিতে জনসমাগম সুরু হয়। প্রথমে কোম্পানী বাহাদুরের কার্য্যের জন্য ইংলণ্ড হইতে আগত শ্রমজীবী ও স্থপতিগণের জন্য হেষ্টিংসে একটি অস্থায়ী উপনিবেশ নির্ম্মিত হইয়াছিল, পরে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের পদস্থ কর্ম্মচারিগণ এখানে আসিয়া বাসোপযোগী বহু সুরম্য অট্টালিকা ও বাঙ্গলা প্রস্তুত করাণ।৬ বহুকালাবধি হেষ্টিংসকে দেশীয় ভাষায় 'কুলি

৫। This charity School, which in 1800 was amalgamatrd with the Calcutta free School, was founded, as far back as 1727, by public Subscription for the purpose of "educating poor European children in the Protestant religion" —স্থানীয় church records পাঠে এইরূপ অবগত হওয়া যায়।

৬। ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের মেরামত কার্য্যও ঐসময় প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু কোনও কারণে Contractor (ঠিকাদার) ও কারিগরদিগের মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হওয়াতে উহা শেষ পর্য্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় নাই। উপায়ান্তর না দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষ বাধ্য হইয়া ইংলণ্ড হইতে বহুসংখক রাজমিস্ত্রী ও পেশাদার মজুরীকে আনাইয়া লন। ইহাদের বেতনের হার ছিল বৎসরে ৬০ হইতে ৭০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত।

বাজার' বলিয়া অভিহিত করা হইত। ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে মার্কুইস অব হেষ্টিংসের সম্মানে "টালীর নালার" উপর নূতন হেষ্টিংস সেতু নির্ম্মিত হইলে উহার নামানুসারে ঐ পল্লীকে হেষ্টিংস বলিয়া ডাকা হইতে থাকে। এই

হেষ্টিংস্ হাউস্, আলিপুর

পায়ে-চলা নাতিদীর্ঘ পুলটীকে ভারতের প্রথম লৌহ সাঁকোটী বা Iron agnoduct বলা হয়। সাঁকোটী ছিল ১৪১ ফুট দীর্ঘ ও ৮ ফুট প্রশস্ত, একটী থাড়াই বাঁ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া উহার দুই পার্শ্ব বেষ্টন করিয়া থাকিত। সাধারণতঃ রাহী পথিক ও মালবাহী গোযান ইত্যাদি 'হেষ্টিংস' সেতুর উপর দিয়া চলাচল করিত। অন্যান্য যানবাহনাদি গমনাগমন করিতে পারে এই উদ্দেশ্যে সরকার ১৮৯১ খৃঃ অব্দে পায়ে-চলা পুরাতন সেতুটীর উত্তরে আর একটি পুল নির্ম্মাণ করান। ঐ সময় পুরাতন পুলটী ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। উহার একটী পিল্লার উপর তাম্রফলকে নিম্নলিখিত অনুশাসন লিপিটী উৎকীর্ণ ছিল :

"মহানুভব ফ্রান্সিস হেষ্টিংসের মার্কুইস, শ্রীলশ্রীযুক্ত ইত্যাদি, ইত্যাদি ভারতের শাসনকর্ত্তা ও প্রধান সেনাধ্যক্ষের আনুকূল্যে, ভারতে এই সর্ব্বপ্রথম লৌহনির্ম্মিত সেতুর ভিত্তিস্থাপন করা হইল। "Lt. G. Aug. Setta Lch, Act. Mas, Mas., Anno Domini 1822, June 1st ; Anno Lucio 5226," ৭

১৭৬০ খৃঃ অব্দে মীরজাফর ক্লাইভ কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইলে তাঁহার স্থলে তাঁহার জামাতা মীরকাসেমকে বাঙ্গলার নবাবী প্রদান করা হয়। পদচ্যুত বৃদ্ধ মীরজাফর কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে ইচ্ছুক হওয়ায় কলিকাতা বোর্ড তাঁহাকে সানন্দে অনুমতি দিলেন। কোনও কারণে ইংরাজদিগের রক্ষণাবেক্ষণে থাকা মীরজাফরের পক্ষে তখন একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। একমাত্র কলিকাতা ভিন্ন বঙ্গের আর কোন স্থানে এই সুবিধা মিলিত কি না সন্দেহ।

মীরজাফর আলিপুর অঞ্চলে বাস করিতে লাগিলেন। মুসলমান প্রথানুযায়ী তাঁহার নামানুসারে প্রতিবেশটী 'আলিপুর' বলিয়া অভিহিত হইল। কালীঘাট, ভবানীপুর, দুর্গাপুর প্রভৃতি হিন্দুনামের মধ্যে 'আলিপুর', 'বেগমবাড়ী' 'সাহেব বাগান' জাতীয় শব্দ দেখিয়া এই সকল স্থানে যে পূর্ব্বে একাধিক মুসলমান উপনিবেশ ছিল—একণে এমন ধারণা করিতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। অনেকে অনুমান করেন, জাফর আলী বর্ত্তমান ২৪ পরগণার জজ কোর্টের নিকট একখানি বাগান বাটীতে বসবাস করিতেন। ১৭৬৩ খৃঃ অব্দে কোম্পানী বাহাদুর তাঁহাকে সিংহাসন ফিরাইয়া দিলে উদ্যান সংলগ্ন জমিজমা সমেত নবাব-ভবন ওয়ারেন হেষ্টিংসের দখলে চলিয়া যায়। সম্ভবতঃ কৃতজ্ঞ মীরজাফর হেষ্টিংসের সদয় ব্যবহারে অভিভূত হইয়া বাড়ীখানি বড়লাট বাহাদুরকে উপহার দেন। ইহার বহুকাল পরে হেষ্টিংস প্রসিদ্ধ "টালীর নালা" ও "হেষ্টিংস ভবন" গাঁথিয়া তোলেন।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস যে স্বয়ং আলিপুরে "হেষ্টিংস হাউসে"ই বাস করিতেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। দুর্ভাগ্য বশতঃ ঐতিহাসিক নজীরের গুরুত্ব অগ্রাহ্য করিয়া অনেকে "বেলভেডিয়ারের" স্কন্ধে এই সম্মান অর্পণ করিয়া থাকেন। ইহার কারণও আছে। শ্রীযুক্তা ফে নামক জনৈক আইনজীবির পত্নী ১৭৮০ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ড হইতে কলিকাতায় আসেন ও কলিকাতা হইতে তাঁহার স্বদেশীয় আত্মীয় বন্ধুকে পর্য্যায়ক্রমে কয়েকখানি পত্র লেখেন। ভাষা ভাব ও ভঙ্গীর দিক দিয়া অনবদ্য হইলেও পত্রগুলি সব সময়, সকল ক্ষেত্রে সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা

৭। Lt. General Aug. Schalch সম্বন্ধে স্থানান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।—লেখক।

করিয়া চলে নাই। শ্রীযুক্তা ফে স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে, ১৭৮০ খৃঃ অব্দে হেষ্টিংস পত্নী বেলভেডিয়ার প্রাসাদে বাস করিতেছিলেন ও এই সময় তাঁহার সহিত শ্রীযুক্তা ফের সাক্ষাৎ হয়। এই ঘটনার প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে শ্রীযুক্তা ফে কোনও পারিবারিক গোলযোগ বশতঃ দায়রা সোপরদ্দ হন ও তাহার স্বামী তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। স্বদেশে থাকিলে অযথা কলঙ্কের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া অসম্ভব বুঝিয়া শ্রীক্তা ফে অবিলম্বে ইংলণ্ড হইতে কলিকাতায় চলিয়া আসেন ও গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে দর্জ্জির ব্যবসা গ্রহণ করেন। চার্চ্চ লেন ও হেষ্টিংস ষ্ট্রীটের এককোণে তাঁহার দোকান অবস্থিত ছিল। উহার সম্মুখেই বিস্তীর্ণ গীর্জ্জার প্রাঙ্গণ। স্থানীয় যজমান সভার কাগজপত্র পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সম্মুখস্থ গীর্জ্জার পশ্চাদভাগের প্রাচীর অতিক্রম করিয়া যথেষ্ট পরিমাণে রৌদ্র ও বাতাস শ্রীযুক্তা ফের দোকানে প্রবেশ করিতে পারিত না বলিয়া তিনি কর্ত্তৃপক্ষের নিকট ঐ মর্ম্মে অনুযোগ করেন। (১৩ই এপ্রিল, ১৭৮৯)। কাগজ পত্রে, শ্রীযুক্তা ফের দোকানকক্ষ সমেত পুরাতন বাসগৃহটীকে "পূর্ব্বেকার ডাকঘর" (Post-office) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।৮ চার্চ্চ লেনের গীর্জ্জাটী নির্ম্মিত হইলে পুরাতন ডাকঘরের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। এতদ্ব্যতীত, স্থানাভাবহেতু নিকটবর্ত্তী সমাধিভূমি হইতে আরও কয়েক বিঘা জমি লইয়া চার্চ্চ লেনের সহিত যোগ করিলে উহারও সমধিক প্রসার হয়। শ্রীযুক্তা ফের পুরাতন বাসাবাটীখানি আজও দেখা যায়। গীর্জ্জার প্রাচীর তেমনই আছে বলিয়া গীর্জ্জার কর্ত্তৃপক্ষের সহিত উক্ত বাটীর বাসিন্দাগণের রৌদ্র-বাতাস লইয়া বিবাদ-বিসম্বাদের আজও মীমাংসা হয় নাই।

এইবার আলীপুর ও বেলভেডিয়ার-প্রসঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তন করা যাউক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শ্রীযুক্তা ফে ভ্রম বশতঃ "হেষ্টিংস হাউসের" পরিবর্ত্তে "বেলভেডিয়ার হাউসকে" হেষ্টিংস-পত্নীর বাসস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই মারাত্মক প্রমাদ কয়েক পুরুষ পরম্পরায় উত্তরাধিকারসূত্রে সঞ্চারিত হইতে থাকিলেও ইহার সম্বন্ধে কেহ কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই। সৌভাগ্যবশতঃ, ১৭৮০ খৃঃ অব্দে হেষ্টিংসের সহিত ফ্রান্সিসের যে

খিদিরপুর হাউস (১৭৯৪)

দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয় তাহার বিবরণে উক্ত ভ্রম সংশোধনের চেষ্টা করা হইয়াছিল। আহত হইলে ফ্রান্সিসকে শ্রীযুক্ত টালি ওরফে ফলি মহোদয়ের বসতবাটী বেলভেডিয়ারে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হয়।৯ শ্রীযুক্ত টালি ছিলেন জনৈক পদস্থ যন্ত্রাধ্যক্ষ। সরকার বাহাদুর গোবিন্দপুর নালাটী তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন। ঐ নালার মধ্য দিয়া যে সকল জলযান যাতায়াত করিত, শ্রীযুক্ত টালি ইচ্ছামত তাহাদের উপর মাশুল ধার্য্য করিতেন। টালি ঐ নালাটী আরও গভীর করিয়া খনন করান ও উহা অধিকতর নাব্য হইয়া উঠে। ফলে, তাঁহার ইজারা মাত্র দ্বাদশ বৎসরের জন্য হইলেও সরকারের অনুগ্রহে উহার মেয়াদ অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বর্দ্ধিত করিয়া দেওয়া হয়। ১৭৮৪ খৃঃ অব্দে টালি পরলোকগমন করিলে নালাটী উপেক্ষিত হয় ও উহার গর্ভে পলি পড়িতে থাকে। ১৮০৬ খৃঃ অব্দে নালাটীকে পুনর্ব্বার খনন ও উহাকে দৈর্ঘ্যে আরও ১৬ (ষোল) মাইল বিস্তৃত করা হয়। কলিকাতার হিন্দু-

৮। ইহা হইতেই Old Post Office Street নামের উৎপত্তি।

৯। ভ্রান্তিক্রমে একাধিক ব্যক্তি Tolly-র পরিবর্ত্তে Foley নাম ব্যবহার করিতে ইতস্ততঃ বোধ করেন নাই।

দিগের নিকট নালাটী অত্যন্ত সম্মানের বস্তু ছিল। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে, কালীঘাটের কালীমন্দির প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব্বে পূতসলিলা ভাগীরথী ঐ পথেই প্রবাহিতা হইতেন। জানা যায়, মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বে একাধিক ব্যক্তি তাঁহাদের প্রিয়জনকে এইস্থানে বহন করিয়া আনিতেন। নালার কর্দ্দমাক্ত ও পঙ্কবহুল কিচড়ের উপর শায়িত হইয়া তাঁহারা অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন অতঃপর তাঁহাদের নশ্বর দেহ ভস্মীভূত করা হইত। অবশিষ্ট অস্থি ইত্যাদি তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত আত্মীয়স্বজন পবিত্র নালার সলিলে নিক্ষেপ করিতেন।

সম্ভবতঃ নালার নিকটবর্ত্তী হইবে এই মনে করিয়া শ্রীযুক্ত টালি "বেলভেডিয়ার" খরিদ করেন। আমার কিন্তু ধারণা যে উহাই তাহার একমাত্র কারণ নহে। নবাব জাফর আলির আলিপুরে অবস্থিতিকালে তাঁহার পরিবার ও অনুচরবর্গের সংখ্যা এইরূপ অধিক হইয়া উঠিয়াছিল যে, আলিপুরে সকলের যথাযথ স্থান সঙ্কুলান হয় নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইহার প্রায় এক শতাব্দী পরে অযোধ্যার পদচ্যুত নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ ও গার্ডেন রীচের নাম করা যাইতে পারে। শ্রীযুক্ত টালি কোলাহল মুখরিত, অতি-পূরিত (congested) আলিপুরে বসবাস করিতে চাহেন নাই। তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে, সহর হইতে দূরে, অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ অঞ্চলে বেলভেডিয়ার প্রাসাদের সন্ধান মিলে। ইউরোপীয় প্রথায় সুসজ্জিত, নির্ম্মিত ও আসবাবপত্র সমন্বিত এই অত্যুৎকৃষ্ট অট্টালিকাখানি পাছে হাতছাড়া হইয়া যায় এই আশঙ্কায় তিনি অবিলম্বে উহা ক্রয় করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই।

বেলভেডিয়ার ময়দানে আরও কয়েকখানি বাড়ী ছিল। বর্ত্তমান কৃষি ও উদ্যান কর্ষণবিদ্যা সমাজ (Agri Horticultural Society) এক্ষণে এইস্থানে অবস্থিত। অধিক দিন হয় নাই, এই উদ্যানের একাংশে একটী ধ্বংসপ্রায় সমাধি আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনুমান, উহা মুর্শিদাবাদ নবাব পরিবারের কোনও বেগমের সমাধি।১০

১৭৮৪ খৃঃ অব্দে টালি পরলোকগমন করেন ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর অনতিকাল পরে বেলভেডিয়ার বিক্রয় করিবার কথা হয়। সংবাদপত্রে উক্ত মর্ম্মে বিজ্ঞাপনও দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে কেহ বাটীখানি ক্রয় করিতে চাহেন নাই। ১৮০২ খৃঃ অব্দে স্বর্গত কর্ণেল উইলিয়াম টালির এ্যাটর্ণী পুনর্ব্বার বেলভেডিয়ার বিক্রয় করিতে উদ্যোগ করেন। বিজ্ঞাপণে এইরূপ লিখিত ছিলঃ "প্রকাণ্ড সুপ্রশস্ত বেলভেডিয়ার ভবন বিক্রয়ার্থে মজুত আছে।" লণ্ডনে ইহার ভাড়া বাৎসরিক ৩৫০ পাউণ্ড হিসাবে প্রদেয়। বেলভেডিয়ারের সহিত আরও দুইখণ্ড জমি লাটে বিক্রয় করিবার প্রস্তাব হয়। "বেলভেডিয়ার সেতু হইতে উহারা যথাক্রমে "বেলভেডিয়ার হাউস" পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৮০৯ খৃঃ অব্দে তৃতীয় বারের জন্য বেলভেডিয়ার বিক্রয় করিবার কথা উঠিলে নূতন বিজ্ঞাপণ দেওয়া আবশ্যক হইল। কিন্তু তাহাতেও বিশেষ ফল পাওয়া গেল না। অবশেষে ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে শ্রীযুক্ত চার্লস প্রিন্সেপ উহা ক্রয় করিয়া লইলেন।

১৭৯৪ খৃঃঅব্দে অঙ্কিত Upjohn-এর মানচিত্রে দেখা যায়, বেলভেডিয়ার ভবনের সীমানা দক্ষিণে বেলভেডিয়ার লেন পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। তখনও বেলভেডিয়ার রোড নির্ম্মিত হয় নাই—পশ্চিমদিকের চতুঃসীমা স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিসের বাগানবাটী "The Lodge" ও বেলভেডিয়ার ভূমিকে পরস্পরের সহিত পৃথক করিত। কালক্রমে "The Lodge" আলিপুর ম্যাজিষ্ট্রেটের বাসগৃহে পরিণত হয়। ফ্রান্সিস যখন ঐ স্থানে বাস করিতেন, তখন "The Lodge"-এ চারিখানি নাতিপ্রশস্ত কক্ষ ও একটী দরদালান ছিল। উহার পশ্চিমদিকে ছিল জেলখানা, সংস্কার গৃহ এবং অন্যান্য দুইচারিখানি অট্টালিকার তিনদিকে টালির নালা। প্রবেশ-পথ ছিল বেলভেডিয়ারের নিকটে। গাড়ী-ঘোড়া চলিবার রাস্তাটি এক্ষণে সাধারণ রাজপথের সহিত এক হইয়া গেলেও উহার অবশিষ্ট কিয়দংশ অদ্যাপি অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় দৃষ্ট হয়। চতুর্দ্দিকে উদ্যানবেষ্টিত, সুবিস্তৃত হরিদ্রাবর্ণ তৃণভূমির উপর অবস্থিত মনোরম এই গৃহখানিকে দূর হইতে দেখিলে তপোবন বলিয়া ভ্রম হইত।

১০। ১৮৯০ খৃঃ অব্দে উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সমতল ভূমির সহিত অনুচ্চাবচ করিয়া দেওয়া হয়।

ময়দান হইতে চৌরঙ্গীর দৃশ্য (১৭৯২)

স্যার ফ্রান্সিসের শ্যালক ম্যাক্রাবি "The Lodge" এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াও ক্ষান্ত হন নাই। স্যার ফ্রান্সিসের বাছা-বাছা জনকয়েক অন্তরঙ্গ বন্ধু প্রতি সপ্তাহে এইস্থানে সমবেত হইয়া গান-বাজনা, আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদিতে সময় অতিবাহিত করিতেন। কলকাতায় পদার্পণ করিবার এক বৎসরকাল পরে ফ্রান্সিস এই সম্পত্তি ক্রয় করেন (১৭৭৫) ও ভারত ত্যাগ করিবার ছয়মাস পূর্ব্বে ১৭৮০ খৃঃ অব্দের এপ্রিলে ৩০,০০০ টাকায় উহা লিভিয়াস নামক তাঁহার এক বন্ধুর নিকট বিক্রয় করিয়া যান।

আলিপুরের প্রাচীন শ্রী ও স্বাস্থ্য আর সেরূপ নাই। অতীতের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলে আধুনিক আলিপুরকে বিগত কয়েক শতাব্দীর প্রেতাত্মা বলিয়া বোধ হয় মাত্র। প্রগতিশীল বর্ত্তমান সমাজের কৃত্রিম আবহাওয়া দৈনন্দিন জীবনের প্রতিস্তরে প্রবেশ করিয়া উহার আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছে। প্রাচীন আলিপুরের রসিক, আমোদ-পিপাসু, দেহে এবং মনে সুস্থ নরনারীবৃন্দ আজ কোথায়? অতি প্রচলিত প্রবাদ বাক্যটী উদ্ধৃত করিতে গেলে বলিতে হয়, "সে রামও নাই, সে রাজ্যও নাই।" তাহাদের 'স্মৃতিমাত্র' কায়ক্লেশে টিকিয়া আছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানীর স্মৃতি, কবির কথায় "আজ বায়ুভরে উড়ে যায়···পথের ধূলি পরে।" সেই উদ্ধত ক্ষমতার প্রতীক, কোম্পানীর নক্সালাঞ্ছিত জাতিদ্যোতক কেতু কোম্পানীর সঙ্গে-সঙ্গেই এদেশ হইতে অপসৃত হইয়াছে। বেল-ভেডিয়ার ভবনের পশ্চিম ফটকের সম্মুখে আলিপুর রোড। আলিপুর রোডের পশ্চিমে কোম্পানীর আমলে রোপিত যুগল তরু-বীথিকার একসারি এখনও অতীতের সাক্ষী স্বরূপ দণ্ডায়মান। শ্রীযুক্ত বারওয়েলের বসতবাটী ইহার অনতিদূরে অবস্থিত। সম্ভবতঃ এই খিদিরপুর হাউসের নিকটবর্ত্তী কোনও অপেক্ষাকৃত নির্জ্জনাংশে অন্যূন তিন শতাব্দী পূর্ব্বে এক কুজ্ঝটিকাময় বাষ্পাচ্ছন্ন আগষ্ট প্রভাতে স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিসের সহিত ওয়ারেন হেষ্টিংসের ইতিহাস প্রসিদ্ধ দ্বন্দযুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পরাজিত ও আহত হইয়া ফ্রান্সিস কলিকাতা পরিত্যাগ করেন। রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে ফ্রান্সিস অপসারিত হইলে, অতঃপর ওয়ারেন হেষ্টিংসের যদৃচ্ছভাবে রাজ্যশাসন করিবার পথে আর কোনও বাধা রহিল না।

১১। Macrabicর মতে The Lodge ছিল "Pleasant to the last degree"—লেখক।

জেল ঘুঘু

দক্ষিণা রঞ্জন বসু

মেয়েটা রূপসীই বটে! নামটিও বেশ। বাহারী।

এ নিশ্চয় শহর কলকাতার জলেরই গুণ হবে। তা' নইলে এমনি রূপ কী করে সম্ভব হতে পারে একজন সাধারণ চাষীর ঘরে?—মেয়ের লাবণ্যমণ্ডিত মুখের দিকে চেয়ে অনেকদিনই লতিফের মনে জেগেছে এ প্রশ্ন।

প্রশ্নটা অবান্তর এবং অনেকটা সংস্কারগত হলেও শহরের আবহাওয়া যে ছোটবড় সকলের মধ্যেই একটা পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস এনে দেয় তাতে কোন সন্দেহ নেই। তা' ছাড়া সন্তানের রূপ যতই সামান্য হোক না কেন, তা' অসামান্য মনে না হয়ে পারে কখনো বাপ-মায়ের কাছে! আর এতো সত্যি সত্যিই সুন্দরী মেয়ে বাহারী।

পূব বাংলার এক চাষীর ছেলে লতিফ। প্রথম জীবনটা তার গাঁয়ের মাঠে মাঠে কাটলেও কৈশোর থেকে সে একরূপ কলকাতাবাসীই। মূল অর্থে দীর্ঘকাল ধরে সে শহরতলীর বাসিন্দে বটে, তবে আসলে দিনের বার আনাই কাটে তার শহরে। সেই ভোর সকালে শিয়ালদা'র বাজারে এসে গোরুর গাড়ি বোঝাই সব্জি বিক্রী শেষ করে অন্য সব জিনিষপত্র কেনাবেচায় পয়সা উপায়ের ফন্দি বের করে নিয়েছে লতিফ প্রায় সুরু থেকেই। দিনের বাকি সময়টা এবং রাত্রিরও অনেকখানি কাটে তার এই করেই। তারপর গোরুর গাড়িতে চড়েই সে বাড়ি ফেরে পাতিপুকুরে। গাড়িতে বসে কখনো সে হিসেব কষে লাভ-লোকসানের, কখনো বা গান ধরে বাহারীর কথা ভাবতে ভাবতে, আবার কোন কোনদিন ক্লান্তদেহে ঝিমোতে ঝিমোতেই বাড়ি এসে পড়ে সে। গোরু দু'টোই গাড়ি চালিয়ে নিয়ে আসে বলা চলে। পথ ওদের মুখস্ত। তবে লতিফ ঘরে এসে যখন পৌঁছয় তখন মধ্যরাত পেরিয়ে যায় প্রায়ই। সে হিসেবে তাকে কলকাতাবাসী বলা যায় বৈকি!

কলকাতায় নাকি টাকার ছড়াছড়ি। ছোটবেলায়ই লতিফ শুনেছিল একথা তার বাপ-খুড়োর কাছ থেকে। বাবুদের বাড়ির সব ছেলেরা কলকাতায় থাকেন এবং ঝুড়ি ঝুড়ি টাকা নাকি নিয়ে আসেন সেখান থেকে। এসব কথা গল্পের মত মনে হলেও, ক্ষতি কি একবার ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখতে? তা'ছাড়া বাপের জমিটুকু দু'ভাগ করলে দু' ভাইয়ের কারুরই কোন কাজে আসবে না এও লতিফের মনকে ধাক্কা দিয়েছে ছোটবেলাতেই। তাই সে সবার অজ্ঞাতে একদিন কলকাতার পথে পা বাড়িয়েছিল অর্থের অন্বেষণে। সেদিন সম্পূর্ণ অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ছিল তার সামনে। সেই অনিশ্চয়তা নানা বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে নিষ্ঠার সার্থকতায় তাকে যেন অর্থাগমের স্থির পথে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। ক্রমে ক্রমে তার অভাবনীয় সাফল্যের সুষমামণ্ডিত সমগ্র পরিবেশ অতি মনোরম হয়ে উঠল লতিফের মনের উদ্যানে। বাহারীর রূপের তুলনা লতিফ যে কল্পনায়ও আনতে পারে না, এও তার অন্যতম কারণ।

ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যায় এক এক সময়। গাঁয়ের ছোট বড় সব মেয়ে-পুরুষের চেহারাগুলোও সব যেন ভেসে উঠে লতিফের চোখের সামনে। কিন্তু দূর ছাই, বাহারীর চেহারার সঙ্গে তাদের কারুর কোন তুলনা চলে? চাষীর ঘরে এমনি রূপ আর দ্বিতীয় হতে পারে না, লতিফের এ ধারণার নড়চড় হবার নয়—কিছুতেই নয়।

একমাত্র সন্তান বাহারী। বয়স যখন তার নয় কি দশ তখন লতিফের সে কী ভাবনা! কী করে সে বাঁচবে বাহারীকে পরের ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে?

কিন্তু বিচিত্র এই সংসারের অভিজ্ঞতা। কন্যাকে পরের হাতে সঁপে দিয়ে সব বাপ-মাই তো বেঁচে থাকে! সংসারে সবই তো সয়ে যায়! আজকের শূন্যতা পূর্ণতর আনন্দ বয়ে আনে আগামী দিনের অজস্রতায়। এই ভাবেই তো সৃষ্টির বিকাশ।

দিনরাত্রির দুর্ভাবনা সত্ত্বেও লতিফ তার মনকে তৈরী করতে থাকে সেই নিদারুণ দিনটির জন্যে যেদিন তার আদরের বাহারীকে বিদায় দিতে হবে নতুন সংসার পাতবার জন্যে।

এরই মধ্যে কয়েকবার তাগিদ এসেছে গৃহিণীর কাছ থেকে মেয়ের জন্যে ছেলে খোঁজবার। হচ্চে হবে বলে সার্থকভাবেই সে-সব তাগিদকে চাপা দিয়ে আসছিল লতিফ অনেক দিন ধরে। কিন্তু আর তো পারা যায় না! মায়ের তাগিদের সঙ্গে মেয়ের মনের স্পর্শও যেন টের পায় লতিফ।

সত্যি সত্যি ছেলে খোঁজা সুরু হয়ে গেল। কিন্তু বেশি সন্ধানের প্রয়োজন হলো না। পাতিপুকুর অঞ্চলেরই একটি সুবেশ তরুণের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল বাহারীর। ঈশ্বরেরই যেন এ ব্যবস্থা। পরম সৌভাগ্য বলে মনে হলো লতিফের তার বাহারীকে যখনি দেখতে ইচ্ছে হবে তখনি সে দেখতে পাবে তাকে। কোন দৌড়োদৌড়ির দরকার হবে না তার জন্যে। সে কি বড় কম কথা?

কিন্তু সে কথার গুরুত্ব কম কি বেশি তা' বিচার করে উঠতে খুব বেশি সময়ের দরকার হলো না। কয়েকমাস না যেতেই আপন পরিচয় পাওয়া গেল জামাতার—জামাতা নয়, একেবারে জেলঘুঘু।

বাস্তবিক পক্ষে বাদশার কাছে জেল-জীবনই নাকি আরামের। নিশ্চিন্তে অন্নলাভের এমন সুবিধে আর কোথায়? শ্বশুর বাড়ি? সেখানেও বেশিদিন থাকতে গেলে মান অপমানের প্রশ্ন এসে পড়ে। জেলখানায় সে সবের বালাই নেই। দিব্যি কাটিয়ে দাও যতকাল ইচ্ছে। ছেড়ে দেয় তো আবার ঘুরে এসো। সে তো তোমার খুশি! আর কেনই বা বাইরে থাকতে যাবে এমনি আরামের জেলখানা থাকতে? বাইরে থাকলেই রুজি রোজগারের প্রশ্ন, বউ-এর তাড়না। কী দরকার এসব সতেরো রকম ঝঞ্ঝাটের?

ঠিক এমনিধারা ভাবে বাদশা। সাত বছরেরও বেশি সময় সে জেলেই কাটিয়েছে। বাহারীকে বিয়ে করার পর তার জন্যে শ্বশুর লতিফ দু' দু' বার জামিন হয়েছে, কিন্তু দু' দু' বারই লতিফের জামিনের টাকা বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

বাদশা অবশ্য গোড়াতেই বলেছিল যে, তার জন্যে জামিন হতে যাওয়া নিরর্থক এবং তাকে বাইরে রাখার চেষ্টাও বৃথা। কিন্তু এ সাবধান বাণীতে কোন কাজ হয়নি। বাহারীর বিপদে লতিফ পিতৃ-কর্তব্য পালনে এগিয়ে এসেছে বার বার। ব্যর্থ হয়েছে, তবু সে আশা ছাড়েনি যে, দু'দিন আগে হোক পরে হোক বাহারী পারবেই বাদশাকে সুপথে এনে সুন্দর করে সংসার সাজাতে।

আশায় আশায়ই লতিফের কাল কেটে যায়। বাদশার চরিত্রে সংশোধনের কোন আভাষই মেলে না।

পুব বাংলার ঢাকা জেলারই লোক বাদশা। সেও ছেলে বেলায় তার এক চাচার সঙ্গে চলে আসে কলকাতায় যা হোক কিছু করে খাবে বলে। কিন্তু চাচা হঠাৎ কলেরা রোগে মারা যাবার পর বাদশা যা শিখল তা' মোটেই সামান্য কিছু নয়, বরং তাতে অল্প শ্রমে যেমনি আয় তেমনি আবার কঠোর 'ধোলাইবে'র আশংকা। এর চেয়ে সহজসাধ্য আর কোন পথের হদিস করতে না পেরে এ শিক্ষাকেই সে বেশ দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগিয়ে আসছে সেই থেকে।

বাদশা তো খোলাখুলিই বলে এ রাজ্যে চাকরি কোথায় যে সে চাকরীর জন্যে ঘুরে ঘুরে মরবে। তার জন্য যে কোন একটা কাজ জোটাবার আশায় তার চাচা কি কম লোককে হাতে-পায় ধরেছে? কিন্তু হয়েছে কি তাতে কিছু? কিছুই না। তবে কি করবে সে? তাকে তো খেয়ে পরে কোন রকমে বাঁচতে হবে। তাই সব অপমান গঞ্জনার ভয়কে অগ্রাহ্য করে সে হাত সাফাইকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে।

ক্রমে ক্রমে হাত সাফাই-এ খুবই ওস্তাদ হয়ে উঠেছে বাদশা। অনেকদিন পর্যন্ত পুলিশের চোখ এড়িয়ে সে বেশ পয়সাও কামাই করেছে।

এ পেশার লোকদের যে বেশিদিন এক যায়গায় থাকা উচিত নয় সে জ্ঞানও বাদশার টনটনে। তাই গত কয়েক বছরে সে কলকাতা ও শহরতলীর বিভিন্ন অঞ্চলে ঘর করেছে। সব অঞ্চলের সব অলিগলি পথঘাট তার একেবারে নখদর্পণে।

পাতিপুকুরে এসে একখানা ঘর ভাড়া করে সে বেশ সাজিয়ে গুছিয়েই বসেছিল। কিছুদিন আগে কেনা হারমনিয়ামটা নিয়ে সে যখন সময়ে অসময়ে গান সুরু করে দিত তখন আশপাশের লোকরা জমা হয়ে রীতিমত এক একটা বৈঠক বসিয়ে ফেলত তার ছোট্ট ঘরখানিতে। এমন কি দরজায় ভিড় করেও অনেককে গান শুনতে হত।

বেশ আনন্দেই কাটছিল বাদশার দিন। কিন্তু বিয়েটাই যেন তার হল কাল। বিয়ের পর আর বেশি দিন বাইরের আরাম সইলো না বাদশার।

প্রথম প্রথম কিন্তু তার নিজেরও বিয়েতে মন উঠে নাই। 'কি অইব এই সব ঝকমারি কইরা?—এমনি সব কথা সে বলেছে তার বন্ধু-বান্ধবদের তাগিদের উত্তরে। শেষ পর্যন্ত তাদেরই চাপে এবং লতিফের পীড়াপীড়িতে সে একদিন সত্যি সত্যি নেহাৎ হুজুগের মাথায় বাহারীকে বিয়ে করে ফেলে।

ইতিমধ্যে বাদশার পশার অনেক বেড়ে গিয়েছে। পুলিশকে বশ করার মন্ত্র সে শিখে নিয়েছে বড় এক ওস্তাদের কাছ থেকে। শিকারে যেদিন যেখানে যা' জোটে তার একটা অংশ পুলিশকে বখরা দিয়ে নিশ্চিন্তে বাড়ি ফেরে বাদশা।

পকেটমার মহলে বেশ নামডাক হয়ে গিয়েছে বাদশার। জনতার হাতে 'ডলাই মলাই'ও হচ্ছে যথেষ্ট। তবে মন্ত্র-

গুণে পুলিশ বশ রাখার সুবিধে এই যে, মারধরের প্রথম ধাক্কা সামলে নিয়ে কোনরকমে পুলিশের হাতে পড়তে পারলে এখন আর হাজতে বা জেলগারদে ঢুকতে হয় না তাকে, ঘটনাস্থল থেকে একটু দূরে যেয়েই নিয়মিতভাবে ছাড়া পায় সে। এমনি অবস্থায় পড়লে সময় সময় পুলিশী বখরার মাত্রাটা একটু বাড়িয়ে দিতে হয়, এই যা।

বারে বারে ঘুঘু ধান খেয়ে বা ধান খেতে যেয়ে পালাবার সুযোগ পেলেও সেবার যে জেল-যাত্রার অভিজ্ঞতা লাভ হলো বাদশার তা' নানা কারণেই অন্তত তার মনে রাখার মত।

বিয়ের কয়েক মাস পরের ঘটনা। সব পুলিশই তার হাতের মুঠোর মধ্যে এমনি ধারণা হয়ে গিয়েছিল বাদশার। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে কোথা দিয়ে কী অবাক কান্ড হয়ে গেল যেন!

পুলিশটাকে জানিয়ে শুনিয়েই তো সে ভদ্রলোকের পকেট কেটে তিনশ' টাকার নোট এবং কিছু খুচরাসহ মনি-ব্যাগটা বেশ আলগোছেই বাগিয়ে নিয়েছিল। একটুও টের পায়নি বেচারা। কিন্তু তা' হলে কি হবে? চিলের মত ছোঁ মেরে কোত্থেকে পুলিশটা ছুটে এসে তার একটা হাত কষে ধরে মাথায় গাট্টা মারতে মারতে নিয়ে যায় থানায়। সেখানে নেবার পর তার উপর যে পুলিশী ধোলাই চলেছিল বাদশার কাছে তা' নিছক 'জলভাত' বলেই মনে হয়েছে। হবেই তো। শহর কলকাতার রাজপথে দিনদুপুরে পরের গাঁট কাটতে যেয়ে ধরা পড়ে হাজার হাতের ঘুসি আর কানমলা এবং শ' শ' পায়ের লাথিও তো সে অনেকবার হজম করেছে এর আগে। কাজেই এ আর এমন কি বেশি? এমনি ভাবখানা।

বিচারে একমাসের কারাদন্ড ও দু'শ টাকা অর্থদন্ড হয়ে যায় বাদশার। এতে কোন দুঃখই নেই তার। তবে বিয়ের পর এই প্রথম জেলযাত্রার ব্যাপার বলে লজ্জায় ও সংকোচে মনটার মধ্যে কেমন যেন একটা মোচড় লাগে।

'শালা পুলিশ কী সাধু! ব্যাটা নতুন পুলিশ অইচে বোধ হয়।'—বাদশা সন্দেহ করে আর বিচারের রায় ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে কাটগড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কটমটিয়ে চায় ঐ পুলিশটার দিকে যে তাকে সেদিন হাতেনাতে ধরে ফেলে গাট্টা মারতে মারতে থানায় নিয়ে গিয়েছিল। দু'চার বছরের মধ্যে ও ব্যাটার সাধুগিরি যে ছুটে যাবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই বাদশার। পুলিশ কখনো সাধু থাকতে পারে? বাদশার কাছে এ এক বিস্ময়কর জিজ্ঞাসা।

বাহারীকে নিয়ে ঘর বাঁধবার পর যেদিন প্রথম থানায় যেতে হলো বাদশাকে সে রাত্রিতে তাকে বাড়ি ফিরতে না দেখে বাহারীর সে কী কান্না! বাদশার বন্ধু-বান্ধব কয়জন এসে বাহারীকে এই বলে বুঝাতে চেয়েছে যে, বাদশা একটা বড় কাজে কয়েক দিনের জন্যে বাইরে গিয়েছে এবং বাড়িতে খবর দেবার জন্যে তাদের পাঠিয়ে দিয়েছে। হয়ত দু'চার দিনের মধ্যেই ফিরে আসবে সে।

বাদশার বন্ধুদের এসব কথায় বাহারী সেদিন মোটেই বুঝ মানেনি। সে তার বাপজানকে ডেকে এনে দেবার জন্যে তাদের কাছে অনুনয় বিনয় করেছে। শেষ পর্যন্ত তার ডাক চিৎকারে বাধ্য হয়েই লতিফকে ডেকে আনতে হয়েছে তাদের।

জামাতার যে একটা কিছু বিপদ হয়েছে তা' লতিফ সে রাত্রিতে মেয়ের বাড়িতে পা দিয়েই বুঝতে পেরেছে, তবে বাদশা যে পকেট কাটতে যেয়ে ধরা পড়েছে এবং সে বিদ্যায় যে সে একজন পারদর্শী এমন কোন সন্দেহ তার তখনো পর্যন্ত মোটেই হয়নি। অবশ্য পরদিনই সব জানাজানি হয়ে পড়ে। লতিফ তার মেয়ের অদৃষ্টের জন্যে অনুতাপ করে। আর কীইবা করার আছে!

দু'মাস পর ছাড়া পেয়ে বাদশা কিন্তু হাসতে হাসতেই বাড়ি ফেরে। তবে তার মনে বড় দুঃখ। জানাজানি যখন হয়েই গেছে তখন আর দু' মাসের বিশ্রামে তৃপ্তি আসে? তা' ছাড়া ট্যাঁকেও কিছু এলো না, মিছিমিছিই জেল।

এবার বড় একটা কিছু করলে হয় না? মারি তো হাতি বাজি তো লাখ।—খালাস পেয়ে এ লাইনে ভাবতে সুরু করেছে বাদশা। বাহারী তাকে ভাল পথে ফিরিয়ে আনার জন্যে কত কীই না করছে! কিন্তু তার সব অনুরোধ ও উপরোধই বৃথা। সেদিকে বাদশার কোন ভ্রূক্ষেপই নেই।

সত্যি পকেটমার ব্যবসায়ে আর তেমন মন বসে না বাদশার। তবু অভ্যাসবশে বার হতে হয়, এই যা। আসলে মন তার বড় একটা কিছু করার দিকে। একেবারে একটা ঝোঁক চেপে গিয়েছে মাথায়।

উপযুক্ত গুরুর সন্ধান সুরু হয়ে যায়। তেমন জাঁদরেল গুরু না পেলে বড় কিছুতে হাত দিতে যাওয়া ঠিক নয়, এ বুদ্ধিটুকু আছে বাদশার। চুম্বক চুম্বকের আকর্ষণ বোধ করে। বড়বাজারে এক সোণার দোকানের সামনে ভকত সর্দারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যায় তার। ভক্তের ডাকে ভগবান যেন স্বয়ং এসে ধরা দিলেন।

কেউ কাউকে চেনে না। কিন্তু গুণেই গুণীর পরিচয়। কাশীতে সেরা গুন্ডা ভকত সর্দার। বৎসরে এক মাসের জন্যে কলকাতায় আসে দু'চারটে বড় কেস করে যাবার জন্যে আর তার চেলা-চামুন্ডাদের উৎসাহিত করে যাবার উদ্দেশ্যে।

বড় সোণার দোকানটা লুঠ করবারই মতলব আঁটছিল ভকত। এ জিনিস সে জিনিসের দর জানবার অছিলায় সে দোকানের সব কিছু দেখে নিচ্ছিল। ঠিক এমনি সময় তার চোখে পড়ল এক অপূর্ব ব্যাপার। একটি ছোকরা খুব সন্তর্পণে এক খদ্দেরের কোটের-পকেট কেটে সদ্য-কেনা গয়নার প্যাকেট নিয়ে বেশ স্বচ্ছন্দে সরে পড়ল।

শিকারীর চোখ ভকতের। সে ছাড়া আর কেউ কিছু টেরই পেল না। দু'পা এগিয়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে পড়তেই বাদশার পিঠ চাপড়ে দিয়ে ভকত এসে তার পাশে দাঁড়ায়। ভয় পেয়ে চমকে উঠে বাদশা।

কুচ ভয় নেহি বাচ্চা। ম্যয় তো তুম্‌হারা গুরুজী হ্যায়। বহুৎ আচ্ছা হাত বানায়া তুম্‌। ঠিক হ্যয়, হামারা সাথ সাথ চলো। ঘবরাও মৎ।—ভকত এই বলে আবার পিঠ চাপড়ে বাহবা দেয় বাদশাকে এবং তাকে গংগার ঘাটে নিয়ে যেয়ে সেখানে বসে অনেক সলাপরামর্শ করে।

ভকত সর্দারের কথা বার্তায় বাদশা বুঝেতে পারে যে, এ লোক প্রকৃত সমজদার এবং এতদিনে তার সাধ পূর্ণ হতে চলেছে।

ছোট কাজ নিয়ে আর তাকে থাকতে হবে না বলে ভকত সর্দারও বাদশাকে ভরসা দেয় এবং বড় কাজে হাত দিতে গেলে ঘর-সংসারের মায়াও যে অনেকটা কাটাতে হবে সর্দার তার উদ্দেশ্যে তেমনি ইংগিতও করে।

ভকতের দলে ভর্তি হবার পর বাদশা মোটর গাড়ি চালাতে শিখেছে, ছোরা মারতে এবং রিভলবার ছুঁড়তেও শিখেছে। শুধু কি এই? মাথায় ডান্ডা মেরে জ্যান্ত মানুষকে খতম করতেও সে হাত পাকিয়েছে। কয়েক বছরের মধ্যে এমনি অনেক অভিজ্ঞতাই সঞ্চয় করেছে বাদশা।

একটা বড় কেস করতে যেয়ে একবার একই সঙ্গে দু'টো লোককে খুন করেছে বাদশা, কিন্তু খুনের দায়ে পড়ে নাই। এ কৃতিত্বের জন্যে সে কী তার অহংকার!

ভকতের সঙ্গে পরিচয় হবার পর দু' দুবার সে ধরা পড়ে শ্বশুরের জামিনে খালাস হয়েছে বটে, কিন্তু তা' বাদশার কাছে বড়ই লজ্জার বলে মনে হয়েছে। এ ধরণের দুর্বলতাকে তার গুরুজী কখনো প্রশ্রয় দিতে পারে না, এই ছিল তার আশংকা। আর সত্যি সত্যি, এ নিয়ে পরে তাকে একটু মিঠে-কড়া কথাও শুনতে হয়েছিল গুরুজীর কাছে। ভাগ্যি পরে আর জামীন দিতে রাজি হননি হাকিম! তা'হলে তো ভকতের দলে আর থাকাই সম্ভব হতো না।

দরকার হলে জেলখানার পাঁচিল টপকে বেরিয়ে আসবে, এই যেখানে দলপতির নির্দেশ সেখানে জামিনে খালাস হতে গেলে সর্দার তা' সইবে কেন? দলের সভ্যদের মনে দুর্বলতা ঢুকবার কোন সুযোগ দিতে পারে কখনো কোন দলপতি?

যাই হোক, সাদি করার পর সাত বছরের মধ্যে বাদশা জেল খেটেছে পাঁচ ছয় বছর—একবার খাটতে হয়েছে লম্বা মেয়াদে একেবারে চার বছরের জেল।

সপ্তাহ বা পক্ষকালের বেশি বাইরে থাকা তার অদৃষ্টে আর হয়ে উঠে না। আর সে সময়টুকুই যেন তার কাছে ইদানিং বিড়ম্বনা বলে মনে হয়। নতুন একটা কিছু করে ফেলে আবার জেলে ঢুকবার জন্যে মনটা যেন উশ্‌খুশ করতে থাকে। জেলে নতুন নতুন কয়েদীদের উপর খবরদারি করায়ও তো বেশ একটা আনন্দ আছে।

বাইরে থেকে কী হবে? সেই মদ আর মেয়েমানুষ, এইতো! পয়সা তো সে আরে কম উপায় করেনি সর্দারের দৌলতে, কিন্তু তার প্রায় সবটাইতো উড়ে গিয়েছে মদ আর মেয়েলোকের পিছনে। এ সবে বাদশার কোন লোভই নেই আর।

একবার সর্দারের এক রূপসী রক্ষিতার দিকে নজর পড়েছিল বাদশার। রক্ষিতার নাম চাঁদিবিবি। কিছু ভাল গয়না দিয়ে আর মিঠাই খাইয়ে চাঁদকে হাতও করে ফেলেছিল বাদশা। শুধু কি এই? একদিন সুযোগ বুঝে দু'জনে চম্পট দিবে, এরকম সলাও হয়ে গিয়েছিল। কেবল গয়না বা মিঠাইয়ের লোভই নয়, ওরকম গয়না আর মিঠাই যখন তখনই এনে দেয় সর্দার। বাদশার কাঁচা চেহারার আকর্ষণই ছিল চাঁদিবিবির কাছে বেশি। কিন্তু উধাও হবার চক্রান্তের কথাটা জানাজানি হয়ে যাওয়ায় চাঁদ আর বাদশাকে যে কঠোর শাস্তি পেতে হয়েছে ভকতের হাতে তাতে চরম শিক্ষা হয়ে গিয়েছে উভয়েরই। মেয়েমানুষের উপর তো বাদশার একেবারে অভক্তিই এসে গেছে সেই থেকে।

ইদানিং যখনই জেল-খালাস পেয়েছে তখনই বাড়ি ফিরে সে বউকে বলেছে, 'আরে হীরি, এইবার একটা নিকা কইরা ল! আমারে দিয়া আর সংসার করন চলব না। এই ঝামেলা আমার ভাল্‌লাগে না।'

এমনি ধরণের একটা কথা থেকেই সেদিন বাদশার সঙ্গে বাহারীর সুরু হয়ে যায় ভীষণ বিতর্ক। বাদশার চরিত্রে পরিবর্তন আনার সব চেষ্টা ব্যর্থ হলেও বাহারী এ আশাই এতদিন ধরে করে আসছিল যে, বয়স হলে এবং দু'একটা ছেলেপুলে হলে আপনা থেকেই হয়ত ওর সংসারে মন বসবে এবং চরিত্রেরও সংশোধন হয়ে যাবে। সে আশায় আশায়ই সে চুপ করে সব সহ্য করে যাচ্ছিল। কিন্তু কিছু কাল ধরে

'নিকা' করার কথা বল্‌তে থাকায় কেমন যেন মনটা বিষিয়ে উঠছিল বাহারীর। সেদিন আর বাদশার সে কথা সহ্য করতে না পেরে একেবারে ফেটে পড়ে লতিফ-নন্দিনী। বেশ কড়া কড়া কয়টা কথা বলে ফেলে সে বাদশার মুখের উপর।

জেলে কয়েদী-ঠেঙ্গানোর সর্দার বাদশার সহ্য হবে কেন মেয়েছেলের ঝাঁঝালো কথা? মাটির দেয়ালে হেলানো বঁটিটা তুলে নিয়ে চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে সে একেবারে সোজা এক কোপ বসিয়ে দেয় বাহারীর পিঠে। রাগে সে এমনি অন্ধ হয়ে গেছে তখন।

ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছোটে বাহারীর পিঠ থেকে।

'মাগো, গেলাম গো—বাবা গো' বলে ভীষণ একটা চিৎকার দিয়ে বাহারী লুটিয়ে পড়ে মাটিতে।

রক্ত দেখে আনন্দ হয় বাদশার। বাহারী একেবারে খতম হয়ে গিয়েছে ধরে নিয়ে খুশি মনেই বলে উঠে বাদশা, 'বাঁচালি হারামজাদি, আমিও কয়েক বছরের জন্য নিশ্চিন্দি!'

বাদশার ঘরের পিছন দিয়েই চলে গিয়েছে এক ফালি সরু রাস্তা। রাস্তা সরু হলে কি হবে, এ পথে লোক চলাচল চলে রাতদিন। যত কব্‌জিওলা, ছানাওলা ওরা সব দলবেঁধে আসে যায় এ রাস্তায়। কলকাতা যাবার সর্টকাট পথ এটা।

বঁটির কোপের সঙ্গে-সঙ্গে বাহারীর আকস্মিক চিৎকার ও গোঙানির শব্দে তাই দেখতে দেখতে লোকের ভিড় জমে যায় বাদশার ঘর-দোরে।

বাদশা কিন্তু নির্বিকার। এতবড় একটা অপকর্মে এতটুকু বিচলিত নয় সে। পরম নিশ্চিন্তে সে বসে আছে এক পাশে—পালিয়ে যাবার কোন চেষ্টা তো নেই-ই, তেমন কোন কথাও যে সে ভাবছে তার কোন চিহ্নও নেই তার চোখে-মুখে।

সকালবেলার ঘটনা। সেদিন শরীর আর মন-মেজাজ ভাল না থাকায় লতিফও যায়নি কলকাতার বাজারে। একটু বেলা হতেই মেয়ে-জামাইয়ের খোঁজখবর করতে সে এসে উপস্থিত বাদশার বাড়িতে। লোকের ভিড় দেখে সে তো অবাক! আরো অবাক ঘরে ঢুকে মেয়েকে রক্তাপ্লুত অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে। একবার বাহারী এবং একবার বাদশার দিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে সেও বসে পড়ে মেজের উপর মাথায় হাত দিয়ে। কি হয়েছে বুঝতে আর তার কিছুই বাকি থাকে না।

পুলিশে আগেই খবর চলে গিয়েছিল। পুলিশ এসেই সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করে বাদশাকে এবং ঘটনার বিবরণ ও কয়েকজন সাক্ষীর নাম টুকে নেয় তাদের খাতায়। লতিফ মাথা তুলে কোন কথাই বলতে পারেনি পুলিশের সঙ্গে, যা দু' একটা কথার উত্তর দিয়েছে তা' মাথা নীচু করেই।

বাদশা কিন্তু পুলিশের হাতকড়া পরার সময়ও মুচ্‌কি মুচ্‌কি হেসেছে। মাজায় দড়ি বেঁধে পুলিশ যখন তাকে ঘরের বার করে নিয়ে যায় তখনও সে বেশ হাসিখুশিই। তার ঘরের পিছন দিয়ে পথ চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ বাদশা যেন মুহূর্তের জন্যে একটু থমকে দাঁড়ায়। ঘরের মেঝ থেকে 'পীরা' বেয়ে পড়ছিল তাজা রক্তের স্রোত। সেদিকে হঠাৎ চোখ পড়ে গিয়েছিল তার। কেমন যেন একটা ধাক্কা লাগছিল তার বুকে। কিন্তু তা' নিতান্তই ক্ষণিকের ব্যাপার। পুলিশের ব্যাটনের ধাক্কায় আবার চাঙ্গা হয়ে এগিয়ে চলে বাদশা।

লতিফ সেদিনই বাহারীকে যে প্রায়-অজ্ঞান অবস্থায় নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছে আর বাদশার বাড়িতে আসতে দেয়নি।

বিচারে বাদশার দশ বছরের জেল হয়েছে। সেও এবার অনেকদিনের জন্যেই নিশ্চিন্ত! তবে এবার কেন জানি তার ঘরের পীরা বেয়ে পড়া রক্তস্রোতের দৃশ্যটা জেলখানায় বসে বড্ড ঘন ঘন মনে পড়ে।

অয়েল

আপটন সিনক্লেয়ার ★ অনুবাদক : যতীশ বেদজ্ঞ

[৭]

ওরা আবার ফিরে চলেছে ওদের সেই পুরোনো খনিটায়। যেতে যেতে বান্নীর মনে পড়ে যায় সেদিনের সেই সব জায়গার কথা যেখানে ওরা সেরে নিয়েছিল ওদের লাঞ্চ আর যেখানকার পরিচারিকাটি এসে ওদের শুনিয়েছিল সব মজার মজার কথা, যেখান থেকে ওরা গ্যাস নিয়েছিল ওদের গাড়ীটায় আর যেখানকার কর্মচারীটির সাথে ড্যাড বলেছিল নানা কথা, আর সেই সাথে ওর মনে পড়ে যায় সেই জায়গাটার কথা—যেখানে এসে ওরা পড়েছিল ট্রাফিক পুলিশের পাল্লায়। ব্যাপারটার কথা মনে হলে আজও চঞ্চল হয়ে ওঠে বান্নী, ওর মনে পড়ে যায় মাছ ধরার কথা, আর সেটা কিছু কুয়োর ভেতরের 'মাছ' নয়, সত্যিকারের মাছ, যা কিনা ধরা হয়ে থাকে জল থেকে ; একবার যেখানে বড় মাছ ধরা পড়ে মনে হয় বারবারই বুঝি তারা এসে বড়শী ধরবে সেখানে। কিন্তু ড্যাড বলে বড় মাছ নাকি একটাই ধরা পড়ে একজায়গায়, আর ট্রাফিক পুলিশের বেলায়ও ঠিক তাই। এবার তারা ওদেরকে ধরে ফেললো ঠিক বীচ সিটীর সীমানাটা পার হতেই, যখন কিনা ওরা তাদের পাতা একটা ফাঁদ পার হয়ে যাচ্ছিল সাতচল্লিশ মাইল বেগে। কনস্টেবলটা এগিয়ে আসতেই মুচকি হেসে ড্যাড রসিকতা করে, সে নাকি খুসী হয়েছে সত্যই কিছু নির্দিষ্ট হারের বেশী বেগে গাড়ী হাঁকাচ্ছে না বলে!

লোবস্ রিভারে ওরা গিয়ে পৌঁছলো সন্ধ্যায়। লোকজনরা তখনও চালিয়ে যাচ্ছে 'মাছ ধরা'র কাজ। পাইপের সাথে পাইপ এঁটে ঠেলে পাঠিয়ে দিচ্ছে মাটির তলায় আর তার মুখে থাকছে চিমটে জাতীয় একটা কিছু। তারপর আবার সেগুলোকে টেনে তুলে আনছে উপরে, একটা একটা করে খুলে ফেলছে সবগুলোকে আর সেগুলো সংখ্যায় হবে পঞ্চাশ ষাটটারও বেশী। সব শেষে দেখা যাচ্ছে আসলে 'মাছ'টাই গেছে ফস্কে।

শেষ পর্যন্ত ড্যাড্ বলে চললো তার যা বলবার, আর তাও এমনভাবে যা কিনা কারোরই উপায় নেই না শুনে। যারা নিজেদের হাড়গুলোই আস্ত রাখতে পারে না তারা আর কি করে রক্ষা করবে ড্যাডের সম্পত্তি! স্কুলের ছাত্রদের মত দাঁড়িয়ে তারা শুনলো সে কথা আর তাদের দেখাতে লাগলো, ঠিক বেত খাওয়া ছেলেদের মত, যদিও তারা অনেক আগেই তাড়িয়ে দিয়েছে সেই গুণ্ডাটাকে যে কিনা বাধিয়েছে এত সব হাঙ্গামা।

কোন্ এক কোম্পানীর এক দালাল এসেছে একটা যন্ত্র নিয়ে যা দিয়ে নাকি একবারেই তুলে ফেলা যাবে ডাণ্ডাটাকে, আর সেজন্য দরকার হলে সে নাকি গ্যারান্টি দিতেও আছে তৈরী। কাজেই তাকেও দেওয়া হলো একটা সুযোগ, কিন্তু আটকে গিয়ে সে যন্ত্রটাও রয়ে গেল গর্তটার মধ্যে। বেশ বোঝা গেল এমন একটা কিছু ঘটেছে কুয়োটার তলায় যাতে করে ডাণ্ডাটা সেখানে গিয়েছে আড়াআড়িভাবে আটকে। অগত্যা ড্যাড বললো পরীক্ষা করে দেখতে ছোটখাটো একটা ডিনামাইট দিয়ে দেখ একবার কাণ্ড, চার হাজার ফিট মাটির তলায় কে কবে শুনেছিল বিস্ফোরণের কথা! তা সে যাই হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত তাই করেই আল্গা করে ফেলা হলো ডাণ্ডাটাকে, তারপর গর্তটাকে পরিষ্কার করে সেটাকে ঠেলে পাঠানো হলো আরও কিছুটা তলায় আর প্রথম জায়গাটাকে ঢেকে দেওয়া হলো ইস্পাতের পাত মুড়ে।

এমনি করেই দিনের পর দিন এগিয়ে চললো বান্নীর তেলের খনির শিক্ষা। ভূতত্ত্ববিদ আর ওদের প্রধান মিস্ত্রীর মত ও-ও মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ায় ড্যাডের সাথে নূতন খনির সন্ধানে আর খামের পরে পেন্সিলের দাগ কেটে ড্যাড ওকে বুঝায় কুয়োগুলোকে কেন সমচতুর্ভুজ ক্ষেত্রের পরে না বসিয়ে বসানো হয় সমদ্বিবাহু চতুর্ভুজের পরে। কুয়োগুলোর চারপাশে একটা করে বৃত্ত এঁকে কোন জায়গা থেকে কোন কুয়োর তেল উঠছে ঠিক করে নিলেই তা বুঝা যাবে আপনা থেকে ; তখন দেখা যাবে সমদ্বিবাহু চতুর্ভুজেরই কম সম্ভাবনা থাকে পরস্পরের সঙ্গে মিশে যাবার। আর যেখানেই দেখা যাবে মিশে গেছে সেখানেই বুঝতে হবে দুটো কুয়ো বসানো হয়েছে একই জায়গার তেলের জন্য, যা কিনা করে থাকে শুধু গবেটরাই।

বীচ সহরে ফিরে এসে ওরা দেখে বার্টী ফিরে এসেছে বাড়ীতে। বার্টী বান্নীর বোন ওর চেয়ে বছর দুয়েকের বড়, আর আজকাল সে মেলামেশা করছে উত্তর দেশের অতি সৌখীন উড্রিজ পরিবারের সাথে। বান্নী চেষ্টা করে তাকে ওদের 'মাছ ধরার' গল্প শুনাতে আর লোবস্ রিভারে কি কি ঘটছে তাই বুঝাতে। কিন্তু নিষ্ঠুর বার্টী ওকে শুধু চলে বিদ্রূপ করে, বলে ও নাকি একটা 'তেলের পোকা' আর ওর নখগুলোও নাকি বেজায় বিশ্রী। অথচ একদিন ওদের অন্তরঙ্গতা ছিল খুবই, মেলাই উৎসাহ দেখাত সে ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে, বান্নীর সাথে তর্ক করতো এটা ওটা নিয়ে আর অজস্র গিন্নীপনা ফলাতো যখন তখন, ঠিক যেমনি ফলিয়ে থাকে আর আর সব দিদিরা। বান্নী বুঝতে পারে না হঠাৎ তার এই পরিবর্তনের কারণ। কিন্তু আস্তে আস্তে বুঝে নেয় মিস্ ক্যানের স্কুলের আধুনিক শিক্ষাই ওকে করে তুলেছে এমনি।

দায়ী অবশ্য এজন্য এম্মা খুড়িই। বাম্নীর শিক্ষাকে টাকা-পয়সা রোজগারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবার বিষয়ে জিমের অধিকার তাঁকে মেনে নিতে হয়েছে বটে, কিন্তু অন্তত বার্টীকে তিনি এক-জন আধুনিকা না বানিয়ে ছাড়ছেন না। তার মানে বার্টীকে শিখতে হবে কি করে খরচ করতে হয় ড্যাড্ আর বাম্নীর উপায় করা টাকা। খুঁজেপেতে তিনি বের করলেন এমন একটা স্কুল যেটা কিনা তরুণী খরচকরনেওয়ালীদের সবগুলোর চাইতেই সেরা। সেদিন থেকেই পরিবারের লোকজনদের সাথে দেখাসাক্ষাতের পাট চুকে গেছে বার্টীর। স্কুলের পর সে দেখা করতে যায় তার নূতন পাওয়া বড়লোক বন্ধুদের সাথে, তাদেরকে তো আর সে বাড়ীতে আনতে পারে না, সেখানে না আছে একটা সত্যিকারের বাটলার আর না আছে কিছু, ওদের রুডলফটা তো তার মতে নেহাৎই একটা ক্ষেতমজুর। * মেলাই সব অদ্ভুত অদ্ভুত কথা সে রপ্ত করে নিয়েছে এর মধ্যে। কারো কথাবার্তা তার পছন্দ না হলে তাকে সে বলে 'মোরব্বার জালা' মানে কিনা নেহাৎই সেকেলে। একপাক ঘুরে নিয়ে লাল ফিতে ঝুলানো সৌখীন ঘাঘরাটাকে দুলিয়ে হি-হি করে সে হেসে ওঠে, 'কেমন খাসা মাল, বলতো?' এমনি আরও সব তার কথা যা শুনে ঠাকুমা তাকিয়ে থাকেন হাঁ করে আর ড্যাড্ হাসে তার মুচকি হাসি। বাপের ভুল উচ্চারণ শুনে সে আঁৎকে ওঠে, বলে "দোহাই তোমার, ড্যাড, তুমি আর 'জিস্ট' বলো না 'জাস্ট'কে।" মুচকি হেসে ড্যাড বলে, "ঊনষাট বছর ধরে তো ঐই বলে এলাম রে, পাগলী!" কিন্তু তা হলেও এর পর থেকে সে যেন একটু সামলিয়েই বলে ও কথাটা। এমনি করেই তো এগিয়ে চলে সভ্যতা!

নেহাৎ যেন দয়া করেই বার্টী চললো ওদের খনির নূতন যন্ত্রগুলো দেখে আসতে। গাড়ী থামিয়ে ওরা নেমে পড়লো খানিকটা বেড়িয়ে নিতে, আর পড়বি তো পড় একেবারে মিসেস্ গ্রোর্তির সামনে। ছ্যাকরা ফোর্ডখানা থেকে সবে এসে তিনি তখন নামছেন তাঁর বাড়ীতে। ভারী খুসী হযে উঠলো বাম্নী তাঁকে দেখে আর জিদ্ ধরলো বার্টীকে তাঁর সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে। কিন্তু বার্টী রইলো একদম চুপ করে, আর এগিয়ে যেতে যেতে বেশ দু'কথা শুনিয়ে দিল বাম্নীকে ওর বিশ্রী রুচি প্রবৃত্তির জন্য। ওর ভাল লাগে তো ও নিজেই গিয়ে খাতি জমাক না কেন যত সব চাষাভূষোর সাথে, তাই বলে ওর কি দরকা ছিল ওর বোনকে দিয়ে তাদের সাথে হ্যান্ডশেক করাবার! বা বুঝতে পারে না—আর পারবেও না সারা জীবনে—মানুষ কি ক এত অবহেলা করতে পারে অন্য মানুষকে।

কথায় কথায় ও বার্টীকে বললো পলের কথা, বললো অদ্ভুত আর চমৎকার ছেলে সে। কিন্তু ড্যাডের মত বার্ট বললো সে নাকি একটা পাগল। শুধু তাই নয়, খানিকটা রেগেও গেল বার্টী। তার মতে পল নাকি একটা ভীষণ প্রকৃ লোক, বাম্নী যে তাকে আর খুঁজে পায় নি এতে সে খুসীই হযে আর পল্ সম্বন্ধে তার এই প্রথম দিনের ধারণাই বার্টীর হয়ে রইলো চিরকালের মত। ভাবসাব দেখে বেচারা বাম্নী একদম থ'। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে কেন বার্টী স্কুলে গি অর্থেরই স্তুতি শিখতে, আর শিখতে কি করে একনজরে বু নিতে হয় কার আছে সেই অর্থের কি পরিমাণ আর সেই অনু-যায়ী ব্যবহার করতে হয় কার সাথে কি রকম। কাজেই বাম্নী কি করে আশা করে সে এমন একটা লোককেও প্রশংসা করবে যে কিনা বলে নিজের উপার্জিত না হলে কারোরই নাকি কোন অধি-কার নেই কোন অর্থের পরে।

আপন আপন প্রবৃত্তি অনুযায়ী ওরা দুজনে চললো দুই পথে। দিদির রাগ বাম্নীর কল্পনায় পলকে করে তুললো এক নিঃসঙ্গ মহিমায় মহীয়ান কেমন যেন এক আধারহস্যময় পুরুষ। জীবনে সেই শুধু একবার সুযোগ পেয়েছিল ড্যাডের অর্থের কিছুটা পাবার, অথচ অবজ্ঞার সাথেই সে তা করেছিল প্রত্যাখ্যান। সময় সুযোগ পেলেই বাম্নী গিয়ে হাজির হয় মিসেস্ গ্রোর্তির কাছে আর খরগোসের খাঁচাটার পরে বসে জিজ্ঞেস করে তাঁর ভাইপোর খবরাখবর। একবার সেই স্থূলাঙ্গী মহিলাটি ওকে এনে দেখালেন একখানা চিঠি, নেহাৎই খারাপ হাতের লেখা—আর লিখেছে পলেরই সব চাইতে আদরের বোন রুথ ওয়াটকিন্স। পলের কোন সংবাদ পায়নি জানিয়ে সে লিখেছে তাদের চরম দুঃখদুর্দশার কথা, বেঁচে থাকাই নাকি হয়ে উঠেছে কষ্টকর; খামার বাড়ী থেকে প্রায়ই ছাগল মারতে হচ্ছে একটা করে, যার মানে কিনা সব কিছুই ফেলতে হচ্ছে খেয়ে। কিছুদিন বাদে আরও একখানা চিঠি এলো রুথের কাছ থেকে। সে জানিয়েছে পল নাকি চিঠি লিখেছে তার কাছে। সে এখন আছে বহুদূর উত্তরে এক জায়গায় আর এখনও বেড়াচ্ছে ঘুরে ঘুরে, কাজেই কোন সম্ভাবনাই নেই তার ঠিকানা পাবার। রেজেস্ট্রী খামে পাঁচ ডলারের একখানা নোট পাঠিয়ে পরিষ্কার করে লিখে দিয়েছে টাকাটা পাঠানো হচ্ছে খাবার কিনবার জন্য, গীর্জায় দেবার জন্য নয়। পল জানিয়েছে সে নাকি এখন পাচ্ছে মাত্র একটা ছোকরা চাকরের বেতন, যা থেকে কিনা মোটেই সহজ নয় কোন কিছু বাঁচানো। শুনতে শুনতে বাম্নীর মনে খেলে গেল এক মতলব। বাড়ী ফিরে এসে সে করে বসলো এক অদ্ভুত আর গোপন কাজ। পাঁচ ডলারের একখানা নোটকে খামে পুরে সে ঠিকানা লিখলো—মিস্ রুথ্ ওয়াটকিন্স, প্যারাডাইস্, ক্যালিফোর্ণিয়া,' তারপর নিজেই গিয়ে সেখানাকে ফেলে দিয়ে এল ডাক বাক্সে।

ভারী খুসী হয়ে ওঠেন মিসেস গ্রোর্তি বাম্নীকে দেখলে। ার এমনি কপাল যে বাম্নী কি করে জেনে ফেলেছে তাঁর এই ুসীর কারণ। ও জানে ওকে তিনি লাগাতে চান তাঁর ছেলের নির কাজে। দু' একটা খবর যে ও মিসেস্ গ্রোর্তিকে না দেয় ও নয়। ড্যাডের কাছে ও শুনেছে স্লিপার এন্ড উইলকিন্সরা তি জুয়াড়ী। খবরটা ও জানিয়ে দিয়েছে মিসেস্ গ্রোর্তিকে। চ মাঝারি জমিগুলোর মালিকরা কিনা এগিয়ে গিয়ে বন্দো-স্ত করে এলো তাদেরই সাথে, আর দুদিন যেতে না যেতেই লো পস্তাতে। স্লীপার এ্যান্ড উইলকিন্স কোম্পানী স্থা করলো তাদের জমিগুলো আর একটা সিন্ডিকেটের কাছে ী করবার। দেখা গেল মিসেস্ গ্রোর্তির জমিটার সামনে া তাঁবু ফেলেছে দিলদরিয়া গোছের একটা লোক, আর বীচ্ বর রাস্তার লোকদের ডেকে চা খাওয়াচ্ছে বিনা পয়সায়। টেই নাকি 'বোনাঞ্জা সিন্ডিকেটের একনম্বর খনি'। এর মধ্যেই

তাড়াহুড়ো করে এনে হাজির করেছে একটা তেল তুলবার যন্ত্র, আর পাইপও বসিয়ে ফেলেছে প্রায় শ' খানেক ফিট নীচুতে। মিসেস্ গ্রোর্তি তো আনন্দে আটখানা আর তারই আতিশয্যে হাজার ডলার বোনাসের সবটা দিয়েই কিনে ফেললেন আর একটা সিণ্ডিকেটের শ' খানেক শেয়ার। এটার নাম হলো 'কো-অপারেটিভ সিণ্ডিকেটের তিন নম্বর খনি'। জনতার পায়ের চাপে তছনছ হয়ে গেল মিসেস্ গ্রোর্তির ঘাসের জমিটা। কিন্তু কোন ভ্রূক্ষেপই নেই তাঁর সেদিকে। পরের কুয়োটা বসাবার সময় কোম্পানী নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করবে তাঁর বাড়ীটা সরিয়ে নেবার, আর তখন তিনি যে দিকটায় যাবেন সেটা তো এ অঞ্চলের চেয়ে 'অনেকই ভাল'—বেশ জোর দিয়েই তিনি শুনান বাম্নীকে।

এর পরের বার গিয়ে কিন্তু বাম্নী এই স্থূলাঙ্গী মহিলাটির মুখে স্পষ্টই দেখতে পেল দুশ্চিন্তার ছাপ। কুয়ো বসাবার কাজ গেছে বন্ধ হয়ে; কাগজে বেরচ্ছে মজুররা নাকি ব্যস্ত আছে 'মাছ ধরা' নিয়ে, কিন্তু লোকে বলছে, "হ্যাঁ, মাছ ধরছে বটে, তবে সেটা নেহাৎই তাদের মাইনে আদায়ের ফন্দী।" শেয়ারের বিক্রীও এসেছে কমে, আর সেই দিলদরিয়া লোকটির চায়ের দরিয়ায়ও দেখা দিয়েছে ভাটা। তারপর একদিন এক পাওনাদার কোম্পানীর কাছে সিণ্ডিকেটটাই গেল বিক্রী হয়ে। কুয়ো বসাবার কাজ আর সুরু হলো না; দেখে মিসেস্ গ্রোর্তি করুণভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন বাম্নীকে দিয়ে ওর বাবার কাছ থেকে ব্যাপারটা কি ঘটলো জেনে নিতে। কিন্তু ড্যাড এর কোন কিছুই জানে না, যেমন জানে না আর কেউই। মাস ছ'য়েক কি তারও পরে, ড্যাডের "রস্-ব্যাঙ্কসাইড কোম্পানীর এক নম্বর খনির কাজ শেষ হয়ে গেছে সগৌরবে—এমনি সময় জানাজানি হয়ে গেল আসল ব্যাপারটা। কাগজগুলোতে খবর বেরল ছোট্ট করে, বোনাঞ্জা সিণ্ডিকেটের ডি-বাকেট কীবার আর তার সহযোগীদের বিচারের জন্য নাকি গ্র্যাণ্ড জুরী গঠন করা হয়েছে ভুয়ো তেল কোম্পানীর শেয়ার বিক্রীর দায়ে। ড্যাড বললো—এটাও হয়তো একটা ভয় দেখাবারই ব্যাপার,—হয়তো বা কোন কাগজওয়ালা আর সরকারী কর্মচারী চাইছে মিঃ কীবার গিয়ে 'দেখা' করে আসেন তাদের সাথে, আর হয়তো বা তিনি তা করেও এসে থাকবেন, কারণ, এর-পরে আর কিছুই শুনা গেল না এই বিচারের। এদিকে জমির মালিকরাও পারল না আর কাকেও দিয়ে কুয়ো বসাতে, কারণ তাদের পাশের জমিটাতেই বেরিয়েছে মাত্র দুশো পিপে তেলের এক খনি—যা কিনা এক কথায় কিছুই না; তার পর একদিন কাগজগুলোও জানিয়ে দিল দক্ষিণ দিকের জমিগুলো নাকি তাদের মনে হচ্ছে নেহাৎই ফাঁকা বলে।

পথ দিয়ে যেতে যেতে বাম্নী শুনতে পায় তার বাবার জয়ধ্বনি আর দেখতে পায় বেচারা মিঃ ডাম্পারি নামছেন ট্রলি থেকে, সারাদিন ধরে কারো না কারো হাতে হাজার কয়েক পেরেক ঠুকে শ্রান্ত দেহটাকে টেনে নিয়ে চলেছেন বাড়ীর দিকে; না হয়তো দেখে, হোস্ পাইপে করে জল ছিটিয়ে মিঃ স্যাম্ পরিচর্যা করছেন তাঁর বাগানখানির যেখানে কিনা তিনি লাগিয়েছেন যব আর সীমের চারা। মিসেস্ গ্রোর্তি খাবার খাওয়ান তাঁর মুরগীর ছানাগুলোকে না হয়তো সাফ করেন তাঁর খরগোসগুলোর খাঁচা, আর কখনো দেখা যায় না তাঁর সেদিনের সেই হলদে সাটীনের বাহারের সান্ধ্য পোষাকটা। ভিতরে ঢুকে গিয়ে বাম্নী গল্প জমায় মিসেস্ গ্রোর্তির সাথে, পাছে আবার তিনি না ওকে ভেবে বসেন দেমাকী। সেখানে এখনো রয়েছে সেই সিঁড়িটা যেটা কিনা শেষ হয়েছে শূন্যে, আর টেবিলটার পরে এখনও পড়ে রয়েছে মহিলাদের ভদ্রতা শিখবার সেই বইখানা, আঙুলের দাগ লেগে যার নীল মলাট আর সোনালী হরফে খোদাই নামটা গেছে বিবর্ণ হয়ে। দেখতে দেখতে বাম্নীর মনে পড়ে ড্যাডের কথা, তেলের খেলাকে সে তুলনা করে স্বর্গের সাথে যেখানে চিনা ভাব পড়ে বহু লোকেরই—কিন্তু খুব কম লোকের ভাগ্যেই জোটে ভেতরে ঢুকবার অনুমতি।

[৮]

পাহাড়ের পরে এখানে ওখানে ছড়ানো রয়েছে সব তেল তুলবার যন্ত্র আর তেল তুলিয়েরা সব পাল্লা দিচ্ছে প্রথম গিয়ে কে পৌঁছতে পারে মাটির তলার সেই অমূল্য সম্পদের কাছে তারই চেষ্টায়। দিনের বেলা বাষ্পীয় যন্ত্রগুলো থেকে বেরিয়ে আসে সাদা বাষ্পের মেঘ, আর রাতের বেলা তেল তুলবার যন্ত্রগুলো থেকে ঠিকরে পড়ে অজস্র আলোর বন্যা। সেই সাথে দিনে রাতে সব সময়ই শুনা যায় ভারী ভারী সব যন্ত্রের ঘুরপাক খাবার অবিশ্রান্ত ফটা-ফট্—ফটা-ফট্—ফটা-ফট্ শব্দ। খবরের কাগজে সংবাদ বেরয় নিয়মিত আর অজস্র দালাল আর হবু দালালেরা তাই গাড়ী হাঁকিয়ে এসে হাজির হয়—যেখানে সিণ্ডিকেটগুলো ফেলেছে তাদের তাঁবু না হয়তো গিয়ে ভিড় জমায় কর্মকর্তাদের সহরের অফিসে যেখানে কালো বোর্ডের পরে দাম লিখে রাখা হয় সাদা খড়ি দিয়ে আর অসংখ্য শেয়ার বিক্রী হয় এমনি সব লোকের কাছে যারা কিনা বলতে পারে না জলপ্রপাতের সাথে তেল তুলবার যন্ত্রের তফাৎ।

রস্-ব্যাঙ্কসাইডের এক নম্বর খনির কথাই যে কাগজে আগে বেরুবে এ তো জানা কথাই দিনরাত ভুলে ড্যাড্ গিয়ে সব সময়ই হাজির রয়েছে সেখানে, যারা তার হয়ে কাজ করছে তাদের সকলকেই সে রাখতে চায় চিনে, কড়া নজর রাখে তাদের কাজের পরে, কখনও তাদের দেয় উৎসাহ আবার দরকার মত বকুনি দিতেও করে না কসুর, আর এমনি করেই সে তার খনিতে ঘটতে দেয় নি কোনও দুর্ঘটনা, নষ্ট হতে দেয় নি একটাও দিন কিম্বা রাত। কুয়োটা তার গিয়ে এখন পৌঁছেছে বত্রিশ শ' ফিট নীচে যেখানে তেল মিশে রয়েছে বালির সাথে।

ওদের পাইপটার মুখের লোহার পাতখানা হচ্ছে ইঞ্চি আটেক চওড়া আর কিছুদিন হয় ওরা সেখানাকে চালিয়ে যাচ্ছে পাথুরে মাটির বুকে। মেলাই হুশিয়ার ড্যাড পাথর খোঁড়ার ব্যাপারে. গর্তটার সবটুকুই সে জেনে রাখতে চায় নির্ভুলভাবে আর সেই প্রসঙ্গে বলে চলে কি করে যে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে তেলের স্তরটাই গিয়েছিল পার হয়ে তারই সব মজার মজার গল্প এমনি করেই এগিয়ে চলে ওদের কুয়ো বসাবার কাজ আর এমনি করেই একদিন ওদের কুয়োটা থেকে উঠে আসে একটুকরো পাথর যেটা

কিনা ঠিক আপেলের শক্ত অংশটার মতই ফাঁপা। এই সুযোগে বাম্নী শিখতে থাকে শ্লেটমাটী আর বেলে পাথরের তফাৎ আর কি করে তারা মিশে থাকে পরস্পরের সাথে তারই রহস্য। ও শিখে নেয় কি করে স্থির করতে হয় মাটির তলার বিভিন্ন স্তর আর কি করে তার সাহায্যে ভূতাত্ত্বিকরা বুঝতে পাবেন মাটির তলার বিভিন্ন বস্তুর আকার প্রকার—আর নিরূপণ করতে পারেন খনিটার সম্ভাব্য অবস্থান। তেলের চিহ্ন পেলেই দরকার হয় রাসায়নিক পরীক্ষার আর বাম্নী শিখে নেয় সেই সব পরীক্ষার বিবরণগুলোর ব্যাখ্যা করবার সঠিক কৌশল। দুনিয়ার প্রত্যেকটি তেলের খনিই অন্যটি থেকে পৃথক আর তাবের সবগুলোই যেন এক একটি পৃথক পৃথক রহস্য। যারা ভেদ করতে পারে সেই রহস্য তাদের সামনেই খুলে যায় কুবেরের ধনভাণ্ডার।

ড্যাডের মনে হয় যেন সে পেঁ'ছে গেছে তেলের ঠিক উপরের স্তরটাতেই আর সেই অনুসারে সে অর্ডার দিয়ে দেয় তেল মজুত করবার চৌবাচ্চার। অন্যান্য সবকিছুর মত এ বস্তুটার জন্যও নেই প্রতিযোগিতার অন্ত। কিন্তু ড্যাডের আছে টাকা, আর আছে তার চেয়েও যেটা বেশী দরকারী, সেই টাকা থাকবার সুনাম। চৌবাচ্চাগুলো সে নিয়ে আসবে তার লীজ নেওয়া জমিটাতেই আর যদি নেহাৎই নিষ্ফল হয় তার তেল পাবার আশা তা হলেও কেউ না কেউ খুসী মনেই সেগুলো নিয়ে নেবে তার কাছ থেকে। দেখতে দেখতে এসে হাজির হলো একঝাঁক মাল লরী আর জমির পরে স্তূপ করে রাখতে লাগলো চ্যাপ্টা আর আঁকাবাঁকা নানা আকারের সব ইস্পাতের পাত, যেগুলো কিনা স্বচ্ছন্দেই মিশ খেয়ে যায় একটা আর একটার সাথে।

শেয়ার ক্রেতাদের কিন্তু নজর এড়ায় না এর কোন কিছুই। দিন রাত তারা ভীড় করে থাকে তেল তোলার যন্ত্রটার কাছে, কান খাড়া করে রাখে প্রত্যেকটি সংকেতের অপেক্ষায়। মজুরদের পেছন পেছন তারা ধাওয়া করে তাদের বাড়ী পর্যন্ত, চেষ্টা করে ঘুষ দিয়ে তাদের বশ করতে না হয়তো আলাপ জমাতে চায় তাদের স্ত্রীদের সাথে। বীচ সিটীতে বাম্নীর এখন আদর দেখে কে! দরাজ ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলার যেন আর নেই কোন শেষ। সবাই তারা ব্যস্ত বাম্নীকে আইসক্রীম না হয়তো বাক্সবোঝাই মিঠাই খাওয়াতে। কিন্তু ড্যাড ওকে বলে দিয়েছে কোন অপরিচিতের সাথে মেলামেশা কিম্বা কথাবার্তা না বলতে, আর তারপর একদিন বাড়ীর খাবার টেবিলে বসে আলোচনা করাও হয়ে গেল নিষিদ্ধ। এম্মা খুড়ীর অভ্যেস আছে তার 'মহিলা সংঘে' গিয়ে গল্প করা, আর মহিলারাও গিয়ে সে সব কথা বলে দেন তাঁদের স্বামীদের কাছে, তাছাড়া নিজেদের টাকারও তাঁরা করে থাকেন কিছু না কিছু ফাটকাবাজী।

আরও কিছু চিহ্ন পাওয়া গেল পাথুরে স্তরটা থেকে, আর ড্যাড হুকুম দিল তার চৌবাচ্চাগুলোর ভিত গাঁথতে। তারপর সেগুলো বসাবার হুকুম দিতেই চারদিক থেকে শুনা গেল তুরপুনের খ্যার-খ্যারে আওয়াজ আর দেখতে দেখতে যেন যাদুমন্ত্রেই তৈরী হয়ে গেল তিন তিনটে দশহাজার পিপের চৌবাচ্চা, যার তাদের টকটকে লাল রংয়ের পেইণ্টটা শুধু। আর তারপরে? তারপরে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো রহস্যময় একটা স্তব্ধতা—ওরা পেঁ'ছে গেছে সত্যিকারের তেলের মাটিতে! একদল মেকসিকান কুলিকে ড্যাড লাগিয়ে দিল পাইপ পুঁতবার আর খাদ কাটবার কাজে; যথাসময়ে সে খবরও গিয়ে পেঁ'ছলো জমি আর শেয়ার দালালদের কানে আর দেখতে দেখতে গোটা শহরটাই যেন উঠলো মেতে। দুপুর রাতে হেঁচকা মেরে ড্যাডকে টেনে তোলা হলো বিছানা থেকে, আর সে ডেকে তুললো বাম্নীকে, তারপর এক লাফে পুরনো পোষাকদুটো চাপিয়ে নিয়ে রাস্তার বুক চিরে ওরা ছুটে চললো খনির দিকে। সেখানে তখন আরও পরিষ্কার হয়ে উঠেছে তেলের চাপের চিহ্ন, গর্তের মধ্যে কাদাগুলো লাফাতে সুরু করেছে টগ্-বগ্ করে। পাইপ বসাবার কাজ দেওয়া হয়েছে বন্ধ করে, গর্তের উপরের লোহার ঢাকনাটাতে মিস্ত্রীরা স্ক্রু এঁটে চলেছে রুদ্ধশ্বাসে। আর এসবেরই ব্যবস্থা করে রেখেছে ড্যাড আগে থেকে। এতেও যেন ড্যাড পারছে না নিশ্চিন্ত হতে—লোক লাগিয়ে সে ব্যবস্থা করে দিল—ঢাকনাটার সাথে কতকগুলো মোটা টানা জুড়ে দেবার আর তাড়াতাড়ি দুজন সিমেণ্ট মিস্ত্রী এনে সেগুলোর পরে তৈরী করতে বললো মোটা মোটা সব সিমেণ্টের থাম, যাতে করে হাজার চাপেও ঢাকনাটা না যায় খুলে। আর যেখানেই হোক না কেন, অন্তত বস্-ব্যাঙ্কসাইডের এক নম্বর খনিতে হতে পারছে না কোন বিস্ফোরণ, গর্তটার সবটুকু তেলকেই গিয়ে ঢুকতে হবে ঐ চৌবাচ্চাগুলোর মধ্যে আর সেখান থেকে গিয়ে জমা হতে হবে ড্যাডের ব্যাঙ্কের হিসাব খাতায়।

কিন্তু মূল্যবান তেলগুলোকে বাঁচাতে হলে এখুনি দরকার কুয়োটার মধ্যে জল যাবার সব পথ বন্ধ করে দেওয়া। অনেক নীচে মাটির তলায় রয়েছে গোটা একটা তেলের নদী, আর সেটা ঢাকা রয়েছে উল্টানো গামলার আকারের বিরাট একটা দুর্ভেদ্য পাথরের স্তর দিয়ে। ভেতরে তেলের সাথে গ্যাসও রয়েছে মেলাই আর তা থেকেই আসছে চাপটা। একটিমাত্র গর্ত কেটে পাইপটা বসানো হয়েছে সেই উল্টানো গামলাটার মধ্যে, আর সেই পাইপ বেয়েই উঠে আসবে তেল আর গ্যাস, অবশ্য যদি উপর থেকে জল ঢুকে নষ্ট না করে দেয় সেই চাপটা। এর পরে সিমেণ্ট দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে গর্তটার তলার সব ফাটল, আর তা করতে হলে পাইপের আবরণটার ভেতর বা'র দুদিক থেকেই ঢালতে হবে সিমেণ্ট। তারপর সেটা শুকুলে তার মধ্য দিয়ে পাইপটাকে নিয়ে যেতে হবে আরও কিছুটা নীচে তেলে ভেজা বালিগুলোর মধ্যে আর এমনি করে তৈরী হয়ে যাবে এমন একটা পথ যা দিয়ে কিনা তেল উঠে আসবে উপরে অথচ একফোঁটা জলও নীচে যেতে পারবে না চুঁইয়ে। কাজটা করতে গিয়ে মিস্ত্রি আর মজুরেরাই হয়ে উঠেছে চঞ্চল, মালিক আর তার ছেলের তো কথাই নেই।

প্রথমেই নামিয়ে দিতে হবে পাইপের উপরের সেই আবরণটাকে যাকে বলা হয় কিনা 'জল নিবারণী'। ড্যাডের মত হুশিয়ার লোকেরা অবশ্য তেল তুলবার যন্ত্রটা থেকে সুরু করে গর্তটার তলা পর্যন্ত সবটাই ঢেকে দেয় এই আবরণটা দিয়ে। তারপর পরিষ্কার জল পাম্প করে দেয় গর্তটার মধ্যে আর তা চালিয়ে যায় যতক্ষণ না গর্তটার সব ময়লা আবর্জনাই যায় সাফ হয়ে। এর পরে ডাকা হয় সিমেণ্ট মিস্ত্রীদেরকে, তারা আসে তাদের

গাড়ী নিয়ে, সাজ-সরঞ্জামে বোঝাই গাড়ীটা সব সময়ই তৈরী থাকে যে কোন খনিতে ছুটে যেতে। আর একখানা গাড়ীতে আসে থলে ভর্তি সিমেন্ট, কমসে কম দু' শ থলে তো বটেই, আর তার সবটুকুই হওয়া চাই একদম খাঁটি, যেন না থাকতে পারে এক কণাও বালি। তারা কাজে লেগে যায় সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে, আর খেটে চলে দৈত্যের মত, কারণ সব কাজটাই তাদের শেষ করে ফেলতে হবে ঘন্টাখানেকের মধ্যে, সিমেন্টটা শুকিয়ে উঠবার আগে।

তাদের কাজের কৌশলটা দেখতে দেখতে সত্যি অবাক হয়ে যেতে হয় যে কোন লোককে। পাইপের আবরণটার মধ্যে তারা লাগিয়ে নেয় ঢালাই লোহার একটা রড আর তার দুদিকে থাকে দুখানা রবারের পাত যাতে করে সেটা ভাসতে থাকে আবরণটার মধ্যে, জলের পরে। বস্তা খুলে ফেলে সিমেন্টগুলো ঢেলে দেওয়া হয় মিশ্রণ যন্ত্রটার হাঁড়িটার মধ্যে আর সেটা ঘুরবার সাথে সাথে তরল সিমেন্টগুলো গিয়ে পড়তে থাকে গর্তটার মধ্যে। ভারী পাম্প দিয়ে ধাক্কা মেরে সেগুলোকে ঠেলে দেওয়া হয় গর্তটার ভেতরে আর আধঘন্টার মধ্যেই পাইপের আবরণটা ভর্তি হয়ে ওঠে কয়েক শ' ফিট। তারপর বেশ শক্ত করে লাগিয়ে দেওয়া হয় আর একখানা রবারের পাত আর সুরু হয়ে যায় পাম্পটার কাজ। পাতদুখানার মাঝের সিমেন্টগুলোকে ঠেলে দেওয়া হয় গর্তটার নীচে আর সেগুলো তলায় পৌঁছলে নীচের রবারের পাতখানা আপনা থেকেই যায় খসে; উপরের পাতখানার চাপে সিমেন্টগুলো ছড়িয়ে পড়ে গর্তটার সব ফাটলগুলোর মধ্যে, তারপর আবরণ আর গর্তটার দেয়ালের মাঝ দিয়ে উপরে উঠে আসে দু তিন শ' ফিট; আর এমনি করেই এক সময় সিমেন্ট শুকিয়ে গিয়ে তৈরী হয়ে যায় সেই 'জল-নিবারণী'।

এরকম একটা কাজ দাঁড়িয়ে দেখতেই কি কম মজা? কি রকম কি হচ্ছে মাটির তলায়, কেমন বুদ্ধি করে লোকগুলো সব উৎরে যাচ্ছে নানা বাধাবিপত্তি, মিস্ত্রী মজুররা সব কেমন কাজ করে চলেছে ছুটোছুটি করে আর তাদের চোখে মুখে ফুটে উঠেছে কেমন স্থৈর্য, ধৈর্য আর বুদ্ধিদৃপ্ত গাম্ভীর্য, আর কি করে সব কিছু মিলিয়ে সমস্ত কাজটাই এগিয়ে চলেছে সফলতার দিকে!

দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল সিমেন্টের কাজ; এর পর দিন দশেক যাবে সেটা শুকতে। তার মধ্যেই সরকারী লোক এসে পরীক্ষা করে গেল সব কিছু, না, আর কোন উপায়ই নেই ভিতরে একফোঁটা জল ঢুকবার, তা না হলে গোটা কাজটাই আবার ওরা করিয়ে ছাড়তো গোড়া থেকে, অনেক বেকুবকে তা করতেও হয়ে থাকে বিশ পঁচিশবার! কিন্তু ড্যাডের কথা স্বতন্ত্র, সে জানে কি করে সিমেন্ট দিয়ে সব আঁটতে হয়, আর সেই সাথে জানে সরকারী লোকদের সব মতিগতি—ড্যাড্ বলে তার মুচকি হাসি হেসে। যেমন করেই হোক অনুমতি সে পেয়ে গেল আর বস-ব্যাঙ্কসাইডের এক নম্বর কুয়োটাতে ছ ইঞ্চি ঘেরের পাইপটা গিয়ে পৌঁছলো সত্যিকারের তেলের স্তরে। পরীক্ষা চললো ঘন্টায় ঘন্টায়, ঠিক আছে কিনা তলার চাপটা, একটু এদিক ওদিক হলেই আবার পড়তে হবে মুস্কিলে। সফলতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সবাই হয়ে উঠেছে চঞ্চল, দ্রুততর হয়ে উঠেছে সকলের নাড়ীর স্পন্দন আর চাপা উত্তেজনায় চলা ফিরা করছে পা টিপে টিপে। সবাই যেন উদগ্রীব হয়ে উঠেছে খৃষ্টজন্ম দিবসের প্রভাতের অপেক্ষায়, অধীর আগ্রহে থলি খুলে দেখবে সান্টা ক্লজ দাদু কি নিয়ে আসে তাদের জন্য উপহার! সারাদিন ধরে ভীড় জমে ওঠে খনিটাকে ঘিরে, আর এক দৃষ্টে সবাই তাকিয়ে থাকে কুয়োটার দিকে—বাধ্য হয়ে কড়া ভাষায় নোটীশ টাঙিয়ে দিতে হয় সকলকে দূরে থাকতে বলে।

ড্যাড্ বলে মেলাই বসানো হয়েছে গর্তটা, এবার সুরু করতে হবে শেষ আবরণটা লাগাবার কাজ। এ আবরণটাকে ওরা বলে 'জাল', এটার গায়ে থাকে ছাঁকনির মত অসংখ্য ছিদ্র যা দিয়ে বেরিয়ে আসে অমূল্য সম্পদ। গভীর রাত পর্যন্ত চলতে থাকে কাজ; ওদের পুরনো পোষাক পরে ড্যাড আর বান্নী যেন স্নান করে ওঠে তেল আর কাদায়। তার পর এক সময় "জাল" লাগাবার কাজটাও আসে শেষ হয়ে, যন্ত্রপাতিগুলো সরিয়ে রেখে লোকজনেরা লেগে যায় জল পাম্প করে সব ধোয়া-মোছার কাজে। এতেও কোন না লাগবে পাঁচ-ছ' ঘন্টা, আর সে সময়টা ড্যাড্ আর বান্নী ঘুমিয়ে নেবে ওদের বাকী-ঘুমটা।

ওরা জেগে উঠতে উঠতে সময় হলো জল তুলে ফেলবার। তেল আর গ্যাসের চাপ আটকে রাখবার জন্য গর্তটার মধ্যে ওরা জল ঢেলেছিল মাইলখানেক জায়গা জুড়ে। এবার ওরা নিয়ে এল যাকে বলে দুমুখো এক 'জল-তুলনি' এক কথায় মস্ত লম্বা এক বালতি গর্তটার মধ্যে নামিয়ে দিয়ে সেটা দিয়ে ওরা জল তুলতে লাগলো এক এক-বারেই পঞ্চাশ ফিট করে আর তা ঢেলে দিতে লাগলো পাশের সেই কাদামাটীর নালাটায়। একটু পরে নীচের চাপে আপনা থেকেই জলটা উঠে আসতে লাগলো উপরের দিকে, বেশ বুঝা যাচ্ছে ওদের কাজ এসেছে প্রায় শেষ হয়ে, এর পর বাকী জলটুকু আপনা থেকেই ছিটকে পড়বে বাইরে আর কাদা উপচে পড়ে তেল তুলবার যন্ত্রটাকে করে তুলবে দিব্যি সুন্দর কালো চকচকে। এবার সময় হয়েছে আশেপাশের সব ভীড় হঠিয়ে দেবার আর যে সব আহাম্মকরা সিগারেট ফুঁকছে তাদের চিৎকার করে বারণ করবার।

"ঐ এলো—ঐ এসে গেছে," আনন্দের চীৎকার তুলে দর্শকরা সব দৌড়ে পালাল বাতাসের বেগে ছিটকে আসা পেট্রল থেকে নিজেদেরকে বাঁচাতে। তেল ছুটে বেরচ্ছে ফিনকি দিয়ে, লাফিয়ে উঠছে তেল তুলবার যন্ত্রটার চেয়েও উঁচুতে, শীষ ছুড়ে দিয়ে নেচে বেড়াচ্ছে উপর থেকে নীচে। এইভাবেই চললো বেশ কিছুকাল যতক্ষণ না সবটুকু জলই বের হয়ে গেল নিঃশেষে।

সূর্য ঢলে পড়ছে অস্তাচলে, পশ্চিম আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে রক্তিম বর্ণচ্ছটা। ড্যাড্ হেঁকে বলছে "বন্ধ করে দাও সব আলো! একটা গাড়ীও যেন না নেয় স্টার্ট!" নলের মুখের ঢাকনিটার শক্ত পরীক্ষার জন্য একবার ফোয়ারাটাকে ফেলা হলো বন্ধ করে। তারপর আবার দেওয়া হলো ছেড়ে। সবাই কাজ করে চললো গভীর রাত ধরে, আর অন্ধকারের বুকে রোমাঞ্চের শিহরণ তুলে ফোয়ারাটা মাতামাতি করে চললো আপন মনে। শেষ পর্যন্ত তাকে করে ফেলা হলো পুরোপুরি বন্দী, আর আয়োজন চললো ঘরে নিয়ে আসবার, মানে, গর্তটার ঢাকনির সাথে নল লাগিয়ে চৌবাচ্চাগুলোতে পুরবার। বন্দুর মতই সোজা কাজটা; নেই কোন হৈ হুল্লোড় কিম্বা জ্বালাজানির হাঙ্গামা। শুধু আসতে দিলেই হলো; পরিমাপ যন্ত্রে দেখা গেল তেলটা আসছে

ঘণ্টায় তিরিশ হাজার গ্যালন তেল, যার মানে হ'লো—পরদিন দুপুরের-মধ্যেই ওদের প্রথম চৌবাচ্চাটা যাবে ভর্তি হয়ে।

ঘটনাটা মোটামুটি এই হলেও রটনার প্রভাবে গোটা বীচ সিটীই উঠলো তোলপাড় হয়ে। রঙিন মেঘে চড়ে দেবদূত এসে নাকি সোনার টুকরো ছড়াচ্ছেন সহরের রাস্তায় রাস্তায় আর তার প্রতি টুকরোর দামই নাকি পঁচিশ ডলার। ব্যাস্, রস-ব্যাস্কসাইডের এক নম্বর খনিটাই প্রমাণ করে দিয়েছে উত্তর দিককার জমিটার অজস্র সম্ভাবনার কথা। ছোটবড় অসংখ্য লগ্নীদারদের কাছে এর অর্থ হচ্ছে তাদের মনে বাসনা পূর্ণ হবার নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি। এরকম একটা-সংবাদ কি আর চাপা থাকবার, তা হলে যে মানুষের স্বভাবটাই যেত মিথ্যে হয়ে। সংবাদপত্রগুলো বিশেষ সংখ্যা বের করলো খুটীনাটী সব বিবরণ দিয়ে রস্-ব্যাস্কসাইড তেল তুলছে প্রতিদিন ষোল হাজার পিপে করে আর সে তেলের ঘনত্ব হচ্ছে বত্রিশ। কাজেই পাইপ লাইনটা বসাবার কাজ শেষ হবার সাথে সাথেই এর মালিকের আয় হতে থাকবে প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় প্রায় বিশ হাজার ডলারের মত। এর পরে কেনই বা না আর গোটা সহরের লোক ভীড় করে তাকিয়ে থাকবে ড্যাড আর বান্নীর দিকে? ঐ যাচ্ছেন মহাত্মা জে-আরনল্ড রস, নূতন তেলের খনিটার মালিক। আর ঐ হচ্ছে তাঁর ছেলে। ভাব একবার ব্যাপারখানা, দিনরাতের প্রতিটি মিনিটে ওর আয় হচ্ছে তের ডলার করে, তা উনি জেগেই থাকুন আর ঘুমিয়েই থাকুন। ভগবানের দিব্যি, ওরকম আয়ের লোক পারে বটে খুসীমত খানার হুকুম দিতে।

বান্নীও যেন আর পারছে না নিজেকে একটু ভারিক্কী মনে না করে, কোথা থেকে কি যেন এসে ওকে করে তুলেছে বিশেষ আর চমৎকার একটা কিছু। সর্বাঙ্গে ওর লাগছে পুলকের শিহরণ, মনে হচ্ছে যেন দৌড়ে গিয়ে ও উড়ে বেড়াতে পারে, হাওয়ায় ভেসে। ড্যাড্ বলে, "আস্তে, খোকা, আস্তে! কথা কম ব'লো, আর মাথা ঠিক রেখে চ'লো। মনে রেখ এসব টাকা পয়সা কিছু তোমার তৈরী করা নয়, বেহিসেবীভাবে চললে নষ্ট হয়ে যেতে দেরী লাগবে না।" সত্যি কি তীক্ষ্ণ ড্যাডের বুদ্ধি, আর হবেই বা না কেন? এসব তো আর কিছু নূতন নয় তার কাছে, এর পেছনে রয়েছে তার সারাজীবনের অভিজ্ঞতা, প্রথমে এ্যান্টিলোপে তারপর লোবস্ রিভারে। সে জানে কি সর্বনাশা এই জাকজমকের নেশা—আর জানে বাচ্চা বয়সে এর প্রভাব কত বেশী। হ্যাঁ, মেলাই আনন্দ লাগে বটে মেলা টাকা থাকলে; কিন্তু জীবনের ভোজসভায় কঙ্কালই যে শেষ সত্য এ কথাটাও রাখা চাই মনে, সফলতার উগ্র সুরাপানের অবসরে বিবেক যেন স্মরণ করিয়ে দেয় চুপিসারে, "মৃত্যু একদিন আসবেই আসবে!" [ক্রমশঃ

★

চকিত-বিস্ময়

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

যন্ত্রে বাজায় জীবন-বেহালা
তবু ছিঁড়ে যায় তার
অজান্তে বার বার।
ফের তার টানা, হয়রানী ফের
সময়-আকাশে তারি চলে জের
মত্ত-ঝড়ের রুদ্ধ নাচনে
বিরুদ্ধ দাপাদাপি,
দূরে বসে থেকে, তুমি হেসে সারা
আমি ভয়ে তবু কাঁপি।

তার টানা হলে, খুঁজে পাই সুর
আবার তখন ছন্দ,
আপনার তালে আপনি চলিয়া
থামায় ঝড়ের দ্বন্দ্ব।
তখনও তো দেখি, তুমি হেসে সারা
আমি বিস্ময় মানি,
হতচকিতের মন নিয়ে তাই
ভুলে যাই হয়রানী।

প্রথম মুক্তিযজ্ঞের ঋত্বিক্ তাত্যা টোপে

বাণীকুমার

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ...বিদেশী পদানত ভারতে স্বাধীনতা-সংগ্রামের সূত্রপাত। সেদিন শত শত বীর সন্তানের রক্তে দেশের মাটি লাল হ'য়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই প্রাণোৎসর্গ নিষ্ফল হয়েছিল, তা'র কারণ মুক্তিযোদ্ধাদের শৃঙ্খলার আর প্রকৃত শক্তিশালী অধিনেতার অভাব।

সেদিনকার ভারতবর্ষ যে-রূপে প্রকাশ পেয়েছিল—সে-চিত্র চোখের 'পরে ফুটিয়ে তুল্‌লে আমরা দেখ্‌তে পাইঃ কূট-কৌশল-প্রয়োগে ও কয়েকজন স্বদেশদ্রোহী স্বার্থবাদী কৃতঘ্নের সহায়তায় বণিক ইংরেজ শত বৎসর ধ'রে বিচ্ছিন্ন একতাহীন ভারতে রাজ্য-বিস্তার ক'রে বসেছে। মুঘল-গৌরব-রবি অস্তাচলে, মহারাষ্ট্র-শক্তি বিপর্যস্ত, পঞ্জাবের ভাগ্যহত শিখরাজ অবরুদ্ধ, এবং ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য ইংরেজ-কবলে। ইংরেজ ক্রমে ক্রমে শক্তি-সঞ্চয় ক'রে ভারতের প্রায় অধিকাংশ স্থলে শাসন-দণ্ড পরিচালনে ব্যস্ত। ভারতের উর্বর প্রদেশসকল ইংরেজ কোম্পানীর কুক্ষিগত, তথাপি বিদেশী রাজ-প্রতিনিধি লর্ড ডালহৌসীর পররাজ্য-অপহরণ লালসা তৃপ্ত হোলো না। সাতারা ঝাঁসি অযোধ্যা নাগপুর প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলিকে অপকৌশলে গ্রাস ক'রে এই ইংরেজ-প্রতিনিধি রাজ্য বাড়াবার সয়তানী নীতিকে বড় ক'রে তুল্‌লে ন্যায়ধর্মের উপরে। ইংরেজকোম্পানী ছিল অর্থ-গৃধ্নু পরস্বাপহারী, ভারতের অন্ত্র বিদারণ ক'রে সমস্ত ধন-সম্পদ অপহরণ করতে লাগলো। দেশের যতটুকু সামরিক শক্তি ছিল—সমস্তই একে একে ভেঙে দেওয়া হোলো। বিদেশীর দৌরাত্ম্যে দেশবাসী ভ্রষ্টগৌরব, হৃতসম্পত্তি ও করভারগ্রস্ত হ'য়ে মনে মনে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-ভাব জাগিয়ে তুললে। এই সময়ে সহসা ভারত-আকাশে বিদেশীর স্থাপিত রাজ্যের 'পরে ভ্রূকুটি ক'রে দেখা দিল এক কৃষ্ণ-কুটিল মেঘ। সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের ঝঞ্ঝা উঠে যে অনর্থপাতের সৃষ্টি করলে—তা'র আঘাতে ইংরেজ-প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের ভিত্তি কেঁপে উঠলো প্রবল আন্দোলনে। সিপাহী-যোদ্ধারা উঠলো ক্ষেপে ইংরেজ-কোম্পানীর দুর্ব্যবহারে। বিদেশীর হাতে জাতি-ধর্ম বিপন্ন—তা' রক্ষা করার আহ্বান ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্তে ছড়িয়ে পড়লো। বলিষ্ঠ অধিনায়ক-হীন এই মুক্তি-যুদ্ধে সাড়া মিললো অনেক রাজা-প্রজার ও স্বাধীনতা-প্রিয় কয়েকজন নায়কের, আবার অনেকে যোগ দিল স্বার্থসিদ্ধির আশায় ইংরেজ-তুষ্টি-বিধানে। বিদ্রোহ-বহ্নি জ্বলে উঠলো দাউ দাউ ক'রে। রাজবন্দী মুঘল-বাদশাহ্ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্ সিপাহীগণ কর্তৃক বিঘোষিত হ'লেন হিন্দুস্থানের রাজাধিরাজ সম্রাট-রূপে। এদিকে বিপ্লবীরা কানপুরে মহারাষ্ট্র-চক্রের অধিনায়ক পেশওয়ে-পুত্র নানাসাহেব ধুন্ধুপন্থ্‌কে করলে তাদের প্রধান নিয়ন্তা।

ব্রাহ্মণকুলজাত তাত্যা-টোপে ছিলেন নানাসাহেবের নিত্য সঙ্গী ও বিশ্বস্ত সেনানায়ক। দেশমাতৃকার দাসত্ব-শৃঙ্খল-মোচনের প্রচেষ্টায় তাঁর অসীম উৎসাহ বহুগুণে বাড়িয়ে তুল্‌লে প্রভু নানার আদেশ। কিন্তু এই যুদ্ধ-বিগ্রহে নানা বিপর্যয় অতিক্রম ক'রে শেষ পর্যন্ত ইংরেজ-পক্ষ হোলো জয়ী। স্বদেশী-পক্ষের বন্দী নায়কগণ বিদেশীর বিচারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেন। মারাঠা-বীর সমরনিপুণ তাত্যা টোপেও বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে বিপক্ষ-কবলে পড়লেন—১৮৫৯, ৭-এপ্রিল মধ্যরাত্রে নিদ্রিতাবস্থায়।—পরদিন সকালে তাঁকে আনা হোলো ইংরেজ-সেনানায়ক মেজর মীডের শিবিরে। তারপর মীড্ তাত্যা টোপেকে চালিত করলে সিপ্রিতে মসৌরি-ক্যাম্পে। সেখানে বসলো সামরিক বিচার-সভা। প্রেসিডেন্ট হোলো মেজর মীড্।

বিচার-সভার বাইরে কঠিন প্রহরায় তাত্যা টোপেকে রৌদ্র-দগ্ধ উন্মুক্ত স্থানে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। প্রেসিডেন্টের আদেশে তাঁকে উপস্থিত করা হোলো আদালতে। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক প্রৌঢ় তাত্যা টোপের উন্নত সুগঠিত দেহ, পৌরুষ-ব্যঞ্জক মুখ, প্রশস্ত ললাট, ভয়-শূন্য দীপ্ত নয়ন-যুগ এবং উচ্চশির দেখে সেই বিচার-সভায় বিস্ময়াপন্ন ইংরেজ-নায়কদের মনোযোগ আকৃষ্ট হোলো। কিন্তু তা'রা প্রকৃত বীরের সম্মান বা প্রশংসা করতে সমবেত হয়নি, তাদের সংকল্প—পরের দেশে ব্রিটীশের সাম্রাজ্য-বৃদ্ধির পথে যা'রা বিঘ্নস্বরূপ, সেই সমস্ত বাধা নির্মূল করা।

অতঃপর এক গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে বিচারের কাজ আরম্ভ হোলো।

প্রেসিডেন্ট মীড্ কৃত্রিম আড়ম্বরের সঙ্গে কানুনমতো জিজ্ঞাসা করলেঃ "বন্দী তাঁতিয়াটোপে, এই সামরিক আদালতের কার্য-নীতি সম্বন্ধে কোনো বিবাদী মত পোষণ করো? তোমার বিরুদ্ধে যে নিদারুণ অভিযোগ আছে—সেগুলির বিচার হবে সামরিক আইন অনুসারে। কিছু বলতে ইচ্ছা করো তুমি?"

দ্বিভাষী বক্তব্যটি বুঝিয়ে দিতে তাত্যা টোপের মুখে ঈষৎ কৌতুকের হাসি খেলে গেল। তিনি বললেনঃ "আমি তোমাদের হাতে এখন বন্দী। আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর কিছুই নির্ভর করে না, তা' তোমরা বিশেষভাবেই জানো। তোমরাই অভিযোক্তা—তোমরাই বিচারক। এ-ক্ষেত্রে তোমাদের এ-প্রশ্ন নিরর্থক।"

—তখন প্রসিকিউটার জানিয়ে দিলে যেঃ আইনমতে সেই বিশেষ আদালত অভিযুক্ত বন্দীকে আপন বক্তব্য পেশ করবার সুযোগ বা স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত। আপত্তি যদি কিছু থাকে—তা' প্রকাশ করা যেতে পারে। ব্রিটীশ-আদালতে কোনো নিয়ম অমান্য করা রীতি নয়, দোষীকেও দেওয়া হয় তা'র বিরুদ্ধ-যুক্তি দেখাবার স্বাধীনতা।

তাত্যা টোপে গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলেনঃ "আততায়ী আংরেজের কাছে আমি দোষী, আর ভাগ্য প্রতিকূল হওয়ায় বন্দী। আমি যে-কাজ করেছি আমার দেশ, আমার ধর্ম, আমার দেশবাসীর জন্যে—তা' প্রকৃত অপরাধ কিনা—সূক্ষ্ম ন্যায়-বিচার করবে কে? আজ দৈববশে আমাকে তোমাদের আয়ত্তে পেয়েছ, আমি তোমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছি, প্রবল তোমরা—আমার প্রতি এখন যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারো। সে সম্বন্ধে সকল প্রশ্ন, সকল যুক্তিই নিষ্ফল। আংরেজ খুব কায়দা-দুরস্ত, তাই তোমরা স্বাজাতিক কয়েকজন ন্যায়দর্শী বা ভবিষ্যৎ তাত্ত্বিক ইতিবৃত্তকারের সমালোচনা এড়াবার জন্যে এই ছলনার আশ্রয় নিয়েছ। এ বিড়ম্বনা মাত্র। এখানে আমার মতামতের কোনো মূল্য নেই। সেজন্যে তা' প্রকাশ করতে আমি ক্ষান্ত হলুম।"

আদালত।—যে প্রশ্ন করা হয়েছে তোমাকে, সেইটুকুর জবাব এই আদালত শুনতে রাজি আছে। অবান্তর একটীও কথা বলবার বা অন্যের বিষয় বিবেচনা করার অধিকার তোমার নেই। তুমি নিজের সম্বন্ধে বক্তব্য পেশ করো।

তাত্যাটোপে।—আমার জবাব শুনতে চাও? কিন্তু তা' শোনবার মতো ধৈর্য আছে? আমার জবাব শ্রুতিসুখকর হবে না। আজ তোমরা আমার অধিকার নিয়ে মন্তব্য করছ, কিন্তু তোমরা কোন্ ন্যায্য অধিকারে আমার বিচার করতে বসেছ? আমি কোনোকালেই ব্রিটীশের প্রজা নই, আংরেজের আজন্ম দাসত্ব-স্বীকার কখনো করিনি, অতএব এখানে বিশ্বাসঘাতকতা বা বিদ্রোহের কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

আদালত।—তুমি রাজদ্রোহিতা-অপরাধে অপরাধী নও? ব্রিটীশ-রাজত্বের উচ্ছেদ-করার চেষ্টা কি রাজানুরাগ?

তাত্যাটোপে।—কে রাজা? এই হিন্দুস্থানের প্রকৃত রাজা কে? আমার জননী জন্মভূমির কর্তৃত্ব-ভার ভাগ্য-বিধাতা কা'র ওপর দিয়েছেন? আমি স্বাধীনদেশে জন্মেছি সাতচল্লিশ বৎসর আগে। তখন শ্রীমন্ত পণ্ডিত-প্রধান শিবশ্রী পেশওয়ে বাজীরাও মহারাষ্ট্রপতি, পশ্চিম ভারতের এক বিরাট অংশ তাঁর শাসনাধীন। তিনিই ছিলেন আমার রাজা, আমার পূজ্য প্রভু। যে বিদেশীজাতি আমার প্রভুর রাজ্যপাট লুঠ ক'রে এই মহারাষ্ট্রমুকুটমণিকে অবমাননার বৃত্তি-ভোগে বিঠুরে নির্বাসিত করতেও কুণ্ঠিত হয়নি—সেই পরস্বাপহারী জাতির আজ্ঞাবহ বিশ্বস্ত সেবক হ'তে আমি কোনোক্রমেই বাধ্য নই। তারপর মাননীয় পেশওয়ের দত্তকপুত্র শ্রীমন্ত ধুন্ধুপন্থ নানাসাহেবকে তাঁর পৈতৃক বৃত্তি থেকে বঞ্চিত ক'রে যে-আংরেজ কোম্পানী প্রতারণা-বিদ্যায় সুদক্ষ ব'লে এ-দেশে কুখ্যাত হয়েছে—সেই আংরেজের অনুগত হ'য়ে আমি স্বদেশ-দ্রোহী প্রভুদ্রোহী হ'তে পারি না। নানাসাহেব আমার প্রভু, আমার অন্নদাতা, আমি তাঁর বাল্য-সহচর—তাঁর দক্ষিণহস্ত। আমার প্রভুর আদেশ আমি মানতে বাধ্য—এই আমার সত্যধর্ম, তাই আমি বিদেশী আংরেজের বিরুদ্ধে ন্যায়যুদ্ধ করেছি। আংরেজের সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ নেই। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এসে আমি দাঁড়িয়েছি, অবাধ্য নিয়তির কুচক্রে আজ তোমাদের কৃপার 'পরে আমার অদৃষ্ট নির্ভর করছে। তবুও আমি মুক্তকণ্ঠে বলবো—দেশের স্বাধীনতা স্বাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার সংকল্প যদি অপরাধ হয়, তা' হ'লে সে-অপরাধ আমার চিরগৌরবের। যা' তোমাদের কাছে মহাপাপ—সে আমাদের পরম পুণ্য।

ব্রিটীশ সরকারের এই কঠোর সমালোচনায় আদালত ভীষণ আপত্তি তুললে। তাত্যাটোপেকে প্রেসিডেণ্ট মীড্ আদালত-অবমাননা করার জন্যে সাবধান ক'রে দিলে, এমন-কি নির্মম শাসনের ভয় দেখাতেও ভুললে না।

তাত্যা টোপে এই কথায় অণুমাত্র ভীত না হ'য়ে আরো গলা চড়িয়ে ব'লে উঠলেনঃ "প্রথমেই বলেছি—আংরেজের জিগির তোলা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। স্বাধীন দেশের জলহাওয়ায় আমার দেহ-মন পুষ্ট, স্বাধীনতাই আমার মূলমন্ত্র, পরাধীনতা ঘৃণ্য, এই শিক্ষা-দীক্ষায় আমি মানুষ। তাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমার প্রতিবাদের কণ্ঠ স্বভাবতই তিক্ত হ'য়ে ওঠে। বিদেশীর কাছে আমি মাথা নীচু করতে শিখিনি। আমি কি আংরেজের দাস যে—তাদের স্তুতিবাদ করবো? তোমাদের সাজানো এই আদালতে বিচারের আড়ম্বর সত্যই কৌতুকের সৃষ্টি করে। আংরেজের কূট-বুদ্ধির প্রশংসা করি। প্রবঞ্চনায় তোমরা সিদ্ধ।"

পুনরায় মেজর মীড্ তাত্যা টোপেকে ধমক দিয়ে প্রসিকিউটারকে নির্দেশ দিলে—মারাঠা-নায়কের বিরুদ্ধে অভিযোগের তালিকা পেশ করতে। কার্য-কারণ-সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় প্রমাণ-পত্র আদালতে উপস্থাপিত ক'রে অভিযোক্তা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিযোগগুলির তথ্য উদ্ঘাটন করলে এই ব'লে যেঃ বন্দীর বিরুদ্ধে প্রধান অর্থাৎ মুখ্য অভিযোগ দুটি। প্রথমঃ নানাসাহেবের সহচর ও মন্ত্রণাদাতা তাঁতিয়াটোপে কানপুরে ব্রিটীশ সরকারের বিদ্রোহী হ'য়ে তা'র উচ্ছেদ-সাধনের চেষ্টা করে এবং ইউরোপীয় শিশু-স্ত্রী-পুরুষদের নিরাপদস্থানে পৌঁছে দেবার ছলে তাদের নির্বিচার বিনাশে সিপাহীদের প্ররোচিত করে। এই কার্যদ্বারা তাঁতিয়াটোপে নিজকে 'পয়লানম্বর' বিদ্রোহী প্রমাণিত করেছে।.. দ্বিতীয়ঃ ব্রিটীশ সরকারের বিরুদ্ধে তাঁতিয়াটোপে ১৮৫৭ জুন থেকে ১৮৫৮ ডিসেম্বরের মধ্যে বহু যুদ্ধ-বিগ্রহে নেতৃত্ব করে। কানপুর, কাল্পী, গোয়ালিয়র, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভূভাগের কয়েকটি স্থানে অন্যায়ভাবে সংঘর্ষ, ধন-লুণ্ঠন ও শান্তি-নাশের জন্যে তাঁতিয়াটোপে সম্পূর্ণ দায়ী।...তারপর গৌণ অভিযোগ

নানাসাহেবকে ব্রিটীশের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে এবং তাঁর রাজ্য উদ্ধার করতে বারংবার কুপরামর্শ-দানে তাঁকে উত্তেজিত ক'রে তুলেছে তাঁতিয়াটোপে। পরন্তু কানপুরে নানাসাহেবের অধিকাংশ নিষ্ঠুর কার্যে তাঁতিয়া টোপে ছিল মন্ত্রী ও বিশেষ সহায়। নিরীহ ইউরোপীয়দের পাশব হত্যাকাণ্ডের এই ব্যক্তি অন্যতম কারণ।' এই সমস্ত অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর এবং বিচার-সাপেক্ষ ও দণ্ডযোগ্য।

এই সম্পর্কে প্রামাণিক দলিল, যুদ্ধের পরোয়ানা, মহারাজ সিন্ধিয়া প্রভৃতির কাছে অর্থের অন্যায় দাবির লিপি, বিদ্রোহে মিত্রপক্ষীয় রাজা ও ভূস্বামীদের দলভুক্ত করার জন্যে পত্র, এবং নানাসাহেবের বিরোধী হুকুমত-স্থাপনের ঘোষণা, সেই সঙ্গে রাজস্ব-আদায়ের ইস্তাহার প্রভৃতি দ্বিভাষী লেফ্‌টেনেন্ট গিবনের সাহায্যে পরীক্ষার কাজে সেদিন কেটে গেল। পরদিন প্রামাণ্য কাগজ-পত্রের পাঠোদ্ধার ও আদালতে সেগুলির প্রয়োগ, এবং নানাসাহেবের বিরুদ্ধবাদী ও ব্রিটীশ সরকারের পক্ষপাতী কানপুরবাসী উকিল নানকচাঁদের রোজনামা পরীক্ষা করা হোলো। এই ডায়ারিতে ১৫-মে তারিখ থেকে কানপুরের মুখ্য ঘটনাগুলি লেখা ছিল।

এরপরে প্রথম সাক্ষী নানকচাঁদ দিলে এজাহারঃ "নানা ধুন্ধুপন্থের সঙ্গী-হিসাবে তাত্যাটোপেকে বহুদিন যাবৎ দেখেছি। কিন্তু পেশওয়ে বাজীরাও-এর এক ভ্রাতুষ্পুত্র সম্পত্তির অংশ পাবার জন্যে নানাসাহেবের বিরুদ্ধে যখন মোকদ্দমা করে—সেই মোকদ্দমার ভার পড়ে আমার ওপর, সেই সময়ে তাত্যাটোপে কী প্রকৃতির লোক—তা'র পরিচয় পাই। ব্রিটীশ সরকারের সম্বন্ধে ওর প্রতিকূল মনোভাব তখনি জানতে পারি। কেননা অবস্থাগতিকে আমার পক্ষে নানাসাহেব আর তা'র দুই মন্ত্রী আজিম-উল্লা খাঁ এবং তাত্যা টোপের সকল পরামর্শ আর গতিবিধি সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল থাকা আবশ্যক হ'য়ে পড়েছিল। সেজন্যে আমার গুপ্ত ব্যবস্থা ছিল। ওদের বিরুদ্ধবাদিতা যে যে ঘটনায় প্রকাশ পায়—সে-সমস্ত আমার প্রত্যক্ষ মনে আছে। সকলেই জ্ঞাত আছেন যে, পেশওয়ে বাজীরাও-এর মৃত্যুর পর নানাসাহেব তাঁর ওয়ারিশ হ'য়ে ব্রিটীশ-সরকারের কাছে পেশওয়ের যে আট লক্ষ টাকা বৃত্তি ছিল—তা' দাবি করে। কিন্তু তা'র সেই দাবি অগ্রাহ্য হয়। তা'তে তাত্যাটোপের জ্বালা ধরে। আবার যখন আজিম-উল্লা খাঁ ও রঙ্গবজী নানাসাহেবের পক্ষ নিয়ে বিলেতে দরবার করতে গিয়েও নিষ্ফল হ'য়ে ফিরে এলো—তখনকার তাত্যাটোপের আচরণ এমনি সীমালঙ্ঘন করেছিল, যেন নিজেরি সর্বনাশ হয়েছে। নানাসাহেবের মনের আগুনে এই ব্যক্তিই সবচেয়ে বেশী ইন্ধন যুগিয়েছিল। সেদিন আশা-হত নানাসাহেব গুমুরে উঠে বলেঃ "ভারত ঈর্ষা-দ্বেষ আর আত্মকলহে বিচ্ছিন্ন, তাই বিদেশী বণিক শত বর্ষ ধ'রে একে একে সমস্ত রাজ্য গ্রাস ক'রে আসছে। সত্যিকারের মানুষ বা দেবতা এ-দেশে আর নেই। আজকে ভাগ্য-বিধাতা হয়েছে ধূর্ত ইংরেজ।"—এই কথায় তাত্যাটোপে তা'র প্রভুকে উত্তেজিত করবার ছলে বল্লেঃ 'আত্মকৃত পাপের জন্যে দুঃখ-গ্লানি ব্যাসা বেঁধেছে—তা' দূর করতে হবে অসীম তেজে। আজ অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে প'ড়ে থাকলে—ইংরেজের চাপে প'ড়ে হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিই দলিত পিষ্ট হ'য়ে অতলে তলিয়ে যাবে। ইংরেজ আজ প্রবল হ'য়ে উঠেছে সৈন্যবল বাড়িয়ে এই দেশেরি সিপাহীদের নিয়ে। সংবাদ পেয়েছি, সিপাহীরা ইংরেজের কঠোর আচরণে ক্ষেপে উঠেছে। মদমত্ত ইংরেজ-কোম্পানী আগুন নিয়ে খেলা শুরু করেছে—এই আগুনই তাদের অস্তিত্বের বাইরে চ'লে গিয়ে তাদেরি পুড়িয়ে মারবে। এই সুযোগ ধরতে হবে, বিমুখ মুহূর্তকে আমাদের অনুকূলে আনতে হবে। মহারাষ্ট্রগৌরবের শেষরশ্মি নানা ধুন্ধুপন্থ বুদ্ধিমান, নীতিকৌশলী, তা'ছাড়া অপূর্ব কর্মশক্তির 'পরে পূর্ণবিশ্বাসী। তা'হলে নিরাশার কারণ কি? এ অপমানের শোধ নিতেই হবে। তোমার অপমানে আমার অপমান, তোমার গৌরবে আমার গৌরব। পিতৃসম্মান, পেশওয়ের পদমর্যাদা আর ন্যায়-অধিকার থেকে তোমাকে যখনি বঞ্চিত করেছে ইংরেজ-সরকার, সেইদিনই আমার বুকে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে' উঠেছে। বিদেশীর উচ্ছেদ না হ'লে এ-আগুন নিববে না। আর এ-কথাও ঠিক—ওদের কাল পূর্ণ হ'য়ে এসেছে। পুরাণ-ইতিহাস প্রমাণ দেবে—কোনো বিদেশী জাত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে এই ভারতে তা'র অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেনি।'—নানাসাহেব উৎসাহিত হ'য়ে ব'লে ওঠেঃ 'আবার নতুন ইতিহাস আমরা রচনা করবো—এই উদ্দেশ্যই আমাদের কার্যসিদ্ধির পথে এগিয়ে দেবে। সিপাহীরা সংঘবদ্ধ হ'লে আমার নেতৃত্ব যদি মেনে নেয়—আমি ইংরেজ-সরকারের ধ্বংস এনে দিতে পারবো।"

এই সময়ে আজিম-উল্লা খাঁ সেখানে উপস্থিত হ'য়ে নানাসাহেবের আশার স্বপন নানা রঙে রাঙিয়ে তুললে, বললেঃ 'বারুদ তৈরী কিন্তু আগুন জ্বালাবার উপযুক্ত লোক এখনি এগিয়ে না গেলে—ভিজে মাটির মতো বরবাদ হ'য়ে যাবে। ইংরেজকে খুব বেশী ভয় করবার কিছু নেই। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ইংরেজের বল-বীর্য পরীক্ষা হ'য়ে গেছে। আমি বিলেত থেকে ফিরে এসে অনেক জায়গায় ঘুরে সিপাহীদের সঙ্গে গোপনে মিশে তাদের আসল মতলব জানবার চেষ্টা করেছি। খোঁজ ক'রে জেনেছি সাচ্চা খবর—দেশী ফৌজ বিদেশী সরকারের ওপর বিলকুল নারাজ। সিপাহীদের সঙ্গে গোরা-সাহেবেরা খারাপ ব্যবহার করে, তাদের কথায় কথায় 'ড্যাম নিগার' ব'লে অপমান করে। তা'ছাড়া নির্বিবন্ধ মাংসের চর্বি-লাগানো টোটা হিন্দু-মুসলমান সিপাহীকে দাঁতে কাটতে হবে ব'লে—প্রত্যেকের মন ধর্মনাশের ভয়ে বিদ্রোহী হ'য়ে উঠেছে। আগুনের মতো সিপাহীদের এই বিদ্রোহের খবর ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। সকলেই প্রস্তুত, এমন কি তা'রা অস্থির হ'য়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে দিন গণছে। এখন দরকার শুধু যোগ্য অধি-

নেতা।—ব্যস—তা'হ'লেই কাম ফতে, ইংরেজ সরকারের ফৌত হ'তে কয়দিন মাত্র।" —নানা প্রশ্ন করলেঃ "তবে অধিনায়ক হবে কে? দিল্লীর সেই অকর্মণ্য ললনাবিলাসী বৃদ্ধ মুঘল—না—লক্ষ্ণৌ-এর সেই বিলাস-ভোগী অপদার্থ? পেশওয়ে বাজীরাও-এর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী, মহারাষ্ট্র-গৌরব-রক্ষক বিঠুরাধিপ নানা ধুন্ধুপন্থ কা'র নেতৃত্ব স্বীকার ক'রে নেবে? আমি কারো অধীনে যুদ্ধে যোগ দিতে রাজি নই।"—

চতুর আজিম-উল্লা নানাকে আশ্বস্ত ক'রে বললেঃ "আজকে মিথ্যে অভিমান করবার দিন নয়, রাজাসাহেব! এগিয়ে আসুন—সিপাহীদের নেতৃত্ব নিন। আপনার চেয়ে যোগ্য নেতা আর কে আছে?"

তখনো নানাসাহেবের মন সন্দেহ-দোলায় দুলছিল, সে জানতো ইংরেজের শক্তি-সামর্থ্যের কথা। কিন্তু আর-এক মন্ত্রী তাত্যাটোপে মন্ত্রণা দিলেঃ "যে অবস্থা এসে দাঁড়িয়েছে তা' দৈব যোগাযোগ ভিন্ন আর কিছু নয়। এ-ক্ষেত্রে মনের কোনোরকম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পাপ। ইংরেজের মুখ চেয়ে পিছিয়ে থাকলে সমূহ বিপদ। এই ব্রাহ্মণসন্তান তাত্যা টোপের প্রতিজ্ঞাঃ প্রভুর অবমাননা, জন্মভূমির দাসত্ব-বন্ধন, ধর্মনাশের অপচেষ্টা, আর এই দুর্ভাগা দেশের দরিদ্র প্রজার পীড়ন—সমস্তই একে একে সম্মুখ-যুদ্ধে ইংরেজের সঙ্গে হিসেব-নিকেশ করবো। ওরা আমাদের শত্রু—ওদের বিনাশ করাই ধর্ম।"

এর পরেও নানাসাহেবের উপপত্নী আজিম-উল্লার সম্পর্কিতা আদলা বিবি তা'কে প্ররোচিত ক'রে বললেঃ "ইংরেজের কোনো অনুনয়ে কোনো সর্তে তুমি সায় দেবে না—অঙ্গীকার করো।—আমাদের দেশী পল্টন কোম্পানীর ধ্বংস করতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ। গণনা এবার ফলবে। ইংরেজ-কোম্পানীর একশো বছরের রাজ্যভোগ শেষ হ'য়ে এসেছে। জনবল, অস্ত্রবল—এ কোনোটারই অভাব হবে না। আর দুরদৃষ্টের দোহাই পেড়ে ইংরেজের মার না খেয়ে ইংরেজ-উচ্ছেদে লেগে যাও।" নানাসাহেব এইভাবে উত্তেজিত হ'য়ে উঠলো।

এই বৃত্তান্ত একটুও অতিরঞ্জিত নয়—এ-কথা আমি জোর গলায় আদালতের সামনে বলতে পারি। এর পরের ঘটনা—আমি যা' জানি—তা' সমস্তই কানপুর-সম্পর্কে। ১৮৫৭—জুন মাসের গোড়াতেই কানপুরে বিদ্রোহীরা এসে নানাসাহেবকে তাদের অধিনায়ক করলে। ৬-জুন তারিখে কানপুরের ইংরেজরা আক্রান্ত হোলো। মাটির প্রাচীরে-ঘেরা একস্থানে থেকে ইংরেজ-পক্ষ সিপাহীদের আক্রমণে বাধা দিতে লাগলো। কিন্তু সিপাহীরা ছিল সংখ্যায় বেশী, তাই ইংরেজরা দুর্দশার চরমে এসে পৌঁছুলো। জলের অভাব, খাদ্যের অভাব প্রভৃতি তাদের অতিষ্ঠ ক'রে তুললে। ইংরেজ-মহিলারা এই বিপদ দেখে হাহাকার ক'রে উঠলো। জীবন-রক্ষার কোনো উপায় তারা দেখতে পেলে না।—ইংরেজরা যখন আত্মরক্ষায় বিপন্ন হ'য়ে ওঠে—সেই সময়ে কানপুরে সিপাহীদের মধ্যে হিন্দী-উর্দুতে এক ইস্তাহার নানাসাহেবের নামে প্রচার করা হয়। তা'তে ছিল—হিন্দু-মুসলমানকে ধর্মরক্ষার জন্যে অনুরোধ। তখন উভয় জাতির দূরদর্শী যারা—ঐ ঘোষণাপত্রে তারা বিচলিত হয়নি বটে, কিন্তু নগরের অনভিজ্ঞ উত্তেজিত জনসাধারণ ইংরেজের মালখানা লুঠ ক'রে অর্থের লোভে সিপাহীদের সঙ্গে যোগ দিতে মোটেই দ্বিধা করেনি। আর মুসলমান সিপাহীরা তো এই ইস্তাহার পেয়ে ইংরেজ প্রভৃতি চক্রান্তকারীদের রক্ত-নেশায় মেতে উঠলো। তিন সপ্তাহ আত্মরক্ষা করবার পরেও যখন সর্ববিষয়ে অবরুদ্ধ ইংরেজ নিরুপায়, সেই সময়ে নানাসাহেবের কাছে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পাঠানো হোলো তারি পূর্বেকার ইংরেজী-ভাষা-শিক্ষাগুরুর মাধ্যমে।—নানাসাহেবের তাঁবু ছিল 'সাবেডার হাউস' বা 'সাবেদা কুঠীতে'। নানা তখন এক রকম সম্মত হ'য়ে—পরে একটী পত্র-দ্বারা এই বার্তা পাঠালেঃ 'মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রজা-গণ-সমীপে এই প্রস্তাব দেওয়া হ'চ্চে যে—লর্ড ডালহৌসির কাজের সঙ্গে যাদের কোনো সংস্রব নাই, এবং যাদের অস্ত্র-ত্যাগের ইচ্ছা আছে, তা'রা নিরাপদে এলাহাবাদে যেতে পারে।" এই বার্তা বহন ক'রে এনেছিল নানাসাহেবের এক বন্দী ঘড়ির ব্যবসাদার জেকবি সাহেবের বিবি। জেনারেল্ হুইলার এই চিঠি পেয়ে বললেন যে, এ-বিষয়ে পরামর্শ ক'রে উত্তর পাঠাবেন। এই সংবাদে সিপাহীরা ইউরোপীয়দের ওপর গোলা-বর্ষণ বন্ধ করলে। কিন্তু সেনাপতি আজিম-উল্লা খাঁর লেখা পত্রটি পেয়ে বিশেষ উৎসাহ পেলেন না। প্রথমতঃ পত্রে কারো স্বাক্ষর তো ছিলই না, তা'ছাড়া নানাসাহেব বা তা'র উকিল ও মন্ত্রী আজিম-উল্লার ওপর বিশ্বাস রাখতে সেনাপতির মন সায় দেয়নি। তখন শিশু, রুগ্ন, বৃদ্ধ আর মহিলাদের মুখ চেয়ে—অনেক বিবেচনার পর—নানাসাহেবের নামে আজিম-উল্লার হাতে-লেখা প্রস্তাব মেনে নেওয়াই স্থির হোলো। এদিকে 'সবেদা কুঠীতে' নানাসাহেবের সঙ্গে তাত্যাটোপে প্রভৃতি মিলে ইউরোপীয়দের একেবারে ধ্বংস করবার কূটমন্ত্রণায় ব্যস্ত ছিল। পরে সন্ধিপত্রে দুইপক্ষ স্বাক্ষর করে। তা'তে প্রস্তাব ছিল—ব্রিটীশ-পক্ষকে সেই প্রাচীর-ঘেরা আশ্রয়-স্থল, আর সমস্ত ধন-দৌলত ছেড়ে চ'লে যেতে হবে, কেবল নিজেদের অস্ত্র ও প্রতিজনে যাটবার গুলি ছোঁড়বার মতো বারুদ আর টোটা সঙ্গে নিয়ে যেতে সম্মতি মিলবে। নানাসাহেব তাঁদের সকলকে নিরাপদে নদীর ধারে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করবে, ঘাটে প্রস্তুত থাকবে নৌকা। তদুপরি খাদ্যসামগ্রীও দেওয়া হবে। কিন্তু চুক্তির দিন বৈকালে এক ঘোড়সওয়ার সিপাহী এসে নানার এই আদেশ জানিয়ে দেয় যেঃ সেই রাত্রেই ইংরেজদের সকলকেই সে-স্থান ত্যাগ করতে হবে। নইলে আবার যদি গোলা-বৃষ্টি আরম্ভ হয়—তা'হ'লে সেখানকার ইংরেজদের বিনাশ কেউ বাধা দিতে পারবে না। জেনারেল হুইলার মৃত্যুর ভয় তুচ্ছ ক'রেও আপত্তি তুলে জানালেন যে—সে রাত্রিতে যাত্রা করা অসম্ভব। তিনি

সন্ধিপত্র ফিরিয়ে দিতে উদ্যত দেখে ঘোড়সওয়ার-সিপাহী পুনরায় ফিরে গেল নানার শিবিরে। কিয়ৎক্ষণ পরে এসে জ্ঞাপন করলে নানার শেষ বিবেচনার বৃত্তান্ত যেঃ পরদিন সকালেই সমস্ত ইংরেজকে এলাহাবাদে যাবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। এবং নানার শিবির থেকে তিনজন প্রতিভূ উপস্থিত হবে সেখানে সেই রাত্রে থাকবার জন্যে। কোনো বন্দোবস্তের ত্রুটী হবে না। রোগীদের জন্যে ডুলি পাঠানো হবে, মেয়েদের জন্যে পাল্কী, আর সমর্থ পুরুষদের জন্যে হাতী বা ঘোড়ার বাহন।

অতঃপর ইংরেজদের এলাহাবাদ পাঠাবার সমস্ত ভার পড়লো তাত্যাটোপের উপরে। ইংরেজদের সেই প্রাচীর-ঘেরা স্থান থেকে এক মাইল দূরে গঙ্গার সতীচৌরা ঘাটে নৌকা অপেক্ষা করবে—এই জানিয়ে দেওয়া হোলো। এই প্রস্তাব মতো ২৭-জুন সকালেই প্রায় চারশো-পঞ্চাশ জন ইউরোপীয় মেয়ে-পুরুষ-শিশু সকলেই এসে সমবেত হোলো নদীতীরে। সতীচৌরা ঘাটে চল্লিশখানি নৌকা তৈরী ছিল। তাত্যাটোপে সেই ঘাটের সামনে এক দেবমন্দিরের চত্বরে দাঁড়িয়ে সমস্ত তদ্বির করছিল। সকলে নৌকায় উঠতে না উঠতেই হঠাৎ ভেরী-তুরীর শব্দে নদীতীর কেঁপে উঠলো। তারপর নির্বিচারে হত্যা, অগ্নিকান্ড আর আর্ত্তচীৎকার। শুনেছি আজিম-উল্লা 'ইংরেজ সব ফোত হয়েছে' ব'লে নানার কাছে উল্লাস দেখাতে নানা এই রাক্ষসবৃত্তিকে ধিক্কৃত করেছিল। —যাই হোক যা'রা বাঁচতে পারলে, তাদের বন্দী ক'রে রাখা হোলো।...এই হত্যার চারদিন পরে নানাসাহেব বিঠুরে মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রস্থান করে। বিবিঘরে একশো-পঁচিশ জন ইংরেজ বন্দী রইলো। এই সময়ে দু'-একজন ইংরেজ-মহিলা অসমসাহস দেখাতে কুণ্ঠিত হয়নি।

এই পর্যন্ত আমার সঠিক জানা আছে, তারপর যা' জেনেছি—তা' জনশ্রুতির সাহায্যে।"

নানকচাঁদের জবানবন্দীর পর আরো কয়েকজন প্রত্যক্ষ-দর্শীর সাক্ষ্য নেওয়া হোলো। কানপুর অধিকারের পর নানাসাহেব পয়লা জুলাই বিঠুরে সগৌরবে পেশওয়ের পদে অধিষ্ঠিত হলেন। প্রথমে একুশবার তোপ দেগে ঘোষিত হোলো—নানা ধুন্ধুপন্থ্ দক্ষিণ ভারতের স্বাধীন পেশওয়ে। —পরপর তিন দফা কামান-গর্জন শেষ হলে নগরে শুরু হোলো বিজয়োৎসব। কানপুর ও পার্শ্ববর্তী জনপদসমূহে দামামা-বাদ্যে প্রচারিত হোলো—ইংরেজের পরাজয়-কাহিনী। তারপরে স্বাধীন রাষ্ট্রের তিনটি ঘোষণা জানতে পারলে জনসাধারণ। সাক্ষীগণের জবানবন্দীতে এই সকল তথ্য প্রমাণিত হোলো।

এরপর দশ নম্বর রেজিমেন্টের এক হাবিলদার এজাহার দিতে উঠে বললেঃ "আমি যা' দেখেছি বা জানি—তা'তে তাত্যাটোপে সতীচৌরার হত্যার জন্যে দায়ী ব'লে সাব্যস্ত হয়। আমি মন্দিরের একধারে লুকিয়ে ছিলুম। সেই মন্দিরের সামনে হাজির ছিল তাত্যাটোপে, আজিম-উল্লা, আর সুবাদার টীকা সিং। আংরেজরা হাঁটু জলে নেমে বিবিলোক, কাচ্চা-বাচ্চা, বিমার আর জখমীদের নায়ে তুলে দেবার পর—তাত্যাটোপে হাত তুলে কী ইশারা করলে। একটু পরেই কানে গেলঃ দোসরা ঘোড়সওয়ারদের সুবাদার টীকা সিংকে হুকুম দেওয়া হ'চ্চে—আংরেজদের বেবাক খুন করবার জন্যে সওয়ার চাই।"

এই উক্তিতে তাত্যাটোপে আদালতের সমক্ষে রুদ্ধকণ্ঠে প্রতিবাদ ক'রে বললেনঃ "ঝুট—সব ঝুট। আমি নৌকা সংগ্রহ ক'রে সাহেব বিবি আর ছোট ছেলেমেয়েদের এলাহাবাদে রওনা করিয়ে দিই। সেই সময়ে সমস্ত অশ্বারোহী, পদাতিক আর গোলন্দাজ সৈন্য নদীর ধারে উপস্থিত হয়। হঠাৎ দেখি—সিপাহীরা লাফ্ দিয়ে জলে নেমে সাহেব বিবি ছেলেমেয়ে সকলকে বধ করতে থাকে। তা'র আগুন লাগিয়ে উনপঞ্চাশখানি নৌকা নষ্ট করে। একটীমাত্র রক্ষা পেয়ে কালো কাঁকুড় পর্যন্ত যেতে পারে, কিন্তু সেই নৌকা-টিকেও কানপুরে ফিরিয়ে আনা হয় এবং আরোহীদের সিপাহীরা মারে। কা'র আদেশে এই হত্যাকান্ড ঘটেছে—জানি না। কিন্তু এই অমানুষিক কাজে হুকুম দোবো—সে-রকম ভীরু কাপুরুষ আমি নই। তখন সিপাহীরা উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে ওঠে—কঠিন হ'য়ে পড়ে তাদের আয়ত্তাধীন করা। বিশ্বাস করো—না করো—আমার প্রত্যেক কথা খাঁটি সত্য।"

আদালতের নিয়মে তাত্যাটোপে বাধা পেলেন, তাঁকে বলা হোলোঃ "তোমার সওয়াল জবাবে যা' বক্তব্য আছে—বলতে পারো। এখন প্রমাণের উপর—তোমার কথা যথার্থ কিনা তা' নির্ভর করছে।"

তারপর হাবিলদার সাক্ষীটি আদালতের নির্দেশ পেলে জবাব দিতে যে—বিবিঘরে যে-সমস্ত ইংরেজ-মহিলা ও শিশুসন্তানকে আটক রাখা হয়, বিদ্রোহী সিপাহীরা সেই নিরীহদের নিধন করে কা'র হুকুমে?

হাবিলদার এই ঘটনার মূল কারণ যা' বিবৃত করলে—তা' এই যেঃ বিবিঘরের বন্দীগণকে ইংরেজরা পাছে উদ্ধারের চেষ্টা করে এই আশঙ্কা জানিয়ে আজিম-উল্লা তাদের নিশ্চিহ্ন ক'রে দেবার জন্যে নানাসাহেবকে বহু যুক্তিদ্বারা প্ররোচিত করতে থাকে। নানাসাহেব নারী ও শিশু-হত্যায় অসম্মত হন। তাত্যাটোপেও এই হীন অপৌরুষের কাজে ভীষণ আপত্তি তোলেন। এর ফলে আজিম-উল্লা ও তাত্যা টোপের মধ্যে বাগ্‌বিতন্ডা শুরু হয়। আজিম বলেঃ "বিদেশীরা কি দেশ-জয় করতে এসে এ-দেশের নারী-শিশুকে অনুগ্রহ দেখিয়েছে? তারা দরিদ্রকে করেছে পথের ভিখারী, ধনীর ঐশ্বর্য কেড়ে নিয়ে তা'কে করেছে নিঃস্ব। আজ স্বদেশীরা নিজের গৃহে প্রবাসী। শুধু তাই নয় দুশমন ইংরেজ রাজার রাজ্য কেড়ে নিয়ে করেছে রাজ্যহারা, গৃহহারা করেছে গৃহীকে। আর যা'রা সমর্থ—তাদের তা'রা লাগিয়েছে দাসত্বের হীন কাজে—মুহুর্মুহু তাদের পিঠে চাবুক কসিয়ে। তাহলে দয়া-মমতার স্থান কই? জীবন-মৃত্যুর সমস্যায় যে-দেশ আজকে বিপন্ন,

সেই দেশকে বাঁচতে হ'লে গোড়াতে নিষ্ঠুরের সাধনা করা নিতান্ত দরকার। এখন মেয়ে হোক্—পুরুষ হোক্—ক্ষমা করা শোভা পায় না। মেয়েদের ওপর যদি অনুগ্রহই দেখাতে হয়, যা'রা বশ মান্‌বে—তাদের হত্যা না ক'রে বাঁদী ক'রে রাখ্‌লেই যথেষ্ট।"—তাত্যা টোপে এই নীচ প্রস্তাবে ধিক্কার দিয়ে সে-স্থান ত্যাগ করেন। তারপর আদলা বিবি ও আজিম-উল্লা—দুজনে মিলে অতিথির ছদ্মবেশে গোরাদের পাশবিক আচারের দৃষ্টান্ত দিয়ে নানা সাহেবের সম্মতি আদায়ের চেষ্টা করে। তবুও নানা-সাহেব এই হত্যায় অনুমতি দিতে রাজি হন নি। কিন্তু পরে নানাসাহেব খবর পেয়ে স্তম্ভিত হলেন যে—দু'চার জন গোরা সৈন্য ছিট্‌কে বেরিয়ে প'ড়ে তস্করের মতো গ্রামীণ গৃহস্থদের সর্বনাশ ক'রে বেড়াচ্ছিল। তা' জান্‌তে পেরে সিপাহীরা তাদের ধ'রে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে কেটে ফেলেছে। সিপাহীরা সমস্ত বাধা-বন্ধ দূর ক'রে দিয়ে দুর্নিবার হ'য়ে উঠেছে। তা'রা সমস্বরে চেঁচিয়ে বল্‌ছে—তাদের আওরত-বালবাচ্চার ওপর এখনো আড়ালে-আব্‌ডালে পীড়ন সতীত্ব-নাশ চলেছে, সেই বর্বর গোরাদের যোগ্য উত্তর দিতে হবে।—এই কারণে উন্মত্ত সৈন্যরা বিবিঘরের সমস্ত বন্দীকে হত্যা করেছে।

হাবিলদার এই ব'লে তা'র বক্তব্য শেষ করলে যেঃ যতদূর জানা গেছে—এই হত্যাকাণ্ডের মূলে আদলা বিবি আর আজিম-উল্লার গোপন ব্যবস্থা।

বিচারপর্ব এগিয়ে চল্‌লো। হাবিলদার প্রভৃতির এজাহারে সত্যে-মিথ্যায় জড়িত হ'য়ে ইউরোপীয়-হত্যার রহস্য হোলো উদ্ঘাটিত। তারপর প্রসিকিউটারের বিবরণে প্রকাশঃ নানাসাহেবের দুদিনের রাজ্যভোগ ঘুচে গেল। ব্রিটীশ-সৈন্য এসে পুনরায় কানপুর ও বিঠুর আক্রমণ করলে। নানাসাহেব অনুচিত সাহসে যুদ্ধ করলেন, কিন্তু পরাজিত হ'য়ে পলায়ন করতে বাধ্য হলেন। আজিম-উল্লারও আর খোঁজ মিললো না। কানপুর ব্রিটীশ-অধিকারে গেল। নানাসাহেবের সমস্ত ধন-সম্পত্তি ইংরেজ-কবলে গিয়ে পড়লো। ইংরেজ সৈন্যরা প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হ'য়ে উঠে লুণ্ঠন ও নির্বিচার হত্যাকাণ্ড শুরু করে। কিন্তু সেনাপতি হ্যাভলকের কঠোরতায় এবং উচ্ছৃঙ্খল সেনাদের শাস্তিদানের জন্যে 'প্রোবোস্ট মার্শ্যাল'—নিয়োগে এই অসংযম রুদ্ধ হয়।—নৃশংস হত্যার প্রতিশোধ হত্যা—এ-ক্ষেত্রে ব্রিটীশ সৈন্যদলকে বিশেষ দোষী করা যায় না।

প্রসিকিউটারের এই উক্তিতে তাত্যা টোপে আহত ব্যাঘ্রের মতো গর্জন ক'রে উঠে বললেনঃ "আংরেজের দোষ এই আদালতের চোখে দোষ নয়—যত অপরাধ এই দেশ-বাসীর! তোমরা ন্যায়ের বড়াই করো, অথচ সত্যের অপলাপ করছ পদে পদে। বিজয়-গর্বিত আংরেজ-সেনার মনুষ্যত্ব-ঘাতী অত্যাচার দানবকেও ছাড়িয়ে গেছে। নানাসাহেবের প্রাসাদ লুঠ করেছে তোমাদের সেনা হীন দস্যুর মতো, তাঁর সোনার বা চাঁদির তৈজসপত্র পর্যন্ত লোভীর মতো হরণ করা হয়েছে।'

আদালত।—নানাসাহেব কি ইউরোপীয়দের ভীষণ অত্যাচার করে নি? সিপাহীরা কি লুঠতরাজে ক্ষান্ত ছিল? যে অত্যাচার একবার করেছে—তা'র পাল্‌টা জবাব তো পেতেই হবে, ঈশ্বরের এই নিয়ম।

তাত্যা টোপে।—আর ঈশ্বরের পবিত্র নাম মুখে নিয়ে তাঁর অপমান কোরো না। সিপাহীদের অন্যায়কে সহস্র-গুণে ছাড়িয়ে গেছে আংরেজ-সেনার আসুরিক লীলা। তা' বর্ণনা করতে ভাষাও অক্ষম। দোষী-নির্দোষ কেউই আংরেজের অস্ত্রের প্রহার থেকে নিস্তার পায়নি। রক্তস্নানে সারা কানপুরকে তোমরা রাঙা ক'রে দিয়েছ। তোমার কাছে শত্রু-মিত্র সমান, নিরীহ অধিবাসীরা যেন ধূলিকণা। যাদের ওপর তোমাদের তিলমাত্র সন্দেহ জেগেছে, তাদেরি ফাঁসি-কাঠে ঝুলিয়ে দিয়েছ। কেবল এক কানপুর শহরেই আংরেজের অস্ত্রাঘাতে দশ হাজার প্রাণী বন্য পশুর মতো নিহত হয়েছে। মাতাল গোরাসেনারা নির্বিরোধ গ্রাম-বাসীদেরও অত্যাচার করতে কুণ্ঠিত হয় নি। শান্তিপ্রিয় দুর্ভাগার দল উৎপীড়িত হয়েছে, লুণ্ঠিত হয়েছে, বিনষ্ট হয়েছে। তোমরা ঘরে ঘরে তুলে দিয়েছ হাহাকার, মায়ের কোল থেকে শিশুকে ছিনিয়ে নিয়ে আছাড় মেরেছ, নারীকে করেছ নির্যাতন। তোমরা আবার সভ্যজাতি ব'লে গর্ব করো? আংরেজের এ-অত্যাচার এই দেশে বিকট রূপে দেখা দিয়েছে।

আদালত।—যে-সমস্ত মত্ত সেনা এই সমস্ত দুষ্ট কাজে ব্রতী ছিল—তাদের শাস্তি দেবার ব্যবস্থা হয়। তা' কি মিথ্যা ব'লে অমান্য করতে পারো?

তাত্যা টোপে।—কুচক্রী তোমরা, তাই ধ্বংস শেষ ক'রে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা। তোমাদের কর্নেল নীলের পীড়ন যে কতদূর সীমাহারা হ'য়ে উঠেছিল—তা' কি মনে করিয়ে দিতে হবে? বন্দী সিপাহীদের ফাঁসি দেবার পূর্বে আংরেজ-বন্দীদের মৃত্যুর জায়গায় নিয়ে গিয়ে—চাবুকের পর চাবুক মেরে অতি জঘন্যভাবে মেঝের রক্ত জিব দিয়ে চাটানো হয়েছে। হিন্দু সিপাহীকে হত্যা ক'রে তা'কে গোর দিয়েছ, আর মুসলমান সিপাহীদের শবদাহ করেছ। কোন্ ধর্মে, কোন্ দেশে, কোন্ জাতির কাছ থেকে আংরেজ তা'র এই রাক্ষসীবৃত্তির সমর্থন পেতে পারে। পরের দেশে এসে তোমরা পায়ের চাপে সকলকে দ'লে পিষে দেবে, নির্বিচারে রক্ত বওয়াবে, আর সেই দেশের লোক প্রতিবাদ করলে—তাদের কণ্ঠ চেপে ধরবে। এই তো তোমাদের নীতি। তোমরা যে প্রবল অন্যায়ে দেশ ভরিয়ে দিচ্ছো—তা'র বিচারের দিন আস্‌বেই—আজ না হয় কাল। আমরা এ-যুদ্ধে হার মেনেছি—জানি, এতে ক্ষয়-ক্ষতি অনেক হয়েছে, কিন্তু এই দেশে প্রাণের শিকড়ে শিকড়ে লেগেছে নাড়া। যুগনিদ্রা ছেড়ে আবার এ-দেশ জেগে উঠ্‌বে।... তোমরা শত বাধা দিয়েও আমার বাক্‌রোধ করতে পারবে

না। জগৎ জানুক্ তোমাদের পাশব প্রকৃতির কলঙ্ক-কাহিনী।

আদালত।—তুমি যদি না চুপ করো, তাহ'লে তোমাকে আদালত থেকে বা'র ক'রে দেওয়া হবে, রাখা হবে কয়েদ-খানায়।

তাত্যা টোপে কেবল একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন। ...অনন্তর আরো সাক্ষী প্রকট করার ব্যস্ততা বৃদ্ধি পেল। —তাত্যা টোপের বিরুদ্ধে প্রমাণিত হোলো যে: গোয়ালিয়র সৈন্য দলের সেনাপতি-রূপে পুনর্বার তিনি কানপুর ও বিঠুর উদ্ধারের জন্যে ইংরেজদের আক্রমণ ক'রে জয়ী হন। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে ব্রিটীশ প্রধান সেনাপতির কাছে হার মেনে তাত্যা টোপে সুশৃঙ্খলভাবে কানপুরের পঁয়তাল্লিশ মাইল দূরে যমুনার দক্ষিণ-তটবর্তী কাল্পীতে প্রস্থান করেন।—নানাসাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র রাওসাহেব তাত্যা টোপের সঙ্গে কাল্পীতে ছিলেন। সেই সময়ে নানাসাহেবের নামে ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর পত্র প্রেরিত হয়। ঝাঁসীতেও তখন বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠেছে। ইংরেজরা বহু যুদ্ধের পর কূটচক্রে ঝাঁসী অধিকার করতে রাণীকে সাহায্য দেবার অভিপ্রায়ে তাত্যা টোপে সৈন্য পাঠালেন। কিন্তু যুদ্ধে হার হোলো। কাল্পীও ইংরেজের অধিকারে গেল। তখন গোয়ালিয়রে ছুটলেন রাণী লক্ষ্মীবাঈ, তাত্যা টোপে ও রাওসাহেব।

গোয়ালিয়রের মহারাজ জয়াজীরাও সিন্ধিয়া ছিলেন ইংরেজের পক্ষপাতী, তাঁকে সপক্ষে পাওয়া সহজ ব'লে বোধ হোলো না। কিন্তু গোয়ালিয়র-দুর্গে আশ্রয়-লাভ করতে না পারলে—ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-পরিচালনা করা এক-প্রকার অসম্ভব, এই কঠিন সত্যটি রাণী লক্ষ্মীবাঈ প্রমুখ নেতৃগণ উপলব্ধি করলেন। তা' ছাড়া সুশিক্ষিত সৈন্যবল ও রাজনীতিজ্ঞ মন্ত্রী দিনকর রাও-এর সুদক্ষ রাজ্য-চালনার গুণে সিন্ধিয়া পরাক্রান্ত, তাঁকে সম্মুখ-যুদ্ধে পরাজিত করা সুসাধ্য নয়।

এই সমস্যার সমাধান করলেন রাণী লক্ষ্মীবাঈ। তিনি মন্ত্রণা দিলেন: এক অভিনব উপায়ে সুদৃঢ় গোয়ালিয়র-দুর্গ জয় ক'রে—এই আশ্রয়-স্থানে ধনরত্ন, জিনিস-পত্র প্রভৃতি রক্ষা করতে হবে। এখানে প্রতিভাকে করতে হবে অস্ত্র। সিন্ধিয়ার সৈনিকদের জাতি-ধর্ম ও দেশ-প্রেমের নামে চেতিয়ে তুলতে যদি পারা যায়—তাহ'লে অল্পায়াসেই দুর্গ-অধিকার করা সম্ভবপর। বিচক্ষণা রাণীর এই পরামর্শে তাত্যা টোপে আশান্বিত হলেন। তদনুসারে কার্য নিয়ন্ত্রিত হোলো, হঠাৎ আক্রমণে সিন্ধিয়া পরাজয় স্বীকার ক'রে বিজয়িনী রাণীর সঙ্গে ত্রস্তপদে সাক্ষাৎ করতে এলেন। কিন্তু সিন্ধিয়া সেখানে উপস্থিত হ'য়ে নিজের সৈন্যদল দেখে সাহসে ভর ক'রে রাণীকে ও অন্য দুই রণ-নায়ককে বন্দী করতে আদেশ দিলেন। সে আদেশ প্রতি-পালিত হোলো না।

রাণী লক্ষ্মীবাঈ মৃদু হেসে শ্লেষ ক'রে বল্লেন:

'আমরা এসেছি আপনার কাছে—দেশের জন্যে, দেশবাসীর জন্যে, ধর্মের জন্যে। আপনার রাজ্যে অশান্তি এনে দেওয়া আমাদের একেবারেই অভিপ্রেত নয়, আপনার সঙ্গে যুদ্ধও আমরা চাই না। ঝাঁসীর রাণী কিংবা রণপণ্ডিত তাত্যা টোপে যে-হাতে অসি বা বন্দুক ধরে—তা' বীর্যবানের বিরুদ্ধেই। ইংরেজের শত শত সৈনিক, কাপ্তেন, মেজর, কর্নেল এই অস্ত্রাঘাতে মরেছে। মহারাজের ন্যায় পরপদ-লেহী কাপুরুষকে আঘাত ক'রে এ-অস্ত্রকে কোনোদিন আমরা কলঙ্কিত করবো না।...আমার ঝাঁসী গেছে। হয়তো আমার জীবনের শেষ দিন এগিয়ে এসেছে। তাই মৃত্যুর আগে আমার মনের একটী সাধ মেটাতে চাই। আপনাকে আর হোলকার প্রভৃতি বিদেশীর অনুগ্রহ-লোভী রাজগণকে যোগ্য বেশ-ভূষা দিয়ে সম্মানিত করবার আকাঙ্ক্ষা রাখি। এই আপনার যোগ্য উপহার—নারীর এই বসন, আর এই নথ। এর পরিবর্তে আপনার পাগড়ী আর পুরুষের পোষাকটি দিন।'

এই বিদ্রূপ শুনে সমবেত সকলে হাস্য-মুখর হ'য়ে উঠলো। সর্বজন চীৎকার ক'রে বলতে লাগলো: 'মহারাজ সিন্ধিয়া—তোমার বসন আর নথ নাও, মেয়েদের ওড়না পরো—অন্তঃপুরে ঢুকে বাস করো।'—

সিন্ধিয়া হলেন পলাতক। গোয়ালিয়র-দুর্গ তাঁদের অধিকারে গেল। আত্মরক্ষা এবং ইংরেজ-বিরুদ্ধে যুদ্ধের ত্বরিত আয়োজনে তাঁরা উদ্যোগী হলেন। কিন্তু গোয়ালিয়র-দুর্গ জেনারল্ হিউরোজ বহু ইংরেজ-ফৌজ নিয়ে গিয়ে আক্রমণ করলে। উভয়পক্ষে তুমুল সংঘর্ষ বাধলো। এই সংগ্রামে রাণী লক্ষ্মীবাঈ দৈবদোষে নিহত হলেন। পরাজিত তাত্যা টোপে সদলবলে এক স্থান থেকে স্থানান্তরে গিয়ে যুদ্ধ-বিগ্রহ দ্বারা ইংরেজদের ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুললেন। যুদ্ধ-নীতি-বিশারদ তাত্যার কূটকৌশলের কাছে ইংরেজ-পক্ষ জয় ক'রেও হার মানলে, তাদের মহাতঙ্ক দুর্ধর্ষ শত্রুর তারা নাগাল পেল না। পরাজয়ের পর থেকে ন' মাস কাল তাত্যা টোপে ব্রিটীশ পক্ষের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি একাধিকবার রাজপুতানা ও মালবদেশ পরিভ্রমণ করেন। তা'র পরিধি হোলো—একশো একষট্টি হাজার সাতশো বর্গমাইল। তিনি নর্মদা উত্তীর্ণ হন এবং পশ্চিম ভারতীয় ভূভাগে প্রতিপক্ষের সহজ আক্রমণেরও বন্দী হবার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও পণ্ডিত টোপে শত্রুদের আঘাত হানতে পশ্চাৎপদ হন নি। তারপর যুদ্ধজয়ের আশা নির্মূল হ'তে রণক্লান্ত বীর সৈন্যদল ত্যাগ ক'রে 'পারণ' নামক অঞ্চলের এক নিবিড় বনে গিয়ে আত্মগোপন করেন। সেখানে তাঁর এক সহযোগী গোয়ালিয়র-রাজ্যান্তর্ভুক্ত 'নরবরের' সর্দার মানসিংহের সঙ্গে দেখা হয়। মানসিংহ ছিল গোয়ালিয়র-মহারাজের বিদ্রোহী। এই মানসিংহ একদিন বিপদ্‌গ্রস্ত হ'য়ে তাত্যা টোপের শরণ-ভিক্ষা করে। এই সমস্ত বিবেচনায় তাত্যা টোপের বিশ্বাস হয় যে: মানসিংহ ইংরেজের

কাছে সপরিবারে আত্মসমর্পণ করলেও—বন্ধুত্বের মান অবশ্যই রাখবে। মানসিংহও এই উপকারী মিত্রকে নিরাপত্তা সম্বন্ধে আশ্বাস দিতে ত্রুটী করেনি।

৭ এপ্রিল, ১৮৫৯, গভীর রাত্রি। পারণের বনপ্রদেশে তাত্যা টোপে নিদ্রিত। এমন সময়ে বিশ্বাসঘাতক বন্ধু মানসিংহের কঠোর স্পর্শে তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হোলো। বোম্বায়ের সিপাহীদের সাহায্যে মানসিংহ তাঁকে বন্দী ক'রে পরদিন প্রভাতে সেনানায়ক মীডের শিবিরে প্রেরণ করলে।

তৎপরেই সামরিক আদালতে তাত্যা টোপের বিচার-পর্ব আরম্ভ।

সর্বশেষে তাত্যা টোপে আদালত কর্তৃক আদিষ্ট হ'য়ে সওয়াল-জবাব দিতে উঠ্লেন:—

'আজ এক স্বার্থান্বেষী বেইমানের চক্রান্তে আমি তোমাদের হাতে অতর্কিত মুহূর্তে বন্দী হয়েছি। তাই তোমরা এই বিচার-অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছ। তোমরা আমাকে মুক্তি দেবে না—জানি, কেননা আমি তোমাদের একটা আতঙ্ক। এই বিচার-সভায় আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে—আমার প্রভু নানাসাহেব এবং কাল্পী অধিকৃত হওয়ার পর রাওসাহেবের আদেশ পালন ক'রে কাজের রথ চালিয়েছি। তাছাড়া আর একটি কথা: আমি কোনো ইংরেজ স্ত্রী-পুরুষ বা বালক-বালিকার প্রাণহানি করিনি, কিংবা কোনো সময়ে কারো ফাঁসির জন্যে অনুমতি দিইনি। আর কিছু বলবার নেই।...কিন্তু আজকে শেষকথা ব'লে যাবো।—ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসাদে তোমরা এই হিন্দুস্থানে এসে দিনে দিনে আধিপত্য বিস্তার করছ। তোমাদের সহায় মানসিংহ-সিন্ধিয়ার মতো দেশদ্রোহী জনশত্রুর দল। আমাদের অধিনায়ক আর সংহত শক্তির অভাবে তোমরা আজ জয়ী হয়েছ। কিন্তু এ-রাজ্যপাট তোমাদের গুটিয়ে নিয়ে সাগর-পাড়ি দিতে হবেই। তোমাদের অহঙ্কার তোমাদের মারবে। আজ আমার যদি মৃত্যু হয়—কোনো খেদ নেই। আমি মহামৃত্যুঞ্জয়ের সাধক-শিষ্য। আমার মহারাষ্ট্র—আমার ভারত—এই তপস্যাপূত দেশের মুক্ত আকাশের নীচে যেদিন স্বাধীনতার পতাকা উড়বে—সেদিন আমার ভারতবাসী এই ব্রাহ্মণকে যদি স্মরণ করে—তাহ'লেই দেশ-মাতৃকার পুণ্য বেদীমূলে আমার জীবন উৎসর্গ করা সার্থক হবে। দেশকে বাঁচাতে পারলুম না—এই দুঃখ বুকে ক'রে বিদায় নোবো। আমার শাশ্বত ভারত আবার নবজীবন-যৌবনে জেগে উঠুক। এই আমার অন্তরের প্রার্থনা রেখে গেলুম। কোটি কোটি কণ্ঠে ধ্বনিত হোক্—জয় হিন্দ্! জিন্দ্গী হিন্দুস্থান!! জয়তু ভারতমাতা!!!

ইংরেজের বিচারে তাত্যা টোপের হোলো প্রাণদণ্ড। ১৮ এপ্রিল, ১৮৫৯—মারাঠাবীরকেশরীর ফাঁসি হোলো সিপ্রিতে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে স্বাধীনতা-যজ্ঞের এক শ্রেষ্ঠ ঋত্বিক্ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। কিন্তু তিনি এই ভারতভূমিতে স্মরণীয় বরণীয় হ'য়ে রইলেন অমর প্রাণের সন্ধানী-রূপে।

অ্যাক্সিডেন্ট

সুনীলকুমার নন্দী

কথার মিলে আলতো মনে উঠছি ট্রামে যেম্নি—
হঠাৎ পিছে চোখ ফিরিয়ে চোখ ফিরিয়ে এম্নি
আসছো দেখি দু'হাতে ঠেলে লোকের ভিড় স্বপ্না:
দু'চোখে ভরা গহন রাত—রাতের ঢেউ, বন্যা।

এ-কোন টান মুহূর্তেই সে-রাতে ডুবি; বন্ধ
হ'লো কি আহা বর্তমান, অতীত তার ছন্দ
জোগাল গতি স্মৃতির পায়ে: বেহুঁশ মন অন্ধ
আচ্ছা হ'লো ট্রামের থেকে ফসকে দেহ। শব্দ

উঠলো জোর; ঝাপসা কানে ঢুকলো শুধু মিষ্টি
একটি কথা 'বাঁচবে তবে?' করুণ তার দৃষ্টি
স্বরের মাঝে ভাসছে যেন। সকল কথা অন্য
পিছলে গেলো কানের থেকে। আমার শুধু জন্য

আজ-ও এত স্বপ্না ভাবে। আবার নামে বৃষ্টি
মরুভূ ঝেঁপে। অনর্গল ভীরু কালির সৃষ্টি।

বৈশ্য-যুগ

শ্রীসুধীর গুপ্ত

অন্ন-কোষে অবিরাম আনাগোনা করি
যান্ত্রিক জীবন-যাত্রা যাপনাভিলাষে;
সুন্দরের সুক্ষ্ম শোভা দূরে পরিহরি'
'চিম্‌নী' কলের কালি ছড়াই আকাশে।
বৈশ্য দৃষ্টিকোণ দিয়া দেখি বিশ্ব হায়;
স্বর্ণ শস্য-ক্ষেত্রে শুধু উদরান্ন খুঁজি;
মানস মাধুর্য-রস ভুলেছি ধরায়;
জান্তব অস্তিত্ব লাগি' করি যোঝাযুঝি;—
যুদ্ধমান জীবনের বোঝাপড়া শুধু;—
বিংশ শতাব্দের বৈশ্য-সভ্যতা ভীষণ;
বসুন্ধরা রুক্ষ্ম হোলো বালু-বন্ধ্যা ধু ধু;
বস্তুর পাহাড়ে চাপা পড়েছে স্বপন।
মোরা যত বস্তু-দাস বৈশ্য আত্মহীন
আশা-লুপ্ত শতাব্দীর 'মড়ক' মলিন।

রায়

শ্রীঅক্ষয়কুমার চক্রবর্তী

দিনটা ছিল সম্ভবতঃ পনেরোই আগস্ট্।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির স্মারক হিসাবে ছুটীর দিন। আহারের মাত্রাটা সেদিন কিঞ্চিৎ অধিক হইয়াছিল। দুপুর বেলায় তাই আরাম-শয়নে দেহ-যষ্টি এলাইয়া দিয়া আড়গোড় ভাঙ্গিতেছিলাম। নিদ্রার পূর্বাভাষ।

নিচে পথ দিয়া বহু-আড়ম্বরে একটি মিছিল চলিয়া গেল। সে প্রবল হৈ-হল্লায় তন্দ্রার রেশ কাটিয়া গেল। এ উন্মাদনা স্বাধীনতা দিবসের উচ্ছ্বল প্রাণরসের বহিঃপ্রকাশ হইতে পারে, বা বিরুদ্ধবাদীদের 'কমন্‌ওয়েলথ্' বিরোধী প্রচারণার কারণেও হইতে পারে। মোট কথা, স্বভাব আলস্যের দরুণ মনের দিক হইতে মিছিলের বহরখানা উঠিয়া দেখিবার মত উৎসাহ পাইলাম না। যথাপূর্ব নিশ্চেষ্টভাবে বিছানায় পড়িয়া রহিলাম। ইহার মধ্যে কখন নিদ্রাদেবীর কোলে আত্মসমর্পণ করিয়া বসিয়াছি বলিতে পারি না। তরল নিদ্রার মাঝে স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, এইটুকু উপলব্ধি করিয়াছি পরে। কিন্তু স্বপ্নটি বড় অদ্ভুত; আর তাহাই বলিবার জন্য এই ভূমিকা।...

অনুরূপ একটি মিছিল।—অভিনব।

পনেরোই আগস্টের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন কিছুই নহে। এ মিছিলের প্রবাহ একপাল জন্তু-জানোয়ারকে লইয়া। দলটির মধ্যে আছে ছাগ, বলীবর্দ, শূকর, গড্ডালিকা আর ক'একটি হংস-কুক্কুট। একুনে হাজার খানেকের মত হইবে। তবে, ছাগের সংখ্যাই বেশি—রাম, পাটনাই, বঙ্গীয় পাঁঠা ও বিলাতী অভিজাত প্রভৃতি জাতিনির্বিশেষে প্রায় সাত শত।

ইহাদের মিলিত জিগিরে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত। ধীর-মন্থর প্রবাহে উহারা পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে অগ্রসর হইতেছে। পথে দর্শনার্থী উৎসুক জনসমুদ্র কাতারে কাতারে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। মিছিলস্থ ছাগ, বলীবর্দ ইত্যাদির কাহারও পৃষ্ঠে, শৃঙ্গে বা লেজে নানা চটকদার বাণী সম্বলিত পোস্টার আর ফেস্টুন লট্‌কানো বা উঁচু করিয়া বাঁধা। তাহাতে স্পষ্ট বড় বড় হরফে লেখা—

'শলটার হাউস্ নিপাত যাক্, জবাই করা চল্‌বে না, মাংস খাওয়া বন্ধ কর, 'খাসি-করা' প্রথার উচ্ছেদ চাই, আমাদের লড়াই বাঁচার লড়াই, মানুষের জুলুম সইবো না।'

এই সব দাবীদাওয়া। স্বভাবতই হাসি আসে—পাঁঠাদের আবার দাবী, কিন্তু হাসিলে চলিবে কেন? তাহাদের কি দাবী করিতেও নাই? অবশ্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পক্ষে এ আন্দোলন সহ্য করা কঠিন বৈ কি। মাছ-মাংস ভোজন এখন হইতে সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া গেলে পৃথিবী মনুষ্যবাসের অযোগ্য হইয়া উঠিবে, এ জন্মটাই নস্যাৎ হইবার উপক্রম হইবে। আর, তাও ঐ সব অর্বাচীন ছাগ-বলীবর্দের আন্দোলনের ফলে! দর্শক সাধারণের মধ্যে অতি-উৎসাহীর অভাব হইল না,—ক'একজন এসব সহ্য করিতে না পারিয়া বীরবিক্রমে চলিষ্ণু মিছিলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া লেখা কাগজ, ন্যাক্‌ড়া ছিঁড়িয়া ছড়াইয়া দিল। ছাগ, বলীবর্দ, শূকরপালও শৃঙ্গ-আস্ফালনে আগাইয়া আসিল। স্নিগ্ধ-মস্তিষ্ক কয়েকজন প্রবীণ-ব্যক্তি মধ্যে পড়িয়া সংঘর্ষের অনিবার্যতা কোনক্রমে থামাইয়া দিয়া দিনকতক সবুর করিয়া অপোগণ্ডদের বাড়টা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার পরামর্শ দিলেন। ইতিমধ্যে সাংবাদিকদের ক'একজনকে ক্যামেরা হাতে আশে-পাশে ঘোরাঘুরি করিতে দেখা গেল।

ছোটখাট বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া মিছিলটি সুবিধামত একটি পার্কে আসিয়া জমায়েৎ হইল। এখানে পূর্ব হইতে সভার আয়োজন প্রস্তুত ছিল। বলা বাহুল্য উদ্যোক্তারা সবাই গৃহপালিত পশু,—মনুষ্যের নিত্য মিছিল, সভাসমিতি দেখিয়া তাহারা কায়দাকানুন রপ্ত করিয়া লইয়াছে।

বলীবর্দগণ প্রবীণতম গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইলেও তাহারা আমন্ত্রিত মাত্র, এই বিবেচনায় ছাগ-প্রতিনিধিগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বংশমর্যাদাবান রাম-জাতীয় একটি বৃদ্ধ ছাগ আজকার সভায় সভাপতিত্ব করিবার জন্য আহূত হইলে অধিবেশন শুরু হইয়া গেল। উদ্বোধন-সঙ্গীতটি কিরূপ মনোরম হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার উল্লেখ নাই বা করিলাম।

সভাপতির অনুরোধে মূল-আইনায়ক পাটনাই জাতীয় জনৈক প্রৌঢ় ছাগ প্রথমে দাঁড়াইয়া অধিবেশনের উদ্দেশ্য

সম্বন্ধে সবকথা বিশদভাবে বুঝাইয়া দিল। প্রতিনিধি-গণের দিকে লক্ষ্য করিয়া লম্বা-লম্বা দাড়ি ঘন-ঘন নাড়িয়া উদাত্তকণ্ঠে সে বলিয়া চলিল—

বন্ধুগণ, আজকার মিছিল পরিচালনা ও সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বুঝিয়ে বলার ভার আমার উপর প'ড়েছে। দীর্ঘকাল যাবৎ পৃথিবীর নরগণ বুদ্ধি ও শক্তিমদে মত্ত হ'য়ে আমাদের মত নিরীহ জীবদের উপর জঘন্য ও নিষ্ঠুরতম অত্যাচার চালিয়ে আস্‌ছে। আমরাও যুগ-যুগ ধ'রে শুধু নির্বিবাদে যূপকাষ্ঠে মাথাটা বাড়িয়ে দিয়েই এসেছি। জাতীয়তা বিপন্ন হ'লেও আমাদের চেতনা এতদিন সুপ্ত ছিল, তাই কোন প্রতিকার হয়নি বা বিপন্মুক্তির উপায় চিন্তা কারও মাথায় আসেনি। জাগ্রত ছাগমানস কি চিরদিন এই অত্যাচার মুখ বুজে সয়ে যাবে? সত্যিই কি এ-অন্যায়ের কোন প্রতিকার নেই?

—আছে, আছে—নিশ্চয়ই আছে।—সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল।

ক্লাইমাক্স্ চরমে উঠিয়া গিয়াছে—শিরায় শিরায় রক্তের দ্রুত সঞ্চরণ।

উত্তেজিত স্বজাতিকে সম্মুখের দুই পা তুলিয়া থামিতে ইঙ্গিত করিয়া বক্তা আবার বলিয়া চলিল—আমার মনে হয়, আপনারা যদি চান আপনাদের ন্যায্য দাবীকে মানুষ কিছুতেই দাবিয়ে রাখতে পারবে না। ক্রমাগত আন্দোলনের ফলে তাদের একদিন নতি স্বীকার করতেই হবে। ফেস্টুন্ ও পোষ্টারগুলো আপনারা দেখেছেন। তা'তে আমাদের দাবীগুলি সংক্ষেপে লেখা আছে। সময় আর সুযোগ এলে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী আমরা ক্রমে ক্রমে পেশ করবো তাদের কাছে। আমরা একক হয়তো শক্তি-হীন, কিন্তু দেখুন আমাদের ডাকে প্রথম থেকেই বলীবর্দ বন্ধুগণ সাড়া দিয়েছেন। তাঁদের উৎসাহে ও শক্তি সামর্থ্যে আমাদের যথেষ্ট আস্থা আছে। তাছাড়া বিশ্ব কুক্কুট ফেডারেশন, হংস সমিতি, শূকর পাল, গড্ডরিকা সংসদ তাঁদের ক্ষুদ্র সামর্থ্য নিয়ে আমাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। কেবল, নিখিল বিশ্ব দুগ্ধবতী সংস্থা এবং মহিষ সভা এই সম্মেলনে প্রতিনিধি পাঠাতে অক্ষমতা জানিয়ে পত্র দিয়েছেন। মহিষ মহাসভার স্বরূপ তো আপনারা জানেন। ওদের মাংস অখাদ্য বিবেচনায় মানুষ নাকি ক্রমে-ক্রমে মহিষ-বলি প্রথা রদ ক'রেছে, সুতরাং এ সময় মিছামিছি আন্দোলন ক'রে তাদের সহানুভূতি হারানো নাকি জাতির অভিপ্রেত নয়। বিশ্ব দুগ্ধবতী সংস্থার সামনে বলিবন্ধের সমস্যা নাই। তবে, তাঁরা অপর এক সম্মেলন মারফৎ 'বাছুরকে বঞ্চনাপূর্বক দোহন' বন্ধের দাবী দাওয়া সম্বলিত পৃথক স্মারকলিপি-মানুষের দরবারে পেশ করার কথা চিন্তা করছেন। আজকার সম্মেলনে যোগ দেওয়ার ফলে তাঁদের সে দাবী বিবেচিত নাও হ'তে পারে, এই অজুহাত দেখিয়ে তাঁরা ফাঁক কাটার চেষ্টায় আছেন।

সভামধ্যে আবার গর্জন উঠ্‌লো—শেম্, শেম্।

বক্তা আবার বলিল—আমাদের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সব কথাই আপনাদের কাছে বিবৃত ক'র্‌তে পেরেছি, আশা করি। মোট কথা, পশুপক্ষী বধ ক'রে মাংস খাওয়া আর কিছুতেই চল্‌তে দেওয়া হ'তে পারে না। কিন্তু কি উপায়ে এবং আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থাই বা কি হবে, সে সম্বন্ধে আমার পরবর্তী বক্তাগণ আলোকপাত ক'রবেন।

বক্তা আসন গ্রহণ করিলে চারিদিকে আনন্দসূচক কর্ণ-আস্ফালনের আওয়াজ শ্রুত হইল। বক্তৃতাটি খুবই মনোজ্ঞ হইয়াছে বুঝা গেল। অতঃপর দ্বিতীয় বক্তার পালা। তাহার বক্তব্যের জ্বালাময়তা দেখিয়া বোধ হয় সে উগ্রপন্থী। তাহার বিবেচনায় বলি ও জবাইরূপ ঘৃণ্য কার্যের জন্য মানুষের বিরুদ্ধে অচিরাৎ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আরম্ভ করাই সমীচীন। কিন্তু সে সংগ্রামের বয়ান কি প্রকার হইবে, অর্থাৎ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া মানুষের বিরুদ্ধে পুরা-পুরি সংগ্রাম ঘোষণা করা অথবা নাশকতামূলক কার্যা-বলীর দ্বারা তাহাদের বিপর্যস্ত করিয়া মূল দাবীর স্বপক্ষে অবনত করার চেষ্টা করা—এই দুই পথের কোন্‌টি অবলম্বনীয় তাহাই এখন চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। প্রস্তাবটি জোরালো হইলেও সুফলপ্রসূ নয়, মানুষের সহিত প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে আঁটিয়া ওঠাও সহজসাধ্য নয়, তাই সভামধ্যে বিশেষ সাড়া পাওয়া গেল না।

তৃতীয় বক্তা রক্ষণশীল দলের হইবে। তাহার মতে আবেদন-নিবেদনের পথই সবচেয়ে নিরাপদ। প্রথমেই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ঝুঁকি ঘাড়ে না লইয়া সমগ্র দাবী-দাওয়া সম্বলিত একটি স্মারক 'উনো'র বিশ্বমানব সভায় অচিরে পেশ করা হউক। সে সম্বন্ধে তাঁহাদের মন্তব্য জানার পর পরবর্তী কর্মপন্থা বিবেচনা করা যাইতে পারে। অবশ্য এই উপায় সময় সাপেক্ষ, কিন্তু পরাধীনতার নাগপাশ ও জাতির বিনষ্টির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য বেশ কিছুদিন সময় অপেক্ষা করিতেই হইবে।

বয়স্ক ছাগ নেতার মস্তিষ্কের উর্বরতা সম্বন্ধে সবারই আস্থা। তাহার পাণ্ডিত্য সর্বজনবিদিত। ছাগসাহিত্য লইয়া বেশ কিছুদিন সে গবেষণা করিয়াছিল। এখন তাহাকে বক্তৃতা করিবার আহ্বান জানানো হইলে সে উঠিয়া

বলিতে লাগিল—প্রথমেই চরম পন্থা অবলম্বন করার কথা এখন আমি চিন্তাও ক'রতে পারি না। মানুষের কাছেও আবেদন-নিবেদনে ফল হ'তে পারে ব'লে কোন আশা রাখি না। ওদের সঙ্গে আমাদের খাদ্যখাদক সম্বন্ধ, আমাদের আবেদন ওদের শোনার কথা নয়। মানুষের কাজ কারবার দেখে দেখে আমার ঘৃণা জন্মে গেছে—অতি নিরীহ মৎস্য-কুলের উপর বাঙালী সমাজের অকথ্য নির্যাতন দেখে শিউরে উঠতে হয়। শক্তিমদে ওরা এতই মাতোয়ারা যে, বুদ্ধি খাটিয়ে রকমারি মারণাস্ত্র তৈরি ক'রে নিজেরাই কাটাকাটি ক'রে মরে। তার চেয়ে আমার মনে হয়, মানুষ ও ছাগল উভয় জাতিরই স্রষ্টা পিতামহ ব্রহ্মার কাছে এক প্রতিনিধি দল পাঠানো হোক্—যে-দল আমাদের সকল ন্যায্য দাবী সবিস্তারে তাঁর কাছে নিবেদন ক'রতে পারে। স্রষ্টা ও সৃষ্টের সম্বন্ধের মাঝে মানবরূপী তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপে তাদের সঙ্গে ভক্ষক ও ভক্ষ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হয় কেন? বাঘ ও মানুষের সম্বন্ধ নিয়েই বা তবে মানুষের এত আন্দোলন কেন? এ সম্বন্ধে তাঁর রায় আমরা নিশ্চয় দাবী করতে পারি।

চারিদিক হইতে বিপুল গর্জনে 'সাধু, সাধু' রব উঠিল। আবেগময়ী ভাষায় বক্তা অতঃপর বলিল—মুক্তির এ-স্বপ্ন সফল ক'রে জীবনের জয়গান গাইবার কোনদিন সুযোগ পাবো কিনা জানি না, তবু ইতিহাসের পৃষ্ঠায় রেখে গেলাম উত্তপ্ত-প্রতিবাদ। ভবিষ্যৎ যুগে আমাদের উত্তর পুরুষ এই প্রচেষ্টার জন্য আমাদের স্মৃতি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ ক'রবে।

প্রস্তাবটি সবারই মনঃপূত হইল। আর ভোটে দিবার প্রয়োজন নাই। অচিরকাল মধ্যে সর্বসম্মত প্রতিনিধি দলও গঠিত হইয়া গেল।

সুবিধামত একটি তারিখে উক্ত প্রতিনিধি কমিটি ব্রহ্মলোকে সৃষ্টিকর্তার সম্মুখে উপস্থিত হইল। পদ্মযোনি তাহাদের যথারীতি আপ্যায়নাদি করিয়া আগমনের হেতু জানিতে চাহিলে ছাগনেতা দীর্ঘবিলম্বিত শ্মশ্রু আন্দোলন-পূর্বক বলিল—হে পিতামহ, আজ বহুযুগের সঞ্চিত বেদনা বুকে নিয়ে প্রতিকারের আশায় আপনার দরবারে হাজির হ'য়েছি। আশা করি, আপনি ধৈর্য সহকারে আর সহৃদয়তার সঙ্গে আমাদের বক্তব্য শুনবেন এবং যথারীতি একটা ব্যবস্থা করবেন।

পিতামহ সম্ভবতঃ তাহাদের কর্কশকণ্ঠের এই ভূমিকায় বিরক্ত হইয়া থাকিবেন, কিন্তু সে বিরক্তি চাপিয়া যথাসম্ভব কোমলস্বরে বলিলেন—তোমাদের অভিযোগ কিছু থাকলে শুনবো বৈ কি। তবে, সংক্ষেপে বক্তব্য বিবৃত করো। জানো তো, বাপু, আমার সময় বড় কম, সৃষ্টির ব্যাপার নিয়ে আমি সদাই ব্যস্ত।

প্রতিনিধিটি অতঃপর অশ্রুনিরুদ্ধকণ্ঠে নিবেদন করিল—ভগবন্, সৃষ্টকে স্রষ্টা না রাখ্‌লে কে রাখ্‌বে। আপনি এতাবৎকাল যত ছাগ সৃষ্টি করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, সংখ্যাতত্ত্বের হিসাবে দেখা যায়, দুর্বৃত্ত মানবসমাজ নিছক লালসার বশবর্তী হ'য়ে তা'র শতকরা ৯৯ ভাগ হত্যা ক'রে ভক্ষণ করেছে। আমাদের জাতের মাংস নাকি অতি স্বাদু। অভাগিনী, অবলা ছাগীরও আজকাল এ হত্যালীলা থেকে রেহাই পায় না—আবার পাঁঠাদেরও খাসি ক'রে রাখার প্রথাও আপনার অবিদিত নয় বলীবর্দ, কুক্কুট, এরাও একই-রূপে অত্যাচারিত। আপনি সৃষ্টিকর্তা—আমাদের জীবনমরণ আপনার উপরই নির্ভর করা উচিত। স্রষ্টা-সৃষ্ট সম্বন্ধের মাঝে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ সহ্যের অতীত। জাতীয়তা আজ বিপন্ন, বংশ প্রায় লোপ পেতে বসেছে।—তাই, স্বজাতির জীবনভিক্ষায় আপনার দ্বারে হাজির হ'য়েছি। এতকাল নীরবে সহ্য ক'রেছি কারণ, উপায় সম্বন্ধে অন্ধ ছিলাম। কিন্তু যুগের হাওয়া আমাদের চোখ ফুটিয়েছে। বিহিত ব্যবস্থা আপনাকে ক'রে দিতেই হবে, দেব।

উহাদের যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া ব্রহ্মা চিন্তান্বিত হইলেন। ক্ষণপরে মুখ তুলিয়া বলিলেন—বাপু হে, আমার কাজ সৃষ্টি করা। তোমাদের অভিযোগের বিচারের ক্ষমতা সরাসরি আমার হাতে নেই। সংহারকর্তা মহারুদ্রই এ-বিভাগের অধিকর্তা, তাঁর কর্তব্য-কর্মে আমার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ উচিত হবে না। একখানি আবেদনপত্র লিখে আমার মারফৎ পাঠাতে পারো, সহৃদয় বিবেচনার জন্য আমি বড়জোর তার উপর মন্তব্য লিখে দিতে পারি।

প্রতিনিধিগণ ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া একবাক্যে আপত্তি তুলিল—তা হয় না, পিতামহ। তাঁর সামনে আমরা কিছুতেই যেতে পারবো না। সে রুদ্রমূর্তি দেখলেই আমাদের ভির্মি লেগে যাবে। সবচেয়ে বড় কথা, মা কালী তাঁর ঘরণী। রক্তপিপাসায় তিনি সর্বদা চার যোজন লম্বা জিভ বিস্তার ক'রে থাকেন। আমাদের দেখলে হস্তধৃত বিশাল খড়্গাঘাতে কচাকচ সাবড়ে দেবেন। আর, নালিশ তো তাঁরও বিরুদ্ধে—মানুষেরা তো তাঁকে উৎসর্গ ক'রে আমাদের হত্যায় কালোবাজারী মঞ্জুরী নেয়। ও কথা ছাড়ুন দেব, আমাদের রক্ষা করুন—

একথাগুলিও যুক্তিসহ বটে। মহাকালীর দশমহাবিদ্যা রূপ স্মরণে আসিলে এ বয়সে তাঁহারও গা ছমছম করে। চতুর্ম্মুখের একটি মুখ নীচু করিয়া এবং কপোলদেশে মুষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তিনি উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।—সত্যই কি এইরূপে চলিয়া চলিয়া পাঁঠার বংশটি পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইবে। নাঃ, আর পারা যায় না, মানুষগুলিকে লইয়া যত বিষম সমস্যা। কখন কোন্‌দিক দিয়া যে ফেঁসাদ বাধাইয়া বসে, কে জানে।

এবম্প্রকার চিন্তার মধ্যে তাঁহার নিচুকরা মুখ গহ্বর হইতে সহসা 'টস্' করিয়া এক ফোঁটা লালা ঝরিয়া পড়িল। তিনি তাড়াতাড়ি উহা গোপন করিতে চেষ্টা করিলেন। বৃদ্ধ বয়সে ইন্দ্রিয় সকল লোল হইয়া আসিতেছে—পাঁচজনের সম্মুখে খালি অপদস্থ হওয়া।

যত্নসত্ত্বেও এ-দৃশ্য জনৈক ডেঁপো-গোছের প্রতিনিধির দৃষ্টি এড়াইল না। ছোকরাটিও পিতামহের সহিত ঠোঁটকাটার মত রসিকতা করিয়া বসিল—ওকি, পিতামহ! চাণক্য শ্লোক মারফৎ জেনে এসেছি, 'লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি'...অর্থাৎ কিনা, শিশুকালে পঞ্চবর্ষ বয়ঃক্রম পর্যন্ত লালা নির্গত হয়। বয়সের কোটী কল্প চ'লে যাওয়ার পর এখনও কি আপনার পাঁচ বছর বয়স পূর্ণ হয়নি?

সৃষ্টিকর্তা অপ্রতিভ হইলেন। ব্রীড়াবনতমুখে তিনি বলিলেন—ভায়া হে, সম্পর্কে নাতি হও, তাই ব'ল্‌তে বাধে। তবে দেখেই যখন ফেলেছ, তখন কারণটা অগত্যা ব'স্‌তেই হয়। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে তোমাদের কজনের যে নধর-পুষ্ট গড়ন, তাতে দেখ, আমা-হেন দেবতার জিভেও জল এসে গেছে। মানুষ বেচারাগুলো কি ক'রে লোভ সামলায় বলো দেখি। এখন স্পষ্টই বুঝতে পারছো, আমার কাছে তোমাদের সুবিবেচনা পাবার কোন আশা নেই। অতএব ভালোয় ভালোয় সরে পড়ো। কারণ, বিলম্বে এখানেও বিপদের সম্ভাবনা কম নয়।

এ-কথায় প্রতিনিধিগণ স্মারকাদির ফাইল্‌পত্তর ফেলিয়া তারস্বরে ব্যা ব্যা শব্দে যে যেদিকে পারিল দৌড় দিল। তাহাদের ব্রহ্মলোক হইতে প্রত্যাবর্তনের পর বিশ্ব পশুক ফেডারেশন্ কোন্ কার্যক্রম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা আমার জানা হয় নাই। কারণ জানার পূর্বেই ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল।

এই অবসরে নেপথ্যে বলিয়া রাখি, সেদিন জাগিয়া অনুভব করিলাম, মাথার বালিসটি অল্প ভিজা—ঘামে কিম্বা অন্য কিছুতে ভিজিয়াছিল, আজও তাহা নির্ণয় করিতে পারি নাই।

★

অন্য পৃথিবী চেয়ে

কল্যাণ সেনগুপ্ত

তোমার চোখে কি দোলে ঝড়?
এ-হাওয়ায় এ-হাওয়ায় কখনো বাঁধেনা কেউ
ঘর।
এ-হাওয়ায় হয়ে বেদুইন—
গ্রহের মতন ছুটে খুঁজে নিতে হয়
নতুন পরিধি আর নতুন সময়,
নতুন আকাশ; সীমাহীন।

এ-হাওয়ায় ঠিক থাকা দায়।
পৃথিবী-সাগর বেয়ে কোথায় কোথায়
ছুটে চলে মন তার দিশা
পায়না পায়না কেউ; কাঁদে হতাশায়
বল্লিরেখা-বলয়িত প্রাচীন মনীষা।

পথে ঘাটে যারে দেখি যারে দেখা যায়,
তারই চোখে দেখি যেন ঝড়!
প্রাণ থেকে প্রাণে প্রাণে ছুটে গেছে কিসের খবর,
একজনও স্থির ব'সে নেই,
পাড়ি দেয় পাড়ি দেয় ভূগোল-অতীত ঠিকানায়
অজানা পথের ধ'রে খেই;
গতানুগ পৃথিবীর সীমানা-বলয়—
শেষ হলে নামহীন পরিচয় হীন
আরও এক পথ শুরু হয়।

তারই ঢেউ লেগে লেগে দুচোখে তোমার
রয়েছে কি ঝড়?
মাঠে ঘাসে বনে তাই তোমার মিতালী ওঠে দুলে,
ভালবাসা পৃথিবীর পর?
আকাশের সামিয়ানা, এ-মাটির ধূলিরাঙা পথ
তোমার মনের কোণে তাইকি জাগায়
বেদেনীর মত দুরাশায়—
আরেক জীবন-ঝরা পৃথিবীর দিকে,
চারণের অসীম শপথ?

প্রভাত দেব সরকার

মাসের শেষে একবার করে সহরে যেতেন সারদা দেবী। মাসকাবারী বাজার আর সংসারের প্রয়োজনীয় টুকিটাকি জিনিষ কিনতে। আগে একাই যেতেন টাঙ্গা করে এখন নিভাকে সঙ্গে নেন। ঘুরে-ঘুরে পরিচিত দোকানে তিনি নিভাকে নিয়ে ফিরতেন। নিভা আশ্চর্য হ'য়ে যেত, এতদূরে দেশে অবাঙালীদের সঙ্গে কিরকম অবলীলাক্রমে আলাপ করতেন সারদা দেবী। কত যেন আপনার লোক এরা সব। ভাষার বা বক্তব্যের এতটুকু জড়তা নেই সারদা দেবীর—কোথাও দু'দণ্ড বসতেন, কোথাও সওদা করতেন, কোথাও বা ঘরকন্নার সুখদুঃখের আলাপ করতেন। বাজারের মশলাওয়ালা, ডালওয়ালা সবার সঙ্গে সমান খাতির ছিল তাঁর। তিনি বাজারে ঢুকলে চারপাশ থেকে সাদর আহ্বান আসতো, মাই, ইধার আইয়ে। মাই। মাই।

নিজের বোনকে, মাকে এত মিষ্টি করে বোধ হয় ডাকতে নিভা শোনেনি আর কাউকে। সবার কাছে আশ্চর্য ভালবাসা পেতেন সারদা দেবী-সামান্যা বাঙালী মেয়ে হ'য়েও।

প্রথম প্রথম নিভাকে সঙ্গে দেখে দোকানদাররা পরিচয় জানতে চাইতো। সারদা দেবী সহাস্যে বলতেন, লেড়কি আছে। আমার মেয়ে।

আর দ্বিতীয় কোন প্রশ্ন হ'ত না, সবাই মেনে নিত। কেউ কেউ বোধ হয় বিস্ময় প্রকাশ করতো কেবল: তোমার এতবড় মেয়ে! আমরা তো জানতুম না। বাঃ, বেশ!

মাসে একদিন হ'লেও অদ্ভুত এক অবাধ স্বাধীনতার স্বাদ পেত নিভা। বড় ভাল লাগতো এই দিনটা, পাহাড় প্রাচীরের মধ্যে এমন দেশও আছে যেখানে কেনাকাটার নামে এমন মেলামেশা করা চলে, এমন মুক্তির নিঃশ্বাস নেওয়া যায়: স্ত্রী-পুরুষের এমন স্বচ্ছন্দ গতি বোধ হয় এখানের আর কোথাও নেই। পরস্পর পরস্পরের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি এখানে যতটা সজাগ জীবনের আর কোন ক্ষেত্রে নয় বোধ হয়। স্ত্রী-স্বাধীনতার সত্যিকার রূপটা এখানে ধরা পড়ে। বাড়ীর মেয়েরা এখানে অবাধগতি, ভয় নেই, ডর নেই সঙ্কোচ নেই।

চোখে নেশার মত লাগতো নিভার এ জায়গাটা। এতদূরে আসার স্বার্থকতা যেন এখানে আসাটা। জায়গাটার নাম চক বাজার; চক মেলান-বাড়ীঘর রাণীগঞ্জ টালির ছাদ—স্নিগ্ধ চওড়া রাস্তা যতদূর দেখা যায়। হরেক রকম দোকান-পসরা। কলকাতার বাজারের মত ভিড় নেই, কিন্তু তাতে আকর্ষণ কিছু কম মনে হয় না। ভিড় আর গোলমাল ছাড়াও মানুষ যে কত নিঃশব্দে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের সমাধা করতে পারে এখানে না এলে বিশ্বাস হবে না। পাহাড়ের ধূলিমলিন রাস্তা এখানে কি-করে যেন হঠাৎ চিক্কণ হয়ে উঠেছে: মাঝখানে একটা ফোয়ারাকে ঘিরে একটা ফুলের বাজার বসে গেছে, অসংখ্য মালা আর খোঁপায় গোঁজার ফুল নানাছন্দে মেলে ধরা—ফোয়ারাটার আশেপাশে ফুলবুরির মত ফুলের কেতা, ছয়লাপ। পুরুষেরাই ফুল বিক্রী করে—ছোট ছোট চুপড়ি করে, বাঁশের লাঠিতে ঝুলিয়ে। হাতে ফুল ধরে এরা ফুলের কোমলতা ম্লান করে না। তাই বোধ হয় এখানে ফুলের বাহার এতো প্রস্ফুটিত। কলকাতার মত মাছের বাজারে, পেঁয়াজ-রসুনের সঙ্গে বা পানবিড়ির দোকানের পাশে ফুলের পসার যেমন খুসী বসে নাই। অমন ঊর্ধশ্বাসে নয়, ধীরে সুস্থে শান্ত মনে এই ফোয়ারার সামনে এসে দাঁড়িয়ে ফুল খুঁজতে হবে—কি ফুল চাই? দাঁড়িয়ে থাকলে যদি চোখ না তোল হয়তো কখনো মনে হতে পারে রাত্রি-শেষে অসংখ্য খসে-পড়া তারা ব্যাপারীরা কুড়িয়ে এনে এখানে বিক্রী করছে। পাহাড়ের চূড়ায় উঠে তারা ভরা আকাশ নেড়ে ফুল পেড়েছে কত।

সব শেষে সারদা দেবী নিভাকে এখানে নিয়ে আসেন। বেছে বেছে ফুলের মালা আর ফুলের অলঙ্কার কেনেন। তাঁর গৃহ-দেবতা গোলোকিশোরের জন্যে। নিভা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, এত লোকের এভাবে ফুল কেনাটা তার আশ্চর্য লাগে। কিন্তু সবাই কি ঠাকুরের জন্যে ফুল নিয়ে যায় সওদা-শেষে সারদা দেবীর মত? ফুল-কিনতে-আসা অপরিচিত মুখগুলো উদ্ভাসিত দেখলে নিভার কিন্তু অন্য কথা মনে হয়। গৌরীর ফুলশয্যার কথা মনে পড়ে—আর মনে পড়ে তাদের স্বামীস্ত্রীর ফুলের মালা বদলের দৃশ্যটা। ফুলের সাহায্যে উভয়ে উভয়ের লজ্জা কত সহজে কেড়ে নেয়।

পবিত্র, কোমল মধুময় হয়ে ওঠে সম্পর্ক। এই বোধহয় ঠিক।

অনেক আশা করে' থাকে নিভা সারদা দেবী হয়তো তাকে ফুল নিতে বলবেন। না, শেষ পর্যন্ত তিনি কোন কথাই বলেন না। সখ করে আবার বাঙালী মেয়ে ফুল কিনবে কি—শুধু শুধু দরকারই বা কি।

কেনা ফুলগুলো হাতে করলে কেমন এক রকম মনমরা নিষ্ক্রিয়তা বোধ করে নিভা। সারদা দেবীর এত আত্মীয়তা অর্থহীন মনে হয় তার। কেন তিনি ঐ সঙ্গে তাকে একটা মালা কিনে দিতে পারেন না? আইবুড়ো মেয়েদের কি ফুলের সখ যায় না, না, ফুলের আশা তাদের পক্ষে অন্যায়? কে জানে কি মনে করেন সারদা দেবী।

তবু ভাল লাগে এই জায়গাটা নিভার। তার প্রাত্যহিক একঘেয়ে কর্মপরিক্রমা থেকে এ একটা ছুটি—মাছেদের জীবনে কখন-সখন জলের ওপর ভেসে উঠে ফুট-কাটা, নিঃশেষ-নেওয়া, হাঁফ-ফেলা। এখানে নানা জনের সংস্পর্শে এসে নিজেকে কেমন যেন সার্থক মনে হয় নিভার। অনেক কিছু সম্ভাবনার যোগ্য সে। নেহাৎ বোবা, গলগ্রহ বা পরমুখাপেক্ষী সে নয়। ভবিষ্যতের কোন ভয়ই তাকে নিষ্পিষ্ট করতে পারবে না। চেষ্টা করলে, দ্বিধা-সংকোচ ত্যাগ করলে অনায়াসে সে সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। সঙ্গে তার কাউকে থাকতে হবে না। সে অনন্যা।

ছেড়ে দিয়ে সারদা দেবী একবার দেখুন না কেন। একা-একা এখানে এসে আবার ফিরে যেতে পারে কিনা বাজার-হাট করে। কিন্তু সারদা দেবী ছাড়বেন না, অন্ততঃ যতদিন বেঁচে আছেন, শক্ত আছেন ততদিন তো নয়।

এখানে এসে অনেকবার নিভার মনে হয়েছে, সারদা দেবীকে জিজ্ঞেস করে, অমলের দোকানটা কোথায়? সহর মানে তো এই!

কি যেন ঔৎসুক্য হয় তার অমলকে দোকানদারী করতে দেখায়। কত বড় ব্যবসাদার সে যা নিয়ে রাতদিন পড়ে আছে। আর যার জন্যে—

হঠাৎ পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা শিহরণ বোধ করা যায়, খোলা বিজলী তারে আচমকা হাত পড়ার মত। নিজেকে নিভা সংযত করে। মুখ ফুটে কোনদিন সারদা দেবীকে অমলের দোকানের কথা জিজ্ঞেস করতে পারে না।

বাড়ী ফিরে একদিন সরবতীয়া বাঈকে নিভা গোপনে প্রশ্ন করে অমলের দোকানটার পাত্তা পেতে চেষ্টা করেছিল। সরবতীয়া তাকে বিশেষ সন্তুষ্ট করতে পারেনি—চক্ বাজার, ফোয়ারা, বেলবাগ আরো কি সব যেন বলেছিল, কিন্তু সহরের কোনখানটায় অমল ব্যবসা করে বুঝিয়ে বলতে পারেনি, কি সে-ই বুঝতে পারেনি। দুজনকে দুজনের সেদিন নির্বোধ মনে হয়েছিল বোধ হয়।

অত না করে সহজেই ঠিকানাটা মিলতো। কিন্তু কেন জানি না, নিভা সহজ পথে যেতে চায়নি। এ যেন, না না তুমি কিছু বলো না, আমি ঠিক খুঁজে নেব।

কে জানে এ কোন্ আবিষ্কারের নেশা নিভার।

গরমটা তবু যা হোক করে কেটেছে, এবারের বর্ষাটা বোধ হয় আর কাটবে না। পাহাড়ে বর্ষা যে এমনি কে জানতো—বৃষ্টির কামাই নেই, মেঘের ছাড় নেই—ছানি-পড়া চোখের মত। মনে হয়, পাহাড়গুলো ধুয়ে নিশ্চিহ্ন না করে, বর্ষা ক্ষান্ত হবে না। শুধু কি বর্ষণ, শীতও আছে সঙ্গে। বাঙলাদেশের কার্তিক-অঘ্রাণ মাসের মত ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা। গায়ে গরম কাপড় চাপাতে হয়, ঠাণ্ডা না লাগার প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হয়।

সারদা দেবীর তাড়ার অন্ত নেই, তিনি কেবল নিভাকে সাবধান করেন নড়তে-চড়তেঃ গায়ে কিছু দে, ফট করে ঠাণ্ডা লেগে যাবে ভুগিয়ে ছাড়বে। এখানের বর্ষা বড় বিশ্রী।

সারা গ্রীষ্মটাও সারদা দেবী অমন টিক্ টিক্ করেছেন। দারুণ গরমে নিভাকে সর্বাঙ্গে কিছু না কিছু পরিয়ে ছেড়েছেন—খালি গায়ে এখানে সর্দিগর্মি লাগবার ভয়। তা ছাড়া অসহ্য গরম সহ্য করার ও-ও একটা প্রক্রিয়া। একটু অসাবধান হলে আঁর রক্ষে নেই।

কিন্তু তাঁর নিজের বেলায় অন্য ব্যবস্থা—তাঁর সব সহ্য হয়ে গেছে, কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা, কি শীত কোনটাকেই তাঁর ভয় নেই।

যত না বৃষ্টির জোর, তত জোর এখানে হাওয়ায়—এক সঙ্গে দুটোই গলাগলি করে সামনের পাহাড়ে আছাড় খায়। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো ফেটে ছেঁ-ছত্রাকার হয়ে দিগন্ত আচ্ছন্ন করে ফেলে—ঘসে মাজার মত দেখতে হয় সবটা। এই জায়গাটুকু ছাড়া যেন আর পৃথিবী নেই। এসময় জানালায় এসে দাঁড়ালে অতীত মনের জানালাটা আবার খুলে যায়। আবার আত্মোপলব্ধিতে নিভা অতিশয় সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। অজানা বেদনায় মন ভরে ওঠে।

কলকাতায় এমনি বর্ষা কতকাল গেছে, নিজের ছোট্ট ঘুপসি ঘরে বসে আর যাই চিন্তা করুক এমনি করে বেদনা উপভোগ করেনি সে। বিষণ্ণ দিনের যতটুকু বিষণ্ণতা ভোগ করা যায় ততটুকু, তার বেশী নয়। বরং মাঝে মাঝে তার কুমারী চিত্ত উদ্বেলিত হয়েছে অকারণ পুলকে; চোখের ওপর উঠানটা কখন জলে টৈ-টুম্বুর হয়ে উঠেছে, পাশের কয়লা-ঘরের সঙ্গে একাকার হয়ে কাজল-ধোয়ার মত রঙ হয়েছে—ওদিকের গলিটাও জল থৈ-থৈ। কলকাতায় বন্যা হলো বুঝিবা।

এখানে সে দৃশ্য নেই, কিন্তু চিত্ত বিক্ষেপের জ্বালা আছে। কলকাতার সব কিছু আবার নতুন করে মনে পড়ছে—সেই ঘর, সেই দোর সেই সে। বৃষ্টিতে সব ভেসে গেলেও কখনো এমন অসহায় তার নিজেকে মনে হয়নি। জানতো বৃষ্টি থেমে যাবে, জল নেমে যাবে, উনুনে আঁচ দিতে হবে, রেণুকাকীমার মুখ শুনতে হবে। তবু যেন তা কত ভাল ছিল, কত সহজ ছিল, কত জানা ছিল তার। কত স্বাধীন ছিল।

এখানে প্রকৃতির এই দুর্যোগে নিজেকে বেশী করে বন্দিনী মনে হয় নিভার। ভয়ও হয় তার তিলে তিলে ক্ষয়ে যাবে সে এখানে। অনুভূতির একঘেয়েমীতে সে হয় তো মারা যাবে।

এতদূরে যে-আশায় সে এসেছে এই বর্ষায় তার পুনরুক্তি করা হয়তো উচিত হবে না। আর হলেও তার সেই অনুচ্চারিত আকাঙ্ক্ষার কথায় কে কর্ণপাত করছে। সে শুধু এখানে মাথা-গোঁজা আশ্রয়ের জন্যে আসেনি, কে শুনছে। খেতে-পরতে আর ঘুমতে পাওয়াটা তার পক্ষে যথেষ্ট। চিত্ত বিলাসে তার কাজ কি।

তবু মন মানে না। নিষ্ক্রিয় দিনে অবিরাম আদিম বর্ষণে চাওয়া-পাওয়ার একটা অস্পষ্ট ধারণা মনের মধ্যে ঘনিয়ে ওঠে। যা

চাইছে, যা খুঁজছে সে কেন তা আজও পাচ্ছে না? সফল হবার তার আশ্রয় বা অবলম্বন কোথায়?

বোধ হয় অমলের কথাই তার মনে হয়। এতদিন এসেছে কিন্তু আজও এতটুকু হৃদ্যতা হলো না। কেমন যেন অন্যমনস্ক উদাসীন মনে হয় তাকে। প্রথম দু একদিন অমলের এই ভাবটা ভাল লেগেছিল নিভার, মনে হয়েছিল ওটা আবরণ ভিতরে-ভিতরে সে তার সম্বন্ধে খুবই সচেতন। কলকাতার বাসায় যে-হৃদ্যতা সে অমলের কাছে পেয়েছে এখানে তার কিছুমাত্র ব্যত্যয় হবে না। অমলের ও ভাবটা পুরুষের বিশেষ এক ধরণের চালাকী ছাড়া আর কিছু নয়।

কিন্তু না, অমল অমলই। ব্যবসা ছাড়া আর তার কোনদিকে খেয়াল নেই। কলকাতায় সে অবসর কাটাতে যেত তাই অমন হৃদয়বান হতো। না হলে আসলে সে—

মনে মনে নিভা কৃষ্ণা ভুজঙ্গিনীর মত ফুলে ফুলে উঠতো, নিষ্ফল ছোবলে সে নিজেকে নিজে দংশন করতো। এ নিয়ে ঘৃণা-অপমান তার কম নেই। অমলের মত উপেক্ষা বোধ হয় তাকে আর কেউ কখনো করেনি—এমন করে অনাদর আর অপমানও সে পায়নি আর কারো কাছে। এত বড় ভুল সে কি করে করলে।

চেষ্টা করলে সে কলকাতাতেই মানিয়ে চলতে পারতো। একটু সজাগ আর বুদ্ধির পরিচয় দিলে এমনটা হতো না। সারদা দেবীকে সে মিথ্যে বলেছে। প্রকাশের সঙ্গে তার যা হয়েছে তা কোন গৃহিনীই সহ্য করতে পারে না। গৌরীর কথা তো ভিন্ন। একটু হায়া রেখে চলা উচিত ছিল। কিছু না বলে এত দূরে পালিয়ে এসে যতই উড়িয়ে দিক ব্যাপারটাকে তার কিছুটা ছাপ তো এখনো নিভার মনে আছে। প্রকাশ তাকে ভালবাসতো, সে প্রকাশকে ভালবাসতো কিনা, সে প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব নিজেকে সে যেমন দেয়নি, অন্যকে তেমনি সন্দিগ্ধ করে তুলেছিল। উপস্থিত আশ্রয়দাতার কাছে নিজেকে যতই ভালমানুষ নির্দোষ বলে জাহির করুক মনের আগোচরে কোন সত্যি নেই। রেণুকাকীমার অভিযোগ সত্যি। আর অমল যদি সেটা বিশ্বাস করে' অমন দূরে সরে থাকে, তাকে কি বিশেষ দোষ দেওয়া যায়?

হয়তো নিভা এমন করে আর কোনদিন কথাটা ভাবতো না যদি না এমনি ধারা বর্ষায় নিজেকে সে এত একলা বোধ করতো। পাহাড় -দেশের সবটাই যদি রুক্ষ হতো তা হলে তার মনের সব কিছু মুছে যেতে পারতো।

নিজের কাছেও নিভা লজ্জা পায় আজ এসব কথা ভেবে। সঠিক উত্তর আজও ঠিক না করতে পারলেও—প্রশ্নটা বারে বারে মনে মনে উচ্চারণ করে: প্রকাশকে কি সে ভালবেসেছে? ভালবেসেছে?

মনে পড়ছে সেদিনের কথা—কয়লা ঘরের পাশে তার খুপরি ঘরে অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে এলে, শুক্লপক্ষের অষ্টমীর চাঁদ আকাশে সবে উঠলে, ঘুম-ঘুম আচ্ছন্নতার বাড়ীটা নিঃসাড় হয়ে গেলে, হঠাৎ ঘুম ভেঙে দোরে আলতো টোকার শব্দ শুনতে পায় নিভা। একবার, দুবার, তিনবার! দম বন্ধ হয়ে আসে নিভার; চোর নয়, কিন্তু—

না না কিছুতে সে খুলবে না অর্গল। সে বধির হয়ে থাকবে।

আবার এক, দুই তিন!—গভীর রাত্রে ভূকম্পনে দোরের শিকল নড়ার মত—ঠক্! ঠক্! ঠক্! শব্দহীন মহাতরঙ্গে কি যে ভয়ানক আলোড়ন ওঠে, বধির শ্রবণও না শুনে পারে না।

সর্বদেহ ঝড়-খাওয়া কলাগাছের মত থর থর কাঁপতে থাকে নিভার লজ্জা, ভয় আর ঘৃণায়। সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে' প্রকাশকে সে বাধা দেয় না, না, না।

প্রকাশ ভীম আকর্ষণে নিভাকে কাছে টেনে চাপা কণ্ঠে বলে, চুপ! আমি! শব্দ করো না!

বাধা দিতে নিজেকে মুক্ত করতে নিভা ক্ষান্ত হয় না। অন্ধকারে একটা দানব তাকে তিলে তিলে গ্রাস করছে আনন্দে, দুঃখে, অপমানে নিভার প্রতিরোধ শক্তি ক্রমে পরাভূত হয়ে আসে।

কিছুক্ষণ পরে নিজেকে আবার নিভা ফিরে পায়। দরজা-খোলা ঘর হা-হা করে। কলতলায় ইঁদুরের পায়ের শব্দ শোনা যায়। কলে বোধ হয় জল এলো।

চোখ ঢেকে অনেকক্ষণ বিছানার ওপর নিভা চুপ করে বসে থাকে। কাঁদেও বোধ হয়। অপমানে না, আনন্দে না অনুরাগে? সেদিন মনে হয়েছিল প্রকাশ তাকে ভালবাসে না। কেউ জানতে না পারলেও মনে হয়েছিল কাজটা বড় গর্হিত। অনেতদিন প্রকাশের আকর্ষণ-স্পর্শ সে দেহ থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারেনি। প্রকৃত ভালবাসার অভিব্যক্তি বোধ হয় ও নয়।

এতদিন পরে হঠাৎ নতুন করে ভয় পায় নিভা, কি দুঃসাহসিক, সর্বনাশা কাজ করেছিল তারা! চলে না এলে আরো কি হতো কে বলতে পারে।

তবু সেই প্রকাশের কথাই আজ মনে পড়ছে বেশী করে। রেণুকাকীমার জামাই নয়, তারই একজন ছিল সে। সত্যি প্রকাশ তাকে ভালবাসতো। না হলে বাড়ী শুদ্ধ সবাই অমন করে সন্দেহ করবে কেন—তাদের দুজনের সম্পর্কে অমন আতঙ্কগ্রস্থ হবে কেন? কথা উঠবে কেন?

স্পষ্ট করে মুখে কিছু না বললেও নিজের ব্যবহারে প্রকাশ কিছুই অপ্রকাশিত রাখেনি। শুধু একদিন রাত্রে ঐ রকম ব্যবহার নয়, তারপর নানা ভাবে প্রকাশ নিভাকে কাছে টানতে চেষ্টা করতো। গৌরীর কথা নিয়ে তাকে মধ্যস্থতা মেনে বিশেষ অপ্রস্তুতে ফেলেছে কতদিন! গৌরী রাগ করেছে, রেণুকাকীমা অসন্তুষ্ট হয়েছেন তবু প্রকাশ নিজেকে সংশোধন করেনি! ইদানিং শ্বশুরবাড়ী এসে দেখিয়ে দেখিয়ে সে বাড়িয়ে তুলেছিল। মুখে বিরক্তি প্রকাশ করলেও মনে মনে যেন নিভা এই-ই চাইতো। আপন মূল্য-বোধের মাদকতা বড় লোভনীয়।

প্রকৃত দোষী সে, সর্বনাশা মেয়ে সে—যার খেয়ে পরে মানুষ তারই ঘরে অশান্তি এনে দেয় সে। রেণুকাকীমার দোষ কি আত্মজার ভাল মন্দ দেখবেন বই কি।

কে জানে এখন প্রকাশের স্বভাব কেমন হয়েছে—ভুলে কোনদিন স্ত্রীর বিছানা ছেড়ে নীচে কয়লা-ঘরের পাশে অন্ধকারে কোন ঘরের দরজায় টোকা দেয় কিনা।

প্রকাশ একটা চিঠি দিতে পারতো তো। নিশ্চয়ই জেনেছে সে এতদিনে নিভা কোথায় আছে। তবে সে কি ভেবেছে, তার জন্যেই নিভা দেশত্যাগ করেছে।

কেমন যেন খটকা লাগে নিভার। কিসের জন্যে কার জন্যে এত দূরে এল সে? না, না, প্রকাশের উৎপাতে সে এখানে পালিয়ে

আসেনি। কেন যে এসেছে স্পষ্ট করে বলতেও পারবে না। নতুন করে পাবার ইচ্ছেই তার প্রবল, কিন্তু কি পেতে চায় নিজেই বুঝি জানে না সে আজো। ভালবাসা না, নিশ্চিন্ত আশ্রয়? বন্ধন না মুক্তি? বন্ধন না আদিগন্ত লবণাক্ত জলরাশি? জীবনভোর পাড়ি দেবে না স্থির হ'য়ে বসবে এখানে?

কেমন একটা ক্রূর হাসি খেলে যায় মুখে। বর্ষায় আকাশ ডাকে না, ডাকলে হয়তো নিভার মনের প্রতিধ্বনি বোঝা যেত, বিদ্যুৎও চমকাচ্ছে না, চমকালে বোধ হয় নিভার মুখের হাসিটা ধরা যেত।

অদূরে সাইকেলের শব্দ হলো যেন সাইকেলটার কে গলা চেপে ধরেছে। বার নাম দাঁড়িয়ে ভেজা, অমল জলের মধ্যে ভিজতে ভিজতে সাইকেল চালিয়ে আসছে, ওয়াটার প্রুফে বাগ মানছে না। এতক্ষণে বাড়ির কথা, খাবার কথা মনে পড়েছে তার।

শুকনো কাপড় আর তোয়ালে নিয়ে নিভাকে ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে আসতে দেখে সাইকেলটা কোন রকমে রোয়াকের ওপর তুলে ছেলেমানুষের মত অমল ভিজে মাথাটা বাড়িয়ে দিলে।

একটুক্ষণের জন্যে নিভা অপেক্ষা করলে, তারপর তোয়ালেটা অমলের প্রসারিত মাথার ওপর চাপিয়ে দিয়ে কোলের কাছে আকর্ষণ করলে পরম সেবাপরায়ণতায়।

বৃষ্টিটাও বোধ হয় ধরে এল।

ঠিক হলো কোজাগরী পূর্ণিমা রাতে বিখ্যাত 'মার্বেল রকস্' দেখতে যাওয়া হবে। অমন আশ্চর্য জিনিস না দেখলে এখুনি দেখা উচিত, আর দেখলেও আবার দেখা উচিত। দেখে দেখে কিছুতে আশ মিটবে না। চন্দ্রালোকপ্লাবিত প্রস্তরে সে কি রহস্য! শ্বেত পাথরের সে কি মোহিনী রূপ! নিস্তরঙ্গা ক্ষীণকটি নর্মদার বুকের মাঝে সেকি অপরূপ সৃষ্টি!

শুনে সারদা দেবী বললেন, একদিন দেখে আসিস। দেখবার মত জিনিস! দেশ-বিদেশ থেকে কত লোক আসে ঠিক নেই। পুজোর পরে ভিড়টা বেশী হয়, পূর্ণিমায় শেষ হয় লক্ষ্মী পুজোর দিন।

নিভা জিজ্ঞেস করলে, পাহাড় তো!

কেন নাম শোনিসনি, জব্বলপুরের মার্বেল রক্স! পাহাড় না তো কি! তবে সে আলাদা, শ্বেত পাথরের পাহাড়, নর্মদার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। সারদা দেবী বলেন।

রেণুকাকীমার ওখানে থাকতে শ্বেত পাথরের ময়দা বেলা চাকি দেখেছে নিভা, আর দেখেছে শ্বেতপাথরের তাজমহল। কিন্তু তা দেখে কোনদিন মনে হয়নি, শ্বেত পাথরের কোন দর্শনীয় পাহাড় আছে, যার রূপের আকর্ষণে বিদেশ থেকে পর্যটক আসে দলে দলে।

কই, কলকাতায় থাকতে অমল তো কোনদিন গল্প করেনি। বলেওনি এমন একটা আশ্চর্য জিনিস আছে এখানে। ভাগ্যে আজ সরবতীয়াকে সে জিজ্ঞেস করেছিল, কাল নাগা করেছিল কেন?

সরবতীয়া বলেছিল, মার্বল রক্স দেখতে গিয়েছিল তার পরিবারের সবাই।

সরবতীয়া আরো বলেছিল, দেখার জিনিস আছে দিদিমণি! খাপসুরৎ! না দেখো তো মাইজীকে বলে একদিন যেও। দেখলে চোখ ঘুরবে না, সফেদ সে কি চীজ!

সারদা দেবীও তাই বললেন। দেখবার মত জিনিস। তুলনাই হয় না।

নিভা আগ্রহ বোধ করে। দিন গোণে। কবে পাষাণের রূপ সচক্ষে দেখবে। মর্মরে কি মোহিনী আছে? তার কি করে জানিনা মনে হয়, সেই প্রস্তরীভূত রূপ দর্শনে তার নারী জন্ম সার্থক হয়ে যাবে—এমন জিনিসের সন্ধান পাবে যাতে তার মনপ্রাণ ভরে যাবে, চিত্ত বিক্ষেপ শান্ত হবে।

এ শুধু ঔৎসুক্য নয়, এ যেন অনুসন্ধান। তাই বোধ হয় আর তর সয় না নিভার।

কথা ছিল, সবাই মিলে যাওয়া হবে। কিন্তু পুজোর দিন থেকে সারদা দেবী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বিছানা না নিলেও অল্প অল্প জ্বর, সর্দি-কাশি তাঁর দেখা দিল। নিভা ধরেই নিয়েছিল এ অবস্থায় আর যাওয়া হবে না। আর সারদা দেবীকে ছাড়া কি হিসাবেই বা সে যেতে পারে! তা ছাড়া পথও একটুখানি নয়, আন্দাব করলে তিনি জবলপুরেই যেতে রাজী হবেন। সাত আট ক্রোশ টাঙ্গায় যেতে হবে। বড় সহজ কথা নয়, কুটুমের মেয়ে বলে অমন অন্যায় আব্দার বা নিভা কি করে করবে।

সারদা দেবী কিন্তু ভোলেননি। অসুস্থ শরীরে আগের দিন লক্ষ্মী পুজোর আয়োজন করতে করতে নিভাকে তিনি বললেন, কাল একটু সকাল-সকাল বেরোস তোরা, সন্ধ্যের আগে পোঁছবি—

নিভা অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চায়। কেন কোথায় বেরবে বুঝতে পারছে না। জিজ্ঞেস করলে, কোথায়?

সারদা দেবী বললেন, মার্বেল রক্স দেখতে। কেন!

দ্বিধায় নিভা ইতস্তত করে। জড়িত কণ্ঠে বলে, আপনার শরীর খারাপ...তা ছাড়া—

সারদা দেবী উড়িয়ে দেন, আমার শরীর খারাপ তো তোদের যেতে কি! কাল না দেখলে আর দেখবি কবে!

নিভা আপত্তি করলে, না, আপনি সেরে উঠুন তারপর দেখা যাবে।

সারদা দেবী বললেন, উঠিনি কি আমি শুয়ে আছি! তোর অত ভাবনার দরকার নেই। আমি বলচি যাবি।

নিভা বলে, আপনি না গেলে আমি যাব না। অসুখ সারুক।

বোধ হয় সারদা দেবী মনে মনে খুশীই হন। তবু নিজের জেদ বজায় রাখতে বলেন, তা হলেই আর যাওয়া হয়েচে! আমার অসুখ সারবে তারপর তুমি যাবে! আচ্ছা বোকা মেয়ে তো তুই!

নিভা চুপ করে থাকে। সারদা দেবীর কথায় সে ভয় পায়—অসুখের কথা নিয়ে তিনি অমন করে বলছেন কেন। সামান্য সর্দি-জ্বরকে তিনি ওভাবে দেখছেন কেন। না না, কিছুতেই সে তাঁকে রেখে যাবে না।

সারদা দেবী বললেন, কি চুপ করে আছিস যে! যাবি না?

নিভা মৃদুস্বরে বললে, না। আপনার সঙ্গে যাব।

সারদা দেবীও নাছোড়বান্দা, আচ্ছা অবাধ্য মেয়ে তো তুই! আপনার সঙ্গে যাব! কেন?

কেন'র কথাটা মুখ ফুটে বলা যায় না। হয়তো নিজেও জানে না সেই কেন'টা কি! সারদা দেবীর অসুখটা যে যথার্থ কারণ নয় তা সে মনে মনে জানে।

সারদা দেবী বললেন, অমলকে বলা আছে, সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।

কতক্ষণের মামলা। তার মধ্যে নিশ্চয়ই আমি মরে যাব না। পাগলী মেয়ে কোথকার ভেবে ভেবে সারা।

নিভা চুপ করে রইল। কে বলবে, অভিভাবকহীনা হয়ে এমন একলা-একলা যেতে পাওয়া সুযোগ না, দুর্যোগের সূচনা? অমল সঙ্গে থাকবে, কই সে তো খুব খুশী হ'তে পারছে না মনে মনে। তবে কি অমলের সান্নিধ্য সে চায় না, অমলকে নিভৃতে একান্তভাবে পেতে চায় না? সারদা দেবী কি তা জানেন? না জানলে, তিনি এভাবে সমস্ত মেয়ে আর সমস্ত ছেলেকে একলা একলা ছেড়ে দিচ্ছেন কি করে? নিজের ছেলেকে তিনি চেনেন? কোন দিক থেকে তাঁর কোন ভয় নেই! আশ্চর্য মা!

কিন্তু এ ব্যবস্থায় কোথায় যেন তাকে অপমান করা হয়েছে, তার ফুটন্ত যৌবনকে একদিন সন্দেহ করে রেণুকাকীমা যেমন তাকে অপমান করেছিলেন, সারদা দেবী তেমনি আজ তাকে সন্দেহ না করে অপমান করলেন। সত্যি কি সে কিছু বোঝে না? সারদা দেবীর তার সম্বন্ধে এ ধারণা হলো কোথা থেকে? ঘি-আগুনের সম্পর্কের আপ্ত বাক্যটা কি তিনি জানেন না? কাকে তিনি বিশ্বাস করেন, ছেলেকে না এই পরগাছা, অনাথা মেয়েকে?

মনে কোন পাপ না থাকলে এ সব কথা ভাববার নয়। তবে কি নিভার মনে পাপ আছে, না সে এই ব্যবস্থাটাই মনে মনে কামনা করছিল? প্রকৃতির সেই অদ্ভুত সৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে মুখোমুখি অমলকে দেখে নেবে, বুঝে নেবে। নিভাকে কি চোখে দেখে সে। মর্মর মূর্তি যদি এতই দর্শনীয় হয় তা হলে নারীর চিন্ময়ী মূর্তি দর্শনীয়া হবে না কেন? অমলকে সে দেখে নেবে, নিজেকে দেখাবে। উপেক্ষায়, অনাদরে, অবহেলায় আর চোখের আড়াল হয়ে থাকবে না। সে উপেক্ষণীয়া নয়, আদরনীয়া।

হঠাৎ চোখের সামনেটা যেন কেমন শূন্য হ'য়ে যায়—কিছু বুঝতে পারে না নিভা মুহূর্তের জন্যে কি শুনছে, কি ভাবছে। তার উৎসুক, উদ্গ্রীব মন সহসা ভোঁতা হয়ে যায় অভীষ্ট সিদ্ধির অভূতপূর্ব সুযোগ পেয়ে।

মনকে ফিরে প্রশ্ন করলে যেন আর কোন জবাব পাওয়া যায় না —কি চেয়েছিল আর কি পেয়েছে, যার জন্যে এই লুকোচুরি? অমলকে একলা পেয়ে কি দেখাবে সে? তা কি লজ্জার, অপমানের, ভয়ের কারণ হবে না। সমাজে উপযাচিকার মূল্যই বা কি। ছি, ছি, ছি।

সারদা দেবী বললেন, কি চুপ করে আছিস কেন। কি, যাবি কি না বল? টাঙ্গাওলাকে বলা আছে।

নিজেকে ঢেকে ফেলতেই যেন রুদ্ধ কণ্ঠে নিভা বললে, যাব্-ব। আপনি গেলে কিন্তু...

মনে মনে সারদা দেবী বোধ হয় হাসলেন। বললেন, শরীরটা একটু সুস্থ হোক, যাব। এবার তোরা যা।

নিভা চমকে ওঠে, সারদা দেবীর কণ্ঠস্বরে কিসের যেন ইঙ্গিত আছে। অনিচ্ছায় যেন তিনি একটা অনভিপ্রেত কাজ করছেন। হঠাৎ বড় অসম্ভব মনে হয় তার গলার স্বরটা—এবার তোরা যা!

কি জানি কেন নিভার মনে হয়, এরপর আর কোনদিন ও প্রসঙ্গ উঠবে না। এই-ই তার শেষ এবং প্রথম যাওয়া।

বেলাবেলি এসে পৌঁছলে কি হবে, পূর্ণিমার চাঁদ মস্তকের ওপর না-এলে সে-শোভা দেখবে কি করে। মুখের কাছে আলো না বাড়ালে রূপ খুলবে কেন, স্ফটিকে চন্দ্রমা চর্চিত না হলেই বা দেখবে কি। দেখতে এলেই যদি দেখা যেত তা হ'লে আশপাশের পাহাড়গুলোয় চুমাখিয়ে নিলে হ'তো—শ্বেতপাথর হতো, শোভা শুধু কি দর্শনপ্রার্থীর চোখে না, দর্শনীয়ের সজ্জায়, রূপায়ণে? তা হলে দাঁড়াও অপেক্ষা কর, চাঁদ উঠুক।

নিভা অবাক হয়ে যায় ভিড় দেখে। যেন একটা মেলা বসে গেছে। দেশ-বিদেশের কত লোক, কত কলরব। প্রথমটা কিছু বোঝা যায় না, উদ্দেশ্য এদের কি, কেনই বা এখানে ভিড় করছে। আর কোথায় বা সেই শ্বেত-পাহাড়? ধারে কাছে তার চিহ্নমাত্র নেই। একটা উপলক্ষ্য করে কেবল এত ভিড়!

টাঙ্গা থেকে নেমে নিভাকে নিয়ে অমল একটা চালা ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। এখানেও ভিড় পা গলাবার জায়গা নেই। জনে-জনে, দলে-দলে ঘরবার ভিতর-বাহির দখল করে কম্বল বিছিয়ে আস্তানা করেছে। মনে হয় কেবল রাতের আশ্রয়টুকু এদের কাম্য। পথশ্রমে ক্লান্ত মুসাফির সরাইখানায় আশ্রয় নিয়েছে।

পৌঁছে দিয়ে উঠে গিয়ে অমল খানিকক্ষণ পরে ফিরে এসে নিভাকে ডেকে নিয়ে গেল। ঘরের মধ্যে হাটের মাঝখানে একটা জায়গা নির্দেশ করে বললে, কম্বলটা বিছিয়ে ওখানটায় বস। আমি আসছি। জায়গা ছেড় না।

বলেই এমন ভাবে অমল ঘর ছেড়ে চলে গেল যেন এইটুকু কর্তব্য ছাড়া নিভার প্রতি আর তার কোন দায়িত্ব নেই। নিভাকে কোন রকমে কাঁধ থেকে এখন নামাতে পারলেই সে বাঁচে।

চুপ করে নির্দিষ্ট জায়গায় বসে নিভা আশপাশ লক্ষ্য করতে লাগল। বাইরে অনেকক্ষণ অন্ধকার হয়ে গেছে, ভিতরে কিন্তু সে তুলনায় আলোর ব্যবস্থা করা হয়নি মাঝখানে টিম্ টিম্ করে একটা লণ্ঠন জ্বলছে—তারই আবছা আলোয় মানুষগুলোকে কেমন যেন অদ্ভুত দেখাচ্ছে। মনে হয় না, এসব মানুষকে আর কোথাও নিভা দেখেছে, কৌতূহল-ভয়-বিস্ময় মণ্ডিত এরা। সে ছাড়া ঘরে একলা একলা কেউ নেই, কেউ না কেউ সঙ্গী আছে, সাথী আছে, এক বা দুই। বেশীর ভাগই পুরুষ, দু' পাঁচটি মেয়ে আছে। তা-ও বোধ হয় পুরুষদের পথশ্রম লাঘব করতে সময় মত খাবারটা বিছানাটা এগিয়ে দিতে। নিভাও কি তাই? না, ঐ দলে নয়।

তবু চোখদুটো নিভার সামনের বিছানায় একটি সমবয়সী যুবতীর দিকে আকৃষ্ট হয়। তখন থেকে মেয়েটি যেন ঘর গুছতে মহা ব্যস্ত, রাতটুকু নয়, আরো কতদিন যেন এখানে থাকতে হবে! সঙ্গের পুরুষটির কিন্তু কোনই খেয়াল নেই, এই এতক্ষণ কি সব কাগজপত্তর নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল, সবে মেয়েটির পাশে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েছে। সব দায়িত্ব এখন ঐ মেয়েটির।

অমলও তাই চায় কিনা কে জানে। নিভার মনে হয়, নিশ্চয়ই তাই, না হলে ফাঁক কাটলো কেন!

কিন্তু কি করবে সে? কম্বলটাকে দুজনের মত করে পাতবে? উষ্ণ শয্যার উপকরণ হিসাবে নিজের গাত্রবাসটা খুলে বিছিয়ে দেবে?

ভাবতেও নিভা লজ্জারক্তা হয়ে ওঠে। ছি, ছি, একি ভাবনা অনূঢ়া, পরভৃতার ?

তার চেয়ে যেমন আছে তেমনি থাক, অমল ফিরে যে ব্যবস্থা করে। তার কি মিছে ভাবনা করে'। দেখাই যাক না চুপটি করে অমল কি করে। তার কোন দায়িত্ব নেই, সে প্রকৃতির শোভা দেখবে, দেখে চলে যাবে। সারদা দেবী তাকে পাঠিয়েছেন রক্ষী দিয়ে, সুতরাং রক্ষণাবেক্ষণ—

কিন্তু সামনের মেয়েটিকে দেখে বার বার চিত্ত বিক্ষেপ ঘটে। এখানে এখন তারও যেন কিছু করবার আছে। ঠুঁটো হয়ে বসে থাকবার জন্যে অমল তাকে এখানে রেখে যায়নি। প্রত্যাশা তার একটা আছে। ফিরে নিশ্চয়ই সে নিভাকে এভাবে বসে থাকতে দেখলে মনে মনে ক্ষুণ্ণ হবে।

কিন্তু কি প্রত্যাশা অমল তার কাছ থেকে করে ? আর এই হাটের মাঝখানে নিভাই বা তাকে কি দিতে পারে ? বিছানাটাকে খেলিয়ে পাতলেই কি সব কর্তব্য করা হয়ে যাবে ?

খানিক পরে মেয়েটি ছেলেটিকে ঠেলছে আঙুলের টিপ দিয়ে। কৌতুকে মুখটা হাসি-হাসি। কম্বলের মধ্যে ছেলেটিও বোধ হয় কৌতুক চাপতে পারছে না। এক সময় মেয়েটি টেনে ছেলেটির মুখের আবরণ খুলে ফেললে। দুজনেই এমন ভাবে হাসে যেন ঘরে তারা ছাড়া আর কেউ দেখবার শোনবার লোক নেই। বেহায়াই তো !

গুটোন কম্বলের ওপর বসে নিভা কাঠ হয়ে ওঠে। দৃশ্যটা কোথায় যেন তাকে ব্যথা দেয়। কত যেন শূন্য আর নিবর্থক মনে হয় নিজেকে। কত কি চায় সে কিছুই পায় না—পাবেও না কোন কালে। কি যে জড়তা আর সঙ্কোচ কিছুই বুঝতে পারে না। কেন, তাও ঠিক ধরতে পারে না।

নিজের ওপরই বোধ হয় রাগ হয় নিভার। এখন সামনে ওরা খাবার ভাগাভাগি করে খাচ্ছে। কলহাস্যে পরিতৃপ্তিতে স্থানটুকু মুখর। এর পর ওরা বোধ হয় পাশাপাশিই শয্যা গ্রহণ করবে। কে চেনে কাকে, লজ্জা ভয় ওদের কার জন্যে ? যদি স্বামী স্ত্রী না হয় ? বয়েই গেল, তা বলে এমন সুযোগ ওরা হেলায় হারাবে কেন !

পাথর দেখার অবসরে পরস্পরকে ওরা আজ যে ভাবে অসঙ্কোচে দেখলো এই হট্টমেলার মাঝখানে পরবর্তী জীবনে হয়তো তা ওদের পাথেয় হয়ে থাকবে। সমাজে লোকালয়ে যে-জীবন ওদের সঙ্কুচিত ছিল, এখানে তা বিস্তৃত হলো। লাভ ওদের কম কি !

উঠে কম্বলটা খেলিয়ে পাততে গিয়ে আবার কি ভেবে নিভা বসে পড়ল। না, থাক অমল আসুক। ছি, ছি, অমন বেহায়ার মত ব্যবহার সে করতে পারবে না, বিশ্বাসঘাতিনী সে হতে পারবে না। উপযাচিকা সে হবে না।

কিন্তু এই দিন আর এমন একলা করে' আর কোনদিন যদি সে অমলকে না পায় ? অমলের মনোভাব বুঝবে কি করে ? আর কবেই বা নিজের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করবে ? মনে মনে এখানে আসবার আগে কি সঙ্কল্প করেছিল সে ভুলে গেল : অমলের ঔদাসিন্যের শোধ নেবে না ? বুঝিয়ে দেবে না কি চায় সে ?

কেন জানি না কেমন এক রকম জড়তা বোধ করে নিভা। নারী মনের সেই কুটিল ক্রূর বাসনা নিশ্চেষ্ট হয়ে আসে। মেয়ের মত তাকে বিশ্বাস করে সারদা দেবী তাকে অসম্মান করেননি বরং তার সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছেন। কেউ না জানলেও নিজের মর্যাদা নিজের কাছে।

কিন্তু তাই কি ? আর কোন বিবেচনা তার নেই ? আর কোন ভাবনা ? শুধু সম্মান রক্ষার্থে এখনো নিভা নিজেকে রক্ষা করছে ? ঐ মেয়েটির মত সহজ, অসঙ্কোচ হতে পারছে না ?

অনেকটা সময় চলে গেল। ঘরটা নিস্তব্ধ হয়ে এল। মাঝখানে রাখা লণ্ঠনটার তেলও বোধ হয় ফুরিয়ে এল বলে। এখনো অমল ফিরছে না কেন ? তাকে এতক্ষণ ঘটের মত বসিয়ে রেখে গেল কোথায় ? বাইরে কি করছে একলা-একলা ? 'মার্বেল রক্স' দেখতে আসায় এত কাণ্ড করতে হয় নাকি ! আচ্ছা লোক ! তা হলে এরা এখানে কি করতে এসেছে ? শ্বেত মর্মরের শোভা দেখবে না ?

ওরাও তো শুয়ে পড়ল। গাটা শির শির করে নিভার। চাদরটা গায়ে টেনে দিলে ভাল করে।

ঘণ্টা দুয়েক পরে অমল হন্তদন্ত হয়ে ঘরের মধ্যে এল। নিভাকে এক ভাবে ঠায় বসে থাকতে দেখে বললে, সে কি, অমন করে বসে আছ তখন থেকে !

হ্যাঁ-না নিভা কিছু বললে না। কেমন এক রকম করে অমলের মুখের দিকে চাইলে।

অমল বললে, বিছানাটা খেলিয়ে তো বসতে পারতে। দেখ দেখি—

তবু নিভা উঠলো না, বা নড়ে-চড়ে বসল না—বা বিছানাটা পাতবার কোন চেষ্টা করলে না। অমল তাকে ভর্ৎসনা করছে কি।

অমল এগিয়ে এসে বললে, ওঠ, ওঠ, দাঁড়াও বিছানাটা পাতি ! তবু রক্ষে কেউ এসে জায়গাটা নেয়নি !

এতক্ষণে নিভা নিম্নস্বরে বললে, পাহাড় দেখা হবে না ?

বিছানাটা সাবধানে পাত্‌তে পাত্‌তে অমল বললে, সেই যার নাম রাত ১২টা-১টা, আজ বেজায় ভিড় বোট পেতে পেতে রাত কাবার। বেছে বেছে আজই সবাই এসেছে !

কিছুই নিভার বোধগম্য হয় না। পাহাড় দেখার সঙ্গে বোট পাওয়ার কি সম্পর্ক ? কে জানতো পাহাড় দেখার এত কায়দা-কানুন। চাঁদ কি ততক্ষণ বসে থাকবে শ্বেত মর্মরের মুখে আলো ফেলবার জন্যে।

ভয়ে ভয়ে নিভা জিজ্ঞেস করলে, এখনি দেখা যায় না ?

অমল হেসে বললে, তা হলে তো চুকেই যেত, এতক্ষণ আমরা বাড়ী ফিরে যেতুম। পাহাড় কি এখানে, ঐ নর্মদার মাঝখানে—বোটে করে না গেলে পাড়ে দাঁড়িয়ে কিছুই দেখা যাবে না—মনেই হবে না এই রকম একটা জায়গায় প্রকৃতির কোন গুপ্ত ধন আছে।

কি বুঝলে নিভা কে জানে, বিছানার কম্বলটার একটা খুঁট ধরে শয্যা রচনায় অমলকে সাহায্য করলে। সহজ ভাবে প্রশ্ন করলে, বোট পেতে এত দেরী হয় কেন ?

বসে পড়ে অমল বললে, আর বল কেন, মাত্র দুখানা বোট—

যাত্রী হয়েছে পাঁচশো। ব্যাচ্ বাই ব্যাচ যেতে হবে। সেই নিয়ে তো এতক্ষণ ঝগড়া ঝাঁটি হচ্ছিল। মুসকিল।

ঝগড়া-ঝাটির নামে নিভা ভয় পায়। আড় চোখে একবার আপাদমস্তক অমলের ভাল করে দেখে নেয়। না, লোকটাই জিতবে যে-কোন দ্বন্দ্বে, চেহারাটা বিরুদ্ধতার উপযুক্ত। ভয় নেই। মুহূর্তের জন্যে একটা তুলনার কথা নিভার মনে উদ্ভাসিত হয়, নিভা শিউরে ওঠে।

অমল বললে, দুখানার বেশী চারখানা বোট দিলে ভিড়টা কমে, তাড়াতাড়ি কাজও সারা যায়। চেপে ধরতে বলে কিনা, আর দুখানা বোট রিসার্ভড হয়ে গেছে—জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ফ্যামিলি নর্মদায় চাঁদের আলোয় 'রোইং' করবে। আবদার।

আর অনুমতির অপেক্ষা না করে নিভা বাড়ী থেকে-আনা খাবার সাজাতে বসে। অপেক্ষা যখন করতেই হবে তখন ওগুলোকে অপেক্ষা করিয়ে লাভ কি। তড়াতাড়ি গতি করাই ভাল।

আজ ঠান্ডাও পড়েছে তেমনি। কি মাস? আশ্বিনের শেষ, বাঙলার ঘরে ঘরে আজ লক্ষ্মী পুজো।

[ক্রমশ

চৈত্র শেষ

শ্রীকরুণাময় বসু

শূন্যবন কেঁদে ওঠে, ক্ষ্যাপা হাওয়া বলে তবে যাই,
লতায় পাতায় ছিল ফুলের স্বপন,
মাধবী রাতের শেষে ফুলদল হাওয়ায় ওড়াই;
চাঁদের উদাস চোখে ঘুমের আবেশ,
স্মৃতি শুধু পড়ে আছে মায়াদীপ জেবলে, আর কিছু নাই,
ক্ষ্যাপা হাওয়া বলে তবে যাই।

ফসলের ক্ষেত আছে, কোথা গেল শ্যামলিমা শীষ?
শূন্য শাখায় আর কোয়েলিয়া দেয় নাত শিষ;
নীলজল ছলছল চলে যায় অবিরল
প্রভাতের পার হ'তে গোধূলির তীরে,
যে পথিক চলে যায় ডাক দেয় সেই অতিথিরে।
ক্ষেতে আর দোলে না ত শ্যামলিমা শীষ,
চড়ুয়ের স্তব্ধপাখা, কোয়েলিয়া ভুলে গেছে শিষ।

ক্ষ্যাপা হাওয়া বলে তবে যাই,
বকুলের শূন্যবন হা-হা করে, যারা ছিল তারা আজ নাই;
আকাশের ছায়াপথ তবু আছে আঁকা,
ঝরাফুল পড়ে আছে, দিগন্তরে চাঁদখানি বাঁকা।
মউবন-উন্মন, বুকে ছিল মধু মৌচাক,
শূন্য চাক, মধু নেই উড়ে গেছে মৌমাছির ঝাঁক;
চঞ্চল হাওয়ায় ওড়ে নীল পারাবত,
কতো দূরে চলে যায় বনান্তের ছায়াঢাকা পথ।

সাগরের ঢেউ দোলে, পথ বুঝি খুঁজে মরে মনের জাহাজ,
মাস্তুল ভেঙে গেছে, খোঁজে তাই কাছাকাছি বন্দর আজ;
দূরে থাক দারুচিনি, লবঙ্গদ্বীপ,
জাফরানী রঙে যেথা ঢাকা পথধূলি,
রাঙা মেঘে নেমে আসে রঙীন গোধূলি;
হয়তো জেবলেছে সেথা মায়াবিনী সোনার প্রদীপ;—
ভুরুতে কাজল-রেখা, কপালেতে কাঁচপোকা টিপ,
গান গায় হাসে খেলে সাগরের জলে,
গহিন সাগরে ফেরু কোথা যন্ত্র চলে।

যায় যদি চলে যাক, স্বপ্নের আজি হোক শেষ,
চৈতালি ফসল ক্ষেতে ছায়া দিক বৈকালি মেঘ;—
তারপর উড়ে যাব দূরে দেশে ক্ষ্যাপা নিরুদ্দেশ,
স্বপ্নের আজি হোক শেষ।
রাঙা রাত টলোমল, ভাঙা-চাঁদ ছলোছল,
ফুলের বাসর আজি শেষ;
স্মৃতি থাক, দীপ জবলে শেষ হোক, শালবনে ক্ষ্যাপা হাওয়া
উড়ে যাক কোথা নিরুদ্দেশ।

মিংমা দোরজে

অচেনা

২৮শে অক্টোবর, ১৯৫২।

হিমালয়ের উত্তুঙ্গ পর্বতমালা হতে সবার অলক্ষ্যে কখন যে সূর্যের শেষ আভা মিলিয়ে যায়, কেউ টের পায় না। ক্রমে নেমে আসে অন্ধকার, গাঢ় অন্ধকার, নিঃসীম, রন্ধ্রহীন রাত্রি। মিংমা দোরজের চোখে ঘুম নেই। কর্মক্লান্ত দেহটাকে কোনমতে মেলে দিল বাতাসপূর্ণ গদীতে, টেনে নিল একরাশ প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভারের স্তূপ হ'তে তিব্বতী তামাকের পাইপ। তামাক-ভরা নলের মুখ জ্বলতে থাকে অন্ধকারে, সাইক্লপস্ গুহার একচক্ষু পলিফিমাসের চোখের মত, নড়তে থাকে অন্ধকারে জ্বলন্ত অজগরের মত। মিংমা দোরজে ভাবতে থাকে কত কথা, তার যেন শেষ নেই।

সুইস এভারেস্ট পর্বতারোহীদের থেকে বহুদূরে, অনতিক্রম্য চিরতুষারময় হিমালয়ের পর্বতগাত্র বেয়ে বহু-উর্ধ্বে সে চলে এসেছে। কত নদ-নদী, পার্বত্য উপত্যকা, কত ভয়-ভীষণ, যন্ত্রণা-জর্জর, শিলাময় দুস্তর গিরিপথ যে অতিক্রম করে সে এসেছে এখানে, তার ইয়ত্তা নেই। পৃথিবীর উচ্চতম গিরিশৃঙ্গের শিখরে সে উঠতে চলেছে—পরাজিত করতে হিমালয়ের এই শেষ প্রহরীকে। হতমান করবে সেই অভিযাত্রীদলদের, গিরিরাজ্যের বিরুদ্ধে যাদের অভিযান বারে বারেই ব্যর্থ হয়েছে।

কোথায় কাঠমুণ্ডের নানচী বাজারে তার গণ্ডগ্রাম, আর কোথায় এই একুশ হাজার একশ পঞ্চাশ ফিট উর্ধ্বে চির-তুষারাবৃত হিমালয়ের হিমকোলে তার তুষার শয্যা। ভাবলেই যেন হাসি পায়। মিংমা দোরজের মনে পড়ে যায় তার যাত্রার পূর্বে গিরি-দেবতার পূজা, অন্ধকারে যেন ভেসে ওঠে অতি প্রিয় পরিজনের মুখাবয়ব, তাদের যাত্রা নিরস্তের তরে অশ্রুসিক্ত অনুরোধ। কিন্তু কেন? মিংমা দোরজে ভাবতে থাকে...। কেন তারা বারণ করে? কেন তারা বোঝে না? যা কিছু দুর্লভ, যা কিছু দুষ্প্রাপ্য, তাকে লাভ করা, তাকে পাওয়াই যে তার জীবন। অবশ্য পাহাড়ে পর্বতে, বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান যে তার জীবিকা নির্বাহের একটা উপায়। আশৈশব সে যে এই করে এসেছে। কত ভয় ভীষণ, বিপদসঙ্কুল পর্বতে ঘুরে বেড়িয়েছে, কত বাধা, কত বিপত্তি এসেছে, ভ্রূক্ষেপ করেনি সে। কত ভীতি-ময় পার্বত্য প্রস্রবণ এড়িয়ে, কত উন্মত্ত নির্ঝরিণীর জল পান করে, কতবার অসহ্য তুষার-ঝঞ্ঝা মাথায় নিয়ে সে অতিক্রম করেছে বরফের নদী। অসহ্য আঘাতে কতবার রক্তাক্ত হয়েছে শরীর, ক্লান্তিতে সর্বদেহ অবশ হয়ে গেছে, প্রচণ্ড শীতে তার তপ্তরক্ত কতবার হিম হয়ে গেছে। তবু, তবু সে থামেনি।

নানচী বাজারের সে আজ বিখ্যাত সেরপা; তাই বা কেন? কাঠমুণ্ডের এক সীমা থেকে অপর সীমায় ছড়িয়ে গেছে তার প্রসিদ্ধি। কিন্তু কাঠমুণ্ড কতটুকুই বা? সে আজ যদি হিমালয় গিরিশৃঙ্গের চরম শীর্ষে উঠতে পারে, তবে সে গৌরব কাঠমুণ্ডের চতুঃসীমায় বদ্ধ থাকবে না। ছড়িয়ে যাবে সমগ্র বিশ্বে। তার প্রতিকৃতি প্রকাশ পাবে সংবাদপত্রে। দৈনিক পত্রিকায় বড় হরফে সেখানে লেখা থাকবে "মিংমা দোরজে, হিমালয়-বিজয়ী বিশ্ব-বিখ্যাত নেপালী সেরপা",—মিংমা দোরজে একটু হাসল।

এইতো সেদিনকার কথা। তার মনে পড়ল প্রথম শিবির হতে তৃতীয় শিবিরে যাত্রার কথা। কি ভীষণ, কি দুস্তর সে পথ। প্রতি পদক্ষেপে ছিল হারিয়ে যাবার ভয়। যে কোন মুহূর্তে সে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যেতে পারতো এ পৃথিবী থেকে। তুষার স্তূপ তার সর্বাঙ্গ ঢেকে দিতে পারতো। যন্ত্রণা-জর্জর বন্ধুর পথ তাদের দুর্ধর্ষ অভিযানকে রুখতে পারেনি। তারা এগিয়ে এসেছে। এগিয়ে তার যেতেই হ'বে। আর কতটুকুই বা পথ! কয়েক হাজার ফুট উঠলেই সে পৌঁছবে চিরবাঞ্ছিত, চিরঈপ্সিত পথের শেষে। যে পথের শেষে আজ পর্যন্ত কোন মানুষ পৌঁছয়নি। কতটুকুই বা রাত। রাতের অবসানে আবার যাত্রা সুরু হবে। সে বাধা মানবে না, হার মানবে না। যাবেই যাবে। মিংমা দোরজের তামাকের আগুন তখন নিভে এসেছে। চোখে ভরে এসেছে ঘুম। শিবিরের বাইরে অসহ্য ঠাণ্ডা বাতাসের গোঙানি। ক্যানভাসের জানলার পর্দাগুলোকে সরিয়ে হু-হু শব্দে ঠাণ্ডা বাতাসের স্রোত, হাড় কাঁপিয়ে দেয় যেন। হঠাৎ শুনলে মনে হয় কে যেন চীৎকার করে কাঁদছে, কে যেন নাকিসুরে কথা বলছে। চারধার অন্ধকার, সূচীভেদ্য অন্ধকার। মিংমা দোরজে ভারী চামড়ার কম্বলটা আর একটু টেনে নিল। কখন হাতের নলটা তার পড়ে গেছে, ঠিক নেই। মিংমা দোরজে ঘুমিয়ে পড়েছে।

পরদিন ভোরবেলা থেকেই সুরু হ'ল যাত্রা। সুইস পর্বতারোহী 'রুজিরো' সেদিন মিংমা দোরজে এবং অপর কয়েকজন সেরপাকে নিয়ে কর্মের মাঝে ডুবে গেল। ইতি-মধ্যে ল্যাম্বার্ট, গ্রস্, তেনমিং এবং কয়েকজন সেরপা দক্ষিণ কল্ (South Cal) অভিযানে এপেরোঁ-দে-জেনেভোয়া (Eperon-Des-Genevoio) অভিমুখে এগিয়ে গেছে। পর্বতের ঢালু প্রদেশের নিম্ন অঞ্চল বরফে ঢাকা। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা চলে না। একটু চড়াই-এ বরফ জমে শক্ত হয়ে গেছে। মিংমা দোরজের দল অপূর্ব নৈপুণ্যে নির্মাণ করল বরফের সোপান। লোহার খুঁটি আর আংটা পুঁতে

দিয়ে দড়ির সেতুর সৃষ্টি করা হ'লো। ক্রমিক দড়ির সাহায্যে অভিযাত্রীদল পার হয়ে চলল একটার পর একটা বিপদ-সঙ্কুল গিরিশৃঙ্গরাজি। মিংমা দোরজের বাহুতে সেদিন অপরিমিত শক্তি, মনে প্রচন্ড সাহস। অতীতের দুঃখকে সে হারিয়ে ফেলেছে বর্তমানের সাফল্যের মাঝে। সে ভাবে, আর কতদূরই বা? এবার বুঝি গিরি-দেবতার কৃপা হোল. এতদিন পরে বুঝি তার মনস্কামনা পূর্ণ হোল। সেদিন রাত্রে অসম্ভব উত্তেজনায় মিংমা দোরজের ঘুম হয় না।

৩০শে অক্টোবর, ১৯৫২।

ভোর থেকে শিবিরে সাজ সাজ রব। বিলম্ব করা চলে না, তার কারণ মাত্র ছ ঘণ্টার জন্যে সূর্যদেবতার দর্শন পাওয়া যাবে। তার পরেই নেমে আসবে অন্ধকার। সকাল নয়টার সময় যাত্রা সুরু হোল। আইলা, তা নুরবু এবং মিংমা লিতারকে নিয়ে মিংমা দোরজে সুরু করল যাত্রা। পিঠে তাদের ড্রেজার (Drager) অক্সিজেন যন্ত্রপাতি বাঁধা। কিন্তু আজ যেন তার পা দুটো দেহটাকে বহন করতে চায় না। কোথা থেকে কে যেন পিছনে টানতে থাকে। তার এত উৎসাহের মাঝেও মনেতে উঁকি মারে শূন্যতা। তবু সে চলে। মন যে তার ভরে থাকে দূরের নেশায়, ভবিষ্যতের স্বপ্নে। চলার পথে বিছিয়ে থাকে এক আনন্দ, যার সৃষ্টি হয় দুঃখের উৎস থেকে। মিংমা দোরজে পিছন পানে একবার তাকায় ফেলে আসা পথের দিকে। কি যেন ভাবে, আবার এগিয়ে চলে। অনিশ্চয়তা তার সাথী, যাতনা যেন পথ প্রদর্শক। তার সামনে ছড়িয়ে থাকে লোৎসির শ্বেত-শুভ্র হিমস্রোত। তারা উঠল তুষারধবল পর্বতগাত্র বেয়ে অসীম নির্মল শুভ্রতার মাঝে কতকগুলি কালো বিন্দুর মত। চারিদিক নিস্তব্ধ, নিঝুম। মাঝে মাঝে পর্বতমালার অপার স্তব্ধতা ভেঙ্গে দিয়ে শোঁ শোঁ শব্দে ছুটে চলে তুষার-ঝঞ্ঝা, পায়ের নীচে অসহ্য ঠান্ডা, বরফের চাপ। পা যেন আর চলতে চায় না। হিম হ'য়ে আসে সর্বশরীর।

বেলা তখন দশটা। এপেরোঁ-দে-জেনেভোয়ার বুক থেকে এক বিশাল কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তরস্তূপ অসীম শূন্যতার মাঝে যেন হাত বাড়িয়ে থাকে। দেখলেই ভয় করে। মনে হয় এই মুহূর্তেই যেন এই অতিকায় বাহু খসে পড়ে প্রলয়ের সৃষ্টি করবে। মিংমা দোরজে উপরে উঠে গেছে। কিছুই খেয়াল নেই তার। পর্বতের সানুদেশ দিয়ে দলপতি নেভালী সাহেব স্পোহেলকে (Spohel) সাথে করে দড়ি ধরে উপরে ওঠবার ব্যবস্থা করছেন। তাঁকে সাহায্য করছে দাওয়া মণ্ডুপ, আর আং টেম্পা—দুজন সেরপা। কিছুদূর অগ্রসর হতেই কে যেন পিছন থেকে চীৎকার করে উঠল, সাহাব!...সাহাব!...মুহূর্তের মধ্যেই কি যেন হ'য়ে গেল। ধরিত্রীর বুক কেঁপে উঠলো থরথর করে। অনেক উপর থেকে কি যেন গড়িয়ে আসছে প্রচন্ড বেগে। একটা গুরু-গুরু শব্দ পাষাণের স্তরে স্তরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠলো।

দেখা গেল অনেক উপর থেকে এক বিশাল তুষারমণ্ডিত শিলাখণ্ড ধ্বসে পড়ে নীচে গড়িয়ে নেমে আসছে তীব্র বেগে, সাক্ষাৎ মৃত্যুর মত। পাষণের গায়ে ধাক্কা খায়, লাফিয়ে ওঠে, আবার গড়িয়ে পড়ে। যে যেখানে ছিল ঝুঁকে পড়ে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করল। কিন্তু মিংমা দোরজে? সে কোথায়? দেখা গেল শিলাখণ্ডের আঘাতে সে দড়ির গায়ে ঝুলছে। সমস্ত মুখটা রক্তে ভেসে গেছে, চোখের চশমা ভেঙ্গে গেছে। ফুসফুসটা ছিদ্র হ'য়ে গেছে।

দেখতে দেখতে এ দারুণ দুঃসংবাদ পৌঁছল সবার কাছে। স্যাম্বার্ট, রাইস, গ্রস্, তেনসিং যে যেখানে ছিল সবই ছুটে এলো দুর্ঘটনাস্থলে। সবাই মিলে বয়ে নিয়ে এলো মিংমা দোরজের অসাড় রক্তাক্ত দেহ পরমযত্নে। তাকে শুইয়ে দেওয়া হল এক বাতাসপূর্ণ গর্দীর ওপরে। সাধ্যমত চিকিৎসার ব্যবস্থা হোল। কিন্তু কোন ফল হোল না। শেষবারের মত মিংমা দোরজে পৃথিবীর আলো বাতাসের মধ্যে একবার চোখ খুললে। কি যেন বলবার চেষ্টা করল, বোঝা গেল না। ধীরে ধীরে সে চিরনিদ্রায় ঢলে পড়লে।

ধীরে ধীরে বহন করে আনা হল মিংমা দোরজের প্রাণহীন দেহ ৪নং এবং ৫নং শিবিরের মধ্যস্থলে, এভারেষ্টের উচ্চতম গিরিশৃঙ্গের প্রবেশপথে বরফরাশির ওপর সমাধির জন্যে। মানুষের কোলাহলের বাইরে। সকল আত্মীয়-স্বজনকে বহুদূরে রেখে ১লা নভেম্বর ১৯৫২; বিশ হাজার ফিট উর্দ্ধে, এই তুষারমৌলীর মাঝেই রচিত হ'লো তার সমাধি। রাইস মিংমা দোরজের সমাধিফলকে লিপিবদ্ধ করে রাখলো মিংমা দোরজের নাম, আর তার এই মৃত্যুর দিনটি শ্বেত প্রস্তরখণ্ড দিয়ে তার সমাধিস্থানটি চিহ্নিত করা হোল।

আজ সুইস অভিযাত্রীদলের সবাই ফিরে এসেছে নিজ নিজ আলয়ে। তাদের অভিযান আজ হয়েছে ব্যর্থ শুধু পড়ে আছে পিছনে মিংমা দোরজের অনন্ত স্মৃতি বহন করে তার রিক্ত সমাধি চিরতুষারের মাঝে। এখনও মাঝে মাঝে তুষার-ঝঞ্ঝার ডাকের সাথে তার যেন ঘুমঘোর ভেঙ্গে যায়। সে উঠে পড়ে পরমোৎসাহে, ডাকে ভবীকালের অভিযাত্রীদের হাতছানি দিয়ে, তার অসমাপ্ত কর্মের সমাপ্তির জন্যে। তার ইঙ্গিতে নিহিত হয়ে থাকে পথচলার নির্দেশ, অসম্ভবকে সম্ভব করার দুর্বার বাসনা।

বন্দর

শ্রীবিমলকুমার ঘোষ

লোকটি উস্‌খুস করছিল অনেকক্ষণ থেকেই।

মাস্টারবাবুর হাতের কাজ শেষ হয়েছে দেখে, অর্দ্ধভগ্ন জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে সকাতরে জিজ্ঞাসা করল—"ইস্টি-মার আস্‌তে আর কত দেরী হবে মাস্টারবাবু?

মাস্টারবাবু চশমার ফাঁক দিয়ে লোকটিকে দেখলেন ভাল করে। যেন এমন অদ্ভুত প্রশ্ন তিনি শোনেননি কোনদিন।

—বলি ইস্টিমার কি এই প্রথম চড়ছ?

—আজ্ঞে চড়ব না। তেমনি সকাতরেই বলল লোকটি—মাল পাঠাব খুলনায়। তাই একটা খবর দেব খুলনার গঙ্গাদাস মাড়োয়ারীর কাছে। রসিদ দিয়ে বোট পাঠিয়ে দেবে। দুশো মণ পাট আছে।

ওঃ! মাস্টার বিরক্ত সুরে বললেন—"তা ষ্টীমার কখন আসবে—কেমন করে বলব বাপধন—একি রেলগাড়ী, যে এক বিঘতের যন্তর কাণে তুলে দু চার বার "হ্যালো হ্যালো" করলাম গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর করলাম—আর তার পরেই বললাম—ঘণ্টা লাগাও, গাড়ী আসছে! এ ষ্টীমার—বুঝলে বাবাজী— চক্ষু আছে—মীরে পাড়ার বাঁক ছাড়া-লেই দেখতে পাবে—কর্ণ আছে নলদীর ঘাটে এসে ফুঁ দিলেই শুনতে পাবে। কিছু ভাবনা নেই—চুপকরে বসে থাকো—চিত্তিরে—মধুমতী—নবগঙ্গার জল তোলপাড় করে ইস্টিমার এসে পড়বে।

মাস্টারবাবু কথা বলছিলেন আর টিকেটের বাক্‌স-খাতা পত্র গুছিয়ে রাখছিলেন। মাস্টারবাবু কথা বলেন খুব বেশী। পাট চালানকারী লোকটি তা বুঝতে পেরে আর দ্বিতীয় প্রশ্ন না করে মাস্টারবাবুর উপদেশই মেনে নিল। ষ্টীমার ঘাটের বেঞ্চের উপর এসে বসল সে।

নলদী। নবগঙ্গা-চিত্রা আর মধুমতীর মিলনস্থল।

উচ্ছল বর্ষায় যখন তিনটি নদীর জল কানায় কানায় ভরে উঠে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে— তখন ঢাকাইয়া মুসলমান কেরায়ার মাঝি ডাক ছাড়ে—"সামাল গো নাইয়া, নলদীর "তিরমুনী" (ত্রিমোহনা) ছামায়—পাল টানাইয়া যাও ক্যান্? নামাইয়া ফালাও—"

স্থানীয় যশোরের মাঝি বলে—"কিডারে মণি তুমি? ভরা জোয়ারে পাল টানাইছ নলদীর তিরমুনিতে—বলি পরাণের ভয় নেই? এ গাঙ্গে কি নতুন আইছ?

অনভিজ্ঞ মাঝি অপরাধ স্বীকার করে—"হ' দাদা, বাড়ী আমাগো পুবে। নপাড়ার হাটে গিছিলাম—রাতারাতি গোণ ধরবার পারি নাই—

দাদা সম্বোধনে যশোরের মাঝি নরম হয়—"তা বেশ করিছ। এ্যাকন নাও গেরাফি কর—"সন্‌ঝে" বেলায় ছা'ড়ে দিও—

যশোরের মাঝি নৌকা চালিয়ে দেয়। "সন্‌ঝে" বেলায় তাকেও গিয়ে পৌঁছুতে হবে গোব্‌রার বন্দরে। সকাল বেলায় বন্দরের হাট। নপাড়া ষ্টেশনের যাত্রী ধরতে হবে তাকে। কলকাতার যাত্রী নামবে ইষ্টিমার থেকে।

চিত্রা বাঁক ফিরেছে। সেই বাঁকের মুখেই গোবরার হাট এবং ষ্টীমার স্টেশন। প্রতিদিন হাজার মণ পাটই চালান যায়। তার পরও আছে নারকেল—গুড়—ঝাটার শলা—আরও কত কি? মাগুরা লাইনে গোবরাই শুধু বন্দর—আর সব টিম টিমে স্টেশন। দুজন প্যাসেঞ্জার উঠল—কি একজন নামল—ব্যাস্ মাস্টারবাবুর কাজ শেষ।

কিন্তু নিঃশ্বাস ফেলার অবসর নেই জগন্নাথের—গোবরার মাস্টারবাবুর।

হাজার মণ পাটের চালান দেওয়া শুধু মুখের কথা নয়।

জগন্নাথের কথা মিথ্যা নয়।

চিত্রার জল তোলপাড় করে ইষ্টিমার এসে লাগে গোবরার বন্দরে। নলদীর ঘাটে এসে হুইসিল দিলেই জগন্নাথ খোলায় ভাজা খই-এর মত ছটফট করতে থাকে। যত তাড়া-তাড়ি করতে যায়—ততই গণ্ডগোল হয়ে যায়। কোথায় রইল পাশ বই—কোথায় রইল ক্যাশের চালান কিছুই ঠিক থাকে না। সব যেন তালগোল পাকিয়ে যায়। আধ ঘণ্টার জন্য ঝড় বয়ে যায় ষ্টীমার স্টেশনে। প্রত্যেক দিনের চালান দেখে—রসিদ বই-এ সই দিয়ে নেমে আসে জগন্নাথ। তার পর শেষ হুইসিল দিয়ে যখন সিঁড়ি টেনে তোলে তখন হাপ ছেড়ে বাঁচে।

কাজ থাকে না আর জগন্নাথের। অফিস ঘরে এসে চুপ করে বসে থাকে চিত্রার জলের দিকে চেয়ে। বাড়ী যাওয়ার তাড়া নেই। একা একা ভাল লাগে না নির্জ্জন পুরীতে। তার চেয়ে চুপ করে অফিস ঘরে বসে থাকা ভাল। নয়তো বাজারে গিয়ে বিষ্টু ময়রার দোকানে গিয়ে গল্প সল্প করাও যায়।

নিজের জন্য দুটী রান্না—তা যখন ইচ্ছে করে নিতে পারে। ইচ্ছে না করলেই বা কি? বিষ্টুর দোকান থেকে এক পোয়া চিঁড়ে-বাকী আনলেও চলবে—গুড় ঘরেই আছে। নিজের খাওয়ার জন্য ভাবে না জগন্নাথ।

পাঁচটা বাজল।

গোবরার স্কুলের ছুটী হয়ে গেল। এক্ষুনি ছেলের পাল এসে পড়বে হৈ হৈ করে। জগন্নাথ তাড়াতাড়ি অফিস বন্ধ করে বেরিয়ে পড়ে। বাজারের দিকেই পা চালিয়ে দেয় সে।

চিত্রা বাঁক ফিরেছে। সেই বাকের মুখেই বাজার। হাটও বসে দু' দিন।

নপাড়া স্টেশনে যেতে হলে খাল দিয়ে ভৈরবে যাও—সেখান থেকে নপাড়া—বনগাঁ—কলকাতা যেখানে খুসী যাওয়া যায়।

বাজারও এই খালের মুখে। ষ্টীমার স্টেশনের জন্যই গড়ে উঠেছে, নয়তো কিই বা ছিল এখানে। জগন্নাথই গল্প করে—

—বুঝলে বিষ্টুদা, এই সেদিনকার কথাই ধর—এক পয়সার বিড়ি কিনতে হলে সেই বকুলতলা মীরে পাড়া—। বাজার বলতে তখন বিপ্‌নের খাবারের দোকান—আর ঐযে নালে কুণ্ডু, পুলে কুণ্ডু দুই ভাই এখন মহাজন ফুটায়—ওরা এক ছাপ্‌রা বেঁধে এক খাব্‌লা চিঁড়ে আর খানকয়েক বাতাসা নিয়ে বসে থাকতো। এখন তো মাটীতেই পা ফেলে না, দোকানকে বলে "গদী"। এসব কিসের দৌলতে—এই মাগ্‌রো—খুলনা লাইনটা আছে বলে। বড় বর্ষার কথা তোমার মনে আছে বিষ্টুদা? সেই যে কালুখালি ভাটিয়া পাড়া লাইন ভেসে গেল বন্যের জলে—ধান পাট-সুপুরীর চালান বন্ধ। কলকাতার লোক না খেয়ে মরে। লাট সাহেব হুকুম দিল—"কুছ পরোয়া নেই—চালানী নৌকা মাল এনে দেবে বরিশাল—সেখান থেকে স্টীমারে খুলনা। ব্যস্‌—সেই থেকেই তো গোবরার কপাল ফিরল। সদাগরী মহাজন এসে পড়ল পালে পালে—দেদার মাল এনে ফেলতে লাগলো গোবরার চরে। সেই থেকেই তো বন্দর—কি বল বিষ্টুদা?

সন্দেশের পাক ঠিক করতে করতে বিষ্টু বলল—হু—এই তো সেদিনের কথা। বয়স আর কি রে ভাইডি? গাঙের জল মেঘে মেঘে বেলা কম হয়েছে?

জগন্নাথ সোৎসাহে নড়বড়ে বেঞ্চটার উপর জাঁকিয়ে বসল—"তাহলেই বোঝ মাগ্‌রো লাইন যতদিন—এই ভাঙ্গা কুলোর ছাই জগন্নাথ পোদ্দারও ততদিন মাষ্টারী করছে গোবরার ঘাটে। লোকে বলে দুই কলম লিখতে শিখে জগন্নাথ হয়েছে মাস্টার। কাণ দিই না বিষ্টুদা—লোকের মুখ আছে বলুক। কিন্তু তোমারে একথা বলে রাখলাম—দেখো এই বন্দরের সাথে সাথে সহর গড়ে উঠবে—হাসপাতালের "পেলান" হয়ে গেছে। বাঁধানো রাস্তা হবে—নড়াল পর্যন্ত শুনছি নাকি বাসও চলবে—তা চলুক। কিন্তু তার মূলে তো এই বন্দর?

"একশো বার! বিষ্টু বলল।

"লোকে বলে—বিনয় চক্কোত্তি আর জগন্নাথ পোদ্দার। গোবরার চোখ কাণ ফোটালো দুজনে। কাণ দিয়ে শুনি না—আত্মব্যাখ্যা শোনা পাপ। ওদিকে স্কুলের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলছে বিনয় চক্কোত্তি—লোকে আবার আদর করে ডাকে কালাঠাকুর। আর জগন্নাথ পোদ্দার সকাল হলেই খবরের কাগজখানা খুলে ধর নাকের সামনে। কোথায় জার্মান হাতের তেলোয় মশা মারার মত পিষে মারছে ইংরেজকে—চট্টগ্রামে বন্যা হয়েছে—সুতরাং ছোট সবাই—গান্ধীজি উপোস করেছেন—অতএব আমরাও করব একদিন—এ সব কিসের জন্য? এ সবই জগন্নাথের জন্য।

সহসা গলা খাটো করে জগন্নাথ বলে—"একটা কথা বলি বিষ্টুদা—দেখো এই গোবরাকে আমি টাউন বানিয়ে মরব।

সন্ধ্যা লেগে গেছে অনেকক্ষণ। বিষ্টু তার দোকানে সন্ধ্যাপ্রদীপ দেখিয়ে বলল—

—ওঠো জগন্নাথ রাত হয়ে গেছে—

জগন্নাথ উঠতে চায় না—বিরক্ত সুরে বলল—আঃ তুমি বড্ড ঝামেলা কর বিষ্টুদা, দুটো কথা কইতে এলাম।

—উঁহু যাও রান্না বান্না করগে—রাত হয়ে যাচ্ছে—খেতে হবে তো দুটি?

"একা মানুষের রান্না—কতক্ষণই বা লাগবে? তারপর তুমি শোন বিষ্টুদা—এই গোবরার বন্দর—এখানে পাকা ঘর হবে স্টেশনের জন্য। আরও কর্মচারী রাখতে হবে। ধর তোমার মাল বাবু থাকবে একজন—খালাসী থাকবে—মাল সিল দেওয়া ওঠানো নামানোর সময় গুন্‌তি কর—কাজের কি অন্ত আছে?

বিষ্টু এতক্ষণে অবসর পায়। জগন্নাথের পাশে বসে একটি বিড়ি ধরিয়ে বলল.

—আমার একটি কথা রাখবে জগন্নাথ—

কি বল?

তুমি আবার বিয়ে কর—কিই বা বয়স হয়েছে?

জগন্নাথ বিস্মিত হয়ে বলল— কি যে বল বিষ্টুদা। চারুর বিয়ে দিয়েছিলাম মনে আছে? বেঁচে থাকলে এতদিনে ছেলে মেয়ে হ'ত ভুর। মাস্টারী করতে হ'ত না তাহ'লে—নাতি নাত্‌নীর ধকল সইতেই দিন কাবার!—সে যাক্‌—শোনো—এই বন্দর বলতে গেলে আমারই হাতে গড়া—

অন্ধকার জমাট বেঁধে যায়। চিত্রার জল দেখা যায় না—মনে হয় একখানি দোদুল্যমান কালো যবনিকা।

জগন্নাথের মুখও আর দেখা যায় না। অবশ্য তাতে কিছু ক্ষতি নেই। মুখ দেখে তার মনের বিচার করা সম্ভব নয়। গোবরার প্রাইমারী স্কুলের পড়া শেষ করে কবে সে এই স্টীমার ঘাটে বসেছিল, স্টেশন মাস্টার হয়ে—সে কথা জগন্নাথই ভুলে গেছে।

জীবনের হিসাব নিকাশের পাতা একটির পর একটি উল্টে গেছে—কিন্তু লাভ লোকসানের খতিয়ান মেলাতে জগন্নাথ কোনদিন ব্যস্ত হয়নি।

বারো টাকা বেতনের মাস্টারী পেয়ে নতুন বিয়ে করা বউ ভামিনীকে বলেছিল—"আমাদের অভাবটা বিলের বউ—আমরা দুজনে স্বর্গ গড়ে তুলব—"

সেদিন বালিকা বধূ সেকথার অর্থ ভালভাবে বুঝতে পারেনি হয়তো—কিন্তু খুসী হয়েছিল, দু' বছর না যেতেই সুন্দর ফুটফুটে একটি মেয়ে কোলে পেয়ে।

কিন্তু সে আনন্দ ভামিনীর সইল না—স্বর্গ রচনা

অসমাপ্ত রেখেই সে ওপারে পাড়ি ধরল—মাত্র একুশদিনের টাইফয়েডে—

দু' বছরের মেয়েকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে জগন্নাথ। একহাত দিয়ে মেয়েকে সামলেছে আর অন্যহাতে রসিদ কেটেছে—ক্যাশের চালান লিখেছে।

চারু বড় হ'ল। বিয়েও দিয়েছিলাম—নাকোল—শ্রীকোলের বনেদী পোদ্দার বংশে। অল্প বয়সী জামাই—সবে বি-এ পাশ করে মার্চেণ্ট অফিসে ঢুকেছে।

জামাই লিখল—"কলকাতায় বড় অসুবিধা—চারুকে নিয়ে যাব—যাওয়ার পথে আপনার ওখানে দু'দিন থাকব।"

এসেছিল তারা। কিন্তু—

রাক্ষুসী—সর্বনাশী—চিত্রা—

ভরা ভাদ্রে চিত্রা ক্ষেপে ওঠে দুলে বাগদীদের ঝগড়াটে মেয়ের মত। রাগে চুল ছিঁড়তে থাকে যেন। কুটো পড়লে দু'ভাগ হয়ে যায় এমনি স্রোত। কত অসাবধানী সদাগরী নৌকা যে রাক্ষুসী গ্রাস করেছে তার ঠিক নেই—

কুকুর বেড়াল বাড়ীর বা'র করে না ভাদ্র মাসে—মেয়ে জামাই চললেন কলকাতায়।

জগন্নাথ মুখে কিছু বলেনি।

বলল চিত্রা। এতবড় অনিয়ম সর্বনাশী মুখ বুজে সহ্য করল না।

স্টীমারের সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে পা ফস্‌কে গেল চারুর—

ধর—ধর—গেল—গেল—ওরে ধর—

কিন্তু কেউ ধরতে পারেনি। ভরা ভাদ্রের স্রোতের টানে চারু কোথায় চলে গেল—

সেই থেকেই জগন্নাথ আলাদা মানুষ। দুনিয়ার পরে টিকেটের ঘর—বিষ্টু ময়রার দোকান ছাড়া আর কিছু চেনে না সে।

লোকে বলে বন্দর গড়ে তুলেছে জগন্নাথ।

জগন্নাথ সবিনয়ে হাত কচলায়—গড়লাম আর কই দাদা—চিত্তিরে সর্বনাশীর পরে বিশ্বাস নাই—হয়তো কোনদিন ভাঙ্গন ধরবে—সব পেটে পুরে বসে থাকবে। যেটুকু নিয়ে বেঁচে আছি—তাও তোমাদের পাঁচজনের আশীর্বাদ।

জগন্নাথ বেঁচে আছে ঐই বন্দরের স্বপ্ন নিয়ে।

আরও বড় হবে বন্দর। পুবের থেকে রং বেরং-এর পাল তুলে অসংখ্য নৌকা এসে ভীড়বে গোবরার ঘাটে। কার নৌকায় কি মাল আছে—কোথায় যাবে—ভীড় জমাবে তারা জগন্নাথকে ঘিরে। এই স্বপ্নই দেখে জগন্নাথ।

নলদীর ঘাটে হুইসিল দিয়েছে। জগন্নাথ ব্যস্ত হয়ে ওঠে। তাড়াতাড়ি খাতা পত্তর গুছিয়ে ফেলে। রসিদ বই-এ ফস্ ফস্ করে নাম সই করে নেয় কয়েকটা।

লোকজন হৈ-হুল্লোড়; যত কাজের ভীড় এই সময়টায়। স্টীমার ছাড়লে যেন হাপ্ ছেড়ে বাঁচে।

টিকেট বিক্রী হয়েছে খান্ আষ্টেক—কলেকশন হয়েছে মাত্র দু'খানা। জগন্নাথের নজর পড়ে যাত্রী দুটির পরে। অল্প বয়সী একটি ছোকরা। ফিন্‌ফিনে আদ্দির পাঞ্জাবী গায়ে। আঙ্গুলে সোনার আংটী। ভদ্রলোক। সাথে রয়েছে অল্প বয়সী বউ। সদ্য বিয়ে হয়েছে সম্ভবতঃ। অদূরে নতুন ট্রাঙ্কের পরে বসে রয়েছে মেয়েটি—মাথার ঘোমটা খুলে। আল্‌তা পরা ছোট পা দুখানি—ধুলোর পরেই ছড়িয়ে দিয়েছে। রঙ্গীন বেনারসীর একপ্রান্ত ধুলো দিয়েই গড়াচ্ছে।

জগন্নাথ চশমার ফাঁক দিয়ে মেয়েটীকে ভাল করে দেখে।

—আপনি বুঝি মাস্টারবাবু—

জগন্নাথ ছেলেটীর আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করে বলল—"হ্যাঁ, কি দরকার—

—আজ্ঞে বলতে পারেন—নপাড়ায় যাওয়ার কি উপায় আছে এখন?

আজ আর কোন উপায় নেই বাবাজী—উপায় হবে আর কাল বিকেলে। বন্দরের হাট কাল—"কেরায়ার" নৌকা পাওয়া যাবে—কোথায় যেতে হবে—

"কলকাতায়।"

তা এখানে না নেমে খুলনায় গিয়ে মেল ধরলেই হ'ত—

ছেলেটী বলল—শুনলাম গোবরায় নেমে নৌকা ভাড়া পাওয়া যায়—তাই ভাবলাম আর রাতের ধকল না পোহায়ে এক্‌স্‌প্রেসেই চলে যায়—

জগন্নাথ মৃদু মৃদু মাথা নেড়ে বলল—"ভুল শুনেছ বাবাজী! নৌকা পাওয়া যাওয়া মাত্র দু'দিন—বন্দরের হাটের দিন। হাটবার কাল।

জগন্নাথ টিকেট দুখানা হাতে নিয়ে অফিসে ঢুকে পড়ল। ছেলেটিও হতাশ হয়ে মেয়েটীর পাশে গিয়ে বসে পড়ল।

জগন্নাথ টিকেটের নম্বর মিল করে খাতায় লেখে—কিন্তু কাণ থাকে তার বাইরে—

—ওগো দ্যাখো—দ্যাখো—কি ফুল ওগুলো কাঞ্চন না? আনো না তুলে খোঁপায় পরব—

ছেলেটী বিরক্ত হয়ে ওঠে বোধ হয়—"ছেলেমানুষী কর না আর, দেখছ না কাল সন্ধ্যাবেলা অবধি এই গাছতলায় পড়ে থাকতে হবে—সে খেয়াল আছে—

"বেশ তো চাই না ফুল—অভিমান ভরে মেয়েটী চুপ করে বোধ হয়।

উঠতে ইচ্ছে করে না জগন্নাথের। একটা অবসাদ—একটা আচ্ছন্নতা এসে ছেয়ে ফেলেছে তার দেহ মন। চিত্রার বুকে ছোট ঢেউ উঠে আবার ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে—

সেই তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতের পরে—একটি অস্পষ্ট ছবি ভেসে বেড়ায় যেন—কোন চিহ্ন নেই—রূপ পরিগ্রহ করে না—অথচ বেশ বোঝা যায়।

দুরন্ত—চঞ্চল—হাত পা যেন এক মুহূর্তের জন্য স্থির থাকে না। অত চাঞ্চল্য কি ভাল মেয়ে মানুষের। মাটীতে পা ফেলে কি—জলে পা ফেলে—একটু দেখে শুনে ফেলতে হয়।

চলবার—বলবার ধরণ ধারণ দেখলে গা শিউরে ওঠে—স্টীমারের সিঁড়ি, কি বিপজ্জনক—

সহসা হা হা করে জগন্নাথ অফিস ছেড়ে বেরিয়ে এল—দ্যাখো—দ্যাখো— সেই বিপজ্জনক ছবিটিই বাস্তব রূপ ধরেছে জগন্নাথের চোখে—

"—দ্যাখো—দ্যাখো—ওরে হারামজাদী, ডাল ছেড়ে দে—ওরে এক্ষুনি পড়বি ভাঙ্গনের মুখে—চোখের নিমিষে চিত্তিরে গ্রাস করে ফেলবে—লক্ষ্মী মা সরে আয়—"

নবাগতা যাত্রী বধূটী ফুলের লোভ সংবরণ করতে পারেনি। স্বামীর নিষেধ না শুনেই সে ভাঙ্গনের মুখে গিয়ে নিজেই ফুল সংগ্রহ করছে।

ট্রাঙ্কের পরে বসে ছেলেটী অবাক হয়ে যায়।

এক হাত দিয়ে ডাল নুইয়ে ধরে মেয়েটীও তাকায় অবাক হয়ে।

সংসারে এক শ্রেণীর লোক আছে, যাদের চোখের দিকে একটিবার মাত্র তাকালে তাদের একটি মাত্র পদক্ষেপেই মনের উপর নীচ পর্যন্ত দেখে নেওয়া যায়—পরিষ্কার কাসার পাত্রে রাখা জলের মত।

এই অসঙ্গত সম্বোধনে—বরবধূ উভয়েই জগন্নাথের মধ্যে আবিষ্কার করল এক স্নেহপ্রবণ পিতৃরূপ। ভাঙ্গনের মুখে পা বাড়িয়ে এক অপরিচিতা বালিকা জগন্নাথের কঠিন মুখোস খুলে ফেললো—গভীর সান্নিধ্য পেয়ে বিষ্টু ময়রা যা পারেনি।

জগন্নাথকে চিনতে একটুও দেরী হয় না। কিন্তু জগন্নাথের চিনতে বেশ সময় লেগে গেল—

অপরিসীম লজ্জা পায় সে। ধাতস্থ হয়ে—মাথা চুলকায়—অপরাধ স্বীকার করবার ভাষাও হারিয়ে ফেলেছে। দেখুন মানে—ও ভাঙ্গনের মুখ কিনা—মানে একটা বিপদ—এই যদি হঠাৎ পা ফস্কে—"

মেয়েটী মন্থর পায়ে এগিয়ে এল জগন্নাথের সামনে।

জগন্নাথ আতঙ্কিত হয়ে ওঠে মনে। সত্যিই সে কি বলে ফেলেছে—ঝোঁকের মাথায়—এ রকম বলা তো উচিৎ নয়।

মেয়েটীর চোখমুখ দিয়ে যেন একটা চাপা হাসি ফেটে বেরুতে চায়। "বলুন—হারামজাদী বলুন রাক্ষুসী বলুন—সবশেষে কিন্তু মা বলতে হবে—"

মনের সন্দেহ কেটে যায় জগন্নাথের। আবেগ ঝরানো প্রাণখোলা হাসি হাসে। "বলব না—একশ' বার বলব—ওরে আমার কাছে তোর বয়সের সব মেয়েরাই হারামজাদী—অদূরে ট্রাঙ্কের পরে বসে ছেলেটী মুখ টিপে হাসে।

জগন্নাথ ছেলেটীকে উদ্দেশ্য করে বলে—"তা হলে যাওয়া তো আর দেখছি—সেই—" ব্যস্তভাবে সে এদিক ওদিক তাকিয়ে ট্রাঙ্কটাই টেনে তোলে—"চল্ মা চল্—দেরী করিস নে—সেই কখন দুটি মুখে দিয়ে বেরিয়েছিস—আহা-হা-ওগুলো থাক ঐ অফিসের বারান্দায় পরে লোক দিয়ে নিয়ে গেলেই চলবে—তাহলে বাবাজী—

"সে কি আপনার বাড়ীতে—"

সেকথার জবাব দেয় না জগন্নাথ—শুধু এই ট্রাঙ্কটাই নিই—স্টীমারের কাপড় চোপড় ছাড়তে হবে তো—ওবে হারামজাদী তোর ও ফুল আমি পরে পেড়ে দেব—তুই চল্ দিকি এখন—"

লোকে বলে—"মন তো নয়—বন"। কিন্তু বনেরও শেষ আছে। মনের বোধ হয় তাও নেই। স্নেহ, প্রেম, প্রীতি—প্রভৃতি বৃত্তি মনের এক একটি স্রোতের ধারা। সংস্কারেব অভাবে কোন সময়ে হয় তো স্রোতের মুখে কঠিন বাধা জমে ওঠে। কিন্তু কেউ যদি নিপুণ হস্তে এই বাধা সরিয়ে দেয় তবে তার গতি হয়ে ওঠে উদ্দাম। জগন্নাথের অন্তরের স্নেহের গতির বাধা সরিয়ে দিল এক অপরিচিত দম্পতি—একটি মুহূর্তে। সেই উত্তাল গতিমুখে কোথায় ভেসে গেল বন্দরের স্বপ্ন। বানচাল হয়ে গেল—রং বেরং-এর পালতোলা সদাগরী নৌকা—।

"ওকি জগন্নাথ অত ব্যস্ত কেন—বিষ্টু ময়রা বলে—বলি চল্লে কোথায় এই ভর সন্ধ্যেবেলায়—

"আর বল কেন বিষ্টুদা আমার কি দাঁড়াবার জো আছে—যেতে পারছেন না ন'পাড়ায় সুতরাং এসে চাপ্‌লেন আমাব ঘাড়ে—আমার হয়েছে যত জ্বালা—দেখি জেলেপাড়ার দুটী মাছ পাই নাকি? শুধু ভাত হয় তো রুচবে না মেয়েব মুখে—

বিষ্টুর দোকান থেকে জগন্নাথ ডক ছাড়ে—"ও যোগেন একসের মুগের ডাল দিও তো আমি চট্ করে এসে নিয়ে যাবো—হ্যাঁ, ভালো কথা, চ আছে বিষ্টুদা—ভালো চা রাখতে হয় দোকানে। কখন কোন খদ্দের আসে—ডিম কোথায় পাই বল্‌তো? বাবাজী অবার সহুরে লোক কিনা? সন্ধ্যেবেলায় চা চাই আবার—নাঃ, আমার হয়েছে যত জ্বালা—বলতে বলতে জগন্নাথ পা বাড়ায়। বোধ হয় জেলে পাড়ার উদ্দেশ্যে।

জগন্নাথের কোন কথাই বিষ্টু ময়রা কাণ দিয়ে শোনে না। আজও হয় তো শুনলো না—কিংবা শুনলেও বুঝতে পারতো না। যদি চেষ্টা করত—তব বুঝতে পারতো—বন্দরের স্বপ্ন-দেখা সদাগরী নৌকার মাল খালাস করা জগন্নাথ এ নয়। বহুদিনের কোন ঘুমন্ত জগন্নাথ যেন এই মাত্র উঠে এসেছে।

মেয়েটির নাম আরতি—জগন্নাথ ডাকে—"এ আরু, এগুলো তোল্‌তো মা—এক ব্যাটা জেলেও বাড়ী নেই—সব গেছে ন'পাড়ার হাটে—এই মাগুর কটি পেলাম।

আরু অভিযোগ করে—"এ আপনি কি করেছেন—এত জিনিস পত্তর দিয়ে কি হবে—মেয়ে বাপের বাড়ী এসে বুঝি রাক্ষুসীর মত গিলতে?

জগন্নাথ রেগে ওঠে—"শোনো মেয়ের কথার ছিরি—বলি তুই না হয় নাই খেলি কিন্তু বাবাজী সহুরে লোক—এ সব টাট্‌কা জিনিস পাওয়া যায় সহরে? বলতো বাবাজী তুমিই বল—"

বাবাজী সকৌতুকে বলল—আজ্ঞে না—

জগন্নাথ আত্মপ্রসাদের হাসি হাসে—"শুনলি তো—"

"তবে আর কি সোহাগ ধরে না—" জিনিসপত্তরগুলো নিয়ে আরতি ঘরে চলে যায়।

শুনলে তো বাবাজী—

"আপনিই শুনুন—"

—ও চারু—এ্যাই দ্যাখো কি বলে—ও আরু—

ঘর থেকে বেরিয়ে আসে—ডাকছেন?

—হ্যাঁ, তোর জন্য একটা জিনিষ এনেছি—এই কোঁচড়ে বলতো কি?

"কি দেখি?"

জগন্নাথ কোঁচড় খুলে ধরে আরতির চোখের সামনে। মুখে তার কৌতুকের হাসি একগাদা কাঞ্চন ফুল।

আরতি লুফে নেয় "বাঃ, কি সুন্দর—খোঁপায় পরব—"

একদিনের পাতানো পিতৃগৃহ ছাড়তেও আরতির চোখে এক ফোঁটা জল জমে ওঠে। জগন্নাথকে প্রণাম করতে গিয়েও তা লুকোতে পারে না। কিন্তু জগন্নাথের চোখে জল নেই—

কি একটা অস্ফুট আশীর্বাদ করে সে বলে—"ওকি কাঁদছিস কেন হারামজাদী—ভেবেছিস চোখের জল দেখলেই ভুলে যাব আমি—উঁহু—আমার চোখ দিয়ে জল বেরোয় না—শক্ত করে ধর সিঁড়ির বাঁশ—আস্তে আস্তে পা ফেলিস—দেখে শুনে—আমার—চোখে জল নেই—আমি কাঁদি না—ও আমি সইতে পারি—আস্তে আস্তে উঠিস কিন্তু স্টীমারে—বাবাজী হাত ধরে নিয়ে যেও—"

সত্যই কাঁদে না জগন্নাথ। শুধু একটি প্রশ্ন জাগে তার মনে। এই যে একটি দিনের এত কথা—বাপ মেয়ের এত মান-অভিমান, এ তো এমনি আচমকা ভাবে পূর্ণচ্ছেদ পড়বার কথা নয়। তবে কি ভুল? গত একটি দিনে জগন্নাথের নিজের অজ্ঞাতে কখন যে মন একটি অপূর্ব স্নেহ-রসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল তাও—ভুল? স্টীমার ঘাটে সজল চোখে মেয়েকে বিদায় দেওয়া এ শুধু জগন্নাথের একার নয়—আরও অনেক জনের—অনেকদিনের জন্য।

স্টীমার হুইসিল দিয়ে ছেড়ে চলে যায়। রেলিং ধরে সজল চোখে দাঁড়িয়েছিল আরতি—কিন্তু জগন্নাথ দাঁড়াতে পারেনি। অতদূরে—আরতির মুখের দিকে তাকাতে গেলে চোখ জ্বালা করে ওঠে—চোখের জ্যোতি কমে এসেছে—

অফিসেও বসতে পারে না। নিজের বাড়ী চলে আসে। ঘরের মধ্যে এখনও স্নো এসেন্সের গন্ধ ভুর ভুর করছে। খানিকটা পাউডার পড়ে গেছে মেঝেয়। চঞ্চল—দুরন্ত—হাতে পায়ে একটুও স্থিরতা নেই—জগন্নাথ ভাবে।

মাটীর মেঝেয় পা রেখে আলতা পরে গেছে আরতি। তুলির টানে তার ছোট পা দুটির দৈর্ঘ্য প্রস্থ আঁকা হয়ে গেছে। জগন্নাথ এ বিষণ্ণ পদলেখা চেনে। প্রত্যেক গৃহের আনন্দ প্রতিমাই বিদায় বেলায় এমনি করে অতিতুচ্ছ চিহ্ন রেখে যায়।

কিন্তু এও ভুল।

বন্দর গড়ে তোলার স্বপ্নও ভুল। জগন্নাথ যেন স্পষ্ট চোখে দেখতে পায়—তার অন্তরের এক বিস্তীর্ণ জলধারা। সেই স্রোতে হাল্কা হাওয়ায় পাল টানিয়ে এসেছে—ভামিনী। হিসাব নিকাশ করেছে এ জীবনের দেনা পাওনার। তারপর আবার পাল তুলে চলে গেছে ভাসতে—ভাসতে। এসেছে চারু—উত্তাল স্রোতের মুখে খোলামকুচির মত নৌকা ভাসিয়ে, বিশ্রাম নিয়েছে জগন্নাথের জীবন বন্দরে। সেও চলে গেল একদিন—হিসাব নিকাশ না করেই। তার পর শুধু চর জেগে উঠেছে—। সেই চরেরই একটি সূক্ষ্ম জলধারা বেয়ে আজ এল আরতি। নিজের পাওনা গণ্ডা কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করে নিয়ে গেল—বসে থাকল না।

এই জীবনটাই কি এক বন্দর? তাই হবে জগন্নাথ ভাবে। বিশ্বজুড়েই এমনি অসংখ্য বন্দর—আর অসংখ্য পণ্যতরী। আসছে—যাচ্ছে—কেউ কারও জন্য বসে থাকে না যার যতটুকু পাওনা—তা নিয়ে যায়। কারও জন্যে কেউ বসে নেই। আদিকাল থেকে অনন্তকাল ধরে শুধু এই দেওয়া নেওয়ার খেলাই চলছে।

★

রূপ ও গুণ

অমূল্যরতন দাশ

কাকের কর্কশ স্বর শুনি' লাগে ক্লান্তি;
কোকিলের কাকলিতে জাগে কি বা শান্তি;
কাঁঠাল কাঁটায় ভরা অন্তরে সরস,
গোলাপ সবার প্রিয় সুমধুর বাস,
দেখিতে সুশ্রী মাকাল ভিতরেতে ছাই,
রূপ আছে গুণ নাই, হতাদর তাই;

সুরূপ, সুবেশ যদি গুণহীন হয়,
কেহই না চাহে তায় মাকালের প্রায়।
যদ্যপি কুরূপ হয় কেহ গুণবান,
সর্বত্র মিলিবে তার বিপুল সম্মান;
বাহিরের আবরণ মূল্যহীন হায়
অন্তর মধুর যাঁর তাঁরে লোকে চায়।

সুরঙ্গ খোঁড়া হচ্ছে। পরিদর্শক পরীক্ষা করে দেখছেন।

উপরে জাহাজ চলে নীচে চলে নর

প্রভাতকুমার গোস্বামী

বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্য্যন্ত বিশ্বের সাতটী আশ্চর্য্য জিনিসের মধ্যে "টেম্‌স নদীর সুড়ঙ্গ"কে একটী ধরা হয়েছে। আজ বিজ্ঞানের প্রসার এত অসম্ভবরূপে বেড়ে গেছে যে, আজকে টেমস নদীর সুরঙ্গকে আর বিশ্বের একটী আশ্চর্য্য জিনিসের মধ্যে ফেলা চলে না—ওটা যেন একটা স্বাভাবিক ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। "উপরে জাহাজ চলে নীচে চলে নর"—কবি এর থেকে আর কোনও আশ্চর্য্য কল্পনা করতে পারেন নি; আজ কবিতার ঐ লাইনটী ঠিক রেখেও (অর্থাৎ উপরে জাহাজ চলবে আর তার নীচে মানুষ চলবে)-যে সুরঙ্গ নির্ম্মাণ হচ্ছে, তা কোনও নদীর নীচ দিয়ে নয়—সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে।

গ্রেটবৃটেন আর বিচ্ছিন্ন দ্বীপ রইবে না এমন পরিকল্পনা হয়েছে যাতে ইংলণ্ড আর ফ্রান্স সুরঙ্গ পথের দ্বারা যুক্ত হবে—ইংলিশ চ্যানেলের বরাবর রইবে এই সুরঙ্গ। এই সুরঙ্গ পথ নাকি এমন শক্ত আস্তরণে হবে যা আণবিক বোমার ঘায়েও কিছু করা যাবে না।

নেপোলিয়ান ইংলণ্ড আর ফ্রান্সের সংযোগ সাধনের কল্পনা করেছিলেন। সেই থেকে গত ১৫০ বছর ধ'রে বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনিয়াররা সেই কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেবার চেষ্টা করছেন। বর্ত্তমানে ফরাসী ও বৃটীশ ইঞ্জিনিয়াররা ফ্রান্স ও গ্রেটবৃটেনের মধ্যে সংযোগ সাধনের জন্যে সম্পূর্ণ পরিকল্পনা প্রস্তুত ক'রে ফেলেছেন। বৃটীশ পরিকল্পনা আর ফরাসী পরিকল্পনার মধ্যে কিছুটা তফাৎ আছে বটে, তবে সরকারী মহলে অনুমান করা হয়েছে যে পরিকল্পনাটী কার্য্যকরী করতে কমপক্ষে ২০০,০০০,০০০ ডলার প্রয়োজন হবে এবং পরিকল্পনা কার্য্যকরী করতে পাঁচ থেকে আট বৎসর লাগবে।

এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার জন্যে যে অর্থের প্রয়োজন তার অভাব নেই এবং কারিগরও অভাব নেই। তা ছাড়া প্রায় ৫০ বছর আগেই এই ধরণের টানেল

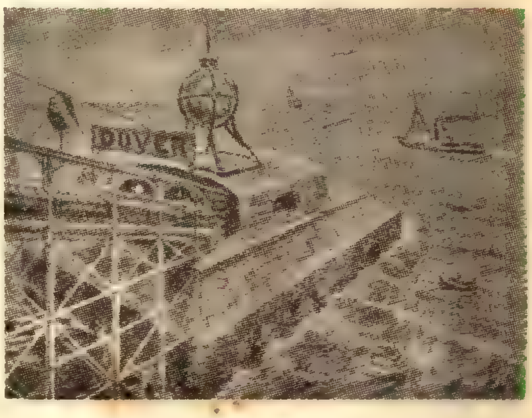

ডোভারে ১৮৮২ সালে যেখান থেকে যে অবস্থায় সুরঙ্গ পথ আরম্ভ করা হয়, তার প্রবেশ পথের চিত্র।

নির্ম্মাণ ব্যবস্থা ইঞ্জিনিয়ারিং দিক থেকে সম্ভাব্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের জনসাধারণও এইরূপ টানেল নির্ম্মাণের পক্ষপাতী। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে এই টানেল নির্ম্মাণে দেরী হচ্ছে।

ইংলণ্ড যখন নৌশক্তিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত ছিল (আজ আমেরিকা সেস্থান অধিকার করেছে) তখন ইংলণ্ডের ক্ষমতায় আসীন রাষ্ট্রনায়করা ভাবতেন যে, এই ধরণের টানেল নির্ম্মিত হ'লে ইউরোপ থেকে সহজে ইংলণ্ড আক্রমণ করা যাবে।

আজ বিমান শক্তির প্রাধান্যের যুগে এই চিন্তা অত নেই। সুতরাং প্রাকৃতিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থা আজ একটা কথার কথা। কোনও দেশ যদি বিমান বলে অসম্ভব শক্তিশালী হয়, তার পক্ষে একটা তথাকথিত বিচ্ছিন্ন দেশে অভিযান চালান কিছু কষ্টকর নয়।

গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্ম্মানীর অভিযাত্রী সেনাদল ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে নি সত্যি, কিন্তু দিনের পর দিন জার্ম্মানীর বিমান বহর ইংলণ্ডের উপরে যে আক্রমণ চালিয়েছে তা রীতিমত ভয়াবহ। সেই বিমান আক্রমণ প্রতিরোধের জন্যে ইংলণ্ডের বিমান বহরকেই রীতিমত সক্রিয় হতে হয়েছে।

তারপর টানেল একটা জিনিস যার মুখ বন্ধ করে দেওয়া এবং একটীমাত্র এই প্রবেশ পথে প্রতিরোধ করা বিশেষ কঠিন ব্যাপার নয়।

বৃটীশ এবং ফরাসী পরিকল্পনা দুটীই বিবেচনা করে দেখা হয়েছে। বৃটীশ পরিকল্পনায় সমুদ্রের ৩৯ ফুট নীচ দিয়ে সুরঙ্গ কাটার কথা বলা হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারদের মতে এটী সম্পূর্ণ করতে পাঁচ বছর লাগবে এবং খরচ পড়বে ৪০,০০০,০০০ ডলার। এর সঙ্গে থাকবে দুটী জোড়া রেল চলাচলের সুরঙ্গ এবং এতে খরচ পড়বে ১৬০,০০০,০০০ ডলার।

ফরাসীরা অবশ্য একটী বৃহৎ সুরঙ্গের পক্ষপাতী। এই একই সুরঙ্গ পথে রেলগাড়ীও চলবে, আবার গাড়ী ঘোড়া মানুষ সবই চলবে। খরচ দু'টী পরিকল্পনাতেই প্রায় এক রকম হবে।

ফ্রান্স-এর গ্রীজ্‌নেজ্‌ অন্তরীপ থেকে ইংলণ্ডএর ডোভার প্রণালীর নিকট ফকর্ষ্টোন পর্য্যন্ত প্রায় ২০ মাইল সুরঙ্গ নির্ম্মাণ করতে হবে। সম্পূর্ণ নিরাপত্তার জন্যে সুরঙ্গকে ১০০ ফিট নীচে করতে হবে। তারপর দুই তীর থেকে ধীরে ধীরে সুরঙ্গ নামিয়ে আনবার জন্যে সুরঙ্গের দৈর্ঘ্য মোট প্রায় ৩০ মাইল লম্বা হবে। আলপস্‌ পর্ব্বতে ১৯০৬ সালে এক সুরঙ্গ নির্ম্মাণ করা হয়। এই সুরঙ্গ নির্ম্মাণের চেয়ে ইংলিশ চ্যানেলের সুরঙ্গ নির্ম্মাণ অনেক সহজ হবে বলে ইঞ্জিনিয়াররা বিশ্বাস করছেন।

ফরাসী ও বৃটীশ ইঞ্জিনিয়াররা পরিকল্পনা সম্পর্কে ঐক্যমত হবার পক্ষে কতকগুলি বাধা রয়েছে। ফরাসী পরিকল্পনা অনুসারে সুরঙ্গের ব্যাস হবে ৬ ফিট এবং বৃটিশদের মতে ১২ ফিট। তা ছাড়া বৃটীশরা বলছে সুরঙ্গ কন্‌ক্রীট করে গড়া হোক, ফরাসীরা বলছে লোহার আস্তরণ ছাড়া চলবে না। লোহার আস্তরণ করতে গেলে আবার নির্ম্মাণের ব্যয় বেড়ে যায় ৬০,০০০,০০০ ডলার।

এই ধরণের সুরঙ্গের কথা ১৮০২ সালে লোকের মাথায় আসে। ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার ম্যাথ্যুফেরা নেপোলিয়ানের কাছে প্রথম এই পরিকল্পনা দাখিল করেন। নেপোলিয়ান বৃটীশ দূতের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করেন। কিন্তু ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধের ফলে এই পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়।

এর ত্রিশ বছর পরে ডান্‌ নামীয় জনৈক বৃটিশ ইঞ্জিনিয়ার আর একটী পরিকল্পনা প্রস্তুত করলেন। কিন্তু এটাও কার্য্যকরী করা সম্ভব হলো না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই ধরণের পরিকল্পনা আবার ইঞ্জিনিয়ারদের মাথায় এলো। এই সময় ইংলণ্ড থেকে ফ্রান্সে জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে অভিযানরত সৈন্যবাহিনীকে একটী পাইপের সাহায্যে তেল সরবরাহ করা হচ্ছিল।

ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার র‍্যানসোন্টে এবং পোলানসু ইংলিশ চ্যানেলের ওপর দিয়ে সেতু নির্ম্মাণের পরিকল্পনা দাখিল করেন, তাঁরা বলেছিলেন এই সেতু তৈরী করতে এক কোটী ডলার লাগবে। এই সময় থোম্‌ ডি গ্যামোণ্ড সুরঙ্গের এক পরিকল্পনা দাখিল করলেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে এই পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন। তৃতীয় নেপো-

লিয়ান তাঁকে খুব উৎসাহ দিয়েছিলেন, সম্ভবতঃ তাঁর কাকা নেপোলিয়ান বোনাপার্ট এই পরিকল্পনা পছন্দ করতেন এইজন্যে। কিন্তু তবুও পরিকল্পনা পরিকল্পনাই রয়ে গেল।

তখনকার দিনে এই সুরঙ্গ পরিকল্পনার একটা বড় সমস্যা ছিল সুরঙ্গে আলো হাওয়ার সমস্যা। গ্যামোণ্ড পরিকল্পনা করেছিলেন এইরূপ—সুরঙ্গ পথ খুঁড়লে পর যে মাটি উঠবে সেই মাটি দিয়ে ১৩টা ছোট দ্বীপ তৈরী করা হবে। সেই দ্বীপগুলিতে থাকবে ভেনটিলেসন চিমনী। কিন্তু বৃটিশ ও ফরাসী নৌ-বিভাগীয় অফিসাররা এতে আপত্তি জানালেন। কারণ চ্যানেলে এইরূপ দ্বীপ গড়লে জাহাজ চলাচলের অসুবিধা ঘটবে।

যতবারই পরিকল্পনা হয়েছে নৌ-বিভাগ থেকে ততবারই বাধা এসেছে। নৌ-বিভাগের মতে এইরূপ সুরঙ্গ খোঁড়া হলে জাহাজ চলাচলের অসুবিধা ঘটবে। কিন্তু শত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও ১৮৭২ সালে গ্যামোণ্ড-এর পরিকল্পনা অনুসারে কাজ আরম্ভ হলো। তিনি Channel Tunnel Company-র প্রতিষ্ঠা করলেন। দশ বছর পরে সুরঙ্গ খোঁড়া আরম্ভ হলো।

চ্যানেলের দুই পাশ থেকে ইংলণ্ডে সেক্সপীয়ার ক্লীফ্ এবং ফ্রান্সের স্যাঙ্গেট' থেকে সুরঙ্গ খোঁড়া চলতে থাকলো। দুইদিকেই প্রায় এক মাইল করে সুরঙ্গ নির্ম্মাণ হয়ে গেছে, এমন সময় হঠাৎ বৃটিশ সেনাধ্যক্ষ জেনারেল ওয়েলেসলী হুকুম দিয়ে কাজ বন্ধ ক'রে দিলেন। তিনি ধ'রে নিলেন যে, সুরঙ্গ হলেই সেই সুরঙ্গ পথে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে বহিঃশত্রুর আক্রমণ চালাবার সুবিধা হবে। তিনি লর্ড পামারষ্টোন-এর পুরাতন কথার প্রতিধ্বনি ক'রে বললেন—"যে দূরত্ব আগে থেকেই এত কম তা' আবার কি ক'রে কমাবার কথা চিন্তা করা যেতে পারে?

বৃটিশ পক্ষের এই জেদাজেদীর ফলে সব কাজ বন্ধ হয়ে গেল। ১৯০৬ সালে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী ক্যাম্পবেল—ব্যানারম্যান একবার কাজ বন্ধ করলেন। ১৯১৪ সালে লর্ড এসকুইন্-আর একবার বন্ধ করলেন এবং ১৯২০ সালে লয়েড জর্জ্জ আবার বাদ সাধলেন এবং ১৯২৪-এ ম্যাকডোনাল্ডও একইভাবে কাজ বন্ধ করলেন।

এবারে দুই পক্ষই রাজী হয়েছে। তাই আশা করা যায় এবারে সুরঙ্গ নির্ম্মাণ হবেই। এই সুরঙ্গ পথ সৃষ্ট হলে ইংলণ্ড থেকে ফ্রান্সে লোকজন ট্রেণে, মোটরে অনায়াসে যাতায়াত করতে পারবে। ভবিষ্যতে কোনও দিন যদি যুদ্ধ বাধে তখন এই সুরঙ্গ যথেষ্ট উপকারে আসবে।

★

অমর্ত্য-প্রেম

– প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

কতোবার, আহা কতোদিন আমি তোমাকে ডেকেছি। দু'হাতে
কত স্বপ্নের রচেছি বাসর। আলপনা আঁকি দেহলি
সাজিয়ে তোমার আসার আশায় প্রহর গুনেছি। তবুও
কোনো দিন তুমি দাওনিকো সাড়া। ফিরিয়ে দিয়েছো কেবলি।

তবুও আশার নেভেনি প্রদীপ। চির-অকম্প্র শিখা
তোমার আসার দিন গোনে আজো। পথ পানে চেয়ে দেখি।
মধু-বসন্তে এখনো হৃদয়ে দোলা লাগে—আহা, এখনো
অমর্ত্য-প্রেমে ব্যাকুল এ-মন বলে, 'তুমি এলে, এলে কি?'

প্রতিবিম্ব

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

[ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ]

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

যদু বলিল, তা বটে। তাহলে—

তাহলে যে-কি সেটাও সহজে নৃপতির মগজে আসিল না। দুজনেই নিরুপায়ের উপায় সত্যশরণের পানে সাগ্রহে চাহিয়া রহিল।

সত্য বলিল, ও'রা এসেছেন মোটে মাস তিনেক। এরই মধ্যে সত্তর—বাহাত্তর জন লোককে ডিস্‌মিস্ ডিস্চার্জ করেছেন। শুনেছি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে লঘু পাপে গুরুদণ্ডেরই বিধান হয়েছে। সেগুলো রিভিউ করতে এসোসিয়েসন নিশ্চয়ই বলতে পারে। সেই সঙ্গে সুরেশ মিত্তিরের কেস্‌টা জুড়ে দিতে পারা যায়।

যদু ও নৃপতি একসঙ্গেই বাহবা দিয়া উঠিল; বলিল, ঠিক, ঠিক। তাহলে সত্য দা, রেজোলিউসনটা গুছিয়ে লিখে ফেলা চাই ত।

লেখ না ভাই, বলিয়া সত্য নৃপতির পানে চাহিল। নৃপতির ইংরাজীতে মুন্সিয়ানা সকলেই স্বীকার করে। নৃপতি হাসিয়া বলিল, কাগজ পেন্সিল দাও—দেখি।

পেন্সিল গোটা দুই বাহির হইল কিন্তু কাগজের অভাব। সত্য-শরণের পকেটে ডায়েরী ছিল, আবার তাহারই একখানা পাতা ছিঁড়িতে হইল। নৃপতি নিষেধ করিতেছিল—ও, কি করছো সত্য দা? ভেলী ডায়েরীর পাতা ছিঁড়তে আছে। খাতা পরীক্ষা হয় যে। ততক্ষণে ছেঁড়া হইয়া গিয়াছে। সত্য বলিল, মনে ছিল না ভাই। সকালেও একখানা পাতা ছিঁড়ে ফেলেছি, আবার—একখানা ছিঁড়লুম।

অনেক সলা পরামর্শ, অনেক বাদানুবাদের পর প্রস্তাব রচিত হইয়া গেল এবং যদু ও নৃপতির নির্বন্ধাতিশয্যে প্রতিবিধান জন্য একটা জোরালো কাউন্সিল অফ য়্যাক্‌সন গঠনের প্রস্তাবও গঠিত হইল।

কাউন্সিল অফ য়্যাক্‌সান রেজোলিউসন খুবই আড়ম্বর ও হুল্লোড়ের সঙ্গে পাশ হইয়া গেল, মুশকিল বাধিল সদস্য বাছাই সম্পর্কে। বোধ করি ইহা কালধর্ম। এক কালে কণ্ঠের বল একমাত্র গুণ বিবেচিত হইত, এখন সেটা অনাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আবার একটা কাল ছিল যখন দৈহিক বল দ্বারাই যোগ্যতার পরিমাপ করা হইত; এক্ষণে কে কতটা কষ্ট করিতে পারিবে, কাহার কতখানি ত্যাগ স্বীকারের শক্তি আছে, এই সকলের বিচার দরকার হয়। এটা আরও দরকার হইয়া পড়িল শচীন সেনের প্রস্তাবে। সে বলিল, পনেরো দিন অপেক্ষা করবো, তারপর সত্যাগ্রহ, তাতেও যদি অবিচারের প্রতি-কার না হয়, প্রায়োপবেশন। আমরা সুরেশ মিত্তিরের দণ্ড চাই, অন্যায় বিচার ও এক তরফা রায়ে যাদের চাকরী গেছে, তাদের পুনর্নিয়োগ চাই। আর যদি সুরেশ মিত্তিরের এখন শাস্তি হয়, তা হলেও তদন্তের দাবী থাকবে কেন প্রথমেই তার শাস্তি হয়নি।

ব্যাপার সঙ্গীন হইয়া উঠিল। সত্যাগ্রহে অনেকের সাহস নাই, প্রায়োপবেশনে দস্তুর মত বিভীষিকা রহিয়াছে। ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের একগুঁয়েমিতে একটা দুটো যতীন দাশ মরেছিল, স্বদেশী গভর্ণ-মেণ্টের শতমারীতেও ভয় নেই। জালিওয়ানওয়ালা বাগ ইংরাজ রোজ রোজ করতো না, স্বাধীনতার পর থেকে ওটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। আধুনিক উদাহরণও চোখের উপর জ্বল জ্বল করছে। কলিকাতা কর্পোরেশনে সর্বাত্মক ধর্মঘট সফল হয়েছিল—সে কথা সবাই স্বীকার করেছিল। আবার সেই পুরো দশদিনের মাইনে জলাঞ্জলি দিয়েই ধর্মঘটীদের কাজে ফিরে যেতে হয়েছে। কাউন্সিল অফ য়্যাক্‌স্যান হলেও অবাস্তু সঙ্গত ন্যায্য জেদ বজায় রাখাও কঠিন হবে, অনেকেই জনান্তিক আলোচনায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছিলেন।

আসল কথাটা বলা উচিত, তা বুঝি; কিন্তু মুশকিল এই যে, সেই আসল কথাটার সঙ্গে আমাদের জাতীয় দৌর্বল্য এমনভাবে জড়াইয়া রহিয়াছে যে, মসীমুখ লেখনীও তাহা লিখিতে লজ্জায় মুখ কালো করিয়া লেখকের পানে অতীব করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। এসোসিয়েসনের কক্ষমধ্যে ও প্রস্তাবে ভীমার্জুননকুল সহদেব সাজিয়া জ্যান্ত দুর্যোধনের আদ্যশ্রাদ্ধ করিতে তৎপরতার বিন্দুমাত্র অভাব না থাকিলেও সাধারণ রঙ্গ মঞ্চে প্রকাশমান হইতে কি-জানি কোথায় যেন অনেকেরই বাধা বোধ হইতেছে। এমন যদি কোন উপায় থাকিত যাহাতে কেবলমাত্র প্রস্তাব পাশ করিয়াই প্রবল প্রতাপ সরকারী পরি-চালকবৃন্দের বিভীষিকা উৎপাদন এবং অভিলাষ পূরণ হইত, তাহা হইলে এক নিকুঞ্জ মজুমদার ছাড়া আর কাহাকে কোন প্রস্তাব আনিতে দেওয়াই অনাবশ্যক বিবেচিত হইতে পারিত। নিকুঞ্জের প্রস্তাবের শেষের দিকে বোলতার উপান্তপ্রদেশের হুলের মত "আর্মড্ অথবা পানআর্মড" বিপ্লবের সম্ভাবনীয়তাও আশঙ্কা করা যাইতেছিল। পরদিনই সত্য নিকুঞ্জকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিল, ভাল করতে গেলে মন্দ হয়। দেখ সত্য দা, তোমাতে আমাতে কথা, বাইরের লোক শুনতে যাচ্ছে না—ও ইংরেজই বল, স্বদেশী প্রভুরাই বল, শক্তের ভক্ত সবাই। আমার প্রস্তাব পাশ হয়নি বটে কিন্তু রেজোলিউসন উপরে পাঠাবার সময়ে আমার প্রস্তাবটার নকল ঐ সঙ্গে পাঠিয়ো। কদর হবে—এসোসিয়েসনের আদর হবে। রামকৃষ্ণদেব সাপকে বলেছিলেন, বাপু-হে, ফোঁস করতেও ভুলে গেলে! লোকে তবে আর মোটা কেঁচো বলে টানা-হেঁচড়া না করবে কেন?

এ-যুক্তি সত্যর মনঃপূত হইল না; বলিল, কিন্তু হিংসা প্রচার না করবার সঙ্কল্পই ভারতবর্ষের। তা ছাড়া, তোমারও বিপদের আশঙ্কা আছে।

নিকুঞ্জ হাসিয়া বলিল, উঁহু, ও রকমের কথা আখছার হচ্ছে, ওতে আমাদের দিকের কারও কোন ভয় নেই।

কিন্তু নিকুঞ্জ, ভারতের সংবিধানের বিরুদ্ধেই শুধু নাই, হিংস্র বিপ্লব ভারতের মর্মবাণীরই বিরুদ্ধে। এ কথা উত্থাপন করাই অনুচিত।

বেশ তো সত্য দা, এক কাজ করো না কেন। আমাকে কনডেম্ করে একটা প্রস্তাব পাশ করিয়ে দাও; না-হয় হিংসাত্মক প্রস্তাব আনার জন্যে আমাকে ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদে ইস্তফা দিতে বলো। সত্যি কথা তোমার বলি শোন। সুপারসিসনের পরেই তোমার লয়্যালটি প্রস্তাব পাশ করলে, তার ফল কি হোলো? অশ্বডিম্ব। একটা ধন্যবাদ দিয়ে চিঠি লিখলে কেউ? এই যে হুড়্মু দুড়্মু করে একে সাসপেন্ড, ওকে ডিসচার্জ, তাকে ডিসমিস করছে, এসোসিয়েসনের অস্তিত্ব যদি ওরা স্বীকার করতো, কোন-না-কোন সূত্রে একটা পরামর্শও কি করতো না? আর আজ আমার কথা রাখো, আমার প্রস্তাবটা "ভোটাধিক্যে পরিত্যক্ত" করেও জানিয়ে দাও, কালই যদি না ডাক পড়ে—এই—এই দেখ—বলিয়া নিকুঞ্জ স্বকীয় কর্ণ মর্দন করিতে লাগিল।

দূর ছাই, এ সব আমি বুঝি নে। আমি ছেড়ে দোব এসোসিয়েসন, বলিয়া সভাপতি বাড়ী চলিয়া গিয়াছিল। নিকুঞ্জর প্রভাব অতিক্রম করিবার মত শক্তি যদু বা নৃপতির ছিল না। সভার সমুদয় বৃত্তান্তই "উপরে" প্রেরিত হইয়াছিল। অচিরে তাহার সুফল—নৃপতির পক্ষে—ফলিয়াছিল।

কিন্তু ফায়ার-ইটারদের রাজী করানো আরও কঠিন। তাহারা প্রায়োপবেশন পণ করিয়া বসিয়া আছে। ভীষ্মের পণ, নড়চড় হইবার নহে।

তাহাদেরই একজন জলদমন্দ্র স্বরে গর্জিয়া উঠিল, মুন্সীর কেসটা আমরা যেন না ভুলি। সে সাধু হোক যাই হোক, বোর্ডকে তার বিচারের ভার না দিয়ে চোরাগোপ্তা মুন্সীকে পুলিশে হ্যান্ডওভার করে দেওয়াটা নাজিসম্ ফ্যাসিসম্ ছাড়া আর কিছুই নয়। যেহেতু বোর্ডের "দাদা" তার ওপর বিরূপ, তদন্ত নয়, চার্জশীট নয়, এক্সপ্ল্যানেসন নেওয়া নয়, একেবারে পুলিশ। আমরা স্ট্রংলি কনডেম্ করবোই। আমাদের ডিম্যান্ড হচ্ছে কেস্ পুলিশ থেকে উইথড্র করে বোর্ডের দ্বারা তদন্ত করাতে হবে; কেন তা না করে পুলিশকে দেওয়া হয়েছে তার কৈফিয়ৎ এসোসিয়েসানকে জানাতে হবে এবং এর দ্বারা বোর্ড এই এসোসিয়েসানকে যে অসম্মান করেছে, তার জন্যে দুঃখ প্রকাশ (জনতা ওই সময়ে চীৎকার করিয়া "ক্ষমা প্রার্থনার" দাবী জানাইল) ও ক্ষমা ভিক্ষা করতে হবে, আর যে "দাদার" মতলবে পুলিশ ডাকা, সেই দাদাকেও এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের নিকট দুঃখ প্রকাশ করতে হবে, নইলে—অকস্মাৎ মুন্সী প্রবেশ করিয়া "হাঁ হাঁ করো কি, করো কি" মধ্যস্থলে আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান। তাহাকে দেখিয়া জনতা যখন জয় হিন্দ, হিপ্ হিপ হুররে, থ্রি চিয়ার্স অথবা কি যে করিবে ভাবিয়া না পাইয়া স্তম্ভিত বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া পড়িয়াছে, তখন সেই মুন্সীই তাহাদিগকে পথ নির্দেশ করিয়া কহিল, আমাকে ওর মধ্যে টেনো না, টেনো না, সুবিধে হবে না, সুবিধে হবে না।

কেন? সুবিধে হবে না কেন? পুলিশে দেবে কেন? বোর্ড কি ম'রে গেছে নাকি যে পুলিশে যেতে হবে? হোয়াট রাইট দে হ্যাভ—বুঝা গেল সদস্যগণ খুবই রুষ্ট হইয়াছেন, নইলে ইংরাজী খই ফুটিবে কেন?

আর একজন বলিল, "ডাউন উইথ পুলিশ।"

মুন্সী বলিল, উঁহু, ভাল কথা নন, ভাল কথা নয়। এ পুলিশ ইংরেজের পুলিশ নয়, আমাদেরই পুলিশ, আমাদের স্বজন। ওতে দোষ নেই।

জনতা আকাশ হইতে পড়িয়া সাশ্চর্যে কহিল, কি বলছো মুন্সী, পুলিশ আসবে আমাদের ইন্টারন্যাল এ্যাডমিনিস্ট্রেসনে ইন্টারফিয়ার করতে? নিশ্চয় তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।

কনডেম্ আমাদের করতেই হবে।—অপর একজন বলিল।

না হে না, করো না, করো না, এই গরীব বেচারী মারা পড়বে। সকাতরে মুন্সী বলিল।

সার্টেনলি নট্। আমরা মেরিট্ অ-মেরিট্ নিয়ে কথা বলছি না ত। আমরা বলছি বোর্ড সস্পেন্ড করতে পারতো, তদন্ত করতে পারতো, দোষ প্রমাণ হ'লে ডিস্‌মিস্ করলেও দোষ ছিল না; তা না করে গোড়াতেই পুলিশ—

গোড়ায় নয়, গোড়ায় নয়, শেষ অঙ্কেই পুলিশ এসেছে; অন্যায় হয় নি, অন্যায় হয় নি। আরে ভাই, আমি বলছি, অন্যায় হয় নি।—মুন্সী হাতজোড় করিয়া ক্রমে ক্রমে পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ কোণে উপবিষ্ট ও দণ্ডায়মান দেবতাবৃন্দকে অভিবাদন করিল।

তাহ'লে খুলে বলো কি হয়েছিল?

সে ত বলবেই। কিন্তু ঐ রেজোলিউসান্-টেজোলিউসান্ যদি কিছু করে থাকো, ছিঁড়ে ফেলে দাও ভাই, আমার নাম গন্ধটি রেখো না। তোমাদের মিটিং ফিটিং খতম্ করো আগে, ধীরে সুস্থে ব'সে সব বলবো তারপরে।—বলিয়া মুন্সী সিগ্রেটের টিন বাহির করিয়া একটা ধরাইল ও অনেকগুলি প্রসারিত হস্তের উদ্দেশে গোটা টিনটা মমতা বর্জনান্তর অগ্রসর করিয়া ধরিল।

যদু তাহাকে একান্তে টানিয়া লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ধরেছিল নাকি?

মুন্সী অত্যন্ত সপ্রতিভ; বলিল, হাতে-হাতে—"লাল হস্তে"।

ইস্।—যদুর মুখমণ্ডলে দুশ্চিন্তার অনেকগুলো রেখা প্রকট হইয়া উঠিল।

মুন্সী বলিল, ভয় নেই; নির্ভয় হও ভাই, নির্ভয় হও।

যদু বলিল, বলো কি? নির্ভয়।

অবশ্য।

ঠিক ত?

ঠিক। যদি তোমরা একটুও গণ্ডগোল না করো।

এই সময় নৃপতি এবং একজন অগ্নিখাদক তাহাদের সঙ্গে যোগ দিল। যদু সংক্ষেপে ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিতে অগ্নিখাদক বলিল, তোমার জন্যে আমরা ফাস্ট অনটু ডেথ্ পর্যন্ত করতে প্রস্তুত।

খবর্দার, খবর্দার! অমূল্য প্রাণ নষ্ট করো না, ধর্মে সইবে না।

তুমি বোধ করি আমাদের পুয়েন্টটা ঠিক বুঝতে পারছো না।

আমরা ইণ্টারফিয়ারেন্স বাই দি পুলিশ কনডেম্ ক'রে কর্তাদের এপোলজি করাবো। দরকার হয়, স্ট্রাইক, সত্যাগ্রহ, শেষে আমরণ প্রায়োপবেশন করবো।

মুন্সী হাসিয়া বলিল, তোমাদের অপারেশন ভালই হবে, কিন্তু ভাই রোগী বাঁচবে না।

তার মানে?

মানে চাকরীটি আমার যাবে। চাকরী গেলে অর্দ্ধেক প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আর বিলকুল পুরো গ্র্যাচুইটিও গো-গণ্-ওয়েণ্ট।

একসঙ্গে অনেকগুলি বন্ধু হামলা করিয়া কহিল, আমরা তোমার হয়ে ফাইট্ করলে তোমার চাকরী যাবে? আর তা' নইলে—

মুন্সী স্মিতহাস্যে বলিল, নইলে যাবে না। সিম্পল যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ।

আশ্চর্য। মুন্সী, আমাদের মনে হচ্ছে তোমাকে ম্যাডনেস্ পেয়ে বসেছে।

ফলেন পরিচীয়তে। পরখ ক'রে দেখই না দাদা।—মুন্সী বেশ গম্ভীর ভাবেই কথাগুলি বলিল। অগত্যা কিছুক্ষণ সকলেই চিন্তিত, বাক্‌রহিত। কেবল একজন বলিল, কিন্তু পুলিশ আনাটাই যে অন্যায়। সেটার বিরুদ্ধে একটা রেজোলিউসান্ ক'রে রাখতেই হবে।

মুন্সী বলিল, অর্থাৎ আমার চাকরীটি খেতেই হবে? ভাল, বন্ধু, ভাল বোঝ, তাই খাও। তিন গণ্ডা ছেলে মেয়ে ভাই বোন মা শাশুড়ী নিয়ে তোমাদের এসোসিয়েসানে এসে আশ্রয় নেবো। দু'টি দু'টি খেতে দিও বন্ধু। আর এই হল ঘরটা দিও খালি ক'রে।—বলিয়া দন্ত বাহির করিয়া হাসিল।

হোয়াট্ ননসেন্স ইউ টক্—

দলের পাণ্ডারা ঐ ব্যক্তিকে থামাইয়া দিল এবং সর্বসম্মতি-ক্রমে ইহাই স্থিরীকৃত হইল যে, যোগীন মুন্সী সম্পর্কে কাহারও চিন্তান্বিত হইবার কোনই হেতু নাই। অতঃপর মুন্সীর কথায় নির্ভর করিয়াই মুন্সীর হিতকামনায় তাহাদের বিরত থাকার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

মুন্সী সবিনয়ে নিবেদন করিল, কেবল বিরত থাকিলেই হইবে না, কিছুদিনের জন্য মুন্সীকে বিস্মৃত হইতে হইবে। তাহা হইলে মুন্সী একদিন ষ্টীমার পার্টি দিবে—আর বাইনাচ ও রেডিয়ো রাধারাণীর জলসা।

তাজ্জব কাণ্ড। কোথায় চাকরী যায়, আর কোথায় নাচ-গানের জলসা! বাসি বিবাহের মত ভাঙ্গা সভা বিচ্ছিন্ন ও খণ্ড খণ্ডভাবে তখনও চলিতেছে, শ্রীরামচন্দ্রের সভায় দুর্মুখসদৃশ এক ব্যক্তি হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া কহিল, মিটিং ডিজলভ্ করবেন না, ট্রান্সপোর্ট ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট, ভাইস্‌প্রেসিডেণ্ট সেক্রেটারী সব আসছেন ভয়ানক এক গ্রেভ ইনজাস্টিসের খবর শুনতে পাবেন। তাঁরা সমুদয় কাগজপত্তর সাক্ষীসাবুদ নিয়ে আসছেন। আমাকে আগে পাঠিয়ে দিলেন, মিটিং প্রোলং করবার জন্যে বলতে। তাঁরা এলেন বলে।

কিন্তু মিটিং ত আমরা শেষ ক'রে ফেলেছি।

তা বললে ত হবে না। ট্রান্সপোর্টের আজকের ব্যাপারে একটা য়্যাকসান্ না নিলে ট্রান্সপোর্ট ইউনিয়ন এসোসিয়েসান থেকে বেরিয়ে যাবে। কমিউনিস্ট সেণ্টার ত হাত ধুয়ে আচমন্ করে বসে আছে, এখুনি তিন হাজার মেম্বারের অমন জোরালো ইউনিয়নকে লুফে নেবে।

নিকুঞ্জ মাথার উপরে একটা হাত ঘুরাইয়া, কীর্তন অঙ্গের মাঝে "হরি বোল্ বল ভাই,হরি বোল্ বল" করার ভঙ্গীতে আধা হিন্দী আধা বাঙ্গলা সিকি ইংরাজীভাষায় হাঁক দিল—ভেইয়ো, এক ত বহুৎ জরুরী কাম আ গিয়া, আপলোকনকে ঔর এক দফে সভায় বসনে হোগা। ট্রান্সপোর্টমে বহুৎ বড়া জুলুম কি বাৎ আভি শুনেগা—ম্যাটার অফ গ্রেট্ আর্জেন্সি। আপনারা বসুন, এসোসিয়েসানের প্রেস্টিজ য়্যাট্ ষ্টেক্; আমাদের এক্সিজটেন্স য়্যাট্ পেরিল। আর একবার আপনাদের বসতে হবে। আমার বিশেষ অনুরোধ, প্লিজ, জেণ্টেলম্যান।

ব্যাপার যত গুরুতর, কঠোর ও মর্মান্তিক হোক, শক্তিমানের বিরুদ্ধে দুর্বলের করিবার কিছুই নাই। মিটিং ডাকিয়া গুল-তুলি করিয়া মুণ্ডমালার দাঁত কপাটি করা অবশ্যই যায়, ফলোদয় হইবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা আছে কি? ঔষধ নাই, তাহা নহে; আছে এবং উৎকৃষ্ট দাওয়াই আছে। নামঃ স্যাংসন। কমিউ-নিস্টরা স্যাংসনের চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িয়াছে; তাহারা সার বুঝিয়াছে, তর্কের চেয়ে লাঠি ভাল; আবেদন নিবেদন, কাকুতি মিনতির চেয়ে বোমা বন্দুকে ভাল ফল পাওয়া যায়।

কিন্তু আজও অধিকাংশের সমর্থন তাহাতে পাওয়া যায় না; আর যায়—না বলিয়াই আজও বঙ্গের শিরে রক্তপতাকা উড়ে নাই। কিন্তু আর বুঝি ঠেকানো যায় না।

তবে এখন অত বড় তর্ক তুলিয়া লাভ নাই। রাত্রিও অনেক হইয়াছিল। পেটে জ্বালা ধরিয়াছে; সে জ্বালা কর্তৃপক্ষের কুকর্মের জ্বালার অপেক্ষা ঊন বা ন্যূন নহে। পরবর্তী মঙ্গল-বারের সন্ধ্যায় পুনরধিবেশনের দিন ধার্য করিয়া সভা শেষ করা হইল।

পথে বদু বলিল, একদিনে, এক খাতায়, এক আঁচড়ে তিন তিনটে মোটর ড্রাইভারকে কনডেম্ ক'রে রাখবার উদ্দেশ্যটা বুঝলে ত?

নিকুঞ্জ কহিল, তা আর জানি নে। ট্রান্সপোর্ট ইউনিয়নই হচ্ছে আমাদের বল; ঐ তিনজনই আমাদের মেন্ সাপোর্টার, ওদের দাগী ক'রে এসোসিয়েসানকে উইক ক'রে দিলে। এ আর বুঝি নে?

বদু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিল, দূর ভোর এসোসিয়েসান! এদের তিনজনকে তাড়িয়ে তিনটে ড্রাইভার—নিজেদের লোক তিন-জনকে ভর্তি করবে। আজ তার ভিৎ প্রতিষ্ঠা হলো। নিকুঞ্জ, ঠিক কি-না?

নিকুঞ্জ ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে মাথার একাংশ চুলকাইতে চুল-কাইতে বলিতে লাগিল, হ্যাঁ, তা হ'তে পারে! সে হয়ত আরও কিছু বলিত, নৃপতি তৎপূর্বেই গর্জিয়া উঠিল, ইয়েস্—হ্যাঁ, ঠিক। তাহ'লে ত মঙ্গলবারের মিটিঙে এসোসিয়েসানের পক্ষ থেকে

একটা জোরদার রেজোলিউসান ক'রে ফেলতে হয়। ডিম্যাণ্ড হবে—এ্যাডভার্স রিমার্কস্ মাস্ট বি উইথড্রন।

আঃ তোর ভাল হোক্, রেজোলিউসন পাস ক'রে ত' সব করবি। তোরা যত বেশী বেশী রেজোলিউসান পাশ করবি, বাথ-রুমের জন্যে টয়লেট পেপার কেনা ওরা তত কমিয়ে দেবে।

তা যা বলেছিস্, মাইরি। কিন্তু কি করা যায় বল্ ত? একটা কিছু না করলে এসোসিয়েসান থাকবে না—ভেঙ্গে যাবে। আর একবার ভাঙ্গলে—

হ্যা স্পেক্টেকুল্যার একটা কিছু করতেই হবে সে ত আমিও জানি, কিন্তু ততঃ কিম্? অল্ রাইট, গুড বাই, বিকেলে আবার মিট্ করা যাবে,—বলিয়া যদু বাঁ দিকের গলিটায় ঢুকিয়া পড়িল।

নির্জন হইবামাত্র নৃপতি বলিল, সত্য-দা, তুমি কিন্তু ভাই একটি কথাও আজ বল নি। আমার ভয় হচ্ছে—

সত্য তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, সত্যি ভাই, ভয়ই হচ্ছে। এই দুর্দিনে এতগুলো লোকের ভাগ্য নিয়ে আমরা ভাল করছি কিম্বা খেলা করছি ভেবে পাচ্ছিনে, তাই ভয় হচ্ছে। বিশেষ করে মুন্সী আমাকে বড্ড কাতর ক'রে ফেলেছে, ভেবে আমি কূল কিনারা পাচ্ছি নে। মনে হচ্ছে এসোসিয়েশনে আমরা ব্যাক্ নম্বার হয়ে পড়ছি।—তাহার ইচ্ছা ছিল নিকুঞ্জর ঘৃণ্য প্রস্তাবটা বলে; কিন্তু বলা হইল না।

নৃপতি বলিল, মুন্সীর কথা শুনলে ত, সে ত আমাদের হাত দিতেই মানা করছে; বলছে হাত দিলে খারাপ হবে, না-হলে সে বেরিয়ে যায়।

সত্য অত্যন্ত করুণস্বরে কহিল, সত্যি কথা বলবো নৃপ? আমাদের উচিত মুন্সীকে রেজিগনেসন দিতে বলা। এসোসিয়েশনকে আমরা যদি মর‍্যাল প্লেনে না তুলতে পারি, তাহ'লে কিসের জোরে লড়বো ভাই? ওর ব্যাপারটা আমরা সব জানিনে; কিন্তু মুন্সী নিজেই বলেছে, ওর হাতে নাতে চুরি ধরা পড়েছে। যদি সোজা পথে চলতে হয়—মুন্সীকে কনডেম্ না ক'রে কি ক'রে পারি ভাই? অথরিটিসদের চ্যালেঞ্জ করতে হ'লে আগে মুন্সীকে এসোসিয়েশন থেকে এক্সপেল্ করতে হয়। না পারলে, চ্যালেঞ্জ করার মর‍্যাল গ্রাউণ্ড নেই।

সে কি ক'রে হবে, সত্য দা, মুন্সীর 'সাপোর্ট' কি রকম ওভারহোয়েলমিং, দেখলে ত?

দেখেছি ভাই দেখেছি, তবু নৃপ, ওকে না তাড়িয়ে উপায় নেই।

নৃপতি বলিল, মুন্সীর কেস্ আমরা একদম ওভ্যারলুক করছি, সত্য দা।

সত্য সহাস্যে কহিল, সে ত ভাবের ঘরে চুরি ভাই। আমরা অন্যায় করি নে, বুক ফুলিয়ে একথা বলবার জোর কি থাকবে ভাই?

নৃপতি যুক্তি খণ্ডন করিতে পারিল না, চুপ করিয়া রহিল। সত্য বলিল ভেবে দেখি দাঁড়া। মিটিংটা বরং একদিন দু'দিন পেছিয়ে দেওয়া যাক্, কি বল?

তাই দ'ও, নৃপতি মানিয়া লইল।

সত্য একটু পরে বলিল, নৃপ, তোর ওপর আমি একটা কঠিন কাজের ভার দোব, ভাই।

কি? মুন্সীকে বলতে হবে?

না, আমিই বলবো তাকে। তুই আমার মেজ-দা'কে বলবি। শুধু বলবি নয়, রেজিগনেশন লিখিয়ে নিতে হবে।—এক মুহূর্ত থামিল; তারপর গলাটা সাফ করিয়া লইয়া বলিল, আগে মেজ-দা, তারপর মুন্সী। মেজ-দা'কে যদি না পারি, অন্য লোককে বলবার অধিকারই থাকবে না আমাদের।

নৃপতি কথাটা খুব ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিল এবং বুঝিয়াছিল বলিয়াই কাঠিন্য যেন তাহাকে পিষ্ট করিয়া ফেলিতেছিল।

সত্য এতক্ষণ বেশ আসিতেছিল। দুর্গতের দুর্গতিমোচন, দুশ্চিন্তাগ্রস্তের দুশ্চিন্তার গ্রন্থি উন্মোচন করিয়া সত্যশরণের সাধের তরণী তর্ তর্ শব্দে বহিয়া চলিতেছিল, অকস্মাৎ বালির চড়ায় ঘ্যাস্ করিয় নৌকা দুলিয়া উঠিয়াই থামিয়া গেল। বাড়ীর সামনে আসিতেই বিকারাক্রান্ত সন্তানের কথা মনে পড়িতেই পা দু'টি ভারি বোধ হইতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ঘরে ঢুকিয়া ঘরের যে চেহারা দেখিল, তাহাতে অন্য কোন লোক হইলে ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িত। সত্য হারিকেনের আলোটা একটু বাড়াইয়া দিয়া স্ত্রীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ছেলের মাথায় আইস্‌ব্যাগ চাপাইয়া করবী অপলক দৃষ্টি ফেলিয়া প্রাণাধিক পুত্রের মুহূর্তে মুহূর্তে ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল মুখের পানে চাহিয়া বসিয়াছিল এবং বুঝিবা তাহার চক্ষু হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রুও ঝরিয়া পড়িতেছিল, সত্যশরণ তাহা দেখিল। অনুশোচনা তাহার যত বড় ও যতই আন্তরিক হোক, আচরণ দেখিয়া কেহই তাহা বিশ্বাস করিবে না। ছেলের এই অবস্থা সে কি সকালে তাহা দেখিয়া যায় নাই? তাহার পর সমস্ত দিন কাটিয়া গিয়াছে, অর্ধরাত্রিও বিগতপ্রায়, এতখানি দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কতটুকু সংবাদ সে রাখিয়াছে? নিজের কাছেই নিজেকে যেন অপরাধী বলিয়া মনে হইল। রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিতে যাইবে, করবী আর্দ্র চক্ষু দুইটি তুলিয়া বলিল, গলিতে উনুনটা ধরতে দিয়ে এসেছিলুম। যদি না নিভে গিয়ে থাকে, পেতলের হাঁড়ীটা বসিয়ে দিয়ে এস না।

করবীর কথা শুনিয়া তাহার অপরাধের বোঝা নিমেষে খালি হইয়া গেল।

একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, হ্যাঁ গো, তোমাদের খাওয়া হয় নি নাকি?

করবী ম্লান মুখে কহিল, উনুনে আগুন দিয়ে চাল ডাল ধুয়ে কাপড় কেচে বেরোচ্ছি, বাবা ভয় পেয়ে ডেকে উঠলেন, "ওমা, ওমা সতু যে কি রকম করছে মা", শুনে সেই যে এসে বসেছি, আর উঠতে পারি নি। জ্বর চার ছিল, হু হু করে উঠতে উঠতে পাঁচও ছাড়িয়ে গেল, আর সে কি হাত পা খেঁচুনী, মনে হলে, মা গো! এখনও বুক ধড়াস ধড়াস করে। হ্যাঁ গা, উনুন নেবেনি ত?

না। ওরা কি না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়লো?—করবী কথার উত্তর দিল না।

ঘরের একটা পাশে তাহাদের ছোট ছেলেটি একখানা কাপড় বিছাইয়া পড়িয়া ঘুমাইতেছে। সত্যশরণ সেদিকে দেখিতে দেখিতে আবার বলিল, ওটা দুপুরবেলা খেতে পেয়েছিল?

করবী আস্তে আস্তে মুখ তুলিয়া অত্যন্ত কাতরকণ্ঠে কহিল, বাবা খাবার টাবার এনে খাইয়েছিলেন।—একটু থামিয়া পুনরায় কহিল, আজ রাঁধতে পারি নি।

মেজ দা'রা খবর নেন নি বোধ হয়!

ও'দের যা গেছে আজ! মেজ বটঠাকুর সেই সেবারের মত মুখ থুবড়ে প'ড়ে গেছলেন, অনেকক্ষণ জ্ঞান হয় নি।

মেজ দা আপিস যান নি?

বোধহয় বেলায় গেছলেন, ঠিক বলতে পারি নে।

সত্য বলিল, কেউ খবর নিতে এদিকে আসেন নি মনে হচ্ছে।

করবী ব্যস্ত হইয়া বলিল, না, না। বিলু, পিলু, মিলু ত সারাদিন মুখ শুকিয়ে এইখানেই ব'সেছিল। দুপুরবেলা ঝি এসে তবে ওদের নিয়ে গেল।

ও'দেরও রান্নাবান্না হয় নি বোধ করি?

করবী বলিল, হ্যাগা, হাঁড়ীর কাছেই চারটে আলু রেখেছিলুম, হাঁড়ীতে ফেলে দিয়েছ ত?

সত্য বলিল, দিয়েছি।—তারপর নিজের মনেই বলিল, হাঁ, মায়ের পেটের ভাই বটে। সারাটা দিন বাচ্ছাটা একমুঠো ভাত পেলে না। বলিহারি দুনিয়া। বলিহারী যাই; বলিহারী যাই।

দেখ, ও'দের দোষ নেই। মেজদি'কে ত জান, কি রকম ভয়-কাতুরে লোক। মেজ বটঠাকুর মাথা ঘুরে পড়া, মেজদি'রও অমনি মিনিটে মিনিটে ফিট্। কতো বেলায় মেজদি'র মা এসে পড়লেন; তারপর বোধ হয় রান্নাবান্না হয়েছিল। হ্যাগা, তুমি আজ এত দেরী করলে যে? সতু সমস্ত দিন তোমায় খুঁজেছে। সারাক্ষণ কেবল অমুক কোথায়, অমুক কোথায় ক'রেছে আর কেঁদেছে। বাবা আমি—দুজনে রাখতে আর পারি নে।

বাবা কখন্ গেলেন?

সন্ধ্যে হ'তেই একখানা রিক্স আনিয়ে দিলুম। রাত্রে চোখে দেখতে পান্ না ত। কোথায় হোঁচট্ টোচট্ খেয়ে পড়বেন, তাই বাড়ী পাঠিয়ে দিলুম। বাড়ীতে একটা ছোঁড়া চাকর ছাড়া আর কেউ নেই ত, তার ভরসায় বাড়ী ফেলে রাখা যায় না ত।

তুমিও সমস্তদিন খাও নি বোধ হচ্ছে?

করবী হাসিয়া বলিল, তুমি খেয়েছিলে? মিছে বলো না, সত্যি বলো ত, খেয়েছিলে?

আমার অভ্যাস হয়ে গেছে।

অভ্যাস বুঝি তোমার একচেটে অধিকার? বাবা খাবার রেখে দিয়েছিলেন ত। সতু যতক্ষণ জেগেছিল, আমার আঁচল ছেড়েছে কি একবারও? ওকে ছেড়ে উঠি কি ক'রে বলো? যেমন ভুল বকুনি, তেমনই মাথা চালাচালি। খেতে কি প্রাণ চায়? তুমি একটু কিছু মুখে দেবে? খাও না, ঐ কুলুঙ্গিতে বাটী চাপা খাবার রয়েছে।

সত্য নিঃশব্দে খাবার আনিয়া করবীকে বলিল, হাঁ করো।

করবী বলিল, তুমি খাও আগে, তারপর—

হাঁ করো—কথা শোন।

করবীর মুখে একটি রসগোল্লা ফেলিয়া দিয়া সত্য নিজে একটা খাইল। আরও দুইটি রহিল, কুলুঙ্গিতে রাখিতে যাইতেছে, করবী বলিল, আবার রাখছো কার জন্যে, খেয়ে ফেলো না। সারাদিন কিছুই জোটেনি, সে ত মুখ দেখেই বুঝেছি।

সত্য হাসিয়া বলিল, মরা পেটে চাপ বেশী দিতে নেই, বেসামাল হয়ে পড়ে। দুটো রইলো, সকালে ভেঙ্গে ভাগ ক'রে ওদের দিও। —জল, কলসী হইতে গড়াইয়া নিজে খাইল, আর এক গ্লাশ আনিয়া করবীকে দিল। তারপর বলিল, আস্ত একটা রসগোল্লা—কত কাল পরে পেটে গেল, বল ত?

করবীর চোখে জল আসিয়া পড়িতেছিল, সামলাইতে অকারণেও সতুর মাথা হইতে বরফের থলিটা তুলিয়া আঁচল দিয়া থলির গায়ের ঘাম মুছিতে লাগিল। সত্য বুঝিল, বলিল, আর বলবো না। হয়েছে, ওটা আমাকে দাও, বরফ ভ'রে নিয়ে আসি। তুমি ওঠো, কাপড় ছেড়ে ওটাকে তুলে খাইয়ে দাও।

করবী উঠিতে উঠিতে বলিল, খোকনের সঙ্গে তোমারও ভাতটা দিয়ে আসি, তুমি খেয়ে নেবে চল; আমি এসে বস্‌ছি, সমস্ত দিন কিছু খাওনি। শরীরের দশা কি হচ্ছে দিন দিন, তা দেখতে পাও কি?

আর তুমি?

সে হবে, বলিয়া করবী চলিয়া গেল।

নিদ্রিত শিশুকে তুলিয়া খাওয়ানো এক দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু করবী হাত ধরিয়া টানিবামাত্র মিতু উঠিয়া দাঁড়াইল।

সত্য বলিল, জেগেই ছিল যেন মনে হচ্ছে।

করবী বলিল, না গো না, খালি পেটে কি ভাল ঘুম হয়? দেখছো না পেটটা কোথায় ঢুকে গেছে। আহা, বাছারে! চল্ বাবা খাবি চল—মিতুকে কোলে তুলিতে গিয়া করবীই টলিয়া পড়িতেছিল, সত্য ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, প্রায় শেষ ক'রে এনেছ, কি বল?

সত্য রাগ করিয়া বলিল, এমন জানলে আমি কক্‌খনো খেতুম না। মিথ্যে ধাপ্পা দিয়ে আমাকে তুমি খাওয়ালে? নিজে এক ঘটি জলও মুখে দাও নি বোধ হচ্ছে।

করবী বলিল, সত্যি বলছি, ধাপ্পা নয় গো, ধাপ্পা নয়। সতুর জন্যে একটা মানত করেছি। কাল সকালে মা'র মন্দিরে পূজো দিয়ে এক জায়গার একটি মাদুলী পাব, বাছার গলায় পরিয়ে দিয়ে তখন খাবো। আজ আমাকে আর খেতে বলো না, লক্ষ্মীটি।

পূজো দেবে? পয়সা কৈ? আমার কাছে ত কিছুই নেই। পাঁচ সিকে পয়সা চাই যে।

সত্য জামার পকেট হাতড়াইয়া বলিল, চোদ্দটা পয়সা আছে। বাবা কি সকালে আসবেন?

আসবেন; কিন্তু পূজোর পয়সা তাঁর ঠেঙে ত আমি নিতে পারবো না। নোব না।

তবে উপায়?—সত্যশরণের মুখে সত্য সত্যই উৎকণ্ঠা ফুটিয়া উঠিল।

করবী বলিল, নেই তার আর কি করবে। ভোরে উঠে মেজদির ঠেংগে নিতে হবে, আর ত উপায় নেই।

সত্য বলিল, তার চেয়ে বাবার কাছে নেওয়া ভাল। মায়ের পেটের ভাই হয়ে যারা এক বাড়ীতে থেকে অবলা অপগণ্ড শিশু খেতে পেলে কি-না সে খোঁজটুকুও করে না, তাদের কাছে হাত পেতো না। মা'র মন্দিরে গিয়ে মা'কে বলো—মা, আমার এই চোদ্দটি পয়সা সম্বল—

করবী তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিল, মা'র মন্দিরে পয়সা লাগবে না। এক ফিন্‌কি বুকের রক্ত মা'র পায়ে আলতা পরিয়ে দোব। পয়সা ঐ মাদুলিটার জন্যে। বড় ভাল মাদুলি। যারা এনেছে, তাদেরই ভাল হয়েছে। মেজদির ঠেংগে কি শুধু হাতে নোব নাকি? আমার সেই মাথার কাঁটাটি আছে না, সেইটি—

তেজারতিও করছেন, তাহ'লে!

করবী কি বলিতে যাইতেছিল, হুড়মুড় দুড়দুড় শব্দে কে দু'তিনজন লোক ঘরে ঢুকিয়া 'ছোড়দি' 'ছোড়দি' রবে ঘর সচকিত করিয়া তুলিল।

বল্লরী! অবাক্ কাণ্ড। বল্লরী করবীর খুড়তুতো বোন, ছোট খুড়োর মেয়ে। ভগ্নী না হইলে করবীর মুখ হইতে—আ মর্ বেঁচে আছিস্—প্রশ্নটা প্রায় বাহির হইয়া পড়িয়াছিল।

চুপ, আস্তে, আস্তে। তুই কোথা থেকে এত রাত্রে?

তোমার বেবীর অসুখ বুঝি? তা শোন, আস্তে আস্তে বলছি। সত্য বাবু স'রে আসুন-না-মশাই? অমন দূরে দাঁড়িয়ে জুল্ জুল্ ক'রে দেখছেন কেন? স'রে আসুন, আপনাকেই আমাদের দরকার।

আমাকে!! কি বলছো—আমাকে!!

আকাশ থেকে পড়বেন না, শুনুন। আপনার সেই 'স্যার'টি কোথায়? তাঁকে দিয়ে আমাদের একটা অভিনন্দন পত্র লিখিয়ে দিতে হবে—

পারবো না।

কেন?

শক্ত লোক, বল্লরী। 'ত্বয়া হৃষিকেশ' কেবল একজনকেই বলতে অভ্যস্ত। কোন মানুষকে 'তুমি সূর্য, তুমি অদিতি; তুমি ব্রহ্মা, তোমাতেই সৃষ্টি; তুমি সুধাংশু, সৌন্দর্য সব তোমাতেই' "স্যার"কে দিয়ে একথা ত লেখানো যাবে না ভাই; অথচ এসব যদি না থাকলো, তবে আর সে কিসের 'রঘুনন্দন'।

সকলেই একসংগে হাসিয়া উঠিল এবং হাসি থামিলে, বল্লরী বলিল, আমাদের জবানিতে লিখবেন। তাঁর ভাষাটি বড় মধুর, সেই জন্যে বলা। তাঁর নাম গন্ধও থাকবে না। কেউ জানবেও না।

যুগ্ম সেকালে মা-মাসীরা যেমন কচি কচি মেয়েদের হয়ে নব-পরিণীত প্রাণপতি প্রাণেশ্বরদের চিঠি লিখিয়ে দিতেন। কেমন? মেয়েটা বুঝতো না, কি লেখা হোল, স্বামী ছোঁড়াটাও ভেবে পেতো না—কি কাণ্ড সে। কিন্তু, ভাই "স্যার"কে দিয়ে তাও পারা যাবে না। তা' কোন্ ভাগ্যবানকে দেবরাজের ইন্দ্রত্ব দান করছো, শুনতে পাই কি?

বলছি, বলছি। এ্যাড্রেস্‌টা বাঙলায় হয়েই ত সর্বনাশ করেছে, ইংরিজিতে হলে আপনার তোষামোদ করতে আসতুম না, আমরা দু' ডজন এ্যাড্রেস্ লিখে ছাপিয়ে প্রেজেণ্টেসন—ডিস্ট্রি-বিউসান ক'রে ফেলতুম।

সত্য হাসিয়া কহিল, সে আর বলতে! ইংরেজী তোমাদের মাদার টাং—মাতৃভাষায় তোমাদের সংগে পেরে উঠবে হেন সাধ্যি কার?

বল্লরী বলিল, দিন, যত পারেন গালাগাল। সত্যি কথা বলতে লজ্জা নেই। যাক্, ওটা পারলেন না, আর একটা কাজ পারবেন?

বাঙলা এ্যাড্রেস্ পড়তে হবে? না ভগ্নি; সেটা পড়ায় তোমারই বড় দাদা, আর এক দফা কম্ম ক'রে ফেলো।

না, না, সে নয়। আমরা বোর্ডের কমিশনারকে এ্যাট হোমে এণ্টারটেন্ করবো। সেদিন বড় গেছেন একটা ভেবার র‍্যালি র‍্যারেঞ্জ করতে পারবেন?

"ধীরে, রজনী ধীরে।" আমাদের কমিশনারকে তোমরা এ্যাট হোম্ দিচ্ছ, ব্যাপারটা কি বল্লরি? বোর্ডের সংগে তোমাদের কি সম্পর্ক?

আছে, আছে, সম্বন্ধ আছে।" পারবেন ত বলুন? খরচ-পত্র সব আমরা দোব।

আশা বড়ই কম, দিদিমণি।

করুন না মশাই, সুবিধে হবে।

সত্যশরণের মুখখানা মুহূর্তের জন্য যেন ঝলমিয়া উঠিল। করবী স্বামীর মুখ দেখিয়া অত্যন্ত বিব্রত বোধ করিল। স্বার্থ ও সুবিধার দোহাই দিয়া এই লোকের কাছে কাজ আদায় করিবার দুর্বুদ্ধি হইতে বোনকে বাঁচাইবার উপায় চিন্তা করিতেছে, বল্লরী পুনরায় কহিল, জানেন ত বোর্ডে দলাদলি গুঁতোগুঁতির বহর। বড় দলের পাণ্ডাদের ভারি রাগ আই-সি-এস্‌দের ওপরে, ভয়ে কিছু করতে পারে না। তাই, নইলে সেই যে ভুভারপ্লো যাই ভাওলেন্স বলে, তা'ও করতো। আমরা ছোট দল, সংখ্যায় ছোট, কিন্তু বুদ্ধিতে নয়। আমাদের সম্বর্ধনাটা বিফলে যাবে না, প্রিপ্রি-সিয়েসান সাপোর্ট এসিওরড। চাকরী প্রোমোশন, প্রেড্ রিভিসন্, পেটিং কত কি!—গ্রেটেস্ট গুড ফর দি গ্রেটেস্ট নাম্বার্স। লোকের ভাল হ'লেই ভাল।

সেটা বুঝতে পারি। কিন্তু এপ্রিসিয়েসানের জন্যে তোমার এত মাথাব্যথা কেন?

মাথা থাকলেই ব্যথা ধরে, সত্য বাবু, চাই কি আপনারও—

করবী আর পারিল না চুপ ক'রিয়া থাকিতে। তাড়াতাড়ি বলিল, তুই আজ যা-না বল্লরী। দেখছিস্ ছেলেটার কি রকম বাড়াবাড়ি অসুখ।

বল্লরী বলিল, সেরে যাবে, ছোড়দি যাবে। আর আমাদের প্ল্যানটি জানানো যদি সফল হয়, তাতে তোমাদের ভালই হবে।

[ক্রমশঃ

পুস্তক ও আলোচনা

মহাভারতের কথা। শ্রীবিশ্বেশ্বর গোস্বামী, এম্-এ, কাব্যতীর্থ প্রণীত। বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদঃ শান্তিপুর, নদীয়া। মূল্য—২॥০ টাকা মাত্র।

মহাভারতের আদিপর্ব হইতে স্বর্গারোহণ পর্ব পর্যন্ত মূল ঘটনাপঞ্জীকে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপযোগী করিয়া সহজ ভাষায় আলোচ্য গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন ডাঃ নলিনীমোহন সান্যাল এবং পরিশিষ্ট লিখিয়া দিয়াছেন ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী। মহাভারতের কথাই ভারতের কথা। মহাভারত হইতেই গীতার উৎপত্তি। মহাভারতের ঋষির মানসচক্ষে যে ভারত-কল্পনা জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল, উত্তরকালে শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রান্ত হইয়া গেলেও সেই ঋষি-কল্পনার বাস্তব-রূপায়ণ কিন্তু কোথাও ব্যর্থতার সূচনা করিল না, বরং রাজনীতি, দর্শন ও জীবন-ধর্মের দিক হইতে তাহা ভারতবাসীকে যুগে যুগে অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত করিল। দুঃখের বিষয় আজকাল ছেলেমেয়েদের মধ্য হইতে মহাভারত বা রামায়ণ পাঠের লিপ্সা প্রায় পুরাপুরিই অন্তর্হিত হইতে চলিয়াছে; ইহা আদৌ ভারতীয় আত্মার সান্ত্বনার কথা নয়। আলোচ্য গ্রন্থখানির মধ্যে বৃহত্তর মহাভারতের সমস্ত বিষয়গুলিই ছাত্রছাত্রীরা সংক্ষিপ্তাকারে পাইবে। আশা করি এই জাতীয় গ্রন্থ পাঠ করিয়া নিজেদের প্রাচীন ঐতিহ্যকে জানিতে তাহারা যত্নবান হইবে।

গানে রামপ্রসাদ। শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায়। প্রাপ্তিস্থানঃ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। মূল্য—এক টাকা মাত্র।

সাধক রামপ্রসাদের শ্রেষ্ঠ পরিচয় তাঁহার গানে। মাতৃসঙ্গীত গাহিয়া একদিন তিনি সমস্ত বঙ্গভূমিকে ভগবৎ-রসমাধুর্যে রসায়িত করিয়া গিয়াছেন। তিনি ছিলেন বাংলার জনপ্রিয় লোক-কবি। কিন্তু ইহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ পরিচয় নয়; তাঁহার পাণ্ডিত্যও ছিল সমধিক। যুগের পর যুগ অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু রামপ্রসাদ আজও তাঁহার স্বস্থানে সমভাবেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, বরং ক্রমে তাঁহার খ্যাতি বাংলার সীমানা অতিক্রম করিয়া সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং তাঁহাকে লইয়া বহু কিংবদন্তীর সৃষ্টি হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থে রামপ্রসাদের সুনির্বাচিত অন্যূন পঞ্চাশখানি গান উদ্ধৃত করিয়া লেখক সাধক ও গীতিকার রামপ্রসাদের জীবন ও সাধনা সম্পর্কে নানা তথ্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। আলোচনা সাহিত্যের দিক হইতে গ্রন্থখানি উপভোগ্য হইয়াছে সন্দেহ নাই।

একরাত্রির ইতিহাস। লেখক শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র কুশারী। শিক্ষক পাবলিশিং হাউস, ৬১, বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১৯ হইতে প্রকাশিত। দামঃ দেড় টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি লেখকের কয়েকটী ছোট গল্পের সমষ্টি। লব্ধপ্রতিষ্ঠ কতকগুলি পত্রিকায় গল্পগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখায় পাকা হাতের ছাপ—একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষের জীবন দোলায়িত হইতেছে। মানুষের জীবন-নাট্যের আলো-ছায়ার বিচিত্র রূপ গল্পগুলিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। লেখকের দৃষ্টিতে একটা বিদ্রূপের হাসি—কিন্তু তিক্ততা সেখানে নাই। কাহিনীগুলির অপ্রত্যাশিত নাটকীয় পরিসমাপ্তি খ্যাতনামা মার্কিন গল্পলেখক ও হেনরির (O. Henry) লেখার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস গল্পগুলি পড়িয়া বাঙালী পাঠক-পাঠিকাগণ প্রচুর আনন্দরসের আস্বাদন পাইবেন।

—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি সমালোচনার জন্য আমাদের হাতে আসিয়াছেঃ

[ক] **ঊর্দ্ধগামী** (উপন্যাস)—শ্রীসুবোধ বসু। গ্রন্থাগারঃ পি-৫৮, ল্যান্স্‌ডাউন রোড্, কলিকাতা। দাম—৩৲ টাকা মাত্র।

[খ] **প্রাত্যহিক** (কাব্যগ্রন্থ)—শ্রীতারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। প্রাপ্তিস্থানঃ কমলা বুক ডিপো, কলিকাতা। দাম—২৲ টাকা মাত্র।

[গ] **চার কলম** (গল্পগ্রন্থ)—মানব বন্দ্যোপাধ্যায়, হিমাদ্রিশেখর বসু, নন্দদুলাল ঘোষ, অসীম ভট্টাচার্য। প্রাপ্তিস্থানঃ ভবানীপুর বুক ব্যুরো, কলিকাতা-২৫। দাম—৩৲ টাকা মাত্র।

[ঘ] **পাখ্‌না** (কাব্যগ্রন্থ)—শ্রীবটকৃষ্ণ দাস। ইউনাইটেড বুক্‌সঃ ৫৪, গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা। দাম—২৲ টাকা মাত্র।

[ঙ] **বিবর্তনে বাঙলী** (নিবন্ধ)—শ্রীঅমিয়মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। শিক্ষাতীর্থ কার্যালয়ঃ ৪০।১, শিকদার বাগান স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম—॥০ আনা মাত্র।

সম্পাদকীয়

বর্ষ-শেষ

১৩৫৯ সাল আজ বিদায়লগ্নে উপস্থিত। পুরা একটি বৎসরের দুঃখসুখের ইতিহাসের পাতায় পাতায় প্রতিমুহূর্তের স্বাক্ষর রাখিয়া আজ সে গৃহ ছাড়িয়া বহির্বাটিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কবিগুরুর ভাষায় তাহার কণ্ঠে সকরুণ বাণী জাগিয়া উঠিয়াছে—

'পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহ ভাই,
সবারে আমি প্রণাম ক'রে যাই।'

বাংলার প্রান্তরসীমা ছাড়াইয়া আজ তাহার চিরকালের ছুটি। দুঃখের অভিঘাতের মধ্যেই তাহার প্রথম আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, দুঃখের তিমির রাত্রীর শেষ প্রহর না ফুরাইতেই আবার তাহার কানে তিরোভাবের বাঁশী বাজিয়া উঠিল।

আমরা আশা করিয়াছিলাম—অন্যান্য বৎসরাপেক্ষা এই বৎসরটিতে আমাদের সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক জীবনের উন্নততর মানের উপর নতুন করিয়া আমরা নবতম সংস্কৃতির বিজয়কেতন উড়াইতে পারিব, কিন্তু সে-আশা আমাদের মুকুলেই ঝরিয়া গিয়াছে। মানুষের মর্যাদাকে আমরা মানবীয় মূল্যে বাড়াইয়া তুলিতে পারি নাই, সমাজ-কল্যাণের পথে জাতিকে উন্নত করিতে পারি নাই, দেশের দারিদ্র্য ও অর্থকষ্ট সেই একই ভাবে রহিয়া গিয়াছে, এমন কি খাদ্যোৎপাদন সম্পর্কেও আমরা দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপে গড়িয়া তুলিতে পারি নাই। ইহারও উপরে আছে জাতির নৈতিক চরিত্র। আমাদের বহুমুখী সমস্যা-ভারাক্রান্ত বাঙালী জীবনে কোনোদিক দিয়াই এই একটি বৎসরে সার্থকতার দুন্দুভিনিনাদ ধ্বনিয়া তুলিতে পারি নাই। স্বাগত বলিয়া যাহাকে শুভ বৈশাখের নতুন প্রভাতে সাদরে আনিয়া আমাদের ঘরে তুলিয়াছিলাম, ব্যর্থতার গ্লানি লইয়া আজ চৈত্রের শেষ লগ্নে তাহাকে কিন্তু হাসিমুখে বিদায় দিতে পারিলাম না। এ দৈন্য আমাদের গোটা সমাজজীবনের দৈন্য, সমগ্র দেশের দৈন্য। কবে আমরা এই দৈন্যমুক্ত হইতে পারিব—তাহা লইয়া আজ প্রশ্ন তুলিয়া লাভ নাই। আজ শুধু এই শপথই গ্রহণ করিব—আমরা উন্নত হইব, জাগ্রত হইব, মানুষ হইব, সর্ব পশুত্বকে আমাদের অন্তরদেবতার ত্রিশূলের ঘায়ে খর্ব করিব, আমরা দেশ ও জাতিকে ফলে শস্যে সহায়ে সম্পদে উন্নত করিব; তবেই আমাদের জীবনে এক-একটি নবীন বর্ষ নবীন আনন্দের হিরণ্ময় দ্যুতি বিকীর্ণ করিয়া আমাদের মন ও বুদ্ধিকে জাগ্রত ও ফলবান করিয়া তুলিবে। ১৩৫৯ সালের বিদায়লগ্নে আজ বর্ষশেষের এই প্রতিশ্রুতিই আমাদের জাতীয়-শপথরূপে উচ্চারিত হউক।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১৯৫৩-৫৪ সালের বাজেট

১৯৫৩-৫৪ সালের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাজেটে রাজ্য সরকারের রাজস্বখাতে আগামী বৎসর মোট ৫ কোটি ১০ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া উল্লেখ করা হয়। উক্ত খাতে ১৯৫৩-৫৪ সালে আয় ধরা হইয়াছে ৩৮,১৫,৮৭,০০০ টাকা এবং ব্যয় হিসাবে ধার্য হইয়াছে ৪৩,২৬,৬৩,০০০ টাকা। নিম্নের ফিরিস্তি হইতে ১৯৫১-৫২ সাল হইতে আলোচ্য বৎসর পর্যন্ত একটি তুলনামূলক হিসাব পাওয়া যাইবে :

[হাজার টাকার হিসাবে]

	১৯৫১-৫২ প্রকৃত হিসাব	১৯৫২-৫৩ মূল বাজেট	১৯৫২-৫৩ সংশোধিত বাজেট	১৯৫৩-৫৪ বাজেট
রাজস্ব খাত—				
আয়—	৩৮,৫৮,৮৪	৩৬,৩৭,০৫	৩৮,২৯,৫১	৩৮,১৫,৮৭
ব্যয়—	৩৭,৩০,৭৫	৪২,০৪,৪১	৪২,১০,৩০	৪৩,২৬,৬৩
রাজস্ব খাতে উদ্বৃত্ত (+) বা ঘাটতি (–)	+১,২৮,০৯	–৫,৬৭,৩৬	–৩,৮০,৭৯	–৫,১০,৭৬

	১৯৫১-৫২ প্রকৃত হিসাব	১৯৫২-৫৩ মূল বাজেট	১৯৫২-৫৩ সংশোধিত বাজেট	১৯৫৩-৫৪ বাজেট
মূলধনী খাত—				
ঋণ খাত, জরুরী ভাণ্ডার ও				
পাবলিক একাউণ্টস্ বাবদ আয়	১,৪৬,০২,৭২	১,০৪,৮৫,০৬	১,৫৪,১১,৭০	১,৬২,১৬,৩০
উক্ত খাতসমূহে ব্যয়—	১,০৬,৫৪,৮৮	১,১১,৯১,৯৪	১,০৮,৬০,০৮	১,৪২,১৭,৫৬
মূলধনী ব্যয়—	১১,২০,৩৫	২০,৬৮,০৪	১৬,৮৯,৯৮	২১,০১,৫৮
রাজস্ব খাতের বাহির ঘাটতি (–)	১,৪২,৫১	—৭৪,৯২	১,৪১,৬৬	—১,০২,৮৪
তহবিল—				
বর্ষারম্ভের তহবিল বাদে মোট				
ফলাফল—	—১৪,৪২	—৬,৪২,২৮	—৫,২৫,৪৫	—৬,১৩,৬০
বর্ষারম্ভের তহবিল—	+৭,৪২,০৫	+২,৬৭,৮১	+৭,২৭,৬০	+২,০২,১৮
বর্ষশেষের তহবিল—	+৭,২৭,৬৩	—৩,৭৪,৪৭	+২,০২,১৮	—৪,১১,৪২

আলোচ্য বৎসরে রাজস্ব খাতের বাহিরে ঘাট্তিব পরিমাণ ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকা বলিয়া অনুমিত হয়। এই ঘাট্তি পূরণের জন্য কোনো নূতন কর ধার্য করা হয় নাই। মুখ্য এবং অর্থমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁহার বাজেট বক্তৃতায় ১৯৫২ সালে এতদ্রাজ্যে খাদ্যশস্য, চিনি, সিমেণ্ট, কাগজ এবং আরও অনেক দ্রব্যের অধিকতর সরবরাহ হইয়াছে বলিয়া মন্তব্য করেন এবং উল্লেখ করেন যে, এতদ্রাজ্যে সরল পন্থায় উচ্চমূল্যজনিত অর্থনীতি যে নিম্ন মূল্যের অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হইয়াছে—উহা তাহারই প্রমাণস্বরূপ। তিনি এই আশা পোষণ করেন যে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষিত সহজ অর্থনৈতিক অবস্থাকে ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হইবেন। অর্থ কমিশনের রিপোর্টের সমালোচনা প্রসঙ্গে ডাঃ রায় বলেন যে, আয়কর আদায়ের ভিত্তিতে মোট সংগৃহীত আয়কর হইতে তাঁহারা ন্যায্য প্রাপ্য অংশ পাইবেন বলিয়া একান্তভাবে আশা করিয়াছিলেন; কিন্তু কমিশনের রিপোর্ট তাঁহাদিগকে অতিমাত্রায় হতাশ করিয়াছে। তাঁহাদের অংশ বৃদ্ধি করার পরিবর্তে তাঁহারা শতকরা যে ১৩।৹ ভাগ পাইতেছিলেন, কমিশন তাহাও হ্রাস করিয়া শতকরা ১১½ ভাগ ধার্য করিয়াছে।—দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে বলেন যে, এই বৎসর আর্থিক অবস্থা পূর্বাপেক্ষা অনেকখানি সরল হইয়া আসিয়াছে। সবে যে বৎসরটি শেষ হইয়াছে, সেই বৎসরেই দ্রব্যাদিমূল্য ক্রেতার অনুকূলে যাইতে থাকে। কিন্তু মূল্যের এই নিম্নগামী অবস্থা উৎপাদনকে ক্ষুণ্ণ করে নাই; উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সেইজন্যই ১৯৫২ সালে বিবিধ অত্যাবশ্যক দ্রব্যের অধিকতর সরবরাহ সম্ভবপর হইয়াছে। অনেকক্ষেত্রে সরকার কণ্ট্রোল তুলিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছেন; আজ বস্ত্র, চিনি ও অন্যান্য অনেক দ্রব্য আরও সস্তা ও সুলভ হইয়াছে এবং উহাতে জনসাধারণ বিশেষ সন্তোষলাভ করিয়াছে।...১৯৪৮-৪৯ সালে মূলধন ব্যয়-সাপেক্ষ কোনো খরচ ছিল না। কিন্তু ১৯৫৩-৫৪ সালে ঐবাবদ ব্যয় ২১ কোটি ২ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে। রাজ্যের অধিবাসী-বর্গের অবস্থার উন্নতির জন্য তাঁহারা যে সকল প্রয়াস করিতেছেন, উক্ত ব্যয়বৃদ্ধি তাহাই প্রতিপন্ন করিতেছে।

মুখ্য ও অর্থমন্ত্রী ডাঃ রায়ের বাজেট বক্তৃতার এই সুনিপুণ প্রকাশভঙ্গী ও তথ্যবিবরক ফিরিস্তি বহুজনকেই আশ্বস্ত করিয়াছে সন্দেহ নাই। পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক অবস্থাকে তিনি সমগ্র ভারতের অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করিয়াছেন এবং এই বলিয়া নিজের অভিমত দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রায় সর্বত্রই শুভলক্ষণ দেখা যাইতেছে; মূল্যমান হ্রাস পাইয়া উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে। শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে যেমন সম্প্রীতি দেখা দিয়াছে, তেমনি কাঁচামালের প্রাচুর্য উৎপাদনের সহায়তা করিয়াছে। কণ্ট্রোলের কড়াকড়িও অনেকাংশে হ্রাস করা হইয়াছে। কিন্তু জনগণের সাধারণ অর্থনৈতিক দিকটি ডাঃ রায় অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পারেন নাই। তিনি যদি একমাত্র এই বিশ্বাসই করিয়া থাকেন যে, তাঁহার প্রকাশিত তথ্যের উপরে নির্ভর করিয়াই জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মান স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, তবে বলিব—জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে তাঁহার যোগাযোগ এতই দূরত্বের যে, তাহাদের সুখ-দুঃখের খবর তিনি কিছুই রাখেন না। সম্প্রতি বস্ত্র প্রভৃতির মূল্য অপেক্ষাকৃত হ্রাস হইলেও জনগণের ক্রয়ক্ষমতা এখনও এমন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়ায় নাই যে, তাঁহাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় অথচ দৈনন্দিন অভাবের উপর এতটুকুও স্বাচ্ছন্দ্যের সৃষ্টি হইতে পারে। ইতিপূর্বে ডাঃ রায় পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত সমাজের সর্ববিধ উন্নতির জন্য যে বিরাট পরিকল্পনা করিয়া দীর্ঘতম ফিরিস্তি জনসাধারণ্যে প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা থিয়োরী হিসাবেই ফাইলে আবদ্ধ হইয়া আছে; মধ্যবিত্ত জনসাধারণের অভাব কিন্তু বিন্দুমাত্রও ঘুচিল না। ইহার একটি বৃহত্তর অংশ জুড়িয়া আছে এই রাজ্যের বেকার সমস্যা এবং তদুপরি উদ্বাস্তু সমস্যা। গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এপর্যন্ত এই উভয়বিধ সমস্যার কিছু একটাও সন্তোষজনক সমাধান হয় নাই। অবশ্য একথা নিশ্চিত যে, দেশ বিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গের উপর যে অত্যধিক চাপ বাড়িয়াছে—

তাহাতে এই রাজ্যের অর্থনৈতিক মানের অবনতি ঘটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিছু কিছু জনহিতকর কার্যেও যে অগ্রসর না হইয়াছেন, এমন নয়। উক্ত কার্যে কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছেন। তবে একথাও ঠিক যে, উন্নয়ন-কার্যের একাধিক পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বহুতর অর্থধ্বংসও করিয়াছেন। অতএব তাঁহাদের সেই কৃতিত্ব শেষ পর্যন্ত আর কীর্তির সঙ্গে দাঁড়াইতে পারে নাই। তথাপি এই কৃতিত্বের অধিকারের দিকটিকে ডাঃ রায় তাঁহার বাজেটের বৃহত্তর অংশেই স্থান দিয়াছেন। তবে একথা নিশ্চিত যে অর্থকমিশনের সুপারিশের ফলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অংশত আয়বৃদ্ধি না ঘটিলে ঘাটতির পরিমাণ আরও অত্যধিক হইত।

আগামী বৎসরের বর্ধিত ১ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা অধিক ব্যয়ের মধ্যে একমাত্র শিক্ষার খাতেই ৬৪ লক্ষ টাকা অধিক ব্যয় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। শিক্ষা সম্পর্কিত এই ঔদার্য নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। এ পর্যন্ত এদিকটি গভর্ণমেন্টের চোখে একেবারেই ঢাকা পড়িয়া ছিল। ফলে দেশের শিক্ষা যেমন বহুমুখী পথে অগ্রসর হইবার সুযোগ পায় নাই, তেমনি শিক্ষকশ্রেণীর সমস্যারও কিছুমাত্র সমাধান হয় নাই। বাজেট আলোচনা কালে বিধান-সভার কক্ষদ্বারের সম্মুখে অগণিত শিক্ষকশ্রেণীর সমবেত দাবীর ঐকাধ্বনি তাহারই অনিবার্য পরিণতি। কিন্তু উক্ত বর্ধিত ৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয়েও শিক্ষকশ্রেণীর যথার্থই যে বিশেষ উপকার হইবে, এরূপ আশা এখনই কিছু একটা করা যায় না।

এখনও যে সমস্ত পরিকল্পনা কার্যতঃ বাস্তবে রূপায়িত হইতে পারে নাই, অত্যধিক ঘাটতির জন্য তাহা শেষ পর্যন্ত একেবারেই চাপা পড়িয়া যায় কি না, ইহাও একটা প্রশ্ন। ঘাটতিদেশ হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের কুখ্যাতি আজকের নতুন নয়। প্রতিবারই তাঁহাকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু এভাবে একটা প্রদেশ কতকাল আত্মস্বাতন্ত্র্যের মধ্যে উন্নয়নকর সর্ববিধ ঐতিহ্য লইয়া টিকিয়া থাকিতে পারে? যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হইলে এইরূপ ঘাটতি একেবারেই বন্ধ হইতে পারে—সেই পরিবেশ এখনও অন্ধকারেই অবলুপ্ত। স্বস্তির বিষয় যে, বাজেটে এই বিপুল ঘাটতি দেখানো হইলেও এবারও জনসাধারণের উপর কোনোরূপ কর ধার্য করিয়া তাহাদের বিপর্যস্ত জীবনকে আরও বিপর্যস্ত করিয়া তোলা হয় নাই।

তিলাইয়া বাঁধ উদ্বোধন

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার প্রথম সমাপ্ত তিলাইয়া বাঁধের উদ্বোধন হয়। তিলাইয়ার দৈর্ঘ্য ১১৪৭ ফুট। উদ্বোধনপ্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরু ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসীগণকে সমবেতভাবে অধিক খাদ্য উৎপাদনে যত্নবান হইতে আহ্বান জানাইয়া বলেন: এই উপত্যকায় এবং অন্যান্য যে সমস্ত স্থানে নদী উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হইতেছে, তথায় নবভারতের সূচনা হইতেছে। ইহা আমাদের ধ্যানের ভারত; ইহার জন্যই লক্ষ লক্ষ অধিবাসী আত্মবলি দিয়াছেন।' এই নদী-পরিকল্পনাকে নবীন ভারত গঠনের ভিত্তিস্বরূপ বলিয়া শ্রীনেহেরু উল্লেখ করিয়াছেন।

এই পরিকল্পনা দেশকে যে ক্রমেই সমৃদ্ধশালী করিয়া তুলিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা সম্পূর্ণ ভাবে রূপায়িত হইলে বৎসরে আনুমানিক ৯৯ হাজার একর জমিতে জলসেচ সম্ভবপর হইবে। পূর্ববঙ্গের বিস্তীর্ণ জলাভূমি ভারতের বহির্ভূত হইয়া যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, দামোদর পরিকল্পনার কাজ সম্পূর্ণ হইলে সেই অবস্থার তো উন্নতি হইবেই, এতদ্ব্যতীত বহুতর কৃষিশিল্পের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হইয়া দেশের বেকার সমস্যা ও দারিদ্র্য অনেকাংশে লোপ পাইবে। জলাধারের এই জল জমিতে সম্পদ উৎপাদনে জনসাধারণকে সাহায্য করিবে। এতদ্ব্যতীত বোকারো বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের কাজ সমাপ্ত হইলে উহাতে শত শত মাইলের জনগণকে শুধু বিদ্যুৎ সরবরাহ করাই সম্ভব হইবে না, জনগণেরও প্রচুর কল্যাণ সাধিত হইবে। এ সম্পর্কে শ্রীনেহেরুর উক্তিটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।—'গ্রামবাসীদিগকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা নদী উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি দিক মাত্র। এখন আর আমাদের কৃষকদিগকে জল সরবরাহের জন্য আকাশের মুখাপেক্ষী হইয়া অসহায়ভাবে প্রার্থনা করিতে হইবে না। প্রকৃতির খেয়াল চিরতরে বন্ধ হইল। বন্যা ও ধ্বংসলীলার জন্য বিখ্যাত দুরন্ত দামোদর নদকে বশে আনা হইতেছে। ভারতবাসী জনকল্যাণের জন্য প্রকৃতিকে পরাভূত করার কাজে অগ্রসর হইতেছে। জনসাধারণকে এখন সুলভে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাইবে। শুধু গৃহ ও রাস্তা আলোকিত করিবার জনাই বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইতেছে না, উপরন্তু কুটীর শিল্প আরম্ভ করাও সম্ভবপর হইবে। শিল্পোন্নয়নের পথে সমস্ত বাধা অপসারিত করিয়া পথ প্রশস্ত করা হইতেছে। ইহাই এই বাঁধ ও বিদ্যুৎ সরবরাহ যন্ত্র নির্মাণের তাৎপর্য।'

প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান সম্পর্কে কমনওয়েলথ পরামর্শ-সম্মেলন

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান সম্পর্কিত কমনওয়েলথ পরামর্শ সভার অধিবেশন হয়। কমনওয়েলথ ভুক্ত সাতটি রাষ্ট্র—বৃটেন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, পাকিস্তান ও ভারতের চল্লিশজন বৈজ্ঞানিক প্রতিনিধি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সিংহলের পর্যবেক্ষকগণ অধিবেশনে যোগদান করিয়া প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত সর্ববিধ ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণার উন্নয়ন সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সভার উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরু। ভাষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, এই সম্মেলনে দেশরক্ষা বৈজ্ঞানিকরা তাঁহাদের দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা তো করিবেনই, কিন্তু তাঁহাদিগকে বিশ্বের এক বৃহত্তর পটভূমিকার কথাও মনে রাখিতে হইবে। যাহাতে বিজ্ঞান শান্তির, গঠনের ও সহযোগিতার কৌশল আয়ত্তের দিকে প্রবাহিত হইতে পারে, তাঁহাদিগকে সেই প্রকার এক আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে হইবে।" —এ সম্পর্কে ভারত সরকারের সম্পূর্ণ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়া শ্রীযুক্ত নেহেরু বলেন: "বিজ্ঞান বিশ্বের শান্তিপূর্ণ প্রগতির জনক, কিন্তু যুদ্ধের জন্য অত্যন্ত তৎপর মধ্যে এই বিজ্ঞান উৎকর্ষের দিকে গিয়াছে। এই সময় অত্যন্ত উত্তে-

জনাপূর্ণ অবস্থায় চিন্তা করিতে হয়, বিজ্ঞানীকেও অত্যন্ত উত্তেজনার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হয়। যে-সকল অবৈজ্ঞানিক সরকার পরিচালিত করেন, তাঁহাদিগকে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কাজ করিতে হয়। তখন বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য সকলপ্রকার আর্থিক বা অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হয়। আজ বিজ্ঞানের সৃষ্টি দুষ্কার্যের প্রতিকারের জন্য বিজ্ঞানের দিকেই পৃথিবী চাহিয়া আছে, অথচ উহার আতঙ্কের সীমা নাই। বিজ্ঞান যাহা গড়িয়াছে, তাহাকে সে ধ্বংস করিয়া দিতে পারে। ইহা এক অদ্ভুত ধাঁধা।

এই ধাঁধা হইতে যতক্ষণ না বিজ্ঞানকে রক্ষা করা যাইতেছে, ততক্ষণ কোনো একটি জাতিরই কল্যাণ নাই। একটা দেশের প্রতিরক্ষা বিজ্ঞানের ঔৎকর্ষ সম্পর্কে ইহাই বুঝায় না যে বাহিরের আক্রমণকেই সে কেবল রক্ষা করিবে বা বিপদকালে উহার যথোচিত ব্যবহারের দ্বারা নিজের দেশের আত্মিক চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া রাখিবে; বরং প্রতিরক্ষা বিজ্ঞানের তবেই সার্থকতা হইবে—যদি সে পারস্পরিক দেশগুলির সঙ্গে ঐক্যের দ্বারা পৃথিবীর স্থায়ী শান্তি ও মহৎ কল্যাণ সাধন করিতে পারে। এ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক ঔৎকর্ষের নিদর্শন শুধু যুদ্ধজাত পরিবেশের মধ্যেই পরিলক্ষিত হইয়াছে, শান্ত পরিবেশে তাহার যথোচিত প্রসার হয় নাই। শান্তি ও কল্যাণের পথে সেই প্রসারের গুরুত্ব সম্পর্কে যদি কমনওয়েল্‌থ পরামর্শ সভার প্রতিনিধিবর্গ স্ব স্ব দেশে ফিরিয়া নিজেদের ষ্টেট্ বা গভর্ণমেণ্টকে সজাগ করিয়া তুলিতে পারেন—তবেই এই জাতীয় সম্মেলনের উদ্দেশ্য সাধু ও প্রয়াস সার্থক হইতে পারিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করিব। সেই প্রয়াসের পথে ভারতের সংযোগের কথা উল্লেখ করিয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু ভারতবাসীর ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন, সন্দেহ নাই।

রেলওয়ে বাজেট

সম্প্রতি লোকসভায় ১৯৫৩-৫৪ সালের রেলওয়ে বাজেট পেশ করিয়া রেলওয়ে ও পরিবহনমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী বলেন: বিগত মে মাসে অনুমান করা গিয়াছিল যে, ১৯৫২-৫৩ সালে ২৩ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে; কিন্তু পরবর্তীকালে হিসাব করিয়া দেখা যায়, ৯ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ পূর্ব অনুমান অপেক্ষা ১৪ কোটি টাকা কম উদ্বৃত্ত হইবে। তিনি এই বলিয়া ঘোষণা করেন যে—আলোচ্য বৎসরে ১২টি নূতন রেলপথ নির্মাণের কাজে হাত দেওয়া হইবে। রেলওয়ের আয় হইতে সাধারণ রাজস্বে ৩৪ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা জমা দেওয়া যাইবে। চলতি বৎসরের সংশোধিত হিসাবে ইহার পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৪ কোটি ১১ লক্ষ টাকা। অনুমোদিত বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকদের দলবদ্ধভাবে ভ্রমণের এবং সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজে নিযুক্ত স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য সুবিধামূল্যে টিকিট দেওয়া হইবে, এবং রেলওয়ে শতবার্ষিকী উপলক্ষে এপ্রিল মাসের প্রথম এক পক্ষকাল তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের যথেচ্ছ ভ্রমণের টিকিট দেওয়া হইবে। প্রসঙ্গত শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী বলেন যে, এই বৎসরের ১লা এপ্রিল হইতে কয়েকটি এক্সপ্রেস ও মেল ট্রেন ব্যতীত সমস্ত ট্রেনে প্রথম শ্রেণী বাতিল করিয়া দেওয়া হইবে এবং অক্টোবর মাসের মধ্যে প্রথমশ্রেণী সম্পূর্ণরূপে বাতিল হইয়া যাইবে। —আলোচ্য বৎসরে উদ্বৃত্তের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার কারণ সম্পর্কে উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, ১২ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা আয় কম হইয়াছে, অথচ পরিকল্পনার ব্যয় ১ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। মোট আয় হ্রাসের মধ্যে যাত্রীভাড়া বাবদ কম আয় হইয়াছে ১০ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা এবং মালের মাশুল বাবদ কম আয় হইয়াছে ১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা।

আগামী বৎসরে বাজেটে মোট আয় অনুমান করা হইয়াছে ২৭২ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা এবং রেলওয়ে পরিচালনার ব্যয় ধরা হইয়াছে ১৯১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। রিজার্ভ ফাণ্ডে দেয় এবং অন্যান্য ব্যয় অনুমিত হইয়াছে ২২৮ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। তাহা হইলে নিট আয় দেখা যায় ৪৪ কোটি টাকা। তন্মধ্য হইতে সাধারণ রাজস্ব তহবিলে দেয় ৩৪ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা বাদ দিয়া আগামী বৎসরের বাজেটে মোট উদ্বৃত্ত দাঁড়ায় ৯ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা।

আয় হ্রাসের একটি বিশেষ কারণ সম্বন্ধে রেলওয়ে ও পরিবহন-মন্ত্রী যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি এই বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যে—যুদ্ধোত্তরকালে মুদ্রাস্ফীতি হেতু যে অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, গত বৎসর হইতে তাহা স্বাভাবিকের দিকে ফিরিয়া আসিতে আরম্ভ করার ফলেই এইরূপ ঘটিয়াছে।—আরও একটি কারণ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তাহা হইতেছে এই যে, ইতিপূর্বে মাইলপ্রতি এক পয়সা করিয়া ভাড়া বাড়াইবার ফলে দূরপথের যাত্রা অনেকের পক্ষেই বন্ধ হইয়াছে। রেলওয়ের আয় হ্রাসের ইহাও একটি বড় কারণ। দেশের অনিশ্চিত অর্থনৈতিক অবস্থার ফলে এইরূপ হওয়া স্বাভাবিক। বাজেট আলোচনায় অবশ্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উৎপাদন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির প্রচুর সম্ভাবনার দিকে ইঙ্গিত করিয়া শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছুটা আশা পোষণ করিয়াছেন, কিন্তু সে আশার ফলপ্রসূতা সম্পর্কে এখনও যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে। রেলওয়ের নানা দুর্নীতি সম্পর্কেও তিনি অবশ্য যথেষ্ট সচেতন; সেই দুর্নীতি রোধ করিতে গভর্ণমেণ্টের অবিলম্বে শক্তি ব্যবহারের প্রয়োজন। অবাধে বিনাটিকিটে রেল ভ্রমণ প্রভৃতি এই দুর্নীতির মধ্যে পড়ে। তাহা আবশ্যিকভাবে বন্ধ করিতে হইবে।

বাজেটে রেলওয়ের নূতন অগ্রগতির যে আভাস স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তাহা অবশ্যই প্রসংশার যোগ্য। নূতন পরিকল্পনার মধ্যে কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে বৈদ্যুতিক ট্রেন চালু করিবার ব্যবস্থা একটি বৃহত্তর ও ব্যয়সাপেক্ষ বিষয়। ব্যয়সাপেক্ষ হইলেও ইহার আকস্মিক প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ইহা চালু হইলে রেল বিভাগের আয়ের দিক স্বভাবতঃই বৃদ্ধি পাইবে। অন্যদিকে রেলওয়ে ইঞ্জিন নির্মাণের উদ্যোগে ভারত যে ক্রমেই অগ্রগতির পথে আগাইয়া যাইবে, তাহা চিত্তরঞ্জন ও টাটার কারখানার কর্মশীলতা হইতেই উপলব্ধি করা যায়। চলতি বৎসরে ২৩৯টি নূতন ইঞ্জিনের প্রয়োজন রেলওয়ে ও পরিবহন মন্ত্রী জানাইয়াছেন যে—উক্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যার মধ্যে চিত্তরঞ্জন কারখানা ৩৬টি ইঞ্জিন সরবরাহ করিবে, এতদ্ব্যতীত এ বৎসরের গোড়ায় টাটার কারখানায় ৩৫টি ইঞ্জিন প্রস্তুত হইয়াছে। প্রয়োজনের তুলনায় ইহা পর্য্যাপ্ত না হইলেও আশার লক্ষণ সন্দেহ

নাই। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সুখ-সুবিধার দিকে অবিলম্বে দৃষ্টি দেওয়া হইবে বলিয়া পূর্বাপর বৎসরে যে ঘোষণা করা হইয়াছিল, অদ্যাবধি তাহা কার্যে পরিণত হয় নাই। তৃতীয় শ্রেণীতে সব চাইতে বেশী ভীড়; এই ভিড় কমাইবার জন্য শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী অবশ্য ট্রেন-সংখ্যা আরও বাড়াইবার ইঙ্গিত করিয়াছেন, কিন্তু তাহা যেমন এখনও পর্যাপ্ত হয় নাই, তেমনি তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের অসুবিধাগুলি এখনও একই পর্যায়ে রহিয়া গিয়াছে। সেদিকে অবিলম্বে দৃষ্টি দেওয়া রেলকর্তৃপক্ষের অবশ্য কর্তব্য। এতদ্ব্যতীত—প্রায়ই যে সমস্ত ট্রেন-দুর্ঘটনা ঘটিতে দেখা যায়, তাহার মূল কারণ অনুসন্ধান করিয়া ইহার প্রতিকার ও জনসাধারণের নিরাপত্তা বিধান করাও রেল কর্তৃপক্ষের কর্তব্য। ট্রেন-দুর্ঘটনাগুলিতেও তাহাদের কম অর্থব্যয় হয় না। এই বিষয়গুলি স্মরণে রাখিয়া নূতন অগ্রগতির পথে পা বাড়াইলে কেন্দ্রীয় সরকারের রেল-বিভাগ আদর্শ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হইবেন, সন্দেহ নাই।

ভারতীয় রেলওয়ে শতবার্ষিকী

মাত্র একশো বৎসর পূর্বের কথা। ১৮৫৩ সালের এপ্রিল মাস। বোম্বাই হইতে থানা পর্যন্ত মাত্র ২২ মাইল পথকে কেন্দ্র করিয়া প্রথম ভারতীয় বাষ্পযান চলিতে আরম্ভ করে। ভারতে রেলপথের ইহাই প্রথম প্রতিষ্ঠা। সেদিনের সেই ২২ মাইলের সামান্য পথ কালক্রমে আজ ৩৩ হাজার মাইল দীর্ঘ রেলপথে পরিণত হইয়াছে। ইহা স্বভাবতঃই আনন্দ, বিস্ময় এবং আশার কথা।

ভারতীয় রেলওয়ের এই শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে গত ৭ই মার্চ দিল্লীতে একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধনের দ্বারা শতবার্ষিকী উৎসবের সূচনা হয়।

কৃষিশিল্পের উৎকর্ষ এবং ব্যবসাবাণিজ্যের সম্প্রসারিতার দিক দিয়া বৃটিশ সরকার তাঁহার নিজের স্বার্থের জন্যই একদা এদেশে পরীক্ষামূলকভাবে রেলওয়ে প্রবর্ত্তনে উদ্যোগী হন। সেই উদ্যোগেই এদেশে প্রথম গঠিত হয় ইস্ট-ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানী। ১৮৫৯ সালের মধ্যে বেসরকারী বৃটিশ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ৮টি রেলওয়ে কোম্পানী গঠিত হয়। বৃটিশ সরকার মূলধনের উপর নির্দিষ্ট হারে মুনাফা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। ১৮৪৯ হইতে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত ভারতে রেলপথ সম্প্রসারণের প্রথম পর্যায় বলা যাইতে পারে। এই সময়ে সরকারী প্রতিশ্রুতির আশ্রয়ে থাকিয়া রেল কোম্পানীসমূহ প্রধান ট্রাঙ্ক লাইনগুলি নির্মাণে উদ্যোগী হন। সরকার শতকরা ৫ টাকা হারে মুনাফা এবং বিনামূল্যে জমির প্রতিশ্রুতি দান করেন। কিন্তু লোকসান হওয়ায় সরকারী নীতির পরিবর্তন করিতে হয়। ১৮৭৪ সালে একটি রেলওয়ে পরিচালনসংস্থা গঠিত হয় এবং ১৯05 সালে গঠিত হয় রেলওয়ে বোর্ড। ইহার পর রেলওয়েতে মুনাফা অর্জন সুরু হয়। কিন্তু সম্প্রসারণ তখন অত্যন্ত মন্থরগতিতে চলিতেছিল। ১৯০০ হইতে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত মাত্র ১৫ হাজার মাইল অতিরিক্ত রেলপথ নির্মিত হইয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় রেলপথ সরকার-পরিচালনাধীনে আনয়নের দাবী উত্থাপিত হয়। ১৯২০ সালে অকওয়ার্থ কমিটি রেল-বাজেটকে সাধারণ বাজেট হইতে পৃথক করার সুপারিশ করেন। ১৯২৯ সালের মধ্যে পাঁচটি প্রধান রেলপথ সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে চলিয়া আসে। ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল ব্রহ্মদেশের রেল ব্যবস্থা ভারতীয় রেল ব্যবস্থা হইতে বিচ্ছিন্ন হয়।—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারতীয় রেলপথের উপর যুদ্ধের চাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়; যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সহায়তার জন্য ইঞ্জিন, ওয়াগন, রেল প্রভৃতির সংস্থানের ভার পড়ে।—যুদ্ধের অবসান এবং ভারতের স্বাধীনতালাভের পর ভারতীয় রেলপথসমূহ পুনর্গঠনের বিরাট দায়িত্বের সম্মুখীন হয়। মাল ও যাত্রী চলাচল প্রায় আড়াইগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বাধীনভারতে রেল পরিচালন ব্যবস্থায় গুরুতর সমস্যা দেখা দেয়। স্বাধীনতা লাভের পর রেলওয়েসমূহের পুনর্বিন্যাস আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। দেশের ২১টি রেলপথকে ৬টি আঞ্চলিক বিভাগে বিন্যস্ত করা হইয়াছে। পুনর্বিন্যস্ত রেলওয়েসমূহের মধ্যে প্রথমে ১৯৫১ সালের ১৪ই এপ্রিল তারিখে সাদার্ণ রেলওয়ে গঠিত হয়, এবং উক্ত সালেরই ৫ই নভেম্বর তারিখে সেণ্ট্রাল ও ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে গঠিত হয়। তৎপর ১৯৫২ সালের ১৪ই এপ্রিল নর্দার্ন, নর্থ-ইস্টার্ন ও ইস্টার্ন রেলওয়ে গঠিত হয়। পুনর্বিন্যস্ত রেলওয়েসমূহের মধ্যে সাদার্ণ রেলওয়ে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, ইহার দৈর্ঘ্য ৬০১৭ মাইল।

শুধু ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক হইতেই নয়, সভ্যতা এবং সংস্কৃতি প্রসারের দিক হইতেও রেলওয়ের অত্যাবশ্যকতা গুরুত্বভাবেই রহিয়াছে। পূর্বে একমাত্র গঙ্গানদী এবং শেরশাহর সড়কই ছিল এই সংস্কৃতি প্রসারের একমাত্র বাহন। রেলওয়ে প্রচলনের ফলে পৃথিবী আজ মানুষের কাছে ছোট ও সহজ হইয়াছে। এই সহজতার পথেই বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সংযোগ ও সাজাত্য লাভ অনায়াসলব্ধ হইয়াছে। আগামী এপ্রিল ভারতীয় রেলওয়ের শত বার্ষিকীর পরিপূর্তি মাস। তাই দিল্লীতে শত-বার্ষিকী উৎসবের অনুষ্ঠানটি নানাদিক দিয়াই চিত্তাকর্ষক, চমকপ্রদ ও ইতিহাসসিদ্ধ হইয়াছে।

ভারতীয় সাহিত্যিক সঙ্ঘ

ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারতীয় সাহিত্যিক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। যে অবস্থায় আজ ভারত-বর্ষে কার্য সমাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে প্রদেশগত ভাবে সাংস্কৃতিক চিন্তার ক্ষেত্র একেবারেই সীমাবদ্ধ। ভারত-সংহের একতন্ত্রে আজ একটিমাত্রই ঐক্যবিধায়ক সুর অনুরণিত হইয়া ওঠা বাঞ্ছনীয়। প্রদেশগত বৈশিষ্ট্য তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইতে পারে না। এই ঐক্যবোধ হইতেই ভারতীয় চিন্তানায়কদের এককেন্দ্রীক হওয়া প্রয়োজন। ভারতীয় সাহিত্যিক সঙ্ঘ সেই ঐক্যব্রতে ব্রতী হওয়ায় তাঁহারা দেশের ধন্যবাদভাজন হইবেন সন্দেহ নাই। এই নবতম কার্যের উদ্যোক্তা সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার রায় চৌধুরীর উদ্যম প্রশংসনীয়। ইতিমধ্যেই এই সঙ্ঘ প্রায় পাঁচ হাজারের উপর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগার এবং একহাজারের উপর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করিয়াছেন এবং ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় রচিত পঞ্চাশাধিক সুললিত রচনার বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন ভাবের সংযোগ রক্ষা

করিয়া চলিতে পারিলে অদূর ভবিষ্যতে এই সঙ্ঘ যে বিরাট মহীরুহ রূপে ভারতীয় সমাজসংস্থার বৃহত্তর কার্যের প্রতিভূ হইয়া শুধু ভারতবর্ষেই নয়, ভারতের বাহিরেও সাংস্কৃতিক অভিযান চালাইতে সক্ষম হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আশা করি, প্রতিটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানই এই সঙ্ঘে যোগদান করিয়া নতুন আলোকে ভারতীয় সংস্কৃতিকে উজ্জীবিত করিয়া তুলিতে অগ্রসর হইবেন।

ভারত সরকারের ১৯৫৩-৫৪ সালের বাজেট

ভারত সরকারের ১৯৫৩-৫৪ সালের বাজেটে ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা ঘাট্‌তি হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। রাজস্ব খাতের আনুমানিক আয় ধরা হইয়াছে ৪৩৭ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা এবং আনুমানিক ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হইয়াছে ৪০৮ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা। অর্থমন্ত্রী শ্রী সি ডি দেশমুখ জানান যে, আগামী বৎসর প্রধানতঃ উন্নয়নমূলক কার্যের জন্যই অধিক অর্থ ব্যয় হইবে। আলোচ্য বৎসরে মূলধনী বাজেটে মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ ৭৭ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে। রাজ্যসমূহকে ১৩১ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হইবে। অর্থমন্ত্রী শ্রীযুক্ত দেশমুখ ঘোষণা করেন যে, করধার্যযোগ্য ন্যূনতম আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ব্যক্তিগত আয়ের ক্ষেত্রে ৪,২০০, টাকা এবং হিন্দু যৌথ পরিবারের আয়ের ক্ষেত্রে ৮,৪০০্ টাকা নির্দিষ্ট করা হইবে। ইহাদ্বারা আয়কর সম্পর্কে কিছুটা সুবিধা দেওয়া হইবে। এতদ্ব্যতীত করের হার রদ্‌বদল সম্পর্কে তিনি বলেন—চটের উপর রপ্তানী শুল্ক টন প্রতি ১৭৫্ টাকা হইতে হ্রাস করিয়া ৮০্ টাকা হারে ধার্য হইবে। সুপারীর উপর আমদানী শুল্ক পাউণ্ড প্রতি দুই আনা বৃদ্ধি পাইবে। প্রসাধন দ্রব্য, কয়েক প্রকার বস্ত্র, মোটরগাড়ী, ঘোড়া এবং মুক্তার উপর আমদানী শুল্ক বর্ধিত হইবে। অপরপক্ষে পেনিসিলিন, এণ্টিবায়টিক্স এবং শিশুদের খাদ্যসামগ্রীর উপর আমদানী শুল্ক হ্রাস পাইবে। পার্শ্বেল, পুস্তকের প্যাকেট, রেজিষ্ট্রেশন এবং ইন্‌সিওর করা খামের উপর ডাকমাশুল বৃদ্ধি করা হইবে বলিয়া তিনি ঘোষণা করেন। পার্শ্বেল মাশুল ৪০ তোলার উপর ৬ আনা হইতে ৮ আনা; রেজিষ্ট্রেশন মাশুল সাড়ে ৪ আনা হইতে ৬ আনা; ইন্‌সিওর করা খামের মাশুল প্রথম ১০০্ টাকার জন্য ৪ আনা হইতে ৬ আনা এবং অতিরিক্ত প্রতি ১০০্ টাকায় ২ আনা হইতে ৩ আনায় বৃদ্ধি করা হইবে।

অর্থবিল পেশ করিয়া করবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্ত দেশমুখ যাহা বলেন, তাহার অর্থ হইতেছে এই যে, আগামী বৎসর কর বৃদ্ধির ফলে দেড়কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় হইবে এবং ইহার ফলে ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি মিটিয়া গিয়া ৪৫ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে। অর্থমন্ত্রী দেখাইয়াছেন যে অর্থকমিশনের সুপারিশ অনুসারে রাজ্য সরকারগুলিকে অধিক পরিমাণে অর্থ দিতে হইয়াছে, এতদ্ব্যতীত সস্তাদরে খাদ্যশস্য সরবরাহ বাবাদও অধিক ব্যয় করিতে হইয়াছে, ফলে এই ঘাট্‌তি অনিবার্যরূপে দেখা দিয়াছে। তবে ইহা দ্বারা আগামী বৎসরে ভারত-সরকারের আর্থিক অবস্থার অবনতির বিশেষ কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না।

নানাবিধ উন্নয়ন পরিকল্পনা বাবদ ভারত-সরকার যে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, তাহার ফলে আপাতত ঘাট্‌তি অনিবার্য হইলেও অদূর ভবিষ্যতে উক্ত পরিকল্পনাসমূহ কার্যকরী হইলে এই অর্থব্যয়ের সার্থকতা অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা দিবে। এতদ্ব্যতীত আয়কর অনুসন্ধান কমিটি গঠন করিয়া ভারত সরকার বিশেষ সুরুচির পরিচয় দিয়াছেন, সন্দেহ নাই। ১৯২৪ সালের Taxation Inquiry Committee-র পর এই উদ্যম ইহাই প্রথম। ডাঃ জন মাথাইয়ের নেতৃত্বে এই কমিটি গঠিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা ভারত সরকারের কর-অনুসন্ধান কার্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হইবে নিঃসন্দেহ।

আলোচ্য বৎসরে ৩৬০০্ টাকা আয়কর ধার্য্যের উপযোগী নিম্নতম আয়। অর্থমন্ত্রী ইহাকে ৪২০০্ টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করিয়াছেন। সাধারণ আয়ের উপর কর ধার্য না হওয়ায় জনসাধারণের উপকার হইবে সন্দেহ নাই। প্রসাধন দ্রব্য, মোটরগাড়ী প্রভৃতি আমদানীর উপর বর্ধিত হারে করবৃদ্ধি করার ব্যবস্থা করিয়া ভারতসরকার যে সুবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অনেকাংশেই ম্লান হইয়া গিয়াছে সুপারী ও এক শ্রেণীর কাপড়ের উপর কর ধার্য করিয়া। এখনও কাপড় প্রভৃতির যে মূল্য ধার্য রহিয়াছে, তাহা জনসাধারণের আদৌ ক্রয়োপযোগী নয়; ইহার পরও যদি কাপড়ের উপর কর ধার্য হয়, তবে শুধু অন্যায় নয়, ভারতসরকার পরোক্ষে জনসাধারণের দিক হইতে অপরাধই করিবেন। অবশ্য—এই কর কোন্ শ্রেণীর কাপড়ের উপর ধার্য হইবে—তাহা অর্থমন্ত্রী খুলিয়া কিছু বলেন নাই। ইহা ব্যতীতও কয়লা, সিমেণ্ট, লোহা, ইস্পাত প্রভৃতি শিল্পজ দ্রব্যগুলি রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত মধ্যবিত্তের বেকার সমস্যা, উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন প্রভৃতি বৃহত্তর বিষয়গুলি রহিয়াছে। এই সমস্যা মিটাইতে হইলে ভারতসরকারকে নানাবিধ ছোটবড় শিল্প ও কারিগরী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে। তজ্জন্যও ব্যয়ের পরিমাণ কম নয়। দেশের খাদ্যসমস্যাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে হইলে উৎপাদন বৃদ্ধির দিকেও ভারতসরকারকে অধিকতর ক্রিয়াশীল হইতে হইবে। এই সব দিক দিয়া যে অর্থব্যয় হইবে, তাহাও ভারতসরকারের নিজেকেই বহন করিতে হইবে। তজ্জন্য কর ধার্য করিয়া জনসাধারণকে বিপর্যস্ত করা উচিত হইবে না।

★

শোক-সংবাদ

জোসেফ স্তালিন

এ-যুগের দুইজন বিস্ময়কর মহান নেতার তিরোভাব আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম। একজন মহাত্মা গান্ধী, আর একজন জোসেফ স্তালিন। দুইজনেই বিশ্বশান্তির উদ্গাতা, দুইজনেই জনগণের ভরসাস্থল ও প্রতিভূ। পৃথিবীব্যাপী অগণিত গণচিত্তে এমনভাবে আর কোনো মানুষ সাড়া জাগাইতে পারে নাই। মানুষের অপমান, মানুষের ক্ষুধাতৃষ্ণা, মানুষের শোষণ-শাসন, নিত্য হাহাকার আর দারিদ্র্য—ইহারই বিরুদ্ধে সংগ্রামের হাতিয়ার লইয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইলেন দুইজন শক্তিশালী পুরুষ: মহাত্মা গান্ধী আর জোসেফ স্তালিন। শান্তির উদ্গাতা হইলেও দুইজনের নীতিগত পার্থক্যটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। গান্ধীজী চাহিয়াছিলেন ত্যাগের পথে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়তা, কিন্তু সেই নিষ্ক্রিয়তা অর্থ নির্বীর্যতা নয়। আর জোসেফ স্তালিন চাহিয়াছিলেন সক্রিয়ভাবে শান্তির প্রতিষ্ঠা, অর্থাৎ শান্তির জন্য তিনি যুদ্ধ করিতেও প্রস্তুত ছিলেন। শান্তির একই পথিকৃৎ হইয়াও দুইজনের জীবন-দর্শন ছিল স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্য দেশগত স্বাতন্ত্র্যেরই প্রকাশ, সন্দেহ নাই।

জোসেফ স্তালিন সম্পর্কে পণ্ডিত সুন্দরলাল বলেন: আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে যে বাণীটি সান্ত্বনার রূপ লইয়া স্বতোৎসারিত হইতেছে, তাহা হইল—স্তালিন অমর, তাঁহার মৃত্যু নাই। দুনিয়ার শোষিত মানুষের মুক্তির যে সাধনা তিনি আজীবন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পথ-নির্দেশের মধ্যেই স্তালিন চিরজীবী থাকিবেন।'

গত ৫ই মার্চ্চ অকস্মাৎ সন্ন্যাসরোগে এই সাধকজীবনের দীপশিখাটি নির্বাপিত হয়। তাঁহার মৃত্যুসংবাদ সমগ্র মানবজাতির কাছে এক নিদারুণ আঘাতের ন্যায়ই নামিয়া আসে। পূর্ণ মুক্তি ও শান্তির পথে মানুষের অগ্রগতিকে আলোকোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল জোসেফ স্তালিনের নেতৃত্ব। ইস্পাতের মতই তিনি ছিলেন শক্তিমান ও ক্ষুরধার। কোনো অবস্থাতেই কোনো বিরোধী পক্ষ তাঁহাকে অবদমিত করিতে পারে নাই। গত মহাযুদ্ধে মস্তিষ্কের যে তীক্ষ্ণতা দ্বারা তিনি দুর্ধর্ষ জার্মান-শক্তিকে পরাভূত করিয়াছিলেন, সেই তীক্ষ্ণতা দ্বারাই কোরিয়া-যুদ্ধকে তিনি বন্ধ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। আজ এমন একটি মুহূর্তে জোসেফ স্তালিনের জীবনদীপ নির্বাপিত হইল—যখন তিনি তাঁহার আপন দেশে সাম্যবাদী নির্মাণকার্যে এবং বিশ্বের জনগণের শান্তি ও স্বাধীনতা আনয়নের কার্যে বিশেষভাবে নিমগ্ন ছিলেন। মানব-ইতিহাসের এই মহাপরিবর্তনকালে তাঁহার মৃত্যুতে যে ক্ষতি হইল, তাহা পূর্ণ হইবার নয়।

স্তালিনের পিতৃদত্ত নাম—জোসেফ ভিসারিয়ান যুগাশভিলি। তাঁহার পিতা ছিলেন একজন চর্মকার এবং মাতা কৃষকদুহিতা। ১৮৭৯ সালের ২১শে ডিসেম্বর জর্জিয়ার গোরী সহরে এই দরিদ্র পিতামাতার গৃহে স্তালিন জন্মগ্রহণ করেন। গোরীর একটি ক্ষুদ্র বিদ্যায়তনেই তাঁহার হাতেখড়ি হয়, পরে জর্জিয়ার রাজধানী টিফ্‌লিসে আসিয়া পাদ্রীর পাঠ গ্রহণ করার নিমিত্ত তিনি টিফ্‌লিস সেমিনারীতে ভর্তি হন। বৎসরখানেক এখানে অধ্যয়নের পর 'রাজনৈতিক দিক হইতে অবাঞ্ছিত' বলিয়া স্তালিনকে সেমিনারী হইতে বহিষ্কৃত করা হয় এবং তিনি একজন তরুণ মার্ক্সবাদী বিপ্লবী বলিয়া জারের পুলিশবাহিনীর বিবনজরে পড়েন। সেমিনারী হইতে বহিষ্কারের পরে স্তালিন সারাক্ষণের কর্মীরূপে শ্রমিক আন্দোলনে যোগদান করেন। পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিবার জন্য নিজেকে তিনি নানা স্থানে নানা নামে পরিচয় দেন, যথা— ডেভিড্, কোবা, আইভ্যান্‌নোভিচ্, স্তালিন প্রভৃতি। শেষ পর্যন্ত তাঁহার শেষের নামটিই অক্ষয় হইয়া থাকে।

জোসেফ স্তালিন

কিন্তু টিফ্‌লিশে অবস্থান ক্রমেই তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। ১৯০২ সালে বাতুরামে গণবিক্ষোভের নেতৃত্ব করায় তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হয় এবং ১৯০৩ সালে তিন বৎসরের জন্য তাঁহাকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে পাঠানো হয়। কারাগারে থাকা কালীন তাঁহার নেতৃত্বে কয়েদীরা ধর্মঘট করে। ১৯০৪ সালে স্তালিন সাইবেরিয়া হইতে পলায়ন করেন এবং কিছু কাল আত্মগোপনের পর স্বীয় কর্মস্থানে ফিরিয়া আসেন। এই সময়ে স্তালিনের বয়স মাত্র ২০ বৎসর ছিল। তিনি মোট ছয়বার নির্বাসিত হন এবং প্রায় আট বৎসরকাল কারাগারে কাটান।

দীক্ষাগুরু লেনিন সম্পর্কে স্তালিন বলেন: 'আমি লেনিনের শিষ্য মাত্র। আমার জীবনের একমাত্র উচ্চাশা এই যে, আমি যেন আজীবন তাঁহার বিশ্বস্ত শিষ্যই থাকিয়া যাইতে পারি।' এই স্তালিন যখন মার্ক্সবাদের প্রতি প্রথম আকৃষ্ট হন, তখন লেনিনের নাম পর্যন্ত জানিতেন না। ১৮৯৮ সালে লেনিনের একটি প্রবন্ধ তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহার পর স্তালিন তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য অধীর হইলেন। পাঁচ বৎসর পর লেনিনের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎকার হয়। এই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে স্তালিন বলেন: 'আমার মানসপটে লেনিন কেবল একজন রাজনীতিকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন বলিষ্ঠ, দীর্ঘকায়, সৌম্যকান্তি এক মহাপুরুষ। কিন্তু যখন দেখিলাম, আমার সম্মুখে একজন খর্বকায় সাধারণ মানুষ দাঁড়াইয়া আছেন, যাঁহার অবয়ব একান্ত বিশেষত্বহীন, তখন আমার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না।' ১৯০১ সালে স্তালিন শ্রমিকদের একটি আন্দোলন পরিচালনা করেন এবং ১৯০৯ সালে রাশিয়ার প্রথম বেআইনী সংবাদপত্র 'ব্রদজোরিয়া' প্রকাশ করেন।

স্তালিনের বীরত্ব ও দেশের প্রতি তাঁহার আনুগত্যের নিদর্শন হিসাবে যে কাহিনীটি প্রায়ই বলা হইয়া থাকে, তাহা এই—১৯০৫ সালের বিদ্রোহ ব্যর্থ হইলে লেনিন ও ট্রট্স্কি সুইজারল্যাণ্ডে পলায়ন করেন, কিন্তু স্তালিন দেশেই রহিয়া যান। এই সময় ধরিতে পারিলে জার সরকার তাঁহাকে গুলী করিয়া হত্যা করিতে একটুকুও দ্বিধা করিত না। ১৯১২ সালে প্রাগ সহরে বিপ্লবীদের এক সম্মেলনে স্তালিনকে রাশিয়ার অভ্যন্তরে কার্যরত বিপ্লবী সংস্থার পরিচালক নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তিনি এই সময় সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে ছিলেন। এই সংবাদটি তাঁহার নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়ার পর স্তালিন সাইবেরিয়া হইতে পলায়ন করিয়া লেনিনগ্রাদে আসেন।

১৯১৭ সালের ৬ই নভেম্বরের বিপ্লবের ফলে বলশেভিকরা রাজশক্তি করায়ত্ত করে। ইহার পূর্বেই স্তালিন দলের 'পলিট ব্যুরোর' সদস্য নির্বাচিত হন। এই সময়ে দলের নীতিঘটিত প্রশ্নে লেনিন ও ট্রট্স্কির মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। লেনিনের যুক্তি সমর্থন করিয়া স্তালিন বলেন যে, ইউরোপের অবশিষ্টাংশ কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ বা উহার প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন না হইয়া থাকিলেও রাশিয়ার নববিধান প্রবর্ত্তন করিতে ইতস্ততঃ করা উচিৎ নয়। মতবিরোধ সত্ত্বেও অবশ্য স্তালিন ও ট্রট্স্কি বিপ্লবোত্তরকালে ভাঙা সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা তাঁহাদের আদর্শ ও লক্ষ্য অনুযায়ী গড়িয়া তোলার কাজে যুক্তভাবে আত্মনিয়োগ করেন, কিন্তু লেনিনের মৃত্যুর পর শেষ পর্যন্ত ট্রট্স্কিকে দেশত্যাগ করিয়া মেক্সিকোয় নির্বাসনে আততায়ীর হস্তে প্রাণ হারাইতে হয়।

১৯২২ সালের ১২ই এপ্রিল স্তালিন 'প্রাভদা' পত্রিকা প্রথম প্রকাশ করেন। ঐদিনই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া পুনরায় সাইবেরিয়ায় প্রেরণ করা হয়। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি পলায়ন করেন এবং পুনরায় ধৃত হইয়া চারি বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ হন। বিপ্লবী স্তালিনের জীবনের একটিমাত্র লক্ষ্য ছিল, সেই লক্ষ্যটি হইতেছে জারতন্ত্রের স্বৈরাচারের চির উচ্ছেদ ঘটানো। তিনি সংকল্পে অটল, বিশ্বাসে লৌহদৃঢ় ছিলেন; তাই কারাদণ্ড, বেত্রদণ্ড, এমনকি মৃত্যুভয়ও তাঁহাকে কোনোকালে টলাইতে পারে নাই। লেনিন প্রথম লালফৌজ গঠন করিয়া স্তালিনকে রাশিয়ার দক্ষিণাংশ হইতে লালফৌজের জন্য রসদাদি সংগ্রহের ভার দেন। স্তালিনের উপর রাশিয়ার জাতিগত সমস্যা মীমাংসার ভারও অর্পণ করা হয়। রাশিয়ার বিপ্লবে স্তালিন উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেন। ১৯২৪ সালে লেনিনের মৃত্যুর পর স্তালিন কমিউনিস্ট দলের সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করেন। ১৯২৮ হইতে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত সময়ে স্তালিন সোবিয়েৎ ভূমির শিল্পায়ন ও যৌথ কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি সোবিয়েৎ রাষ্ট্রের কর্ণধারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইহার পূর্বেও অবশ্য তিনিই কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী জেনারেলরূপে কার্যতঃ রাষ্ট্রের কর্ণধারই ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে স্তালিনের নেতৃত্ব তাঁহার সামরিক প্রতিভার অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন। হিট্লারের হিংস্র আক্রমণ রুখিয়া তিনি শুধু সোবিয়েৎ ভূখণ্ডকেই রক্ষা করেন নাই, সমগ্র বিশ্বকে প্রাগৈতিহাসিক বর্বরতার কবল হইতে উদ্ধার করেন। তিনি পুরামাত্রায় বাস্তববাদী ছিলেন, তাঁহার জীবনে ভাববিলাসের কোনো স্থান ছিল না। ১৯১৭ সাল হইতে তিনি যখন যে কাজে হাত দিয়াছেন, তাহাই তিনি স্বীয় অসামান্য কর্মশক্তি বলে সুসম্পন্ন করিয়াছেন, অথচ সাফল্যের গর্বে কখনও তিনি আত্মবিস্মৃত হন নাই।

তিনি জীবনে দুইবার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁহার প্রথম পত্নীর নাম ছিল ক্যাথারিন। জেকভ নামে একটি পুত্র রাখিয়া তিনি পরলোকগমন করেন। ১৯১৯ সালে স্তালিন তাঁহার দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করেন। ইনিও ১৯৩২ সালে দুইটি পুত্র রাখিয়া মারা যান।

আমৃত্যু স্তালিন সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। ক্রেম্লিন-প্রাসাদের একটি ছোট চারকামরা অংশে তিনি বাস করিতেন। এইখানে বসিয়াই তিনি শতকর্মের মধ্যেও বহু গ্রন্থ প্রনয়ণ করিয়াছেন। তাঁহাকে ক্ষুদ্র করিয়া দেখাইবার জন্য সারা পৃথিবীতে এ পর্যন্ত চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই, কিন্তু নিন্দুকের সমস্ত নিন্দাবাদ ও কুৎসা রটনা কাটাইয়া উঠিয়া স্তালিন আজ বিশ্বমানবের এক বিরাট অংশের চিত্তমন্দিরে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছেন। অতি সাধারণ পরিবারের যে যুবক একদিন সর্বমানবের মুক্তি কামনায় অধীর হইয়া অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি আজ সাধারণ মানুষের অন্যতম শ্রেষ্ঠবন্ধু ও হিতৈষিরূপেই লোকান্তরিত হইলেন। তাঁহার পরলোকগত পবিত্র আত্মার কল্যাণ হউক।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র

কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠানের মেয়র শ্রীনির্মলচন্দ্র চন্দ্র গত ১লা মার্চ্চ তাঁহার ওয়েলিংটন স্ট্রীটস্থ নিজ ভবনে ৬৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। দীর্ঘকাল যাবৎই তিনি অসুস্থাবস্থায় ছিলেন। শ্রীযুক্ত চন্দ্র বিগত ১৯৫২ সালের ১০ই এপ্রিল কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের অল্ডারম্যান এবং ১লা মে মেয়র নির্বাচিত হন। অসুস্থতানিবন্ধন তিনি উক্ত নির্বাচনের দিন উপস্থিত হইতে পারেন নাই, এবং নিয়মানুসারে নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে তিনি ২৫শে জুলাই ইন্‌ভ্যালিড্ চেয়ারে বাহিত হইয়া কেন্দ্রীয় পৌর প্রতিষ্ঠান ভবনে আসেন এবং যথারীতি শপথ গ্রহণ করেন। মেয়র নির্বাচিত

হইয়া এই একদিনই মাত্র তিনি পৌরসভায় উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত চন্দ্র কলিকাতার একজন খ্যাতনামা আইনব্যবসায়ী ছিলেন। বহু সামাজিক ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি যুক্ত ছিলেন। একাধারে রাজনৈতিক, সমাজহিতৈষী, শিক্ষাব্রতী ও দেশপ্রেমিক হিসাবে বাংলা তথা ভারতের জনসাধারণের নিকট তাঁহার খ্যাতি ছিল। তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সহকর্মী ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গেও তিনি একযোগে কার্য করিয়াছেন। দেশবন্ধু স্বরাজ্যদল গঠন করিলে শ্রীযুক্ত চন্দ্র সেই দলের অন্যতম স্তম্ভ হইয়া দাঁড়ান। ১৮৮৮ সালের ৬ই অক্টোবর কলিকাতার বিখ্যাত চন্দ্র পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সসম্মানে তিনি এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯১২ সালে সম্মানের সহিত আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা হাইকোর্টে এডভোকেট রূপে যোগদান করেন। পরে ১৯১৭ সালে সলিসিটর হন এবং তাঁহার পিতামহের বিখ্যাত সলিসিটর ফার্ম্ম 'জি সি চন্দর এণ্ড কোং'-এ যোগদান করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ১৯১৫ হইতে ১৯২১ সাল পর্যন্ত কলিকাতা মিউনিসিপালিটির কমিশনার, ১৯২৩ সাল হইতে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য এবং ১৯২৬ হইতে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত ভারতীয় আইন সভার সদস্য ছিলেন। ১৯৩৫ সাল হইতে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি চিত্তরঞ্জন সেবাসদন ও চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের পরিচালন ব্যবস্থার সহিত জড়িত থাকেন। দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি ঐ দুইটি প্রতিষ্ঠান ছাড়াও নিঃস্ব হিতৈষিনী সভা এবং আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সহিতও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯১৭ সাল হইতে শ্রীযুক্ত চন্দ্র ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসেরও সদস্য এবং পরবর্তী সময় হইতে প্রতাপচন্দ্র হোমিওপ্যাথী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সভাপতি ছিলেন। কলিকাতা ইন্‌কর্পোরেটেড ল' সোসাইটির সভাপতি ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন পরীক্ষার অন্যতম পেপার সেটার হিসাবেও তিনি দীর্ঘকাল সসম্মানে কাজ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ন্যূনাধিক ৩০টি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের তিনি ডিরেক্টর ছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুতে বাংলার একজন বৃহত্তর সমাজকল্যাণকারী সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তির অভাব ঘটিল। এ অভাব শীঘ্র পূরণ হইবার নয়। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

শিল্পাচার্য্য যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলার শিল্পক্ষেত্র হইতে শ্রীযামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের আকস্মিক তিরোধান মর্মান্তিক। তিনি কেবল ভারতীয় শিল্পেরই পুনরুদ্ধার করিয়া উহাকে নবরূপায়নে উজ্জ্বল করিয়া তোলেন নাই, সেই সঙ্গে পাশ্চাত্য শিল্পের নব নব আঙ্গিক ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজনা করিয়া জাতীয় শিল্পের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করিয়াছেন। ভারত যে শিল্পকলার ক্ষেত্রে ইউরোপের সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে যামিনীপ্রকাশের অবদান অসামান্য। তাঁহার সূক্ষ্ম শিল্পনৈপুণ্যের গুণে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। ১৮৭৬ সালের ৩রা নভেম্বর গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে যামিনীপ্রকাশ জন্মগ্রহণ করেন। গুণেন্দ্রনাথ ছিলেন যামিনীপ্রকাশের পিতার মাতুল। আচার্য অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে একত্রে বড় হইয়া ওঠেন যামিনীপ্রকাশ। ছাত্রাবস্থায় সিটি কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক শ্রীক্ষেত্র মিত্র মহাশয়ের নিকট হইতে তিনি প্রথম চিত্রাঙ্কনের প্রেরণা লাভ করেন, পরে এন্‌ট্রান্স পাশের পর শিল্পসাধনাকে জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন। ১৮৯৭ সালে যামিনীপ্রকাশ কলিকাতা সরকারী আর্টস্কুলে ভর্তি হন। এখানকার পাঠ সমাপ্ত করিয়া তিনি বৃটিশ তৈলচিত্রশিল্পবিশেষজ্ঞ মিঃ সি এল্‌ পামারের সংস্পর্শে আসেন। অবনীন্দ্রনাথও একই সঙ্গে মিঃ পামারের নিকট শিক্ষালাভ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই যামিনীপ্রকাশের তৈলচিত্রশিল্পের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের পৃষ্ঠপোষকতায় সিমলায় যে সর্বভারতীয় চিত্রশিল্পপ্রদর্শনী হয়, তাহাতে যামিনীপ্রকাশের 'স্নানের ঘাট' শীর্ষক চিত্রটি প্রথম পুরস্কার লাভ করে। ১৯০৯ সালে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় প্রদর্শনীতেও তাঁহার চিত্রই সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়। ১৯১৪ সালে তিনি কলিকাতা সরকারী আর্ট স্কুলের উপাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। অধ্যক্ষ ছিলেন মিঃ পার্সি ব্রাউন; এই সময় মাঝে মাঝে অধ্যক্ষের কাজেও যামিনীপ্রকাশকে পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। ভারতীয় রাজন্যবর্গ তাঁহার শিল্পের বিশেষ ভক্ত ছিলেন; যামিনীপ্রকাশকে প্রায়ই গিয়া তাঁহাদের সাদর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে হইয়াছে। ভেনিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চিত্রপ্রদর্শনীতে ভারতীয় চিত্র হিসাবে একমাত্র যামিনীপ্রকাশের চিত্রই স্থানলাভ করে। এতদ্ব্যতীত ইটালী, আমেরিকা প্রভৃতি দেশেও তাঁহার চিত্রের অসাধারণ আদর ছিল। ইটালীর রাজা ইমানুয়েল তাঁহাকে 'ক্যাভেলিয়ার' উপাধিতে ভূষিত করেন। যামিনীপ্রকাশের ন্যায় এইরূপ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী ভারতে আজ একান্ত দুর্লভ। তাঁহার মৃত্যুতে তাই ভারত-শিল্পের সব চাইতে বড় দীপশিখাটিই যে নিভিয়া গেল, তাহাতে সন্দের নাই। তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ হউক, এই কামনা করি।

আগামী বৈশাখ সংখ্যা বঙ্গশ্রীর বিশেষ আকর্ষণ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পুণ্য জন্মতিথি উপলক্ষে কবির প্রতিকৃতি সহ কবির দর্শন ও সাহিত্যের বিশেষ বিশেষ আলোচনা

বন্দেমাতরম ও যুবক বাংলার চমকপ্রদ ইতিহাস

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের সচিত্র দৃশ্য ও জাতীয় সপ্তাহের ঐতিহাসিক আলেখ্যঃ রবীন্দ্রনাথের 'নাইট' উপাধি ত্যাগ

বুদ্ধদেবের পুণ্য আবির্ভাবতিথি উপলক্ষে বৌদ্ধস্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প সম্পর্কিত মনোরম রচনা

এতদ্ব্যতীত বিশেষ বিশেষ সাংস্কৃতিক প্রবন্ধ, গল্প, রস-রচনা, কাব্য ও নিয়মিত ক্রমশঃ প্রকাশিত উপন্যাস

নিয়মিত বঙ্গশ্রী পাঠ করুন

বাংলার অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্র বঙ্গশ্রী গত বিশ বৎসর ধরিয়া ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক রূপে গণ-চিত্তে বিশেষ আলোকসম্পাত করিয়া আসিতেছে। চিন্তাশীল প্রবীণ ও নবীন লেখকবৃন্দের অপূর্ব সমন্বয়ে শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, সংগীত, সমালোচনা, রাজনীতি, অর্থনীতি, কৃষিশিল্প বাণিজ্য, গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা প্রভৃতি রচনা ও মনোজ্ঞ চিত্রে বঙ্গশ্রীর প্রত্যেকটি সংখ্যা সমৃদ্ধ থাকে। বঙ্গশ্রীতে বিজ্ঞাপন দিয়া ব্যবসায়ী মাত্রেই লাভবান হন।

কার্যালয়ঃ ৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড
৯০, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-১৪ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধান-মারাই [উড্‌কাট্]

শিল্পী—নন্দদুলাল কুণ্ডু

বিংশ বর্ষ — বৈশাখ—১৩৬০ — ২য় খণ্ড—৫ম সংখ্যা

'বন্দেমাতরম্' ও যুবক বাঙ্গলা

অধ্যাপিকা উমা মুখোপাধ্যায়

'বন্দে মাতরম্' ভারতের অন্যতম জাতীয় সংগীত। পরাধীন ভারতবাসী একদিন 'বন্দে মারতম্' গান গাহিয়া দেশ-মাতৃকার অর্চ্চনা করিয়াছিল,—আজ স্বাধীন ভারতেও এই সংগীতেই চলে সেই মাতৃ-পূজা। বিগত শতাব্দীর হিন্দু-মেলার আবহাওয়ায় (১৮৬৭-১৮৮০) সর্বপ্রথম এরূপ জাতীয় সংগীতের গোড়া-পত্তন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কবি মনমোহন বসু ভারতে জাতীয় সংগীতের আদি রচয়িতা। এর পর (১৮৭০-১৯০০) কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বহু জাতীয় সংগীত রচনা করিয়াছেন। এই আবহাওয়ায়ই প্রকাশিত হয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দ মঠ' (১৮৮২)। 'আনন্দ মঠের' বিপ্লবী সন্তানের কণ্ঠে বঙ্কিম দিয়াছেন 'বন্দে মাতরমে'র শক্তিমন্ত্র। যে 'বন্দে মাতরমে' 'আনন্দ মঠে'র সন্তানদল মুসলমান ও ইংরেজ ফৌজের সহিত লড়াই-এর প্রেরণা পাইয়াছিল; সেই 'বন্দে মাতরম'-ই একদিন বাংলা, তথা ভারতের জনগণকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্দীপিত করে। সেদিন 'বন্দে মাতরমে'র জয়ধ্বনি সারা ভারতকে প্রাণ-চঞ্চল করিয়াছিল। তাই এই মাতৃনাম কণ্ঠে লইয়া পরাধীন ভারতবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়—অম্লান বদনে কারাবরণ করে, পুলিশের নির্য্যাতন সানন্দে বরণ করে। বস্তুত, সেদিন ভারতে চলিয়াছিল 'বন্দে মারতম্'-এর বিজয় অভিযান।

এখন প্রশ্ন, 'বন্দে মাতরম্' কি ১৮৮২-৮৩ সনেই অর্থাৎ 'আনন্দ মঠ'-এর প্রকাশকালেই কি বর্তমান মর্য্যাদা লাভ করে? না। 'আনন্দ মঠ' আত্মপ্রকাশের প্রায় কুড়ি বাইশ বৎসর পরেও 'বন্দে মাতরম্'-এর স্রষ্টারূপে বঙ্কিম দেশের সাধারণ মানুষের কাছে ছিলেন সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট 'আনন্দ মঠ' আদরণীয় ছিল খুবই। কিন্তু সেই 'আনন্দ মঠ' 'বন্দে মাতরম্'-মন্ত্র প্রচারক 'আনন্দ মঠ' নয়; সেই 'আনন্দ মঠ' 'দুর্গেশ-নন্দিনী',

'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রভৃতি বঙ্কিম-রচিত অপরাপর উপন্যাসের ন্যায় অন্যতম অনবদ্য উপন্যাসরূপে সমাদৃত। কি 'আনন্দ মঠ' প্রকাশকালে (১৮৮২), কি তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে (১৮৯৪-৯৫), বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার শিক্ষিত সমাজে ঔপন্যাসিকের আসন লাভ করেন। তখনও 'বন্দে মাতরম্' রচয়িতা 'ঋষি বঙ্কিম' বঙ্গালী চিন্তায় নিতান্তই অপরিচিত। তখন কেহই হয়ত কল্পনা করেন নাই যে, 'বন্দে মাতরম্'-এর কবি বঙ্কিমকে যুবক বাঙ্গলা কোন দিন এত উচ্চে স্থান দিবে, 'বন্দে মাতরম্' ভরতের জাতীয় সঙ্গীত হইবে। স্বয়ং বঙ্কিমও এরূপ কল্পনা করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ *(১)।

১৮৮২ সনে 'আনন্দ মঠ' আত্মপ্রকাশ করে। যে ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া উপন্যাসটি কল্পিত ও রচিত, তাহা ১৭৭২ সনের সন্ন্যাসী বিদ্রোহ। বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন স্থানে,—যথা, পূর্ণিয়া, দানাপুর, ত্রিহুট প্রভৃতি—এই বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। একদল সন্ন্যাসী বেশধারী ডাকাত দলবদ্ধ হইয়া, কখনও কখনও "পাঁচ হাজার লোক একত্রে ধ্বংস ও লুঠতরাজ করিয়া বেড়াইত ও ঘর-বাড়ী জ্বালাইয়া দিত।" Gleig-এর 'Memoirs'-এ, Colebrooke, Josias du Pre প্রভৃতির নিকট লিখিত হেষ্টিংসের পত্রাদিতে এবং Hunter-এর Annals of Rural Bengal গ্রন্থে এই সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কাহিনী কম-বেশী জানা যাইবে *(২)। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাঁহার "ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম" (১৯০৫) পুস্তকে, পৃ ৯৭-৯৮, লিখিয়াছেনঃ বাংলা দেশে নাগা সন্ন্যাসী ও মজনু ফকিরের বিদ্রোহ সত্য হইলেও 'আনন্দ মঠ' উপন্যাস উহা অবলম্বনে রচিত নয়। তাঁর মতে "সন্তান সম্প্রদায় ইউরোপের মধ্যযুগের নাইট টেম্প্লারাদের অনুকরণে কল্পিত।" এই প্রসঙ্গে তিনি 'আনন্দ মঠে' ভিক্টর হুগোর The Year '93'-র প্রভাব সম্পর্কে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় 'আনন্দ মঠে' ইংরাজী সাহিত্য, যথা, Robin Hood, Rob Roy প্রভৃতির প্রভাবও লক্ষ্য করেন। নিরপেক্ষ বিচারে মনে হয়, 'আনন্দ মঠ' দেশী ঘটনার অবলম্বনে ও বিদেশী সাহিত্যের প্রেরণায় রচিত হইয়াছিল। যাহা হউক, বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দ মঠে' যে-সন্তানদলের কাহিনী আঁকিয়াছেন, তাহারা আদর্শনিষ্ঠ, ভাবপ্রবণ, ব্রহ্মচারী সৈনিক। ঐ সন্তানদলের নেতা ছিলেন সত্যানন্দ, জীবানন্দ, ভবানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসী। ১৭৭০-৭২ সনে বংলা ও বিহারে দ্বৈত শাসন প্রতিষ্ঠিত। মীরজাফর তখন বাংলার নবাব, আর ইংরেজ তাহার দেওয়ান। নবাবের হাতে শাসনের গুরু দায়িত্ব, কিন্তু ক্ষমতা ও রাজস্ব নাই। ইংরেজের হস্তে ক্ষমতা আছে, কিন্তু দায়িত্ব নাই। বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দ মঠে' লিখিয়াছেনঃ "১১৭৬ সালে বাঙ্গালা প্রদেশ ইংরেজের শাসনাধীন হয় নাই। ইংরেজ তখন বাঙ্গালার দেওয়ান। তাঁহারা খাজনার টাকা আদায় করিয়া লন, কিন্তু তখনও বাঙ্গালীর প্রাণ সম্পত্তি প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের কোন ভার লয়েন নাই। তখন টাকা লইবার ভার ইংরেজের, আর প্রাণ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাপিষ্ঠ নরাধম বিশ্বাসহন্তা মনুষ্যকুলকলঙ্ক মীরজাফরের উপর। মীরজাফর আত্মরক্ষায় অক্ষম, বাঙ্গালা রক্ষা করিবে কি প্রকারে? মীরজাফর গুলি খায় ও ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেস্‌পাচ্ লেখে। বাঙ্গালী কাঁদে আর উৎসন্ন যায়।"

এই মুসলমান শাসক ও ইংরেজ শোষকের উপরই সন্তানদলের যত আক্রোশ! মুসলমান রাজত্ব ধ্বংস ও ইংরেজ বণিককে বিতাড়িত করিয়া তাহারা বাংলায় পুনরায় হিন্দুরাজত্ব প্রতিষ্ঠায় ব্রতবদ্ধ। সন্তানদলের এই সংগ্রাম চালাইবার জন্য বঙ্কিম তাহাদের কণ্ঠে দিয়াছেন 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত। 'বন্দে মাতরম্' সন্তানের সংগ্রামী মন্ত্র—

---

*(১) ১৯০৭-এর ২১শে এপ্রিল ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি বঙ্কিম-স্মৃতি উৎসবে কাঁঠালপাড়া গিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহারা একটি খবর পাইয়াছিলেন, তাহা এইরূপঃ বঙ্কিমবাবু 'বন্দে মাতরম্' গানটি রচনা করিয়া পণ্ডিতমশাইর হস্তে অর্পণ করিলে পণ্ডিতমশাই উক্তি করিয়াছিলেন, 'এতে কি বঙ্গ-দর্শনের পেট ভরবে?' উত্তরে বঙ্কিম বলেন, 'যদি বেঁচে থাক তো দেখবে এই গানেই অনেকের পেট ভরবে। ততদিন হয়ত আমি বেঁচে থাকব না।' উক্ত পণ্ডিতমশাই নিজে হেমেন্দ্রবাবু প্রভৃতির নিকট এই ঘটনাটি বিবৃত করেন এবং আমি হেমেন্দ্রবাবুর নিকট ইহা শুনি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, তৎকালে ভাষা সংশোধনের জন্য প্রত্যেক প্রেসেই একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত নিযুক্ত হইতেন। সেই ব্যক্তি 'পণ্ডিতমশাই' নামে সুপরিচিত। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এই ঘটনাটির সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা যাইতে পারে। ১৯০৫-০৭ সন বাংলার ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। দেশে তখন 'বন্দে মাতরম্' ভাবের বন্যা প্রবাহিত। 'বন্দে মাতরম্'-এর এই অভিনব দিগ্বিজয়ের দিনে গুরুর ভবিষ্যদ্দৃষ্টি সপ্রমাণ করিবার জন্য সত্য-অসত্য মিশাইয়া এইরূপ কাল্পনিক গল্প রচনা করা পণ্ডিতমশাইর পক্ষে অসম্ভব মনে হয় না। শ্রদ্ধেয় শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "বঙ্কিম-জীবনী"তে (তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৩৮, পৃ ২৯০-৯১) লিখিয়াছেন যে, বঙ্কিমের মৃত্যুর দুই চারি বৎসর পূর্বে একদিন তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত 'বন্দে মাতরম্' নিয়া কথা উঠিলে বঙ্কিম উক্তি করিয়াছিলেন, "একদিন দেখিবে—বিশ ত্রিশ বৎসর পরে একদিন দেখিবে, এই গান লইয়া বাঙ্গালা উন্মত্ত হইয়াছে—বাঙ্গালী মাতিয়াছে।" বঙ্কিমের মৃত্যুর কিছুদিন পরে শচীশবাবু তাঁহার ভগিনীর নিকট এই গল্পটি শুনিয়াছিলেন। এই গল্পটিও অনুরূপ কারণে অনৈতিহাসিক বলিয়া বর্তমানে বিবেচিত হইল।

*(২) Indian Problems : By S. M. Mitra (লণ্ডন, ১৯০৮, পৃ ৬৫-৬৬)।

এই মন্ত্রে নিহিত রহিয়াছে শক্তির বীজ। 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সন্তানেরা যখন বৃটিশ ফৌজের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে, তখন ঐ গান তাহাদের রক্তে আলোড়ন ও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। বঙ্কিম লিখিয়াছেনঃ "তখন ধীরানন্দের আজ্ঞানুক্রমে যুদ্ধোন্মত্ত সকল সন্তান মহাতেজে 'বন্দে মাতরম্' গায়িল। তাহাতে তাহাদিগের বাহুতে দ্বিগুণ বলসঞ্চার হইয়া উঠিল। সেই ভয়ংকর মুহূর্তে অবশিষ্ট গোরাগণ নিহত হইল। রণক্ষেত্রে আর শব্দ রহিল না।" বঙ্কিমের সন্তানেরা শক্তিমন্ত্রের উপাসক। 'বন্দে মাতরম্'-এ তাহাদের সংগ্রামী মনোভাব পরিস্ফুট।

১৭৫৭ সাল হইতে ভারতবর্ষের ইতিহাস এক কথায় পরাজয়ের পর পরাজয়ের ইতিহাস, জাতীয় জীবনের ঘোরতর দুর্যোগের ইতিহাস। এক নিদারুণ ক্লৈব্য ও জড়তা সেদিন ভারতবাসীকে আড়ষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যুগাবতার রাজা রামমোহন (১৭৭২-১৮৩৩) জাতির জীবনে এক নব অধ্যায়ের সূচনা করেন। রামমোহন-প্রচারিত ভাবধারা সেদিন পরাধীন ভারতবাসীকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে—ধর্ম,রাষ্ট্র, সমাজ সকল ক্ষেত্রে এক নূতন জাগরণের সূত্রপাত দেখা যায়। রামমোহনের পর এই ধারা বাঙ্গালার কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, সাংবাদিক, যথা, ঈশ্বর গুপ্ত, অক্ষয় দত্ত, রঙ্গলাল, মধুসূদন, বিদ্যাসাগর, ভূদেব, হেম, নবীন, গিরীশ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতির কাব্য, সাহিত্য, নাটক ও সাময়িক-পত্রে বহুল প্রচারিত ও প্রসারিত হয়। স্বাধীনতা ও স্বাজাত্যবোধ ভারতবাসীকে অনুপ্রাণিত করে, আত্মশক্তি ও আত্মচেতনা তাহার প্রাণে সঞ্চারিত হয়। ১৮৯৩ সালে যুবক ভারতের সংগ্রামদূত স্বামী বিবেকানন্দ সুদূর মার্কিন-মুল্লুকে বজ্রকণ্ঠে যে-অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিকীর্ণ করেন, তাহাতে আত্মসচেতন ভারতের বাণী রূপ পায়। বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-৯৪) সেই একই ধারার এক বিশিষ্ট প্রকাশ। বঙ্গদর্শনের (১৮৭২) মারফত তিনি যে আদর্শ ও চিন্তাধারা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালী, তথা ভারতবাসীর অন্তরে এক দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও জাতীয়তাবোধ সঞ্চারিত করে। 'আনন্দ মঠে' সন্তানদলের সংগ্রামের চিত্র আঁকিয়া তিনি পরাধীন ভারতবাসীকে অনুরূপ শক্তিযোগে দীক্ষিত করিয়াছেন। বস্তুত, 'আনন্দ মঠে'র 'বন্দে মাতরম্'-এ বঙ্কিমের কৎ-ধর্মী মানব-পূজা ও স্বদেশ-সেবার আদর্শ মূর্তি পাইয়াছে। 'বন্দে মাতরম্'-এর যিনি দেবী, তিনি চির-আরাধ্যা দেশ-মাতৃকা। দেশের পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, মাঠ-ঘাট প্রভৃতি সন্তানদলের আরাধনার বস্তু। এ-মাতৃপূজায় বেদ-পুরাণের মৃন্ময়ী দেব-দেবীর স্থান নাই। 'বন্দে মাতরম্'-এ ভারতবাসী সেযুগে দেশাত্ম-বোধের সাড়া পাইয়াছিল। এই অর্থে 'আনন্দ মঠ' বাংলার রেঁণাসাঁস বা নবজাগরণের ইতিহাসে এক বিশেষ ধাপ নির্দেশ করে।

'আনন্দ মঠে' বঙ্কিমচন্দ্র রামমোহন-বিদ্যাসাগর-মধুসূদনের আদর্শ স্বকীয় সাহিত্যিক তুলিতে অনবদ্য ভাষায় জোরের সহিত প্রচার করিয়াছেন। 'বন্দে মাতরম'-এর মাধ্যমে তিনি সেদিন ভারতবাসীকে কোন অভিনব বিপ্লবী মন্ত্রের সন্ধান দিতে পারেন নাই। ভারতবাসীও উহাতে যুগান্তকারী কোন বাণী খুঁজিয়া পায় নাই। 'বন্দে মাতরম্' তখনও জাতীয় সংগীতের মর্যাদা লাভ করে নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইলবার্ট বিলের আন্দোলনের (১৮৮২-৮৪) কথা উল্লেখ করা চলে। আইনের ক্ষেত্রে 'নেটিভ্' ও ইংরেজের মধ্যে যে বৈষম্য টান হইত, তাহা দূর করিবার প্রচেষ্টায় এই বিলের জন্ম। ১৮৪৯ সালের Black Acts-এর পরবর্তী ধাপ ১৮৮২-৮৩ সনের ইলবার্ট বিল। কিন্তু ভারতবর্ষীয় ইংরেজগণের তুমুল আন্দোলনে এই বিলের শুভ প্রয়াস আংশিক ব্যর্থতায় পর্যবশিত হয়। Keswick, Miller, Branson প্রভৃতি ইংরেজ ছিলেন এই বিল-বিরোধী আন্দোলনের নেতা। তাঁহারা বিভিন্ন স্থানে সভা করিয়া তীব্র ভাষায় বিলের নিন্দা করেন এবং ভারতীয় ইংরেজের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেন। ভারতীয় পক্ষ সমর্থন করিয়া যাহারা এই আন্দোলনের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিলেন বাগ্মী ব্যরিষ্টার লালমোহন ঘোষ। তিনি সে-সময় ঢাকার নর্থব্রুক হলে যে জ্বালাময়ী বক্তৃতা করেন, তাহা ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে ভারতীয় পক্ষে সেসময় যাঁহার ডাক পড়িয়াছিল, তিনি 'বন্দে মাতরম্'-এর কবি বঙ্কিম নন, তিনি ছিলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। হেমচন্দ্রের বিখ্যাত "নেভার—নেভার" কবিতা ব্যঙ্গার্থে রচিত হইলেও সে-যুগে বহু বাঙ্গালীকে অনুপ্রাণিত করে। হেমচন্দ্র লেখেনঃ

গেল রাজ্য, গেল মান, ডাকিল ইংলিশম্যান,
ডাক ছাড়ে ব্রান্‌সন্ কেওয়িক মিলার—
"নেটিবের কাছে খাড়া নেভার—নেভার"।
"নেভার" সে অপমান— হতমান বিবিজান,
নেটিবে পাবে সন্ধান, আমাদের "জান না" ?
বিবিজান ! দেহে প্রাণ কখনও তা হবে না ॥
হিপ্ হিপ্ হিপ্ হুরে, হ্যাট কোট বুট প'রে,
সারা ভাবে জগতেরে—তাদের বিচার,
নেটিবের কাছে হবে ?—"নেভার নেভার" !

"নেভার"—সে অপমান হতমান বিবিজান,
নেটিবে পাবে সন্ধান আমাদের "জান না" ?
দেহে প্রাণ বিবিজান কখনও তা হবে না॥

দ্বিতীয়ত উল্লেখযোগ্য ১৮৮৩ সনের সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারাবরণ সংক্রান্ত ছাত্র-আন্দোলন। কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নরিস্ সাহেব বড়বাজারের জনৈক বটুকনাথ পণ্ডিতের মামলায় তাহার বস্তীর শালগ্রাম শিলা পরীক্ষার্থ আদালতে আনিবার আদেশ দেন। ইহাতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় "ব্রাহ্ম পাব্লিক অপিনিয়নের" সম্পাদক ভুবনমোহন দাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া "বেঙ্গলী" পত্রিকায় বিচারপতি নরিসের কাজের তীব্র নিন্দা করেন। সুরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেনঃ "We have now, however, amongst us a judge, who, if he does not actually recall to mind the days of jeffreys and Scroggs, has certainly done enough, within the short time that he has filled the High Court Bench, to show how unworthy he is of his high office, and how by nature he is unfitted to maintain those traditions of dignity which are inseparable from the office of the judge of the highest Court in the land." *(৩)।

সুরেন্দ্রনাথের এই সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশের এক মাস পর তাঁহার নামে আদালতের 'রিট্' (Writ) বাহির হয় (২রা মে, ১৮৮৩) ও আদালতে বিচারের পর তিনি প্রেসিডেন্সী জেলে কারারুদ্ধ হন (৫ই মে)। সুরেন্দ্রনাথের বিচারের সময় ছাত্রনেতা আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলার ছাত্রসমাজ যেভাবে আদালতে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল ও আন্দোলন চালাইয়াছিল এবং ৪ঠা জুলাই সুরেন্দ্রনাথের মুক্তিদিবসে 'বেঙ্গলী' অফিসে ও কলিকাতার রাজপথে তাঁহাকে যে-বিপুল সম্বর্ধনা দিয়াছিল, তাহাতে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি উচ্চারিত হয় নাই। প্রত্যক্ষদর্শী এস্, এম্, মিত্র লিখিয়াছেনঃ "Notwithstanding the agitation over the Ilbert Bill, and the imprisonment of Mr. Surendranath Banarji in 1883, no fuss was made over the *Bande Mataram*. I was then in Calcutta, and remember distinctly that the thousands of students who flocked round the Calcutta High Court during the trial of Mr. Banerji did not sing the *Bande Mataram*" (Indian Problems, পৃ ৬৭)।

এই ঘটনার দুই বৎসর পর ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা (ডিসেম্বর, ১৮৮৫)। সেই সময়ও 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতরূপে গীত হয় নাই। তবে ১৮৮৬ সনে কলিকাতা কংগ্রেস উপলক্ষ্যে হেমচন্দ্র যে-রাখীবন্ধন রচনা করেন, তাহাতে সুজলাং-সুফলাং প্রভৃতি আট লাইন সন্নিবেশিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, উক্ত কংগ্রেসের অধিবেশনের উদ্বোধনে রবীন্দ্রনাথ

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে!
ঘরের হয়ে পরের মতন
ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে!... ...

গানটি গাহিয়াছিলেন।

'বন্দে মারতম্' কেন সেই যুগে সার্বজনিক স্বীকৃতি পায় নাই, তাহার একটা কারণ নির্দেশ করা চলে। 'বন্দে মাতরম্' সংস্কৃতপ্রধান কবিতা। 'বন্দে মাতরম্'-এ সর্বশুদ্ধ ছত্রিশটি লাইন আছে। এই ছত্রিশটির মধ্যে সাতটি লাইন বাংলায়, অবশিষ্ট ঊনত্রিশটি সংস্কৃতে। 'বন্দে মাতরম্' শব্দ দুইটিও সংস্কৃত। প্রধানত সংস্কৃতে লিখিত এই সঙ্গীত তাই সর্বজনের বোধগম্য হয় নাই। তাছাড়া, 'বন্দে মাতরম্'-এর শব্দ-যোজনায় সংগ্রামসূচক বা উত্তেজক শব্দও খুব বেশী নাই। ছত্রিশটি লাইনের মধ্যে তেত্রিশটির মধ্যেই পাওয়া যায় দেশ-মাতৃকার বর্ণনা ও বন্দনা। বাকী তিনটিতে যথা—

ত্রিংশকোটিকণ্ঠ কলকল নিনাদকরালে
দ্বিত্রিংশকোটি ভুজৈর্ধৃত খরকরবালে
অবলা, কেন মা, এত বলে।

দেশবাসীকে সংগ্রামে উত্তেজিত করিবার খানিকটা আভাস পাওয়া যায় মাত্র। কাজেই এই সংস্কৃতপ্রধান মাতৃ-বন্দনা যে কোনদিন অশিক্ষিত ভারতবাসীর সংগ্রামী মন্ত্র হইতে পারে, এ সম্ভাবনা সে যুগে ছিল খুবই কম। সমসাময়িক এস্, এম্, মিত্রও অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। তাঁহার মতে, "The novel is powerfully conceived, and when it was published it was generally believed that it was well executed, and calculated to infuence the Bengali race for good. No one had then the slightest idea that within a quarter of a century the *Bande Mataram* would be made use of for breaking the peace, and to mislead young

*(৩) A Nation in Making: By Surendranath Banerjee, পৃ ৭৪, সুরেন্দ্রনাথের এই মন্তব্য ২রা এপ্রিল, ১৮৮৩-র 'বেঙ্গলী' পত্রে প্রকাশিত হয়। শ্রদ্ধেয় হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁহার Indian National Congress পুস্তকে, পৃ ৮৯, যে ২৮শে এপ্রিল তারিখ দিয়াছেন, তাহা ঠিক নয়।

students (পৃ ৬৭)। তাই প্রশ্ন, 'বন্দে মাতরম্' কাহার সৃষ্টি? 'বন্দে মাতরম্' রচনা করেন বঙ্কিম, কিন্তু 'বন্দে মাতরম্' আবিষ্কার করে ১৯০৫-এর যুবক বাঙ্গলা।* 'বন্দে মাতরম্' যুবক বাঙ্গলা সৃষ্টি করে নাই বা যুবক বাঙ্গলার স্বাধীনতা সংগ্রামের (১৯০৫) ইহা প্রধান কারণও নয়। পক্ষান্তরে, নানা কার্য-কারণ সংযোগে যুবক বাঙ্গলা (১৯০৫) যখন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়, তখন সে 'বন্দে মাতরম্'-এ আবিষ্কার করে তাহার অগ্নিমন্ত্র। 'বন্দে মাতরম্'-এর জয়ধ্বনিতে তাহার সংগ্রাম অনুপ্রাণিত হয়। যুবক বাঙ্গলাই 'বন্দে মাতরম্'-এর সত্যকার স্রষ্টা ও জন্মদাতা।

১৯০৫-এর ৭ই আগষ্ট কার্জন-কল্পিত বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া যে-দেশজোড়া আন্দোলন সুরু হয়, তাহাই গৌরবময় বঙ্গ-বিপ্লব বা স্বদেশী আন্দোলন নামে অভিহিত। বঙ্গভঙ্গ রদ্ করিবার এবং সেই সঙ্গে বৃটিশ পণ্যের 'বয়কট' ও স্বদেশী পণ্য প্রচারের সংকল্প সার্বজনিকভাবে ঘোষিত হয় ৭ই আগষ্ট টাউন হলের তিনটি বিরাট সভায়। সভাপতি ছিলেন কাশীমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, প্রধান বক্তা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী। সমসাময়িক প্রফুল্লচন্দ্র সরকার বলেনঃ "স্বদেশী আন্দোলনে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি কবে প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল তাহা এখন নির্ণয় করা কঠিন। তবে আমাদের যতদূর স্মরণ হয়, ১৯০৫ সনের ৭ই আগষ্ট তারিখে টাউন হলে যে বিরাট বয়কট সভা হইয়াছিল, তাহাতেই 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি প্রথম উচ্চারিত হয়" *(৪)। অবশ্য ইহার পূর্বেই ১৮৯৬ সনের কলিকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম 'বন্দে মারতম্' গান গাহিয়াছিলেন। কিন্তু সে গান ছিল "আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে" (১৮৮৬), "অয়ি ভুবন মনমোহিনী" (১৮৯৬) প্রভৃতির মত অন্যতম সময়োপযোগী সঙ্গীত। 'বন্দে মাতরম্' তখনও শক্তিরূপিণী মায়ের বন্দনাসঙ্গীত হয় নাই।

কিন্তু ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি ও সঙ্গীত সার্বজনিকরূপে গৃহীত হয়। দেশে তখন যে 'বন্দে মাতরম্' ভাবের বন্যা প্রবাহিত হইল, তাহা বাঙ্গালার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হয়। সেদিন যুবক বাঙ্গালা এক নূতন উন্মাদনায় চঞ্চল হইয়া উঠে। শতাব্দীর প্রস্তুতি তাহার মধ্যে যে প্রাণশক্তি সঞ্চিত করিয়াছিল, তাহা কার্জনের 'এক কলমের খোঁচায়' স্বদেশী আন্দোলনে আত্মপ্রকাশ করে। সেদিন "যুবক ভারত জাগিয়া উঠিয়া দেখিল একটা জিনিষের তার অভাব। একটা মন্ত্র তার দরকার। এই মন্ত্র হইতেছে 'বন্দে মাতরম্'" *(৫)। ১৯০৫-এর সংগ্রামের দিনে যুবক বাঙ্গলা 'আনন্দ মঠে'র বিদ্রোহী সন্তানের 'বন্দে মাতরম্'-এ তাহার মন্ত্র খুঁজিয়া পাইল। 'বন্দে মাতরম্' জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত হইল।

১৯০৫-০৭ সনে বঙ্কিম এক নয়া মূর্তিতে বাঙ্গালীর নিকট আবিষ্কৃত হইলেন। সে-বঙ্কিম ঔপন্যাসিক বঙ্কিম নয়, সে-বঙ্কিম সংগ্রামী মন্ত্রদাতা বঙ্কিম, 'বন্দে মাতরম্'-এর উদ্গাতা বঙ্কিম। সেদিন বাঙ্গলায় 'বন্দে মাতরম্'-এর প্রভাব কিরূপ অনুভূত হইয়াছিল, তাহা দু-একটি দৃষ্টান্তেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় এমন দিন খুব কমই গিয়াছে যেদিন কোন-না-কোন স্থানে সভা হয় নাই বা 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি উচ্চারিত হয় নাই। ১৬ই অক্টোবর (৩০শে আশ্বিন) অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গের দিন বাঙ্গলা দেশে রাখী-বন্ধন উৎসব উদ্যাপিত হয়। ঐ দিন সারা বাংলায় অরন্ধন প্রতিপালিত হয় ও স্বদেশ সেবকগণ 'বন্দে মাতরম্' গান গাহিয়া শোভাযাত্রা করেন। ইহার পরও কয়েক বৎসর পর্যন্ত বাঙ্গলায় এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ও 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতে নগর পরিভ্রমণ করা হয়। ১৬ই অক্টোবর তারিখে ঐক্যবদ্ধ বাঙ্গলার প্রতীকস্বরূপ কল্পিত ফেডারেশান্ হলের মাঠে যে বিরাট সভা হয়, সেখানে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র ধ্বনিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ, ব্রহ্মবান্ধব, বিপিন পাল, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি বাংলার প্রায় সকল বড় বড় নেতা ঐ সভায় উপস্থিত থাকিয়া 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র প্রচার করেন। বাঙ্গলার ছাত্র ও যুবসমাজ সে-যুগে 'বন্দে মাতরম্'-এর একনিষ্ঠ সেবক হইয়া দাঁড়ায়। ইংরেজ শাসক শীঘ্রই এই মন্ত্রে রাজদ্রোহের ইঙ্গিত খুঁজিয়া পান। এই মন্ত্র উচ্চারণের অপরাধে কত ছাত্র যে সে-সময় কার্লাইল সার্কুলারের (অক্টোবর, ১৯০৫) বিধি অনুসারে সরকারী স্কুল-কলেজ হইতে বহিষ্কৃত হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। 'বন্দে মাতরম্' প্রচারের অপরাধে বহু লোক কারাবরণ করে। কিন্তু সরকারী নির্যাতন সত্ত্বেও 'বন্দে মাতরম্'-এর প্রচারকার্য কিছুমাত্র প্রশমিত হয় নাই। একদিকে যেমন স্বদেশী আন্দোলনের বন্যা ক্রমশই বাড়িতে থাকে, সেই সঙ্গে তেমনি 'বন্দে মাতরম্'-এর প্রচার ও দিগ্বিজয়ও পুরাদমে চলিতে থাকে।

*(৪) জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথঃ প্রফুল্লচন্দ্র সরকার, (কলিকাতা, ১৩৫২, পৃ ৬৫)।

*(৫) নয়া বাঙ্গলার গোড়া পত্তনঃ বিনয়কুমার সরকার (কলিকাতা, ১৯৩২, পৃ ১৯০)।

এই আবহাওয়ায়ই বরিশালের "বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্স" সরকারী পুলিশ লাঠি সঞ্চালনে ভাঙ্গিয়া দেয় ও বহু নেতাকে গ্রেপ্তার করে। "এই কনফারেন্সেই মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার পুত্র চিত্তরঞ্জন পুলিশের পুনঃ পুনঃ লাঠির আঘাতে অজ্ঞান হইয়া না পড়া পর্যন্ত কিছুতেই 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি ত্যাগ করেন নাই।" এইরূপে বাঙ্গলার নেতৃবৃন্দ ও যুবকসমাজ 'বন্দে মাতরম্'-এর সেবক ও প্রচারক হইলেন।

কলিকাতার শিক্ষিত যুবকগণ ১৯০৫ সনে একটি সম্প্রদায় গঠন করে, তাহার নাম "বন্দে মাতরম্ সম্প্রদায়"। মন্মথ মিত্র ও সুরেন ব্যানার্জী ছিলেন ঐ সম্প্রদায়ের যথাক্রমে প্রথম ও পরবর্তী সভাপতি। সভ্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য যোগেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর, রাধারমণ কর, চুণীলাল গুপ্ত, সরেশ সমাজপতি, ললিতচন্দ্র মিত্র, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, নলিনবিহারী সরকার প্রভৃতি। এই সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য ছিল প্রতি রবিবার "বন্দে মাতরম্" গান গাহিয়া নগর ও উপকণ্ঠ পরিভ্রমণ করা। সুরশিল্পী দক্ষিণা সেন ঐ গানের সুর যোজনা করেন। চাঁদা সংগ্রহের কোন প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য এই সম্প্রদায়ের না থাকিলেও নগর পরিভ্রমণের সময় একদিকে যেমন সম্প্রদায়ের কলেবর বৃদ্ধি পাইত, অপরদিকে তেমনি বহু টাকা আপনা হইতেই চাঁদা উঠিত। বাড়ীর মেয়েরা অনেক সময় জানালা বা ছাদের উপর হইতে টাকা পয়সা ছুঁড়িয়া দিতেন *(৬)। প্রফুল্ল সরকার বলেনঃ "তখনকার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে রাজপথে 'বন্দে মাতরম্' গান গাহিয়া যাইতে দেখিয়াছি। এই সম্প্রদায়ের সভাগৃহে জাতীয়ভাব প্রচারের উদ্দেশ্যে সভা-সমিতি, বক্তৃতা প্রভৃতিও হইত। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় উহাতে মাঝে মাঝে যোগ দিতেন ও স্বরচিত গান গাহিতেন।" সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের মতে, রবীন্দ্রনাথও এইরূপ একদিন সম্প্রদায়ের নগর ভ্রমণে যোগ দিয়াছিলেন। দেশের লোক তখন 'বন্দে মাতরম্' প্রচারকার্যে কিরূপ উৎসাহী ছিলেন, তাহা একটি উদাহরণেই বুঝা যাইবে। সম্প্রদায়ের দুইটি সভায়,—২৭শে এপ্রিল, ১৯০৬ ও ২২শে জুলাই, ১৯০৬,—যথাক্রমে ১৫০৲ ও ১৪৪৲ স্বেচ্ছায় চাঁদা উঠে। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মভূমি কাঁঠালপাড়া সে-যুগে স্বদেশপ্রেমিকদের তীর্থস্থানে পরিণত হয়। ১৯০৬-এর ২৯শে জুন "বন্দে মারতম্ সম্প্রদায়" কাঁঠালপাড়া তীর্থ ভ্রমণে গিয়াছিলেন। এইরূপে "বন্দে মাতরম্ সম্প্রদায়" কলিকাতা ও উপকণ্ঠে মাতৃনাম প্রচার করিয়া "সহস্র সহস্র টাকা" সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। সংগৃহীত অর্থে একটি বয়ন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় বর্তমান রাজা মণীন্দ্র নন্দী স্কুলগৃহে, পাইকপাড়ায়। ঐ বয়ন বিদ্যালয়ে Haltersley loom নামে একপ্রকার উন্নত ধরণের তাঁত ব্যবহৃত হইত। উহাতে কম সময়ে বেশী কাপড় বোনা যাইত। কিন্তু তাঁতশালার কাজ ভাল না চলায় ঐ বছরের শেষভাগে (৯ই ডিসেম্বর, ১৯০৬) উহা বন্ধ করিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অবশিষ্ট অর্থ সম্পাদক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের মারফত ১৯০৮ সালে নিবেদিতা স্কুলে দান করা হয়।

১৯০৫-০৬ সনেই 'বন্দে মাতরম্' জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত হয়। জনসমাজে এই গানের প্রচারকার্যে "বন্দে মাতরম্ সম্প্রদায়ের" দান সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ১৯০৬ সনে কলিকাতায় নৌরজী কংগ্রেসের অধিবেশনে (২৬-২৯শে ডিসেম্বর, ১৯০৬) দক্ষিণা সেনের নেতৃত্বে 'বন্দে মাতরম্' সমবেত উদ্বোধন সঙ্গীতরূপে গীত হয়। এইরূপে কংগ্রেসী মহলেও 'বন্দে মাতরম্' আসন লাভ করে।

"বন্দে মাতরম্ সম্প্রদায়" ছাড়াও আরও নানাভাবে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বাংলার রাষ্ট্রিক পটভূমিতে 'বন্দে মাতরম্'-এর প্রভাব অনুভূত হয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 'চরম' ও 'নরম' দুই দলের সৃষ্টি হইলে চরমপন্থীদের নীতি ও আদর্শ প্রচারের জন্য একটি পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়। তখন উপাধ্যায়ের বাংলা দৈনিক 'সন্ধ্যা' ও ভূপেন দত্তের 'যুগান্তর' ছাড়া চরমপন্থীদের বিশেষ আর কোন পত্রিকা ছিল না। এই উদ্দেশ্যে হরিদাস হালদারের উদ্যোগে, সুবোধ মল্লিকের অর্থে ও বিপিন পালের সম্পাদনায় ১৯০৬-এর আগস্ট মাসে "বন্দে মাতরম্" নামক ইংরেজী দৈনিক আত্মপ্রকাশ করে। পত্রিকার নামকরণে বঙ্কিমী প্রভাব লক্ষ্যণীয়। জাতীয়তার মন্ত্র 'বন্দে মাতরম্'-এর সহিত নব জাতীয়তাবাদীদের পত্রিকা "বন্দে মাতরম্"-এর সংযোগ ছিল সাক্ষাৎ ও গভীর। 'বন্দে মাতরম্' যে

---

*(৬) প্রফুল্ল সরকার জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ পুস্তকে লিখিয়াছেন (পৃ ৫৫): "এই সম্প্রদায় রাজপথে 'বন্দে মাতরম্' গান গাহিয়া জাতীয় ভাণ্ডারের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেন।" তাঁহার এই তথ্য সম্পূর্ণ সত্য নহে। বঙ্গভঙ্গের পর একটি নূতন 'জাতীয় ভাণ্ডার' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাহাতে প্রচুর অর্থও সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু সেই জাতীয়-ভাণ্ডারের সহিত "বন্দে মাতরম্ সম্প্রদায়" কর্তৃক সংগৃহীত অর্থের কোন প্রত্যক্ষ ও সাক্ষাৎ সংযোগ ছিল না। দ্বিতীয়ত, অর্থ সংগ্রহের নিমিত্ত ঐ সম্প্রদায় গঠিত হয় নাই। মাতৃ-নাম প্রচারই উহার আসল উদ্দেশ্য ছিল। তৃতীয়ত, "বন্দে মাতরম্ সম্প্রদায়ের" সংগৃহীত অর্থ সম্পূর্ণ অন্য কাজে ব্যয়িত হইয়াছিল। জাতীয় ভাণ্ডারের অর্থ পরে স্বতন্ত্র ভাণ্ডাররূপে ভারতসভার হস্তে অর্পিত হয়। (কংগ্রেস : হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, পৃ ১২২)।

বাঙ্গালী চিন্তাকে কতদূর প্রভাবিত করিয়াছে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ "বন্দে মাতরম্" পত্রিকা। কিছুদিনের মধ্যেই অরবিন্দ ঘোষ এই পত্রিকার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হইয়া পড়েন। অরবিন্দ'র সম্পাদনায় "বন্দে মাতরম্" পত্র ভারতের রাজনৈতিক চিন্তায় এক বিশিষ্ট মতবাদ প্রচার করে, যাহার পরিচয় পূর্বেই 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রে অরবিন্দর লেখালেখির মধ্যে (১৮৯৩-৯৪) পাওয়া যায়। মডারেট্দের দাসসুলভ আবেদন-নিবেদনের নীতিকে বর্জন করিয়া তিনি আত্মশক্তি, আত্ম-নির্ভরতা ও আদর্শনিষ্ঠার বাণী প্রচার করেন। 'বন্দে মাতরম্'-এর শক্তিমন্ত্র "বন্দে মাতরম্" পত্রে ধ্বনিত হয়। সত্যানন্দের কাছে যাহা ছিল আদর্শ,—"শত্রু-শোণিতে সিক্ত করিয়া মাতাকে শস্যশালিনী করিব"—"বন্দে মাতরম্" পত্রিকায় তাহা বাণী পরিগ্রহ করে। অরবিন্দ বঙ্কিমকে "ঋষি বঙ্কিম" নামে সম্মানিত করেন ("বন্দে মাতরম্", ১৬ই এপ্রিল, ১৯০৭)।

স্বদেশী আন্দোলনের আবহাওয়ায় 'বন্দে মাতরম্'-এর প্রভাব প্রসঙ্গে কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিম-স্মৃতি উৎসব (২১শে এপ্রিল, ১৯০৭) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সেদিন "বন্দে মাতরম্ সম্প্রদায়" ও অন্যান্য বহু লোক কলিকাতা হইতে ঐ উৎসবে যোগদানের জন্য কাঁঠালপাড়া গমন করেন। কাঁঠালপাড়ার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি হইতেও অসংখ্য লোক এই উৎসবে যোগ দিয়াছিল ও "বন্দে মাতরম্ সম্প্রদায়ের" সহিত জাতীয় সঙ্গীত গাহিয়াছিল। উৎসবের তিনটি প্রধান অঙ্গ ছিল—স্বদেশী শিল্প ও কৃষি দ্রব্যের একটি জাতীয় মেলা, অপরাহ্নে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের পৌরোহিত্যে বঙ্কিম স্মৃতি-সভা ও সন্ধ্যার পর বঙ্কিমচন্দ্রের পূজার দালানে 'আনন্দ মঠে'র অভিনয়। প্রফুল্ল সরকার লিখিয়াছেন, উক্ত অভিনয়ে "ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় স্বয়ং সত্যানন্দের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন" *(৭)। এইরূপে মহা সমারোহে সেদিন বঙ্কিম উৎসব উদ্যাপিত হয়।

বাস্তবিকই ১৯০৫-০৭ সনে বাঙ্গলায় 'বন্দে মাতরম্'-এর জয়-জয়কার চলিয়াছিল। সেদিন যুবক-বাঙ্গলা 'বন্দে মাতরম্'-এর রচয়িতা বঙ্কিমকে যে সু-উচ্চ আসন দিয়াছিল, বঙ্কিমের জীবিত কালে তিনি বা তাঁহার বন্ধুবর্গ তাহা ভাবিতে পারেন নাই। সমসাময়িক পত্রিকা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'ডনে' (Dawn, November, 1905) এই মতবাদ খোদাই করা আছে। "'Bande Mataram', Hail, Mother !—What Bengali heart is not set beating faster at the sound of the two magic words ? When the late Bankim Chandra Chatterjee in his immortal work—Ananda Math, the "Abode of Joy"—first sang the heart-stirring and soul-lifting song, the opening words of which have furnished Modern Bengal with a battle-cry and a divine inspiration, so to say—could he have dreamt of the transformation—the miraculous and wonderful transformation which the two mellifluent words were destined to work in the hopes aspirations of his degenerate countrymen. The welkin now rings with *Bande Mataram*. The streets and lanes of Calcutta and of the rest of the province recound with the solemn watch-word. *Bande Mataram* has stirred the hearts of the people to their depths". সতীশ মুখোপাধ্যায়ের 'ডনে'র এই মন্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সতীশবাবু আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সহপাঠী বন্ধু। ১৮৮৩ সনে সুরেন ব্যানার্জীর জেল সম্পর্কীয় আন্দোলনে আশুতোষের সহিত সতীশবাবুও এক মূল্যবান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'আনন্দ মঠ' প্রকাশের পর বাঙ্গলার সকল ঘটনা ও আন্দোলনের তিনি প্রত্যক্ষদর্শী, স্বদেশী আন্দোলনের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অন্যতম জনক ও নেতা। তিনিও বলেন, ১৯০৫ সনে 'বন্দে মাতরম্' যুবক বাঙ্গলার হাতে এক নূতন অর্থ লাভ করে। বাস্তবিকই, 'বন্দে মাতরম্' ১৯০৫-এর যুবক বাঙ্গলার এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক সৃষ্টি। এই বিশিষ্ট অর্থেই বিনয় সরকার বলিয়াছেন "বঙ্কিম-স্রষ্টা ১৯০৫ সন।" তাঁহার মতে, "বঙ্কিমচন্দ্র যুবক-বাঙ্গলা সৃষ্টি করেন নাই। যুবক বাঙ্গলাই বঙ্কিমকে গড়িয়া তুলিয়াছে।...

"এটা ১৯০৫ সনে প্রথম ছাপা হয় নাই। এটা ছাপা হয় আরও আগে সেই ১৮৮৫ কি ৮৬ সনে কিম্বা ঐ যুগের কোনো এক ক্ষণে। কিন্তু তখন বঙ্কিমকে কেউ বড় একটা পুছে নাই। যখন বঙ্কিচন্দ্র মরিয়া ভূত হইয়া গিয়াছিলেন তারও অনেককাল পরে বঙ্কিমের তলব পড়িয়াছিল। কে ডাকিয়াছিল? বুড়োরা নয়। যুবক ভারত, যুবক-বাঙ্গলা বলিয়া উঠিল, 'ঐ একটা লোক আছে, মানুষের মত মানুষ, ওকে খাড়া করিয়া তুলিতে হইবে।' বঙ্কিমের যাঁরা চরম অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন তাঁরা কল্পনাও করিতে পারেন নাই

---

*(৭) জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ: প্রফুল্লচন্দ্র সরকার, পৃ ৫৫-৫৬।

পুনরাবৃত্তি

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

গঙ্গার ঘাটে সোণাপিসির দেখা। হরিনামের মালা জপতে জপতে পুত্রবধূর পিতৃশ্রাদ্ধের চাল চড়াচ্ছিলেন তিনি। তাঁর সঙ্গিনী অনুরাগিণীদের মধ্যেও একই অভিযোগের পুনরাবৃত্তি—পেটের ছেলেকে পর ক'রে নেয়, সব্বনাশীদের এমনি যাদুমন্ত্র!

যাদুমন্ত্র ব'লে যাদুমন্ত্র! আমার বদনকে দেখেছো তো ভাই। দুবেলা মায়ের পায়ের ধুলো মুখে না দিয়ে জলগ্রহণ ক'রতো না যে, সেই ছেলেই কিনা বৌয়ের হ'য়ে এখন দুবেলা আমার সঙ্গে ঝগড়া করে! বলে, পোষায় না তো কাশী গিয়ে থাকো গে, কুড়ি টাকা ক'রে মাসোহারা পাবে!

সোণা পিসির একথায় অবাক বিস্ময়ে তাঁর এক সঙ্গিনী বলেন, বলো কী দিদি? বদন? তোমার বদন ব'ললে এই কথা? সঙ্গিনীর কথায় উৎসাহিতা হ'য়ে সোণাপিসি বললেন, হ্যাঁ, আমার পেটের ছেলে, সাত রাজার ধন এক মাণিক, সেই বদনই বলে একথা। শুধু কি তাই?

আরও অনেক কথা বলতে যাচ্ছিলেন সোণাপিসি, হঠাৎ আমাকে দেখেই জিজ্ঞেস ক'রলেন, কে? গোবিন্দ?

সোণাপিসিকে প্রণাম ক'রে দাঁড়ালুম।

আমাকে দেখে সোণাপিসি আনন্দে গদগদ হ'য়ে উঠলেন, কোথায় আছিস আজকাল?

ব'ললুম, লক্ষ্ণৌতে। সেইখানেই চাকরি বাকরি ক'রছি।

সোণাপিসি সঙ্গিনীদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। বললেন, পর নয়, জ্ঞাতি কুটুমও নয়, আপনার খুড়তুতো ভাইয়ের ছেলে। খুড়তুতো ভাইও ছিলেন নিজের ভাইয়ের চাইতে বাড়া। আসতে যেতে বোনের বাড়িটিই ছিল তাঁর পরমস্নেহের আশ্রয়। ভাইপোও তাই, পিসি বলতে একেবারে অজ্ঞান'।

কথার জের টেনে তিনি বললেন সঙ্গিনীদের, চললুম ভাই আজ তা হলে, কতদিন বাদে গোবিন্দ আমার পিসির কাছে এসেছে!

পিসির কাছে আসিনি, এসেছিলাম বাগবাজারে একটা দুরূহ কাজ স্কন্ধে নিয়ে। প্রতিজ্ঞা ছিল কাজ হাঁসিল হলে গঙ্গায় ডুব দিয়ে পরিশুদ্ধ হব। সহজেই কাজটি হ'য়ে গেল, তাই গঙ্গার পবিত্র জল স্পর্শ করতে বাগবাজারের ঘাটে নেমেছিলুম। সোণাপিসির সঙ্গে সেইখানেই অকস্মাৎ দেখা আমার। পিসি কিন্তু কোন কথাই শুনবেন না; কোন ওজর আপত্তিই টেঁকলো না আমার।

তাই কী হয় নাকি? পিসির বাড়ি থাকতে উট্‌কো জায়গায় গিয়ে খাওয়া-দাওয়া সারা?

বললুম, উট্‌কো জায়গা নয় পিসি। বিশেষ বন্ধুর বাড়ি। সোণাপিসি তাড়া দিলেন, থাম্, ডেঁপোমি করিসনে। বলে, মায়ের চেয়ে দরদ বড় মাসির। বন্ধু আর পিসির বাড়ি কখনো এক হয়?

তবুও অনুনয় জানালুম, কিন্তু কোন কথাই শুনবেন না সোণাপিসি। এতদিন পরে দেখা; ভাইপোকে তিনি বাড়ি না নিয়ে গিয়ে রাস্তা থেকেই এমনভাবে বিদায় দিতে পারেন না।

অগত্যা পিসির সঙ্গে যেতেই হ'ল বাগবাজারে তাঁর বাড়িতে।

বাড়িতে ঢুকেই সোণাপিসি হৈচৈ সুরু করে দিলেন। আমার সঙ্গে তাঁর যে কত নিবিড় সম্পর্ক তা তিনি তাঁর পুত্রবধূকে বার বার ব'লে বোঝাতে লাগলেন।

যে, যুবক-ভারত, যুবক-বাঙ্গলা একদিন বঙ্কিমকে অত উপরে আসন দিবে—অতখানি মাথায় করিয়া রাখিবে।...

"যুবক-ভারত, বাঙ্গলার যৌবনশক্তি বঙ্কিমচন্দ্রকে বাঙ্গলার মানুষের মধ্যে দুনিয়ার কাছে অদ্বিতীয় বীর বলিয়া দাঁড় করাইয়া দিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র যুবক বাঙ্গলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। বঙ্কিম-দর্শন দিগ্বিজয়ী বঙ্গীয় যৌবনের সর্বপ্রথম কীর্তিস্তম্ভ।" (নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তন, পৃ ১৯০-৯১)।

সোণাপিসির পুত্রবধূ অর্থাৎ বদনদা'র স্ত্রীকে দেখলুম। এ বাড়িতে অনেকদিন আর যাতায়াত নেই আমার। বদনদাকে দেখেছিলুম অবিবাহিত অবস্থায়। বিয়ের খবর অবশ্য পেয়েছিলুম কিন্তু বিয়ের বরযাত্র যাওয়া কিংবা বৌ-ভাতের নিমন্ত্রণ রক্ষা করা কোনটাই সম্ভবপর হ'য়ে ওঠেনি। বাংলার বাইরে পশ্চিম-প্রবাসী এখন আমরা—বাংলার আত্মীয় স্বজন তাই দূরে সরে গেছেন।

বসুন ঠাকুরপো, আপনার দাদা এক্ষুণি এসে পড়বেন। ভারিক্কী চালের দেহ, যদিও বয়েসের ভারে পীড়িত নয়, তবুও বাংলা দেশের বধূদের এই ভাব বিয়ের দু'চার বছরেই প্রকাশ পায়।

বৌদিকে নমস্কার করে আমি ঘরে একটি চেয়ারে উপবেশন করলুম। আপনার সঙ্গে আলাপ নেই বটে, কিন্তু এ বাড়ির সঙ্গে আলাপ আমার অনেক দিনের। আর সম্পর্কটা তো পিসির মুখেই শুনলেন। সম্পর্কটা বড় নিকট করে ধরলেন না বৌদি; কিন্তু মৌখিক ভদ্রতার কসুর হ'ল না; হ্যাঁ, দূরে দূরে সব থাকা হয় তো, তেমন আত্মীয়তা প্রকাশের সুযোগ কই?

পুত্রবধূর একথায় দপ করে জ্বলে উঠলেন সোণাপিসি। কথার ঠেস মেরে বললেন, নিকটকেই যারা দূরে ঠেলে দেয়; তারা আবার আত্মীয়তার মর্ম বুঝবে কী করে?

আমিই লজ্জিত হচ্ছিলুম সোণাপিসির এতটা বাড়াবাড়িতে। তাঁর সঙ্গে সম্পর্কটা আমাদের সত্যিই খুব দূরের নয়; তবুও এই বাড়ীটি সম্পর্কে আমার একটা ভীতি আছে। খুব নিকট ক'রে নিতে পারিনি তাই এ বাড়ীটিকে। আর ইদানীং বাংলার বাইরে বসবাস করার দরুণ এ বাড়িতে আর আসাই ঘটে না।

কিন্তু এককালে এ বাড়িতে খুবই এসেছি। বাবার সঙ্গে প্রায়ই আসতুম বাগবাজার রসিক মিত্তির লেনের এই বাড়িতে। সোণাপিসির তখন জাজ্জ্বল্যমান সংসার। স্বামী, পুত্র নিয়ে খুব জাঁকজমক করে তাঁর দিন কাটাবার বয়েস। কিন্তু মানুষের নাকি সর্বদিক থেকে সুখের ভাগ্য থাকে না। সোণাপিসিরও নিরবচ্ছিন্ন সুখ ছিল না। লাল চওড়া পাড় শাড়িতে, উজ্জ্বল সিঁথিমূলে সিন্দুর বিন্দু শোভায় অনেক দামী অলঙ্কার সজ্জায়ও সুখী ছিলেন না সোণাপিসি। সর্বদাই যেন তাঁকে বিষণ্ন থাকতে দেখা যেত। বিত্তবান স্বামী তাঁর, মায়ের কোল আলো করা একটি মাত্র পুত্রসন্তান তাঁর তখন কলেজে পড়ছে—সংসারে অভাব-অভিযোগের ঝড়-ঝাপটা নেই; কিন্তু দজ্জাল শ্বাশুড়ির দাপটে জীবনে তাঁর কোন শান্তি নেই; উঠতে বসতে শাসন আর তিরস্কার গৃহিণী বধূর প্রতি—সেদিনকার শিশু আমি, আমিও বহুবার তা প্রত্যক্ষ করেছি। আমার কিশোর মন ভ'রে উঠেছে সোণাপিসির প্রতি সহানুভূতিতে।

বেঁটে ছোটখাটো চেহারায় কী সদম্ভ উক্তি আর কী রাশভারি চাল সোণাপিসির শ্বাশুড়ির। মুখের আঁচে যেন খৈ ফুটছে আর দাপটের ঠেলায় কারুর টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করবার উপায় নেই! তাঁকে দেখলেই জুজুর ভয়ে আমি আতঙ্কগ্রস্ত হতুম—বালক কিশোর সুলভ সকল চাপল্য আমার নিমেষে অন্তর্হিত হ'ত। ভয়ে বাবার কোঁচার খুঁটটি ধরে মিনতি জানাতুম, চল বাবা, দেরি হ'য়ে গেল।

শ্বাশুড়ির ভয়ে পিসি আদর-আপ্যায়নে আমাদের ভরিয়ে রাখতে পারতেন না; এমন কী আমার বালকোচিত ভয়কেও দূরে সরিয়ে দেবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। পিসির বাড়ি তাই আমার কাছে মোটেই লোভনীয় নয়।

বাবার কাছে দুঃখ প্রকাশ ক'রে সোণাপিসি কাঁদতেন গোপনে, দাদা, কী দুর্ভাগ্য আমার দেখো। খেয়ে-পরে, শুয়ে-বসে—কোনদিক থেকেই শান্তি আমার নেই! বাবা সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন, বুড়ি শ্বাশুড়ি আর কদিনই বা! ওসব কথা তুমি গায়ে মেখো না।

গায়ে মাখবার উপায়ও ছিল না সোণাপিসির। তার কারণ তখনকার দিনের মাতৃ-ভক্ত সন্তানদের সাংসারিক ব্যাপারে স্ত্রীর পক্ষ নিয়ে লড়াই করা ছিল নিন্দনীয়। অন্যায় এবং অত্যাচারের আঘাত যতই বর্ষিত হোক না কেন, সহনশীলতাই ছিল আদর্শ বধূ-ধর্ম!

সোণাপিসিকে তাই শ্বাশুড়ির যতকিছু অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য ক'রতে হ'য়েছে।

একদিনের কথা বেশ মনে আছে আমার। বাবার মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ ক'রতে গিয়েছিলুম সোণাপিসির বাড়ি। সামাজিক প্রথায় অবশ্য নিন্দনীয় আচরণই হয়েছিল আমার। কিন্তু তখন আমি তাতে অভ্যস্থ ছিলাম না। অপরিসীম দুঃখ এবং শোকের বোঝা মাথায় নিয়ে পিসির শ্বাশুড়ির কাছে না গিয়ে পিসিকেই জানিয়েছিলুম পিতৃ-শ্রাদ্ধের কথা। তারই প্রতিক্রিয়ায় সামাজিকভাবে অপদস্থ হয়েছিলুম সোণাপিসির শ্বাশুড়ির কাছে; এবং সেই থেকেই সোণাপিসির বাড়ির আর ছায়া মাড়াইনি। তারপর মাকে নিয়ে পশ্চিমে মামার

বাড়িতেই পড়াশুনা এবং বসবাস করতে থাকি কলকাতার সম্পর্ক উঠিয়ে দিয়ে।

সোণাপিসির ছেলে বদনদা' এলেন মুখে চোখে সংসারের কর্তাসুলভ গাম্ভীর্যের ছাপ নিয়ে।

বহুদিন বাদে বদনদা' আমাকে দেখেও অনায়াসেই চিনতে পারলেন, আরে গোবিন্দ যে! কোত্থেকে আসা হচ্ছে? বদনদা'কে আমার আবির্ভাবের তথ্য জানালুম, গঙ্গার ঘাট থেকে সোণাপিসি ধরে এনেছেন।

বদনদা রহস্য করে মন্তব্য ছুড়লেন, তা ধরে না আনলে তো তোমার আর পাত্তাই পাওয়া যায় না। সম্পর্কটা তো একেবারে তুলেই দিয়েছো।

ত্রুটি স্বীকার করে বললুম, থাকি যে সাত সমুদ্দুর তের নদী পারে। হামেশা সম্পর্ক বজায় রাখি কেমন ক'রে?

বদনদা'র স্ত্রী এসে ঘরে ঢুকলেন। স্বামীকে উদ্দেশ ক'রে বললেন, যাও বাজার যাও একবার। মায়ের অনেক ফরমায়েস আছে।

আমাকে খাওয়ানোর ব্যাপারেই যে বাজারের প্রয়োজন তা উপলব্ধি করে আমি আপত্তি প্রকাশ করলুম, চলি বদনদা', আজ একটা বিশেষ জরুরি দরকার আছে। বদনদা বাধা দিয়ে বললেন, তাই কী হয় নাকি? না খেয়ে গেলে মা ভীষণ রাগ করবেন।

কথার মাঝখানেই সোণাপিসি এসে হাজির হলেন, গোবিন্দ আজ এখানেই খাওয়া-দাওয়া সেরে যাবে।

আমাকে এই নির্দেশ দিয়ে তিনি পুত্রকে তিরস্কার ক'রে বললেন, এখনও তুমি বাজার যাওনি বদন?

প্রবাসী ভাইপোর আহারের জন্যে তিনি পুত্রের নিকট আর এক দফা যে ফর্দ পেশ ক'রলেন তা আমার কাছে লোভনীয় হলেও বদনদা'র কাছে বিশেষ ব্যয়সাধ্য।

আমি বাধা দিয়ে বললুম, পিসি, আজ আমার এখানে খাবার কোন উপায় নেই।

কেন উপায় নেই শুনি? ছোটলোকের বেটি বুঝি কিছু বলেছে?

সোণাপিসির এ মন্তব্যে আমি মর্মাহত হলুম! কিন্তু বদনদা'র স্ত্রী এতে জ্বলে উঠলেন।

সাত সকালে বাপ মা তুলে গালাগাল দেবেন না বলছি।

গালাগাল দেবো না? একশোবার দেবো। মায়ের কাছ থেকে ছেলেকে পর করে নিয়েছো তাতেও আশ মেটেনি? ভায়ের ছেলে একদিন পিসির বাড়ি এসেছে অমনি তাতে চোখ টাটিয়েছে? বলি একী তোর বাবার বাড়ি যে বেজার হচ্ছিস?

বদনদা'র স্ত্রীও কণ্ঠস্বর সপ্তমে তুললেন। কটু-কাটব্য পূর্ণ উক্তি উভয় পক্ষেই সমান ভাবে বর্ষিত হতে লাগলো।

আমি স্থানুর মতন দাঁড়িয়ে রইলুম। কলহটা এত সপ্তগ্রামে চ'ড়েছে যে তার মাঝখানে আমার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনা যায় না। তবুও সোণাপিসিকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করি।

পিসি এবং তাঁর পুত্র-বধূর এই দ্বৈত সংগ্রামের মাঝে বদনদা'ও ঝাঁপিয়ে পড়লেন। স্ত্রীর পক্ষ নিয়ে তাঁর নির্লজ্জ উক্তি আমার উপস্থিতিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করলো।

মা, তোমার এই ইতরমি সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এরপর হয় তুমি আমাদের ছেড়ে কাশী গিয়ে বাস করো, না হয়ত বলো আমরাই এ বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাই।

সোণাপিসি ছেলের কথায় গর্জন করে উঠলেন, কী, আমি ইতর? পেটের ছেলে হয়ে একথা তুই মুখে আনতে পারলি? ইতরেরও বাড়া হয়ে উঠেছো তুমি আজকাল। দিনরাত ছোটলোকদের মতন গালা-গাল মন্দ। ভদ্দরলোকের বাড়িতে এসব চলবে না বলে রাখছি। বাড়িটাকে একেবারে বস্তি করে তুলেছো!

পুত্রের এই জঘন্য মন্তব্যে সোণাপিসি ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠলেন, প্রতিবাদ বা প্রতি-আঘাতের ভাষা আর তাঁর কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হল না। মৃত স্বামীকে স্মরণ ক'রে পিসি ভাঙা কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে উঠতে যাচ্ছিলাম, সোণাপিসি বাধা দিলেন, দাঁড়া, আমিও যাবো।

কোথায় যাবে?

তোর সঙ্গে। পেটের ছেলে পর হতে পারে, কিন্তু ভাইয়ের ছেলে পর হয় না।

অগত্যা রাজি হ'তে হ'ল।

ঝগড়ার শেষ পর্বেই বাজারের থলি হাতে ক'রে বদনদা' বেরিয়ে গেছেন, আর বৌদিও রণে ভঙ্গ দিয়ে নিজের রুদ্ধ ঘরে খিল এ'টে দিয়েছেন।

রাগটা আমারও হয়েছিল। সোণাপিসির ছেলের এ স্পর্ধার একটা কড়া জবাব দেবারও ইচ্ছে ছিল। যত অন্যায়ই করুন না কেন পিসি, তবুও পুত্র এবং পুত্রবধূর কাছে এতদূর হেয় হ'য়ে থাকবেন কেন তিনি?

সোণাপিসিকে বললুম, চলো পিসি, আমার সঙ্গে লক্ষ্ণৌ যাবে। সেখানেও তোমার এক ছেলের বৌ আছে। এত অযত্ন কখনই করবে না সে।

পিসি ভাঙা টিনের বাক্সে সব গুছিয়ে নিলেন, কিন্তু যাত্রার সময় এক বিঘ্ন এসে উপস্থিত হল। দু' চোখ ভরা উদ্গত অশ্রুকে আর তিনি ঠেকিয়ে রাখতে পারলেন না, কত যত্নের সংসার তাঁর; কত আশা-আকাঙ্ক্ষা এখনও তাঁর মনে আছে। স্বামী না থাকলেও একটিমাত্র পুত্র; অনেক সাধের পুত্রবধূ। সংসার আলো করে আবির্ভূত হবে নাতি-নাতনী।

বদনদা' ফিরে আসতেই সোণাপিসি গ'লে গেলেন অন্ধ অপত্যস্নেহে; আজ আর যাওয়া হয় না গোবিন্দ। বদন আমাকে কিছুতেই ছেড়ে থাকতে পারে না বাবা। বৌ পরের ঘরের মেয়ে; কিন্তু ছেলে তো আমার পর নয়। সাত রাজার ধন এক মাণিক!

পিসি আমার আহারের তাগিদ দিয়ে পুত্রবধূকে আর এক প্রস্থ বাক্যবাণে জর্জরিত করে তোলেন, ছোটলোকের মেয়ের আক্কেল দেখো একবার। গোবিন্দ আমার কতক্ষণ ধরে এসে বসে আছে, এখনও পর্যন্ত তাকে দুটি খেতে দেবার ফুরসৎ হল না!

সোণাপিসির বাড়ি থেকে বার হবার সময় কেবলই আমার মনে পড়তে লাগলো, পিসির সেই স্বর্গগতা শ্বাশুড়ির কথা—মুখের আঁচে খৈ ফুটতো, বধূ নির্যাতনে যাঁর এতটুকুও শালিনতা বোধ ছিল না।

কিন্তু আশ্চর্য হলুম পিসির পুত্রবধূর এহেন পরিবর্তনে—সোণাপিসির এই কথায় যার ক্ষুরধার রসনাকে ইতিপূর্বে মুখর হ'তে দেখেছি এই স্বল্প কালের অবস্থিতিতে এখন আর তার মুখে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত নেই।

★

আবেশ

মৃণালকান্তি দাশগুপ্ত

অনেক বন্ধুর পথ পিছু ফেলে এলাম যেথায়
সেখানে প্রশান্তি কত—কতটুকু প্রাণের প্রবাহ?
স্মরণের গ্রন্থপত্র একে একে উল্‌টিয়ে দেখি
বিবর্ণ পাণ্ডুর রূপ ক্রমশই গাঢ়তর ঘোর।

এখানে সমুদ্ধত মৃত্যুরূপী হায়নার হানা—
সদম্ভে শোণিত সুরা পান করে লক্ষ পাত্র ভরি,
দুঃসহ ব্যথায় কাঁদে ধরণীর জরাজীর্ণ প্রাণ
ওঠেনি এখনও সূর্য—বিভৎসতা রাত্র ভরি চলে।

এখানে ধূসর সন্ধ্যা ঘনাইত বিষাদ লগন
শ্যামলীর কাঁচ শিশু অকালেই বিলীন মাটিতে।
জোয়ার আনে না বান জনতার স্তিমিত জঠরে
সুপ্ত এখনও তারা রাত্রির দুর্বল আঁধারে।

নাগিণীরা চুপি চুপি এখানে বিষাক্ত বিষ ফেলে
প্রিয়ার ললাট হ'তে মুছে নেয় সিঁথির সিঁদুর!
শিথিল স্তবকগুলি একে একে ঝরে বৃন্ত হতে
তাই নিয়ে ভেসে চলা এ নদী ও নদী মোহনায়।

ইঙ্গিত

ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

শব ব্যবচ্ছেদ করার ঘরে প্রবেশ করার আগে তরুণ সার্জেন বিনায়ক হাসপাতালের রেসিডেণ্ট সার্জেন অরূপ সান্যালের অপিসে ঢুকল একবার। অরূপ কিছুক্ষণ আগে স্লিপ দিয়ে তার সঙ্গে দেখা করার কথা বলেছিল একবার।

যে নার্সটির সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলছিল, বিনায়ক ঘরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে বিদায় দিলে অরূপ।

বোসো।

বসলুম, কি বলবে বলো শীগ্‌গির।

ছুরি হাতে নিয়ে কসাই-এর মত সব সময়েই তৈরি দেখছি তুমি। দু' মিনিট কথা বলতেও কর্তব্যবোধে বাধে বোধহয়!

চেয়ারে বসে দারুণ অস্বস্থিতে মুখখানাকে গম্ভীর করবার চেষ্টা করে বিনায়ক।

তুমি বোধ হয় আর দুদিন পরে স্বীকার করতেই চাইবে না যে আমরা কোনদিন একসঙ্গে পড়াশোনা করেছিলুম দু'জনে।

সে আশংকা বরং আমি করতে পারি তোমার সম্বন্ধে। আজ রেসিডেণ্ট সার্জেন আছো, কাল—

বেয়ারা এসে একখানা স্লিপ দিয়ে গেল অরূপ সান্যালের হাতে।

বসতে বলো।

চেয়ার ছেড়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল বিনায়ক। অযথা ভদ্রলোককে বসিয়ে রাখার মানে হয় না কোন। ক্ষমতার অপব্যবহার আমি সহ্য করতে পারি না মোটে।

উঠলে কেন, বসো, কথা আছে যে তোমার সঙ্গে!

পরিত্যক্ত চেয়ারখানায় ধীরভাবে বসে পড়ল এবার বিনায়ক। পাঁচ মিনিটের বেশি অপেক্ষা করতে পারবো না আমি—তা' বলে রাখছি।

হাসপাতাল থেকে সপ্তাহখানেক আগে ছাড়া পেয়েছিলেন যে ভদ্রমহিলাটি তিনি চিঠি লিখেছেন আমাকে। ভারি অদ্ভুত চিঠি!

চেয়ারটাকে ঠেলে খানিকটা এগিয়ে নিয়ে গেল বিনায়ক অরূপ সান্যালের দিকে।

অসংখ্য ধন্যবাদ আর আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শেষকালে লিখচেন,—'মরে পরজন্মে যেন হাসপাতালে আপনার মত ডাক্তারের হাতে পড়ি—এই আশীর্বাদ করুন শুধু আমায়।...'

অরূপ সান্যাল যে রকম সহজভাবে হেসে নিলে খানিকটা, বিনায়ক হাসতে পারলে না সেরকম সহজভাবে।

পুনশ্চ দিয়ে রসিকতা করে লিখেচে, 'খুকু এখানে আসার পর ভয়ানক বিরক্ত করতে সুরু করেছে,—যখন তখন বিনা নোটিশে কান্না-কাটি সুরু করে দিচ্ছে! কান্নাটা হাসপাতাল থেকে চলে আসার প্রতিবাদের দরুন কিনা সন্দেহ হয় আমার। সত্যি, ভয়ানক মন কেমন করচে আপনার আর সিস্টারদের জন্যে।'—অদ্ভুত চিঠি নয়? রোগীর পক্ষ থেকে এ ধরনের চিঠি আমার জীবনে এই প্রথম।

......চিঠির কথাই ভাবছিল এতক্ষণ বিনায়ক। সে চিঠিও ভদ্র-মহিলার, তবে হাসপাতালের প্রাক্তন রোগী নয় সে।

অনিমা এতদিন পরে হঠাৎ এভাবে চিঠি লিখবে ভাবতে পারেনি এক মুহূর্তের জন্যেও বিনায়ক। পাঁচ বছর আগেকার ভালবাসার মর্যাদা দেবে সে এতদিন পরে এবং চরম আঘাত হানবে একখানা চিঠির মধ্যে, কল্পনায় আসেনি সেকথা বিনায়কের।

কলেজে যখন একসঙ্গে পড়ত দুজনে তখন একদিন কথায় কথায় বলেছিল বিনায়ক, দেখবেন মিস্ চ্যাটার্জি, আপনার বিয়েতে নিমন্ত্রণ পাই যেন একটা। অনিমা অদ্ভুত ভঙ্গিতে মৃদু হাসতে হাসতে বলে-ছিল: আর সবাই ফাঁক পড়ুক আপনাকে ছাড়লে একেবারেই মাটি হয়ে যাবে বিয়েটা। আপনাকে যে একটা বিশেষ অংশ নিতে হবে আমার বিয়েতে।...এরপর চোখের চাহনির মধ্যে যে আবেদন ফুটে উঠেছিল অনিমার তার অর্থ বুঝতে বিলম্ব হয়নি একটুও বিনায়কের।

বছরখানেকের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হ'ল দুজনের মধ্যে। ইণ্টারমিডিয়েট পড়া শেষ করে মেডিকেল কলেজে এ্যাডমিশন নিলে বিনায়ক; অনিমা বি-এ ক্লাশে ভর্তি হবে বলেও কলেজে পড়া ছেড়ে দিলে শেষপর্যন্ত।

সেই অনিমা পাঁচ বছর পরে হঠাৎ চিঠি লিখলে বিনায়ককে।

......'যাবার আগে আপনার সঙ্গে দেখা করাবার জন্যে মনটা ছট্‌ফট্ করে উঠল ভীষণ। হাসপাতালে যাবার পথে দূর থেকে আপনার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে নিয়ে সে আশা পূর্ণ করেচি কিছুটা। আপনার সঙ্গে কথা বলবার ইচ্ছে জাগলেও প্রাণপণে দমন করেছিলুম সেটা। পাঁচ বছর আগেকার কলেজের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে আপনার? আমার সেসব কথা স্পষ্ট মনে পড়লেও জোর করে ভুলতে চেষ্টা করি এখন সেটা। জীবনে অনেককিছুই পেয়েচি, পরের ঘরকে নিজের মত করে সাজিয়ে নিজের করে নিয়েচি।—গিরিশবাবুর একটা কথা মনে পড়ে যাচ্ছে এখানে।—'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল।' —সত্যি আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল শেষপর্যন্ত!...... হঠাৎ কেন জানি না মনে হল অপনাকে আমার দুঃখের কথা জানাতে পারলে মনটা হাল্‌কা হবে অনেকটা। হয়ত হলও তাই।......সঙ্গে আমার একখানা ফটো পাঠাচ্ছি। দেখুন এ থেকে আগেকার অনিমাকে চিনতে পারেন কিনা?

—ইতি অনিমা

......শব ব্যবচ্ছেদাগারে গিয়ে শবের আবরণ উন্মোচন করে চমকে উঠল বিনায়ক। পকেট থেকে সদ্য পাওয়া অনিমার ফটো-খানা বের করে মেলে ধরলে চোখের সামনে সে খানিকক্ষণ। ফটো-খানার সঙ্গে আশমান্ ফারাক্ তফাৎ এখন অনিমার শব দেহটার।—অনিমা যে পটাসিয়াম সাইনাইড খেয়ে যথার্থই আত্মহত্যা করেচে শবদেহে ছুরি চালাবার আগেই এখন নিশ্চয় করে বলে দিতে পারে বিনায়ক!

পঁচিশে বৈশাখ

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

জাগে
পঁচিশে বৈশাখ। বাজে শাঁখ :
বৈশাখী সমীরে
উষার উদয় রাগে
ডাকে
বিহগেরা জীবনের তীরে
আজিকে তোমারে।

যেথায় পূরবী তুমি গেয়েছিলে সন্ধ্যাতটে বসি,
সেথা তব জন্মদিনে আশাবরী উঠেছে বিকশি
তটিনীর সুরে সুরে সংসারের প্রভাতের পারে।

জন্ম নিল নিখিলের উদয়-ভারতী
হে সূর্য্য সারথী!
এই দেশে, দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত দেশে
তব জনমের মহা কাব্যের উন্মেষে
দেবতার হে শ্রেষ্ঠ বিভূতি!
এই দিনে আবির্ভাবে তব ওঠে শত স্তবস্তুতি
সংসারের নানাদিকে
বিস্মিত করিয়া চির অনন্ত পথিকে!
ভারতের সভ্যতার সংস্কৃতির সর্ব্বোত্তম বাণী
তুমি ছিলে, গুরুদেব! প্রবাহিনী হোলো যে পাষাণী,
মুঞ্জরিল শুকতরু তব উদয়নে
সেই কথা পড়ে মনে!

সারস্বত কলস্বনা বহমান করে গেছ কবি
তারি গান বাজে
সপ্তর্ষি মণ্ডল মাঝে
অপাবৃণু রবি!
লোকে লোকে পরিক্রমা তব চির সৃষ্টি-আবর্ত্তনে
হে সুন্দর! ভুবনে ভুবনে

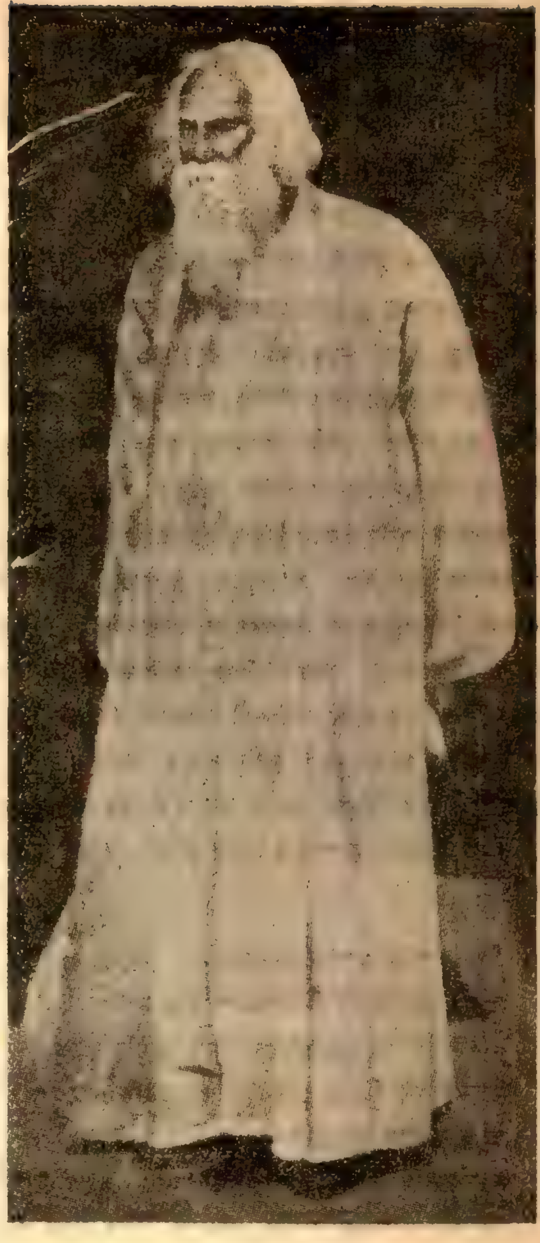

কালের অদৃশ্য চক্রে পদধ্বনি শুনি তব পরম বিস্ময়ে :
যুগ-যুগান্তের স্তরে বহে তব ভাবধারা কত অভ্যুদয়ে
কত পরিচয়ে
অমৃতের বার্ত্তা লয়ে
আসে তব জন্মতিথি বর্ষে বর্ষে এমনি বৈশাখে,
প্রণাম তোমারে করি, প্রণাম তোমাকে।

চিরশিশু রবীন্দ্রনাথ

শ্রীঅনুরূপা মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন চিরশিশু, তাই তিনি প্রৌঢ় বয়সেও প্রবীণতার পাদপীঠে পৌঁছেও শিশুমনের যে ছবিগুলি এঁকেছেন, কাব্যের মধ্যে তার তুলনা দিতে পারি এমন কিছু মনে পড়ে না। জীবনের শেষ অধ্যায়ে পৌঁছেও লিখেছেন "শিশু" "শিশু ভোলানাথ" "খাপছাড়া ;" শিশুমনের আসল রূপটী উপলব্ধি ক'রে শিশুর মতই উচ্ছ্বাসে আবেগে হয়েছেন তিনি মুখর। সংসার-উদ্যানের ছোট ছোট স্ফুটনোন্মুখ কুঁড়িগুলির জন্যে কবি আবার শিশুজীবন উপভোগ ক'রেছেন কখনো খেলাচ্ছলে, কখনো শৈশবলীলাকে রহস্যজালে মণ্ডিত ক'রে ; শিশুর কল্পনা রহস্য আরও মধুর। শিশু ভোলানাথে মাতৃহারা একটী শিশুচিত্তে দেখি মর্ম্মস্পর্শী বেদনায় বিরাজ করছে তার হারিয়ে যাওয়া মা ! সকল কাজে খেলাধুলার মাঝে, চলতে, ফিরতে, উঠতে, বস্‌তে মা তার সঙ্গ ছাড়া নয়, খোকার স্পষ্ট মনে না পড়ার মাঝে জড়িয়ে আছে মায়ের স্মৃতি—

"মাকে আমার পড়ে না মনে
শুধু কখন খেলতে গিয়ে হঠাৎ অকারণে
একটা কি সুর গুণগুণিয়ে কানে আমার বাজে
মায়ের কথা মিলায় যেন আমার খেলার মাঝে
মা বুঝি গান গাইতো আমার দোলনা ঠেলে ঠেলে
মা গিয়েছে যেতে যেতে গানটী গেছে ফেলে।"

খোকার মনে নেই শান্তি, খেলতে গিয়ে মনে পড়ে মাকে, সেই গলার সুর বাজছে কানে, ভোরে ঘুম ভেঙ্গে শিশির ভেজা শিউলী ফুলের গন্ধ এসে নাকে লাগে, তখন মনে পড়ে তার মাকে, দেবমন্দিরের ধূপধূনা ফুল চন্দনের গন্ধটী নাকে লাগে—তখন শিশুর মনে হয় এ বুঝি আমার মায়ের গায়ের গন্ধ, সে কল্পনায় দেখে তার মা ফুলের সাজি বয়ে আনতো, বিশ্ব ভুবন জুড়ে ছিল তার মা, নীলাকাশে চেয়ে মনে হয় বুঝি তার মায়ের চোখের দৃষ্টি, দূর আকাশে থেকেও মা তাকে দেখছে সেই অনুভূতিকে কেন্দ্র ক'রে মনে আসে অতীতের অবদান। মা যখন কোলে নিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতো, সেই চাউনী কি রেখে গেছে তার জন্যে ?

"কোলের পরে ধরে কবে দেখতো আমায় চেয়ে
সেই চাউনী রেখে গেছে সারা আকাশ ছেয়ে।"

মাতৃ অঙ্কচ্যুত শিশুর জীবনের প্রতিটী মুহূর্ত্তে জেগে আছে অব্যক্ত হাহাকার ধ্বনি, তাই তার কথায়, কাজে, কল্পনায় দেখতে পায়। মমতাশীল রবীন্দ্রনাথ মা-হারা অভাগার ছবি এঁকেছেন বুকভরা দরদ নিয়ে, বুঝি ব্যক্তিগত বেদনার উপলব্ধি হতে এসেছে এই অনুপ্রেরণা, তাঁর জীবনস্মৃতিতে বলেছেন, "বেলফুলের কুঁড়িগুলি আস্তে আস্তে কপালে বুলাতাম, মনে করতে চেষ্টা করতাম মায়ের হাতের আঙ্গুলের স্পর্শ পাচ্ছি"।

শিশুর মনে হাসি, আনন্দ, দুঃখ, বেদনা, শিশুর বীরত্ব, শিশুর ভাবপ্রবণতা, শিশুর নানা খেয়াল খুসীর ছবি এঁকেছেন অদ্ভুতভাবে, রবীন্দ্রনাথের নানা বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গীর এই দিকটী দেখে বিস্মিত হতে হয়। আমরা মায়ের জাত, মা, আপন সন্তানের বাল্য, শৈশব, কৈশোর, অবস্থার বিচিত্র মনোভাবের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিতা, তাই শিশুচিত্তের নানাদিক দেখেছি ও অনুভব করেছি, বিশ্বকবির উপলব্ধিতেও সেই চিরশিশু প্রকৃতি দোলা দিয়েছে বলেই সম্ভব হয়েছে "খাপছাড়া" পুস্তকে স্বরচিত চিত্রাবলী ও মধুর ছন্দ সমস্ত শিশু সমাজকে পরিবেশন করা। ছড়া ও ছড়ার ছবি শিশু-সাহিত্যে কবির অমূল্য দান। শিশুমনের বৈশিষ্ট্য তিনি উপলব্ধি ক'রেছিলেন সম্পূর্ণরূপে ; শিশুমনের মান, অভিমান, প্রত্যক্ষ হয়ে ফুটেছে তাঁর কাছে। কবি যেন দূরে দাঁড়িয়ে সুগভীর দরদ নিয়ে অনিমেষ আঁখিতে শিশুজীবনের অন্তরাল রহস্যের মধ্যে দৃষ্টি নিমজ্জিত করেছেন, তাই খোকার সম্বন্ধে বলেছেন—

"খোকা থাকে জগৎ মায়ের অন্তঃপুরে
তাই সে শোনে কত যে গান কত সুরে"

জন্ম কথায় এঁকেছেন অনুসন্ধিৎসু খোকার প্রশ্ন ও মায়ের স্বীকারোক্তি—

"খোকা মাকে শুধায় ডেকে
এলাম আমি কোথা থেকে
কোনখানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে?"

খোকার প্রশ্নে মায়ের চোখে জলের ধারা, মুখে হাসির ঝিলিক, এই বাস্তব কামনা যখন বালিকার অবচেতন মনে দানা বেঁধেছিল, সেই কামনায় সে খেলাঘরের নকল শিশু, প্রাণহীন পুতুলকে ছেলে সাজিয়ে করেছে কত আদর, যত্ন, বুক থেকে নামায়নি তার আদরের ধনকে। এই কামনা যে মায়েদের মর্ম্মগত, মজ্জাগত, সেই বহু সাধনার ধন মাণিক রতন এসেছে কোলে, মা বলছেন—

"ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝে।"

খোকা ছিল তার বাল্যের খেলাঘরে, শিবপূজার বর প্রার্থনায়, খোকা ছিল ঠাকুরের সঙ্গে জড়িয়ে, তখন ছিল খোকা অপ্রাপ্য, তাই দেবতার সঙ্গে শিশু-দেবতাও পূজা পেয়েছে। সেই শত সাধনার ধনকে বুকে পেয়ে আজ মার মন ভরেছে সার্থকতার আনন্দে, এই অপরূপ আশাতীতকে পেয়েও কি মার শান্তি আছে? সে ধন হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় মা ব্যাকুল, সর্ব্বক্ষণ ত্রাসে মাতৃ-হৃদয় কন্টকিত, তাই বলছেন—

"জানিনা কোন মায়ায় ফেঁদে
বিশ্বের ধন রাখব বেঁধে
আমার এ ক্ষীণ দুটী বাহুর আড়ালে"
(জন্ম কথা, শিশু)

কবি শুধু শিশুমনের ছবিই আঁকেননি, মায়ের কিশোরী মনের ছবিও এঁকেছেন নিখুঁৎ ভাবে, তাই মায়ের মনের ছবিও দেখতে পাই তাঁর কাব্যে—

"মা যবে ছিল কিশোরী মেয়ে
করুণ তারি পরাণ ছেয়ে
মাধুরী রূপে মুরছি ছিল
কহেনি কোন কথা"।...

কবি তাঁর কলমের স্পর্শে মাত্র প্রকৃতিকেই রূপ দেননি, বিশ্বের সুন্দর জিনিষ মাত্রেই তাঁর কাব্যে রূপ পেয়েছে;—কবি সর্ব্ব প্রাণের প্রতি স্পন্দন অনুভব করেছিলেন। শিশুরা চিরদিন রূপকথা প্রিয়, তাই শিশুর কল্পনার পক্ষীরাজ ঘোড়া কত তেপান্তরের মাঠ, কত দূরদূরান্তর, সাত সমুদ্র পেরিয়ে ভগবগিয়ে ছুটে চলে; শিশুর মনে বিরাজ করে রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, মেঘবরণ রাজকন্যার চিরন্তন কাহিনী; খোকার মুখে শুনি—

"সাতমহলা বাড়ী সেথা থাকেন সুয়োরাণী,
সাতরাজার ধন মাণিক গাঁথা গলার মালা খানি"
(রাজার বাড়ী, শিশু)

বৈচিত্র্য প্রয়াসী খোকার মনে কত সাধ জেগে আছে, কখন ভাবে নিজে কি মস্ত বীর, কখনো ঘাটের মাঝি, কখনো খোকা বনবাসের প্রয়াসী, কখন খোকা জ্যোতিষ-শাস্ত্র বিচার করছে, কখন খোকা সমালোচক, খোকার মনে ফেরিওয়ালা হবার সাধ,—

"ইচ্ছে করে শেলেট ফেলে দিয়ে
অমনি করে বেড়াই নিয়ে ফেরী"
(বিচিত্রসাধ, শিশু)

খোকা মাষ্টারমশায়ের আসনে বসে বিড়ালছানাকে উপদেশ দিচ্ছে—

"আমি ওরে বলি বার বার
পড়ার সময় পড়া পোড়ো
তারপরে ছুটিহয়ে গেলে
খেলার সময় খেলা কোরো" (মাষ্টারবাবু, শিশু)

শিশুর চোখে মায়ের চেয়ে সুন্দর, মায়ের চেয়ে বিজ্ঞ সমঝদার আর কেউ নাই, তাই সমালোচক খোকার মনে আর কিছু ভালো লাগেনা, একমাত্র মাকে ছাড়া—

"তোর মুখে মা যেমন কথা শুনি
তেমন কেন বলেন নাকো উনি?
ঠাকুমা কি বাবাকে কখনো
রাজার কথা শোনায় নিকো কোন!
সে সব কথা গুলি
গেছেন বুঝি ভুলি?" (সমালোচক, শিশু)

বিজ্ঞ খোকা খুকির ছেলে-মানুষীর জন্যে অভিযোগ করছে—

"সামনেতে ওর শিশুশিক্ষা খুলে
যদি বলি খুকি পড়া করো,
দুহাত দিয়ে পাতা ছিঁড়তে বসে,
তোমার খুকির পড়া কেমন তর ?" (বিজ্ঞ, শিশু)

মনের জগতে কল্পনার রাজ্যে খোকা মস্ত বীর, কল্পনায় মাকে নিয়ে একলা চলেছে নদীর পার দিয়ে, এমন সময় দস্যুরা এসে ঘিরেছে মার পাল্কী ; বীরপুরুষ বলছে—

"এমন সময় হাঁরে রে রে রে রে রে
ঐ যে কারা আসতেছে ডাক ছেড়ে,
তুমি ভয়ে পাল্কীতে এক কোণে
ঠাকুর দেবতা স্মরণ করছ মনে,
বেয়ারাগুলো পাশের কাঁটাবনে
পাল্কী ছেড়ে কাঁপছে থরো থরো ;
আমি যেন বলছি তোমায় ডেকে
আমি আছি ভয় কেন মা করো ?"

(বীরপুরুষ, শিশু)

খেয়ালী খোকার মনে কত সাধ জাগছে, তার সব সাধ সব কল্পনা মাকে কেন্দ্র করে সাধ মেটাতে চায়, খোকার বড় সাধ খেয়ার মাঝি হতে—

মা যদি হও রাজি
বড় হলে আমি হব
খেয়াঘাটের মাঝি" (মাঝি, শিশু)

খোকা শুনেছে সদাগরপুত্রের সাতনৌকা নিয়ে বাণিজ্য যাওয়ার কথা, খোকার মনে জেগেছে সেই বাসনা, তার নৌকা যাত্রার অভিলাষ—

"আমি কেবল যাব একটী বার
সাত সমুদ্র তের নদীর পার" (নৌকাযাত্রা, শিশু)

ছুটীর দিনে স্নেহপিপাসু খোকা খেলাধূলা কিছু চায়না, চায় খালি তার মাকে, তাই ব্যাকুল অন্তরে খোকা বলছে—

"আজকে আমার ছুটী আমার শনিবারের ছুটী,
কাজ যা আছে সব রেখে আয়, মা তোর পায়ে লুটি ;"

(ছুটীর দিনে' শিশু)

খোকা মায়ের কোলে বসে মায়ের মুখে শুনেছে রামায়ণের কাহিনী, রামের বনবাস, চিত্রকূট পর্ব্বতে কুটীর বেঁধে রামের অবস্থান, সেই কাহিনী তাকে লুব্ধ করেছে—

"চিত্রকূটে পাহাড়ে যাই এমনি বর্ষা রাতে
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার থাকতো সাথে সাথে"

(বনবাস, শিশু)

বিচিত্র মনোভাব নিয়ে খোকা কত জিনিষ দেখে, কত ভাবে, সেই সবকে কেন্দ্র করে আছে খোকার মা ! তাই খোকা আকাশের চাঁদ দূরে কি নিকটে সেই তর্ক করছে—খোকার জ্যোতিষশাস্ত্রে আছে চাঁদের সমান হয়ে তার মায়ের মুখ—

"মা আমাদের হাসে যখন ঐ জানলার ফাঁকে
তখন তুমি বলবে কি মা অনেক দূরে থাকে ?"

(জ্যোতিষশাস্ত্র, শিশু)

দাদার ভ্রান্তি ঘোচাবার জন্যে খোকা বোঝাচ্ছে—

"মা আমাদের চুমো খেতে মাথা করে নীচু
তখন কি মার মুখটী দেখায় মস্ত বড় কিছু ?"

(জ্যোতিষশাস্ত্র, শিশু)

নব আষাঢ়ের বৃষ্টিধারা নেমেছে চারিদিকে, মাটীর বুকে ফুটেছে কতফুল খোকা নিজের কল্পনা দিয়ে—তারা যে ফুল নয়,স্কুলের ছেলেকে তারই বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেখাচ্ছে—

"তুই যে ভাবিস ওরা কেবল অমনি যেন ফুল
আমার মনে হয় মা তোদের সেটা বড় ভুল,
ওরা সব হাইস্কুলের ছেলে পুঁথিপত্র কাঁখে
মাটীর নীচে ওরা ওদের পাঠশালাতে থাকে।"

(বৈজ্ঞানিক, শিশু)

মাতৃবৎসল খোকা কখনো মেঘ হয়ে মাকে বলছে চাঁদ হতে, কখনো বলে ঢেউ হতে, খোকা মাকে ছেড়ে পারবে না কোথাও যেতে, তার সব সাধ কল্পনা মাকে জড়িয়ে, তাই খোকা ঠিক করেছে—

"তার চেয়ে মা আমি হব ঢেউ
তুমি হবে অনেক দূরের দেশ,
লুটিয়ে আমি পড়বো তোমার কোলে
কেউ আমাদের পাবেনা উদ্দেশ"।

(মাতৃবৎসল, শিশু)

নতুনত্ব প্রয়াসীর ফুল হয়ে চাঁপা গাছে ফুটতে সাধ—

"সন্ধ্যাবেলা প্রদীপখানি জ্বেলে
যখন তুমি যাবে গোয়াল ঘরে
আমি তখন ফুলের খেলা খেলে
টুপ করে মা পড়বো ভুঁয়ে ঝরে"।

(লুকোচুরি, শিশু)

খোকা বিদেশে যাচ্ছে দূর তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে যেখানে সোনার গাছে হীরার ফুল ফোটে, সেখান হতে মার জন্যে আনবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন—

"তোর তরে মা দেব কোটা খুলি,
সাত রাজার ধন মাণিক একটী জোড়া"

(দুঃখহারী, শিশু)

খোকা বিদায় চাইছে, কিন্তু খোকা নিজের মন দিয়ে বুঝেছে খোকা তার মায়ের কতখানি জুড়ে আছে, তাই মাকে বলছে মায়ের মনের কথা—

"বলিস খোকা সে কি হারায়
আছে আমার চোখের তারায়
মিলিয়ে আছে আমার বুকের কোলে।"

(বিদায়, শিশু)

রবীন্দ্রনাথের অন্তর্দৃষ্টিতে শিশুমনের প্রতি সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা, ভাল মন্দ, লাভ ক্ষতি, আনন্দ উল্লাস, ব্যথা বেদনা, হাসি, অশ্রু কিছুই বাদ পড়েনি। শিশু-মনের অনুভূতি, তার উপলব্ধি, অভিযোগ, অভিমান, তার বহু বিচিত্র মনের অজস্র ছবি তার মনের কথা এমন করে কোন কবি কোন দিন আঁকেন নি। জীবন-স্মৃতিতে দেখা যায় তাঁর অনেক আকাঙ্ক্ষা, অনেক ব্যর্থতা শিশু কাব্যে কবিতার রূপ নিয়েছে। শিশু কাব্যে মধুর বাৎসল্য রস অপরূপ রূপ লাভ করেছে অপূর্ব্ব রহস্য নিয়ে। শিশুকে তিনি দেখেছেন বিশ্বজীবনের খণ্ড অংশ রূপে। মানব জীবনের দীপ্তির একটী পরম প্রকাশ তিনি দেখেছেন শিশুর মধ্যে। "শিশু", "শিশু ভোলানাথ" "খাপছাড়া" এগুলি তো শিশুর মুখের কথা নয়, শিশুকে আশ্রয় করে বাৎসল্য রস যখন কবির মধ্যে মূর্ত্তি নিয়েছে তারই বহিঃপ্রকাশ।

শিশুর নানা খেয়াল নিয়ে কবির চিত্তে উঠেছে তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসা, কোন কোন কবিতায় ব্যথার আভাসও পাওয়া যায়। স্নেহ মধুর বাৎসল্য রস, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, বাল্যের নিঃসঙ্গ দিনগুলির স্মৃতি তার ব্যথা বেদনা রবীন্দ্র-নাথের মনে শিশু কাব্যের প্রেরণা দিয়েছে। কবি শুধু শিশুকাব্যই লেখেন নি, শিশুনাটকও লিখেছেন অনেক, তিনি বলেছেন "শিশুরা ধনলোভী নয়, ওরা খেলা করবে ধ্বনি নিয়ে" কবির বাল্যের বিচিত্র অভিজ্ঞতার একথা বলাই সম্ভব। ডাক ঘরে একটী বালকের সঙ্গে নিজের ছেলেবেলার চরিত্রের সামঞ্জস্য দেখিয়েছেন, মুকুট রচনায় রাজ্যধরের চরিত্র এঁকেছেন তার স্বভাবসিদ্ধ নিপুণতার সঙ্গে। শিশুদের ভালবাসতেন একান্তভাবে তাই শিশু-সমাজকে দিয়ে গেছেন কাব্য, নাটক, ছড়া, ছবি। তিনি ছিলেন শিশুসাথী, চিরন্তন শিশু তার অন্তরের অন্তঃপুরে বাস করতো, জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত। মানবের সচেতন মনের তলায় বাস করে শিশুপ্রকৃতি, তার জরা আসেনা, বার্দ্ধক্য নাই, সে লীলাকুশলী নতুনত্বের প্রয়াসী, তারই প্রমাণ পায় রবীন্দ্রকাব্যে শিশু-সাহিত্যে।

★

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি।
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।
ধরায় আছে যত মানুষ শত শত
আসিছে প্রাণে মোর হাসিছে গলাগলি।

—রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের 'দুই বোন'

শ্রীতারক ঘোষ

প্রিয়া ও গৃহিণী, নারীচরিত্রের এই দুইটি রূপের কল্পনা রবীন্দ্র-কাব্যধারায় প্রথম হইতেই দেখা যায়। অসংখ্য কবিতায় তিনি রমণীকে কখনও বা মদিরাবেশময়ী নারী-রূপে আবার কখনও বা শান্তশ্রী গৃহিণীরূপে চিত্রিত করিয়া আসিয়াছেন। নারীর এই দুইটি রূপ সম্পর্কে সচেতনতা তাঁহার মনে সর্ব্বপ্রথম যে কখন আসিয়াছে তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন—তবে বোধ হয় চিত্রার 'রাত্রে ও প্রভাতে' কবিতায় তিনি নারীর এই দ্বৈধী মূর্ত্তি সর্ব্বপ্রথম অঙ্কন করিয়াছেন। বলাকার ২৩ সংখ্যক কবিতায় দেখিতে পাই যে নারীপ্রকৃতির এই দুইটি রূপকে তিনি যেন পৌরাণিক আখ্যায়িকার পটভূমিকায় উপলব্ধি করিতে উৎসুক হইয়াছেন,

কোন ক্ষণে
সৃজনের সমুদ্র মন্থনে
উঠেছিল দুই নারী
অতলের শয্যাতল ছাড়ি।
একজনা উর্ব্বশী, সুন্দরী,
বিশ্বের কামনারাজ্যে রাণী,
স্বর্গের অপ্সরী।
অন্যজনা লক্ষ্মী সে কল্যাণী
বিশ্বের জননী তাঁরে জানি,
স্বর্গের ঈশ্বরী॥

সৃজনের সমুদ্র মন্থনে এই যে দুই নারীর উদ্ভব হইয়াছে, ইহারা সহোদরা। একজনের রক্তস্রোতে সমুদ্রের তরঙ্গের আবেগ উচ্ছলতা,—সে যাহা কিছু স্পর্শ করে তাহার মধ্যেই একটা ফেনিল উচ্ছ্বাস জাগাইয়া দিয়া চলিয়া যায়। অপরার মধ্যে রত্নাকরের গভীরতা, ব্যাপ্তি,—সে যাহা কিছু স্পর্শ করে তাহার উপর যেন স্নিগ্ধ শান্তির একটা প্রলেপ বুলাইয়া দেয়।

শর্ম্মিলার মধ্যে লক্ষ্মীর এই মাধুর্য্য এই প্রশান্তি ছিল। স্বামী শশাঙ্কের জীবনকে সে স্নেহরসে ভরিয়া দিতে চাহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাহাকে গৃহিণী-মায়ের জাত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। মাতা যেমন সন্তানকে তাহার স্নেহময় হৃদয় দিয়া আবৃত করিয়া রাখে, সন্তানের প্রতিটি দিন যেমন করিয়া আপনার স্নেহহস্তের লালনে ভরিয়া দেয়, শর্ম্মিলাও তেমনই শশাঙ্কর জীবনকে তাহার স্নেহ বিহ্বল সেবা দিয়া ভরিয়া রাখিয়াছিল। শর্ম্মিলা স্বামীর জীবন-সংগ্রামে সঙ্গিনী হইতে চাহে নাই, তাহার নর্ম্ম-সহচরী হওয়াও তাহার কাম্য ছিল না—সে কেবল একটি বয়স্ক ছেলেমানুষের দিনগুলিকে আপনার কর্ম্মশীল কল্যাণ-হস্তের স্পর্শ দিয়া সুমধুর করিয়া তুলিতে চাহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ শর্ম্মিলার রূপের আভাস দিতে গিয়া তাহার বড়ো বড়ো শান্ত চোখ, ধীর গভীর চাহনি, জলভরা নব মেঘের মতো স্নিগ্ধ শ্যামল নধর দেহের উল্লেখ করিয়াছেন; তাহার বেশভূষার মধ্যে প্রসাধনের ভাষার চেয়ে শুভ সাধনের ভাষাই যে বেশি করিয়া ব্যক্ত হইত সে ইঙ্গিত তিনি করিয়াছেন; শশাঙ্কর জীবন হইতে সে যে সকল শ্রীহীনতাকে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিল, তিনি সে কথা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন।

কিন্তু পুরুষ বোধ করি নারীর এই মাতৃমূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ করে না। সে চিরকাল একটা স্নেহতৃপ্ত শান্ত জীবনযাপন করিতে পারে না। তাহার রক্তের স্রোতে যে একটা গোপন উন্মাদনা থাকে তাহা যে কিসে পরিতৃপ্ত হয় তাহা কি সে জানে?—শশাঙ্ক শর্ম্মিলার স্নেহের মাধুরীতে একটা নিবিড় সুখ উপভোগ করিতেছিল সন্দেহ নাই—কিন্তু তাহার মধ্যে যে পৌরুষ ছিল তাহা দিন দিন যেন কিসের প্রতীক্ষায় অধীর হইয়া উঠিতেছিল। শর্ম্মিলার টাকা লইয়া সে যখন ব্যবসায়ে নামিল, তখন তাহার পৌরুষ কর্ম্মসাফল্যের মধ্য দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতে

চাহিল—স্ত্রীর ঋণ শোধ করিবার দুর্দ্দম আকাঙ্ক্ষা তাহাকে পাইয়া বসিল। স্ত্রীর ঋণ শোধ হইল, তবু তাহার কাজের নেশা ছুটিল না। মৃত্তিকার স্নেহরস লালিত বনস্পতি যেমন ধরণীকে বিস্মৃত হইয়া ঊর্দ্ধ আকাশের দিকে হাত বাড়াইয়া থাকে, তেমনই শশাঙ্ক শর্ম্মিলার শান্ত সেবা হইতে আপনার জীবনরস গ্রহণ করিয়া তাহাকে যেন বিস্মৃত হইয়া আপনার পৌরুষকে দিগন্তসঞ্চারী করিয়া তুলিতেছিল—এমন সময় সোণালী রৌদ্রের উত্তপ্ত মাধুর্য্য লইয়া দেখা দিল উর্ম্মিমালা।

উর্ম্মি গৃহিণী নয়, সে প্রিয়া। সে স্বর্গের ঈশ্বরী লক্ষ্মী নয়, সে স্বর্গের অপ্সরী উর্ব্বশীরই সগোত্রা। এই প্রিয়া

···তপোভঙ্গ করি
উচ্চহাস্য-অগ্নিরসে ফাল্গুনের সুধাপাত্র ভরি
নিয়ে যায় প্রাণমন হরি—
দু হাতে ছড়ায়ে তারে বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপে,
রাগরক্ত কিংশুকে গোলাপে
নিদ্রাহীন যৌবনের গানে।

উর্ম্মিমালা কর্ম্মসাধক শশাঙ্কমৌলির তপোভঙ্গই করিয়াছে। বসন্তসখা যখন তাহার পুষ্পশর হানিয়া দেবাদিদেব মহাদেবের তপোভঙ্গ করিয়াছিল, তখন বসন্ত পুষ্পাভরণময়ী পার্ব্বতীর যে মদির আকর্ষণ ছিল, উর্ম্মিমালার তাহা ছিল না—অপর্ণা উমার যে একনিষ্ঠ সাধনায় ধূর্জটি স্বয়ং আসিয়া তাঁহার আশ্রমে অতিথি হইয়াছিলেন, তাপসীর সেই নিস্তরঙ্গ জীবনাদর্শও তাহার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শশাঙ্কর জীবনে উর্ম্মি আসিয়াছে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে—তাহার প্রতিদিনকার সাহচর্য্য কী করিয়া যে শশাঙ্কর জীবনে প্রেমরাগ সঞ্চার করিয়াছে তাহার লেখ-চিত্র অঙ্কন করা সম্ভবপর নয়। সংস্কৃত কাব্যের নায়ক-নায়িকার মতো একটিবার দেখিয়াই তাহাদের চেতনায় প্রণয়ের ঘোষবতী ধ্বনিত হয় নাই। দিনের পর দিন দুইটি অসমবয়সী অথচ সমপ্রকৃতির নরনারীর সখ্য গাঢ়তা লাভ করিয়াছে। সহসা এক মহা মুহূর্ত্তে তাহারা তাহার মধ্যে হৃদয়ের রক্তিমা আবিষ্কার করিয়াছে, পুরুষ অনুভব করিয়াছে যে এই প্রেয়সী নারীর দুর্নিবার আকর্ষণই তাহার জীবনের শেষতম সত্য। নারী উপলব্ধি করিয়াছে যে তাহার নিজের মধ্যে কী যেন একটা ছিল যাহা ঐ পুরুষকে তাহার কাজের মধ্য হইতে টানিয়া আনিয়াছে; আপনাকে ভরিয়া লইবার একান্ত মোহে সে তাহাকে দিন দিন রিক্ত করিয়া ফেলিয়াছে।

শশাঙ্কর এই প্রেম তাহার পারিবারিক জীবনের দিক হইতে বিচার করিলে একটা বিরাট অন্যায়। কিন্তু মানুষের জীবন তো সুনীতির সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ নয়—তাহার দাবিকে বিশ্লেষণ করিয়াও হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। শর্ম্মিলা তাহার স্বামীকে যাহা দিয়াছে তাহার প্রতিদান পায় নাই কি? শর্মিলা উপলব্ধি করিয়াছে যে উর্মি তাহার স্বামীকে যাহা দিয়াছে তাহা সে দিতে পারে নাই—উর্মি শশাঙ্কর নিকট যাহা পাইতেছে তাহা পাইবার অধিকার তাহার নিজের ছিল কি না সে বিষয়ে শর্মিলা সংশয় পোষণ করিয়াছে। শর্মিলা তাহার স্বামীকে ভালবাসিয়াছে—কিন্তু তাহার পুরুষসত্তাকে সে জয় করিতে পারিয়াছিল কি? পারে নাই! যে স্নেহময় নীড়টি শর্মিলা গড়িয়াছিল তাহার মধ্যে সে স্বামীকে একান্ত আপন করিয়া পাইয়াছিল—কিন্তু শশাঙ্কর পুরুষসত্তা অন্যত্র পরিতৃপ্তি খুঁজিতে চাহিয়াছিল। বাহিরের কাজের দুর্দ্দম নেশার মধ্যে পুরুষ শশাঙ্ক আত্মগরিমা আবিষ্কার করিয়াছিল। উর্মিমালার মধ্যেও সে আপনাকে খুঁজিয়া পাইয়াছিল বলিয়াই সে তাহার দিকে ঝুঁকিয়াছে; তাহার প্রতি আকর্ষণের মধ্যে একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দানুভূতি ছিল বলিয়াই সে আপনার গোচরে বা অগোচরে তাহার সাহচর্য কামনা করিয়াছে। তাহার পুরুষসত্তা কর্ম্মের পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া প্রেমের মোহে আবদ্ধ হইয়াছে।

উর্মিমালার জীবনেও এমনই একটা প্রেমের প্রতীক্ষা ছিল, নীরদের সহিত তাহার জীবন গ্রথিত করিবার একটা প্রস্তাব পূর্ব্ব হইতেই উঠিয়াছিল এবং সেই সূত্রেই নীরদ তাহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু নীরদের শিক্ষাবিধির মূলে মস্তিষ্ক থাকিলেও প্রাণ ছিল না। উর্মিমালার চঞ্চল চিত্ত তাহাকে স্বীকার করিতে পারে নাই। স্বর্গগত অগ্রজের কথা স্মরণ করিয়া সে কর্ত্তব্য পালন করিতে আগ্রহশীল হইবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু তাহার প্রকৃতি এই বাঁধনের মধ্যে তৃপ্তিলাভ করে

নাই—প্রাণরসের প্রাচুর্য তাহার মধ্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। এইজন্যই নীরদের বাতাবরণ কাটাইয়া যখন সে শশাঙ্কর কাছে আসিয়াছে তখনই সে তাহাকে ভালোবাসিয়াছে। তাহার প্রকৃতির মধ্যে যে উচ্ছলতা ছিল তাহা কৃত্রিম সংযমের মধ্যে বাঁধা পড়ায় সে একটা অতৃপ্তির বেদনা ভোগ করিতেছিল। শশাঙ্কর সন্নিধি সেই অতৃপ্তির গুমট কাটাইয়া যেন মাধুর্যের কালবৈশাখীতে তাহাকে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছিল এবং ইহা প্রণয়ের সন্ধ্যারাগে পরিণতিলাভ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ শেষজীবনে চিত্রকলার প্রতি অনুরাগের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। যে সকল ছবি তিনি আঁকিয়াছিলেন সেগুলি বর্ণাঢ্য নয়, সেগুলির মধ্যে রচনার প্রাচুর্য নাই—সবল হস্তের স্বল্প আঁচড়ে তিনি ভাবমূর্ত্তিকে রূপায়িত করিয়াছেন। সংক্ষিপ্ত রেখাপাতের প্রতি তাঁহার অনুরাগ তাঁহার শেষজীবনের রেখাগুলির মধ্যেও সুপ্রকট। সেই জন্যই দেখি যে এখানে ঔপন্যাসিকের বিশ্লেষণী রীতি অবজ্ঞাত হইয়াছে, কবির লেখনীও বুঝি কখন পরিত্যক্ত হইয়াছে; শিল্পী রবীন্দ্রনাথ যেন তুলির আঁচড়ে তাঁহার মনের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। অন্যান্য অনেক রচনার মতোই দুই বোনের মধ্যেও ছবির সমষ্টি আছে এবং উপন্যাস রচনার স্মার্ত্ত বিধান সেখানে উপেক্ষিত।

এই জন্যই, যে কথা তিনি বলেন নাই, সে কথা-গুলিকে আমাদের কল্পনার সাহায্যে অনুভব করিতে হয়। উর্মিমালার আত্মউপলব্ধির একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র আছে—হোলির রাত্রে ফাল্গুনের দমকা হওয়ায় যেন তাহার মনের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে। সে যে কী করিয়া কর্ম্মপাগল শশাঙ্ককে তাহার আবেষ্টনী হইতে জয় করিয়া আপনার করিয়া লইয়াছে তাহার বিস্তৃত বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ দেন নাই। শশাঙ্কর ক্ষেত্রে আত্মসমীক্ষণ একেবারেই উপেক্ষিত হইয়াছে। দুই বোনের সুনিবিড় আকর্ষণের মধ্যে পড়িয়া তাহার হৃদয়ের মধ্যে সুতীব্র বিক্ষোভ জাগে নাই কি? সে শর্মিলাকে দেবীর আসনে বসাইয়া উর্মির পাণিগ্রহণে অগ্রসর হইয়াছে—কিন্তু তাহার এই সিদ্ধান্তের মূলে কি মর্ম্মবিদারী দ্বিধা ছিল না? পুরুষ কি এত সহজেই নারীকে পরিত্যাগ করিতে পারে—অতীত দিনের জন্য তাহার হৃদয়ে কি এতটুকু মমতাবোধ থাকে না?

তাহাই যদি থাকে তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথ শশাঙ্কর সেই দ্বিধার চিত্র অঙ্কন না করিয়া কেবলমাত্র উর্মিমালার প্রতি তাহার আকর্ষণের চিত্রটিকেই ফুটাইয়া তুলিলেন কেন? এই প্রশ্ন পাঠকবৃন্দকে বিদ্ধ করিলেও বস্তুত ইহার উত্তর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের রচনার চিত্রানুগা প্রকৃতির কথা স্মরণ করিয়াই তাহাদের নিরস্ত হইতে হয়।

বিকাশের সহিত বিশ্লেষণ নাই বলিয়া শর্মিলার চরিত্রও আমাদের নিকট অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হওয়া অসম্ভব নয়। যখন সে অসুস্থা হইয়া স্বামীর পরিচর্যার জন্য আপনার ভগিনীকে আহ্বান করিয়াছে তখন তাহাকে আমরা সহজেই চিনিতে পারি। যখন সে দেখিয়াছে যে তাহার স্বামী উর্মিমালার সাহচর্যে আনন্দ উপভোগ করিতেছে এবং মনের মধ্যে বেদনা পোষণ করিয়াও সে তাহাতে প্রশ্রয় দিতেছে তখনও তাহাকে বুঝিতে আমাদের কষ্ট হয় না। তাহাদের বিবাহের সাম্বৎসরিক দিবসে শশাঙ্ক যখন উর্মিমালাকে লইয়া ষ্টীমলঞ্চে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছে এবং মর্ম্মাহতা হইয়া শর্ম্মিলা কাঁদিয়া উঠিয়া বলিয়াছে, 'ঠাকুর তুমি মিথ্যে', তখন তাহার বিক্ষুব্ধ নারীহৃদয় আমাদের নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে যখন তাহার স্বামী ও ভগিনীর বিবাহের আয়োজন করিতে উদ্যত হইয়া সমস্ত বিক্ষোভের একটা শান্তিপূর্ণ অবসান ঘটাইয়া দিতে চাহিয়াছে, তখন তাহাকে যেন কতকটা রক্তমাংসহীন আদর্শ চরিত্র বলিয়া বোধ হয়। তাহাকে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে চিত্রিত করিয়াছেন তাহাতে তাহার এই সঙ্কল্পকে অভাবনীয় বলিয়া মনে হয় না বটে, কিন্তু কুন্দ ও নগেন্দ্রের বিবাহ ঘটাইবার জন্য সূর্য্যমুখীর চেষ্টার মূলে যে একটা প্রত্যাশা ছিল এখানে যেন তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সূর্য্যমুখী স্বামীকে সুখী করিতে চাহিয়াছিল, শর্ম্মিলাও তাহাই চাহিয়াছে—তাহা ছাড়াও সহোদরার প্রতি তাহার হৃদয়ের আকর্ষণও ছিল, কিন্তু তবুও সূর্য্যমুখী-নগেন্দ্রনাথ-কুন্দ ও শর্ম্মিলা-শশাঙ্ক-উর্ম্মির চরিত্র কল্পনার মধ্যে যে একটা

মৌলিক পার্থক্য আছে তাহাই তাহার সঙ্কল্পকে স্বাভাবিক করিয়া গ্রহণ করিবার অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্য্যন্ত উর্ম্মিমালা ও শশাঙ্কর বিবাহ ঘটিতে দেন নাই। উর্ম্মি আপনাকে অতি সন্তর্পণে সরাইয়া লইয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে এই বিবাহ স্বাভাবিক বা শিল্পসঙ্গত কোনটিই হইত না। শশাঙ্ক ও উর্ম্মির প্রণয় যতই নিবিড় হউক না কেন, উভয়েই বিশেষ করিয়া উর্ম্মি শর্মিলা বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে এই বিবাহে সংকোচবোধ করিয়াছে। শর্মিলার পক্ষেও এই বিবাহ ঘটানোর সংকল্প স্বাভাবিক ব্যাপার নহে। সে আপনার মর্ম্মবেদনাকে লুকাইয়া রাখিয়াই এই বিবাহের মধ্য দিয়া সমস্ত বিক্ষোভ প্রশমিত করিতে চাহিয়াছিল। এই বিবাহ হইলে একটি সুপাঠ্য সুগোল গল্প আমরা পাইতাম—তাহাই যদি গল্পটির পরিণাম হইত তাহা হইলে শিল্পের সৌন্দর্য্যহানি ঘটিত। আধুনিক যুগের জীবননাট্যে বাসবদত্তা রত্নাবলীর সহিত স্বামীর পরিণয় ঘটাইয়া দিলে ভরতবাক্য উচ্চারিত হইতে পারে না। সূর্য্যমুখী কুন্দর সহিত স্বামীর বিবাহ দিয়া শান্তির আশা করিয়াছিল। কিন্তু সকলের অলক্ষ্যে যে বিষবৃক্ষ-রোপিত হইয়াছিল, তাহার ফলের সুতীব্র বিষজ্বালা তাহাকে নগেন্দ্রনাথকে ও কুন্দকে জর্জ্জরিত করিয়াছে। শশাঙ্ক ও উর্মির বিবাহ হইলেও এমনই একটা হলাহলের জ্বালা তাহাদের জীবনকে ছারখার করিয়া দিত। শর্মিলা আপনার বঞ্চিত জীবনের বেদনার দাহ লইয়া কোন সময় অগ্ন্যুৎপাতে ফাটিয়া পড়িত—বাহিরের ও অন্তরের দাহে উর্মি তিলে তিলে শুকাইয়া যাইত—যে তীব্র পিপাসা শশাঙ্কর জীবনকে একটা সুখকর বেদনায় ভরিয়া দিয়াছিল, তাহা হয়তো নিদারুণ বিতৃষ্ণায় পর্য্যবসিত হইত।

কিন্তু সেই সর্ব্বনাশের দাবদাহ সৃষ্টি করা রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত ছিল না; ইহা তাঁহার রচনার প্রকৃতিও নয়। শশাঙ্ক ও উর্মির প্রেমের বেদনাময় আনন্দকে তিনি রূঢ় বাস্তবের মধ্যে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিতে চাহেন নাই। কীটসের মত তিনিও অনুভব করিয়াছিলেন যে মোহাবিষ্ট প্রেম মিলনের পর বিরাগই টানিয়া আনে। সুতরাং কীটসের মতোই তিনি সেই প্রেমকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কাহিনীর উপর যবনিকা টানিয়া দিয়াছেন, যাহা—

'For ever warm and still to be enjoy'd
For ever panting and for ever young;
All breathing human passion far above
That leaves a heart high sorrowful
and cloy'd
A burning forehead and a pearching tongue.'

কবি রবীন্দ্রনাথের ভাবলোকে যে উর্বশীর জন্ম, তাহাকে তিনি মর্ত্ত্যের ধূলিতে মলিন করিয়া দিতে পারেন না। উর্মিমালা যে প্রিয়ার প্রতীক তাহার জন্য দিশে দিশে ক্রন্দসী কাঁদিতে থাকে—তাহা পুরুষের নিত্য কামনার ধন। পুরুষ শশাঙ্কর প্রাণের ক্রন্দনে তাহার জন্য আশা চিরকাল জাগিয়া থাকিবে।

রবীন্দ্রনামা

প্রফুল্ল রায়

রবিপ্রয়াণের পর একটা দশক পেরিয়ে গিয়েছে, নৈরাশ্যের অসরল পথ বেয়ে মানুষ অজানা-বিক্ষুব্ধ দিগন্তে পদসঞ্চার করেছে। রয়েছে রাজনীতির জটিলতা, লোভ-লিপ্সার অবিরাম হুঙ্কার; ক্লেদাক্ত পৃথিবীর আকাশে-বাতাসে হৃদয়হীন মানুষের দুর্ভেদ্য দুর্গের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। বিশ্বপ্লাবিত দ্বিতীয় নরমেধের শ্মশানে তৃতীয় মহাযুদ্ধের অঙ্কুর আকাশের দিকে মাথা তুলেছে। এই দশটা বছরের নিরুচ্ছ্বাস ও নীরস পটভূমিতে কেবলমাত্র মানস-মৃত্যুর শোভাযাত্রা; হাহাকারের কালবৈশাখী আকাশগঙ্গার স্বপ্নকে, তার বর্ণসমৃদ্ধিকে মুছে দিয়েছে পৃথিবীর মাটি থেকে।

অথচ মানুষ রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন, শুনেছেন তাদের গ্লানি-বেদনার ক্রন্দন। অনাদিকাল থেকে ইতিহাসের চষা পথ বেয়ে বেয়ে যে মানুষগুলো এই বিংশ শতাব্দীর ছল্পা-মন্দ্রিত বন্দরে এসেছিল, উপস্থিত হয়েছিল যাযাবর আশা-আবেগের সেতু বেয়ে, তারা যুগে যুগে জীবনকে দেখেছে, শুনেছে অভ্যুত্থানের বাজনা, আবার কখনও বা অন্ধ-তমসায় ঝাপসা হয়ে হারিয়ে গিয়েছে। তারপর আবার দিকে দিকে ঝঙ্কার উঠেছে পদধ্বনির—মানুষের পদপাতের। ইতিহাস আর সময়, জীবন আর মানুষ, এই নিয়ে সুন্দর অব্যাহত ও বর্ণসমৃদ্ধ পৃথিবীর পরিসর। নতুন ক্রান্তির দিকে অগ্রযাত্রা, স্তিমিত ভাব-সাধনা – এই নিয়ে মানুষের আবহমান থেকে জীবন-সমস্যা। আর সমস্যা আছে বলেই জীবন সুস্বাদু; বিচিত্র। রবীন্দ্রনাথ এই চিরমানুষের কথাই ধ্বনিত করে তুলেছেন—

আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত ওঠে ধ্বনি;
আমার বাঁশীর সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি।

একদল মানুষ আছে যারা যুগে যুগে কোটি কোটি মানুষের স্বর্ণ-উচ্ছ্বসিত দিগন্তকে পঙ্গপালের মত ছেয়ে দিয়েছে, শোণিত-বন্যায় পৃথিবীপথ তরঙ্গময় হয়ে উঠেছে; শান পড়েছে শড়কি বল্লমের উজ্জ্বল অগ্নিফলকে। এই মানুষগুলো নানা রূপে, নানা বর্ণে আত্মপ্রকাশ করেছে নানা সময়ে। পৃথিবী উদ্বেল হয়েছে, তবু পুরযায়ী মানুষ মরে নি, সে মরতে পারে না, সে অমৃত-সন্তান। পুরাতন পৃথিবী থেকে আজ পর্য্যন্ত সব জ্ঞানী-সাধকেরা এই মানুষের ধ্যান করে আসছেন। এদেরই পদপাত সাধকের সাধনায়, কথকের কণ্ঠে, বাউলের একতারায়। নানা রূপে এই শাশ্বত মানুষের তপস্যা চলেছে; আর সমবেত সাধনার মধ্যে রয়েছে একই মানুষ। কেউ পূজো করে ফুল বাতাসা দিয়ে, কেউ বা ধুনি জ্বালিয়ে, কারো-সাধনা মড়ার মাথায় কারণ নিয়ে, কেউ মূক, কেউ মুখর, কেউ গাছতলায়, কেউ মন্দিরে। ঠাটে-ঠমকে, জমকে-গমকে কেউ প্রসারিত, নীরবে-নিভৃতে কেউ সঙ্কুচিত। কিন্তু সকলের সাধনায়, সকল মনের বিভূতিতে তারই প্রহর্ষ-প্রকাশ। কে সে? উত্তর আসে—'সোঽহং'। এই নিত্যসত্য 'সোঽহং' আমি, তুমি, সে। সকলের মনের মধ্যেই তার অবস্থান। রবীন্দ্রকণ্ঠে এই মানুষের উদাত্ত ঘোষণা—

'ইতিহাসের উচ্চচূড় রথ চলিয়াছে, বিস্মিত হইয়া দেখো, সমবেত হইয়া মাতিয়া উঠ, কিন্তু সেই রথচক্রতলে যদি একটি মানব-হৃদয় পিষ্ট হইয়া ক্রন্দন করিয়া মরিয়া যায়, তবে তাহার সেই মর্ম্মান্তিক আর্ত্তধ্বনিও—রথের চূড়া যে গগনতল স্পর্শ করিতে স্পর্দ্ধা করিতেছে, সেই গগনপথে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, হয়তো সেই রথচূড়াকেও ছাড়াইয়া চলিয়া যায়।'

তাই এই যে পতনপিষ্ট মানুষ, তার শক্তিও বিশাল, কারণ সেও তো অখণ্ড মানবেরই একটু পরমাণু; ক্ষুদ্রের মধ্যেও সেই বিরাটের প্লাবন, সেই প্রচণ্ডের পরিবহন। এই মানুষই রবীন্দ্র-সাধনার বীর্য্য ও বীজ। এই মানুষের বন্ধনে তাঁর ক্রন্দন, এই মানুষের মুক্তিতে তাঁর শান্তি।

মানুষের ভিতরে যেমন একটা দিক, বাইরেও তার একটা দিগন্ত আছে। আর বাইরের মানুষটাই ব্যবহারিক মানুষ, তার সব কিছু উদ্বৃত্তই ঐ ভিতরের মানুষটার তহবিলে জমা পড়ছে। এই যে ব্যবহারিক মানুষ বা বাইরের মানুষ, সে এক জায়গায় হিন্দু আর এক জায়গায় খ্রীষ্টান, একটা পরিবেশে সে সাদা, আর একখানে কালো কি হলদে; বেগুনি হওয়াও বিচিত্র নয়। সুমেরুতে সে হয়ত সম্রাট, বিষুবরেখায় অপরিচিত অতিথি, আবার কুমেরুতে সম্বলহারা ভিখারী, বিভিন্ন জায়গায় তার বিভিন্ন সংজ্ঞা। কিন্তু ভিতরের মানুষটা সব জায়গাতেই রাজ-রাজেশ্বর, সব জায়গাতেই এক-অব্যয়। তার ক্ষয় ব্যয় নেই, সে যোগ-বিয়োগ, গুণ-ভাগের জটিলতায় নেই। তার সব ভূমিতেই এক স্বাদ, এক বর্ণ, এক গন্ধ; সব অনুভূতির কষ্টিপাথরে সে যাচাইকরা উজ্জ্বল সোনা; এক অদ্বিতীয়। সে মানুষ, অতনু মানুষ। কোন রূপের রেখায় সে বন্দী নয়। অনুভবের নীহারিকায় তার পদ-সঞ্চার বাইরের মানুষের এই যে দর্শন আর ভিতরের মানুষের অদর্শন; এই দর্শন আর অদর্শন মিলিয়ে অনেক-খানি, এমন কি সবখানিই বলা যায় তাকে। এই নিয়েই মানুষের ভরে-ওঠা, এইই তার রহস্য-উদাত্ত উচ্চারণ। বাইরের মানুষ যখন স্তব্ধ, ভিতরের মানুষ তখন মুখর, বাইরে যখন নির্জ্জনতার ছায়া নামে, ভিতরে তখন সঘন উচ্ছ্বাস। বাইরের মানুষ যখন তট, ভিতরের মানুষ তখন সমুদ্র। এই ছায়া-আলো, এই মুখরতা, নিরাবতা নিয়ে, এই ভিতর-বাইরের দ্বন্দ্ব-বিপর্য্যয় নিয়েই মানুষ। বাইরের মানুষটা যখন গৃহী, সন্তান-সন্ততির হিসাব নিকাশ নিয়ে উন্মাদ, ভিতরের মানুষটা ঠিক তখনই একটা যাযাবর বাউল। মানুষের একটা দিক বেঁধে রাখবার, আর একটা দিক ছেড়ে যাবার। রবীন্দ্রনাথ একই মানুষের মধ্যে এই দ্বৈত অবস্থান উপলব্ধি করেছেন। একযুগে তিনি গাইছেন—

> আমি এলাম ভাঙল তোমার ঘুম,
> ফুটল শূন্যে তারায় তারায় আনন্দ-কুসুম।

ঠিক পাশাপাশাই আবার শূণ্য-বিসারী মন নেমে এসেছে ধূলা-কাঁকরে আকীর্ণপথে, রক্ত-মাংসের অবরুদ্ধ পৃথিবীতে; চাষী-কৃষাণের জীবনের বিথারে, ব্যবহারিক মানুষটার চলা-বলা-কৈফিয়তের সঙ্গে তাল-মেলানো ছন্দে তাঁর কণ্ঠ উদাত্ত—

> তাঁতি বসে তাঁত বোনে জেলে ফেলে জাল,
> বিচিত্র এদের কর্ম্মভার।

বাইরের যুদ্ধে মরে মানুষ, তার রক্ত-মাংসের দেহটা; যার পচন আছে, গলন আছে, বিকৃতি আছে, বিপর্য্যয় আছে। কিন্তু ভেতরের মানুষটা মরে না; সে মানুষটা ভাবের মানুষ; অনুভূতি তার দেহ, উপলব্ধি তার রক্ত আর রহস্য তার গায়ের বর্ণ। এই মানুষটা বেদনার সরোবরে আনন্দের পদ্ম হয়ে ফোটে। বাইরের মানুষটা যখন ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে যায়, তখন ভেতরের মানুষটা সরগরম হয়ে ওঠে। যেন কত কালের চেনা তার সঙ্গে কত সোহাগ তার অঙ্গে, কত মাধুর্য্য তার ভঙ্গিমায়। যেন চেনা ঘরের মেয়ে অচিন ঘরের বউ হয়ে সরমের ঘোমটার নীচে হারিয়ে গিয়েছিল; আবার ঘরের মেয়ে ঘরে এসে কাকলিমুখর হয়ে উঠেছে; মুহূর্ত্তের বৃন্তে বৃন্তে আনন্দের রেশমী-রঙিন পাপড়ি হয়ে ফুটে উঠছে। মন একটু স্থিতি পেলেই সে সুমুখে এসে দাঁড়ায়। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'সেই জন্যই এই জগৎ শূন্য নহে, মিথ্যা নহে। সেই জন্যই এ জগতে রূপের মধ্যে অপরূপ, শব্দের মধ্যে বেদনা, ঘ্রাণের মধ্যে ব্যাকুলতা আমাদিগকে কোন্ অনির্ব্বচনীয়তায় নিমগ্ন করিয়া দিতেছে।' তাই ব'লে রবিসাধনা ভেতরের মানুষকে নিয়েই শুধু আত্মমগ্ন হয়ে থাকে নি। তার প্লাবন দেশে দেশে, দেহে-মনে; তার বন্যা দিকে-দিগন্তে। ধূপ জ্বালালে যেমন ঘর ভরে ওঠে সৌরভে, তেমনি রবিসাধনার ধূপ গন্ধের পাথনার চেয়ে প্লাবিত হয়ে পড়েছে পৃথিবী জোড়া একটা বিশাল বিস্তৃত পরিসরে। পৃথিবীটাই তাঁর সাধনা-ভূমি, তাঁর আবাস-বিগ্রহ। তাই একযুগে রবিকথা শুনি—

> শুধু বাঁশীখানি হাতে দাও তুলি,
> বাজাই বসিয়া প্রাণমন খুলি,
> পুষ্পের মত সঙ্গীতগুলি
> ফুটাই আকাশ-ভালে।

ঠিক সন্নিহিত উচ্চারণটাও কম উদ্দীপ্ত নয়—

'দেখা হয় নাই তোমাসনে প্রাসাদের কুসুম-কাননে
জনতার প্রগলভ আদরে।...
অবজ্ঞার নির্জ্জনতা তোমারে দিয়াছে
কাছে টানি।'

এই ভিতরের মানুষটা কোন এক বর্ণ-বর্ষণক্লান্ত গোধূলিতে আচম্‌কা যেন শুভদৃষ্টি করে যায় বাইরের দেহময় মানুষটার সঙ্গে। আর তখনই সঙ্গীত বেজে ওঠে; নৃত্য উচ্ছ্বসিত হয় আর মানুষ হয় পরিপূরিত। তারই স্বপ্নে কবিমন বিভোর হয়ে ওঠে।

'গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে,
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।'

আর তখনই চেনা-অচেনার ওপর ছেদরেখা পড়ে। ভেতর-বাইরের এই যে মিলন, যা দিয়ে মানুষ সম্পূর্ণ, যা দিয়ে মানুষ ধ্বনিতে-সঙ্গীতে ছাপাছাপি-করে-ভরা, বারে বারে ব্যাহত হচ্ছে; যুদ্ধের বাজনায়, শিবিরে শিবিরে হানাহানিতে, পতনে-পেষণে মানুষ ভগ্নপক্ষ পাখীর মত বেদনা-পাণ্ডুর। ভেতরের মানুষটা আবার অচিন ঘরের বউ হয়ে সরমের ঘোমটার তলায় হারিয়ে গিয়েছে। আর তখনই রবিকণ্ঠে অগ্নি ঝলসিত হয়ে উঠল :

'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস,
শান্তির ললিত-বাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।'

★

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্ব-কবি
চির-দীপ্ত রবি
হে ঋষি রবীন্দ্রনাথ, স্বর্ণকরে তব
সুগন্ধে ভুবন ভরি' লক্ষদল কুন্দ সরোভব
বিকশিল থরে থরে। সঙ্গীতের মন্দাকিনী ঢালে বঙ্গ-বীণ
শতাব্দীর পারাবারে। হেসে ওঠে অরূপ-অচীন
রূপের অতল হ'তে আনন্দে উছলি'
লভি' গীতাঞ্জলি।

ছন্দে-সুরে
নিকটে ও দূরে
নিবিড় মিতালী আর জানা অজানার
আত্মীয়তা চিরন্তনী। বলাকার ব্যাকুল ডানায়
স্থাণুর বন্ধন টুটি' বিকাশ ক্রন্দন ছুটি' চলে নিরুদ্দেশে।
অনাদি কালের স্রোতে নিখিলের ঘাটে-ঘাটে ভেসে
সোনার তরীর নেয়ে ভরা-পালে তার
করে পারাবার॥

কবি-সূর্য্যোপস্থান

শ্রীশ্যামাপদ ঠাকুর

শক্তি যেখানে লীলায়িত, ঐশ্বর্য্য এবং সৌন্দর্য্য যে আধারে শতদলে বিকশিত, সেখানেই ভগবানের বিভূতির বহিঃপ্রকাশ। তাই ভগবান গীতায় ব'লেছেন—

'যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং
শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং
মম তেজোংঽশসম্ভবম্।'

ভাব-ঐশ্বর্য্যের আধার, অপরূপরূপলাবণ্যময় কান্তি এবং কাব্যসৃজনীশক্তির অন্যতম ধারক, বাহক এবং পরিপোষক রবীন্দ্রনাথ ভগবানের লোকোত্তর বিভূতিরই মূর্ত্তরূপ।

যে কবি-সূর্য্যের উদয়ের সম্ভাবনা নিয়ে পঁচিশে বৈশাখের কাব্যগগন উদ্‌ভাসিত হ'য়ে উঠেছিল, আমরা—ভারতের প্রাচীন ঋষিদের বিদ্যাবংশধরেরা—সেই চিরনূতন অথচ চিরপুরাতন পঁচিশে বৈশাখের কবি-সূর্য্যকে ধ্যান-গম্ভীর মানসে স্মরণ করি। আমাদের মানস-গগন আলোয় উদ্‌ভাসিত ক'রে ভেসে উঠেছে—

"ভাস্বদ্রত্নাঢ্যমৌলিঃ স্ফুরদধররুচা রঞ্জিতশ্চারুকেশো
ভাস্বান্ যো দিব্যতেজাঃ করকমলযুতঃ স্বর্ণবর্ণপ্রভাভিঃ।
কাব্যাকাশাবকাশগ্রহপতিশিখরে ভাতি যশ্চোদয়াদ্রৌ
সর্বানন্দপ্রদাতা বুধজননমিতঃ কীর্ত্তিমান্ কাব্যচক্ষুঃ॥"

—উজ্জ্বল কাব্যরত্নমণিপ্রভায় মণ্ডিতশীর্ষ, আননসৌন্দর্য্যে দেদীপ্যমান, অলকদামে সুশোভিত, পদ্মরাগরঞ্জিতপাণি, স্বকীয় প্রভার স্বর্ণচ্ছটায় কাব্যলোক উদ্‌ভাসিত ক'রে যশঃশিখরে বিরাজমান, সর্বানন্দবর্দ্ধন, বিদ্বজ্জনাভিবন্দিত, কীর্ত্তিমান এবং কাব্যচক্ষু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ।

যে ঋষি কবীন্দ্রের নামকরণ ক'রেছিলেন তিনি ছিলেন প্রকৃতই দ্রষ্টা—কবিবরের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার দিকে তাঁর

দৃষ্টি ছিল দিগন্তপ্রসারী। কাব্যাকাশের জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে রবীন্দ্রের আসন দেবসভায় ইন্দ্রেরই মতো—সহস্র-কিরণের মতো তাঁর অপ্রতিহতপ্রভা সহস্রধারায় বিচ্ছুরিত; সপ্তাশ্বেরই মতো কবিসূর্য্য কাব্য, সাহিত্য, সমালোচনা, গল্প, নাট্যকলা, চিত্রকলা এবং সঙ্গীতকলা—এই সপ্তবিভূতি-সম্পন্ন।

সপ্তাশ্ব আবার ত্রিগুণাত্মক—তামসিক, রাজসিক এবং সাত্ত্বিক। তাই প্রাতে, মধ্যাহ্নে এবং সন্ধ্যায় আমরা সাবিত্রীমন্ত্রে সবিতার এই গুণত্রয়ের যথাক্রমে উপাসনা করি। প্রিন্স দ্বারকানাথের তামসিকতা, রাজা রামমোহনের রাজসিকতা আর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাত্ত্বিকতা—এই গুণত্রয়ের একাধারে একত্র সমাবেশ আমরা দেখি রবীন্দ্রনাথে।

আকাশের সূর্য্য চিরনবীন, অন্তহীন—হিরণ্ময়রথে আকাশপারাবার পার হ'য়ে আদিজননী সমুদ্রের গর্ভ ভেদ ক'রে বেরিয়ে আসে প্রতিদিন প্রতিপ্রাতে—রাত্রির দুস্তর তপস্যার মোহান্ধকার যায় ছিন্ন হয়ে। নিশা অন্ত যায়'—

দিবা আসে—আবার দিবার কোলে নিশা পড়ে ঘুমিয়ে। সূর্য্যের এই অনাদি অনন্তপ্রবাহে ভেসে ওঠে জীবনের শতশত বুদ্বুদ।

এই জীবনাবর্ত্তে প্রতিদিন আকাশদুহিতা লাস্যময়ী উষা বিলোলচরণে এসে উঁকি মারে—আড়ি পাতে পূর্ব্বাশার সুবর্ণতোরণে—অধরে তার মৃদুলহাসির রক্তিমতা। নববধূ প্রকৃতি লজ্জায় রাঙা হ'য়ে বৃথাই ঘোমটায় মুখ লুকোতে চায় জীবনদেবতার আবির্ভাবে।

পঁচিশে বৈশাখের উষাও তেমনি ব'য়ে নিয়ে আসে চিরনবীন, অন্তহীন কবিসূর্য্যের উদয়বার্ত্তা। আকাশ-দুহিতা কবির মাথায় পরিয়ে দেয় অম্লান আলোর জয়-মুকুট—ভালে এঁকে দেয় ভাইফোঁটার অক্ষয়তিলক! কাব্যলক্ষীর লজ্জাবগুণ্ঠন যায় খ'সে—আরক্তিম কপোলে জাগে পুলকের মৃদু শিহরণ। আকাশের রবি কাব্যাকাশের রবির সঙ্গে মিতালী পাতায় নিজের কিরণমালা কবির গলায় পরিয়ে দিয়ে;—প্রভাতের শিশির-সলিলে স্নান ক'রে তরুণ রবির করে হেসে ওঠে ধরিত্রীমাতা—দিগ্‌বিজয়ী সন্তানের আনতশীর্ষে বর্ষণ করে অমৃতত্ব-আশীর্ব্বাদ! দিগ্‌বধূগণের কম্বুকণ্ঠে নিনাদিত হ'য়ে ওঠে অভয়শঙ্খ—

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।"

আবার আসছে পঁচিশে বৈশাখ—সেই চিরনবীনেরে দিয়েছে ডাক! কাব্যগগন মুখরিত হ'য়ে উঠেছে কবি-সূর্য্যের বন্দনা গানে—

"উদয়গিরিমুপেতং ভাস্করং পদ্মহস্তং
কবিতা গগননেত্রং দিব্যরত্নোপমেয়ম্।
তিমির-করি-মৃগেন্দ্রং বোধকং পদ্মিনীনাম
কবিবরমভিবন্দে সুন্দরং বিশ্ববন্দ্যম্॥"

আমরা বন্দনা করি সেই বিশ্ববন্দ্য কবিশ্রেষ্ঠকে যিনি কাব্যাচলের উদয়শিখরে সমাসীন, কাব্যপ্রভায় দীপ্তিমান, পদ্মরাগরক্তপাণি, কবিতাগগনের নেত্রস্বরূপ, কাব্য-রত্নাকরে যিনি চিন্তামণি, অজ্ঞানতিমির-করি-যূথে যিনি মৃগেন্দ্র, যিনি মাতৃজাতির উদ্বোধক এবং চিরসুন্দর। ঋষিদের উদাত্তকণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরা স্বাগত জানাই কবিসূর্য্যকে যাঁর বরেণ্যতেজঃপুঞ্জ জাগিয়ে তুলেছে আমাদের কাব্যধী—সাবিত্রীমন্ত্রে আমরা আবাহন করি নব নব সৃষ্টির নিধান সবিতাকল্প রবীন্দ্রকে যিনি জাতির জীবনে এনে দিয়েছেন নবপ্রেরণা—মানবজীবনে ক'রেছেন নবচেতনার সঞ্চার—

"তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥"

★

রবীন্দ্র স্মরণে

সনৎকুমার মিত্র

দাবদগ্ধ পৃথিবীতে পঁচিশে বৈশাখ এলো ফিরে:
শুষ্ক কণ্ঠে ওষ্ঠাগত প্রাণ নিয়ে জানাই আহ্বান,
রসহীন প্রাণ ঘিরে ছন্দবন্ধ সুমধুর গান
নাহি ভাসে,—নাহি আসে মধু-স্বপ্ন হৃদয়ের তীরে!

সবুজের সমারোহ আর নেই—নেই পুষ্পহার—
বনানীর শাখে শাখে,—কোকিলও ডাকে না ভুল করে:
রাতের কান্নার মত পান্না হ'য়ে শিশিরেরা ঝরে
বুকফাটা পৃথিবীতে,—আর বুঝি এই মরু-মনে!

প্রতিভার প্রাণস্পর্শে দীপ্তোজ্জ্বল সুমহান প্রাণ,
এমনি মরুর মাঝে জন্ম লভি, ছন্দে আর গানে
অনন্ত রসের উৎস সৃষ্টি করি, স্বপ্ন মরুস্থানে
সবারে আশ্রয় দিয়ে; শোনালেন নির্ঝরের গান।

সেই মরুস্থানে তাই আজও ঘুরি রসের আশায়,
বৈশাখের রুদ্ধশ্বাসে হৃদয়ের যত ভাব আত্মহত্যা করে;
তোমার আশিস দিয়ে শ্রাবণের প্লাবনের সুরে,
এ হৃদয় পূর্ণ কর সুরে, ছন্দে, ভাবে ও ভাষায়।

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(৩১)

সমীর বোস উত্তর দিলে, "আপনার জন্যে সে অধিকার আমি পেয়েছি ভারতী দেবী, আমি চেয়ে নিয়েছি।"

ভারতী আবার অধর দংশন করে—।

পিতার কোন সংবাদ নাই, জয়ন্ত এসেছে কিনা তাও সে জানে না। বাইরের কোন খবর তার ঘরে এসে পৌঁছায় না। সমীর বোস আরও দুদিন দেখা করতে এসেছিল, ভারতী তার সঙ্গে দেখা করেনি।

এই লোকটীকে সে কোনদিনই বিশ্বাস করে না, তার মুখ দেখার প্রবৃত্তি পর্যন্ত তার নাই। শান্তি রক্ষার ছলে অশান্তি ঘটায় এরাই —এই পুলিস জাত—। অথচ এই পুলিসের উপরই নির্ভর করছে দেশের ধন প্রাণ মান।

এই সমীর বোস—

আগেও সে একে দেখেছে। কোনদিন স্বপ্নেও সে ভাবতে পারে নি সেই লাজুক প্রকৃতির ছেলেটি এমন অনর্গলভাষী হতে পারে। মানুষের মনের গতি এমনভাবেও বদলাতে পারে, সেই কথাই ভাবে ভারতী।

পিতার কোন সংবাদ না পেয়ে ভারতী ব্যাকুল হয়ে পড়ে, কে জানে —তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কিনা। শেষ পর্যন্ত সমীর বোসকেই ভারতী ডাকতে পাঠায়।

সমীর বোস এলো কয়েকদিন পরে।

গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলে, "কোন দরকার আছে কি?"

মনে মনে বিরক্ত হলেও ভারতী মুখে তা প্রকাশ করে না। সে বললে, "আমি শুধু আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি মিঃ বোস, আমায় এ রকমভাবে আমারই ঘরে বন্দিনী করে রাখবার উদ্দেশ্য কি? যা হয় বিচার করুন, আপনার গভর্নমেণ্ট,—হয় স্বাধীনতা দিন—নয়—"

সমীর বোস মাথা নাড়ে—অর্থাৎ স্বাধীনতা পাওয়া ভারতীর পক্ষে অসম্ভব।

সে বললে, "বিপ্লবীদলের কাউকে গভর্নমেণ্ট বিশ্বাস করেন না কোনদিন, আপনার বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হবে না।"

ভারতী মুখ নত করে।

একটু পরে মুখ তুলে সে শক্ত কণ্ঠে বললে, "আপনি কি মনে করছেন এমনই ভাবে শাসনদণ্ড চালিয়ে দেশের বিপ্লব দূর করতে পারবেন, বিপ্লবীদের দমন করতে পারবেন? চোখ রাঙিয়ে জয় করা চলে না, ভয় দেখালেও জয় করতে পারবেন না সমীর বাবু, আপনাদের সকল কল্পনা ব্যর্থই হবে।"

ক্রূর হাসির রেখা সমীর বোসের মুখে ফুটে ওঠে, সে সংক্ষেপে বললে, "হোক না তাতেই বা কি।"

ভারতী আবার নীরব হয়ে যায়, মনে মনে সে যে অস্থির হয়ে উঠেছে তা বুঝতে সুচতুর বোসের বিলম্ব হয় না।

ভারতী জিজ্ঞাসা করলে, "আমার বাবা কোথায় সে কথাটা বলবেন কি?"

সঙ্গে সঙ্গেই সমীর বোস উত্তর দেয়, "নিশ্চয়ই বলব,—তিনি বিচার না হওয়া পর্যন্ত হাজতে আছেন।"

"হাজতে—"

ভারতীর মুখ দিয়ে আর একটীও শব্দ বার হয় না—।

সমীর বোস স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে, "হ্যাঁ—হাজতেই আছেন তিনি। জানেন তো রাজদ্রোহীদের হাজত বাস কি কষ্টকর। একদিন রতন-মণি দত্ত পথ চলতে পায়ে ব্যথা পেতেন, আর আজ তিনি কি কষ্টই যে সইছেন তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেন না ভারতী দেবী—। এই সামনের সতেরো তারিখে তাঁর বিচার হবে, তারপর—"

সে থেমে যায়—।

কম্পিতকণ্ঠে ভারতী জিজ্ঞাসা করে—"বিচারের ফল কি হবে বলতে পারেন সমীর বাবু—"

উদাস হাসি হাসে সমীর বোস, উদাস কণ্ঠে সে বললে, "বিচারের ফল যা হবে তা আমি যেমন বুঝছি আপনিও তেমনি বুঝছেন ভারতী দেবী। বিপ্লবী নেতা কিশোর মিত্রের গোপন সহকারী রূপে তিনি বরাবর কাজ করেছেন, ঐ বিপ্লবীদল বিশেষ করে তাঁর কাছ হতে প্রচুর অর্থসাহায্য পেয়েছে—"

ভারতী অধৈর্যভাবে চেঁচিয়ে ওঠে,—"মিথ্যাকথা—সমস্ত মিথ্যা

কথা, দাদুর সঙ্গে বাবার মোটে দেখাই হয় নি, আমি পর্যন্ত তাঁকে কখনও দেখিনি—"

সমীর বোস মুখ টিপে হাসে—

"ভারতী দেবী, জয়ন্ত রায় আপনার কাছ হতে টাকা নিয়ে গিয়েছিল, আপনার দাদু আপনাকে পত্র দিয়েছিলেন, এসব কথা আপনি মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে পারেন ?"

বিবর্ণ মুখ তুলে ভারতী একবার সমীর বোসের পানে তাকায়।

সমীর বোস বলে চলে, "আপনি চাপা দিতে চাইলেও এ সত্য গোপন নেই ভারতী দেবী,—পুলিস বিভাগ সমস্ত প্রমাণ হস্তগত করেছে।"

ব্যাকুলভাবে ভারতী হাত কচলায়—

"হ্যাঁ, আমিই দোষী কিন্তু আমার বাবা নন; তিনি ঘুণাক্ষরেও কিছু জানতেন না, আজও অনেক কিছু জানেন না। মিথ্যাই তাঁকে আপনারা ধরেছেন, মিথ্যা হাজতে রেখেছেন, মিথ্যাই তাঁকে শাস্তি দেবেন—"

ভারতীর পাতলা লাল ঠোঁট দুখানা কাঁপতে থাকে, তবু সে প্রাণপণে অবাধ্য অশ্রুকে সংহত করে—।

সমীর বোস আস্তে আস্তে বললে, "আমাদের আইন বিরুদ্ধ কাজ কাউকে কিছু জানানো, তবু নেহাৎ আপনি জানতে চাচ্ছেন বলেই আপনাকে জানাচ্ছি ভারতী দেবী। মিঃ দত্ত শুধু নন, তাঁর মাও বড় কম মেয়ে ছিলেন না—শেষ পর্যন্ত পুলিসের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়েছিলেন। তারপর কিশোর মিত্রের কাজ লক্ষ্য করুন,—আপনার বাবার এ পর্যন্ত সমস্ত কাজ দেখুন। মুখে তিনি গভর্নমেণ্টের সঙ্গে সৌহার্দ্য রাখলেও এ পর্যন্ত যে সব কাজ করেছেন তাতে তাঁকে বিপ্লবী বলা নিঃসন্দেহে চলতে পারে। দণ্ড যে তাঁর কম হবে তা মনে করবেন না, আমার মনে হয়—যাবজ্জীবনের জন্যে তাঁকে দ্বীপান্তরেই যেতে হবে।"

ভারতীর বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে—

একটী মাত্র প্রশ্ন তার মুখে আসে—"আর জয়ন্ত রায়—

ক্রূর হাসির রেখা সমীর বোসের মুখে ফুটে ওঠে—"সে তো ফাঁসির আসামী ভারতী দেবী, তার ফাঁসি কেউ রদ করতে পারবে না—"

"উঃ, মাগো—"

ভারতী অকস্মাৎ চেয়ার হতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

সমীর বোস সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরে ফেলে, নচেৎ মাথায় তার বেশী রকমই লাগতো।

"ভারতী দেবী—ভারতী দেবী—"

সমীর বোস তাকে বার বার ডাকতে থাকেন। ততক্ষণে ভারতীর মুহ্যমানভাবটা কেটে গেছে, দুই হাতের মধ্যে মুখখানা ঢেকে সে উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে।

একদৃষ্টিতে তার পানে তাকিয়ে থাকে সমীর বোস—শিকারী বাঘ আহত শিকারকে সামনে রেখে যেমন তার পানে তাকিয়ে থাকে, সেই রকম দৃষ্টি তার চোখে।

অনেকক্ষণ পরে ভারতী মুখ হতে হাত নামায়, কান্নাঝরা সুরে বললে, "কিন্তু সমীর বাবু, আমি জানি, আপনি ইচ্ছা করলে এ'দের দুজনকে রক্ষা করতে পারেন।"

"আমি—"

সমীর বোস চমকে ওঠে—

আত্মবিস্মৃতা ভারতী সমীর বোসের হাত দুখানা চেপে ধরে; আর্তকণ্ঠে বললে, "হ্যাঁ, একমাত্র আপনিই পারেন। আমি জানি, এ ঘটনা সম্বন্ধে যা কিছু এনকোয়ারীর ভার আপনার উপর দেওয়া হয়েছে, আপনি যে সব প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন তার অনেকগুলি এখনও আপনার হাতে আছে, এখনও উপরে পাঠান নি। সমীর বাবু, আমি আপনার হাতে শুধু নয়—আপনার পায়ে ধরছি,—আপনি আমায় বাঁচান। এ'দের মুক্তি না হোক, গুরুদণ্ড যাতে না হয়,—জগৎ হতে বিদায় নিতে না হয়, অন্ততঃপক্ষে তাই করুন, তাই করুন সমীর বাবু। এর জন্যে আমায় যা করতে বলেন, আমি তাই করব—হ্যাঁ, সত্যই তাই করব কথা দিচ্ছি।"

তার চোখের জলে সমীর বোসের হাত দুখানা ভিজে উঠলো।

সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সমীর বোসের চোখ—

"ঠিক তো—আমি যা চাইব আপনি তাই করবেন—এ কথা ঠিক বলছেন ?"

সমীর বোস প্রশ্ন করে।

আশাপূর্ণ হয়ে ওঠে ভারতীর বুক, দ্বিধা না করে সে উত্তর দিলে, "হ্যাঁ, তাই করব—আপনি যা বলবেন—

সমীর বোস তার হাত দুখানা নিজের হাতের মধ্যে তুলে নেয়, —স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলে, "আমি তোমায় চাই ভারতী, নিজেকে আমায় দান করতে হবে—রাজি ?"

মুহূর্তে ভারতী আড়ষ্ট হয়ে ওঠে, তার মুখখানা বিবর্ণ শক্ত হয়ে যায়, হাত দুখানা সজোরে টেনে নিয়ে সে উঠে দাঁড়ায়—।

কম্পিত কণ্ঠে সে বললে, "আজ এ কথা বলতে আপনার সাহস হয়,—জানেন, আপনি কে—আর আমি কে ?"

ক্রূর হাসি ফুটে ওঠে সমীর বোসের মুখে,—তিক্তকণ্ঠে সে উত্তর দিলে, "খুব জানি ভারতী দেবী, তুমি এক বিপ্লবী নেতার মেয়ে—যে নেতা রাজহিতৈষী সেজে কাজ করেছে, ভিতরে ভিতরে চালিয়েছে ষড়যন্ত্র—। আরও জানি যে জয়ন্ত রায়ের জীবন আজ আমারই দয়ার উপর নির্ভর করছে, তুমি আজও হয় তো তাকে পাওয়ার আশা কর। আমি কে শুনতে চাও ভারতী। আমি তোমাদের তিনজনকে আজও অন্ততঃপক্ষে বাঁচিয়ে রাখতে পারি, প্রমাণগুলো নষ্ট করে অন্ততঃপক্ষে তোমাকে আর তোমার বাবাকে মুক্তি দিতে পারি, জয়ন্ত রায়কে ফাঁসির দড়ি না পরিয়ে মাত্র চৌদ্দ বছরের জন্য আন্দামানে পাঠাতে পারি।"

"যাও—যাও, তুমি এখান হতে যাও—"

দুই হাতের মধ্যে মুখখানা ঢেকে ভারতী থরথর করে কাঁপছিল।

সমীর বোস উঠে দাঁড়াল, শান্ত কণ্ঠে বললে, "হ্যাঁ, যাব বলেই এসেছি, না ডাকলে আমি আসতাম না। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো ভারতী—তোমার অবিমৃষ্যকারীতার ফলেই যে দুজনকে তুমি বাঁচাতে চেয়েছিলে তাদের হারালে। আমি তোমায় ভালোবাসি,—আজ নয়, বহুকাল হতে তোমায় ভালোবাসি, তবু তোমায় পাওয়ার আশা আমি যে কোনদিনই করতে পারি নি এ কথা মিথ্যা নয়। আজ ভেবেছিলুম—প্রমাণ যখন আমারই হাতে,—আমার আবেদনে তুমি কর্ণপাত করবে। আমি ঠিক জানতুম জয়ন্ত জেলে গেলেও সে আবার ফিরবে আর তোমার বাবাকে আমি মুক্ত করবই। তা যখন হল না আমি এখনই আমার সংগৃহিত কাগজ পত্র সরকারের হাতে সমর্পণ

করতে চললুম ; এর পর যেন আমায় অপরাধী করো না।"

সে অগ্রসর হয়—

"না না, শুনুন—শুনুন, যাবেন না—"

ভারতী ছুটে যায় তার পিছনে, সমীর বোস ফিরে দাঁড়ায়। রূঢ় কণ্ঠে সে বললে, "কি বলতে চাও বল, মেয়েদের অভিনয় অন্য কারও ভালো লাগলেও আমি ভালোবাসিনে। কি তুমি বলতে চাও ?

ভারতী কাঁপছিল, তার চোখ দিয়ে জল পড়ছিল—একান্ত অসহায় ভাবে দুই হাত কচলাতে কচলাতে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সে বললে, "আমি রাজি, হ্যাঁ, ওদের দুজনকে রক্ষা করতে আমি আত্মদান করব সমীর বাবু। কিন্তু আপনি কেবল কথা দিলে চলবে না—আমায় লিখে দিতে হবে—দু একদিনের মধ্যে আমার বাবা ফিরে আসবেন আমার কাছে, জয়ন্তের ফাঁসি হবে না—যাবজ্জীবন কারাদণ্ডও নয়, দু-পাঁচ বছরের জেল হবে।"

সমীর বোস মুহূর্ত গম্ভীর হয়ে কি ভাবে, তারপর বললে, "তাই হবে, আমি প্রমাণ পত্র তোমার সামনেই নষ্ট করে ফেলব ভারতী, এখনই তোমায় অংগীকার পত্র লিখে দেব। কিন্তু তোমার কথাকেও তো আমি বিশ্বাস করিনে, গাং পার হয়ে কুমীরকে কলা দেখানো তোমার মত মেয়ের পক্ষে অসম্ভব নয়।"

ভারতীর মুখখানা লাল হয়ে ওঠে—কণ্ঠস্বর শান্ত রেখে সে বললে, "আমিও লিখে দেব সমীর বাবু—।"

সমীর বোস বললে, "তোমার বাবা ফিরবামাত্র আমাদের রেজেষ্ট্রী করে বিয়ে হবে; নারায়ণ শিলা আমি জানিনে, সে জন্যে বিয়েটা রেজেষ্ট্রী করতে চাই। আপত্তি হবে না ?"

শুষ্ক কণ্ঠে ভরতী জবাব দিলে—"না—।"

(৩২)

বাড়ীতে ফিরে এলেন রতনমণি দত্ত—

এই কয়টা দিনে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে তাঁর, মনে হচ্ছে দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর শয্যাত্যাগ করে তিনি উঠে এসেছেন।

নির্যাতন অত্যাচারের সহস্র চিহ্ন লুকিয়ে আছে তাঁর কাপড় জামার আড়ালে,—ভারতী তা দেখতে পেলে না। একবার মাত্র সে পিতার মুখের পানে তাকালে, তারপর তাঁর কোলের মধ্যে মুখখানা লুকিয়ে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে কাঁদতে লাগলো। নির্বাকে রতন দত্ত তার মাথায় হাতখানা বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

কুড়ি বৎসর বয়স তাঁর যেন বেড়ে গেছে, নিজেকে আজ বড় শ্রান্ত বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছে! চোখের দৃষ্টি যেন কমে এসেছে, কাণও বধির হয়ে আসছে।

"বাবা—"

অনেকক্ষণ কেঁদে ভারতী নিজেই শান্ত হয়, মুখ তুলে সে পিতার শীর্ণ আরক্তিম মুখের পানে তাকায়। ভারতী কাঁদতে পারে, কেঁদে সে বুকের ব্যথা কতকটা লাঘব করতে পারে, পারেন না রতনমণি দত্ত। তাঁর বুকের মধ্যে যে কি ওতোপ্রোত কাণ্ড চলছিল তা বোঝা যায় তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে।

ভারতী ভয় পায়, পিতার গায়ে হাত দিয়ে ডাকে—"বাবা—"

"কে—? আমায় ডাকছিস—ডাকছিস ভারতী ?

মর্তের মাটিতে নেমে আসেন রতনমণি দত্ত। ভারতীর মুখখানার উপর শীর্ণ আংগুল কয়টী বুলিয়ে দিতে দিতে বলেন, "বড় রোগা হয়ে গেছিস—হ্যাঁ, সত্যই বড় রোগা হয়ে গেছিস ভারতী। মাত্র মাস দেড়েক কলকাতা ছেড়েছি,—এই কয়দিনে তোর কি চেহারাই হয়ে গেল মা—"

ভারতীর চোখে জল ফেটে বার হয়ে আসতে চায়, ভারতী আত্মগোপন করে, করুণ হাসি তার মুখে ফুটে ওঠে; সে পিতার কণ্ঠের অস্থি কয়টার উপর হাত রাখে, বললে, "কিন্তু তবু তো আমি নিজের বাড়ীতে আছি বাবা, অত্যাচার নির্যাতন তো তোমার মতো সইনি। তোমায় নাকি অনেক কষ্ট দিয়েছে, অনেক নির্যাতন করেছে—"

তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়—।

"কষ্ট, নির্যাতন—"

রতন দত্ত টেনে টেনে হাসেন—"বিপ্লবীকে কেউ কি জামাই আদরে রাখে মা ? কিন্তু ওরা যতই ভয় দেখাক, যতই নির্যাতন করুক, জয় ওরা করতে পারবে না—ভয় দেখিয়ে জয় করার দিন চলে গেছে। কেবল আমিই নই, আরও কত ছেলে—কত মায়ের সন্তান, কত বোনের ভাই, আহা কত দুঃখই না সইছে তারা রে—কি সে অত্যাচার —ধারণাও করতে পারবিনে ভারতী—"

তিনি চক্ষু মোদেন—

তারপর বললেন, "আমি এই বয়সেও শেষ পর্যন্ত সইবার জন্যে প্রস্তুত ছিলুম ভারতী, হঠাৎ যখন শুনতে পেলুম—আমি মুক্তি পাব, তখন যেন আকাশ হতে পড়লুম। বিশ্বাস করতে পারিনি—শাসকের ওই হাজতখানার বাইরে আমি আসতে পাব, সুনীল আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে আবার আমি নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিতে ফেলতে পারব। বিশ্বাস করতে পারিনি, আমি আসব আবার তোর কাছে ফিরে, আবার তোকে দেখতে পাব। কিন্তু এ মুক্তি তো আমি চাই নি ভারতী, আমায় কেন ওরা হত্যা করলে না ? তোর আত্মবিক্রয়ের মূল্যে আমার মুক্তি —এ আমি চাইনে—আমি চাইনে ভারতী—

তিনি নিস্তব্ধ হয়ে যান।

এসেছিল সেদিন জানকীবাইয়ের দানপত্র। বৃন্দাবনে দেহরক্ষা করেছে জানকীবাই—বিখ্যাত বাইজী জানকী বাই। মৃত্যুর কিছু দিন আগে সে উইল করে গেছে, তার সমস্ত সম্পত্তি রতনমণি দত্তের কাছ হতে পাওয়া, নিজের বাড়ীখানিও পঞ্চাশ হাজার টাকা সে দেশের কাজের জন্য দান করেছে, বাকি প্রচুর টাকা যা তার নামে ব্যাংক জমা আছে তা দিয়ে গেছে রতনমণি দত্তকে।

সুশ্বেতা—জানকী বাই—

একজন দিয়ে গেছে জীবনের উপলক্ষ্য ভারতীকে—ভারতী না থাকলে আজ রতনমণি দত্তের জীবনে কোন বন্ধনই থাকতো না, আর একজন দিয়ে গেছে তার আজীবন কাজের সঞ্চিত লক্ষাধিক অর্থ—

জানকী বাই—

সব ছেড়ে সে চলে গেল পঞ্চাশডাংগার বাগান বাড়ী হতে, সেদিন সে কতই না ফেলেছিল চোখের জল, কতই না ফেলেছিল দীর্ঘশ্বাস।

রতন দত্তের প্রত্যাবর্তনের সংগে সংগে ভারতীর বিবাহ, তাকে চলে যেতে হবে সমীর বোসের সংগে, এই আছে তার লেখাপড়ার সর্ত।

"বাবা—"

ভারতী অনুনয়ের সুরে ডাকে। বাইরে সমীর বোস এসেছে, রতনমণি দত্তের সামনে আসার সাহস তার নাই, সে গাড়ীতে বসে

আছে। একজন কনেষ্টবল এসে খবর দেয়—ভারতীকে নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ী এসেছে।

রতন দত্ত আবার চক্ষু মোদেন—।

সুশ্বেতা, তোমার মেয়ে—

রতন দত্তের ঠোঁট দুখানা শুধু থরথর করে কাঁপে, কন্যার মাথার উপর তিনি হাতখানা রাখেন।

একান্ত অসহায়ার মতই ভারতী জিজ্ঞাসা করে "তুমি যাবে না বাবা—?"

সর্বহারার দৃষ্টিতে রতনমণি দত্ত তার পানে তাকান, আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন—"না—"

কান্না চাপতে পারে না ভারতী, ছুটে ঘর হতে সে বার হয়ে যায়।

রতন দত্ত উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েন, প্রসারিত দুই বাহুর মধ্যে মুখখানা তিনি গুঁজে দেন। অন্তর্যন্ত্রণায় ছটফট করেন রতনমণি দত্ত।

ভারতী দিলে আত্মবলিদান, কিন্তু কেন—কেন—কেন সে নিজেকে বিলিয়ে দিলে?

আজ সত্যই অভিশাপ দাও সুশ্বেতা, অভিশাপ দাও রতনমণি দত্তকে; তোমার গচ্ছিত রক্তের মর্যাদা সে রাখতে পারলে না, নিজের মুক্তিপণে সে দিয়ে ফেললে তোমার মেয়েকে।

ওগো লোকান্তরবাসিনী সাধ্বী সুশ্বেতা, জীবনে কি কষ্ট পেয়েছো তুমি—এ যন্ত্রণার সংগে সে কষ্টের তুলনা হতে পারে কি? আত্মজাকে পশু-প্রবৃত্তির কাছে বলিদান তোমায় দিতে হয় নি, সে যে কত বড় যন্ত্রণা তা তো তুমি জানো না সুশ্বেতা। রতন দত্ত হয়-তো তোমায় অনেক কষ্ট দিয়েছেন, সেজন্য কোনদিন তাঁকে এমন অনুতপ্ত হতে হয়নি। আজ পর্যন্ত নিজের জন্য কোনদিন তিনি ভাবেন নি, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে তাঁর মুক্তির বিনিময়ে ভারতীর আত্মদান—এ কথা যদি তিনি আগে জানতে পারতেন। তোমার মেয়ে সুশ্বেতা—তাকে যদি বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখবার স্থান থাকতো—তাকে রতন দত্তের অদেয় যে কিছুই ছিল না সুশ্বেতা, তোমার প্রতি তিনি যতটা অবিচার করেছেন, তার প্রায়শ্চিত্ত কি হয় নি?

শূন্যঘরে একা রতন দত্ত বার বার কাকে ডাকেন—একি করলে সুশ্বেতা, আমার অপরাধের এত বড় শাস্তি আমায় দিলে তুমি?

অর্দ্ধ মূর্ছিতের মত পড়ে থাকেন রতনমণি দত্ত; শয্যা নাই উপাধান নাই, মেঝের উপর তিনি পড়ে থাকেন। বিপ্লবী জীবনে বহু কষ্ট অভ্যস্ত হয়ে গেছে; কিন্তু এ কষ্ট—উঃ, এ সহ্যেরও অতীত।

কতক্ষণ পরে—

আস্তে আস্তে জ্ঞান ফেরে রতন দত্তের, মনে হয় কার কোলে তাঁর মাথা রয়েছে, কার সুকোমল হাতখানা তাঁর কপালে—।

মা মা—

মহেশ্বরী দেবী কি ফিরে এসেছেন? বড় আদরের রতনমণির কষ্ট তিনি বুঝি সহ্য করতে পারেন নি, সবহারা পুত্রের কাছে তিনি এসেছেন কি? তিনি ছাড়া আর কে তাঁকে কোলে নেবে? এমন স্নেহময় কোমল হাত তো আর কারও নাই,—যে হাতের স্পর্শে সকল বেদনা জুড়িয়ে যায়।

"মা—গো মা—"

ক্ষুদ্র শিশুর মতই কেঁদে ওঠেন রতনমণি দত্ত, জীবনে জ্ঞান হওয়ার পর এই প্রথম বইলো তাঁর চোখে জলের ধারা—।

"বাবা—আমার বাবা—"

ভারতীর কণ্ঠস্বর; পিতার বুকের উপর নিচু হয়ে সে মুখখানা রাখে।

রতন দত্ত চোখ মেলেন—।

ফিরেছে ভারতী—তাঁর ভারতী ফিরে এসেছে তাঁর কাছে। তাঁর ভারতীকে কেউ আটক করতে পারেনি, ভারতী এসেছে। তিনি একা নন, তাঁর ভারতী আছে, জরাজীর্ণ দুর্বল পিতাকে ছেড়ে সে কোথাও যাবে না।

তবু যেন বিশ্বাস হয় না। দুটি হাতে ভারতীর মুখখানা বুকের মধ্যে চেপে ধরে আর্দ্রকণ্ঠে পিতা জিজ্ঞাসা করলেন, "তুই এসেছিস ভারতী, তোকে ওরা ধরে রাখেনি?"

ক্ষীণ একটু হাসির রেখা ভারতীর মুখে ফুটে ওঠে, সে বললে, "তাই কি পারে বাবা? আমায় কেউ ধরে রাখতে পারেনি, কেউ পারবেও না। তোমার মেয়ে আমি—কথার মূল্য রেখেছি বাবা, কথা দিয়েছি বলেই কথার খেলাপ করিনি। তোমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণপত্র যা কিছু সংগৃহীত হয়েছিল, নিজের হাতে সে সব আগুনে দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছি, বিনিময়ে সমীর বোসকে বিবাহ করেছি। আমি তেজস্বী জমিদার রতনমণি দত্তের মেয়ে বাবা, আমার মা নিজের মর্যাদা রাখতে চির দারিদ্র্য বরণ করে নিয়ে মরেছেন, তাঁর শক্তি আছে আমার মধ্যে, চুক্তিমত কাজ শেষ করে এসেছি, আর কোন কথাই তো থাকতে পারে না বাবা—।"

রতন দত্ত আবার চক্ষু মোদেন, বুকের ভিতর কি যেন একটা যন্ত্রণা ধরে, তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।

ডাক্তার আসে, ঔষধ দেয়—ইনজেক্‌শানও চলে।

কিন্তু হার্ট যার ফেল করতে বসেছে, ঔষধ পত্র সে হার্টকে আর কর্মক্ষম করে তুলতে পারে না। দুদিন সম্পূর্ণ অচৈতন্যাবস্থায় কাটিয়ে একদিন নিঃশব্দে জমিদার রতনমণি দত্ত ইহলোকের কাজ মিটিয়ে পরলোকের পথে যাত্রা করেন।

বুঝতে পারলে না ভারতী, বজ্রাহতের মতই সে নিঃসাড়ভাবে বসে রইল, একটী কথা তার মুখে ফুটলো না, একটী ফোঁটা চোখের জলও সে ফেলতে পারলে না।

খবর পেয়েই এসে পড়লো সমীর বোস।

রতন দত্তের জামাতা সে, মৃতের সৎকার এখন তার দায়িত্বের মধ্যে এসে পড়েছে।

ভারতী নির্বাকে শুধু তাকিয়ে থাকে—

জমিদার রতনমণি দত্ত—পলাশডাঙ্গার বাড়ী—ভারতী চোখ মেলে দেখে—বাগানবাড়ীর উৎসব, মমতাহীন ভাবে অর্থ ব্যয়। কানে আসে নূপুরের সংগে অতি মিষ্ট গানের সুর—

আজু সখী কাঁহা গিয়া—

অব হুঁ না আওয়ে—

শাওনের কালো মেঘ ঘিরে ফেলেছে সমস্ত নীলাকাশ খানা, বাগানবাড়ীর খোলা জানালায় দাঁড়িয়ে আছে পরমসুন্দরী মেয়ে—এলোচুল তার বাদল বাতাসে উড়ছে,—তার বড় বড় চোখ দিয়ে শাওনের ধারা ঝরছে—

জানকী বাই—হ্যাঁ, ভারতী তাকে চেনে, সে জানকী বাই। চলে যাওয়ার পর সে যথেষ্ট অর্থ পেয়েছে—ভারতের গায়িকা বাইজীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল, তবু সে ভুলতে পারেনি বাংলা দেশের অখ্যাতনামা পল্লী পলাশডাঙ্গাকে, ভুলতে পারে নি রতনমণি দত্তকে।

সেই রতনমণি দত্ত—

দাঁড়িয়েছিলেন আর্তের পক্ষ নিয়ে—মন চলে গেল বিভিন্ন পথে, রতন দত্ত ভেসে গেলেন কোন দিকে? বিলাসী ও সুখী রতন দত্ত, মন সব আঘাত সইলেও দেহ তো সইলো না।

শীর্ণ দুর্বল রতন দত্ত, দুই পা হেঁটে হাঁফিয়ে ওঠেন, বুকের মধ্যে থর থর করে কাঁপে, সকলের অজ্ঞাতে বুকটাকে চেপে ধরেন। জানাতে চান না কাউকে তিনি অসুস্থ, তাঁর হার্টের অসুখ, যে কোন মুহূর্তে আর এতটুকু আঘাত তিনি সইবেন না।

ভারতী যদি একটু কাঁদতে পারতো—

অর্থ দিয়ে গেছে জানকী বাই,—সে অর্থে ভারতী দান করবে দেশকে, নিজেদের জমিদারী—কিন্তু রতনমণি দত্তকে তো ফিরে পাবে না।

"বাবা—জাগো—জাগো বাবা—"

ব্যর্থ ব্যাকুলকণ্ঠে কেবল ডেকে চলে ভারতী।

(৩৩)

আস্তে আস্তে গত হয়ে গেছে দীর্ঘ বারো বৎসর—।

এসেছে উনিশশো বিয়াল্লিস খৃষ্টাব্দ।

উনিশশো তিরিশ সালে বিপ্লবী ভারতীর মৃত্যু হয়েছে—।

ভারতী আজও বেঁচে আছে, তার মনের গতি বদলেছে, নূতন-জীবনে সন্ন্যাসিনী ভারতী বেঁচে আছে।

উনিশশো তিরিশ খৃষ্টাব্দে মারা গেছেন রতনমণি দত্ত,—আজীবন কালের জন্য জেলে গেছে জয়ন্ত রায়। এই লোকটীকে ফাঁসি হতে রক্ষা করলেও আজীবন কারাবাস হতে বাঁচানো সম্ভব হয় নি। সমীর বোস ভারতীর কাছে নিজের অপারগতা জানিয়েছে, কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছে ভারতীর সে সম্বন্ধে আর কোন ঔৎসুক্য নাই।

তবু এই জয়ন্ত রায়কে মনে মনে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারে নি সমীর বোস; মনে মনে সে জানতো—ভারতী মুখে কিছু না বললেও অন্তরে আজও জয়ন্তের কুশল কামনা করে।

ভারতীর সঙ্গে জয়ন্তের আর দেখা হয়নি, সুদীর্ঘ বারো বৎসরে জয়ন্তেরও যে কি পরিবর্তন হয়েছে তাই বা কে জানে? আজকের দিনে তপস্বিনী ভারতী সেদিনকার জয়ন্ত রায়কে দেখে যে চিনতে পারবে না সে কথা সত্য।

স্বামী স্ত্রীর মিলন জীবনে কোনদিনই হয়নি। ভারতীর পিতার মুক্তির বিনিময়ে সে সমীর বোসকে পতিত্বে বরণই করেছে মাত্র, মিলনের মাঝখানে বিরাট প্রাচীর রূপে জেগে রইল রতনমণি দত্তের মৃতদেহ; সে ব্যবধান দূর করবার ক্ষমতা সমীর বোসের হয়নি।

সমীর বোস রইলো নিজের কাজ নিয়ে, ভারতী ফিরে এসেছে পলাশডাঙ্গায়।

উত্তরাধিকারিণী সূত্রে পলাশডাঙ্গার মিল অঞ্চল সুদ্ধ মালিক এখন সে। মিল ফ্যাক্টরী আজও চলছে, জমীর মালিক হিসাবে খাজনা পায় ভারতী।

বিখ্যাত পদ্মবিল আজও আছে—নাই কেবল দুস্থ গ্রামবাসীর জন্য যিনি দাঁড়িয়েছিলেন তিনি, আর নাই একজন—সে সূদন, মধুসূদন দাস—। সেই দ্বিতলের জানালায় দাঁড়িয়ে ভারতী তাকিয়ে থাকে পদ্মদহের দিকে—; তার চারিধার ঘিরে গড়ে উঠেছে মস্ত বড় মিল অঞ্চল—ঘস ঘস করে শব্দ ওঠে, চিমনীর কালো ধোঁওয়ায় আকাশের নীল রং ছেয়ে ফেলে।

উনিশশো বিয়াল্লিস খৃষ্টাব্দ—

দেশে চারিদিকে উঠেছে হাহাকার—অন্ন চাই—আর কিছু নয়, শুধু দুটি ভাত।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কি ঘুরে এলো?

গ্রামের পথে সারি দিয়ে চলে বুভুক্ষু নর নারীর দল—জীর্ণ শীর্ণ শিশুরা। জমীদার বাড়ী তারা ঘিরে ফেলে—তারা চীৎকার করে—"খেতে দাও মা, খেতে দাও।"

ভারতীর দুই চোখ জ্বলে ওঠে—।

বিপ্লব আবার মাথা তুলতে চায়, মনে হয়—কেন—কেন এ দেশের লোক খেতে পায় না, কেন এরা ঘর ছেড়ে পথে বার হয়েছে? যুদ্ধ উপলক্ষ্য করে লক্ষ লক্ষ বিদেশী এসেছে এদেশে, তাদের ব্যয় জোগাতে বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট এদের মুখের অন্ন কেড়ে নিয়েছে, এদের খাবার তাদেরকে খাওয়াচ্ছে।

দেশ আজ ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়েছে, দেশবাসী সাহায্য চাইবে কার কাছে, বিচার চাইবে কার কাছে?

আজ কোথায় বিপ্লবী নেতা জয়ন্ত রায়—

বহুকাল পরে ভারতীর মনে জেগে ওঠে জয়ন্ত রায়—সে তখনকার দিনে ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহ করে নিরন্নকে খেতে দিয়েছে। আজ কোথায় তার পিতা রতনমণি দত্ত—যিনি তাঁর নিরন্ন শরণাগতকে রক্ষা করতে নিজের যথাসর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছিলেন?

ভারতী একবার আকাশের পানে তাকায়—

পিতা আছেন ওইখানে, হয় তো জয়ন্ত রায়ও আছে তাঁর পাশে। ভারতী তাঁদের মঙ্গল কামনা করে।

ভারতী খুলে দিলে অন্নভাণ্ডার, খুলে দিলে ধনভাণ্ডার—

দলে দলে আসে বুভুক্ষু নরনারী, পেটভরে তারা খেয়ে যায়।

সত্যকার পথ দেখতে পেয়েছে ভারতী, স্বামীজিকে সে চোখের সামনে দেখতে পায়, কাণে আসে তাঁর বাণী—

বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেই জন—
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

মহীয়সী নারী জানকী বাই, তোমার অর্থ আজ সার্থকতা লাভ করেছে; পিতা, তোমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে, আর জয়ন্ত—

ভারতী আর ভাবে না, ভাবতে পারে না।

এক ছাড়িয়ে সে এখন বহুর মধ্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। সকাল হতে আরম্ভ হয় দরিদ্র বুভুক্ষু নারায়ণের সেবা—

সন্ধ্যায় সে আসে গোবিন্দজীর মন্দিরে, এই সময়টুকু সে নিজের—সম্পূর্ণ নিজের। মরণের পর কি আছে, কি হবে তা ভারতী জানে না, স্বর্গে যাওয়ার কামনা সে কোনদিন করে না। পূজা সে করে না—শুধু ঠাকুরের সামনে নিস্তব্ধে বসে থাকে।

(৩৪)

ভারতী মন্দিরের ভিতর দিকে তাকাল।

জমাটবাঁধা গাঢ় অন্ধকার, এই অন্ধকারে পলায়িত লোকটী কোথায় আত্মগোপন করে আছে কে জানে।

"শুনছো,—যে মন্দিরে প্রবেশ করেছো—আমার কথা শোন, এদিকে এসো—"

একটা খস খস শব্দ শোনা যায়, মনে হয় লোকটী তাঁর কথা অনুসরণ করে সরে এসেছে।

ভারতী চাপা সুরে বললে, "শোন, পুলিসের লোকেরা ওই পথ ধরে গ্রামের ভিতর গেছে—এই সুযোগে তুমি মন্দিরের পিছনের এই পথ ধরে ছুটে চলে যাও। মাইল দুই তিন গেলে রেল ষ্টেশান পাবে, শেষ রাত্রের দিকে যে ট্রেনখানা আসবে ষ্টেশনের বিপরীত দিক হতে তাতে উঠে পড়তে পারবে নিশ্চয়ই। ওরা ষ্টেশানে পাহারা রেখেছে বলছে, রাখলেও তুমি সতর্ক হয়ে নিশ্চয়ই উঠতে পারবে। হ্যাঁ, একবার কলকাতায় গিয়ে পড়তে পারলে তোমার মত লোক যে কোন রকমে যে কোন জায়গায় চলে যেতে পারবে বাঁচবার জন্যে—।"

লোকটীর কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না।

ভারতী অধীর হয়ে ওঠে—"কই,—তুমি আমার কথা শুনছো—এদিকে আসছো না কেন? ইচ্ছে করে ফাঁসির দড়িটা গলায় পরতে চাও—কিন্তু তাতে কি লাভ হবে শুনি? আকাশ পরিস্কার হয়ে আসছে, এখনই চাঁদ উঠে পড়বে যে, এর পর আর পালাতে পারবে না।"

লোকটী সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যায়,—কোন কথা সে বলে না।

ভারতী বললে, "হয় তো তোমার জীবনে বিতৃষ্ণা এসেছে তাই যেতে চাচ্ছো না, কিন্তু মরে কোন ফল নেই, বিশেষ করে এ রকম ভাবে ফাঁসির দড়িতে ঝুলে। বেঁচে হয় তো তুমি অনেক বড় কাজ করতে পারবে—মরলেই তো সব ফুরিয়ে যাবে।"

এক মুহূর্ত নীরব থেকে আবার বলল, "আমি বুঝেছি, হয় তো তোমার কাছে টাকা পয়সা নেই—কেমন—কথাটা ঠিক তো—?"

সে অস্ফুট কণ্ঠে কেবল বললে—"হ্যাঁ—"

ভারতী নিজের অঞ্চল হতে টাকা খুলে দেয়—বললো, "এই নাও, এই পাঁচটা টাকা আমার কাছে আছে, তোমায় দিচ্ছি, এতে তোমার খরচ উপস্থিতকার মত কুলিয়ে যাবে। নাও—হাত বাড়াও—"

অন্ধকারেই সে হাত খোঁজে—হাত পায় না।

বিরক্ত হয়ে উঠে ভারতী বলল, "বলছি—হাত পাতো ওরা এখনই এসে পড়বে। এরপর তুমি তো ধরা পড়বেই, আমারও বড় কম বিপদ হবে না সে কথাটা মনে করো।"

নিঃশব্দে সে এবার হাত বাড়ায়—ভারতী তার প্রসারিত হাতের উপর পাঁচটা টাকা রাখে।

এতক্ষণে লোকটী কথা বলে—

আর্দ্র কণ্ঠে বললে, "আপনি এই মাত্র শুনতে পেলেন আমি আপনার স্বামী সমীর বোসকে হত্যা করে এসেছি, আমায় আশ্রয় দিয়েছেন, আমার বাঁচানোর জন্যে পুলিসের কাছে মিথ্যা কথা বলেছেন, আবার আমায় পালানোর জন্যে টাকা দিলেন আপনি—"

ভারতী বাধা দিল, "তুমি যখন আমার আশ্রয়ে এসে পড়েছো, আমি তোমায় রক্ষা করতে বাধ্য। আমি জানি না তুমি কে—ওরা তোমার যে নামই দিক আমি জানি সে নাম মিথ্যা। জানি না—কেন তুমি মিঃ বোসকে হত্যা করেছো, তা জানবার ইচ্ছাও আমার নেই। আজ তুমি আমার আশ্রিত—এইটাই আমার কাছে সব চেয়ে বড় সত্য—আর—"

লোকটী যেন আত্মসম্বরণ করতে পারে না—

"ভারতী—"

স্পষ্টই সে ভারতীর নাম ধরে ডাকে—

চমকে ওঠে ভারতী।

জয়ন্ত রায়ের নাম সে মিঃ মজুমদারের মুখে শুনেছে, বিশ্বাস করতে পারে নি। এই আহ্বানে অনেকদিনকার হারানো কণ্ঠস্বর সে শুনতে পায়—

"কে তুমি—বল, কে তুমি?"

ভারতী হাঁফাচ্ছিল।

লোকটী সরে দাঁড়ায়—"হ্যাঁ, আমিই জয়ন্ত রায় ভারতী—আমিই এসেছি।"

ভারতী নিশ্চল হয়ে যায়।

জয়ন্ত ধীর কণ্ঠে বলে—"হ্যাঁ, সত্যই জীবনে ধিক্কার জেগেছে ভারতী, এমন করে পালিয়ে বেড়াবার প্রবৃত্তি আর আমার নেই।—এ জীবন এখন বোঝা হয়ে উঠেছে, নামাতে পারলে এখন বাঁচব। শুনেছো—আমিই তোমার স্বামীকে হত্যা করেছি। তোমার সঙ্গে একবার শেষ দেখা করব বলে এই পলাশডাঙ্গায় এসেছিলাম, এ খবরটা সমীর বোস জানতে পেয়েছিল। কয়েকজন পুলিশ নিয়ে সে আমায় ধরতে এসেছিল তখন বাধ্য হয়ে আমায় গুলি চালাতে হয়। আমার দুর্ভাগ্য যে আমারই গুলিতে তিনি মারা গেলেন—আমার এ কষ্ট এ দুঃখ কোনদিনই যাবে না ভারতী যে আমিই তোমায় বিধবা করেছি। শুধু একটা কথা বিশ্বাস করো ভারতী—আমার সঙ্গে রিভলভার ছিল না, তিনি আমায় লক্ষ্য করে রিভলভার তুলবার সঙ্গে সঙ্গে আমি লাফিয়ে পড়ে তাঁর হাতখানা চেপে ধরি, আমারই দুরদৃষ্টবশে সেই গুলি বিঁধলো গিয়ে তাঁরই বুকে—"

"থাক—" বাধা দিল ভারতী—"যা হয়ে গেছে তা নিয়ে আলোচনা করা আর মিথ্যে। অনেক দেরী হয়ে যাচ্ছে,—আর নয়, তুমি এবার যাও। আমি চাইনে ফাঁসির দড়িতে বিপ্লবী বীর জয়ন্ত রায় ঝুলবে, বৃটীশ গভর্নমেণ্ট তোমায় শাস্তি দিয়ে গর্ব অনুভব করবে। তোমার কাজ এখনও ফুরায় নি, চারিদিকে হাহাকার, দুঃখ বেদনা, মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা সুরু হয়েছে। আজ প্রকৃত বিপ্লব সুরু হয়েছে, দেশ ধ্বংস হচ্ছে, নিদারুণ শাসনযন্ত্রের চাপে দেশবাসীর প্রাণ কণ্ঠাগত হয়েছে। জাতির উন্নতি অবনতি, দেশের স্বাধীনতা পরাধীনতার সন্ধিক্ষণ এসেছে, এর মান নির্ণয় করার সময় এ নয়—এই

উনিশশো বিয়াল্লিশে সত্যকার বিপর্যয় এসেছে। এ সময় স্বেচ্ছায় ধরা দিলে চলবে না, বীরের মত যুদ্ধ করে মরো তাতে আমার দুঃখ হবে না। তুমি যাও, এ বিপ্লবকে বাঁচিয়ে রাখো, এই বিপ্লবই আনবে আমাদের দেশের, আমাদের জাতির স্বাধীনতা এ কথা মনে রেখো।"

জয়ন্ত রায় দাঁড়ায় না, দরজার দিকে অগ্রসর হয়।

দরজার ফাঁক দিয়ে ভাঙ্গা চাঁদের আলো আসে, জমাট বাঁধা অন্ধকার যেন পাতলা হয়ে যায়।

রুদ্ধ কণ্ঠে ভারতী ডাকেন, "একটু দাঁড়াও—"

জয়ন্ত দাঁড়ায়—।

গলায় অঞ্চলটা জড়িয়ে ভারতী নতজানু হয়ে প্রণাম করল—

কান্নাঝরা সুরে বলল, "গুরু তুমি, তাই তোমায় প্রণাম করছি। সেদিনকার সে ভারতী মরে গেছে, তার জায়গায় যে ভারতী আছে তাকে তুমি আশীর্বাদ করে যাও—যে কর্মভার সে গ্রহণ করেছে, তাতে যেন তার আনুরক্তি থাকে, ভুল করে যেন নিজেকে সে না হারিয়ে ফেলে।"

"সেই আশীর্বাদই করলুম ভারতী—"

দরজাটা খুলে ফেলে জয়ন্ত—

ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে চাঁদ হেসে ওঠে, জয়ন্ত মন্দির হতে নামে।

চলতে চলতে পথের বাঁকে থেমে সে একবার পিছন ফিরে তাকায়। চাঁদ মেঘের আড়ালে ডুবে যাওয়ার সঙ্গে সেও পথের বাঁকে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

ফিরল ভারতী।

দরজা রইলো খোলা, চাঁদের আলো দরজার পথে ঘরের ভিতর উঁকি দিচ্ছিল।

বিগ্রহের সামনে মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ল ভারতী। এতক্ষণ যে কান্নার ঢেউ বুকের মধ্যে আছড়ে ফিরছিল, নির্জন মন্দিরে সে ঢেউ উথলে প্রকাশ হয়ে পড়লো।

"ঠাকুর—ওগো অন্তর্যামী ঠাকুর—"

ভারতী ফুলে ফুলে কাঁদে,—"কার পাপে, ওগো, এ সব ঘটলো কার পাপে? আজ সবাইকে নিয়ে আমায় একা কেন রাখলে ঠাকুর, আমাকেও নাও,—আমায় মুক্তি দাও।"

বাইরে লোকের সোরগোল শোনা যায়—রাধানাথের কণ্ঠ স্বর ভেসে আসে—

'কাল তোদের সব কোতল করব, আজ রাতটা খেয়ে শুয়ে ফুর্তি করে নে বেটারা, কাল সকালে তোদের গর্দান যদি না নেই, আমার নাম রাধানাথ ঠাকুরই নয়।

বারাণ্ডায় উঠতে উঠতে সে বার বার হাঁক পাড়ে—"দিদিমণি—দিদিমণি গো—"

এলায়িত রুক্ষ চুলগুলো দুই হাতে বেঁধে গায়ে মাথায় কাপড় টেনে দেয় সে, আর্দ্র কণ্ঠে উত্তর দিল, "আমি এখানেই আছি রাধানাথ,—যাচ্ছি।"

রাধানাথ আলো নিয়ে আসে।

বললে, "রাত অনেক হয়ে গেছে দিদিমণি, বাড়ী চলুন—সবাই বড় ভাবছে।"

ভারতী আর্দ্র কণ্ঠে বলল, "আলোতে ঠাকুরের মুখখানা একবার দেখে একটা প্রণাম করে যাই রাধানাথ।"

এই প্রথম রিক্ত হাতে ভারতী ঠাকুর প্রণাম করল। বিগ্রহের প্রণামী টাকা আজ সে তুলে দিচ্ছে বিপ্লবী বীর জয়ন্ত রায়ের হাতে—যে আজ হত্যা করে এসেছে তারই স্বামীকে।

মৃদু বাতির আলোয় দেখা যায়—বিগ্রহের মুখ দৃপ্ত হাসিতে ভরে উঠেছে।

সমাপ্ত

★

মুহূর্ত্তের গান

অরুণবরণ চক্রবর্তী

অবসর—ক্ষণিকেরও ক্ষীণ অবসর দাও যদি,
তার সাথে দিও তবে কাগজের একখানি পাতা,
একটি কলম আর একটু নির্জন পরিবেশ।

উদয় সাগর হতে গোধূলির সীমান্ত অবধি
প্রত্যহ পরিক্রমায়, সুকঠোর জীবনের জাঁতা
দুহাতে ঘোরাই শুধু নিবারিতে উদরের ক্লেশ।

তবু তার ফাঁকে ফাঁকে জীবনের প্রকৃত আভাস
—রূপ রস গন্ধ আর বৈচিত্রের অপূর্ব ঝংকার—
রূপায়িত হয় নাকি মনের অমর আয়নায়?

মেঘে রোদে লুকোচুরিঃ কখনো বা নির্মেঘ আকাশঃ
প্রভাতের আলো গানঃ গোধূলির সুবর্ণ সম্ভারঃ
চকিত বিস্ময় কোন আকস্মিকতার মূর্ছনায়!

মনের সেতার হতে সে অপূর্ব মুহূর্তের গান
আমার কাব্যের ছন্দে—আমি চাই—পায় যেন প্রাণ।

জালিয়ানওয়ালাবাগের স্মৃতি

রণজিৎ কুমার সেন

বৈশাখী পূর্ণিমার প্রশান্ত বেলা। ১৩ই এপ্রিল, ১৯১৯ সাল। পুলিশ কর্তৃক গান্ধীজী এবং অমৃতসরের বরেণ্য নেতা ডাঃ কিচ্‌লু ও ডাঃ সত্য পালের আকস্মিক গ্রেপ্তারের সংবাদে তাঁদের মুক্তির দাবীতে সায়াহ্নে এক জনসভার ব্যবস্থা করা হ'লো জালিয়ানওয়ালাবাগে। সভাপতিত্ব ক'রবেন লালা কানাইয়ালাল। দুদিন আগে থেকেই পাঞ্জাবের বিভিন্ন জনপদে ঘোষিত হ'য়ে গেল এই বার্তা। বৈশাখী পূর্ণিমার প্রশান্ত বেলা, ১৩ই এপ্রিলের উজ্জ্বলন্ত মধ্যাহ্নের বুকের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে গড়িয়ে এলো সেই ঐতিহাসিক সায়াহ্নের প্রতিজ্ঞামুখর বেদনাময় আভা। গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে নিরপরাধ সুস্থ শান্তিপ্রিয় মানুষেরা দলে দলে এসে ভ'রে তুল্‌লো বাগের ময়দানকে। হাজার হাজার মানুষের কি অপূর্ব প্রাণময় মিলন! ময়দান ভ'রে গেল বটে, কিন্তু ময়দানবও দূরে ছিল না।

আকস্মিক এই গণবিক্ষোভের দিকে লক্ষ্য রেখে, ১১ই এপ্রিল কর্তৃপক্ষ অমৃতসরের সর্বময় শাসনক্ষমতা জেনারেল ও, ডায়ারের স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হন। ক্ষমতা প্রয়োগে ডায়ারের বিলম্ব ঘটলো না। যে কোনোরকম সভা-সমিতি বেআইনী বলে তিনি ঘোষণা ক'রে দিলেন। কিন্তু প্রাণাবেগে চঞ্চল জনতার হৃদয় পর্যন্ত গিয়ে তা স্পর্শ ক'রলো না। নির্দিষ্ট দিনে তাই অসংখ্য জনতার রক্ত-লালসায় উন্মত্ত হ'য়ে উঠলো তৃষিত ময়দানব। স্তরে স্তরে মেসিনগান স্থাপিত হ'য়ে গেল বাগের প্রবেশ পথে, সভানুষ্ঠানের পূর্ব থেকেই সবার অলক্ষ্যে ওৎ পেতে রইলেন জেনারেল ডায়ার, সঙ্গে তাঁর বিভিন্ন রেজিমেণ্টের দুর্ধর্ষ সেপাই।

শান্তিপ্রিয় মানুষেরা শৃঙ্খলা রক্ষা ক'রেই সভারম্ভের প্রতীক্ষায় অপেক্ষা ক'রছিল। কিন্তু রক্ত-লোলুপ ডায়ারের ধৈর্যের বাঁধ ক্রমেই শিথীল হ'য়ে পড়ছিল। নর-নারী শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে জনতাকে লক্ষ্য ক'রে সহসা মেসিনগান-গুলো গর্জন ক'রে উঠলো। মাত্র দশ মিনিটে পুরো ষোলশ' গুলি নিঃশেষ হ'য়ে গেল। প্রাণভয়ে জনতা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হ'য়ে প'ড়লো। কিন্তু পালাবার পথ তাদের বন্ধ। বাগের একটি মাত্র প্রবেশ ও নির্গমণ পথ প্রশস্ত, কেউ তাই প্রাচীর ডিঙ্গাতে চেষ্টা ক'রলো, কেউ মাটিতে হামা দিয়ে গুলি থেকে অব্যাহতি পেতে চাইল। কিন্তু অব্যাহতি কে দেয় তাদের? উন্মত্ত ডায়ারের চোখ তখন দাবাগ্নির মতো জ্বলছে। গুলি ছুটচে লক্ষ্যহীন নক্ষত্রগতিতে। দেখতে দেখতে বাগের সবুজ-বুক রক্তবণ্যায় লাল হ'য়ে গেল। মাত্র দশমিনিটে এক হাজার মানুষের মৃত্যু। তৃষ্ণা মিটিয়ে বীর-দর্পে একসময় সৈন্য নিয়ে ছাউনীতে ফিরে গেলেন ডায়ার। মানুষের আর্তরোল আর হতাহতের দেহগুলোর দিকে ফিরে তাকাবারও প্রয়োজন বোধ ক'রলেন না তিনি।

বৈশাখী পূর্ণিমার সায়াহ্নাকাশে তখন তারার মিছিল চ'লেছে, সিঁদুর বিন্দুর মতো গাঢ় ও গভীর হ'য়ে উঠেছে স্নিগ্ধ হাস্যময়ী চাঁদ। চন্দ্রলোকে তখন আবিরের ছড়াছড়ি। চাঁদের এই সুষমা আর তারার ঝিকিমিকিতে যারা এক সময় চিত্ত ভ'রে নিয়ে ঘরে ফিরতে পারতো, জালিয়ান্‌-ওয়ালাবাগের বুকে তাদের দেহ ছিঁড়ে ছুটছে তখন চন্দ্রালোকের ঐ আবিরের চাইতেও লাল রক্তস্রোত। আবির আর রক্তে আকাশ আর মৃত্তিকা তখন রঞ্জিত হ'য়ে উঠেছে। তার-মধ্যে সুবাসিত হ'য়ে উঠেছে বুলেট আর পোড়া বারুদের গন্ধ।

আজ থেকে ৩৩ বছর পূর্বের এক বেদনাময় সায়াহ্নের ইতিহাস। বিংশ শতাব্দীর প্রথম মহাযুদ্ধে ভারতের অকুণ্ঠ সাহায্য ও আত্মদানের প্রতিদানে ভারতবাসীর অদৃষ্টে যে কুখ্যাত 'রাউলাট আইন'-এর মর্মঘাতি অভিশাপের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়, তারই ভিত্তিতে রচিত হয় সেদিনের এই ইতিহাস। সার্বভৌম স্বাধীন ভারতের পটভূমিতে সে-ইতিহাস আজও ভারতবাসী ভুলতে পারেনি।

রাউলাট কমিটির রিপোর্ট বের হয় ১৯১৯ সালের ১৯শে জানুয়ারী। কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বিপ্লব ও অরাজকতা দমনকল্পে ভারতরক্ষা আইনকে নতুন নামে কায়েম করার উদ্দেশ্যে ভারত গভর্ণমেণ্ট ৬ই ফেব্রুয়ারী বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় রাউলাট বিলের খসড়া পেশ করে। রাজনৈতিক আন্দোলনে ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় ভারতবাসীর অধিকারকে সঙ্কোচ করাই ছিল এই বিলের আসল উদ্দেশ্য। পুরনো আইনের নতুন এই সংস্করণে নানা অনুচ্ছেদের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট ক'রেই ঘোষণা করা হ'লোঃ 'অঞ্চল বিশেষে আপদকালীন অবস্থা ঘোষণা ও তার অধি-বাসীদের সঙ্গে শৃঙ্খলাভঙ্গকারী হিসেবে আচরণের এবং সন্দেহবশে গ্রেপ্তার ও নির্বাসনের অধিকার শাসকবর্গের

থাকবে।'—সমগ্র ভারতবাসীর প্রতিবাদ গিয়ে ভেঙে পড়লো সেদিন ব্যবস্থাপক সভার সিংহদ্বারে। কিন্তু গভর্নমেন্টের

জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রধান প্রবেশ-পথ

বিন্দুমাত্র চিত্ত-চাঞ্চল্য দেখা গেল না। দেখতে দেখতে সারা ভারতব্যাপী স্বতস্ফূর্ত গণবিক্ষোভ মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। দুঃখের বিষয়, বিপ্লব আন্দোলন তখন বহুলাংশে কেন্দ্র-ভ্রষ্ট ও শক্তিহীন। এদিকে ১০ই মার্চ সরকারী ভোটাধিক্যে রাউলাট বিল আইনের মর্যাদা পেয়ে সক্রিয় হ'য়ে দাঁড়ালো। জনমতের সক্রিয় দাবীকে দাবিয়ে রেখে সেদিন সরকারী অনাচার, যে-ভাবে স্বৈরাচারের রূপ নিয়ে দেখা দেয়, তার প্রতিবাদে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পণ্ডিত মদন-মোহন মালব্য, মহম্মদ আলী জিন্না এবং পণ্ডিত বিষ্ণুদত্ত শুক্ল সভ্যপদে ইস্তফা দেন। সমগ্র ভারতব্যাপী সংগ্রামী জনসাধারণ এক অধীর চাঞ্চল্যে ন'ড়ে উঠলো। কিন্তু নিষ্ক্রিয় অবস্থায় তাদের বেশী কিছু ক'রবার ছিল না। প্রথম মহা-যুদ্ধ-বিজয়ী বৃটিশ তখন নানা আয়ুধে সজ্জিত।

দিকভ্রান্ত ভারতবাসীর এই নিরালম্ব নিষ্ক্রিয় মুহূর্তে দেশবাসীর পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন গান্ধীজী। ইতি-পূর্বে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকাকে চমকে দিয়ে এসেছেন। নতুন চিন্তাধারা ও কর্মোন্মাদনায় দেশবাসীর বিচ্ছিন্ন শক্তিকে সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে এগিয়ে নিলেন তিনি সামনের পথে। নতুন প্রাণস্পন্দনে জেগে উঠলো ভারতবাসী। নিরুপদ্রব প্রতিরোধ ব্যবস্থাই ছিল গান্ধীজীর সংগ্রামের প্রারম্ভিক কৌশল। তাঁর আবেদনে বিপ্লবী তরুণ সম্প্রদায়, আপোষ-বিরোধী জাতীয় দল, বিক্ষুব্ধ মুসলমান সমাজ ও সংগ্রামমুখী জনতা বিপুলভাবে সাড়া দেয়। ক্ষুব্ধ ভারতের পক্ষ থেকে রাউ-লাট আইনের বিরুদ্ধে গান্ধীজী ঘোষণা করেনঃ 'এই আইন ভারতবাসীর ন্যায্য অধিকার ও মানুষের জন্মগত স্বাভাবিক স্বাধীনতার পরিপন্থি; অতএব যে পর্যন্ত না এই অসংগত ও অপমানকর আইন প্রত্যাহৃত হবে, সে পর্যন্ত আমরা এক-যোগে তা মেনে নিতে অস্বীকার ক'রবো। নিরুপদ্রব প্রতি-রোধ ব্যবস্থা অবলম্বন ক'রে এই আইনকে আমরা সম্মিলিত-ভাবে বাধা দেব।'

মাদ্রাজ থেকে গান্ধীজী সংবাদ প্রচার ক'রলেন—৩০শে মার্চ্চ থেকে সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু হবে। কিন্তু বোম্বাইতে উপনীত হ'য়ে সেখানে সত্যাগ্রহ সভা গঠন ক'রে আন্দোলনের তারিখ পরিবর্তন ক'রে তিনি ৬ই এপ্রিল দিন ঠিক করেন। এ দিনের জন্য তিনটি মূল নীতি পালনের উদ্দেশ্যে তিনি নির্দেশ দেন, যথা—(ক) সমস্ত দিন আত্মশুদ্ধির জন্য উপ-বাস, (খ) যাবতীয় স্বাভাবিক কাজকর্ম বন্ধ এবং (গ) জন-সভায় রাউলাট আইন প্রত্যাহারের প্রস্তাব গ্রহণ।

কিন্তু বহু স্থানে যথা সময়ে এই পরিবর্তিত দিনের নির্দেশ গিয়ে না পৌঁছোয় দিল্লী ও পাঞ্জাবের কয়েক জায়-গায় পূর্বনির্দিষ্ট ৩০শে মার্চ্চই হরতাল পালিত হয়। দিল্লীর রেলস্টেশনে আন্দোলনকারী ও দোকানীদের মধ্যে

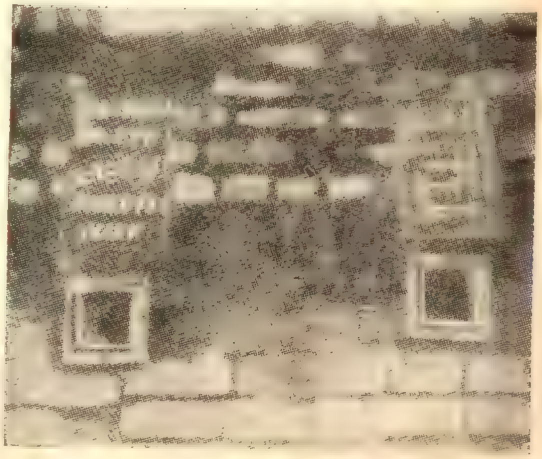

জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রাচীরগাত্রে গুলীর চিহ্ন

কিছু হাঙ্গামার সৃষ্টি হওয়ায় পুলিশ গুলি চালায়। এই হাঙ্গামার সংবাদ পেয়ে ৮ই এপ্রিল গান্ধীজী দিল্লী রওনা হন। সঙ্গে সঙ্গে গভর্নমেণ্ট তাঁর দিল্লী ও পাঞ্জাব যাত্রা নিষিদ্ধ ক'রে সমন জারী করে। পথে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার ক'রে বোম্বাইতে নিয়ে ছেড়ে দেয়।

গান্ধীজীর এই আকস্মিক গ্রেপ্তারের সংবাদ দেখতে দেখতে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র দেশবাসীর মধ্যে এক বিসুভিয়াসের সৃষ্টি ক'রলো। সব চাইতে বেশী বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠলো পাঞ্জাবীরা। এদিকে অমৃতসরের বরেণ্য নেতা ডাঃ কিচ্‌লু ও ডাঃ সত্য পালকে গ্রেপ্তার ক'রে দেশান্তরিত করা হয়। ফলে অবস্থার যা পরিণতি দাঁড়ায়, তা গোড়াতেই বলা হ'য়েছে।

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দৃষ্টি দিলে আমরা স্পষ্টই দেখতে পাইঃ 'শুধু অমৃতসরেই নয়, লাহোর, গুজ্‌রানওয়ালা, কাসুর ও পাঞ্জাবের অন্যান্য কয়েকস্থানেও দাংগা হাংগামা ঘটে; গভর্নমেণ্ট সামরিক আইন জারি ক'রে অমানুষিক অত্যাচার ক'রবার অজুহাত পায়। তারা সংবাদপত্রের কণ্ঠ রোধ করে, পাঞ্জাবে জনসাধারণের গমনাগমনের ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত এবং দীর্ঘকাল সামরিক আইনের নাগপাশে সমুদয় প্রতিরোধশক্তি নিঃশেষ ক'রবার চেষ্টা করে।'

৬ই এপ্রিল থেকে ১৩ই এপ্রিল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ঘটনাবলীকে লক্ষ্য করে ১৯২৫ সালে গান্ধীজী ২রা এপ্রিল তারিখের 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'য় যে প্রবন্ধ লেখেন, তার মর্ম হচ্ছেঃ '৬ই এপ্রিল থেকে ১৩ই এপ্রিল ভারতের ইতিহাসে অমর হ'য়ে থাকবে। ১৯১৯ সালের ৬ই এপ্রিল সমগ্র জাতির মধ্যে এক অপ্রত্যাশিত বিপুল জাগরণ আসে। ১৩ই এপ্রিল জাতিকে আত্মবলি দিতে হয়; তাতে হিন্দু, মুসলমান ও শিখের সম্মিলিত রক্তধারা একখাতে প্রবাহিত হয়। মহামৃত্যুর মধ্যেই তারা ঐক্যলাভ ক'রে গেছে।'

এই ঐতিহাসিক ভিত্তিতেই প্রতি বছর ৬ই এপ্রিল থেকে ১৩ই এপ্রিল পর্যন্ত সপ্তাহটি সারা ভারতে জাতীয় সপ্তাহরূপে পালিত হ'য়ে আসচে।

রাউলাট আইনের প্রতিবাদে গান্ধীজী তাঁর 'কাইজার হিন্দ' ও 'বুয়র যুদ্ধের পদক' বর্জন করেন।

শুধু গান্ধীজীই নন্, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও জালিয়ান্‌ওয়ালাবাগের এই হত্যাকাণ্ডে সমগ্র দেশবাসীর সঙ্গে একসাথেই অশ্রুবিসর্জন ক'রেছিলেন। ভারতের প্রতি বৃটিশের এই নিগ্রহ ও অত্যাচারকে তিনি আত্মনিগ্রহ ব'লেই বোধ ক'রেছিলেন। ইতিপূর্বে তাঁকে যে 'নাইট' উপাধী দেওয়া হয়েছিল, এই উপলক্ষ্যে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডকে পত্র দিয়ে তিনি ঘৃণার সঙ্গে সে উপাধী ত্যাগ করেন। পত্রখানিতে শুধু এই উপাধী বর্জনই নয়, নিরীহ দুর্বল ভারতবাসীর উপর বৃটিশের অত্যাচারের কাহিনী সভ্যযুগের ইতিহাসের দিক থেকে যে কতখানি নির্মম ও বর্বরোচিত, তারও জ্বলন্ত চিত্র ভাস্বর হ'য়ে উঠেছে। ঐতিহাসিক সম্পূর্তির দিক থেকেই পত্রখানি এখানে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ লেখেনঃ

Your Excellency,

The enormity of the measures taken by the Government in the Punjab for quelling some local disturbances has, with a rude shock, revealed to our minds the helplessness of our position as British subjects in India. The disproportionate severity of the punishments inflicted upon the unfortunate people and the methods of carrying them out, we are convinced, are without parallel in the history of the civilised Governments, barring some conspicious exceptions, recent and remote. Considering that such treatment has been mated out to a population, disarmed and resourceless, by a power which has the most terribly efficient organisation for destruction of human lives, we must strongly assert that it can claim no political expediency, far less moral justification. The accounts of insults and sufferings undergone by our brothers in the Punjab have trickled through the gagged silence, reaching every corner of India, and the universal agony of indignation roused in the hearts of our people has been ignored by our rulers, possibly congratulating themselves for inparting, what they imagine as salutary lessons. This callousness has been praised by most of the Anglo-Indian papers, which have, in some cases, gone to the brutal length of making fun of our sufferings, without receiving the least check from the same authority, relentlessly careful in smothering every cry of pain and expression of judgment from the organs representing the sufferers. Knowing that our appeals have been in vain, and that the passion of vengeance is blinding the noble vision of statesmanship in our Government, which

could so easily afford to be magnanimous as befitting its physical strength and moral tradition, the very least that I can do for my country is to take all consequences upon myself in giving voice to the protest of the millions of my countrymen surprised into a dumb anguish of terror. The time has come when badges of honour make our shame glaring in their incongruous context of humilation, and I for my part wish to stand, shorn of all special distinctions, by the side of my countrymen, who for their socalled insignificance, arc liable to suffer a degradation not fit for human beings. And these are reasons which have painfully compelled me to ask Your Excellency to relieve me of my title of my Knighthood, which I had the honour to accept from His Majesty the King at the hands of your predecessor, for whose nobleness of heart I still entertain great admiration.

Your's faithfully
Rabindra Nath Tagore.

জেনারেল ডায়ারকে অবশ্য পরে সেনাবিভাগ থেকে পদচ্যুত ক'রে সরকারী কাজের অনুপযুক্ত ব'লে বিবেচন করা হয়, কিন্তু ভারতবাসীর অজস্র প্রাণবিসর্জনের তুলনায় তা কতটুকু? হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ বেসরকারী তদন্ত কমিটি নিয়োগ করেন। এই সময়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে গান্ধীজীর প্রথম মিলন হয়। ইতিহাসের দিক থেকে এটাও কম বড় উল্লেখযোগ্য বিষয় নয়।

১৯১৯ সালে কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় অমৃতসরেই। সভাপতি হন পণ্ডিত মতিলাল নেহরু। অভিভাষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেনঃ 'অমৃতসর এবং পাঞ্জাবের অন্যত্র যাঁরা নিহত হ'য়েছেন, তাঁদের পবিত্র আত্মার প্রতি আমরা শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন ক'রি। যাঁরা আজও জীবিত অথচ মৃত্যুর অধিক লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য ক'রছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যেও আমরা শ্রদ্ধা জানাই। এই সব শহীদদের স্মৃতিরক্ষার জন্য স্মারকস্তম্ভের প্রয়োজন নেই। আমাদের বক্তৃতা একদিন মানুষ ভুলে যাবে। আমাদের প্রস্তাবও পরে একমাত্র ঐতিহাসিক ছাড়া আর কারও নজরে প'ড়বে না, কিন্তু ভারতমাতার এই সন্তানদের ত্যাগ ও দুঃখবরণের কথা ভারতবাসী কোনোদিন বিস্মৃত হবে না।'

জাতীয় সপ্তাহের মঙ্গললগ্নে আমরাও আজ সকৃতজ্ঞচিত্তে জালিয়ানওয়ালাবাগ-শহীদদের অমর আত্মদানের কথা স্মরণ ক'রে তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

★

সঞ্চার

বীরেন্দ্র কুমার গুপ্ত

আকাশ ভাস্বর, স্মিত। ঘনঘটা প্রাবৃট-বুনন
কোথাও প্রস্তুতি নেই, অন্ধকার, বায়ুর ব্যস্ততা
মেঘস্তরে ব্যাপ্ত নয়, শুধু নীল—প্রবাহ-মত্ততা
দিগন্ত-বলয়ে স্পন্দমান। শুভ্র মণির মতন
কোনো এক জ্যোতিচ্ছটা তারপর অলক্ষ্যে কখন
দেখা দেয়, ঢালে শান্তি, সুবিস্তীর্ণ নিবিড় স্তব্ধতা,
তখন কি আকাশের মন ভ'রে নক্ষত্রের কথা
অনির্বাণ কাজ ক'রে?—দোল খায় স্বপ্ন-আলোড়ন?

আমারো হৃদয় দেখো আকাশের মত অনাবৃত—
উজ্জ্বল কামনাগুলি। শরীরের নানা গ্রন্থি-কোনে
একটি বিচিত্র দোলা লঘুস্বরে হয় সঞ্চারিত।

জানি যে দাঁড়াবে এসে জ্যোতির্ময়ী উদ্ভিন্ন প্রদোষে
পীনস্তনভারানতা। তাই স্বপ্ন—আকাঙ্ক্ষা জড়িত
হৃদয়কে খুলে রাখি, উর্ণনাভ-জাল বুনি বসে।

প্রস্তাব

শ্রীঅখিল নিয়োগী

বলা-নেই কওয়া নেই হঠাৎ বিনা নোটীশে বাপ মারা যাওয়ায় বটুক যেন আচমকা চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। মাথার ওপর অভিভাবক কেউ নেই, এখন কোন্ পথে সে এগুবে সেইটেই হল দুশ্চিন্তা যাদের বাপ হঠাৎ মারা যায় এবং গোটা সংসারের বোঝা কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে সরে পড়ে, তারা বোঝার ভারে আর সংসারের চাপে বেশ কাবু হয়ে পড়ে—সুতরাং বটুকের মতো এমন এলোমেলো অবস্থায় পড়ে না। বটুকের জীবনের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ এর বিপরীত। মাথার ওপর কোনো অভিভাবক নেই, বাপ নেহাৎ পথের ভিখিরী করে রেখে যান নি, ব্যাঙ্কে বেশ মোটা নগদ টাকা আর প্রচুর কোম্পানীর কাগজ গচ্ছিত রেখে গেছেন, যাতে সংসার-সমুদ্রে ছেলেকে হাবুডুবু খেতে না হয়।

এ অবস্থায় বটুক সত্যি চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো কোন্ পথে সে এগুবে।

এক বুড়ী দিদিমা শিবরাত্তিরের সল্তের মতে দেশের বাড়ীতে ক্ষীণ আলো জ্বালিয়ে চলছেন। তিনি চিঠি লিখলেন: এইবার একটি টুকটুকে বউ এনে সংসারী হও। পাছে তিনি তাঁর নির্ব্বাচিতা কোনো মেয়ে সহ এসে আচমকা এখানে উপস্থিত হন—সেই ভয়ে বটুক সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিলে যে, ওর শরীর খারাপ—পশ্চিমে হাওয়া খেতে যাচ্ছে! কিন্তু কল্‌কাতাতেই ফুটবল খেলে যখন প্রচুর খিদে পাচ্ছে—তখন খামোখা পশ্চিমের ধুলো খেতে যাওয়ার কোনো মানে হয় না।

বটুক তাই বিভিন্ন টিমের সঙ্গে ম্যাচ খেলে, রেষ্টুরেণ্টে চপ কাটলেট গিলে আর হাল্‌কা হিন্দি ছবি দেখে দিনগুলি কাটিয়ে দিতে লাগলো।

এক বন্ধু এসে সদুপদেশ দিলে, দেখ ভাই, তোমার বাবা যখন ব্যাঙ্কে প্রচুর টাকা রেখে গেছেন—তখন বাণিজ্যে সেটা বাড়িয়ে তোলা উচিত। জানো ত শাস্ত্র-বাক্য বল্‌ছে "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী"।

বটুক মাথা নেড়ে জবাব দিলে, সে ত' সত্যি কথাই! কিন্তু কি ব্যবসা করা যায় বল ত?

বন্ধু গোপীমোহন সোল্লাসে উত্তর দিলে, আজকের দিনে সেকথা আবার নতুন করে বল্‌তে হবে নাকি? এ যুগে একটি মাত্র বাণিজ্যেই প্রচুর টাকা এবং তার নাম হচ্ছে—সিনেমা।

বটুক মুখ কাচুমাচু করে উত্তর দিলে, কিন্তু ভাই, আমি যে সিনেমা বিজিনেসের কিছুই জানিনে!

—তার জন্যে আটকাবে না। অভিজ্ঞতার প্রসন্ন হাসি হাসে গোপীমোহন।

গোপীমোহন বটুকের কাছে গিয়ে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে। ফিস্ ফিস্ করে বলে, রঞ্জিতা দেবীর নাম শুনেছ ত? নামকরা ফিল্ম ষ্টার। আমার সঙ্গে খুব পরিচয় আছে। তোমায় একদিন নিয়ে যাবো তার কাছে।

অপরিচিতা মহিলার কাছে যেতে বটুক খুবই সঙ্কোচ বোধ করে। কিন্তু গোপীমোহন নাছোরবান্দা।

একদিন বটুকের গাড়ী করেই দু'জনে গিয়ে হাজির হল রঞ্জিতা দেবীর রিজেন্ট পার্কের বাড়ীতে।

রঞ্জিতা ওদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। নিজের অভিনয়ের বিভিন্ন পোজের ছবি দেখালেন, তাঁর কি কি ভালো লাগে জানালেন, বিভিন্ন কাগজে তাঁর অভিনয়ের ও রূপের কি রকম প্রশংসা করেছে সেই 'কাটিং'গুলি পড়ে শোনালেন, তারপর মৃদু হাস্যে বল্লেন, বটুকবাবু যদি খুসী মতো সন্ধ্যের দিকে তার গৃহে পদধুলি দান করেন তবে ফোন করে এলেই ভালো হয়। সঙ্গে সঙ্গে ফোন নম্বর সমেত ছাপানো কার্ড একখানিও ওর হাতে গুঁজে দিলেন।

ফিরতি মুখে গোপীমোহন শুধোয়,—কেমন দেখলে রঞ্জিতাকে? এ ফুটবলের মাঠ নয় যে প্রতিপক্ষের জবাবে একটা লম্বা সট্ মেরে দেবে!

বটুক কোনো উত্তরই দিতে পারে না! শুধু রঞ্জিতার কার্ডখানি তার বুকে কেবলি খোঁচা দিতে থাকে।

এই ঘটনার দিন দুই পরের কথা।

একটা ম্যাচ জিতে বটুক নামকরা একটি রেষ্টুরেণ্টে খুব চপ-কাটলেট গিলছে—পাশের কামরার দু একটি কথা শুনেই ওর কান সজাগ হয়ে উঠল।

গোপীমোহন না! হ্যাঁ, গোপীমোহনই আর একটি ভদ্রলোককে বলছে—দিয়েছি রঞ্জিতাকে সামনে এগিয়ে। এইবার বটুক ভায়ার মুখে আর কথাটি নেই! সাপ যেমন হরিণকে চোখের দৃষ্টিতে হিপনোটাইজ করে—ঠিক তেমনি ভাবে ওকে খেলিয়ে তুলবে রঞ্জিতা। প্রস্তাবটা রঞ্জিতার কাছ থেকেই আসবে কিনা। আর আমাদের কোন ভাবনা নেই। এখন শুধু বসে বসে পা নাচানোর পালা।

বলা বাহুল্য বটুক আর এরপর কোন প্রস্তাব শুনতে ওদিকে পা বাড়ায় নি।

কিন্তু আর একটি প্রস্তাব এলো…অন্য একটি অঞ্চল থেকে।

বটুকের দূর সম্পর্কের এক পিসেমশায়ের শালা একদিন এক পা ধুলো নিয়ে এসে উপস্থিত।

গ্রামের লোক—কোনো ভণিতার ধার ধারেন না। বললেন, জামাই বাবুর মুখে আপনার কথা শুনেই ছুটে আসছি। আমার অনেক দিনের প্ল্যান—ট্র্যাক্টার দিয়ে একেবারে বিজ্ঞান-সম্মত পন্থায় একটি কৃষি প্রতিষ্ঠান করবো। তা ভগবান যখন আপনাকে ঝুলি ঝেড়ে দিয়েছেন—মানে—টাকা অনেকেরই থাকে—কিন্তু এই বয়সে ত' কেউ হাতে পায় না—তাই বলছিলাম কি আমার পেছনে এসে একবারটি শুধু দাঁড়ান। আর আপনাকে কিছু দেখতে হবে না।

পেছনে দাঁড়িয়ে কোনকিছু নিরীক্ষণ করবার বাসনা বটুকের আদৌ নেই। কেননা সে চিরকাল মাঠে নেমে সরাসরি গোল দিতে ভালো বাসে, আর তার স্থান সব সময়েই ফরোয়ার্ডে।

কিন্তু মুস্কিল হয় এই যে, একজন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলেই আর একজন এসে হাজির হয় এবং তার প্রস্তাব পেশ করে। এই প্রস্তাবের হাত থেকে বটুক কি করে রেহাই পাবে সেই হয়েছে ওর মস্ত বড় ভাবনা।

মনে মনে ভাবলে দিন কতক গা ঢাকা দিলে মন্দ হয় না। দেশের দিদিমা কখন যে এসে সশরীরে আবির্ভূতা হবেন সে কথা বলা শক্ত।

সেদিন সকাল বেলা এক ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে তার বৈঠকখানায় এসে হাজির।

—আমার একটি প্রস্তাব আছে আপনার কাছে।

—প্রস্তাব যখন—তখন ত শুনতেই হবে। আকাশ-প্রমাণ উদাসীনতা নিয়ে বটুক জবাব দেয়।

—আজ্ঞে, আপনাকে সম্পাদক হতে হবে।

এবারে বটুক সত্যি হকচকিয়ে ওঠে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে জবাব দেয়, দেখুন, আপনি বেমালুম ভুল করেছেন। আমি লেখক নই খেলোয়ার। যদি কোথাও ম্যাচ খেলাবার প্রস্তাব থাকে ত' সোজাসুজি বলুন, নয় ত' সরে পড়ুন।

—আজ্ঞে না, সরে পড়বার জন্যে ত' আসিনি। ভদ্রলোক করে আমার প্রস্তাবটা আপনাকে বুঝিয়ে বলছি—

নিতান্ত নিরুপায় হয়ে বটুক উত্তর করে,—আচ্ছা, তা' হলে আপনার প্রস্তাবটা শেষ করুন—

—হ্যাঁ, সেই কথাই ভালো। ভদ্রলোক বেশ ঘনীভূত হয়ে বসেন। তার পর এক টিপ নস্যি নিয়ে সুরু করেন নিজের বক্তব্য:

—বুঝলেন, আমার একটি প্রেস আছে। আপনাকে আমি সরাসরি সম্পাদক করে দিচ্ছি। না, না, কোনো ওজর আপত্তি শুনবো না আমি। সম্পাদক হিসাবে মলাটে আপনার নামটাই ছাপা থাকবে। আর যা করবার সব আমিই করবো। আপনি টাইপের টাকা, কাগজের ব্যবস্থা, ব্লকের খরচা সব জুগিয়ে যাবেন। একেবারে নির্ঝঞ্ঝাটে কলকাতার বুকের ওপর একটি প্রথম শ্রেণীর কাগজের সম্পাদক হয়ে বসবেন। এরকম প্রস্তাবে যে

সম্মত হবেন—সে ত' জানা কথাই। তা হলে আজই একটা লেখাপড়া হয়ে যাক।

ভদ্রলোক বিজয়গর্ব্বে উল্লসিত হয়ে আর এক টিপ নস্যি নাসিকাদ্বয়ে গুঁজে আপন মনেই দুলতে লাগলেন।

অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও বটুকের পক্ষে বোঝানো শক্ত হল যে, রাতারাতি সম্পাদক হয়ে খ্যাতি অর্জ্জন করবার বাসনা তার আদপেই নেই। কিন্তু শুভানুধ্যায়ী যখন মরিয়া হয়ে ওঠে—তখন স্থান ত্যাগ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। সুতরাং বটুকও সরাসরি সেই পন্থাই অবলম্বন করে প্রাণ বাঁচালে।

এইবার বটুকের পক্ষে বোঝা কিছুমাত্র শক্ত হল না যে, ভালো খেলোয়ার হওয়া সত্ত্বেও কল্‌কাতা তার পক্ষে আদৌ নিরাপদ নয়। কেননা ইদানীং তাঁকে নিয়ে যে খেলা সুরু হয়েছে তাতে গোল দেবা খুবই কঠিন কাজ।

মধুপুরে ওদের একটি বাড়ী আছে। বহুকাল থেকেই বাড়ীটি খালি পড়ে আছে। একটি বুড়ো পুরোনো মালী দেখাশোনা করে।

যেমন মনস্থির হওয়া—অমনি বিছানা-পত্তর বেঁধে সুটকেস গুছিয়ে সে তৈরী হয়ে নিল এবং সরাসরি হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ে হাজির হল।

টিকিট কিনে, একটি কুলির মাথায় মালপত্তর চাপিয়ে সবে প্ল্যাটফর্ম্মের দিকে রওনা হয়েছে এমন সময় সে যাত্রার মুখে পেছনে হাঁচি পড়ার মতো একটি ডাক শুনে থম্‌কে দাঁড়ালো।

—একটু শুনুন।

সর্ব্বনাশ করেছে। এখানেও প্রস্তাব।

বটুক মরিয়া হয়ে উঠল। এইবার একটা হেস্তনেস্ত সে করবেই।

—আপনাকে ভদ্রলোক বলেই মনে হচ্ছে। পেছন থেকে আর একটি মৃদু আলতো কথা ভেসে আসে।

চটে মটে বটুক জবাব দিলে, তবে কি আপনার ধারণা আমি অভদ্র, জানোয়ার?

কিন্তু মুখটা ঘুরিয়ে যে দৃশ্য চোখে পড়ল তাতে হেস্তনেস্ত কোনো রকমেই করা চলে না।

কুড়ি-একুশ বছরের শ্যামলী একটি মেয়ে। কিন্তু তার চোখ দুটি এত কালো আর চোখের পাতা এত ঘন যে মনে হল বুঝি বিশ্বের বিস্ময় তাতে জমা হয়ে আছে।

মেয়েটি এইবার আর একটু এগিয়ে এসে বল্লে, এত অভদ্র আর ইতর দেখেছি এই কয়েকটা দিনে যে ভরসা করে কাউকে আর কোনো কথা বল্‌তে পারিনে। আপনি নিশ্চয়ই তাদের দলে নন।

এত বড় 'কমপ্লিমেন্ট' বটুক জীবনে এত সহজ ভাবে পায়নি। তাই একেবারে হকচকিয়ে গেল। কাজেই যে 'প্রস্তাব'কে সে চিরকাল ভীতির চক্ষে দেখে এসেছে তাই বেমালুম ভুলে গিয়ে আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞেস করলে, না-না, বলুন না, কি আপনার দরকার?

মেয়েটির কাছ থেকে যা জানা গেল—তাকে অতি সহজ ভাষায় বলা চলে—পূর্ব্বাঞ্চল থেকে আসতে সে আত্মীয় স্বজন সবাইকে একরাত্রে হারিয়েছে। এখন কোনো ভদ্রপরিবারে সে আশ্রয় চায়।

এরপর বটুক আর কোন্ মুখে না বলে।

—মধুপুর যেতে আপত্তি আছে আপনার? নিজের অজান্তে সে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে বসে।

—না - না, আপত্তি আবার কিসের? ছেলে বেলায় বাবার সঙ্গে কতবার গেছি। কিন্তু আমাকে আপনি বল্‌বেন না। নাম আমার বাসন্তী।

অবলীলাক্রমে হেঁট হয়ে মেয়েটি বটুকের পায়ের ধুলো নিয়ে বসলো।

এই এক হাট লোকের মাঝখানে একী কাণ্ড। বটুকের সত্যি লজ্জা করতে লাগলো। জানা শোনা কেউ যদি হঠাৎ দেখে ফেলে। তাই লজ্জাটাকে তাড়াতাড়ি ঢাকবার জন্যে মেয়েটিকে নিয়ে একটি প্রথম শ্রেণীর কামরায় উঠে বসল। পকেটে টাকা থাকলে অনেক বিপদ এড়ানো অতি সোজা।

মধুপুরে এসে যেন বটুক আপন আনন্দেই পাখা মেলে উড়ে বেড়াতে লাগলো। বাসন্তী যে কখন গিয়ে রান্না ঘরের কোনে আশ্রয় নিয়েছে—তাকে আর খুঁজে পাওয়াই মুস্কিল।

কিন্তু বটুকের পুলক বাধা মানে না। আপন উল্লাসেই সে আকুল। একটি ফিতে, দুটো চুলের কাঁটা, কয়েকটি সেফটিপিন্ নিয়ে কারো সামনে কাজে-অকাজে দাঁড়ানোর মধ্যে যে এত আবেগ আর আনন্দ লুকিয়ে থাকতে পারে সে কথা কি বটুক এর আগে জানতে পেরেছিল? ফুটবল মাঠে আধ-ডজন গোল দিয়েও সে ইতিপূর্ব্বে এত উল্লাস আবিষ্কার করতে পারেনি!

সন্ধ্যেবেলা 'চয়নিকা' খুলে সে কবিতা আবৃত্তি করতে থাকে:

আকুল হইয়া বনে-বনে ফিরি
আপন গন্ধে মম—
কস্তুরী-মৃগ সম।"

ইদানীং লোকের প্রস্তাবকে সে ভীতির চক্ষে দেখে এসেছে। এখন কি জানি কি করে ওর নিজের মনে একটি 'প্রস্তাব' গুঞ্জন করে ফিরতে থাকে। কিন্তু নিজেকে বড় অসহায় বলে মনে হয়। কি করে কখন কার কাছে সে প্রস্তাব পেশ করবে!

বটুক আপন মনে ঘামতে থাকে।

ইতিমধ্যে বাসন্তী ওকে দিয়ে অনেকগুলি বই আনিয়ে নিয়েছে। কখন যে ও পড়ে, কখন রান্না করে, কখন অঙ্ক কষে—সেটা বটুকের কাছে হেঁয়ালী বলে মনে হয়।

মাঝে মাঝে ঝড়ের মতো বাসন্তী ওর ঘরে এসে হাজির হয়। জিজ্ঞেস করে—এই ট্রান্স্লেশনটা করতে পারছি নে। একটু দেখিয়ে দিন্ ত!

জানা বিষয়ও বুঝিয়ে দিতে ভুল করে বসে বটুক। বাসন্তী বলে, তবেই আমার অনুবাদ করা শেখা হয়েছে! এই বলে খাতাখানি টেনে নিয়ে কোনো দিকে না তাকিয়ে সরোবরের রাজহংসীর মতো ওর মনে একটা দীর্ঘ জলের দাগ কেটে বারান্দায় দীর্ঘ ছায়া ফেলে আপন নিরালা কোণে বসে যায়। হয়ত সারাদিনে আর বাসন্তীর সন্ধানই মিলে না!

বটুক কোনোদিন ফুল আনে, কোনোদিন সুগন্ধী তেল কেনে, কোনোদিন বা দোকান থেকে নতুন ডিজাইনের সাড়ী নিয়ে অগ্রসর হতে যায়…কিন্তু কাছাকাছি পৌঁছুতে পারে না!

বাসন্তী কখনো কাপড় কাচছে, কখনো ঘর ঝাট দিচ্ছে, কখনো ডালের বড়ি দিচ্ছে—কখনো বা বটুকের পুরোনো বইগুলি গুছিয়ে রাখছে! গাছ-কোমর করে আঁচল জড়ানো, হাতে ঝাঁটা, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, …এমন সময় কি লাল টকটকে গোলাপ নিয়ে কাছে দাঁড়ানো যায়? বাসন্তী যদি খিল্ খিল্ ক'রে হেসে ওঠে?

বটুক বারে বারে এগোয়—কিন্তু বারেবারেই ভগ্ন-মনোরথ হয়ে ফিরে আসে।

একী মেয়ে বাসন্তী।

সর্ব্ব রকমে ওর পরিচর্য্যা করাই যেন তার কাজ। ওকে দিয়ে কি কোনো প্রয়োজন নেই? ভদ্রতার খাতিরেও ত' এসে দু' দণ্ড কাছে দাঁড়াতে পারে, জিজ্ঞেস্ করতে পারে, কি সে খেতে ভালোবাসে? কিন্তু রান্না যা আসে—চেষ্টা ক'রেও তাতে খুঁত ধরে ঝগড়া করা চলে না।

বটুক এই জাতীয় সমস্যার কখনো সম্মুখীন হয় নি।

একদিন বাসন্তী ইন্দারার পাশে ব'সে একরাশ কাপড় সাবান দিয়ে কাচছে। বটুক বল্লে, তোমায় কি বাড়ীর ঝি রাখা হয়েছে? কি তোমার দরকার আমাকে বল্লেই ত' পারো।

বাসন্তী মিটি মিটি হাসে আর কাপড় কাচে। কোনো কথার জবাব দেয় না।

এমন মানুষের সঙ্গে গলা চুলকে ঝগড়া করাও ত' চলে না। রাগে গজ্ গজ্ করতে করতে বটুক ওখান থেকে সরে আসে।

কল্‌কাতায় রাশি রাশি প্রস্তাব বটুককে একরকম তাড়া করেছিল। কিন্তু আজ মধুপুরের মধু-বাসন্তী সন্ধ্যায় যখন ওর মনে একটি প্রস্তাব ভ্রমরের গুঞ্জনের মতো গুণ্ গুণ্ ক'রে ফিরতে লাগলো, তখন সে অনাথ বালকের মতো নিজের বাড়ীর আনচে-কানাচেই ঘুরে বেড়াতে থাকে।

সেদিন একটি জুয়েলারী দোকানে সুন্দর একটি মুক্তোর আংটি দেখে বটুকের পছন্দ হয়ে গেল।

পাঁজিতে কি লগ্ন ছাপা আছে ওর জানা নেই। তবু তাড়াতাড়ি সে আংটি কিনে বাড়ীর দিকে ছুটলো।

অদ্ভুত যোগাযোগ!

দোর গোড়ায় একেবারে বাসন্তীর সঙ্গে মুখোমুখি।

সে যেন ওরই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

সত্যি তাই!

বাসন্তী এগিয়ে এসে লজ্জারাঙা মুখে বল্লে, আপনি আমায় কতদিন কত কিছু চাইতে বলেছেন। আজ একটি জিনিষ আমি চাইব। দেবেন ত' আমাকে?

এর উত্তর বটুক কি দেবে? আকাশ ফাটিয়ে উত্তর দিতে পারত। কিন্তু কিছুই সে করল না। শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে কেবলি ঘামতে লাগলো।

বাসন্তীর মুখে একরাশ লজ্জা। তবে কি বটুকের শুভ লগ্ন সমুপস্থিত? তবু সে নীরবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

বাসন্তী বল্লে, আমায় এক্ষুণি একটি সোনা বাঁধানো লোহা এনে দিতে হবে। দেশ থেকে আস্‌বার সময় গুণ্ডারা সব গয়না ছিনিয়ে নিয়েছে।

বটুক অবাক হয়ে শুধোয়, কিন্তু সোনা বাঁধানো লোহা কেন? কি গয়না তোমার চাই বলো—সব এনে দিচ্ছি।

বাসন্তীর মুখে ম্লান হাসি।

সে ধীরকণ্ঠে জবাব দিলে, ওই সোনা বাঁধানো লোহাই শুধু চাই। আমার স্বামীর খোঁজ পেয়েছি। তিনি আজই আস্‌ছেন। বিয়ের রাতে ঐটি তিনি আমায় পরিয়ে দিয়েছিলেন।

বটুকের কি কিছু জবাব দেবার ছিল? জীবনে শুধু একটি প্রস্তাবই তার মনে জেগেছিল। হাতে ছিল তার একটি লুকোনো আংটি। কিন্তু সে প্রস্তাব বটুক পেশ করতে পারলো না কারো কাছে। তাড়াতাড়ি দোকানের উদ্দেশ্যে ছুটল—একটি সোনা বাঁধানো লোহা কেন্‌বার জন্যে। দুত্তোর তোর প্রস্তাবের নিকুচি করেছে!

নারীর মন—সে বাইরে সোনা, আর ভেতরে প্রাণহীন শীতল লোহা! আপন মনে আওড়ায় সে। না,—বটুক তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিলে। ভদ্রলোক যদি এক্ষুণি এসে হাজির হন? ভাবী লজ্জা পাবে বটুক। তার আস্‌বার আগেই সোনা বাঁধানো লোহাটি বাসন্তীর হাতে পরিয়ে দিতে হবে।

কোনো মেয়ের কাছে প্রস্তাব?—রক্ষে করো!

★

সুন্দরের আবাহন

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

তোমারে খুঁজিয়া মরি দিবারাতি
নিদ্রা-জাগরণে,
হে সুন্দর, চিরারাধ্য, পূজারীরে
ভুলিলে কেমনে?
তোমারি প্রসাদ লভি'
এ দীন হ'য়েছে কবি,
গুঞ্জে ছন্দ-মধুকর
মর্ম্মকুঞ্জবনে!
এ খোঁজার নাহি শেষ—চলিয়াছে
জন্ম-জন্মান্তর,
সৃষ্টির আদিম উষা ভুলি নাই—
আমি জাতিস্মর!
মনে পড়ে—কবে প্রাণ
প্রথম সৌন্দর্য্য স্নান
সাঙ্গ করি' এলো হেথা
ধরণীর 'পর।

সেই হ'তে এ অন্তরে জাগে নিত্য
অপার বিস্ময়,
এ বিশ্বসৃষ্টির সনে প্রতিদিন
নব পরিচয়!
জানি—কদর্য্যতাভরা
এ জীবন, এই ধরা
তবু যেন শাশ্বত এ
সৌন্দর্য্য-নিলয়।
উর মোর আঁখি-আগে হে দুর্লভ,
মম চিত্তচোর,
টুটে না জীবনে যেন কোনোদিন
তব স্বপ্নঘোর!
জরতী এ ধরিত্রীরে
সিঞ্চিয়া লাবণ্য-নীরে
তন্বী কিশোরীর মত
কর চক্ষে মোর!

সাহিত্যের কথা

অজিত দত্ত

এমন একটা সময় এসেছে—যখন জীবন-ধারণ, জীবন-যাপন ও জীবনের ধারা নিয়ন্ত্রণের সমস্যাগুলি মানুষের চিন্তা, অভিনিবেশ ও কর্মকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করেছে ; তার যেন এতটুকু স্বস্তি, একবিন্দু অবসর নেই যে, সে জীবনের সুন্দর, মধুর ও মহৎ উপলব্ধিগুলির দিকে মুহূর্তের জন্যও ফিরে তাকায়। মানুষ এতকাল ধ'রে যে রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও সাংসারিক জীবনপ্রণালী গ'ড়ে তুলেছিল, শান্তিময় মন্থর দিনে তা সুষ্ঠু ও সুখদ মনে হ'য়েছিল বটে, কিন্তু ইতিহাসচক্রের দ্রুত ঘূর্ণনে কলহ-ক্ষত-পৃথিবীতে আজ যেন তা অকেজো, অবান্তর ব'লে মনে হ'চ্ছে। এখন আবার একটা নতুন পথ, নতুন জীবন-প্রণালী, নতুন অবলম্বনের প্রয়োজন লোকের কাছে এতই বড় হ'য়ে দেখা দিয়েছে যে, আজকের মানুষের সমস্ত সত্তাই যেন তার অনুসন্ধান ও অর্জনের অনবসররূপে ব্যাপৃত। জীবনের সৌন্দর্য ও আনন্দ সে আজ দেখেও দেখ্‌ছে না, যেটুকু দেখছে, তাও মানসিক অস্থৈর্যের দরুণ বিকৃত দৃষ্টিতে। যেন প্রকৃতির পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের পরিবেশে থেকেও বিভ্রান্ত পথিক আরণ্যশ্বাপদের থেকে আত্মরক্ষার চিন্তাতেই মগ্ন হ'য়ে আছে,—চতুর্দিকের অপূর্ব শোভা যেন তার কাছে লুপ্ত কিম্বা বিস্বাদ।

আজকে জগতের সর্বত্র চিন্তার এই বিক্ষোভ, কর্মের এই বিভ্রান্তি জনসমাজকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে, আলোড়িত ক'রে রেখেছে তার স্বভাবতঃ শান্তিকামী চেতনাকে অশান্ত অতৃপ্তিতে। পুরোনো বিশ্বাস ও নির্ভরতার ঘর ভেঙে গেছে, চিরাচরিত শিক্ষা ও মূল্যবোধ ধ্বসে প'ড়ে গেছে, অধিকাংশ মানুষ আজ নিজেদেরকে নিরাশ্রয় ও নিরবলম্ব ব'লে মনে করে চতুর্দিক হাতড়ে বেড়াচ্ছে। যতদিন বিভ্রান্ত বিক্ষুব্ধ জনগণ আবার নতুন ক'রে ঘর গোছাতে না পারে, এবং যতক্ষণ এক নতুন জীবন-প্রণালীতে সে নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় আত্মসমর্পণ ক'রতে না পারে, ততদিন ও ততক্ষণ এ বিক্ষোভ ও বিভ্রান্তির আলোড়ন অবশ্যম্ভাবী। নিজেকে ও অন্যকে অবিশ্বাস ক'রেই ততদিন মানুষকে চ'ল্‌তে হবে, অভিশপ্ত নিষাদের মত তাকে থাকতে হবে প্রতিষ্ঠাহীন হ'য়ে।

এই বিক্ষুব্ধ মনোবৃত্তি, জীবনের এই একদেশদর্শী মনোভাব, মহৎ ও সুন্দর জীবনপটের এক কৃষ্ণবর্ণ অংশে সমস্ত চেতনা, চিন্তা ও কর্মপ্রয়াসকে অভিনিবিষ্ট করার এই বিকৃত আগ্রহ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হ'তে পারে, কিন্তু তা স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। অসুস্থ দৃষ্টিতে সৌন্দর্যও চক্ষুকে পীড়া দেয়, অসুস্থ রসনায় মধুর স্বাদও তিক্ত ব'লে মনে হ'য়ে থাকে। এ-কারণেই চারুকলার সর্বক্ষেত্রে জনসাধারণের ঔদাসীন্য আজ প্রকট হ'য়ে উঠেছে দেখ্‌তে পাই। কারুরই যেন সময় নেই কিম্বা প্রবৃত্তি নেই ললিত-কলায় মনোনিবেশ ক'রবার মতো। গ্রহীতার শ্রদ্ধা ব্যতিরেকে যেমন দানের মর্যাদা নেই, তেমনই বিদগ্ধ অন্তরে আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত ও তৃপ্ত পরিবেশন করতে না পারলে ললিতকলার পূর্ণ পরিস্ফুরণ অসম্ভব। আজ যে উৎকৃষ্ট সাহিত্য হ'চ্ছে না ব'লে অভিযোগের কোলাহল আমরা শুনতে পাচ্ছি, তার অর্থ এ নয় যে প্রতিভাবান সাহিত্যিকের সংখ্যা লুপ্তপ্রায় অথবা সাহিত্যিকরা আর যথেষ্ট অভিনিবেশ সহকারে সাহিত্যসৃষ্টি ক'রছেন না। একথাও সম্পূর্ণ সত্য নয় যে, সাহিত্যিকেরা সকলেই তাঁদের বিশ্বাসের অবলম্বন ও আদর্শের আশ্রয় হারিয়ে অধিকাংশের মতই বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে প'ড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। কোন এক জীবন-প্রত্যয়কে আশ্রয় না ক'রে কেউ সাহিত্যিক হ'তে পারে না। এক শাশ্বত কল্যাণে বিশ্বাসী না হ'লে রসস্রষ্টা হওয়া সম্ভব নয়। তাই যিনি প্রকৃত সাহিত্যিক, তিনি সাময়িক অসাম্য অবিচার-অনাচারের বিরুদ্ধে লেখেন বটে, কিন্তু কখনই তাঁর চিন্তাকে বিকৃত অথবা ভ্রান্তিতে সঞ্চারমান হ'তে দেন না। নিজস্ব সাহিত্যিক প্রত্যয়ে অবিচলিত থেকে তিনি সাহিত্যসৃষ্টি করেন, স্বধর্মে নিষ্ঠা রেখে তিনি শাশ্বত মানব-কল্যাণের পথ এঁকে যান।

আজও যে বাংলাদেশে কিম্বা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই এ নীতির ব্যাভিচার ঘ'টেছে, এরূপ মনে হয় না। কিছু-সংখ্যক লেখক সর্বদেশে এবং সর্বকালেই সাময়িক পছন্দ ও মতের ধারা অনুসরণ ক'রে সহজলভ্য সাময়িক খ্যাতির দিকে প্রলুব্ধ হন। যুগপরিবর্তন-সময়ে যখন অধিকাংশ লোকই জৈব-সমস্যাতেই উত্তেজিত, তখন এরূপ কালসেবী

সাহিত্যিকের সংখ্যা ফেঁপে ওঠা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু জগতে উৎকৃষ্ট সাহিত্য যে সৃষ্ট হ'চ্ছে না, অথবা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে উন্নত চিন্তা ও সত্যদৃষ্টির আলোক যে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌ছে না, একথা বলাও ক্ষীণদৃষ্টিরই পরিচয়।

বর্তমানে উৎকৃষ্ট সাহিত্যসৃষ্টির পরিমাণ বহুলাংশে কমে গেছে—একথা সত্য। শান্তি ও আনন্দময় পরিবেশ এবং পাঠকজনের আগ্রহ ও সহানুভূতি না পেলে সাহিত্যিক প্রেরণা জাগ্রত হয় না। তবু সাহিত্য ও শিল্পের গোধূলিতেও কিছুসংখ্যক প্রতিভা ও নিষ্ঠাসম্পন্ন সাহিত্যিক অন্তরের উপলব্ধি ও বিশ্বাসের প্রেরণায় রসসৃষ্টি ক'রে চলেন ব'লেই সাহিত্যের ধারা অব্যাহত থাকে। কালধর্মে যুগবৈষম্যে এই স্রোত কখনো দিগন্তবিস্তৃত, কখনো ক্ষীণ,—কিন্তু কখনই শুষ্ক অথবা মৃত নয়।

তাই যাঁরা বলেন, আমাদের সাহিত্যে আজ কিছুই হ'চ্ছে না, তাঁদের সঙ্গে আমরা একমত নই। বর্তমানে আমাদের সাহিত্যে বহু বিকৃতি ঘট্‌ছে সত্য, সাহিত্যের একাংশ ভাব ও ভাবনার পথ ত্যাগ ক'রে মত ও বুকনির বিপথে পা বাড়িয়েছে, একথাও সত্য। কিন্তু তবু আমাদের সাহিত্য এখনও প্রাণবান। তার যেটুকু ক্ষীণতা—সে কেবল সহানুভূতিপ্রবণ হৃদয়ের আগ্রহ ও উত্তাপের অভাবে। এ কারণে আমাদের সাহিত্য এখন আর কিছু হ'চ্ছে না—এই উক্তির কলরব ও তৎপশ্চাদ্বর্তী রস-গ্রহণে বিমুখতার মনোভাবকে যেন আমরা আশ্রয় না দিই। সাহিত্য ও সর্বপ্রকার চারুকলার পুষ্টি ও সমৃদ্ধির জন্য সেটাই প্রয়োজন। আমাদের সাহিত্যিকদের রচিত বইগুলি শ্রদ্ধাসহকারে যতই পঠিত হবে, ততই সাহিত্য পুষ্টিলাভ ক'রবে—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আমাদের সাহিত্যে যেটা সর্বাপেক্ষা সঙ্কটের কাল—সেটা কেটে গেছে ব'লেই মনে হয়। সাহিত্যের বিষয় জীবনের সর্বক্ষেত্রকে নিয়ে; রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম ও দর্শন—কিছুই সাহিত্যে সম্পূর্ণ বর্জনীয় নয়, একথা যেমন সত্য, তেমনি শুধুমাত্র এর কোনো একটিকে মাত্র আশ্রয় ক'রে সাহিত্য দাঁড়াতে পারে না—একথাও তেমনি সত্য। সাহিত্যের একমাত্র বিষয় মানবতা, মানবকল্যাণ। সমাজ মানব-জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ব'লেই তা সাহিত্যগ্রাহ্য এবং সাহিত্যের সঙ্গে একাত্ম। তেমনি যে সকল মানসিক প্রবৃত্তি—প্রেম, দয়া, স্নেহ, মমতা, বাৎসল্য ও সখ্য—মানবমনের বৃহত্তর অংশ অধিকার ক'রে আছে তাই যে সাহিত্যের প্রাণ—এটা এখন সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হ'য়েছে। এখন যদি শুধু অবহেলা, উন্নাসিকতা অথবা ঔদাসীন্যের দ্বারা আমাদের সাহিত্যকে আমরা ম্রিয়মান ক'রে রাখি, তবে তার চেয়ে বড় লজ্জা আর আমাদের কী আছে?

★

টুকরো কথার মালা

সুশীলকুমার গুপ্ত

(ক)

জয়ন্তী, তব জন্মদিনের উপহার পাঠালাম—
আমার হাতের যত্ন-পালিত একটি গোলাপ ফুল;
রাঙা পাঁপড়িতে মাখামাখি প্রেম, লেখা সেরা প্রিয় নাম,—
কাঁটায় বেদনা, সবুজ বৃন্তে আশা, সুমধুর ভুল।

(খ)

আমার পৃথিবী ঘিরে আকাশের মত ছিলে তুমি,
আজ সে-আকাশ নিরুদ্দেশ,
আজ সে-পৃথিবী শুধু মাটি,
হয়ত পেয়েছে তাকে কারো শ্যাম বসন্তের ভূমি!
মৃত সে-হৃদয়,
যে-প্রাণ সূর্যের আলো কেড়ে, ছুঁড়ে শূন্যে ধূলিকণা—
করেছিল আকাশ রচনা।

(গ)

মুখরতা দিয়ে না পাই যাহাকে স্তব্ধতা দিয়ে ছুঁই,
আলোতে না পেরে আঁধারের হাতে ফোটাই প্রেমের জুঁই।

(ঘ)

কত ইতিহাস-পথ আমরা মাড়িয়ে চলে গেছি,
কত প্রেম স্বপ্ন দিয়ে সভ্যতা ও সমাজ গড়েছি;—
তবু এতোকাল
হৃদয়ের বিস্ময়ের পাইনি নাগাল!
আমরা জানিনা—
কখন উজ্জ্বল প্রেম হ'য়ে ওঠে ঘৃণা,
বিরাগ সোহাগে থরোথর,
হঠাৎ একটি চোখে খুঁজে ফিরি পরম নির্ভর!

প্রভাত দেব সরকার

[পূর্বানুবৃত্তি]

ঘড়িতে যেন এ্যালার্ম দেওয়া ছিল, মুহূর্তের মধ্যে ঘরটা মুখর হ'য়ে উঠলো। একটা সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। কম্বল গুটিয়ে চাপাচুপি দিয়ে জনে-জনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রাত এখন ১০।১১টা।

দেখে শুনে নিভার মনে হয়, এর পর গেলে শেষ আর কিছু দেখা যাবে না। এরা জোট বেঁধে গিয়ে পাহাড়টাকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। কি লোভাতুর দৃষ্টি সব। বেশ সব চুপচাপ ছিল, ঠিক সময়টিতে সবার ঘুম ভেঙে গেছে। অমলের ঘুম ভাঙবে না?

কিছুক্ষণের মধ্যে ঘরটা ফাঁকা হ'য়ে গেল। আবার সেই নিস্তব্ধতা। নিভা একরকম বসেই কাটিয়ে দিলে—কোন রকমে কম্বলের একপাশে বসে আছে। রাত প্রহরার মত জেগে আছে। শুলেও শোয়া যায়, কিন্তু শোয় কি করে? শোভন অশোভন আছে তো। উচিত অনুচিত—

অমল বললে কি হবে, নিজের মনে নিভা নির্বিকার হ'তে পারেনি। কতবার তো অমলের হাতটা তার কোলের ওপর এসে পড়েছে ঘুমের ঘোরে, রোমাঞ্চিত হ'লেও সে হাতকে বার বার নিভা যথাস্থানে ঠেলে দিয়েছে। কি মনে করেছে সে সে-ই জানে।

নিভা একা, কোন বিছানায় কেউ নেই। এমনকি সেই দুটিও কখন দলের মধ্যে মিশে গেছে, আলোটাও নিভে গেছে কখন, বাইরের জ্যোৎস্নায় যা ঘরটা আলোকিত। মনে হচ্ছে কোথা দিয়ে যেন আলো চুইয়ে আসছে। ঠায় চেয়ে থেকে মাথার মধ্যে কেমন ঝিম ঝিম করে। চর্মচক্ষে আলো নেই, অথচ যেন কত আলো আড়াল করা।

ঘুমন্ত অমলের গায়ে হাত দিতে গিয়ে নিভা হাত সরিয়ে নিলে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে কি যেন শুনলে উৎকর্ণ হ'য়ে। কে জানে পাশের লোককে ডাকতে তার এত ভয় কেন?

যদি অমলের খেয়াল না থাকে, ঘুম না ভাঙে, তখন কি জবাব দেবে নিভা। ডেকে না দেওয়ায় কি কৈফিয়ৎ দেবে—জেগে বসে-ছিলুম, তবু জাগাবার লোককে জাগাইনি। কি করতে তাহ'লে এসেছ?

একটু সরে এসে নিভা বসল। এতে যদি লোকটার ঘুম ভাঙে, না, কুম্ভকর্ণ। হাতটা মুখের কাছে ব্যজনের ভঙ্গিতে নাড়লে নিভা। না, তাতেও না। কোন সাড়া শব্দ নেই অমলের।

এখন কি করবে নিভা? আর কি করে জাগাবে? সেই মেয়েটির মত? কিন্তু অমলের যদি কষ্ট নিদ্রা হয়? ছি ছি, কি ভাববে অমল।

কিন্তু এভাবে যে আর বসে থাকা যায় না। তার চেয়ে বাইরে বেরিয়ে ঠান্ডা হাওয়ায় পাইচারি করলে শান্ত হওয়া যায়। বসে বসে এই দুর্ভোগ ভোগ করার কোন মানে হয় না। হয় ডাকুক, না হয় উঠে বেরিয়ে যাক নিভা। যতক্ষণ পারে অমল পড়ে পড়ে ঘুমুক, কার কি।

উঠতে গিয়ে কাপড়ে টান পড়ল নিভার। কাপড়ের খুঁটের অনেকটা অমলের শায়িত দেহের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট। আস্তে আস্তে নিভা টান দিলে। না, পাথর চাপা হ'য়ে গেছে, লোকটাকে না সরালে কাপড়ের মায়া ত্যাগ করতে হ'বে। কোনটা চায় নিভা?

আচমকা অমলকে ধাক্কাদিয়ে কোপনকণ্ঠে নিভা বললে, আঃ কাপড়টা ছাড়। আঃ সর, সর—

অমল জেগে উঠল, পাশ ফিরে বললে কটা বেজেছে?

হয়তো হাসলেও।

নিভা জবাব দিলে না। আঁচলটা ছাড়িয়ে নিয়ে কি যেন ভাবতে লাগল।

অমল তৎক্ষণে উঠে বসে চারদিক চেয়ে বললে, ইস্-স্, সবাই চলে গেছে। আমায় ডাকতে পারনি।

নিভা বললে, ডাকবার কথা কি ছিল। আর ডাকলেই কি সাড়া পাওয়া যায়, যে নাকের ডাক। শুনবে কে।

অমল মাথায় জামা গলাতে গলাতে বললে, নাকটাকে চেপে ধরলে নিশ্চয়ই সাড়া পেতে। ইস্-স্ বড় দেরী হ'য়ে গেল।

সভয়ে দোষ স্বীকারের মত নিভা বললে, সবে সাড়ে দশটা বেজেছে। আমাদের বোট তো—

অমল বসল থ্‌পে মেরে। একটু অবাকও বোধ করে 'বাজার' কথাটা নিভা এত ভণিতা করে বললে কেন। এক কথায় উত্তরটা দিলে কি এমন অন্যায় হ'তো।

তবু অমল বসলে না, নিভাকে বসিয়ে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বললে, দেখে আসি—যদি বোট আগে পাওয়া যায়।

নিভা আনমনা, প্রতীক্ষারতা হ'য়ে বসে রইল। ভাবটা, দেখা যাক আরো কতক্ষণ বসতে হয়।

চুপ করে নির্জন ঘরে বসে থাকতে থাকতে নিভার কেমন মনে হ'লো, চাঁদ বোধ হয় ডুবে গেছে—ঘরটার মধ্যে ছায়া দীর্ঘ হ'য়ে উঠেছে। বাইরে যাত্রীদের আর সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

বিবিক্ত বেদনায় নিভার মনে হয়, সে পরিত্যক্তা—তার সঙ্গ কারো কাম্য নয়। সে উপেক্ষিতা।

* * *

মনে হয় যেন ডোবার জল,—এমনি আবেগহীন, স্থির। এই নদী। ভীষণা নর্মদা। এতটুকু নালার মত। মাটির ওপর হাঁসের পায়ের মত থপ্ থপ্ শব্দ করে বোট চলেছে এগিয়ে, নিস্বাত, নিষ্কম্প চারিদিক, যেন একটা গড়খাই-এর মধ্যে আসা গেছে।

খানিকদূরে এসে অমল বললে, তুমি হয়তো ভাবছো স্রোত নেই —বেগ নেই, টান নেই, এ আবার কি নদী।

নিভা চুপ। ঠিক এই মুহূর্তে কি সে মনে করছে কেমন করে বলবে। প্রথমে হয়তো নদীর এ রূপ তার পছন্দ হয়নি, কিন্তু নদীকে নিয়ে এই শান্ত পরিবেশটা তার বোধ হয় ভাল লেগেছে। এখানে নদীর রূপ তো কেউ দেখতে আসে না।

অমল বললে, তলায় ভীষণ স্রোত, কিছু পড়লে আর রক্ষে নেই—কোথায় যে ভেসে যাবে তার ঠিক নেই। নর্মদা অন্তঃসলিলা, খরস্রোতা।

নিভা চমকে ওঠে। আপাদমস্তক কিসের যেন শিহরণ বোধ করে। এত নিরীহ, ক্ষীণার ভিতরে ভিতরে এত তেজ।

এই পাহাড় দেখতে এসে কত লোক যে মরেছে—বোট থেকে পড়ে গেছে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।—অবলীলাক্রমে অমল কথাগুলো বলে বিশেষ সংবাদ দেওয়ার মত।

ভয়ে নিভা শক্ত হ'য়ে যায়। আচ্ছা লোক, এখন ওসব কথা কেন। কই, যা দেখতে আসা?

হঠাৎ জলের মধ্যে গম্বুজের মত একটা পাহাড় মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। বোটটা ঘুরতে চাঁদ আড়াল হ'য়ে গেল—মুহূর্তের জন্যে বোটের মধ্যে নিকষ অন্ধকার নেমে এল। নিভা অমলের সংযুক্তা হ'য়ে বসল। সমস্ত দেহটা যদি অমলের দেহের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যেত তাহ'লেও বোধ হয় জীবনে এ ভয় কাটতো না। আশ্চর্য দৈত্যের মত পাহাড়টা।

কিছুক্ষণে চন্দ্রালোকে দ্বিগুণ শোভা উৎকীর্ণ হ'লো। শ্বেত স্ফটিকে আলো ঝল্ মল্ করে উঠলো। ভাষাহীন রূপ-প্রশস্তিতে সম্মুখে একটা অব্যক্ত চেতনা যেন ব্যক্ত হ'তে চাইল। অমল ধবল-কোমল-চন্দ্রমা স্পর্শে পাথরে প্রাণসঞ্চার হ'লো, শিলিভূত রূপ নিঃশব্দ আনন্দ দ্যোতনায়, হর্ষ-পুলকোচ্ছ্বাসের অনুরননে চরাচর পূর্ণ করে দিলে।

মুখ ফিরিয়ে নিভা অমলের মুখের দিকে চাইলে—আশ্চর্য শ্বেতমর্মরের সেই ছবি।

চোখ বুজিয়ে মাথাটা অমলের বুকের ওপর রেখে গদ্‌গদ্ কণ্ঠে নিভা বললে, কি সুন্দর। এত সুন্দর মার্বেল রক্‌স্।

অমল চুপ। তার মনে হয়, শ্বেতপ্রস্তরের দিকে মুখ করে আর রূপের সন্ধান করতে হবে না। সে-রূপ এখন তার বক্ষস্থলে প্রতিফলিত। তার মাধুরিমা, তার চেতনাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে, তাকে হতবাক করেছে।

চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দেওয়ার মত শ্বেতপাথরের মুখে হাসি। নিভার চক্ষু নিমীলিত, মদালসা, কেজানে, এখন কোথায় তার মান-অভিমান, স্বাধিকারের হিসাব-নিকাশ, না-পাওয়ার ক্ষোভ। নর্মদার অন্তঃস্রোতে তা হয়তো চিরকালের জন্যে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে ভেসে গেল। এতদিন এরই বোধ হয় প্রতীক্ষা সে করছিল।

* * *

পরের দিন ঘুম ভাঙতে অনেকটা বেলা হ'য়ে গেল। ঘুম ভেঙে চোখ চাইতে নিভার মনে হলো, গত রাতের জ্যোৎস্নাটা এখনো যেন গন্ধ-স্মৃতির মত আলতো চোখের ওপর ভাসছে।

সঙ্গে সঙ্গে উঠতে ইচ্ছে করলো না নিভার,, আরো কিছুক্ষণ শুয়ে শুয়ে চাঁদহীন ঘরে জ্যোৎস্নানুলেপন যদি গ্রহণ করা যায়। মনে হ'চ্ছে, কি যেন একটা মদির উষ্ণতা তাকে ঘিরে আছে আচ্ছাদনের মত।

নিজের মনে হেসে গায়ের কাপড়টা সরিয়ে ফেলে নিভা উঠে পড়ল। আর বোধ হয় শুয়ে থাকা উচিত নয়। সারদা দেবী কি ভাবছেন—সারা রাত স্ফূর্তি করে এসে দিব্যি এখন—

ছি, ছি। খোলা চুলটা হাতের মধ্যে জড়াতে জড়াতে কেমন যেন মুহূর্তের জন্যে আনমনা হ'য়ে যায় নিভা। কেউ না জানলেও গত রজনীর কাজটা তার গর্হিত হ'য়েছে বোধ হয়। আশ্রয়দাত্রীর প্রতি এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করা উচিত হয়নি তার। সারদা দেবী কিছু না ভাবলেও আত্মপক্ষ সমর্থনে নিভার বলবার কিছু নেই। বোধ হয় মুখ মুছে চুরি ঢাকার মত এখন সারদা দেবীর সামনে উপস্থিত হওয়াটা কেমন যেন। নির্লজ্জতার একশেষ।

ঘরে বাইরের উঠন্ত রোদ্দুরটা তীরের মত চোখে এসে লাগে। নিভা বেশবাস ঠিক করে প্রস্ত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

কলঘরের কাছে আসতে সরবতীয়া বললে, কাল রাতসে মাইজীকো বহুৎ বুখার।...বেমারী বড়া, রেহুস।

ছ্যাঁৎ করে ওঠে নিভার বুকটা। মাত্র একটি রাত্রের ব্যবধানে একি ব্যতিক্রম। অসুখের জন্যে মাসীমা এখনো শয্যা ত্যাগ করেননি? এত জ্বর বাড়লো? কোন রকমে কাপড় ছেড়ে নিভা সারদা দেবীর ঘরে এসে ঢুকলো। নিজেকে তার কেমন অপরাধী মনে হ'তে লাগল। সারদা দেবীর অসুখ বাড়ার জন্যে সে-ই যেন পরোক্ষ ভাবে দায়ী। কি দরকার ছিল 'মার্বেল রক্‌স' দেখতে যাবার এ সময়।

গুটি গুটি এগিয়ে এসে বিছানার কাছে দাঁড়াল নিভা অপরাধীর মত। দৃশ্যতঃ সারদা দেবীর কোন সাড়া নেই—আচ্ছন্ন হ'য়ে বিছানার সঙ্গে মিশে আছেন তিনি। সারা রাত জ্বর ভোগের চিহ্ন তাঁর মুখে-চোখে স্পষ্ট। কপালটা ঠেলে উঠেছে, বন্ধ চোখ দুটো কোটরে ঢুকে গেছে। চেনা যাচ্ছে না, শুদ্ধা তপশ্চারিণী সারদা দেবীকে।

মাথার কাছে ব'সে নিভা রোগিনীর কপালে হাত রাখলে। অতি সন্তর্পণে, ভয়ে।

সারদা দেবী চোখ মেললেন, নিভন্ত দীপশিখার মত। নিভা চমকে উঠলো।

ক্ষীণকণ্ঠে সারদা দেবী বললেন, আজ আর উঠতে পারচি না মা, শরীরটা কেমন করছে। বোধ হয়—

নিভা অস্ফুটে বললে, আপনি শুয়ে থাকুন—আমি দেখবোখন, ব্যস্ত হবেন না।

সারদা দেবী চোখ বুজলেন। সংসারের ওপর তাঁর মুঠিটা যেন হঠাৎ আল্‌গা হ'য়ে গেছে, কিছুতেই তিনি সেটাকে শক্ত করতে পারছেন না।

চুপ ক'রে বসে নিভা তাঁর গায়ে মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

হয়তো কিছু আরাম বোধ করলেন সারদা দেবী। বললেন, কাল তোদের খুব কষ্ট হ'লো তো? কেমন দেখলি। অমল কি বেরিয়ে গেছে?

হঠাৎ ঝাঁকানি দিলে মানুষের যেমন অবস্থা হয় নিভা সারদা দেবীর প্রশ্নে তেমনি থতমত খেয়ে গেল। কি উত্তর দেবে সে? এই রুগ্না শুদ্ধাচারিণীর সামনে গত রজনীর অভিজ্ঞতার কি বর্ণনা দেবে?

সারদা দেবী উৎসুক কণ্ঠে জিগ্যেস করলেন, কি রকম দেখলি? ভাল লাগল না? কি রে।

মাথা নীচু করে নিভা বললে, ভাল।

কেন সারদা দেবীর এ আগ্রহ কে জানে। পাহাড় দেখার অজুহাতে অমল-নিভার একত্র রাত্রিবাসটা তিনি কি মনে মনে পছন্দ করেননি? তাহ'লে তিনি অনুমতি দিয়েছিলেন কেন। তারা ইচ্ছে ক'রে তো আর দেরী করেনি ফিরতে? জ্বরের ঘোরে কোন সন্দেহ জেগেছে কি সারদা দেবীর?

মুখটা সারদা দেবীর কঠিন দেখায়। বোধ হয় উনি অসন্তুষ্টই হ'য়েছেন নিভার ব্যবহারে। অমলকে কিছু না বলে তাকে ঘুরিয়ে প্রশ্ন করছেন।

নিজের ভাগ্যকে নিভা দোষ দেয়। কে জানতো তার জন্যে ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস এমনভাবে অপেক্ষা করছিল। অবিমিশ্র সুখানুভূতি তার জন্যে নয়। কোন কারণে উৎফুল্লা হ'য়ে ওঠাও তার পক্ষে শোভা পায় না। সে পরমুখাপেক্ষী, পরাশ্রয়ী, পরপুষ্টা, পরভৃতা। অনেক জায়গায় তাকে অনেক কৈফিয়ৎ দিতে হবে, মনোবেদনায় হৃদয়কমল তার বারে বারে দীর্ণ হবে। নিজেকে খোঁজার তার যে শেষ নেই। অহেতুক সন্দেহ-দোলায় মনটা বিক্ষিপ্ত হ'য়ে গেলেও সারদা দেবীর সেবাশুশ্রূষার নিভা ত্রুটী করলেনা। সংসারটাকেও সে মাথায় করে রাখলে কদিন। নিজের সমস্ত সত্তা সে ভুলে গেল। সারদা দেবীর আরোগ্য লাভের ওপর যেন তার মর্যাদার সবটুকু নির্ভর করছে, তিনি না বাঁচলে যেন তারও বাঁচবার কোন পথ থাকবে না।

কখনো কখনো রোগযন্ত্রণার কিছুটা উপশম হ'লে সারদা দেবী চোখ মেলে চেয়ে দেখতেন, নিভা ঠায় তাঁর শিয়রে বসে আছে। নির্বাক, নিশ্চল, কর্তব্য-কঠিন।

তাকে ওভাবে বসে থাকতে দেখে সারদা দেবীর কি মনে হ'তো কে জানে, তিনি বলতেন, অমন করে আগলে বসে থাকলে কি আর মরবো না ভাবিস?

নিভা অপ্রস্তুত বোধ করতো। অনন্যমনস্ক হ'য়ে অসময়ে রোগিণীকে কিছু একটা খাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠতো।

সারদা দেবী আপত্তি করতেন, এই খানিকটা আগে ওষুধ খেলুম, এরি মধ্যে আবার। খালি খালি ওষুধ খেলে কি বাঁচবো ভাবিস।

নিভা নিরুত্তর, নির্বাক। কি করলে সারদা দেবীকে সে বাঁচাতে পারবে? তার সেবাপরায়ণতার কি কোন ফলই নেই? শুধু শুধু লোক-দেখান কি তার এই সাধনা?

সময় সময় সারদা দেবী বলেন, যা যা একটু বাইরে ঘুরে আয়, অমন করে বসে থাকিসনি। অত সহজে আমি মরবো না রে? যা, যা।

মাঝে মাঝে সারদা দেবীর কথাবার্তায় মনে মনে কেমন যেন খুশী বোধ করে নিভা। নিজের কাজটাকে পরম সার্থক জ্ঞান করে। আর কোন গ্লানি থাকে না মনে।

কখনো কখনো সারদা দেবী নিজের ডান হাতটি নিভার শুশ্রূষারতা বাঁহাতের ওপর রেখে কৃতজ্ঞতায় বিগলিতকণ্ঠ হ'য়ে বলেন, আর জন্মে তুই আমার মা ছিলি, না হ'লে এমনি করে কেউ করতে পারতো না। বুড়ো মেয়ের সেবা করাচিস।

সহসা সারদা দেবীর বন্ধচোখের কোণ অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। আঁচল দিয়ে মোছাতে মোছাতে নিভার চোখ দুটোও ঝাপ্সা হ'য়ে আসে।

বিকৃত গম্ভীর কণ্ঠে সারদা দেবী বল্লেন, ঐ তো অমল্ল ছেলে আছে, ভুলে একবারও কাছে আসছে না, খোঁজ নিচ্ছে কেমন আছি। ভাগ্যে ভগবান তোকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কেউ কারো নয়।

কি বলবে নিভা। এ সারদা দেবীর আজন্ম আক্ষেপ কিনা কে জানে। মৃত্যুপথযাত্রীর বৈরাগ্য কি না, তাই বা কে বলবে। অভিমান সারদা দেবীর এই প্রথম নিভা দেখছে। স্বামী বিয়োগের পর থেকে কোন প্রত্যাশা কোন দিক থেকে যে মানুষটি কখনো করেননি আজ রোগ-শয্যায় তাঁর একি অভিব্যক্তি। সামান্য স্নেহের জন্যে তাঁর কি কাতরতা। কেউ কারো নয় মানে কি বোঝাতে চান উনি? এ সময় আত্মজ সামনে না এলে কিসের ত্রুটী বোধ করা যায়?

তবু কি ভেবে রোগিণীকে সান্ত্বনা দিতে নিভা বল্লে, অমলদা রোজই এসে খোঁজ নিয়ে যায়, আমি আছি বলে তাই বল্লেন না।

কি বোঝেন সারদা দেবী, চুপ করে চোখ বুজে থাকেন। সত্যি মায়ের রোগ নিয়ে কাজের ক্ষতি করতে তিনি তা বলে অমলকে বলেন না। তাঁর আচ্ছন্নতার মাঝখানে, অবরুদ্ধ চেতনার গভীরে পুত্র-স্নেহের ফল্গুধারা বয়ে যাক।

নিজের মায়ের শেষ সময়ের কথা নিভার মনে পড়ে। বছর ঘোরেনি বাবা মারা গেছেন, মা নির্বাক হয়ে গেলেন, অত মুখরা মা তার। ছোট হ'লেও নিভা বুঝতে পারতো, মনে মনে মা যেন তার কিসের যন্ত্রণায় ক্রমশ এতটুকু হ'য়ে গেছেন—মায়ের অমন রঙ দুদিনেই কালো হ'য়ে গেছে। তার পর একদিন শক্ত রোগে পড়লেন উত্থানশক্তি তাঁর রহিত হ'য়ে গেল।

নিরুপায় নিভাকে মাথার কাছে বসে থাকতে দেখে আচ্ছন্নভাবে মা বলতেন, আর নয়, এইবার তাঁর কাছে যাবো। তুই কি দেখচিস্ অমন করে?

ফ্রকপরা দশ বছরের মেয়ে নিভা। মার কথাবার্তার ধরণ বুঝতে পারতো না। মা তার মরে যাবে এইটুকু সে বুঝে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠতো।

রুগ্না মা তাকে সান্ত্বনা দিতেন না। বরং দ্বিগুণ উৎসাহে বলতেন, কাঁদলে কি হবে।...কেঁদে কি তুই আমাকে ধরে রাখতে পারবি। কেউ কারো নয় রে হতভাগী, মুখপুড়ি।

মরবার কদিন আগে চিবিয়ে চিবিয়ে মা কেবল বলতেন, কেউ কারো না। কেউ কারো না। ছেলে বল, মেয়ে বল, স্বজন বল, বন্ধু বল, সব ফোক্কা দুঃসময়ে।

এখন মনে করতে পারে নিভা এই 'কেউ'-এর মধ্যে তার বাবা পড়তেন না। সবাই ঐ দলে কিন্তু তাঁর মৃত স্বামী ছাড়া। তাঁর আসন যেন অন্যভাবে মনের অন্য কোথায় পাতা ছিল। মৃত্যুর সময় সবাইকে ভুলে গেলেও তাঁকে বাঙালী মেয়েরা কিছুতে ভুলতে পারে না। মিলনের আর এক মুহূর্তের জন্যে মুমূর্ষু প্রাণ উন্মুখ হ'য়ে থাকে।

বাবার মৃত্যুর পর মা অনেক দুঃখ পেয়েছিলেন, নিজের মৃত্যুর সময় তাই কি তিনি অমন আক্ষেপ করেছিলেন? কারো প্রতি তাঁর কোন টান ছিল না।

মার মৃত্যুর সে-বিভীষিকা আজো স্পষ্ট মনে আছে নিভার। যেন ইচ্ছে করে মা তার নিজের মুখটাকে বীভৎস করেছেন এই কদিনে। সংসারের প্রতি সমস্ত বিতৃষ্ণার শোধ নিয়েছেন নিজের বিকৃত মৃত্যুতে। দেহটা শুকিয়ে এতটুকু হ'য়ে গিয়েছিল, মরচে ধরার মত মুখটা কত বিকৃত হ'য়ে গিয়েছিল। ঠিক সেই সময় খোলার চালে বৃষ্টির শব্দে ছোট নিভার মনে হ'য়েছিল মা তার মরে গিয়ে বিকট চীৎকার করতে করতে কোথায় যেন পালিয়ে যাচ্ছেন। মরে বাঁচার হাসিও হ'তে পারে ঐ অঝোর ধারা বর্ষণের অর্থ। মা তার সব ভাবনার শেষ করেই চলে গিয়েছিলেন।

প্রায় একমাস রোগ ভোগের পর সারদা দেবী মারা গেলেন। রাত নয়, দুপুর নয় ঠিক সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রাণবায়ু নির্গত হ'লো। নিভা বোধ হয় তখন ওষুধ খাওয়াতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু বৃথাই—গাল বেয়ে ওষুধ গড়িয়ে পড়ল, সারদা দেবী মুহূর্তের জন্যে নিমীলিত চোখ দুটো বিস্ফারিত করে কট্ কট্ করে চেয়ে দেখলেন চারদিক। তার পর আর তাঁর কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

স্তব্ধ, বিমূঢ় হ'য়ে কিছুক্ষণ নিভা বসে রইল চুপ করে। ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে তার জ্ঞান লোপ পেল। জানলার ওপারে পাহাড়ের আড়ালে সূর্যদেবও ডুবে গেলেন, পশ্চিমের আরক্ত আকাশ ক্রমশঃ ম্লান হ'য়ে এল।

সরবতীরা শুনে হাউ হাউ করে উঠলো। নিস্তব্ধ বাড়ীটাকে সাক্ষী মেনে অসহায় আর্তনাদ করতে লাগল। ধীরে ধীরে সারদা দেবীর আপাদমস্তক নিভা সাদা চাদরে ঢেকে দিলে। মৃতার ঘরে একটা টিমটিমে আলো জ্বালিয়ে রেখে বেরিয়ে এসে পাণ্ডুর আকাশের দিকে অসহায় আক্রোশে চেয়ে দেখলে। অন্তহীন আকাশে নিজের অন্তহীন প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা পাঠিয়ে দিলে। সেদিন অমলের বেদনাহত মুখটা দেখে নিভার মনে হ'য়েছিল, বেচারা তারই মত হতভাগ্য। সংসারে আর তার কেউ নেই। কোথায় যেন দুজনের মিল আছে, প্রভেদ শুধু ও পুরুষ আর সে নারী।

ছেলেমানুষের মত অমল শোক ক'রতে নিভা পাশে এসে তার কাঁধে হাত রেখে বলেছিল, এ সময় কি অমন ক'রতে আছে! মা শান্তি পাবেন না—ওঠ, এখন যোগাড়-যন্তর কর।

আশ্চর্য পুরুষ মানুষের বিহ্বলতা। সেদিন নিভা যদি পাশে না থাকতো, কি যে হ'তো কিছুই বলা যায় না। অমন মানুষটা একেবারে দিশাহারা হ'য়ে গিয়েছিল।

অতঃপর ক্রিয়া করণ সব কিছু নিভাকে করতে হ'য়েছিল। দাহ-শেষ পর্যন্ত রাত্রি জেগে অতবড় বাড়ীটায় একলা পাহারায় থাকতে হ'য়েছিল। সরবতীরা যতই শোকার্ত হোক, কিছুতেই তার সঙ্গে রাত্রি বাস করতে চায়নি। মাইজী জীবিত অবস্থায় তার যতই ভাল করুন, মৃত্যুর পর কিছুতে তার ঘাড়ে না চেপে ক্ষান্ত হবেন না। বিশেষ করে যাদের বেশী ভালবাসা যায় মৃত আত্মার তাদের ওপর লোভ সমধিক। মনে মনে ভয় পেলেও নিভা তাকে আটকে রাখেনি। সেই অশুভ রাতে শূন্য বাড়িতে একলাই শঙ্কিত মনে অপেক্ষা করেছিল। কত যে সময় বয়ে গিয়েছিল তার শূন্য দৃষ্টির ওপর দিয়ে, কত যে তারা ডুবে গিয়েছিল প্রহরে প্রহরে কিছু খেয়াল ছিল না নিভার।

একসময় ভোরের তারা জ্বল্ জ্বলে হ'য়ে উঠতে উস্কখুস্কো, ঝড়-খাওয়া, গলায়-কাচা অমল এসে দাঁড়াল তার সামনে। ঘুমের ঘোরে দুঃস্বপ্ন দেখার মত নিভা রুদ্ধ-কণ্ঠ হ'য়ে গিয়েছিল তাকে দেখে। ও কি মূর্তি। শ্মশান প্রত্যাগমনের পর পরম আত্মীয়ের ঐ দশা, ঐ ছিরি হয়।

নিভা চোখে হাত চাপা দিয়েছিল ভয়ে—এতক্ষণ যে-ভয়টা সে অসীম ধৈর্যে নিবারণ করেছিল। এখন কি বলবে, কি বলে সান্ত্বনা দেবে অমলকে?

সারদা দেবীর মৃত্যুতে অমলের মতই অশৌচের নিয়ম পালন করেছিল নিভা: হবিষ্যান্ন ভক্ষণ, রুক্ষ শয্যাগ্রহণ, তৈলহীন রুক্ষ স্নান ইত্যাদি সব খুঁটিয়ে।

কেন, কি সম্পর্কে এই কৃচ্ছ্রসাধন সে করেছিল কেউ তাকে তখন জিজ্ঞাসা করেনি। অমলের দিক থেকেও কোন প্রশ্ন হয়নি। যেন ভাই-বোনে মৃত মায়ের গ্রহ শান্তির ব্রত উদ্‌যাপন করছে। শ্রাদ্ধের দিনে অমলের সঙ্গে পায়ে হেঁটে নর্মদা তীরে গিয়ে নিভা পিণ্ডদান করে এসেছিল শ্রদ্ধাভরে। ফিরে এসেছিল ধীর পদক্ষেপে অমলের পিছনে পিছনে। পিণ্ডদানের অধিকার বিষয়ে কেউ তাকে কোন প্রশ্ন করেনি। আজ নিভা ভেবে বলতে পারে না, এ ঔচিত্য-বোধ তার এল কোথা থেকে। প্রকারান্তরে অমলের সে কোন অহিত করেনি তো! কোথাকার কে মেয়ে, এমন করে পরের সংসারে জুড়ে বসে থাকি! অমলের সঙ্গে আর তার সম্পর্কই বা কি! কেন যে কি ভেবে নিভা অমন কাণ্ড করেছিল! মৃতার প্রতি কৃতজ্ঞতায় মাতৃজ্ঞানে না, নিজেকে রক্ষা করতে?

অমলের এমন দুঃসময়ে এত বড় দুঃখে নিভা দেখলে, আপনার বলতে দূরে কাছে অমলের কেউ নেই। থাকলেও তখন কাউকে দায় উদ্ধার ক'রতে আসতে দেখা যায়নি।

বেণুকাকীমার দিক থেকেও কোন সাড়া আসেনি। হয়তো তিনি সারদা দেবীর মৃত্যুতে চুপ করে থেকে নিভার প্রতি আক্রোশের

শোধ নিয়েছিলেন। মনে মনে নিভার কেমন যেন ভয় ছিল, আর কেউ কোথা থেকে না আসুক, বিনয়কাকা ঠিক আসবেন। স্বদেশের আত্মীয় বলতে ও'রাই। নিজেকে নিভা সেই মত প্রস্তুত করে রেখেছিল। আবার যদি তাকে কোলকাতায় নিয়ে যাবার কথা ওঠে, তখন 'সারদা' দেবীর মত কে তাব পক্ষে কথা কইবে—মুখের ওপর 'না' করবে অমল হয়তো এক কথায় রাজী হ'য়ে যাবে। বিশ্বাস কি।

সংসারের কাজকর্মে নিভা নিজেকে বিশেষ ব্যাপৃতা রাখে। সারদা দেবীর স্থলাভিষিক্তা হয। সেই ভোর থেকে রাত নটা-দশটা পর্যন্ত অন্য আর কোন চিন্তা কববার তার অবসর থাকে না। সারদা দেবীর অবর্তমানে সংসারটা যাতে পূর্ববৎ চলে তাব প্রতি তার লক্ষ্য,—বিশেষ করে অমল যেন না মনে করে, মা নেই বলে তার কষ্ট হ'চ্ছে।

ক'দিন যেন কেমন নেশার ঝোঁকে নিভা কাজ করে যায়। এ কাজের মূল্য কি, কেন তার এমন আত্মীয়তা, কার জন্যেই বা এত আঁকপাকানি, স্পষ্ট কোন ধারণা নিভার নেই। পিন্ডদানের সম্পর্কে কি সে এ সংসারের একজন? তাই দুঃসময়ে হাল ধরেছে—একমাত্র পুরুষকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, মুখের অন্ন আর সুখের শয্যা যোগান দিচ্ছে? না, আর কোন উদ্দেশ্য আছে তার? চিরকালের জন্যে সে এখানে থাকতে চায়? ঘরণী, পরিচারিকা, না গলগ্রহ আত্মীয়া?

সারদা দেবীর শ্রাদ্ধশান্তি চুকে যাবার পর শীতের রাত্রে অমলের জন্যে ভাত কোলে করে অপেক্ষা করতে করতে আবছা আলোর সামনে জড়িত চোখের ওপর নিজ মনের ছবিটা দেখে নিভা কতদিন চমকে উঠেছে। প্রথম প্রথম এভাবে অপেক্ষা কবতে তার লজ্জা করেছিল সত্যি, কিন্তু নারীমনের দুর্জ্ঞেয় রহস্যময়তায় তা ক্রমে অবশ্য কর্তব্যে পরিণত হয়। সে ছাড়া অমলকে এখন দেখবার কে আছে। লজ্জা-ঘৃণা-ভয় তিন থাকতে নয়।

কিন্তু এর পর? নির্জন দুপুরে বসতি বিরল, এই পাহাড়তলী গাঁ অঞ্চলটি খাঁ খাঁ ক'রলে জানালার গরাদে মুখ রেখে উদাস দৃষ্টিটা সামনে মেলে ধরে নিভা বিমনা হ'য়ে যায়। শুধু আশ্রয় নয়, সে পায় সাহচর্য—সুখদুঃখের সমান অংশ ভাগ। ঐ অনন্ত আকাশের মত তার কুমারী মনের অনন্ত কামনা—মেঘরৌদ্রের খেলায় তা কখনো স্পষ্ট কখনো অস্পষ্ট কখনো ব্যক্ত, কখনো অব্যক্ত।

এ ভাবে সে এখানে থাকতে পারবে না। পরিচারিকা'র পদমর্যাদা তাব কাম্য নয়। সামান্য উপযাচিকা হ'য়েও সে নিজের আসন কায়েমী করতে চায় না। নিজের মনে এই দ্বন্দ্ব সে আর সহ্য করতে পারে না। সারদা দেবীর বর্তমানে যে আশ্রয় তার পক্ষে সহজ এবং নিশ্চিন্ত মনে হ'য়েছিল এখন তাঁর মৃত্যুতে তা জটিল এবং অনিশ্চিত হ'য়ে উঠেছে।

একটি কথায়, একটি মাত্র কাজে এর মীমাংসা করে এখানেই এর যবনিকা টানা যায়। অসম্ভবও হয়তো নয়। এতদূর প্রবাসে নগণ্য দুটি নরনারীর নীতিবিগর্হিত একত্র বাসের সম্পর্ক নিয়ে কে আর মাথা ঘামাবে? আর দেশ ছেড়ে যারা বিদেশে যায় তারা তো ঐ রকমই, নতুন কি। এত কথার দরকারই বা কি। ওদের দুজনকে বরং—

কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। নিভার আত্মসচেতনতা, সতীত্ব মর্যাদাবোধ এ কাহিনীকে অন্যভাবে গ্রথিত করেছিল। কাহিনীকার হিসাবে নিভার মনের খবর আমি যে সব সময় ঠিক ধরতে পেরেছি তাও মনে করবার হেতু নেই। সে আমার ক্রীড়াপুত্তলি নয়। এখন তাকেই আমাকে অনুসরণ করতে হবে।

[ক্রমশঃ

যাযাবর

শ্রীসুগৌতম

আমার শরীর ঘিরে দুর্বার আলোক
আর
দুর্বার আলোর মাঝে, যাহা রিক্ত,
যাহা কিছু শূন্য
তা'রা যেন মোরে ভালবাসে,
মোরে যেন প্রেম দিয়ে ভরে দেয় তারা,
ভরে দেয় প্রভাতের মত।

'আমি যাযাবর—
আমার শোণিতে কাঁপে বাসনার ঝড়,
দূর পথ মোরে ডাক দেয়
ঘর বাঁধা নহে মোর তরে
নহে প্রিয় প্রেমের বন্ধন।

দুরন্ত দামাল ছেলে আমি পৃথিবীর,
পৃথিবীর পথে মোর স্থান।
পদচিহ্ন রেখে যাই পৃথিবীর পথে ও পৃষ্ঠায়
রেখে যাই ঘর-ছাড়া প্রাণ
আমার চোখের আলো নিয়ে যাই
ইরাণের পথে,
তাই, মোর তোমারে মিনতি
তুমি মোরে ভালবেস নাকো।

ম্যাগিয়ারদের দেশ

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

ইউরোপে মোঙ্গোলীয় জাতি আছে এই সত্য সকলে হয় তো অবগত নহেন। হাঙ্গেরীয় ম্যাগিয়ারগণ, ফিনল্যাণ্ডের ফিনরা এবং ইউরোপের সর্ব্বোত্তর সীমনায় অবস্থিত মেরুমণ্ডলের অধিবাসী এস্কিমো সম্প্রদায়ের দেহে মোঙ্গোলীয় শোণিত প্রবাহিত। সুতরাং এই তিনটি জাতিরই আদি জন্মস্থল এশিয়া মহাদেশ। ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীরা ম্যাগিয়ারদিগের প্রতি ঘৃণা বা অবজ্ঞাসূচক 'হান্' আখ্যা দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রয়োগ করিয়াছিল। ম্যাগিয়ার নাম তাহাদের মুখে কচিৎ শোনা যাইত। পরে এই জাতি তাহাদের প্রতি প্রযুক্ত এই অবজ্ঞাসূচক আখ্যার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া উচ্চ কণ্ঠে জানাইয়া দেয় তাহারা হান্ নহে, ম্যাগিয়ার। ম্যাগিয়ার-দের দেশ হাঙ্গেরী দীর্ঘকাল ধরিয়া অষ্ট্রো-হাঙ্গেরীয়াণ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকার কালে এই জাতিকে সকল বিষয়ে জার্ম্মাণ বা অষ্ট্রিয়ানদের অধীনতা স্বীকার করিতে হয়। অবশ্য এই অধীনতা অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই স্বীকৃত হয়। আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবার জন্য ইহাদের আপ্রাণ চেষ্টা প্রথম মহাযুদ্ধ সমাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সাফল্য লাভ করে। ঐ সুবিশাল সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর যে কতিপয় স্বায়ত্তশাসনশীল নূতন রাষ্ট্র জন্মলাভ করে ম্যাগিয়ারদের দেশ হাঙ্গেরী তাহাদের অন্যতম। এই দেশের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে বেশ বুঝা যায় স্বাধীনতার ফলে জাতির অন্তর্নিহিত শক্তিগুলি কিরূপ বিস্ময়জনক বিকাশ প্রাপ্ত হয়। জাতীয় মুক্তিকে অমৃত বা 'মৃতসঞ্জীবনী'র সহিত তুলনা করা যায়। বিজয়ী জাতিদের পদতলে পিষ্ট হইয়া যাহারা প্রায়ই বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল, স্বাধীনতা সুধা সিঞ্চিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা ইউরোপের রাষ্ট্রীয় উন্নতির রঙ্গমঞ্চে বিশিষ্ট ভূমিকা অভিনয় করিতে আরম্ভ করিল।

ওই মোঙ্গোলীয় সম্প্রদায় ইউরোপে কিরূপে প্রবেশ করে, এই প্রশ্ন অনেকের মনে জাগিতে পারে। যেমন মোগলদের পূর্ব্বপুরুষ চেঙ্গিজ বা তৈমুরলঙ্গ ভারতে প্রবেশ করেন, 'হান' দলপতি বিজয়ী এটিলার প্রবেশ ঠিক সেইরূপ। দুর্দ্ধান্ত, দুর্দ্দমনীয় এটিলাকে ইউরোপীয়রা "ঈশ্বরের অভিসম্পাত" আখ্যায় অভিহিত করিয়াছে। এটিলার অশ্বপদস্পর্শে উর্ব্বর ভূমি উষর হইয়া গিয়াছে এবং সেখানে সবুজ তৃণরাজি আর জন্মায় নাই—এইরূপ বাক্য ইউরোপে প্রচলিত আছে। রোম্যান সভ্যতা সলিলে সিক্ত হইয়া যে শ্যামল শস্য বা শষ্প ইউরোপের বুকে জন্মিতে আরম্ভ করিয়াছিল তাহা বিধ্বস্ত করিয়া ছুটিয়া চলেন এই নির্ম্মম হান দলপতি এবং তাহার বর্ব্বর ও দুর্দ্ধার অনুচরবর্গ—ইহাই তদানীন্তন ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের অভিমত।

পশ্চিম এশিয়া হইতে অগ্রসর হইয়া ইউরোপে প্রবেশ পূর্ব্বক এটিলা তৎকালীন রোম্যান ও বীজান্টাইন সাম্রাজ্যকে বিধ্বস্ত করিতে করিতে পশ্চিমে আগাইয়া হাঙ্গেরীর উত্তরাংশে উপনীত হন। তথায় তিনি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত প্রাসাদে সানুচর বাস করেন বলিয়া আমরা গ্রীক ঐতিহাসিকদের লিখিত বিবরণ হইতে জানিতে পারি। গ্রীকদূত প্রিস্কাস এটিলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দেখিতে পান, গৃহগুলি কাষ্ঠনির্ম্মিত হইলেও স্বর্ণ ও রৌপ্য-নির্ম্মিত তৈজসাদি ব্যবহৃত হইতেছে। অকুণ্ঠ লুণ্ঠনের ফলে এই সকল স্বর্ণ ও রৌপ্য সংগৃহীত বলিয়া ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা মনে করেন। এটিলা পশ্চিম ইউরোপ আক্রমণ বা অধিকার করিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হন। রোম্যান পতাকাতলে দণ্ডায়মান ফ্রাঙ্ক, ভিসিগথ প্রভৃতি পশ্চিম ইউরোপীয় সম্প্রদায়রা বীর-বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া শ্যাম্পেন নামক স্থানে দুর্দ্ধান্ত হান-দলপতিকে পরাজিত করে। উত্তর হাঙ্গেরীতে অবস্থান কালেই একদিন

হাঙ্গেরীর বর্তমান রাজধানী বুডা-পেষ্ট নামক যুগ্ম নগর—দানিউবের পরপারবর্তী পেষ্ট অপেক্ষা বুডা প্রাচীনতর সহর, সংযোগ-সাধক সেতুটি ইংরেজ ইঞ্জিনীয়ারগণের দ্বারা নির্মিত

অতিরিক্ত উন্মার্গগামিতার ফলে এটিলার মৃত্যু ঘটে বলিয়া ইউরোপের ইতিহাসে বর্ণিত আছে।

এটিলার মৃত্যুর পর তাঁহার অধিকাংশ অনুচর এশিয়াস্থ জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করে বলিয়া আমাদের মনে হয়। স্বল্পসংখ্যক যাহারা থাকে তাহাদের দ্বারা দুই একটি বর্ণসঙ্কর সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। ফ্রান্সের বারগাণ্ডী নামক অংশ পর্য্যন্ত এই বর্ণসঙ্কর সম্প্রদায় দেখা যায়। অনেকে মনে করেন জার্ম্মান পৌরাণিক কাহিনী বা রূপকথায় যে রাজা ইৎজেপের কথা আছে তিনি এটিলা ছাড়া অন্য কেহ নহেন। ইৎজেল সিগফ্রিডের বিধবা পত্নী ক্রিমহিলডকে বিবাহ করেন। যে নিযে বেলুঙ্গেন যোদ্ধবর্গের দ্বারা সিগ্‌ফ্রিও হত হইয়াছিলেন তাহারা ইৎজেলের দরবারে আসিলে তাহাদিগকে বধ করিয়া ক্রিমহিল্‌ও তাঁহার পূর্ব্বস্বামী (পৌরাণিক বীর) সিগৃফ্রিডের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন বলিয়া জার্ম্মাণ পৌরাণিক কাহিনীতে উল্লিখিত আছে।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে এটিলা ইউরোপে আসেন। খৃষ্টীয় দশম শতকের প্রারম্ভে আর এক দল হান্ ইউরোপে প্রবেশপূর্ব্বক বাভেরিয়া পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। সম্রাট অটো কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হওয়ার ফলে ইহাদের অগ্রগতি রুদ্ধ হয় এবং ইহারা এসিয়ায় প্রত্যাবৃত্ত না হইয়া ইউরোপের সেই অংশে বাস করিতে আরম্ভ করে যেখানে দলপতি এটিলা একদিন অস্থায়ী বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং যাহা এখন হাঙ্গেরী আখ্যায় অভিহিত। এসিয়া হইতে অগণিত এই পরবর্ত্তী মোঙ্গোলীয় যোদ্ধজাতিই ম্যাগিয়ার সম্প্রদায়ের প্রকৃত পিতৃপুরুষ। এই অংশের আদিম অধিবাসী স্লাভদিগকে তাড়াইয়া ইহারা এই ভূখণ্ডে স্থায়িভাবে অবস্থান করিতে আরম্ভ করে। এটিলার বর্ব্বর অনুচরবর্গের ন্যায় ইহারাও প্রথমে যাযাবর ছিল কিন্তু ক্রমশঃ পশুপালনের সঙ্গে কৃষিকার্য্য শিখিয়া এবং ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া স্থায়ী বাসস্থান স্থাপন করিবার পদ্ধতি শিখে। যেমন ইংলণ্ডে রাজা

আর্থার বা ফ্রান্সের সম্রাট শার্লামান তেমনই ম্যাগিয়ার জাতির পক্ষে রাজা আর্পাদা, ইঁহাকে ম্যাগিয়ার সভ্যতার প্রবর্ত্তক বলিয়া অভিহিত করিলে ভুল হয় না। ইনিই এই জাতির যাযাবর জীবন বা স্বভাবের অবসান ঘটান এবং কেমন করিয়া নগর ও গ্রাম নির্ম্মাণ এবং ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে হয় তাহা শিক্ষা দেন। রাজা আর্পাদের স্থাপিত নৃপ-বংশ চারিশত বৎসর ব্যাপিয়া বিদ্যমান ছিল।

রাজা প্রথম ষ্টিফেন আর্পাদ প্রতিষ্ঠিত নৃপবংশেই উদ্ভূত হন। ইংরেজদের চক্ষে যেমন রাজা এলফ্রেড, ম্যাগিয়ার-দের পক্ষে তেমনই রাজা ষ্টিফেন। আর্পাদের সময়ে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম এই জাতির মধ্যে সেরূপ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করে নাই। ষ্টিফেনই প্রজাদের মধ্যে এই ধর্ম্মকে বদ্ধমূল করিবার জন্য প্রবল প্রযত্ন প্রয়োগ করেন। রোমের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মগুরু পোপ ইঁহার নৃপত্ব স্বীকার করেন এবং ইঁহার মস্তকে রাজমুকুট স্বহস্তে পরাইয়া দেন। ফলে ষ্টিফেন ইউরোপের নৃপমণ্ডলীর মধ্যে স্থান লাভ করেন এবং তাঁহার শাসিত প্রদেশ ইউরোপের অন্যতম ক্রমোন্নতিশীল রাজ্যরূপে গণ্য হয়। খৃষ্টধর্ম্মানুরাগী এবং বিশেষ রোম্যান ক্যাথলিক মতের অনুরক্ত ভক্ত রাজা ষ্টিফেন ল্যাটিনকে ম্যাগিয়ারদের বা হাঙ্গেরীর রাষ্ট্রভাষা বলিয়া ঘোষণা করেন। ইহা খৃষ্টীয় ১০০০ অব্দের ঘটনা।

ইংরেজদের ন্যায় ম্যাগিয়াররাও বরাবরই অখণ্ড স্বতন্ত্রতাপ্রিয়। ইংরেজরা যখন রাজা জনের নিকট ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ম্যাগনাচার্টা আদায় করিয়া লইতেছে, তখন হাঙ্গেরীর জমীদার ও প্রজাবর্গ তথাকার রাজার নিকট হইতে ঐরূপ স্বাধীকার পত্র প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রাণপণ প্রযত্ন প্রয়োগ করিতেছে। ইংরেজদের ন্যায় ম্যাগিয়াররা রাজার স্বৈরাচার কখনও সহ্য করিতে পারে নাই। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর সূচনায় আর্পাদ প্রবর্ত্তিত নৃপবংশের অবসান ঘটে। এই সময় ম্যাগিয়াররা ইউ-রোপীয় সভ্যতার সহিত প্রায় সম্পূর্ণ সংস্পর্শ বা সম্পর্ক স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই সময় হইতে নৃপত্ব বংশগত না হইয়া নির্ব্বাচনের দ্বারা স্থিরীকৃত হইতে আরম্ভ করে। ফলে প্রায়ই নৃপ-পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে। প্রাচীন আর্পাদ রাজ পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ থাকার জন্য ফ্রান্সের এঁজু নামক নৃপবংশোদ্ভূত একব্যক্তিকে হাঙ্গেরীর সিংহাসনে বসান হয়। তখন ইটালীর নেপলস নগরে এই এঁজু বংশের আধিপত্য স্থাপিত ছিল। এই এঁজু বংশের সঙ্গে সম্পর্কের পর ম্যাগিয়ারদের মধ্যে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অধিকতর প্রচার লাভ করিয়াছিল। চতুর্দ্দশ শতকের শেষভাগে হাঙ্গেরীয়ান নৃপতি সিগিশমাণ্ড এরূপ প্রতাপ-শালী হইয়া পড়েন যে তাঁহাকে 'সম্রাট' অধ্যায় অভিহিত করা হয়। যখন তুর্কীরা ইউরোপের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ আরম্ভ করে তখন জন হলিয়াদী নামক ম্যাগিয়ার বীর তাহাদিগকে হাঙ্গেরী হইতে বিতারিত করিতে সমর্থ হন। হলিয়াদীর পুত্র ম্যাথিয়াস কর্ণিভাস হাঙ্গেরীর সিংহানে উপবিষ্ট হইয়া এই রাজ্যের এইরূপ উন্নতি সাধন করেন যে তাঁহার শাসন সময়কে এই দেশের অগাষ্টান এজ বা স্বর্ণযুগ বলা হইয়া থাকে। কিন্তু এই শক্তিশালী নৃপতির বংশধরগণ এরূপ অক্ষমতার পরিচয় দেন—বিদেশীদের আক্রমণ এবং আভ্যন্তরীন অশান্তি দুইই এই দেশকে পুনরায় অবনত অবস্থায় আনিয়া দেয়। এই সুযোগে তুরস্ক আবার হাঙ্গেরী আক্রমণ করিয়া ইহাকে করগত করিতে সমর্থ হয়।

যেমন স্পেনে মূরদের তেমনই হাঙ্গেরীতে তুর্কদের আক্রমণ ও অধিকারের বহু নিদর্শন আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। তুরস্ক শাসিত অংশ ব্যতিরেকে অবশিষ্ট যাহা ছিল তাহা অষ্ট্রিয়াধিপতি ফার্দ্দিনান্দের হস্তগত হয়। ফার্দ্দিনান্দের বংশধরগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া হাঙ্গেরীর বক্ষে শাসনচক্র চালিত করেন। সুতরাং নির্ব্বাচনগত না হইয়া পুনরায় জন্মগত শাসন এই দেশে স্থাপিত হয়। ফার্দ্দিনান্দ বংশ হইতে সম্ভূত শাখাবিশেষ হ্যাপসবার্গ বংশের শাসন হাঙ্গেরীর বক্ষে সেদিন পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল। সমগ্র অষ্ট্রো-হাঙ্গেরীয়ান সাম্রাজ্য শাসিত হইত এই নৃপবংশের দ্বারা। কালচক্রের অদ্ভুত আবর্ত্তনে আজ কোথায় সেই দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী হ্যাপসবার্গগণ, যাহাদের অপ্রতিহত অখণ্ড আধিপত্য সমগ্র ইউরোপ সবিস্ময়ে দর্শন করিত।

উনবিংশ শতকে ম্যাগিয়ারদের মনে যে সুতীব্র জাতীয় চেতনা, মুক্তির যে উদগ্র আকাঙ্ক্ষা, জাতীয় বৈশিষ্ট্যের

ভিত্তিতে রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিবার যে প্রবল প্রেরণা ও প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল, তাহার ফলে হ্যাপসবার্গ শাসিত সুবিশাল সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর ম্যাগিয়ার জাতি অধ্যুষিত স্বতন্ত্র এই জনপদ জন্ম লাভ করিল। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ম্যাগিয়ারগণ সম্রাটদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহধ্বজা সর্ব্বপ্রথম উত্তোলিত করে। রুশবাহিনীর সাহায্যে যে ভাবে এই বিদ্রোহাগ্নি নির্ব্বাপিত করা হয় তাহা সমগ্র ইউরোপ ব্যাপিয়া একপ্রকার চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। শুধু যে বিদ্রোহী ম্যাগিয়ারদের অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লওয়া হয় তাহা নহে, বিদ্রোহ দমিত করিবার জন্য অষ্ট্রিয়ানরা এবং হস্তক্ষেপকারী বা মধ্যস্থ সেই রুশ সেনাদল অকুণ্ঠভাবে অজস্র শোণিত-স্রোত প্রবাহিত করে। এই অন্যায় অত্যাচারে বৃটেন ও আমেরিকার মনে উৎপীড়িত ম্যাগিয়ারদের প্রতি অনুকম্পা ও সহানুভূতির সঞ্চার করে বটে, কিন্তু তাহারা এ বিষয়ে বিশেষ কোন সক্রিয় উপায় অবলম্বন করিবার কথা আমরা অবগত নহি।অষ্ট্রিয়ান সেনাপতি হেনাউ শুধু পুরুষদের উপর নয়, ম্যাগিয়ার নারীদের উপরও বেত্রাঘাত প্রভৃতি অত্যাচার করেন বলিয়া কথিত। এই মার্শাল হেনাউ ইংলণ্ডে আসিলে তথাকার জনসাধারণ ক্রুদ্ধ হইয়া এরূপ ভাবে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করে যে তিনি প্রাণভয়ে লুকাইতে বাধ্য হন এবং অবশেষে ছদ্মবেশে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই ব্যাপার লইয়া অষ্ট্রিয়ান ও ইংরেজদের মধ্যে একপ্রকার মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া মার্শাল হেনাউর নিকট ক্ষমা চাহিতে বলিলে প্রধানমন্ত্রী পামারষ্টন 'ঠিকই হইয়াছে' বলিয়া ক্ষমা চাহিতে অস্বীকৃত হন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইংরেজ ও আমেরিকানদের এই অনুকম্পা অনেকটা মৌখিক। তাঁহারা হাঙ্গেরীর পক্ষ লইয়া কোন আন্দোলন করেন নাই। করিয়াছে ম্যাগিয়াররা একাই। অবশেষে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাটের নিকট হইতে ইহারা একপ্রকার আংশিক স্বায়ত্ত শাসন আদায় করিতে সমর্থ হয়। এই অধিকার অনুসারে শুধু বৈদেশিক ও সামরিক ব্যাপারে তাহারা সম্রাটের শাসন স্বীকার করিবে। অন্যান্য বিষয়ে ম্যাগিয়ারদের দেশ হাঙ্গেরী অষ্ট্রিয়া হইতে পৃথক স্বতন্ত্র এক রাষ্ট্র বলিয়া বিবেচিত হইবে। প্রয়োজন হইলে একপ্রকার জাতীয় বাহিনী বা "মিলিশা" গঠন করিবার ক্ষমতাও হাঙ্গেরীর থাকিবে বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। কারেন্সী এবং পোষ্টেজ যেমন চলিত তেমনই চলিবে বটে, কিন্তু নাম ও চিহ্নে পার্থক্য থাকিবে।

প্রসিদ্ধনামা আইরণ গেট্‌স বা লৌহ তোরণ
দানিউবের গতিপথে প্রতিরোধকারী পাহাড়শ্রেণী
থাকার জন্য এইরূপ নাম

ম্যাগিয়ারদের জাতীয় নেতৃবর্গের মধ্যে কোসুথ প্রধান। তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতা ম্যাগিয়ারদের মনে প্রবল দেশানুরাগ সঞ্চারিত করিয়াছে। যেমন আমাদের দেশে তিলক ও গান্ধীজি তেমনই এ দেশে কোসুথ। একটা প্রকাণ্ড পার্থক্য ; তিলক ও গান্ধীর রাজনীতি বা দেশপ্রীতি একপ্রকার অধ্যাত্মভাবের বিভায় উদ্ভাসিত, কিন্তু ওদেশে এই দুইটি বস্তু সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মসম্পর্ক শূন্য পার্থিব ব্যাপার। ম্যাগিয়ার রাজনীতিতে উদ্দীপনা অপেক্ষা উত্তেজনা অধিক। পূর্ব্বে পরিষদ ভবনে অনেক সময় তর্কজনিত মাতামাতি হাতাহাতিতে পরিণতি লাভ করিয়াছে। সুখের কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইবার পর, ম্যাগিয়াররা ক্রমশঃ পূর্ব্বের দুর্দ্দান্তপণা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্তভাবাপন্ন হইয়া পরিয়াছে। ইহারা অত্যন্ত সাহসী। অতিথি ও আশ্রিতের জন্য ইহারা প্রাণ পর্য্যন্ত দান করিতে পারে। আমি ম্যাগিয়ার—এই অনুভব ইহাদের মনে সর্ব্বদা একপ্রকার বিচিত্র গর্ব্ব বা আত্মগৌরব জাগ্রত করে।

হাঙ্গেরীতে যত ইহুদী আছে, পৃথিবীতে অন্য কোন দেশে তত নাই। এখানকার ব্যবসা-বাণিজ্য এতকাল

ধরিয়া হয় ইহুদীদের, নয় জার্ম্মানদের হাতেই ছিল। সম্প্রতি ম্যাগিয়াররা বাণিজ্যের মর্য্যাদা ও উপকারিতা বুঝিয়াছে। পশুপালন এবং কৃষিকার্য্য এই দুইটিই ইহারা ভাল জানে। এক সময় পশুপালনের প্রাধান্যই এখানে বিদ্যমান ছিল। যাযাবর প্রকৃতি পরিত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকার্য্যে ইহারা যেরূপ বিশেষ নৈপুণ্য অর্জ্জন করিয়াছে, ব্যবসা-বাণিজ্যে সেরূপ এখনও হয় নাই। নৃত্যগীতের দিকে ইহাদের অত্যন্ত অনুরাগ। ম্যাগিয়ার গৃহে প্রায় নিত্যই নৃত্যগীত অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। হাঙ্গেরীর জাতীয় সঙ্গীত "র‍্যাডকজী মার্চ্চে"র ন্যায় চিত্তোন্মাদক জাতীয় গীতিকা অতি অল্পই আছে। "র‍্যাডকজী মার্চ্চ" প্রত্যেক ম্যাগিয়ারের শিরায় শিরায় অদ্ভুত উদ্দীপনার প্রবাহ বহাইয়া দেয়। সাধারণ সঙ্গীতেও ইহাদের অসাধারণ অধিকার। সম্প্রতি ম্যাগিয়ার সাহিত্যের প্রসার সাধিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতশিল্প সাধনায় ইহারা অধিকতর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে। প্রথমে লাটিন, তারপর জার্ম্মান ভাষার প্রাধান্য এদেশে বিদ্যমান ছিল। তীব্র জাতীয় সম্বিদের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশীয় সাহিত্যের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হওয়ায় নিত্য নব নব সৃষ্টির দ্বারা ম্যাগিয়ার ভাষা বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হইয়াছে। লোকসঙ্গীত এবং লৌকিক কথা ও কাহিনীতে বিশেষ সমৃদ্ধ বলিয়া সহজেই এই বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষতা অর্জ্জিত হইয়াছে। এই গীতানুরাগী জাতির পক্ষে কবিতা স্বাভাবিক। কবির সংখ্যা কথাসাহিত্যিক অপেক্ষা অনেক বেশী। গীতিকবিতায় পেটুফিকে অদ্বিতীয় বলা যায়। যেমন কৃষককবি বার্ণস স্কটল্যাণ্ডের মর্ম্মগাথা গাহিয়াছেন, তেমনই ম্যাগিয়ার জাতির মর্ম্মবাণী এই জাতীয় কবির কণ্ঠ হইতে উত্থিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া কবি আরাণী, ব্রাজা ও ভুরুস মার্জ্জিত কাব্য রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। ঔপন্যাসিকদের মধ্যে জোকাই প্রধান। চিন্তাশীল গুরুগম্ভীর রচনায় ভ্যাম্বেরীর ন্যায় কৃতিত্ব কেহই দেখাইতে পারেন নাই। যেমন সুরশিল্পে সাধকদের মধ্যে লিজৎ, তেমনই চিত্রকলাবিদদের মধ্যে মুনাকজী। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের তালিকায় উভয়ের নামই আমরা দেখিতে পাই!

ম্যাগিয়াররা মাঝারী আকারের। মোঙ্গোলীয় শোণিত প্রবাহিত থাকার জন্য ইহাদের আকার অন্যান্য ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের ন্যায় দীর্ঘ হইতে পারে নাই। মাথা খাটো, কিন্তু মুখ চওড়া। মুখের গোলাকৃতি হওয়ার দিকে প্রবণতা মোঙ্গোলীয় শ্রেণীর পরিচায়ক। মুখ সুগঠিত এবং চিবুক গোল। উচ্চ গুম্ফগুচ্ছ পৌরুষের পরিচয় প্রদান করে। গোঁফে চাড়া দিয়া উহার প্রান্তকে সরু করা ম্যাগিয়ারদের স্বভাব। চওড়া সমতল কপাল। বক্ষস্থল শারীরিক শক্তি ও সহনশীলতার পরিচায়ক। প্রশস্ত করতল কিন্তু অঙ্গুষ্ঠ খর্ব্বাকৃতি। ম্যাগিয়ারদের চলিবার ভঙ্গী চিত্তাকর্ষক। নৃত্য করিবার ভঙ্গীতে তালে তালে পা ফেলে বলিয়া মনে হয়। গতি ও শক্তি উভয়ের সামঞ্জস্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। তবে বসিয়া থাকিবার সুযোগ থাকিলে তাহারা প্রায়ই চলিতে চায় না এবং অশ্বারোহণে গমনের সুযোগ মিলিলে পদব্রজে আগাইতে সম্পূর্ণ নারাজ। ইউরোপের জাতিবর্গের মধ্যে ম্যাগিয়াররাই অশ্বারোহণে সর্ব্বাপেক্ষা সুদক্ষ। শৈশব হইতেই অশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক। দলপতি এটিলা সানুচর অশ্বারোহণে আসিয়াছিলেন। এই অশ্বানুরাগ মধ্য-এশিয়া হইতেই এই মোঙ্গোলীয় জাতি লইয়া আসিয়াছিল। ভূপৃষ্ঠ অপেক্ষা অশ্বপৃষ্ঠেই ইহারা অধিক স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে, এবং সহজে আগাইয়া যায়। যে তেজস্বী, দুর্দ্দমনীয় অশ্ব দেখিলে অপরে শঙ্কিত হইয়া সরিয়া যায়, ম্যাগিয়ার বালকও নিঃশঙ্ক হৃদয়ে তাহার পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করে। একটা কথা চলিত আছে, ম্যাগিয়ারদের গৃহ অপেক্ষা আস্তাবল সুন্দর। তাহারা নাকি বাসভবন অপেক্ষা অশ্বশালার অধিক যত্ন লয়।

সাহসী হইলেও ম্যাগিয়াররা একটুতেই নিরুৎসাহ হয়, ইহাও সত্য। ইহাদের মন যেমন সহজেই উত্তেজিত হয়, তেমনি সহজেও বিষণ্ণ ও উদাস হইয়া পড়ে। একজন লেখক বলিয়াছেন, পরস্পর বিপরীত ভাবাপন্ন কতকগুলি স্বভাবের সমষ্টি ম্যাগিয়ার সম্প্রদায়। ইহারা যেমন শিকারপ্রিয় তেমনই দ্যূতক্রিয়ায় অনুরক্ত। সুখের বিষয় এই দ্যূতানুরাগ আজকাল অনেক কমিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে বাজি রাখিয়া দ্যূতক্রিড়া করিতে করিতে কোন কোন

ম্যাগিয়ার সম্ভ্রান্ত অভিজাত ব্যক্তি ইহুদী মহাজনের নিকট ঋণ লইয়া অবশেষে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ইহাদের জ্ঞানচক্ষু খুলিয়াছে বলা যায়।

যেমন মিশরের নীলনদ তেমনই হাঙ্গেরীর পক্ষে দানিউব। দানিউবের তীরে তীরে অষ্ট্রিয়া হইতে হাঙ্গেরীর দিকে আগাইলে নিসর্গের যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দৃষ্টিগোচর হয়, সমগ্র ইউরোপের মধ্যে তাহা সত্য সত্যই অনুপম। অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা হইতে হাঙ্গেরীর প্রাচীন রাজধানী প্রেসবার্গ পর্য্যন্ত যাহারা ভ্রমণ করিয়াছেন তাঁহারা দুর্দ্দমনীয় দানিউবের যে ভীমকায় মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, আরও আগাইয়া হাঙ্গেরীর অভ্যন্তরভাগে প্রবেশের পর তাহা অন্যরূপ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। যে দুর্দ্দান্ত নদ পার্ব্বত্য প্রকৃতির বন্ধুর বক্ষ ভেদ করিয়া গর্জ্জনগীতি গাহিয়া তাণ্ডব তালে নৃত্য করিতে করিতে সবেগে ধাবিত হইয়াছে, হাঙ্গেরীর দিগন্ত প্রসারিত বিরাট প্রান্তরে অবতরণের পর তাহা প্রশান্ত—গম্ভীর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ভিয়েনা হইতে ত্রিশ মাইল দূরে অম্বরচুম্বী ডেভেনী অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীকে বিভক্তকারী সীমান্ত শৈলরূপে দণ্ডায়মান আছে। এই অভ্রভেদী গিরির একদিকে হাঙ্গেরী এবং অন্যদিকে লিটন কার্পেথিয়ান্স নামক পাহাড় শ্রেণী। এই পার্ব্বত্য অঞ্চলের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দানিয়ুব উদ্দাম গতিতে বহিয়া যাইবার কালে দক্ষিণ হইতে লীথা ইহার সহিত মিলিবার জন্য আসিয়াছে। ম্যাগিয়ারদের দেশের আর একটি সীমা নির্দ্দেশক প্রাকৃতিক পদার্থ এই লীথা নদী। দানিয়ুবের আর একটি করদ নদ মার্ব্বকমোর্জা ও শ্লোভাকিয়া ও হাঙ্গেরীকে পৃথক করিতেছে। ইতিহাসের পাঠকরা হয় তো জানেন পুরাতন অষ্ট্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত চেক ও শ্লোভাক সম্প্রদায় অধ্যুসিত অংশটিকে চেকোশ্লোভাকিয়া নামক স্বতন্ত্র একটি রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করা হইয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে অষ্ট্রিয়া যেরূপ ক্ষুদ্র হইয়া পরে সেরূপ আর কোন দেশই নহে। এখন যাহাকে অষ্ট্রিয়া বলা যায় তাহা জার্ম্মানজাতি অধ্যুসিত ক্ষুদ্র একটি রাষ্ট্র। অষ্ট্রিয়ান বলিয়া কোন জাতি নাই। খাস অষ্ট্রিয়ানরা খাটি জার্ম্মান। অন্যান্য যেসকল জাতি অষ্ট্রিয়া হাঙ্গেরীয়ান সাম্রাজ্যে বাস করিত প্রত্যেকেই জাতীয় বৈশিষ্ট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, মাতৃভাষাভাষী সতন্ত্র রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিয়াছে। এই সত্য ভাবিবার বিষয়, আন্তর্জ্জাতিক মিলন বা ঐক্যের উপকারিতা মানুষ যতই বুঝিয়া থাকুক, জাতীয় বৈশিষ্ট্য বিসর্জ্জন দিয়া সেই ঐক্যকে কার্য্যকরি করিবার ইচ্ছা আজ কাহারও নাই। অবশ্য ইহাই বাঞ্ছনীয়। যে জাতির সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্য নাই, তাহার স্বাতন্ত্র্য শুধু কথার কথা মাত্র। ভাগ বাটোয়ারার সময় হাঙ্গেরীর খানিকটা অংশ রুমানিয়া লাভ করে। এই অংশই ট্রান্সিল ভেসিয়া আখ্যায় অভিহিত। এই অঞ্চলে ম্যাগিয়াররা অত্যন্ত সংখ্যাল্প। ওয়াপাচ নামক বর্ণসঙ্কর সম্প্রদায়ই সংখ্যাধিক।

গ্রামের পথে—হাটের দিনে

হাঙ্গেরীর প্রাচীন রাজধানী প্রেসবার্গ বা পো জোনীর (ম্যাগিয়ার ভাষার নাম) পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইবার সময় দানিয়ুব কতিপয় শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই নগরের গির্জ্জাতে ম্যাগিয়ার রাজাদের অভিষেকক্রিয়া সম্পাদিত হইত এবং সম্রাজ্ঞী মেরিয় থেরিসা একদিন এখানেই ম্যাগিয়ার সামন্তবর্গের নিকট অশ্রুসিক্ত নয়নে করুণ আবেদন জ্ঞাপন করেন বলিয়া জানা যায়। লিটন কার্পেথিয়ান্স শৈলশ্রেণীর দ্রাক্ষাক্ষেত্রাবৃত গাত্রের পার্শ্বে অবস্থিত দানিউব তীরবর্ত্তী এই সুন্দর প্রাচীন সহরে লক্ষাধিক লোক বাস করে। শ্লাভ ভাষায় ইহা ব্র্যাটিস্লাভা নামে অভিহিত। হাঙ্গেরীর ঐতিহ্যের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট এই অঞ্চল শ্লোভাক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হওয়ায় ম্যাগিয়াররা অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

শ্রোতাকরা সংখ্যাধিক বলিয়াই এরূপ হইয়াছে। প্রেস-বার্গ পার হইবার পর দানিয়ুব কোমণ নামক বিরাট দুর্গ-বিশিষ্ট নগরে আগমন করিয়াছে। উভয় নগরের মধ্যস্থলে এই মহানদ ৬০ মাইল প্রশস্ত এক দ্বীপাকৃতি ভূখণ্ডকে বেষ্টন করিয়া ধাবিত হইয়াছে। দানিউব নদের দ্বারা সাগ্রহে আলিঙ্গিত এই অঞ্চল এরূপ উর্ব্বর যে প্রায় শতাধিক গ্রামের অন্ন ইহা যোগাইয়া থাকে। দানিউব অত্যন্ত চিত্তোন্মাদক দৃশ্যাবলীর ভিতর দিয়া হাঙ্গেরী প্রবেশ করিতেছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পার্ব্বত্য প্রকৃতিকে পশ্চাতে রাখিয়া সমতল প্রদেশের উপর দিয়া প্রবাহিত হইবার সময় ইহার গতি ও প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হওয়া স্বাভাবিক। অরণ্যাকীর্ণ পর্ব্বতবন্ধুর নিসর্গের বৈচিত্র্য সমগুণ প্রান্তরপূর্ণ প্রদেশে থাকিতে পারে না।

হাঙ্গেরী প্রবেশের সময় দানিউব কতকগুলি দ্বীপ ও হ্রদ সৃষ্টি করিয়াছে। এই হ্রদগুলি বর্ষায় তট-ভূমি প্লাবিত করিয়া থাকে বলিয়া জায়গাগুলি কিছু জলাপ্রকৃতির। গ্রীষ্মকালে হ্রদের ধারে গ্রামবাসী ম্যাগিয়াররা শস্যপিষ্ট করিবার কল স্থাপন করে। বর্ষায় জলের বেগে কলগুলি চলে। ইহার পর দানিউব 'লিটল আলফালড' নামক প্রান্তর ভেদ করিয়া আগাইয়া গিয়াছে। বৃহত্তর প্রান্তর বা গ্রেট আলফালড এবং ক্ষুদ্রতর প্রান্তর বা লিটল আল-ফালড; এই দুইটি দূর-দিক-চক্র চুম্বিত বিরাট প্রান্তর এই দেশের বহু অংশ অধিকার করিয়া রহিয়াছে। উভয়ের মধ্য-স্থলে "ব্যাকনী-ওয়ালড" নামক কান্তার কুন্তলা শৈলমালা এই অরণ্যাকীর্ণ গিরিশ্রেণীর দক্ষিণে প্ল্যাটেনসী বা ব্যালাটন হ্রদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ব্যালাটন হ্রদ হাঙ্গেরীর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ জলাশয়। ইহা ৫০ মাইল অপেক্ষাও অধিক দীর্ঘ। হ্রদের উত্তরে আগ্নেয় প্রকৃতির শৈলমালা। এই পাহাড় শ্রেণীর বক্ষদেশে বহু স্বাস্থ্য নিবাস। দানিউব তীরবর্ত্তী ব্যাকনীবন পূর্ব্বে দস্যুদলের আবাসস্থল ছিল। বর্ত্তমানে তথায় একপ্রকার পশুপালক সম্প্রদায় বাস করে।

ব্যাকনীবনের নিকটে গ্রীণ নদ তাত্রা শৈলশ্রেণী হইতে ছুটিয়া আসিয়া দানিউবের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। এখানে গ্রাণ নামক প্রাচীন নগর। হাঙ্গেরীর প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ এই নগরে থাকেন। সুতরাং ইংলণ্ডের ক্যাণ্টারবারীর ন্যায় ইহা এই দেশের ধর্ম্ম-ধানী। দুর্গের পরিবর্ত্তে এখানে দণ্ডায়মান রহিয়াছে কয়েকটি গুরুগম্ভীর গীর্জ্জাগৃহ এবং বিরাট মঠ। এই মঠ-মন্দির দর্শনের জন্য অগণিত ম্যাগিয়ার তীর্থযাত্রী গভীর অনুরাগের সহিত একদিন আগমন করিত। তীর্থস্থানটি আমাদের দেশের দর্শনার্থীপূর্ণ তীর্থক্ষেত্রের মতই একদিন ছিল। আজ অবস্থা সম্পূর্ণ অন্যরূপ। ইহা এখন বিশাদমলিন মূর্ত্তিতে অতীত সমৃদ্ধির কাহিনী স্মরণ করিতেছে বলিয়া মনে হয়। হাঙ্গেরী ধর্ম্মসম্পর্কশূন্য সেকিউলার রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হওয়ায় গ্রাণ নগরের পূর্ব্ব মর্য্যাদা আর নাই। এই বিলুপ্ত-গৌরব নগরের পথগুলি এখন জনবিরল। ধর্ম্ম-যাজকীয় প্রভাবও ঐশ্বর্য্যের লীলাস্থলী এই নগরী মধ্যযুগে ক্রুজেডার বা খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-যোদ্ধাদের একটি বিশিষ্ট মিলন-কেন্দ্র ছিল।

গ্রাণ নগরের পাদপীঠ ধৌত করিয়া দানিউব নদ "রক অফ্ ভিসেগ্রাদ" নামক শৈলের পার্শ্ব দিয়া বহিয়া গিয়াছে। এই শৈলের শীর্ষদেশে এক প্রাচীন প্রাসাদ ও দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই শৈলটিকে ম্যাগিয়ার জাতি-অধ্যুসিত হাঙ্গেরী নামক রাষ্ট্রের কেন্দ্রস্থল বলা চলে। ইহার পর এই নদ প্রশস্ততর এবং বহু সংখ্যক শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া উদ্দাম আবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। অকস্মাৎ দক্ষিণে আগাইয়া বুডা ও পেষ্ট নামক নগর-দ্বয়ের মধ্যস্থল দিয়া ধাবিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে বুডা-পেষ্ট নামক ধারণপূর্ব্বক ইহা দুইটির পরিবর্ত্তে একটি নগর বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। ইহাই এখন হাঙ্গেরীর রাজধানী। ভিয়েনা হইতে বুডাপেষ্ট আসিবার জন্য দুইটি রেলপথ প্রস্তুত রহিয়াছে। একটি রেলপথ হাঙ্গেরীর প্রাচীন রাজধানী প্রেসবার্গ নগরের পার্শ্ব দিয়া, অপরটি গিয়র নগরের নিকট দিয়া। প্রথমটি দানিউব নদের উত্তর পার্শ্বে দ্বিতীয়টি দক্ষিণ দিকে। রেলপথ ছাড়া দানিউব-নদের বক্ষ দিয়া জলপথে ষ্টিমারযোগে ও প্রেসবার্গ হইতে বুডাপেষ্ট আসা যায়।

রেলপথে ভ্রমণের সুবিধার জন্য "জোন-সিষ্টেম" নামক প্রণালীতে ভাড়া লইবার যে ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, উহা

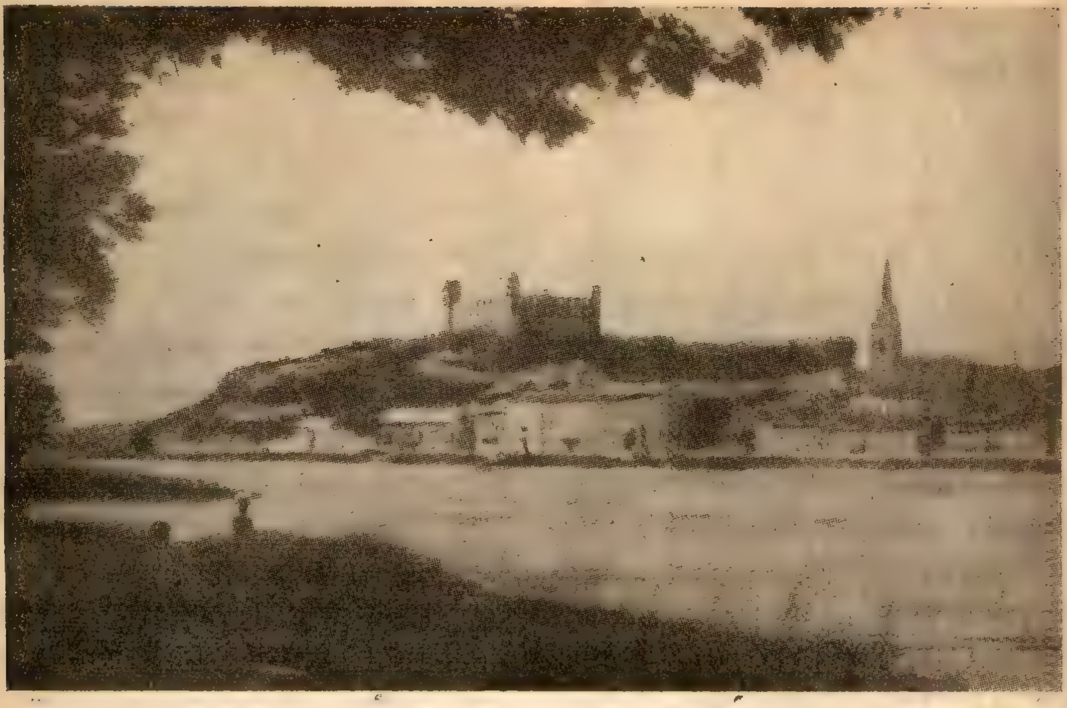

হাঙ্গেরীর প্রাচীন রাজধানী প্রেসবার্গ (দানিউব তীরে)
(ম্যাগিয়ার ভাষায় পোজোনী আখ্যায় অভিহিত)।

সর্ব্বপ্রথম হাঙ্গেরীতেই প্রবর্ত্তিত হয়, ইহা এইস্থানে স্মরণীয়। এই প্রণালী আনুসারে ভ্রমণার্থ ব্যবহৃত রেলপথ যত দীর্ঘ হইবে ভাড়ার হার তত কমিবে। হাঙ্গেরীর অনুকরণে সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া এই প্রণালী এখন চলিতেছে। পথের পরিমাণ অনুসারে ভাড়ার অল্পতা বা আধিক্য এই দেশেও দেখা যায়।

বুডাপেষ্টকে জুডাপেষ্টও বলা হয়। 'বুডা' 'পেষ্ট' অপেক্ষা প্রাচীন। ইহা রোম্যান যুগে বিদ্যমান ছিল। হানদলপতি এটিলার ভ্রাতা বুডার নামানুসারে এই নামকরণ। বুডা পেষ্ট অপেক্ষা উচ্চতর ভূমির উপর বিরাজিত। গিরিগাত্রে গঠিত দুর্গ, গম্ভীর দর্শন প্রকাণ্ড প্রার্থনা গৃহ, সাম্রাজ্ঞী মেরিসার খেরিলাত বিশাল প্রাসাদ, সুদর্শন পরিষদ ভবন, বুডার প্রধান দর্শনীয়। পরিষদ গৃহটি নগরের নিম্নাংশে এবং নদীতটে। বুডা ও পেষ্টের মধ্যস্থলে দানিউবের বক্ষে একটি মনোজ্ঞ সেতু। অবশ্য এই প্রধান সেতু ছাড়া উভয় নগরের সংযোগসাধক আরও কতিপয় সেতু বিদ্যমান রহিয়াছে। যদিও পেষ্ট দীর্ঘতর কাল মুসলমান তুর্কদের করগত ছিল তবুও বুডাই বেশী প্রাচ্য-ভাবাপন্ন। বুডার বক্ষে তুর্কী শাসনের বহু নিদর্শন আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। নগরের কয়েকটি মসজেদ ও স্নানাগার ঐ যুগের কলা স্মরণ করাইয়া দেয়। বিভিন্ন বর্ণে বিচিত্রিত কয়েকটি গৃহ বুডার একটি পল্লীতে দেখা যায়। ইহারা তুর্কীশাসন যুগে 'সার্ব্ব' সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রস্তুত।

বর্ত্তমানে বুডা অপেক্ষা পেষ্ট আকারে বৃহত্তর এবং অধিকতর কর্ম্মব্যস্তও বটে। হাঙ্গেরী স্বাধীনতা লাভের পর এই অংশে অনেক নূতন নূতন ভবন প্রস্তুত হইয়াছে। বহু অভিজ্ঞ ভ্রমণকারীর মতে হাঙ্গেরীর রাজধানী বুডাপেষ্ট ইউরোপের রাজধানীসমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রমোদপূর্ণ এবং পরিচ্ছন্ন। অনেকে অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনার সহিত ইহার তুলনা করিয়াছেন। ভিয়েনার সমকক্ষ না হইলেও বুডাপেষ্টের চিত্রাগার, স্মৃতিস্তম্ভসমূহ, অভিনয় ভবনগুলি, পার্ক বা উদ্যানমণ্ডিত ভ্রমণ স্থানসমূহ, ক্লাব,

হোটেল ও প্রমোদশালাগুলি (ভিয়েনা অপেক্ষা সংখ্যায় অল্প হইলেও) অধিকতর সুন্দর। ম্যাগিয়ার শিল্পীরা তাহাদের রাজধানীকে সাজাইবার জন্য সর্ব্বপ্রকার প্রযত্ন করিয়াছে ; এই সত্য সংশয়াতীত।

বুডা-পেষ্ট হইতে নদীতীর দিয়া একটুখানি আগাইয়া যাইলে মার্গারেটন দ্বীপ নামক একটি মনোজ্ঞ ভ্রমণস্থানে পৌছান যায়। শীতের সময় এই দেশে বর্ষা তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। বর্ষায় এই দ্বীপটি দানিউবের বারিরাশিতে প্লাবিত হইয়া অপরূপ রূপ ধারণ করে। গ্রীষ্মে জল শুকাইয়া গেলে উদ্যান ও কুঞ্জকাননগুলি মনোজ্ঞ ভ্রমণ স্থানে পরিণত হয়। এখানকার স্নানাগারের গন্ধকবিশিষ্ট জল স্বাস্থ্যকামী ব্যক্তিদিগের পক্ষে আর একটি আকর্ষণীয় বস্তু। রোম্যান যুগ হইতে এখানে স্নানাগার এবং ঐ যুগ হইতেই গন্ধকবিশিষ্ট জলের জন্য এখানকার উষ্ণ উৎসগুলি প্রসিদ্ধ। এই সকল ধাতব জল বোতলে প্রবেশ পূর্ব্বক ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ভৈষজ্য ভাণ্ডারগুলিতে বিক্রয়ার্থ রক্ষিত রহিয়াছে। হাঙ্গেরী অপেক্ষা চেকোশ্লোভাকিয়ায় অধিক সংখ্যক বিদেশীয় স্নানার্থী আসিবার অন্যতম কারণ ম্যাগিয়ারদের স্নানপদ্ধতি ইউরোপের অন্যান্য দেশের নরনারীরা সেরূপ সুরুচির পরিচায়ক বলিয়া মনে করে না। সম্প্রতি এই স্নানপদ্ধতির পরিবর্ত্তন সম্পাদিত হইয়াছে, ইহাও স্বীকার্য্য।

ম্যাগিয়াররা আমোদ-প্রমোদ অত্যন্ত ভালবাসে তাহা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। সবাক চিত্রভবনগুলি প্রায়ই দর্শনার্থীদলে পরিপূর্ণ থাকে। যে সব চিত্র পূর্ব্বে প্রদর্শিত হয় তাহা অন্যদেশের অধিবাসীদের পক্ষে প্রীতিপ্রদ না হওয়া বিস্ময়ের বিষয় নয়। ম্যাগিয়ার নরনারী নীতিমূলক নাটক অপেক্ষা উদ্দাম নৃত্যগীতবিশিষ্ট্য অভিনয় ভালবাসে। সুখের বিষয় সম্প্রতি কয়েক বৎসর ইহারা নিজেদের ত্রুটিবিচ্যুতি বুঝিতে পারিয়া সংস্কার সাধনে তৎপর হইয়াছে। 'কুছ পরোয়া নেহি' ভাব এবং চঞ্চল ইন্দ্রিয় বিলাস যাহা পূর্ব্বে দৃষ্ট হইত এখন তাহা হ্রাস হইয়া এক প্রকার গাম্ভীর্য্য ও চিন্তাশীলতা ম্যাগিয়ারদের জীবনে দেখা যাইতেছে। পানাগার বা নৈশ ভোজনশালাগুলিতে পূর্ব্বের ন্যায় ভিড় দেখা যায় না। পূর্ব্বে পান-ভোজনাগারগুলি প্রায় সারারাত্রি খোলা থাকিত এবং সেখানে উদ্দাম নৃত্যগীতের উচ্ছল প্রবাহ অবাধে বহিয়া যাইত। এখন আইনের দ্বারা সেরূপ করা নিষিদ্ধ কার্য্য বলিয়া গণ্য।

বুডাপেষ্ট অতিক্রম করিয়া কিছুদূর আগাইবার পর দানিউব নদ "গ্রেট আলফল্ড" নামক সুবিরাট প্রান্তরে প্রবেশ করিয়াছে। ইউরোপের অপর কোন দেশে এরূপ সুদূরদিগন্তপ্রসারিত মহাপ্রান্তর নাই। যেন একটা বিরাট মরুভূমি, কিন্তু মরুর মত উষর না হইয়া উর্ব্বর শস্যক্ষেত্র সমূহে পূর্ণ। মধ্য এশিয়ার মহাপ্রান্তর হইতে আগত এই দুর্দ্দমনীয় মোঙ্গোলীয় জাতির জন্য বিধাতাপুরুষ যেন এখানেও অন্তহীন প্রান্তর সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহা অনেকের নিকট বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হইতে পারে, মরুপ্রান্তরচারী অশ্বারোহী যাযাবর জাতির দুর্দ্দান্ত অধিনায়ক এটিলার বন্ধুর পর্ব্বত অপেক্ষা এই প্রান্তর প্রধান সমতল দেশ ভাল লাগিয়াছিল বলিয়া তিনি তথায় অস্থায়ী বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এশিয়ার 'ষ্টেপস' আখ্যায় অভিহিত তৃণাস্তীর্ণ বিরাট মাঠ ও আমেরিকার 'প্যাম্পাস' নামক শষ্পসমাচ্ছন্ন বিশাল প্রান্তরের সঙ্গে অনেকে ইহার তুলনা করেন। সীমাশূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হওয়ার জন্য ম্যাগিয়াররা এই প্রান্তরকে 'পুজতা' আখ্যায় অভিহিত করে। মরুবক্ষে মরুস্থানের মত মধ্যে মধ্যে সবুজ শস্যক্ষেত্র। কোথাওবা তৃণাস্তীর্ণ চারণ ভূমি। অবশ্য যে অংশ জলা বা জলাশয়যুক্ত সেখানেই শস্যক্ষেত্র। প্রায়ই বৃক্ষবর্জ্জিত এই মহাপ্রান্তরের বক্ষে মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটির। এই কুটিরগুলি পশুপালক সম্প্রদায় বা কৃষকদের অস্থায়ী বাসস্থল। এই প্রকাণ্ড প্রান্তরে প্রস্তর নাই বলিলেই হয়। গ্রীষ্মে পায়ের গোড়ালি পর্য্যন্ত বাদামী বর্ণাভ ধূলায় ডুবিয়া যায়। শীতে বৃষ্টি হইলে ধূলা কাদায় পরিণত হইয়া পথচারীর পক্ষে আর-একপ্রকার বাধা জন্মায়।

পূর্ব্বে দস্যুর ভয়ে এই মহাপ্রান্তরে দিনেও একা যাইতে একপ্রকার শঙ্কার সঞ্চার হইত। অশ্বারোহী দস্যুদল পথিকদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া অতি দ্রুত গতিতে দূর দিগন্তের ক্রোড়ে অদৃশ্য হইয়া পড়িত। পার্শ্ববর্ত্তী পাহাড়শ্রেণী ছিল তাহাদের আশ্রয়স্থল। পরে

কর্ত্তৃপক্ষের প্রবল চেষ্টায় এই অঞ্চল সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ হইয়া পড়িয়াছে। দস্যুদের আশ্রয়স্থলগুলি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত করা হইয়াছে। যেমন আরবে উষ্ট্রচোর, তেমনই হাঙ্গেরীতে অশ্বাপহারকের বিশেষ উপদ্রব ছিল। আজকাল রাত্রিতেও এই প্রান্তর বক্ষে কোন আশঙ্কার কারণ নাই। পর্ব্বত-বন্ধুর প্রকৃতির সৌন্দর্য্য অপেক্ষা সীমাশূন্য মহা প্রান্তরের প্রগাঢ় প্রশান্তি এবং উদার ও উদাস মূর্ত্তি মোঙ্গোলীয় শোণিত সম্ভূত ম্যাগিয়ারদের পক্ষে অধিকতর মনোমুগ্ধকর। এই অন্তহীন প্রান্তরের বুকে ছায়ালোকের বিচিত্র অভিনয় গীতিকবি পেটুফির প্রাণে যে অনুভূতি ও প্রেরণা জাগাইয়া তুলিয়াছিল তাহাই গীতি কবিতাকারে উৎসারিত হইয়া ম্যাগিয়ারদের অন্তরকে আজিও পরিতৃপ্ত করিয়া তুলিতেছে। যিনি যৌবনে যোদ্ধা ছিলেন এই মহাপ্রান্তরের উদার বিস্তার ও শব্দশূন্য সঙ্গীত তাঁহাকে করিয়া তুলিল এই দেশের শ্রেষ্ঠ কবি।

দানিউব এই প্রান্তর হইতে বাহির হইয়া ড্রেভনদের বারিরাশিকে সাগ্রহে গ্রহণ করিবার পর, পুনরায় এই প্রান্তরে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক অগ্রসর হইয়াছে। তদনন্তর থিজ বা থিজানদী দানিউবের বক্ষে প্রবেশ করিয়াছে। আঁকিয়া বাঁকিয়া ৮ শত মাইল পথ পরিভ্রমণের পর থিজা এই মহানদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। থিজার বহু নিজস্ব করদ নদও আছে। বর্ষায় এই সকল নদ-নদীর সম্মেলন যে বিরাট বন্যার সৃষ্টি করে তাহা শস্যসমূহের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। থিজার তীরে জেগেদিন নামক শহর। জেগেদিন আকারে বৃহৎ এবং জনবহুলও বটে। ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থান বলিয়া কর্ম্মব্যস্ততাও আছে। বুডাপেষ্ট হইতে ইহার দূরত্ব কম নয়। তেমেশ্বর, আরাদ ও গ্রস-ওয়ার্দ্দিন, এই তিনটী নগর দানিউবের পূর্ব্বদিকস্থ করদ-নদগণের তীরদেশে অবস্থিত। উত্তরে আগাইলে ডেব্রেজেন নগরে উপনীত হওয়া যায়। ইহা হাঙ্গেরীয়ান প্রোটেষ্টান্টদের কেন্দ্রস্থল। বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহী দেশভক্তদের দ্বারা ইহাই রাজধানী নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। হাঙ্গেরীর ভিতর এই অঞ্চটিই সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বরতার গৌরব করিতে পারে। এই প্রদেশে অবস্থিত টোকের দ্রাক্ষা ক্ষেত্রগুলিতে। উৎপন্ন দ্রাক্ষা হইতে যে মদ্য প্রস্তুত হয় তাহাকে মদ্যরাজ আখ্যায় অভিহিত করা হয়। এই অঞ্চলের কতকগুলি অংশ হাঙ্গেরীর নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। এই অঞ্চলের সহরগুলির বৈশিষ্ট্য, মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি উদ্যান-মণ্ডিত ময়দানে বাজার বা হাট বসিয়া থাকে। হাটের দিন নানা প্রকার পরিচ্ছদধারী নানা সম্প্রদায়ের লোক আসিয়া বেশ চিত্তাকর্ষক দৃশ্য প্রকাশিত করিয়া তুলে। ম্যাগিয়ার ছাড়া, শ্লোভাক, রুম্যানিয়ান, সার্ব্ব, ক্রোট, ইহুদী ও জিপসি সম্প্রদায়ের লোককে হাটে ক্রয়-বিক্রয় করিতে দেখা যায়।

ওয়ালাচ পরিবার
হাঙ্গেরীর এই সংখ্যাল্প বর্ণসঙ্কর সম্প্রদায়ের দেহেও মোঙ্গোলীয় শোণিত প্রবাহিত

দানিউব ও থিজার মাঝখানে বানাট নামক প্রদেশ। উর্ব্বর শস্যক্ষেত্র সমূহে সমৃদ্ধ বলিয়া এই প্রদেশ লইয়া রুম্যানিয়ার সহিত এবং সার্ব্বিয়ার সঙ্গেও বিবাদ-বিসম্বাদ বরাবরই চলিয়াছে। ইহার পর দানিউব নিম্ন জলাভূমির উপর দিয়া অগ্রসর হইয়াছে এবং তদনন্তর দক্ষিণ কার্পেথিয়ান্স গিরি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত শৈলসমূহের বক্ষ ভেদ করিয়া ধাবিত হইয়াছে। পার্ব্বত্য প্রকৃতির পক্ষে প্রবাহিত হইবার সময় ইহা পূর্ব্বের ন্যায় পুনরায় উদ্দাম হইয়া তাণ্ডব তালে নৃত্য করিতে করিতে ছুটিয়াছে। কখনও বা শিলায় শিলায় লাফাইয়া ঘূর্ণাবর্ত্ত সৃষ্টি করিয়াছে, কখনও বা শুভ্রফেণপুঞ্জ উদ্গীরণ করিতে করিতে প্রচণ্ড প্রপাতে

পরিণত হইতে লইলে উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিয়া চলিতেছে। এই দেশের প্রচণ্ডতম প্রপাত "গর্জ্জ অফ্ কাজানে।" যে দৃশ্য দানিউবের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা দেখিলে বিস্ময়ে অবাক হইতে হয়। মাত্র দুইশত গজ স্থানে সংহত হইয়া দানিউবের দুর্দ্দান্ত জলরাশি দুই হাজার ফিট উচ্চ হইতে প্রচণ্ড বেগে ঝম্প প্রদান করিতেছে। দানিউবের সবেগে ঝাঁপাইবার স্থানটিতে রোম্যানযুগের একটি পথের অবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। রোম সম্রাট ট্রাজানের দ্বারা উৎকীর্ণ শিলালিপিও এখানে আছে। লিপিগুলি জলের আঘাতে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া ঠিক পড়া যায় না।

অর্সোডা নগরী হইতে কিঞ্চিৎ নিম্নে দানিউব নদ বিখ্যাতনামা আইরণ গেট বা লৌহতোরণে প্রবেশ করিয়াছে। এখানে শৈল ও শিলাসমূহের দ্বারা দানিউবের গতি পদে পদে প্রতিহত হওয়ার জন্য এইরূপ নামকরণ করা হইয়াছে। এই বাধার জন্য এই অংশে জলযান চালন বিশেষ বিপজ্জনক বলিয়া বিবেচিত হইত। পরে উনবিংশ শতকের শেষভাগে ডিনামাইটের দ্বারা প্রতিরোধ-কারী পাহাড় শ্রেণী ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড সমূহ ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে। ইহাতে দানিউবের এই অংশ জলযান চালনোপযোগী হওয়ায় যাতায়াত ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অনেক সুবিধা হইয়াছে সন্দেহ নাই। কেবল নদীর পার্শ্বের পাহাড় শ্রেণী এখনও দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

লৌহ তোরণের কিছুদূরে সেই "হার্কিউলিস উপত্যকা" যেখানকার হার্কিউলিস বাথ বা স্নানস্থান পৃথিবীব্যাপী প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। চর্ম্মরোগ বিনাশক, স্বাস্থ্য সঞ্চারক, গন্ধকবিশিষ্ট জলের জন্য এই স্নানস্থান রোম্যান যুগ হইতে খ্যাতিসম্পন্ন। স্নানপ্রিয় রোম্যানরা এই গন্ধক সমৃদ্ধ উষ্ণ উৎস সলিলে স্নান করিবার জন্য দলে দলে এই স্থানে আসিত বলিয়া তৎকালে এখানে একটি রোম্যান উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল। রোম্যান, গ্রীক ও তুর্কী, এই তিনেরই প্রাধান্যের নিদর্শন এখানে বিদ্যমান আছে। এই পার্ব্বত্য উপত্যকার দৃশ্য এরূপ চিত্তচমৎকারী যে ভ্রমণ কারীর মন স্বতঃই বিস্ময় বিজড়িত সম্ভ্রমের ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া পড়ে।

ই ডি গেরাড´ তাঁহার "ওয়াটার্স অফ হার্কিউলিস" নামক পুস্তকে এই উপত্যকার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্মানুবাদ আমরা নিম্নে প্রদান করিলাম।

"যেমন লোকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া নভোমণ্ডলস্থ নক্ষত্ররাজির দিকে বা অস্তগামী সূর্য্যের পানে চাহিয়া রহে, তাহাদের নিকট যাইবার স্পর্দ্ধা পোষণ করে না, তেমনই শতকরা ৯৯জন দর্শক নীচে দাঁড়াইয়া উপত্যকার অনুপম সুষমা দর্শন করে। শতকরা ১জন বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া সেই দিব্য দৃশ্য দেখিতে দেখিতে পার্ব্বত্য প্রকৃতির দ্বারা প্রসারিত মায়াজাল বা ইন্দ্রজালের দ্বারা এমনভাবে মন্ত্র-মুগ্ধবৎ হইয়া পড়ে যে আরোহণ না করিয়া থাকিতে পারে না। যেন পর্ব্বতের আত্মা তাহাকে হাতছানি দিয়া আহ্বান করিয়া উঠিতে বাধ্য করে। প্রত্যেক পদে আরোহীকে শ্বাসের জন্য সংগ্রাম করিতে হয় এবং কষ্ট ও চেষ্টার সীমা থাকে না। অবশেষে মায়াপুরীর সীমান্তে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে সকল সংগ্রামের সমাপ্তি ঘটে। আরোহী এইবার স্বচ্ছন্দে, সানন্দে সেই বনানীর বুকে বিচরণ করিতে পারে যাহা তাহার পক্ষে স্বপ্ন বা কল্পনার অতীত ছিল। এখানে সবই বিরাট ও উদার, গভীর ও গম্ভীর। সবই সম্ভ্রমোদ্দীপক। এখানে অন্ধকার নিরানন্দ নাই, কিন্তু গাম্ভীর্য্য আছে। একঘেয়েমি নাই, নিবিড় প্রশান্তি আছে। দর্শকের পদে পদে মনে হইবে, আমার মত মায়ামলিন, পাপপঙ্কিল মানুষের এই প্রকৃতিদেবী প্রস্তুত প্রার্থনাগারে, উপাসনা গৃহে প্রবেশাধিকার নাই। সেই নিসর্গ নির্ম্মিত মহামন্দিরের প্রাকৃতিক স্তম্ভশ্রেণী মণ্ডিত বারান্দা বা অলিন্দের উপর দিয়া আগাইতে ভ্রমণকারী আপনার পদ-ধ্বনিতে আপনি চমকিয়া উঠে। এই পদ-ধ্বনিই সেই নিবিড় নিস্তব্ধতা, সেই গভীর প্রশান্তির মধ্যে একমাত্র শব্দ। পর্ব্বতশীর্ষে শোভমান এই সবুজ অরণ্যানী যেন চিরহরিৎ বর্ণে চিত্রিত একটা বিরাট অর্চ্চনাগৃহ যাহা নিসর্গলক্ষ্মী স্বকীয় করকমলে প্রস্তুত করিয়াছে পরমপুরুষের পাদপদ্মে আত্মনিবেদনের জন্য। পাপপঙ্কিল মানুষের স্পর্শ ইহাকে কলঙ্কিত করিতে পারে বলিয়া পদে পদে শঙ্কা হয়। এই যে শ্যামল মখমল মন্দিরতলে বিছান আছে, ইহা

কামনা-কলুষিত মানুষের দ্বারা পদদলিত হইবার জন্য নয়। পত্র পুষ্পে প্রস্তুত পূজাবেদীর বুকে বায়ুস্তরে স্বর্গ-সুরভি সঞ্চারী এই যে পুষ্পমাল্য, কলাকুশলী প্রকৃতিদেবীর কমনীয় করকমলের এই যে বর্ণবিচিত্র কান্ত কারুকার্য্য, ইহা অপার্থিব দিব্য জগতের অধিবাসীদের জন্য, অপর কাহারও জন্য নহে।"

দানিউব নীল নদের প্রায় দ্বিগুণ জলরাশি বহন করিয়া থাকে। ইহা সম্পূর্ণরূপে ভূভাগ বেষ্টিত এবং প্রায়ই সমগ্র মধ্য-ইউরোপ ব্যাপিয়া প্রবাহিত। হাঙ্গেরীর তিনটি নৈসর্গিক বিভাগ (গ্রেণ্ট আলফলভ, লিটল আলফলভ এবং ব্যাকনী ওয়ালভ) ভেদ করিয়াই ইহা ধাবিত হইয়াছে। সুতরাং হাঙ্গেরীর পক্ষে এই নদের গুরুত্ব বা উপকারিতা অসাধারণ। গ্রেট আলফলভ নামক বৃত্তের প্রান্তরটির বক্ষে দানিউব ও থিজানদী উত্তর হইতে দক্ষিণে সমরেখায় প্রবাহিত হইয়া ইহাকে অত্যন্ত উর্ব্বর করিয়া তুলিয়াছে। পশ্চিম ও পূর্ব্ব হইতে কয়েক নদসমূহ আসিয়া উভয়ের সহিত মিলিত হওয়ার জন্য এই নদীমাতৃক প্রদেশের পক্ষে শস্যশ্যাম হওয়া স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে কৃষিজ সম্পদই হাঙ্গেরীর প্রাণ ধারণের প্রধান অবলম্বন। শস্যের মধ্যে ভুট্টাই সর্ব্বাধিক জন্মায়। তার নীচে গোধূম। তারপর ক্রমান্বয়ে যব, জৈ, রাই, গোল আলু ও বীট; পার্ব্বত্য অঞ্চলে প্রচুর দ্রাক্ষা জন্মায়। কিছু তামাকও এই রাজ্যে উৎপন্ন হয়।

এক সময় হাঙ্গেরী খনিজ সম্পদের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর সাম্প্রদায়িক বা জাতিগত ভেদের ভিত্তিতে যে বিভাগ হইয়াছে, তাহাতে তাহার বহু অংশ করচ্যুত হইয়াছে। চেক, শ্লোভাক, ক্রোট, ওয়ালাচ, রুম্যানিয়ান, পোল প্রভৃতি বহু জাতি এই অঞ্চলে বাস করে। চেক, শ্লোভাক, ক্রোট, শ্লভেন, পোল ইহারা সকলেই শ্লাভ বা শ্লাভনিক জাতির অন্তর্ভুক্ত উপজাতি। ম্যাগিয়াররা মোঙ্গোলীয় পিতৃপুরুষের সন্তান, সুতরাং শ্লাভদের সহিত তাহাদের সম্মেলন সম্ভব হয় নাই। শ্লাভনিক উপজাতিরাই যখন পরস্পর বিবাদ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে দ্বিধাবোধ করে নাই তখন ম্যাগিয়ারদের সঙ্গে তাহাদের মিলনের আশা সুদূরপরাহত। হাঙ্গেরীর যে অংশে ম্যাগিয়ার অল্প, শ্লোভাক বেশী—উহা চেকোশ্লোভাকিয়া দাবী করিলে সে দাবী জাতিসঙ্ঘ কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে। অষ্ট্রিয়ান বলিয়া কোন জাতি নাই। জার্ম্মানরা অষ্ট্রিয়ার প্রধান অধিবাসী।

হাঙ্গেরীয়ান বা ম্যাগিয়ার দম্পতি

হাঙ্গেরীর যে অংশে ম্যাগিয়ার অপেক্ষা জার্ম্মান অধিক উহা অষ্ট্রিয়া লাভ করিয়াছে। ম্যাগিয়ার অপেক্ষা রুম্যানিয়ান বেশী বলিয়া ট্রান্সিলভেনিয়া নামক খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ প্রদেশ রুম্যানিয়া প্রাপ্ত হইয়াছে। শুধু সেই অংশটুকু ম্যাগিয়াররা পাইয়াছে যেখানে তাহারা সংখ্যাধিক। সুতরাং বর্ত্তমান হাঙ্গেরিয়ার আয়তন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ছোট। আমরা বর্ত্তমানে পৃথিবী ব্যাপিয়া বিপরীতধর্ম্ম দুইটি শক্তিপ্রবাহের বিচিত্র অভিনয় দেখিতে পাইতেছি। একটি চাহিতেছে মানুষের চিন্তা ও কার্য্যকে কেন্দ্রিভূত করিয়া বিশ্বমানবমণ্ডলী গড়িয়া তুলিতে, অপরটি চেষ্টা করিতেছে প্রত্যেককে সাম্প্রদায়িক ভেদের ভিত্তিতে পৃথক করিয়া পৃথিবী ব্যাপিয়া অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র সৃষ্টি করিতে। একটিকে কেন্দ্রানুগ এবং অপরটিকে কেন্দ্রাতিগ বলা যায়। শেষ পর্য্যন্ত কোন শক্তি জয়লাভ করিবে কে জানে?

খনিজ সম্পদের দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যেমন উন্নত হয় তেমন আর কিছুতেই নহে। অতীতের হাঙ্গেরী একদিকে কার্পেথিয়ান্স গিরীশ্রেণী এবং অন্যদিকে ট্রান্সিলভেনিয়ার অধিকারী হওয়ায় ইহার খনিজ সম্পদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। টাশ্যারী যুগের লিগনাইট কয়লা প্রচুর পরিমাণে থাকায় এই দেশ কয়লা বেচিয়া বিশেষ লাভবান হইত। বর্ত্তমানে এখানে দুইটি মাত্র কয়লার খনি আছে। একটি সালগো-ট্রাজানে এবং অপরটি পীজ নামক স্থানে। বুডাপেষ্টের উত্তর পশ্চিমে লিগনাইট কয়লার খনি অল্পকাল হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে কিন্তু পুরামাত্রায় কাজ আরম্ভ হয় নাই। লৌহ, লৌহ-প্রস্তর এবং লবণ এত জন্মিত যে যথেষ্ট রপ্তানী করা চলিত। জাতীয় ভেদের ভিত্তিতে বিভাগ হওয়ার পর হাঙ্গেরী এই সম্পদ প্রায়ই হারাইয়াছে। উৎকোউইজ নামক স্থানের লৌহপ্রস্তরখনি ছাড়া কোন খনিই এই রাষ্ট্রে এখন নাই। প্রাকযুদ্ধ যুগে ২০ লক্ষ টন পিগ আইরণ এই দেশে উৎপন্ন হইত। ইহার মধ্যে ৫ লক্ষ টন বিদেশে চালান যাইত।

বর্ত্তমানে হাঙ্গেরীর পক্ষে যে সকল কলকারখানা দেখা যায় তাহারা প্রধানতঃ কৃষিজ পণ্য সম্পর্কীয়। ময়দা প্রস্তুত করিবার কল, বীয়ার ও মদ্য তৈয়ারি করিবার কল, তামাক শুদ্ধীকরণের কল, শর্করা প্রস্তুত করিবার কলই এখানে এখন প্রধানতঃ দেখা যায়। রজ্জু এবং রজ্জু-রচিত দ্রব্য, শণে প্রস্তুত জিনিষ, পশম ও কার্পাস প্রস্তুত পরিধেয় পদার্থ প্রভৃতির কারখানা অল্পবিস্তর আছে। তবে এই সব পণ্য পরিমাণের অল্পতার জন্য রপ্তানী করা আর সম্ভব নহে। যে পশমী ও কার্পাস বস্ত্র ইহারা পরিধান করে তাহার শতকরা ৫ ভাগ মাত্র এই দেশে উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বে উৎপন্ন হইত শতকরা ৪৮ ভাগ। আরণ্য সম্পদের প্রায় শতকরা ৮৬ ভাগ হাঙ্গেরী হারাইয়াছে। বর্ত্তমানে যে সব পণ্য এই দেশ হইতে চালান যায় তাহাদের মধ্যে গম ও ময়দা, বীট-চিনি, তামাক এবং চামড়ার জিনিষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল পণ্যও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কম রপ্তানী হয়। প্রাক্‌যুদ্ধ যুগে শতকরা ৭৪ ভাগ ব্যবসা চলিত জার্ম্মানীর সঙ্গে। এখন প্রধানতঃ ইটালী, রুম্যানিয়া ও সুইজারল্যাণ্ডের সঙ্গে ব্যবসা চলে। বীট বিশুদ্ধীকরণের (চিনি প্রস্তুত করিবার জন্য) যে বিরাট কারখানা হাঙ্গেরীর হাটভান নামক স্থানে স্থাপিত আছে ইউরোপের মধ্যে তাহাই এ বিষয়ে বৃহত্তম বলিয়া বিবেচিত। রাজধানী বুডাপেষ্টে লোহার যন্ত্রপাতি এবং কাঠের আসবাবপত্র প্রস্তুত করিবার যে কারখানা আছে তাহা উল্লেখযোগ্য। এখানকার আরও কয়েকটি স্থানে এই শ্রেণীর কারখানা বিদ্যমান আছে। এক সময়ে যে বস্ত্রশিল্প ও কাগজশিল্প হাঙ্গেরীর অর্থনৈতিক অবস্থার বিশেষ উন্নতির কারণ হইয়াছিল তাহা এই দেশ হইতে প্রায়ই বিদায় লওয়ায় অপূরণীয় আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে সন্দেহ নাই।

দানিউব বক্ষে বাণিজ্য বিস্তারের জন্য বৃটিশ এবং ফরাসী বণিক ও ধনিরাই প্রধানতঃ প্রযত্ন করিয়াছে। অবশ্য তাহারা করিয়াছে স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়াই। লণ্ডন ও প্যারিস হইতে মধ্য ইউরোপের বক্ষ দিয়া প্রাচীতে পণ্য চালান দিবার প্রধান জলপথ এই দানিউব নদ। ৩৭০ মাইল দীর্ঘ একটি পয়ঃপ্রণালী খনন করিয়া দানিউবের সঙ্গে ম্যালনিকার সংযোগ সাধনের জন্য যে সঙ্কল্প ফরাসীরা করিয়াছিল, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে প্রাচীর সহিত প্রতীচীর (মধ্য ইউরোপের মধ্য দিয়া) পণ্য বিনিময়ের অনেক সুবিধা হইবে সন্দেহ নাই।

কাউণ্ট মাইকেল ক্যারলিকে রাষ্ট্রপতি পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া হাঙ্গেরীয়ান জনসঙ্ঘ এই দেশে গণতন্ত্র সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত করে। হাঙ্গেরীর সীমানির্দ্ধারণ লইয়া যে বিতর্ক ঘটে তাহাতে কাউণ্ট ক্যারলি স্বীয় মতের সমর্থন লাভ না করায় পদত্যাগ করেন। ইহার পর এখানে অল্প দিনের জন্য সোভিয়েট শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শাসনতন্ত্রের কর্ত্তারা সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত হাঙ্গেরীকে সংযুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া ব্যর্থমনোরথ হন। বিরোধী দল রুম্যানিয়ান বাহিনীর সহায়তায় ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট এখানে জাতীয় সরকার স্থাপন করে এবং নূতন পরিষদ গঠিত হয়। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন "কম্‌মিউন" ও "কমিটি" এই দুইটি বিভাগে বিভক্ত। কম্‌মিউনের সদস্যগণ ছয় বৎসর অন্তর নির্ব্বাচিত হন।

সর্ব্বাধিক করদাতা ছাড়া অন্য কেহ সদস্যপদে নির্ব্বাচিত হইতে পূর্ব্বে পারিত না। কমিটির সদস্য শহরসমূহে ছয় বৎসর অন্তর এবং গ্রাম্য বিভাগগুলিতে তিন বৎসর অন্তর নির্ব্বাচিত হওয়া নিয়ম। বয়স ২০ বৎসর হইলেই ম্যাগিয়ারদের ভোট দিবার অধিকার আছে।

সেকিউলার রাষ্ট্র বলিয়া সকল ধর্ম্মমত সমান ব্যবহার পাইয়া থাকে। তবে অধিকাংশ ম্যাগিয়ার এখনও রোম্যান ক্যাথলিক। শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে জাতীয়তার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম্মের সহিত উহার কোন সম্পর্ক নাই। ছয় হইতে বারো বৎসর পর্য্যন্ত লেখাপড়া সকলেরই শিখিতে হইবে। প্রত্যেক গ্রামে অবৈতনিক শিশুবিদ্যালয় থাকিবেই। বালক ও বালিকা পৃথক ভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়া এই দেশের নিয়ম। প্রাইমারী বা প্রাথমিক শিক্ষা তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহার পর সেকেণ্ডারী শিক্ষা যাহা আমাদের দেশের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সমকক্ষ। প্রত্যেক সেকেণ্ডারী বিদ্যালয়ে ব্যায়ামশিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। ৮ বৎসরে সেকেণ্ডারী শিক্ষা সমাপ্ত হয়। জাতির যোগ্যতা শিক্ষার উপর নির্ভর করে এই সত্য উপলব্ধি করিয়া ম্যাগিয়ার সরকার প্রত্যেক শিক্ষককে সুশিক্ষা প্রণালী শিখিতে বাধ্য করে। অতীতের বৃহত্তর হাঙ্গেরীতে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যমান ছিল, এখন তিনটি মাত্র আছে, বুডাপেষ্ট, কলজভার এবং ড্রেবেজেন। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবহারশাস্ত্র বা আইন শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা আছে।

আকারে ক্ষুদ্রতর হইয়া গেলেও এই ক্ষুদ্র হাঙ্গেরীর নিকট আমাদের শিক্ষণীয় অনেক কিছুই আছে। পূর্ব্বে জার্ম্মাণদের সঙ্গে বিবাদ প্রায়ই লাগিয়া থাকিত, বিভক্ত হওয়ার পর সেই বিবাদ সম্পূর্ণরূপে বিদায় লইয়াছে। বর্ত্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অধিবাসীদের শতকরা ৯০ জন ম্যাগিয়ার। শতকরা ১০ জন যে অম্যাগিয়ার সম্প্রদায় এই দেশে এখনও আছে তাহারা সংখ্যাধিক্যের সকল কার্য্যে সানন্দে সহযোগিতা করে। সংখ্যাধিকও সংখ্যাল্পের স্বার্থের দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখে। পরস্পর অটুট ঐক্যবন্ধন এবং অনবদ্য জাতীয় শিক্ষা প্রণালী ম্যাগিয়ার জাতির এই দুইটি আমাদের পক্ষে সর্ব্বথা অনুকরণ যোগ্য।

ম্যাগিয়ারদের পরিচ্ছদ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া আমরা বিদায় লইব। অঞ্চল ভেদে পরিচ্ছদের কিঞ্চিৎ ভিন্নতা লক্ষিত হইলেও, পরিচ্ছদ বাহুল্য সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে। বর্ণরাগের দিকে ম্যাগিয়ারদের বিশেষ লক্ষ্য আছে। জরিদার জমকালো পোষাক ইহারা ভালবাসে। আঁটা ওয়েষ্ট কোটের উপরে ভেলভেটের ঢিলা অঙ্গাবরণ ইহারা পরিধান করে। সোনালি ঝালরযুক্ত জুতা ইহাদের প্রিয়। পশুলোমে বা পক্ষীর পালকে মণ্ডিত টুপি উৎসবের সময় ইহারা পরিধান করিয়া থাকে। মহিলাদের পরিচ্ছদের বর্ণ বৈচিত্র্য ও চাকচিক্যও লক্ষ্য করিবার বিষয়। উপরের অঙ্গাবরণটিতে নানারকম কারুকাজ করা ম্যাগিয়ার নারীদের নিয়ম। নারীরা টুপির পরিবর্ত্তে চিত্রিত রুমাল মাথায় বাঁধিয়া রাখে। মধ্য ইউরোপ ও বল্কান রাষ্ট্রের প্রায় সর্ব্বত্রই এইরূপ প্রথা।

আমরা লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইব আফগানিস্থান হইতে যে জাঁকজমকযুক্ত পরিচ্ছদ ও পরিচ্ছদ বাহুল্য আরম্ভ হইল তাহা শেষ হইয়াছে ম্যাগিয়ার জাতি অধ্যুষিত হাঙ্গেরীতে। পাঠানদের পোষাকের সঙ্গে ম্যাগিয়ারদের পোষাকের সাদৃশ্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। উভয় জাতির জীবনে সঞ্চারিত মোঙ্গোলীয় ও তুর্কী প্রভাব এই সাদৃশ্যের কারণ, সে বিষয়েও সংশয় থাকিতে পারে না।

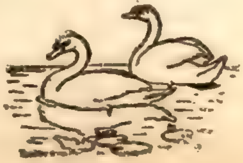

বোবা কান্না

নেপাল মুখোপাধ্যায়

কয়লা ভাঙতে ভাঙতে চক্ষুর সামনে যদি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটতো তাহলেও এতো অবাক হতো না পূর্ণশশি। রান্না করছিল এতক্ষণ, কয়লা ফুরিয়ে গিয়েছিল উনুনে, অই পেছন ফিরে তারই যোগাড় ক'রছিল সে। ভাবতে কি পেরেছিল, হঠাৎ ঠিক দিন দুপুরে এমন একটা কাণ্ড ঘটে যাবে? যা তার মনের মধ্যে গাঁথা থাকবে অক্ষয় হয়ে?

প্রথমটা এক ঝলক বিস্ময় এসে রাঙিয়ে দিল মুখটা, খোঁপা থেকে এলিয়ে পড়লো বাসি চুলের গুচ্ছ আর পূর্ণশশি হতচেতনের মত তাকিয়ে রইল সামনে। তার পর যেন নিজের অপরাধ বুঝতে পেরে একগাল হাসতে হাসতে বললে, ও মা আমার কি হবে গো—আমি আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলুম!

অতিথি। অনেকদিন পরে পূর্ণশশির ঘর হল জম-জমাট। পূর্ণশশি যেন মাটীর তল খুঁজে পেলো না।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো ছিটের ছেঁড়া জামা পরে দরজার ফাঁক দিয়ে তাকাচ্ছে। পূর্ণশশির আঁচল ধরে জানতে চাইছে পরিচয়।

ও মা, এ যে তোর মাসীমা হয়, আপন মাসীমা। যা যা, নমস্কার কর একটা। এতক্ষণ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিল কাজল। স্বামী আর ছেলেকে পেছনে দাঁড় করিয়ে মজা দেখছিল। এবার একটু নড়েচড়ে উঠলো, একটু হাসলো ঠোঁট বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে। মনে হল ও যেন তার মায়ের পেটের বোন নয়, ও যেন খুব দয়া করে পায়ের ধুলো দিয়েছে গরীবের বাড়ী। বুঝতে পারলো পূর্ণশশি। তার উদ্বেলিত অভ্যর্থনা মিইয়ে এল তাই, আবহাওয়াটা হঠাৎ যেন ঘোমটা টেনে দিল ফরসা মুখের ওপর। বসলো কাজল তক্তোপোষে, বললো, এই বুঝি তোর বড় মেয়ে, কত বয়স হল রে এখন?

—সতেরোয় পড়লো আর কি।

বাব্বা, ছেলেটেলে খোঁজ করছিস তো?

ছেলে—এবার কাঁদতে ইচ্ছে করে পূর্ণশশির। চোখের কোলে টলটল করে ভাঙা নদীর বন্যা। বুক ঠেলে বেরিয়ে আসে প্রকাণ্ড একটা দীর্ঘনিশ্বাস। প্রায় কাঁদতে কাঁদতেই বলে: ছেলে তো দেখছিলুম অনেকগুলো; কিন্তু হোল না।

তাই বলে বসে থাকবি চুপ করে? জামাইকে বাইরে পাঠিয়ে দে, যা হোক একটা ব্যবস্থা করে ফেলুন।

প্রায় ভেঙে পড়লো পূর্ণশশি: তোমার হাতে যদি কোন ছেলে থাকে দিদি···

আছে একটা। তবে···

এবার হোঁচট খাওয়ার পালা। একটা বিরাট চোখ ধাঁধাঁন টাকার অঙ্ক হতচেতন করে দেবে সর্ব্বাঙ্গটা। পূর্ণশশি কথা বলতে পারে না। কেবল চেয়ে থাকে গীতার দিকে। এত বড়ো যোয়ান মেয়েটা যে চোখের সামনে নেতিয়ে যেতে থাকবে তা যেন কল্পনাই করা যায় না। দুঃখে আর বেদনায় হু হু করে উঠলো মন। অনেক দিন পরে দিদির সামনে প্রাণভরে কাঁদতে ইচ্ছে করলো।

তাড়াতাড়ি উঠে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল পূর্ণশশি। দেখলো বুড়িমা বসে বসে কাঠ দিচ্ছে উনুনে—আর পারলো না, উচ্ছ্বসিত হয়ে ভেঙে পড়লো সেখানে।

ওমা তুমি কাঁদছ? বাড়ীতে কুটুম এসেছে আর তুমি এখানে কাঁদছ কি গো? তারপর এগিয়ে এসে মাথায় হাত দিয়ে বলে: ও তোমার কে হয় গো।

আমার বড় বোন।

তা যাও, একটু তদ্বির করো গে। একলা বসে আছেন ওঁরা। পূর্ণশশি ওঠবার চেষ্টা করে না। হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে থাকে চুপটি করে। কি করবে সে; এখন সে কি করতে পারে?

বর কোথায় ?

পড়াতে গেছে, আসবে এখুনি।

তা যাও একবার ওঠ। ভাত চাপাও।

এবার যেন ডুকরে কেঁদে উঠলো পূর্ণশশি। কাঁদতে কাঁদতে বললে, আচ্ছা বলুন তো, এ সময় কি দিদির উচিত হয়েছে আমাদের বাড়ী আসা! জানছে, এই দিনে রেশনের চাল ফুরিয়ে যায়।

চুপ চুপ, ও কথা বলতে নেই। শুনতে পাবে যে। তারপর একটু থেমে বললে, : দেখ্‌ দিকিনি স্বপুর মার কাছে। ওদের তো কটা বেশী কার্ড আছে; হয়তো চাল থাকতে পারে।

তুমি একটু যাওনা বুড়ী মা ?

ও বাব্বা, যা মেয়ে ঘরে আছে ; না না, আমার দ্বারা হবে না। তুমি গেলে বরং দিতে পারে।

উঠলো পূর্ণশশি।

অনেককাল পরে আবার কথা বলবে স্বপুর মার সঙ্গে। কথা বলতেই হবে, আর আশ্চর্য্য—এই কিছুদিন আগেও পূর্ণশশির চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরিয়েছিল, হাত-পা কাঁপছিল দুর্দ্দমনীয় ক্রোধে। মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল প্রতিজ্ঞার ঝড়: ভগবান আছেন, দেখছেন সব। ঠেস দিয়ে দিয়ে কথা বলা, রাত বিরেতে গণ্ডগোল করা কখনই সহ্য করবেন না ভগবান। সেদিন হাঁপিয়ে উঠেছিল পূর্ণশশি—এতবড় জলজ্যান্ত মানুষটার সূক্ষ্ম বিষাদ অনুভূতি তাকে পাগল করে তুলেছিল। সে যেন প্রথম অনুভব করেছিল, শরীর তার দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে, হাড়ের ভেতরে ঘুন ধরতে আরম্ভ করেছে। বুড়ীমার কাছে কেঁদে গিয়ে বলেছিল, কি করবো, আমি কি করবো বলো তো ? ভাড়া দিয়ে বাস করি বলেই কি বানের জলে ভেসে এসেছি! রাত বারোটা নেই, একটা নেই গান বাজনা লেগেই আছে। বলতে গেলে বলে, না পোষায় উঠে যাও। আচ্ছা, তোমরাই বলো, এটা কি বাড়ীউলির মত কথা হলো!

সেই স্বপুর মা। ওপর নীচে ভাঙা পুরোন চলচলে চারচারখানা ঘরের মালিক।

পূর্ণশশির মুখ কালো মেঘে থমথম। বুকের অণুতে অণুতে কেমন এক অস্বাভাবিক কাতরতা।

ভাড়াটে—আর পাঁচজনের মত তাকেও হয়তো অন্য কোথাও চলে যেতে হবে।

কাঠের সিঁড়িটা ককিয়ে ওঠে। ভয় পায় পূর্ণশশি। মনে হয় নিজের অজান্তে যেন কেঁদে ফেলেছে আবার। স্বপুর মা বুঝি ধরে ফেলেছে তার কান্না। ঘাড় উঁচু করে ওপরে তাকাল পূর্ণশশী। নির্ব্বাক, নিস্পন্দ। দেখলো সামনেই দাঁড়িয়ে আছে স্বপুর মা। যেন বলছে: ঘরে দেখছি নতুন মানুষ। কারা গো ?

লজ্জায় যেন মরে গেলো পূর্ণশশি। এই অযাচিত আমন্ত্রণ পুড়িয়ে মারলো সর্ব্বশরীর, জ্বালা ধরিয়ে দিল মনে। দুঃখে আর বেদনায় তর তর ক'রে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এল পূর্ণশশি।

নেমে এসে দেখলো অভয়বাবু বিড়ি টানছেন তক্তো-পোষে আর বিকাশবাবুর ঠোঁটে রয়েছে সিগারেট। কথা বলছেন তারা। নিজের নিজের কথায় একেবারে মিশে গেছেন পরস্পরে।

পূর্ণশশিকে দেখে কাজল অবাক হয়ে গেল। বললে: হ্যাঁরে, কোথায় গিয়েছিলি ? এতদিন পরে এলাম, কোথায় গল্পগুজব করবি, তা নয়, কেবল রান্নাঘর আর কাজ। বলি রাঁধলে কি চুলও বাঁধতে নেই ?

পূর্ণশশি বোবা।

কাজল বললে: চল একদিন আমার বাড়ী। এলগিন রোডে। দেখবি কত গাছ-গাছড়া আর পাখী-পোক্ষের সখ তোর জামাইবাবুর। চল, আজই বিকেল-বেলার দিকে।

ওদিক থেকে বিকাশবাবুর গলার স্বর শোনা গেল।

: হ্যাঁ, যাবে বল্লেই যেন যাওয়া হয়। বাচ্ছা-কাচ্ছাদের দেখবে কে ?

: হ্যাঁ, তাও তো, ছেলেপিলেদের নিয়ে যাওয়াও একটা ঝন্‌ঝাট। তারপর চেপে চেপে হাসতে লাগলো কাজল: হেঁ হেঁ, ও সব কি যে সে ঝাড়ী। সব সময় ঝক্-

ঝক্‌ তক্‌তক্‌ করছে ; একটু নোংরা হবার উপায় নেই। হাজার হোক অফিসার তো!

: অঁ্যা, লাফিয়ে উঠলেন অভয়বাবু : ভায়া আমাদের অফিসার হয়েছো ? তা তো আমাদের বলোনি এতক্ষণ ?

: ও মা, বলবে কি গো, সাজপোষাক দেখে—

: কাজল—মিনতি করলেন বিকাশবাবু : বড্ডো বাড়াবাড়ী হচ্ছে না ?

মাঝ পথে থেমে গেলো প্রচণ্ড উদ্দীপনা। কাজলের চোখ দুটো স্তিমিত হয়ে এলো। মাথাটা ঝুলে পড়লো বুকের কাছে আর কেমন যেন অভাবনীয় ভীতি মুচড়ে দিল কাজলের সর্ব্বাঙ্গ।

কি হয়েছে ? স্বামী অফিসার হয়েছে স্ত্রীর বুক গর্ব্বে দশহাত হবে না! অভয়বাবু বিড়ি ধরালেন : মনে করো আজ যদি আমি নেহাৎ স্কুলমাষ্টার না হয়ে অন্য কিছু হতাম তাহলে দেখতে তোমার ঐ শালির মুখ··· হঠাৎ থমকে পড়লেন অভয়বাবু। তাকালেন পূর্ণশশির দিকে।

কাঁদছে। মুখে কাপড়চাপা দিয়ে বুকভাঙ্গা কান্নার দমকা বাতাস প্রশান্ত করার চেষ্টা করছে। কিন্তু বেশ জানেন অভয়বাবু, পারবে না। কাঁদতেই হবে পূর্ণশশিকে। ফুলে ফুলে চোখে একফোঁটা জল না এলে কেঁদেই চলতে হবে, তারপর উঠে যেতে হবে বাইরে। কিন্তু আশ্চর্য্য, আজ আর বাইরে বেরিয়ে গেল না পূর্ণশশি। নির্লজ্জের মত পাঁচজন মানুষের সামনে কাঁদতেই থাকলো। অভয়বাবু বারান্দায় ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন : দেখো না বাড়ীউলির কাছে। বোধহয় চাল পাওয়া যাবে।

আমি পারবো না, ও মাগীর কাছে হাত পাততে পারবো না কিছুতেই।

তাহলে হবে কি করে ?

আমি কি জানি!

দুর্দ্দমনীয় ক্রোধে এখনি হয়তো থান্‌ থান্‌ হয়ে পড়বে পূর্ণশশি। এতক্ষণের স্তিমিত আগুন হয়তো জ্বলে উঠবে নতুনভাবে। ফোলা ফোলা চোখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে কথা বলতে পারলেন না অভয়বাবু। এমনকি সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে আসতেও পারলেন না। আতংকে আর অনুশোচনায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন সেখানে। এমন সময় কাজল এলো বেরিয়ে, বললে : চল্‌, তোদের বাড়ীটা একটু ঘুরে আসি।

ডানদিকের একচিলতে বারান্দাটা কায়েমীভাবে দখল করেছে বাড়ীওলার ভাইপো। মনে পড়ে, একদিন সন্ধ্যে-বেলায় পাশের ঘরের খিট্‌খিটে বিধবাটা সকলকে জানিয়ে দিলে তারা ঘর পেয়েছে। ঠন্‌ঠনে কালিতলার কাছে কেতাদুরস্ত দু-খানা ঘর। আর সংগে সংগে ফিসফাস কথা শোনা গেল—পাগলা কাকাকে ঠকিয়ে ভাইপোরা ঘর দখল করবে। আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল পূর্ণশশি। পার্টিশনের পাঁচিল ভেঙ্গে সদ্য একটা পরিবার বিনা ভাড়ায় বেশ দিনের পর দিন কাটিয়ে যাচ্ছে আর তারা ভাড়া গুনছে পঁচিশটা টাকা।

পূর্ণশশি কাজলকে নিয়ে দেখায় বাড়ীখানা, যেন আর একটা ভাড়াটে এসেছে। মুখ কুঁচকিয়ে থুথু ফেলতে ফেলতে বলে কাজল : মাগো কি করে থাকিস্‌ তোরা এখানে ?

কি করবো দিদি, বাড়ীওলা সারিয়ে দেবার গা করে না।

কিন্তু এই নোংরার মধ্যে বাস করলে অসুক করবে যে!

সে কি আর পূর্ণশশি বোঝে না ? বর্ষার দিনে যখন ছাদ ফুড়ে ঝর ঝর করে জল পড়ে বিছানায়, তখন মনে মনে অভিসম্পাত দেয় বাড়ীওলাকে ; ইচ্ছে করে ঘাড় ধরে নীচে নামিয়ে এনে দেখায় কাণ্ডখানা ; কিন্তু কোন-দিন পারেনি পূর্ণশশি। স্বামীকে খোসামোদ করেছে বারবার ; জবাব পায়নি কিছু।

ভাইপোর বউ জোর করে দখল করা ঘরে বসে নভেল পড়ছে। রতিজীবন। সেখানে গিয়ে একটু উঁকি মেরে বললে কাজল : এটা বুঝি আপনারা ভাড়া নিয়েছেন ?

না, এটা নিজেদের ঘর।

খিল খিল করে হাসতে ইচ্ছে করলো পূর্ণশশির। বলবে নাকি ঘর দখল করার ইতিহাস ? বেআইনীভাবে পাঁচীল ভেঙে পাগলা কাকাকে ঠকিয়ে দেবার ইতিহাস ? কিন্তু না থাক। একমাসের ভাড়া বাকি আছে এখনও। কথাটা বলা উচিত হবে না।

বাড়ীউলী ওপর থেকে নেমে এল। কোলে একটা বাচ্চা।

এই বুঝি তোমার দিদি? তা বেশ, কোথায় থাকা হয় আপনাদের?

এলগিন রোডে। নিজের বাড়ী।

নিজের বাড়ী? অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে কাজলের দিকে। স্বস্তি পায় না। কোন আলোড়ন নেই সেখানে। মনে হয় কথাটা বলে তৃপ্তি পায়নি কাজল, মোটেই শান্ত হতে পারেনি। মনে হয় মস্ত বড় একটা ফাঁক থেকে গেছে। কোলকাতা শহরে একটা গোটা বাড়ীর মালিকের বোন পূর্ণশশি? কথাটা ভাবতে একটু আশ্চর্য্য লাগে বৈকি! পূর্ণশশি কিন্তু স্থির হয়ে দাঁড়াতে পাচ্ছে না। দিদিকে বলবে নাকি ওদের বাড়ীতে যেমন তেমন একটা ঘর ছেড়ে দিতে। আজকালকার বাজারে ছেলেপুলে নিয়ে মাস মাস পঁচিশ টাকা ভাড়া গোণা কি মুখের কথা! মাসের অর্দ্ধেক না হতেই পয়সা ফুরিয়ে যায়, জমান তো দূরের কথা। কিন্তু যতই তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো ঝকঝকে একটুকরো ঘর, ততই সেটা ফ্যাকাশে হয়ে আসতে লাগলো; তারপর কখন যে সে নিজের ঘরে চলে এলো তা নিজেই জানতে পারলো না। দেখলো বাড়ীউলি দাঁড়িয়ে আছে আর ফিসফিসিয়ে বলছে তার কানের কাছে: এই তালে চেয়ে নাও না কিছু টাকা। ওমাসের বাকি ভাড়াটা শোধ হয়ে যাবে'খন।

পূর্ণশশি এবার ঝংকার দিয়ে ওঠে: ভাড়া দেবো না। ইচ্ছে হয় নালিশ করো গে। এক পয়সাও আমি ভাড়া দেবো না।

আজ আর কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে এগিয়ে এলো না বাড়ীউলি। আর আশ্চর্য্য, আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে। বড় মেয়ে এসে বললে: মা, বাবা মাংস এনেছে। ভাতও হয়ে গেছে।

ভূত দেখে চমকে উঠলো পূর্ণশশি: হয়ে গেছে? চাল পেলি কোত্থেকে?

নবৌদির কাছ থেকে ধার করলুম চার কৌটো।

কত ধার করবি? ওদিকে তিনসের পাওনা আছে। তারপর একটু থেমে বললে: মাংস আবার আনতে গেলো কেন? মোটে ভাত পায় না আবার মাংস। ভারী আমার সাতপুরুষের নাউখোলা।

সত্যিই তো, এই অভাবের সংসারে জেনেশুনে মাথা গলাবার কি দরকার ছিল! এক পয়সা দেবার মুরোদ নেই, একবেলার খরচ টেনে নিয়ে যেতে ওস্তাদ। নতুন বাড়ী করেছে, স্বামী অফিসার হয়েছে, কত ঢং। এতদিনে জানাবার দরকার হলো। কেন, পূর্ণশশি কি বোন নয়? অথচ?···

তাড়াতাড়ি পূর্ণশশি টীনের বাক্সটা খুলে ফেলল। অনেকদিনের ভাঁজ করা এক চিঠি থমকে দাঁড়াল চোখের সামনে: জানো আজ দুদিন আমরা শুকিয়ে রয়েছি। তোমার দিদি কিছুতেই চিঠি লিখবে না। ভারী একগুঁয়ে। বলে, ছোটবোনের কাছে মাথা নোয়াবো কেন? তাই লুকিয়ে তোমায় চিঠি লিখছি। ছোট ছেলেটা মাটীতে শুয়ে শুয়ে কাঁদছে খুব! তোমার দিদির বুকে দুধ নেই। পারো কিছু টাকা পাঠিয়ে দিতে? বাঁচাতে পারো তোমার কাজলাদিদিকে?

চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে দেয় পূর্ণশশি। কাজলদির ওপর ক্রোধে ফেটে পড়তে চায়। একটা অব্যক্ত বেদনা কুরে কুরে খেতে থাকে সর্ব্বশরীর। তীরলাগা কেউটে সাপের মত মেঝেতে গুটিয়ে গজরাতে থাকে পূর্ণশশি।

অভয়বাবু আসেন। চারিদিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলেন: দেখো, আমার জন্যে বেশ বড়ো বড়ো চার টুকরো মাংস লুকিয়ে রেখো, বুঝলে?

গজরে ওঠে পূর্ণশশি: ফের তুমি ধার করতে গেলে? বার বার বলেছি, অত জড়িয়ে পোড়ো না। পুলিশ এসে যখন পাঁচজনের সমনে অপমান করতে করতে হাতে দড়ী দেবে তখন কোথায় থাকবে মান-সম্ভ্রম?

হাসতে হাসতে বলেন অভয়বাবু: দেখো না, সব আজ আদায় করবো তোমার ঐ কাজলাদির কাছে। অত বড়লোক, দেখবে বিপদের কথা বললে টাকা দিতে পথ পাবে না। সাধে কি আমি খরচা করছি!

খানিকক্ষণ পরে স্নান সেরে ফিরে আসেন বিকাশবাবু।

খেতে বসেন; গোগ্রাসে গিলতে গিলতে প্রায় আধসের চালের ভাত খেয়ে নেন।

ওদিকে সমানে বকে চলেছে কাজল: আমাদের একটু ভাল খাওয়া দাওয়া অভ্যেস।

কি হচ্ছে কাজল? অত বাড়াবাড়ি কি ভাল? ভাত চিবুতে চিবুতে অস্পষ্ট উচ্চারণ করেন বিকাশ বাবু। কাজলের সজল চোখে আসে অস্বাভাবিক জিজ্ঞাসা। কিছু সে প্রশ্ন করতে চায়, কিছু জানাতে চায় সকলকে। আসল একটা কিছু। কিন্তু সারাক্ষণ অশান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও কেমন যেন জুড়িয়ে যায়—মিইয়ে যায় ভেতরের ভাষা। আস্তে আস্তে সরে আসে পূর্ণশশি।

শরীরটা ভয়ানক জ্বালা করছে, রক্তের কনিকাগুলোতে উষ্ণ প্রস্রবনের স্রোত পুড়িয়ে দিচ্ছে সর্ব্বাংগ। হয়তো এবার ফেটে পড়বে, হয়তো অমানুষিক জোরে চিৎকার করে উঠবে পূর্ণশশি। কিন্তু আশ্চর্য্য, গলাটা কে যেন টিপে ধরেছে, ক্রমশঃ শ্বাস রোধ হয়ে আসছে। ঠোঁট কাঁপছে থরথর করে।

গর্ব্ব।

দিদির সেই চিরন্তনী গর্ব্বের অগ্নিস্ফুলিংগ মাটির সংগে মিশিয়ে দিচ্ছে পূর্ণশশিকে। আর সেটা বাইরে প্রকাশ করতে পারছে না বলে মন কাতরাচ্ছে যন্ত্রনায়, চোখের দৃষ্টিতে এসেছে কাতরতা।

ভয়ে উঠে পড়ল কাজল। দরজার দিকে তাকিয়ে দেখলো কবিরাজের বউ দাঁড়িয়ে আছে ঠেস দিয়ে। বললে: বর বুঝি আসেনি এখনও?

না, উনি আসেন একটায়। ততক্ষণ বারোটার কলে জলটল তুলে নিই, বাড়তি কাজকর্ম্মও সেরে রাখি।

বাঃ. তুমিতো খুব কাজের মেয়ে।

মুখ নীচু করলো বউটি।

স্বামী ভক্তি। আজকালকার মেয়েরা আবার ভক্তি করে নাকি? কই কাজল তো কোনদিন করতে পারেনি? দশটায় পাঁচটায় হাতপাখা নিয়ে খাবারের সামনে বসে থাকতে পারেনি।

কাজলের চোখ সজল হয়ে উঠলো। মনের পাণ্ডুলিপি ছুঁয়ে ছুঁয়ে বিবর্ণ এক ঘটনা বারবার বিপর্য্যস্ত করে দিতে লাগলো বর্ত্তমান পরিবেশ।

কই কাজল তো কোনদিন ভক্তি করেনি বিকাশ-বাবুকে? কবিরাজের বউয়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেমন যেন বিভোর হয়ে যায় কাজল। যতক্ষণ না পূর্ণশশি এসে ঝাকানি দেয় ততক্ষণ যেন জ্ঞানই ফিরে আসে না।

এখানে দাঁড়িয়ে কি করছো? চলো, ভাত বাড়া হয়েছে। চমকে উঠলো কাজল। ভাত বাড়া হয়েছে? আঃ, বাঁচলাম। যা ক্ষিদে পেয়েছিল। একটা লোভাতুর দৃষ্টি ক্রমশঃ এগিয়ে আসে পূর্ণশশির দিকে। ভাতের কথা শুনে পেটের ভেতর মোচড় দিয়ে ওঠে সাংঘাতিক। এক-রকম ছুটতে ছুটতেই কাজল চলে যায় ভেতরে।

কলের জল এসে গেছে। আসেপাশে উপর নীচ থেকে এক একটা বালতি নিয়ে একজোট হচ্ছে সবাই। আজ আর ঝগড়া-ঝাটি নেই। আগে পাছে নিয়ে দর কষাকষি নেই। দম দেওয়া পুতুলের মত সবাই আসছে যাচ্ছে আর কথা বলছে উচ্ছসিত সুরে।

পূর্ণশশিকে অমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে উপদেশ দিলে বাড়ীউলি।

হ্যাঁ লা পুণ্য, নে না কিছু টাকা চেয়ে! বাজারে যে ধার দেনা করে রেখেছিস সব শোধ হয়ে যাবে। আবার নিশ্চিন্তে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে পারবে অভয়বাবু।

হ্যাঁ, নেবেই তো। সকলে সায় দেয় এ কথায়। ইচ্ছে করলে দশ বিশ পঞ্চাশ টাকা খয়রাতি করা কাজলের পক্ষে কিছুই অসুবিধা নয়। প্রথমে ধার হিসেবে নাও, পরে পয়সা হলে আস্তে আস্তে শোধ দেওয়া যাবে। এ তো আর ভিক্ষে চাওয়া নয়। আর মায়ের পেটের বোন যখন, বোনের বিপদে একটু উপকার করতে পারবে না?

ছ্যার ছ্যার করে জল পড়ছে চৌবাচ্ছায়। কলতলার ভাঙা চাতালটায় যে ছোট ছোট আমের চারা হয়েছে তাতে মিষ্টি হাওয়া এসে লাগছে। ছাদের কার্ণিস ঘেঁষে বারোটার একফালি রোদ পিছলে পড়ছে ধোঁয়াধরা বারান্দার আনাচে কানাচে। ওপাশে ময়লার টব থেকে উপছে পড়ছে এঁটো কলাপাতা। আজ

পূর্ণশশির ঘরে মাংস এসেছে। মশলা দেওয়া মাংসের কুচি এখনও লেগে রয়েছে কলাপাতাগুলোতে। অনেকদিন পরে ওপর নীচের ভাড়াটেগুলো প্রাণের কথা বলতে পারলো। যেন এতদিন ধরে চলছিল একটানা অস্বস্তি। আজ যেন হঠাৎ একঝলক মিষ্টি হাওয়া সেই ঘুমকাতুরে মেঘটাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল। তারা কথা বলতে পারলো না আনন্দে, কেবল এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করেই সময় কাটাতে লাগল।

পুণ্যদের আজ খাওয়া হবে ভাল।

হ্যাঁ, অনেকদিন পরে এককুচি করে মাংস পড়বে বাচ্চাগুলোর পেটে।

কিন্তু আশ্চর্য্য, সকলের শেষে ভাত খেতে গিয়ে দেখলো পূর্ণশশি মাংস তো নেইই, এমন কি ভাতও কম পড়বে। মাথার রক্ত গরম হয়ে উঠলো। টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে আছাড় খেয়ে পড়লো রক্তকনাগুলো। অতিথির কথা ভুলে গেলো পূর্ণশশি, ভুলে গেল মান-সম্ভ্রমের কথা। রাগে দুঃখে অভিমানে ডুকরে কেঁদে ওঠবার চেষ্টা করলো। পারলো না। শুকিয়ে গেছে চোখের জল। কেন এত ভাত খেলো? কেন ভাবলো না আর একজনের কথা? মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সারাদিন ছোটাছুটী করে পায়ের কাছে হাত পেতে চাল যোগাড় করলো যে, তাদের কথা কেন ভাবলে না কাজলাদিদি? কেন⋯কেন?

আগুনচোখে সামনের দিকে তাকায় পূর্ণশশি। কাজলকে সামনাসামনি পাবার আশায় তক্তাপোষের কাছে এগিয়ে আসে। কিন্তু হঠাৎ ধাক্কা খায় প্রচণ্ড।

ঘুমুচ্ছে ওরা। পেটপুরে খাবার পর পরম শান্তি। বুকের কাপড় খুলে দিয়েছে কাজল। ভেতর থেকে ঠেলে বেরুচ্ছে হাড় কখানা।

পাণ্ডুর মুখে কেমন প্রশান্ত শান্তি। অনেকদিনের বাক্সে তোলা কাপড়খানা এলিয়ে পড়ছে ঘাড়ে মাথায় চুলে। বুকের খালি জায়গায় তাকিয়ে দেখে আঁৎকে ওঠে পূর্ণশশি। মাত্র ছ-মাসের মধ্যে ভয়নক রোগা হয়ে গেছে দিদি। এত রোগার কথা চিন্তা করতে ভয় পায়। তাই উদ্বেলিত হয়ে ওঠে মন। সমস্ত ক্রোধ জুড়িয়ে জল হয়ে যায়। ক্রোধের বদলে আসে করুণা, ব্যর্থতার বদলে জুড়ে বসে বেদনা। ঘুমন্ত কাজলের মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে এবার সত্যি সত্যিই ডুকরে কেঁদে ওঠে পূর্ণশশি।

কেন এমন হোল? কে তোমাকে করলে এমন রোগা? এই না বলেছিলে তোমার স্বামী অফিসার, এই না বলেছিলে তোমাদের অনেক টাকা, তবে কেন তুমি এত রোগা হয়ে গেলে?

চোখের সামনে সমস্ত ঘরটা ঘুরতে আরম্ভ করেছে। পায়ের তলা থেকে চটাওঠা সিমেণ্টের মেঝেটা তলিয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ। হয়তো এখনই জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে, হয়তো চেতনাহীন অনুরণন্ শুরু হবে সমস্ত মাথাটা জুড়ে। দেওয়াল ধরে ধরে বসে পড়তে চেষ্টা করে পূর্ণশশি। পাগলের মত চলে যায়: এমন করে ঠকাবার কি দরকার ছিল! বলতেই তো পারতে তুমি,—রক্তে তোমার ভাটা পড়তো না; মহাভরতও অশুদ্ধ হয়ে যেতো না।

হঠাৎ নজর পড়ল—কাজল উঠে বসেছে। অবাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখছে চারদিকে। কথা বলতে পারছে না কাজল। কেবল চোখ দিয়ে অঝোর ঝরে গড়িয়ে পড়ছে জলের ধারা।

পূর্ণশশি আবার অনেকদিন পরে নতুন করে কাঁদতে দেখলো কাজলকে।

বৌদ্ধ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য শিল্পের অঙ্কুর

অসীম মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের ইতিহাসে বৌদ্ধধর্ম এক নবযুগের সূচনা করেছিল। এমন কি একথাও বললে বোধহয় অসঙ্গত হবে না যে, আর্যভারতের শিল্পসৃষ্টির আদি বিকাশ হল বৌদ্ধ সংস্কৃতির উন্মোধনে। অবশ্য ভারতের আদিম বা অনার্য সমাজের সভ্যতা ও কৃষ্টি ভারতীয় শিল্পকে বড় কম প্রভাবিত করেনি। এর এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন অনার্য দেবতা নটরাজের নৃত্য ও ভাস্কর্যশিল্পের মধ্যে আর্যভারতের লোকোত্তর রসানুভূতির সাগ্রহ সন্ধান। ভারতীয় শিল্প, বিশেষ করে স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যশিল্পের উপর গ্রীক সংস্কৃতি যে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল, তাও অস্বীকার করবার উপায় নেই। তবে গ্রীকশিল্পই ভারতীয় শিল্পের উৎস, এ মতবাদ বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় পণ্ডিতরা স্বীকার করবেন না। ভারতীয় নাট্যকলার উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে অনেকেই মন্তব্য করেছেন যে, ভারতীয় রঙ্গমঞ্চে ব্যবহৃত 'যবনিকা' শব্দটি 'যবন' শব্দ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। Ionia-র গ্রীকদের নামানুসারে Ionian শব্দটি থেকে যবন শব্দের উৎপত্তি হলেও ম্লেচ্ছাচারী বিদেশী মাত্রকেই যবন নামে অভিহিত করা ছিল ভারতীয় সমাজের রীতি। সিল্‌ভাঁ লেভি'র মতে, যবনদের (বিদেশীদের) দ্বারা পারস্য দেশ থেকে আনা পর্দাকে 'যবনিকা' বলা হত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যবনের সঙ্গে যবনিকা শব্দের কোন সম্পর্কই নেই। যবনিকা শব্দের উৎপত্তি 'যমনিকা' শব্দ থেকে, প্রাকৃতে এর রূপ 'জবনিকা', পরে 'জ' পরিবর্তিত হয়ে সংস্কৃতে 'যবনিকা' হয়েছে। ভাস, কালিদাস, ভবভূতির নাটকে যবনিকার উল্লেখই নেই। যবনিকার প্রথম উল্লেখ দেখা যায় রাজশেখরের 'কর্পূরমঞ্জরী'তে।

যাই হোক, ভারতীয় নাট্যকলার উৎপত্তি আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়, তবু এত কথা বলার কারণ শুধু এই যে, আমরা স্বাধীনভাবে গবেষণা না করে য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের মতবাদকে সম্পূর্ণ নির্ভুল বলে মেনে নিয়ে আজও অনেক ভুল ধারণা পোষণ করছি।

গান্ধার, কম্বোজ প্রভৃতি অঞ্চলের প্রাচীন ভাস্কর্যশিল্পের উপর গ্রীক শিল্পাদর্শের প্রভাব একথা প্রমাণ করে না যে, ভারতীয় ভাস্কর্য বা স্থাপত্যশিল্পের জন্ম গ্রীক সভ্যতার স্পর্শে। বস্তুতঃ ভারতীয় শিল্পের অঙ্কুরোদ্গম হয়েছিল ভারতেরই সরস মাটিতে। প্রাক্ বৌদ্ধ ভারতীয় সাহিত্য এবং সমাজ-শিল্পে এর স্বাক্ষর বহন করছে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, বৌদ্ধ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের জন্ম বিশুদ্ধ ভারতীয় মন এবং দক্ষিণী গণচেতনার সংমিশ্রণে।

সহজ ও সুন্দরের এই অপূর্ব মিলনের ফলে বৌদ্ধযুগে ভারতীয় শিল্পের প্রায় সকল শাখাতেই নতুন সৃষ্টির যে নবউদ্দীপনা ও কর্মপ্রেরণা দেখা দিয়েছিল সেকথা ভাবলে মন আরও একটু অতীতের একটি ঘটনার প্রতি আকৃষ্ট হয়। রাজ-ঐশ্বর্য, স্নেহ, মায়া, মমতা ত্যাগ করে, যে মন গৃহত্যাগ করে নির্জনে মুক্তির রহস্যদ্বার উন্মোচনের নীরব সাধনায় নিমগ্ন হয়েছিল, সেই আশ্চর্য একটি মনেই প্রথম অঙ্কুরিত হয়েছিল বৌদ্ধ স্থাপত্য ও ভাস্কর্যশিল্পের বিরাট সম্ভাবনাময় একটি ক্ষুদ্র বীজ।

প্রাক্ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সম্প্রদায় এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের নিয়মকানুন, আচার ব্যবহারের মধ্যে বিরাট পার্থক্য ছিল। প্রথমতঃ বুদ্ধ নিয়ম করলেন, বৌদ্ধ ভিক্ষুরা নগরের উপকণ্ঠে দলবদ্ধভাবে বাস করবেন। এই দলবদ্ধভাবে বাস করার দরুণ বিহার গড়ে উঠলো। অনাথপিণ্ডক প্রভৃতি সে যুগের ধনীরা অনেক বিরাট বিরাট অট্টালিকা সংঘকে দান করেছিলেন। এই সমস্ত অট্টালিকাগুলি বৌদ্ধ ভিক্ষুরা অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে ব্যবহার করতেন এবং গৃহগুলির সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁরা গৃহগুলিকে অপূর্ব কারুশিল্পে মণ্ডিত করে তুলতেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুসমাজের এই মার্জিত রুচি এবং শিল্পবোধ ভগবান বুদ্ধের কাছ থেকে পাওয়া। বুদ্ধ সেকালের এক অতি শিক্ষিত বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, ফলে তাঁর রুচিবোধও সেইভাবে জন্ম নিয়েছিল। তাই ভিক্ষুসংঘের জন্যে তিনি যে ত্রিচীবরের বিধান দিলেন, তার মধ্যেও আমরা পাই বুদ্ধের মার্জিত রুচি এবং কবিমনের পরিচয়। মনের দিক থেকে বুদ্ধ শুধু দার্শনিকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন অকৃত্রিম কবি ও শিল্পী।

বুদ্ধ একটি গৃহকে কেমনভাবে সাজাতে চান, তারই একটি বর্ণনা 'বুদ্ধাপদানে' আছে।

"বিচিত্তথম্ভম্ সুকতম্ সুবিভত্তম্ মহারহম্
কণ্কময়সংঘাতম্ তোরণচ্ছত্তমণ্ডিতম্
পঠমা বেলুরিয়া ভূমি বিমলব্ভসমা সুভা
নীরনজলজাকিণ্ণা বরকঞ্চনভূমিয়া
পবালম্ সপবারবণ্ণা কাচি লোহিতকাসুভা
ইন্দগোপকবণ্ণাভা ভূমি ওভাসতি দিসা
সুবিভত্তা ঘরমুখা নিয্যুহা সিহপঞ্জরা
চতুরো বেদিকা জালা গন্ধবেরা মনোরমা
নীলা পীতা লোহিতকা ওদাতা সুদ্ধকারকা
কুঠাগারবরূপেতা সত্তর তনবিভূসিতা
ওলোকময়া পদুমা বারাবিহংগসোভিতা
নক্খত্ত তারকাকিণ্ণ চন্দ সুরিয়েহি মণ্ডিতা
হেমজালেন সঞ্ছন্না সোণ্ণকিঙ্কণিকাযুতা
বাতবেগেন কুজন্তি সোণ্ণমালা মনোরমা
মঞ্জেটঠকম্ লোহিতকম্ পীতকম্ হরিপঞ্জরম্
নানারঙ্গেহি সম্পিতম্ উস্সিতদ্ধজমালিনী
নানাবহুঅনেকসতা ফলকা রজতাময়া
মণিময়া লোহিতঙ্কা মসারগল্লময়া তথা
নানাসয়নবিচিত্ত সংহাকাসিকসনথতা
কম্বলা দুকুলা চীনা পটটুণ্ণা পণ্ডু পাবুরা
বিবিধ ত্থরণম্ সব্বম্ মনসা পঞ্ঞপেম অহম্
তাসু তাস্বেব ভূমিসু রতনকুটলঙ্কতম্
মণিবেরোচনা উক্কা ধারয়ন্তা সুতিটঠরে
সোভন্তি এসিকা থম্ভাসুভা কঞ্চনতোরণা
জম্বোনদা সারময়া অথো রজতময়া পি চ
অনেকাসন্ধিসু বিভত্তা কবাটগ্গরচিত্তিতা
উভতো পুণ্ণঘটা অনেকে পদুমুপ্পলম্যুতা"

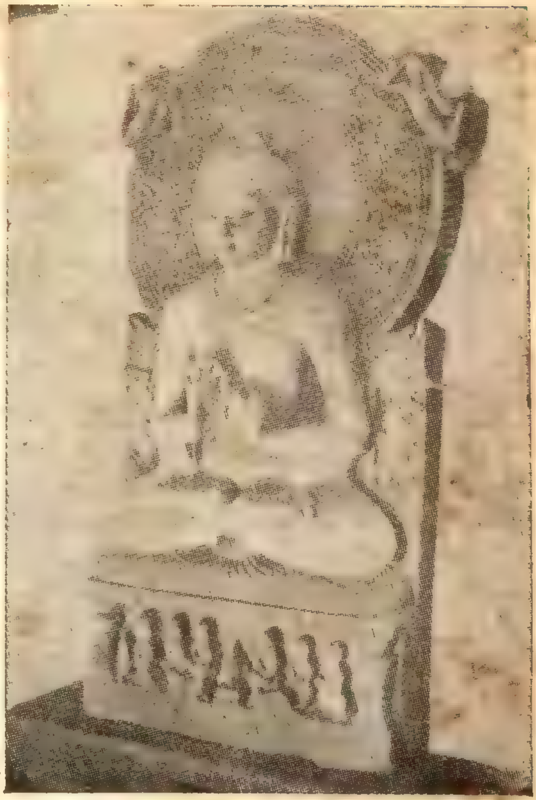

উদ্ধৃত অংশটি প্রকৃতপক্ষে হয়ত ভগবান বুদ্ধের বাণী নাও হতে পারে। তবে এ থেকে এইটুকু প্রমাণিত হয় যে, বৌদ্ধভিক্ষুদের মন সত্যিকারের শিল্পীর উপাদান দিয়ে গড়া হয়েছিল এবং সেই শিল্পীমনের স্রষ্টা হলেন স্বয়ং ভগবান বুদ্ধ।

★

'যেমন এক-একটি ফুল গেঁথে গেঁথে একছড়া চমৎকার মালা হয়, তেমনি এক-একটি মানুষকে দিয়ে সমাজের মহত্তর কল্যাণ সাধিত হ'তে পারে।'

—বুদ্ধদেব

অয়েল

আপ্‌টন সিন্‌ক্লেয়ার ★ অনুবাদক ঃ যতীশ বেদজ্ঞ

চতুর্থ অধ্যায়

[১]

এরপর সময় এল বান্নীর ওর মাকে দেখতে যাবার। আর আর সব ছেলেদের মায়েদের মত বান্নীর মা কিন্তু ব্যবহার করেন না ওর ড্যাডের উপাধি। লোকে তাঁকে বলে মিসেস্ ল্যাংগ আর তিনি বাসও করেন এ্যাঞ্জেল সিটীর বাইরের এক বাংলোয়। এমন একটা কিছু ব্যবস্থা ছিল যাতে করে তাঁর অধিকার আছে ছ'মাসে এক সপ্তাহ বান্নীকে নিয়ে নিজের কাছে রাখবার। বান্নীও সাগ্রহে অপেক্ষা করে থাকতো এই দিনটার জন্য আর ওর মনে খেলে যেত নানা রকমের ভাব। মাকে ওর ভাল লাগে খুবই, যে আদরটা ও অন্য কারো কাছ থেকে পায় না সেইটেই ওর জোটে তাঁর কাছ থেকে। বান্নীর কাছে নিজেকে তিনি পরিচয় দিতেন "সুন্দর ছোট্ট মা" বলে। অন্য দিক থেকে কিন্তু আবার কিছু অসুবিধাও ছিল এই সাক্ষাতের, কারণ এমন কতকগুলো বিষয় ছিল যা লুকিয়ে রাখবার কথা বান্নীর কাছ থেকে অথচ এই সাক্ষাতের অবকাশে ও কিছু না কিছু আন্দাজ করে বসতো সেই সব সম্বন্ধেই। মা ওকে নানা প্রশ্ন করতেন ড্যাডের বিষয়ে, অথচ ও জানে ড্যাড একদমই পছন্দ করে না কেউ কোন আলোচনা করুক তাকে নিয়ে। তাছাড়া মা ওকে শোনাতেন তাঁর টাকা পয়সার অভাবের কথা; ড্যাড নাকি মাসে তাঁকে দেয় মাত্র দুশো ডলার; কি করে এতে চলতে পারে একজন স্বামী-পরিত্যক্তা মেয়ের, বিশেষ করে সে যদি হয় আবার সুন্দরী আর তরুণী? কয়েক মাস ধরে তো ভাড়াই দেওয়া যাচ্ছে না গ্যারেজটার, এমনি সব কথা তিনি শোনাতেন বান্নীকে আর আশা করতেন বান্নী গিয়ে সে সব বলবে ওর ড্যাডকে। ড্যাড কিন্তু শুনতে চায় না ওসব কথা, ফলে পরের বার যেতেই মা ফেলতেন কেঁদে আর বান্নীকে শুনিয়ে বলতেন জিম্ নাকি ভীষণ অত্যাচারী আর কৃপণ। বিশেষ করে এই সময়টাতেই আবার ওদের সম্পর্কটা হয়ে দাঁড়িয়েছে খুব জটিল। মা কাগজে পড়েছেন ওদের নতুন খনির কথা আর সেই সাথে জেনে নিয়েছেন ঠিক কত টাকা ড্যাড তাতে পাচ্ছে। বান্নীকে তিনি বুঝিয়ে বললেন একটা পরিকল্পনার কথা, যাতে করে ও গিয়ে ড্যাডকে রাজি করাবে ওর মায়ের ভাতা বাড়িয়ে দিতে অথচ সে বুঝতে পারবে না তিনিই তা করিয়েছেন বান্নীকে বুদ্ধি দিয়ে। আর এমনি বিপদ, এ প্রস্তাবটা এল এমন সময়ে যখন কিনা ও ঠিক করে বসেছে মিথ্যে বলার সখ ত্যাগ করবে বলে!

এছাড়া ওর মায়ের বন্ধুদের সম্পর্কেও কেমন যেন একটা রহস্য রয়েছে বলে মনে হ'তো বান্নীর। ওখানে থাকবার সময় অনেক ভদ্রলোক বন্ধুকেই বান্নী আসতে দেখতো ওর মায়ের কাছে, যাদের কাকেও ওর ভাল লাগতো কাকেও বা লাগতো না। তারপর বাড়ী ফিরে আসার পর সুরু হ'তো এম্মা খুড়ীর জেরা যা থেকে স্পষ্ট বোঝা যেত তাঁর আগ্রহ শুধু ঐ ভদ্রলোক বন্ধুদের সম্বন্ধে জানবার, যদিও তিনি তা চাইতেন না বান্নীকে বুঝতে দিতে। বান্নী লক্ষ্য করেছে ড্যাড কখনও ভুলেও উল্লেখ করে না এসব বিষয়ে, এমন কি ওর মায়ের সম্বন্ধেও তাকে শোনা যায় না কখনও কোন প্রশ্ন করতে; এম্মা খুড়ীকেও তাঁর জেরা চালাতে হ'তো শুধু তখনই যখন কিনা ড্যাড থাকতো না উপস্থিত।

সব মিলে বান্নীর পরে এর প্রতিক্রিয়াটাও হ'লো একটু অদ্ভুত ধরণের। ড্যাডের ব্যাঙ্কের সিন্দুকটার ভিতরটা যেমন কেউই কখনো পায় না দেখতে, বান্নীও তেমনি ওর মনের একটা দিক গোপনই রেখে দিল আর সকলের কাছ থেকে। বাইরে দিব্যি হাসিখুসি আর সরল ছেলে, বয়েস আন্দাজে হয়তো বা একটু বেশী বুঝমানই মনে হবে ওকে, আসলে কিন্তু এর ভেতরেই ওর মধ্যে গড়ে উঠেছে দুটো স্বতন্ত্র জীবন। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে ও আপন মনেই সংগ্রহ করে চলেছে নানা ভাবসম্পদ আর মনের মণিকোঠায় সেগুলোকে লুকিয়ে রাখছে সংগোপনে, যেমন করে কাঠবেড়ালীরা লুকিয়ে রাখে তাদের সংগৃহীত বাদামগুলো যাতে করে পরবর্তী ঋতুটা চালিয়ে দিতে পারে সেগুলো দিয়ে। সব-গুলোই কিছু আর ভাল হয় না বাদামগুলোর, ভাল মন্দ দুই-ই থাকে তাদের মধ্যে, তাই বান্নী শিখছে সেগুলোকে বাছাই করতে, শিখছে কি করে ভালগুলো রেখে খারাপগুলোকে দিতে হয় ফেলে।

একটা জিনিস তো ও পরিষ্কারই বুঝতে পারে; সমস্ত স্ত্রী-পুরুষের মধ্যেই এমন একটা কিছু রয়েছে সবাই মিলে ষড়যন্ত্র করে যেটা তারা লুকিয়ে রাখতে চায় ছেলেপিলেদের কাছ থেকে। জীবনের ও-দিকটা অন্ধকার আর রহস্যময়, হয়তো বা কিছুটা কুৎসিতও বটে। প্রথম প্রথম অবশ্য বান্নী ত্রুটী ঘটতে দেয়নি ড্যাডের প্রতি ওর বিশ্বস্ততায়। ড্যাড যা ওকে জানতে দিতে চায় নি কোন চেষ্টাই ও করে নি তা জনাবার। কিন্তু তাই বলে চিরকালই তো আর তা চলতে পারে না, মনেরও তো একটা ধর্ম আছে, স্বভাবতই সে চায় সব কিছু জানতে। ইঙ্গিত আসে পাখী, মুরগী আর রাস্তার কুকুরের কাছ থেকে, আর আসে বাইরের ছেলেদের কাছ থেকে যাদের জানা আছে ব্যাপারটা আর যারা সব সময়েই বুঝিয়ে দিতে চায় তাদের সেই জানাটা, কিন্তু সব চাইতে বেশী আসে সেই সব বোকা বয়স্কদের কাছ থেকে যাদের কিনা বলতেই হবে এমন সব কথা যা না বুঝবার কোন উপায় নেই।

এম্মা খুড়ীর দৃঢ়বিশ্বাস সব মেয়েই নাকি "তালে" আছে ড্যাডকে "বাগাবার"। তাদের কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছে "টুপি হেলিয়ে" কেউ বা আবার শুধুই "ভেড়ার চোখের চাউনি" নিয়ে—এমনি আরও কতো কথাই যে তিনি বলেন! ফলে কোন মেয়ের সাথে একটু ভাল ব্যবহার করে ফেললেই ড্যাড হয়ে পড়ে কুণ্ঠিত, তার আশঙ্কা পাছে বান্নীও কিছু একটা সন্দেহ করে বসে এম্মা খুড়ীর মত। আসলে কিন্তু বান্নী বিরক্তিই বোধ করে খুড়ীর এই সব সন্দেহে। ও শিখে নেয় কি করে এড়িয়ে যেতে হয় তাঁর প্রশ্নগুলো, আর সেই সাথে শিখে নেয় কি করে না বলে পারা যায় লোবোস্ রিভারের সেই সুন্দরী মহিলাটি কি কথা বলেছিল ড্যাডকে আর ওরা খেয়েছিল কিনা তাঁর সাথে সে রাতের ডিনার। বাধ্য হয়েই বান্নীকে শিখতে হয় এই সব ছলচাতুরী, কিন্তু মনের ভিতর ওর গুমরিয়ে ওঠে চাপা বিদ্রোহ। কেন? কেন ওরা পাবে না সরল-ভাবে কথা বলতে? কেন ওদের এত সব ছলনা আর ফিসফিসানি? আর কেনই বা ওরা এমন করে মানুষকে করে তোলে শান্তিহীন?

[২]

রস্-ব্যাঙ্কসাইডের এক নম্বর খনিতে তেল উঠতে সুরু করবার সপ্তাহখানেকের মধ্যেই ড্যাড ব্যবস্থা করে ফেললো তার লীজের জমিতে আর একটা কুয়ো বসাবার যন্ত্র নিয়ে আসবার, পরের সপ্তাহের মধ্যে লোকজনও গেল সব জোগাড় হয়ে আর দেখতে দেখতে আগেকার সেই যন্ত্রপাতিগুলোই আবার নেমে চললো মাটির বুক ভেদ করে। এ ছাড়াও শীঘ্রই আসছে আরও দুটো কুয়ো বসাবার যন্ত্র আর সেই সাথে আরও দু সেট যন্ত্রপাতি। চতুষ্কোণ জমিটার প্রতিটি দিকই হচ্ছে তিনশ ফিট করে লম্বা আর তার প্রতিটি কোণেই বসানো হবে একটা করে কুয়ো। লোক-জন চাই আরও অনেক—মিঃ ব্যাঙ্কসাইডের বাড়ীখানাকে সরিয়ে নিতে হবে অন্য জমিতে। তাতে অবশ্য কিছুই যায় আসে না মিঃ ব্যাঙ্কসাইডের, তিনি তো অনেক আগেই গিয়ে উঠেছেন ড্যাডের পাশাপাশি সাগর পাড়ের এক প্রাসাদে, আর এর মধ্যেই কিনে ফেলেছেন পুরো এক প্রস্থ আসবাবপত্র আর সেই সাথে মস্ত বড় ঝকঝকে এক লাইমোসিন আর একটা স্পোর্টস্ কার যাতে করে তিনি প্রতিদিন বিকেলে গলফ্ খেলতে যান তাঁর ক্লাবে। এর মধ্যেই ব্যাঙ্কসাইড পরিবার অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন বাটলারে আর মিসেস্ ব্যাঙ্কসাইডের নাম উঠে গেছে সহরের সব চাইতে অভি-জাত মহিলা ক্লাবের খাতায়। পশ্চিম দেশের প্রধান কথাই হলো নিখুঁতভাবে কাজ করা, কাজেই যখন সময় আসে অবস্থা ফেরাবার তখন তাও তো করা চাই নিখুঁতভাবেই।

পূর্বের মতই আবার একবার ড্যাড আর বান্নীকে ছুটতে হলো লোবস্ রিভারে আর পূর্বের মতই জয় করতে হলো নানা রকমের বাধাবিঘ্ন, তারপর একদিন তেমনি করেই ওরা বসিয়ে ফেললো দিব্যি সুন্দর আর একটি কুয়ো। এখন বাকী রইলো আর দুটো তেল তোলার ইঞ্জিন নিয়ে আসা আর নিয়ে আসা আরও অনেক রকমের যন্ত্রপাতি। তেল ব্যবসায়ের এইটেই হচ্ছে রীতি—টাকা পাওয়ার সাথে সাথেই তাকে আবার খাটাতে হবে নতুন কুয়ো বসা-বার কাজে আর তার সাথে নিতে হবে আরও বেশি ঝুঁকি। ব্যবসা আপনা থেকেই বাধ্য করবে এ করতে। কারণ সেখানে নিয়তই প্রতিযোগিতা চলছে মানুষে মানুষে—প্রত্যেকে চেষ্টা করছে প্রত্যেকের তেল কেড়ে নিতে। একটা কুয়োতে তেল পাবার সাথে সাথেই তার আসে পাশেও বসাতে হবে আরও কয়েকটা কুয়ো, না হয়তো চারপাশের লোকেরা তুলে নেবে সে তেল তাদের নিজেদের জমিতে কুয়ো বসিয়ে। ঐ ছাড়া তেল বাজারে ছাড়ার দিক দিয়েও গোলমাল দেখা দিতে পারে মেলাই; তখন বোঝা যায় তেল-শোধন করবার ব্যবস্থাটা হাতে থাকার সুবিধে কত, আর তখনই ঠিক বোঝা যাবে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারার কি আনন্দ। কিন্তু সে স্বাধীনতারও আছে একটা নিজস্ব মূল্য—শোধন যন্ত্রটাকে চালু রাখতে হলে ব্যবস্থা রাখতে হবে প্রচুর তেলের আর সেই সাথে ব্যবস্থা রাখতে হবে মেলাই সব বিতরণ কেন্দ্রের। কম টাকার লোকের পক্ষে খুবই কঠিন এ খেলা চালিয়ে যাওয়া, আর যত টাকাই যার থাক্ না কেন, খেলতে গিয়ে দেখা যাবে তার চেয়েও আরও অনেক টাকা নিয়ে বসে আছে আরও অনেক লোক।

তবে কিনা ড্যাডের এখন পয়ের সময়—কোন কিছুই পারছে না তাকে আটকাতে, যা কিছু সে ধরছে তাই-ই যেন আপনা থেকে উঠছে সফল হয়ে। অন্যান্য বিজয় অভিযানের মাঝেই হঠাৎ তার খেয়াল হলো এ্যান্টিলোপের পূর্বের্ণ খনিগুলোকে আরও একটু খুঁড়ে দেখবার। আর খেয়াল হলে তা করাও চাই ড্যাডের যেমন করেই হোক। দেখতে দেখতে কাজও সুরু হলো সুরু হলো, আর তার ফলও ফললো সত্যি চমৎকার। মাত্র আট শ' ফিট নীচে যেতেই তেলের চাপে কুয়োর মুখের ঢাকনিটাই গেল ফেটে—ওরা পৌঁছে গেল নতুন আর একটা তেলের স্তরে, আর ওদের দুবছর ধরে শোষিত নিঃশেষিত-প্রায় ষোলটা কুয়োর প্রত্যেকটাই আবার ওদের পরে বর্ষণ সুরু করলো নতুন ঐশ্বর্যের ধারা।

কিন্তু সেই সাথেই দেখা দিল আর এক নতুন সমস্যা; এতদিন পর্যন্ত এ খনিটায় কোন ব্যবস্থাই করা যায় নি তেলের পাইপের, কিন্তু এবার আর তা না করলেই নয়। ড্যাড ঠিক করলো অন্য কয়েকজন তেলমালিকের সাথে মিলে এবার সে দূর করবেই ফেলবে এই অসুবিধেটা; আর সেরকম একটা কিছু ব্যবস্থার উদ্দেশ্যেই সে তৈরী হচ্ছিল এ্যান্টিলোপে যাবার জন্য। এমনি সময় এসে হাজির হলো বান্নী আর চোখেমুখে উৎকণ্ঠা ফুটিয়ে তুলে জিজ্ঞেস করলো "এদিকে পনেরই নভেম্বর যে ঘনিয়ে এল, সে কথাটা ভুলে গেলে নাকি, ড্যাড?"

"এলো তো তাতে কি হলো, খোকা?"

"বারে! তুমি না বলেছিলে এ বছর কোয়েল শিকারে যাবে?"

"হায় ভগবান! সত্যিই তো তাই! কিন্তু আমি যে এখন বড় ব্যস্ত, খোকা।"

"বড় বেশী পরিশ্রম করছো তুমি ড্যাড।" এম্মা খুড়ী বললেন, "ডাক্তার বলেছেন তোমার বাঁড়ু নিতে নাকি খুব চাপ পড়ছে।"

"আর সেজন্যেই বুঝি ডাক্তার বলেছেন কোয়েল খেতে?"

ড্যাডের মুখে চাপা হাসি, দেখে বান্নী বুঝলো সে নরম হয়েছে।

"শিকারের জিনিষপত্রগুলো তাহলে গুছিয়ে নি ড্যাড", আব্দারের সুরে বলে চলে বান্নী, "তারপর তোমার এ্যান্টিলোপের

কাজ শেষ করে ফিরবার পথে স্যান্ এ্যালিডো উপত্যকাটা ঘুরে এলেই চলবে?"

"স্যান্ এ্যালিডো! সে কি খোকা, সে যে আমাদের পথ থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে!"

"সবাই বলে ওখানেই নাকি সব চেয়ে বেশী কোয়েল পাখী পাওয়া যায়, ড্যাড।"

"তা না হয় যায়; কিন্তু কোয়েল তো ওর চেয়েও কাছাকাছি অনেক জায়গায় পাওয়া যায়।"

"সে আমি জানি, ড্যাড; কিন্তু ও জায়গাটা একবারও আমি দেখিনি কিনা, তাই ইচ্ছে হচ্ছে একবার দেখে আসতে।"

"কিন্তু এতো সব জায়গা থাকতে ও জায়গাটার পরেই বা তোমার এতো ঝোঁক হ'লো কেন?"

এবার বাম্মী বেকায়দায় পড়লো। ও জানে সত্যি কথাটা বললেই ড্যাড বলবে ওর মাথায় নাকি ছিট আছে। তা সে যাই হোক বাম্মী ঠিক করলো সত্যি কথাই ও বলবে।

"বারে! ওখানেই তো ওয়ার্টকিন্সরা থাকে।"

"ওয়ার্টকিন্স? তারা আবার কারা?"

"সেই যে সেই ছেলেটি, তোমার মনে নেই, ড্যাড? সেই যে সেই পল্? যার সাথে সেদিন সেই জমি লিজ নেওয়ার সময় আমার দেখা হয়েছিল?"

"হায় ভগবান, এখনো তুমি সেই ছেলেটাকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ, খোকা?"

"মিসেস্ গ্রোর্তির সাথে কাল দেখা হয়ে গেল রাস্তায়। ওদের কথা বলতে গিয়ে বললেন ওরা নাকি বিপদে পড়েছে খুবই। দেনার দায়ে ওদের ক্ষেতখামার নাকি সব চলে যাচ্ছে কোন্ ব্যাঙ্কের হাতে। মিসেস্ গ্রোর্তি তো ভেবেই পাচ্ছেন না তা হ'লে ওদের তখন কি উপায় হবে। নিজের হাত তো একদমই ফাঁকা। জমির দাম যা পেয়েছিলেন তা তো কোন্ কালেই শেষ করে ফেলেছেন শেয়ার কিনে, তার যে এক পয়সাও আর ঘরে আসবে সে আশাও খুব কম। স্বামী রাতের পাহারাদারের কাজ করে যা পান তা দিয়েই এখন কোনমতে চলে যাচ্ছে তাদের দুজনের।"

"তা হলে তুমি এখন কি করতে চাইছো?"

"আমার ইচ্ছে তুমি ওদের বন্ধকী জমিটা কিনে নাও, ড্যাড; না হয়তো এমন একটা কিছু করো যাতে করে ওরা ওদের বাড়ীতেই থাকতে পারে। দেনা শোধ করবার আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও কাকেও তার বাড়ীঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হবে সেটাও কিন্তু খুব ভাল কথা নয়, ড্যাড।"

"কিন্তু দেনার দায়ে ঘরবাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে আসতে তো হামেশাই অনেক লোককে হচ্ছে, খোকা।"

"কিন্তু যখন তাদের কোন দোষ না থাকে, ড্যাড?"

"কার যে দোষ আর কার যে গুণ সে তো অনেক হিসেব পত্তরেরই ব্যাপার, আর ব্যাঙ্কই বা যাবে কেন অত সব বিচার বিবেচনা করতে?" তারপর বাম্মীর চোখে প্রতিবাদ ফুটে উঠতে দেখে নরম সুরে বললো, "বড় হয়ে দেখবে অমন মেলা অন্যায়ই ঘটছে পৃথিবীতে যা তোমার ইচ্ছে থাকলেও বদলাবার শক্তি নেই। আজই হোক আর কালই হোক সেগুলোকে তোমার একদিন মেনেই নিতে হবে, খোকা।"

"কিন্তু, ড্যাড, ওদের চার চারটে কাচ্চাবাচ্চা, আর তার মধ্যে শুনেছি নাকি তিনটেই আবার মেয়ে, তাদের নিয়ে ওরা এখন যাবেই বা কোথায়? তারপর আবার পলও রয়েছে এখন বিদেশে, তাকে যে সব ঘটনা জানাবে তারও তো কোন উপায় নেই। মিসেস্ গ্রোর্তি একখানা ছবি দেখালেন ওদের, তা থেকেই বোঝা যায় কত ভাল লোক ওরা, একমাত্র কঠোর পরিশ্রম ছাড়া আর কোন কিছুই ওরা কখনো করেনি। সত্যি বলছি ড্যাড, ওদের একটা ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই আর শান্তি পাচ্ছি না। তুমি তো একদিন বলেছিলে আমাকে একটা গাড়ী কিনে দেবে, সেই টাকাটা দিয়েই এখন ওদের ঐ বন্ধকী জমিটা কিনে নাও না, ড্যাড। শুনেছি নাকি দু'হাজার ডলারেরও কম ওদের দেনা, সে তো তোমার কাছে কিছুই না।"

"তা না হয় কিনেই নিলাম—কিন্তু তারপর যে ওদের সব দায়িত্বই এসে পড়বে তোমার পরে—।"

"না ড্যাড, তা কখনও পড়বে না; ওরা সেরকম লোকই নয়, মেলাই সম্মান বোধ ওদের। মিসেস্ গ্রোর্তি বলেন পলের মত ওরাও নাকি কিছুতেই নিতে চাইবে না তোমার টাকা। কিন্তু মর্টগেজটা কিনে নিলে তখন আর ওদের কিছুই বলবার থাকবে না। আর না হয়তো ওদের জমিটাও তো তুমি কিনে নিতে পার, ড্যাড, তারপর ওদের ভাড়াটে হিসাবে থাকতে দিলেই চলবে। পল বলে ওদের ঐ জমিগুলোতে নাকি তেল আছে, অন্তত তার এ্যাবি খুড়ো তো ওরকমই একটা কিছু দেখেছিলেন মাটির পরে।"

ওরকম তেল ক্যালিফোর্ণিয়ার সব জমিতেই মেলে। মাটির উপরের তেল থেকে কোন কিছুই বলা চলে না।"

"আচ্ছা ড্যাড, তুমি তো প্রায়ই বলো বড় রকমের একটা কিছু করবে। তা করতে হলে, মানে কিনা গোটা একটা খনির মালিক হয়ে বিনা খাজনায় কারো ধার না ধেরে কাজ করতে হলে, এ রকম একটা কিছু তো তোমায় করতেই হবে, ড্যাড। সে দিক দিয়ে প্যারাডাইসেই না হয় একবার পরীক্ষা করে দেখলে? গাড়ীতে করে দু'চারদিন গিয়ে সেখানে থাকলে, কোয়েল শিকারে কোয়েল শিকারও হবে আর সাথে সাথে জমিটা সম্বন্ধেও জেনে নেওয়া যাবে যা কিছু জানবার। তাতে করে একদিকে যেমন ঐ গরীব বেচারাদেরও হবে যথেষ্ট সাহায্য অন্যদিকে আবার তোমার কীড্‌নিদ্‌টোরও জুটবে কিছু বিশ্রাম।"

শেষ পর্যন্ত ড্যাডকে বলতে হলো, "আচ্ছা তাই না হয় হবে", আর মনে মনে ভাবতে লাগলো, "হায় ভগবান, একি অদ্ভুত ছেলে!"

[ক্রমশঃ

জটিল

মানস রায় চৌধুরী

ক্রশওয়ার্ডের শেষ লাইনটা পূরণ করে নিয়ে সুশীলবাবু চশমাটা আরেকবার মুছলেন। আর দেখতে হচ্ছে না। মার দিয়া কেল্লা। এবার আর কানের কাছ দিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট নয়। শ্রেফ-অল কারেক্ট। পাঁচ হাজার রোখে কে। কারেন্সী থেকে সদ্য বেরিয়ে আসা কড়কড়ে নোটগুলোর খস্‌খসে আওয়াজই যেন কানের কাছে শুনতে পেলেন সুশীলবাবু। আরেকবার মিলোতে হ'বে ছকটা। কথায় বলে, সাবধানের মার নেই। সেই কোন দুপুরে খেয়ে দেয়ে চেম্বার্সের ডিক্সনারী নিয়ে বসেছেন: এদিকে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যার উঠোনে। ঘরের কোণে ক্রমশঃ অন্ধকার জমে উঠছে।

মাথাটা যেন ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে সুশীলবাবুর। তবু অতন্দ্র উদ্দীপনা আর সমস্ত উৎসাহ নিয়ে মন বসাতে হ'বে। কষ্ট করতেই হ'বে, নইলে এই পাথর-চাপা কপালে কেষ্ট নেই। আচ্ছা এ জায়গাটা 'ওয়ার্ক' হ'বে, না 'ওয়ার্ড' হবে? দেওয়ালের সংগেই যেন কথা বলে চলেছেন। এরই মধ্যে তাঁর মনে পড়লো—এবারকার ক্লোজিং ডেট একুশ তারিখে। আজ হচ্ছে চোদ্দ। হঠাৎ অস্থির হয়ে ওঠেন তিনি। কালকের মধ্যেই ডাকে দিতে হবে—নইলে সব করেও শেষ রক্ষা হ'বে না

—রাণু, রাণু, ভাইঝিকে ডাক দেন। একটু চাপা গলাতেই। কেন না স্ত্রী মালতীর কানে পৌঁছলে আর রক্ষে নেই। আরেক দফা বকাবকি চলবে। দাঁতে দাঁত চেপে স্বামীকে সাতকথা শুনোবেন। আর রাণুকে ডাক দেবার অর্থও বোঝেন তিনি। জেঠা-ভাইঝিতে সলা-পরামর্শ হয়েই আছে। ভাইঝি তার হাত-খরচের টাকা থেকে ফি জোগায় আর জেঠা ছক পূরণ করে তোলেন।

অবশ্যি রাণুর কাছে টাকা চাইতে তাঁরও যে খুব আরামের ঠেকে তা নয়। ভীষণ খারাপই লাগে। আত্মগ্লানিতে মন তেঁতো হয়ে ওঠে। কিন্তু কি করা, মনকে চোখকে ঠাওরানো; কোনদিন টাকা হ'লে ওকে সুদে-আসলে মিটিয়ে দিতে হ'বে।

ঃ আমাকে ডাকছেন? রাণু এসে দাঁড়িয়েছে দরোজার গোড়ায়।

সুশীলবাবুর মুখে নির্ভাজ হাসি। কিছুটা অর্থও ব্যস্ত রয়েছে সে মুখে।

রাণুর বুঝতে দেরী হয় না, জেঠামশাই-এর চোখ ক্যালেণ্ডারের একটা বিশেষ তারিখের দিকে।

ঃ কাল সকালে ডাকে দিতে হ'বে না? রাণু প্রশ্ন করলো,

ঃ কালকে সকালেই। ওর কথারই পুনরুচ্চারণ করলেন তিনি। একটু থেমে এক খাবলা নস্যি নাকে গুঁজলেন। তারপরে হঠাৎ অনুনাসিক স্বরে বল্লেন: তুই কিস্‌সু ভাবিসনে। এবার আর কেউ রুখতে পারছে না। পাঁচ হাজার আমার কপালেই নাচছে। বুঝেছিস্‌? রাণু এ'ধরণের কথা নোতুন শুনছে না। গত দু'বছর ধরে প্রতি মাসেই একথা শুনতে হয় তাকে। একটা মানুষের আশা-নিরাশার সংগী হ'তে হয়। তাই প্রথমের দিকে এসব কথায় সে যতো উদ্দীপ্ত হ'তো এখন আর ততো হয় না। পুরো ব্যাপারটাই তা[র] কাছে ভুয়ো—উটপাখী আশায় দিন কাটানো আর কি?

—জানিস্‌, এই একটা জায়গাটাতেই খটকা ছিলো। সুশীলবাব[ু] ছকটার একটা জায়গায় আংগুল দিয়ে দেখান। —তা ভেবে দেখলা[ম] 'ওয়ার্ক'ই হ'বে, 'ওয়ার্ড'টা নেহাৎ অর্থহীন হয়ে পড়ে। তা তোর কি মনে হয়? রাণুর দিকে চোখ তোলেন তিনি।

ঃ আমার আর মনে হওয়া, আপনি যা মনে করেন তাই বহাল রাণু জবাব দিলো।

ঃ উঁহু, সে কথা নয়। তোমারও একটা লজিক্যাল থিংকিং আছে

লজিক্যাল থিংকিং-এর কথা শুনে রাণুর মনে পড়ে যায় অনেকা[ল] কথা। কলকাতার একটা নামী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন সুশীল[]বাবু। কি ভীষণই পালটে গেছেন। যেন একটা মূর্তির কাঠ-মো[] টাই আছে। ওপরের বর্ণের প্রলেপ ধুয়ে মুছে একাকার।

ঃ আরেকটা কথা, টাকা জিনিসটা আমার কাছে কেমন জানিস ট্রাম-বাসের মতো।

রাণু আতংকিত হয়। বাড়ীর মধ্যে একমাত্র এই জেঠামশাইয়ে[র] সংগেই তার হৃদ্যতা আর তাঁকেই সবচেয়ে বেশী আতংক। মাঝে মা[ঝে] টাকা নেন বলে নয়। ওকে দাঁড় করিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা এক নাগা[ড়ে] বক্তৃতা দেন বলে। কথা শুনতে শুনতে রাণুর মাথা ধরে যায়, কাঁ[]দপ দপ করে। তবু অন্যমনস্ক হবার জোটি নেই। ধমকের গমে[] আবার কথার মধ্যে টেনে আনবেন ওকে।

ঃ টাকা জিনিসটা ট্রাম-বাসের মতোই। এই ধর্‌ ট্রেন্স দাঁড়ি[য়ে] আছি স্টপেজে। ভীষণ উদ্বিগ্ন, কখন গাড়ী আসে; গাড়ী এলে চড়লাম, গন্তব্যস্থানে পৌঁছলাম। তারপর নিজের কাজে চলে গেলাম এরপর আর একবারও ফিরে তাকাইনা, বাসটা উত্তরে গেল কি পশ্চি[মে] গেল; এক্সিডেন্ট হলো কি তেল ফুরোলো। তেমনি টাকা, দরকা[র] আছে বলেই আঁকুপাঁকু; দরকার নেই, রামকৃষ্ণ—টাকা মাটি, মাটি টাকা এক ঝলকে কথাগুলো উগরে দিয়ে প্রাণখোলা হাসি হাসেন।

রাণুর হাসি পায় না—ভেবে দুঃখ হয়। কি লোক ছিলেন, আ[র] কি হয়েছেন। হাল কি চিরকালই এরকম ছিলো?

দশ-বিশ বছর পড়ে মরুকগে, বছর চারেক আগেই তফাৎ ছিলে[া] এক যোজন। অবস্থা তখন অনেক সচ্ছল, অভাবের আঁচ গায়ে একটু[ও] লাগবার সুযোগ পায়নি। তিন ভাইয়ের একান্নবর্তী পরিবা[রে] সুশীলবাবু বড়ো এবং বেকার। অন্য ভাইয়েরা চাকুরে আর তাদে[র] রোজগারে হাত বসান তিনি। যেন এটাই স্বাভাবিক এব্যাপা[রে] তিনি নিতান্ত অসহায়, শিশুর মতো অবুঝ। পাকিস্তানে পৈতৃ[ক] বেশ কিছু ছিলো। কিন্তু কপালের লেখা—সে টাকাও আসা বন্ধ

রাণুকে বাইরের দিকে পা বাড়াতে দেখে তিনি বল্লেন: একটা ক[থা] শুনে যা।

রাণুকে ফিরতে হলো, টেবিলের কাছে সরে এলো সে। অনু

কণ্ঠে বল্লেন তিনি ঃ তোর জেঠিমাকে কিন্তু টাকার কথা একটিবারও জানাস নে। তাহলে একেবারে খেয়ে ফেলবে। আর তুই শ্বশুরবাড়ী যাবার আগে তোর সব দেনা শোধ করে দেবো। আর দেখ না, এই বারেই পাঁচ হাজার ঘরে তুলছি। তুই মিথ্যে ঘাবড়াচ্ছিস্।

ঃ কই? ঘাবড়ালাম কখন? বাণ্টু মুখ তুললো।

ঃ মুখে না বললেও তোর চোখ মুখ দেখে তো বুঝতে পারি। তোকে তো আর আজ নোতুন দেখছি না।

বাণ্টু জবাব দিলো না।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে জেঠিমার মুখোমুখী। একেবারে হাতেনাতে ধরা পড়েছে।

ঃ জেঠামশাই তোকে কি বলছিলো রে? চোখ বড়ো বড়ো করে প্রশ্ন করলেন মালতী।

ঃ কিছু না। ছোট্ট করে জবাব দিলো বাণ্টু।

ঃ কিছু না বল্লেই হ'লো, যতো সব মিথ্যেকথা। এতোক্ষণ ধরে কিছুই বলে নি তোর জেঠামশাই। আরে আমি কি হাবা-কালা হয়ে গেছি। কিছু বুঝি না? ক'টাকা দিলি আবার ঐ ক্রশওয়ার্ডের জন্যে। রাগে যেন ফুঁসে উঠ্‌ছেন মালতী।

ঃ টাকা তো দিই নি জেঠিমা।

ঃ না দিয়েছিস তো, দিবি এই কথা বলে এলি তো, বুঝেছি। আচ্ছা বলতো এরকমভাবে টাকাগুলো কন্টিনন্টি না করে কাজের কাজ ক'রলে হয় না। সংসারের এই হাল। কান্নার ঢেউয়ে মালতীর গলা ভিজে ওঠে।

ঃ আমাকে বলাই মিথ্যে। উনি চাইলে না বলি কি করে? রাণ্টু নীচু গলায় বললো। বুক কাঁপে, পাছে জেঠামশাইয়ের কানে পৌঁছোয়।

যতো সব হয়েছে। এক পয়সা ঘরে আনবার মুরোদ নেই, টাকা নষ্ট করতে দাও যতোখুশী। বিড়বিড় করতে করতে ওপরে ওঠেন মালতী। রাণ্টু নিচে নেমে যায়। আশংকা করে একটা দাম্পত্য কলহের।

ক্রশওয়ার্ডটা ডাকে দেওয়ার পর থেকেই যেন অস্থিরতা আরো বেড়ে যায় সুশীলবাবুর। কেবল ঘর আর বার। তাতেও যেন স্বস্তি নেই। পুরোনো খবরের কাগজখানা খুলে ধরেন চোখের সামনে। যদিবা একটু অন্যমনস্ক হ'তে পারেন তাতে। কিন্তু কোথায়, ছাই—! সব খবরের বাঁধ ভাসিয়ে দিয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো ক্যালেণ্ডারের তারিখটা, একুশে অঙ্কটা আরো যেন জ্বলজ্বলে হয়ে উঠলো। ঐ দিনই রেজাল্ট বেরোবে। ভাবলেই বুক ঢিপ্‌ঢিপ্ করে তাঁর। পাঁচ হাজার টাকা, কম নয়। হার্টের ব্যারাম ধরে যায় বুঝি।

এই ক্রশওয়ার্ডের ভূত মাথায় চাপবার পর থেকেই কেমন যেন পাল্‌টে-গেলেন তিনি। সংসারের কোনো ধান্ধাতেই থাকেন না। এমন কি নিজের খাওয়াদাওয়া। একদিনের ঘটনা। দুপুরে সবার খাওয়া হয়ে গেলো। সুশীলবাবু বে-হদিশ। নাওয়া নেই খাওয়া নেই। মালতী বকে বকে গলা চিরে ফেললেন। কাকস্য পরিবেদনা। সুশীলবাবুর কানে কোনো কথাই ঢোকে না। শেষকালে বাড়ীর চিলেকোঠাঘরে পাওয়া গিয়েছিল তাঁকে।

মালতী বল্লেন ঃ কিগো নাওয়াখাওয়া করবে না কি? না বাড়ীশুদ্ধ লোক তোমার জন্যে উপোষী থাকবে।

ঃ কেন, আমি আবার কি করলাম, যাতে বাড়ী শুদ্ধ উপোষী থাকে। আরো যেন অবুঝ হয়েছেন তিনি।

ঃ চলো, খাওয়াদাওয়া করবে।

ঃ ও, হ্যাঁ যাচ্ছি। এতক্ষণে যেন সম্বিত ফেরে তাঁর।

এই হলেই দুবছর কাটলো। আর সংসারের কথা না বলাই ভালো। দুটো ছেড়ে তিনটে রেশন আনতেই নাভিশ্বাস ওঠে। বাজার খরচা চলে না। ভাই-এরা আর কতো দেবে। তখন সুরু হলো সোনার গয়না বন্ধকী-কারবার। সে-ওবা কতোদিন। খরচ করতে করতে রাজার ভাণ্ডারও ফুরোয়। তাতো এই।

রাত্রে শুতে যাবার আগে স্ত্রীকে নরম গলায় ডাকলেন সুশীলবাবু ঃ ওগো, একটা কথা শুনবে,—গলাটা যেন থরথর করে কাঁপছে। গত দুদিন ধরে যে গোপন কথাটা বুকে করে নিয়ে বেড়াচ্ছেন, সেটাকে বাইরে ছড়িয়ে দিতে হবে।

ঃ কি, বলো। বেশী দেরী করোনা। আমার ঘুমে চোখ জুড়ে আস্‌ছে। মালতী দূর থেকেই বল্লেন।

ঃ একটু কাছে এসো না, সব বলছি; বলবার জন্যেই তো ডাকা।

একটু এগিয়ে এলেন মালতী। গলার বিরক্তির সুর কাঁপলো ঃ কই বলো!

সুশীলবাবু এদিকে ওদিকে একবার তাকালেন। পাছে কেউ শুনে ফেলে এরকম যেন ভাব। গুপ্তধনের সন্ধান দিতে চলেছেন কাউকে। তাই এতো সতর্কতা।

ঃ এবার পাঁচ হাজার নিশ্চয়ই কপালে।

মালতী শুনে একটুও প্রসন্ন হ'লেন না। প্রসন্ন হবার কথাও নয়। মুখ বেঁকিয়ে বল্লেন ঃ ও ভাবনা ছেড়ে, কিছু কাজের কাজ করো তো দেখি।

ঃ ঐ তোমার এক কথা। সুশীলবাবু ঝল্‌সালেন। আমার মন বলছে এবার পাবোই। কাল শেষ রাত্রে স্বপ্ন পর্য্যন্ত দেখেছি। এরকমটি কোনোবারও হয় না।

ঃ থামো তো, এই নিয়ে কতবার যে শুনলাম তার ইয়ত্তা নেই। আর কাউকে বোলোনা। তাহলে লোকে পাগল বলে হাস্‌বে।

ঃ হাসবে? হাসলেই হ'লো। যতো সব! দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ওঠেন তিনি। মনে মনে ভাবেন, হে ভগবান, এবারটি মুখ রেখো। তাহলে সবার বাঁকা মুখ সমান করে দিতে পারি। দেখাতে পারি আমি পারি কিনা।

পরের কটা দিনও সেইরকম। দুঃখের এপিঠ আর ওপিঠ। কোনোটাতেই সুখ নেই। মালতীর আঁচল খালি,—আর এরই মাঝে মাঝে শোনা যেতে লাগলো সুশীলবাবুর কথা ঃ কাউকে সবিস্তারে বোঝাচ্ছেন, কপাল ফেরাতে হয় কেমন করে, মানে টাকা আনতে হয় কি করে। মোদ্দা কথা, ক্রশওয়ার্ড ছাড়া রেহাই নেই। ঐ রেসই বলো আর জুয়োই বলো, এর মতো কস্মিন জোর-এর পরীক্ষা আর কিছুতে হয় না।

মালতীর দেখেশুনে সারা শরীর জ্বলে যায়। মুখে বলেন ঃ যতোক্ষণ তুমি বক্‌ছো, ততোক্ষণ সুনীলটার পড়াশুনাটাও যদি দেখতে, তাহলে আজ আমার ছেলেরা মুখ্যু হয়ে থাকতো না।

সুশীলবাবু ক্ষেপে ওঠেন : ক্লাস নাইনের ছেলে পড়ানো আমার কাজ নয়।

মালতী আর কথা বাড়ায় না। যেমন লোক, তার তেমন কথা।

মাঝে মাঝে মনে পড়ে সুশীলবাবুর, সংসারে ধান্ধায় হালফিল নাজেহাল হয়ে যখন চোখে অন্ধকার দেখছিলেন তখন তাঁর এক দূরসম্পর্কের ভাই এই ক্রশওয়ার্ডের আলো দেখিয়েছিলো চোখের সামনে। পাকিস্তান থেকে জমিদারীর টাকা আসা বন্ধ হতেই বাড়ীর সকলের নাড়ী ছাড়বার যোগাড়। সুশীলবাবু রাত নেই, দিন নেই সরকারী কর্তাদের ঊর্ধ্বতন ও নিম্নতন চতুর্দশ পুরুষের সপিণ্ডকরণের ব্যবস্থা করেন। মালতী বোবা হয়ে গিয়েছিলেন। বিপদের ওপরে বিপদে তাঁর মুখে কথা সরত না।

সুশীলবাবুর সেই ভাই রাস্তা বাৎলে দিয়েছিলেন দাদাকে :— তোমার যেন মেয়েমানুষের মতো ভাবনা। এতো ভাবছো কেন?

: কি আর করি বলো। ঐ এক ভাবনাটাই পারি। সুশীলবাবু দার্শনিকের মতো বলেছিলেন।

: তাহলে তো তুমি সব পারো। ভাবনা আছে মানে মগজ আছে। আর মগজ আছে যার, তার তো তামাম দুনিয়াই আছে হাতে।

: মানে?

: মানে আর কি! এদিকে ওদিকে চোখ ফিরিয়ে দেখো না। টাকা তো কোলকাতার রাস্তার ধুলোতেই ছড়ানো। কায়দা করে পকেটে খেলিয়ে তোলা হলো কথা।

: এ আর বেশী কথা কি। সুশীলবাবু ভাইয়ের আকাশ-ছোঁয়া কথাবার্তা শুনে ক্রমশঃ হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। ফোঁপরা ঢেঁকির শব্দ বেশী।

: আমি ক্রশওয়ার্ডের কথা বলছিলাম। সে ভণিতা ছেড়ে আসল কথাতে আসে।

: দূর, ওতে কি কিছু হয়?

: হয়না মানে, সব হয়। তোমার আমার মতো আনস্টেবল্-লোকেরা আর কি চাই। দু-পাঁচ হাজার মাঝে মাঝে আসবেই— এ তুমি দেখে নিও।

দু-ভাই আরো ঘেঁষে এসেছিলেন। এক কথাতেই অনেক বেশী হৃদ্য, অনেক নৈকট্য।

: কেউ পেয়েছে এমন শুনেছিস্?

: অলবৎ, টেবিল চাপড়ায় ভাই।—তা নইলে বলছি কেন। এই তো সেদিন আমাদের অফিসের মনীশবাবু। ধারে কান অবধি ডুবে আছেন। রাতারাতি গরম শাল চড়িয়ে অফিসে চলে এলেন। আমরা ধরলাম কষে, কি ব্যাপার দাদা, গুপ্তধনটন পেলেন নাকি? কিছুতেই কি বলতে চান ভদ্রলোক। শেষে অফিসের ছুটির সময় এক কাপ চায়ের বদলে কবুল করলাম—ক্রশওয়ার্ডে কিছু পেয়েছেন।

: হ্যাঁ? তাই নাকি। সুশীলবাবুর চোখ দুটো বিস্ফারিত, কতো?

: আট হাজার! গর্বের হাসি ভাইয়ের মুখে। যেন সে-ই এই কৃতিত্বের অধিকারী।

এই হলো কাল। আলোর রোশনাই-এ চোখ গেল ধাঁধিয়ে। দু-পাঁচ হাজারের স্বপ্নে রাতের ঘুম উধাও। কাগজ আর কলম, পুরোনো দিনের ইংরেজী বিদ্যেটা ঝালিয়ে নিয়ে সুরু করেছিলেন ছকপূরণ।

মালতী শুনেই যাচ্ছেতাই বলে গেলেন। : আচ্ছা কি ব্যাপার বলো ত' তোমার? পুরুষমানুষ খেটে ঘরে টাকা আনবে; তা না ঐ সব দৈব দৈবাৎ-এর খেলায় নামলে। ছি, ছি!

সুশীলবাবু মৃদু হেসেছিলেন। মেয়েমানুষের কথা কোনো-রকম ভাববিকার দেখা যায়নি তাঁর মধ্যে। শুধু স্ত্রীর হাতটা কাছে টেনে এনে বলেছিলেন : এই হাতে কি প্লাস্টিক মানায়? সোনার চুড়ীতে সব ভরে দেবো। মালতী এক ঝটকায় হাতটা সরিয়ে নিলেন। : আদিখ্যেতা রাখো ত'। এই বয়েসে আর প্রেম রঙ্গ-রস সহ্য হয় না। আমার এদিকে সুনীলের ইস্কুলের মাইনের কথা ভেবে ঘুম হচ্ছে না। আর তোমার এই সব ঠাট্টা তামাসা।

সুনীল সুশীলবাবুর ছেলে। ক্লাশ নাইনে পড়ে।

বিশ তারিখের রাতটা যেন ফুরোতে চায়না। সুশীলবাবু কম্‌সে কম্ উনিশবার কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খেয়েছেন। খাওয়া যতো হোক না হোক, চোখে মুখে ঘাড়ে গর্দানে দেওয়া হয়েছে তার বেশী। তবু কি ঘুম আসে—স্বপ্ন—হাজার হাজার নোটের তাড়া বাতাসে উড়ছে, ঘুড়ির মতো কেটে পড়ছে কারো কারো কপালে। হাওয়ার তালে তালে নাচছে টাকার পাঁজা। কে ধরে, কার কতো ওস্তাদি! সকালে কাকপক্ষী ডাকতে না ডাকতে বিছানা ছেড়ে বাইরে বেরোলেন। ছেলে সুনীলকে ঘাড় ধরে বিছানা থেকে তুললেন। প্রথমে বাবা-বাছা, শেষে গালিগালাজের ভৈরবো। সকালের রাগ!

: যাতো একছুটে মনিলালের স্টল থেকে একটা—কাগজ নিয়ে আয়। যাবি আর আসবি। পথে কোথায়ও দেরী করবি না। ঐ কাগজটাতেই নির্ভুল ছকটা দিয়ে দেওয়া হবে। প্রতিযোগীদের নিজেদের ছকের সংগে মিলিয়ে দেখবার জন্যে। তাই এতো ব্যস্ততা।

: কিগো হ'লো কি? মালতী ঘুম চোখে মশারী থেকে বেরিয়ে আসেন।

সুশীলবাবু কথা বলেন না। সাত সকালে কলহ বাধিয়ে একটা শুভ কাজ অশুভ করতে তাঁর ইচ্ছে হয় না।

ছেলের হাতে দশটা পয়সা গুঁজে দিয়ে বলেন : যা দাঁড়িয়ে কেন; চট্‌পট্ চলে যা।

ছেলেকে পাঠিয়েও স্বস্তি নেই তাঁর। নিজেই রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন ফতুয়া গায়েই। কাপড়ের কোঁচা অবিন্যস্ত; তাতেও ভ্রূক্ষেপ নেই। গলির মোড় ছেলের সংগে মুখোমুখি হলেন।

চিলের মতো ছোঁ মেরে কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে পড়তে লাগলেন। প্রথম পাতা, দ্বিতীয় পাতা, তৃতীয়, চতুর্থ...হ্যাঁ বেরিয়েছে। ঐতো বিজ্ঞাপনের ভিড়ের মধ্যে উঁকি মারছে ১৫৬নং ছকের ফলাফল। উত্তেজনায় রাস্তার পাশে রকে বসে পড়লেন। নিঃশ্বাস দ্রুত থেকে দ্রুততর—সারা শরীর থরথর কাঁপছে। চোখেমুখে যেন আগুনের হল্‌কা।

আড়াআড়িভাবে কি কি আছে, হ্যাঁ, হ্যাঁ মিলেছে। সব মিলেছে। ওপর থেকে নীচে, তাও তার মতই সমাধান করা হয়েছে।

তবে কি তিনিই প্রথম হয়েছেন?—

আর পারলেন না সুশীলবাবু, চোখস্ দৌড়বাজ-এর মতো ছুট্‌তে ছুট্‌তে বাড়ীর ভিতরে ঢুকলেন।

ঃ রাণু, মালতী—চিৎকারে বাড়ী কাঁপিয়ে তুললেন—ঃ আমার সব মিলেছে। পাঁচ হাজার আসবে না বলে! বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে।

চিৎকার করতে করতে সুশীলবাবুর গলার শিরগুলো ফুলে উঠ্‌লো, স্পষ্ট হয়ে উঠলো কপালের রগগুলো। সোজা রান্নাঘরে ছুটে গেলেন তিনি। যেখানে মালতী চা-জলখাবারের তোড়জোড় করছিলেন।

ঃ ওগো, শুনছো, স্তব্ধ অন্ধকার রান্নাঘরে শব্দের উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লেন। মালতী মুখ তুললেনঃ কি হলো?

ঃ এবার সব দুঃখ ঘুচবে। আমার অল কারেক্ট। একটা ভুলও বেরোয়নি। একেবারে লক্ষ্যভেদ।

ঃ সত্যি? কি করে জানলে? উৎসাহের আলোয় উজ্জ্বল হলেন মালতী। কিছুটা অবিশ্বাসও আছে তাতে।

ঃ এই তো, কাগজে নির্ভুল সমাধান বেরিয়েছে। মুঠোর ভিতরে রাখা কাগজের গোছাটা স্ত্রীর দিকে এগিয়ে দিলেন।

মালতী বল্লেনঃ আমি আর কি বুঝবো, তুমি দেখো তাহলেই হবে।

সুশীলবাবুর মুখে গর্বের উদ্ভাসিত হাসি। তৃপ্তির বন্যায় প্লাবিত।

ঃ টাকাটা কবে পাবে গো? ধারদেনাগুলো একটু শোধ হ'তো। স্যাকরা প্রায়ই তাগাদা দিচ্ছে। ঘরোয়া অভাব-অভিযোগের মধ্যে এলেন মালতী।

ঃ কাল-পর্শুই মণি-অর্ডার আসবে দেখো। দেরী তো হবার কথা নয়।

এতক্ষণে সারা বাড়ীতে খবর ছড়িয়ে পড়েছে। এক কান থেকে দু কান, এমনি করে ঘরে ঘরে এক কথা।

মেজো ভাই বারান্দায় ব্রাশ হাতে করে দাঁড়িয়ে ছিলো। সুশীলবাবুকে ডেকে জিজ্ঞেস করলোঃ সত্যিই তাহ'লে টাকা পেলে? ধন্য উৎসাহ তোমার। আমরা হলে তো পারতামই না।

সুশীলবাবু এ প্রশ্নের জবাবটা অন্যভাবে দিলেন। বল্লেনঃ তোর কাছে কিছু টাকাকড়ি হবে? আজ একটু খাওয়াদাওয়া হ'তো আর বাড়ীতে পুজো দিতাম একবার। মানৎ ছিলো।

মেজোভাই একথা শুনে তেমন প্রসন্ন হলো বলে মনে হলো না। তাকে ইতস্তত করতে দেখে সুশীলবাবু বল্লেনঃ কাল-পর্শুই শোধ দিয়ে দেবো। মণি-অর্ডারটা এসে যাক।

ঃ আচ্ছা নিও'খনে। প্রচ্ছন্ন বিরক্তির সংগে জবাবটা শোনা গেলো।

বেলা বাড়ার সংগে সংগে পাড়ার মধ্যে রটে গেলো সুশীলবাবুর এই অপ্রত্যাশিত টাকা পাবার সংবাদ। সুশীলবাবুর প্রতিবেশী অমরবাবু অভিনন্দন জানাতে এলেনঃ যাই হোক, মশায় মাথা খাটিয়ে টাকাটা পেয়ে গেলেন তো। আমাদের তো বিশ্বাস হয় না যে একসাথে ফোকোটসে অতোগুলো টাকা পেয়ে যেতে পারি।

সুশীলবাবু কপালে হাত দিয়ে বল্লেনঃ সবই এই, বুঝলেন না। এইখানে লেখা না থাকলে কিছু হবার জোটি নেই।

ঃ তা যা বলেছেন।

সারাদিনের মধ্যে দু-পাঁচ জন যে এরকম এলেন না তা নয়। সবার মুখেই এক কথা—অভিনন্দনের ব্যাপারে সবাই পঞ্চমুখ। এদিকে দুপুরে মেজোভাইয়ের কাছে ধার করা টাকায় বেশ কিছু ভালোমন্দ খাওয়াদাওয়ার বন্দোবস্ত হলো। বাড়ীর সবাই জানলো একটা কিছু হলো। কিন্তু মালতীর সব কিছুর পর মনকে বিশ্বাস করাতে ইচ্ছে হচ্ছিলো না। টাকাটা হাতে না আসা পর্যন্ত বিশ্বাস নেই।

পরদিন পিয়ন আসবার সময় পেরোলো। বাড়ীর সবাই চন্-মনিয়ে উঠলো। কি জানি কেন দেরী হচ্ছে। বিকেলের ডাক এলো পাড়ায়; তবুও কোনো খবর নেই। সুশীলবাবু অস্থির হয়ে সোজা ডাকঘরে গিয়ে ঘুরে এলেন। যদি পিয়ন দিতে ভুল করে থাকে, কিম্বা অন্য গণ্ডগোল। কিন্তু হা হতোস্মি। পোস্ট অফিসে জানা গেলো, ও নামে মণিঅর্ডার তো বেশী কথা, এক টুকরো কাগজ পর্যন্ত আসেনি।

সুশীলবাবুর মুখ ছুট্‌লো এইবার। দেশের ডাকবিভাগের অব্যবস্থা চরমে পৌঁচেছে। নইলে একটা মণিঅর্ডার পেতে এতো দেরী হয়। এতো আর বিলেত থেকে আসছে না। দেশের মধ্যেই ডাক পেতে যদি এতো দেরী হয় তাহলে কি যে অবস্থা হয়েছে, ঈশ্বরই জানেন।

সে রাতও অনিদ্রায় কাটলো তাঁর। সংগে সংগে মালতীরও। একটা দুশ্চিন্তা! যদি টাকা না পান তাহলে লজ্জার একশেষ। মুখ দেখানো পর্যন্ত দায় হবে। কে জানে, কেন টাকা আসতে এতো দেরী হচ্ছে।

পরক্ষণেই নিজেকে সান্ত্বনা দেন তিনি। হয়তো বা কোনক্রমে পাঠাতে দেরী হচ্ছে। বলা তো যায় না। কোনোরকমে যদি দেরী হয়ে গিয়ে থাকে। কিন্তু একটা টেলিগ্রামও আসে শুনেছিলেন। তাও তো এলো না। তবে কি, তাঁর ফর্ম ঠিক মতো পৌঁছোয় নি। সেই রাত্তিরে বাণুকে ডেকে তুললেন।

ঃ চিঠিটা ঠিকমতো ডাকে দেওয়া হয়েছিলো তো? রাণু ঘুমচোখে জবাব দিলোঃ কোন চিঠি?

ঃ কোন চিঠি মানে? ক্রশওয়ার্ডের চিঠি। সুশীলবাবু গর্জে ওঠেন।

ঃ ও, হ্যাঁ, আমি সুনীলকে দিকে ডাকে দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়েছি। ঠিক সময়েই ডাকে পড়েছে।

ঃ তবে? সুনীল কি কিছু গোলমাল করলো! পোস্টাল অর্ডার দেওয়া হয়েছিলো তো। বলতে বলতে অন্যঘরে সুনীলের বিছানার দিকে এগিয়ে যান তিনি।

সুনীল এই হৈ-চৈ তে জেগে উঠেছিল। বল্লোঃ সব ঠিক দেওয়া হয়েছে। আপনারাই বোধহয় ভুল হয়েছে। ডাকে দেওয়ার কোনো ত্রুটি নেই।

ঃ চোপরাও পাজী! যা মুখে নয়, তাই বলা। ওর কানটা পাকড়ে ধরতে যান সুশীলবাবু।

মালতী চিৎকার করে ওঠেনঃ স্ত্রী-ছেলেকে যে পুরুষমানুষ খেতে দিতে পারে না, তার আবার মেজাজ। ওসব মেজাজ বাস্তায় দেখাও গে। মুরোদ তো সব জানা আছে।

ঃজানা তো সবই আছে। তা আবার বলছো কেন। আরো গলা জোর হয়ে ওঠে।

হাঁফাতে হাঁফাতে বলে চলেন ঃ সবাই তো আমার মরোদ জেনে ফেলেছে। বুঝেছি, সবাই মিলে আমাকে কোণঠাসা করতে চাও। আমি রোজগারে নই। তাতেই সবার চক্ষুশূল। বুঝেছি। গলার স্বর সজল হয়ে ওঠে। তিনি সরে আসেন ঘর থেকে। মালতী দেবী দেখেন স্বামীর বসে-যাওয়া চোখের কোলে মুক্তোর মতো জল টলমল করছে। স্বামীকে কখনো কাঁদতে দেখেন নি তিনি।

পর পর দুটো দিন গেলো। মণি-অর্ডার এলো তিন দিনের দিন। সুশীলবাবু খেতে বসেছিলেন দুপুরবেলায়। পিওনের ডাক শুনেই তিনি ভাতের থালা সরিয়ে রেখে উঠোনে পা দিলেন। যাবার সময় পায়ের ধাক্কায় জলের গ্লাস উল্টে পড়লো ভাতের থালে। তাঁর কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। বাসনের আওয়াজ শুনে রান্নাঘর থেকে বাইরে এলেন মালতী। অবস্থা দেখে বলে উঠলেন ঃ কি হলো কি, যার জন্যে জল ফেলে একাকার করে ছুটতে হ'লো?

সুশীলবাবু ততক্ষণে উঠোনের মধ্যে পিওনের সংগে কথা বলতে সুরু করে দিয়েছেন।

ঃ পাঁচ হাজারের মণি অর্ডার তো হে। এ'টো হাতে মণি অর্ডার-এর কাগজটা টেনে নেন কাছে।

ঃ পাঁচ হাজার কি বাবু, ঠাট্টা করছেন নাকি? পিওন এক-গাল হেসে বলে।

ঃ ঠাট্টা করবো কেন, পাঁচ হাজার টাকাই তো আসবার কথা। বোম্বাই থেকে মণি অর্ডার না?

ঃ হ্যাঁ বাবু, মণি অর্ডার, টেলিগ্রাম মণি অর্ডার।

ঃ কতো টাকা? সই করতে করতে বলেন সুশীলবাবু।

ঃ দু' টাকা। সহজভাবে জবাব দেয় ডাক-পিওন।

ঃ দু' টাকা। সুশীলবাবু আর্তনাদ করে ওঠেন। — হাতের থেকে কলম খসে পড়ে প্রায়।

দু' টাকা?...মালতীর কানেও কথাটা পৌঁছোয়।

অসহ্য একটা যন্ত্রণা ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায় মালতীর বুক থেকে।

সুশীলবাবু মণি অর্ডারের কুপনটা একবার চোখ বুলিয়ে নেন। আড়াই হাজার জন নির্ভুল সমাধান দিয়েছে। তিনি ছাড়া আরো দু' হাজার চারশো উনোপঞ্চাশ জন পুরস্কারের অধিকারী। ভাগ বাঁটোয়ারাতে এই পড়েছে তাঁর কপালে। সেই কথাই স্পষ্ট করে লেখা আছে কুপনে, ক্রশওয়ার্ড কোম্পানীর তরফ থেকে একটা দুর্বোধ্য স্বাক্ষর।

সুশীলবাবু কোনোরকমে দুটো এক টাকার নোট হাত বাড়িয়ে টেনে নিলেন। তাঁর চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবীটা দুলতে লাগলো। কিছু নেই এমন যেন এক রিক্ততা। হাতের কাছে পেয়েও হারানোর মতো ব্যর্থতা।

আর এদিকে দূর থেকে দাঁড়িয়ে মালতী ঝাপসা চোখে যেন দেখতে পেলেন তাঁর স্বামী ক্রশওয়ার্ড পাজলের গোলোকধাঁধার মতো জটিল অলিগলিতে আলোর সন্ধান করে বেড়াচ্ছেন। তাঁর স্পষ্ট মনে হ'লো—তিনি ক্রমশঃ হারিয়ে যাচ্ছেন ও পথে।

★

মধ্যাহ্নে

সুবীর বসু ঠাকুর

ইথারের কম্প বাহি' নেমে আসে অমরার সুর;
এ কোন্ মধ্যাহ্নে জপি অচঞ্চল মন্ত্র-ছন্দহীন।
উদাস ধরণী মগ্ন রিক্ততার মহা-আবাহনে—
অবহেলে ছুয়ে যায় আলো আর বাতাস মধুর।

দৃষ্টিপথে বরাবর শান্ত, সৌম্য পাহাড়ের ছায়া
মৌনতা ঘিরিয়া পাশে যুগান্তের তপস্যা-অধীর।
তাপ-তপ্ত ধরা বুঝি তন্দ্রাহত চেতনাবিহীন,—
সূর্যরশ্মি-কশাঘাতে কম্পমান বাতাসের কান্না।

ঊষর, ধূসর ভূমি ব্রতপ্রাণ সন্ন্যাসীর মত
কঠোর তপস্যারত; অচেতন, ক্লান্তি-শ্রান্তিহীন।
অদূর বনানী হতে মহুয়ার মদির সুবাস
পঞ্চবান হানে বুঝি, চিত্তে তবু ছন্দ অনাহত।

ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে সেকালের বাংলা ও বাঙালী

অরুণ চৌধুরী

মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যগুলোর সঙ্গে সেকালের বাংলা ও বাঙালীর এক বিশেষ ধরণের নাড়ীর যোগ ছিল। মঙ্গলকাব্যগুলোর পাতায় তৎকালিক দেশ ও সমাজের রূপ বিশেষ ভাবে প্রতিফলিত, অবশ্য সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের সৃষ্ট সাহিত্য সেই সেই বিশেষ দেশের বিশেষ সময়ের ছাপ বহন করবেই। কারণ, দেশ ও সমাজের বাস্তব অবস্থাকে উল্লঙ্ঘন করে, দেশ ও সমাজ-নিরপেক্ষ কোনো সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভবপর নয়। মানুষের বাস্তব জীবনের ভূমিই হচ্ছে সাহিত্যের রস সংগ্রহের পাদপীঠ। ওখান থেকেই সাহিত্যের দেহে জীবনরস সরবরাহের কাজ চলে। এ হিসেবে সমস্ত সাহিত্যই সামাজিক, সমাজ নিরপেক্ষ নিরলম্ব কোনো বস্তু নয়। মধ্যযুগীয় বাংলার অন্যতম সাহিত্যসম্পদ মঙ্গল কাব্যগুলোর সেই সামাজিকতা অত্যন্ত প্রখর ও প্রত্যক্ষ। যদিও ওদের উপজীব্য সর্ব্বত্রই অলৌকিক জগতের বাসিন্দা দেবদেবীগণ; তবু আসলে ওদের সেই অপ্রাকৃতভাবের খোলস ছাড়িয়ে অন্তরঙ্গের সামাজিক রূপ ও পার্থিব স্বরূপ বের করা সুকঠিন কাজ নয়, মুসলমান আমলের (সূচনা ১২০১) অধীনতাগ্রস্ত হিন্দু ও বৌদ্ধ বাঙালী সমাজের জনমনের পরাশ্রিত চেতনা এবং প্রতিরোধ ও মুক্তির বাসনা থেকেই মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টি। ওদের দেবদেবীগণ বহিরঙ্গে অতীন্দ্রিয় পুরীর বাসিন্দা হলেও, প্রকৃতপক্ষে সেকালের হিন্দু ও বৌদ্ধ বাঙালীর প্রার্থিত শক্তির উৎসের রূপকছাড়া কিছুই নয়। রাজ- ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিপর্য্যস্ত হিন্দু ও বৌদ্ধ বাঙালীসমাজ মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীগণের প্রদত্ত শক্তি লাভ করে নিজেদের সংকট হ'তে ত্রাণ পেতে চেয়েছিল। শক্তির সাধনা মূলত মুক্তির বাসনা হ'তেই এসেছিল, কাজেই মঙ্গলকাব্যগুলোর মধ্যে সামান্য দৃষ্টিপাত করলেই ওদের আভ্যন্তরিক সামাজিক পরিচয় পাওয়া যায়, ওদের নানাবিধ বর্ণনা ও চিত্র থেকে দেশ ও দেশবাসীর স্বরূপও ধরা পড়ে।

শাসক তরফের হিসেব

রূপরাম চক্রবর্ত্তীর 'ধর্ম্মমঙ্গল' সমগ্র মঙ্গলকাব্য ধারার একটি বিশিষ্ট উপধারা, এ গ্রন্থের রচনাকাল সতের শতক। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের মতানুযায়ী ১৬০৪-৫ খ্রীষ্টাব্দ এবং ডাঃ সুকুমার সেনের মতে ১৬৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দ, যাহোক মতান্তরের খুঁটিনাটির মধ্যে না গিয়ে বলা চলে—সতেরো শতকই ধর্ম্মমঙ্গলকাব্যের রচনাকাল, আর তা' ঐ শতকের প্রথমার্দ্ধেই। কেন্দ্রে তখন মুঘল সম্রাটগণ সিংহাসনারূঢ়। তারাই সমগ্রদেশবাসীর দণ্ডমুণ্ডের একমাত্র কর্ত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

বাংলার প্রাদেশিক শাসনের ক্ষেত্রেও মুঘল সম্রাটদের মনোনীত প্রতিনিধিরাই বিরাজিত। ডাঃ সেনের মত স্বীকার করলে, দিল্লীতে তখন সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকাল (১৬২৭-৫৮) এবং তার দ্বিতীয় পুত্র সুজা বাংলার প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা। রূপরামের 'আত্ম-কাহিনী'তে পাই—

রাজমহলের মধ্যে যবে ছিল সুজা,
পরম কল্যাণে যত আছিলত প্রজা।

মুঘল সম্রাটের এটা পতনকাল না হলেও, নতুনতর উন্নতি আর ঘটছে না। সাম্রাজ্যের অটুটতা মোটামুটি ভাবে তখনো অক্ষুণ্ণ ছিল। 'ধর্ম্মমঙ্গল' কাব্যের রচনা-কালিক শাসকদের তরফের হিসেব এই। মুঘল সম্রাটদের শাসনক্ষমতার গুণে রাজনীতিক শান্তি মোটের পরে ছিল বলেই মনে হয়।

সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গীর সাক্ষ্য

'ধর্ম্মমঙ্গল' কাব্য পাঠে তার অন্যতম যে বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে তা' হ'ল তৎকালিক বাংলার বিশিষ্ট ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি সমন্বয়ের নিদর্শন। ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি সমন্বয়ের প্রাপ্ত নিদর্শনকে তিন ভাগে বিভক্ত করা চলে। প্রথম,

এদেশের বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের সমন্বয়ের যে বৃহত্তর 'হিন্দু সমাজ' ও 'হিন্দু সংস্কৃতি' গড়ে উঠছিল, তার গঠনের কাজ এ সময় সমাধা হয়ে গেছে। প্রাক্ আর্য্য যুগের বিভিন্ন গোষ্ঠীর আচরণীয় 'ধর্ম' ও তাদের আদিম সংস্কৃতির সঙ্গে উন্নত ধরণের ভাবসম্পদে পুষ্ট আর্য্যদের আচরণীয় ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির মিলন সংসাধিত হয়ে বৃহত্তর 'হিন্দু সমাজ' ও 'হিন্দু সংস্কৃতি' গড়ে উঠেছে। তা ছাড়া শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব বলে আখ্যাত বিভিন্ন ধর্মীয় শাখার মধ্যে যে পারস্পরিক কলহ ও দ্বেষের ভাব ছিল 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য পড়ে মনে হয় তা' যেন অনেকটা থিতিয়ে এসেছে এবং বিরোধের ভাব কেটে গিয়ে একটা সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গীরও সৃষ্টি হয়ে উঠেছে, যা' পরবর্ত্তী কালে রামপ্রসাদ সেন (১৭২০—?) প্রভৃতির সৃষ্ট 'শাক্ত পদাবলী'তে এসে সম্পূর্ণভাবে সার্থক হয়েছে, প্রথমটির উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায় ধর্ম্মঠাকুরের পরিকল্পনা। ধর্ম্মঠাকুর আদিম প্রাক্ আর্য্য সমাজের সূর্য্য দেবতা বলেই অনুমিত। বহু রূপান্তরের মধ্য দিয়ে এসময়ে তা' ধর্ম্মঠাকুরের রূপ পেয়েছে। ধর্ম্মঠাকুর যে আদিম জাতির দেবতা মূলত, তার লক্ষ্য মেলে ওর পূজারী ও সেবায়েতদের স্বরূপ দেখে, তারা ডোম, হাড়ি, চোয়ার, চণ্ডাল, লোহার প্রভৃতি আদিম সম্প্রদায়ের (গোষ্ঠী ?) উত্তর পুরুষ। দ্বিতীয়টির নমুনা পাই কাব্যের প্রথমে 'দিগবন্দনা' অধ্যায় থেকে। যেখানে সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ধর্ম্মঠাকুরের সঙ্গে গণেশ, সরস্বতী, চৈতন্য, ঠাকুরাণী প্রভৃতির বন্দনা করা হয়েছে। এমন কি শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বদেবীর পায়ে কবি দণ্ডবৎ হচ্ছেন।

কোটি কোটি দণ্ডবৎ সর্ব্বদেবীর পায়।

তাছাড়া 'গ্রাম্যদেবতা' প্রভৃতির বন্দনা তো আছেই।

গ্রামের দেবতা বন্দো মস্তক উপর।

ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি সমন্বয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে যে তৃতীয় বৈশিষ্ট্যটি পাওয়া যায়, বাংলার সংস্কৃতিকক্ষেত্রে তার গুরুত্ব সমধিক। বিদেশাগত মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাহকরা বাংলা তথা ভারতের মাটিতে পা দেবার অল্পদিন পর হ'তেই তাদের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির সংগে এদেশের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির একটা সমন্বয় সুরু হয়ে যায়। প্রথম দিকে অবশ্য সংঘর্ষ যে ছিল না তা' নয়, তবে অতি অল্পকালের মধ্যেই সংঘর্ষের স্থলে সমন্বয় আরম্ভ হয়। মুসলমান সাধক ও দার্শনিক সম্প্রদায়ই এ বিষয়ে অগ্রনীভূমিকা গ্রহণ করেন। যাঁদের মধ্যে বিখ্যাত মঈনুদ্দিন চিস্তি ইত্যাদির নাম সমধিক উল্লেখ্য। হিন্দু সম্প্রদায়ের সাধকরাও এগিয়ে আসেন। শ্রীচৈতন্য প্রভৃতির নাম এ বিষয়ে স্মরণীয়। এভাবে উভয় ধর্ম্মমতেও সংস্কৃতির সমন্বয়ে এক নতুন উদার দৃষ্টিভংগী জন্ম নেয়। বিশেষ করে দেশের নিম্নস্তরের জনজীবনে এর প্রভাব বেশি করে চোখে পড়ে। এই সমন্বয়ের ফলে 'লা শরীক আল্লাহর' মন্ত্রে দীক্ষিত তৌহীদ-অনুগামী মুসলমানরাও তাঁদের পূর্ব্বপুরুষদের আচরিত নানা লৌকিক ধর্ম্ম ও লৌকিক আচরণকে নিজেদের জীবনে স্বীকৃতি দেয়। পারস্পরিকভাবে হিন্দু সমাজের লোকেরাও মুসলমান পীর, গাজী এদের অলৌকিক মাহাত্ম্যে ও ক্ষমতায় বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে থাকে। এভাবে হিন্দুদের দেবী শীতলা, মনসা প্রভৃতি পূজা পেলে মুসলমানদের; আবার মুসলমানদের পীর বা গাজীরা পূজা পেলো হিন্দুদের। উভয় সম্প্রদায়ের দ্বৈত পরিকল্পনায় নতুন দেবতাও জন্ম নিলো ক্রমে, 'সত্য-পীরের' জন্ম এভাবে। 'ধর্ম্মমঙ্গল' কাব্যের 'দিগবন্দনা' অধ্যায়ে হিন্দু সমাজ ও মুসলমান সমাজের লোকদের মধ্যে পারস্পরিক ধর্ম্ম বিনিময়ের ও সমন্বয়ের নিদর্শন বিশেষভাবে পাওয়া যায়। রূপরাম চক্রবর্ত্তী যেমি হিন্দু দেবতাদের সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে বন্দনা করছেন, তেমি বন্দনা করেছেন মুসলমান পীর ও গাজীদের।

বন্দিব বড়খাঁগাজী গ্রিসিবাটি গাঁ,
নিজ বাটী বন্দিব পেঁড়োর শুভি খাঁ।
ত্রিপর্ণীর ঘাটে বন্দো দফরখাঁ গাজী
তাহার মোকামে বন্দো ষোলশয় কাজী।
জাড়গ্রামের কালুরায় বন্দো সাবধান,
গবপুরে বন্দে বাপা-স্বরূপ নারায়ণ।

অন্যত্র,—

পীর পাখাম্বর বন্দো আছ যতগুলি-
মান্দারণ গড়েতে বন্দিব পীরসমাধি।

পীবসমালি সঙরিয়া যে পথে চলে যায়,
দস্যুতে না মারে তারে বাঘে নাহি খায়।
বন্দিব দবিয়াব পীর নাম কালুরায়,
একশত প্রনাম প্রভুর দুই পায়।

রূপরাম চক্রবর্ত্তী নিজেকে স্থানে স্থানে 'ফকির' পর্য্যন্ত বলেছেন। রূপরাম ফকির ধর্ম্মের গান গায়।

এথেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে সমাজে 'ফকির'দেরও বিশেষ সম্মান ছিল। অন্য ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুরাও 'ফকির' দেব সম্মান দিতে কুণ্ঠিত হত না। সমন্বয়ের ফলাফলটা এছাড়া আরও প্রত্যক্ষবলেই অনুমান করা যায়।

সমাজ জীবনের বিভিন্ন দিক্

'ধর্ম্মমঙ্গল' কাব্যে সেকালের হিন্দু সমাজের বর্ণ-বিন্যাসের যে রীতির উল্লেখ পাওয়া যায়, তা'তে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুসরণেই ব্রাহ্মণদের সমাজের শীর্ষস্থানীয় আসন দেওয়া হয়েছে। ব্রাহ্মণদের অলৌকিক ক্ষমতার কথাও সমাজ স্বীকার করত বলেই মনে হয়। রূপরাম চক্রবর্ত্তী 'বন্দনা' অধ্যায়ে বিভিন্ন দেব-দেবীগণের সংগে 'বিপ্রবন্দনা'ও করেছেন।

বন্দিব বিপ্রেব পদ হয়ে সাবধান,
বিপ্রের চরণ বন্দো করিয়া প্রণাম।

অন্যত্র—

ব্রাহ্মণ গোবিন্দে কিছু ভেদ না করিবে,
যেই বিপ্র সেই কৃষ্ণ অবশ্য জানিবে।

রূপরাম চক্রবর্ত্তী স্বয়ং ব্রাহ্মণ। কাজেই তাঁর রচিত কাব্যে ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রচারের ঝোক থাকাই স্বাভাবিক। ব্রাহ্মণ ব্যতীত 'কাত্রত কাবকুন', রজক নাপিত প্রভৃতি বিভিন্ন পেশায় বিভক্ত সম্প্রদাযেরও উল্লেখ আছে। কায়স্থদের কাজ তহশিলেব হিসেবপত্র রাখা। সমাজের লেখাপড়ার কাজ ওরা করত।

'কাত্রত কারকুন' কত করে লেখাপড়া।

প্রাদেশিক ক্ষেত্রে মুসলমান শাসকরা বহুদিন যাবৎ অধিষ্ঠিত। কাজেই তাদের কাজকর্ম্মে ব্যবহৃত আরবী ফারসী পদবী ও আদব কায়দা ক্রমশ যে সমাজে প্রচলিত হ'বে তা'তে সন্দেহ কী। হয়েছিলও তাই। ও কারণেই 'সিফাই' প্রভৃতি পদবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে তখনো হিন্দু সামন্ত রাজাদের রাজ সভায় হিন্দু আমলের রীতি-নীতি আদব-কায়দা ও পদবী কিছু অক্ষুন্ন ছিল। রাজার চারণ হিসেবে 'ভাটে'র উলেখ পাই। এছাড়া ধর্ম্মপূজার বিবিধ অনুষ্ঠানে এবং অন্যান্য ব্যাপারে এ সব পদবীগুলোর উল্লেখ রয়েছে। যথা: আমিনি (আম্নায়িক) পড়িহার বা পড়্যার (প্রতীহার), মহাপাত্র, শান্তিবিগ্রহী (সন্ধিবিগ্রহিক), সজেই (সজপতি), ঘুড়াইত (ঘোটকপতি) ইত্যাদি।

ক্রমশ সমাজে মুসলমানী পোষাকপরিচ্ছদ গৃহীত হচ্ছিল। রাজকার্য্যেবক্ষেত্রে বিশেষ করেই এ গ্রহণ চলেছিল। হিন্দু-সামন্ত রাজারা এবং তাদের সেনাপতিগণ দরবারে মুসলমানী ঢঙ্এ পশ্চিমী পোষাক পরতেন। যুদ্ধকালে তারা ইজার-পাগড়ি-কাবাই পরতেন। সম্ভবত, ষোলোশতকের পূর্ব্ব হ'তেই এর প্রচলন হয়। (মধ্য-যুগের বাংলা ও বাঙালী—ডাঃ সুকুমার সেন)। রণসজ্জায় সজ্জিত লাউসেনের রূপবর্ণনা করছেন রূপরাম,

পরিল ইজার খাসা নাম মেঘমালা,
কাবাই পরিল দশদিগ করে আলা।
পামরি পাটুকা দিয়া বান্ধে কোমরবন্ধ,...

অন্যত্র,

মাথায়পাগড়ি দেহ গায় জামাজোড়া।

মেয়েরাও (সম্ভবত দরবারের মেয়েরা এবং নর্ত্তকী প্রভৃতি) ইজার ও মেখলা পরত পশ্চিমী ঢঙ্এ। নর্ত্তকীর রূপসজ্জাবর্ণনা করছেন রূপরাম চক্রবর্ত্তী,

ইজার পরিয়া পরে মেখলা কিঙ্কিণী,
ভূষিত হইয়া পরে গলেহাব মণি।

বাংলার নারীদের প্রসাধনদ্রব্যের মধ্যে সিঁদুর ও কাজল বহুকাল থেকেই প্রচলিত। সিঁদুর খুবসম্ভব পরবর্ত্তী কালের বাঙালীরা বাংলার আদিম অধিবাসী কোনগোষ্ঠীর কাছ থেকে পেয়েছিল। রূপরাম চক্রবর্ত্তী বর্ণিত নর্ত্তকীর রূপসজ্জা থেকে এ সব প্রসাধন দ্রব্যের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। যথা, সিঁদুর, কাজল, চন্দন, জাবক, অগুরু-চন্দন, গোরোচনা ইত্যাদি। অলংকরণের বর্ণনা দিচ্ছেন রূপরাম চক্রবর্ত্তী—

কাণে দিল কুণ্ডল কনক পরিজয়,
উপরে বউলি চাকি বসি কথা কয়।
নাকে নাকমাছি পরে নাপান করিয়া,
চাঁদের কলঙ্ক হৈল কিসের লাগিয়া।
পরিল কুলুপ শঙ্খ সুবর্ণ কঙ্কণে,
করে বাজুবন্ধ ঝাঁপা মাদুলী-রসনে।
টাড়ের উপরে পরে বাজুবন্ধ ছড়া,
নাপান করিতে যায় দিয়া বহুনাড়া।
শশীসিন্ধু অঙ্গুলে অঙ্গুরি ছাবময়,
রবিশশী মিলন দুজন কেহ হয়।
গলাভরা পলা পরে শতেশ্বরী হার,
দোমতি তেমতি রসকাঁটি অবিচার।
চরণে নুপুর দিয়া পরিল পাশুলি,
বুকের উপরে বামা পরিল কাঁচুলি।

অলংকরণের এ বর্ণনা থেকে মধ্যযুগীয় বাঙালীর ব্যবহৃত বহুবিধ অলংকারের নাম জানা যায়।

হিন্দুসমাজে বহুকাল হ'তেই (মুসলমান আধিপত্যের প্রারম্ভ হতে ?) সহমরণ ও অনুসরণ প্রথা প্রচলিত ছিল। মুঘল সম্রাট আকবর (১৫৫৬-১৬০৫) একবার এ কুসংস্কার-পূর্ণ প্রথাকে রদ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু সার্থক হলোনা; 'ধর্ম্মমঙ্গল' কাব্যে অনুসরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইছাই ঘোষের সঙ্গে সমরে কর্ণসেনের ছ'পুত্র নিহত হ'লে তাদের বিধবা স্ত্রীরা অনুমৃতা হয়েছিল।

অনুমৃতা আনন্দে হইল ছয়বধূ।

মধ্যযুগীয় বাংলায় কৃষি ও শিল্প পাশাপাশি গড়ে উঠেছিল। বাংলার বস্ত্রবয়নশিল্প বিশ্ববাসীর বিস্ময় উৎপাদন করত। এবং ওরই লোভে একদা পশ্চাত্যের বণিকসমাজ হিংস্রলোলুপ দৃষ্টি নিয়ে ভারতের মাটিতে পা দেয়। তারপরের ট্র্যাজিককাহিনী মোটামুটিভাবে প্রবাদ হয়েই বেঁচে থাকবে চিরকাল। এসময়েও বাঙালীর বয়নশিল্পের উল্লেখ পাই। পট্টবস্ত্র, সুতীবস্ত্র উভয়ধরণের বস্ত্রই এখানে বোনা হ'ত। তাদের সুবিখ্যাত সূক্ষ্মতার বর্ণনাও দিয়েছেন রূপরাম চক্রবর্ত্তী—

বাছিয়া বসনপরে নাম গুয়াগুটি,
বাইশ গজ বসন বাঁ হাতে লয় মুঠি।

বাঙালী সমাজে তখন লিখবার জিনিষ হিসেবে কাগজের প্রচলন থাকার উল্লেখ পাওয়া যায়।

সমুখে লইয়া পাত্র কাগজের গড়া।

বাংলার কৃষিজাত দ্রব্যহিসেবে ধান, পাট, কার্পাস প্রভৃতি সুবিখ্যাত। ধান, কার্পাস ও পাটের দর ওঠা-নামার সংগে মধ্যযুগীয় বাংলার জিনিষপত্রের দর ওঠানামা করত। কৃষিজীবীদের প্রধান ভরসা ছিল ধান, কার্পাস ও পাট।

ধান কাপাস বিনা মোর গ্রহল্য টুট।

কলাই প্রভৃতিও উৎপন্ন হ'ত তখন।

প্রজাদের তথা দেশের সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থার যে বর্ণনা দিয়েছেন রূপরাম চক্রবর্ত্তী তা'তে অতি-কথনের দোষ থাকা সম্ভবপর। ওসময়কার লেখকরা বিভিন্ন সামন্ত রাজাদের অনুগ্রহপ্রাপ্ত হয়ে তাঁদের রাজ সভার ছায়ায় বসে কাব্যরচনা করতেন প্রায়ই। সে কারণে, সেই সব শাসকদের গুণপনা বর্ণনা করা ও তাদের প্রশংসা করা একটা ফ্যাশন হিসেবে ছিল। অবশ্য ব্যতিক্রম যে নেই তা' নয়। তাই, প্রজাদের খাঁটি বাস্তব অবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই বিকৃত হ'ত। তবে মধ্যযুগের বাঙালী কৃষি ও শিল্পের সাহায্যে মোটামুটি সুখে ছিল। তখন সামন্ত-রাজাদের অত্যাচার যে প্রবল আকার ধারণ করত তার বর্ণনা পাই গৌড়ের রাজ সভায় বন্দী প্রজা সোমঘোষের আত্ম-দুঃখ-বর্ণনা থেকে।

খাজনা দেবার সামান্য ত্রুটির অজুহাতে তাকে বন্দী করে আনা হয়েছে।

পঞ্চাশ কাহন দিনু সাত কাহন কানা,
তার পাকে মহাপাত্র দিল বন্দিখানা।

মুদ্রা হিসেবে তখন কড়ির ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। কড়ির ব্যবহার মধ্যযুগীয় বাংলার মুদ্রা-রীতির বিশেষত্ব।

দক্ষিণা আনিয়া দিল দশ গণ্ডা কড়ি।

টাকাকড়ির হিসেব চলত শুভংকরীর মতে। কড়া, বুড়ি, গণ্ডা, পণ, কাহন এভাবে গণনা করা হ'ত।

তৎকালিক বাঙালীর খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে চিড়া, খই, মুড়ির উল্লেখ পাওয়া যায়।

চিড়া ভাজা উড়্যা গেল শুধু খাই জল।

গুড়, চিনিও ব্যবহৃত হ'ত। পান, গুয়া বাঙালীর প্রিয় খাদ্য ছিল বলেই মনে হয়। বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের একটি আকর্ষণীয় বর্ণনা রয়েছে 'রঞ্জার বিবাহ পালা' নামক অধ্যায়ে।

চিনি চাঁপাকলা নাড়ু নিল দশভার,
পাঁচ রাস পরিপাটি পাঁচ উপহার।
বাগুন নারিকেল নিল কান্দি-বান্ধা গুয়া,
তিন ভার খাসা দই এক ভার চুয়া।

জলপথে নৌকা এবং স্থল পথে হাতী, ঘোড়া এসব ছিল প্রধান যানবাহন। উটগাড়ী ও পালকির উল্লেখও পাওয়া যায়।

নানাধনে ভার রোঝা সাজে উটগাড়ী।

অন্যত্র—

আরোহণ করে পুত্র পালকি উপরে।

বাংলা দেশে দুর্গা পূজা এবং শারদীয় দুর্গোৎসব তখন হিন্দু-বাঙালীর প্রধান সামাজিক উৎসব ছিল। চোদ্দ শতকের পূর্ব্ব হ'তেই শারদীয় দুর্গোৎসব হিন্দু বাঙালীর প্রধান সামাজিক উৎসব হয়ে দাঁড়িয়েছিল বলে মনে হয়। (মধ্য যুগের বাংলা ও বাঙালী—ডাঃ সুকুমার সেন)।

দুর্গাপূজা আরাধিলে তিনলোকে সুখী।

অন্যত্র—

আশ্বিন পূজার যোগে তুলেছে কাজল।

হিন্দুদের (মূলত উচ্চবর্ণের) জন্যে সংস্কৃত শিক্ষা এবং মুসলমানদের জন্য আরবী ফারসী মারফৎ মুসলমানী শাস্ত্র শিক্ষা এ-ই ছিল মুসলমান আমলের বাংলার দস্তুর। রূপ-রাম চক্রবর্ত্তীর বর্ণিত 'আত্মকাহিনী' অধ্যায়ে তৎকালিক প্রচলিত সংস্কৃত শিক্ষার পাঠ্যবস্তুর উল্লেখ রয়েছে। যথা, অমর (অমরকোষ), জুমর (জুমর নন্দীকৃত টীকাসমেত সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ), মাঘ, রঘু. নৈষধ, পিঙ্গল (পিঙ্গলের ছন্দঃসূত্র বা প্রাকৃত-পৈঙ্গল) ইত্যাদি।

হিন্দু সামন্ত রাজাদের সভায় মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণ গ্রন্থাদি পঠিত হত।

সমুখে পুরাণ পড়ে পাঠক ব্রাহ্মণ,
রাজা গৌড়েশ্বর শুনে হৈয়া একমন।

সামরিক শক্তির পরিচয়

'ধর্ম্মমঙ্গল' কাব্যে সেকালের রাজা ও সামন্ত প্রভুদের সামরিক বলের বিশেষ উল্লেখ রয়েছে। প্রায়শঃই তা চতুরঙ্গ নর—ত্রি-অঙ্গ—অশ্ব, গজ ও পদাতি। পশ্চিমবংগে নৌবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষাকৃত স্বল্প। তাই, নৌবাহিনীর বিশেষ উল্লেখ নেই। তবে ইছাই ঘোষের যুদ্ধযাত্রার বর্ণনায় নৌবাহিনীরও উল্লেখ রয়েছে।

লোহাটাবর্জ্জর বীর সংগ্রামে সাজিল।
ব্যালিশ কোটাল সঙ্গে যমের সমান,
তরণি উপরে চড়ে অতি বেগবান।

অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে তীর-ধনুক, কামান-বন্দুক, বর্শা-বল্লম, ঢাল-সড়কি, লাঠি, খাঁড়া, গুলতাই-বাটুল প্রভৃতির নাম উল্লিখিত আছে। এ-গুলোর অনুচারী সেনাদলের নামও পাওয়া যায়।

আগে যায় ধানুকি বন্দুকী পাইক ঢালি।

বাগদি, লোহার, ডোম, হাড়ি, চোয়াড়, চণ্ডাল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেরা সুনিপুণ যোদ্ধা ছিল। এরা বাংলার আদিম অধিবাসী বিভিন্ন প্রাক্-আর্য্য কৌমের উত্তর উত্তর পুরুষ। মুসলমান রাজাদের অধীনে মুসলমান সেনা-বাহিনীও ছিল। হিন্দু সামন্ত রাজারা সম্ভবত মুসলমান সৈন্য রাখতেন না বা কম সংখ্যায় রাখতেন।

মোটের 'পরে, 'ধর্ম্মমঙ্গল' কাব্যে সামন্তপ্রথামর্দিত মধ্য যুগীয় বাংলার এবং মূলত গ্রামকেন্দ্রিক সমাজের বাসিন্দা কৃষি ও শিল্পনিপুণ বাঙালীর একটি বাস্তবগর্ভ চিত্র পাওয়া যায়।

প্রতিবিম্ব

[ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ]

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

[পূর্বানুবৃত্তি]

অন্যে দেখিতে না পাইলেও, সেই প্রায়ান্ধকার ঘরে সত্যশরণের চোখ দুটোর অগ্নিদীপ্তি করবীর চোখ এড়াইল না। ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া বলিল, তোর কি উপকার হবে সেইটে যদি বলিস, তাহ'লে হয়ত তোর জামাইবাবু সহজেই রাজী হয়ে যাবেন। নইলে স্বয়ং বিধাতাপুরুষ সাধ্যিসাধনা করলেও তাঁকে ফিরে যেতে হবে।

বল্লরী বলিল, আমার—আমাদের স্বার্থ ত আছেই, নিঃস্বার্থ পরোপকার করবার অবকাশ অথবা অভিলাষ আমাদের নেই। বোর্ডের এডুকেশন সেক্সনের জুবিলী হচ্ছে, সত্যবাবু নিশ্চয় জানেন।

না দিদি, জানবার সুযোগ হয় নি। তুমি বল, শুনি?

সাতদিনের ফাংসন। প্রথম দিন কমিশনার ফেলিটিসেসন। বোর্ডের পাঁচ শ স্কুলের ছেলেমেয়েদের ড্রিল, এক্সারসাইজ, স্পোর্টস। দ্বিতীয় দিনে মেয়েদের থিয়েটার—

মিস্ সুলতা সরকারই বোধ করি এ সবের পাণ্ডা। ফাঁসি কাঠ থেকে নেমে এসেছেন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা চাই বৈ কি!

সুলতা দি' আছেন সত্যি, তবে একা ও অদ্বিতীয়া নন।

আমার কথাটা তুমি শোন নি দেখছি, আমি বলেছি, পাণ্ডা।

না। পাণ্ডা আমি—আমরা। সস্ত্রীক বোস সাহেবকে আমিই অতি কষ্টে রাজী করিয়েছি।

তাহ'লে সত্যিই হার মানলুম দিদি।

আমাদের সাহায্য করবেন?

তোমার স্বার্থটা বল, বুঝে দেখি, তারপর জবাব দোব।

বলবো, মশাই বলবো, অত তাড়া কেন? আগে এটা হয়ে যাক্, তারপর শুনবেন'খন। কি বলছেন, রাজী?

না।

না কেন?

নাই বা শুনলে? খুশি হবার মত কথা ত নয়।

অখুশি হবো না, বলুন।

সত্য এক মুহূর্ত ভাবিয়া লইল, পরে বলিল, অযোগ্য পাত্রে শ্রদ্ধা নিবেদন করার মত বিড়ম্বনা আর নেই। এতদিন এসেছেন বোর্ডের মাথার নৈবেদ্যের গাছ মণ্ডার মতন ব'সে আছেন একটিও ভাল কাজ করেছেন কি? তোমার আমার চাকরী বাকরীর কথা ছেড়ে দাও, স্বয়ং ভগবান এসে বসলেও সে দুঃখ বুঝবেন না; কিন্তু রাস্তা, জল, স্বাস্থ্য—বলো দিদি—এক তিল ভাল করেছেন?

বল্লরী বলিল, খারাপও কিছু করেন নি ত? আর, ভাল কাজ করবার সময়ও ত ব'য়ে যায় নি, সত্য বাবু?

সত্য বলিল, তোমার দুটো কথাই প্রমাণে টেকে না। খারাপ যথেষ্টই করেছেন। তোমার ঐ সুলতা দি 'তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এসোসিয়েশনের লোকেরা বলে, অন্য কেউ হলে, মাটিতে পুঁতে ডালকুত্তা দিয়ে না খাইয়ে ছাড়তো না। উঠতি মুলো পত্তনেই চেনা যায়। ভাল কাজ করবার লোক ও'রা নন। বি-এ পাশ করেছো দিদি, "মর্ণিং শোয়েথ দি ডে" চস কি শোন নি? ইতিহাসে, দিদি, তৈমুর, চেঙ্গিজ ও নাদির শা যে স্থান ও সম্মান আদায় ক'রেছেন, মনে হচ্ছে এ'রা তাদের পাশে কম্‌তি যাবেন না।

করবী মনে মনে ভয় পাইয়া, ভগ্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, বল্লরী, দুটো দিন যাক্ না ভাই, তারপরে আসিস্, কথা হবে। ছেলেটার এই অসুখ দেখছিস্, তার ওপর তোর জামাইবাবুর দু'দিন না-নাওয়া, না-খাওয়া—

না-খাওয়া কেন? বল্লরী জিজ্ঞাসা করিল। ও'র ত চাকরী ভালই, বলিয়া কি-রকম একটু হাসিল।

সত্য বলিল, আই-সি-এস্ বন্দনায় মন নিয়ে আমাদের কষ্ট ত বুঝতে পারবে না তুমি দিদি, ও কথা ছেড়ে দাও।

করবী ভগ্নীর হাতটা ধরিয়া কাছে টানিয়া মৃদু, অত্যন্ত নিম্নকণ্ঠে কহিল, সব কথা এখন বলবার সুবিধে হবে না ভাই। দিনের বেলা একদিন আসিস্ যদি, দেখতে পাবি। কাল ভোরে পুজো দিতে যাব আর আজ পাঁচসিকে পয়সার সম্বল নেই। ঐক'টা পয়সা কোথায় পাই সেই কথাই বলাবলি করছিলুম, তুই এসে পড়লি।

বল্লরী সাশ্চর্যে কহিল, সে কি বলছো ছোড়দি? বোর্ডের বিল্ডিং ওভারশিয়ারদের খুব রোজগার সবাই বলে, ভাই।

এই দেখ্ না কত রোজগার? বলিয়া করবী তাহার কাপড়ের যে অংশটা সামনে পাইল, তুলিয়া বল্লরীকে দেখাইল—শতছিন্ন, অগণ্য গ্রন্থিযুক্ত। যেন চেয়ে দেখা যায় না। দেখিলে, চোখে জল আসিয়া পড়ে, রোধ করা যায় না।

বল্লরী বলিল, ছোট দিদি, আমার কাছে কটা টাকা আছে, তোমায় দিতে পারি, তোমার পুজো না কি বলছিলে—

করবী মনে মনে সাধুবাদ ও আশীর্বাদ করিয়া বলিল, না দিদি, ঠাকুরের পুজো ও দিয়ে হবে না।

বল্লরী কহিল, আমি কাল দুপুরবেলা আবার আসবো। এর মধ্যে যদি পার, দিদি, ছোটজামাইবাবুকে তুমি একটু বুঝিয়ো। সেবার র‍্যালিটা হ'লে খুব গ্র্যান্ড দেখাবে।

বোধ হয় পারবো না। ও মানুষ একবার যখন না বলেছে, তখন হ্যাঁ হবে না।

সংসারের দুঃখু ঘুচবে জানলেও না?

চুপ, চুপ, শুনতে পেলে আর রক্ষে থাকবে না। তাহ'লে এত কষ্টই বা হবে কেন বোন?

তবু একবার চেষ্টা করো, ছোড়দি, কাল আসবো, এখন চলসুম—সে উঠিতেছিল, করবী তাহার বস্ত্রপ্রান্ত ধরিয়া ফেলিয়া টান দিয়া বসাইয়া বলিল, হ্যাঁরে, তোর যে কা'র সঙ্গে লভ্ হচ্ছিল, তার কতদূর কি হোল? বিয়ে হবে কবে

বল্লরী বলিল, বিয়েটাই জীবনের শেষ লক্ষ্য নয় ছোটদি।

করবী হাসিয়া বলিল, দূর হ' পোড়ারমুখী। বিয়ে হবে না যদি তবে লভ্ করছিলি কেন?

লভের জন্যেই লভ্ করি ছোড়দি, বিয়ের জন্যে নয়।

তুই দূর হ'—করবী তাহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিল।

বল্লরী হাসিতে হাসিতে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, কাল আসবো। দূরে দণ্ডায়মান জামাইবাবুর পানে ফিরিয়া বলিল, চললুম, সত্যবাবু, নমস্কার।

নমস্কার। আমরা কবে একপাত পাবো বলতে পার ঠাকরুণ।

আশায় থাকাই ত ভাল, মশাই।

বেশ, আশাতেই প্রাণ রাখলুম, দেখো ভাই, নিরাশ করো না।

গলির মোড়ে মস্ত মোটর দাঁড়াইয়াছিল, সত্যশরণ তাহাদিগকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিয়া করবীকে বলিল, রাত অনেক হয়ে গেলো, মিতু আবার ঘুমিয়ে পড়লো। নাও, আমি সতুর কাছে বসছি, তুমি ওকে তুলে খাইয়ে নিয়ে আস।

সতু ঘুমোচ্ছে। তোমার ভাত মিতুর কাছে দিই, কেমন?

তাই দাও।

রাত্রে আহারাদির পর করবীর সনির্বন্ধ অনুরোধে সত্য সতুর বিছানার নিকটেই একটা বালিশ টানিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। সর্ত ছিল, করবী তাহাকে মধ্যরাত্রে তুলিয়া দিয়া একটু শুইবে। কিন্তু যখন ঘুম ভাঙ্গিল কাক কোকিলের কলকাকলীতে দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ হইয়াছে। করবী স্নানাদি সমাপনান্তে ঘরে ঢুকিয়া কুলুঙ্গী হইতে কাঁটাটা খুঁজিয়া লইয়া দ্বিতলে মেজ বট্‌ঠাকুরের বাড়ীর উদ্দেশে যাইতে প্রস্তুত হইতেছে, তাহাদের দ্বারপ্রান্তে তাঁহারই কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল। করবী বলিল, ওগো, বট্‌ঠাকুর নিজে। আমি ত এই আসছি উপর থেকে। বট্‌ঠাকুর ঘুমুচ্ছিলেন।

সত্য বলিল, মেঘ না চাইতে জল। ব্যাপার গুরুতর বলো। খিলটা খুলে দাও। সতুর অসুখের কি ভাগ্যি!

নিত্য আসিয়া নানা সম্বন্ধ-অসম্বন্ধ প্রলাপ ও বিলাপ সহযোগে এই কথাটাই প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলেন যে, কাল গভীর রাত্রিতে ছেলেটার অসুখের সংবাদ না পাইলে তাঁহারা ত একেবারেই অজ্ঞ থাকিতেন। আর, পরের মুখে ঝাল খাইতে হওয়ায় তাঁহাদের মনস্তাপের অবধি নাই। ইহার পরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাপ্য মর্যাদার তাঁহার ত কোন অধিকারই থাকিবে না। থাকা উচিতও নয়। তবে ইহাও ঠিক যে, দোষ অপরের নহে, তাঁহারই। দোতালা-একতালা, ছেলেটার যে এত বড় অসুখ, খোঁজ নেওয়া ত তাঁহার কর্তব্য ছিল। তিনি সে কর্তব্য কিভাবে পালন করিয়াছেন, তাহা ত কাহারও অজানা নাই। কিন্তু কি ভীষণ আপদ বিপদের ভিতর দিয়াই তাঁহার দিন যাইতেছে, ভগবান ছাড়া কে বুঝিবে সে সব।

'ভাই, আমার ক'টা দিন যে কি ক'রে কেটেছে সে শুধু আমি জানি আর ভগবানই জানেন। বাইশ বছরের চাকরী, বিনাদোষে তা'ও আজ যেতে বসেছে। ভাই রে, এই বয়সে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার হাত ধ'রে বুঝি বা গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াতে হয়। উঃ কি ষড়যন্ত্র, কি ষড়যন্ত্র। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত ভাই রে, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। আমি যে খবর নোব, আমাতে কি আর আমি আছি রে ভাই।

একটু থামিয়া আবার মর্মভেদী কণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিলেন, আর বৌমা, তোমাকেও বলি, মা লক্ষ্মী, নিজের জাবের কাছে মাথার কাঁটা বাঁধা রেখে তুমি পাঁচটি টাকা চাইতে গেলে, মা। সতুর কল্যাণে পুজো দেবে বললে তোমার ভাসুর কি ঐ ক'টি টাকা দিতে পারতো না মা?

সত্য বলিতে গেল, পুজোর টাকা কি-না, চেয়ে চিনতে নিতে নেই মেজদা'।

নিত্য কহিলেন, হাঁরে সত্য, তুইও এই কথা বললি। আমরা যে মায়ের পেটের ভাই রে ভাই। হাঁড়ীই না হয় আলাদা হয়েছে। মা-বাপের রক্ত ত আলাদা হয় নি রে। চলো, মা, চলো, আমি সঙ্গে যাচ্ছি, মা'র পুজো দেবে চলো। আর তোমার যাবার দরকারই বা কি। আমার ভাইপো'র কল্যাণের পুজো আমি দিলে কি মা কালী নেবেন না, ভেবেছো?

করবী প্রকাশ্যে কথা বলিত না, তবে শুনা যায় এমনভাবে বলিত। স্বামীর নিকটে সরিয়া আসিয়া বলিল, বল না বুকের রক্ত মানত আছে—মা'র পায়ে আলতা পরিয়ে দোব, আমাকে যেতেই হবে।

নিত্য বলিলেন, বেশ, চলো, পুজো দেবে চলো, আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাই।

করবী বলিল, ক'টা টাকা আমার দরকার আছে, একটি মাদুলী নিতে হবে।

নিত্য ট্যাঁক হইতে পাঁচ টাকার নোট একখানি বাহির করিয়া ভ্রাতৃজায়ার দিকে হাত বাড়াইয়া বলিলেন, এই নাও। আর কখন্ পুজো দিতে যাবে বল, আমি এসে তোমায় নিয়ে যাব।

করবী কহিল, আমি একটু পরেই যাবো। কিন্তু বড়ঠাকুরকে আর কষ্ট ক'রে যেতে হবে না, তুমি বলো।

সত্যকে কষ্ট করিয়া কোন কথা বলিতে হইল না, নিত্য নিজেই শুনিলেন। বলিলেন, আচ্ছা, আচ্ছা, তুমিই দিয়ে এসো। সত্য তুই খোকার কাছে আছিস্ ত? আমি একটু পরে আসছি। তুই—

তাঁহাকে থামাইয়া দিয়া সত্য বলিল, তোমার কথাটা কি এখনই কেন বলো না। একটু পরেই এসোসিয়েসনের ওয়ার্কিং সেক্রেটারী যদুপতিবা আসবে, তাকে ব'লে দোব'খন আজকের জরুরী মিটিংএই তোমার কেস্‌টা প্লেস্ করবে। দেরী ক'রে লাভ কি!—একটু থামিয়া আবার বলিল, তুমি যখন এসোসিয়েসন থেকে বেরিয়ে গেলে তখন পই পই ক'রে তোমাকে আমি বলি নি যে, মেজদা' এসোসিয়েসনকে দুর্বল করো না। এম্‌প্লয়িসদের ঐ একটাই প্ল্যাটফরম। তা আমি জেনারেল সেক্রেটারী হ'তেই আমার ওপর হিংসেয় তুমি রেজিগনেসন দিয়ে বসলে।

তোমার ওপর হিংসেয়, সতু একথা তুই বললি। তুই আমার মা'র পেটের ভাই হয়ে তুই আমার মুখের ওপর এই কথা বললি। এর চেয়ে আমার মরণ যে ছিল ভাল রে।—বলিতে বলিতে নিত্যশরণ কাঁদিয়া ফেলিলেন। চোখে জল, নাক দিয়া সর্দি, সঙ্গে সঙ্গে হাঁচি ও কাশি সব মিলিয়া জুলিয়া সে এক অদ্ভুত দৃশ্য হইয়া পড়িল।

সত্য বলিল, যাক্ গে সে সব পুরানো কথা। যদুর আসবার সময় হয়ে এলো, সংক্ষেপে তোমার ব্যাপারটা কি বলো ত, শুনি?

সংক্ষেপে কোন কথা বলা নিত্যশরণের অভ্যাস নহে, বরং বড় বেশী ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া কথা বলিতেই তিনি অভ্যস্ত। মোদ্দা কথাটা এই: তিনি একজন ঠিকাদারকে পঞ্চাশটি টাকা কর্জ—অন্য

কিছু নয়, স্রেফ কর্জ—দিয়াছিলেন। ঠিকাদার কাল দুপুরে যখন টাকাটা ফেরত দিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে বোর্ডের গোয়েন্দা পুলিশ টাকাসমেত তাঁহাকে ধরিয়াছে। নোটে হিজিবিজি কতকগুলো লেখার দাগ ছিল, সেগুলোকে পুলিশ সুপারের সহি বলিতেছে। নিতান্তই বাজে কথা। আমাকে তাড়িয়ে সেই যায়গায় কমিশনারের শালার ছেলেকে য়্যাপয়েন্ট করার জন্যে এই সব ষড়যন্ত্র। নইলে দোহাই ধর্ম—

ধর্মের দোহাইয়ে দরকার নেই, মেজদা'। আমি কিছু কিছু আগেই শুনেছি, তুমি আমার কাছে সত্যি কথা বলো। যদি পারি, চেষ্টা করবো।

বললুম ত ভাই।

বিশ্বাস করতে পারলুম না মেজদা', তোমাকেও জানি, তোমার ব্যাভারও জানি। আমার কাছে লুকিয়ে পেরে উঠবে না। বরং আসল কথা জানলে একটা উপায় খুঁজে বার করতেও পারি।

ভাই রে, আমার কপাল মন্দ, নইলে মায়ের পেটের ছোট ভাই হয়ে তুমি আমাকে অবিশ্বাস করবে কেন।

সত্য বলিল, তবে যাও, যা খুশি কর' গে। আমার দ্বারা কিছুই হবে না।

তবে যাই, মাগ-ছেলে-মেয়ের হাত ধ'রে পথে পথে ভিক্ষে ক'রে বেড়াই গে। কি বল বৌমা, সেই ভাল, তাই করিগে যাই। কেমন?

সে তোমার অভিরুচি।—বলিয়া সত্য সেখান হইতে সরিয়া যাইতেছিল, ফিরিয়া আসিয়া বলিল, মেজদা, তুমি টাকা ধার দিয়েছিলে বলছো? সুদ কত ঠিক হয়েছিল?

টাকায় ছ' পয়সা।

কত দিন আগে ধার দিয়েছিলে?

তা প্রায় তিন মাস হবে। হ্যাঁ, তা হবে বৈকি।

কণ্ট্রাক্টার যখন টাকা ফেরত দিলে, তখন সেই সঙ্গে সুদটাও হিসেব ক'রে দিয়েছিল ত?

নিত্যশরণ বিব্রতভাবে বলিয়া উঠিল, সুদটা পরে দেবে বলেছিল।

সত্যশরণ অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিল, মেজ দা, আমার কাছেও মিথ্যাটা ছাড়তে পারলে না? সুদ বাকী থাকে, আসল আদায় দিয়ে যায়, এ কথা কি পৃথিবীতে কেউ বিশ্বাস করবে মনে করেছো? এখনো বলো—

মেজ দা হঠাৎ কনিষ্ঠের হাত দুখানা চাপিয়া ধরিয়া কাঁদ কাঁদ কণ্ঠে কহিলেন, ভাই একটা অন্যায় হয়ে গেছে।

সত্য বলিল, একটা অন্যায় নয়, মেজদা, বিশ বাইশ বছর ধ'রেই অন্যায় চলে আসছে, তুমিও জান, আমিও জানি। বোর্ডের বেয়ারা চাপরাশীও জানে।

ভাই রে, এই আমি পৈতে হাতে ক'রে—

সত্য ধমক দিয়া বলিল, পৈতেটা পুড়িয়ে ফেলাই তোমার উচিত হবে, মেজদা। আচ্ছা মেজদা, তুমি কি মনে করো দুনিয়ার বুদ্ধি যা কিছু সব তোমার ঐ মাথাটার মধ্যে। আর সবাই বোকা গাধা! দু'শ দশটাকা মাইনে পাও তুমি। তোমার দু'টো চাকর, তোমার রেডিয়ো, গ্রামোফোন, সেদিন আবার নতুন রেফ্রিজারেটার এসেছে। তোমার বাড়ীতে নিত্যি ভোজ, নিত্যি কারি কোপ্তা চপ্ কাটলেট। নীচের তলায় তোমার মায়ের পেটের ছোট ভাই, তার ছেলেপুলেগুলো না খেয়ে শুকিয়ে কাঠ হয়ে মরলেও উঁকি মেরে দেখতে কখনও দেখিনি। সে যাক্, ট্যাক্সি ক'রে হরদম্ বড় বড় আমের ঝুড়ি, লেবুর বাস্কেট নিয়ে আসছো, হাঁক ডাক করে উপরে তুলছো। সে কি ঐ দু'শ দশ টাকায় হয়, তুমিই বল না কেন! তা যাক্, এখনকার কথা সে নয়। তুমি এখন যাও, আমি আপিসে গিয়ে খোঁজখবর ক'রে দেখি, কতদূর কি হয়েছে।

দেখিস্ সত্য, ছেলেমেয়ে নিয়ে গাছতলায় না দাঁড়াতে হয়। ভাই রে, এ উপকার জীবনে ভুলবো না, আর এখন থেকে বাড়তি একটা পয়সা ছুঁই যদি, বাবা মার দিব্যি।

দিব্যি দিলেশায় দরকার নেই, আমি খবর করি আগে। তুমি এখন যাও।

যাই ভাই।—বলিয়া নিত্য প্রস্থানোদ্যত হইয়াছেন, করবী আসিয়া পাঁচ টাকার নোটখানা স্বামীর হাতে প্রত্যর্পণ করিয়া কহিল, এটা বটঠাকুরকে ফিরিয়ে দাও এতে মা'র পুজো হবে না; এ টাকা দিয়ে মাদুলী এনে আমার বাছাকে আমি পরাতে পারবো না।

সত্য নিঃশব্দে, কোন কথা না বলিয়া পাঁচ টাকার নোটখানা মেজদা নিত্যশরণের হাতে গুঁজিয়া দিয়া শশব্যস্তে করবীকে বলিল, তোমার কাঁটাটা দাও ত, দেখি যদি মোড়ের মাথার স্যাকরার দোকান খুলে থাকে।

কেন ভাই, এ টাকাটা—মাইরি বলছি সত্য এ চুরির টাকা নয়।

না মেজদা', ওটা থাক—বলিয়া করবীর মাথার কাঁটাটি লইয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

নিত্যশরণ তখন ভাল ভাল নাটকের নায়কনায়িকাগণের পদাঙ্কানুসরণে সলিলকি—বাণীচিন্তা—করিতে লাগিলেন, অতীব কুক্ষণে তিনি কাঞ্চিলাল কন্ট্রাক্টারকে টাকা ধার দিয়াছিলেন। এ বাজারে কি কাহারও ভাল করিতে আছে, ছাই! য়্যাণ্টি করাপসান অফিসার দেখিয়াই কাঞ্চিলাল হারামজাদা যদি ঊর্ধ্বশ্বাসে না দৌড় মারিত, কাহারও কোনও সন্দেহ হইত না। কিন্তু চোর বেটা, কেবল চুরি করিয়া বেড়ায়, আগে ভাগেই মারু টেনে দৌড় করিতে গিয়া আপনিও মজিল, আমাকেও ফাঁসাইল। সত্য ঠিক বলিয়াছে ছুঁচো বেটা দুটো তিনটে টাকা সুদও ধ'রে দিত যদি। চামার, চামার!—অকস্মাৎ সত্যকে আসিতে দেখিয়া ত্রস্তে উঠিয়া পড়িয়া ভ্রাতৃবধূকে "পুজো দিয়ে এসো মা, তারপরে আমি আবার আসবো" আশ্বাসিত করিয়া কঠোর বেগে প্রস্থান। এত দুঃখের মধ্যেও তাঁহার পলায়নের ভঙ্গী দেখিয়া করবীর বিরস আননে সূক্ষ্ম একটি হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়াই মিলাইয়া গেল।

সত্য আসিয়া বলিল, সেকরাটি আশ্চর্য ভাল লোক, করবী, শুধু হাতেই টাকা দিলেন। এই নাও, কাঁটাটা রাখ। শুদ্ধ তাই নয়। সতুর জন্যে কচি ডাব ও'র বাড়ীর গাছ থেকে পাঠাবেন, বললেন। পাছে আমরা না নিই, ও'র ঠাকুরের আদেশটাও আমাকে শুনিয়ে দেওয়া হোল। কারও ছোট ছেলেপুলের অসুখের খবর শুনলেই ঠাকুর গাছের ডাব পাঠাতে হবে, ঠাকুর স্বপ্ন দিয়েছিলেন। ঐ নাও—বুড়ো ডাব ঘাড়ে নিজেই আসছেন।

দেবতা বলো!—বলিতে বলিতে করবীর চক্ষু মুদিয়া আসিল।

[ক্রমশঃ

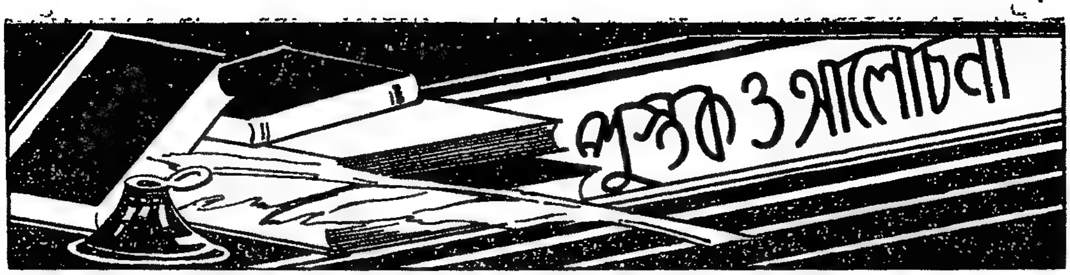

রবীন্দ্রনাথের রেখার কাব্য। শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়, এম্‌-এ। এশিয়া প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স সিন্ডিকেট; ১৯, নূর মহম্মদ লেন, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা মাত্র।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার চিত্রশিল্পকে 'রেখার কাব্য' আখ্যা দিয়াছিলেন। লেখক উল্লেখ করিয়াছেনঃ 'রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবিগুলির অধিকাংশ রেখাপ্রধান এবং কাব্যিকও বটে। তাঁর আঁকা ছবিগুলিতে কবি-চিত্ত ও শিল্পী-চিত্ত—দুইয়েরই যুক্তপ্রকাশ আশ্চর্যভাবে দেখা যায়।' সেই যুক্ত প্রকাশ সম্পর্কেই আলোচ্য গ্রন্থের অবতারণা। শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায় অত্যন্ত নিপুণভাবে চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথকে আঁকিয়াছেন। বাংলার সাংস্কৃতিক আলোচনার ক্ষেত্রে এতদিন এ বিষয়টির অভাব ছিল। শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার গ্রন্থের মাধ্যমে অংশতঃ সে-অভাব পূরণ করিয়াছেন। ডাঃ কালিদাস নাগের ভূমিকা এবং সুদৃশ্য আর্ট পেপারে পরিচ্ছন্ন ছাপা গ্রন্থখানির অধিক মর্যাদা বাড়াইয়াছে।

অ্যালবার্ট হলঃ উপন্যাস। শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। মিত্রালয়ঃ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। মূল্য—সাড়ে তিন টাকা।

সংখ্যায় স্বল্প অথচ ভালো লিখিয়েদের মধ্যে গৌরীশঙ্কর বাবু একজন। ইতিপূর্বে তিনি আনা কারেনিনা, ওয়ার এ্যান্ড পীস, গ্র্যান্ড হোটেল, কশাক্‌স্‌ প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থগুলির বঙ্গানুবাদ করিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার সাম্প্রতিক প্রকাশিত 'অ্যালবার্ট হল' গৌরীশঙ্কর বাবুর সেই খ্যাতিকে সুদূরপ্রসারি করিবে সন্দেহ নাই।

তথাকথিত সংসার-জীবনের মামুলী কাহিনী লইয়া অ্যালবার্ট হল রচিত নয়, অথচ ইহার এক একটি টাইপ চরিত্রের মধ্যে এক একটি বিরাট সংসারেরই ছায়াপাত স্পষ্টভাবে ধরা পড়িয়াছে। একদিন যে অ্যালবার্ট হলে ভারতীয় মনীষীরা আসিয়া বক্তৃতা করিতেন, কালের পরিবর্তনে আজ তাহা ভারতীয় কফি হাউসে পরিণত হইয়াছে। গ্রন্থে লেখক উল্লেখ করিয়াছেনঃ 'সেদিনের পথিক যারা অ্যালবার্ট হলকে আত্মপ্রকাশের ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি দিয়ে ভরিয়ে রেখেছিল, তারা কেউ জানতো না আজকের সম্ভাবনাকে। আজ যদি কোনো অলৌকিক ঘটনাচক্রে কেশব সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, সুরেন বাড়ুজ্জে হঠাৎ অ্যালবার্ট হল কফি হাউসে এসে উপস্থিত হন—তাঁদের কেউ বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রণ করবে না। তাঁরাই কি সেকালের কোনো চিহ্ন খুঁজে পাবেন এই পানশালাতে?' সত্যই পাইবেন না। আজ কফি হাউসকে সর্বক্ষণের জন্য যাহারা মাতাইয়া রাখে—তাহারা হইতেছে জগদীশ, নিশাপতি, অজিত, নিবারণ, ভূতনাথ, তিনকড়ি, যমুনা, রমেন, সতীশ, অমিত, সুমিত্রা, সন্তোষ, অম্বিকাচরণ, বুলবুলী, অনুপম, প্রেম, নারায়ণ, অরুণ, নীলাম্বর এবং তাহাদেরই মতো আরও কতো বিভিন্ন বয়সের এবং বিভিন্ন রুচির নরনারী। ইহাদিগকে লইয়াই এ-যুগের অ্যালবার্ট হল রচিত। একটি বিশেষ দিনকে কেন্দ্র করিয়া গৌরীশঙ্কর বাবু গভীর দরদ লইয়া তাঁহার উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। আঙ্গিক সম্পূর্ণ অভিনব। লেখকের স্বাভাবিক পর্যবেক্ষণশক্তির গুণে এক একটি চরিত্র এক একটি জীবন্ত টাইপ হইয়া উঠিয়াছে। গৌরীশঙ্কর বাবুকে আমাদের সাদর অভিনন্দন।

সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারেঃ স্বপনবুড়ো। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, কলিকাতা ১২। মূল্য ২৷৷০ টাকা মাত্র।

যুগান্তর পত্রিকার 'ছোটদের পাত্‌তাড়ী' বিভাগের পরিচালক স্বপনবুড়ো (শ্রীঅখিল নিয়োগী)র নূতন করিয়া পরিচয় দিবার কিছু নাই। বাংলার অন্যতম শিশু-সাহিত্যিক হিসাবে দীর্ঘকাল পূর্বেই তাঁহার আসন সুপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিল, স্বপনবুড়োর দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া তাঁহার খ্যাতি আরও দূরপ্রসারি হইয়াছে। ১৯৫২ সালে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শিশুরক্ষা সম্মেলনে যোগদান করিয়া দেশ-বিদেশের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশিয়া তিনি যে বিপুল অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, তাহারই ভিত্তিতে আলোচ্য গ্রন্থখানি রচিত। তাই বলিয়া একমাত্র সেই অভিজ্ঞতার বর্ণনার মধ্যেই গ্রন্থখানি শেষ হয় নাই। সেই সঙ্গে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা কি ভাবে শিক্ষায়, সভ্যতায়, জ্ঞানে ও আদর্শে বড় হইয়া পৃথিবীর অন্যান্য স্বাধীন দেশের ছেলেমেয়েদের সমপর্যায়ে গিয়া দাঁড়াইতে পারে, তাহারও একটা কার্যকরী ইঙ্গিত গ্রন্থখানির সর্বত্র পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। অখিল বাবু সব্যসাচী শিল্পী। বাংলার কিশোর-কিশোরীদের জন্য তিনি যে একাধারে গল্প, কবিতা উপন্যাস, নাটক, রসরচনা ও ভ্রমণ-সাহিত্যই কেবল দান করিয়াছেন, তাহা নয়, সেই সঙ্গে নিজেকেও দিয়াছেন। 'স্বপনবুড়ো'র কীর্তি তাহার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। আলোচ্য গ্রন্থে নানা দেশের নানা ছবি সংযোজনা করিয়া তিনি ছেলেমেয়েদের আরও বেশী মনোরঞ্জন করিয়াছেন। গ্রন্থখানি তাহার যথোপযুক্ত ক্ষেত্রে সাদরে গৃহীত হইবে বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি।

সম্পাদকীয়

স্বাগত নববর্ষ

দেখিতে দেখিতে আমরা আর-একটি নবীন বৎসরের স্নিগ্ধ উষাপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। জীর্ণ ক্লান্ত পুরাতন বৎসর আজ অতীতের ইতিহাস ভিন্ন আর কিছুই নয়। এমনি করিয়াই এক একটি বৎসরকে অতীতের ইতিহাসের পথে নিক্ষেপ করিয়া আমরা সামনের পথে অগ্রসর হই। জন্ম-মৃত্যুর কত ইতিহাস, দুঃখ-সুখের কত কাহিনী, হাসি-কান্নার কত আলেখ্যই না এমনি করিয়া আমরা বৎসর হইতে বৎসরান্তরে অতিক্রম করিয়া চলিয়াছি। অনন্তকাল ধরিয়া এই চলার গতি একই নিয়মে বহিয়া চলিয়াছে। যাহাকে একদিন নবীন বলিয়া গ্রহণ করিলাম, নানা পাদ্য-অর্ঘে যাহাকে একদিন আরতি করিয়া ঘরে তুলিলাম, কালের অমোঘ নিয়মে আর একদিন তাহাকেই ত্যাগ করিয়া আবার কোনো নূতনতর পথে আমাদিগকে পা বাড়াইতে হয়। পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত দিনগুলি তখন বিস্মৃত স্বপ্নের মতো ছায়ালোকে বিচরণ করে। ১৩৫৯ সালও আজ এমনই একটা ছায়াচ্ছন্ন অতীত ভিন্ন আর কিছু নয়।

১৩৬০ সালের স্নিগ্ধ প্রভাতে নব বৎসরের উদয়-ভৈরবীরাগে আমাদের ঘুম ভাঙিল। জাগিয়া উঠিয়া দেখিলাম—পাশে দেওয়াল-পঞ্জিতে নবীন স্বাক্ষর। গতকল্যের চড়কের ঢাকের বাদ্যে যে রাত্রি নিঃশেষ হইল, সেই রাত্রি আর কোনোদিনই ফিরিবে না। নব বর্ষের নবীন উষালগ্নে আজ সূর্যকিরণে আর বনমল্লিকার গন্ধে যে উদয় ভৈরবী বাজিয়া উঠিয়াছে, তাহারই সুরে হৃদয় আপনি গাহিয়া ওঠে—

'জাগো জাগো হে পুষণ, হে নবীন ছন্দ।
খুলে দাও, ভেঙে দাও যত মোহবন্ধ।
আনো তেজ আনো প্রাণ
আনো প্রেম আনো গান,
করো নাশ তিমিরের সংশয় সন্দ।
এস চির উজ্জ্বল এস হে আনন্দ।'

অতীতের জড়তা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া নবীন সূর্যকরোজ্জ্বল দিনের আলোয় অবগাহন করিয়া আমরা শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ হইতে চাই। তাই জবাকুসুমসঙ্কাশং সেই মহাদ্যুতি পুষণের ধ্যানে মন এমন মর্মরধ্বনিতে জাগিয়া ওঠে। বার বার নবীন বৎসর আসিয়া আমাদের চিত্তে এই জাগরণের প্রেরণা সৃষ্টি করে। আনন্দের মধ্যে আমরা তখন শক্তি-উদ্বুদ্ধ হই, নতুন প্রাণের অঞ্জলী ঢালিয়া আমরা তখন নব-যৌবনের প্রসাদ রচনা করি। নতুন বৈশাখ তাহার নব-কিশলয় সদৃশ বাহুযুগল বাড়াইয়া আমাদিগকে সম্ভাষণ জানায়। আমরাও প্রতি-সম্ভাষণে শঙ্খজন্যে বিজয়ধ্বনি তুলিয়া তাহাকে আমাদের ঘরে তুলিয়া আনি। আজ দেওয়াল-পঞ্জিতে সেই নবীন বৈশাখেরই স্বাক্ষর। আমাদের অঙ্গনে প্রাঙ্গণে সেই শুভ বৈশাখেরই প্রতিষ্ঠা।

কি ছিলাম, তাহা লইয়া আজ মিথ্যা ভাবিয়া সময় নষ্ট করিব না। কত বেশী সততা ও সত্যের-মধ্যে আমরা মহৎ ও সত্য হইয়া উঠিতে পারি, আজ সেই চিন্তাই করিব। অতীতের পাপের জন্য আজ যেমন আমরা প্রায়শ্চিত্ত করিব, তেমনি এই শপথও যেন আমরা উচ্চারণ করিতে পারি—আমরা নির্লোভ হইব, পরের কারণে আত্মস্বার্থ বিসর্জন দিব, দেশকে ফুলে ফলে শস্যে সম্পদে জাগাইয়া তুলিব, সমাজকে কল্যাণের পথে লইয়া যাইব, গৃহকে আশ্রমের মতো পবিত্র করিয়া তুলিব, আমরা খাঁটি হইব, সৎ হইব, পূর্ণ মানুষ হইয়া উঠিব আমরা। স্বদেশ ও স্বজাতির দীক্ষায় সকলকে দীক্ষিত করিয়া নব-বর্ষের নবীন আনন্দে এইদিনে আমরা পারস্পরিক সৌভ্রাত্রসূত্রে আবদ্ধ হইব। আমাদের এই সুখবাসরে ১৩৬০ সালের বর্ষবোধন হউক শ্রী ও কল্যাণের প্রতীক। তাহাকে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া বলিঃ আজ হইতে তোমার উজ্জ্বল মুহূর্তগুলি শ্রেয়তর সঙ্গে সার্থক হইয়া উঠুক। স্বাগত তোমাকে, তোমাকে আমাদের সাদর অভিবাদন।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা সমস্যা

শিক্ষাব্যবস্থা লইয়া ইতিপূর্বে বহুস্থানে বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে এবং বর্তমানেও নিয়মিতই আলোচনা চলিতেছে। ইহা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, শিক্ষাগত সমস্যাগুলি এখন পর্যন্ত অপরিবর্তিতই রহিয়াছে। প্রশ্ন হইতেছে, ইহার সমাধান হইবে কি উপায়ে? বৃটিশ আমলে যে শিক্ষাপদ্ধতি এদেশে প্রচলিত ছিল, আজও তাহাই আছে। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত শিক্ষার প্রসার যাহা হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ বেসরকারী ভাবে শিক্ষানুরাগী কর্মী ও বদান্য-ব্যক্তিবৃন্দের অর্থানুকূল্যেই হইয়াছে, শাসক সম্প্রদায় শিক্ষা-নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিকেই বাছিয়া লইয়াছিলেন। এদেশকে অশিক্ষার অন্ধকারে তিমিরাচ্ছন্ন রাখিতে পারিলেই শাসক-গোষ্ঠির বনিয়াদ দীর্ঘকালের জন্য পাকা থাকিবে—এমনই একটা দুর্বিনীত ভাব ইংরেজ-গভর্নমেন্টকে পাইয়া বসিয়াছিল। রাজকার্য পরিচালনার জন্য মোটামুটি তাঁহারা কিছু লোককে ইংরেজিয়ানায় অভ্যস্ত করিয়া লইয়াছিলেন মাত্র। ফলে গণশিক্ষার ক্ষেত্রটি চিরকালের জন্যই অবহেলিত ও উপেক্ষিত হইল। বেসরকারী উদ্যমে সেই শিক্ষাক্ষেত্র অনেকাংশে সম্প্রসারিত হইলেও বহুলাংশেই অকৃতকার্য রহিয়া গেল। দেশ স্বাধীন হইবার পরেও অবস্থার কিছু-মাত্র তারতম্য ঘটিল না। ইংরেজি অনুশাসনকেই স্বদেশী গভর্নমেন্ট মনে প্রাণে গ্রহণ করিয়া ইংরেজ-শাসকগোষ্ঠির রেখাঙ্কিত পথ ধরিয়াই চলিতে সুরু করিলেন। যে পদ্ধতি অবলম্বন করিলে এবং যে সংখ্যক অর্থ বরাদ্দ করিলে শিক্ষার মান উন্নত হইতে পারে—সে পথ তাঁহারা পুরাপুরি বর্জন করিয়াই চলিলেন। এদিকে জনসাধারণের জীবনে শিক্ষার পথ গ্রহণ না করিয়া উপায় নাই। চাকুরী, ব্যবসা প্রভৃতি সর্ব ক্ষেত্রেই মস্তিষ্কে যথেষ্ট বিদ্যা ও বুদ্ধি লইয়া তবে প্রবেশ লাভের সুযোগ ঘটে। ফলে ছেলেমেয়েদিগকে উপযুক্ত শিক্ষার সুযোগ দিতে হয়। তাহারা 'গাড়ি ঘোড়ায় চড়িয়া' স্ফূর্তি অনুভব না করুক, অন্ততঃ ঘরে দুই পয়সা আনিয়া সংসারক্ষেত্রকে উর্বর রাখিতে পারিবে। কিন্তু দিন-কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই গুড়েও বালি পড়িল। শিক্ষার ক্ষেত্রে বেকারবৃত্তি বাড়িয়া উঠিল। স্কুল কলেজ ডিঙ্গাইয়া আসিয়াও ছেলেমেয়েরা জীবনসংগ্রামের ক্ষেত্রে উপযুক্ত অবলম্বন খুঁজিয়া পাইল না। ব্যবসার বাজার মন্দা, চাকুরীর ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ। জনসাধারণের এই গুরুতর সমস্যা গভর্নমেন্টের হৃদয় স্পর্শ করিল না। ফলে শিক্ষাসম্পর্কে জনসাধারণের জীবনে ধিক্কার আসিল। শিক্ষাপ্রসারকল্পে একদিন যাঁহারা উদ্যোগি হইয়া অর্থ ও শ্রমের ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়াছিলেন, আজ তাঁহারা বা তাঁহাদের উত্তরসাধকেরা উহার অসারতা উপলব্ধি করিয়া পুরাপুরি নিষ্ক্রিয় হইয়াই পড়িয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত শিক্ষার মূল ক্ষেত্রে পাঠ্যতালিকা প্রভৃতি সংক্রান্ত আরও বহুতর সমস্যাই রহিয়া গিয়াছে। শিক্ষার্থী, শিক্ষক বা শিক্ষাব্রতী এবং এমন কি অভিভাবকশ্রেণীর সমস্যাও ইহার অঙ্গীভূত। পাঠ্যতালিকা সংস্কারের বিষয় লইয়া এযাবৎ বহুতর আলোচনাই মুখর হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু অদ্যাবধি তাহার বিশেষ কোনো কার্যকারিতা পরিলক্ষিত হয় নাই। এই যেমন একদিকের সমস্যা, অন্যদিকে তেমনি স্কুল-কলেজের ছাত্র-বেতনের হার অত্যধিক বাড়িয়া যাইবার ফলে মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজে যেভাবে শিক্ষাসংকট দেখা দিয়াছে, তাহাও একই পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ।

সম্প্রতি সিউড়ীতে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সম্মেলনে বিষয়গুলি লইয়া বিভিন্ন অধ্যাপক বিস্তৃত আলোচনা করেন। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী। ভাষণপ্রসঙ্গে তিনি যে সকল তত্ত্ব ও তথ্য প্রকাশ করেন, বর্তমান শিক্ষা-সমস্যা প্রসঙ্গে তাহা নানাদিক দিয়াই উল্লেখযোগ্য। অভিভাষণে শিক্ষা সম্পর্কে সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীর উদাসীনতা ও গতানুগতিকতা, শিক্ষাখাতে ব্যয়-কার্পণ্য, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার ও পরীক্ষণরীতির ত্রুটিবিচ্যুতি, ছাত্রগণের অধিকসংখ্যায় অকৃতকার্যতার কারণ ইত্যাদি নানা বিষয়ের আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিয়া তিনি বলেন যে, সরকার বা অপরের সাহায্য-নিরপেক্ষভাবেই বর্তমান নিরুদ্যম ও নৈরাশ্যময় পরিবেশের মধ্যেই শিক্ষকগণকে তাঁহাদের কর্তব্য পালন করিয়া যাইতে হইবে এবং পথপ্রদর্শকরূপে দেশের যৌবনশক্তি ছাত্রগণকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করিতে হইবে। —অধ্যাপক চক্রবর্তীর ভাষণটি সংক্ষিপ্তাকারে এখানে উদ্ধৃত করা বোধ করি অযৌক্তিক হইবে না। তিনি বলেন:

'বেসরকারী বিদ্যালয়গুলি চিরকালই সরকারের নিকট হইতে বিমাতাসুলভ ব্যবহার পাইয়া আসিতেছে। আজ দেশে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হইলেও সেই মনোভাবের বিশেষ কোনো পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইতেছে না। আজ হয় সমস্ত কলেজগুলোর আর্থিক দায়িত্ব সরকার স্বহস্তে গ্রহণ করুন, নয়তো সমস্ত কলেজগুলোকে একটা সুপরি-কল্পিত মাপকাঠি অনুসারে অর্থসাহায্য করুন।...আমাদের বর্তমান শিক্ষা সমস্যার একটি গোড়ার কথা এই যে, শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য এবং যোগাযোগ

স্থাপনের কোনো ব্যবস্থা নাই। প্রাথমিক শিক্ষার হর্তা-কর্তা-বিধাতা ডি, পি, আই মহোদয়। মাধ্যমিক শিক্ষার দায়িত্বভার পড়িয়াছে সরকার নিয়ন্ত্রিত মাধ্যমিক শিক্ষা-বোর্ডের উপর; আর উচ্চতর কলেজীয় শিক্ষায় খবরদারী করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাজ্ঞ ও প্রাচীন কর্ণধারগণ। তাহার ফল হইয়াছে এই যে, গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত শিক্ষা-সংস্কারের কোনো ধারাবাহিক ও সুস্পষ্ট পরিকল্পনা একেবারেই গ্রহণ করা হইতেছে না। শিক্ষার্থিগণ বিভিন্নস্তরে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কবলে পড়িয়া তাঁহাদের খেয়াল-খুসীর উপর নির্ভর করিয়া অসহায়ভাবে ভাসিয়া চলিয়াছে। এক্ষেত্রে যদি দেশের সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা-ব্যবস্থার সত্যকার উন্নতিসাধন করিতে হয়, তবে বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিস্থানীয় শিক্ষাব্রতীদের লইয়া একটি স্থায়ী সংগঠন গড়িয়া তুলিতে হইবে।...বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য মহাশয়ের আবির্ভাবের পর হইতেই কলেজের ছাত্ররা প্রতিবৎসর পরীক্ষায় গড়ে প্রায় শতকরা ৭০ জন ফেল করিতেছে। উপাচার্য মহাশয় দাবী করিয়াছেন, তিনি কঠোর হস্তে 'গ্রেস মার্ক্‌স্' তুলিয়া দিয়াছেন, পরীক্ষার্থীরা যাহাতে ইংরেজি নোট বা অর্থপুস্তক হইতে মুখস্ত করিয়া কোনো প্রশ্নের উত্তর না করিতে পারে, সেইভাবে প্রশ্ন করার নির্দেশ দিয়াছেন এবং এসব কারণে তাঁহার নাম যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণের মধ্যে নিম্নতম স্থানে ধার্য হয়, তাহাতেও তিনি দুঃখিত হইবেন না। যাহা হউক; এই কয় বৎসর ধরিয়া যে ছাত্রনিধন চলিয়াছে, তাহার কারণ অনুসন্ধান করাও কর্তব্য। —আমরা জানি, ফেল করা ছাত্রদের শতকরা প্রায় ৭০ জন ইংরেজিতেই পাশ করিতে পারে না। তাহাদের মধ্যে অনেকে অন্যান্য বিষয়ে, শতকরা এমন কি ৫০।৬০ নম্বর পাইয়া থাকে, এমনও দেখা যায়। কাজেই ইংরেজি বিষয়টা হইতেছে পরিক্ষার্থীদের প্রধান প্রতিবন্ধক। ইহাতে ছাত্রদের দায়িত্ব কতটা, বিবেচনা করা নিশ্চয়ই অসমীচীন হইবে না। দায়ী প্রধানতঃ শিক্ষার কর্ণধারগণ।... ইংরেজি সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে বলিয়া মনে করি। আমার মতে, যে সাধারণ ছাত্র আই-এস্‌-সি পাশ করিয়া কোনো টেক্‌নিক্যাল শিক্ষার দিকে যাইবে, তাহার পক্ষে ইংরেজির একটা সাধারণ ব্যবহারিক জ্ঞানই যথেষ্ট। তাহার পক্ষে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার একটি প্রশ্নপত্র ও পাশের নম্বর শতকরা ৩০ হওয়াই উচিৎ। কিন্তু যাহারা বি-এ পরীক্ষায় সাহিত্য পড়িবে, তাহাদের জন্য ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় আরও দুইটি প্রশ্নপত্র রাখা চলিতে পারে। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ব্যবস্থা আছে।...আমার মতে মোটামুটিভাবে বি-এ পর্যন্ত সকল ছাত্রের জন্য ইংরেজির একটি সহজ কম্পোজিশন প্রশ্নপত্র বাধ্যতামূলক থাকা উচিৎ। তাহাতে থাকিবে বাংলা হইতে ইংরেজিতে অনুবাদ, চিঠিপত্র আর মর্মার্থ প্রকাশ ও সাধারণ রচনা। এতদ্ব্যতীত ইংরেজির আরও দুইটি প্রশ্নপত্র স্বেচ্ছানুসারে ছাত্রেরা নিতে পারিবে। তাহাতে থাকিবে ইংরেজি সাহিত্য হইতে নির্বাচিত গদ্য ও কবিতা। তাহার উদ্দেশ্য হইবে ইংরেজি সাহিত্যের বোধ ও রসাস্বাদন। সাহিত্যের এই দুইটি প্রশ্নপত্রের উত্তর ছাত্ররা মাতৃভাষায় লিখিতে পারিবে—এমন ব্যবস্থা থাকা উচিৎ।...তিনটি প্রশ্নপত্রের উত্তরের জন্য তিনজন আলাদা প্রধান-পরীক্ষক নিযুক্ত না করিয়া একজন প্রধান পরীক্ষক নিযুক্ত করিলে দেখা যায় যে, পুনর্বিবেচনার সময় সাহিত্যপত্রের দুই চারি নম্বর অনায়াসেই দিয়া দেওয়া যায়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এই সামান্য আবেদনেও কর্ণপাত করেন নাই। মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড এই নীতি গ্রহণ করিয়া সুফল পাইতেছেন।... কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নববিধান দেশের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নবতর পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে। এই আইন সম্পর্কে আমাদের সমিতির সুপারিশগুলিতে বিশেষ কর্ণপাত করা সরকার আবশ্যক মনে করেন নাই। রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের মূল আদর্শ এবং মুখ্য সুপারিশগুলিকেও তেমন আমল দেওয়া হয় নাই। একটু বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, দেশের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারী আধিপত্য সম্প্রসারণের চেষ্টাই এই আইনের এক প্রধান লক্ষ্য। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সার্বভৌম ক্ষেত্রে শিক্ষকদের যে পরিমাণ প্রতিনিধিত্ব থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহাও নতুন বিশ্ববিদ্যালয় আইনে প্রকৃত শিক্ষকদের দেওয়া হয় নাই। কিন্তু তবু শিক্ষাব্রতিগণকে এই ব্যাপারে অসহযোগিতার মনোভাব লইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। বিশ্ববিদ্যালয়কে নানা দিক দিয়া নতুনভাবে রূপায়িত করা প্রয়োজন। দেশের নতুন পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো পরিবর্তন হয় নাই। শিক্ষাই সর্ববিধ অগ্রগতির মূল উৎস। বাঙালীকে প্রতিযোগিতামূলক নূতন জগতে বাঁচিতে হইলে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ও সংস্কৃতির এই মুখ্য পীঠস্থানের আমূল সংস্কার সাধন করিতে হইবে।'

একথা আমরাও বহুবার বহুভাবে আলোচনা করিয়া সরকারী কর্তৃপক্ষ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টি এই দিকে ফিরাইতে চেষ্টা করিয়াছি। অধ্যাপক চক্রবর্তীর ভাষণে আমাদেরই প্রতিধ্বনি নতুন করিয়া অনুরণিত হইয়া

উঠিয়াছে। আশা করি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অবিলম্বে উল্লেখিত সমস্যাগুলির সমাধানে অগ্রণী হইয়া দেশ ও জাতির মহৎ কল্যাণ সাধন করিবেন। এ সম্পর্কে সময়ের অপব্যবহার মোটেই বাঞ্ছনীয় হইবে না।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

গত ৩রা ও ৪ঠা এপ্রিল শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরী হলে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের দুইদিনব্যাপী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানের গ্রন্থাগার-সমূহের প্রতিনিধিস্থানীয় প্রায় ৩০০ প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন। উভয় দিনের অধিবেশনে যথাক্রমে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের চেয়ারম্যান ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং শেষোক্ত দিন ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়ের পৌরোহিত্যে সমাপ্তি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন উপলক্ষে জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রী বি, এস্, কেশবন একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এই প্রদর্শনীতে চিত্র ও প্রাচীরপত্রাদির সাহায্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্রমবিস্তৃতি দেখানো হয়; এতদ্ব্যতীত কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য পুস্তকও প্রদর্শনীকে চিত্তাকর্ষক করিয়া তোলে। যাঁহারা সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া বাণী পাঠান, তাঁহাদের মধ্যে ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ, রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ইউনেস্কোর গ্রন্থাগার শাখার মিঃ এড্ওয়ার্ড কার্টার, ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সঙ্ঘের সভাপতি ও মাধ্যমিক শিক্ষাপরিষদের প্রেসিডেন্ট শ্রী এ, কে, চন্দ তাঁহার ভাষণে মধ্যশিক্ষার বিদ্যালয়গুলিতে যেসব গ্রন্থাগার আছে, সেগুলিকে প্রকৃত কার্যকরী করিবার প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করেন। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিয়া শ্রী বি, এস্, কেশবন বলেন যে, গ্রন্থাগারগুলি যাহাতে তরুণ ও কিশোরদের চিত্তাকর্ষক হয়, পরিচালকগণের সেইরূপ ব্যবস্থা করা উচিৎ। তাহা না করিয়া কতকগুলি নিষেধাজ্ঞার বাণী এখানে ওখানে উৎকীর্ণ করিয়া রাখিয়া গ্রন্থাগারকে পাঠকদের বিভীষিকাস্বরূপ করিলে গ্রন্থাগারের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হইয়া যায়।

ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহার ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন যে, আমাদের দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। এই সম্পর্কে একটি যুগোপযোগী চেতনাও নানাদিকে দেখা যাইতেছে। আরও বেশী গ্রন্থাগার দেশের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গভর্নমেণ্ট এ সম্পর্কে বিশেষ অবহিত না হইয়া কয়েকটি গ্রন্থাগারকে কিছু কিছু অর্থসাহায্য দিয়াই যেন তাঁহাদের কর্তব্য শেষ করিতেছেন। —বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের যেসকল প্রয়াস হইয়াছে, তাহার ইতিহাস বর্ণনা করিয়া ডাঃ চট্টোপাধ্যায় বলেন যে, মন্দিরগাত্রে খোদিত চিত্রকাহিনী, যাত্রা কথকতা প্রভৃতিই ছিল একসময় সাধারণ মানুষের গ্রন্থাগার। প্রাচীনকালে বা মধ্যযুগে কোনো সাধারণ গ্রন্থাগারের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। কয়েকটি ব্যক্তিগত গ্রন্থসংগ্রহের কথা জানা যায় মাত্র। —আধুনিক কালে বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষের সংস্কৃতি যদিও ইংরেজি শিক্ষাকে অবলম্বন করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে, তথাপি ইংরাজরা প্রথমে এদেশে কোনো সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে নাই। ইংরাজী বিদ্যালয়গুলিতে সে-সময়ে কোনো গ্রন্থাগারের বালাই ছিল না। কলিকাতা মেটকাফ্ হলে প্রথম সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। কতকগুলি কলেজকে কেন্দ্র করিয়া কয়েকটি গ্রন্থাগার গড়িয়া ওঠে। কিন্তু সেগুলির কার্যকারিতা সীমাবদ্ধ ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙালীর সংস্কৃতি যে সকল ধারায় প্রকাশিত হয়, গ্রন্থাগার আন্দোলন তাহার অন্যতম। কলিকাতার পল্লীতে পল্লীতে সেই সময়ে উৎসাহী যুবকগণ অনেকগুলি গ্রন্থাগার স্থাপন করে; এই সকল গ্রন্থাগারের মধ্য দিয়া সুলভে পাঠ করিবার সুযোগ লাভ করায় বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি সাহিত্যিকগণের রচনা সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এইভাবে সেই সময়ে গ্রন্থাগারগুলি বাংলা সাহিত্যের প্রচারে বিশেষ সহায়ক হয়। —ডাঃ চট্টোপাধ্যায় বলেন যে, গ্রন্থাগারের সহিত সংযোগ যে দেশবাসীর মানসিক উন্নতির একমাত্র পথ, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কার্লাইল বলিয়াছেন—'আজিকার দিনে পুস্তকই হইল সত্যকারের বিশ্ববিদ্যালয়।' একথা খুবই সত্য। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বহু উন্নত ধরণের ও চিত্তাকর্ষক গ্রন্থাগার গড়িয়া তোলা হইয়াছে। এই সকল দেশ যে পরিমাণ অর্থব্যয় করে, ভারতবর্ষের পক্ষে তাহা সাধ্যাতীত হইলেও উহাদের দৃষ্টান্ত সম্মুখে রাখিয়া গ্রন্থাগারের বহু উন্নতি করা যাইতে পারে। এখন কিছু লোকের দৃষ্টি যে এদিকে পড়িয়াছে, তাহা আনন্দের বিষয়। গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মিগণ দেশের আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিতেছেন, এজন্য তাঁহারা অভিনন্দনযোগ্য।

এই জাতীয় সম্মেলন শুধু একবারই নয়, প্রতি-বৎসর

যাহাতে পশ্চিমবঙ্গের এক একটি সহরে অনুষ্ঠিত হয়, তজ্জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার-সঙ্ঘকে কার্যকরী ব্যবস্থায় অগ্রণী হইতে হইবে। দেশের কোনো কোনো গ্রন্থাগার গভর্ণমেণ্ট ও পৌর প্রতিষ্ঠানের সাহায্য পায় বটে, কিন্তু তাহাতে আপামর গ্রন্থাগারগুলির ঔৎকর্ষ ঘটিতে পারে না। জনসাধারণকে গ্রন্থাগারের সার্থকতার প্রতি আকৃষ্ট করিতে হইবে; গ্রন্থাগার যত বিস্তৃত ও শ্রেষ্ঠ মনীষিগণের চিন্তার খনি হইয়া প্রচার লাভ করিবে, দেশও তত বেশী শিক্ষিত ও সাংস্কৃতিক আলোকে উজ্জ্বল হইয়া এতকালের নিরুদ্ধ অন্ধকার কাটাইয়া উঠিতে পারিবে। দেশ জাগিবে, জাতি জাগিবে।

নিখিলভারত ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠন সম্মেলন

গত ৩রা ও ৪ঠা এপ্রিল নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠন সম্মেলন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কংগ্রেস যে সময়ে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হন, তখন হইতেই তাঁহারা ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠন পরিকল্পনাটি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশ স্বাধীন হইবার পর, কংগ্রেস তথা স্বাধীন ভারত গভর্ণমেণ্ট নানা বিরুদ্ধবাদী যুক্তি উত্থাপন করিয়া পরিকল্পনাটিকে মোটামুটি নাকচ করিয়া দিতেই উদ্যত হন। কিন্তু ভারতীয় জনগণ—বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গ ও মাদ্রাজের অন্ধ্রবাসী ইহাকে স্বীকার করিয়া লইতে রাজি হইলেন না। ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের আন্দোলনে পশ্চিমবঙ্গের মানভূমে যেমন বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়া উঠিল, তেমনি অন্ধ্রের অবিসংবাদী নেতা শ্রীরামলু অনশনে প্রাণ বিসর্জন করিলেন এবং জনগণ ভারত গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহে মাতিয়া উঠিলেন। শ্রীরামলুর মৃত্যুই স্বতন্ত্র অন্ধ্ররাজ্য গঠনকে ত্বরান্বিত করিল। ভারত গভর্ণমেণ্ট সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের স্বতন্ত্র রাজ্য গঠন ব্যবস্থায় অগ্রণী হইলেন। দেখাদেখি পাঞ্জাবীরাও তাঁহাদের ভাষাভিত্তিক স্বাতন্ত্র্য দাবী করিলেন; তৎসহ পশ্চিমবঙ্গের দাবী তো অক্ষত অবস্থায় রহিয়াছেই। ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিয়া মূল বিষয়ের প্রতি ভারত গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি।

সম্প্রতি নিখিল ভারত ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন সম্মেলনের কমিটি ভারত গভর্ণমেণ্টকে বলেন যে, ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠন ও তাহাদের সীমানা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে অনতিবিলম্বে একটি সীমানা কমিশন নিয়োগ করা হউক। কমিটির একটি প্রস্তাবে বলা হয় যে, দেশের স্বার্থে এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠন প্রয়োজন। প্রস্তাবে হায়দরাবাদ রাজ্য পুনর্বণ্টনেরও দাবী করা হয়। কমিটি বলেন যে, বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণাংশে শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে হায়দরাবাদ রাজ্য ভাঙ্গিয়া দেওয়া এবং নিজামকে গদিচ্যুত করা প্রয়োজন। কমিটির একটি ইস্তাহারে বলা হয়ঃ কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, প্রজা-সোস্যালিস্ট, হিন্দু মহাসভা, জনসঙ্ঘ, কিষাণ মজদুর পার্টি প্রভৃতি দেশের প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলের ইহাই দাবী। কমিটি স্থির করিয়াছেন যে, ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন আন্দোলন সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে আগামী ৬ই ও ৭ই জুন নিখিল ভারত সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। এই সম্মেলনের উদ্যোগ আয়োজনের উদ্দেশ্যে ডাঃ এন্, এম্, জয়সূর্যকে সভাপতি করিয়া একটি সংগঠন কমিটি গঠিত হইয়াছে। কমিটির অভিমত বিহারের কয়েকটি বাঙ্গলা ভাষাভাষি অঞ্চল অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গে স্থানান্তরিত হওয়া প্রয়োজন। কমিটি শাসন কর্তৃপক্ষকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, ১৯১১ সালেই তাঁহারা ইহা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। অপর একটি প্রস্তাবে কমিটি পাঞ্জাবী ভাষাভাষী রাজ্যসমূহ উহার অন্তর্ভুক্ত করিয়া সীমানা পুনর্নির্ধারণ করিতে বলেন। কমিটি সংযুক্ত কেরল, সংযুক্ত কর্ণাটক এবং মহাগুজরাট গঠন সম্ভব কিনা—আলোচনা করিবার উদ্দেশে একটি কমিশন নিয়োগ করিতেও অনুরোধ জানান। কমিটির ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, নিখিল ভারত ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন সম্মেলন তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিধিসঙ্গত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সমর্থন করেন।

আশা করি ভারত গভর্ণমেণ্ট অবিলম্বে এ সম্পর্কে সুপরিকল্পিত পরিকল্পনার ভিত্তিতে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

ভারতীয় বীমা অফিস সঙ্ঘের রজত জয়ন্তী উৎসব

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জীবনবীমা অফিস সঙ্ঘের রজত জয়ন্তী উৎসব ভারতীয় অর্থনৈতিক জীবনের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। উপ-রাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ কন্‌ষ্টিটিউশন ক্লাবে এই উৎসবের উদ্বোধন করিয়া বলেনঃ একটি কল্যাণরাষ্ট্রে নাগরিকদের

জন্য বেকার-সমস্যা, অসুস্থতা, বার্ধক্য এবং মৃত্যুর ঝুঁকির বিরুদ্ধে যথোচিত রক্ষামূলক সংস্থান থাকা উচিৎ। যে পর্যন্ত না রাষ্ট্র এ সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সমর্থ হয়, ততদিন বেসরকারী প্রচেষ্টার যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। প্রসঙ্গতঃ তিনি বলেনঃ দুইটি মূল ভিত্তির উপর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত; একটি রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং অপরটি অর্থনৈতিক নিরাপত্তা। অর্থনৈতিক সঙ্কট রাষ্ট্রের সামাজিক সংহতি রক্ষার পথে অত্যন্ত বিপজ্জনক। এই সঙ্কটের ফলে গণতন্ত্রের সার্থকতা বিনষ্ট হইয়া যায় এবং যাহারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নহে, তাহাদের মধ্যে দেখা দেয় বিদ্রোহ। তিনি দেখিয়া সুখী হইয়াছেন যে, বীমা ব্যবসায়ীরা ঝুঁকি নিবারণ এবং নিরাপত্তাবোধ জাগ্রত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন।

সঙ্ঘের সভাপতি—শ্রী ডি, সুব্রহ্মণ্যম বলেনঃ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য অর্থ সংস্থানের উদ্দেশ্যে অনুকূল পরিবেশ রচনাকল্পে সরকার এবং বীমা কোম্পানীসমূহের মধ্যে সহযোগিতার প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে—মৃত্যুকর রিলে জীবন বীমা সম্পর্কিত অব্যাহতি দানের মাত্রা ৫,৫০০, টাকা হইতে বর্ধিত করিয়া ১০,০০০, টাকা নির্দিষ্ট করার জন্য তিনি প্রস্তাব করেন। অতঃপর সঙ্ঘের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়া শ্রীসুব্রহ্মণ্যম বলেনঃ ১৯২৭ সালে এই সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার পূর্বে জীবনবীমা কোম্পানীসমূহের কাজের পরিমাণ ছিল মাত্র ১৩ কোটি টাকা। ১৯৫১ সালে কেবলমাত্র ভারতীয় কোম্পানীসমূহের কাজের পরিমাণ দাঁড়ায় ১১৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা।

ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের এই ক্রমোন্নতি ভারতীয় অর্থনৈতিক বনিয়াদেরই উজ্জ্বল স্বাক্ষর সন্দেহ নাই। এতদুপলক্ষে ভারতীয় পত্রিকাসমূহ 'বীমা-ক্রোড়পত্র' সংখ্যা প্রকাশ করিয়া জনসাধারণকে বীমা-ব্যবসায় ও ইহার কার্যকারিতা সম্পর্কে জনসাধারণকে অধিকতর সচেতন করিয়া তোলেন। এক সময় বীমার উপকারিতা ও বীমা কোম্পানীগুলির উপর নির্ভরশীলতা সম্পর্কে জনসাধারণের চিত্তে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল; ক্রমে যতই অধিকতর সক্ষম ব্যক্তি দ্বারা বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালিত হইতে লাগিল, এবং সরকারী ব্যবস্থায় ইহার নির্ভরশীল দায়িত্ব গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিল, জনসাধারণও ততই বীমা সম্পর্কে অধিকতর সজ্ঞান হইতে লাগিল। আজ ভারতীয় জনসাধারণের সহযোগিতায় ভারতীয় বীমা জগৎ যেভাবে ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে যে ভারতীয় বীমা বিশ্বের যে কোনো উন্নত স্বাধীন দেশের বীমার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কেনিয়ায় মধ্যযুগীয় বর্ব্বরতার এক অধ্যায়

গত কিছুকাল ধরিয়া কেনিয়ায় শ্বেতাঙ্গ-অত্যাচার লইয়া যে নাটকীয় প্রহসন ঘটিয়া চলিয়াছে, সভ্যতার ইতিহাসে তাহা বর্বরতারই নামান্তর মাত্র। কোরিয়ার ন্যায় কেনিয়ারও এই নারকীয় বীভৎসতা শেষ পর্যন্ত বিশ্বশান্তির পরিপন্থী হইয়া দাঁড়ায় কিনা—ইহাই আজ প্রধান চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সম্প্রতি কেনিয়া আফ্রিকান ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ জোসেফ মুরুম্বী এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, আফ্রিকাবাসীদের কৃষি ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান, অভাব-অভিযোগ পূরণ, রাজনৈতিক অধিকার রক্ষা এবং বর্ণবৈষম্যের অবসানকল্পে উদারমতাবলম্বী রাজনৈতিক দলগুলি যে শাসনতন্ত্রসম্মত শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম সুরু করিয়াছেন, তাহা বিনষ্ট করার জন্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষার নামে কেনিয়ায় জরুরী আইন প্রবর্তন করিয়া শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকেরা জঘন্য অত্যাচার ও বর্বর দমননীতি ও বিভীষিকার রাজত্ব আরম্ভ করিয়াছেন। অবিলম্বে এই জঘন্য দমননীতির অবসান না ঘটিলে সমগ্র আফ্রিকায় আগুন জ্বলিয়া উঠিবে।

মিঃ জোসেফ মুরুম্বীর এই উক্তি সম্পর্কে আফ্রিকান সরকারকে অবিলম্বে সচেতন হওয়া কর্তব্য। কোনো অপ্রীতিকর কার্য বা বর্বরতাই যে দীর্ঘকালের জন্য কেহ বা কোনো সভ্য দেশ বরদাস্ত করিতে পারে না, তাহা বোধ করি শ্বেতাঙ্গ আফ্রিকান সরকারকে নতুন করিয়া বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই।

কেনিয়া-পরিস্থিতির বর্ণনা প্রসঙ্গে মিঃ জোসেফ মুরুম্বী বলেনঃ কেনিয়া আফ্রিকান ইউনিয়ন উদারমতাবলম্বী রাজনৈতিক দল এবং শাসনতন্ত্রসম্মত পন্থায় তাঁহারা সংগ্রাম চালাইয়া যাইতেছেন। তাঁহারা মহাত্মা গান্ধীর নীতি ও অহিংস পন্থায় বিশ্বাস করেন। এই রাজনৈতিক দলের নেতা মিঃ জোমো কেনিয়াট্টা এক সপ্তাহকাল গান্ধীজীর নিকট থাকিয়া অনুপ্রেরণা লাভ করেন। কেনিয়া আফ্রিকান ইউনিয়ন অহিংসপন্থায়

বিশ্বাসী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং তাঁহারা সর্বপ্রকার হিংস্রনীতির নিন্দা করিয়াছেন। এই দলের সহস্র সহস্র নেতা ও সদস্য আজ কারারুদ্ধ রহিয়াছেন এবং তাঁহাদের অনুপস্থিতিতে জনসাধারণের ধৈর্যচ্যুতি হওয়া অথবা হিংস্র পন্থা অবলম্বন করা খুবই সম্ভব।

—ইউনিয়ন চরমবাদী নয় এবং তথাকথিত মাউ মাউ আন্দোলনের সহিত তাহাদের কোনো সম্পর্ক নাই। মাউ মাউদের ন্যায় কেনিয়া আফ্রিকান ইউনিয়ন শ্বেতাঙ্গদের বিতাড়িত করিতে চায় না। তাঁহারা তাঁহাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য শাসনতন্ত্রসম্মত পন্থায় সংগ্রাম করিতেছেন। জনসাধারণের দাবীর প্রতি সম্মান দেওয়া প্রয়োজন। কেনিয়াবাসীদের কি প্রয়োজন, তাঁহারাই তাহা নির্ধারণ করিবেন, শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকদের তাহা নির্ধারণের কোনো অধিকার নাই।

—প্রধান সমস্যা হইল ভূমি-সমস্যা। এক অর্ডিন্যান্সের সাহায্যে ১৯১৫ সাল হইতে স্থানীয় অধিবাসীদের জমি অসঙ্গতভাবে কাড়িয়া লওয়া হইতেছে এবং তাহা শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকদের দেওয়া হইতেছে। জনসাধারণ তাঁহাদের জমি প্রত্যর্পণ, বর্ণবৈষম্যের অবসান ও গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য দাবী জানাইয়া আসিতেছেন। পরিবারপিছু শ্বেতাঙ্গদের পাঁচশত হইতে তিন হাজার একর জমি আছে, কিন্তু আফ্রিকানদের পরিবারপিছু জমির পরিমাণ হইল ২.৬১ একর। কেনিয়ায় মাত্র ৩৫ হাজার শ্বেতাঙ্গ আছে এবং আফ্রিকানের সংখ্যা হইল সাড়ে বহান্ন লক্ষ। কিন্তু কেনিয়ার আইন পরিষদে শ্বেতাঙ্গরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। শ্বেতাঙ্গরা কফি, ধান ও 'সিসলের' চাষ করে, কিন্তু আইনবলে আফ্রিকানগণকে এইসকল ফসলের চাষ করিতে দেওয়া হয় না। এইসকল ফসল হইতে শ্বেতাঙ্গদের দশ লক্ষ টাকা উপার্জন করা কিছুই নয়। কিন্তু আফ্রিকানদের অবস্থা শোচনীয়। তাহাদের শ্বেতাঙ্গদের খামারে বস্তুতঃ দাসজীবন যাপন করিতে হয় আর শ্বেতাঙ্গরা 'রোল্‌স্‌ রয়েসে' করিয়া প্রমোদভ্রমণ করেন। এইভাবে একদিকে রহিয়াছে নৈরাশ্য ও ব্যর্থতা, অপরদিকে রহিয়াছে আতঙ্ক।

কেনিয়ার বর্বরোচিত নৃশংস অত্যাচার সম্পর্কে মিঃ মুরুম্বী যে বর্ণনা দেন, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।—মেরুদণ্ড ভাঙিয়া না যাওয়া এবং দেড় ইঞ্চি পরিমাণ ক্ষত না হওয়া পর্যন্ত জনসাধারণকে বেত্রাঘাত করা হয়। সাঁড়াশীর সাহায্যে নারীদের স্তনদেশ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা হয় এবং পুরুষদের পুরুষাঙ্গ কাটিয়া হত্যা করা হয়। লোহার পেরেক আঁটা বুটে করিয়া পুরুষদের পদাঘাত করা হয়। নারীদের ধর্ষণ এবং শিশুদের গুলী করিয়া হত্যা করা হইতেছে। সরকারি বাহিনী ও শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিক কর্তৃক আফ্রিকান হত্যার যে সংবাদ কেনিয়ার সংবাদপত্রে ও সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত হয়, তাহা প্রকৃত সংবাদের একাংশ মাত্র।

অবিলম্বে এই অত্যাচার বন্ধ না হইলে সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশ যে একটা বিরাট দাবাগ্নির ক্ষেত্রে পরিণত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্বেতাঙ্গরা যদি যুদ্ধের কথা না বলিয়া ন্যায়বিচারের কথা বলেন, তবে অনেকাংশে শান্তি ফিরিয়া আসিতে পারে বলিয়া মিঃ মুরুম্বী মনে করেন। তবে একথা সত্য যে, জনসাধারণের মূল অর্থনৈতিক অভিযোগ ও রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার পূরণ না হইলে দমননীতি ও হিংস্রপন্থায় জনগণের আন্দোলন বিনষ্ট করা যাইবে না।

ভারত-পাকিস্থান বাণিজ্যচুক্তি

কয়লা এবং পাট বিনিময়ের উদ্দেশ্যে গত ২০শে মার্চ নয়াদিল্লীতে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে তিন বৎসরের জন্য এক বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। এই চুক্তি অনুযায়ী আগামী তিন বৎসরকাল ভারত বৎসরে ১৮ লক্ষ গাঁইট পাট পাকিস্তানের নিকট হইতে ক্রয় করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। অপরপক্ষে তিন বৎসরকাল মাসিক ৮২ হাজার হইতে ৮৪ হাজার টন পর্যন্ত কয়লা পাকিস্তানকে সরবরাহ করা হইবে।

যুক্ত ইস্তাহারে উভয় দেশের চুক্তিগুলি সম্পর্কে বলা হইয়াছে—

(ক) পাকিস্তান যাহাতে কাঁচা পাট উৎপাদন সম্পর্কে পরিকল্পনা করিতে পারেন, সেজন্য ভারত জানাইয়াছেন যে, ভারত পাকিস্থান হইতে বৎসরে ১৮ লক্ষ গাঁইট পাট ক্রয় করিবে। ১৯৫৩ সালের ১লা জুলাই হইতে তিন বৎসরের জন্য ভারত সরকার উক্ত পরিমাণ পাট আমদানীর জন্য লাইসেন্স প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছেন। ভারতের অধিক পরিমাণ পাটের প্রয়োজন হইলে পাকিস্থান ভারতকে বৎসরে ২৫ লক্ষ গাঁইট পর্যন্ত পাট সরবরাহ করার ব্যবস্থা করিবে, স্বাভাবিক লেনদেনের পথেই ব্যবসায় চলিবে।

(খ) পাকিস্থানে কয়লা সরবরাহের ব্যাপারে ভারত

অধিকতর সুযোগ সুবিধা প্রদান করিবে এবং রেলযোগে পশ্চিম পাকিস্থানে কয়লা সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবে।

(গ) পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত অঞ্চল এবং আসাম ও ত্রিপুরার সীমান্ত অঞ্চলের মধ্যে বাণিজ্যের বিষয়টি যে বিশেষভাবে বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন, সম্মেলনে একথা স্বীকৃত হয়। এইরূপ বাণিজ্য পরিচালনের জন্য কতকগুলি নীতি প্রণীত হয়। ভারত ও পাক-সরকার এই সব নীতি অনুমোদন করিলে এইসব নীতিকে কার্যে পরিণত করার জন্য এপ্রিল মাসের মধ্যে আরও একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে।

(ঘ) সম্মেলনে ইহাও ঠিক হইয়াছে যে, দেশের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের পরিধি বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে ভবিষ্যতে উভয় সরকারের মধ্যে আরও আলোচনা হইবে। সম্ভবতঃ আগামী জুনমাসে উভয় গভর্নমেণ্টের মধ্যে পুনরায় আলোচনা অনুষ্ঠিত হইবে। বর্তমান বাণিজ্যচুক্তির মেয়াদ আগামী জুন মাসে শেষ হইবে। ভারত পাকিস্তানকে জানাইয়াছে যে, পাকিস্তানকে বৎসরে প্রায় ১০ লক্ষ টন কয়লা সরবরাহের ইচ্ছা তাহার আছে।

আমরা যথাসময়ে এ সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।

শান্তি চুক্তি

বিগত ৩৩ মাসব্যাপী কোরিয়াকে কেন্দ্র করিয়া তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের যে প্রস্তুতি চলিতেছিল, সম্প্রতি তাহা কিছু ভাটার পথে নামিয়াছে। মার্শাল স্তালিনের আকস্মিক মৃত্যুর প্রভাব এবং মঃ ম্যালেনকভের নবতম উদ্যমই ইহার পিছনে বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল বলিয়া ওয়াকিবহাল মহলের অভিমত। দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেণ্ট মিঃ সিংম্যান রী অবশ্য এই বলিয়া বিষোদ্গার তুলিয়াছেন যে, কোরিয়া হইতে আহত বন্দী-বিনিময় ব্যবস্থাকে স্বীকার করিয়া লওয়ার অর্থই হইতেছে কমিউনিস্টদের সর্বৈব জয় স্বীকার করিয়া লওয়া। কিন্তু এই বিষোদ্গার এমনই অবাস্তব যে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার অবধি তাহাতে কর্ণপাত করিবার অবকাশ পান নাই। ফলে গত ১১ই এপ্রিল পানমুজন বৈঠকে জাতিসঙ্ঘ ও কমিউনিস্ট প্রতিনিধিগণ কর্তৃক আহত ও অসুস্থ যুদ্ধবন্দী-বিনিময় সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ঊর্ধ্বতন মহলে শান্তি চুক্তি আলোচনা পুনরারম্ভের ইহাই প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই চুক্তি অনুযায়ী কমিউনিস্ট পক্ষ ৬০০ এবং জাতিসঙ্ঘ ৫৬০০ আহত ও অসুস্থ বন্দীকে মুক্তিদান করিবে। চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর কমিউনিস্ট পক্ষ হইতে পূর্ণাঙ্গ শান্তিচুক্তি আলোচনা পুনরায় সুরু করার জন্য জাতিসঙ্ঘপ্রতিনিধিদলের নিকট দাবী জানান হয়। জাতিসঙ্ঘ প্রতিনিধিদলের নেতা জানান যে, তাঁহারা প্রস্তুত, প্রয়োজনীয় নির্দেশ আসা মাত্র তাঁহারা আলোচনার পথে অগ্রসর হইবেন। জাতিসঙ্ঘের পক্ষে রীয়ার এ্যাড্‌মিরাল জন ডেনিয়েল ও উত্তর কোরিয়ার পক্ষে মেজর জেনারেল লী সাংশো চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। মূল দশটি ধারায় এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

রাশিয়া ও চীনের এই শান্তি-প্রচেষ্টা সমসাময়িক রাজনীতির ক্ষেত্রে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আবহাওয়ার সৃষ্টি করিবে সন্দেহ নাই। ভারত সরকার রাশিয়া ও চীনের সাম্প্রতিক এই শান্তিপ্রচেষ্টাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইয়াছেন। বর্তমান আন্তর্জাতিক বিরোধের অবসানকল্পে এই দুইটি রাষ্ট্র যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে, উহার প্রশংসা করিয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরু বলেনঃ 'ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই যে, বিশ্বপরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি ঘটিয়াছে। বিশ্বপরিস্থিতিকে শান্তির দিকে লইয়া যাইবার এই নূতন উদ্যম দেখিয়া আমরা ভারতবাসীরা সন্তুষ্ট হইয়াছি।'

আমরা আশা করিব—আনবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ ও নিরস্ত্রীকরণ নীতির পথে রাশিয়া এবং তৎসহ নয়া চীন যে শান্তির পথের নির্দেশ দিয়াছেন, তাহা রাষ্ট্রপুঞ্জ পরিষদ সানন্দে গ্রহণ করিয়া বিশ্বের স্থায়ী নিরাপত্তা বিধানে যত্নবান হইবেন।

রাষ্ট্রপুঞ্জের নূতন সেক্রেটারী জেনারেল

সম্প্রতি মিভ ট্রিগ্‌ভি-লীর স্থলে রাষ্ট্রপুঞ্জের নূতন সেক্রেটারী জেনারেল হইয়াছেন সুইডেনের সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডাগ হামারাস্কজ্‌লেড্‌। জাগতিক পরিবেশে আজ যে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার সমাধান করিয়া পৃথিবী হইতে যাহাতে চিরকালের জন্য যুদ্ধ ও যুদ্ধজাত বিভীষিকা নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতে পারে এবং বিশ্বে স্থায়ী শান্তি বিরাজ করিয়া বিভিন্ন দেশ ও জাতি স্ব স্ব মর্যাদায় উন্নত হইতে পারে, তাহার জন্য তিনি সক্রিয়ভাবে কাজ করিয়া যাইবেন বলিয়াই আমরা আশা করিব। মিঃ ডাগ হামারাস্কজ্‌লেডকে আমাদের সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রীপদে শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ

প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শানুসারে রাষ্ট্রপতি সংসদসদস্য শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহকে সহকারী অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন। বাংলার পক্ষে ইহা একাধারে আনন্দ এবং গর্বের বিষয়।

বিপ্লবী যুগে তাঁহার নেতৃত্ব, স্থৈর্য ও অধ্যবসায় ইতিহাসে উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। বাংলা সাহিত্যের প্রতিও তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ রহিয়াছে। একাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়া সাহিত্যিক হিসাবে তিনি খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত 'মন্দিরা' মাসিকপত্রের তিনি সম্পাদক। কেন্দ্রে বাংলার সম্মান তিনি রক্ষা করিবেন, এ বিশ্বাস স্বভাবতই আমরা করিতে পারি। অরুণবাবুর এই নূতন পদলাভে তাঁহাকে আমাদের সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

★

শোক-সংবাদ

পরলোকে জনাব আসফ আলি

জনাব আসফ আলী

গত ১লা এপ্রিল মধ্যরাত্রে সুইজারল্যাণ্ডস্থিত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত জনাব আসফ আলী হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার মাত্র ৬৫ বৎসর বয়স হইয়াছিল। ভারতের আকস্মিক এই ক্ষতি অপূরণীয়। গত জুলাই মাসে জনাব আসফ আলী নূতন কর্মভার গ্রহণ করেন এবং তৎসঙ্গে অস্ট্রিয়া এবং ভ্যাটিকানস্থিত ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের কর্মভারও তাঁহার উপর অর্পিত হয়। তাঁহার পত্নী ভারতের সমাজতন্ত্রী নেত্রী শ্রীমতী অরুণা আসফ আলী মৃত্যুর মাত্র একদিন পূর্বে ভারত হইতে বার্ণে স্বামী সকাশে উপনীত হন। জনাব আসফ আলীর মৃতদেহ বিমানযোগে ভারতে আনীত হয় এবং রাজকীয়ভাবে তাঁহার অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া সমাপন করা হয়।

১৮৮৮ সালের মে মাসে জনাব আসফ আলী জন্মগ্রহণ করেন। দিল্লীর স্টিফেন্স কলেজে তাঁহার প্রথম শিক্ষালাভ ঘটে। পরে লণ্ডনের লিঙ্কন ইন হইতে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কংগ্রেসের জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করিয়া তিনি বহুবার কারাদণ্ড ভোগ করেন। তিনি সমগ্র ইউরোপ পরিভ্রমণ করিয়া ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন এবং এ্যানি বেশান্তের হোমরুল লীগ আন্দোলনে যোগদান করেন। অতঃপর প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানে জনাব আসফ আলী খিলাফৎ আন্দোলনে যোগদান করেন এবং

১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন এবং কারারুদ্ধ হন। ১৯৩০ সালের আগষ্ট মাসে আইন অমান্য করায় দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ গ্রেপ্তার হইলে তিনি নূতন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনীত হন। কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কিত দিল্লীর 'সংগ্রাম পরিষদের' তিনি তৃতীয় ডিরেক্টর ছিলেন। এতদ্ব্যতীত মুস্‌লিম ন্যাশনালিষ্ট পার্টির তিনি সদস্য ছিলেন। ১৯২৮ সালে জনাব আসফ আলী শ্রীমতী অরুণা গাঙ্গুলীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। কিছুকালের জন্য তিনি দিল্লীর মিউনিসিপাল কমিশনার ছিলেন। ১৯৩৪ সালে তাঁহাকে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টির সেক্রেটারী করা হয়। ১৯৩৫ সালে তিনি দিল্লীর হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সমর্থনে কংগ্রেস প্রার্থীরূপে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৯৪০ সালের ২০শে মার্চ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনীত হন। ১৯৪৫ সালে জনাব আসফ আলী হিন্দু মহাসভা ও মুসলীম লীগ প্রার্থীদ্বয়কে বহু ভোটাধিক্যে পরাজিত করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে তিনি কংগ্রেসী দলের ডেপুটী লীডার ছিলেন এবং আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বিচারের সময় আসামীপক্ষের কৌসুলীদের অন্যতম ছিলেন। ১৯৪৬ সালের ১লা সেপ্টেম্বর জনাব আসফ আলী ভারতের অন্তর্বর্তী গভর্ণমেণ্টের অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হন এবং তাঁহার উপর রেলওয়ে ও যানবাহন বিভাগের কার্যভার অর্পিত হয়। ১৯৪৭ সালের জানুয়ারী মাস হইতে তিনি উক্তপদে বহাল ছিলেন। ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী হইতে ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত তিনি ওয়াশিংটনে প্রথম ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরে ১৯৪৮ সালের জুন মাসে উড়িষ্যার গভর্ণরের কার্যভার গ্রহণ করেন। ১৯৫২ সালের মে মাস পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে বহাল ছিলেন। অতঃপর ১৯৫২ সালের জুন মাসে তিনি সুইজারল্যাণ্ডে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের কার্যভার গ্রহণ করেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি দক্ষতার সঙ্গে তাঁহার দপ্তরের কার্যভার পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ হউক, আমরা এই কামনা করি।

পরলোকে প্রখ্যাত দার্শনিক ডক্টর জোয়েড্

প্রখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক ডক্টর সি ই এম্ জোয়েড্ গত ৯ই এপ্রিল লণ্ডনস্থ তাঁহার বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে ডক্টর জোয়েড মাত্র ৬১ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুরা নাম সিরিল এড্উইন মিচিনসন জোয়েড। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ১২ই আগষ্ট তাঁহার জন্ম হয়। ১৯৩০ সাল হইতে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। তৎপূর্বে ১৯১৪ সালে তিনি সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন। ১৯৩৬ সালে তাঁহাকে ডি-লিট্ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থসমূহ এবং বেতার জীবন বিশ্বজ্জনমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি 'প্রফেট জোয়েড' নামে খ্যাতি অর্জন করেন। এতবড় সম্মান সকলের ভাগ্যে জোটে না। তাঁহার অমূল্য গ্রন্থরাজির মধ্যে—Matter, Life and Value, Philosophical aspects of modern Science, Guide to the Philosophy of Morals and Politics, Guide to modern thought, Journey through the war-mind, The Future of life, The present and future of Religion, Liberty to-day, The Story of civilization, The meanings of life, The story of Indian Civilization, Opinion, More opinion প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার মৃত্যুতে পৃথিবী শুধু একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিককেই হারাইল না, একজন শ্রেষ্ঠ মানুষকেও হারাইল। ঈশ্বর তাঁহার আত্মার কল্যাণ করুন।

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস্ লিমিটেড্
৯০, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-১৪ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্যামল পল্লীশ্রী [শিল্পী—অজয় চট্টোপাধ্যায়

বিংশ বর্ষ — জ্যৈষ্ঠ—১৩৬০ — ২য় খণ্ড—৬ষ্ঠ সংখ্যা

গুর্খা যুদ্ধের পটভূমিকা

অধ্যাপক সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ওয়ারেন হেষ্টিংস গুর্খাজাতির বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ সুরু করেছিলেন তা অত্যন্ত গৌণ। অর্থাৎ তার রাজনৈতিক মূল্য নিতান্ত অল্প। এই যুদ্ধে রহস্যময় গুর্খাজাতির সম্বন্ধে কোম্পানীর কোন অভিজ্ঞতাই লাভ হয়নি। অবশেষে ১৮১৪ খৃঃ অব্দে সীমান্ত বিপ্লব ও প্রান্তরেখা বিষয়ক কতকগুলি গোলযোগ সহসা উপস্থিত হওয়াতে এক নূতনতর বিপত্তির সূত্রপাত হোলো। প্রথমে ইংরাজ ধারণা করেছিলেন, এই অশান্তির জন্য কোনও অনিষ্টপ্রিয় প্রত্যন্ত নৃপতিই দায়ী।১ কিন্তু যথাবিহিত তদন্তের পর দেখা যায় যে, প্রকৃত অবস্থা অন্য প্রকার : এক অতীব শক্তিশালী জাতির সঙ্গে সংঘর্ষ আগতপ্রায় এবং উক্ত জাতির সামরিক সম্পদও অজস্র ; ভ্রম এবং জাত্যভিমান বশতঃ তাঁরা সেই শক্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করে নিশ্চিন্ত ছিলেন। সেনাবিভাগে সাহস ও নিয়মানুবর্ত্তিতার কোন অভাবই ঘটে নি। একমাত্র প্রতিবন্ধক ছিলো number বা সংখ্যার। বৃটিশ সরকার এই সামরিক অসুবিধাটুকু লক্ষ্য করে স্বীয় বাহিনীর কলেবর বৃদ্ধি করতে তৎপর হলেন।২ ১৮১৪ খৃঃ অব্দ হ'তে ১৮১৮ খৃঃ অব্দাবধি কোম্পানী যুদ্ধে ৪০,০০০ সৈন্য নিযুক্ত করেছিলেন ; ১৮১৬ খৃঃ অব্দে ১৬,০০০ সৈন্য। দ্বিতীয়োক্ত বিভাগটি ইউরোপীয় পল্টনের কতিপয় spearhead নিয়ে গঠিত হয়েছিলো—প্রয়োজন

১। হেনরী,টি, প্রিনসেপ, History of the Political and Military Transaction of the Marquis of Hastings, ১৮১৩—২৩, প্রথম খণ্ড, ১৩৩।

২। মেটকাফ, ৬ই মার্চ্চ ১৮৩০ : কে (kaye) Selections ১৮৬।

বোধে অক্টারলোনীকে বলপূর্ব্বক শত্রুব্যূহ ভেদ করে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সহায়তা করবার জন্য।

সেন্ট জর্জ্জ টাকারের সংশয়

অন্যান্য বড়ো যুদ্ধের মতো—উদাহরণস্বরূপ ১৮৩৯ খৃঃ অব্দের আফগান যুদ্ধের কথাই ধরা যাক। গুর্খা যুদ্ধের সময়েও সরকার রাজস্ব অথবা উচ্চ সামরিক বিভাগের কর্ম্মচারীদের তরফ হ'তে কোন উৎসাহ পাননি। গভর্ণর জেনারেলই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যাবতীয় দায় গ্রহণ করে-ছিলেন স্বীয় স্কন্ধে। সেণ্ট জর্জ্জ টাকার তাঁর এই স্বাধীন মনোবৃত্তি বরদাস্ত করতে সমর্থ না হয়ে যে সন্দিগ্ধ উক্তি করেছিলেন, তা এইরূপ :

'তাঁর চরিত্রে অল্পবিস্তর রোমাণ্টিক উপাদানের অস্তিত্ব দেখা যায়, এবং আমার ধারণা এই যুদ্ধে একটি বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন এও তাঁর অন্তরের বাসনা, অবশ্য ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন···আমি এখনই কয়েক কোটী মুদ্রাকে৩ পলায়িত দগ্ধ মৎস্য বলে কল্পনা কর্চ্ছি,···ক্ষতিগ্রস্ত হলে চিন্তা নাই, কারণ রাজকোষে যথেষ্ট অর্থ বর্ত্তমান; সৌভাগ্যক্রমে নেপাল অধিকার করতে সক্ষম হলে আমরা এই ঋণ পরিশোধ করবো। আমি কেবল এই দেখে বিস্ময় বোধ করি যে ফরাসী সম্রাটের মতো শান্তির পরিবর্ত্তে যুদ্ধকে অধিকতর পছন্দ করেন পৃথিবীতে এমন ব্যক্তিও বিরল নন।৪

সেনাবাহিনীর পশ্চাদস্থিত ভারতবর্ষের দিকে বারংবার ভীতিব্যাকুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগলেন টাকার। 'আমরা এই পর্ব্বতগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করে অনর্থক কালাতিপাত করি ও মারাঠাগণ অবসর মতো ইংরাজদের আক্রমণ করুক। কিন্তু গৃহ বিবাদে ব্যাপৃত আছে বলে, আমার মনে হয়, এই ভয়ানক বিভীষিকা আমাদের অসাব-ধানতার সুযোগ নাও গ্রহণ করতে পারে। এমন কি অক্টারলোনী, এই যুদ্ধে তাঁর পদোন্নতির নিশ্চিত সম্ভাবনা আছে এতথ্য অবগত হয়েও নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। ১৮১৪ খৃঃ অব্দে, ২৫শে আগষ্ট তিনি মেটকাফকে লেখেন :

'দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত একটা রাজ্যকে সহসা আক্রমণ পূর্ব্বক অভিভূত করার চিন্তাও অতীব হাস্যকর। পরন্ত, আমার মতে, এই অভিযানের কোনও সার্থকতা নেই। শারীরিক সুবিধার অসুবিধার কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল—বৃটিশ সরকার যে ইতিপূর্ব্বে কোনদিন এইরূপ অবিমর্ষিত পরিকল্পনাকে কর্য্যে পরিণত করতে প্রয়াস পেয়েছেন এহেন সংবাদ তোমার কর্ণগোচর হয়েছে কি?'

যুদ্ধের কারণ : নেকড়ে ও মেষশাবকের কাহিনী

Casus belli অর্থাৎ 'যুদ্ধের কারণ' ছিল একাধিক; নিরীহ মেষশিশুকে আক্রমণ করবার কালে চতুর নেকড়ের মুত্রাভাব হয়েছিল বলে স্মরণ হয় না। ভারতে বৃটিশ শাসক সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করলেন, সীমান্ত-উপদ্রব, প্রান্ত প্রহরীদের প্রাণনাশ ও অযথা সরকারী এলাকার মধ্যে নানাবিধ উৎপাত রোধ করণের জন্যই উক্ত অভিযান প্রেরিত হওয়া বিধেয়। কিন্তু যুদ্ধের ব্যয়ভার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন নবাগত গভর্ণর-জেনারেল যদি এভাবে আপন দায়ীত্বে জনৈক সীমান্ত-সর্দ্দারের বিরুদ্ধে এক Punitive যুদ্ধযাত্রা করা সর্ব্বতো-ভাবে সমুচিত হবে—এমন ধারণা পোষণ না করতেন, তবে গুর্খাযুদ্ধ আদৌ ঘটতো কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

সুবিখ্যাত ইঙ্গ-ভারতীয় Hearsey গোষ্ঠীউদ্ভূত Major Henry Hearsey ছিলেন গুর্খা জাতির বিষয়ে অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক ব্যক্তি। ২৪শে আগষ্ট ১৮১৪ খৃঃ অব্দে তিনি শত্রুর সামরিক কৌশলের উপর যে রিপোর্ট দাখিল করেন ইতিহাসের দিক হতে তার মূল্য সত্যই বিবেচনার অযোগ্য। পলায়মান গুর্খা নেতার গতিরোধ করবার উদ্দেশ্যে বৃটিশ সরকার যে আয়োজন করেছিলেন রিপোর্টে তার পরিকল্পনা পাঠ করে অক্টারলোনীর যারপরনাই কৌতুক বোধ হয়েছিল। রিপোর্টে শত্রুর প্রতিটি (রক্ষার্থ রচিত) গড়া বা কাষ্ঠের প্রাচীরকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দর্শন করা হয়েছে; কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থা সম্যকরূপে পর্য্যালো-চনা করে অবশেষে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে

৩। এক কোটি = ১০০ লক্ষ।

৪। ১৪ই নভেম্বর ১৮১৪ কে, Life of Tucker.

এগুলি কোনমতেই উপহাস্য নয়, পরন্তু দুর্ভেদ্য ও অপ্রবেশ্য—এমনকি কলুঙ্গার গড়াগুলিও এদের তুলনায় তুচ্ছাদপি তুচ্ছ (কলুঙ্গায় ইংরাজের প্রথম শোচনীয় পরাভব ঘটে)। 'I am aware of the tone of despondency that prevails.' এপ্রিল ১৮১৫ খৃঃ অব্দে Hearsey সদলবলে বিধ্বস্ত হন; শত্রুপক্ষ তাঁকে আহত ও বন্দী করে। ঐতিহাসিক এই পরাজয়কে poetic justice বা 'কাব্যের বিধান' বলে অভিহিত করেছেন।৫

আরম্ভ হওয়ার পর যুদ্ধ সুদীর্ঘকালাবধি অনিশ্চিতাবস্থায় অবস্থান করে। ৩০শে অক্টোবর ১৮১৪ খৃঃ অব্দে জেনারেল জিলেস্পী (Gillespie) কলুঙ্গা বা নলপাণির কাষ্ঠ নির্মিত দুর্গ অতর্কিতভাবে আক্রমণ করবার প্রয়াস পান। ভেলোর এবং Fort Cornelis পূর্ব্বে তিনি একই পন্থায় পদানত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ শত্রুর গুলি বক্ষে বিদ্ধ হওয়াতে জিলেস্পীর স্বপ্ন সফল হল না।

কলুঙ্গার পার্ব্বত্য উপত্যকার রণক্ষেত্রে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি। অর্দ্ধ-পৌরাণিক চরিত্রের মতো "ঊনবিংশ শতাব্দীর Nikal Seyn" জেনারেল জিলেস্পীও সমগ্র ইংরাজ নরনারীর প্রীতির পাত্র ছিলেন। জনৈকা ইংরাজ তরুণী তাঁর শোকাবহ মৃত্যুর উপলক্ষে উপস্থিত ক্ষেত্রে মুখে-মুখে যে অন্ত্যেষ্টি-সঙ্গীতটী রচনা করেছিলেন তা বাস্তবিকই করুণ। কথিত আছে, ব্যক্তিমাত্রেই উক্ত সঙ্গীত শ্রবণ করে অশ্রুবিসর্জ্জন করতেন। গাথাটী এইরূপ :

'Ye banks and braes of bonny Doon !৬
    How late your scenes sae peaceful smiled !
How sweetly bloomed your mountain rose,
    In spot-less white sae saft and mild !
But now ensanguined be thy flower !
    And fatal be thy banks, fair vale !
While sad amang the blooming braes
    Resounds the soldier's mournful wail !

অর্থাৎ, 'হে, সদাপ্রফুল্ল দুনের নদীতীর ও প্রবণভূমি! কিছুদিন পূর্ব্বেই তোমার হাস্যলাস্যময়ী মূর্ত্তি আমাকে বিমোহিত করেছে। তোমার পর্ব্বতশিখরে শুভ্র পেলব পাটল পুষ্প সেইদিনও প্রস্ফুটিত হত। কিন্তু আজ সেই পুষ্প শোণিতময়! তোমার নদীতীর শ্মশানভূমির মতো ভয়ানক! উদ্ভিদ্যমান বিষণ্ণ টিলাগুলিতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সৈনিকের মৃত্যুকাতর হাহাকারধ্বনি!'

'How lately burned our hero's soul
    In glory's fatal, bright Career !
Ah, Doon ! Thy bosom now entombs
    The heart that never knew a fear !
Ye banks and braes of bloody Doon !
    Ah, woe the while ! ye're Rollo's tomb !
But with his sacred blood imbrued
    Your glens shall know immortal bloom !'

অর্থাৎ, 'অতি অল্পকালপূর্ব্বেই বিজয়ের সঙ্কটজনক, গৌরবময় সন্ধিক্ষণে তোমার ক্রোড়ে আমাদের বীর নায়কের আত্মা দগ্ধ হয়েছে। হে দুন!' যে হৃদয় কখনও ভীতি অনুভব করেনি আজ তোমার বক্ষের তলে তিনি চিরনিদ্রায় অভিভূত! হে, সদাপ্রফুল্ল দুনের নদীতীর ও প্রবণভূমি! দুর্ভাগ্য তোমার। তুমি রোলোর সমাধিভূমি! কিন্তু তাঁর পূতরক্ত সিঞ্চিত তোমার সানুদেশে চিরদিন পুষ্পের সমারোহ থাকবে অমরাবতীর উদ্যানের মতো—চিরদিন! চিরদিন!'

যুদ্ধের গতি : কলুঙ্গা

২৫শে নভেম্বর, শত্রুপক্ষ দ্বিতীয়বার কলুঙ্গার (ইংরাজ) ঘাঁটি আক্রমণ করে। ইংরাজরা পশ্চাদপসারণ করতে বাধ্য হন ও তাঁদের পক্ষে বহু উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী প্রাণ হারায়। উপর্য্যুপরি এই দুইটী আক্রমণের ফলে বৃটিশ সরকারকে যথাক্রমে ২৬০ এবং ৪৮০টি সৈনিক বলি দিতে হয়েছিল বলে প্রকাশ। মোটামুটি ক্ষতির মূল্যাবধারণ করা অসম্ভব বললেও চলে।

এই ঘটনার তিনদিন পরে ইংরাজ কলুঙ্গা ত্যাগ করে অন্যত্র আশ্রয় নেন। অবিশ্রান্ত গুলিবর্ষণ ও অবরোধের ফলে তাঁদের কোন অবশিষ্ট উৎসাহ ছিল না। গুর্খা সেনাপতি ৭০ জন সৈন্য সমভিব্যাহারে অলক্ষিতে কলুঙ্গা দখল করেন। ৬০০ ব্যক্তি তাঁকে অনুসরণ করেছিল, কিন্তু

৫। India Office Records, Home Miscellaneous Service., ৫১৫, ৫১৬।

৬। কলুঙ্গা দেরাদুন উপত্যকায় অবস্থিত।

তার মধ্যে মুষ্টিমেয় মাত্র কতিপয় ব্যক্তি বিজয়লক্ষ্মীর মুখ দেখে থাকে। দুর্গে প্রবেশ করা প্রথমে সহজ হয়নি। দুর্গের প্রায় সকল অংশই ভগ্ন, চতুর্দ্দিকে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত ইংরাজ নরনারীর খণ্ড-বিখণ্ড দেহ চক্ষুকে পীড়িত করে··· অসহ্য পূতিগন্ধে শ্বাস রোধ হয়ে আসে; আনুমানিক নব্বইটী শবদেহ সংগ্রহ করে দাহ করা হয়েছিল; আহত সৈনিকদের হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।'৭

নভেম্বর মাসে মেটকাফ্ গুর্খাযুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁর বিখ্যাত memorandum রচনা করেন। কিন্তু সামরিক সমস্যা ও কৌশলে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকলেও, উক্ত বিবরণীর মাল-মসলা বা তথ্যগুলি সংগ্রহ করবার সময় ব্যস্ততাবশত: তিনি যে একটী ভ্রম করেছিলেন সেকথা অস্বীকা রকরবার কোন উপায় নেই। স্বীয় অন্তদৃষ্টির উপর অত্যধিক আস্থাস্থাপনই হলো এই ভ্রম। memorandum খানি পাঠ করলে বোঝা যায় যে ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক স্বার্থ-ব্যতীত আর একটী দুশ্চিন্তা নিবন্ধন মেটকাফ্ বৎপরোনাস্তি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। "His fears were rooted in unforgettable experience." গভর্ণর-জেনারেল তখন সফরে বহির্গত হয়েছিলেন; কাজে-কাজেই জানুয়ারী ১৮১৫-এর পূর্ব্বে মেটকাফ্ তদীয় সকাশে উক্ত স্মরণ লিপি দাখিল করতে সমর্থ হ'ননি। তিনি লিখেছেন: 'আমার এই অনধিকার চর্চ্চার জন্য হুজুর (his Lordship) হয়ত অসন্তুষ্ট হবেন, কিন্তু ভ্রমসঙ্কুল হলেও আমি স্বীয় দৃঢ়বিশ্বাস এই চুম্বক পত্রে লিপিবদ্ধ করতে প্রয়াস পেলাম।'

ইতিহাসে এই memorandum এর মূল্য অপরিমেয়; সবিশেষ সাবধানতা এবং ততোধিক স্বাবলম্বন সহকারে মেটকাফ্ তাঁর সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ন। 'বৃটিশ সাম্রাজ্য সাধারণের প্রীতির উপর স্থাপিত নয়। তরবারিই হলো তার একমাত্র ভিত্তি। বৈদেশিক স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রগুলি (Native State) ইংরাজের প্রতি বিশ্বাসসম্পন্ন এ হেন মোহ যেন আমাদের মনে স্থান না পায়।" ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ঋষির মতো বারংবার এই সতর্কতাবাণী তিনি উচ্চারণ করেছিলেন। মেটকাফ আরও লিখেছেন: 'যাঁরা এই যুদ্ধ পরিচালনা করছেন, উচ্ছ্বাসের আধিক্যে তাঁদের বুদ্ধি-বৃত্তি ও সাধারণ প্রতিভাকে অতিশয়িত মূল্যদান করা সহজ। ইতস্তত: লম্বাচৌড়া বহু মন্তব্য আমার কর্ণগোচর হয়েছে; লক্ষের পূর্ব্বে যে সকল ব্যক্তি বিবেচনা করে দেখেন তাঁদের আমরা হীনচেতা ও কাপুরুষ নামে অভিহিত করেছি। উৎসাহী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যোদ্ধাগণ সুবিধার অনুকূলে report দেন ও অবিশেষিত বিজয়বার্ত্তা প্রত্যাশা করেন ···প্রতিভার যথাযোগ্য মর্য্যাদা দেওয়া সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়; এবং ব্যক্তি মাত্রেই alarmist আখ্যা অর্জ্জন করতে অনিচ্ছুক। বিরুদ্ধ শক্তিকে অবজ্ঞার চক্ষে দর্শন করাই হলো আমাদের পেশা, কিন্তু পরাজয়ের পর সেই মনোভাব অতিশীঘ্র পরিবর্ত্তিত হয়। যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে শত্রু বাধা দানে অক্ষম'—এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে আমরা তাকে উপহাস করি। তার দুর্গ-প্রাকারাদি জঘন্য, তার অস্ত্রশস্ত্র অব্যবহার্য্য ও অকর্ম্মণ্য। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায়, আমাদের সাহস এবং সমর কুশলতা সত্ত্বেও এই নিকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে, এই ভগ্নপ্রবণ দুর্গপ্রাকার হ'তে সে অনায়াসে প্রতিপক্ষের প্রাণহরণ করে।"৮

ঘর্ষণ সমর: গুর্খাসৈন্যের গতিশীলতা

স্থানাভাবহেতু, গুর্খা যুদ্ধের অসংখ্য ক্ষুদ্র engagement-গুলির একটী পূর্ণ তালিকা এইস্থানে দেওয়া সম্ভবপর হলো না। প্রথম মহাসমরে মেসোপটেমিয়ার রণক্ষেত্রের মতো এই যুদ্ধেও বৃটিশ সরকার দুই বৎসরের মধ্যে চল্লিশজন সেনাপতির জীবন এবং ততোধিকবার স্বীয় মান মর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।৯ শোনা যায়, জনৈক অবিমৃষ্যকারী সৈন্যাধ্যক্ষ হঠকারিতাপূর্ব্বক যুদ্ধের শেষভাগে পশ্চাদপসারণ সুরু হওয়ার পূর্ব্বেই নিজ দায়ীত্বে তাঁর অধীনস্থ দলকে baseএ উপস্থিত করেছিলেন। জিলেস্পীর নেতৃত্বে মীরাট হ'তে যে বিভাগটী রওনা হয়েছিল তার

৭। Prinsep, H. T. History of the Political and Military Transactions in India during the Administration of the Marquis of Hastings, 1813-23 (London, 1825) i. 94.

৮। Kaye, Sir John William, Selections from the Papers of Lord Metcalfe, 85.

৯। আগষ্ট ১৯১৬ এর প্রারম্ভে

এক তৃতীয়াংশ অর্দ্ধপথে বিনষ্ট হয়। অদ্ভুত তৎপর, ভয়-লেশহীন গুর্খা সৈন্যের দল অদৃশ্য বিদ্যুতের মতো পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করে কখন যে তাদের আক্রমণ করে এই আশঙ্কায় অবশিষ্টাংশের কর্ম্মক্ষমতাও লুপ্ত হয়েছিল। গভর্ণর-জেনারেল লিখেছিলেন: "যুদ্ধে তাঁর একাধিক সাফল্যই আমাদের সেনাদল ও সৈন্যাধ্যক্ষগণকে নিরুৎসাহিত করে তুলেছে।" ১০

কাড়নাকাড়ার কর্কশ বাদ্যধ্বনির মধ্যে, বামহাতে আগ্নেয়াস্ত্র ও দক্ষিণহাতে বিস্তীর্ণ তরবারি সমেত অগ্রসর হলো গুর্খা সৈন্যের দল "রণধারা বাহি, জয়গান গাহি, উন্মাদ কলরবে।" স্কন্ধে তাদের বিলম্বিত চর্ম্মের ঢাল, পায়ে বন্যাতবক্ষের বিশৃঙ্খল উল্লাস।১১ এক জন সৈন্য নিহত হলে তার বিধবা পত্নী উভয় পক্ষের সমুখেই স্বামীর সঙ্গে জলন্ত চিতায় প্রাণত্যাগ করে। শত্রুর এই নির্ভীক দেশপ্রেম ও অটল সাহস কোম্পানীর বেতনভোগী সিপাহীদের ছিল না। যেন একটা নিছক নৈতিক প্রবৃত্তির প্রতিঘাতেই তাদের সমস্ত শক্তি সহসা মন্ত্রবলে অন্তর্হিত হয়।১২

আত্মরক্ষাই ছিল গুর্খাবাহিনীর একমাত্র উদ্দেশ্য। বিরুদ্ধ পক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধ করা ভিন্ন যুদ্ধের সময় অন্য কোন সুবিধা—(যথা, কোম্পানীর এলাকাবিশেষ বা তার অংশ বলপূর্ব্বক অধিকার, ইত্যাদি)—তারা গ্রহণ করেনি। মাঝে-মাঝে ইংরাজ সৈন্যের একাধিক সামরিক ঘাঁটি তাদের অতর্কিত অভিঘাতের ফলে বিপর্য্যস্ত হত। কিন্তু ইংরাজ এ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করায় তাও অল্প-কালের মধ্যে বন্ধ হয়। ঘাঁটির বাহিরে, আনুমানিক দুই শত গজ স্থান ব্যেপে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত থাকত। শত্রু সেই পরিধির মধ্যে প্রবেশ করলেই প্রহরীর হস্তে ঘটতো তার আশু প্রাণহানি।১৩ সম্মুখসমর বহুদিন পূর্ব্বেই শেষ হয়েছিল, উভয় পক্ষ যথাক্রমে স্ব স্ব ঘাঁটির মধ্যে

১০। Private Journal i. 298.

১১। Military Sketches of the Goorka in India, in the years 1814, 1815, 1816, 13-14.

১২। Ibid, xiv.

১৩। I. O. R. H. M. S., 646, p. 383.

গোপাশ্রিত হলে এইবার সুরু হলো 'ঘর্ষণ সমর' (অর্থাৎ ইংরাজীতে যাকে বলে 'a campaign of attrition' involving one of continuance that is.. length of the purse)

'দেশপ্রেম' যে ভারতবাসীদের অন্তরেও থাকতে পারে ইংরাজ সেকথা বিশ্বাস করতেন না। গুর্খাযুদ্ধের সময় তাঁরা এই বস্তুটীর অস্তিত্ব প্রথম অনুভব করলেন। স্কট ও সুইসদের মতো দুদ্ধর্ষ এই পার্ব্বত্য জাতি কি অন্তঃশক্তির বলে অজেয় ইংরাজের রাজদণ্ডকে অগ্রাহ্য করে? মেট-কাফ অনুসন্ধান করে তার উত্তর পেলেন: "দেশপ্রেম!" দিল্লী হতে কর্ত্তৃপক্ষ আদেশ দিলেন: "গুর্খাজাতির মধ্যে অনৈক্য ঘটাও, বিভেদ আনয়ন কর!" মেটকাফ যথা-সাধ্য চেষ্টা করেও সফল হলেন না। দেশপ্রেম যে জাতিকে চালিত করে তার ভিত্তি শিথিল করবার ক্ষমতা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের কোথায়?

কূটচক্রী ময়রা

তদানীন্তন বৃটীশ ভারতে অসংখ্য ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য ছিল। কূটবুদ্ধি ইংরাজের চক্রান্ততায় তাঁদের মধ্যে অনেকেই বাধ্য হয়ে সিংহাসন ত্যাগ করেন। আর্ল অব ময়রা ওরফে লর্ড হেষ্টিংস ঘোষণা করলেন, অপমানজনক বিরোধীতার ফলে বিড়ম্বিত এই রাজপুরুষবৃন্দকে এক্ষণে পুনর্ব্বার স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করা হোক্। কণ্টকের সহায়তা ভিন্ন কণ্টক উৎপাটন করা দুঃসাধ্য। অতএব···

যাঁদের প্রত্যানয়ন করা হবে তাঁদের সম্বন্ধে—নৈতিক এবং রাজনৈতিক যাবতীয় জ্ঞাতব্য সম্বাদ সংগ্রহ করবার জন্য গুপ্তচর নিয়োগ করা হলো। স্বয়ং রাজ্যপাল বাহাদুর ঐ বিবরণগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে দেখলেন। শ্রীনগরের বহিষ্কৃত নৃপতি বিশেষ ভাগ্যবন্ত ছিলেন নিশ্চয়ই। কারণ তাঁর প্রতি লর্ড হেষ্টিংসের কৃপাদৃষ্টি প্রথমে পতিত হয়। যুদ্ধাবসানে, শ্রীনগর উপত্যকা হতে হিমালয়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত এই বিরাট ভূখণ্ড সরকারে বাজেয়াপ্ত করেন এই ছিল তাঁর বাসনা। মধ্য-এসিয়া ও উত্তর-ভারতের মধ্যে বাণিজ্যিক কুটুম্বিতা স্থাপন করতে হলে উক্ত পন্থা তাঁকে অবশ্যই

অবলম্বন করতে হোত। সে যাই হোক, মেটকাফের তরফ হতে কোন সঠিক খবর লাভ না করা অবধি গভর্ণর জেনারেল নিষ্ক্রিয় থাকাই যুক্তিসঙ্গত বোধ করলেন।

এই সময় এক অপ্রত্যাশিত সুযোগ লাভ করে হেষ্টিংস বিশেষ উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন।

হরিদ্বারে জনৈক বিদ্রোহী গুর্খা নেতাকে নির্ব্বাসন দেওয়া হয়েছিল। স্বদেশের topography সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতার খ্যাতি শ্রবণ করে গভর্ণর জেনারেল তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে দিল্লীতে আহ্বান জানালেন। কুমায়ুনের বিতাড়িত সর্দ্দারের সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপন করতে তিনি বিস্মৃত হলেন না। উদ্দেশ্য : (১) প্রথমোক্ত ব্যক্তির নিকট হ'তে কৌশলে সংবাদ আদায় করা ও (২) দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তি এবং কাটমাণ্ডু সরকারের মধ্যে দীর্ঘ দিনব্যাপী বৈরভাবকে ইংরাজের স্বার্থে নিয়োজিত করা। এমন কি মেটকাফ গোপনে তাঁর (কুমায়ুনের দেশত্যাগী রাজকুমারের) প্রতিদ্বন্দ্বী বামশাহকে পর্য্যন্ত এই নিশ্চয়তা দিলেন যে তিনি কোম্পানীর পক্ষে যোগদান করলে পুরস্কার স্বরূপ সমগ্র কুমায়ুনের অধিনায়কত্ব তাঁকে প্রদান করা হবে।১৪ গুর্খা যুদ্ধের নেতা অমর সিংহ থাপা ও তস্য পুত্র রঞ্জোর সিংহ থাপা সন্ধি স্থাপনে ঔৎসুক্য প্রকাশ করলে মেটকাফ্‌কে উক্ত প্রস্তাব বিবেচনা করতে বলা হল। লর্ড হেষ্টিংসের ধারণা ছিল, বিদ্রোহী পার্ব্বত্য জাতিগুলির সাহায্যে দেরাদুনের পশ্চাদাবস্থিত গিরি-সঙ্কট কয়েকটী উত্তমরূপে রক্ষিত হলে গুর্খাগণ পলায়নে কৃতকাম হবে না, কারণ অক্টারলোনী প্রস্তুত হয়ে অদূরেই অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু কার্য্যকালে তারা ভীতি বা অজ্ঞতাবশতঃ দীর্ঘসূত্রতা অবলম্বন করায় উক্ত পরিকল্পনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। ব্যর্থ ক্রোধে অসহায় গভর্ণর বাহাদুর পার্ব্বত্য অঞ্চলের প্রধানগণকে জানালেন যে শাস্তি হিসাবে তিনি তাঁদের পুনরায় রঞ্জোরসিংহ থাপার কবলে সমর্পণ করবেন। হায়! ভাগ্যের ক্রূর পরিহাসে এই তর্জ্জন-গর্জ্জনেও তাঁহাদের অবিচলতা ভাঙ্গল না। নান্যঃ পন্থা। সমর বিভাগের দায়ীত্ব স্বীয় হস্তে গ্রহণপূর্ব্বক লর্ড হেষ্টিংস অতঃপর Fraser ও Gardnerকে দেরাদুনে প্রেরণ করলেন। উদ্দেশ্য : (১) বিজিত হওয়ার পর Fraser দেরাদুনের শাসন সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার বিশৃঙ্খলার অবধারণ করবেন ও (২) Gardner বাম শাহের সহিত পত্রাদি আদান-প্রদান করবেন। ঐতিহাসিক লিখেছেন : "It was a repetition of Metcalf's own mission to Ranajit Singh, while still in tutelage to Seton. The characters of his subordinates already way-ward and masterful, Fraser especially, were strengthened into yet fiercer independence ?"

১৪। সেপ্টেম্বর ৩০শে, ১৮১৪ তারিখের পত্র।

দূরদর্শী বামশাহ : ইংরাজের শিখভীতি

তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হলে বামশাহকে জায়গীরদারের পদে উন্নীত করা হবে, এই ছিল হেষ্টিংসের প্রকৃত অভিপ্রায়। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাস্বরূপ সরকার হতে তাঁকে বাৎসরিক ১২০০০৲ বৃত্তি দেওয়া হত। হেষ্টিংস মেটকাফকে প্রয়োজনবোধে ঐ বৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে আদেশ দিলেন। কুমায়ুনের অধিবাসীদের উপর বাম-শাহের প্রভাব সমধিক হলে তাঁকে অবিলম্বে ভারতের অন্য কোন অংশে স্থানান্তরিত করবার ক্ষমতাও হেষ্টিংস মেটকাফকে দান করেছিলেন। কিন্তু দূরদর্শী, দেশভক্ত বামশাহ এভাবে শত্রুর হস্তে স্বীয় মাতৃভূমিকে সমর্পণ করা অপেক্ষা যুদ্ধই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করাতে অস্ত্রের সাহায্য ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে কুমায়ুন অধিকারের আশা সম্পূর্ণ-রূপে নির্ম্মূল হয়। সুদীর্ঘকালব্যাপী ইতস্ততঃ যুদ্ধের পর ইংরাজ বামশাহকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করেন।

শিখনেতা রঞ্জিৎ সিংহ এই সুযোগে কোম্পানীর রাজ্য আক্রমণ করতে পারেন, মেটকাফের এমত আশঙ্কা ছিল। রঞ্জিৎ ইতিপূর্ব্বেই অক্টারলোনীর সঙ্গে সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন বটে, কিন্তু মেটকাফ তৎসত্ত্বেও তাঁর উদ্দেশ্যের সাধুতায় বিশ্বাস স্থাপন করতে সমর্থ হননি।১৫ প্রথমে নলগড় এবং তদীয় আশ্রিত দুর্গ তারা গড়ের যুদ্ধে ৯৫ জন সৈন্যকে বন্দী করে অক্টারলোনী তাঁর বিজয় অভিযান শুরু করেন। রামগড়ে, ২৬শে নভেম্বর ১৮১৪ খৃঃ অব্দে

১৫ Edmonstoneএর নিকট মেটকাফের অনুযোগ, ১৯শে অক্টোবর ১৮১১ খৃঃ অব্দ, Poona Mss. Records, Alienation Office, File 61, 325.

তিনি গুর্খাদের হস্তে পরাজিত হন ও তাঁর দলের ৭৬টী সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই সময় সিপাহীদের চর্ম্মমেখলায় কুঞ্চন লাগে।১৬

শত্রুকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আক্রমণ করতে বাধ্য করেছিলেন অক্টারলোনী। মালাওনের যুদ্ধই তার প্রকৃষ্টতম উদাহরণ। 'শেষাবধি কোম্পানীই জয়যুক্ত হবেন', এই ধারণা শত্রুর মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করা ছিল তাঁর অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য। Once the British begin a war, they would not rest still it is finished' গুর্খা সৈনাধ্যক্ষ কলুঙ্গা-যুদ্ধের কথা উল্লেখ করে রণজিৎ সিংহের নিকট একাধিক পত্রে তদীয় সাহায্যের জন্য পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা জানান। যে ১৮১৫ খৃঃ অব্দে নেপালের মহারাজা লিখেছিলেন: "ইংরাজের প্রতিশ্রুতির কোন মূল্য আছে কি? আমিও তার মিত্র ছিলাম, কিন্তু আমার বর্ত্তমান অবস্থা দেখুন।' মহারাজা রণজিৎকে একটী দুর্গ ও প্রচুর অর্থ দিতে স্বীকৃত হলেন। 'লক্ষ্ণৌএর নবাব বাহাদুর, মারাঠা ও রামপুরের রোহিল্লাগণ আমার সহায়তা করিতে ইচ্ছুক; আপনার আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া মাত্রই তাঁরা গুর্খা-পতকাতলে সমবেত হবেন।' পাছে ইংরাজ তাঁর এই আচরণের অন্যায় অর্থ করেন, এই জন্য রঞ্জিৎ সিংহ উক্ত প্রসঙ্গে ত কর্ণপাত করিলেনই না উপরন্তু অক্টারলোনীকে যথাকালে তাঁর সংবাদ লেখক মারফৎ যাবতীয় তথ্য জ্ঞাপন করলেন।

লেফটেনাণ্ট পিকার্সজিল ও কর্ণেল জ্যাস্পার নিকলস্

১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৮১৫ খৃঃ অব্দে লেফটেনাণ্ট পিকার্সজিল নামক জনৈক সতর্ক সংবাদ-হারক ৫০০ শত গুর্খাকে কৌশলে বন্দী করেন। পশ্চাদভাগে অশ্বারোহী সৈন্যের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তাদের অবশিষ্টাংশ পার্ব্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করতে বাধ্য হয়। দুর্দ্দমনীয় গুর্খাদের পরাজিত করতে হ'লে রোহিল্লাজাতির সহায়তা প্রয়োজন। অতএব, মারাঠাযুদ্ধ প্রত্যাগত Major Hearsey এবং Colonel Gardnerকে গভর্ণর জেনারেল সদ্য-সংগৃহীত এক বিপ্রযুক্ত রোহিল্লা দলের সঙ্গে সহযোগিতা করবার জন্য নেপালে পাঠালেন। রোহিল্লাগণ গিরিবর্ত্ম হতে গিরিবর্ত্মে কিছুদিন ধৈর্য্যসহকারে যুদ্ধ চালায় কিন্তু Hearseyর অধীনস্থ রোহিল্লাসর্দ্দার সহসা পথিমধ্যে প্রাণত্যাগ করাতে আতঙ্কবশতঃ তারা নিরুৎসাহ ও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। অতঃপর রণক্ষেত্রে গুর্খাবাহিনীর সম্মুখীন হ'লে তাদের দীর্ঘকাল একস্থানে সমবেত রাখাই দুঃসাধ্য হয়ে উঠত।১৭

সিপাহীদের তুলনায় গুর্খাসৈন্যের একনিষ্ঠতা ছিল লক্ষ গুণে অধিক। উদাহরণস্বরূপ, চামাপ্গড়ে অবরুদ্ধ দুইশত গুর্খার নাম করা যেতে পারে। "পলায়নের আশা হারালে গুর্খাগণ বীরের ন্যায় রণক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জ্জন দেওয়াই সমধিক শ্রেয়ঃ বলে বিবেচনা করেছিল।" যুদ্ধের কোন প্রয়োজন হয় নি। তাদের নির্ভীকতার পরিচয় সিপাহীগণ পূর্ব্বাহ্নেই লাভ করে থাকে। আতঙ্কের উদ্দাম প্রাবল্যে স্বাভাবিক বোধশক্তি বিকৃত হওয়া বিচিত্র নয়; জিলেস্পীর নেতৃত্বে পরিচালিত সেনাদল বাধাদান করা ত দূরের কথা, চক্ষের সম্মুখে শত্রুকে অগ্রসর হতে দেখেও যে তারা পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মতো দণ্ডায়মান হয়ে কোম্পানীর দুরবস্থা অবলোকন করেছে, এমন অসংখ্য প্রমাণের অভাব নেই।

স্ব স্ব যুদ্ধঘাঁটি স্থাপনপূর্ব্বক সতর্কভাবে উভয়পক্ষ যুদ্ধের গতি লক্ষ্য করতে লাগলেন ইংরাজীতে যাকে loose অথচ permanent siege (অসংবদ্ধ অথচ স্থিরতর অবরোধ) বলা হয়, এও ছিল অনেকটা সেইরকম। এমন সময় হঠাৎ কর্ণেল জ্যাস্পার নিকলস্ কুমায়ুন অধিকার করলে যুদ্ধের স্রোত নূতন খাতে প্রবাহিত হয়। ছোটখাটো একাধিক বিপত্তি পদদলিত করে জেনারেল অক্টারলোনী সবেগে অগ্রসর হচ্ছিলেন। রামগড়ে পৌঁছালে যে ১৮১৫ শত্রু তদীয় সকাশে সন্ধির প্রস্তাব জানায়। ক্ষমতাদর্পী অক্টারলোনী দাবী করেন, "কাট-

১৬ অর্থাৎ তাদের leather-belt সংলগ্ন বন্দুকের টোটা নিঃশেষিত হতে থাকে।

১৭। প্রিন্সেপ, i. 152.

মাণ্ডুতে একজন বৃটিশ রেসিডেণ্ট রাখা হোক্।" কিন্তু অমরসিংহ এভাবে যবনকে গুর্খারাজ্যে প্রবেশাধিকার দেওয়া অপেক্ষা শেষ অবধি সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করতে দৃঢ় সঙ্কল্প হলে অতঃপর কথা-বার্ত্তা, স্থগিত রাখা ভিন্ন অন্য উপায়ান্তর রইলো না।

সগৌলির সন্ধি: গুর্খাযুদ্ধের মুল্যানুমান

মার্চ্চ ১৮১৬ খৃঃ অব্দে, সগৌলির নিয়ম পত্রানুসারে গাড়োয়াল এবং কুমায়ুন ও তরাই অঞ্চলের অধিকাংশ (হিমালয় এবং ভারতের মধ্যবর্ত্তী জলাটিয়া সমভূমি) ইংরাজের হস্তগত হয়। সিপাহী বিদ্রোহের সময় বৃটিশ সরকারের পক্ষে যোগদান করেছিল বলে পুরস্কারস্বরূপ ইংরাজ নেপাল গভর্ণমেণ্টকে তরাইএর অপেক্ষাকৃত মূল্যবান অরণ্য প্রদেশটা ফেরত দেন বটে, কিন্তু এই সন্ধির ফলে গুর্খাজাতিকে যে হীনতা ও লজ্জা ভোগ করতে হয়েছিল, তার তুলনায় উক্ত ক্ষতি স্বীকারের গুরুত্ব কতটুকু? পাঠক পাঠিকা শুনে আশ্চর্য্য হবেন যে কায়মনোবাক্যে স্বাধীনতাপ্রেমি গুর্খাগণ অবশেষে কাটমাণ্ডুতে একজন বৃটিশ রেসিডেণ্ট রাখতেও আপত্তি প্রকাশ করেনি।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে অন্যতম স্মরণীয় অধ্যায় হল ইঙ্গ-গুর্খা সমর। "জিমখানাব লড়াই" এর সঙ্গে কোন সাদৃশ্য নেই বললেও চলে এই যুদ্ধের। নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে মহীয়ান গুর্খাবিগ্রহের কাহিনী একদিকে যেমন ভয়াবহ, অন্যদিকে তেমনই কৌতুহলোদ্দীপক। যুদ্ধের সুরু হতে গুর্খাগণ শত্রুর প্রতি যে মহত্ব, যে সম্মান ও যে বীরত্ব প্রদর্শন করেছিল সুসভ্য বিংশ শতাব্দীতেও তদনুরূপ দৃষ্টান্ত মেলা কঠিন। সম্মান পেতে হলে অন্যকে সম্মান দিতে হয়, পীত বর্ণের ক্ষুদ্র দেহী এই পার্ব্বত্য জাতি তা ভালো ভাবেই জানত। মৃতদেহের উপযুক্ত সৎকার করতে যে কখনও তারা বিলম্ব করেনি প্রিনসেপের মতো ছিদ্রান্বেষী ঐতিহাসিককেও একথা স্বীকার করতে হয়েছে।১৮ এতদ্ভিন্ন যুদ্ধের বহু পরেও সন্ধির প্রত্যেকটি সর্ত্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলো তাঁরা। কোন শক্তির বলে গুর্খাজাতির স্বাধীনতা অদ্যাপিও অটুটভাবে বিদ্যমান? পাঠক-পাঠিকাদের এই প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করতে হলে অধিক দূর অগ্রসর হতে হবে না। নিঃস্বার্থ দেশ সেবা, অকপট আত্মত্যাগ, শত্রুর প্রতি শ্রদ্ধা ও সর্ব্বোপরি প্রকৃতিনিষ্ঠ সততাই হলো স্বাধীনতার কয়েকটি অবিশ্লেষ্য প্রত্যঙ্গ বিশেষ। অলমতি বিস্তরেণ…

গুর্খাযুদ্ধের ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে স্থাপিত হয়েছিল মৈত্রীর সম্পর্ক। লব্ধপ্রতিষ্ঠ গুর্খা পল্টনের সহায়তায় ইংরাজ অতঃপর ভারতে, এসিয়ায় এবং ইউরোপের নানাস্থানে বহু যুদ্ধ জয় করেন। কলুঙ্গা ও জিতগড়ে যারা ইংরেজকে পরাজিত করে তাঁদেরই বংশধরগণ সাঁয়েহয়াৎ ও তাই-গ্রীসের সমরাঙ্গ অঙ্গপ্রঙ্গে পাশাপাশি শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন দেয়। ইস্তাম্বুলাতের ভীষণ সমর প্রাঙ্গণে ২২শে এপ্রিল ১৯১৭এর প্রত্যুষে তাদের ও বৃটিশ সরকারের সহস্রাধিক সৈন্যকে একত্রে শেষ-নিদ্রা উপভোগ করতে (মৃতাবস্থায়) দেখা গিয়েছিলো। বিদেশী আক্রমণ কারীকে 'বন্ধু' বলে স্বীকার করতে গুর্খাদের জাতীয়তা বোধ আহত হয়নি। তাই তারা ইংরাজের প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র।

অনাবশ্যক বোধে, ভারতের বহির্ভাগে গুর্খা বিগ্রহের ফলাফল ও বর্ত্তমান নেপালের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা স্থগিত রাখা গেল। সত্য ইতিহাস এবং রাজনীতি পরস্পরের সঙ্গে অচ্ছেদ্যরূপে সংশ্লিষ্ট কিন্তু এই নিবন্ধটী যথাসম্ভব গুর্খাজাতির চতুষ্পার্শে কেন্দ্রস্থ করতে প্রয়াস পেয়েছি বলে এবং ইংরাজীতে যাকে mark অর্থাৎ সীমারেখা বলে সেটি অতিক্রম করতে চাই না বলেও এই apologyর অবতারণা করলাম। রাজা ত্রিভুবনের নেপাল transitional periodএর দোলায় দোদুল্যমান। আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও আনুষ্ঠানিক গোলযোগে কাটমাণ্ডু আজ টম টিডলারের লীলাভূমিতে পরিণত হয়েছে। কোয়রলা ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে রাজনৈতিক মত-বিরোধের চিতা বহ্নিমান। মহাচীনের পার্ব্বত্য উর্দ্ধতা অতিক্রম করে তিব্বতের তুষারাচ্ছন্ন গিরিসঙ্কটের ভিতর দিয়ে দুর্ব্বার রাহুর মতো মুদ্গার ও কাস্তিয়া লাঞ্ছিত রক্ত পতাকার যে অপচ্ছায়া প্রতি মুহূর্ত্তেই রাজধানীর দিকে অগ্রসর হচ্ছে তার গতিরোধ করে রাজদণ্ডের এমন শক্তি আছে কি?

১৮। প্রিনসেস, i,107

খেয়াল

সমীর ঘোষ

সোমলতার মুখের দিকে চেয়ে আজ বড়ো ভাল লাগলো। তার মুখ আমার এমনিতে ভালো লাগে। তবে সেই ভালো লাগার ফাঁকে ফাঁকে আমাকে যথেষ্ট অস্বস্তি বোধ করতে হয়। এর কারণ আপনারা সকলে জানেন। ওর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ একটু জটিল। এই জটিলতা আমাকে জ্বালিয়ে মারে। তাই গল্প বলার সময় আমার ভয় থাকে। ভাবি এ গল্প হয়তো সোমলতার ভালো লাগবে না। আমি কথক হিসাবে একটা বিলোল কটাক্ষও পাব না।

আজ কিন্তু আমি ভীষণ সাহস পেলুম সোমলতার মুখের প্রতি তাকিয়ে। সে মুখে একটা প্রসন্নতা খেলা করে বেড়াচ্ছে। সেই দুটি বড়ো বড়ো চোখে একটা ভারি শান্ত আলো ছড়ানো রয়েছে। আর সব থেকে আশ্বাসের ব্যাপার হোল ওর পরণের শাড়ী। অন্যান্য দিনের সাদা রং ছেড়ে আজ ও কমলা রঙের শাড়ী পরেছে। কমলারঙ বোধ হয় বৈরাগ্যের প্রতীক। বৈরাগিণীর উদাসীনতা নিয়ে ও যদি আজকের গল্প শোনে তা হোলে আমি বেঁচে যাই। কেননা আজকের গল্প কি হবে তা বলা বড়ো কঠিন।

চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিলো সোমলতা। বললো, কই বলুন।

নির্ভয়ে বলি সোম?

কালো ভ্রূলতা ছিলাটানা ধনুকের মতো বিসর্পিত হোয়ে গেল। তারপর মৃদু হাসিতে দুটি সুন্দর ঠোঁট উজ্জ্বল করে সে বললো, বলুন। আর বলেই বা কি হবে। বাগান থেকে নতুন চায়ের বাক্স এসেছে। আমার কৃতিত্ব কিছু নেই এর মধ্যে।

সোমলতার মুখের প্রতি তাকিয়ে মস্তিষ্ক উত্তেজিত হোয়েছিল। তাই চায়ের সুগন্ধ মস্তিষ্ক গ্রহণ করেনি তখনো। সোমলতা যদি না নিজে থেকে ধরিয়ে দিতো তবে কথা (পায়ের বদলে উপস্থিত) পিছলিয়ে এমন মিষ্ট সন্ধ্যাটা মাটি হয়ে যেতো।

ধন্যবাদ দিলুম ভাগ্যবিধাতাকে। তারপর সন্তর্পণে বললুম, তাই—

বাধা দিলো সোমলতা। আগেকার সেই সুন্দর হাসিটাই দুচোখে ভরে রেখে বললো, তাই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থেকে আর কাজ নেই। চায়ে চুমুক দিয়ে যাহোক কিছু বলুন।

নির্ভয়ে বলি?

হ্যাঁ। বাবারে বাবা! কবে যে আপনি ভয়ে ভয়ে বলেন তাতো জানিনা। আর বাজে কথা বলবেন না। যা বলবেন বলে মনে করে এসেছেন, বলুন।

চা'টা সত্যি ভালো। তাই পর পর দু তিন চুমুক দিয়ে আর একবার মনে মনে চায়ের বাগানকে প্রশংসা করে বললুম, মেয়েটি দেখতে ভারি সুন্দর ছিল।

গল্প সুরু হোল?

হ্যাঁ।

বেশ। সোমলতা কাঁধের ওপর দিয়ে শাড়ীর আঁচল আর একবার বেশ করে গুছিয়ে নিয়ে আমার মুখের ওপর দুটি চোখের চাহনী মেলে ধরলো।

মুখ নীচু করে আর একটা চুমুক দিয়ে খানিকটা চায়ের আস্বাদ গ্রহণ করে বললুম, মালিনী নামটা যে কে রেখেছিল তা মনে করা আজ ভারি কঠিন। তবে এটা ঠিক যে নাম রেখেছিল সে হয় ভবিষ্যদৃষ্টি সম্পন্নব্যক্তি ছিল না—হয় নিজেরি অজান্তে তিনটি অক্ষরে একটি কাব্য বলতে পারো, গীতিকাব্য রচনা করে গিয়েছিল।

রূপের বর্ণনাটা বেশি করে করবো না। কেন না ঠিকমতো পারবো না। তবে একটু বলবো যে ওর সারা মুখ যেন জ্যোৎস্না দিয়ে মাজা ছিল, চোখে দীঘির অতল-স্পর্শী কালোজলের ঝিলিক থৈ থৈ করে উঠতো। আর

দেখবার ছিল দুটি ঠোঁট। মনে হোত আঙুল দিয়ে টোকা মারলেই ফেটে গিয়ে রক্ত পড়বে।

বয়স তখন তার বেশি নয়। বছর দশেক হবে। কিন্তু বয়সের মাপকাঠি সকল ক্ষেত্রে জীবনের মাপকাঠি নয়। যে দেখতো মালিনীকে সেই মুগ্ধ হোত। সব থেকে বেশি মুগ্ধ হোতেন তার বাবা যখন দেখতেন মেয়েকে রেগে যেতে। কোঁকড়ানো চুলভরা মাথাটি নিজের গালের ওপর চেপে ধরে সুখদাচরণ বলতেন, কি গো এতো রাগ কিসের ?

দীঘির সেই কালো জলভরা চোখে তখন আগুনের রক্তশিখা ঝলসে উঠেছে। বাপের আদরে সামান্য স্তিমিত হোত সেই রক্তশিখার ঝলসানি। তীক্ষ্ণ গলায় মালিনী বলতো, রাগ করবো না ? আমাকে ডাকছে মানী বলে!

মানী তো ভালোকথা। যার মান আছে সেই মানী।

না, না,—কোঁকড়ানো চুলেভরা মাথাটা একবার ঝাঁকিয়ে দিয়ে মালিনী বলে, বিনুদা বলছে কানির সঙ্গে খুব ভালো মিল হোচ্ছে মানী!

কি রকম ?

মানী কানি জানি না!

হেসে ওঠেন সুখদাচরণ, বলেন, ওই যা বিনু হেরে গেল। ওকি বলছে বুঝতে পারছো না। ও বলছে মানী যে কানি সে কথা তো ও জানে না। আর মাগো দেখো তো সামনের আয়নাখানার দিকে চেয়ে, দেখো তো ওখানে কে, বড়ো বড়ো দুটো চোখ কার ?

মালিনীর দুটো চোখেই এবার হাসি জেগে ওঠে। দুটি পাতলা বক্তাধরে সেই হাসির ঝিলিক লাগে। তবুও একটা অভিমানের হিল্লোল বইয়ে দিয়ে বাপের গায়ে নিজেকে এলিয়ে রেখে সে বলে, তুমি বড়ো দুষ্টু বাবা!

—তাই নাকি ?

আমাকে হাসিয়ে দিলে। মেয়ে এবার মুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য আনবার চেষ্টা করে।

সুখদাচরণ আর একবার হাসেন, তারপর সারা মুখে একটা গাম্ভীর্য্যের কালো ছায়া নামিয়ে এনে বলেন, কি অন্যায়, ও হো কি অন্যায়! হাসবে কারা ? প্যাঁচা, বোঁচা! মানুষ কখনো হাসতে পাবে না। যদি হাসে তাহোলে সেও যে প্যাঁচা বোঁচা হোয়ে যাবে।

কখনো না। মালিনী ছুটে পালিয়ে যায়।

সুখদাচরণ এমন করে মালিনীকে মামলায় ডিক্রী দিয়ে দিলেও নিষ্পত্তি এখানে হোত না। রাত্রিতে স্বামী-স্ত্রীর দেখা হোলে সামান্য দু-একটা কথার পর শোভনা বলেন, মালাকে তুমি আর আদর দিও না।

কেন, কি হোল ?

কি মুখ যে ওর হয়েছে। এমনভাবে চললে ও আর পরের ঘর করতে পারবে না।

তুমি এখন থেকেই ওর পরের ঘরের কথা ভাবছো ?

তা ভাববো না ? মেয়ে দশ পার হোয়ে এগারোয় পড়লো।—শোভনা গভীর বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

গড়গড়ির নলটা মুখ থেকে সরিয়ে নিয়ে একটু হাসলেন সুখদাচরণ, বললেন, না, তুমি কোনোকালে গিন্নী হোতে পারবে না। আমি মালাকে পরের ঘরে যেতে দোবো কেন ?

দেখো বাপু, তুমি ওসব প্যাঁচালো কথা কয়ো না। কি বলতে চাও বেশ সোজা কথায় বলো, আমি বুঝতে পারবো। শোভনার গলা একটু তীক্ষ্ণ হোয়ে উঠলো।

সুখদাচরণ হাসলেন আবার। তারপর একটা সুখ-টান দিয়ে তামাকের মিষ্টি গন্ধভরা ধোঁয়া চারপাশে ছড়িয়ে দিতে দিতে বললেন, নতুন বৌ, তোমার কি একেবারে চোখ নেই ? ধরো মেয়ের বিয়ে দিয়ে যদি আমি ঘরজামাই রাখি। বিনুতো খারাপ ছেলে নয়।

বিনু ? কি বলছো তুমি ? শোভনা যেন অস্ফুট স্বরে নিজেকেই প্রশ্ন করলেন।

চমকাচ্ছো কেন ? বিনু যেদিন প্রথম এলো সেদিনই আমার কথাটা মনে হোয়েছিল। তবে তখনো ছেলেটির কোনো পরিচয় পাইনি, তাই তোমাকে কোন কথা বলি নি। তা এখন দেখছি ছেলেটি লেখাপড়ায় ভালো, দেখতে শুনতেও পরিষ্কার। রূপবান না হোলেও চটক আছে চেহারার মধ্যে। আচ্ছা এখন ওসব কথা থাক। মালার জন্য তুমি ভেবো না।

না ভাবনা-ভাবনির কিছু নেই। কিন্তু তুমিও বেশী আদর দিও না। একগুঁয়ে জেদী হোয়ে যাচ্ছে মেয়ে। এর ফল ভালো হবে না—সংসার করতে পারবে না।

মায়ের জেদ তো কম দেখি না। এত করে বুঝিয়ে বললুম—

বাপের তো জেদ একেবারে নেই—শোভনা একটা কটাক্ষ করলেন।

যেমন দেবী তেমনি দেবা।—সুখদাচরণ একটা স্মিত হাসি দিয়ে শোভনার কটাক্ষ ফিরিয়ে দিলেন। উত্তরে শোভনা হাসলে।

সুখদাচরণ ছিলেন মেদিনীপুর আদালতের সরকারী উকীল। বাঁকুড়া সহরের কাছাকাছি একটা গ্রামে তাঁর বাড়ী। বাড়ীর আশেপাশের অনেকখানি জঙ্গলের ও চাষের জমির মালিক তিনি। জঙ্গল তিনি বিক্রী করে দেন না। কাঠ কাটিয়ে এনে নিজের খামারে জমা করেন, তারপর সেখান থেকে সেই কাঠ বিক্রী করেন। বর্ষাকালটা শোভনা মেদিনীপুর সহরে সুখদাচরণের কাছে চলে যান। আর বাকী সময়টা থাকেন গ্রামের বাড়ীতে। চাষবাসের তদারক থেকে সুরু করে জঙ্গলের কাঠ বিক্রী সমস্তই তাঁর তত্ত্বাবধানে হয়। মাঝে মাঝে সুখদাচরণ বলেন—জঙ্গল ও জমি বিক্রী করে দেবেন। শোভনা রাজী হন না। তিনি বলেন, না, না, চাষের জমী লক্ষ্মী। আমার অভাব কিসের যে লক্ষ্মী বেচবো!

আসলে ব্যাপার তা নয়। ছেলে বয়সে বিয়ে হোলেও প্রায় পঁয়ত্রিশের কাছে আসবার পর শোভনা মা হন। সুখদাচরণের বয়স তখন চল্লিশের ওপর। মেদিনীরের আদালতে কিছু নামডাক তাঁর হোয়েছে। ওই অবধি মালিনীর জন্মের প্রায় দুবছরের মাথায় সরকারী উকিল হোলেন তিনি অকস্মাৎ। তারপর একে একে আরো তিনটি সন্তান জন্ম গ্রহণ করলো—তিনটিই পুত্রসন্তান।

সুখদাচরণের ওকালতির আয় যেমন, ব্যয়ও আছে তেমনি। মানুষটা সৌখীন ও মেজাজী। কাজেই সঞ্চয় কম। মালিনীর দশ থেকে এগারো চলেছে, ছেলেরাও শিশু। সংসারে প্রকৃতপক্ষে অন্য কোনো ঝামেলা নাই। সুতরাং খরচ কম। শোভনা সাবধানী মানুষ। তিনি তিনটী ছেলের লেখাপড়া আর মালিনীর বিয়ের কথা বেশ গম্ভীররূপে চিন্তা করেন; আরো জানেন সুখদাচরণের বয়স হোয়ে আসছে। ওকালতির উপার্জ্জনে ভাঁটা পড়বে শীঘ্র। সুতরাং মেদিনীপুর শহর আঁকড়ে পড়ে থাকলে চলবে না। দেশের বাড়ী জমি আর জঙ্গলই হোল নিরাপদ। তার পেছনে মন দেওয়াই সমীচীন। ছেলেদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য খুব বেশি তিনি ভাবেন না। কেননা মেদিনীপুরের চাইতে বাঁকুড়াই তাঁর পছন্দ। ওখানকার কলেজ বড়ো ভাল লাগে তাঁর।

সুখদাচরণ কিন্তু একটু স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করেন। ইচ্ছা তাঁর মালিনীকে লেখাপড়া শেখাবেন। সম্ভবপর হোলে কলকাতার কোনো কলেজেও ভর্ত্তি করবেন।

এই কলেজে ভর্ত্তি করবার প্রস্তাব উঠলে বিরোধ বাধে শোভনার সঙ্গে। নরম গলায় তিনি বলেন, ধেড়ে বয়স পর্য্যন্ত কইমাছের মতোন আইবুড়ো মেয়েকে জিইয়ে রাখতে নেই। কবে আমরা আছি, কবে আমরা নেই। পনের ষোল বছর বয়স হোলে দেখেশুনে মেয়ের বিয়ে দাও। আমাদের কাজ আমরা করে যাবো, ছেলেমেয়েরা বলতে পারবে না—বাবা মা কেন করেন নি।

কথাটা স্পষ্ট, যুক্তিটা জোরালো। সুখদাচরণের এতে তবুও সায় নেই। মেয়ের বিয়ে তিনি দিতে চান, কিন্তু কলেজে পড়ানোর সাধও তাঁর প্রচুর

এই পরিস্থিতির মধ্যে এ সংসারে নতুন লোক এলো: সুবিনয়। সুখদাচরণের দূর সম্পর্কের এক বোনের ছেলে সে। সংসারের অবস্থা তাদের ভাল ছিল। কিন্তু হঠাৎ পর পর সুবিনয়ের দুটি বোনের বিয়ে দিয়ে বাবা মারা গেলেন। ফলে সংসারের আয় শুধু বন্ধ হোল না, বেশ কিছু ঋণও এসে পড়লো সুবিনয়ের মার ওপর। তিনি তখন অন্য কোন উপায় না দেখে শরণাপন্ন হোলেন সুখদাচরণের। সুখদাচরণ খাটলেন, কিন্তু সম্পত্তি বাঁচাতে পারলেন না। তবে সুবিনয়কে তিনি নিজের কাছে রাখলেন—লেখাপড়া শেখানোর ভারটা নিলেন।

সুবিনয়ের বয়স তখন তের থেকে চৌদ্দ। অল্প বয়সে মালিনীর রূপ দেহের বাঁধন ছাড়িয়ে যাচ্ছে। সুবিনয়ের

রূপ কিন্তু দেহের রেখায় রেখায় বাঁধা। এ দেশের লাল মাটি যেমন মন ভুলায়, সুবিনয় তেমনি সামনে এসে দাঁড়ালেই মন টেনে নেয়। বসন্তের বিলাশালের মতোন ওর দেহে কৈশোরের সজীবতা। নাকটা একটু বেশি উঁচু, আর চোখ দুটো ছোট। এ ছাড়া আর কোন খুঁত নেই মুখে কি দেহে।

মালিনী কিন্তু পছন্দ করলো না সুবিনয়কে। সে শুনেছে লেখাপড়ায় সুবিনয় প্রথম হয়। তার নিজের পড়তে গেলে বিষম খারাপ লাগে, এমন কি মাথাব্যথা করে অনেক সময়। তাই বোধ হয় সুখদাচরণ যখন মালিনীকে ডেকে সুবিনয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, বললেন, মালা এই হোল তোর বিনুদা, লেখাপড়ায় খুব ভালো।—মালিনীর শেষ কথা দুটো মোটে ভালো লাগলো না।

সুখদাচরণ অবশ্য ওইখানে থামলেন না, বলে চললেন, ওর কাছ থেকে তোমার যা ইচ্ছে পড়া অঙ্ক জেনে নেবে। কি বিনু, পারবে না মালাকে পড়া বলে দিতে?

লজ্জিত বিনু কোনোরকমে একবার মুখ উঁচু করলো। পরক্ষণে মাথা হেলিয়ে মুখ নীচু করলো, অর্থাৎ পারবে।

মালাকে তুমি এতো লজ্জা করছো কেন? লজ্জা পাবার কি আছে? ছোট মেয়ে, সম্পর্কে তোমার বোন হয়।

এই সময় শোভনা ঘরে এসে ঢুকলেন; কণ্ঠে তাঁর ভর্ৎসনার সুর, আঃ তোমাদের নিয়ে আর পারবার জো নেই! কতোবার যে ডাকলুম, চলো, বিনুকে নিয়ে চলো, জল খাবে। মালা, আয়, তোর বাবাকে গিয়ে চা করে দিবি। বিনু, তুমি বাবা চা খাও?

না, মামিমা। শোভনার মিষ্ট সম্ভাষণে সুবিনয় অনেকটা সহজ হোতে পারলো।

সুখদাচরণ কিন্তু আবার জট পাকালেন, ওগো বিনুকেও এক পেয়ালা চা দিতে বলো। আমার কাছে যখন থাকবে তখন হাতেখড়ি হোয়ে যাওয়া ভালো।

বলা বহুল্য সুখদাচরণ চা খান একটু বেশি।

আতঙ্কিত হোয়ে উঠলেন শোভনা, বললেন, না, না, হাতেখড়িতে আর দরকার নেই। বিনু বাবা, তুমি চা খাওয়া অভ্যাস করো না, আজ অবশ্য একপেয়ালা খাও।

চা তৈরী করলো মালিনী। সুখদাচরণকে দিয়ে, সুবিনয়ের হাতে যখন পেয়ালা দিতে গেল, তখন মুখ নীচু করেই পেয়ালা নিতে গিয়ে বিভ্রাট বাধিয়ে বসলো সুবিনয়। রেকাবের ওপর থেকে পেয়ালা পিছলিয়ে গিয়ে খানিকটা চা মালিনীর ফ্রকে পড়লো।

ইস্, অসভ্য কোথাকার! মালিনী আক্ষেপের চাইতে তিরস্কারের প্রকাশটাই বেশি জানিয়ে দিলো নিজের দ্রুত উচ্চারিত কথা-ক'টার মধ্যে।

সেও তিরস্কৃত হোল আরও কঠিনভাষায় শোভনার দ্বারা, চা পড়ে গেছে তো কি হয়েছে? অন্যায় তো তোরি। নতুন মানুষকে অমন করে ডিসে বসিয়ে হাতে হাতে চা দেয় কেউ? বিনুবাবা তুমি কিছু মনে করো না, ও মেয়েটা ওই রকম। তোমার মামাবাবুর আদরে আদরে কি যে তৈরী হোচ্ছে ও!

সুখদাচরণ কি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু শোভনার মুখের কঠিনভাব চোখে পড়তে তাঁর বক্তব্য অনুক্ত রয়ে গেল। মালিনী নিঃশব্দে চলে গেল। চা খাওয়া হোয়ে গেলে শোভনা বললেন, বিনু তুমি বাবা বারান্দা বেয়ে বরাবর চলে যাও—খিড়কীর দরজা পাবে। দরজা খুললে বাগান। দেখো তো আমি কেমন বাগান করেছি।

বারান্দায় বেরিয়ে এলো সুবিনয়। মুখ তার তখনও রক্তবর্ণ হোয়ে আছে। দুটো কর্ণমূল হোতে আগুনের ঝলক ছুটে বেরোচ্ছে। মনে মনে সে হাজার রকম ধরণের কথা ভাবছে যাতে করে সে অনায়াসে সহজ হাতে শক্ত করে রেকাব পেয়ালা ধরতে পারতো, চা পড়তো না মালিনীর শাদা রেশমী ফ্রকে। সেই সব ভাবতে ভাবতে বারান্দা শেষ হোয়ে খিড়কীর দরোজার সামনে এসে পড়লো সে। খিড়কীর দরজার কপাট খোলা। দেখলো সে। খোলা কপাট দেখেও সে কিছু ভাবলো না, সোজা দরজা পার হোয়ে বাগানে ঢুকলো।

বাগানে ঢুকে তার মনের ক্ষোভ মিটে গেল। ফুলের গাছ যেমন প্রচুর, ফলের গাছও তেমনি অনেক। সব থেকে তার মন টানলো একটা লেবুর গাছ। গাছটা খুবই

বড়ো ফলেছেও তেমনি অজস্র ফল। চির-সবুজ মোটা পাতার ওপর হলদে হয়ে আসা সুপক্ক ফলগুলি দেখাচ্ছে ভারি সুন্দর। গাছটার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে মন তার আনন্দে নেচে উঠলো। পাকা লেবুর সুগন্ধে চারপাশ ভরে উঠেছে।

গাছের একেবারে কাছে এসে সে চমকে গেল। গাছের তলা একেবারে পরিষ্কার। গুড়ির বেশ খানিকটা ওপর থেকে ডালপালা সুরু হোয়েছে। নীচে সবুজমাটির ওপর অনেকগুলো হলদে লেবু পরে আছে সবুজঘাসের ওপর। আর সেই ঘাসের ওপরই মালিনী শুয়ে আছে।

বিকালের রোদ তখন উজ্জল হোয়ে থাকলেও লেবু-গাছের তলা নরম ছায়ায় ঢাকা নিরিবিলি। সেই নিরি-বিলিতে আপন মনে পড়ে আছে মালিনী। বা হাতের কনুয়ের খাঁজ দিয়ে চোখ চাপা দিয়েছে, ডান হাতের করতল মাথার নীচে দেওয়া। প্রায় স্তম্ভিত হোয়ে সুবিনয় দাঁড়িয়ে রইলো মিনিটখানেক। তারপর সবেগে পেছন ফিরলো। পেছন ফিরে সে কয়েক পা গেছে এমন সময় ডাক এলো, শোনো।

দাঁড়িয়ে পড়লো সুবিনয়। আবার আহ্বান এলো, এখানে এসো।

অনেকটা ভীরু পায়ে সুবিনয় সেই গাছতলার কাছে মালিনীর সামনে এসে দাঁড়ালো।

মালিনী তখন নতজানু হোয়ে উঠে বসেছে। চোখের দৃপ্ত দৃষ্টি সুবিনয়ের চোখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বললো, তুমি আমার জামায় চা ফেলে আমাকেই বকুনি খাওয়ালে কেন?

আমি ইচ্ছে করে ফেলিনি। প্রায় কম্পিতকণ্ঠে উত্তর দিলো সুবিনয়।

দেখো তো আমার জামা কি রকম নষ্ট হোয়ে গেছে। মালিনীর বোধহয় চোখ ফেটে জল এলো, তীক্ষ্ণগলায় সে বললো, লেখাপড়া জানে, না হাতী। তুমি আমার সঙ্গে কখনো কথা বলবে না বলছি। তোমার সঙ্গে আড়ি।

মালিনী উঠে দাঁড়ালো এবং কোনদিকে না চেয়ে বড়ো বড়ো পা ফেলে বাড়ীর মধ্যে চলে গেলো।

সেই গাছতলাতেই বসে পড়লো সুবিনয়। এইবার চোখ ফেটে জল আসবার পালা তার। কি করেছে সে এই সুন্দর মেয়েটির, যে প্রথম দেখা থেকে ও এমন করে তার সঙ্গে ঝগড়া করছে?

বিকালের আলো ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। সন্ধ্যার অন্ধকার নামতে সুরু করলো। সেই ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে সবিস্ময়ে এক সময় সে দেখলো মালিনী তার দিকে আসছে। সামনে এসে দাঁড়ালো সে। পরনের সাদা জামা বদল করে একটা টকটকে লাল জামা পরেছে ও। এলোচুল উভবেণীতে সংবদ্ধ করে কানের পাশ দিয়ে বুকের ওপর নামিয়ে দিয়েছে।

চলো, আর বসে থাকতে হবে না। মা ডাকছে।

নীরবে উঠে দাঁড়ালো সুবিনয়। তারপর মালিনীর পেছন পেছন বাগান ছেড়ে বাড়ীতে সে ফিরে চললো। এই পথটুকুন তাদের আর কোনো কথা হোল না।

ছয় বছর পরে আবার এ গল্প সুরু করা যাক। বি, এস, সি, পরীক্ষা দিয়ে সুবিনয় নিজের দেশের বাড়ীতে মাকে প্রণাম করতে গিয়েছিল। প্রণামটা তার শেষ প্রণাম হোল। দেশের বাড়ীতেই কোনক্রমে মায়ের কাজ কর্ম সেরে ফিরে চললো সে মেদিনীপুরে সুখদাচরণের কাছে। মেদিনীপুরে এসে সে দেখলো মৃত্যুবাক্স তখনও তার সঙ্গ ছাড়ে নি। অতিরিক্ত রক্তচাপে আগের দিন থেকে সুখদাচরণ অজ্ঞান হোয়ে পড়ে আছেন। ডাক্তার সমস্ত আশাভরসা ছেড়ে দিয়ে গেছে। তার নামে দেশের বাড়ীতে 'তার' গেছে।

সুখদাচরণের জ্ঞান আর ফিরলো না। আঘাতটা তাঁর বেশ গুরুতর ও আকস্মিক হোয়েছিল। সরকারী উকিলের কাজ থেকে অবসর পাওয়ার পর আবার স্বাধীনভাবে ওকালতি সুরু করেছিলেন এবং লুকিয়ে শেয়ার ব্রোকারের চালিয়েছিলেন। এই শেয়ার-বাজারের এক দারুণ বিপর্য্যয় তাঁকে মরণ-আঘাত হানলো।

সব কথা প্রকাশ পেলো মাসখানেকের মধ্যে। দেখা গেল সুখদাচরণ অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট করে গেছেন। শোভনার অলঙ্কার, জঙ্গল আর ধানজমি ছাড়া অন্য কিছু নেই। শোভনা হোয়ে গেলেন এক প্রকৃতির। প্রথমে

খাওয়া ছেড়ে দিলেন। কেউ-ই খাওয়াতে পারে না। অবশেষে সুবিনয় এগোলো এবং অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর বহু সাধ্যযত্নে সে শোভনাকে কিছুটা সুস্থ করে তুললো। শোভনার একেবারে কাছাকাছি থাকার ফলে সে বুঝতে পারলো শোভনার আঘাত সব থেকে বেশি কোথায় লেগেছে। আর সত্যি কথা বলতে গেলে তার মনে হোল ওটাকে আঘাত বলা যায় না, বলতে হয় আশঙ্কা। তিনি তখন ভাবছেন মালিনীর বিয়ের কথা। মনের গভীরে তাঁর এই আশঙ্কাটাই প্রবল যে, সুবিনয় তাঁর কথা নাও রাখতে পারে। কেন না বিয়ের পাত্রী হিসাবে মালিনীর রূপ ছাড়া আর অন্য কোনো মূল্য নেই।

নিজের দিকে তাকিয়ে কোনো আশ্বাস পেলো না সুবিনয়। পরীক্ষায় পাশ অবশ্য সে করবে—এমন কি জলপানিও পেতে পাবে। কিন্তু জলপানি ও ছেলে পড়ানোর আয় ছাড়া এম, এস, সি পড়বার কোনো উপায় তার নেই। এম, এস, সি, পড়া শেষ করতে ও পরীক্ষার ফলাফল পেতে আরো আড়াই বছর যাবে। পরীক্ষা পাশ করলেই বা ভরসা কোথায়? সমস্ত কিছু শেষ হোয়ে গেছে সুখদাচরণের সঙ্গে। সুতরাং মুখ ফুটে কোনো কথা সে শোভনাকে বলতে পারলো না।

শোভনা আর সুবিনয় যখন পরস্পরের চিন্তা নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জ্জরিত, তখন নিয়তি তাঁর আসল খেলা সুরু করলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হোল, দেখা গেল মালিনী উত্তীর্ণ হোতে পারে নি।

মালিনীকে বিচলিত হোতে দেখা গেল না। বরং সকলকে সে-ই বিচলিত করে তুললো যখন বললো, আমি আর পড়বো না।

সুবিনয় এসে শোভনার দরবারে আর্জ্জি পেশ করলো; বেশ গম্ভীরভাবে বললো, এ হয় না মামিমা। কতো ছেলে মেয়ে তো এমন ফেল করেই। তা বলে পড়াশোনা তারা ছেড়ে দেয় না। মালা অন্ততঃ সাপ্লিমেনটারীটা দিক। আমি নিজে পড়াবো, দেখি সে কেমন করে ফেল করে।

বেশির ভাগ সময় শুয়ে থাকেন শোভনা। আজও শুয়েছিলেন। সেই অবস্থাতে বললেন, জান তো মেয়ে কি রকম বেয়াড়া। আচ্ছা, তুমি বোঝাও—যদি রাজি হয়। যদি নয় রাজি হোতেই হবে। সুবিনয় বেশ উত্তেজিত ভাবে কথা বললো, একটা সাবজেক্টে ফেল করে কেউ কখনো পরীক্ষা দেওয়া ছেড়ে দেয়!

কোনো কথা বললেন না শোভনা—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়লো তাঁর।

সেদিন দুপুর বেলা সুবিনয় মালিনীকে খুঁজে বার করলো সেই লেবুগাছতলায়। আজও মালিনী শুয়ে পড়েছিল। কিন্তু আজকের মালিনীর সঙ্গে সেই ছ' বছর পূর্ব্বেকার মালিনীর সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া কঠিন। আজও সে কনুয়ের খাঁজ দিয়ে মুখ চোখ ঢেকে শুয়েছিল। তবে সেই বা-হাতখানির সুডৌল গড়ন আর কাঁচা মোমের উজ্জ্বল রঙ সুবিনয়ের বুকের রক্তে হঠাৎ কেমন একটা দ্রুত আবর্ত্তন জাগিয়ে তুললো। আর একটু এগিয়ে আসবার পর চোখে পড়লো দুটি পা। সুবিনয় কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে দাঁড়িয়ে পড়লো। একবার ভাবলো সে ফিরে যায়, যা সে বলতে চায় শোভনার সামনে রাত্রিবেলায় বলবে। কিন্তু বুকের দ্রুতস্পন্দন সে জোর করে থামিয়ে দিলো। এই নির্জ্জনে নিভৃতেই বোঝাতে হবে মালিনীকে। কটু কথা বলবেমালিনী? বলুক। এই সুযোগ ওকে দিতে হবে। আর অমন ভাবে কথা বললে মালিনীর মন যদি ফেরে।

অনেকখানি কাছে এগিয়ে এসে সুবিময় ডাকলো, মালা?

মুখের ওপর হোতে হাত না তুলে মালিনী উত্তর দিলো, কি?

তোমার সঙ্গে আমার গোটাকতক কথা ছিল।

বলো। সেই একভাবে শায়িত অবস্থায় মালিনী উত্তর দিলো।

উঠে বসো মালা, এমনভাবে কি কথা বলা যায়?

কোনো উত্তর না দিয়ে আরো কয়েক মুহূর্ত্ত মালিনী শুয়ে রইল। তারপর ধীর অলস গতিতে উঠে বসলো। ওই ধীর অলস গতির প্রতি চেয়ে থাকতে থাকতে সুবিনয়ের বুকের রক্তধারা কেঁপে উঠলো। আবার তার মন সতর্কতার বাণী শোনালো: চলো ফিরে চলো। এ লড়াই-এ তুমি জয়ী হোতে পারবে না।

সবলে নিজের সমস্ত অনুভূতিকে নিপীড়িত করলো সুবিনয়ঃ সে কি মালিনীকে চেনে না? গর্ব্বিতা উদ্ধতা মালিনীকে সুখদাচরণের মিষ্ট ব্যবহার মাত্র নত করতে পেরেছে। সুতরাং উচ্ছল রক্তধারার নাচবার কোনো প্রয়োজন নেই। এ নৃত্যের মূল্য তারা কোনোদিন পাবে না।

বলো। মালিনীর দুই চোখে একটা কৌতুকের হাসি দেখা গেল। সেই হাসি আজ সকালে হালকা করে নেওয়া সুরমা ওই দুই চোখের রূপকে এক অসামান্য ঔজ্জ্বল্যে প্রদীপ্ত করে তুললো। মনে হোল স্বয়ং দীপ্ত দুটি মণি-ঘন চোখের পাতার বেষ্টনীর মধ্যে দীপ্তি বিকিরণ করছে। বেণীবদ্ধ চুলের সংযম ভেঙে গেছে। কিছু চুল কানের পাশ দিয়ে কপোলের ওপর এসে পড়েছে আর বাকিটা ছড়িয়ে গেছে পিঠের ওপর। বা-হাতের ছোট ছোট কমনীয় আঙুলগুলি মুঠি করে চিবুকের নীচে দিয়ে সে বললো, বসো, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি কথা বলা যায়?

বসলো সুবিনয়। মালিনী বললো, বলো কি বলতে চাও?

মালা, আবার তুমি পড়ো।

না, কি হবে পড়ে? আর পড়ার খরচ আসবে কোথা থেকে?

পড়ার খরচ কিছু নয়, মাত্র পরীক্ষার ফি—সে মামিমা দেবেন বলেছেন। আর আমি তোমাকে পড়াবো।

মালিনীর মুখের রেখাগুলি যেন এক নিমেষে কঠিন হোয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে সেই কঠিনতা মিলিয়ে গেল। নরম গলায় সে জিজ্ঞেস করলো, আমি তোমার কাছে পড়বো কেন? তুমি আমাদের কে?

আমি কেউ নই?

না।

অল্প একটু নীরবতা। সুবিনয়ের মুখ তখন বিবর্ণ হোয়ে গেছে। হঠাৎ ভারি গলায় সে নীরবতা ভাঙলো, মালা!

কি?

আমাকে তোমাদের করে নিতে পারো না? আমি তো তোমার কোন অনিষ্ট করি নি, কোন শত্রুতা করি নি। প্রথম যেদিন এসেছিলুম, পাড়াগাঁয়ের ছোট ছেলে অনভ্যস্ত হাতে তোমার ফ্রকে চা ফেলে দিয়েছিল। সে তো ইচ্ছে করে করে নি। সেদিন এই গাছতলাতে তুমি তাকে কাঁদিয়ে দিয়েছিলে। তারপর ছ বছর চলে গেছে। মামাবাবু মামিমা যে আমার নন এক মুহূর্তের জন্যে একথা আমার মনে আসে নি। তিনু বিনু আর মিনু আমাকে নিজের দাদা বলেই জানে, এমন কি ডাকেও বড়দা বলে।

সুবিনয় থামলো। মালিনীর সেই রক্তপ্রবালের মতো দুটি ক্ষীণ ওষ্ঠাধরে অল্প একটু হাসি ফুটে উঠলো। বাঁকা গলায় সে বললো, আমিও তোমাকে বড়দা বলবো?

ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে সুবিনয়ের সব কিছু গোলমাল হোয়ে গেল। বিবর্ণতা মুছে গিয়ে রক্তের প্রাবল্যে সারা মুখ আগুনের মতো লাল হোয়ে উঠলো। প্রায় ভাঙা গলায় সে বললে, না বড়দা ডাক নয়, আমি চাই তুমি আমাকে বিয়ে করো। সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে মালিনীর একটা হাত চেপে ধরলো সে।

এমনি করেই বুঝি পরীক্ষার পড়া পড়াবে? মালিনী দুটি ছন্দিত ভুরু কুঞ্চিত করলো, কিন্তু হাত ছাড়ালো না। বলে চললো সে, এ পরীক্ষাতেও আমি ফেল করে গেছি। আমার বাবার খেয়ে যে মানুষ, তাকে আমি বিয়ে করতে পারি না।

মালিনীর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুবিনয়ের হাতের বাঁধন শ্লথ হয়ে গেল। মালিনী গাছতলা থেকে বেরিয়ে এলো। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে শাড়ীর আঁচলটা ঘুরিয়ে নিয়ে নিজেকে গুছিয়ে নিলো। তারপর প্রচ্ছন্ন কৌতুকভরা কণ্ঠে বললো, আমি চললুম।

সুবিনয় তখন সেই গাছতলায় উপুড় হোয়ে শুয়ে পড়েছে—একটা অবরুদ্ধ উচ্ছ্বাসে সারা দেহ কাঁপছে। রাত্রিতে সুবিনয় খেতে পারলো না। মনে হচ্ছে তার একখানা অতি-প্রচণ্ডভার লোহার চাকা তার গলায় কে আটকে দিয়ে গেছে। সুবিনয়ের এমন কোন ক্ষমতা নেই যে সেই ভারি চাকাটাকে গড়িয়ে ফেলে দেয়।

খাবার সময়টা শোভনা সকলের সামনে এসে বসেন। লক্ষ্য করলেন তিনি সুবিনয়ের অক্ষুধা। তিনি বললেন, বিনু, খাচ্ছো না কেন বাবা? শরীর খারাপ হয়েছে?

না মামীমা, শরীর খারাপ নয়। আমি কাল মেদিনীপুর যাবো। জড়িতকণ্ঠে উত্তর দিলো সুবিনয়।

মালিনী খাবার সময় প্রতিদিন গম্ভীরভাবে পরিবেশন করে। আজ তাকে ভীষণ উচ্ছল ও হাসিখুসীভরা দেখলেন শোভনা। সুবিনয়ের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ছোটভাই মৃন্ময়কে বললো, কিরে মিনু, লেখাপড়া শিখে মেদিনীপুরে কলেজে পড়তে যাবি, না আমার মতো মুখ্যু হোয়ে থাকবি?

মৃন্ময়ের গাল তখন খাবারে ভর্তি। তার বক্তব্য কিছু বোঝা গেল না।

শোভনা সুবিনয়ের মুখের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে চাইলেন মালিনার মুখের প্রতি। বুঝলেন তিনি একটা এমন কিছু ব্যাপার ঘটেছে যার জন্যে সদাহাস্যময় সুবিনয় বিষণ্ণ ও গৃহত্যাগোন্মুখ আর গম্ভীরা মালিনী রহস্যচঞ্চলা ও কলহাসিনী।

বিনু, মালার পড়ার কি হবে তুমি চলে গেলে?

ও পড়বে না। মুখ নীচু করে সুবিনয় উত্তর দিলো।

হু! শোভনা চুপ করে চিন্তা করতে লাগলেন।

রাত্রিতে কিছুতে ঘুম এলো না সুবিনয়ের। সেই লোহার চাকাটা আকারে অনেক বেড়ে গেল এবং গলা হোতে বুক, বুক থেকে পা ইত্যাদি সারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়লো। আঃ, কেন ওকথা সে মালিনীকে বলতে গেল। রূপ ছাড়া মালিনীর কি আছে। একটু মায়া নেই, মমতা নেই, প্রাণ নেই, তবুও কেন সে মালিনীকে ওকথা বললো।

'রাত্রি গভীর হোল। মাথার দিকের খোলা জানলা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়লো তার বিছানায়। আলো ভালো লাগলো না তার। কিছুক্ষণ পরে উঠে দাঁড়ালো সে জানালার কপাট ভেজিয়ে দেবে বলে। ঠিক সেই সময় চমকে গেল দরজায় টক্ টক্ আওয়াজ শুনে। আরো একবার আওয়াজ হোল। এবার দরজার কাছে গিয়ে আস্তে জিগ্যেস করলো সে, কে?

উত্তর এলো, আমি।

দরোজায় আঘাত হতে যে চমক তার লেগেছিল তার চাইতে আরো অনেক বেশি চমক লাগলো তার 'আমি' কথাটায়। দরজা খুলতে খুলতে সবিস্ময়ে সে বললো, মালা তুমি?

হ্যাঁ, আমি। বলতে বলতে মালিনী ঘরে ঢুকে এলো, তুমি কাল মেদিনীপুর যাবে কেন?

পরের বাড়ীতে কেমন করে থাকবো?

এতোকাল কেমন করে ছিলে? আমি তোমার পর হোতে পারি, কিন্তু মা, তিনু, বিনু, মিনু? মা বললেন তুমি চলে গেলে তিনি মারা যাবেন, আর—

মালিনী চুপ করে গেল।

বলো কি বলছিলে?

পারবো না, আমি বলতে পারবো না। কি ভেবেছো তুমি? যা ইচ্ছে তাই করবে? কেন আজ দুপুরে গাছতলায় এসেছিলে, কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়েছিল—রাক্ষস কোথাকার!

চীৎকার করো না মালা—কে শুনতে পাবে কেলেঙ্কারী হবে।

হোক, শুনুক সকলে শুনুক। শোনো, আমি বলছি তোমার যাওয়া হবে না।

তা হয় না মালা, আজ আমি এ বাড়ীর কেউ নই। তুমিই পর করে দিয়েছো।

না, দিই নি। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে মালিনী সুবিনয়ের হাত ধরতে গেল।

পাশে একটু সরে গিয়ে সুবিনয় মালিনীর হাত ধরলো, টেনে নিয়ে এলো তাকে নিজের বিছানায়; মাথার বালিশ ঠিক করে শুইয়ে দিতে দিতে বললো, ঘুমোও মণি, পাগলামি করো না।

সুবিনয়ের বালিশ দুহাতে আঁকড়ে ধরে তাতে মুখ গুজে আরো জোরে কেঁদে উঠলো মালিনী। চাঁদের আলো তার দেহের ওপর সম্পূর্ণ ছড়িয়ে পড়লো।

বারান্দায় বেরিয়ে আসতে সুবিনয়ের চোখে পড়লো—শোভনা একটা থামে হেলান দিয়ে অবসন্নের মতো বসে আছেন।

মামিমা!—স্থবিনয় রুদ্ধনিশ্বাসে তাঁর কাছে ছুটে গেল।

বিষ্টু, তোমার মামাবাবুর ইচ্ছে ছিল মালাকে তোমার হাতেই দেবেন। শোভনার এই উক্তির কোনো উত্তর স্থবিনয় দিলো না।

এগল্প এখানেই শেষ। তবে স্থবিনয় আজও মালিনীকে বিয়ে করে নি। শোভনা মারা গেলেন। মেদিনীপুরে সুখদাচরণের বাড়ীতে মালিনী তিনটি ভাইকে নিয়ে আছে। বড়ো ভাইটি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হোয়ে কলেজে গেছে। আর ছুটি এখনও ছোট। আজ অবশ্য সংসার চলে স্থবিনয়ের টাকায়। সুখদাচরণের জঙ্গল বিক্রী করতে গিয়ে উপার্জ্জনের পথ দেখতে পেলো স্থবিনয়। যুদ্ধের বাজারে সে শিখলো ঠিকেদারী।

এই স্থবিনয়ের সঙ্গে দেখা হোয়েছিল আমার দার্জিলিং-এর এক হোটেলে। ভদ্রলোক মদ খেতেন অসম্ভব। কিন্তু আশ্চর্য্য মাতলামি করতেন না। একদিন মেয়েদের কথা উঠতে ভদ্রলোক বলে ফেললেন তাঁর কাহিনী।

আমি সে টেবিলে বসে মৌতাত করছিলুম দু'এক গ্লাস বিয়ার খেয়ে। ভদ্রলোককে জিগ্যেস করলুম, তা আপনি মালিনী দেবীকে বিয়ে করেন না কেন?

অট্টহাসি হেসে উঠলেন ভদ্রলোক। ঠোঁটে ছিল একটা হাভানা চুরুট। আঙুলে সেটাকে নামিয়ে নিয়ে বললেন, আরে মশায়, আমার যে খায় তাকে আমি বিয়ে করি কি করে?

বুঝতে পারলুম না।

বুঝতে পারলেন না? শেম! ভদ্রলোক আবার অট্টহাসি হেসে উঠলেন। সে হাসির দমক কিছুতে কমতে চায় না। অনেকক্ষণ পরে হাসি থামলে ভদ্রলোক আবার বললেন, ও! কি হাসিই আপনি হাসাতে পারেন। হোয়াট্ এ হিউমারিষ্ট ইউ আর! তারপরই ভদ্রলোক হাঁকলেন বয়, একটা পেগ—সোডা মাত লাও।

টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লুম। শাস্ত্রে বলে মাতাল দাঁতাল ইত্যাদিকে বিশ্বাস করতে নেই।

আমার কি মনে হয় জানো শোম স্থবিনয় মালিনীকে ভালোবাসে নি। যদি ভালোবাসতো, তবে নিশ্চয় বিয়ে করতো। না হোলেও, অন্তত: শোভনাকে সেদিন সে কথা দিতো।

আচ্ছা আপনিও ভদ্রলোকের টেবিলে বসে বিয়ার খাচ্ছিলেন না? আপনিও তো মাতাল। আর শাস্ত্রে বলে মাতাল দাঁতালকে—কি বলছিলেন যে আপনি?—সোমলতা উঠে দাঁড়ালো।

আমি আবার মাতাল কোথায়, কি বিপদ!

তার থেকে বড়ো বিপদ মালিনী স্থবিনয়ের সম্বন্ধ। ভেবে দেখুন।

আমি তো সেই কথাই বলছিলুম। তুমিই তো বিয়ার ফিয়ার এনে—

বাধা দিলো সোমলতা। দুই চোখে হাসি জাগিয়ে রেখে বললো, আমি ঠিকই বলেছি। আপনি মাতাল, তা না হোলে স্থবিনয় মালিনী সম্বন্ধ নির্ণয় করতে পারলেন না?

তুমি করেছো?

হ্যাঁ।

বলো।

ওরা পরস্পরকে ভালোবাসে।

তা হোলে বিয়েটা?

আপনি মশায় টেবিলে বসে বিয়ার খাচ্ছিলেন কেন? স্থবিনয়ের দুঃখ থাকতে পারে মালিনীর ব্যবহারে। কিন্তু, আপনার কি দুঃখ ছিল?

সোমলতার মুখের দিকে চুপ করে চেয়ে রইলুম—কি বলতে চায় সে?

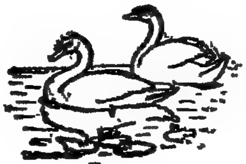

বাংলার প্রাচীন যাত্রা

বিদ্যুৎ মিত্র

বাংলা দেশের প্রাগাধুনিক দৃশ্যকাব্যের ইতিহাস রচনা করতে বসলে তার অধিকাংশ স্থান জুড়েই থাকবে যাত্রার আলোচনা। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে বহুশত বৎসর ধরে এই একান্ত দেশীয় এবং লৌকিক অনুষ্ঠান তার নিজস্ব সংকীর্ণ ও অপূর্ণ আয়োজনে জনসাধারণের নাট্যরসকামনার তৃপ্তিবিধান করত, শিক্ষা ও আনন্দের যুগল উপাচারে জনমানসকে সঞ্জীবিত করে তুলত। কিন্তু কবে কিভাবে এই যাত্রানুষ্ঠান বাংলার সমাজজীবনে এতবড় একটা স্থান অধিকার করে বসল, কোথায় কিসের প্রভাবে তার উৎপত্তি হল সম্ভাবিত তা এখনও যথাযথ উপকরণের অভাবে অজ্ঞাতই রয়ে গেছে। তাই যাত্রার উৎপত্তির কথা পণ্ডিতদের গবেষণা ও মতবাদের বিভিন্নতায় কণ্টকিত। দেশ-বিদেশের মনীষীদের সেই গভীর-গম্ভীর আলোচনার মধ্য দিয়ে কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছোন একরূপ অসম্ভব।

যাত্রার উৎসের সন্ধানে কোন কোন পণ্ডিত হিন্দু-ইতিহাসের প্রথমতম প্রভাতের দিকে অভিযান করেছেন, কেউ কেউ আবার প্রাক্-ইতিহাসের অন্ধকারাচ্ছন্নতার মধ্য থেকে লোকজীবনের কর্ম ও নর্মের মধ্যে এর সন্ধান পেয়েছেন, কেউ কেউ আবার যাত্রাকে ভারতীয় (সংস্কৃত) নাটকের ক্রমবিকাশের একটি বিশেষ স্তর বলে উল্লেখ করেছেন।

প্রতীচ্যের বিখ্যাত নাট্যতত্ত্ববিদ ডাঃ হার তেল যাত্রাকে "a distinct stage in the evolution of the Indian drama" বলেছেন। সংস্কৃত 'বীথি' নাটকের এবং 'মহানাটক' নামে পরিচিত দৃশ্যকাব্যের সংগে যাত্রার অন্তরংগতা লক্ষ্য করেছেন কোন কোন পণ্ডিত। মহামুনি ভরতের নাট্যসূত্রে যে জনপ্রিয় উপ-নাটকাদির কথা আছে তাই থেকেই যাত্রার জন্ম হয়েছে বলে একটা সাধারণ স্বীকৃতি অনেক পণ্ডিত মহলে চলে আসছে। এই সব মতবাদের যুক্তিযুক্ততা ও যাথার্থ্য আলোচনা করা প্রয়োজন।

এই আলোচনা সুরু করবার আগেই আমাদের একটা কথা মনে রাখা দরকার যে সংস্কৃত নাটক তথা সম্পূর্ণ সংস্কৃত সাহিত্যই অভিজাত আর্যসংস্কৃতির ফসল। ১॥ রাজপ্রাসাদের সন্নিকটে রাজার নাট্যশালায়ই থাকত তার অভিনয়ের ব্যবস্থা, রাজার সভাকবিরা সংস্কৃত নাট্যসূত্রের বিধিনিষেধের প্রতি সচেতন ও সজাগ দৃষ্টি রেখেই রচনা করতেন তাঁদের নাট্যাবলী; নাট্যশালায় জনসাধারণের প্রবেশদ্বার নির্বাধ ছিল, মনে করবারও কোন কারণ নেই। অপরপক্ষে যাত্রাগানের স্বরূপ-লক্ষণ যাই হোক না কেন এ যে অনভিজাত লোকসংস্কৃতির সৃষ্টি, জনজীবন ও জনমানসের সংগে এর যোগ যে ছিল একান্ত নিবিড় তাতে সন্দেহ করবার অবকাশ নেই।

আবার নাট্যসূত্রোক্ত 'বীথি' বা অন্যান্য উপ-নাটকগুলোর সংগে গুণধর্মের তুলনামূলক আলোচনায়ও এই কথাই প্রতীয়মান হবে যে এদের মধ্যে সাদৃশ্য যতটুকু আছে, তাতে করে যাত্রাকে সংস্কৃত নাট্যগোষ্ঠীর মধ্যে ফেলবার কোনই যুক্তিযুক্ত কারণ নেই।

যাত্রাগানের সাধারণ চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে সাধারণত মাত্র তিনজন পাত্রপাত্রীতেই এর সম্পূর্ণতা আর তারচাইতেও বড় কথা এই যে যাত্রাগান গানেরই মালা, কথার সূত্র তাকে গেঁথে রাখে শুধু। কিন্তু 'বীথি'—এ শ্রেণীর দৃশ্যকাব্য হয়তো ছিল অনেকটা ভাণের মত। (ভাণে—একটিমাত্র লোক থাকবে, ধূর্ত বা বিট। সে একাই দাঁড়িয়ে অঙ্গভঙ্গীসহকারে নিজের অনুভূত ব্যাপার বা অন্যব্যক্তি সম্পর্কিত ঘটনার বর্ণনা করবে এবং মাঝে মাঝে তার নিজের সামনে বা দূরে অন্য বক্তার অস্তিত্ব কল্পনা করে তার সংগে কথা কইবে।) এতে একটিমাত্র অঙ্ক থাকবে; তবে এর পাত্রপাত্রীর সংখ্যা দুই তিনও হতে পারে এবং সব রকম রসেরই এতে সন্নিবেশ করা চলে।" ২

বীথির সংগে যাত্রাগানের আত্যন্তিক যোগাযোগ-ব্যাপারটা যে অনেকাংশেই কাল্পনিক তা নিশ্চয়ই আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

প্রাচীন ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র ও বৈদিক গ্রন্থাদি নিয়ে যে সব পাশ্চাত্য পণ্ডিত গবেষণা করেছেন, তাঁদের অনেকেই যাত্রার উৎপত্তি খুঁজতে গিয়ে ঋগ্বেদ এমন কি তারও পূর্ব পর্যন্ত পৌঁছেছেন। অধ্যাপক হারউইৎস্‌জ্‌ তাঁর "দি ইণ্ডিয়ান থিয়েটার গ্রন্থে বলেছেন, "Even the Vedic age knew yatras, a venerable heirloom of Aryan antiquity. The Gods of the Rg. Veda were hymned in choral processions. Some of the Sam-Veda hymns re-echo the rude mirth of the primitive yatra-dances."

হারউইৎস্‌জ্‌-এর এই Primitive yatra-dances কথাটির একটি বিশেষ মূল্য আছে। তা আমরা পরে দেখব।

ম্যাক্সমুলার, সিলভান লেভী প্রমুখ ভারত-বিশেষজ্ঞদের দল বিট্‌য়াল-তত্ত্বের (Ritual theory) প্রতিষ্ঠা করেছেন যাত্রার জন্মসূত্রের অনুসন্ধানে। তাঁদের মতে কৃষ্ণ-বিষ্ণু অথবা রুদ্র-শিব উপাসকমণ্ডলীর ধর্মোৎসবের মধ্যেই যাত্রার উৎপত্তির বীজ লুকিয়ে আছে। এই বিষয়টি নিয়ে যাত্রার ইতিহাসকারেরা দীর্ঘ এবং জটিল

---

১ ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত রচিত The Indian Stage. Vol. I. দ্রষ্টব্য। "Indian drama is the fruit of high Aryan culture, and perfection was reached both in its composition as well as in its exhibition upon the stage."

২ মনমোহন ঘোষ প্রণীত "প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা"

তর্কজালের সৃষ্টি করেছেন। প্রধানতঃ তিনটি পরস্পরবিরোধী তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে ঃ

(১) কৃষ্ণ-বিষ্ণু উপাসকমণ্ডলীর ধর্মোৎসবের মধ্যে যাত্রার উৎপত্তি ;

(২) রুদ্র-শিবের উপাসনার মধ্যে যাত্রার উৎপত্তি

(৩) শক্তি-উপাসনায় যাত্রার উৎপত্তি।

সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাসকার ডাঃ কেইথ যদিও রিচুয়াল-তত্ত্বের সমর্থক নন কিন্তু তিনিও পৌরাণিক যুগে কৃষ্ণ-বিষ্ণু সম্প্রদায়ের চেষ্টায়ই যাত্রার সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করেন। এই মতবাদের সমর্থকদের সংখ্যা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু প্রবীণ অধ্যাপক ও শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের দ্বারা বর্ধিত হয়েছে। অধ্যাপক হোরেস তো কেবলমাত্র যাত্রার উৎপত্তিই নয়, যাত্রার স্বরূপ-ধর্মের মধ্যেও এই সম্প্রদায়ের অনন্য আধিপত্যের সন্ধান পেয়েছেন ; তাঁর মতে, "The yatra is generally the exhibition of some of the incidents in the youthful life of Krishna, maintained also in extempore dialogue but interspersed with popular songs." এইদিক দিয়ে বাংলা যাত্রার সঙ্গে পশ্চিমভারতের রাসোৎসবের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন হোরেস। লাসেন জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'কে প্রাচীন যাত্রার নিদর্শন বলে গ্রহণ করেছেন আর ক্রেইন 'গীতগোবিন্দ'কে divine idea or a mystery play of the Hindus' বলে উল্লেখ করেছেন। কোন কোন সমালোচক অবশ্য 'গীতগোবিন্দ'কে সংস্কৃত কাব্য বলে, বাংলা যাত্রার সংগে যুক্ত করে দেখতে আদৌ রাজী নন। ৩॥ কিন্তু এ ধরনের বিচার একান্তই যান্ত্রিক তাই পরিত্যাজ্য। বাংলা ভাষায় রচিত না হলেও (বাংলা ভাষা-সৃষ্টির সেই প্রথমতম যুগে) বাঙালীর মনন অনুভূতি ও চিন্তাই 'গীতগোবিন্দে'র প্রাণ ; বাংলার লৌকিক-সাহিত্যের সংগেও এর যোগসূত্র সহজে অস্বীকার করা যায় না।

ডাঃ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় তাঁর গবেষণা গ্রন্থে ৪ কৃষ্ণকমলের কয়েকখানা যাত্রাকে অবলম্বন করে কৃষ্ণ-বিষ্ণু কাল্টের এই মতবাদটি প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য একথা সত্য যে কৃষ্ণকমলের ঊনবিংশ শতাব্দীতে লিখিত কৃষ্ণযাত্রার পুঁথি দিয়ে যাত্রার উৎপত্তি সম্বন্ধীয় কোন তত্ত্ব আবিষ্কারই আদৌ সম্ভব নয় ; কিন্তু এই মতবাদ অবলম্বনকারীদের পেছনে এমন কয়েকটি দৃঢ়ভিত্তি যুক্তি আছে যার আলোচনা প্রয়োজন।

প্রাচীন বাংলার অর্থাৎ মুসলমান আক্রমণের পূর্ববর্তীকালের যত মূর্তি এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে শতকরা প্রায় ৮০টি বিষ্ণুমূর্তি। ফলে এ ধারণা করা খুবই স্বাভাবিক যে সে-যুগে বাংলার প্রধানতম ধর্ম হিসেবে বৈষ্ণবধর্মই প্রচলিত ছিল।

বাংলার প্রাচীনতম দুখানা কাব্যগ্রন্থ এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোকপাত করতে পারে। কাব্য দুখানি 'গীতগোবিন্দ' ও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। সম্ভবত বাংলা-যাত্রার যে প্রাচীনতম রূপ আমাদের হাতে এসে পৌঁছেচে তা এই 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।' যাত্রার সাধারণ চরিত্রের অন্তত প্রধান তিনটি লক্ষণ 'গীতগোবিন্দ' ও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' সুস্পষ্ট।

(১) কাব্য দুখানিই কথোপকথনে রচিত,—বর্ণনাত্মক নয়, তাই দৃশ্যকাব্যের সমধর্মী।

(২) এই কথোপকথনের বাহন সংগীত।

(৩) উভয় কাব্যেই মাত্র তিনটি চরিত্র, রাধা, কৃষ্ণ ও দূতী (বা বড়ায়ী)।

প্রধানত এই দুটো কারণের জন্য বাংলা যাত্রার উৎপত্তির পেছনে কৃষ্ণবিষ্ণু কাল্টের প্রভাব অনুভব করা স্বাভাবিক নয়। কিন্তু এই তত্ত্ব সর্ববাদীসম্মত স্বীকৃতি পায় নি। ম্যাক্সমুলার নিজভান লেভী রিচুয়াল তত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসংগে কৃষ্ণ-বিষ্ণু কাল্ট ও রুদ্র-শিব কাল্ট-এর কথা একসংগেই বলেছেন, সমান গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার তাঁর The folk element in Hindu Culture নামক গ্রন্থে এবং অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু তাঁর "বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ" গ্রন্থে রুদ্র-শিব-কাল্টের তত্ত্বটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছেন।

অধ্যাপক বসুর মতে প্রত্যেক দেশেই উৎসবের দেবতা ছিলেন রুদ্র। ঋতু উৎসবের সঙ্গে তালে তালে মিলিয়ে, সূর্যের উত্তরায়ণে, দক্ষিণায়নে রুদ্রপূজার উৎসব হত। সূর্যদেবতা কোন্ প্রাচীন যুগে রুদ্রের সংগে অভিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। সূর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন রুদ্রের মৃত্যু ও পুনর্জন্মের রূপকে আভাসিত হত। তাঁর মতে সব দেশেরই প্রথম নাট্যসৃষ্টি এই রুদ্র পূজার ঋতু উৎসবে। গ্রীসের ডাইওনীসাস তো এই রুদ্র-দেবতা। অতঃপর তিনি বাংলা দেশের শিবের 'গাজন' প্রভৃতির মধ্যে যাত্রার অনুষ্ঠানের মূলবীজ খুঁজে পেয়েছেন। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার জোর দিয়েছেন গম্ভীরা গান ও অনুষ্ঠানের উপরে সুস্পষ্টত বাংলার এই সুপ্রাচীন উৎসবটি শিবপূজার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। তিনি তাঁর গ্রন্থে গম্ভীরা উৎসবের উৎপত্তি ও বিকাশের ধারার অনুসরণ করেছেন বেদ রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্য বৌদ্ধসাহিত্য এবং হুয়েন-সাঙের ভ্রমণবিবরণীর মধ্য দিয়ে এবং এর সঙ্গে বাংলা যাত্রার সম্বন্ধ ঘোষণা করেছেন। ৫॥

মুসলমান-পূর্ব যুগে বৈষ্ণব মত বিস্তারেরও পূর্বে শৈবমতই বাংলায় অধিকতর প্রচারিত হয় বলে এঁরা মনে করেন। বৌদ্ধধর্মকে পরাভূত করে বাংলায় হিন্দুধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠায় শৈবধর্মের দান

৩ ডাঃ প্রভুকুমার গুহঠাকুরতা প্রণীত 'Bengali Drama: its origin and development.'

৪ ডাঃ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'Yatra—the popular drama of Bengal.'

৫ অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার প্রণীত 'The folk element in Hindu Culture' দ্রষ্টব্য। "To a certain extent the literature of the Gambhira cycle may be composed with the mystery and miracle plays in old English and 'no-plays' in Japan."

বলা বাহুল্য এই mystery ও miracle play অনেকটা যাত্রার সমধর্মী।

অনস্বীকার্য বলে এ'রা দাবী করেন, ৬ বলা বাহুল্য এই দাবীই তাঁদের বর্তমান মতবাদের পটভূমি ও ভিত্তিভূমিও বটে।

"বৈষ্ণব অথবা শৈব নয় শাক্ত উপাসনার মধ্যেই যাত্রার উৎপত্তি বীজ লুকিয়ে আছে,"—এই মতবাদের সমর্থন আছে প্রাচীন সোম-প্রকাশ বংগদর্শনের পাতায়। ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এই মতের সমর্থন করে লিখেছেন, "বাংলায় প্রচলিত প্রাচীন যাত্রাগুলি শক্তি-পুজাকে অবলম্বন করেই রচিত হত, এবং তাদের আলোচ্য ছিল প্রধানত শুম্ভ-নিশুম্ভ ও অন্যান্য অসুরদের সংহার কাহিনী।" ৭॥

তত্ত্ব ও তথ্যের এত বিতর্কমূলক ঘনসন্নিবেশের মধ্য দিয়ে কোন সত্যে পৌঁছোন অসম্ভব। আর ভারতীয় সাধনার বিশেষ ধারায় বিশেষ করে বাংলাদেশের আদিধর্মের ৮ বিশেষ গুণধর্মের পরি-প্রেক্ষিতে কোনও একটি বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদায়ের উপাসনাপদ্ধতির মধ্যে যাত্রার উৎপত্তির সন্ধান করা আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়।

যে-কোন দেশের অথবা জাতির মধ্যে প্রচলিত দৃশ্যকাব্যের উৎস খুঁজতে হলে আদিম কৌমসমাজের বিশিষ্ট উপাসনা প্রণালী ও ধর্ম-পদ্ধতির মধ্যে চলে যেতে হবে। কৌম-সমাজের এই বিশেষ পুজা-প্রণালী টোটেমবাদ (Totemism) নামে পরিচিত। বিখ্যাত ইংরেজ পণ্ডিত টমসন টোটেম সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলছেন,

"The characteristic religion of tribal society in its more primitive phases is totemism. Each clan of which the tribe is composed is associated with some natural object, which is called its 'totem'. The clans-men regard themselves as akin to their totem-species and as descended from it. They are forbidden to eat it, and performed a traditional ceremoy designed to increase its numbers. Members of the same clan may not inter-marry." ৯॥

এই টোটেমবাদের সঙ্গে সম্বন্ধ-বদ্ধ 'Primitive dances' ১০ এর মধ্যেই প্রথম দৃশ্যকাব্যের বীজ লুকিয়ে আছে। জর্জ টমসনের ভাষায়,

"The ceremonies for the increase of the totem species are performed at the begining of the breeding season at a prescribed spot called the 'totem-centre' on the hunting ground of the clan to which the totem belongs."

আদিম কৌম মানুষের খাদ্য সংগ্রহের সঙ্গে কোন না কোনভাবে জড়িত হয়েই গড়ে উঠেছিল টোটেমবাদ ও টোটেমপুজার অনুষ্ঠানাদি। স্বভাবতই এই অনুষ্ঠান প্রচুর নৃত্য-গীত ও অনুকৃতির মধ্যেই রূপ-লাভ করত। ১১ ক্রমে ক্রমে টোটেমটির জীবনযাত্রার অনুকৃতির স্থানে কৌম-সমাজের আদিপুরুষের জীবনকাহিনীর নাটকীয় উপ-স্থাপন স্থানলাভ করতে থাকে

"Meanwhile the ceremonies themselves were adapted and developed. From being representations of the activities of the totem-species as such, they became commemorations of events of life of the clan ancestors.."

আদিম কৌমসমাজের এই উদ্দাম নৃত্য নাটকীয় অনুকরণ এবং সজোর চিৎকারের মধ্যেই কবিতা গান নৃত্যাদির তথা দৃশ্যকাব্যের আদি-সূত্র খুঁজতে হবে।

আমাদের বাংলাদেশের আদিধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে ধ্বজাপুজা একটি প্রধানতম উৎসব ছিল। সেই ধ্বজার পুজাই (ইন্দ্রধ্বজ, ময়ূরধ্বজ, মীনধ্বজ) বিশেষ গোষ্ঠীর কৌমগত-পুজা এবং তাই তাদের পরিচয়, এবং সেই কৌমগোষ্ঠীর যিনি নায়ক বিশেষ বিশেষ লাঞ্ছন অনুযায়ী তাহার নাম তাম্রধ্বজ, ময়ূরধ্বজ বা হংসধ্বজ। এই ধরণের পশু বা পক্ষীলাঞ্ছিত পুজা আদিম পশুপক্ষী পুজা (totemism) থেকেই উদ্ভূত। ১২ এই ধ্বজাপুজার মধ্যে প্রধানতম আয়োজন ছিল ধ্বজা বহন করে শোভাযাত্রা। আমাদের প্রাচীন যাত্রার সঙ্গে সম্ভবত এর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান এবং এই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা গবেষণা-সাপেক্ষ। এ ছাড়াও আমাদের খুঁজে দেখা দরকার অনার্য কৌম-সমাজের রথযাত্রা, স্নানযাত্রা, দোলযাত্রা (পরে এদের আর্যীকরণ হয়) প্রভৃতি নৃত্যগীতসহ সামাজিক অনুষ্ঠানের মধ্যেই বা কী পরিমাণে যাত্রাভিনয়ের বীজ লুকিয়ে ছিল। এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ উচ্চকোটির লোকেরা বোধ হয় এই ধরণের সমাজোৎসব ও যাত্রা পছন্দ করতেন না। চৈত্রমাসের নীল বা চড়কপুজার অনুকৃতিমূলক অনুষ্ঠানের মধ্যেও যাত্রার বীজ ছিল বলেই সম্ভব। অবশ্য একথা নিশ্চয়ই মনে রাখতে হবে যে শিব-দেবতার আর্যত্ব-স্বীকৃত পুজা-র্চনার সঙ্গে এর সম্বন্ধ ছিল সুদূর পরাহত।

পরবর্তী কালে আর্যীকরণ ও ব্রাহ্মণ্য প্রভাবান্বিত ধর্মকর্মা-নুষ্ঠানকে আশ্রয় করে যাত্রাগান বিস্তার লাভ করে ও রূপগত এবং আবেদনগত পরিণতি লাভ করতে থাকে। কোন বিশিষ্ট ধর্ম-সম্প্রদায়কে আশ্রয় করে এর জন্ম, বাংলার মানসগঠন ও ধর্মদীক্ষার সাধারণ পরিপ্রেক্ষিত মনে রাখলে একথাও বলা চলে না। সমন্বয়-বাদের যে-আদর্শ বাঙালী হিন্দু বার বার দেখিয়েছে তাতে করে

৬ ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন: বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

৭ ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রণীত The Indian Stage, Vol. I. দ্রষ্টব্য। "The ancient yatras that were prevalent in Bengal were about the cult of Sakti worship and dealt mainly with the death of Sumbha Nisumbha or of other Asuras."

৮ আদিধর্ম (বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব)—ডাঃ নীহার-রঞ্জন রায়।

৯ "Aeschylus and Atheus"—Social basis of the origin of drama, by George Thompson.

১০ ডাঃ হারউইৎস্ জ্ প্রণীত The Indian Theatre'.

১১ G. Thompson, 'Aeschylus and Atheus' দ্রষ্টব্য। "The increase ceremonies are designed to represent *dramatically* the growth or gathering of the totem, if it is a plant or if it is an animal, its distinctive hairts, gestures and cries."

১২ নীহাররঞ্জন রায়: 'বাঙালীর ইতিহাস'।

নিঃসংশয়ে স্বীকার করতে হয় যে হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে উচ্চশ্রেণীর পণ্ডিতদের কূটবিতর্ক সহজে প্রবেশ করতে পারে নি, পারে নি তাদের মানসিক ভারসাম্য রক্ষা করতে। শৈবসাধকও বিষ্ণুর পূজা করেছে, শক্তিমন্ত্রের উপাসনায়ও সে দ্বিধা করেনি কোনদিন। কাজেই যাত্রা কেবল কৃষ্ণ-বিষ্ণু বা রুদ্র-শিব কাল্টই নয়, পৌরাণিক নানা দেবতাকে আশ্রয় করেই বিকশিত হয়ে চলেছে।

(দুই)

যে দিক থেকেই যাত্রার উৎপত্তিকে স্বীকার করি আমরা, এ কথা বিতর্কের অবকাশ রাখে না যে যাত্রা একটি লৌকিক-অনুষ্ঠান; জনজীবনের মধ্য থেকেই প্রত্যক্ষভাবে উঠে এসেছে তা, আবেদনও তার বৃহত্তর জনসাধারণের কাছে। কাজেই এমন একটি জীবন্ত সংস্কৃতি-অনুষ্ঠানের রূপরেখাকে সুস্পষ্টভাবে বেঁধে দেওয়া যাবে না; জীবন্ত প্রাণীর মতই তার পরিবর্তন,—কখনও বা গ্রহণ, কখনও বা পরিবর্জন। যাত্রার সাধারণ গুণধর্ম বিশ্লেষণ করবার আগে তাই এ কথাটি মনে রাখতে হবে অবশ্যই যে এ চারিত্র-রূপকে একেবারে যথাযথ যান্ত্রিকভাবে ধরলে ভুল হবে, এখানে কেবল তার মূল-সূত্রেরই পরিচয় নেবার চেষ্টা করব।

যাত্রাগানের কাহিনীটি সাধারণত মানবিক জীবন থেকে গ্রহণ করা হ'ত না। আমাদের দেশে সামন্তযুগের মানুষের মনে ইহলৌকিক জীবন-চর্যার আত্যন্তিক মূল্য স্বীকৃত হয় নি কোনদিনই, পারলৌকিকভাব অজানা মহিমা অস্পষ্টতার হাতছানি দিত তাদের। প্রাচীন প্রায় সব কাব্যগাথার ন্যায় যাত্রারও লক্ষ্য তাই ভক্তিরসোদ্রেক। কিন্তু এই যে ভক্তিরসোদ্বোধনে যাত্রানুষ্ঠান চৈতন্য-পূর্ববর্তী যুগে, যাত্রার স্বরূপধর্ম এইরূপ ছিল বলে মনে হয় না। কৃষ্ণ-রাধা মর্ত্যেরই হোন বা ব্রজেরই হোন তাঁদের মান-অভিমান মিলন-বিরহ তো লৌকিক জীবনের প্রণয়-ঘটনারই রূপায়ণ। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' এর অনধ্যাত্ম-পার্থিব রূপটি অক্ষত আছে। আবার শিব-যাত্রার শিবের কৈলাস-ভবনের দুঃখ-দারিদ্র্য বাংলার গ্রাম-গৃহস্থেরই নিত্যকার অনুভূতি।১ চৈতন্যদেব প্রবর্তিত ভক্তিতত্ত্বের সর্বব্যাপকতায় যাত্রার লোকজীবন রূপায়ণও অমর্তলোকের দিকেই আভাসিত হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে 'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রার যুগে দেবলীলার পাশাপাশি মানবপ্রেমও স্থান পেতে আরম্ভ করে যাত্রায়; তার কালাভক্তির নামাবলীর স্বচ্ছতা আর গোপন করতে পারে না তাকে।

যাত্রাগানের সব চাইতে বড় বৈশিষ্ট্য তার সংগীত-বাহুল্য। এই গীত-বাহুল্য নাটকীয়তাকে আবৃত করে ফেলেছিল। যাত্রার মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশই গীতায়োজন। এই দিকের কারণ খুঁজলে বাঙলার জাতীয় সংস্কৃতির বিশেষ ধারার সন্ধান অবশ্যই নিতে হবে।

প্রাচীনতম কালে যখন অভিজাত বাঙালী সংস্কৃত-ভাষায় আর ছন্দে তাদের অনুভূতিকে রূপ দিচ্ছিলেন, তখনই একটি নির্দিষ্ট ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুণধর্ম নিয়ে পশ্চিমভারতের কবিদের থেকে আপনাদের স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করেছিলেন তাঁরা। কালিদাসের চিত্রধর্মের সঙ্গে জয়দেবের গীতিধর্মের তুলনা করলেই এই পার্থক্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাবে। বাংলার জলবায়ুতে আর পলিমাটিতে সংগীতপ্রবণতা ও উচ্ছ্বাসবাহুল্যের যে ধারা সৃষ্টি করেছিল জাতির মনে, বৈষ্ণব ধর্মের ও সাহিত্যের রসের বন্যা ও কীর্তনের প্রবাহ তার এই প্রবণতাকে আরও গভীর, আরও অনিবার্য করে তুলল। তাই বাঙালীর নিজস্ব দৃশ্যকাব্য যাত্রায়ও যে সংগীতই হবে প্রধানতম আশ্রয় তাতে আর সন্দেহ কি? গদ্য-সংলাপও যেটুকু বা ছিল তাও গীতিমালের সূত্র হিসেবেই ব্যবহৃত হত; স্বতন্ত্র মর্যাদায় ধন্য হবার সুযোগ তার ঘটে নি। প্রথম প্রথম যাত্রা-লেখকেরা গীতাংশকেই কেবল রচনা করতেন, গদ্যাংশ অভিনেতাদের মুখে মুখেই রচিত হত আসরের উপর দাঁড়িয়ে,—তাঁর পক্ষে উপস্থিত বুদ্ধির ব্যবহারই ছিল যথেষ্ট। যাত্রায় সংলাপ চলত গানে,—কৃষ্ণ গাইতেন, রাধা গাইতেন, গাইতেন বড়ায়ী বুড়ী। রামযাত্রার রাবণকেও গাইতে দেখলে আশ্চর্য হতেন না কেউ, বরঞ্চ তলোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে এবং হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে সে গান সুরু করলেই দর্শকসাধারণের স্বাভাবিক প্রত্যাশা চরিতার্থ হত। এই গীত-রচনারই যাত্রাকারের সার্থকতা, এর শ্রেষ্ঠত্বেই রচয়িতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হত।২

কিন্তু যাত্রাগানের কাহিনী well constructed— না —হলেও নাটকীয়ত্বের দাবী তার ছিল। সূত্রহীন ও উদ্দেশ্যহীনভাবে বিচ্ছিন্ন ঘটনার টুকরোকে জোড়া দিয়ে যাত্রাগানের কাহিনীটিকে দাঁড় করানো হ'ত না।

যাত্রাগানের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য তার জুড়িদল এবং বিবেক। জুড়িগানের দলটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মঞ্চেই উপস্থিত থাকত এবং গ্রীক কোরাসের মত মাঝে মাঝে সমবেত-সংগীতে ঘটনার ও পাত্র-পাত্রীর মানসঅবস্থার বর্ণনা করত। বিবেকের উপস্থিতি ঘটত আকস্মিকভাবে, অবশ্য তার কাজও ছিল পাত্রপাত্রীর মনের একান্ত গোপন অথবা গভীর অনুভূতিকে গানে ব্যঞ্জিত করা। এরা কেউই যাত্রার কাহিনীর সঙ্গে কোন সম্বন্ধেই অবদ্ধ থাকত না।

যাত্রার প্রথমযুগে এর পাত্রপাত্রীর সংখ্যা ছিল মাত্র তিনটি, পরবর্তী কালেও অধিকাংশ যাত্রায়ই এই নিয়ম অনুসৃত হয়েছে; কোথাও কোথাও ব্যতিক্রম ঘটলেও অপর চরিত্রগুলি প্রায়ই একান্তভাবে মূল্যহীন এবং অপ্রধান। এই তিনটি চরিত্র হচ্ছে, নায়ক, নায়িকা ও দূতী। কৃষ্ণযাত্রায় যেমন আমরা কৃষ্ণ রাধা ও বড়ায়ি বা চন্দ্রাবলীর সংগে পরিচিত হই, বিদ্যাসুন্দর যাত্রারও বিদ্যা, সুন্দর ও হীরা মালিনীই অভিনয়ের অধিকাংশ স্থান জুড়ে থাকে, যা কিছু রসাবেদন তাও তাদেরই কেন্দ্র করে উৎসারিত হয়। এর মধ্যে অভিনয়-কৌশলের দিক দিয়ে আবার দূতীরই প্রাধান্য। অধিকাংশ যাত্রা-অধিকারীরাই এ দূতীর ভূমিকায় অভিনয় করে প্রশংসা ও সম্মানের মালা কুড়িয়ে নেন।

১ ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত রচিত The Indian Stage. Vol. I.

২ "The Krishna-yatra-walas found that their audiences cared more for the emotional ecstasies than for well-constructed plot, dialogue or dramatic emotion. The main emphasis was on the music."—Bengali Drama: its origin and development, Dr. P. Guha Thakurta.

যাত্রায় হাস্যরস-সৃষ্টির জন্য প্রধানত নিম্নশ্রেণীর জীবনের অসংগতিকেই আশ্রয় করা হত। কাহিনীর সঙ্গে হাস্যরসাত্মক ঘটনাগুলোর কোন যোগসূত্রের প্রয়োজনীয়তাই অনুভূত হত না। মাঝে মাঝে একাধিকবার নারদমুনি মেথর-মেথরানী কালুয়া-ভুলুয়া অথবা মধু-মংগলের মত চরিত্রগুলির উপস্থাপনের মধ্যদিয়ে হাস্যরস সৃজনের চেষ্টা করতেন যাত্রাকার। বলা বাহুল্য অনেক স্থলেই এ হাস্যরস নিম্নশ্রেণীর ভাঁড়ামী ও স্থূলরুচির সীমা অতিক্রম করতে সক্ষম হত না।

যাত্রাগান কোন স্থায়ী রঙ্গমঞ্চের আয়োজনে অভিনীত হত না। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে ঘুরে তাদের অনুষ্ঠান উপস্থিত করতে হত জনসাধারণের আসরে। তাই কোন দৃশ্যপটের প্রশ্নই প্রায় থাকত না যাত্রাগানে। পরিবেশ ও স্থানমাহাত্ম্য নির্ভর করত দর্শকদের কল্পনাশক্তি ও মানসসৃষ্টির উপরেই।

(তিন)

অতিসামান্যমাত্র নমুনাকে অবলম্বন করে যাত্রাগানের আদি-মধ্য-অন্ত্য যুগের কোন ইতিহাস রচনা সম্ভবপর নয় আদৌ; অতিসাবধানে দ্বিধাসংকোচের সঙ্গে তার ধারাবাহিকতায় একটি অসম্পূর্ণ রূপরেখা-অঙ্কনের চেষ্টা চলতে পারে মাত্র।

যতদূর মনে হয়, বাংলায়ও অন্যান্য প্রদেশের মত সংস্কৃতে নাট্যরচনা এবং অভিনয় চলত। অবশ্য খৃষ্টীয় প্রথম সহস্রাব্দের দিকে নতুন আর্যভাষাগুলির যখন জন্ম হচ্ছিল তখন জনসাধারণের সঙ্গে সংস্কৃতের পার্থক্য বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর হতে হতে বোধগম্যতার সব সম্ভাবনাকেই বিলুপ্ত করে দিয়েছিল। বিশেষ করে উচ্চ এবং অভিজাত শ্রেণীর গৃহপ্রাঙ্গণের সংস্কৃত নাট্যানুষ্ঠানে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার যে অবারিত ছিল না, তা সহজেই অনুমেয়। তাই জনসাধারণের রসের তৃষ্ণা মেটাবার জন্য যাত্রাগানের অনুষ্ঠান চলতে লাগল। মঞ্চের উচ্চতার সাক্ষাৎ মিলল না, কিন্তু আসরের ধূলি-মাটিতে জনজীবন ও জনমনের সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা স্থাপিত হল যাত্রার।

মুসলমান-বিজয়ের পরে যাত্রানুষ্ঠানের ইতিহাসে এক গুণগত পরিবর্তন সম্ভাবিত হ'ল। প্রথমত, নৃত্যগীত নাট্যানুষ্ঠানের বিরুদ্ধে সাধারণভাবে ধর্মের ফতোয়া জারী ছিল ইসলামের নির্দেশে,১ ফলে অভিজাত শ্রেণীর গৃহমঞ্চে অভিনীত সংস্কৃত নাট্যানুষ্ঠান বিজয়ী রাজশক্তির সমর্থন তো পায়ই নি, বিরুদ্ধাচরণই লাভ করেছে। সংস্কৃত নাট্যাভিনয় ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল তাই, নাটক-রচনাও। দ্বিতীয় কারণটি আরও গভীর এবং জাতীয় সংস্কৃতির এক ক্রান্তিকালীন অবস্থার পরিচয়। মুসলমান আক্রমণের ফলে বিদেশী ও বিধর্মী সংস্কৃতির হাত থেকে জাতির সমাজ-ব্যবস্থা ও সংস্কৃতিকে বাঁচাবার প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন অভিজাত শ্রেণী। লোকসংস্কৃতিকে ও লোকসাহিত্যকে যাঁরা এতদিন অবহেলা ও অবজ্ঞা করে আসছিলেন, আত্মরক্ষার প্রয়োজনে একই সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ ফ্রন্টে তাঁদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতে হল উচ্চশ্রেণীকে। বাংলার আর্য ও অনার্য-সংস্কৃতি অনেকটা সেতুবন্ধ হল মুসলিম বিজয়ের পরোক্ষ ফলে। এই যুগের সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় এই সেতুবন্ধের পরিচিতি। বৈদিক রুদ্র ও পৌরাণিক মহাদেব এসে বাংলার মাঠে মাঠে লাঙ্গল চষতে আরম্ভ করলেন, এমন কি তাঁর কাচ-পাড়ায় গতায়তেও ব্রাহ্মণ-সমাজ আপত্তি করল না।২ দেবী চণ্ডী তাঁর মহিমময়ী মূর্তি পরিত্যাগ করে ব্যাধের কুটিরে এসে দাঁড়ালেন।৩ সর্পদেবী মনসা শ্রেষ্ঠী-শ্রেষ্ঠ চাঁদসদাগরের পূজা লাভ করল, কৌম সমাজের প্রজননশক্তির প্রতীক এই দেবতাটির জন্যও আবিষ্কৃত হয়েছে সংস্কৃত স্তোত্র।৪ সাধারণ বাঙালী রাজদরবারের চৌকাঠটি অনায়াসে অতিক্রম করে কৃত্তিবাসকে গ্রহণ করেছেন। লোকজীবনের সঙ্গে অভিজাত সাহিত্য সম্মিলিত হয়েছে। এই সম্মিলনের অন্যতর চিহ্ন রয়েছে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'। একদিকে জয়দেব অপরদিকে গ্রাম্য-বাঙালীর হাত ধরাধরি করে কাব্যের গতিপথে বিচরণ করেছে; গ্রাম্য স্থূলতা রাজসভার সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাকে গ্রহণ করেছে।

ঠিক একই ঘটনা ঘটেছে যাত্রাগানে। সংস্কৃত নাট্যানুষ্ঠান থেকে বঞ্চিত হয়ে, বিশেষ করে বিদেশী বিধর্মী শক্তির বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধী ফ্রন্ট গড়বার প্রয়োজনে অভিজাত শ্রেণী লোকজীবনের কাছাকাছি আসতে বাধ্য হয়েছে। একান্ত লৌকিক অনুষ্ঠান যাত্রা শ্রেণীনির্বিশেষে সমগ্র বাঙালীর জাতীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে, তার ব্যাপক বিস্তৃতি সম্ভব হয়েছে তাই।

কৃষ্ণযাত্রা

জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'কে বাদ দিলেও প্রাপ্ত নিদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে যে গ্রন্থখানির নাম সর্বপ্রথমে করতে হবে, সেখানা কৃষ্ণযাত্রা গোষ্ঠীর—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যাত্রা-গুণ সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি।

কৃষ্ণ-যাত্রার ব্যাপক প্রসার হয় বৈষ্ণব যুগে। চৈতন্যদেব প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম, কীর্তন এবং পদাবলী-সাহিত্য সারা বাংলাদেশে যে ভাবের প্রবাহ তুলেছিল বাংলার যাত্রাগানে তার প্রভাব ব্যাপক এবং গভীর। যাত্রার জনপ্রিয় আধারে বৈষ্ণবী ভক্তিতত্ত্ব ও কৃষ্ণলীলা প্রচারের কামনায় বৈষ্ণব-কবি ও নেতৃবৃন্দ সচেতনভাবেই সচেষ্ট ছিলেন বলে মনে হয়। চৈতন্যদেব স্বয়ং শ্রীবাস আচার্যের গৃহে কৃষ্ণলীলার অভিনয় করেন। সোৎসাহে শ্রীকৃষ্ণের জীবনের নানা ঘটনাকে অবলম্বন করে কৃষ্ণ-যাত্রা রচিত হতে থাকে। চারদিকেই কৃষ্ণপ্রেম, সব সাহিত্যেই বৈষ্ণব প্রভাব, 'কালীয় দমন' নামে সব ধারার সব শ্রেণীর যাত্রারই পরিচিতি। সত্যই সারা বাংলায় যেন "কানু ছাড়া গীত নাই।" স্বভাবতই বৈষ্ণব-উত্থানের যুগে কৃষ্ণযাত্রার বিস্তৃতি ও জনপ্রিয়তা অন্যান্য ধারার পরিচিতিকেও আচ্ছন্ন করেছিল। বৈষ্ণবযুগেই বাংলা যাত্রায় ভক্তিতত্ত্ব ও সঙ্গীতধর্ম বিশেষ প্রবল হয়ে ওঠে। কিন্তু তবুও এ-যুগে রচিত কোন প্রাচীন পুঁথিই আমাদের

---

১ শ্লেগেল বলছেন: "We know of no Mohammedan nation that has accomplished anything in dramatic poetry or even had any notion of it."

২ 'শিবায়ণ' কাব্য।

৩ 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য।

৪ 'মনসামঙ্গল' কাব্য।

হস্তগত হয়নি। এর কারণ সম্ভবত এই যে বাংলার গদ্যসংলাপ ছিল অভিনেতাদের স্বতস্ফূর্ত সৃষ্টি; তা রচয়িতার নয়, তা লিখে রাখবারও প্রয়োজন অনুভূত হত না তাই,—আর সংগীতাংশ তো গায়ক-অভিনেতাদের মুখস্থই করতে হত, তাই তাও লিখে রাখা ছিল একান্তই বাহুল্য।

কৃষ্ণযাত্রার যে-সব প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া গেছে তা বহু পরবর্তী যুগের। সে-আলোচনা ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদ যুগের অর্থাৎ ১৮শ শতকের প্রথম দিকের শিশুরাম অধিকারীকে নিয়েই সুরু করতে হয়। ৫ যাত্রাগানের ধারায় শিশুরাম যে-সব উন্নতির নিশানা দেখিয়ে দেন সেই পথেই তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারী শ্রীদাম-সুবল। পরমানন্দ দাস শ্রীদাম-সুবলের যোগ্যতর ধারাবাহী। পরমানন্দের হাতেই কৃষ্ণযাত্রা উন্নতির উচ্চতম শিখরে ওঠে। অপরাপর যাত্রার ন্যায় তাঁর যাত্রায়ও সংগীতেরই প্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও, তিনি গদ্য-সংলাপ এবং ক্রিয়া (action)র পরিমাণ বাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন। অবশ্য তাঁর খ্যাতির মূল কারণ কিন্তু এই গদ্যাংশ এবং action নয়। তিনি নাটগীতে 'টুক্কো' নামে এক নতুন সুরভঙ্গির প্রবর্তন করেন। 'টুক্কো' হচ্ছে পয়ারে লিখিত গানের পরিসমাপ্তিতে কীর্তনের সুরের প্রবাহ। 'টুক্কো' তৎকালে জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ সমাদর লাভ করে। এই সময়েই সুদাম অধিকারী ও লোচন অধিকারী 'অক্রুর সংবাদ' ও 'নিমাই সন্ন্যাস' রচনায় বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দেন। পরমানন্দের পরে তাঁর শিষ্য গোবিন্দ অধিকারী (১৭৯৮-১৮৭০) টুক্কো উঠিয়ে দেন। তাঁর রচিত গীতাবলী অনুপ্রাসপ্রধান। গোবিন্দ অধিকারীর শিষ্য বদন নাটগীতে আবার টুক্কো প্রথার প্রচলন করেন। বদনের মৃত্যুতে যাত্রাগানের পতন সূচীত হয়। ব্রজনাথ নীলকান্ত প্রতিভার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক নিম্নস্তরের অধিকারী ছিলেন; যাত্রার মর্যাদা রক্ষার শক্তি তাঁদের ছিল না; যাত্রাগানের অবলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল তাই।

শাক্তযাত্রা ও শিবযাত্রা

শাক্তযাত্রা বিভিন্ন রূপমূর্তিতে এদেশে আত্মপ্রকাশ করেছে। দেবী কালী অথবা তাঁদের যে-কোন দেবাংশ বা অবতার (চণ্ডী মনসা প্রভৃতি)কে নিয়ে চণ্ডীযাত্রা, ভাসানযাত্রা রচিত হয়েছে। প্রাচীন চণ্ডীর গান থেকেই সম্ভবত চণ্ডীযাত্রার জন্ম। ফরাসডাঙার গুরুপ্রসাদ বল্লভ এবং বর্ধমানের লাউসেন বড়াল চণ্ডীযাত্রায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। প্রেমচন্দ্র অধিকারী জয়চন্দ্র অধিকারী চণ্ডীযাত্রাকে উন্নততর আনন্দানুষ্ঠানে পরিণত করেন। আনন্দ, জয়চন্দ্র ও প্রেমানন্দের রামযাত্রাও বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল।

মনসার বাৎসরিক পূজানুষ্ঠানের মধ্যে মনসার ভাসান যাত্রার জন্ম হয়। লাউসেন বড়াল চণ্ডীযাত্রা ও ভাসানযাত্রায় সমান কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

শিব-যাত্রা মহাদেবের কৈলাসের পারিবারিক জীবন নিয়ে রচিত হত। প্রাচীন গাম্ভীরা গাজন প্রভৃতি লোক-উৎসবের মধ্য দিয়েই শিব-যাত্রার উদ্ভব। শিব-যাত্রাওয়ালার কারুরই নাম আবিষ্কার করা যায় নি।

বিদ্যাসুন্দর-যাত্রা

বিদ্যাসুন্দর-যাত্রার জন্মলগ্নকে সাহিত্যের ইতিহাসের কোন দূরবর্তী যুগে অপসৃত করা চলে না। ভারতচন্দ্রের পরবর্তীকালে সংকট সমস্যা-জর্জর অন্নহীন অরাজকতার মধ্যে জনতার এবং আরও বেশি করে উচ্চঅভিজাতবর্গের মানস-শৈথিল্য ও রুচিহীনতার পরিচয় বহন করে এর জন্ম। ভারতচন্দ্রের গানকেই আরও তরল আরও সহজবোধ্য করে, আরও একটু রঙ্গিন দিয়ে জনতার আসরে পরিবেশন করতেন এঁরা। বিদ্যাসুন্দর-যাত্রা রচয়িতাদের মধ্যে গোপাল উড়ে এককালে প্রচুর সমাদর পেয়ে গেছেন। সুলভ আদি-রসের স্রষ্টা হিসেবে তিনি সেকালে বাঙালীর চিত্ত জয় করেছিলেন। শব্দ-লালিত্যে ও ছন্দ-মাধুর্যে গোপাল উড়ে তাঁর মন্ত্রগুরু ভারতচন্দ্রের সুনাম রক্ষা করেছেন। তাঁর রসিকতাও উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচনায় প্রতিভার প্রমাণ আছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু ভারতচন্দ্রের মতই তার অনেকখানিই অযথা অপব্যয়িত হয়েছে। অন্যান্য বিদ্যাসুন্দর-যাত্রাকারেরা ভারতচন্দ্রের উগ্র আদিরসেরই সাধনা করে গেছেন, গুরুর নৈপুণ্য ও কবিত্ব-শক্তি না থাকায় তাঁদের রচনা নেহাৎই সাময়িক উত্তেজনার খোরাক জুগিয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে স্বাভাবিকভাবেই কলকাতা অঞ্চলের যাত্রা-ধারায় একটা পরিবর্তন আসছিল। মহেশ চক্রবর্তী বৌ-মাস্টার, ঝোড়ো উমেশ মিত্র, মদন মাস্টার, লোকা ধোপা ইত্যাদির দলে যাত্রার রূপ বিকৃত হয়ে পড়ছিল।

১৭৫৬ খৃঃ বৃটিশ শক্তির কাছে বাংলার স্বাধীনতার অবসান হলেও, বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে, তার চিন্তায় অনুভূতিতে প্রতীচ্যের প্রভাব লেগেছিল অনেক পরে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ইংরেজ-সংস্কৃতির সঙ্গে দ্বন্দ্বে জাতীয় জীবনের সংক্ষুব্ধ ইতিহাস, এবং এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ নবজাগ্রত বাঙালীর সৃষ্টি-প্রাচুর্যের ইতিহাস।

এই নবশিক্ষিত বাঙালীর মনে তাই নিম্নরুচি আর ভাঁড়ামোর এই যাত্রাবেদন কোনই শ্রদ্ধা জাগাতে পারেনি। অবশেষে দেশী-বিদেশী নানা টানা-পোড়েনে জন্ম নিল নতুন নাট্যাভিনয়। কিন্তু এই নাটকের আবেদনও সহরের রঙ্গমঞ্চের সীমার বাইরে আপনাকে বিস্তৃত করতে পারে নি। আপামর গ্রাম্যমানুষ তাই রসকুম্ভের তলানিটুকু নিয়েই বেঁচে রইল বহুদিন।

ইতিমধ্যে নাটকের অভিনয়ের আড়ম্বর শহরবাসীর চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল। তাই পাড়ায় পাড়ায় সখের থিয়েটার-দল গড়ে উঠতে লাগল। স্টেজ-বাঁধার ব্যয়-বাহুল্য এড়াবার উদ্দেশ্যে প্রায়ই স্টেজ ছাড়াই এদের অভিনয় চলত। এমনি করে অজ্ঞাতসারেই নাট্যাভিনয় ও যাত্রাভিনয় খুব কাছাকাছি এসে গেল। ফলে তাদের এক প্রচলিত নাটকগুলিকে এই সব আসরের উপযোগী করে পরিবর্তিত করবার। গানের সংখ্যা বেড়ে গেল স্বভাবতই। মনোমোহন বসু, ব্রজমোহন রায়, মতিলাল রায় তো এই জাতীয় আসরে অভিনয়ের উপযোগী করে তাঁদের গীতিবহুল নাটক রচনা করলেন। কিন্তু প্রাচীন যাত্রার সঙ্গে এই আধুনিক যাত্রার পার্থক্য মূলগত। একে 'থিয়েট্রিকাল-যাত্রা' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এই থিয়েট্রিকাল যাত্রার প্রচলন গ্রামাঞ্চল থেকেও প্রাচীন যাত্রার অবশেষটুকুকে বিতাড়িত করে নিজেই জনমানসে অধিষ্ঠিত হল।

---

৫ রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রণীত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'।

প্রভাত দেব সরকার

[পূর্বানুবৃত্তি]

...এ যেন নিজের কাছে চোর হ'য়ে থাকা। অচল একটা জিনিষকে বার বার চালাবার চেষ্টা করে অপ্রস্তুত হওয়া। মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করা যায় না, অমল তার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করবে অতঃপর? বলাও যায় না নিজের মনোগত ভাবটা অমলকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে। অথচ যেমন চলছে তেমন চলাও আর উচিত নয়। তাদের সম্বন্ধে আড়ালে কথা কইবার লোক না থাকলেও সারদা দেবীর অবর্তমানে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তাও ক্রমে সংক্ষিপ্ত এবং সসঙ্কোচ হ'য়ে উঠছে। নেহাৎ প্রয়োজন ছাড়া কেউ কাউকে সম্বোধন করবার কোন অজুহাত খুঁজে পায় না। অমল খায়-দায় শহরে দোকান করে, নিভা সারদা দেবীর হ'য়ে সংসারের পরিচর্যা করে—অমলের খাওয়া-বসা-শোয়ার স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করে।

আশ্রয় নিভা চেয়েছিল, আশ্রয় সে এখানে পেয়ে গেছে সর্বময়ী কর্ত্রীর আসনে। আর ভাবনা কি! সিন্দুকের চাবি আর খরচের টাকা যখন তার হাতে তখন—

একদিন মৃতা সারদা দেবীর পরিত্যক্ত বিছানাগুলো বার করে রোদে দেবার জন্যে নাড়াচাড়া ক'রতে একখানা খাম নিভার নজরে পড়ল। মেঝের ওপর খামটা ছিটকে পড়ে গিয়েছিল। হাতের লেখা দেখে নিভা চিনলে।

মুখ-ছেঁড়া খামটা উপুড় করে ধরতে চিঠিটা বেরিয়ে পড়ল। সারদা দেবীকে রেণুকাকীমা আবার চিঠি দিয়েছিলেন। মরবার আগে সারদা দেবী হয়তো চিঠিটা পড়ে গেছেন। পড়ে কি ব্যবস্থা তিনি করবেন ঠিক করেছিলেন তিনিই জানেন। ঘুণাক্ষরে একটি কথাও তিনি নিভাকে বলে যাননি। হয়তো সুস্থ হ'য়ে উঠলে নিভাকে দিয়ে জবাব লেখাতেন এর একটা।

এবারে রেণুকাকীমা বিশেষ কাকুতি-মিনতি করেছেন নিভাকে ফিরিয়ে দেবার জন্যে। তাঁর ওখান থেকে অতবড় মেয়ের ওভাবে চলে যাওয়াটা নাকি বিশেষ দৃষ্টিকটু—পাঁচজনের পাঁচ কথার কারণ। পেটে না ধরলেও, নিভা তাঁর মেয়েরই মতই। এতটুকু থেকে তাঁরা তাকে মানুষ করেছেন। কুকুর বেড়াল পুষলেও মায়া পড়ে।...

ফিরিয়ে নেবার যুক্তি রেণুকাকীমার অকাট্য। দাবীও তাঁর অস্বীকার করা যায় না। পাঁচ জনের পাঁচ কথাও মানতে হবে।

কিন্তু না, এত কথার উদ্দেশ্য অন্য। নিভা সাগ্রহে একরকম নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে পড়ে শেষটুকু :—

"তুমি তো জান আমার শরীর কেমন, তার ওপর ছেলেমেয়েদের কি ধকলটা পোয়াতে হয়! কাচ্চাবাচ্চা অনেকগুলো! তোমাকে বলতে আর লজ্জা কি, এর ওপর আবার একটা শত্তুর পেটে এসেছে। শরীরটা কি যে খারাপ হ'য়েছে বলবার নয়, সব সময় মাথা ঘোরে, হাতপায়ে খিল ধরে, চোখে-কানে দেখতে পাই না। নিজের তো এই অবস্থা, কে দেখে তার ঠিক নেই, তার ওপর গৌরী এসে রয়েছে—ভরা পোয়াতী, আজ-কাল হ'য়ে আছে। কে কাকে দেখে তার ঠিক নেই। এ অবস্থায় তুমি যদি দয়া না-কর তা হ'লে এ যাত্রায় আর রক্ষে নেই। তোমাকে নিজের বোনের মত দেখি বলে বিপদের কথা জানাচ্ছি, জানি তুমি একটা সুরাহা করে দেবে।

হঠাৎ নিভার চোখদুটো যেন ঝাপসা হ'য়ে আসে। চিঠিটার বাকি অংশটুকু দেখতে পায় না। একটা অদ্ভুত অনুভূতিতে দেহ-মন তার অসাড় হ'য়ে আসে। মা, মেয়ের একসঙ্গে ছেলে হ'বে! কতদিনই বা গৌরীর বিয়ে হ'য়েছে, এরি মধ্যে!

চিঠির শেষ কথাগুলো খুবই স্পষ্ট এবং দ্রুত লেখা— (অতএব) "নিভাকে পাঠিয়ে দাও। আমার দায় উদ্ধার কর! বাঁচাও দয়া করে। এ-অবস্থায় মা-মেয়ে মারা যাব না হ'লে—" চিঠিটা পড়ে তখন-তখন কি মনে হয়েছিল আজ যথাযথ মনে থাকবার কথা নয়। তবে যুগপৎ নিভা ক্রোধ-কৌতুক বোধ করেছিল তখন। মা-মেয়ের করুণ অবস্থায় মনে মনে হাসি চাপতে পারেনি। গৌরী মার মত বছর বিয়োনী হবে!

না, আরো একটা কথা বেদনার সঙ্গে নিভার সেদিন মনে হ'য়েছিল, প্রকাশ তার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেছে। গৌরীর অন্তঃস্বত্ত্বা হওয়ার সংবাদে কোথায় যেন তার প্রতি একটা মর্মান্তিক ইঙ্গিত

করা হ'য়েছে। নিজের ওপর নিভার রাগ হয়—ছি ছি সে-ও কম নয়!

তারপর কদিন ধরে কেবল গৌরীর ছেলে-হওয়ার কথাটা নিভার মনে হ'য়েছিল। আর সেই একদিন গভীর রাত্রে কোলকাতার বাসায় তার দোরে টোকা মারার শব্দটা কানে স্পষ্ট বেজেছিল। ভেবে দেখলে তার নারীত্বের এত বড় অপমান যেন আর কোনদিন হয়নি। বিশেষ একটি স্মরণীয় আপাত জবরদস্ত সুখানুভূতি যে এমন কুৎসিৎ মনোবিকারের পর্যায়ে পড়বে নিভা সেদিন ভাবতে পারেনি। প্রকাশ তাকে সম্মান করেনি, ভালবাসেনি, তার রূপযৌবনের মধু গ্রহণ ক'রতে চেয়েছিল কেবল। বেণুকাকীমা তার প্রতি সন্দিগ্ধা হ'য়ে সেদিন ঠিকই করেছিলেন। আজ তবু নিজেকে যেটুকু খুঁজে পাওয়া যচ্ছে, তা কেবল ঐ জন্যেই। নিজের স্বভাবে যদি নিভা সেদিন এগিয়ে যেত, তা হ'লে শেষ পর্যন্ত কি হ'তো আজ ভাবতে সে বারবার শিউরে ওঠে। ভাগ্যে কলঙ্কের ভয়ে সে নিজেকে এতদূর টেনে এনেছিল!

না, না, প্রকাশকে সে ভালবাসেনি। মনের শুচিতা আজও সে বজায় রেখেছে। অভিভূত মনের সঙ্গোপনে যদি কোন কামনা প্রকাশের সংস্পর্শে জেগে থাকে তাকে নিভা কোনদিন আমল দেয়নি। মুহূর্তের আবিষ্ট অনুরাগ মুহূর্তেই শেষ হ'য়ে গেছে! প্রকাশের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ পাতাবার তার কোন ইচ্ছাই ছিল না।

তবু আশ্চর্য, কিছুতে গৌরীর বর্তমান আবয়বিক পরিবর্তনের ছবিটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারে না। অন্ততঃ গৌরীর সম্পর্কে প্রকাশকে কিছুতে অস্বীকার করতে পারে না নিভা। অমলের চেয়ে প্রকাশই এখন যেন তার সত্তার অনেকখানি জুড়ে আছে। মাত্র একটি রাত্রের ঘটনায় তার মূল্য প্রকাশের কাছে যেভাবে ধরা পড়েছে এতদিন একসঙ্গে বাস করে অমলের কাছে তার সিকিও প্রতীত হয়নি। অমল শুধু আশ্রয়ই দিয়েছে, তার মনের কোন খবরই রাখেনি। অমল ভীরু, প্রকাশ দুঃসাহসিক। ভীরুতার আশ্রয়ে আর যাই পাক সে, নিজেকে ঠিক মত খুঁজে পাবে না। ঘটনাবর্তে পড়ে হয়তো কোনদিন অমলকে দেহ দান অসম্ভব না হলেও মনটা নিভার আর কোথাও পড়ে থাকবে। তাকে নিতে হ'লে দুর্দম সাহস আর প্রচণ্ড আবেগের দরকার।

অত সাহস কি অমলের আছে, না অত প্রাণ-প্রাচুর্য? তবে কি প্রকাশ? ..সমস্ত দেহটা নিভার অসাড় হ'য়ে যায়, স্বৈরাচার আর মিথ্যাচারের খিক্কারে চিঠিটা হাতে করে কিছুক্ষণের জন্যে নিভা অনড় হ'য়ে যায়! ছি, ছি কোন মুখে আজও সে এখানে টিকে আছে! লজ্জা-সরম নেই! স্বৈরিণী! এখন এসব কথা ভাবাও তার পক্ষে পাপ!...

একদিন দুপুরবেলা অমলকে খেতে দিয়ে অদূরে বসে নিভা কথাটা তুললে। সারদা দেবী মারা যাবার পর অমলের সামনে এত সঙ্কোচ বোধ হয় নিভা আর কোনদিন বোধ করেনি। সম্বন্ধটা তাদের হঠাৎ যেন বড় দূর হ'য়ে গেছে।

সাড়া পেয়ে অমল মুখ তুলে চাইলে।

নিভা মাথা নীচু করে বললে, আমি কোলকাতায় ফিরে যাব। শুনে অমল কি ভাবলে কে জানে, মাথা নীচু করে খাওয়ায় মন দিলে নিঃশব্দে। এবার নিভা মাথা তুলে স্পষ্ট করে বললে, দেশে যাব ভাবচি।

অমল সাড়া দিলে না, তেমনি মাথা নীচু করে খেতে লাগল। কোন উত্তর পাবার আশায় নিভা দেশে ফিরে যাবার কথাটা তোলেনি, তাই অমলের নীরবতায় সে মনে মনে খুশী হয়। তার দেশে ফিরে যাবার সংকল্পের কথা শুনে অমল যে অমনি চুপ করে থাকবে, তা মনে মনে না বুঝলে নিভা হয়তো কথাটা কোনদিন তুলতো না। যাবার মন ক'রলে যেতে কতক্ষণ!

নিভা আবার বললে, আমি দেশে যাব।

এতক্ষণে অমল জবাব দেয়, হঠাৎ! কেন?

নিভা বললে, হঠাৎ মানে! আরো কতদিন এখানে থাকবো? এসেচি তো অনেকদিন—

অমল আমতা-আমতা করে বললে, কিন্তু—তাতে কি

নিজের মনে নিভা হাসে। মুখে বলে, কিছু না। এক জায়গায় এতদিন কি ভাল লাগে!

কেমন অদ্ভুত এক ধরণের মুখ করে অমল নিভার মুখের দিকে চায়। এতদিন পরে নিভার আজ এ কথার অর্থ কি? এখানে তা'হলে সে এসেছিল কি করতে!

কি মনে হয় নিভার। বোধ হয় নিজের দিক থেকে কথাটা পরিষ্কার করতে বলে, তা ছাড়া আর ভাল দেখায় না! আমি দেশে ফিরে যাব এবার।

নিভা লক্ষ্য করলে দেখতে পেতো, ইঙ্গিতটা অমল ঠিকই বুঝেছে। মুখটা তার এতটুকু হ'য়ে গেছে। কিন্তু এর জন্যে দায়ী কি সে?

গম্ভীর গলায় অন্যমনস্কের মত অমল বললে, কবে যাবে?

নিভা বললে, আপনি যেদিন বলবেন।

সম্বোধনের তারতম্যে অমল চমকে ওঠে। হঠাৎ এমন একটা সংকল্পকে এভাবে মানিয়ে নেওয়ার অর্থ কি। সত্যিকারের কি চায় ঐ মেয়েটি! কি এমন অসুবিধা ওর হ'চ্ছে এখানে? এর চেয়ে ভাল আশ্রয় কি ও আর কোথাও পাবে?

নির্লিপ্ত কণ্ঠে অমল বললে, আপনার যেদিন সুবিধা!

অমলের উত্তরটা ঠিক এভাবে নিভা আশা করেনি। বিষয়টাও যে এমন গুরুতর রূপ নেবে তাও সে ধারণা করেনি। এ যেন গাল বাড়িয়ে চড় খাওয়া।

নিজের কথার মর্যাদা রাখতে নিভা বললে, আমার তো সুবিধেই। কি আর এমন রাজকার্য করচি এখানে!

আসন ছেড়ে উঠতে উঠতে অমল বললে, আচ্ছা!

নিভা হাত-পা ছড়িয়ে চুপটি করে বসে থাকে কিছুক্ষণ। বোধ হয় আত্মপ্রবঞ্চনার ফল এই ঠিকই ব্যবহার করেছে অমল! কি শুনতে চেয়েছিল সে অমলের মুখে—তুমি যেয়ো না, তোমাকে ছাড়া আমার চলবে না। তুমি আমার হও? ইত্যাদি।

নিজে হাতে যেন নিজের একটা সর্বনাশ নিভা করলে। এখানে থাকার যেটুকু মুখ ছিল তাও নষ্ট হ'লো। অন্নদাতার অনুমতি পেয়েও এখন না-যাওয়াটা দৃষ্টিকটু, অমার্জনীয়। গলায়-পড়া!

এর পর অমলের সামনে বেরতে নিভা কুণ্ঠিত বোধ করে। দিনস্থির না করা পর্যন্ত মনস্থির ক'রতে পারে না। লোকটার ওপর কেমন-এক-রকম বিদ্বেষ বোধ করে, শুয়ে-বসে স্বস্তি পায় না। এই কি তার মূল্য—সে মুখে যাব বললে আর উনি অমনি মত দিলেন? কোথায় কার কাছে যাবে একবার জিজ্ঞেসও করলে না!

না, দুনিয়ায় কেউ তাকে চায় না। তার পক্ষে কারো মুখ চাওয়াও মিথ্যে। মনের মধ্যে ভীরু আশা পোষণ করা অপরাধ। অপমানের নামান্তর।

তোরঙ্গ গুছতে গুছতে অনেক কথা নিভার মনে হয়। নিজের মনে নিজের কোন হদিস পায় না—কেন সে যেতে চাইলে, আর কোথায় সে যাবে? এ যেন আর এক কলঙ্ক নিয়ে ফিরে যাওয়া। এখানেও জায়গা হ'লো না।

সারদা দেবীর জন্যে চোখের জল ফেলে নিভা, তিনি বেঁচে থাকলে তাকে কখনোই ছাড়তেন না। তার কপাল মন্দ, তাই তিনি তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।

ক'দিন ধরে বাক্স গুছিয়ে আবার তাকে এলোমেলো করে দেয় নিভা। না, সে যাবে না। কেন যাবে? তার খুশী সে এখানে আজীবন থাকবে। মৃত্যুকালে সারদা দেবীর অনুমতি সে নিয়েছিল। তাঁর ইচ্ছেকে অমল অমর্যাদা করতে পারে না। তাকে অপমান করেছে বলে মাকে অমান্য অমল করতে পারে না। তাছাড়া সত্যিকারের যাবার ইচ্ছে নিভার নেই। দেশে কারো জন্যে তার মন পড়ে নেই, ঘটা করে যাবার জন্যে সে দুঃখ নিয়ে দেশ থেকে চলে আসেনি।...

কোথাও কিছু নেই, মাঝে একদিন হঠাৎ শীতের আকাশ ঘোলা হ'য়ে বৃষ্টি নামলো। প্রচন্ড বৃষ্টি। শীতকালে ঠিক এই ধরণের বৃষ্টি বাঙলা দেশে কখনো হ'য়েছে বলে নিভার মনে পড়ে না। আরো আশ্চর্য, সঙ্গে শিলাপাতও হ'য়েছিল। ঠিক যেন কালবৈশাখী।

হঠাৎ, কয়েক ঘণ্টা মাত্র, কিন্তু তাতেই শীতটা আরো বেশী করে পড়ল। বিকেলের পর থেকে হাত-পা আর যেন বার করা যাচ্ছিল না। বুকের ভেতরটা গুর গুর করছিল। অদ্ভুত শীত কনকনে।

নিভা বেলাবেলি রান্নাবাড়ার পাট চুকিয়ে ফেলেছে। সরবতীয়াও অনেকক্ষণ তার বাসায় ফিরে গেছে। সবে সন্ধ্যে হ'লো।

মেজের ওপর কম্বল বিছিয়ে বসে থাকতে থাকতে নিভার মনে হয়, এভাবে এখনো নিজেকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি। আজ বাদে কাল যখন সে থাকবে না, তখন তার এইভাবে প্রতীক্ষা করার কথাটা কি অমল কোনদিন মনে করবে? তা হ'লে এমনি শীতে, এমনি ভয়ে-ভাবনায়, আতঙ্কে অপেক্ষা করে' লাভ কি।

সামনে নিজের ছায়াটা দেখে নিভা আরো যেন ভয় পায়। একটা অশরীরী আত্মা যেন উদ্বন্ধনে বিকৃত হ'য়ে আছে। তার চাদর মুড়ি মূর্তিটা দেওয়াল গায়ে থেবড়ে গেছে।

নিভা উঠে দাঁড়াল। হ্যারিকেনটা তুলে নিয়ে বাইরে ঘুরে এল। আকাশে নক্ষত্র অসংখ্য ফুটেছে, ছেলে-ভুলোন ছড়ার মত আকাশ-মাটিতে সখ্য স্থাপন হ'য়েছে। কে বলবে কয়েক ঘণ্টা আগে অমন অনাসৃষ্টি কান্ড ঘটে গেছে। শিলাবৃষ্টি আর বাতাসে মাটিকে চষে ফেলেছে।

বিনা কারণে বুকের ভেতরটা নিভার মোচড় দিয়ে ওঠে। কোন পথই আর দেখা যায় না। যাব না বলে বসে থাকাটা কেমন বিসদৃশ। আর একদিনও যদি এ-সম্বন্ধে অমলের সঙ্গে কথা হ'তো।

কি জানি কেন নিভা আজ আর বেশীক্ষণ অমলের জন্যে অপেক্ষা করলে না। নিজে খেয়ে নিয়ে, অমলের খাবার চাপা দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল। আরো আশ্চর্য শোবার সঙ্গে সঙ্গে কখন যে সেদিন ঘুমিয়ে পড়েছিল টের পায়নি। সারদা দেবীর মৃত্যুর পর এমন নিশ্চিন্ত গাঢ় নিদ্রা নিভার বোধহয় সেই প্রথম।

নিভার ঘুম ভাঙল সমস্ত চেতনার বিমূঢ়তায়। একি অসম্ভব, অভাবনীয় ব্যাপার। সারা দেহ নিভার অসাড় হ'য়ে গেছে, বুকের ওপর যেন পাথর চেপে আছে। কণ্ঠতালু শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেছে। নিজের বক্ষস্পন্দন নিজেই শুনতে পাচ্ছে নিভা—ঢিপ্, ঢিপ্, ঢিপ্। চোখের ওপর অন্ধকার চিক্-চিক্ করছে।

নড়বার চড়বার আর কোন ক্ষমতা নেই নিভার। একটা ভীম অজগর যেন তার দেহটা দ্রুত গ্রাস করে ফেলছে। এখন শান্ত হ'য়ে শেষ মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া তার কোন আর উপায় নেই। বোঝা যায় সর্বনাশ, কিন্তু করবার কিছু নেই।

চোখ খুলে নিজেকে মুক্ত করে' নিয়ে নিভা রুদ্ধকণ্ঠে বললে, একি করলে?

অন্ধকারে ত্রস্ত পায়ের শব্দ শোনা যায়।

নির্বাক, বিমূঢ় নিভা বিছানার ওপর উঠে বসে' বাইরে শূন্যে আকাশের দিকে চেয়ে ভোরের তারার প্রতীক্ষা করলে।

কে বলে সর্বনাশ? নব জন্মও তো হ'তে পারে।

কিন্তু সফল প্রত্যাশায় এত বেদনা, বিদ্বেষ-ঘৃণা কেন? এত অস্থির, অস্বস্তি কেন?...

পরের দিন সকালে অমল যথারীতি সাইকেলের ঘণ্টা বাজিয়ে চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে সহরের দিকে চলে গেল। নিভা তখন স্তব্ধ বিস্ময়ে কল-ঘরটার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। মাত্র একটি রাতের ব্যবধানে কত যেন উলোট-পালট হ'য়ে গেছে। কি দুর্যোগ যেন গত রাত্রে ঘটে গেছে। বাড়িটার চারদিকে এত ঝরা শালপাতা জড় হ'য়েছে, এত ভাঙা ডাল-পালা এসে পড়েছে যেন বিক্ষুব্ধ প্রকৃতির সব আক্রোশটা এই নির্জন বাসস্থানকে লক্ষ্য করে বর্ষিত হ'য়েছে। আর আশ্চর্য, বাইরে এত কান্ড নিভা আদপে টের পায়নি। কেবল সেই—

পা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত নিভার খাড়া হ'য়ে ওঠে। না, না, কোন আনন্দ পুলক নয়, নিদারুণ ভয়। কাল রাতে সে-সময় প্রকৃতি উন্মাদ হ'য়ে গেল না কেন? আবার দুর্যোগ আরম্ভ হ'লো না কেন?

কোন মতে স্নান-আহার করে সারাদিনটা নিভা একভাবে কাটিয়ে দিলে। সরবতীয়া কয়েকবার নিভাকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলে, তবিয়েৎ আচ্ছি নেই? কেয়া।

নিভা উত্তর করলে না। নিজের মনে সংসারের কাজকর্ম করতে লাগল। তাছাড়া বলবারও যেন তার কিছু নেই। শরীর তার ঠিক-ই আছে।

তবু সরবতীয়া ছাড়ে না। পরিচয়ের হৃদ্যতায় নিভার গায়ে হাত দিয়ে বলে, নেহি, কুছ নেই। জাড় বাস্তি ইস্সে—

হঠাৎ সরবতীয়ার নজরে পড়ে, নিভার চোখের কোলে জল, মুখটা অস্বাভাবিক থম্থমে।

অবাক বিস্ময়ে পরিচারিকা নিভার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। গায়ে হাত দিয়ে পরখ করা তার উচিত হয়নি? শুধু শুধু মানুষ কাঁদে কি? কে জানে কি ব্যাপার।

রাত দশটায় কলকাতা মুখো বোম্বাই মেলে এলাহাবাদে পৌঁছে নিভা যেন দম ফেললে। এতক্ষণ দমটা আটকে ছিল নিজের কাজের

অগ্র-পশ্চাৎটা ভুলে থাকতে। পালিয়ে বাঁচার কথাটাই তখন মনে হ'য়েছিল কেবল।

গাড়িটা বোধহয় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে। এই ফাঁকে কিছু খেয়ে নিলে হয়। খাবার কথা মনে হ'তে মনটা কেমন বিস্বাদ বোধ করে। না, ক্ষিদে-তেষ্টা তার নেই, তা ছাড়া অনেক হাঙ্গামা। একা-একা মেয়েছেলে এই রাতে কোথায় আহার অন্বেষণ করবে। যাক তবে। জানালায় মুখ বাড়িয়ে ঢুলু-ঢুলু স্টেশনটা নিভা দেখে, হঠাৎ আজ বাদে কাল অমলের জন্যে ভাত কোলে করে অপেক্ষা করার কথাটা মনে পড়ে।

পাহাড়ের নীচে অন্দরদেওর বাড়ীটা এতক্ষণে অসাড় হ'য়ে গেছে। অমল হয়তো এখনো টের পায়নি, নিভা তার আশ্রয় ত্যাগ করে এসেছে। হয়তো রাত গভীর হবার অপেক্ষার নিঃশব্দে নিজের বিছানায় আশ্রয় নিয়েছে।

এত শীতেও সমস্ত শরীরটা নিভার ঘর্মাক্ত হয়ে ওঠে। চোখ মুখ ঝা-ঝা করতে থাকে। কে জানে একি ক'রলে সে। এতদিন যা চাইতো তাকে পেয়ে এমনি ভাবে প্রত্যাখান করার কি মানে হয়। কেন করলো ?

জানালা থেকে মুখটা সরিয়ে নিয়ে চোখ বুজিয়ে নিভা স্থির হ'য়ে বসে রইল। আর কোন চিন্তা করবার তার ক্ষমতাই নেই—যেন পাথর হ'য়ে গেছে।

কতক্ষণ ঠিক খেয়াল ছিল না, গাড়িটা নড়তে নিভা চোখ চাইলে। দেখলে একটি সুবেশ প্রৌঢ়া মহিলা কখন এসে তার সামনে বসেছেন। বাঙালী-ই।

চোখাচোখি হ'তে মহিলাটি জিজ্ঞেস করলেন, কতদূর যাবেন ?

কলকাতায়। একটু বোধ হয় থতমত খেয়ে যায় নিভা।

মহিলাটি হাসিমুখে বললেন, তা হ'লে একসঙ্গে যাওয়া যাবে।

নিভা খুব একটা উৎসাহ বোধ করে না। বোধ হয় একলা যেতে পারলেই সে এখন খুশী হ'তো। আর তার গন্তব্যের যদি কিছু ঠিক না থাকতো। কোথায় যাবে কলকাতায় ?

খানিক্ষণ পরে মহিলাটি কি ভেবে জিজ্ঞেস করলেন, কোথা থেকে আসচেন ?

যেন প্রশ্নটা শুনতে পায়নি এমনি অন্যমনস্কের ভাব করলে নিভা।

স্মিতমুখে মহিলাটি আবার জিজ্ঞেস করলেন, কোথা থেকে আসচেন ?

নিম্নস্বরে নিভা জবাব দিলে, অন্দরদেও, জব্বলপুরে।

মহিলাটি বললেন, ও, আত্মীয়ের বাড়ি বুঝি ?

হঠাৎ সহযাত্রিণীর এতটা আত্মীয়তা বোধ হয় নিভার মনঃপূত নয়। তেমনি আড়ষ্ট ভাবে নিভা জবাব দেয়, হ্যাঁ।

হাসি-খুসী মহিলাটি বললেন, আমিও আসচি বোনের বাড়ি থেকে। বোনের খুব বাড়াবাড়ি অসুখ করেছিল, দেখতে গিয়েছিলুম।

উত্তরে কি বলা উচিত নিভা ভেবে পায় না। কেমন যেন নিশ্চেষ্টতা বোধ করে।

মহিলাটিই বলেন, এখন ভালই আছে। আরো কিছুদিন থাকলে হ'তো, কিন্তু ওদিকে আবার ছুটি পাওয়া যাবে না।

মরা-চোখে চাওয়ার মত নিভা নির্বাক। তার সুখ-দুঃখ এখন কে দেখে। মিথ্যে বাক্য-ব্যয়ে লাভ কি

নিভাকে দেখে মহিলাটির কি মনে হ'য়েছিল কে জানে যতক্ষণ না নিভার নাম-ধাম জানলেন ততক্ষণ নীরব হ'লেন না। তার কয়েক সঙ্গে কেউ নেই বলে বিস্ময় প্রকাশ করলেন, হয়তো কিছু রহস্য আন্দাজ করলেন।

নিভা সম্ভব মত নিজেকে ঢেকে রাখলে। সহযাত্রিণীর অহেতুক কৌতুহলে মনে মনে প্রমাদ গোণে, কে জানে কোন বিপদের মুখে পড়ল আবার।

নানা সংশয়-দ্বন্দ্ব, বিরক্তি আর অস্বস্তির মধ্য বাকি রাত কেটে গেলেও সঙ্গিনীর সাহচর্যটা সকালের দিকে নিভার মন্দ লাগে না। অল্পে অল্পে মানুষটার সম্বন্ধে ধারণা তার বদলাতে থাকে।

একসময় সঙ্গিনীর দেওয়া চা-খাবার সঙ্কোচ ভরে হাত পেতে নিয়ে কি যেন খুঁজতে চায় নিভা মহিলাটির মুখে। নিজের মনে কেমন বিস্ময় বোধ করে, গত রাতে ঐ মুখে কত না দুরভিসন্ধির রেখাপাত দেখতে পেয়েছিল। গায়ে-পড়া আত্মীয়তার কত না কদর্থ করেছিল।

তাঁরই অনুরোধে এখন চা-খাবারটা হাত পেতে নিতে নিভার সঙ্কোচের চেয়ে লজ্জাই হয় বেশী। ছি ছি।

লক্ষ্য করে মহিলাটি বললেন, ওকি, খাচ্ছো না যে। কি হ'লো ?

নিভা হাসবার চেষ্টা করে। তার কি হ'লো সে-ই কি জানে যে জবাব দেবে। যাকে সারাক্ষণ এত পর ভেবে এসেছে, দূরে রাখতে চেষ্টা করেছে—সে-ই তাকে কোন হিসাবে এত আপনার ভাবে। কুড়িয়ে পাওয়া সৌজন্যে এত চিত্ত-বিক্ষোভ কেন আশ্চর্য মানুষের মন। আত্মীয়তার স্পর্শে নিভার হাতটা কাঁপতে থাকে।

একবার নয়, বার তিনেক মহিলাটি নিভাকে নিজের আহার্যের অংশ দিলেন। প্রতিবারই নিভা নিমরাজী হ'লে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আতিথ্য স্বীকার করলে। আর বার বারই চলন্ত গাড়ির স্তিমিত প্রকোষ্ঠে অনেক অপরিচিত মহিলার উপস্থিতিতে যে ভয় কণ্টকিত হ'য়েছিল তা মনের কোণে উঁকি দেয়। কত কুৎসিৎ মনুষ সম্বন্ধে মানুষের ধারণা স্থান-কাল পরিবর্তনে। ছি, ছি, এতক্ষণ উনি যদি নিভার নগ্ন-মনের রূপটা দেখতে পেতেন।

দুপুরের দিকে গাড়িটা বাঙলাদেশের মাঠ-ঘাট-পথ মাড়াতে নিভার মনটা কেমন যেন হু-হু করে ওঠে। আর কিছুক্ষণ পরে যেন সব অবলম্বন শেষ হ'য়ে যাবে—অতিক্রান্ত পথের ডোর ছিন্ন হ'বে। গাড়ির কয়লা-বাষ্প ফুরোনো'র সঙ্গে সঙ্গে তারও হৃদয়ের সমস্ত উত্তাপ নিঃশেষ হ'য়ে যাবে।

নিভা একান্ত মনে কামনা করে এ গাড়ির চলার যেন শেষ না হয়। রাত্রি-দিনের সমস্ত ব্যবধান ঘুচে যায়, ক্ষুধা-তৃষ্ণার আর না উদ্রেক হয়—এমনি মুখ বাড়িয়ে শূন্য দৃষ্টিতে সে বাইরের চলমান দৃশ্য জীবনভোর দেখুক। স্বাদ বর্ণ হীন দৃশ্য কেবল - -

তবু নিজের কাজের কোন যুক্তি খুঁজে পায় না নিভা। চেয়ে পেয়ে এমনি ভাবে ফেলে দিল কেন সে ? সঙ্কোচের আপত্তি তার কোথায় ? নারী জীবনের অমন সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে এমন অবহেলা করলে কেন সে ? চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্ব যখন মিটে গেল তখন আবার কিসের দ্বন্দ্ব তার মনে আশ্রয় করলে ?

চায় নি কি সে অমলের ঘরণী হ'তে? প্রবাসিনী হ'য়ে স্বদেশের সমস্ত জ্বালা ভুলতে?

কে জানে কি, নিজেকে নিভা যেন আর চিনতে পারে না। কি খেয়াল হঠাৎ সব ওলোট-পালোট হ'য়ে গেল। মনটাও। পিছন থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে সামনে সে কোথায় দৃষ্টি ফেরাবে? সে কি লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'লো?

বেলা বারটায় হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ী পৌঁছতে কুলির মাথায় নিজের জিনিসপত্তর চাপিয়ে দিয়ে মহিলাটা নামতে গিয়ে নিভাকে তখনো নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কি নামবে না!

চিত্রার্পিত নিভা চমকে ওঠে। হঠাৎ মনে হয় একটা অতি-পরিচিত স্বর তাকে আহ্বান করছে। নিভা কিছু না বলে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে মহিলাটির মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

মহিলার কণ্ঠে উদ্বেগ প্রকাশ পায়ঃ কি নামবে না? এসে গেচি যে!

নিভা বলে, কোথায়?

মহিলাটির কি মনে হয়, ইঙ্গিতে কুলীকে অপেক্ষা করতে বলে নিভার কাছে এসে হাত ধরেনঃ এস, এস—কই তোমার জিনিসপত্তর?

যন্ত্রচালিতের মত নিভা ওঠে। মহিলাটি এদিক ওদিকে উঁকি দিয়ে দেখেন, কোথায় কি—জিনিসপত্রের কোন বালাই নেই নিভারাণীর।

হাত ধরে গাড়ি থেকে নামিযে সঙ্গিনী পরম স্নেহভরে জিজ্ঞেস করেন, ব্যাপার কি? অমন করে ছিলে কেন? নামবার কথা ভুলে গেছলে নাকি?

হয়তো তাই—ভুল। আগাগোড়া তার ঠিকানাই ভুল।

মহিলাটি বলেন, বল কোথায় যাবে? তোমাকে পৌঁছে দিয়ে তবে আমি বাসায় যাব!

নিভা কোন উত্তর করে না। মহিলাটি ব্যগ্র হ'য়ে বলেন, কি! চুপ করে আছ কেন, বল কোথায় যাবে?

প্ল্যাটফরমের মাঝখানে নিভা হাত-পা ছাড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। আকাশ-পাতাল ভেবে পায় না, তার এখন যাবার জায়গা কোথায়। কোন মুখে এখন কার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে! নিজে হাতে সব দরজাই তো সে বন্ধ করে দিয়েছে।

মহিলাটি নিভার বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে কি যেন ভেবে নেন মুহূর্তের জন্যে, তার পর অস্ফুটে বলেন, চল, আমার সঙ্গে।

হঠাৎ যেন নিভার খেয়াল হয়, নিজেকে এভাবে প্রকাশ করাটা ঠিক হয়নি। কিছু না হোক অন্ততঃ একবার রেণু-কাকীমার ওখানে গিয়ে দেখলে পারতো। তার জন্যে না হোক রেণু-কাকীমার নিজের প্রয়োজনে সেখানে সে আশ্রয় পেতো।

মহিলাটি হাত ধরে বললেন, ভয় কি, আমি তোমার বড় বোনের মত, আমার কাছে লজ্জা কি! চল, আমার ওখানে—

নিভা আপত্তি জানায়ঃ না, আমি ঠিক যেতে পারবো, আপনি যান। কলকাতায় আমার কাকার বাড়ী আছে। সেখানেই—

মহিলাটি হেসে বলেন, সে তো আমি অস্বীকার করছি না ভাই, কিন্তু সেখানে যে তোমার যেতে আপত্তি সব চেয়ে বেশী।

ধরা পড়ে নিভা আরো বিবর্ণ হ'য়ে যায়। চোখ দুটো তার ছল ছল করে ওঠে। অস্ফুটে বলে, কিন্তু আমার পরিচয়—

মহিলাটি শব্দ করে হেসে ওঠেনঃ সে আমি বুঝবো। তুমি এসোতো এখন।

কাঠ হ'য়ে দাঁড়িয়ে নিভা শুষ্ক কণ্ঠে বলে, আমি পতিতা, আমি নিন্দিতা, ঘৃণিতা!

হাতে টান দিয়ে মহিলাটি তেমনি সহাস্যে বলেন, আমি জানি। এস তো আমার সঙ্গে। কুলীটা আবার এগিয়ে গেল—এস, এস।

নিভা আরো কি বলতে যাচ্ছিল, মহিলাটি থামিয়ে দিয়ে বললেন, বাসায় গিয়ে শুনবো। চল।

মন্ত্রপূতের মত নিভা মহিলাটির পাশে পাশে হেঁটে এসে ফিটন গাড়িতে মুখোমুখি বসল। নিজের সম্বন্ধে তার আর কিছু করবার বা ভাববার যেন দরকার নেই। সারা পথ নিভা বার বার চোখ তুলে চোখ নামিয়ে নিলে। মনে হ'লো, এই ভাল—ভগবান তাকে রক্ষা করেছেন।

সমস্ত লজ্জা, সমস্ত সঙ্কোচ, সমস্ত ভয় কাটিয়ে উঠে হঠাৎ নিভা অবনত হ'য়ে মহিলাটির পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে। মহিলাটি হাত ধরে তুলে নিভার চিবুক স্পর্শ করে বললেন, থাক্ থাক্, কি পাগ্লামি হ'চ্চে!

নিভার দুই গণ্ড থেকে কখন দু'ফোটা অশ্রু ঝরে পড়ে। ফিরে আসার গুমরে-ওঠা গ্লানিটা তাতে কাটে কি না কে জানে। কৃতজ্ঞতা না বেদনার অভিব্যক্তি তা?

ট্রেনের পরিচিতা ডাক্তার মিসেস সেনের বাসা ভবানীপুরে। রাস্তার নামটা আজ আর মনে পড়ে না নিভার—কালীঘাট ট্রাম ডিপোর কাছাকাছি কোথায় যেন। তিনচার কামরার একতলা বাসাটা আজো মনের কোণে স্পষ্ট কিন্তু। পরিচ্ছন্ন সংসার, স্বামী স্ত্রী আর একটি ন দশ বছরের মেয়েকে নিয়ে ছোট্ট পরিবার অমিয়াদির। ধাত্রীবিদ্যায় পারদর্শিনী অমিয়াদি, রাত-দিন নাইবার-খাবার সময় পান না। অমিয়াদির স্বামীও এম-বি ডাক্তার, কিন্তু তিনি কোন প্র্যাকটিশ করেন না, কোন এক দেশী ঔষধের কারখানার ম্যানেজার। স্বচ্ছল সংসার, নির্ঝঞ্ঝাট, বুলা মেয়েটিও কি সভ্য, কুড়িয়ে আনা পথের একটা মেয়েকে মাসী বলে কাছে আসতে তার এতটুকু বাধেনি। এতদিনে তাদের সংসারে প্রবাসিনী মাসী যেন দয়া করে বাস করতে এসেছেন। মায়ের সম্মান বুলা নিভাকে দিতো। প্রথম প্রথম কিছুটা আড়ষ্ট বোধ করলেও বুলার আগ্রহাতিশয্যে নিভাকে একরকম তার সাথী হ'তে হ'য়েছিল। অমিয়াদিও বোধ হয় তাই চেয়েছিলেন।

মাসখানেক পরে একদিন খাবার টেবিলে অমিয়াদির স্বামী বললেন, তোমার বোনের একটা ব্যবস্থার কথা ভেবেচো কি?—এখন ওর ভবিষ্যৎ যাতে নষ্ট না হয় তা আমাদের দেখা উচিত।

অমিয়াদি বললেন, ক'দিন আমিও তাই ভাবচি। ওর একটা ব্যবস্থা করতে হয়।

নিভা চুপ। এ'রা কি ব্যবস্থার কথা বলছেন কে জানে। মনে মনে সে শঙ্কিত হ'য়ে ওঠে। বুলার মাসী হ'য়ে এদের সংসার দেখা ছাড়া আর কি ব্যবস্থা তার পক্ষে উপযুক্ত এ'রা বিবেচনা করেন।

খানিক চুপ করে থেকে অমিয়াদি বললেন, ভাবচি নার্সিং পড়লে কেমন হয়। তবু নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবার একটা সুযোগ পাবে ও।

অমিয়াদির স্বামী বিমলবাবু সায় দিলেন, খুবই ভাল। তবে একটু লেখাপড়া না জানলে বোধ হয় সুবিধে হ'বে না। স্বামীর কথার উত্তরে অমিয়াদি নিভার দিকে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ চলনসই লেখাপড়া কি আর নিভা না জানে!

কিন্তু না, নিভা মাথা নিচু করেছিল। তারপর ও'দের নির্দেশে স্কুলের বইপত্র নিয়ে নিভা নতুন করে পড়াশোনা সুরু করলে। অল্পদিনে মোটামুটি ইংরেজী বাংলা লিখতে, পড়তে সে শিখে গেল। তার জন্যে আলাদা শিক্ষয়িত্রী অমিয়াদিরা নিযুক্ত করেছিলেন।

দেখে শুনে যথাসময়ে অমিয়াদি তাকে নার্সিং শিখতে একটা হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিলেন। সামান্য হাত খরচে প্রথম প্রথম চাকরির নামে শিক্ষাটা অবশ্য তার মন্দ লাগেনি। এ বাড়ীর সবাই খেটে খায়, সবাই স্বাবলম্বী। নিজেকে বোঝা বলেও আর মনে হ'তো না। কিন্তু শিক্ষানবিশী নার্স হিসাবে মার্কামারা পোষাকটা তার মোটে পছন্দ হ'তো না। নেড়া-নেড়া হাত, স্থির দৃষ্টি, ভোঁতা-ভোঁতা মুখ যেন কাঠের পুতুল সে পটুয়াপাড়ার। সমাজের একটা অবাঞ্ছিত জীবকে বিশেষ একটি পরিচ্ছদে নর-লোকের চোখের সামনে সেবাধর্মের নামে তুলে ধরা হ'চ্ছে। কি লজ্জা! কিন্তু কেন যে লজ্জা স্পষ্ট করে নিভা জানে না। আজকাল নামাবলি গায়ে দিয়েও বোধ হয় লোকে এত লজ্জা পায় না।

দু তিন মাসের মধ্যেই কাজটার ওপর নিভার কেমন এক ধরণের বীতস্পৃহা আসে। তার সঙ্গী হিসাবে যারা ঐ একই জীবিকার সূত্র গ্রহণ করেছে তাদের সঙ্গও নিভার দু'একদিনে অসহ্য মনে হয়। বড় ছোট আর বড় হীনমনা সব। সাতকুলে কেউ নেই, তাই এখানে মরতে এসেছে! স্বাবলম্বী হতে গিয়ে জীবনটাকে যেন বিকৃত করে ফেলছে। এ জীবন তার নয়।

ক'মাস কাজ করার পর নিভার মনে হ'লো এর চেয়ে বড় প্রবঞ্চনা সে আর নিজেকে কোনদিন করেনি। একদিন সোজাসুজি বেঁকে বসল।

অমিয়াদি লক্ষ্য করে বললেন, কি নিভা, আজ হাসপাতালে যাবে না।

নিভা চুপ করে রইল।

অমিয়াদি আবার জিজ্ঞেস করলেন, কি হ'লো। শরীর ভাল তো?

তবুও নিভা উত্তর করলে না। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। কি ভাবলেন অমিয়াদি তখন আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। কাল থেকে ফিরে এসে উপদেশ ছলে তাকে নিজের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করে দিলেন। তার মত মেয়েদের ওছাড়া সম্মানের পথ আর নেই। বার বার গলগ্রহ হ'য়ে তো সে দেখেছে, কি ফল। আজ যেটা খারাপ লাগছে কাল সেটা তার পক্ষে নতুন জীবনের সূচনা করে দেবে—নিজেকে পরিপূর্ণ করার আনন্দ পাবে। নিজের কথা বললেন অমিয়াদি—

তিনিও নাকি অমন আত্মীয়-স্বজনহীনা ছিলেন, অনেক দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়ে এ-পথে এসে সুখ পেয়েছেন। সামান্য নার্স হিসেবে তিনি ছিন্ন ভিন্ন জীবনের সূত্রকে জোড়া দিয়েছেন। গ্লানি কি তাঁর কম ছিল!

কি চায় সে? শুধু আশ্রয়? তা তিনি তাকে সারা জীবন দিতে পারেন, কিন্তু তাতে লাভ কি—নিভার কতটুকু উপকার হ'বে? তা ছাড়া—

নিভা মাথা উঁচু করে চেনে দেখে। অমিয়াদি তার ভালর জন্যেই বলছেন। বোঝা নামাবার উপদেশ নয়, সত্যিকারের শুভেচ্ছার কথা।

আবার ক'দিন মন লাগিয়ে নিভা হাসপাতালে আসা-যাওয়া ক'রলে। কিন্তু মন বসল কই! আবার যে-কে সেই। নতুন জীবনে কিছুতে নিজেকে নিভা খাপ খাওয়াতে পারে না। সব সময় কি-যেন-পেয়ে-হারানর আক্ষেপে মন তার ভারাক্রান্ত হ'য়ে থাকে। অমিয়াদির আশ্রয় ত্যাগ না করলে যেন তার সেই না বোঝা দুঃখের শেষ হ'বে না। এ এক জ্বালা, কাকে বোঝাবে সে!

কিন্তু যাবে কোথায়? আবার সেই ফেলে-আসা আশ্রয়! উপযাচিকার মত নিজেকে সমর্পণ করবে? কে জানে অমল যদি তার জন্যে অপেক্ষা না করে থাকে—ঘরে বাইরে তার সম্বন্ধে কুৎসা রটনা করে থাকে—তাকে অবিশ্বাস করে থাকে। না না কাল যা সম্ভব ছিল আজ তা একান্ত অসম্ভব, অশোভন, অশ্লীল.

অমিয়াদির কথাই ঠিক এখন তাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। নতুন করে সব কিছু অর্জন করতে হবে—প্রেম, ভালবাসা, শান্তি-সুখ।

আর কিছুদিন ধৈর্য ধরে সব ভুলে যদি সে উপস্থিত কাজটা শিখে নেয় তা হ'লে—

সারা রাত ডিউটি, ভোরের দিকে ঘুম-চোখে বাড়ী ফিরে পোষাক পরিবর্তন করতে করতে চকিতে অনেক কথা নিভার মনে হয়। অনেকদিন পরে বহুপূর্বে-দেখা বিষয়বস্তুর স্বপ্নের মত—আগডম-বাগডম! একসঙ্গে রেণুকাকীমা—অমল—প্রকাশ—অমিয়াদি—মার্বেল রক্স—গৌরী—বর্তমান—ভূত—ভবিষ্যৎ। যত ক্লান্তি তত আবোল তাবোল চিন্তা।

স্নানের জন্যে চুলটা খুলে আয়নার কাছে এসে দাঁড়ালে—নিজেকে যেন নিভা চিনতে পারে না। এ কি মূর্তি হ'য়েছে তার! রঙ তার অনেক কালো হ'য়ে গেছে, শ্রীও অনেক মুছেছে, কণ্ঠাস্থিতে বক্ষস্থল শিথিল দেখাচ্ছে।

আয়নার কাছ থেকে সরে আসে নিভা। সভয়ে তার মনে হয়, তার আর কিছু নেই। যা ছিল সব উজাড় হ'য়ে গেছে, তার অজান্তে অসাবধানে লুট হ'য়ে গেছে! শঠ, প্রবঞ্চকের হাতে সে পড়েছিল। দলিত কুসুম ভ্রষ্ট হ'তে কতক্ষণ!

অবিন্যস্ত কেশভারে আঙুল চালাতে চালাতে মনে মনে নিভা কঠিন হ'য়ে ওঠে। আর নয়, এবার ভাল করে নার্সিং শিখে নিজের পথ করে নিতে হ'বে। নিজের কলঙ্কময় অতীতকে ভুলতে হ'বে!

আবার কিছুদিন মন দিয়ে ঝোঁকের মাথায় নিভা হাসপাতালের কাজকর্ম করতে লাগল, মন্ত্রের সাধন।

একে একে যখন সব মনে পড়ছে তখন এটাই বা না মনে পড়বে কেন! ভাল মন্দ বলে নিভা কিছু লুকবে না। হ্যাঁ, মনটাকে দৃঢ় করে তখন সবে সে শুরু করেছে—নার্সের পোষাক পরে গর্বিত পদ-ক্ষেপে আসা-যাওয়া করছে।

হঠাৎ কখন শীত ফুরিয়ে হাসপাতালের সামনে দেবদারু গাছ-গুলোর সব পাতা ঝরে গেছে। শুকনো পাতায় হাসপাতালের প্রবেশপথ আকীর্ণ। পশ্চিম-আকাশ রক্তবর্ণ।

দূর থেকে নিভা দেখেছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে নিয়েছিল। মনকে সংযত করেছিল। না, সুযোগ সম্বন্ধে আর তাব পবিচয় নয়। পরাশ্রিতা, পরভৃতা নিভা নয়। স্বাবলম্বী, স্বাধিকারিণী নিভারাণী! কড়া ইস্ত্রি করা মাথার স্কার্ফটা মুকুট-শোভিনী।

প্রকাশ কিন্তু চিনেছিল। যতই কঠিন হোক না কেন নিভার মুখের ব্যঞ্জনা। সম্বোধন সে-ই করলে, একি: আপনি! বড়াগিন্নী! তুমি?

ডাকামাত্র নিভার সমস্ত কাঠিন্য খসে পড়ে। যেন এই ডাকের সে অপেক্ষা করে আছে পশ্চিম থেকে পালিয়ে এসে। যেন এই যোগিনী বেশ প্রকাশকে খুঁজে বার করবার জন্যে।

নিভা অতি পরিচয়ের হাসি হাসলে। অনেককাল এমন মধুর হাসি সে হাসেনি। থমকে দাঁড়িয়ে বললে, আপনি এখানে? কি ব্যাপার?

প্রকাশ জিজ্ঞাসা করলে, এই হাসাতালে আছ? আচ্ছা ভুর দিয়েছো তো!

নিভা বললে, আপনারা কম কি! বাঁচলুম কি মরলুম কোন খোঁজ রেখেছেন কি। বিদেয় যখন হ'য়ে গেচি, তখন তার দরকার কি।

প্রকাশ কাঁচুমাচু হ'য়ে বললে, উপায় কিছু কি ছিল। ইচ্ছে থাকলেও মানুষ কি সব সময়—

নিভা বাধা দিয়ে বললে, থাক আর বলতে হবে না। বুঝেচি, কেন কতকগুলো মিথ্যে কথা বলবেন শুধু শুধু। বলুন এখন এখানে কেন?

অমন উচ্ছল মানুষটা মুহূর্তে যেন কত নির্জীব হ'য়ে যায়। প্রকাশ নিচু সুরে বলে, হয়তো মিথ্যে শোনাবে আজ তোমার কাছে। কিন্তু কই, সত্যি তো তুমি কিছু শোনাওনি এ পর্যন্ত। বুকটা কি শুধু তোমার।

ঠিক এ সময় এভাবে এ-প্রসঙ্গ উত্থাপন করা উচিত নয়। তা ছাড়া আর প্রয়োজনই বা কি। নিভা কাজের কথায় আসে: হাস-পাতালে কেউ এসেছেন নাকি আপনার?

প্রকাশও চেপে যায়। যত ঘনিষ্ট সম্বন্ধই থাক, একজন নার্সের সঙ্গে প্রকাশ্যে এভাবে দাঁড়িয়ে আলাপ করাটা বোধ হয় দৃষ্টিকটু। কথার ঘায়ে উভয়তঃ হাসি-অশ্রু-অভিমানেব অভিনয়টা প্রকট হ'তে পারে। তার নিজের চেয়ে তাতে নিভার ক্ষতিই বেশী। একে তো ঐ মার্কা তায়—

প্রকাশ বললে, গৌরী আছে।

ব্যগ্রকণ্ঠে নিভা জিজ্ঞেস করলে, কি হ'য়েচে?

প্রকাশ কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললে, মেটারনিটী ওয়ার্ডে ভর্তি করে দিয়েছি।

ও, আমি দেখবো'খন, নিভা গট্ গট্ করে সামনে এগিয়ে যায়।

প্রকাশ ঠিক বুঝতে পারে না নিভা হঠাৎ এভাবে আলাপের ছেদ টানলে কেন। আর একটু ধীরে সুস্থে বিদায় নিলে কি হ'তো।

পিছন থেকে প্রকাশ চেঁচিয়ে বললে, ওয়ার্ড নম্বর বি—বেড নং চুয়াম।

নিভা ততক্ষণে হাসপাতালের কম্পাউন্ড পেরিয়ে মেন বিল্ডিং-এর চত্বরে উঠে পড়েছে। দূর থেকে প্রকাশ দেখলে, নিভার মুখটা থম্ থমে, মাথার দুগ্ধ-শুভ্র রুমালটা ছোবলমারার পূর্বমুহূর্তে ভুজঙ্গিনীর ফলার মত স্থির অচঞ্চল।

প্রকাশ শিউরে ওঠে। নিভাকে আর বোঝা যায় না। কয়েক বছরে যেন অনেক দূরে সরে গেছে ও।

ঘণ্টা দুই পরে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে বোধহয় প্রকাশ ওরই কথা ভাবতে ভাবতে এসে বাস স্টপের কাছে সবে দাঁড়িয়েছে, পাশ থেকে সপ্রতিভ কণ্ঠে সম্বোধন শুনে চমকে ওঠে: কোন দিকে যাবেন আপনি?

চেয়ে দেখে নিভা মিষ্টি মিষ্টি হাসছে। একটু অবাক হয় বৈকি প্রকাশ, খানিক্ষণ আগে নিভার যে মূর্তি দেখেছে তার সঙ্গে এব কোন সামঞ্জস্য নেই। আশ্চর্য রহস্যময়ী।

প্রকাশ মুখে বললে, কেন, বাড়ী যাব—দক্ষিণ মুখো।

একটুখানি চুপ করে থেকে নিভা এদিক-ওদিক চেয়ে ললিত কণ্ঠে বললে, আমাকে সঙ্গে নেবেন? চলুন আপনার সঙ্গে যাই। রাস্তাব আবছা আলো-আঁধারে প্রকাশ চেয়ে দেখলে নিভাব চোখ দুটো বড় উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। [ক্রমশঃ

কবি নজরুল

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

সেই দিনই বহরমপুর জেলে এসেছি হুগলি জেল থেকে। ১৯২৩ কি ১৯২৪-এর বর্ষাকাল। দোতলায় একটা প্রকাণ্ড হলঘর। খাওয়াদাওয়ার পর শুয়েছি। দক্ষিণে বামে পাশাপাশি অনেকগুলি লোহার খাটপাতা। যাঁরা শুয়ে আছেন তাঁদের সঙ্গে আজ রাত্রে প্রথম পরিচয়। ঘুম আসে না। পিছনে যাঁদের ফেলে এসেছি তাঁদের মুখ মনে পড়ছে বার বার। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে রিম্‌ঝিম্ রিম্‌ঝিম্। খোলা জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। নিবিড় অন্ধকার। কিছু দেখা যায় না। সেই বন্দীশালার অন্ধকারের মধ্যে প্রথম শুনলাম নজরুলের গান। সেই গানের স্মৃতি আজও আমার মনের মধ্যে অম্লান হয়ে আছে।

আজি এ বরষা নিবিড় তিমির, ঝরঝর জল, জীর্ণ কুটীর,
বাদলের বায়ে, প্রদীপ নিবায়ে, জেগে বসে আছি একা রে।

মর্মস্পর্শী গানের ভাষা, মর্মস্পর্শী গানের সুর। একমাত্র গানেরই ক্ষমতা আছে প্রাণের অতি সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলিকে প্রকাশ করবার। সুর ঝরতে লাগলো ঝরণার মতো। অমৃতের ঝরণা। বিছানায় শুয়ে উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলাম দরদীকণ্ঠের আকুল-করা গান।

অতিথি অজানা, তব গীত-সুর লাগিতেছে কানে ভীষণ মধুর,
ভাবিতেছি মনে যাব তব সনে অচেনা অসীম আঁধারে।

অন্ধকার কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে সুরের ঢেউ লেগে। নজরুল ভারি সুন্দর গান গাইতে পারতেন। নারীকণ্ঠের পেলবতা ছিল না সেই গানে কিন্তু তার মধ্যে ছিল জীবন্ত প্রাণের প্রকাশ। নজরুল একবার গান গাইতে আরম্ভ করলে সাপ যেমন ক'রে সাপুড়িয়ার বাঁশি শোনে তেমনি ক'রে শ্রোতৃবৃন্দ তাঁর গান শুনতো অনন্যমনা হ'য়ে। আশ্চর্য ছিল সেই গানের আকর্ষণীশক্তি।

বেশ মনে পড়ে সেদিনের কথা যেদিন নজরুল কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ীতে প্রাদেশিক সম্মেলনে প্রথম গাইলেন 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার।' রাজবাড়ীর বিরাট পূজার দালান। হাজার হাজার নরনারী মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছেঃ.

কাণ্ডারী, তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর,
বাঙালীর খুনে লাল হোলো যেথা ক্লাইভের খঞ্জর ;
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে, হায়, ভারতের দিবাকর
উদিবে সে রবি আমাদেরই খুনে রাঙিয়া পুনর্বার।

নজরুলের জোরালো কণ্ঠ প্রাণবন্যায় সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। অনেক লোক আছে যাদের ব্যক্তিত্ব থেকে বিকীর্ণ হয় শান্তির একটা স্নিগ্ধ প্রবাহ। তাদের চোখের দৃষ্টিতে, তাদের চলা-ফেরায়, তাদের প্রত্যেকটি আচরণে যার প্রকাশ আমাদিগকে মুগ্ধ করে সে হ'চ্ছে একটি শান্ত ছন্দ। নজরুলের চলা-ফেরায়, কথাবার্তায়, কবিতায় এবং সঙ্গীতে প্রকাশ পেয়েছে শান্ত ছন্দ নয়, জীবনের ফেনিল উচ্ছ্বলতা। নজরুল বিকীর্ণ করেছে প্রাণের প্রাচুর্য। নজরুলের গানে জ্যান্ত মানুষের জীবন্ত অনুভূতির পরিচয়। নজরুলের কবিতায় দুরন্ত প্রাণের অভিব্যক্তি।

'কাণ্ডারী হুঁসিয়ার' যে-সময়ে লেখা 'আমরা ছাত্রদল'ও সেই সময়েই রচিত হয় 'আমরা ছাত্রদল' প্রথম গাওয়া হয় কৃষ্ণনগর টাউন হলে প্রাদেশিক সম্মেলনের প্রতিনিধিবর্গ ও ছাত্রদলের সামনে। গানের ভাষা ও গানের সুর সম্মেলনের বায়ুমণ্ডলে বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চারিত ক'রে দিয়েছিলো। 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার', 'আমরা ছাত্রদল' প্রভৃতি বিখ্যাত গানগুলি কবি রচনা করেছিলেন কৃষ্ণনগরে অবস্থানকালে। 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিস্‌নে আজি দোল', 'কে বিদেশী বন-উদাসী বাঁশের বাঁশি বাজাও বনে' ইত্যাদি গজল সঙ্গীতগুলিও কবি কৃষ্ণনগরের চাঁদসড়ক পল্লীতে রচনা করেন। গানগুলি এতই লোকপ্রিয় হ'য়েছিল যে কৃষ্ণনগরের গাড়োয়ানেরাও ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারতে মারতে গান ধরতোঃ "বাগিচায় বুলবুলি তুই...।"

একটা জিনিষ নজরুলের মধ্যে বরাবর লক্ষ্য করেছি সেটি হোলো পরম দুঃখের মধ্যেও কবির মুখের প্রসন্নতা কি বন্দীশালায়, কি রোগশয্যায়, কি কঠিন দারিদ্র্যে— কখনো দেখিনি কবিকে প্যাঁচার মতো গম্ভীর হ'য়ে

থাকতে। বহরমপুর জেলে শরৎ এসেছে। জেলখানার পাশ দিয়ে চলেছে ভাগীরথী। নজরুল গান ধরেছেনঃ

ঝরা মালতীর ফুলে
আসন বিছানো নিভৃত কুঞ্জে ভরা গঙ্গার কূলে,
ফিরিছে মরাল ডানা পাতিবারে তোমার চরণমূলে।

বহরমপুর জেল, শরৎকাল, গঙ্গা আর নজরুল সব একসঙ্গে মিশে অতীতের একটি অধ্যায়কে আমার অন্তরলোকে চিরমধুর ক'রে রেখেছে। তখন ভাদ্রমাস। গঙ্গা ছিল কূলে কূলে পরিপূর্ণ। নজরুলের যৌবনেও তখন ভরা গঙ্গার গতিবেগ।

পূজার সময়। বহরমপুর জেলের তদানীন্তন 'সুপার' বসন্ত ভৌমিক মহাশয় হারমোনিয়াম পাঠিয়ে দিলেন। হারমোনিয়াম পেয়ে নজরুলের কি আনন্দ। কবির কণ্ঠ থেকে গানের ফোয়ারা ছুটতে আরম্ভ হোলো। পূজার দিনগুলি গানের মধ্য দিয়ে নাচতে নাচতে চলে গেল। নজরুলের ভাণ্ডারের ঐশ্বর্য দেখে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের পর নজরুল-সঙ্গীতের ধারা ব'য়ে চলেছে। ইংরেজের জেলখানা সুরের ইন্দ্রলোকে রূপান্তরিত হ'য়ে গেল। গানের কি একটা আশ্চর্য মোহিনীশক্তি আছে জীবনের কঠিন রণরঙ্গভূমিতে আনন্দের স্বর্গলোক রচনা করবার। কারাগারের সাধারণ কয়েদীদের অবগুণ্ঠিত অস্তিত্বের একঘেয়েমি সুরের ছোঁয়ায় সরস হ'য়ে উঠলো। নজরুল গানের পর গান গেয়ে চলেছেন আর বারান্দায় শান্ত্রীর পাশে কয়েদী দাঁড়িয়ে চিত্রপুত্তলিকার মতো সেই গান শুনছে। কয়েদী ভুলে গেছে তার কর্তব্য; শান্ত্রীও ভুলেছে তার 'ডিউটি'। সুরের তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে যেখানে চ'লে গেছে তাদের মন সেখানে কর্তব্যের কোন বালাই নেই, আছে সঙ্গীতের রসলোকে বিচরণের অনির্বচনীয় অনুভূতি। নজরুলের কণ্ঠস্বরে সেদিন ছিলো যাদু, আমাদের দেহে মনে ছিলো যৌবন, শরতের আকাশে ছিলো সোনার রোদ্দুর, শহর থেকে বাতাসে ভেসে আসছিলো পূজামণ্ডপের ঢাকের শব্দ। জীবন নয়, যেন স্বপ্ন। নজরুলের সান্নিধ্যে সেবার স্বপ্নের মধ্যে কেটেছিল জেলখানায় পূজার দিনগুলি।

বহরমপুর জেলে একদিনের কথা বেশ মনে আছে। নজরুল সকাল থেকে একটা কবিতা লিখতে সুরু করেছেন। সকালের সূর্য গড়াতে গড়াতে কখন পশ্চিম আকাশে এসে পৌঁছালো। আমরা খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে জানালা দিয়ে দেখছি—নজরুল তখনও মাঠের মধ্যে বসে একমনে কবিতা লিখছে। কবিতা লেখা যখন শেষ হোলো তখন অপরাহ্ণ এসে পড়েছে। কবির তখনও স্নান খাওয়া কিছুই হয়নি। কবিতা লিখবার সময় নজরুলের স্নান খাওয়ার দিকে কোন খেয়ালই থাকতো না। সাধক যেন সাধনার মধ্যে ডুবে আছে। খাওয়ার ব্যাপারেও নজরুলকে কখনও ভোজনবিলাসী ব'লে মনে হয়নি। তাঁকে স্বল্পাহারী ব'লেই মনে হয়েছে।

রোগশয্যাতেও দেখেছি নজরুলের মধ্যে এই jubilation in living. কবি তখন কৃষ্ণনগরে নতুন এসেছেন। মাকে সঙ্গে নিয়ে গেছি তাঁর সঙ্গে পরিচয় করাতে। ঘরে ঢুকে দেখি কবি শয্যাশায়ী। গায়ে বেশ উত্তাপ আছে। কিন্তু জ্বরের মধ্যেও মাকে গান শোনাবার জন্য কবি উঠে বসলেন। নিজের থেকেই গান ধরলেনঃ 'চাষী, ধর কসে' লাঙ্গল।' দরদ দিয়ে গাওয়া সে গানের মর্মস্পর্শী সুর কানে আজও লেগে আছে।

'দারিদ্র্য' কবিতাটি নজরুল কৃষ্ণনগরে ব'সে লিখেছিলেন। কিন্তু আমার ভুলও হতে পারে। দারিদ্র্যের শরশয্যায় জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা না থাকলে এই রকমের কবিতা লেখা যায় না। কিন্তু দৈন্যের মধ্যেও কবির গান একটা দিনের জন্যও থামেনি। নিজের দৈন্য নিয়ে কখনও তাঁকে নালিশ করতে শুনিনি। বুলবুলি যখন ফুলশাখায় ব'সে দোল খাচ্ছে এবং চাঁদ ডুবে যাচ্ছে শাপ্‌লা-বনে তখন কবির হৃদয় এবং চোখ নিয়ে কখনও জীবনের এই সুষমাকে, সৌন্দর্যকে অস্বীকার করা যায়? নজরুল পৃথিবীর সৌন্দর্যসুধা আকণ্ঠ পান করেছেন। জীবনের রূপ-রস শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ তাঁর কবিচিত্তকে রেখেছিল বিভোর ক'রে। তাই দুঃখের কোলে ব'সেও গজল-গাওয়া কবি গানে গানে বাঙলার হৃদয়কে এমন মুগ্ধ ক'রে রেখেছিলেন। অল্প আঘাতে আটাশে ছেলের মতো ককিয়ে ওঠে যারা, বাস্তবের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে খুঁত খুঁত করা যাদের স্বভাব, কণ্ঠে যাদের জীবনের বিরুদ্ধে কেবলই নালিশের সুর তাদের বিষণ্ণতার মধ্যে যা' অত্যন্ত বেশী ক'রে প্রকট হয় তা' হচ্ছে চিত্তের আভিজাত্যের শোচনীয় অভাব। জীবনের যেমন একটা অমাবস্যার দিক আছে তেমনি আছে পূর্ণিমার দিক। আলো-ছায়ায় বিচিত্র এই জীবন। একথা ঠিক যে মানুষের কাছ থেকে নিষ্ঠুর আঘাত আসে, মৃত্যুর অন্ধকারের মধ্যে প্রিয়-জনেরা হারিয়ে যায়, দারিদ্র্যে অস্তিত্ব কণ্টকিত হয়ে ওঠে। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে কোকিল ডাকে এবং বনের আড়ালে ফুল ফোটে, বাতাস ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় এবং মৌমাছিদের গুঞ্জনধ্বনিতে বসন্তের কাননভূমি মুখরিত হয়। জীবনের এই সুষমা এবং সৌন্দর্য হৃদয়ের মধ্যে যদি

বাঁশি বাজাতে না পারে, চারিদিকের প্রাণের আহবানে প্রাণ যদি সাড়া দিতে অক্ষম হয় তবে বুঝতে হবে চিত্ত অসাড় হয়ে আছে এবং মন জৈবস্তরকে অতিক্রম ক'রে চৈতন্যের আলোয় ডানা মেলে উড়তে শেখেনি। বিষাদ যে নজরুলের কাছে ঘেঁসতে পারতো না—সে চারিদিকের প্রবহমান জীবন-ধারা থেকে স্পঞ্জের মতো অতি সহজে আনন্দরস শুষে নেবার ক্ষমতার জন্যে।

ঝিমিয়ে আসে ভোমরা পাখা,
যূথীর চোখে আবেশ মাখা—

এমন লাইন সেই কবির লেখনী থেকে বাহির হতে পারে যিনি প্রকৃতির অত্যন্ত খুঁটিনাটি ব্যাপারকেও অপরিসীম কৌতূহলের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করবার শক্তি রাখেন।

কেবল বাহির থেকে নজরুলকে দেখেছে যারা তারা তাঁকে ভাবতো সৌখীন এবং আরামপ্রিয়। আমি তাঁর মধ্যে দেখেছি চলমান বেদুইনকে। বহরমপুর জেলে থাকতে দেখতাম নজরুলের লেখাপড়ায় ক্লান্তি নেই। কৃষ্ণনগরে একদিন বিকালে দেখি নজরুল এক সভায় হুইটম্যানের একটী কবিতার অনুবাদ পড়তে চলেছেন। কবিতাটী Pioneers, O Pioneers! নজরুল তাঁর মনকে কোথাও শিকড় গাড়তে দেননি। পড়বার এবং জানবার কী দুরন্ত কৌতূহল তাঁর মধ্যে আমরা দেখেছি! হিন্দুর ধর্মশাস্ত্র এবং মুসলমানের ধর্মশাস্ত্র—উভয়ের উপরই তাঁর সমান অধিকার। সংস্কৃত, উর্দ্দু, আরবী, পারসিক এবং ইংরেজী সাহিত্য—সাহিত্যের প্রায় সকল মহলেই তাঁর চলাফেরা ছিল। ইস্কুল-পালানো নজরুলকে দস্তুরমতো তপস্যা করতে হয়েছে মনের মৌচাককে জ্ঞানের মধুতে ভরিয়ে তুলবার জন্য।

বর্ধমানের এক পল্লীগ্রামের কৃষক-পরিবারের সন্তান। গ্রাম তাঁকে ধরে রাখতে পারলো না। বাহির হলেন তিনি বৃহৎ বিশ্ব দেখবার জন্য। সংগীতের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল। শান্তিনিকেতনে যাতায়াত ক'রে ভাণ্ডার ভরিয়ে নিলেন রবীন্দ্রসংগীতের মণিমাণিক্যে। যুদ্ধের বাজনা বেজে উঠলো। নজরুল চলে গেলেন সমুদ্র পারে। শান্তিনিকেতনের শালবীথিকা আর আম্রকুঞ্জ থেকে মেসোপটেমিয়ার খর্জুরবনের ছায়ায় টাইগ্রীস নদীর ধারে। দেখলেন নানা দেশের মানুষ, সংগ্রহ করলেন জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা। দেশে ফিরে এলেন হাবিলদার হ'য়ে ইতিমধ্যে পূর্ববঙ্গের পল্লীজীবনের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রেছেন। নজরুলের জীবনের এই প্রচণ্ড গতিবেগ কোথাও তাঁকে আরামে বসে থাকতে দেয়নি। নিত্য নূতন গান লেখা এবং তাতে সুর সংযোগ করা যখন পেশা হ'য়ে উঠলো তখনও দেখলাম সুর নিয়ে তপস্যা করছেন। এদেশের রাগরাগিণীর সঙ্গে সমুদ্রপারের বিদেশীসুরের মিশেল দিয়ে ভারতীয় সংগীতের মধ্যে তিনি আনতে চেয়েছেন নূতনতর একটা গতিবেগ। তাঁর ভক্তিমূলক সংগীতগুলি শুনলে মনে হয় রামপ্রসাদ নতুন ক'রে জন্ম নিয়েছেন। কতরকমের বিচিত্র অনুভূতির আস্বাদন পেয়েছে তাঁর কবিপ্রাণ। গানে গানে সেই অনুভূতির বৈচিত্র্যের অভিব্যক্তি।

নজরুল ইস্‌লামের অভ্যুদয় বাংলার সাহিত্যের ও সংগীতের রাজ্যে নিশ্চয়ই একটী গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। এই একজন প্রতিভাবান কবি যাঁকে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তাঁর ছায়ায় পর্যবসিত করতে পারেনি। নজরুল কারও প্রতিধ্বনি নন। ধার-করা আলোয় যাঁরা দেদীপ্যমান তাঁদের দলে নজরুলকে ফেলা চলে না। কাজী নজরুল ইসলামের প্রতিভার স্বকীয়তা তাঁকে অমর করে রাখবে।

চোরাবালি

শচীন ভৌমিক

না, গোকুল আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, পাস তার চাই-ই।

অসম্ভব। রোজ রোজ পাখির অমন মুখনাড়া সহ্য করা যায় না। ঃ পাস না, ছাই পাও তুমি। শুধু কথার বাহাদুর, কথায় হাতিঘোড়া মারা, কাজের বেলায় সব জারিজুরি ঠাণ্ডা! আহা, কতো লম্বাই চওড়াই কথা—'পাস পাই আমি, আমার কোলকাতার সব সিনেমা ফ্রি'—। তোমাদের চিনতে আর আমার বাকী নেই। তোমরা সবাই মিথ্যুক, মিথ্যুক, মিথ্যুক, তিনসত্যি।

এরপর স্বভাবতই কার আর মেজাজ ঠিক থাকে? দোষটা গোকুলেরই। কি কুক্ষণে ও সদ্য পাড়াগাঁ থেকে আসা দেশোয়ালি রেফ্যুয়েজী মেয়েটির কাছে কোলকাতার কাপ্তেন ছেলে বলে চাল দিতে গিয়েছিল। অত বাহাদুরী কি না করলেই চলত না? মেয়েটার ওপর যতই দুর্বলতা থাক, সামান্য কম্পোজিটার হয়ে অমন বেফাঁস বাড়াবাড়ি করাটা কি ঠিক হয়েছে? মস্তো বড় সাঁতারুর বাহাদুরী নিতে গেলে এখন জাহাজডুবীর মুখে পালাবার পথ খুঁজলে চলবে কেন?

একেই বলে বিপত্তি। পাখির সামনে মুখ দেখানো এখন শক্ত হয়ে পড়েছে গোকুলের। অথচ সত্যিই তো, সাত বছর কোলকাতায় থেকেও সে দুটো সিনেমার পাস জোগাড় করতে পারবে না এ-ও আবার কেমন কথা! এ তার পারা উচিত। পাখির কাছে মান রাখার তাগিদেই শুধু নয়, কোলকাতার নাগরিকত্বের সম্মান হিসেবেও পারা উচিত তার।

আর মেয়ে বটে পাখি! মুখের কি সব চেটাং চেটাং কথা, যেন একবল্‌দি সংস্কৃত ম্যাটারের ফার্স্ট প্রুফ! মেয়েটাকে দেখলে পুরবী টাইপের মতো ছিপছিপে মনে হলে কি হবে, মুখ যখন খোলে, তখন একেবারে আটত্রিশ পয়েন্ট যুগান্তর।

গোকুল সত্যি বড় বিপাকে পড়েছে।

সহকর্মী সবাইকে ও শুধিয়েছে কারুর কোন পাস-পাওয়া লোকের সংগে জানাশোনা আছে কিনা। সবাই মাথা নেড়েছে। শুধু ক্ষেপে গিয়েছিলেন প্রেসের মালিক জনার্দন চক্রবর্তী। ঃ পাস পাওয়া লোক আবার চেনা থাকবে কিরে বোকা, আমি নিজেই তো একটা পাস পাওয়া লোক। তখনকার দিনের এন্ট্রান্স পাস, বুঝেছিস, আজকালকার ঐ চারটে পাসের বাবা, হ্যাঁ। তা তোর বাপু পাস-পাওয়া লোকের আবার—

—আজ্ঞে, ঐ পাস নয়, সিনেমার পাস।

ঃ অ্যাঁ, বায়োস্কোপের পাস! থেটার-বায়োস্কোপের আবার পাস কিরে গাধা। যা যা কাজ কর। খালি যত সব বাজে জিনিষ নিয়ে সময় নষ্ট। ফাঁকিটি চলবে না বাপু। নো ওয়ার্ক, নো পে, হুঁ হুঁ, বুঝেছ? এ বড় শক্ত ঠাঁই।

এরপর মুখটাকে শিলাশক্ত করে প্রুফে আঁচড় কাটতে গিয়ে কাগজটা ফুটো করে ফেললেন জনার্দন, আর থমথমে মুখ নিয়ে বর্জাইস করেক্‌সন করতে গিয়ে চিমটের ঝাঁকুনীতে একটা কম্পোজ লাইনই ভেঙ্গে ফেললে গোকুল।

কিন্তু পাস যে তার চাই-ই চাই। গত প্রায় সাতদিন সে দেখা করতে পারছে না পাখির সংগে। আর কতোদিন, কতোদিন ধৈর্য ধরে থাকবে সে? কতক্ষণ? কাজে মন বসে না গোকুলের; 'স্ত' তুলতে গিয়ে অন্যমনস্কভাবে 'স্থ' তুলে বসায়, 'স্ম' তুলতে গিয়ে 'র্ম' কম্পোজ করে চলে।

মাঝে মাঝে বামনও চাঁদ ছুঁতে পারে। অবিশ্যি পঙ্গুর গিরি লঙ্ঘনের মতো বিশ্বাসে ভর দিয়েই শুধু এ সৌভাগ্য লাভ হয় না, এর জন্যে চাঁদ-ছুঁই মই তুলে ধরতে হয় অন্য কোন ক্ষমতাবানদের কারুর।

সে মইএর নাগাল পেয়ে গেল গোকুল।

প্রেসের নতুন একটা কাজ সুরু করতে গিয়ে চমকে উঠল ও। একটা ছবিঘরের রজত জয়ন্তী বার্ষিকী'র স্মারক পত্র। বুকের রক্ত লাফিয়ে উঠল গোকুলের। কানের কাছে শোনা গেল পাখির প্রশংসমান মদিরমধুর কণ্ঠস্বর—'সত্যি গোকুলদা, পাস!' আর চোখের সামনে সর্‌সর্‌ সরে গেল যেন একখানা ভেলভেটের ঝলমলে স্ক্রিন!

আঃ, আবেশবিহ্বল চোখদুটো খুলেই গোকুল ঠোঁটের ওপর দাঁতের প্রতিজ্ঞা রাখে, এ সুযোগ ছাড়া চলবে না, শেষ পর্যন্ত একবার চেষ্টা করে দেখতেই হবে।

মন দিয়ে কাজ করে গোকুল, প্রাণ ঢেলে খাটে। বিশেষ তৎপরতা চাই, কেননা রাতারাতি কাজটা করে দিতে হবে, অত্যন্ত জরুরী অথচ রীতিমতো জটীল কাজ।

কই কদ্দুর হলো?—'ছায়ামন্দির'-এর ম্যানেজার অতুল শ্যাম তদারকীতে উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বরে শুধোলেন,—দেখি বাবা, লে-আউট-টা যেন ঠিক ঠিক হয়, ভাঙ্গাটাঙ্গা রুল দিও না যেন, আমার হলের প্রেস্টিজ নির্ভর করছে এর ওপর। আর

যেটুকু হয়েছে দেখছি, বাকী সব কখন হবে? কাল ফার্স্ট আওয়ারেই যে ছাপতে হবে। সেরেছে, কাল না হলে,... তোমরা আমায় মারবে নাকি?—

—ভাববেন না,—রাজকীয় নিশ্চিন্তনির্লিপ্ত কণ্ঠে অভয় জানায় গোকুল,—যতো রাত হোক, আমি এর শেষ না করে আর উঠছি না। আপনি শুধু ঝটপট আমায় প্রুফটা দেখে ছেড়ে দেবেন তা'হলেই হবে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দেবো। বেশ বাবা, কাজটা করে দাও তো, এর সবকিছুই তোমাদের হাতে, তোমরাই রক্ষে করতে পারো এ-যাত্রা। আর শোন,—একটু ঘুষ-চাপা স্বরে বললেন অতুলবাবু, কাজটা তুমি খেটেখুটে তৈরী করে দাও, আমি তোমাকে, ইয়ে, একটা ভালো সিনেমা দেখিয়ে দেবো বিনিপয়সায়। শরৎচন্দ্রের 'দত্তা' আস্‌ছে, ভালো বই, দেখবে? তাই দেখাবো তোমাকে। এখন এর কম্পোজটা ঝট্‌ঝট্ শেষ করে দাও দিকি।

পাস দেবেন?—গোকুলের হাত থেমে যায় তৎক্ষণাৎ। ও ভেবেছিল কি ভাবে আবেদনটা জানাতে হবে, কতটা দাস্য ভাব ফুটিয়ে হাসতে হবে এ-গুলো ভালোকরে রপ্ত করে তবে আর্জিটা পেশ করবে অতুলবাবুর কাছে। কিন্তু এ কি? মেঘ না চাইতেই জল। মাঘ না কাটতেই বসন্ত! অবাক কান্ড। একেই বলে বরাতের জোর।

গোকুল বিগলিত হয়,—একটা নয়, দু'টো পাস দেবেন অতুলবাবু? দুটো!

—বেশ তাই দেবো। এখন তুমি কাজটা—

—এই দেখুন না কি আমি করছি। ভাববেন না, কাল এ বই আপনার আমি বের করে দিলেই তো হল? দেখবেন, গোকুল চক্রবর্তীর কথাটা একবার দেখবেন। পচা, এই গ্যালিটাব প্রুফটা তুলে দে অতুলবাবুকে। বাস্, দু'টো 'স্প' দে তোর কেস থেকে। আপনি প্রুফটা দেখতে থাকুন, আমি দিচ্ছি ফের নতুন প্রুফ।

পক্ষীরাজের পাখা গজিয়েছে যেন গোকুলের হাতে। আঙুলগুলো টগবগে খুড়ের মতো শব্দমাঠের মাটি কাঁপায়। পাখার ব্লেড কি এর চেয়েও জোরে চলে? বা পাখির ঠোঁট?

আশ্চর্য, অন্যদিন হলে মেজাজ বিগড়ে যেত গোকুলের। শেষরাতে বাড়ি ফিরে ঘুমোতে না ঘুমোতেই ভোর সকালে মা ঝগড়া সুরু করেছেন তারস্বরে। প্রতিপক্ষ অদৃষ্ট। ছোট ভাইবোনগুলো ক্ষিধের কথা জানাতে গিয়ে মার খেয়ে কান্নার অর্কেস্ট্রায় মাৎ করছে সারা বাড়ি। মা'র চিৎকার, ওদের কান্না, কলতলায় ঝগড়া সব মিলিয়ে একটা তিক্ত বিশৃঙ্খলায় কাঁচা ঘুম ভাঙা গোকুলের মেজাজ তিরিক্ষি হওয়ারই কথা। অন্যদিন হয়েওছে। কিন্তু আজ ও আশ্চর্য নির্বিকার। যেন প্রিয় কোন নেশার আমেজে এখনও আচ্ছন্ন ও খোয়াড়ি ভাঙেনি, বুঝি ভাঙাতে রাজিও নয়।

ও জানে এ সমস্ত অশান্তির মূলে অনটন। ডাইনে আনতে বাঁয়ে না কুলোলে ও আর কি করতে পারে। রক্ত-জল খেটেও যদি না হয় তবে সে পরিখা আর পার হওয়ার উপায় নেই। কণ্ঠস্বরের উচ্চতা সে আকাশচুম্বী অনটনকে এতে-টুকু টলাতে পারবে না। তার চেয়ে অথৈ নীরবতা ঢের ভালো। ঢের ভালো মুখ বুজে পড়ে থাকা। অন্ততঃ গলাবাজির পরিশ্রমের ক্ষুধানুভূতিটুকু হবে না, সেটুকুও কম বাঁচোয়া নয়।

তাই সাধারণত বাড়ি জুড়ে যখন হট্টমালার মহড়া চলে তখন গোকুলের মুখচোখে একটা স্বর্গীয় বৈরাগ্য লেখা থাকে। নেহাৎ যখন আর সহ্য করতে পারে না তখনই শুধু মেজাজ বিগড়োয়। কিন্তু আজ কি হল গোকুলের?

আজকের চিৎকার ওর মেজাজের পক্ষে যথেষ্ট কড়াপাক। এতদূর ও তো কোনদিন হজম করে না।

অতুলবাবু কাজ পেয়ে খুসী হয়ে বলেছেন শনিবার ওর সংগে যেন দেখা করে গোকুল, ওকে দু'খানা সোমবারের পাস দেবেন 'দত্তা'র। ফার্স্ট ক্লাসের পাস।

ফার্স্ট ক্লাস! —আশ্চর্য, তেল্‌চিটে তোষকটাকেই ওর মনে হচ্ছে 'ছায়ামন্দির'-এর নরমকুশন গদি, আর পিঠের কাছে আলতো লেগে-থাকা ছোটভাইর বালিসটা খুসীবাসন্তী পাখির নরম হাতের ছোঁয়া।

অনেকক্ষণ সে অনুভূতিটা চোখ বুজে জারিয়ে জারিয়ে অনুভব করলে গোকুল। তারপর ঘড়ির কাটায় ওঠবার তাগিদ পেয়ে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো। প্রেস ডাকছে, ডাকছে জীবিকা। কালো কালো সার-সার অক্ষর পোকারা ম্যাজিকের মতো যেন নেচে বেড়াচ্ছে চোখের সামনে।

—মা, ভাত! (এটা নেই, সেটা-নেই'র সঙ্গত)

—কলতলা। ঝগড়া। আঁচানো।

—কালো কোট। চুল পাট। ছুট।

—সেকেন্ড ক্লাস ট্রাম। বিড়ি। কালীঘাট। জোড়হাত। গোদাবরী প্রিন্টিং ওয়ার্কস আর কতদূর?...

শনিবার এলো শেষ অব্দি। এ আসা যেন দিনসৈনিক-বাহিনীর ষষ্ঠপুরুষের মতো পাঁচজনের পেছু পেছু পায়ে পা মিলিয়ে আসা নয়। এ যেন সম্রাজ্ঞীর আগমন, মহারাণীর আবির্ভাব। অন্তত গোকুলের কাছে এর আলাদা মর্যাদা, দুর্লভ ব্যতিক্রম।

কখন ও পাস পেয়েছে, কখন ও ধুকপুক বুকের ওপর চোরা পকেটে লাল রঙের চিরকুট দু'টোকে রেখে আশি নম্বর বাস থেকে 'নেতাজী কলোনী'র পাশে নেমে সখের মাথায় একটা ক্যাভেন্ডারই ধরিয়ে চলে এসেছে পাখিদের বাড়ির প্রায় দরজার কাছাকাছি, কিছু খেয়াল নেই।

খেয়াল হল ঝাপ খুলে যখন হাসিমুখে খুসীর চোখ নাচিয়ে পাখি বলে উঠল,—ওমা, গোকুলদা যে। আমাদের মনে আছে এখনও, কি ভাগ্যি। তারপর হঠাৎ যে, রাস্তা ভুল করে বুঝি? না বিয়ের নেমন্তন্নের চিঠি দিতে এসেছো?

—আঃ পাখি,—মনে মনে মেয়েটার ঠোঁটের ওপর পকেটের জবাবটা অনুভব করে খুসী হয় গোকুল। বলে,—তুই বড্ড বাজে বকিস। মাসিমা কোথায়?—

—মাসিমা, ও মা! মা'র কাছেই এসেছো বুঝি, আমার কাছে নয়! তা বসো তবে, মা জল আনতে গেছে, ডেকে আনি আমি।—যাবার উদ্যোগ করে পাখি।

আর দেরী করে না গোকুল। খপ্ করে ওর একটা হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টানে চৌকির ওপর এনে ফেলে ওকে। তারপর ঝুকে বলে,—আজ এনেছি পাখি। সেই, সেই যে বলেছিলাম। —চোখ কৌতুকে পিটপিট করে গোকুলের। হাতের মুঠোয় পাখির হাতটা কি আশ্চর্য নরম! হাত ছাড়িয়ে নেয় না পাখি, শুধু বিস্মিত চোখে কথার রহস্য খোঁজে,—কি, কি এনেছ? এই গোকুলদা, বলো না কি এনেছো?

যা বলেছিলাম।—গম্ভীর হতে চায় গোকুল, তারপর 'আশা করি সর্বাঙ্গীন কুশল'-সুলভ নিস্পৃহ গলায় বললে, —সেই যে, সিনেমার পাস।

পাস?—বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে পাখি। যেন দৈববাণী শুনছে ও, চোখের সামনে বসে আছে কোন সব-পেয়েছির যাদুকর।—সত্যি বলছ গোকুলদা? যাঃ, খালি আমাকে চমকে দেয়া। ছাই পেয়েছো তুমি! পেয়েছো তো কই, বের করো, দেখি, কেমন পাস পেয়েছো তুমি। বোকা মেয়ে পাওনি আমাকে, না দেখে আমি তোমাকে বিশ্বাসই করব না। কি, বের করো—।

যেন কোন গুপ্তধনের নক্সা অমনি ভঙ্গুর-সতর্ক যত্নে পকেট থেকে পাস দু'টো বের করে হাতের ওপর ভাঁজ খুলে ধরল গোকুল।

সত্যি?—হাতের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল পাখি,—সত্যি গোকুলদা, কি বই, কোন ছবি? কোন হাউসে? কবে? —একসঙ্গে একগাদা প্রশ্ন করে হাঁপায় পাখি। গোকুলের ডান হাতের ওপর ওর সমস্ত নরম শরীরটার লঘুভার। সে পৌরুষ স্পর্শের এতটুকু চেতনা নেই পাখির। থাকলে অনেক আগেই গুছিয়ে বসত ও, স্বাভাবিক দূরত্বের কথাটুকু ভুলত না অন্তত।

—'দত্তা'। সোমবার। 'ছায়ামন্দির'-এ। কালীঘাটের কাছে নতুন হলটায়। কি সুন্দর বাড়িটা যে পাখি, কি বলব। লাল নীল রঙের আলো। নিওন বাতি। ঘুরে ঘুরে জ্বলছে আর নিবছে। এক্সিলেন্ট দেখায় রাত্তিরে। আর আমার ও হলে দেখে দেখে চোখ পচে গেছে। পাস পেয়ে পেয়ে কতো আর দেখা যায় বল্, আমি চাই না তবু হাতে গুঁজে দিয়ে যাবে। তোকে দেখাবো বলেছিলাম কিন্তু সময়ই পাই না দেখা করি ওদের সংগে। কাল দেখি আমার প্রেসে পাঠিয়ে দিয়েছে এ' দুটো পাস। এ নাকি খুব ভালো বই। আমার দেখতেই হবে। না হলে খুব দুঃখ পাবেন অতুলবাবু।

অতুলবাবু কে?—ভয় সমীহ আর শ্রদ্ধার আলো জ্বলে পাখির চোখে। কৌতূহলে আকণ্ঠ বিস্ময়।

—'ছায়ামন্দির'-এর মালিক।

—তাঁর সঙ্গে তোমার জানাশোনা?—গলা বুজে আসে পাখির। আত্মসমর্পণের করুণ স্পর্শ সে শ্রদ্ধাপ্লুত কণ্ঠে।

কোন জবাব দেয় না গোকুল। এ'রকম সাধারণ প্রশ্নে আবার জবাব কিসের। ও শুধু পাখির হাতটার ওপর মৃদু একটা চাপ দেয়।

—সোমবার তৈরী থাকিস আমি চারটে সাড়ে চারটের আসব। শো সুরু হবে ছ'টায়। এখন আমি চলি।

—বসো। যাবে'খন। মা আসুক, দেখা করো। তারপর চা বসাচ্ছি, চা খেয়ে যাবে। আমার কাছে এলে খালি যাই যাই করো তুমি, কেন আমাকে আর ভালো লাগে না বুঝি তোমার?

গোকুল এবারও কোন জবাব দিলো না। মুঠোর মধ্যে পাখির হাতটা টেনে নিয়ে চুড়ি থেকে অন্যমনস্কভাবে একটা সেফ্‌টিপিন খুলে নিল ও। তারপর ফের সেটাকে অন্য একটা চুড়িতে আটকে দিল।

সোমবার এলো রোববারের পিঠে চাবুক কষিয়ে। সকাল থেকে একটা ধোঁয়াটে কুয়াশার মুখোসে আকাশের মুখ পাঁশুটে। তবু কি অবাক, আজ যেন গোকুলের মনে হাজার বাতির দেওয়ালী, বুকে হাজার তারের ঝংকার।

উঁহু,—নির্বিকার তাচ্ছিল্যে বলল গোকুল—আজ আর ওভার-টাইম করবো না বাবু, আজ আমার বাড়িতে কাজ আছে। অবাক হয় জনার্দন। যে ছেলে যেচে ওভার-টাইম করে, জ্বর নিয়ে কাজে আসে পয়সা মার যাবার ভয়ে, তার

এত নিস্পৃহ ঔদাসিন্য। চসমা নাকের ডগা থেকে তুলে দিয়ে কোনাকুনি চোখে তাকায় জনার্দন,—তুই আজ থাকবি না?

—না। বলে আর অপেক্ষা করে না গোকুল। জামাটা গায়ে চড়ায় ও।

—তাই বলে এখন এই তিনটের সময়ই চলে যাবি নাকি? —বিস্ময় থই পায় না জনার্দনের।

—আজ্ঞে, আজ আমার একটু আগেই যেতে হবে। কাজ আছে। আমার ম্যাটারটা বাসুকে আমি বুঝিয়ে দিয়ে গেলাম। চলি। হাত দুটো কপাল বরাবর একবার উঁচু করে গোকুল তারপরই বেড়াল-নরম ক্যাম্বিসের জুতোর মৃদু শব্দ তুলে বেরিয়ে আসে বাইরে।

আঁ, একদিন হোক না একটু ব্যতিক্রম। জ্যামিতির বাইরে একবার পা দিলে এমন কিছু ক্ষতি হয়ে যাবে না। আকাশ-অতল তারা হওয়া না যাক, একদিন ফানুস হ'তে বাধা নেই।

বাড়ির কাছে এসেই রঙিন মনটা হোঁচট খেল গোকুলের। বাইরে থেকে একটা মিশ্রিত উচ্চকণ্ঠের কলরব শোনা যাচ্ছে। আর কারুর গলা চেনা যাক আর নাই যাক, মা'র গলাটা স্পষ্ট। উঃ, সারাদিন বাড়িটায় যেন শব্দাবলীর ঝড় বয়ে যায়!

ঘরে ঢুকে আর ব্যাপারটা বিশেষ হাল্কা মনে হয় না। প্রচুর ধার হয়ে যাওয়ায় ঘুটেওয়ালী আর মা'র ঝগড়া চলছে সপ্তমে। ভাইবোনগুলোর মধ্যে একজন কাঁদছে আর তিন-জন তুলো বের-হওয়া বালিস ছুঁড়ে ছুঁড়ে তাগ প্র্যাকটিস করছে।

দৃশ্য বটে। প্রচণ্ড এক ধমকে ছিঁচকাঁদুনে মেয়েটা চুপ করে গেল। স্তব্ধ হল বালিস-বাহিনীর খণ্ডযুদ্ধ। শুধু মা'র আক্রমণটা দিক পরিবর্তন করল। আজ তাঁকে সামান্য সাড়ে তের আনা পয়সার জন্য এ অপমান সহ্য করতে হয়, হায় ভগবান, তার ছেলে বেঁচে থাকতে, সামনে থাকতেই তার এই দুর্গতি। অদৃষ্টে এ'ও ছিল তার। 'আজ যদি তোর বাপ বেঁচে থাকতো'—ইত্যাদি। অবশেষে,—কান্না। আঃ চুপ করো, চুপ করো মা।—গোকুল পকেট হাতড়ায়। বেরুলো সর্বসমেত এক টাকা দশ আনা। তার থেকে অম্লানবদনে সাড়ে তেরো আনা দিয়ে ঘুটেওয়ালীকে বিদেয় করল ও। আজ হৃতঋণ হতে বাধা নেই। এত ঝামেলা, এত কুশ্রীতা অন্তত একদিনের জন্য অপসৃত হোক। আজ দিনটার পরিবেশ একটু নির্মল থাক, আজ চাই সুন্দর একটি শান্ত-কোমল সন্ধ্যা। আর, সন্ধ্যামালতীর মতোই পাখীর গভীর সান্নিধ্য।

কিছু পয়সা আরও থাকলে ভালো ছিল। কিন্তু, কোথায় পাবে পয়সা? জনার্দন চক্রবর্তী যতটুকু দেবার দিয়েছেন। আর এ ব্যাপারে সে হিংস্ররকমের কঠিন, আর এক পাই পয়সাও অগ্রীম দেবে না। সতীর্থদের মধ্যে যদের সামর্থ্য আছে, গোকুল তাঁদের কাছেও ধার করতে কসুর করেনি। সংসারের রাক্ষুসে খিদেয় সে-সব কবে নিঃশেষিত হয়ে গেছে।

আর পয়সা পাবার রাস্তা কি? কিন্তু থাক, থাক এ-সব চুলচেরা ভাবনা। মন থেকে সব নাই-নাই'র ধুলো ঝেড়ে ফেলে গোকুল। আজ আর না পাওয়া হিসেবের দিন নয়, আজ সব পেয়েছি'র স্বর্ণায় দিন। সযত্নে তিনদিন আগে কেচে রাখা জামা-কাপড় বের করে পরে নিল গোকুল। চুলটা রপ্ত করল। তারপর খালি হওয়া আতরের শিশিটায় খানিক জল ঢেলে সে সুগন্ধি জল মাখল জামায় রুমালে, ঘাড়ে, হাতের কর্কস তেলোতে।

তারপরই রাস্তা। ট্রাম। টালিগঞ্জ। আশি নম্বর বাস। নেতাজী কলোনী। পাখি।

দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে পথ চেয়ে বসেছিল পাখি। গোকুলকে দেখেই চোখেমুখে খুসীর রামধনু ফুটল। পর-মুহূর্তে জিভ কেটে এক দৌড়ে ঘরের ভেতর। কে জানে হঠাৎ এমন আগ্রহ দেখে গোকুলদা টিপ্পনী কেটে বসবেন কিনা। এ'ত কিসের বাপু, ভাবি তো আমার! লজ্জার ভাবনার কপালে কাঁটা দিয়ে হাওয়ায় ভেংচি কাটল পাখি।

—সকাল থেকেই বসে ছিলি নাকি আমার জন্যে?—আলপিন ফুটোতে আর ভুল হয় না গোকুলের।

—ইস্, তোমার জন্যে না আরো কিছু। বয়ের চেয়ে পথ চেয়ে বসে থাকা ছাড়া আর আমার যেন কাজ নেই কিছু, না? আমার ইচ্ছে হচ্ছিল তাই বসেছিলাম, ব্যাস্।

—তোদের এই ইচ্ছেগুলো ভারি ভালো লাগে আমার। —গোকুল হাসল,—নে, এখন তৈরী হয়ে নে শীগগির, তোদের তৈরী হওয়া তো, সাজতে সাজতেই এক যুগ—তারপর আচমকা গলাটা খাদে নামিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল ও,—আর যার জন্য সাজা সে তো এসেই গেছে, আর কার জন্যে সাজের বাহার বল্?

কি,—কৃত্রিম কোপে মুখটা সুঁচলো করে পাখি।—তাই নাকি? তোমার জন্য সাজা বুঝি! খালি খালি ফাজলামো না? এ'রকম করলে আমি যাবো না কিন্তু, বলে দিলাম।

—বেশ। এখন ঝটপট তৈরী হয়ে নে।

—দাঁড়াও, মা আসুক। আচ্ছা বসো, মাকে আমিই ডেকে আনছি এক্ষুণি।—এক দৌড়ে উধাও হয় পাখি। হাওয়ায় শুধু ওর ফেলে-যাওয়া স্নিগ্ধ সুরভি। এ সুরভি

ঘরের হাওয়ায় না মনের হাওয়ায়, ঠিক বুঝতে পারলো না গোকুল।

আশ্চর্য, অজস্র টাইপ, মা'র চিৎকার, বাচ্চা ভাইবোনদের কান্না, জনার্দন চক্রবর্তী, ঘুটেওয়ালি, কলতলা, ভিড় ট্রাম, পায়রা-খোপ বাসা, এ-সব ছাড়াও জীবন থাকে; আর কি অবাক, জীবনের একটা মানেও!

দেরী কম হল না মোটেই।

: চা খাও বাবা চা খেয়ে যাও—মা'র আপ্যায়ন। তারপর পাখী উনুনে আর মা দোকানে। চা। সাতসতেরো আলাপ। গোকুলের মা'র শরীর, অকল্যাণ্ডের মরিচাকা, দেশগাঁয়ের স্মৃতি, পাসপোর্ট। অবশেষে অদৃষ্ট। তারপর পাখির পোষাক পাল্টানো। সাধারণকে অসাধারণ করবার প্রয়াসে আরো কিছু সময়শিকার। 'এই হয়ে গেছে গোকুলদা'-বলে টিপের অভাব ঢাকতে কলমের উল্টোপিঠের কালির ফোঁটায় দশ মিনিট। 'আর একটু' বলে খালি 'হিমানী'র শিশিতে আঙুল ঘষতে পনেরো মিনিট।

আশি নম্বরের চাকা থামল টালিগঞ্জের গুমটীঘরের নাকের ডগায়। এইবার ট্রাম।

কে জানে কোন সাহসে গোকুল আজ ফার্স্ট ক্লাসেই উঠে বসল। আর লেডীজ সীটে বসতে না দিয়ে পাখিকে অবাক করে দিয়ে টেনে নিয়ে বসাল একবারে সামনের একটা সিটে। পাশাপাশি।

পকেটে হাতটা ঢুকিয়েই কেমন আঁৎকে উঠল গোকুল, অসহায়ের মতো একবার সারা পকেটে মুদ্রান্বেষী হাতটা সমস্তটুকু তলানি মুঠো করে তুলল। না, পাখি এখন নৈসর্গ্যবিলাসী। অতএব বাঁচোয়া। টুক টুক করে গুণে নিয়ে মনে মনে ক্ষুন্ন হল গোকুল। আহত পৌরুষ ওকে ভেতরে ভেতরে বারুদ জ্বালিয়ে ফেরে। বাড়ি পর্যন্ত পেঁৗছে দিয়ে বাঁচবে মোটে, মোটে পাঁচ পয়সা। বাসে যাবে চার। তারপর? তারপর টালিগঞ্জ থেকে পায়দল! দু'পয়সা বিড়ির সংগসুখ। ব্যাস তারপর পকেট গড়ের মাঠ। কাল, কাল কি হবে? প্রেসে যাবে কি করে সে? হেঁটে? আর বাজার? কে ধার দেবে তাকে, কে?...

সারা মুখে একটা তেতো অসহায় অক্ষমতার কাঠিন্য দেখা দেয় গোকুলের। কি দাম আছে এ জীবনের? এই নিষ্ঠুর জ্যামিতির গোলকধাঁধার মাছির মতো ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে মৃত্যু ঢের ভালো। একদিন, মাত্র একদিনের জন্যেও মনের মানুষকে নিয়ে ঘোরবার সামান্য সম্বলটুকুও যার জোটে না, ভগবান, কেন তাকে জন্ম দাও তুমি, কেন!...

—এই,—পাখী চাপা গলায় ডাকে।

সাড়া নেই গোকুলের।

—এই, অমন চুপ করে যে?—মুখে নয়, উৎসাহী লোভ-চোখের দৃষ্টি এড়িয়ে কনুইর খোঁচায় এ প্রশ্নটাই করল পাখি।

অ্যাঁ, কি বলছ,—চমকে মুখ ফেরালো গোকুল।

ওমা,—গোকুলের চমকে যাওয়া দেখে পাখিরই চমক লাগে,—আরও অনেক দূর নাকি তাই জিজ্ঞেস করছি।

মুখ বাড়িয়ে দেখে নিয়ে বলল গোকুল,—না আর এক মিনিট।

কিন্তু একি, সে গোমড়া মুখ করে আজকের সমস্ত আনন্দটাই যে মাটি করতে বসেছে। চুলোয় যাক পরের ভাবনা। কালের ব্যাপার কাল হবে। এখন ও সব-পেয়েছির বুড়ি ছুঁয়ে, কাল আবার সেই তো কানামাছি! আজকের মরূদ্যানে যেটুকু জিরোন যায় ততটুকুই লাভ, কাল আবার যেই সাহারা সেই সাহারা।

হেসে এবার বলে গোকুল,—কি পাখি, রাস্তায় অত কি দেখছিস, আমি তো পাশেই বসে। জড়ানো আর আঞ্চলিক ভাষার দৌলতে ট্রামের অন্যান্যদের যে মর্মার্থ গ্রহণ অসুবিধে হবে, তা জেনেই কথাটা বলেছে গোকুল।

অসভ্য,—পাখি কটাক্ষের তীরে লজ্জা ছুড়ল।

অন্ধকার ঘর, পর্দায় চলন্ত হাসি-কান্না-গান-এর মিছিল আর পাশে একটা ভালো লাগা মেয়ে। যার উষ্ণ সান্নিধ্য শুধু পাশাপাশি আসনেই থাকবে না, থাকবে চেয়ারের হাতলে, যে হাতটাকে নিজের মুঠোর মধ্যে ধরে রাখবে গোকুল, যার একআধটু নড়ায় চুড়ি বাজবে টুংটং, সাড়ি খসখস লাগবে বাহুমূলে, নিঃশ্বাসের আওয়াজ শোনা যাবে স্পষ্ট, আর এলানো খোপার চুল লাগবে গা'য়ে। আর যখন, যখন পাখি না বুঝতে পেরে ঝুঁকে তাকে জিজ্ঞেস করবে,—এটা কি হল গোকুলদা, এ ছেলেটা কে বা মেয়েটা কি বলল, তখন দু'টো অসংকোচ এগিয়ে-আসা মাথা কি একবারও লেগে যাবে না? গালে গালে, বা, বা—, এই রোক্‌গে। চল্‌ পাখি, এসে গেছি, আয়,—গোকুল তৎপর হয়।

"ছায়ামন্দির"। দরজার কাছে গিস গিস ভিড়।

তাতে কি, একটা বিজাতীয় অহংকার রক্তের নূপুরে সুর তোলে গোকুলের। আজ, আজ সে সম্রাট। আজ আর সে সামান্য কম্পোজিটর নয়, আজ সে ফার্স্ট ক্লাস বাবুদের সগোত্র। শুধু কি সম্বলে, চরিত্রেও। তাদের অনেকের মতো তারও মেয়েবন্ধু সংগে। সংগে পাখি। মনে হচ্ছে এ যেন সিনেমার পাস নয়, এ তার গোত্রান্তরের ছাড়পত্র। দীনজন থেকে মহাজনের সিঁড়ি, মজুর থেকে হুজুরে

উত্তরণ। অর্থ না থাক, পকেটে আজ তার পরমার্থ রয়েছে, দু'টো লাল কাগজের ময়ূরপংখী।

গেটের কাছে এসে গর্বোদ্ধত অবহেলায় পাস দু'টো তুলে দেয় টিকিট-ছেঁড়া লোকটার হাতে। পাখি ততক্ষণে লবীতে।

ঃ উঁহু, এ তো পাস শুধু। কাউন্টারে এ দু'টো দিয়ে টিকিট নিয়ে আসুন।

—টিকিট-ছেঁড়া লোকটা এবার পরবর্তী টিকিটে মন দেয়।

মানে?—হতভম্ব হয়ে যায় গোকুল।

ঃ কি আশ্চর্য, জানেন না কিছু? পাস দু'টো ওখানে কাউন্টারে গিয়ে জমা দিন। আর, অ্যামুজমেণ্ট ট্যাক্স লাগবে, কতোর পাস যেন, ফার্স্ট ক্লাস না, তা'হলে হল গিয়ে সাড়ে পনেরো আনা। হ্যাঁ ঐ সাড়ে পনেরো আনা আর পাসদু'টো দিলে ওরা দু'টো টিকিট দেবে আপনাকে। বুঝেছেন, যান। —তারপর পাখির দিকে তাকিয়ে লোকটা বলল,—আপনি এ পাশে এসে দাঁড়ান একটু, রাস্তা দিন। হ্যাঁ, দেখি আপনার টিকিট,—ভিড় থেকে একটা টিকিট ছিঁড়ে নেয় ভদ্রলোক,—সেকেণ্ড গেট, হ্যাঁ আপনার, ফার্স্ট গেট—।

বোকার মতো খানিকটা দাঁড়িয়ে থাকে গোকুল। তারপর প্রায় নিঃশেষিত কণ্ঠে বলল একবার,—পাসের ওপর আবার পয়সা লাগে নাকি?

ঃ কি আশ্চর্য, জানেন না, কোলকাতার বাইরের লোক নাকি? পাসের ওপর এমুজমেণ্ট ট্যাক্স নেয়া হয় খবর রাখেন না? আমরা তো নিই না, এটা গভর্নমেণ্টের পাওনা। এ আইন হয়েছে তো অনেকদিন।

ওঃ—, মুমূর্ষু পকেটে হাত দু'টো মুষ্টিবদ্ধ হয়ে যায় গোকুলের। একটা অসহায় আর্তিতে সারা মুখ ছাই-এর মতো সাদা হয়ে যায়।

—কি হল, কি হয়েছে গোকুলদা?—কিংকর্তব্যবিমূঢ় পাখি গোকুলের হাতে ধরে ঝাঁকুনী দেয়। সমস্ত ব্যাপারটাই ওর কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়।

কিন্তু এ কি, গোকুলের চোখের সামনে সব কাঁপছে কেন? পাখির মুখটা কেমন ঢেউ হয়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাচ্ছে। সমস্ত বাড়িটা কি কাঁপছে? চোখের পাতাদুটো এমন ভারি হল কি করে, হাঁটুর নীচে সমস্ত হাড়গুলো কি গুঁড়িয়ে গেছে?

যেমন হঠাৎ আরম্ভ হয়েছিল, তেমনি হঠাৎই ছবি সুরু হওয়ায় শেষ ঘণ্টিটা একসময় থেমে গেল। অন্ধ বোবা নিস্তব্ধতার মতোই একটা অক্ষম পৌরুষ দরজার এ-পাশে দাঁড়িয়ে রইল নিঃশব্দে।

পাখির চোখেও পলক নেই॥

★

ভগ্ন-তরী

শ্রীসুধীরকুমার সেনগুপ্ত

এক তরীতে চলছি ভেসে শুধু তুমি আমি
ঢেউ-এর তালে চলছে তরী, যাচ্ছে কখন থামি
চলছি ভেসে কোথায় মোরা, কোথায় নাই জানি
জল-পরীদের চপল হাসি, মৃদুল কানাকানি।

এক তরীতে তুমি আমি চলছি পাশাপাশি
আর কেহ নাই, তুমি আছ, আমি কেবল আছি।
পূর্ণিমা চাঁদ নীল আকাশে উঠল ধীরে হেসে
হাসি ছড়ায়, মেঘের মতন কালো তোমার কেশে।

উজান স্রোতে চলছে তরী ঢেউয়ের দোলায় নাচে
তোমার হাতটি আমার হাতে মুখটি বুকের কাছে,
পাখির-পালক-নরম-বুকের কাঁপন লাগে দেহে
'ভয়-করোনা সোনা মেয়ে'—বলেছিলাম স্নেহে।

তরী এসে ভিড়ল তীরে কেহ কোথাও নাই
চাঁদ পড়েছে ঘুমে ঢলে নীল আকাশের গায়।
শুক তারাটি জেগে আছে জ্বালিয়ে প্রদীপখানি
চলছি শুধু পাশাপাশি আমরা দুটি প্রাণী॥

মোদের চোখে ঘুম ছিল না নাইক বাণী মুখে
চাঁদের স্বপন মোদের চোখে ঢেউয়ের দোলা বুকে
পথ চলেছি একলা আমি নাইক তুমি সাথে,
ভাঙ্গা তরী উল্টে আছে নদীর কিনারাতে।

টি. এস. এলিয়টের জীবন-দর্শন

শ্রীসুনীল চন্দ্র বসু

সাহিত্য জগতের একটি 'টুকরো খবরে' প্রকাশ যে, আমাদেরই দেশের একজন শক্তিশালী নবীন কবি বিশ্বের প্রখ্যাতনামা আন্তর্জাতিক কবি টি, এস, এলিয়টের কাব্যের বাংলা অনুবাদ করছেন।

বাঙালীর সঙ্গে ইংরাজী কাব্যের অন্তরের এই ঘনিষ্ট পরিচয় আজকের নয়, উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক হতে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরীজ, শেলী, বায়রণ প্রমুখ কবিদের রচনার সঙ্গে আমাদের প্রপিতামহ ও পিতামহের পরিচয় ঘটেছে; সে দিনকার সুশিক্ষিত ইংরাজীনবীশ বাঙালীর মনপ্রাণ ভরে রাখত এঁদের কাব্য; তাঁরা সময় অসময় সেক্সপীয়রের পাশে পাশে আবৃত্তি করতেন উল্লিখিত কবিদের রচনা থেকে। তাই রবীন্দ্রনাথ একদা তাঁর 'জীবন স্মৃতি'তে লিখেছিলেন—'ইংরাজদের সঙ্গে একদিন আমাদের সকল সম্পর্ক ঘুচলেও বাঙালীর সঙ্গে ইংরাজী কাব্যের অন্তরের সম্বন্ধ কোন দিন ঘুচবে না।' কবিগুরুর সেই ভবিষ্যত-বাণী মিথ্যা হয়নি; আজও ইংরাজী কাব্য-সাহিত্য বাংলা কাব্য-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করছে। পাশ্চাত্য জগতের সজীব ভাব ও চিন্তাধারা বাঙালীর উর্বর মানস-ক্ষেত্রে উপ্ত হয়ে নবরূপ ধরণ করছে। বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ দাশ, সমর সেন, বিষ্ণু দে প্রমুখ খ্যাতনামা নবীন কবিদের অধিকাংশই এলিয়ট, অডেন, পাউণ্ড, স্পেণ্ডার প্রমুখ কবিদের কাছে অল্পবিস্তর ঋণী।

টি, এস, এলিয়ট জাত-ইংরাজ-কবি না হলেও তিনি কাব্য সমালোচনা ও কাব্য সৃষ্টির মাধ্যমে এই কথাই প্রমাণ করেছেন যে, কোন দেশের কাব্য-সাহিত্যের ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্য সেই জাতের একচেটে সম্পত্তি নয়; সেটা যে-কোনও দেশের কবি-সাহিত্যিকদের নিষ্ঠা, মনীষা ও কৃষ্টির উপরই নির্ভরশীল। ইংরাজী কাব্যের বিবর্তনের ঐতিহাসিক ধারা বা ইতিহাসের ধারা সম্পর্কে এলিয়টের জ্ঞানের গভীরতা যে-কোনও ইংরাজ-লেখক ও সাহিত্য-ইতিহাসকার অপেক্ষা যথেষ্ট অধিক; বরঞ্চ এদিক থেকে তিনি যে জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন তার অল্পবিস্তর পরিচয় পাওয়া যায় 'What is a classic?' 'Use of poetry and the use of criticise' প্রভৃতি ছোট বড় সমালোচনা পুস্তকে। অবশ্য একথা ঠিক নয় যে, কোনও দেশের কাব্য সাহিত্যের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা সম্পর্কে সুগভীর পরিচয় থাকাই কোনও লেখকের কাব্য সাধনার চরম পরিচয়; কাব্য-প্রতিভার ও কবিকর্ম্মের পরম পরিচয় হচ্ছে বিষয়ী ও বিষয় ঘটিত মানসিক প্রতিঘাত সংঘাতে যে আত্মসচেতনতা বিকাশ লাভ করে তাই-ই। এলিয়টের কাব্য সহজবোধ্য নয়; বহুমুখী জ্ঞানের জটিল সংমিশ্রণে যে মননধর্ম্ম সৃষ্টি হয়েছে তারই উপরে প্রতিষ্ঠিত আমাদের আলোচ্য কবির কাব্য। এই কারণে দেখা যায় যে, এলিয়টের কবিতা নিছক রসতত্ত্বের পথ ধরে চলে নি; তা' চলেছে জ্ঞান ও অধিবিদ্যার পথ ধরে। মহাকালের পটভূমিতে কালান্তরের পথ পরিক্রমণ করতে করতে এলিয়টের কাব্য হয়ে উঠেছে প্রখর আত্মসচেতনশীল। কিন্তু তাঁর এই আত্মসচেতনা সমাজ তথা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ নয়। এ সম্পর্কে 'New Bearings in English Poetry' গ্রন্থে F. R. Leavis বলেছেন—"That Mr. Eliot could be so decisive show, of course, that he was not mere individual in isolation: he had a more important kind of originality. He was more aware of the general plight than his contemporaries, and more articulate: he made himself the consciousness of his age and he did this more effectively in that he was a critic as well as poet." এলিয়টের কাব্যালোচনা প্রসঙ্গে এ কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, তার সমস্ত কবিতাই রচিত হয়েছে জীবন-সংগ্রামের গভীরতম প্রতিক্রিয়া থেকে। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কাল হতে সমগ্র মানব-জীবন যে ব্যর্থতা, যে হতাশ্বাস ও

যে নৈরাশ্যের মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করছে, সেই স্তূপীকৃত জীবন-স্পন্দনহীন সামগ্রিক জীবনের উপর ভিত্তি করেই তিনি রচনা করেছেন Waste Land (১৯২২), The Hallow men (১৯২৫) এবং Ash Wednesday (১৯৩০).

আজকের দিনে প্রায় প্রত্যেক উন্নত শ্রেণীর কবির রচনায় তাঁদের একটা জীবনাদর্শ আছে। এলিয়টের জীবন-দর্শন প্রধানতঃ এই তিনটি উপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত—(১) মানব জীবন অবিচ্ছিন্ন ছায়াচিত্রের অনুরূপ, যেখানে মানুষের ইচ্ছাশক্তি কোনও কাজ করে না, অর্থাৎ মানুষ তার নিজের 'ইচ্ছাশক্তি' দ্বারা চালিত হয়; (২) আমাদের বাহ্যগোচরীভূত কালের অতীত আরও একটী স্বতন্ত্র নিরবধি কাল আছে, এ শুধু তারাই অনুভব করতে পারে যারা মরে বেঁচে আছে অথবা যারা বেঁচেও মরে আছে (৩) সেই জাগতিক কাল সম্পর্কে মানব-চেতনা শুধু জানবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে; কিন্তু মানুষের অন্তরে বাহিরে এমনই একটা প্রতিবন্ধকতা আছে যে ক্ষেত্রে মানুষের অস্তিত্ব অক্ষম ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত। সেই গোচরীভূত কালের ব্যর্থ বন্ধন থেকে স্বাধীনতা লাভ করার নামই মুক্তি; এ বিষয়ে শ্রীঅমিয় চক্রবর্ত্তী তাঁর "Modern Tendencies in English Litarature"এ বলেছেন—"Salvation in Mr.Eliot's poetry whether coming as drowning, as rain, as world ending with a bang, a knock on the door or sudden self-giving of martyr, or resignation of official, invariably result the total disappearance of the whole process of humanity." উপরের উদ্ধৃতি থেকে আমরা এলিয়টের অবচেতন মনের আভাস পাই যেখানে তিনি নিরন্তর ধ্বংস কামনা করছেন বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থার। যেখানে এলিয়টের রাজনৈতিক আদর্শ চলেছে নৈরাজ্যবাদের পথ ধরে, সেখানে এলিয়টের শৈল্পিক আদর্শ হয়েছে সুর-রিয়ালিজিম অর্থাৎ এলিয়টের কবিধর্ম্ম শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্রে আত্মসমাহিত থেকেও নৈরাজ্য-সাধনা; এই প্রসঙ্গে এলিয়ট স্বয়ং বলেছেন যে—"Progress of an artist is a continual self-sacrifice, a continual extinction of personality"

টি. এস্. এলিয়ট

কবি এলিয়ট একাধারে ভাবুক ও চিন্তাশীল শিল্পী, তিনি যেটুকু লিখেছেন সেটুকু যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে মেপে ছকে লিখেছেন। এলিয়ট কাব্য-রচনা করেছেন অর্থ যোজনার দৃঢ় সন্নিবেশ বাদ দিয়ে শুধু মনের গতির পৌর্ব্বাপর্য্যায়ের উপর ভর করে—যেখানে তার ভাবের চলিত প্রবাহ আছে অব্যাহত; কিন্তু সে প্রবাহ শুধু ধরা পড়বে তাঁদেরই চোখে যাঁদের বুদ্ধি মার্জ্জিত, জ্ঞান আধুনিক, বর্ত্তমান জগতের সমস্ত সংস্কৃতির অধিকারী এবং যিনি বিভিন্ন ভাষায় অল্পবিস্তর সুপণ্ডিত। এলিয়টের কাব্য ভাবে, ভাষায়, আঙ্গিক গঠনে অতি আধুনিক হলেও এলিয়ট তাঁর কাব্যে পরিণামবাদকে এড়িয়ে যেতে পারেননি; সম্ভবতঃ এটা তাঁর কিশোর বয়সে ওমর খৈয়ামের রচনা অতি-পঠনের ফল; * তাই তিনি ক্ষণপ্রাণ অভিজ্ঞতাকে সম্মান দেননি, তাই তিনি মহাকালের অমোঘ

* I can recall clearly enough the moment when, at the age of fourteen or so, I happened to pick up a copy of Fitzerald's Omar which

বিধানের কাছে মাথা নত করেছেন। এখানে ওমর খৈয়ামের এই চতুষ্পদীর সঙ্গে কি এলিয়টের রচনার পদ-বিশেষের মিল নেই ?—

"T'is all a chequred board of Night and Day's
Where Destiny with Men for Pieces play's
Hither and thither moves, and mate and slays,
And one by one back in the closet Lay's"
(Rubaiyat of Omar khyayyam)

এলিয়ট

"Shape without form, shdde without colour,
Paralysed force, gesture without Motions"
(The Hollow Men)

অথবা

"Between the desire
And the spasim
Between potency
And the existence
Between the essence
And the descent
Falls the shadow"
"For Thine is the kingdom."
(The Hollow Men)

প্রখ্যাতনামা সমালোচক ম্যাথু আর্নল্ড কবিতাকে 'criticism of life' বলে উল্লেখ করেছেন ; তিনি এই প্রসঙ্গে আরও বলেছেন যে, "No other criticism will even attain any real authority or make any real way towards itslend,—the creating a current true and fresh ideas" এলিয়টের কাব্যালোচনা উপলক্ষে আর্নল্ডের এই অভিমত নানাদিক থেকেই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য কারণ তার প্রতিটি কবিতাকেই ব্যাপ্ত করে আছে তার সুগভীর জীবনালোচন, অধিকন্তু এলিয়ট তাঁর কাব্যে সংযোগ করতে পেরেছেন "current true and fresh ideas" ; এই প্রসঙ্গে এলিয়ট রচিত 'Waste Land' শীর্ষক খণ্ডকাব্যের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখকর। আমরা 'Waste Land' খণ্ডকাব্যটি একটু মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলে এই-ই দেখতে পাবো যে, সমালোচক এলিয়ট যেখানে আর্নল্ড কথিত moral lifeকে সন্তর্পণে পরিহার করেছেন বা অস্বীকার করেছেন সেইখানেই কিন্তু কবি এলিয়টের অবচেতন মন সেই Moralityকে পরিপূর্ণ গরিমায় স্থান দিয়েছেন waste lamdএ। একটু গভীর মনোনিবেশ সহকারে উল্লিখিত খণ্ডকাব্যটি পাঠ করলে স্পষ্টই অনুভব করব যে কবি এলিয়ট প্রাচ্যের বুদ্ধদেব ও প্রতীচ্যের সেন্ট অগাষ্টিনের নৈতিক কৃচ্ছ্রতা (asceticism)কে সসম্মানে স্বীকার করে নিয়েছেন তাঁর জীবনদর্শনে, Waste Landএর আলোচনা প্রসঙ্গে কোনও বিদেশী সমালোচক বলেছেন—"The collocation of this to representative of eastern and western asceticisim as the culmination of this part of the poem is not an accident"

Waste Land আজকের দিনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খণ্ডকাব্য ; তথাকথিত নৈতিক ও প্রাণস্পন্দনহীন সভ্যতার ক্রমবর্দ্ধনার সঙ্গে মানব-জীবন কি ভাবে উষর মরু-সদৃশ হয়ে উঠছে তারই ভয়ঙ্কর রূপ প্রকাশ পেয়েছে এলিয়টের Waste Land, The Hollow men ও Ash Wednesday কাব্যে।

এলিয়টের প্রতিটি কাব্যই প্রায় দুর্ব্বোধ্য, তার মধ্যে Waste Land কাব্যখানিই সমধিক উল্লেখযোগ্য। এই কাব্যটিকে বিশ্বমানবের জীবনেতিহাস বলা যেতে পারে। এখানে 'cantos' প্রণেতা এজ্রা পাউণ্ডের সঙ্গে এলিয়টের পার্থক্য হচ্ছে এই যে, cantosএ যেখানে ঐতিহাসিক পারম্পর্য্য রক্ষিত হয়নি, এলিয়ট সেখানে স্থান কাল ও ব্যক্তির সীমারেখা পাউণ্ডের মত মুছে নিয়ে শুধু ইতিহাসের পুনরাবৃত্তিকে স্বীকার করেছেন ; cantosএ কোনও নায়ক নেই, Waste Land কাব্যে কবি স্বয়ং নায়ক। প্রবন্ধে পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি—এলিয়ট 'পরিণামবাদী'। তাই তিনি ক্ষণ-প্রাণ অভিজ্ঞতাকে বার ক'রে নিতে স্বীকার করেন নি, তাই বলেছেন,—

---

was lying about, and the almost overwhelming introduction to a new world of feeling which this poem was occasion of given me. It was like a sudden conversion, the world appeared anew, painted with bright, delicious and painful colours."

(Use of Poetry And Use of Criticism—P 33)

"I am no prophet—aud here's on great matter,
I have seen the moment of my greatness flicker,
I have seen the eternal Footman hold my coat, and sniker
And in short "I was afraid."
(The Love Song of Prufrock)

এলিয়টীকাল চায়ের আসরেও চিরন্তন সমস্যা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়। তাই তাঁর কাব্যে স্থান কাল ব্যাপ্ত করে এমনি প্রশ্ন নিয়ে উপস্থিত হয়—

"End of the endless
Journey to no end
Conclusion of all
Is inconclusible"

প্রবন্ধ এইখানেই শেষ করব; তার পূর্ব্বে বলা আবশ্যক যে এলিয়ট Waste Land কাব্যে মৃত অতীত ও প্রায় মৃত বর্ত্তমান নিয়ে হৃদয়-পীড়াদায়ক ছবি এঁকেছেন—এ মৃত্যু হচ্ছে নৈতিক গৌরবের মৃত্যু। আধুনিক সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশই ঐতিহ্য ও নৈতিক বোধ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। মধ্যযুগীয় সমাজের ধর্ম্ম, সংস্কার আচার-ব্যবহারের মধ্যে যে মানবিক ঐক্য ছিল; সেই ঐক্যবোধ আজ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। অধিকন্তু যুদ্ধোত্তর কালে তথাকথিত বিজ্ঞানের ভিত্তিতে যে সংস্কারহীন সহরে জীবন ঝড় উঠছে তাই এলিয়টী-দর্শনে সামাজিক ও নৈতিক কারণ বলে উল্লিখত। আজ প্রায় রসহীন সভ্যতার স্তূপীকৃত উপাদান আজ আমাদের জীবন ভারাক্রান্ত করছে তাই A Song For Simonএ কবি গেয়েছেন—

"I am tired with my own life, and the lives those after me
I am dying in my own death, and death those after me.
Let thy servant depart,
Having seen this Salvation."

★

দুপুরের ডাক

শ্রীকৃতান্তনাথ বাগচী

এখন আকাশ মায়ানীল,
শীতের সোনালী রোদ কাঁপে ঝিলমিল
কাজল হ্রদের জলে;
ছায়াখানি ঘুমায়েছে ঘুঘুডাকা ঝাউবীথি তলে।
চন্দ্রমল্লিকার বুকে
প্রজাপতি সুখে
মেলে দিল পাখা
পরীস্বপ্ন আঁকা।
ঘাসের হঠাৎ ফুলে
মউমাছি কি শুধায় দূরান্তের নিমন্ত্রণ ভুলে।
এখন কোথাও কেহ নাই
ঝরিছে হলুদ পাতা পলাতক চপল হাওয়ায়।
অরণ্যের পাখী
সুরার বুদ্বুদসম প্রিয়নামে শুধু যায় ডাকি।
সবুজ পাতার দল
রবির প্রসন্ন মুখে চাহি তোলে নম্র কোলাহল।
নাই জরা, নাই মৃত্যু, নাই মিথ্যা ভয়
হিমের আঁচলে ঢাকা বসন্তের শিখা জ্যোতির্ম্ময়।
ওরা সব গেছে নানা কাজে,
তুমি আর আমি শুধু নিরালার স্বপ্নলোক মাঝে।
সুন্দরের শুভ্রবেদীমূলে
জ্বালিব প্রেমের দীপ মৃত্তিকার অশ্রুনদী কূলে।
তারপর বেলা হলে সারা
নিঙাড়ি প্রাণের ব্যথা আঁধারে রাঙাব সন্ধ্যাতারা।

ছন্দ

চার্লি চ্যাপলিন্ : অনুবাদ—আনন্দ দে

[ফিল্মের জগতে চার্লি চ্যাপ্‌লিনের নাম শ্রদ্ধার সংগে দুনিয়ার সকল দেশে উচ্চারিত হয়; ছায়াছবির ক্ষেত্রে তাঁর সর্ব্বমুখী প্রতিভা দেখে মনে হয়, তিনি যেন জন্মেছিলেন ছায়াছবির জন্যেই; ক্যামেরার মুখে বলা ছবি কাহিনী কী ভাবে চিন্তার বাহন হয়ে সকল মানুষকে স্পর্শ করেতে পারে, মাতিয়ে দিতে পারে চ্যাপ্‌লিন্ তা দেখিয়েছেন। চার্লি চ্যাপ্‌লিনকে তাই বলা হয় সিনেমার চার্লস্ ডিকেন্স। কিন্তু চার্লি চ্যাপ্‌লিন্ যে ছায়াছবি ছাড়াও গল্প-সাহিত্য রচনা করেছেন সে-খবর খুবই কম লোকের জানা। নিচের অনুদিত গল্পটি স্প্যানিশ গৃহযুদ্ধের সময়ে লেখা; এতে চার্লির স্বভাব বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট ধরা পড়েছে।—অনুবাদক]

ছোটো স্পেনীয় কারাপ্রাংগণের নিস্তব্ধতায় চিড় ধরিয়ে দিলো ভোরবেলাটা—এ ভোরটা যেন মৃত্যুর অগ্রদূত; এমন সময়ে তরুণ রাজভক্তটি দাঁড়িয়ে ছিলো ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে। প্রাথমিক কাজ-কর্ত্তব্য আগেই সারা হয়ে গেছে। সরকারী কর্ম্মচারীদের ছোট দলটি একপাশে সরে দাঁড়ালো নিধন কার্য্যটা দেখবার জন্য। এই মুহূর্ত্তটায় যেন বেদনাতুর নিস্তব্ধতার সমস্তটা দৃশ্য ভরে উঠলো।

গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত বিদ্রোহীরা আশা করেছিলো ষ্টাফ-অফিসার শাস্তি দেওয়া থেকে কিছুকালের জন্যে অব্যাহতি দেবেন। দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি তাঁদের উদ্দেশ্যের বিরোধী, কিন্তু স্পেনে সে বেশ জনপ্রিয়। সে একটি অদ্ভুত রসিক লোক, তার লেখা তার স্বদেশবাসীর হৃদয়ে প্রভূত আনন্দ দিয়েছে।

ফায়ারিং স্কোয়াডের হুকুমশাহী অফিসারটি তাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতো। গৃহযুদ্ধের আগে তারা সব ছিলো বন্ধু। একই সংগে তারা মাদ্রিদ্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিপ্লোমা নিয়েছে। রাজতন্ত্র ও চার্চ্চের ক্ষমতা উচ্ছেদের জন্য তারা একই সংগে লড়েছে। একই সংগে তারা এক মদের গ্লাসে চুমুক দিয়েছে, কাফেতে টেবিলের ধারে বসে একই সংগে রাত কাটিয়েছে, হেসেছে, রং-তামাসা করেছে, সমস্তগুলো সন্ধ্যে কাটিয়েছে দার্শনিক তত্ত্ব-টত্ত্বের আলোচনায়। কখনও সখনও তারা ঝগড়া করেছে বিভিন্ন ধরণের শাসক-সরকার নিয়ে। তখন তাদের বিরুদ্ধ মতামত বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল, কিন্তু শেষকালে সমগ্র স্পেনে তারা অশান্তি ও গোলমাল উদ্দীপিত করে তুল্‌লো। তার এই বন্ধুকে আজ ফায়ারিং স্কোয়াডের সাম্‌নে হাজির কর্‌লো তারাই।

কিন্তু অতীতের কথা স্মরণ করে কী লাভ? যুক্তি-তর্কেই বা কী লাভ? গৃহযুদ্ধের সুরু থেকে যুক্তিতর্কে কী লাভ হয়েছে? কারাপ্রাংগণের নিস্তব্ধতায় এইসব প্রশ্ন ভীষণভাবে ভির কর্‌তে লাগলো অফিসারটার মনে। না, অতীতকে একেবারে পরিষ্কার করে ঝেড়ে ফেল্‌তে হবে। এখন ধর্‌তে হবে কেবল ভবিষ্যৎটাকে। ভবিষ্যতে? সে-দুনিয়ায় ত' অনেক পুরোনো বন্ধুই থাক্‌বে না।

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরে এই বিশেষ সকালটিতে তারা সর্ব্বপ্রথম মিল্‌লো। কোনো কথাই বল্‌লো না তারা। কেবল একটু হাসির বিনিময় হলো কারাপ্রাংগণে প্রবেশের উদ্যোগের সময়ে।

সেই শোকাবহ সকাল কারা-প্রাচীরের গায়ে এঁকে দিয়েছিলো লাল আর রূপোলী আলোর রেখা। সব কিছুই শান্ত-নিস্তব্ধ; এই শান্তনিস্তব্ধতার ছন্দের তালের সংগে মিল রেখেছিলো প্রাংগণের নিস্তব্ধতা, সে ছন্দ হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনধ্বনির মতো শব্দ হীন ছন্দ-স্পন্দন। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে ফায়ারিং স্কোয়াডের প্রতি অফিসারটির আদেশের কণ্ঠস্বর কারাপ্রাচীরের গায়ে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো: "এ্যাটেন্‌সান্!"

এই আদেশের সংগে ছ'জন অধস্তন কর্ম্মচারী বন্দুক

বাগিয়ে ধরলো, শক্ত হয়ে উঠলো তারা। তাদের এই একতালে নড়া-চড়ার পরে এলো ক্ষণিক বিরতি, সেই ক্ষণিক বিরতির সময়টুকুতে দ্বিতীয় আদেশ দেওয়ার কথা।

কিন্তু সেই বিরাম-সময়ে কিছু একটা ঘটলো, কিছু ঘটলো যাতে ছন্দ গেলো কেটে। দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি কাশলো, গলাটা খাঁকরি দিলো। সেই বাধাটুকু ঘটনা-বলীর ক্রমপরিণতিটাকে উল্টে দিলো।

অফিসার বন্দীর দিকে ফিরে তাকালো। সে অপেক্ষা করছিলো বন্দীর কোনো কথা শুনবে বলে। কিন্তু কোনো শব্দই এলো না। আবার তাই সে তার লোকদের দিকে ফিরে তৈরী হতে লাগলো দ্বিতীয় আদেশ দেবে বলে। কিন্তু আকস্মিক একটা পরিবর্তন তার মন জুড়ে বসলো, একটা মানসিক স্মৃতিভ্রষ্টতা তার মাথাটাকে পরিণত করলে ফাঁকা জায়গায়। হতবুদ্ধি হয়ে সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো তার লোকগুলোর সামনে। কী ঘটছিলো? কারাপ্রাঙ্গণের দৃশ্যপরে কিছুই ঘটেনি। বস্তুগতভাবে সে বেশি কিছু আর দেখেনি, শুধু দেখলো, একটা লোক প্রাচীরের দিকে পিঠ ফিরিয়ে, অন্য ছ'জন লোকের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর এই ছ'জন লোক বোকা-সোকার মতো তাকিয়ে রয়েছে, টিক্-টিক্ শব্দ করা থেকে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়া ঘড়ির মতো। নড়ছে না কেউ। মানে হয় না কোনো কিছুর। একটা অস্বাভাবিক কিছু যেনো চলছে। দিবাস্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয় কিন্তু এ-সব, এবং অফিসারটির উচিত এর থেকে মুক্তি পাওয়া।

অস্পষ্টভাবে ক্রমে ক্রমে অফিসারটির হুঁস হলো। কতোক্ষণ সে এইভাবে ছিলো? ঘটেছিলো কী? ও হোঃ! সে একটা হুকুম জারী করেছে। আচ্ছা তাহলে পরের হুকুমটা কী হবে?

'এ্যাটেন্‌শান্' বলার পরে হলো 'সোল্‌ডার্ আর্‌মস্', তারপরে 'প্রেজেন্ট', তারপরে শেষকালে 'ফায়ার'। তার অবচেতন মনে এই সম্বন্ধে একটা অস্পষ্টতা এসে ছিলো। যে শব্দগুলো তাকে উচ্চারণ করতে হবে সেগুলোকে তার মনে হলো যেনো অনেক দূরে, অস্পষ্ট আর, তার নাগালের বাইরে।

হতবুদ্ধিতার মধ্যে সে চীৎকার করে বলে উঠলো অসংলগ্নভাবে, বলে উঠলো কতোকগুলো এলোমেলো কথার সমষ্টি যার কোন অর্থ হয় না। কিন্তু স্বস্তি পেলো সে যখন দেখলো তার লোকগুলো বন্দুক কাঁধে নিয়েছে। তাদের এই নড়ন্-চড়নের ছন্দ তার মস্তিষ্কের ছন্দকেও উজ্জীবিত করে তুললো। আবার সে আদেশ করলো। লোকগুলো নিজেদের সামনে বন্দুক খাড়া করে ধরলো।

কিন্তু তারপরের বিরতিটুকুর মধ্যে সে শুনতে পেলো কারা-প্রাংগণের ওপর দ্রুত পায়ের আওয়াজ। তখুনি বুঝতে পারলো অফিসার; ক্ষণিক বিরাম মাত্র। তখুনি সে সম্বিৎ ফিরে পেলো।

পাগলের মতো চীৎকার করে ফায়ারিং স্কোয়াডকে বললো সে, "থামো!"

ছ'জন বন্দুক উচিয়েছিলো। ছন্দের তালে ছ'জনকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিলো। ছ'জন তারা "থামো" চীৎকার শুনেই গুলি চালিয়ে দিলো।

তাজমহল

কল্যাণ কুমার দাশগুপ্ত

তাজমহলের কারুকার্য্যময় প্রধান গম্বুজ।
[বর্ত্তমানে ইহার ফাটলস্থানগুলিতে মেরামতকার্য্য চলিতেছে]

পৃথিবীর যে সকল স্থাপত্য-শিল্পের অনবদ্য নিদর্শন যুগে-যুগে মানুষের বিস্ময়ের উদ্রেক করে এসেছে, তাজমহল তাদের মধ্যে সন্দেহাতীতরূপে অন্যতম। কত চিত্রকর এর ছবি এঁকেছেন, কত কবি এর সৌন্দর্য নিয়ে লিখে গেছেন অপূর্ব্ব সুন্দর কবিতা ও গান! বেদনাই সকল শ্রেষ্ঠ কাব্য-গান-ললিতকলার জন্মদাতা, বেদনাতেই মানুষ খুঁজে পায় মানব-জীবনের নিহিতার্থ, বেদনাতেই মানুষের সার্থক-সুন্দর শিল্পানুভূতির রস-রূপায়ন। আর এই বেদনার রূপ-সায়রেই ফুটে আছে শাশ্বত প্রেমের শ্বেতপদ্ম—মোগল সম্রাট সাজাহানের তাজমহল।

প্রিয়তমা পত্নী মমতাজ (আসল নাম যাঁর আরজুমান্দ বানু বেগম)-এর স্মৃতি রক্ষার্থে সাজাহান এই অনিন্দ্যসুন্দর স্মৃতি-সৌধ নির্ম্মাণ করেন। কথিত আছে কন্যা দাহারারার প্রসব সময়ে মৃত্যু নিশ্চিত জেনে মমতাজ সাজাহানকে দুটি অনুরোধ রক্ষা করতে বলেন। তার মধ্যে একটি হলো এই : "আমার মৃত্যুর পরে তুমি আমার ওপর এমন একটি সমাধি-সৌধ তৈরী করে দেবে, জগতে যা'র আর দ্বিতীয় খুঁজে পাওয়া যাবে না।" বলা বাহুল্য, সাজাহান প্রিয়তমার শেষ অনুরোধ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন।

অবশ্য উপরি-উক্ত ঘটনাটি কিম্বদন্তীমাত্র। সমসাময়িক ঐতিহাসিক আবদুল হামিদ লাহোরি, যাঁর লেখা "পাদ শাহনামা," এ-বিষয়ে তিনি একেবারে নীরব। তিনি মমতাজের মৃত্যু-দৃশ্য এইভাবে বর্ণনা করেছেন : "যখন বেগম তাঁর মৃত্যু নিশ্চিত বলে জানলেন, তখন তিনি কন্যা জাহানারাকে দিয়ে সাজাহানকে ডেকে পাঠালেন। অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত চিত্তে তৎক্ষণাৎ সম্রাট এসে উপস্থিত হলেন প্রিয়তমার শয্যা-পার্শ্বে। অতঃপর মমতাজ সম্রাটের ওপর তাঁর মা এবং প্রিয় পুত্রকন্যাদের ভার অর্পণ করে শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন (৭ই জুন, ১৬৩১ খৃঃ)।" মমতাজ ঐ ধরণের কোন অনুরোধ সত্যিই যদি করতেন, তাহলে আবদুল হামিদ লাহোরি নিশ্চয়-ই তার উল্লেখ করতেন। এ থেকে মনে হয় যে মমতাজের অনুরোধ ব্যাপারটা কিম্বদন্তী মাত্র।

যাই হোক, মৃত্যুর পরে মমতাজের দেহ বুরহানপুর নগরের অপর পারে তাপ্তী নদীর তীরস্থ এক বাগানের মধ্যে সমাধিস্থ করা হয়। সেই বছরেরই পয়লা ডিসেম্বর তাঁর দেহ ওখান থেকে আগ্রায় যুবরাজ সুজার অধীনে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং বিশে ডিসেম্বর তারিখে আগ্রায় এসে পৌঁছোয়।

আগ্রার দক্ষিণে সুবিস্তীর্ণ এক ভূমিভাগ কেনা হলো সমাধিস্থানের জন্যে এবং প্রত্যেক প্রথিতযশা স্থাপত্যশিল্পই তাঁদের পরিকল্পিত সমাধি মন্দিরের নক্সা দিলেন সম্রাটকে। এদের মধ্যে একটি বেছে নিয়ে সম্রাট প্রথমে তার একটি কাঠের নমুনা তৈরী করালেন এবং তা' তাঁর পছন্দ

হওয়াতে সম্রাট তার পরের বছরই অর্থাৎ ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে সমাধি মন্দিরের কাজ সুরু করতে আদেশ দিলেন।

ওস্তাদ ঈশা খাঁ নামক জনৈক নিপুণ শিল্পীর ওপর এই সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণের ভার ছিল। তাঁর মাইনে ছিল মাসে হাজার টাকা। ফাদার মানরিক নামক স্পেনদেশীয় জনৈক পর্যটক যিনি ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে আগ্রায় এসেছিলেন, তিনি বলেছেন যে তাজমহলের পরিকল্পনা-দাতা প্রকৃতপক্ষে জনৈক ভিনিসীয় ইটালীয়ান, নাম জেরোনিমো ভেরোনিয়ো। সাজাহান এই সময় পৃথিবীর সেরা সেরা শিল্পী খুঁজছিলেন, কাজেই তিনি হয়ত ভেরোনিয়োর পরিকল্পনাই গ্রহণ করেছিলেন, বিশেষ করে ইতিপূর্ব্বে যখন তিনি অষ্টিন-দ্য-বোর্দো নামক জনৈক ফরাসী স্বর্ণকারকে ময়ূর সিংহাসন নির্ম্মাণের ভার দিয়েছিলেন বলা বাহুল্য। এই ফরাসী স্বর্ণকারই তাজের গম্বুজ তৈরী করেছিলেন এইরূপ অনেক ঐতিহাসিক বলে থাকেন। কিন্তু তাজের পরিকল্পনা-দাতা এবং নির্ম্মাণ-শিল্পী যে ভেরোনিয়ো নন তার বিপক্ষে দুটি যুক্তি আছে। প্রথমত, ফাদার মানরিকের আসার আগেই ভেরোনিয়ো লাহোরে মৃত্যুমুখে পতিত হন (২রা আগষ্ট, ১৬৪০ খৃঃ), কাজেই সংবাদটি সোজাসুজি ভেরোনিয়োর কাছ থেকে লাভ করা যাচ্ছে না। দ্বিতীয়ত, মানরিকের উক্তির আর কোন সমর্থন মেলে না অন্য কোন বৈদেশিক পর্যটকের কাছ থেকে। পিটার মাণ্ডি যিনি ব্যক্তিগতভাবে ভেরোনিয়োকে চিনতেন এবং তাঁকে আগ্রায় দেখেছিলেন, তিনি এ বিষয়ে একেবারে নীরব। সত্যি যদি ভেরোনিয়ো তাজমহলের নির্ম্মাণ-শিল্পী হতেন তাহলে মাণ্ডি নিশ্চয়ই একথা লিখে যেতেন। ট্যাভার্নিয়ার, যিনি তাজমহলের নির্ম্মাণ-কার্য্যের সময় এসেছিলেন, তিনিও তাজের কোন বৈদেশিক পরিকল্পন-দাতা এবং নির্ম্মাণ-শিল্পীর উল্লেখ করেন নি। বার্নিয়ার ও তদ্রূপ। তাজমহলের পরিকল্পনা-দাতা এবং নির্ম্মাণ-শিল্পী যে জনৈক ইটালীয়ান এ বিষয়ে তিনি একটি কথাও বলেন নি। তাজমহলের মত অমন একটা অতুলনীয় স্থাপত্য-কীর্ত্তির পরিকল্পনা-দাতা এবং নির্ম্মাণ-শিল্পী যদি কোন য়ুরোপীয়ান হতেন তা'হলে উপরি-উক্ত য়ুরোপীয়ান পর্যটকেরা নিশ্চয়ই তা' সগর্ব্বে উল্লেখ করতেন। পরন্তু থীনট নামক ফরাসী পর্যটক যিনি ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে তাজমহল পরিদর্শন করতে এসেছিলেন, তিনি বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়ে বলে গেছেন "This superb monument is sufficient to show that the Indians are not ignorant of architecture, and though the style may appear curious to Europeans, it is of good taste and one can only say that it is very fine." অর্থাৎ শুধু এই অপূর্ব্ব কীর্ত্তিস্তম্ভের দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে ভারতবাসীরা স্থাপত্যশিল্প সম্বন্ধে অজ্ঞ নন, এবং এটির নির্ম্মাণ-কৌশল য়ুরোপীয়দের কাছে অদ্ভুত ঠেকলেও, এ যে সুরুচি-শোভন এবং ভারী সুন্দর একথা বলা যায়।

তা' ছাড়া কোন ভারতীয় ঐতিহাসিক একবারও বলেন নি বা একবারও ইংগিত দেন নি যে তাজের পরিকল্পনা-দাতা এবং নির্ম্মাণ-শিল্পী জনৈক ইটালীয়ান। এমন কি কোন ইটালীয়ান শিল্পী যে পরিকল্পনা-নির্ম্মানে সাহায্য করেছিলেন, এ কথাটুকুও বলে যান নি। কাজেই তাজের পরিকল্পনা-দাতা বা নির্ম্মাণ-শিল্পী প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় বলে আমরা অনায়াসে গর্ব্ব অনুভব করতে পারি।

তাজমহল

যাই হোক, তাজমহলের নির্ম্মাণ-সময় এবং নির্ম্মাণ-ব্যয় নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। কথিত আছে, এর নির্ম্মাণ-কার্য্যে মোট তিন কোটি টাকা ব্যয় হয়েছিল এবং মোট বাইশ বৎসর সময় লেগেছিল। আবদুল হামিদ লাহোরি অবশ্য বলেছেন যে এর নির্ম্মাণ-কার্য্যে মোট পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছিল এবং বারো বৎসর সময় লেগেছিল। কিন্তু এ-কথা ঠিক নয়। লাহোরি সম্ভবত মূল গম্বুজটির কথা বলেছেন। তাজমহলের প্রবেশ-দ্বারস্থ উৎকীর্ণ লিপিতে যে তারিখটা লেখা আছে সেটা হলো ১০৫৭ হিজরী সন অর্থাৎ ইংরাজী ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দ। তার মানে তাজের নির্ম্মাণ-কার্য্যের সময় হলো ১৭ বছর কিন্তু বস্তুত পক্ষে সমস্ত কিছু শেষ করতে আরও দু'তিন বছর নিশ্চয়ই বেশি লেগেছিল অর্থাৎ প্রায় ২০-২১ বছর লেগেছিল। ট্যাভার্নিয়ার যিনি ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে ভারতে বেড়াতে এসেলিলেন তিনি তাজের নির্ম্মাণ-সময় বাইশ বৎসর বলে উল্লেখ করে গেছেন। তার এই মত অভ্রান্ত বলে মনে হয়।

তাজমহলের নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হলে সম্রাট সাজাহান তার সকল ব্যয় নির্ব্বাহার্থে আলাদা এক জমিদারীর ব্যবস্থা করে যান। এই জমিদারী থেকে বছরে এক লাখ টাকার মতো যে আয় হতো তার দ্বারাই এই সমাধি মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। ত্রিশটি গ্রাম নিয়ে এই জমিদারী গঠিত।

তাজমহলের নির্ম্মাণ-কৌশল কারুকার্য্য প্রভৃতি ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে তাতে য়ুরোপীয় প্রভাব অপেক্ষা পারস্ত-প্রভাবই অধিকতর সুপ্রকট। এর পরিকল্পনা নির্ম্মিতি কারুকাজ প্রভৃতি সব কিছুর মধ্যেই প্রাচ্য-শিল্পকলা স্পষ্টীকৃত। হুমায়ুন এবং ইতিমাদ-উদ্দৌলার-সমাধি গাত্রে যে ধরণের সুন্দর কারুকাজ রয়েছে এখানেও ঠিক সেই ধরণের কারুকাজ বর্ত্তমান এবং এই "ধরণ" বিশেষভাবে সন্দেহাতীত রূপে মুসলমান স্থাপত্য-শিল্পীর নিপুণ হাতের স্পর্শ-সুন্দর। তাজমহলের সমস্ত অলংকরণ এবং কারুকাজ বলতে গেলে ওস্তাদ ঈশা খাঁ এবং তাঁর পুত্র মহম্মদ শরীফের তত্ত্বাবধান এবং নির্দ্দেশেই হয়েছিল। কাজেই ভিন্সেন্ট স্মিথের মতো যে সকল ঐতিহাসিক বিশ্বাস করেন যে তাজমহল প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য প্রভাবের সমন্বয়ের ফলশ্রুতি তাঁরা ভ্রান্ত বই কিছু নন। এ-কথা হ্যাভেলের মতো প্রাজ্ঞ জনও স্বীকার করে গেছেন।

সংজ্ঞা-হারা ভাষাতীত অব্যক্ত-মধুর বিশেষ এক হৃদয়ানুভূতির নাম প্রেম, আর সেই প্রেম যে অনিন্দ্য-সুন্দর সমাধি-মন্দিরের শুভ্র-মর্ম্মরে চিরকালের জন্য প্রমূর্ত্ত হয়ে আছে, মানব-হৃদয়ের অনন্ত বিস্ময়ের চিরন্তন নির্জ্জন সাক্ষী-স্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে নীলতোয়া যমুনার একান্ত কিনারে, হৃদয়, মন এবং নয়ন দিয়ে তাকে না দেখলে কী তার সৌন্দর্য্য কখনো ভাষায় যথার্থ ব্যক্ত করা যায়?

অয়েল

আপ্‌টন সিন্‌ক্লেয়ার ★ অনুবাদক ঃ যতীশ বেদজ্ঞ

চতুর্থ অধ্যায়

(৩)

মরুভূমিটার এক কিনারেই হচ্ছে স্যান্‌এ্যালিডো উপত্যকা ; ওখানে যেতে হলে পার হতে হবে কোণ বরাবর। রৌদ্রতপ্ত বালি আর পাথর বিছানো প্রান্তরটার এখানে ওখানে ছড়ানো রয়েছে দুচারটে ধূলি-মলিন গাছপালা, আর তারই মাঝ দিয়ে ওদের গাড়ীটা এগিয়ে চলেছে দিব্যি সুন্দর বাঁধানো রাস্তাটা ধরে। কিন্তু কান পাতলে হয়তো বা এখনও এর চারপাশে শোনা যাবে সেই সব পূর্ববর্তিদের চাপা দীর্ঘ-শ্বাস যাদেরকে দিনের পর দিন এগিয়ে চলতে হতো হাঁটাপথ ধরে, ঠেলাগাড়ী না হয়তো খচ্চরের পিঠে চেপে, আর পথের দুধারে ফেলে যেতে হতো অজস্র কঙ্কালের সার। রাস্তাটার আশে পাশে কোথাও যেতে হলে আজও সবাইকে চলতে হয় হুঁশিয়ার হয়ে। তেলের অভাবে হামেশাই অনেক গাড়ী গিয়ে আটকে পড়ে ও-সব জায়গায় আর তা হলে তখন প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে আসাই হয়ে পড়ে দুষ্কর।

গভীর করে নলকূপ বসালে তবেই হয়তো কিছু জল মিলবে ; আর তারই পরে নির্ভর করে এখানে ওখানে গড়ে উঠেছে দুচারটা ফলের বাগান আর আলফালফার ক্ষেত। চলার পথের দুধারে প্রায়ই দেখা যায় মাটি যেন কেন হয়ে গেছে নুনের মতই সাদা; ড্যাড বলে আসলে ওগুলো নাকি সব ক্ষার, আর ওতেই নাকি দেশটা হয়ে উঠেছে একটা লোক ঠকাবার কল। পূবদেশের লোকেরা এসে প্রথমেই দেখে দিব্যি সুন্দর বাগানগুলো, আর যখন শোনে জমীর দাম হচ্ছে একর পিছু এক শ' ডলার তখন নেহাৎই সস্তা ভেবে যেটা পায় সেইটেই নেয় কিনে। তারপর আরও কিছু গাছ লাগিয়ে তাতে জল দিয়ে চলে দিনের পর দিন; কিন্তু যত জলই তারা ঢালুক না কেন গাছগুলো আর বড় হয় না; দুচারটে আলফালফা ছাড়া জন্মাবে না ওখানে আর কিছুই, আর ক্ষার যদি খুব বেশী থাকে তবে তো তাও না। অগত্যা হবু জমিদারকে নিশ্চিহ্ন করে তুলে ফেলতে হবে তার সেই সব গাছ-পালা আর দালাল লাগাতে হবে তারই মত আর এক বেকুবের সন্ধানে।

বান্নী বসেছে ওদের গাড়ীটার ডান পাশের একটা সিটে যেদিকটার পাদানিটার সাথে আটকানো রয়েছে ওয়াটার প্রুফ কাপড়ে মোড়া বড় একটা বান্ডিল। হ্যাঁ, ওরা বেরিয়েছে শিকারে; ভাবতেই বান্নীর মনে পড়ে যায় হাজার হাজার বছর পূর্বের অসভ্য মানুষ আর তাদের সেদিনকার উত্তেজনাময় বিপদসংকুল জীবনযাত্রার কথা। দু'হাতে ওর রয়েছে দুটো হাওয়াই বন্দুক, আর অনেকক্ষণ থেকেই ও সেদুটোকে ধরে রয়েছে অমনি করে, খানিকটা ভাল লাগছে বলে আর খানিকটা ধরে থাকতে হবে বলেও বটে; কারণ, খুলে বাক্‌সে পুরে রাখলে সেটা হবে "অস্ত্র লুকিয়ে রাখারই" সামিল, আইনের দিক দিয়ে যেটা কিনা হবে অপরাধ।

উপত্যকাটার মুখেই একটা কাঁচা রাস্তা, আর একজায়গায় একটা ফলকে লেখা রয়েছে "প্যারাডাইস এখান থেকে আট মাইল।" পাথরের স্তূপের মত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নানা রং আর আকারের পাহাড়গুলোর মধ্য দিয়ে এঁকে বেঁকে ওরা এগিয়ে চললো একটা সরু পথ ধরে। দু'ধারে ফলের বাগান, গাছগুলোর সব পাতাই গেছে এখন ঝরে, আর গুঁড়িগুলো হয়ে উঠেছে চুণের মত সাদা। চারাগুলোর চারদিকে জালের বেড়া, পাছে আবার খরগোস এসে মুড়িয়ে ফেলে সেগুলোকে। বর্ষার প্রথম আগমনের সাথে সাথে চারদিক ছেয়ে গেছে নতুন ঘাসে, আর একেই বলে ক্যালিফোর্ণিয়ার বসন্ত যা কিনা সুরু হয় বর্ষার সাথে।

সরু রাস্তাটা ক্রমশই এলো চওড়া হয়ে; পথের দুপাশে বিক্ষিপ্ত-ভাবে ছড়ানো রয়েছে খামারগুলো, তার পরই প্যারাডাইস গ্রামখানি একটি রাস্তা আর গুটিকয়েক দোকান নিয়ে বিশ্রাম করছে ইউক্যালি-প্টাসগুলোর বিকেলবেলাকার দীর্ঘ শীতল ছায়ার তলে। ড্যাডের গাড়ী এসে থামলো পেট্রল স্টেশনটার কাছে, আর সেটা নাকি খাবারের দোকানও বটে।

"ওয়াট্‌কিন্সদের খামারটা কোথায় হবে বলতে পারেন কি ?"

"এখানে তো ওয়াট্‌কিন্স আছে মোট দু'ঘর"—উত্তর করলো স্টেশনের লোকটা—"এক হচ্ছে বুড়ো এ্যাবেল ওয়াট্‌কিন্সর"—

"হ্যাঁ, হ্যাঁ ঐটেই আমরা খুঁজছি" বান্নী বলে উঠলো উৎসাহের সাথে।

"এগিয়ে গিয়ে পাহাড়ের ঢালুদিকটার পাশেই রয়েছে তার ছাগলের খাটালটা। খুঁজে বের করা অবশ্য খুব সোজা হবে না,—আপনারা কি আজই গিয়ে পেঁছিতে চান সেখানে ?"

ড্যাড জবাব দেয়, "পথ হারিয়ে ফেললেও খুব কিছু একটা দুর্ভাবনা নেই আমাদের, তাঁবু তো একটা সাথেই রয়েছে।"

এর পরে লোকটা ওদের বাৎলে দিল সেই জটিল পথটার সন্ধান। স্কুলবাড়ীটার পেছনের গলিটায় ঢুকে কিছুদূর এগোলেই দেখা যাবে সেখান থেকে বেরিয়ে গেছে গোটা ষোল পথ, তার মধ্য থেকে বেছে নিতে হবে ঠিকটা, যে নালাটা দিয়ে জল নেমে গেছে রোজভিল গ্রামের দিকে সেইটে ধরে এগিয়ে গেলেই পাওয়া যাবে বুড়ো টাকারের ভেড়ার খামার আর লঙ্কাগাছ ঘেরা কুঁড়েখানা, আর সেখান থেকে তিনটে ঝর্ণা পেরিয়ে গেলেই মিলবে বুড়ো এ্যাবেল ওয়াট্‌কিন্সের আস্তানা।

গাড়ীতে স্টার্ট দিয়ে ওরা এগোতে সুরু করলো আঁকাবাঁকা এক ভেড়া চরাবার পথ ধরে; আস্তে আস্তে অন্ধকার পাহাড়ের আড়ালে সূর্য গেল ডুবে আর তারই রং মেখে মেঘগুলো হয়ে উঠলো লাল। দুর্লংঘ পাথরগুলোর পাশ কাটিয়ে, ছোট ছোট খাঁড়িগুলোর মধ্য দিয়ে নেমে গিয়ে, আর তার পরই হয়তো আবার উপরে উঠে এসে ওদের গাড়ী এগিয়ে চললো সোজা সামনের দিকে, অনবরত গীয়ার বদলাতে বদলাতে। আশেপাশের পাহাড়গুলো মুখর হয়ে উঠেছে কোয়েল পাখীদের সমবেত কণ্ঠের মধুর কলকাকলিতে, এর পর আর ওদের কোন দরকারই হবে না তাদের সম্বন্ধে কারো কাছে কিছু খোঁজ করবার।

শেষ পর্যন্ত ওরা এসে পেঁাছলো সেই ঢালুটার কাছে, আসলে কিন্তু সেটা একটা কাঠের পুল যার নীচ দিয়ে বয়ে গিয়েছে জল। পুলটার অনেক জায়গাই গেছে ক্ষয়ে আর সেখানে গজিয়ে উঠেছে চকচকে সব সবুজ ঘাস। মস্ত এক পাল ভেড়া খুটে খুটে খাচ্ছে সেই ঘাস; গাড়ী কিম্বা হর্ণ দুয়ের কোনটাকেই তারা দিল না কোন আমোল, বেচারারা এমনি বোকা, হয়তো বা এগিয়ে এসে চাকার তলায়ই পড়বে ঢুকে! এমনি সময় কে একজন এগিয়ে এলো ঘোড়ায় চেপে; দিব্যি বড় সড় আর বাদামী রংয়ের সুন্দর চেহারাটা, গলায় জড়ানো রয়েছে রকমারি রংয়ের একখানা রুমাল, আর চওড়া কিনার দেওয়া টুপীটা থেকে চিবুকের তলায় ঝুলছে একটা চামড়ার ফিতে। ঘোড়ার জিন আর পাদানির রেকাবে ক্যাঁচ্‌-কোঁচ্‌ শব্দ তুলে সে ফিরে চলেছে মস্ত এক পাল গরুমোষ চরিয়ে। সন্ধ্যার শান্তিময় পরিবেশে সে শব্দ কেমন যেন এক রোমাঞ্চ জাগায় বান্নীর মনে। ড্যাড্‌ থেমে যাবার সাথে সাথে লোকটিও গেল থেমে আর ড্যাডের "শুভ সন্ধ্যার" উত্তরে জানালো "সন্ধ্যা"। মুখে প্রীতিপূর্ণ সারল্য নিয়ে সে ওদের বলে দিল ওদের পথ। ঝর্ণাটা না চিনবার কোন সম্ভাবনাই ওদের নেই, কারণ সেইটেই হচ্ছে ও অঞ্চলের একমাত্র ঝর্ণা যেটায় কিনা এখনও রয়েছে জল। আর সেখান থেকে আর একটু এগিয়ে গেলেই পাওয়া যাবে ওয়ার্টকিন্সদের খামার বাড়ী। এগিয়ে যেতে যেতে খুসীর হাসি হেসে বান্নী বলে, "কি মজাটাই হতো, ড্যাড, আমরা এখানে থাকতে পারলে; দিব্যি বেড়িয়ে বেড়ানো যেত ওরকম একটা ঘোড়ায় চড়ে।" ও জানে কি করে কায়দা করতে হয় ড্যাডকে; ড্যাড ভালবাসে অমনি সব লোক, অমনি তাকাবার ভংগী, অমনি লম্বা চওড়া আর কষ্টসহিষ্ণু আর ইন্ডিয়ানদের মত অমনি বাদামী আর লালে মেশানো রং। হ্যাঁ, ড্যাডকে দিয়ে তার ছেলের জন্য ওয়ার্টকিন্সদের খামারটা কেনানো খুব কিছু একটা কঠিন হবে বলে তো আর মনে হচ্ছে না!

তা সে যাই হোক এখন তো ওরা হেলেদুলে চলেছে সেই ভেড়া চরাবার পথ দিয়ে, দুপাশের ঝর্ণা গুণতে গুণতে। সন্ধ্যার অন্ধকারে পাথরের দেয়ালগুলোকে মনে হচ্ছে খুবই উঁচু। গাড়ীটার আলো-গুলো দেওয়া হয়েছে জেলে আর সেগুলোকে এদিকে ওদিকে ফেলে ওরা ঠিক করে নিচ্ছে পথ। এমনি করে এগিয়ে যেতে যেতে ওরা এসে পেঁাছলো একটা ঝর্ণার কাছে, নীচের চকচকে সবুজ ঘাস থেকেই বোঝা যায় ওটাতে এখনও জল আছে। সেখান থেকে বাঁক ফিরে ওরা এগিয়ে চললো আরও বেশী উঁচুনীচু আর সরু একটা পথ ধরে। তারপর আর একটু এগিয়ে যেতেই ওরা দেখতে পেল কয়েকটা বাড়ী, আর তারই একটার জানালায় জ্বলছে একটা আলো। এই খামার বাড়ীটাতেই জন্ম হয়েছে পল ওয়ার্ট্‌কিন্সের আর এখানেই সে উঠেছে বড় হয়ে, ভাবতেই বান্নীর ভিতর দিয়ে বয়ে যায় কিসের যেন একটা শিহরণ, ওর মনে হয় ও যেন এসে গেছে এব্রাহাম লিংকলন কিম্বা ওরকমই কোন এক মহামানবের জন্মভূমিতে!

হঠাৎ ড্যাড বলে উঠলো, "শোন, খোকা, তেল এখানে পেলেও পাওয়া যেতে পারে, বলা তো যায় না কিছুই, অসম্ভবের মধ্যেও কত সময় লুকিয়ে থাকে সম্ভাবনা, কাজেই ও সম্বন্ধে কোন কথাই যেন আর তুমি বলো না। ইচ্ছে হলে পলের সাথে তোমার পরিচয়ের কথা ওদেরকে বলতে পার, কিন্তু সে যে তোমায় তেলের কথা কিছু বলেছে তা বলবার কোন দরকার নেই। ব্যবসা সম্বন্ধে কথাবার্তা আমিই যা হয় বলবো।"

বাড়ীটা ওদের ঠিক ক্যালিফোর্ণিয়ার অন্যান্য বাড়ীগুলোরই মত; তার মানে এক ফুট মাপের সব তক্তা পাশাপাশি সাজিয়ে তৈরী, মাঝে মাঝে আবার ফাটল ঢাকবার জন্য লাগানো হয়েছে ছোট ছোট অনেক কাঠের টুকরো। সিঁড়ির জন্য একটা চ্যাপ্টা পাথর ছাড়া সামনে কিম্বা পেছনে কোথাও নেই কোন বারান্দা। আর গোটা বাড়ীটার কোথাও যে কোনদিন রং করা হয়েছিল তারও নেই কোন চিহ্ন। গলিটার অপর দিকে উপত্যকাটার আরও কিছুটা ভিতরে গিয়ে দেখা গেল এক সার চালা ঘর, আর তারই মাঝে দাঁড়িয়ে রয়েছে কাঠের তৈরী মস্ত একটা গোয়ালঘর, এখানে ওখানে ইউকিলিপ্টাসের ডাল দিয়ে জোড়াতালি দেওয়া, আর ভিতর থেকে ভেসে আসছে অনেকগুলো প্রাণীর চলা-ফেরার আওয়াজ।

গাড়ীটাকে দেখতে ওরা এসে সবাই সার করে দাঁড়িয়ে গেছে উঠোনটাতে। ওদের আঙিনায় গাড়ী আসা ওদের জীবনে এই প্রথম। শুকনো চেহারার লোকটি ঈষৎ নুয়ে পড়েছে সামনের দিকে আর তার সাথের বেঁটে ছেলেটিরও এর মধ্যেই হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই এক অবস্থা। দুজনের গায়েই কলার হীন রংচটা নীলকাপড়ের সার্ট, আর অজস্র তালিতাপ্পী দেওয়া প্যান্ট দুটো ঝুলছে তাদের কাঁধ থেকে। মেয়ে তিনটী দাঁড়িয়েছে বয়স অনুপাতে সার দিয়ে, তাদের ক্যালিকো কাপড়ের তৈরী পোষাকগুলোরও রং গেছে উঠে, আর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন প্রেতের মতই ফ্যাকাশে আর শুকনো মূর্তি এক স্ত্রীলোক। উঠোনে ঢুকে ঘস্‌ঘস্‌ আওয়াজ তুলে ওদের গাড়ীটা গেল থেমে। তখনও কিন্তু তারা ছ'জনেই দাঁড়িয়ে রইলো নিশ্চল আর নিশ্চুপ হয়ে। অগত্যা এগিয়ে গিয়ে ড্যাড বললো, "শুভ সন্ধ্যা"।

উত্তরে লোকটি বললে "কেমন আছো, ভাই?"

"এইটেই কি ওয়ার্টকিন্সদের বাড়ী?"

"হ্যাঁ, ভাই।" কেমন যেন ক্ষীণ আর অস্পষ্ট লোকটির গলার স্বর; কিন্তু তাতেই নাড়া দিয়ে গেল বান্নীর মনের অন্তস্থল, ও জানে এই স্বরেই তিনি কথা বলে থাকেন "একসাথে অনেক ভাষায়।" আচ্ছা বান্নীরা ওখানে থাকতেই যদি "ভর" দেখা দেয় পরিবারটির পরে, আর তারা সবাই মিলে সুরু করে দেয় লাফাতে আর গড়াতে!

"আমরা বেরিয়েছি শিকার করতে," ড্যাড বুঝিয়ে বললো লোকটীকে, "শুনলাম এদিকটায়ই নাকি তাঁবু খাটাবার সুবিধে, আচ্ছা জলটা এখানকার ভাল তো?"

"হ্যাঁ, জল এখানকার খুবই ভাল; কিছুই অসুবিধে হবে না আপনাদের। দিব্যি বাড়ীর মতই থাকতে পারবেন এখানে।"

"আমরা এই কাছাকাছিই বাইরে কোথাও থাকতে চাই, আচ্ছা বড়

কোন গাছ আছে কি এদিকটায়, যার তলায় আমরা তাঁবু খাটাতে পারি ?"

"নিশ্চয়ই আছে; ইলি, তুমি গিয়ে ও'দের দেখিয়ে দিয়ে এসো তো সেই ওক্ গাছটা, আর দেখ যেন ওদের তাঁবু খাটাতে কোন কষ্ট না হয়।"

আর একবার রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে বান্নী; এই-ই তা হলে সেই ইলি, যাকে কিনা আশীর্বাদ করেছেন ক্রাইস্টের পবিত্র আত্মা, প্রায়ই যার দেখা দেয় 'কম্পন' আর শুধু মাত্র হাতের স্পর্শেই যে নিরোগ করে তুলেছে মিসেস বুগনারকে! বান্নীর মনে পড়ে যায় এই পরিবারের খুঁটিনাটি সব কথা, বইয়ের গল্পের মতই যা কিনা অদ্ভুত আর রোমাঞ্চকর।

(৪)

ইলি এগিয়ে চ'ললো সরু পথটা ধরে আর গাড়ী নিয়ে ওরা চ'ললো তার পিছু পিছু। কিছু দূরেই দেখা গেল মস্ত বড় একটা জীবন্ত ওক গাছ আর তার তলায় দিব্যি পরিষ্কার বেশ খানিকটা জায়গা। গাড়ীটাকে নিয়ে ড্যাড এমন জায়গায় রাখলো যেখান থেকে আলোগুলো গিয়ে ছড়িয়ে পড়ে সেই গাছতলাটায়। গাড়ীতে করে শিকারে বেরুলে আর যাই হোক আলোর ভাবনা ভাববার দরকার করে না। বান্নী নেমে পড়লো ওর নিজের দিককার দরজা খুলে আর সোজা গিয়ে লেগে গেল পাদানিটা থেকে সেই বড় বাণ্ডিলটাকে নামিয়ে ফেলবার কাজে। দেখতে দেখতে ও সেটাকে খুলে নিয়ে বিছিয়ে ফেললো মাটীতে আর তার মধ্য থেকে একে একে বেরুতে সুরু করলো মেলাই সব আজব বস্তু। প্রথমেই বেরুলো একটা তাঁবু, ওয়াটার-প্রুফ শিল্ক দিয়ে তৈরী, দিব্যি হাল্কা, আড়ে পাশে আট ফিট সেই বস্তুটাকে ভাঁজ করলে খুব জোর হয়তো বা একটা পোষাকের বাণ্ডিলের মতই বড় হবে। পাশেই রয়েছে তাঁবু টাঙ্গাবার-খোঁটাগুলো, টুকরো টুকরো, কিন্তু স্ক্রু এ'টে নিলেই হ'লো, আর সেই সাথে সেগুলোকে মাটীতে পুঁতবার জন্য কুড়োলও রয়েছে ছোট্ট একখানা। এর পরে বেরুলো তিনখানা কম্বল, তা ছাড়া সিল্কের ঢাকনাটা তো রয়েইছে, সেটাকেও প্রোন্ না ব্যবহার করা যেতে পারে চাদর করে। রবারের দু'টো বালিশ আর একটা গদীও পাওয়া গেল বাণ্ডিলটার মধ্যে—বান্নীর নিশ্চয়ই খুব ভাল লাগবে ফু দিয়ে সেগুলোর মধ্যে বাতাস পুরতে! সব শেষে বেরুলো একটা ক্যাম্বিসের থলে, তাঁবুর উপযোগী বাসন-কোশন দিয়ে ভর্তি, আর তার সবগুলোই হচ্ছে এ্যালুমিনিয়া-মের তৈরী আর একটার সাথে আরেকটা খাপে খাপে আঁটা, এসবেরই সাথে দেখা গেল রয়েছে কয়েক কামরাওয়ালা এ্যালুমিনিয়ামের তৈরী একটা খাবারের বাক্স। সব কিছু বের করে গুছিয়ে নিলে যে কোন সেরা হোটেলের মতই আরামে থাকা যেতে পারে, তা সে মরুভূমি কিম্বা পাহাড়ের চূড়ো যেখানেই হোক না কেন!

মিঃ ওয়াটকিন্স ইলিকে পাঠিয়েছেন ওদেরকে সাহায্য করতে; কিন্তু ড্যাড্ বললো, সে যেন কোনও কিছু চিন্তা না করে, ওরা নিজেরাই পারবে সব কিছু করে নিতে, আর তা এমন কিছু কঠিনও হবে না ওদের পক্ষে। অগত্যা মিঃ ওয়াটকিন্স ইলিকে পাঠালেন ওদের জন্য এক কলসী জল নিয়ে আসতে। এর পর তিনি জানতে চাইলেন দুধ খেতে ওদের আপত্তি আছে কিনা, অবশ্য তার নিজের ছাগলেরই দুধ। ড্যাড হেসে বললো, সে তো বেশ ভাল কথা, আর বান্নীর মন উড়ে চললো তার বইয়ে পড়া বলকান আর সেই সব রোমাঞ্চকর দেশে যেখানকার লোকেরা নাকি তাদের গোটা জীবনই কাটিয়ে দেয় শুধু ছাগলের দুধ খেয়ে। মিঃ ওয়াটকিন্স রুথকে ডেকে বললেন দুধ নিয়ে আসতে আর তাই শুনে বান্নী আর একবার উঠলো রোমাঞ্চিত হয়ে, কারণ রুথই হচ্ছে পলের সেই সব চেয়ে আদরের বোন আর পলের মতে মেলাই নাকি তার বুদ্ধি। কয়েকটা ডিমও নিয়ে আসতে বললেন মিঃ ওয়াটকিন্স, আর সেই সাথে ড্যাড বললো কিছু রুটীর কথা। এবার বান্নীর চমকাবার পালা, বুথ জানালেন রুটী নাকি তাঁদের একদমই নেই; একে তো এই পাথুরে দেশে ফসলই জন্মায় খুব কম, তার পর আবার তা কেটে এনে রাখবার মত জায়গারও তাদের অভাব—থাকবার মধ্যে যা ঐ দুচারটে আলু। ড্যাড বললো ঠিক আছে, আলু আলুই সই, রাতের জন্য দুচারটে সিদ্ধ করে নিলেই চলবে। মিঃ ওয়াটকিন্স বললেন, সিদ্ধ তাদের করতে হবে না, তাঁর স্ত্রীই তা করে দিচ্ছেন স্টোভে করে। আর তাতে করে হয়েও যাবে খুব তাড়াতাড়ি। না, বেচারা সত্যই কিছু জানে না শিকার-ভ্রমণ সম্বন্ধে। ড্যাড বললো, আপনার স্ত্রীকে আবার কেন, আগুন তো আমাদের জ্বালাতেই হবে। সে কথা অবশ্য ঠিকই, রোজই আজকাল কুয়াশা পড়ছে রাতে। অগত্যা মিঃ ওয়াটকিন্স ইলিকে বললেন ওদের জন্য কিছু কাঠ যোগাড় ক'রে আনতে। সেটা তেমন কিছু কঠিন নয়, ঝর্ণাটার পাশ দিয়ে দু'পা এগিয়ে গেলেই প্রচুর আগাছার জঙ্গল, আর সেগুলোর বেশীর ভাগই হচ্ছে শুকনো। ইলি গিয়ে টেনে তুলে নিয়ে এলো ওরই কতকগুলো, আর হাটুতে চাপ দিয়ে সেগুলোকে ভেঙ্গে রাখলো টুকরো টুকরো করে। তার পর দুখানা পাথরও যোগাড় হয়ে গেল চটপটই, ওয়াটকিন্সদের খামারে তার মেলাই ছড়া-ছড়ি, গুঁতো না খেয়ে চলবার জো নেই এক পাও।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দিব্যি আগুন তৈরী হয়ে গেল, হাঁড়ির মধ্যে আলুগুলো সিদ্ধ হ'তে লাগলো খুসীমনে; আর কড়াইটার পরে চট্‌পট্ করতে লাগলো এক কৌটো শুকনো শুয়োরের মাংস। রান্নাটা অবশ্য ড্যাডই করছে, তার মতে ওটা নাকি বেশ সম্ভ্রান্ত কাজ। বান্নীও বসে নেই, তাড়াতাড়ি করে ও প্লেট আর অন্য জিনিসগুলো সাজিয়ে রাখতে লাগলো সেই ওয়াটারপ্রুফ ঢাকনাটার পরে, টেবিল না থাকলেও টেবিল ক্লথের কাজ ওটায় বেশ ভালই হয়ে যাবে। শুয়োরের মাংসটা তৈরী হয়ে যেতেই ড্যাড্ ডিমগুলো ভেঙ্গে ফেললো কড়াইটার কানা দিয়ে, তারপর বিনা মসলাতেই সুরু করে দিল সেগুলো ভাজতে। এর পর রয়েছে দিব্যি ঘন আর মাখনযুক্ত ছাগলের দুধ, গন্ধটা একটু কড়া, তা হলোই বা, রোমাঞ্চকর তো বটে! ওদের শিকার-ভ্রমণের সরঞ্জামের মধ্যে এ্যালুমিনিয়ামের পেয়ালাও ছিল বেশ কয়েকটা, তাতে করেই ওরা ঢেলে নিল দুধটা। এ-সবের পর রুথ আবার নিয়ে এলো এক প্লেট মধু আর কিছুটা মৌচাক, দিব্যি সুন্দর বাদামী রং আর কড়া মিষ্টি গন্ধ, যাকে বলে একদম খাঁটী।

ড্যাড ওয়াটকিন্সদের আমন্ত্রণ জানালো ওদের সাথে কিছু কিছু অংশ গ্রহণ করতে, কিন্তু বৃদ্ধ ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন তাদের সকলেরই নাকি খাওয়া হয়ে গেছে। অগত্যা ড্যাড তাদের সকলকে বললো বসে পড়তে, কারণ দাঁড়িয়ে থাকতে নিশ্চয়ই তাদের কিছু আরাম লাগছে না। ইলি, সেই মেয়ে তিনটী আর তাদের মা গিয়ে বসে পড়লেন

আলোটা থেকে একটু দূরে একটা পাথরের পরে; শুধু বুড়ো ওয়াট-কিন্স এসে এগিয়ে বসলেন একটু কাছ ঘেঁসে। খেতে খেতে ড্যাড তাদের সাথে গল্প জুড়ে দিল আবহাওয়া, চাষবাস আর সেই পাহাড়ী দেশের জীবন যাত্রা নিয়ে।

তারপর খাওয়াদাওয়া সেরে তৃপ্তির আরামে ড্যাড আর বাম্নী তাদের শরীর ছড়িয়ে দিল কম্বলগুলোর পরে। মিঃ ওয়াটকিন্স চাইলেন এই অবসরে ইলিকে দিয়ে তাঁবুটা খাটিয়ে ফেলতে; কিন্তু এবারও ড্যাড বাধা দিয়ে বললো, তার কোন দরকার হবে না, তারা যেন ও নিয়ে কোন চিন্তা না করেন, কাজটা খুবই সোজা, কয়েক মিনি-টেই ওরা তা করে ফেলবে। এর পর মিঃ ওয়াটকিন্স প্রস্তাব করলেন মেয়েদের একজনকে দিয়ে বাসনগুলো ধুয়ে আনাবার; এতে অবশ্য ড্যাড রাজি হয়ে গেল, বললো তা বেশ—সে কথা মন্দ নয়। বাম্নীই জড়ো করে দিল থালাবাসনগুলো আর ওয়াটকিন্সদের মেজ মেয়ে মিলি সেগুলোকে নিয়ে চলে গেল তদের বাড়ীতে। এরপর আরও কিছু-ক্ষণ ধরে চললো ড্যাডের গল্প আর বাম্নী লক্ষ্য করতে লাগলো কেমন করে ড্যাড জেনে নিচ্ছে তাদের পরিবারের সব খুঁটীনাটী বিবরণ আর আস্তে আস্তে হয়ে উঠছে তাদের আস্থাভাজন।

ওদের পরিচয়ের পালার মধ্যে হঠাৎই দেখা দিল সংকট। কিছু-ক্ষণ চুপচাপ থেকে হঠাৎই বলে উঠলেন মিঃ এ্যাবেল ওয়াটকিন্স, "একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করছি, কিছু যেন মনে ক'রো না, ভাই।" কেমন যেন অদ্ভুতরকমের গম্ভীর আর ভাবালুতা মাখানো তাঁর গলার স্বর।

ড্যাড বললো, "বেশ তো, করুনই না কেন আপনার প্রশ্ন।"

"আপনার আত্মার সদ্গতি হয়ে গেছে তো, ভাই?" বাম্নী শুনে চললো কান খাড়া করে। ওর মনে পড়ে গেল মিঃ ওয়াটকিন্সের রীতি-নীতি-সম্বন্ধে পলের সেই সব কথা, তাঁর ধর্মের বিরুদ্ধে বললেই হলো কোন কিছু, ব্যাস্ আর দেখতে হবে না, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখ দুটো উঠে যাবে কপালে, প্রার্থনা করতে সুরু করে দেবেন চীৎকার করে, আর তারপরই সুরু হয়ে যাবে, "ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও" বলে সেই আর্তনাদ। বাম্নীর অবশ্য এসব কিছুই আগে থেকে বলা আছে ড্যাডকে, আর দেখা গেল ড্যাডও এর মধ্যেই ঠিক করে নিয়েছে কি করতে হবে না হবে। যথোচিত গাম্ভীর্যের সাথে সে উত্তর করলো, "হ্যাঁ, ভাই, সদ্গতি আমাদের দুজনের আত্মারই হয়ে গেছে।"

"তা হলে আপনাদের রক্ত-স্নানও হয়ে গেছে, বলুন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, স্নানও আমাদের হয়ে গেছে।"

"তা, আপনারা কোন সম্প্রদায়ের সাথে আছেন, ভাই?"

"আমাদের সম্প্রদায়কে বলা হয় "সত্যবাণী" সম্প্রদায়।" কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। তার পর মিঃ ওয়াটকিন্সই আবার সুরু করলেন, "তাদের কথা তো কিছু শুনেছি বলে মনে পড়ছে না?" ড্যাড্ বললো, "সত্যি আমি দুঃখিত, আপনাকে তাদের কথা বলতে পারলে আমি খুসীই হতাম; কিন্তু অন্য কোন সম্প্রদায়ের লোকের সাথে ধর্ম-বিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করা আমাদের বারণ আছে।"

একথা শুনে কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন মিঃ ওয়াটকিন্স; শেষে বললেন, "কিন্তু ভাই, প্রভু তো আমাদের সকলের কাছেই তাঁর বাণী প্রচার করতে বলেছেন? তিনিই তো বলেছেন, 'প্রথম কাজই হ'লো সকল জাতির মধ্যে আমার বাণী প্রচার করা'।"

যথাসম্ভব গাম্ভীর্য বজায় রেখে ড্যাড বললো, "সে কথা তো আমিও জানি ভাই, কিন্তু আমাদের সম্প্রদায়ের মতে প্রথমে লোককে চিনতে হবে বন্ধুত্বের মধ্য দিয়ে তারপরে আসবে ধর্মের কথা; অন্যের ধর্মবিশ্বাসের পরেও তো আমাদের শ্রদ্ধা থাকা দরকার।"

"সে তো ঠিকই, ভাই।" উত্তর করলেন মিঃ ওয়াটকিন্স; কিন্তু কেমন যেন ক্ষীণ শোনালো তাঁর কণ্ঠস্বরটা, বেশ বোঝা যাচ্ছে তিনি যেন ঠিক করে উঠতে পারছেন না এর পরে কি বলবেন। হয়তো সাহায্যের আশায়ই তিনি তাকাতে লাগলেন তাঁর পরিবারের অন্যান্য সকলের দিকে; কিন্তু তাঁর প্রশ্নের উত্তরে "হ্যাঁ—বাবা" ছাড়া আর কোন কথাই তারা এ পর্যন্ত তাঁকে বলতে শেখেনি।

শেষ পর্যন্ত যেন আবহাওয়াটাকে হাল্কা করবার জন্যই ড্যাড বললো, "আমরা এখানে এসেছি শিকারের খোঁজে; শুনেছি নাকি মেলাই কোয়েল পাওয়া যায় এ অঞ্চলে?"

★

গান

শান্তশীল দাশ

বারে বারে মোর ঘর ভেঙে যায়,
তবু বাঁধি বাসাখানি;
এ-বাসা আমার শুধু ক্ষণিকের,
জানি আমি সে তো জানি।
ক্ষণিকের হাসি, ক্ষণিকের গান,
তাই দিয়ে মোর ভরেছে পরাণ;
আলোছায়া ঘেরা ছোট এ জীবন,
সহজে নিয়েছি মানি।

যা' পেলাম নাকো তার লাগি হায়
করি মিছে অভিমান;
কালো মেঘ এসে জোছনা নিশীথে
করে দিয়ে যায় ম্লান।
সরে যায় মেঘ, চাঁদের কিরণ
ভরে দিয়ে যায় আমার ভুবন;
সে আলো আবার ক্ষণিকে মিলায়
জাগে বেদনার বাণী।

বাঙ্গালীর হার-জিত

শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব

আজ বাঙ্গালীর সমাজ-দেহের "সর্ব্ব অঙ্গে ব্যথা, ওষুধ দিব কোথা"—এই ভাবনায় চিকিৎসকবৃন্দ অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। এই চিন্তা স্বাভাবিক। কিন্তু, বাঙ্গালীর সমস্তাকে সর্ব্বভারতের বা সারা দুনিয়ার ব্যথা হইতে পৃথক করিয়া দেখিলে রোগমুক্তির আশা কম। বিজ্ঞানের কল্যাণে আজ যাতায়াতের দূরত্ব মুছিয়া গিয়াছে, ছয় ঘণ্টায় আমরা ছয় মাসের পথ অতিক্রম করিতে পারি। স্বাস্থ্য-সম্পদ, শিক্ষা-সংস্কৃতি তার উন্নতিকল্পে যে সব উপায় অবলম্বন করিবার আলোচনা চলে, তাহা অন্যান্য দেশের উপায় হইতে পৃথক নয়।

একটা কথা লক্ষ্য করিবার জন্য পাঠকবর্গকে অনুরোধ করিতেছি। ইংরেজ শাসনের সূচনা হইতে নব্য শিক্ষা লাভ করিয়া বাঙ্গালী নর-নারী দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছিল। মনের সে উৎসাহ, মনের সেই প্রসারতা বাঙ্গালীকে ভারত-বর্ষের নেতৃত্বপদে বরণ করিয়াছিল। ৫০ বৎসর পূর্ব্বেও এই পদ তার অটুট ছিল। কিন্তু আজ কি দেখি বা কি শুনিতে পাই? চারিদিকে ধিক্কার, আত্মপ্রত্যয়ের অভাব। পথে ঘাটে, রেলে ষ্টিমারে, ট্রামে বাসে, "রোয়াক পার্লা-মেণ্টে" কেবল আত্মদোষ ক্ষালনের চেষ্টা। পরের উপর সকল দোষ চাপাইয়া, নিজের শরীর মনের দুর্ব্বলতা ঢাকিবার চেষ্টা করিয়া আমরা বাজিমাৎ করিবার চেষ্টায় আছি।

আমাদের সমাজ-দেহের, সমাজ-মনের স্বাস্থ্যের জন্য এই আত্মধিক্কারের পরমোৎসাহকে দমন করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে যুগে যুগে সকল সমাজের মধ্যেই নানারূপ সমস্যা দেখা দেয়। কেবল আত্মপ্রত্যয়ের জোরেই মানব জাতি তাহা সমাধান করিয়া থাকে, আজ বাঙ্গালী সেই মূলধন হারাইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করি না। বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গালীর মধ্যে যে সব যুগপ্রবর্ত্তক জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের কথা স্মরণ করিয়া হীনতা বোধ দূর করা সম্ভব। রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, চিত্তরঞ্জন দাস, অরবিন্দ ঘোষ—এই সব লোকত্তর পুরুষ যে সমাজে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কখনই হীন হইতে পারেন না। এই অনুভূতি ও বোধ জাগরিত থাকিলে আমরা আবার ভারত-সভায় যোগ্য আসন লাভ করিতে পারিব।

বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি, "বাঙ্গালীর মস্তকের অপ-ব্যবহার" প্রভৃতি বাক্যের উচ্চারণ যাঁরা করিয়াছিলেন, তাঁরা সমাজের নেতা ছিলেন, দেশের কল্যাণকামী ছিলেন। বাঙ্গালীর আত্মপ্রত্যয় ফিরাইবার জন্য, বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের সদ্ব্যবহারের জন্যই এই সব কথা উচ্চারিত হইয়াছিল। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বাঙ্গালী নৈয়ায়িকের "তাল পড়িয়া ধুপ করে না ধুপ করিয়া তাল পড়ে" এই তত্ত্ব জিজ্ঞাসাকে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, কিন্তু মধ্য যুগে ইয়ুরোপ খণ্ডে "একটি আলপিনের মাথায় কয় লক্ষ পরী নাচিতে পারে", তৎসম্বন্ধে গবেষণার অন্ত ছিল না। সমাজ মনের যে অবস্থায় এরূপ ভাববিলাসে পণ্ডিত লোক ব্যাপৃত থাকিতে পারেন, তাহাও ভাবিবার বিষয়। এবং সেই ইয়ুরোপ খণ্ডই আজ জ্ঞান-বিজ্ঞানে, আচার আচরণে জগতের আদর্শস্থল হইয়া উঠিয়াছে। মানব মন এই ভাবেই জাগিয়া থাকে।

বাঙ্গালীও পাশ্চাত্য সভ্যতার আঘাতে জাগিয়া উঠিয়াছিল। যবন সভ্যতা বলিয়া গোঁড়া পণ্ডিত, মৌলবী মহাশয়গণ তার প্রাধান্য অস্বীকার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু বেশীদিন সে ভাণ চলিতে পারে নাই। রাষ্ট্রের বিধানে তাঁদের অনেকেরই ব্রহ্মোত্তর জমি ও

লাখেরাজ জমি বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল এবং বৃত্তি নষ্টের তাড়নায় তাঁদের উত্তর পুরুষগণ জীবিকা অন্বেষণের জন্য দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িলেন। এই যুগ পরিবর্ত্তনের মর্ম্মার্থ না বুঝিয়াও তাঁহারা হাড়ে হাড়ে তার নিষ্ঠুরতা অনুভব করিলেন এবং বুঝিয়াই তদুপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান শিক্ষা দীক্ষার সাহায্য গ্রহণ করিলেন। সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বাঙ্গালী দ্বারিকা নাথ মিত্র, শম্ভুচন্দ্র পণ্ডিত, রাসবিহারী ঘোষ, তারকচন্দ্র পালিত, সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, তামিল দেশীয় মুথুস্বামী আয়ার, ভাষ্যম আয়েঙ্গার, মারাঠি ব্রাহ্মণ গণেশ মাণ্ডলিক, ত্রৈম্বক তেলঙ্গ, পারশি ফেরোজ সাহ মেটা, মুসলিম বদরুদ্দিন তায়েবজি, মহম্মদআলী জিন্না, কনোজী ব্রাহ্মণ অযোধ্যা নাথ, বিশ্বম্ভর নাথ, কাশ্মিরী ব্রাহ্মণ মতিলাল নেহেরু, তেজবাহাদুর সাপ্রু, উৎকলের মধুসূদন দাশ, রাধানাথ দাশ, বিহারের রাজেন্দ্রপ্রসাদ; আসামের আনন্দরাম বড়ুয়া; পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায়; মুনসী হুইসী-রাম।

আজ বৈশ্যযুগ। আজ কলেজি শিক্ষায় ভাত কাপড় জোটানো কঠিন, ঘর-দোর প্রস্তুত করা কঠিন। এই কথা বুঝিয়াই রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বটকৃষ্ণ পাল, দুর্গাচরণ লাহা প্রভৃতি ব্যবসায় ও শিল্পপতিগণ বাঙ্গালীসমাজে অগ্রণী হইয়াছিলেন। তাঁদের উদাহরণে অনুপ্রাণিত হইয়া সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য, ভোলানাথ দত্ত, নলিনীরঞ্জন প্রভৃতি শিল্পপতি নানাভাবে বাঙ্গালী সমাজের সেবা করিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গালী আজ পল্লীছাড়া হইয়াছে। কিন্তু কেবল সহর নগরের মোহে নহে। পল্লীগ্রামের বৃত্তিগুলি যখন প্রায় অচল হইয়া গেল, তখন বাঙ্গালী বাধ্য হইয়া পৈত্রিক ভিটা ত্যাগ করিল। আর কঠিন ম্যালেরিয়ার অত্যাচারে। রেললাইন স্থাপনের দশ বৎসরের মধ্যে বর্দ্ধমান জেলার দশ লক্ষ নর নারী প্রাণত্যাগ করে; তৎপূর্ব্বে "যশোহরের" জ্বরে দক্ষিণ ও মধ্য বাঙ্গলা উজাড় হইয়া পড়িয়াছিল। এই শ্রম-শক্তির অভাব পূর্ণ হইল সাওতাল পরগণা হইতে; বিহার হইতে; উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে; উড়িষ্যা হইতে; মধ্য-প্রদেশ হইতে। এই তথ্যটির আলোচনা করিলে দেখা যাইবে বাঙ্গলা দেশের বাহিরে এমন একটা সমাজবিপ্লব ঘটিয়াছিল যে তথা হইতে অগণিত লোকসমষ্টি লক্ষ্মীর নূতন পীঠস্থানের প্রতিষ্ঠার সংবাদ পাইয়া তথায় চলিয়া আসিতে আরম্ভ করিল। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের ফলে অনেক রাজা-উজিরের পরিবার পরিজন বৃত্তিহারা হইলেন। তাঁদের বংশধরেরা কলিকাতার জনারণ্যের মধ্যে আত্ম-গোপন করিয়া যে-কোন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিয়া নিয়াছেন। ঝাঁকা-মুটের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন লক্ষ-লক্ষ দোবে-চৌবের, সৈয়দ-পাঠানের বংশধর। ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানের, গরু-মহিষ চালিত গাড়ীর পরিচালকের বংশধরেরা নূতন "বড়লোক" হইয়া কলিকাতার জাহাজ ঘাটায় তাঁদের আধিপত্য এখনও অটুট রাখিয়াছেন। "শ্রমিকরাজ্যের প্রতীকরূপে রেল-ষ্টিমারের কুলিরা নূতন শ্রেণী-বিভাগের ও শ্রেণী-সংগ্রামের সূচনা করিয়াছে। সেইরূপে খনিজ অঞ্চল অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে, আসাম দার্জ্জিলিং অঞ্চলে চা বাগান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ক্ষয়িষ্ণু বাঙ্গালী শ্রমিকের স্থান গ্রহণ করিল অ-বাঙ্গালী শ্রমিক।

এই সব চা-বাগানে স্থানীয় মজুর কাজ করিতে অপারগ। কারণ, "গিরমিট" দিয়া শ্রম করিতে তাদের জাতীয় প্রকৃতি প্রধান বাধারূপে দণ্ডায়মান হইয়া আছে। বাঙ্গালীর শ্রম-বিমুখতা ইহার কারণ নয়। পাটের ক্ষেতে বৃষ্টি বাদলে ভিজিয়া, কাদার মধ্যে গলা-জলে দাঁড়াইয়া তারা যে পরিশ্রম করে তাহা খনির বা চা-গানের শ্রমিকের তুলনায় কম নয়। জাতীয় প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক বলিয়াছেন: The Irish people would never have been willing to endure the horrible slavery that went to the making of England in the first half of the 19th century" খৃষ্টিয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ব্রিটেনের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য তদ্দেশীয় শ্রমিক যে শোষণের চাপে পিষ্ট হইয়াছিল, তাহা কোন আইরিশ শ্রমিক করিলে সহ্য করিত না।

এখন শিক্ষিত বেকারের অবস্থা আলোচনা করিতে চাই। এইরূপ বেকার উত্তর ভারতে ব্রহ্মদেশে ছড়াইয়া

পড়িয়াছিল। শেষোক্ত দেশের শ্রম-বিমুখ চাষীর বা শ্রমিকের স্থান পূর্ণ করিয়াছিল চট্টগ্রামের মুসলিম ; উৎকলের ভূমিহীন কৃষক ও অন্ধ্র ও তামিল দেশের শ্রমিক। আজ তদ্দেশীয় শ্রমিক সেই সেই স্থান অধিকার করিয়াছে। দক্ষিণ ভারতের শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ প্রভৃতি শ্রেণীসমূহ দিল্লীর রাজপাটের চারিদিকে ভিড় করিয়া আছে ; তথায় মাথা গলানো কঠিন ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে।

যুগে যুগে মানব-সমাজে এরূপ ভাঙ্গা-গড়া চলিতেছে। আজ বাঙ্গালী বঙ্গ-বিভাগের তৃতীয় পর্য্যায়ের ফলে বিশেষ ভাবে নিজেদের নিঃসহায় মনে করিতেছে। তজ্জনিত আক্ষেপ-বিক্ষেপ রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে জড়াইয়া পড়িতেছে। পশ্চিমবঙ্গের ২৮,০০০ হাজার বর্গ মাইলের বুকে ৩ কোটি হিন্দুর স্থান সংকুলান হইতেছে না। বিহারের মানভূম-ধলভূমের ২।৩ হাজার বর্গ মাইল ফিরিয়া পাইলেও ; আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ বাঙ্গালী উপনিবেশে পরিণত হইয়া পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের শাসনাধিকারে আসিলেও বড়জোর ১০ লক্ষ নর-নারী তথায় বসবাস স্থাপন করিতে পারেন। পূর্ব্বাচল প্রদেশ গঠন করিয়া তার সহিত কাছাড়, গোয়ালপাড়া, ত্রিপুরা রাজ্য সংযুক্ত করিয়া দিলে আর ১০ লক্ষ নরনারীর সংস্থান হইতে পারে। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত ১ কোটি ১০।১৫ লক্ষ নারীর গতি কি হইবে ?

এরূপ সমস্যা আজ নূতন নয়। বৌদ্ধ-প্রাধান্যের প্রারম্ভে আচারশীল হিন্দু উত্তরে গাড়োয়াল, মধ্যে রাজপুতনায়, দক্ষিণে মারাঠা দেশে মালাবারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাড়োয়ারী বণিকশ্রেণী এই ইতিহাসের জোরে দাবী করেন যে তাঁরাই প্রাচীন বাঙ্গালার বংশধর। কণৌজের ও দক্ষিণের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কায়স্থ বরণ ত উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছেন।

এই তর্ক বিচার সহ। তার প্রকৃত ইতিহাস হইল যে ধর্ম্ম-বিপ্লব ও রাষ্ট্রবিপ্লব সমাজকে নূতন করিয়া গড়িতে চাহিলে দুঃখ-ভোগ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। বাঙ্গালী আজ তার আওতায় পড়িয়াছে। এই সময়ে দুর্ব্বলতা সমাজ-দ্রোহের সমপর্য্যায়ে পড়ে। স্পৃহা বর্জ্জনায়। আমাদের ভরসা রাখিয়া চলিতে হইবে। "চলো চলো", এবং "ভরসা রাখো" এই দুই অমূল্য রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালী সমাজের নিকট ন্যাস (trust) রূপে রাখিয়া গিয়াছেন। সেই কর্ত্তব্য পালনের শক্তি আমাদের আছে এই বিশ্বাসের বলে বাঙ্গালীকে চলিতে হইবে।

★

কংকাল

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

আমাদের চোখে ছানি পড়ে গেছে ভাই
আমাদের চোখে স্বপ্নের লেশ নেই।
চারিদিকে শুধু ঝাপসা দেখি যে তাই—
হারিয়ে ফেলেছি মোরা জীবনের খেই।

কোজাগরী চাঁদ উঠেছে আকাশ মাঝে,
দিকদিগন্ত রূপালি ঝালরে ঢাকা।
আমাদের মনে আঁধারের বীণা বাজে
চোখ দুটি হায় মসীঅঞ্জন মাখা।

কত রঙ নিয়ে কাননে কুসুম ফুটে,
তরুলতিকায় সবুজের সমারোহ।
সোনার শরতে প্রাণের পর্ণপুটে
বলাকার সারি আনেনাকো কোন মোহ।

আঘাতে আঘাতে অপমানে অনাদরে
কেটে গেছে কবে চলিত পথের সুর।
পদে পদে শুধু ব্যর্থতা ক্ষয়ে পড়ে
আমাদের ধরা বেদনায় পাণ্ডুর।

বন্ধুর প্রেম, পত্নীর ভালবাসা,
তেঁতো হয়ে গেছে অভাব ও অনটনে।
নব জাগরণ উজ্জীবনের আশা
কোনখানে উঁকি দেয় নাকো মরা মনে।

যন্ত্রের মতো কাজ করিতেছি শুধু
মোর সৃষ্টির কুৎসিত জঞ্জাল।
বিনিময়ে তার জীবন রিক্ত ধূ ধূ
হায় অগণিত নামহারা কংকাল।

অথ কাক-চরিত কথা

শ্রীগৌতম সেন

লোকে বলে কাজলা দীঘির মাঠ। হয়তো কোনোকালে দীঘি ছিলো, আজ নামটাই আছে।

গাঁয়ের রাখাল গোরু চরায় এই মাঠে। একদিন রাখালরা দেখলে অশথ গাছের মগডালে একটা কাক তার বাসায় বসে নিশ্চিন্ত মনে ডিমে তা দিচ্ছে। দেখে রাখালদের ভারী ফূর্তি। তারা কাকটাকে ধ'রে ফেললো।

কাক অনেক আপত্তি করলো, কৈফিয়ৎও দিলো অনেক, কিন্তু রাখালরা বুঝলো না। সারাটা দিন ধরে তারা কাকটাকে জ্বালাতন করে সন্ধ্যেবেলা বাড়ি নিয়ে এলো। কিন্তু শেষে তাকে নিয়ে কি করা যায় ঠিক করতে না পেরে তার গলায় একটা ছোট্ট ঘণ্টা বেঁধে দিয়ে ছেড়ে দিলো।

টুং—টুং—টুং—

কাক উড়ে বেড়ায় আর তার গলার ঘণ্টা বাজে টুং টুং করে। ঘণ্টা যত বাজে, কাক তত ওড়ে। ওড়ে আর জোরে জোরে চক্কর দেয়। টুং টুং টুং টুং বিরামবিহীন শব্দ।

ফূর্তিতে কাক ভুলে যায় তার বাসার কথা, ভুলে যায় ডিমগুলোর কথা, বন্ধু-বান্ধবদের কথাও সে ভুলে যায়।

টুং—টুং—টুং—টুং—

ধানের ক্ষেতে চাষীরা জমির ঘাস তোলে হেঁট হয়ে—শব্দ শুনে ওপর দিকে চায়।

এদিক ওদিক চারদিক তাকায় তারা, কিছুই দেখতে পায় না। বাতাস নেই, তবে শব্দটা ভেসে আসছে কোথা থেকে?

তারা কি করে জানবে, আকাশে অনেক উঁচু থেকে আওয়াজ আসছে? তারা কি ক'রে জানবে এটা আর কারো কাজ নয়, একটা কাকের কীর্তি!

হারু মোড়ল তার জমিতে কাজ করতে করতে ঠিক ক'রে ফেললে, এ আর কিছু নয়, ভৌতিক ব্যাপার। ভূতে তার ভারী বিশ্বাস। সন্ধ্যেবেলা মাঠ থেকে বাড়ি যাবার পথে ন্যাড়া বটতলায় তার গা ছম ছম করে। কোনো কোনো দিন মনে হয়, কে বুঝি তার নাম ধ'রে ডাকছে। ন্যাড়া বটতলায় একটা ভূত অনেক কাল ধ'রে ঘর-সংসার পেতেছে—গাঁয়ের অনেকেই জানে সে কথা।

টুং—টুং—টুং—

একলা মাঠে কাজ করতে করতে হারু শোনে, ঘণ্টা বাজছে। প্রথমটা মনে হয়, অনেক দূর থেকে শব্দ আসছে, তারপর কাছে—অনেকটা কাছে, আবার দূরে চ'লে যায়। হাতের নিড়ানী ফেলে দিয়ে চারদিকে চেয়ে দেখে সে। মাঠের পর মাঠ...আধক্রোশ রাস্তার মধ্যে জনপ্রাণী নেই। বাতাস নেই, গাছগুলো পর্যন্ত নড়ে না...চারদিক থম্ থম্ করছে, মাঝে মাঝে রোদের ঝিলিক্।

ভয়ে হারুর গলাটা কাঠ হ'য়ে শুকিয়ে যায়।

অন্যদিনের মতো আজো মোড়লগিন্নী মাঠে ভাত পাঠিয়ে দিয়েছে। বড়ো বাটিশুদ্ধ ভাতগুলো খানিকটা দূরে একটা আমগাছের ডালে শিকেয় ঝোলানো আছে। ঘটির জলে হাত-মুখ ধুয়ে হারু বাটি নামিয়ে দেখে, বাটিতে একটাও ভাত নেই—গাছের তলায় কতকগুলো ভাত ছড়ানো আছে, আর যে কি ছিলো তার চিহ্নমাত্র নেই।

রোজই এমনি ঘটে। হারু ভয়ে কাঠ হয়ে যায়। ব্যাপারটা কাউকে সে বলতে পারে না। কি জানি, কি করতে কি হয়, শেষে কি ভুতের হাতে প্রাণটা দেবে?

সন্ধ্যের পর বাড়ি ফেরে মোড়ল। চোখ-মুখ ব'সে গিয়েছে, চেহারা দেখে মোড়ল-গিন্নীও ভয় পায়—বলে, তোমার কি হয়েছে বলো তো?

মোড়ল বলে, হবে আবার কি—শরীরটা বড় খারাপ।

কিন্তু খাবার সময় মোড়লের শরীর-খারাপের কোনো লক্ষণই দেখা গেলো না। সারাদিন শুকিয়ে মোড়লের নাড়ী ক্ষিদেয় চোঁ চোঁ করছে। ভাতে বসেই সে গো-গ্রাসে গিলতে সুরু করলো। মোড়লগিন্নী অবাক হয়ে দেখে আর বলে, ক্ষিধে তো জোর রয়েছে দেখছি।

মোড়ল চটে উঠে বলে, তা তো দেখবেই গো!

ভেতরের কথাটা কাউকে বলতে না পেরে মোড়লের রাগ আরো বেড়ে যায়।

একদিন কিন্তু রহস্যটা ফাঁস হয়ে যায়...ভূতও নয়, কিছুই নয়, একটা দাঁড়কাকের কীর্তি...উঁচুতে উড়ে উড়ে ঘণ্টা বাজিয়ে বেড়ায়।

মোড়ল আপন মনে বলে, ওরে শয়তান! দাঁড়া, তোকে মজা দেখাচ্ছি। আমার ভাত চুরির শোধ তুলবো, তবে আমার নাম—

তারপর দিন মোড়ল বাড়ি থেকে খানকয়েক রুটি তৈরী ক'রে মাঠে আনে। সঙ্গে খানিকটা তারও নিয়ে আসে।

মোড়লের একটা গাধা ছিলো। সে গাধাটাকে রোজ মাঠে আনতো। বাড়ি ফেরার সময় তার পিঠে এক বোঝা ঘাস চাপিয়ে নিজেও চেপে যেতো। মাঠে গিয়ে গাধাটাকে এক-গাছা লম্বা দড়ি দিয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে দিতো, গাধা চরে খুঁটে খেতো। গাধার নাম দিয়েছিলো হারু 'মাণিক'।

প্রতিদিনের মতো আজো লম্বা দড়ি দিয়ে গাধাটাকে বেঁধে তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে হারু বলে, যা ফুর্তি ক'রে চরে খা, আজ দেখবি, কি মজা করি।

হারু এইবারে রুটিগুলো ছিঁড়ে, টুকরোগুলো তারের সঙ্গে গাঁথতে লাগলো। গাঁথা শেষ হ'লে রুটির টুকরোর মালাটা একটা পাত্রের ওপর রেখে, তারের অপর প্রান্তটা গাধার গলার দড়ির সঙ্গে বেঁধে দিলো।

হারু কাজ করে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা যায়, কাকের দেখা নেই।

মাঝে মাঝে হারু হাতের কাজ বন্ধ রেখে কাণ খাড়া ক'রে শোনে, কিন্তু কোনো আওয়াজই সে পায় না।

দুপুর গড়িয়ে যায়। হারুর ক্ষিদে পায়, কিন্তু ভরসা ক'রে খেতে পারে না—আরো অপেক্ষা করে। রুটিগুলোর কাছে যেতে ভরসা হয় না। কাছে গেলে ক্ষিদে বাড়ে। দূরে দাঁড়িয়ে নিজের হাতে তৈরী ফাঁদের দিকে চেয়ে থাকে... চমৎকার হয়েছে। রুটিগুলো খেয়ে এমন ফাঁদ নষ্ট করা যায় না।

দূরে ঘণ্টার আওয়াজ শোনা গেলো...টুং—টুং—টুং—

উৎকর্ণ হয়ে শোনে হারু। ঠিক শয়তানটা এবারে আসছে। গুঁড়িমেরে নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে হারু অপেক্ষা করে।

কিন্তু ফাঁদে ধরা দেবার কোনো লক্ষণই কাক দেখায় না। সে যেন মজা পেয়ে গিয়েছে ঘণ্টা বাজিয়ে বাজিয়ে। হারুর ক্ষিদে বাড়ে, জিদও বাড়ে। শেষে একটা কাকের কাছে হারবে সে? পেটের ক্ষিদে চেপে হারু আবার কাজে মন দেয়। মনে মনে বলে, দাঁড়াও না বাছাধন, কতোক্ষণ!

কাক কিন্তু নীচে নামেই না, উঁচুতে ঘুরে বেড়ায়—যেন ইচ্ছে ক'রেই নামছে না। এদিকে ক্ষিদেয় পেটে মোচড় দিচ্ছে মোড়লের...প্রায় হাতের কাছেই খাবার, কিন্তু খাওয়া চলে না। মেজাজ তার আগুন হয়ে ওঠে।

—দাঁড়াও বাছাধন, আসতেই হবে তোমাকে। ক্ষিদের চোটে নামতেই হবে—কতোক্ষণ!

টুং—টাং—টুং—টাং—টুং—

হারু মোড়লকে যেন ব্যঙ্গ ক'রেই কাকের গলার ঘণ্টা বেজে ওঠে, যেন ঘণ্টা বাজিয়ে বলছে 'তোমারও নয়, আমারও নয়—তোমারও নয়, আমারও নয়।'

সারাদিন এমনিভাবে কাটে। কাকেরই জিত হয়। সন্ধ্যায় হারু মোড়ল রুটির টুকরো চিবুতে চিবুতে বাড়ি ফেরে—ফেরার পথে গাধাটার ওপর গায়ের ঝাল মেটায়। মাঝে মাঝে কাকটাকেও রেহাই দেয় না—শয়তান! বজ্জাত! চোর! ইত্যাদি—

পরের দিন কিন্তু হারু মোড়লেরই জিত হয়।

সেদিনও সে যত্ন ক'রে ফাঁদ পেতে রেখে কাজে বসে। খানিকবাদেই কানে আসে ঘন ঘন ঘণ্টার আওয়াজ, পাখার ঝটপটানি আর 'কা কা' শব্দ।

ছুটে এসে হারু দেখে তারশুদ্ধ রুটি গলায় বিঁধে কাকের কাহিল অবস্থা!

প্রথম তো ডানা দুটো ধ'রে কাকটাকে নির্মম একটা ঝাঁকানি দেয় হারু, তারপর সুরু করে—কেমন? ভারী মিষ্টি রুটি—নয়? এইবার? তারপর তারটা কেটে কাকের মাথায় দুই চড়—এই নাও একটা ভয় দেখানোর মজুরী, আর এই নাও একটা আমাকে উপোস করিয়ে রাখার বকশিস!

—কা! কা!

চীৎকারে নিশ্চিন্তে-চরণশীল গাধা চমকে উঠে, দড়ি-বাঁধা অবস্থাতেই ছুটোছুটি সুরু করে। অনেক ডাকাডাকি ক'রে মোড়ল তাকে থামায়, তারপর কাকটাকে একটা ঝাঁকানি দিয়ে শূন্যে তুলে ধরে তাকে দেখায়—দেখেছিস মাণিক, ধরেছি বেটাকে!

গাছের সঙ্গে বেশ ক'রে কাকটাকে বেঁধে রেখে হারু মোড়ল কাজে মন দেয়। আজ তার মন ভারী খুসী। জোরে নিড়ানী চালায়—চালাতে চালাতে ভাবে, কি-ভাবে বেটাকে আচ্ছারকম জব্দ করা যায়। অনেক ভেবে সে ঠিক করে—আগে তার ডানা দুটো কাটবে, তারপর ছেলেদের হাতে দিয়ে দেবে, তারা জ্বালাতন ক'রে তাকে মেরে ফেলবে। কথাটা ভাবতেই মোড়লের মনটা আরো খুসী হয়।

সন্ধ্যাবেলায় কাকটাকে খুলে তার পায়ে দড়ি বাঁধে মোড়ল, তারপর দড়ির অপর প্রান্তটা বেশ ক'রে গাধার ল্যাজে বেঁধে দেয়—কাকটা হেটমুণ্ডে ঝুলতে থাকে। তার-পর ঘাসের বোঝাটা চাপিয়ে দেয় মাণিকের পিঠে—নিজেও বসে চেপে।

টুং—টুং—টুং—

কাকের গলার ঘণ্টা বেজে উঠতেই মাণিক দাঁড়িয়ে যায় কান খাড়া ক'রে।

—হেট্! হেট্ মাণিক! ও কিছু নয়—চ', হারু মোড়ল হাঁক দেয়।

মাণিক আবার চলতে সুরু করে। কিন্তু তার ভাব-গতিক দেখে বোঝা যায়, তার ক্ষুরের শব্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই অদ্ভুত আওয়াজটা উঠছে—সেটা মোটেই তার পছন্দসই নয়।

যেতে যেতে হারু মোড়ল উঁকি দিয়ে একবার কাকটাকে দেখে নেয়। হুঁ, কেমন জব্দ! বাজনা বাজানোর সখ মিটেছে ওস্তাদ? কাজলা দীঘির মাঠে ঘণ্টা-বাজানোর কেরামতি দেখিয়ে উৎপাত করা এইবার তোমার ঘুচবে।—বেটা ম'রে গেলো নাকি? সাড়াশব্দ দেয় না যে?—হুই, হুস্! ইস্! সাড়া দেওয়া হচ্ছে না—বটে! বড় ধূর্ত্ত—নয়? হাতের পাঁচন দিয়ে মোড়ল কাকটাকে কষিয়ে দেয় এক ঘা।

—ক!

আচমকা কর্কশ আওয়াজে কান খাড়া হয়ে ওঠে মাণিকের—গলা বাড়িয়ে চম্‌কে উঠে চোঁচা দৌড়। হারু মোড়ল হেসেই অস্থির।

—আরে থাম—থাম মাণিক! ঘাবড়াচ্ছিস কেনো রে বেটা! দড়িতে একটা ঝাঁকানী দিয়ে হারু ঠাণ্ডা করে মাণিককে।

আবার মাণিক চলতে সুরু করে। চলতে চলতে সে কান খাড়া করে। হারু মোড়ল আবার কাকের সঙ্গে আলাপ সুরু করে।—বলি, ও স্যাঙাৎ, নিদ্রে হচ্ছেন নাকি? বলেই হারু আরো জোরে পাঁচনের এক ঘা কষিয়ে দেয় কাকটাকে।

ক্-আ-আ! ক্-আ-আ!—

এবার আর মাণিককে রুখতে পারা যায় না। একটা ঝাঁকি দিয়ে ছুটতে সুরু করে প্রাণপণে। হারু মোড়ল থামাবার অনেক চেষ্টা করে, কিন্তু মাণিকের তাতে ভ্রূক্ষেপও নেই।

কা-ক্-আ-আ! ক্-আ-আ!

গাধা যত জোরে ছোটে, কাকও চেঁচায় তত জোরে। তাদের থামায় কার সাধ্য! চাঁট ছুঁড়ে ল্যাজ ঘুরিয়ে গাধা কাকটাকে ঝেড়ে ফেলে দেবার চেষ্টা করে, কাকটা ভয় পেয়ে আরো জোরে— আরো কর্কশ গলায় চেঁচায়! গাধা আরো ছোটে। এমনিধারা চলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা...

এবার আর মাণিককে রুখতে পারা যায় না। একটা গাধার কর্কশ চীৎকার, ক্ষুরের দাপাদাপি, আর সঙ্গে কাকের কঠোর আওয়াজ—কা! কা! কা—আ—আ!

তারপর—অনেকক্ষণ পরে ধড়াস ক'রে একটা শব্দ হয়—তারপর সব চুপচাপ!

সকালবেলা দেখা যায় হারু মোড়লকে—মস্ত উঁচু এক টিলার নীচে খানার পাথরের ওপর মরে পড়ে আছে—হাড়-গোড় ভেঙে গিয়েছে তার। তার দেহের ওপরে গাধাটার মৃতদেহ। খানার মধ্যে পাথরে লেগে দুজনেরই মাথা ছাতু হয়ে গিয়েছে।

সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় মড়া থেকে ধোঁয়া উঠছে, কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সেটা ধোঁয়া নয়, এক ঝাঁক মাছি!

ঝরঝরে পরিষ্কার প্রভাতে নীল আকাশের উজ্জ্বল গায়ে আবার দেখা দেয় একটি কালো পাখী, অনেক—অনেক উঁচুতে, শূন্য থেকে ভেসে আসে আওয়াজ—টুং-টাং-টুং-টাং-টুং—

* (পিরান্দেলোর একটি গল্পের অনুসরণে)

লুডভিগ ফন্ বিটোফেন

শক্তিপদ রাজগুরু

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে (১৭৭০ খৃঃ ১৬ই ডিসেম্বর) বিটোফেন জার্মানীর 'বন্' শহরে জন্মেছিলেন!

সংগীতজ্ঞ অনেকেই জন্মেছিলেন তাঁর জন্মের আগে! প্যালেস্-ট্রিনা থেকে মোজার্ট পর্যন্ত যে কেউ জন্মেছিলেন খ্যাতিমান-প্রতিভাবান সুরস্রষ্টা—তাদের থেকে বিটোফেন সংগীতের প্রাথমিক শিক্ষার পথই বেছে নিয়েছিলেন তাদের প্রদর্শিত পথে কিন্তু তারপরে তিনি নিজের প্রতিভা এবং সৃজনীশক্তিতে যে পথ নিজে প্রবর্তন করেছিলেন, যে জগৎ রচনা করে গেছেন স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এবং প্রতিভায়, আজও তা উজ্জ্বল হয়ে আছে এবং যতদিন সংগীত বেঁচে থাকবে—শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করবে প্রতিটি মানুষ তাঁর নাম।

এমন একসময়ে বিটোফেন জন্মগ্রহণ করেছিলেন যাকে ইউরোপের এক সংকটময় মুহূর্ত বলা যেতে পারে। শান্তি এবং সাধারণ জীবন-যাত্রা বিপর্যস্ত, ফরাসীবিপ্লবের উত্তেজনা ছেয়ে গেছে সারা ইউ-রোপের মনে এবং তন্ত্রীতে, নেপোলিয়নের যুদ্ধবাদী বুভুক্ষু দানবি-কতার করালছায়া গ্রাস করেছে প্রতিটি জাতির ভাগ্যাকাশ, শিল্পীর সহজ সরল মনে তার জটিলতা গুরু-বন্ধন এনেছে পদে পদে, এমন এক যুগসন্ধিক্ষণে জন্মেছিলেন তিনি অতি সাধারণ এক দরিদ্র পরি-বারে। কঠোর বাস্তব জীবনে বাঁচবার জন্য পদে পদে সংগ্রাম, আদর্শ-বাদের সংগে বাস্তববাদের প্রতিমুহূর্ত সংঘাত তাঁর জীবন এবং শিক্ষাকে বাস্তবধর্মী করে তুলেছিল, সেই দৃষ্টিভংগীই নির্দেশ দিয়ে-ছিল তাকে প্রকৃত পথের চিরসত্য এবং সুন্দর পথের—যে পথে তিনি পেয়েছিলেন অমৃতের সন্ধান!

পৃথিবীতে এমন এক এক সময় আসে যখন মহাপুরুষ একজন নয়—একজনের পর একজন আসেন! বিটোফেনের জন্মের আঠার মাসের মধ্যে আরও দুজন অতিমানব জন্মেছিলেন ইউরোপে! নেপোলিয়ান বোনাপার্ট এবং কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ। নেপোলিয়ন সৃষ্টি করেছিলেন ফরাসী সামান্ত, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ সৃষ্টি করেছিলেন ভাষা এবং ভাবের এক মধুময় জগৎ, এবং বিটোফেন ছিলেন সুররাজ্যের স্বর্গদূত। কিন্তু ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে নেপোলিয়ন তার শক্তির অপমাননা করলেন নিজেকে আত্মম্ভর সম্রাট গড়ে তুলতে গিয়ে, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রকৃতির কবি—প্রকৃতিবন্দনা ছেড়ে দিয়ে গেলেন রাজ-সভায় রাজপ্রশস্তি গাইতে কিন্তু বিটোফেন ঈশ্বরদত্ত প্রতিভাকে নিছক পণ্যের বেসাতী করতে স্বার্থবুদ্ধির খরশান লাগান নি, যে মধ্যবিত্ত খেটেখাওয়া জীবন থেকে এসেছিলেন জীবনের শেষদিনেও সেই জগতেই ছিলেন! যে উদ্দাম সৃজনীশক্তি তাকে জীবনের পথে সৃষ্টির প্রেরণা যুগিয়েছিল, সেই মহাশক্তির চরম অপমাননা করেননি তিনি!

বিটোফেন পরিবার দু' পুরুষ ধরে সঙ্গীত চর্চা করছিলেন। বিটোফেনের ঠাকুরদা—কলোনের 'ইলেক্টরে'র অধীনে সঙ্গীত বিভাগে কাজ করতেন সেই সংগে ছোটখাটো একটা মদের দোকানও রাখতেন! বিটোফেনের বাবা জোহান্ বিটোফেন গানের চর্চা করতেন আর বাবার ব্যবসা দেখতেন! সেই সংগে পাকা মাতালও হতেন মাঝেমাঝে! বিচিত্র পরিবেশে প্রথম থেকেই মানুষ বিটোফেন—তাই ঠাকুরদার

চরিত্রের খানিকটা মাধুর্য—স্বাস্থ্যের দৃঢ়তা এসেছিল—আর পিতৃসম্পদ হিসেবে উত্তরাধিকারী সূত্রে পেয়েছিলেন বাবার রগচটা একগুঁয়ে মেজাজ! বিভিন্ন প্রকৃতি মিলে বিটোফেনের শিশুমনে ঘৃণা, বিতৃষ্ণা এবং দারিদ্র্যের সংগে সংগ্রাম যে ছায়াপাত করেছিল—শিল্পীপ্রতিভার সংগে তার বিচিত্র সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছিল তাঁর চরিত্র—যা উত্তরকালে হয়ে উঠেছিল রহস্যময়!

শিশুকালে কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে লালিতপালিত হয়েছিলেন বিটোফেন! জোহানের বাৎসরিক সাড়ে তিনশো ফ্লোরিণ রোজকার স্বামী স্ত্রী দুজনের ভরণপোষণ নির্বাহযোগ্য বলা যেতে পারতো, কিন্তু মোটে সাতটি সন্তানের পিতা হয়ে জোহান বেশ একটু বিপদেই পড়ে ছিল, অবশ্য তিনজন তাদের বেঁচেছিল শেষপর্যন্ত। জোহানের স্ত্রী ছিল একজন রাঁধুনির মেয়ে—তাই বিটোফেনের ঠাকুদা অপবাদ দিত প্রায়ই যে তার ছেলে নীচঘরের মেয়ে বিয়ে করে বংশের 'খান্দান' তো নষ্ট করলই, নিজেকেও মদ্যপ লক্ষ্মীছাড়া করে তুলল। অবশ্য তখনকার সমাজে রাঁধুনী আর পেশাদার গাইয়ে বাজিয়ের মধ্যে তফাৎ বিশেষ ছিল না। তবুও বিটোফেনের বাবার তুলনায় মা ছিলো অনেক গুণ-মণ্ডিত! সংসারকে স্নেহ প্রীতি দিয়ে—বুদ্ধি দিয়ে ঘিরে রেখেছিল! বিটোফেনের কাছে তাঁর বাবা ছিলো মূর্তিমান একটা বিশৃংখলা—আতংক, মা ছিলো তাঁর কাছে এক স্নেহময়ী, বুদ্ধিমতী নারীর প্রতীক! স্বামীর শত অত্যাচার নীরবে মুখবুজে সহ্য করতে কোন-দিন কোন প্রতিবাদ করেনি, অবশ্য জীবন থেকে তার জন্য সমস্ত আনন্দকে নির্বাসন দিতে হয়েছিল!

এ হেন বিটোফেনের বাবা একদিন স্থির করল বংশের মর্যাদা অর্থাৎ সংগীতের ধারা বজায় রাখতে হবে! চেষ্টা করলে নিজেই অমন দু' চারটে মোজার্ট বানাতে সে পারবে। সুরু হল বিটোফেনকে

নিয়েই! বেশ উন্নতিই করতে লাগলেন বিটোফেন! কিন্তু জোহানের কাছে সংগীত ছিল পণ্যের বেসাতী, ছেলেকে সেই পণ্যের বেসাতী-ওয়ালা করে তুলবার জন্য প্রথমই বাইরের সমাজে একবারে এনে হাজির করল, তখন বিটোফেনের বয়স ছয় বৎসর! পিয়ানো আর বেহালা বাজনা শোনাবার ব্যবস্থা হলো—এবং প্রোগ্রামের আগে জোহান ছেলের বয়স বেমালুম দু'বৎসর কমিয়ে দর্শকদিগকে তাজ্জব বানাবার চেষ্টা করতেও কসুর করলে না—ক্যাইসা চিজ বানিয়েছি গোছের ব্যাপার-খানা!

যাহোক, নোতুন একজন মাস্টার নিযুক্ত হলো তার জন্য, কিন্তু বুড়ো মাস্টারের জায়গা নিলো জোহানের বন্ধু এক বেহালা বাজিয়ে। সারারাত্রি কোথায় মদ মেরে জোহানের সংগে ঘুরে ফিরে বাড়ী এসেই মাস্টার খুদে ছাত্রকে টেনে তুললে বিছানা থেকে! চোখে ঘুমের আমেজ, হাত কাঁপছে, ওদিকে মদের ঘোরে চাঙ্গা মাস্টার হাঁকড়াচ্ছে খুদে ছাত্রকে! সে এক বিচিত্র শিক্ষাপর্ব! ফলে শিক্ষা এগোনো দূরের কথা ভুলতেই বসল সবকিছু।

শিক্ষক যথারীতি আসা যাওয়া সুরু করতে লাগলো, বিটোফেন নিজের জন্মগত প্রতিভার বলেই কিছু এগিয়ে গেল, এবং যে 'এলেম-দার' মাষ্টার সাধারণ এলো তারা বিশেষ কিছুই শিখোতে তাকে পারলে না। এই সময়ে 'গ্যটলব নিফে' নামে একজন সরকারী অর্গ্যানিষ্ট বিটোফেনের শিক্ষকতার ভার নিলেন! তিনি ছিলেন সত্যিকার গুণীলোক—বিটোফেনের মনের প্রসারতা বুঝতে তিনি পেরেছিলেন! 'ব্যচ'-এর অপ্রকাশিত একটা স্বরলিপি **"The Well-Tempered Clavichord"** বিটোফেনকে দিলেন, বিটোফেন এতদিন মনের মতন খানিকটা জিনিষের সন্ধান পেলেন! এতদিন সংগীতশিক্ষাটা তার কাছে কোন প্রলোভন কোন আনন্দই দিতে পারেনি, কিন্তু যোগ্য লোকের হাতে পড়ে সংগীতের রসাস্বাদ করতে তিনি পারলেন! প্রথম জীবনের এই অনাস্বাদিত আনন্দ অনুভূতির সংগে সংগেই 'ব্যচ'-এর প্রভাব তাঁর মনের কষ্টিপাথরে রেখাপাত করে গেল নিবিড়ভাবে।

বিটোফেন এত দ্রুত এগিয়ে যেতে সুরু করলেন যে নিফে আশ্চর্য হয়ে গেলেন, এই প্রসংগে ১৭৮৩ সালে একটা কাগজে লিখেছিলেন তিনি, **"If he goes on as he has begun, he will certainly become a Second Mozart".**

এর একবৎসর পরেই স্টেট অর্কেস্ট্রাতে বিটোফেন নিফের সহ-কারী হয়ে উঠলেন এবং নিফের অনুপস্থিতিতে তিনিই পরিচালনা করতেন অনেক প্রোগ্রাম!

বিটোফেন তার প্রথম শিক্ষাগুরুর প্রতি অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাতে কোনদিনই ভোলেন নি! 'বার্লিনার ম্যুসিক য্যাইটুং' পত্রিকায় প্রকাশিত বিটোফেনের একটা পত্রে দেখা যায় তিনি বলেছিলেন নিফের উদ্দেশ্যে:

> "I thank you for your Counsel very often given me in the course of my progress in my divine art. If ever I become a great man, yours will be some of the credit."

১৭৮৪ সালে বিটোফেন ষ্টেট অর্কেষ্টার একজন শিল্পীর মৃত্যুর পর নিফের ১৩ বৎসর বয়স্ক খুদে ছাত্রটি 'সহকারী অর্গানিষ্টের' পদ পেল বাৎসরিক ১৫০ ফ্লোরিন বেতনে!

এত নৈপুণ্য এবং যত্নসহকারে কাজ করতেন তিনি, সকলেই আশা করত 'নিফের' অবর্তমানে তিনিই হবেন তার পদাধিকারী।

১৭৮৭ সালে তাঁর কয়েকজন উৎসাহী বন্ধু এবং ইলেকটরের অর্থসাহায্যে তিনি ভিয়েনাতে আসেন মোজার্টের কাছে ছাত্র হিসাবে। মোজার্টও তাঁর রচনা এবং বাজনা শুনে স্তম্ভিত হয়ে যান।

সমস্ত কাজের মধ্যেও তিনি বিটোফেনকে শিক্ষা দিতে থাকেন কিন্তু এই সময়ে 'বন্' থেকে সংবাদ এল তার মায়ের অসুখের! মা—পৃথিবীতে তাঁর কাছে সেই ছিল পরম সম্পদ, বাবার নিগ্রহপীড়িতা একটি অভাগী নারী, বিটোফেন চলে এলেন—এবং তার কয়েকদিন পরই মাকে হারালেন তিনি!

মা'য়ের মৃত্যু বিটোফেনকে সবচেয়ে আঘাত করেছিল বেশী। শিল্পীর কোমলমনে মায়ের মৃত্যু এনেছিল দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ঘোষণা—সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ—মানুষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জ্বালাময়ী ভাষা। যা তার মনের স্বরূপই বদলে দিয়ে-ছিল পরবর্তী জীবনে! তিনি হয়ে উঠেছিলেন খিট্‌খিটে মেজাজী—একগুঁয়ে—একরোখা প্রকৃতির মানুষ! হাঁফানী রোগও দেখা দিয়েছিল এর থেকেই।

বন্ধুভাগ্য তাঁর ছিল ভালো! অনেক ধনী পরিবারের সংগে ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ! ব্রুনিং পরিবারের সকলেই নিজের সন্তান-সন্ততির মত তাঁকে দেখতেন। ফ্রাউ ভন ব্রুনিং তাঁকে মায়ের মতই স্নেহ করতেন। কাউন্ট অয়াল্ডস্টেন সর্বদাই সাহায্য করতেন, নিজে কিনে দিয়েছিলেন একটা পিয়ানো—যখন যা দরকার সাহায্য করতেন অবশ্য দেখাতেন এসবই দেওয়া হচ্ছে তাকে সরকার থেকে।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি হঠাৎ বিটোফেন সরকারের কাছে দরখাস্ত করলেন যে তাঁর বাবা জোহানের রোজকারের অর্ধেক যেন তাঁকে দেওয়া হয়, এবং তাঁর ছোট ভাইদের তিনিই হবেন আইনতঃ অভিভাবক—তাঁর বাবা নন। মায়ের মৃত্যুর পর থেকেই বিটোফেন দেখে আসছেন তাঁর বাবা রোজকারের সমস্ত টাকাই মদ খেয়ে উড়িয়ে দেয় আর ছোট ছোট মা-মরা দুটি ভাই রাস্তায় ঘুরে ঘুরে অনাহারে দিন কাটায়। শিল্পীর কাছে এর প্রতিবাদ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল! প্রতিদিন এই কঠোর দৃশ্যের পুনরভিনয় তাকে এই পথ নিতে বাধ্য করেছিল! এবং সরকার তাঁর প্রার্থনা পূরণ করেছিলেন! ছোট দুটি ভাই কার্ল এবং জন তাঁর হেফাজতে এলো, সেই সংগে এলো তাদের মানুষ করবার গুরু দায়িত্ব, মুখের গ্রাস যোগানোর দুশ্চিন্তা, দিনরাত্রি তাঁকে কাজ করতে হল এইবার। অত্যধিক কাজের জন্যই নানা কিছু রপ্ত করতে পেরেছিলেন তিনি! গ্লাক-মোজার্ট, শেলরী এবং তৎকালীন অনেক সুরকারের কাজের সংগে সুপরিচিত হয়ে উঠেছিলেন! 'বন' শহরে অনেক সংগীতজ্ঞের কাছে তাঁর স্বরচিত অনেক স্বরলিপি তাঁকে সুপরিচিত করে তুলেছিল! ১৭৯২ খৃঃ জুলাই মাসে 'হেডেন' বন শহরে এলে বিটোফেনের প্রশংসা শুনে তাঁর স্বরলিপি দেখেন, তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞের প্রশংসা তাঁকে অনু-প্রেরণাই দিয়েছিল।

নভেম্বর মাসে 'নিফে'র চেষ্টায় সরকারী সাহায্য নিয়ে এবং কয়েকজন বন্ধুর পয়সায় তিনি 'বন' থেকে ভিয়েনায় গেলেন 'হেডেনের' কাছে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করবার জন্য!

এক মাস পরেই তাঁর বাবা মারা গেলেন, ফরাসী সৈন্য এগিয়ে

আসছে 'বনে'র দিকে, ইলেকটর আগে থেকেই পালালেন, এই সব নানা কারণে ভিয়েনাতে গিয়ে তাঁর অর্থকষ্টের সম্মুখীন হতে হল, হেডেন নিজে অবশ্য তাঁর কাছে বিশেষ কিছু পয়সা নেননি। তবুও বিটোফেনের কাছে হেডেনের শিক্ষাপদ্ধতি মোটেই মনঃপূত হল না।

ক্রমশঃ বিটোফেন তাঁর উপর অসন্তুষ্টই হয়ে উঠলেন, এই সময়ে হেডেন ইংল্যান্ড যাচ্ছিলেন—বিটোফেনকে আমন্ত্রণ জানাতে বিটোফেন যেতে রাজী হলেন না; এইখান থেকেই তাঁদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়। এবং উত্তরকালে হেডেনের অনুরোধ সত্ত্বেও বিটোফেন তাঁর শিষ্যত্বের স্বীকৃতি পরিচয় দিতে কোথাও রাজী হননি।

অস্ট্রীয়া সাম্রাজ্যের রাজধানী ভিয়েনা সেই সময় গুণী, জ্ঞানী, শিল্পীদের কাছে তীর্থ হয়ে উঠেছিল! সমাজের ধনিকসম্প্রদায়ের কিছু অংশ তখন শিল্পীদের ভালবাসতেন। ব্রুনিং পরিবার-ওয়াল্ডস্টেনদের অনেকে পরিচয়পত্র দিয়েছিলেন বিটোফেনকে। এখানকার অনেক ধনী পরিবারে মেশবার সুযোগ তাই তিনি পেয়েছিলেন।

তাঁর শিল্প প্রতিভা সেই পরিচিতির আসন প্রতিষ্ঠিত করেছিল ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের উপর। ভিয়েনার অনেক প্রাসাদের দ্বার তাঁর কাছে উন্মুক্ত ছিল, তাঁদের মধ্যে—প্রিন্স লবকোয়েৎস্, ব্যারণ ভন্ সোয়েতেন, ইস্থারহ্যাযি, কার্ল লিক্নোয়েস্‌স্কি প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে যাদের বন্ধুত্ব তাঁকে আমরণ ঘিরে রেখেছিল প্রেম-প্রীতি দিয়ে। তাঁরা দিয়েছিলেন তাঁকে আশ্রয়-সাহায্য-উপদেশ এবং শ্রদ্ধা।

বিটোফেন এমনি সমাজের মধ্যে এসে শিল্পিদেবতাকে ক্ষণিকের জন্য বিস্মৃত হননি, বিস্মৃত হননি তাঁর অন্তরদেবতার প্রেরণা-বাণী। দিনের পর দিন নীরবে চলেছিল তাঁর মহাসৃষ্টির সাধনা। নোটবই-এর পর নোটবই ভর্তি হয়ে উঠল সংগ্রহের আতিশয্যে। 'লিওনার্ড দা ভিঞ্চির' নোটবই ছিল এমনিধারা একটি ছোটখাটো সংগ্রহশালা।

প্রতিটি ঘটনা মুহূর্তের অনুভূতি.. প্রতিদিনের দেখার মধ্যে যা-কিছু তাঁর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল, তাঁর নোটবইয়ে সেটি ঠাঁই পেত। এমনি করে জীবনের সমস্ত ঘটনাকে সংগীতজ্ঞের চোখে স্রষ্টার দৃষ্টিতে বসে তিনি দেখবার সাধনা করেছিলেন। এই নীরব সাধনাই তাঁকে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর সুরস্রষ্টা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবার ছিল অন্যতম মূল কারণ। বহু পূর্ব থেকেই তিনি প্রস্তুত হচ্ছিলেন বিরাট কিছু সৃষ্টি করবার জন্য।

এই সময়ে ভিয়েনাতে দেশবিদেশ থেকে অনেক ছাত্রই আসত বিটোফেন তাদের মধ্যে শক্তিশালী যে কয়জনকে পেতেন ভাল করে মিশতেন তাদের সঙ্গে। কার কি ক্ষমতা আছে তার একটা হিসাবও তিনি করে নিতেন। তদানীন্তন দু' একজন ছাত্র তাঁর সম্বন্ধে বলত :

> "Ah—he's a devil. He will play me and all of us to death."

১৭৯৫ খৃঃ মার্চ মাসে বিটোফেন প্রথম প্রকাশ্যভাবে একটি চ্যারিটি শো'য় অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। 'B'flat Concerto for piona & orchestra ছিল তার অনুষ্ঠান। জনসাধারণ প্রথম সেবারে পরিচয় পেলেন বিটোফেনের প্রতিভার। যে খ্যাতি এতদিন সমাজের মুষ্টিমেয় ধনীকের প্রাসাদেই সীমাবদ্ধ ছিল এর পর থেকে তা ছড়িয়ে পড়ল জনসাধারণের মাঝে।

এর পর তিন বছর ধরে বিটোফেন প্রিন্স লিক্নোয়েনস্কির সঙ্গে অস্ট্রীয়া, জার্মানী, হাঙ্গেরীর অনেক জায়গায় বাজিয়ে এলেন। 'প্রাগ' শহর মোৎসার্টকে যেভাবে বরণ করে নিয়েছিল তাঁরা বিটোফেনকেও তেমনি অকুণ্ঠ প্রশংসায় আপন করে নিয়েছিল, এখানে তিনি বাজান স্বরচিত C' major Concerto for piano & Orchestra.

সুরকার হিসাবে তাঁর কাছে 'B' flat-এ যে সুরঝঙ্কার সৃষ্টি করেছিলেন তাকে মনে হয় অতি সাধারণ শ্রেণীর সুর, বিশেষ কোন গাম্ভীর্য তাতে ছিল না—সেই তুলনায় 'C' major Orchestra অনেক উন্নত ধরণের।

বিটোফেন উন্নতি করেছিলেন ধাপে ধাপে। যে বয়সে মোজার্ট নিজস্ব প্রতিভায় উজ্জ্বল হয়েছিলেন, সে বয়সে বিটোফেন বিশেষ কোন কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। মোজার্ট যদি ২৭ বৎসর বয়সেই মারা যেতেন—পৃথিবী তাঁর নিজস্ব প্রতিভার—সুজনীশক্তির প্রশংসা তবুও করত, কিন্তু সে বয়সে বিটোফেন মারা গেলে কোন লোকই তাঁর থাকত না সংগীতজগতে। পায়ে পায়ে মুছে যেত বিটোফেনের পদ-চিহ্ন। উত্তরকালে কেউ জানত না তাঁর নাম

সুখ-শান্তির মধ্যে বিটোফেনের প্রতিভার উন্মেষ হয়নি, হতে পারেনি।

দুঃখের অমানিশায় যখন ছেয়ে গেছে তাঁর জীবন, শিল্পীমনের প্রতিটি পুষ্পকোরক তখনই বিকশিত হয়ে উঠেছে থরে থরে অন্তরের জ্বালা সুরের জালে বদ্ধ হয়ে আজও লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে।

১৭৯৮ সালে খুব অসুখে ভুগলেন, কানের মধ্যে তখন থেকেই সুরু হ'ল একটা শব্দ। শ্রবণশক্তি কমে গেল। প্রথম প্রথম ভাবলেন দীর্ঘদিন একটা সুরসৃষ্টি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, Pathetique Sonata-র উপর কাজ করেছেন তাই হয়ত সেই সুরের রেশ কান থেকে তখনও যায় নি, কিন্তু পরে যখন বুঝলেন শ্রবণশক্তি তাঁর লোপ পেয়ে আসছে সেদিনকার মনের অবস্থা হয়ে উঠল বর্ণনাতীত। পৃথিবীর কোন সুর—কোন ধ্বনি তাঁর কানে পৌঁছবে না—সুরকারের পক্ষে এতবড় অভিশাপ আর কি থাকতে পারে? মৃত্যুই তাঁর কাম্য। ভাইকে যে চিঠি লেখেন তার থেকে খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায় সেই ব্যর্থ জীবনের।

এই সময়ে সবে তাঁর খ্যাতি বিস্তার লাভ করতে সুরু হয়েছে। ১৮০১ সালে ভিয়েনাকে তাঁর Die Geschopfe des Ercmetheus ব্যালের সুরজাল মাতিয়ে দিয়েছে। দৃপ্তকণ্ঠে সেদিন ঘোষণা করলেন তিনি—"I am not contented with my work so far; henceforth I shall take a new path."

সেই নোতুন পথযাত্রার সুরুতেই কি সারা হয়ে যাবে?

> "but what a humiliation when one stood beside me and heard a flute in the distance and I heard nothing or someone heard the sheferd singing and again I heard nothing, such incidents brought me to the verge of despair, but little more and would have to put an end to my life—only art it was that withheld me, ah it seemed impossible to leave the world until I had produced all that I felt called upon to produce, and so I endured this wretched existence—"

... শিল্পের এবং সত্যের পূজারী, যে কঠিন কর্তব্য নিয়ে এসেছিলেন তার গুরুদায়িত্ব অনুভব করতে পেরেছিলেন,

"I speak from experience, it was virtue that upheld me in misery to it next to my art I owe the fact that I did not end my life by suicide—"

জীবনের সবচেয়ে বড় হতাশা তিনি ভুলতে বসলেন সাধনার মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করে দিয়ে। এই সময় অনেক নারীই তাঁর জীবনে এসেছিল। অনেক উচ্চবংশীয়া নারীই এসেছিলেন তাঁর সংস্পর্শে এবং তাদের একজনকে প্রথমে তিনি ভালবাসেন নিবিড়ভাবে। অনেকেই সন্দেহ করেন তিনি ছাত্রী কাউণ্টাসিয়া গুইসিয়ারর্জি। তাঁকে কেন্দ্র করেই রচনা করেছিলেন 'Moon Light' স্বরলিপি। এবং রোমাণ্টিক পর্দা 'G'-তে তার সুরযোজনা করেছিলেন। কিন্তু সামাজিক কারণেই সেই উৎসর্গ লিপি তাঁর বদলাতে হয়েছিল।

দরিদ্র শিল্পীর কাছে প্রেম একটা নিছক বিলাসমাত্র। তিনি বিয়েও জীবনে করেননি। তারপরও নারী এসেছিল অনেক তাঁর জীবনে কিন্তু জীবনীকারের ভাষায় বলা যেতে পারে—

"Beethoven's loves were brief because they could never be fulfilled—like Orpheus, he searched the face of every woman, but forever vainly."

গভীর প্রেমের মধ্যেও নিজের অপমান—মনুষ্যত্বের অপমান—সৃষ্টির জন্য তাঁর মহাজীবনের অস্তিত্ব কোনদিনই তিনি ভুলতে পারেননি।

তিনি লিখেছিলেন একখানা পত্রে—

"Humility of man toward man—it pains me—and when I consider myself in connection with the universe, what am I and what is he whom we call the greatest—and yet—herein lies the divine in man."

প্রেমকে সমস্ত শ্রদ্ধা দিয়েও নিজের জীবনের ব্রতটাই বড় হয়ে উঠেছিল তাঁর জীবনে। শেষের পত্রখানি তাই বিয়োগ ব্যথাতুর।

"No one can ever again posses my heart—none—never. Oh, God! Why is it necessary to part from one whom one so loves and yet my life in Vienna is now a wretched life—your love makes me at once the happiest and the unhappiest of man—at my age, I need a steady, quiet life—can that be under our conditions?"

তাঁর এই সময়কার জীবনে দেখা যায় মনের জ্বালা হতাশার সঙ্গে তিনি প্রবল সংগ্রাম করেছেন পদে পদে। সমাজের সঙ্গে মেলামেশাও বেশী করেননি। এই অবস্থাতেই রচিত হয়েছিল জীবনের প্রসিদ্ধ 'সিমফনি'গুলি। মরবার কয়েক বৎসর আগে আবার সমাজে মেলামেশা সুরু করেন।

১৮০০ সালে ৫ই এপ্রিল তিনি প্রথম তার 'Ist Symphony' শোনান জনসাধারণকে। যে গতানুগতিক পথে সঙ্গীতের ধারা বয়ে এসেছিল এতদিন এর তার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—বিটোফেনের নিজস্ব প্রতিভার সমুজ্জ্বল। জনসাধারণের অনুভূতির সম্বন্ধে সমালোচকরা বলেছিলেন:

—"They were so shocked by the unbridled vivacity and the 'lerio' of the last two movements of the Symphony that they failed to see that it was still essentially a classical product, while the more massive and individual—but somehow quieter—concerts was really much more advanced."

এর পরে রচিত হয় '2nd Symphony' বিটোফেনের প্রতিভা প্রকাশ পাচ্ছে নিজস্ব দৃপ্তভঙ্গীতে। '3rd Symphony' এল স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে:

—"'The Third Symphony' is one of the monumental achievements that at first leave one so bewildered that the immediate impulse is to find some measuring rod that will make them seem more approachable."

থার্ড সিমফনির একটু ইতিহাস আছে পিছনে। প্রথম যখন এটি রচনায় হাত দেন তিনি কোন ব্যক্তি বিশেষের জীবনের মহামুহূর্ত নিয়ে সুরু করেননি। সুরের ধ্বনির চেয়ে, এর মধ্যে অন্য কোন জিনিষ এসে গিয়েছিল তাঁর অজ্ঞাতেই—প্রাণসঞ্চার হয়েছিল প্রতিমায়—কারিগরের অজ্ঞাতেই। স্বরলিপি করতে গিয়ে একটি মহামানবের জীবনের ছায়া অনুভূতির ছায়া তাতে এসে যায়—তিনি হচ্ছেন ফরাসী সাধারণতন্ত্রের অন্যতম বীর নেপোলিয়ান, বিপ্লবের যে মহান সুর বেজে উঠেছিল তাঁর প্রাণে, পুরোনো জীর্ণ অত্যাচারী সমাজের বিরুদ্ধে যে দৃপ্ত ঘোষণা ছিল তাঁর কণ্ঠে তারই রেখাপাত করেছিলেন বিটোফেন 'সিমফনির' স্বচ্ছন্দে। শেষ করে আনছেন, হঠাৎ খবর এল নেপোলিয়ান বিপ্লবীর আসন থেকে জনসাধারণের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন ফরাসী সাধারণতন্ত্র, নিজেই গ্রাস করেছেন সব কিছু, নিজে হয়েছেন 'সম্রাট'। নেপোলিয়ানের এই স্বার্থ উন্মাদনায় হতাশায় ক্ষোভে এবং ঘৃণায় বিটোফেন তাঁর উৎসর্গ পত্র ছিঁড়ে ফেললেন এবং ১৮২১ সালে নেপোলিয়ানের মৃত্যুসংবাদ শুনে তিনি বলেছিলেন:

—"I have already written the music for that catastrophe."

এই Symphony শুনে Bernard Shaw বলেছিলেন:

—"The first movement should be played by giants led by a demigod."

নেপোলিয়নের জীবনের মূল সুর ধ্বনিত হয়েছিল এতে। শেষ জীবনে নেপোলিয়ান তাঁর পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন, তাই 'Funeral March on the Death of a Hero.'-র সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল:

—"The second movement is a march—possibly the most solemn and fitting funeral music ever written—fitting, that is, at the funeral of a genius: it would dwarf a smaller man. ..The final is excessively complecated, and abounds in

mystries of form to which no man may boast the Key."

১৮০৪ সালে বিটোফেন একটি অপূর্ব 'Sonata' রচনা করেন। সুর বৈচিত্র্য এবং সুরবিস্তারের নৈপুণ্যের দিক থেকে আজও তা স্মরণীয় হয়ে আছে।

'Appassionata' এটি উৎসর্গ করেন 'বন্' শহরের পুরোনো বন্ধুর উদ্দেশ্যে। ছোট স্বরলিপি কিন্তু একটি পূর্ণছবি পাওয়া যায় এতে। আকাশ ঘিরে মেঘ নেমেছে। ঘন কালোমেঘের মাঝে বিদ্যুতের দীপ্তি, বজ্রনির্ঘোষ, এলো বর্ষণধারার মুখর বাণী, ধরণীর বুকে গাছের পাতায় তার সুরধ্বনি, তারপর বর্ষণশেষে—দেখা দিল আবার সূর্যালোক।

জীবনের পরমতম দুঃখের বরষাপারে পরমপ্রিয়কে পাবার অপূর্ব আনন্দমদির এক সুরজগৎ বাপোরিত হয়েছে এর মধ্যে।

এই বৎসর তিনি প্রথম অপেরার জন্য 'ব্যালে' রচনা করেন 'Fidelio'। ফরাসী সৈন্য জার্মানী অধিকার করে বসে আছে। ভিয়েনার প্রতিটি মিউজিক হলে তাদেরই প্রাধান্য। এমনি এক হলে প্রথম 'ফিডিলিও' অভিনীত হলো ১৮০৫ সালে। প্রেম কি করে জীবনের বাধাবিপত্তি তুচ্ছ করে জয়লাভ করেছিলো—তাকেই কেন্দ্র করে 'ব্যালে'টি রচিত হয়। স্প্যানিশ চরিত্রের মুখে জার্মানি সংলাপ ফরাসী সৈন্যদের কাছে অজানাই রয়ে গেলো—ফলে তিনরাত্রি অভিনয় হওয়ার পর বই বন্ধ হয়ে গেল।

এই বৎসর ব্যালে ছাড়া '5th Symphony'র কাজ সুরু করেছিলেন। ফরাসী সৈন্যদের জন্য বাজাতে অনুরোধ তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। যাদের শ্রদ্ধা করতে পারেননি, তাদের সামনে তিনি বাজাতে পারবেন না।

এই 'পঞ্চম সিম্ফনি' তাঁকে আজও অমর করে রেখেছে, অনেকের মতে এইটিই নাকি শ্রেষ্ঠ কীর্তি, নয়টি সিম্ফনির মধ্যে এইটিই সবচেয়ে জনপ্রিয়।

—"Let's compared it to Orpheus taming the beasts."

এ সম্বন্ধে বিখ্যাত সমালোচক এবং জীবনীকার Wallace Brockway বলেন :

—"It is a fact that thousands of people who say that they abhor or "do not understand," classical music, go about whisting parts of the Fifth Symphony. It is definitely not a work around which a fence can be built: It belongs to the whole world around, and this obvious fact has made enemies for it among those musical Snobs who delight in fencing off the great masterpieces, and marking them "Private Property."

বিটোফেনের '6th Symphony' খুব বেশী সুপরিচিত হয়নি। এটাকে Pastoral Symphony-ও বলা হয়। গ্রাম্যজীবনের এবং প্রকৃতির মাঝে যে সৌন্দর্য—নদীর কলধ্বনি—পাখীর ডাক সবকিছু মিলিয়ে পৃথিবীতে যে মহাসুরলোক রয়েছে তারই ভাব নিয়ে এটি রচিত।

এই সময় অস্ট্রিয়াতে ফরাসী সৈন্যরা আবার হামলা করেছে। সামাজিক জীবনও সুস্থ নয়—, বিটোফেন এই সময় ওয়েস্ট ফ্যালিয়ার রাজা Jerome Bonaparte-র কাছ থেকে চাকরীর আহ্বান পেলেন। আর্থিক অবস্থা মোটেই স্বচ্ছল নয়, চাকরী নেবেন তিনি ভাবছেন, কিন্তু সংবাদ প্রকাশ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ভিয়েনার কয়েকজন পুরোনো বন্ধু এবং তার ছাত্ররা মিলে নিজেদের পকেট থেকে অনুরূপ খানিকটা করে টাকা দিতে সুরু করলেন নিয়মিত। তাছাড়া স্বরলিপি প্রকাশকদের কাছ থেকে কিছু 'রয়্যালটি' পাচ্ছিলেন, কিন্তু ১৮০৯ সালে অস্ট্রিয়ান মুদ্রামূল্য অর্ধেক কমে যাওয়ায় তার আস্থার বিশেষ কিছুই পরিবর্তন সাধন হলো না।

সেই যুগের শ্রেষ্ঠ সুরকার হেডেনের মৃত্যু হল এই বৎসরই, তার পরে সারা ইউরোপে বিটোফেন ছাড়া জনপ্রিয় প্রতিভাবান সুরকার এবং সংগীতরচয়িতা আর কেউ রইল না। সারা অস্ট্রিয়া-জার্মানীতে তাঁর নাম। পর বৎসর বিটোফেনের জীবনে এলো একটি নারী, বেটিনা ব্রেন-টানো ছিলেন মহাকবি গ্যাটের একজন মন্ত্রভক্ত। মনের যোগাযোগও না থাকা ছিল না তাঁর সঙ্গে, বিটোফেনের জীবনে তিনি আবার ঝড়ের সূত্রপাত করলেন। চির নির্জন শিল্পীর মনে রেখাপাত করল এই ব্রেনটানো গভীরভাবে। তারই উৎসাহে বিটোফেন কাব্য পড়লেন ভালো করে এবং গ্যাটের 'Eqmont'-এর সুরসংযোজনা সুরু করে দিলেন। কোন গজদন্তমিনার খচিত প্রাসাদের অন্তরালে সেই স্বরলিপি লুপ্ত হয়ে গেছে তা আজ কেউ বলতে পারে না, তবে সেই মহান সংগীতের কিছু কিছু আজও বাইরের জগতে রয়ে গেছে।

মহাকবি গ্যাটের সম্বন্ধে বিটোফেনের ছিল অগাধ শ্রদ্ধা, টোপলিজ্-এ দুই মহাপুরুষের সাক্ষাৎকার হয়, কিন্তু মনের দিক থেকে দুজনের প্রতি দুজনের শ্রদ্ধা বাইরের জগতে খুব প্রসারলাভ করেনি। বিটোফেন বলেছিলেন গ্যাটের সম্বন্ধে :

—"His talent amazed me; unfortunately he is an utterly untamed personality, not altogether wrong in holding the world to be datestable, but who does not make it any the more enjoyable either for himself or others by his attitude."

১৮১২ সালের মাঝামাঝি বিটোফেন পরিচিত হন প্রসিদ্ধ 'মেট্রো-নোম' যন্ত্রের আবিষ্কারক Johan Matzel-এর সঙ্গে। উনি ছিলেন ব্যবসাদার মনোবৃত্তির লোক। তৎকালীন প্রসিদ্ধ একজন সুরস্রষ্টাকে তাঁর প্রয়োজন হয়েছিল যন্ত্রটির নাম বাড়াবার জন্যই এবং তিনি হঠাৎ একটা দাঁও পেয়ে গেলেন সেবার নেপোলিয়ানের ওয়াটারলু যুদ্ধের পরাজয়ের সংবাদে। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে নেপোলিয়নের আক্রমণের দুঃসহতা অস্ট্রিয়াবাসীদের মন থেকে মুছে যায় নি, ইংরেজের হাতে নেপোলিয়নের পরাজয় মানেই পরোক্ষভাবে ইংলন্ড তাদের বিপদমুক্ত করল, তাছাড়া আগামী ইংলন্ড ট্যুরে ম্যাজেল ইংরেজের জয়গান শোনাবে বলেই বিটোফেনকে উৎসাহিত করল, তিনিও যুদ্ধ এবং তাকে কেন্দ্র করে দেশপ্রেমের জয়গানের সুরসৃষ্টি আরম্ভ করলেন। তার ফলেই—Brtania Rules the Waves. Malbrouck S'en Va-t-en guerre. এবং God Save the King. প্রভৃতি স্বরলিপি রচনা হয়েছিল যুদ্ধ এবং দেশপ্রেমের পটভূমিকায় তিনি রচনা করেছিলেন এই তিনটির চেয়ে অনেক

উন্নততর আরও একটি স্বরলিপি—'Battle of Leipzig.' প্রথমোক্ত তিনটি স্বরলিপির সমালোচনা ক্রমে ভন লুগে বলেছিলেন

—"The worst trash ever signed by a supreme genius."

সপ্তম সিম্‌ফণি রচনার কিছুদিন পর, ১৮১৪ সালে ২৭শে ফেব্রুয়ারী 'অষ্টম সিম্‌ফণি' প্রকাশিত হ'ল। এটিও বেশ জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছিল—তখনও বিটোফেনের সৃজনীশক্তি ম্লান হয়ে যায়নি। এই সুরছন্দের মধ্যে তিনি নতুন কিছু দেবার চেষ্টা করেছিলেন, ম্যালজেলের 'মেট্রোনাম' যন্ত্রকেও স্থান দিয়েছিলেন এর অর্কেষ্ট্রার মধ্যে।

তাঁর আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃ স্বচ্ছল হয়ে ওঠে কিন্তু বিটোফেনের ছোট ভাই কার্ল দাদার দৌলতে বেশ কিছু টাকা হাতিয়ে বংশের পূর্ব্বতন খান্দান অর্থাৎ মদ ইত্যাদির পেছনে উড়োতে লাগলেন, বিটোফেনের বন্ধুরাও অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন, তাঁর বহু পুরোনো এক বন্ধু শেষকালে নিজেই কার্লকে বেশ দুচার কথা শুনিয়ে দিলেন এবং তার হাত থেকে বিটোফেনের প্রকাশকদের সঙ্গে চুক্তিনামাও নাকচ করবার ব্যবস্থা করলেন, কিন্তু ফল হল সম্পূর্ণ বিপরীত। বিটোফেনের রুক্ষ মেজাজ চড়ে গেলো। তিনি বন্ধুর সঙ্গেই সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। এই ঘটনার এক বৎসরের মধ্যে অন্যতম প্রিয় বন্ধু প্রিন্স লিক্‌নোয়স্কী মারা যান, চারিদিক থেকে আঘাত আসতে থাকে একটার পর একটা।

কার্ল মারা যাবার পর তাঁর পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়ল বিটোফেনের উপরই। কার্লের বিধবা স্ত্রীকে তিনি মোটেই সহ্য করতে পারতেন না, নাম দিয়েছিলেন তার—'রাত্রির রাণী!' তার হাতে একমাত্র ভাইপোর লালনপালনের ভার দিয়ে বিটোফেন নিশ্চিন্ত হ'তে পারেননি। অমন মায়ের আওতায় থাকলে তাঁর ভাইপো কার্ল মানুষ হবে না। তাই আইনতঃ দাবী করলেন নিজেই কার্লের অভিভাবকত্ব।

অপুত্রক—সংসার—পরিবারের কোন ছোঁয়া বিটোফেন পাননি, তাই একমাত্র ভাইপো কার্লকেই স্নেহ করতেন সবচেয়ে বেশী। কিন্তু কার্ল ছেলেবেলা থেকে মায়ের অবহেলা এবং কাকার রুক্ষ মেজাজের জন্যই সুস্থ পরিবেশ পেল না মানুষ হবার এবং সেও বাবার মতই একটা অমানুষ হয়ে উঠল।

শেষ জীবনে ভাইপোকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা—তাঁর অবর্ত্তমানে ভাইপোর জন্য বেশ কিছু সঞ্চয় রেখে যাবার জন্যই অর্থকরী চিন্তায় পড়তে হল তাঁকে। 'Missa Solennis' রচনা করবার সময় ছয় জন প্রকাশককে কথা দিয়েছিলেন এবং শেষ হলে সপ্তম জনকে ছাপবার স্বত্ব দিয়েছিলেন তিনি।

'অষ্টম সিম্‌ফণি' রচনার পর দশ বৎসর প্রতীক্ষা করতে হয়েছিল পৃথিবীকে বিটোফেনের 'নবম সিমফণি' শোনবার জন্য। ১৮২৪ সালে 9th Symphony তিনি মাত্র ৫০ পাউণ্ডের বিনিময়ে লণ্ডনের ফিলাহ্যারমণিক সোসাইটিকে কপি দিয়েছিলেন প্রথম দিনই বাজাবার জন্য। অন্যদিকে ভিয়েনার শ্রোতারাও চান প্রথম এই অনুষ্ঠান হোক তাঁদের নগরেই! শেষ অবধি কোন রকমে পরিস্থিতি রক্ষা হয়।

'নবম সিমফণি' তাঁর শেষ জীবনের কৃত্তিস্তম্ভ। জনসাধারণ মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল! কাগজে কাগজে তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। প্রসিদ্ধ সমালোচক বেকার বলেছিলেন নবম সিমফণির প্রসঙ্গে

—"A giddiness of spiritual intoxication seems to seize the mind, and this greatest of all instrumental songs of life closes with dithyrambic outcry, to echo forever in the hearts of mankind."

Sir W. H. Hadow আরও নিখুঁত মন্তব্য ক'রেছিলেন:

—"When the chorus enters it is as though all the forces of humanity were gathered together: number by number the thought grows and widens until the very means of its expression are shattered and we seem no more to be listening to music but to be standing face to face with the living world."

এর পর মাত্র তিন বৎসর তিনি বেঁচেছিলেন এই জীবনটা ছিল অত্যন্ত করুণ—হতাশাময়। ভাইপো কার্ল তাঁকে শান্তি দেয়নি। জীবনে সেই হয়ে উঠেছিল তাঁর দশম গ্রহ। এর পরেও বিটোফেন দশম সিম্‌ফণির কাজ সুরু করেছিলেন—কিন্তু মানসিক অবস্থা সেই শিল্পসৃষ্টির পরিবেশ আর গড়তে পারেনি। সেকাজ অসমাপ্তই রয়ে গেল। Krutzer Sonata-র সুর সংযোজনা করেছিলেন তিনি এই সময়ে।

নিজের অবর্ত্তমানে কার্লের দায়িত্ব তাঁর অন্যতম ভাই জোহানের হাতে দেবার জন্য তিনি ভাই-এর কাছে গেলেন। অনুরোধ উপরোধ আদেশ সব কিছুই ব্যর্থ হল ভাই-এর কাছে। হতাশ হয়ে ভাই-এর উপর অভিমানভরে ভিয়েনাতে ফিরে এলেন তখুনিই। ডিসেম্বর মাস, প্রচণ্ড শীতের মধ্যে একটা খোলা গাড়ীতে ভিয়েনা পৌঁছেই তিনি শয্যা নিলেন! এই তাঁর শেষ শয্যা!

এর পরই অকৃতজ্ঞ কার্লও চলে যায় যুদ্ধে, বিটোফেনের সঙ্গে সেই তাঁদের শেষ দেখা।

চোখের সামনে ঘনিয়ে আসছে জীবনের শেষদিন। রোগশয্যায় তিনি পেলেন লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হ্যাণ্ডেলের কতকগুলো স্বরলিপি, একটা পিয়ানো, মৃত্যুপথযাত্রীর মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। পুরোনো বন্ধুরা এবং ভাই জোহান সকলেই এসেছিল জীবনের শেষদিনে। ২৬শে মার্চ ১৮২৭ সালে ভিয়েনা শহরের বুকে প্রবল ঝড় বইছে, বজ্রের দৃপ্ত নির্ঘোষ—রাত্রির অন্ধকারে বিদ্যুতের দীপ্তি জাগিয়ে তুলল তাঁকে—আকাশের তাণ্ডবের পানে চেয়ে হাতের বদ্ধমুষ্টি নেড়ে জীবনের শেষ নিশ্বাস ফেলে গেলেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুরকার লুড্‌ভিগ্‌-ফন-বিটোফেন।

আজও বিশ্বজন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে নাম—স্বীকার করে

—"If today he is the most universally cherished of all musicians, it is because in the course of this heroic pilgrimage he created something enduring for every sort and condition of man. He failed often, but in the one overpowering ambition of his life he succeeded supremely: for the humanity he loved so much he left a testament of beauty with a legacy for every man."

উৎসব রাতি শেষে

জেমস্‌ জয়েস ঃ অনুবাদ—প্রীতিময় বাগচী

অন্ধকারাচ্ছন্ন বন্ধ গলি হচ্ছে নর্থ রিচমণ্ড স্ট্রীট। 'ক্রিশ্চান ব্রাদার্স স্কুলের' ছুটির পর কয়েক মুহূর্তের জন্য গলিটি মুখর হয়ে ওঠে তারপর আবার নিস্তব্ধতার অতল গহ্বরে তলিয়ে যায় গলির স্তব্ধতাটুকু। গলির একদিকে একটা দোতলা জনহীন বাড়ী—অন্য বাড়ী থেকে তাকে তফাৎ রেখেছে সামনের জমিটুকু। তবে তফাৎ বাড়ীগুলো দেখলে মনে হয় যেন পরস্পর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আলাপনে ব্যস্ত!—তার মাঝেও যেন নিজেদের ভদ্র, নিরবিচ্ছিন্ন অমায়িক ভাব ফুটে উঠেছে।

আমাদের বাড়ীতে আগে এক পাদ্রী ভাড়া থাকতেন। একদিন পিছনদিকের ড্রইংরুমে মারা যাবার পর থেকেই বাড়ীর আবহাওয়া বদলে গেছে। আগেকার সেই হাসি-ঠাট্টা নেই—তার বদলে সমস্তক্ষণই যেন কোন অব্যক্ত বেদনার চাপা দীর্ঘশ্বাসে ভরা। রান্নাঘরের পেছনের আলোবাতাসহীন ছোট্ট ঘরখানাতে নানা কাগজ স্তূপাকার করা ছিল; একদিন তারি মাঝে খুঁজে পেলাম স্কটের 'The Abbot' আর 'The memories of vidocag' সেগুলোর পাতা কুঁচকে গেছে, আসল রং কি ছিল তাও বোঝবার উপায় নেই। বাড়ীর পিছনের আপেল গাছের নীচে ইতস্ততঃ ভাবে ছড়িয়ে আছে কয়েকটি ঝোপ। তারি একটার নীচে একদিন আমাদের বাড়ীর ভাড়াটে সেই পাদ্রী সাহেবের সাইকেল ল্যাম্প খুঁজে পাই। পাদ্রী সাহেব লোক খুব ভালো ছিলেন। তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে যান।

গরমের রৌদ্রদগ্ধ দিনের শেষে আসে শীতের ক্ষীণ আমেজ। এই সময় দিনের অনেকখানি অংশ সন্ধ্যা খাবলে নেয়। তাই আমাদের ডিনার খাবার শেষ হতে না হতেই চারিদিকে নেমে আসতো নিবিড় ঘন অন্ধকার। তারপর যখন রাস্তায় বের হতাম বেড়াবার জন্য তখন মনে হোত আসে-পাশের বাড়ীগুলো যেন নীরব প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে। আকাশের বুকে নীল রং-এর মেঘের দল খেলা করে বেড়াতো আর ল্যাম্প-পোষ্টগুলো যেন সেই খেলার দর্শক হিসাবে পাঠাতো মাথার দিকের ক্ষীণ আলোর শিখাকে। ঠাণ্ডা বাতাসে শরীর কাঁপলেও যতক্ষণ না ক্লান্ত হয়ে পড়তাম ততক্ষণ আমাদের খেলা চলতো। চারিদিকের নির্জন আর নিস্তব্ধতার মধ্যে ভেসে বেড়াতো আমাদের চীৎকার। খেলতে খেলতে কখনও চলে আসতাম বাড়ীর পিছনে, কখনও বা বাগানে, আবার কখনও একেবারে আস্তাবলে। সেখানে সর্বদাই একজন লোক থাকে ঘোড়াগুলো দেখাশুনা করবার জন্য। তারপর বাড়ী ফেরার সময় হলে দেখতাম রান্নাঘরের আলো জানলা ভেদ করেও বাইরে এসে পড়েছে। যদি কোনদিন দেখতে পেতাম যে তখন বাড়ী ফিরছেন, তাহলে তাঁর বাড়ীতে না ঢোকা পর্য্যন্ত বাইরের অন্ধকারে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতাম। কিংবা আমাদের পাশের বাড়ীর মনৃগানের বোন যদি তার ভাইকে চা খেতে ডাকবার জন্য বাইরে বেরিয়ে আসতো তাহলেও সেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে তার চলা-ফেরা লক্ষ্য করতাম। সে চলে যাচ্ছে না দাঁড়িয়ে আছে তাই লক্ষ্য করা ছিল আমাদের কাজ। যদি দেখতাম সে তখনও দাঁড়িয়ে তাহলে আমরা ধীর পায়ে মনৃগানের বাড়ীর দিকে এগিয়ে যাই। পিছনের আধখোলা দরজা থেকে আলো এসে লেগেছে তার গায়ে। আমি রেলিং ধরে তাই দেখতাম।

প্রত্যেকদিন সকাল বেলায় ঘুম ভাঙলেই আমার চোখ দুটোও বাড়ীর দরজার দিকে চলে যেতো। ও পথের লক্ষ্য আমি যাতে পড়তে না পারি। তার জন্য খড়খড়িটা অল্প একটু ফাঁক করে রাখতাম। যখন সে বাইরের দরজায় এসে দাঁড়াতো, কেন জানি না, তখন আমার বুকখানা হাপরের মত ওঠা-নামা করতে থাকে। তখন উঠে পড়ে এক দৌড়ে হাজির হই হলঘরে, তারপর

সেখান থেকে বই নিয়ে তার পিছু নিই। তার মুখের বাদামী রং-এর আভাটুকু হাঁটবার সময় আমার মনকে সর্ব্বদাই আচ্ছন্ন করে রাখে। তারপর পথের বাঁকে সে মিলিয়ে যায়—আমিও তাড়াতাড়ি পা চালাই আমার গন্তব্যস্থলের দিকে। দিনের পর দিন ধরে এই ভাবে চলতো নির্জ্জন আলাপ। কয়েকটি সাধারণ কথা ছাড়া আর কোন কথা হয় নি। তবু তার নাম আমার রক্তে যে নাচন লাগাতো তা যেমনি বিস্ময়ের তেমনি আবেগের।

বাস্তবের রূঢ় প্রকাশ যার মধ্যে আছে সেখানেও তার মূর্ত্তি আমার চোখে জ্বল জ্বল করে উঠতো। প্রতি শনিবার কাকীমার বাজার করা কাজ। আমাকেও তাঁর সাথে যেতে হয় মাল-পত্তর বইবার জন্য। বাজারে যাবার রাস্তার চারিদিকে নোংরা আর কদর্যভরা। কোথাও মাতালেরা ঘর করছে ভাড়াকরা স্ত্রীলোকদের সাথে, কোথাও বা শ্রমিকদের অহেতুক ঝগড়া আর চীৎকার চলেছে। এই আবহাওয়ার মাঝে হেঁটে যেতাম। তখন কেবলি মনে হোত আমার আদর্শকে যেন হাতের মুঠোয় পুরে রেখেছি। প্রতি মুহূর্ত্তে তার নাম আর প্রশংসার কথা ঠোঁটের ডগায় ভিড় করতো। কেন জানি না এক এক সময় ভাবতায় কোন দুরন্ত আবেগ যেন আমার বুকের মধ্যে চালিয়েছে দাপাদাপি। ওর সাথে আর কোনদিন কথা বলব কি না, আর সে সুযোগও যদি আসে তবে কি ভাবে জানাব আমার অন্তরের শ্রদ্ধা?

আমাদের বাড়ীর পিছন দিকে যেখানে পাদ্রী সাহেব মারা গিয়েছিলেন, একদিন সেখানে এসে দাঁড়ালাম। দিনটা ছিল ঠাণ্ডা মাখানো কেমন যেন স্যাঁতস্যাঁতে ভরা। চারিদিক নিশ্চুপ আর নির্জ্জন। হঠাৎ জানলার সার্সিতে বৃষ্টি পড়ার মত টুপটাপ শব্দ বেজে উঠল। খানিক পরেই দূরের একটা আলো আমার চোখ ঝঁজিয়ে দিল। তার জন্য কোন অনুযোগ করলাম না। মনের মধ্যে সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন একসাথে বিদ্রোহ শুরু করে দিয়েছে—যেন বার বার তাদের কাছে ঘটছে আমার পরাজয়। আমি আমার দু' হাত ঘষতে ঘষতে বলে উঠলাম—'হে প্রিয় বান্ধবী মোর!'

অবশেষে তার দেখা পেলাম একদিন। আমার সলজ্জ ভাব দেখে সে নিজেই জানতে চাইল আমি কি 'অ্যারাবী'তে যাচ্ছি? আনন্দের আতিশয্যে কি উত্তর দিয়েছিলাম মনে নেই, কারণ ততক্ষণে তার কথা আমাকে বিভ্রান্ত করে ফেলেছে।

কোন রকমে লজ্জা ভেঙে জিগ্গেস করছিলাম সেও যাবে নাকি! কিন্তু তার যাওয়া হবে না শুনে একটু অবাক হলাম। তাই একমুখ বিস্ময় নিয়ে প্রকাশ করি—'তুমি যাবে না কেন?'

উত্তর না দিয়ে কব্জির দামী চুড়িটা নাড়তে লাগল ও, তারপর একসময় জানালো—এ সপ্তাহে স্কুলে একটা বড় উৎসব আছে, তাই যেতে পারবে না।

রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ কথা বলছিলাম আমরা। ওর দু' ভাই বাগানে খেলা করছে। ও ধীর পায়ে এগিয়ে রেলিংটা চেপে ধরে আমার মাথাটা নেড়ে দিল। উলটো দিক থেকে একটা আলোর রেখা এসে লেগেছে আমাদের গায়ে—সেই আলোয় রেলিং-ধরা হাতটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

'তুমি গেলে ভালো হয়।'

'কেন শুনি? যদি যাই তাহলে তোমার জন্য নিশ্চয়ই একটা কিছু কিনে আনব।' অনেক ভেবে চিন্তে এই কথাটাই বলে ফেলি।

তার পর আলাপ আরো গভীর হয়ে এলো। অপরিচয়ের আড়ালটা কখন ভেঙে গেছে তা কেউই টের পাই নি। কিশোর মনের কত অসংখ্য প্রশ্ন, কত অসামঞ্জস্য প্রলাপ···। ইচ্ছে হোল মধ্যেকার দুঃখে-রাঙা দিনগুলো দিই নিশ্চিহ্ন করে। সমস্ত কর্ম্মতালিকা এক নিমেষে উল্‌টে গেল। শয়নে স্বপনে যেন তার মূর্ত্তি কেবল ভেসে বেড়াচ্ছে···বইএর পাতার প্রতি লাইনে বুঝি তার কথা লেখা।

'অ্যারাবী' কথাটা যে এতখানি আলোড়ন আনবে কে আগে তা ভেবেছিল? শেষে থাকতে না পেরে এক শনিবার কাকীমার কাছ থেকে ছুটি চেয়ে নিলাম। তিনি একটু অবাক হলেন। অন্য রকমের কিছু একটা ভেবেও নিলেন হয়ত! তাই অন্যদিনের মত সেদিন আর খুব

বেশী কথা বললাম না স্কুলে। মাষ্টার মশাইরা আমার এ পরিবর্ত্তন সহজভাবে গ্রহণ করলেন কিনা জানি না, তবে তাঁদের ধারণা হয়ে গেল আমি এবার থেকে ফাঁকি দিতে সুরু করব। এদিকে আমার মনে যেসব চিন্তা পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে তা বোঝাই কাকে? ধৈর্য্য ধরে সরকারী কাজ করবার উৎসাহ কোনদিনই আমার নেই, আর সেই ধৈর্য্য যখন আমার কামনার পথে বাধা সৃষ্টি করছে, তখন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আমার মনের ভাব বদলে চলেছে।

শনিবার সকালে কাকাকে গিয়ে ধরলাম যাতে আজ সন্ধ্যায় 'অ্যারাবী'তে যেতে পারি।

'আমি সে কথা ভুলিনি।'

কাকা হলে দাঁড়িয়েছিলেন, তাই জানালার ধারে শোওয়া হোল না। বাড়ীর সমস্ত আবহাওয়া এক মুহূর্ত্তে যেন ঝিমিয়ে উঠল।

সন্ধ্যা বেলায় খেতে এসে দেখি কাকা তখনও ফেরেন নি, যদিও অন্যদিনের চেয়ে সেদিন অনেক আগেই খেতে এসেছিলাম, ঘড়ির কাঁটার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে যখন বিরক্তি ধরে গেল তখন ওপরে উঠে এলাম। সামনের জানালা দিয়ে চোখ চলে গেল মাঠের ওপর। দেখি আমার বন্ধুরা তখনও খেলা করতে ব্যস্ত। তাদের অস্পষ্ট চীৎকার যদিও আমার কানে এসে বাজছিল তবু তাতে খুব বেশী উৎসাহ পেলাম না। সার্সির কাঁচে চোখ লাগিয়ে ওর বাড়ীটা দেখতে চেষ্টা করি, কিন্তু কিছুই চোখে পড়ল না। তবু পুরো একটা ঘণ্টা এ ভাবে দেখতে লাগলাম।

বেশ বিরক্তি নিয়ে নীচে নেমে দেখি মিসেস মার্থার গল্প করছেন। তিনি আমাদের প্রতিবেশী। লোক হিসাবে খুব সুবিধার নন। বয়স হলে কি হবে তাঁর সাথে কথা বলবার জুড়ি মেলা ভার। চাতে চুমুক দিতে দিতে অনেকক্ষণ তাঁকে সহ্য করতে হোল। এদিকে ঘড়ির কাঁটা ক্রমেই ঘর বদলে চলেছে তবু কাকার আসার নাম নেই। খানিক পরে মিসেস মার্থা বিদায় নিলেন। কিন্তু যাবার সময় সবিনয়ে বলে গেলেন—এত তাড়াতাড়ি বিদায় নেবার জন্য তিনি বিশেষ দুঃখিত। রাতের হাওয়া নাকি তিনি একদম সহ্য করতে পারেন না। আমি অস্থিরভাবে পায়চারী করতে থাকি। কাকীমা আমার অবস্থা দেখে হেসে ফেলে বললেন—'আজ 'অ্যারাবী'তে যাওয়া তোমার কপালে লেখা নেই বোধ হয়।'

ঢং ঢং করে নটা বাজতেই কাকা বাড়ী ঢুকলেন। দূর থেকেই শুনতে পেলাম তাঁর কণ্ঠস্বর। কিন্তু কণ্ঠ যে নিজের সাথেই বলছেন তা বুঝতে পারি নি। গায়ের ওভার কোটটা ছুঁড়ে দিলেন ষ্ট্যাণ্ডের দিকে। থর থর করে কেঁপে উঠল ষ্ট্যাণ্ডটা, তাঁর এই মূর্ত্তির সাথে যদিও আমার পরিচয় ছিল, তবু বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সোজা খাবার ঘরে গিয়ে 'অ্যারাবী'তে যাবার জন্য টাকা চেয়ে বসলাম।

কথাটা তাঁর যেন বিশ্বাস হোল না। সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—'সবাই এখন অধিক রাত্রে তার তুমি যাবে 'অ্যারাবীতে?'

মুখ নামিয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকি আমি।

কাকীমা আমার হয়ে ওকালতী সুরে বললেন—'যেতে চাচ্ছে যখন, তখন যেতে দাও। তোমার জন্য বেচারা কখন থেকে বসে আছে।'

কাকা আর আপত্তি করলেন না। কোথায় যাচ্ছি জিগগেস করে টাকা দিয়ে দিলেন। রান্নাঘর পার হয়ে আসার সময় শুনতে পেলাম কাকার কণ্ঠস্বর। কাকীমাকে তিনি কবিতা শোনাচ্ছেন।

অকারণ পুলকে মনটা ভরে উঠেছে। তাই যেন খুসীর আবেগে বাকিংহাম ষ্টেশনের দিকে ছুটে চলেছি। চারিদিকের আলোকমালা আর সাজানো দোকানের মাঝে বার বার ফুটে উঠতে লাগল তার মুখখানা। ষ্টেশনে এসে দেখি একটা গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। তারি এক খালি কামরায় চেপে বসলাম। ট্রেণ ছাড়তে তখনও দেরী ছিল—এদিকে আমিও ক্রমেই অধীর হয়ে উঠছি। যাই হোক এক সময় আমার আগ্রহের অবসান ঘটিয়ে সে ছুটে চলল ভাংগা ভাংগা বাড়ী আর নদী-খাল-বিলের মাঝখান দিয়ে। ওয়েষ্টল্যাণ্ড ষ্টেশনে গাড়ী আসতেই যাত্রীদের ঠেলাঠেলি সুরু হয়ে গেল। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ বাউকেই

উঠতে দিলেন না—কারণ 'অ্যারাবী' উৎসবে যাবার জন্ত গাড়ীটা বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট করা।

নির্জ্জন পথে জ্যোৎস্নালোকিত রাতের সেই শূন্ত কামরায় আমি একা যাত্রী, কয়েক মিনিট পরেই আমার গন্তব্য স্থানে এসে ট্রেণটা থেমে গেল। আমি লাফ দিয়ে নেমে পড়লাম। রাস্তার এক ঘড়িতে দেখি তখন দশটা বাজে প্রায়। চোখ নামিয়ে সামনে তাকাতেই 'অ্যারাবী' উৎসবের বাড়ীটা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

ছ' পেনীর গ্যেটে ঢোকা হোল না—উৎসব শেষ হয়ে যাবার ভয় রয়েছে মনে। তাই এক শিলিং দিয়ে ঢুকে পড়লাম। ঢুকেই দেখি চারিদিকে গ্যালারী বেষ্টিত এক হলঘরে দাঁড়িয়ে আছি। অনেক দোকান বন্ধ হয়ে গেছে; কোনটা হচ্ছে, কোন কোনটায় আবার তোড়-জোড় চলেছে। সমস্ত ঘরময় একটা আবছা অন্ধকারের আবরণ। উপাসনার পর যে স্তব্ধতা ভেসে বেড়ায় এখানেও ঠিক সেই রকম নিস্তব্ধতা। ধীর পায়ে ভেতরের দিকে এগিয়ে চললাম। যে দোকানগুলো তখনও খোলা রয়েছে, তার সামনে একটা ছোট্ট গলি চলেছে। একটা রেস্তরাঁর দরজায় দু'জন লোক টাকা গুণছিল—তার আওয়াজ বেশ স্পষ্ট শুনতে পেলাম।

হঠাৎ আমার চমক ভাঙলো। এখানে আসার উদ্দেশ্য মনে পড়তেই একটা ষ্টলে গিয়ে কয়েকটা ফুলদানী আর কাজ করা চায়ের সেট বার করতে লাগলাম। দরজায় এক তরুণীর সাথে দু'জন পুরুষের আলাপে তাদের ইংরাজী আলোচনায় আকৃষ্ট না হলেও কথাগুলো কানে এসে লাগছিল।

'বেশ মজা তো? এ কথা আবার কখন বললাম?

'হ্যাঁ নিশ্চয়ই বলেছ।'

'তুমি বল না?'

'হ্যাঁ···ও-ই তো বলেছে।'

'উঃ এটা নিশ্চয়ই ষড়যন্ত্র···।'

আমার দিকে চোখ পড়তেই তরুণী এগিয়ে এসে জিগ্‌গেস করল কিছু কেনার মতলবে এসেছি কিনা। তার কথা বলার ভঙ্গীটা আমার ভালো লাগল না। তবু ষ্টলের প্রবেশ পথের সামনে যে দুটো বিরাট টব ছিল, তার দিকে তাকিয়ে বললাম—'নাঃ এমনি দেখছি!'

টব দুটো অনাবশ্যক নাড়াচাড়া করে তরুণীটি আবার সেই যুবকদের কাছে ফিরে গেল। বেশ বুঝছিলাম ওর দৃষ্টি যুবকদের কাঁধের আড়াল ভেদ করেও আমার দিকে চলে এসেছে।

কেন জানি মনে হোল এভাবে আমার দাঁড়িয়ে থাকা অনুচিত আর অশোভন। তবু নিজের আগ্রহকে প্রকাশ করবার জন্ত দাঁড়িয়ে রইলাম। খানিক বাদে বাজারের দিকে তাকিয়ে নিয়ে এগিয়ে চললাম। হাতের পেনী দুটোকে পকেটে ঢুকিয়ে রেখে দি। কিছুদূর এগিয়ে আসতেই হঠাৎ কে যেন চীৎকার করে উঠল—'আলো নিভে গেছে!'

চমকে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখি হলের ওপর দিকে সত্যি নেমেছে নিবিড় ঘন অন্ধকার।

সেদিকে তাকিয়ে মনে হোল আমার অহংকার আর অন্ধকার আমাকে ব্যঙ্গ করে বলছে—'ওহে, আজ তুমি পশুর স্তরে নেমে গেছ, তার খেয়াল আছে?'

তত্তক্ষণে বুকের মাঝে এক অসহ্য যন্ত্রণা আর অকারণ ক্রোধ আমাকে পাগল করে তুলতে সুরু করে দিয়েছে।

যাভা ও বাঙলা

চুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায়

আজকের যাভার অতীত নাম যবদ্বীপ। বাঙালী ও যাভাবাসীর ধমনীতে একই অষ্ট্রিক মানব-শাখার শোণিত-প্রবাহ প্রবাহিত। অষ্ট্রিক পিতৃপুরুষদের কাছ হতে বাঙালীগণ ও যাভানীজগণ উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে নৃত্য-বাদ্যপ্রিয়তা আর পান-সুপারী চর্ব্বণের স্পৃহা। বাঙলার অষ্ট্রিক-আত্মা খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে আহত হয়েছিল বৈদিক আর্যগণের সন্তানদের দ্বারা তার যাভায় অষ্ট্রিক-আত্মা আহত হয়েছিল খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে সেমেটিক আর্যগণের সন্ততিদের দ্বারা। আজকের যাভাবাসী আত্মিক-বিষয়ে আজকের বাঙালী-হিন্দুর আত্মীয় আর বাহ্যিক-ব্যপারে বাঙালী-মুসলমানের স্বজন।

আজকের যাভার অধিকাংশ জনগণ মুসলমান, কিন্তু যাভার হারানো হিন্দুযুগের সাক্ষ্য দিতে আজো বহু হিন্দু যাভানীজ আছেন। যাভায় 'মাহিষ' ও 'কোবো' প্রভৃতি হিন্দুগণ বাঙলার মাহিষ্য ও কৈবর্ত্তগণের সন্তান বলেই দেশী ও বিদেশী ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক স্বীকৃত। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের এশিয়াটিক সোসাইটি-জার্নালের নবম খণ্ডে যাভার 'মাহিষ' ও 'কোবোগণের' সম্বন্ধে বহু বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। যাভা ও বাঙলার মধ্যে আজো ভাষায়-সভ্যতায়-আধ্যাত্মিকতায় বহুবিধ সমতা পরিলক্ষিত হয়। কোনো মানুষের সংগে কোনো মানুষের, কোনো বিষয়ের সংগে কোনো বিষয়ের সমতা জ্ঞাপক অর্থে বাঙালীগণের মতই যাভানীজগণ 'সম সম' শব্দ ব্যবহার করেন। এই একটী মাত্র 'সম সম' শব্দ যাভা ও বাঙলার মধ্যে সর্ব্ব-বিষয়ে সমতা প্রকাশের সহায়ক।

খৃষ্টের জন্মের অন্ততঃ সহস্র সাল পূর্ব্বে যাভায় প্রথম বাঙালী উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল। যাভা-সুমাত্রা-সিংহল বাঙলার প্রাচীনতম উপনিবেশ। স্মরণাতীত কাল হতে যাভার সংগে বাঙলার বহুবিধ আদান প্রদানের ফলে এক সম ও শুভ সংস্কৃতি, সমাজ-ব্যবস্থা, আধ্যাত্মিকতা স্থাপিত হয়েছিল। আদি অষ্ট্রিক পূর্ব্ব-পুরুষদের রক্ত বিশেষ সহায়ক হয়েছিল যাভা ও বাঙলার মধ্যে সমত্ব অর্জ্জনের সাধনায়।

পণ্ডিত গেবরিল ফেরান্তের মতে খৃষ্টীয় প্রথম শতকে হিন্দু যাভানীজদের দ্বারা মাডাগাসকরে হিন্দু-উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল। মার্কিন-পণ্ডিত প্রেসকটের অভিমত অনুযায়ী মেক্সিকোর মায়া ও আজ্‌তিকজাতির দিন-মাস গণনা-প্রণালী প্রাচীন যাভানীজ গণনা-প্রণালী হতে অভিন্ন। ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে যে মহানাবিকগণ আফ্রিকা মহাদেশে সংস্কৃতি বিতরণ করেছিলেন তাঁরাই প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে আমেরিক মহাদেশে সভ্যতা পরিবেশন করেছিলেন। ইতিহাসের নজীর আছে খৃষ্টীয় দশম শতক পর্যন্ত হিন্দু-মেক্সিকো ও হিন্দু-মাডাগাস-করের সংগে হিন্দু-যবদ্বীপের আদান-প্রদান অটুট ছিল।

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে হিন্দু-নাবিক ও বণিকগণের লব্ধ-জ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই গ্রীক-পণ্ডিত টলেমী পৃথিবীর বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। পণ্ডিত টলেমীর ভূগোলে যাভার সম্বন্ধে বহুবিধ বর্ণনা আছে। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে যবদ্বীপপতি দেববর্ম্মন চীনের রাজদরবারে রাজনৈতিক প্রতিনিধি প্রেরণ করেছিলেন। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে লিখিত চৈনিক পণ্ডিত ফাহিয়ানের বর্ণনা হতে যাভা সম্বন্ধে বহু প্রামাণিক বিবরণ পাওয়া যায়। পণ্ডিত ফাহিয়ানের মতে যাভায় শ্রেণীহীন হিন্দু-সমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল। শ্রেণীহীন হিন্দু সমাজ আর্য-পূর্ব্ব আদি হিন্দু-সমাজের স্বরূপ। বঙ্গদেশেও খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের আগে অর্থাৎ গুপ্ত যুগে বাঙলায় প্রথম আর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্ব্বে শ্রেণীযুক্ত সমাজ-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল না। যাভায় ফাহিয়ানের পরিভ্রমণকালে যাভাবাসী শৈব, শাক্ত, গাণপত্য সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে যাভায় বৌদ্ধ-সম্প্রদায় প্রসার লাভ করেছিলেন।

অষ্ট্রিক পূর্ব্ব-ভারতের পদাংক অনুসরণ করে দ্রাবিড় দক্ষিণ-ভারত পরবর্ত্তীকালে দ্বীপময়-ভারতের বিভিন্ন দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপনে সক্ষম হয়েছিল। বহুদিনের বহুবিধ আদান-প্রদানের ফলে পূর্ব্ব ভারত ও দ্বীপময়-ভারতের মধ্যে রক্তের-হৃদয়ের, সাধনার-সংস্কৃতির যে সুদৃঢ় সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল দক্ষিণ-ভারত তার বিলুপ্তি ঘটাতে সক্ষম হয়নি। যাভার ইতিহাসের হিন্দু-বৌদ্ধ অধ্যায়ের আদি ও অন্ত পর্ব্ব পূর্ব্ব ভারতের সাধনার সুফল আর মধ্য পর্ব্ব দক্ষিণ-ভারতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের মধ্যপাদে 'পূর্ণ বর্ম্মন' নামে এক রাজা যাভার 'বাটাভিয়া' অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। রাজা পূর্ণবর্ম্মনের রাজত্বকালে যাভার অধিকাংশ অঞ্চল আদিতে পূর্ব্ব-ভারতবাসী 'শৈলেন্দ্র-বংশের' অধীনস্থ ছিল। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে সমগ্র যবদ্বীপ শৈলেন্দ্র-সম্রাটগণের অধীনতাবদ্ধ হয়েছিল। খৃষ্টীয় নবম শতকের শেষভাগে যাভায় শৈলেন্দ্র-শাসনের বিলুপ্তি ঘটেছিল এবং যাভা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে সম্রাট 'জয়বর্ম্মন' সমগ্র যবদ্বীপের অধীশ্বর হয়েছিলেন। 'সম্রাট জয়বর্ম্মনের' রাজধানী ছিল 'মজপহিতে'। ষোড়শ শতকে আবার বিজয়ের ফলে যবদ্বীপের বহু হিন্দু স্বকীয়তা সংরক্ষণের জন্য বালি-দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।

যাভায় আর্য্য-পূর্ব্ব আদি-হিন্দু সংস্কৃতি হুহাজার বছর সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। যাভায় প্রাপ্ত দেব-দেবীর মূর্ত্তিগুলি অনার্য্য, শৈব-শাক্ত-গাণপত্য সম্প্রদায়ভুক্ত। 'প্রম্বানান' নামক স্থানের হিন্দু-মন্দিরের শিল্প-স্থাপত্য অপূর্ব্ব। যাভার বিশ্ব-বিখ্যাত বৌদ্ধ-মন্দির 'বারবুদরের' (বড়ভুদরের) সংগে যাভার 'প্রম্বানানের' হিন্দু-মন্দির প্রতিযোগিতার যোগ্যতা রাখে।

যাভায় বৌদ্ধ-ধর্ম্মেরও বিশেষ প্রভাব ছিল। বুদ্ধ ও মৈত্রেয়র বহু ব্রোঞ্জের মূর্ত্তি যাভায় আবিষ্কৃত হয়েছে। যাভায় বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি শৈলেন্দ্র-নৃপতিগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত 'বড়ভূধরের' মন্দির। শিল্প-স্থাপত্যের বিচারে 'বড়ভূদরের' বৌদ্ধ-মন্দির সমগ্র বিশ্বে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান লাভের অধিকারী। যাভার হিন্দু ও বৌদ্ধ-মন্দিরের শিল্প-স্থাপত্যে ও দেব-দেবীর মূর্ত্তি-গঠন প্রণালীতে বাঙলার শিল্প-স্থাপত্যের ও মূর্ত্তিগঠন প্রণালীর প্রভাব প্রমাণিত হয়, বিশেষ করে বাঙলার পালযুগের প্রভাব স্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়। বাঙালী কবি সত্যেন দত্ত তাই গর্ব্বভরে গেয়ে গেছেন—'স্থপতি মোদের স্থাপনা দিয়েছে বড়-ভূধরের ভিত্তি'।

যাভার রামায়ণ ঐতিহাসিকদের কাছে যাভায় বাঙালীর সাধনা ও সংস্কৃতি পরিবেশনের দিগ্‌দর্শন। বাল্মীকির রামায়ণে অথবা রামায়ণের দক্ষিণ ভারতীয় সংস্করণে সীতা রাবণের কন্যা বলে স্বীকৃত নয়, রামচন্দ্রকে সাহায্যে গমনের পূর্ব্বে লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক মন্ত্রপূত গণ্ডীর মধ্যে সীতাকে অপেক্ষা করতে নির্দ্দেশ দেবার কোনো উল্লেখ নেই এবং রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রার পূর্ব্বে রামচন্দ্র কর্ত্তৃক দেবী দুর্গার পূজা প্রভৃতি বহু কাহিনীও লিপিবদ্ধ নেই, একমাত্র পূর্ব্ব-ভারতীয় সংস্করণে ছিল আজো কৃত্তিবাসী সংস্করণে আছে। সিংহল-সুমাত্রা-যাভা-মালয়-আনাম-কম্বোডিয়ায় যে রামায়ণ প্রচলিত তা বাঙালীর রামায়ণের সংগে মৈত্রী-মূলক।

বিখ্যাত ঐতিহাসিকদের মতে অতীব অতীতকাল হতে অনেক কথকের কথিত ও অনেক লেখকের লিখিত বহু কাহিনী ও কিম্বদন্তী প্রচলিত ছিল। কবি-বাল্মিকি কাহিনী ও কিম্বদন্তীগুলির পরিবর্ত্তন ও সংশোধন ঘটিয়ে এবং প্রয়োজন বোধে গ্রহণ ও অপ্রয়োজনীয় বিধায় বর্জ্জন করে মহাকাব্য-রামায়ণ সংকলিত করেছিলেন। ডাঃ বিজন চাটুজ্জের 'ভারত ও যাভা' নামক ইংরেজী পুস্তক এবং ডাঃ সাটেরহামের মালয়-উপদ্বীপ ও দ্বীপময় ভারতে রামায়ণের প্রভাব সম্বন্ধে সুচিন্তিত অভিমত অনুসন্ধানী জনের মনে এ সম্বন্ধে আলোক সম্পাত করবে।

পঞ্চদশ শতকে আরববাসীদের দ্বারা যাভা অধিকৃত হয়েছিল। আরবের মরু-সভ্যতা পাঁচশো বছর যাভা শাসন-শোষণের সুযোগ পাবার পরেও আজো যাভার মাটিতে বিদেশী। যাভাবাসীর বাহ্যিক পরিবর্ত্তন ঘটলেও আত্মিক পরিবর্ত্তন ঘটেনি। আজো মক্কা ফেরৎ যাভার মৌলভী ফল-ফুল-ধূপ-ধূনা হাতে ছুটে যায় শিব ও বুদ্ধের মন্দিরে। যাভার প্রতি গ্রামে মুসলমান জনগণ প্রতি

সন্ধ্যায় অভিনয় করে 'রামলীলা', যাভার প্রতিগ্রামে মুসলীম মহিলাগণ নৃত্যের ছন্দে প্রকাশ করে মহাভারতের কাহিনী। যাভাবাসী মুসলমানের নামকরণ আজো সাধারণতঃ আরবী ভাষায় হয় না। যাভার মুসলমান আজকের স্বাধীন ইণ্ডোনেশিয়ার মুসলীম রাষ্ট্রপতির নাম তাই "সুকর্ণ"।

আর্য্যাবর্ত্তের সংগে অষ্ট্রিক বাঙালীর সম্বন্ধ শাসক ও শাসিতের কিন্তু দ্বীপময়-ভারতের সংগে বাঙলার সম্বন্ধ রক্তের-হৃদয়ের-সংস্কৃতির-আধ্যাত্মিকতার। বিগত একশো বছর ধরে বাঙালী যদি সিন্ধু হতে ব্রহ্মপুত্র অবধি সীমাবদ্ধ ভারতবর্ষে নব আর্য্য-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রচারক হবার পরিবর্ত্তে ভেদ্দাগণের সিংহল হতে আইনুগণের জাপান পর্য্যন্ত অষ্ট্রিক এশিয়ায় আর্য্য-পূর্ব্ব বেদ-পূর্ব্ব স্বকীয় সত্তা ও সংস্কৃতির পুনঃ প্রতিষ্ঠার সহায়ক হত, তাহলে বাঙলার নবযুগ বেশী জয়যুক্ত হত, মানবিকতা অনেক অধিক সমৃদ্ধ হত।

★

সংক্রান্তি

সুবোধকুমার গুপ্ত

আমার যৌবন কেন কল্পনায় আছাড়িয়া পড়ে,
বসন্ত বাঁধানো যত কলা মঞ্জু পুষ্পিতার ভীড়ে।
শুধু মনে হয়,
এমন ক্ষুধিত মন সূর্য অস্ত-সনে
হ'য়ে যাক ক্ষয়।

* * *

বীণা হাতে কতবার সমুদ্রের বেলাভূমে বসে
ভেবেছি আমার মনে এইখানে বুঝি,
ওপারের শতপ্রাণ সুর পাব খুঁজি;
হেসেছে বালুর কণা :
ছিঁড়ে ছিঁড়ে বাঁধা তার পড়ে গেছে খসে।
মনে হয় মন কৃষ্ণ জলে,
ডুবে যাক এই বীণ গভীর অতলে।

* * *

প্রাণের পসরা নিয়ে
জীবনের কত না বন্দরে
মরেছি অনেক ঘুরে
যোরা পথে কত ঘুরে ঘুরে।
কেনা বেচা হয় নাই, কোন লাভালাভ ;
ক্রেতারা থেকেছে বহুদূরে।

* * *

সূর্য কুবো, হে সূর্য আমার ভাই।
নয়, কঠিন আগুন জ্বলে আমাকে পুড়িয়ে করো ছাই।

প্রতিবিম্ব

[অষ্টম পরিচ্ছেদ]

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

সপ্তাহব্যাপী মহামহোৎসব। বোর্ড আপিসের সম্মুখে যে বিরাট ময়দান, যুদ্ধের সময়ে যে স্থানে বিশাল রুজভেল্ট কলোনী স্থাপিত করিয়া আমেরিকানরা ভারতে নব্য আমেরিকার পত্তন গাড়িয়াছিল, সেইখানে মোটা মোটা দড়ির বেষ্টনী, বাঁশের বেড়া, গরাণের খুঁটি, চুণের রেখা দেখা যাইতেছে। মার্কিণ সেনাবাহিনীর চিত্তবিনোদিনী সিনেমা মণ্ড একটা অর্ধভগ্ন দশায় অতীত বৈভবের করুণ সাক্ষ্য দিতেছিল, তাহাই ডালপালায় পত্রে ফানুসে পতাকায় সমুম্খ হইয়া উঠিয়াছে, একদিন ছেলেদের, দুই রাত্রি মেয়েদের থিয়েটার হইবে। হয়ত বা এক সন্ধ্যায় পঙ্কজ মল্লিক, হেমন্ত মুখো, রাই বড়াল, ইলা, এবা, মেনকা, রম্ভা শশা পেয়াবার নাচ গান বাজনার জলসাও বসিতে পারে। বোর্ডের সর্বযজ্ঞের যজ্ঞেশ্বর স্বনামধন্য "দাদা" এক এক সহস্র, গদাঘূর্ণায়মান চরকী হইয়া ঘুরিতেছেন। দাদা 'গেম্' সেক্সনে, 'ইনভিটেসান' ক্যাম্পে, দাদা রিহার্স্যালে, যেখানে খাবার দাবার লাইট্ রিফ্রেশমেন্টের ফর্দ—ওম্নিপ্রেজেন্ট দাদা সেখানেও।

যোগীন মুন্সী এক হাজার কমলা লেবু (সাইজ কি! যেন ২ নম্বরের ফুটবল), দেড় হাজার আপেল, দু' হাজার ন্যাসপাতি. আম, আনারস, আঙুর, পেস্তা, বাদাম, আখরোট; কিসমিস্ আনিয়া একটা ঘর বোঝাই করিয়া ফেলিয়াছে। দাদা সমভিব্যাহারে কমিসনার বোস সাহেব সেই ঘরে ঢুকিয়াই তাজ্জব। হাউ নাইস্! এত বড় আপেল-ত অস্ট্রেলিয়াতেও দেখা যায় না। এ কি, এ যে দেখি, আলফান্সো! বা বা! আপনারা ত খুব আয়োজন করেছেন দেখছি। বিস্তর টাকা খরচ করতে হয়েছে, নিশ্চয়ই। শুধু তাই নয়, এ সব যোগাড় করাও ত অসাধ্য ব্যাপার।

দাদা পশ্চাদবর্তী মুন্সীকে দেখাইয়া বলিল, যোগাড়, এই মুন্সী করেছে, স্যার। ওকে সকলে ওয়ান্ডার-মেকার মুন্সী বলে।

তারা খুব ভুল বলে না। কিন্তু এসব জিনিষ পেলে কোথায়? হগ মার্কেটেও ত' দেখি নি কোনদিন, কমিশনার সাহেব বলিলেন।

দাদা স্নেহের, প্রেমের ধমক দিয়া মুন্সীকে কহিলেন, বল না মুন্সী, বল না, কোথা থেকে আনলে?

আমার বাগানের স্যার। ওর একটি জিনিষও বাজারের নয়, সমস্তই বাগানের।—বলিতে বলিতে মুন্সী আনন্দের আতিশয্যে কোঁকাইয়া কুঁকড়াইয়া প্রায় কেন্নুয়ের মত গোলাকার হইয়া পড়িল।

সাহেব বলিলেন, আপেল আখরোট আঙুর আপনার বাগানের?

মুন্সী বলিল, নইলে কোথায় পাবো, স্যার। আমার ঠাকুর্দা মশাই ঐ বাগান তৈরী করেছিলেন, স্যার, সেকালের লাট বড়লাট সাহেবেরা সময় পেলেই বেড়াতে যেতেন। তাঁদের দেওয়া সার্টিফিকেট মেডেলগুলো—

প্রসঙ্গ পরিবর্তন মানসে 'দাদা' কিঞ্চিৎ ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, মিষ্টির কি ব্যবস্থা করলে হে মুন্সী?

ভিয়েন বসিয়ে এসেছি স্যার। সরপুরিয়া, সরভাজা, মুগের লাড়ু, আবার খাব, আইসক্রীম সন্দেশ—এসে পড়লো ব'লে।

সাহেব গোটা দুই আম হাতে লইয়া পরীক্ষা করিতে করিতে বলিলেন, আমি জানতুম আলফ্যান্সো বোম্বাই স্টেট ছাড়া কোথায়ও হয় না।

মুন্সী দাদার পানে চক্ষু নিবদ্ধ করিয়া—প্রপার চ্যানেল দিয়া যাইতে হইবে ইহাই আইন। ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়া এসব ক্ষেত্রে একেবারেই অচল—সাহেবের উদ্দেশে হইলেও জবাব যেন দাদাকেই শুনাইতে লাগিলেন, সয়েলের উপর সব নির্ভর করে, স্যার—ঐটেই আসল জিনিষ। বোম্বাইয়ের আলফান্সো একটু পান্‌সে পান্‌সে, জলো-জলো ভাব; আর এ একেবারে মধু, মধু। তবু স্যার, বাগানের সে পাট নেই, তেমন সার পড়ে না, দেখাশোনা তাম্বির তদারক কিছুই না। তবু যে হচ্ছে সে কেবল আমার বাপ পিতামোর পুণ্যে। নইলে, স্যার, এই ত ছেঁড়া চাকরী করি, বাগান টাগান রাখা কি আমাদের কম্মো।

দাদা বলিলেন, হয়েছে, হয়েছে। মিষ্টিগুলো এসে পড়লে সাহেবকে দেখিয়ে নিয়ে যেতুম।

এসে পড়লো ব'লে স্যার। সাহেব পাঁচ দশ মিনিট আছেন ত? তার মধ্যে নিশ্চয় আসবে।

দাদা সাহেবকে বলিলেন, স্টেজের দিকটা একবার দেখবেন না?

সাহেব কহিলেন, হ্যাঁ চলুন।

চলিতে চলিতে, থামিয়া পড়িয়া দাদা বলিলেন, তোমার মিষ্টি-টিষ্টিগুলো এলে আমাদের খবর পাঠিয়ো।

সাহেবেরও একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। কথাটা বলিতে হইবে মুন্সীকে, ডিসিপ্লিনের ঠাট্ বজায় রাখিতে বলিলেন দাদাকে। বলিলেন, নতুন চেয়ারম্যানকে এখানেই আসতে বলেছি, ব'লে দিন তিনি এলে আমাকে খবর দিতে।

ইয়েস্ স্যার, আমিই খবর দিয়ে আসবো—বলিয়া মুন্সী লম্বা সেলাম করিল।

দাদা ও সাহেব কয়েকপদ গিয়াছেন মাত্র মুন্সী ছুটিয়া আসিয়া বলিল, স্যার, মিস্টার সিং এসেছেন।

পাঠক অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, সুধাকর সাহেবকে নিঃশব্দে বিদায় লইতে হইয়াছে, তাঁহার স্থানে মিস্টার বি, ডি সিং নং ওয়ান্ (আই-সি-এস) গভর্ণমেন্ট কর্তৃক চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইয়াছেন। আজই তাঁহার জয়েন্ করিবার কথা।

মুন্সী সাহেবদ্বয়কে খবর দিয়াই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া সিং

সাহেবকে প্রত্যুদগমন করিয়া আনিল। বড় সাহেব ছোট সাহেবকে দাদা সাহেবের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন; মুন্সী পার্শ্বে দাঁড়াইয়া হাত কচলাইতে লাগিল।

দাদা বোধ করি অন্তর্যামী, মুন্সীকে কহিল, সিং সাহেবকে তোমার ভাঁড়ার টাঁড়ারগুলো দেখিয়ে দাও হে। আজ থেকে এ সব ভার ত ও'রই।

মুন্সী তৎক্ষণাৎ ছোট সাহেবকে বলিল, আয়োজনটা দেখবেন না স্যার?

ছোট সাহেব বড় সাহেবের সহিত জনান্তিকে দু'একটা কথা সংক্ষেপে সারিয়া লইয়া, দাদার পানে চাহিয়া বলিলেন, আমি আপিসে আপনাদের অপেক্ষায় থাকবো।

সিং সাহেব যেটা দেখেন, অবাক হইয়া যান এবং যেন পূর্বে কখনও দেখেন নাই, বলেন অপূর্ব। তারপর যখন শুনিলেন সমস্তই এই লোকটির উদ্যানজাত, তখন ইহার প্রতি তাঁহার ভক্তি জন্মিয়া গেল। ছোট সাহেব বলিলেন, এ সকল অত্যুৎকৃষ্ট ফসল ফলাইতে নিশ্চয়ই তাঁহার অনেক খরচ হয়?

মুন্সী সবিনয়ে কহিল, হোক স্যার, কিন্তু স্যাটিসফ্যাকসনের কথাটা মনে করলে—

সিং সাহেব কহিলেন, অবশ্য অবশ্য।

মুন্সী ফ্যাচ্ করিয়া একটা লেবু ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দু'হাতে দু'খণ্ড সাহেবের চোখের সামনে ধরিয়া বলিল, রস দেখছেন, স্যার? ঠিক যেন অরেঞ্জ স্কোয়াশ।

এস্‌প্লেণ্ডিড। কমলা লেবুতে এত রস আমি আগে দেখিনি। সিং সাহেব কথাটা মিথ্যা বলেন নাই। সচরাচর কেন, অসচরাচরও এরূপ রসাল কমলা দৃষ্ট হয় না। রস যেমন, সাইজও তেমন।

মুন্সী উল্লাসভরে কহিল, ওয়ান ড্রপ টেস্ট করে দেখুন স্যার, কোথায় লাগে অস্ট্রেলিয়ান পিওর হনি।—বলিয়া একখণ্ড সাহেবের মুখের কাছে ধরিল। মুখের এত কাছে যে, অনিচ্ছা থাকিলেও অধর স্পৃষ্ট হইয়া গেল। সিং সাহেব বলিলেন, হাউ সুইট্।

স্যার, ফ্ল্যাট নিয়েছেন কোথায়?

স্যার একটা ঠিকানা বলিয়া দিলেন, মুন্সী মনে মনে মুখস্থ করিতে লাগিল।

একটু পরে বরাত ঠুকিয়া বলিল, মেম সাহেব, বাবালোগ সব আসিয়াছেন ত, হুজুর।

সিং সাহেবের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল; বলিলেন, হোয়াই?

মুন্সী মুশড়িয়া পড়িলেও ভাগ্যান্বেষণ চেষ্টা পরিহার করিতে পারিল না; বলিয়া ফেলিল, তাঁরা আসেননি বুঝি।

সাহেব কহিলেন, না।

লোকপরম্পরায় প্রচার হইয়াছিল সিং সাহেব বিহারের কোন একটি জেলায় সহকারী জজ ছিলেন। অকুতো সাহসে কহিল, তাঁরা কি স্যার বিহারেই আছেন?

সাহেব সে কথার উত্তর দিলেন না। একটা অবজ্ঞার দৃষ্টি ফেলিয়া সামনের দিকে পদচালনা করিলেন। মুন্সী আরও একবার অনুপস্থিতাদের উদ্দেশে উৎকণ্ঠা জ্ঞাপন করিল, সাহেব কি-এক-রকম হাস্য করিলেন কিন্তু কৌতূহল চরিতার্থ করিবার দরকার দেখিলেন না।

আয়োজন পর্যবেক্ষণ করতঃ সিং সাহেব যখন আপিসে ফিরিলেন, বড় সাহেব তৎপূর্বে নিজের কামরায় অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, সিং সাহেব তথায় গমন করিলেন।

আপিসে একজন নূতন মনিব—দণ্ডমুণ্ডের কর্তা আসিলে কর্মচারী সমাজে কৌতূহল কিরূপ অদম্য হইয়া উঠে তাহা বলা বাহুল্য। সেই কৌতূহলের সহিত বিস্ময় মিশ্রিত হইয়া মাউণ্ট এভারেস্ট প্রমাণ হইয়া উঠিয়াছে এই দেখিয়া যে, মুন্সী নবাগত নবীন মনিবের সহিত একদণ্ডেই এইসা জমাইয়া ফেলিয়াছে। তাহার কৃতিত্বে কাহারও কণামাত্র সন্দেহও ছিল না সত্য কিন্তু সে যে এইরূপ এতোখানি, এবং এক সময়ে অঘটন-ঘটাইতে সক্ষম এ বোধ বোধহয় তাহাদের পুরামাত্রায় ছিল না। অনেকেই তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল এবং সাহেবের নামধাম মর্জি-মেজাজের সম্বন্ধে প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত করিয়া তুলিল। এম্‌প্লয়িজ এসোসিয়েশনের ওয়ার্কিং সেক্রেটারী যদুপতি মিত্র সংক্ষেপে অভিনন্দন জানাইয়া কহিল, আই উইস্ ইউ অল্ সাকসেস্।

মুন্সী হাসিয়া কহিল, দাঁড়ারে ভাই, দাঁড়া, সবুর কর্। এই ত মোটে মাছ চারে আসতে সুরু করেছে।

আর একজন কে বলিয়া উঠিল, মুন্সীর চার, বাবা, অকাট্য, অভ্রান্ত। পুকুরে একটা মাছ থাকলে সেইটেই গপ্ করে টোপ গিলবে।

মুন্সী হাত জোড় করিয়া তাহাকে নিরস্ত করিয়া দিয়া কহিল, শুভকর্মের সুরুতেই শনির দৃষ্টি দিয়ে না বাপসকল।

বোর্ডের সেক্রেটারী মৃত্যুঞ্জয় হন্তদন্ত ভাবে আসিয়া খবর দিলেন, ওহে তোমরা যে যার সীটে বসে পড় গে। নতুন চেয়ারম্যান ঘরে ঘরে ঢুকে কাজ দেখবেন।

কতক লোক গেল, কতক গেল না, কতক যাই যাই করিয়া বিড়িগুলোয় জোর জোর টান পড়িতে লাগিল, বিড়ী ফুরাইলেই টেবিল-চেয়ার জমকাইয়া কর্মে অভিনিবেশ সহকারে মনঃসংযোগ করিবে দৃঢ়সঙ্কল্প, হেলিতে হেলিতে দুলিতে দুলিতে "দাদা" বাহির হইলেন এবং বারান্দা অতিক্রম করিয়া নিজের কামরায় প্রবেশ করিলেন। কেহ দেখিল, কেহ দেখিল না, কেহ দেখিয়াও দেখিল না, কেহ দেখিবে না বলিয়া অন্যদিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দাদা ভি-সি—ভাইস চেয়ারম্যান তবে দেশী ছিলেন আর সিং সাহেব চেয়ারম্যান এবং মেড্ ইন্ ইংলণ্ড মেড্ ফর ইংলণ্ড ও মেড্ বাই ইংলিশম্যান—দুয়ে আসমান জমিন ফারাক্। মৃত্যুঞ্জয়কে অগ্রবর্তী করিয়া সিং যখন বারান্দায় পদার্পণ করিলেন, বারান্দা জনশূন্য, নিস্তব্ধ। এদেশের লোক যমকে ততটা ভয় করে না, আই-সি-এস্‌কে যত ডরায়। দেশ স্বাধীন হইলে কি হয়। "মেড্ ইন্ ইংলণ্ডের" কথাই আলাদা। রিসেপসানের দিন সর্বপ্রথমে দাদা বক্তৃতা করিতে উঠিয়া বোর্ডের অপার, অসম্ভব, আশাতিরিক্ত সৌভাগ্য বিবৃত করিয়া কহিলেন, দু' দু'জন আই সি এসের কর্তৃত্বাধীনে কর্ম করিবার মাহেন্দ্র সুযোগ বোর্ডের জন্মাবধি হয় নাই। তাহার ফলে গাফিলাতি, ফাঁকি, অসাধুতা, আলস্য আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছিল। ভূতে পাইলে যেমন ভাল রোঝা আনিতে হয়, তবে ভূত ছাড়ে, সদাশয় সরকার বাহাদুরও তদ্রূপ দয়াপরবশ দুইজন বিজ্ঞ বিচক্ষণ, ন্যায়বান আই সি এস্ বোর্ডে প্রেরণ

করিয়াছেন। আমাদের এই পক্ষপাতদুষ্ট আত্মীয়পালনপরায়ণ, নৈতিক কালিমালিপ্ত বোর্ড অতঃপর শত সহস্র—না, না অজস্র কলঙ্কমুক্ত হইয়া বঙ্গদেশে আদর্শ বোর্ডের সৌরভ বিস্তার করিবে তাহাতে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। গত কয়দিন হইতে আমি অত্যন্ত দুঃখের সহিত একটা গুজব শুনিয়া অন্তঃকরণে গভীর বেদনা বোধ করিতেছি। বোর্ডের কোনো কোনো কর্মচারী আমাদের নূতন চেয়ারম্যান মিস্টার সিং বাঙ্গালী নহেন বলিয়া তাঁহার নামে কুৎসা রটাইয়া বেড়াইতেছেন। শুনিয়া আমার বড়ই মনস্তাপ হইয়াছে। দেশ স্বাধীন হইল কিন্তু যে কূপমণ্ডুক আমরা ছিলাম অদৃষ্টের দোষে তাহাই রহিলাম। আমরা সকলে ভারতবাসী আজও একথা বলিতে পারিলাম না এমনই আমাদের চরিত্র। আমাদের মন্দ চরিত্রের কথা কত আর বলিব? আই সি এস্ হইলেই দুইজন এই অলীক ও অন্যায় ধারণা কি ঘুচিবে না? তাঁহারা যে দুর্জন নহেন, সুজন, অত্যাচারী নহেন, পরন্তু হিতকারী সে প্রমাণ কি আপনাদের সম্মুখেই নাই? এই সপ্তাহভোর আনন্দ উৎসব—ভাবিয়া দেখুন, আগে আর কখনও হইয়াছিল কি? ছেলেরা খেলিবে, ব্যায়ামের কৌশল দেখাইবে, মেয়েরা তাহাদের শিল্প-কলা, ললিত-কলা ও অন্যান্য গুণপণা প্রকাশ করিবে (ভিড়ের মধ্য হইতে চাপাগলায় কোন্ দুরাত্মা কহিল, মিস্ সুলতা সরকার কষ্ঠীপাথর হাতে স্বর্ণকার আনিয়াছেন ত?—"শেম্! শেম" !!), থিয়েটার বায়স্কোপ ম্যাজিক হইবে, আমরা ও আমাদের পরিবারবর্গ উপভোগ করিব, হিংসাবিদ্বেষ বর্জন করিয়া আমরা সকলে সকলের সহিত বন্ধুতা করিব (আবার কোন্ পাপিষ্ঠ কৃত্রিম কণ্ঠে চীৎকার করিল, বন্ধুতার চোটে সুধাকর সাহেবের ভেরাইটি কাটিল না! আরও বন্ধুতা! আর একটা স্বর—ডিসগ্রেস্! ডিস্গ্রেস !!")—সুতরাং আর আমি কি বলিব? (সেই পামর পুনর্বার কহিল, না না, থামিবেন না, থামিবেন না, বলুন, বলুন, স্তবকবচমালা মুখস্ত বলুন। মুখে ওগুলো খুব ভাল শোনায়!—"হিয়ার! হিয়ার !!") আশা করি, আপনারা খুব আনন্দ উপভোগ করিবেন, আমি বসিলাম। (পাষণ্ড ষণ্ডানিনাদ করিল, আপনারা একবার সমস্বরে বলুন, জয় দাদার জয়!—জয় দাদার জয়। থ্রি চিয়ার্স ফর আওয়ার দাদা। আর একটা অসভ্য বর্বর নকিব ফুকরাইল—পৈতৃক মুলোক্ষেত দাদা, মনের আনন্দে দু' হাতে মুলো উৎপাটন করো দাদা—হি'ইয়ো জোয়ান. হি'ইয়ো।)

বোস সাহেবের গম্ভীর আনন অধিকতর গম্ভীর হইয়া উঠিল। সভা না করিলেই হইত। আমাদের পূর্বপরিচিত সান্যাল মশাই সাহেবের কানে কানে কহিলেন, আপনি বলতে উঠলে দেখবেন সব চুপ থাকবে।

সাহেবের কিন্তু ততখানি বিশ্বাস ছিল না। স্যান্যাল মহাশয়ের কথায় সায় দিলেন না। প্রোগ্রাম পাঠে মনঃসংযোগ করিলেন।

"মাননীয় সভাপতি মহোদয় ও ভদ্রমহিলা ও বন্ধুগণ"—হঠাৎ জলদগম্ভীর স্বর শুনিয়া লোকসকল যেন ত্রস্ত হইয়া উঠিল। যদুপতির মাথাটা যেন চাঁদোয়া পর্যন্ত উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। হাততালি আর থামে না। বোস সাহেব প্রমাদ গণিলেন। দাদার পানে চাহিলেন, দাদা সমাধিস্থ—বাহ্যজ্ঞান বিরহিত। সাহেব সিং-এর দিকে ফিরিলেন। সিং যেন রেকাবিতে পা দিয়া লাফাইয়া অশ্বারোহণ করিবে, এই ভাব। দেখিয়া সাহেব আশান্বিত হইলেন। চোখে-চোখে বোধ হয় যেন কি কথা হইয়া গেল। সিং তখনই দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিলেন, অদ্যকার সভা বক্তৃতার সভা বলিয়া ভুল না করাই ভাল। বোর্ডের অনুরক্ত কর্মচারিবৃন্দ কর্তৃপক্ষকে মানপত্র দিবেন ও অভিনন্দন জানাইবেন, ইহাতে বক্তৃতার বান ডাকাইবার কারণ দেখি না। তবে অভিনন্দনের শেষে কাহারও কিছু বলিবার থাকিলে মাননীয় সভাপতির অনুমতি লইয়া শুভেচ্ছাসূচক দু'চার কথা বলিতে পারেন। তর্কাতর্কি বা মতবিরোধ হইবার সম্ভাবনা আছে এমন কোন কথা বলা এখানে অত্যন্ত অসঙ্গত হইবে—যাকে বলে indiscreet তেমন কোন কথা বলিতে না দেওয়াই ভাল।

যদুপতি দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই বলিল, indiscreet কথাটায় আমার আপত্তি আছে।

সিং সাহেব বলিলেন, আপনি কি জানিতে চান বলুন?

বলিতে দেওয়া হইবে না—আপনি কি ইহাই বলেন নাই? আমরা কি জেলখানার কয়েদী—? আমি জানতে চাই আমাদের কথা বন্ধ করিবার ক্ষমতা কাহারও আছে কি না? আমাদের বক্তব্য আমরা অবশ্য বলিব। তাহাতে বাধা না দেওয়াই সঙ্গত।

সিং ততক্ষণে আরবি ঘোড়ার পিঠে বসিয়াছেন; ঘোড়ার পেটে গোড়ালির চাপ দিবামাত্র গ্যালপে ছুটিবে। সেই চাপটুকু দিতে যা দেরী। বোস সাহেব দেখিলেন, ফ্যাসাদ বুঝি বাধে বা। তাড়াতাড়ি বলিলেন, প্রোগ্রামের নীচের দিকে সমবেত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহোদয়াগণের মন্তব্য লিখিয়া রাখিতেছি। তখন সকলকে বলিবার সময় দেওয়া হইবে।

নৃপতি দাঁড়াইয়া বলিল, বোর্ডের ভি সি যে প্রস্তাব করলেন, আমি সেটার কিয়দংশ সেকেন্ড—সমর্থন করতে চাই।

দ্যাট ইউ ক্যান্—বোস সাহেব অনুমতি দিলেন। না দিয়া করেন কি। সভাস্থলে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহ বহিতেছে। লাঠি খেলার আসরে লাঠিগুলো যেন চক্ চক্ করিতেছে।

নৃপতি একবার এক দৃষ্টিতে সমস্ত প্যান্ডেলটা যেন তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া লইল—সেই জনতা, সেই উৎসবব্যাকুল দৃষ্টি, সেই "দাদা"—ভি সি—বেশ করিয়া সার্ভে করিয়া লইল। তারপর বক্তার ঢঙে, বক্তার ভাষায় সুরু করিল:

বোর্ডের পক্ষ থেকে এই যে মিলনের প্রচেষ্টা, ক্রীড়াকৌতুক আনন্দ উৎসবের আয়োজন, আবৃত্তি সঙ্গীত প্রভৃতিতে বোর্ডের ছাত্রছাত্রীদের কৃতিত্ব প্রদর্শনের ব্যবস্থা, আমরা এর সমর্থন করি। আমরা মনে করি এর প্রয়োজন আছে। এতে আত্মপ্রত্যয় জন্মায়, আত্মপ্রত্যয় থেকে আত্মপ্রতিষ্ঠা। যে ব্যক্তি—বালক হোক, বালিকা হোক, খেলুড়ে হোক অথবা ব্যায়ামী হোক্—আপনাকে দশজনের সামনে সাহস করে দাঁড় করাতে পারে এবং আপন আপন শক্তির বিকাশ দেখাতে পারে, তাকে সেই সুযোগ দেওয়া উচিত। সেইজন্যই এই উৎসব আমরা সমর্থন করি। কিন্তু সমর্থন করি না স্তাবকতা; সমর্থন করি না অযোগ্য ব্যক্তির বন্দনা। যোগ্যের পূজার্চনায় জাতির মহত্ব প্রকাশ পায়; আর যে জাতি যত অন্তঃসারশূন্য অপদার্থ, নির্গুণ ও নির্বীর্য্য সে জাতি যোগ্যাযোগ্য নির্বিচারে স্তাবকতা করাকেই পরমার্থ জ্ঞান করে। বোর্ডের অতীতকে নিন্দায় নরকে নিক্ষিপ্ত ক'রে বর্তমানের জয়ঢাক ঘাড়ে

ক'রে যারা চড়কপুজোয় শিবের গাজন জমাতে চায়, তাদের জঘন্য মনোবৃত্তির ছোঁয়াচ যেন আমাদের না লাগে। তাদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে তারা না পারে এমন কাজ নেই। তারা স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যে দরকার বুঝলে অন্যের ঘরের দরোজায় পা-পোষ হ'য়ে শুয়ে থাকতে পারে। সুবিধে হবে জানলে জুতোর সুখতলা হতে চাইবে; লাথি খেয়েও চটাপট্ চটাপট্ শব্দে লাঙ্গুল আছড়াতে থাকবে (সমুদ্র গর্জনবৎ শব্দ উত্থিত হইল Long live our Dada the great!)। বোর্ডের অতীত অনেক মন্দ কাজ করেছেন, আমরা জানি; আমাদের খাতাপত্র দেখলে দেখা যাবে অনেক নিন্দা-প্রস্তাব এসোসিয়েসান থেকে আমরাও পাশ করেছি। অনেকের মুখে চুণকালীও মাখিয়ে দিয়েছি। কিন্তু বর্তমান সামনে বর্তমান আছে ব'লেই তার পদলেহন করবার প্রবৃত্তি যেন কারও না হয় (পুনরায় গর্জন, Dada, please note, please note)। প্রশংসা করবার কোন কাজ কি বোর্ডে হয়েছে?

দরিদ্র মজদুর শ্রমিক কেরাণীর দারিদ্র্য, দুর্দশা ও দুঃখের পানে কারও নজর পড়েছে কি? অনাচার কি এক বিন্দুও হ্রাস প্রাপ্ত হয়েছে? বোর্ডের পুঞ্জীভূত আবর্জনা কি সাফ হয়েছে, না, বেড়েই চলেছে? বরং আমরা দেখছি—

বোস সাহেব দণ্ডায়মান হইয়া দুই-তিন মুহূর্ত নীরব রহিলেন, তারপর বলিলেন, নৃপতি বাবু, আপনি সীমা লঙ্ঘন করছেন ব'লেই মনে হচ্ছে। আপনি পরে যথেষ্ট সময় পাবেন—

জনতা চীৎকার করিয়া জানাইল, আমরা শুনতে চাই। গো—অন্, গো—অন্।

বোস সাহেব বলিলেন, পরে শুনবেন।

জনতার মধ্য হইতে কে-একজন কৌতুক সহকারে কহিল—পরে—কখন্? মিটিং ডিজল্‌ভ হওয়ার পর? আর একজন বলিল, হ্যাঁ হ্যাঁ ঘরে ফিরে দরজায় খিল দিয়ে।

বোস সাহেবের মুখ বেগুনে হইয়া উঠিতেছিল—কৃষ্ণবর্ণের উপরে রোষের রক্তিমাভা পড়িলে বেগুনে হওয়াই স্বাভাবিক—তিনি আরও কি নির্দেশ দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, নৃপতি পুনরায় দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, লেডিস্ এণ্ড জেণ্টেলমেন্, আমার আর বেশী কথা বলবার নেই। আমি শুধু এই কথাটি ব'লেই বসবো যে, বর্তমানে যাঁরা বোর্ডের পরিচালক, তাঁরা যদি ভাল কাজ, প্রশংসার কাজ করেন আমরা নিশ্চয়ই সুখ্যাতি করবো; তাঁদের নামে জিন্দাবাদ হাঁকবো— জয়ধ্বনি দোব; কিন্তু পুজোর পূর্বেই প্রসাদ বিলি করবার হীনতা যেন আমাদের না হয়। আমরা গরীব হতে পারি, অল্প বেতনের কর্মচারী হতে প্যারি, সামাজিক পোজিসান আমাদের না থাকতে পারে কিন্তু আমরা মানুষ! —নির্দোষ নই, গ্লানিমুক্ত নই, স্বার্থপরতাশূন্য নই; আমাদের মধ্যে ক্ষুদ্রতাও আছে, পরশ্রীকাতরতাও আছে, আরও অনেক দোষও আছে। কিন্তু কি করবো বলুন? আমরা ত দেবতাও নই, উপদেবতাও নই, আমরা নিতান্তই মানুষ! কাজেই দোষ ত থাকবেই; দোষ ত করবোই; ত্রুটী ত হবেই; কারণ অপরাধ করি ব'লেই ত আমরা মানুষ, নির্দোষ যেদিন হতে পারবো, সেদিন মানুষ আর থাকবো না—দেবতা হয়ে যাবো। যতদিন তা না হচ্ছে, ততদিন আমরা মর্ত্যের মানুষ। তাই ব'লে, আমরা খোশামুদে নই, পা-চাটা লেড়িকুত্তাও আমরা নই, আমরা মানুষ। এবং মানুষ বলেই আমরা মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিতে পারি না—কখনও না। জয় হিন্দ।

জনতা বারংবার গর্জিল, জয় হিন্দ। নৃপতি মাথার উপর হাত তুলিয়া হাঁকিল, বন্দেমাতরম। জনতা মেঘস্বরে হুংকার ছাড়িল, বন্দেমাতরম। তার পর, ভীষণ হাততালি—সে আর থামে না। বোস সাহেব টেবিল চাপড়ান, সিংহ সাহেব অর্ডার অর্ডার হাঁকেন, তাঁহাদের দেখাদেখি দাদাও "সাইলেন্স প্লিজ" ফরমাস করেন তবু সাগরের কলরোল থামে না। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট কাটিয়া গেল, কোলাহল শান্ত হইল না, বরং মনে হইল উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে।

'দাদা' একবার বামে, একবার দক্ষিণে ফুস্ ফুস্ করিয়া বলিলেন, বেটাদের মতলব ভাল বুঝছি না, মিটিং পণ্ড করবার চেষ্টায় আছে বোধ হচ্ছে।

সিংও সেইরূপ কানে কানেই বলিলেন, আপনি থামতে বলুন না।

নির্লজ্জের নাহি মান নাহি অপমান। দাদা দাঁড়াইয়া উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গেই কলরব বৃদ্ধি পাইল। দাদা কিন্তু নামিবার পাত্র নহেন, হাসি-হাসি মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং একবার একটু ফাঁক পাইবামাত্র উচ্চকণ্ঠে হাঁকিয়া হাঁকিয়া কহিলেন, "ভাই সব মিছামিছি হট্টগোল ও গণ্ডগোল ক'রে প্রোগ্রামটা পণ্ড.." শুনা গেল না, দাদার রাসভস্বরও চাপা পড়িয়া গেল..."চ্যাটাম্ চ্যাটাম্ বক্তৃতা সবাই করতে..." আবার আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল..."মানুষের মান রাখতে জানা চাই, নইলে আমরা মানুষ, আমরা মানুষ ব'লে হল্লা করলেই মানুষ হওয়া যায় না। এই মাত্র যিনি বুক ফুলিয়ে মানুষ মানুষ ক'রে চীৎকার করছিলেন, আমি তাঁকেই বলছি যদি মানুষ হ'ন তবে তাঁর চেলা চামুণ্ডাদের—

যদুপতি দাঁড়াইয়া উঠিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও বিশ পঁচিশ ত্রিশ চল্লিশ জন দাঁড়াইয়া 'উইথড্র', 'উইথড্র' রবে আস্ফালন করিতে লাগিল। দাদাকে দমায় কাহার সাধ্য? তাহারাও চেঁচায়, দাদাও হাঁকেন হোয়াই উইথড্র—হোয়াট উইথড্র?

প্রথমাবধিই বল্লরী দূর হইতে সত্যশরণের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিল; কিন্তু একটিবারের জন্যও তাহাকে চঞ্চল হইতে দেখে নাই। তাহার নন্দী ভৃঙ্গীদের উৎপাত ধাপে ধাপে চড়িতে চড়িতে যখন প্রলয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে, তখন আর থাকিতে পারিল না। হঠাৎ ভিড় ঠেলিয়া বল্লরী সত্যশরণের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়া কানে কানে বলিল, আমি হাত জোড় করছি ছোট জামাইবাবু, ওদের একটু নিরস্ত করুন! আমার মাথা খান্।

সত্যশরণ হাসিয়া ফেলিল, বলিল, ক্ষুধামান্দ দিদি, দারুণ ক্ষুধামান্দ্য। ক্ষুধামন্দের সঙ্গে অজীর্ণ, অম্ল, অতিসারের অত্যন্ত নিকট সম্পর্ক—মারা পড়বো যে ভাই! কিন্তু, তোমাকে এত বিচলিত দেখছি কেন, দিদি? এটা ত সীতা স্বয়ম্বর সভা ব'লে মনে হচ্ছে না, তবে—

বল্লরী বলিল, পরে বলবো বলেছি তো! দোহাই আপনার, গোল ক'রতে দেবেন না। আমি পরে আপনাকে সব বলবো।

ঠিক ত? ফাঁকি দেবে না ত?—বলিয়া সত্যশরণ একটি নীরব ইঙ্গিত যেন বিদ্যুতপ্রবাহে প্রেরণ করিল, সঙ্গে সঙ্গে সকলেই আসন পরিগ্রহ করিল। বোস সাহেব ইহা দেখিলেন—বলা বাহুল্য খুশি হইলেন এবং পুনশ্চ দন্ডায়মান হইয়া কহিলেন, ন্যাসান্যাল সং। এবারে জাতীয় সঙ্গীত।

অতঃপর সমুদয় প্রোগ্রামটি নিরুপদ্রবে পার হইয়া গেল। এসোসিয়েসানের দলবল যখনই একটু উস্‌খুস্ করিয়াছে, বল্লরী তখনই সত্যশরণের পানে করুণ দৃষ্টি ক্ষেপ করিয়াছে এবং তন্দণ্ডে শান্তি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। বোস সাহেব ছোট সাহেবকে জনান্তিকে বলিয়াছেন—দ্যাট্ গার্ল—বল্লরী হ্যাজ এ চার্মিং পার্সোন্যালিটি ইউ সি। সত্যশরণের মত ডিস্টার্বিং এলিমেন্টকে কি চমৎকার রকম কন্ট্রোল করলে, দেখলে ত?

বাট্—সিং সাহেব কহিলেন, ঐ ডেভিলগুলোকে আর আস্কারা দেওয়া উচিত্ত হবে কি?

দাদা আগাটাও শুনেন নাই, গোড়াটাও ঠিক ধরিতে পারেন নাই তথাপি ডিগ্রী দিতে তাঁহার বাধে না, বলিলেন, স্যার, আমি হ'লে কোতল, স্রেফ কোতল।

বোস সাহেব সহাস্যে পাশাপাশি সকলে শুনিতে পায়, এমন ভাবে কহিলেন, তাহ'লে এই নাও জিহন খান্, এই আমার দস্তখত। আজ রাত্রেই দাদার ছিন্নমুন্ড চাই।

সিং সাহেব ছাড়া আর সকলেই হাসিয়া উঠিল। একটা বিশ্রী অবস্থার সূচনাতেই বাতাস নির্মল হইয়া গেল, ইহা বুঝিয়াও অন্তরে আনন্দ ও স্বস্তি অনুভব করিল। সিং সাহেব ছোকরা আই-সি-এস্, ডব্‌কা বয়স, রাষ্ট্রশাসনের চাবিকাঠি তাঁহার হাতে। জ্যেষ্ঠজাতগুলোকে কতক্ষণে অনু পরমাণুতে রূপান্তরিত করিয়া বিলীয়মান বৃটিশ মহাশক্তির রুদ্র বিকাশ প্রদর্শন করিবেন তাহারই ছক্ আঁকিতেছিলেন এমন সময় লঘু হাস্য পরিহাস ভৈরবীর পথাবরোধ করায় শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে উষ্ণ শোণিতস্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। বোস সাহেব বোধ করি পশুরাজের মনোভঙ্গিজনিত অন্তর্দ্বন্দ্বের আভাষ অনুমানে বুঝিয়াছিলেন; ডাকিয়া বলিলেন, কৈ হে সিং, রাঁচে রেসে তুমি যে দৌড়বে বলেছিলে। সিং সে কথার উত্তর না দিয়া রুদ্ধরোষে ফুঁসিতে ও ফুলিতে লাগিলেন। বড় সাহেব চোখ টিপিলেও, সিংহের কেশর স্ফীত হইতে লাগিল।

স্কুলের ছেলেদের স্পোর্টস সুরু হইয়া গিয়াছে, সুতরাং গল্পগাছায় অখন্ড অবসর। বড় সাহেব বলিলেন, মার্ক টাইম্।

দাদা বলিলেন, ঠিক বলেছেন, স্যার।

সিং ততটা ধৈর্য ধারণে নারাজ; বলিলেন, আর বাড়তে দিলে মুশকিল হতে পারে।

দাদা—হ্যাঁ স্যার, আমিও তাই বলি। হাতের দড়ি নিজেরাই গলায় দেবে।

সিং এ সকল তুচ্ছ কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিলেন, ইনসোলেন্স য়্যান্ড ইনসাবর্ডিনেসন। এক্সপ্ল্যানেসান চাওয়া যেতে পারে।

দাদা—একটা কিছু করুন, স্যার, নইলে কাজ কর্ম করা অসম্ভব। আমাকে কোন্‌দিন মেরেই বসে, না কি করে, আমি ত ভেবেই পাই নে। ভারি রাগ আমার ওপর। দেখুন না সব বেটা বেড়াল চোখে আমার দিকেই ওৎ মারছে।

বোস সাহেব মৃদু হাস্য করিলেন।

তাহা দেখিয়া দাদা একেবারে আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন, স্যার, হাসবেন না—এসোসিয়েসানটি দিনের দিন যে-রকম ন্যুইসেন্স হয়ে উঠ্‌ছে, কোন্‌দিন একটা কি কান্ড বাধিয়ে দেবে তখন আমি মারা পড়বো, স্যার।

বোস সাহেব সহাস্যে কহিলেন, সে ভয় আর নেই। ওর ট্র্যান্সফর্মার পাওয়া গেছে।—সাহেবের শ্রোতৃন্দর ইঙ্গিতটা বুঝিলেন।

সিং বড় সাহেবের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া অতীব আত্মীয়বৎ মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, সৌখীন মহিলাটি উঁহার কে?

সম্ভবতঃ কেউ নয়। বড় সাহেব বলিলেন। কিন্তু, যদি ঐটুকু বলিয়াই নীরব হইতেন, তাহা হইলে ঐখানেই যবনিকা পতন হইয়া যাইত; তবে তাঁহারা নাকি সর্বজ্ঞ জাতির বংশধর, কথার শেষে এমন একটি অর্থপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ ও রহস্যসঞ্জাত বঙ্কিম হাস্য করিলেন যে, সিং সাহেবের কৌতূহল একেবারে বর্ষাকালের পুষ্করিণীর মত কানায় কানায় ভরিয়া উঠিল। অন্যের পক্ষে অবোধ্য হইলেও সর্বজ্ঞ বড় সাহেবের তাহা অজ্ঞাত রহিল না; ভরসা দিয়া বলিলেন, চিন্তা করিও না, ঐ মহিলাটি অবিলম্বে তোমার নিকটেই ধর্ণা দিবেন।—ছোট সাহেবের বক্ষ বুঝি বড় সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতায় গদগদ হইয়া উঠিল।

বোস সাহেব ক্ষুদ্র একটি বক্তৃতায় রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি অর্থাৎ এক কথায় কোনও নীতির ধার দিয়াও গেলেন না, তিনি সকলকে—আচন্ডাল পরম ব্রহ্ম সকলকে ধন্যবাদ দিলেন। কোনদিক হইতে কেহ একটি শব্দও করিল না। যে যতই আশ্চর্য হোক না কেন, বড় সাহেব বল্লরীর পার্সোন্যালিটির প্রভাবকেই স্তুতি—অবশ্য মনে মনে—করিলেন।

এখন ঐক্যতান বাদন। ইহাতে এক বিভ্রাট। যে ব্যক্তি বাঁশী বাজাইবে, সে অনুপস্থিত। অথচ তাহার বাঁশী একটা মস্ত আকর্ষণ। ট্যাক্সি চড়িয়া তাহার খোঁজে লোক গিয়াছে, এই আসে, এই আসে করিয়া কনসার্ট পার্টির কর্তারা গড়িমসি করিয়া—একবার বা হার্মোনিয়মে, আর একবার বা বেহালার সুর দিয়া কালক্ষেপ করিতেছিলেন। দর্শকবৃন্দ ক্রমশঃ বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। আধুনিক কালের বিরক্তির অভিব্যক্তি যে কিরূপ বীভৎস আকার ধারণ করে তাহা ভাবিয়া কর্তৃপক্ষ যখন দস্তুরমতো উদ্বিগ্ন ও সভা সাঙ্গ করিয়া মান রক্ষা করিবার কথা চিন্তা করিতেছিলেন, সত্যশরণ এসোসিয়েসান কক্ষ হইতে তাহার ক্ল্যারিওনেট্ আনিয়া এতই মধুর বাজাইল যে 'ঐক্যতান' সভাস্থলে আনন্দের মন্দাকিনী বহাইয়া দিল। সত্যর বাঁশীর ফুঁ এককালে সুবিখ্যাত ছিল এখন বোর্ডের কর্মচারীরাই ধুয়া ধরিল, সত্য দা, একটি 'সোলো' বাজাও —'সোলো' বাজাও।

একটি নহে; উপর্যুপরি তিনটি গৎ বাজাইয়া পরিশ্রান্তভাবে সত্য যখন বাঁশী মুখ হইতে নামাইল, তখন সভা এমনই মন্ত্রমুগ্ধ যে হাত তালি দিবার অবস্থাও ছিল না। যখন চৈতন্য হইল, তখন আর তাহাকে দেখা গেল না। অনেক অনুসন্ধানেও সত্যশরণের সন্ধান কেহই পাইল না।

আজ প্রথমাবধিই সভায় কেমন যেন ভাল লাগিতেছিল না। তারপর যখন উগ্র বাক্‌বিতণ্ডা সুরু হইল, তখন হইতেই সে মরমে মরিয়া যাইতেছিল অথচ থামাইবার কোন উপায় খুঁজিয়া পাইতেছিল না। 'দাদা' ও সিং যেভাবে আঘাত হানিয়া আলোড়ন চালু করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে এসোসিয়েশনকে পরাভব মানিয়া নিরস্ত হইতে বলিলে কেহ তাহার কথা রাখিবে না বলিয়াই শঙ্কা হইতেছিল। হঠাৎ এক সময় বল্লরীর করুণ আবেদনে চকিত হইয়া সত্য যদুনৃপতির পানে সকাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে, তাহারা স্বেচ্ছায় হোক অথবা অনিচ্ছায় হোক, নীরব হইয়া রহিল, অর্থাৎ ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আর বাধা দিতে উদ্যত হইল না তবে, তাহাদের মানসিক প্রফুল্লতা যে অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহাদের সঙ্গে সত্য-শরণেরও তাহা অবিদিত থাকে নাই। কিন্তু, সেটা ত কিছুই নয়, ভুলিয়া যাইতে দেরী হইত না। শেষটায় সত্য-দা এ কি কাণ্ড করিয়া বসিল। কি করিতে আসিয়া কি করিয়া ফেলিল। যে অবাঞ্ছনীয় অভিনন্দনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য, তাহাকেই জয়শ্রীমণ্ডিত করিয়া আস্তাকুঁড়ের সামগ্রীকে চন্দনবাসিত নির্মাল্য করিয়া দিল। সত্য-দা এ কি করিল? এ কি ঘটাইল?

ভোজন পর্ব। সাহেবদের টেবিলের ধারেই যত জনারণ্য। সর্বত্রবিরাজমান দাদা ত আছেনই। বোর্ডের অধিকাংশ কর্মচারীরই অপরিসীম যত্ন ও আগ্রহ এইখানেই করিয়া পড়িতেছে। সাহেব-সুবা এবং তাহাদের দেশীয় সংস্করণদিগের জামাই ষষ্ঠী হয় কিনা জানি না, আজিকার সমারোহ ও সমাদর দেখিয়া বার বার কেবল সেই দৃশ্যই মনে পড়িতেছে। কে কতটা জোর করিয়া কোন্ জিনিষটা সাহেবদিগকে খাওয়াইতে পারে, তাহার কি ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতাই না চলিয়াছে। ইহারই মাঝে মুন্সী যেন নবপরিণীতা শ্যালিকারূপে ব্রীড়ানম্রঈক্ষণে প্রাণে প্রাণে হর্ষ ঈর্ষা কৌতুক ও কৌতূহল ছড়াইয়া বেড়াইতেছে বটে তবে অশ্বত্থ ও বটের তলেই তাহার অধিক আনাগোনা। সাহেবরা যে মুহূর্তে কমলা লেবুর কোয়া লেহন করিতেছেন, মুন্সী তদ্দণ্ডে তথায় আবির্ভূত হইয়া লেবুর বাগানের সারের সর্বশেষ তত্ত্ব বিজ্ঞাপিত করিতেছেন। উদ্যান পৈতৃক, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হওয়ায় তাহার কৃতিত্ব না থাকিতে পারে, কিন্তু উদ্যানই ত সব নহে, মৃত্তিকা—Soilই সব। Soil-এর গুণেই ফল, Soil-এর গুণেই সরেশ, আবার Soil-এর দোষেই নিরেশ। সে আশা করে ভূমির ঔৎকর্ষজনিত কৃতিত্ব দাবী করিলে কেহ প্রতিবন্ধক হইবেন না। সিং সাহেব তাহাকে পুনঃ পুনঃ আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, বাঙ্গালাদেশের লোক যদ্যপি তোমার মত ভূমিমনা (Soil minded) হইত, তবে বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষও চিরস্থায়ী হইত না এবং খাদ্যবিষয়ে একটি দিনও বঙ্গদেশকে পরনির্ভর থাকিতে হইত না।

'দাদা' অতি নিকটেই দক্ষিণ হস্তের কার্য সম্পন্ন করিতেছিলেন, মুন্সীকে ডাকিয়া কানে কানে কহিলেন, বাঁদরামী করছো কেন! Soil এক্সপার্টের বক্তৃতা শুনে বাগান দেখতে চেয়ে বসে যদি, তখন দন্ত বেরিয়ে পড়বে যে! পোস্তাব বাজার দেখাবে নাকি? স'রে পড়ো, স'রে পড়ো।

মুন্সী বলিল, নিশ্চিন্ত থাকুন, স্যার। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের স্বামী বিবেকানন্দ যেমন, আমিও তেমনি আপনার ত্রুইরক্ত মন্ত্রশিষ্য, আমাকে ঠকাবে ওরা।

গর্দভ! বাগান দেখাতে পারবে বিবেকানন্দ নও, তুমি গর্দভানন্দ।

কি বলছেন, স্যার, বাগান দেখাতে আলবৎ পারবো, সাত্তর! বলবো, ঠাকুর্দা মশাই অমৃতসহরে আবগারী দারোগা ছিলেন কিনা, যা-কিছু সম্পত্তি সেখানেই ক'রে গেছেন বলবো চলুন না স্যার, প্লেনে ছ' ঘণ্টার জার্ণি বই ত নয়। দেখে আসবেন রিটার্ণ টিকিট আমিই কিনবো।

দাদা প্রশংসমান দৃষ্টিতে চাহিয়া শিষ্যের ভাষণ শুনিতেছিলেন, মুন্সীর কথা শেষ হইবামাত্র এঁটো হাতেই তাহার পৃষ্ঠে প্রেমের চপেটাঘাত করিয়া কহিলেন, ওঃ স্কাউণ্ড্রেল বটে! ইট্ আর এ 'রোগ'! মুন্সী সবিনয়ে শ্লোক আওড়াইয়া বলিল, অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

দাদা পুলকাতিশয্যে ডগমগ হইয়া কহিলেন, দূর! আজ থেকে তুই আমার গুরু। বাপ্ অমৃতসরে বাগান—অমরের চোদ্দপুরুষের মাথাতেও ঢুকতো না।

অন্যান্য কর্মচারী—মুন্সীর সহকর্মীরা অনুযোগ করিয়া বলিল, কি চাঁদ, সারাক্ষণ সাহেবদেরই তোয়াজ করছো, বাবা, বলি আমরা কি কেউ নই রে গোপাল?

মুন্সী অকপটে অপরাধ স্বীকার করিয়া লইয়া বলিল, আরে দাদা, ওরা সাহেব যে।

একজন কে রহস্যভরে কহিল, রাখিলে রাখিতে পারে, মারিলে কে করে মানা! কি বলো মুন্সীজী?

মুন্সী সানন্দে কহিল, যা বলিছ মাইরি। পায়ের ধুলো দে বেটা, পায়ের ধুলো দে।

বৃদ্ধ সান্যাল মহাশয় মন্তব্য করিলেন, তাই হয় রে ভাই, তাই হয়। আমি তখন গয়ায় রিলিভিং এ-এস্-এম্। রবি ঠাকুর বেড়াতে এলেন, উঠলেন বাঙ্গালীর গৌরব মৌক্তার প্রভাত মুখুজ্জের বাড়ীতে। সঙ্গে শ্রীহীন চারু বন্দ্যো, দিগ্বিজয়ানন্দ, বিজয়রত্ন আরও ক'জন কবি সাহিত্যিক ছিলেন। বোধ হয় বাঁড়ুয্যের পো'র খাতিরযত্ন কম হয়েছিল, দেশে ফিরে গিয়ে শ্রীহীন চারু আমাদের মুখুজ্জে মশাইকে পরম পূজনীয় খুল্লতাত মহাশয় নাম গরম পরমিদং কার্যপ্রাণে তোর গবুতে খান খেয়েছ রে শালা চিঠি লিখলেন। মুখুজ্জেমশাই রসিক লোক, পাকে পাক রস—জবাবটি যা দিলেন, আঃ, একেবারে ইউ-পি'র ন্যাশনালের! লিখলেন, বৃহৎ বটবৃক্ষ আকাশের আলো, শূন্যের বায়ু ও মৃত্তিকার রস অধিক পরিমাণে আহরণ করবে এবং অন্যান্য পাদপকে কিঞ্চিন্মাত্রায় বঞ্চিত হতে হবে সে তো জানা কথাই। এর জন্য বটবৃক্ষ দায়ী, আমি নহি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে না এসে একক এলে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কথার কেন কারণ থাকতো না। হয় না হয় trial solicited—পরীক্ষা প্রার্থনীয়।—বলিয়া সান্যাল মহাশয় একাই হাসিয়া যেন লুটোপুটি খাইতে লাগিলেন।

মুন্সী বয়োবৃদ্ধ সান্যাল মহাশয়ের পায়ের ধুলা লইয়া বলিল, ঠাকুর্দা মশাই আঁতের কথা টেনে বলেছেন। বহুদর্শী লোক,

অনেক দেখেছেন, অনেক শুনেছেন। আপনাদের কাছে আমরা? হুঃ। চাঁদে আর কিসে!

হঠাৎ প্যাণ্ডালের আলোগুলো বারকয়েক দেয়ালা করিয়া থপ্ থপ্ নিবিয়া ও দপ্ দপ্ জ্বলিয়া একেবারে দেহরক্ষা করিল। ভোক্তারা কলরব, বিরুদ্ধবাদীরা অট্টহাস্য, ছেলেপুলেরা ক্রন্দন ও চীৎকারের মাঝামাঝি একটা কিছু করিয়া কয়েক মিনিটের মধ্যে দক্ষযজ্ঞ বাধাইয়া তুলিল। সাহেবরাও খানা ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়াছেন, দাদা যাহাকে পাইতেছেন, তাহাকেই তাঁইস্ করিতেছেন ইঞ্জিনীয়ারকে ডাকো, নাইট্ ফোরম্যান্ কোথা, সব ব্যাটাকে ডিস্-মিস্ করবো ইত্যাদি। অন্ধকারে দাদার উগ্রমূর্তি দেখা গেল না বটে তবে বুঝিতে কাহারও কষ্ট হইল না যে, গুটি কয়েক কাঁচা-মুণ্ড দাদা তদ্দণ্ডে হাতেই কাটিয়া ফেলিয়া নৃমুণ্ডমালী হইবেন। কোনই সন্দেহ নাই।

ইঞ্জিনীয়ার, ফোরম্যানদিগকে দূর হইতে আসিতে দেখিয়া দাদা চঞ্চল হইয়া উঠিলেন এবং তাহারা নিকটে আসিতে এমন একটা ভয়ঙ্কর হুঙ্কার ছাড়িলেন যে, সমগ্র প্যাণ্ডেলটা যেন ভূমিকম্পে নাড়াচাড়া খাইয়া গেল।

ইঞ্জিনীয়ারও কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। পাশের একখানা চেয়ার ধরিয়া কোনোরূপে সামলাইয়া লইয়া রুদ্ধশ্বাসে কহিল, ইঞ্জিনের বেয়ারিং গরম হয়ে গেছে, স্যার—বহুৎ পুরনো ইঞ্জিন—

দাদা ঝাঁটিতি কহিলেন, গরম হয়েছে, তা একটু বরফ দিলে না কেন।

ইঞ্জিনীয়ার থ' হইয়া দাদার পানে চাহিল। বড় সাহেব ছোট সাহেব হাসিয়া ফেলিলেন; আশেপাশের আরও দু' দশজন মুখ টেপাটেপি করিয়া হাসিতে লাগিলেন। ইঞ্জিনীয়ার কথাটাকে অধিকতর স্পষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে কহিল, পুরোণো ইঞ্জিনের বেয়ারিংটা গরম—

দাদা ধৈর্য ধরিতে না পারিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, আহা, বললুম ত, একটু বরফ দিয়ে দিতে।

বড় সাহেব দেখিলেন সমূহ বিপদ। আর মুখ টেপাটেপি গা টেপাটিপি করিয়া হাসি নয়, লোকগুলো চলাচলি করিয়াই হাসাহাসি করিতেছে, দাদাকে বলিলেন, চলুন চলুন ইঞ্জিনরুমে গিয়ে দেখা যাক্ ব্যাপারটা কি হোল? বলিয়া এক রকম টানিতে টানিতেই দাদাকে লইয়া চলিলেন। লোকগুলো এবারে বেশ সোরগোল তুলিয়াই বলিল, মানুষের মাথা গরমে যখন বরফ চাপাতে হয়, ইঞ্জিনের মাথা গরমেও বরফ দেবে না কেন বাবা! এমন না-হলে ভি-সি! গাও ভাই তোমরা সকলে একবার সমস্বরে গাও—জয় সর্ববিদ্যাভড় ভি-সি দাদাজীর জয়।

মাথায় বরফ দে রে, বরফ দে, দাদা গরমেছে।—অপর এক দল হাঁকিল। [ক্রমশঃ

★

কতদিন বলো

মণিকা দে

কতদিন বলো লিখিনিক কোন কবিতা
কবিতারা তবে আমায় সবাই ভুললো,
কথা দিয়ে আঁকা জীবনের যত ছবি তা'
বিস্মরণের কালিমায় শেষে মুছলো—
হায়, এ জীবন হায়গো।

কতদিন আর কতরাত বলো কান্নার গান গায় গো?
অফুরান্ জল সবুজের ঢেউ
কতদিন গেছে হারিয়ে,
নীলিম নিবিড় সুদূর আকাশ
কতদূরে গেছে পালিয়ে!
হায়, কান্নার সুর বাঁধা তার হায়গো!

দিনে দিনে যদি সব ছিঁড়ে যায়
কোন্ গান প্রাণ গায়গো?
নীড়ের স্বপ্ন স্বপ্নই হোল, দূরের কাজল মায়া অঞ্জন
বাতাসে বাতাসে কই শুনি সেই পরশের মায়া মধুগুঞ্জন?
হায়, মরু প্রাণ হায়গো!
সঞ্চয়হীন গিরিগুহা হতে কোন্ ধারা ঢালা যায় গো?

আলোচনী

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কয়েকখানি পরিপূরক গ্রন্থ

দীপঙ্কর গুপ্ত

বর্তমান বাংলাসাহিত্য একদিকে যেমন কথাসাহিত্যের বন্যায় প্লাবিত, অন্যদিকে তেমনি রম্যরচনার বহুল সৃষ্টিতে সচকিত। একথা বলিব না যে, ইহারই মধ্যে স্বাধীন মননশীল কোনো কোনো চিন্তানায়ক সমাজকল্যাণকর গঠনমূলক মৌলিক রচনার দ্বারা বাংলাসাহিত্য তথা সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ না করিতেছেন, কিন্তু সংখ্যাল্পতার জন্য তাঁহাদের চিন্তাধারা ও বাণী বৃহত্তর সমাজজীবনে গিয়া পৌঁছাইতে পারিতেছে না। যদি কোনো প্রাণবান সম্প্রদায় সেই পৌঁছাইয়া দিবার কাজটি গ্রহণ করেন, তবে সংস্কৃতিক্ষেত্রে তাঁহাদের সেই কাজকে অপরিসীম দান হিসাবেই গ্রহণ করিতে হইবে। কথাসাহিত্য বা রম্যরচনার ক্ষেত্রে এই পৌঁছাইয়া দিবার দায়িত্ব অপেক্ষাকৃত কম। কথাসাহিত্যের নিজেরই একটা স্বাভাবিক গতি আছে—যে গতির দ্বারা সে সমাজ-মনকে সহজেই স্পর্শ করিতে পারে। তাহা লইয়া বাণীবহতার গুরুদায়িত্বের কাজ অপেক্ষাকৃত কম।

আমরা এখানে সাম্প্রতিক কালের কয়েকখানি গ্রন্থ লইয়া আলোচনা করিব। আধুনিক বাংলাসাহিত্য তথা শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিপূরক হিসাবে গ্রন্থগুলির স্বীকৃতি অনস্বীকার্য।

নূতন শিক্ষাঃ ১৯৪৮সালে প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষাবিভাগ পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যালয়ী শিক্ষার ত্রুটিপূর্ণ দিকগুলির আশু পরিবর্তনের প্রয়াসে তদন্ত, আলোচনা ও পরিকল্পনা করিবার জন্য বিদ্যালয় শিক্ষাকমিটি গঠন করেন। কমিটি তাঁদের পর্যালোচনাকালে বহু সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিগতভাবে বহু শিক্ষাব্রতীর সাহায্য লাভ করেন। বিভিন্ন বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা ও গবেষণার পর ১৯৪৯ সালের মে মাসে নয়া শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তনের সুপারিশ করিয়া কমিটি একটি রিপোর্ট দাখিল করেন। নয়া শিক্ষাব্যবস্থা কিরূপ হইবে এবং তাহার প্রয়োজন এমন অনিবার্য কেন, তাহা এই রিপোর্টে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই 'নূতন শিক্ষা' গ্রন্থখানি রচিত। লেখক বলিয়াছেনঃ 'বর্তমানে শিশু বা বালকবালিকাদের বিদ্যালয়ী শিক্ষার যেমন গুরুত্ব রহিয়াছে, সেইরূপ বয়স্কদের শিক্ষারও প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। বিশেষতঃ, দেশে বয়স্কদের ভোটাধিকার প্রবর্তিত হওয়ায় নিরক্ষর বয়স্কদেরও শিক্ষালাভ অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। সরকারী জনশিক্ষা বিভাগও বয়স্কদের শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা করিতেছেন। তাই বয়স্কশিক্ষার শিক্ষাসূচীও আমরা এই পুস্তকের শেষে দিতেছি।'

এই শিক্ষাসূচী ১৯৪৮ সালে জুলাই মাসে জনশিক্ষা কমিটি কর্তৃক গৃহীত হয়। গ্রন্থসূচী প্রধানতঃ যে যে বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া গ্রথিত হইয়াছে, সেগুলি হইতেছে —(ক) পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যালয় শিক্ষা সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণী, (খ) প্রাক্-প্রাথমিক এবং প্রাথমিক শিক্ষা, (গ) কমিটির প্রধান সুপারিশ এবং উপসংহারগুলির সংক্ষিপ্তসার, (ঘ) মাধ্যমিক শিক্ষা, (ঙ) বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সময়ের সাপ্তাহিক বন্টন এবং (চ) বয়স্ক শিক্ষার সংক্ষিপ্ত সূচী।

ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক বর্ণশিক্ষা হইতে সুরু করিয়া মাধ্যমিক শিক্ষার শেষ স্তর পর্যন্ত ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে গ্রন্থে বিস্তৃত অথচ সহজভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। লেখক উল্লেখ করিয়াছেনঃ সমস্ত অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া কমিটি মনে করেন যে, তাঁহাদের সবর চেষ্টাই, কি প্রাথমিক (নিম্ন বুনিয়াদী), কি উচ্চ বুনিয়াদী (মধ্য), কি নিম্ন হাই, কি উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিত্ব, স্বাবলম্বন এবং চিন্তাশক্তির বিকাশ ও পরিণতির দিকে সর্বদা জোর দিয়া তথ্যগত জ্ঞানের সহিত কারু ও হস্তশিল্পকে সংযুক্ত করিয়া একটি সম্পূর্ণ সর্বগ্রাহী শিক্ষাসূচীর প্রণয়নে নিযুক্ত হইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে কর্মগত নীতির উপর ভিত্তি করিয়া তুলিতে চেষ্টা করা হইয়াছে এবং উহাকে সানন্দ এবং সৃজনশীল করিয়া তুলিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। বিভিন্ন স্তরে শিক্ষাসূচী ও পাঠ্যতালিকাকে এমনভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছে যে, তাহাতে বিভিন্ন রুচি ও শক্তির ছাত্রছাত্রীরা তাহাদের দাবী মিটাইতে পারিবে এবং ছাত্রছাত্রীদের রুচি ও শক্তি অনুসারে একরূপ শিক্ষা হইতে অন্যরূপ শিক্ষায় যাইতে বা উচ্চতর শিক্ষালাভ করিতে কোনো স্তরেই এমন কি প্রকারান্তরেও ব্যাঘাত ঘটাইবে না। কমিটির সমগ্র আলোচনাতেই শিক্ষক এবং তাঁহাদের দক্ষতাকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

বলিয়া মনে করা হয়। কমিটি আশা করেন, তাঁহাদের প্রদত্ত সুপারিশগুলি প্রদেশের সরকার এবং শিক্ষিত জনসাধারণ কর্তৃক মোটামুটিভাবে গৃহীত হইবে।

বিষয়সূচীর পর্যায়ক্রমে গ্রন্থসজ্জা এবং রচনাশৈলীর প্রসাদগুণের জন্য গ্রন্থকার শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হইবেন এবং সাদর অভিনন্দন লাভ করিবেন। তিনি তথ্যানুসন্ধানী এবং দেশের শিক্ষা-সংস্কার, শিক্ষাপ্রসার তথা দেশের ছেলেমেয়েদের নৈতিক চরিত্রোন্নয়নের প্রয়াসী। 'শিক্ষাব্রতী'র সম্পাদকরূপেও তিনি সেই দুরূহ কার্যই সম্পাদন করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ **"সামাজিক ও নাগরিক জ্ঞান—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ"**ও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সামাজিক ও নাগরিক জ্ঞান শুধু শিশুদের নয়, এদেশের উচ্চশিক্ষিত বয়স্ক ব্যক্তিদেরও অনেকেরই অভাব রহিয়া গিয়াছে। একটা সুস্থ ও স্বাধীন জাতির পক্ষে ইহা কলঙ্কস্বরূপ সন্দেহ নাই। সেই কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইয়া দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকেরা যাহাতে নতুনভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে, সেই মহৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থখানি (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ) প্রণয়ন করিয়াছেন। তৎসহ গণতন্ত্র, সংবিধান, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় শাসন, বিচার, স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি বিষয়ে ছেলেমেয়েদের সাধারণ জ্ঞান যাহাতে পাকা হয়, এ বিষয়েও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সহজ ভাষায় গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। সুখের বিষয় যে, মাধ্যমিক শিক্ষাপরিষদ গ্রন্থখানি পাঠ্যরূপে অনুমোদন করিয়া সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। সাহিত্যের দিক হইতেও গ্রন্থ দুইখানির সমধিক মূল্য রহিয়াছে।

পঙ্গপালঃ বাংলা সাহিত্যে আর যাহারই অভাব দেখা যাক, অন্ততঃ ছোটগল্পের সমৃদ্ধি এবং ব্যাপকতম প্রসার অনস্বীকার্য। উপন্যাসের বৃহত্তর পরিকল্পনা এবং সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বসম্মত চরিত্রচিত্রণ ছোটগল্পে না থাকিলেও দরদী লেখকের প্রতিভা-স্পর্শে-ইঙ্গিতে এবং কেন্দ্রানুগ সংক্ষিপ্ততায় তাহার একটি স্বতন্ত্র মূল্য নির্ধারিত হয়। কবি সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ইহার শ্রেষ্ঠতম উদাহরণ। ইহার পর সাহিত্যের এই বিশিষ্ট রাজপথে বহু পথিকৃৎ পদার্পণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের নিজস্ব জীবনে রসরসিকতার বাস্তব ছাপ মুদ্রিত করিয়াছেন। বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম দশকে ছোটগল্প আশ্চর্য শিল্প-কুশলতা লাভ করিয়াছে। তাহারই সঙ্গে সঙ্গে লেখকবৃন্দ পূর্বাপেক্ষা অধিকতর বাস্তবনিষ্ঠার পরিচয় দিতে সমর্থ হইয়াছেন।

আলোচ্য 'পঙ্গপাল' গ্রন্থখানি এই বাস্তবতার অন্যতম নিদর্শন। গ্রন্থখানি কয়েকটি গল্পের সমষ্টি। কতকগুলি গল্পের পটভূমিকা রচনা করিয়াছে যুদ্ধকালীন বাংলা দেশের সমাজমানস। বাংলাদেশের সেই দুর্বিষহ জীবনযাত্রা আজ ঐতিহাসিক সত্য। এই কারণে ইতিহাসের সাহিত্যায়ণ এই গ্রন্থের 'উলুখড়', 'ধোঁয়া', 'পঙ্গপাল' গল্প কয়টি। 'উলুখড়' গল্পটির মধ্যে সুকোমলের মৃত্যু, রাস্তায় গাড়ী-চাপা-পড়া 'হরিবোল পাগলী'র বীভৎস দৃশ্য, এবং সর্বোপরি সতী মৈত্র ও নির্বাণদেবের বিরহের কাহিনী যদিও সংক্ষিপ্ত তথাপি পাঠককে আকর্ষণ করে অনেক বেশী। মাত্র এই কয়টি খণ্ডিত দৃশ্যের সাহায্যে লেখক যুদ্ধের সামগ্রিক ভীষণতা প্রকাশ করিয়াছেন। আর যে নীলরতনবাবু, চিত্রগুপ্তের মত শব আগলাইয়া বসিয়া থাকিতেন, তাঁহারই শেষ পরিণতিটুকু তাঁহার ব্যবহার ও সংলাপের মধ্য দিয়া অতি প্রকটভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সর্বোপরি রজনীর স্বামী মিষ্টার চ্যাটার্জীর উপস্থিতি এই গল্পের শ্বাসরোধকারী পরিবেশে মুক্ত বায়ুর সরসতা আনিয়াছে। 'ধোঁয়া' গল্পে প্রহ্লাদ একটি বিশেষ শ্রেণীর প্রতিনিধিরূপে আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। একদিকে তাহার চতুর ব্যবসায়ী বুদ্ধি তাহাকে যেমন দয়ামায়াহীন করিয়া তুলিয়াছে, অন্যদিকে গোপন পিতৃস্নেহটুকুও লেখক উজ্জ্বলরূপে অঙ্কন করিয়াছেন। প্রহ্লাদ কেবলমাত্র 'ভিলেন' নহে, সে মানুষও বটে। বুভুক্ষিত ননীর নারীহৃদয়ের বিকৃত পরিণতি যুদ্ধের ক্রূর পরিহাস ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে? আবার এই প্রহ্লাদেরই পরিবারে নিতাই-এর মত দরদী সন্তানকে দেখিয়া মানবচরিত্রে বৈচিত্র্যের সম্যক উপলব্ধি হয়। কিন্তু যুদ্ধের বিষময় ফল কেবলমাত্র নিতাই-এর মত একজনের পক্ষেই ধ্বংস করা সম্ভব নয়। গল্পের উপসংহারে লেখক মাত্র কয়েকটি ছত্রে এই নির্মম শ্মশান-সভ্যতার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। 'পঙ্গপাল' গল্পটি আজিকার দিনে গতানুগতিক বলিয়া অভিযোগ উঠিতে পারে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, গল্পটির রচনাকাল যুদ্ধোত্তর যুগ নয়, যুদ্ধকালীন যুগ। বিভিন্ন গ্রাম হইতে আগত ক্ষুধার্ত নরনারী শহরে আসিয়াছে কিছু পাইবার আশায়। শহরবাসীদের কাছে ইহারা পঙ্গপাল। ইহাদেরই করুণ অথচ বাস্তবানুগ চিত্র আঁকিয়াছেন লেখক। লেখকের সহজ স্বাভাবিক দৃষ্টি গণপতি চরিত্রটিকে অপূর্বভাবে প্রকাশ করিয়াছে। এই দুঃখের দিনেও গণপতির 'টাকশাল' সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা এবং জটাধরের সহিত এরোপ্লেন সম্বন্ধে

গবেষণ লেখকের সহজ কৌতুকপ্রিয়তা ও বাস্তবনিষ্ঠারই পরিচয় পাওয়া যায়। এবং শেষ আঘাত আসিয়াছে গণপতির উপরেই। তথাপি সকল আঘাত সহিয়াও 'পঙ্গপাল চলল ক্ষেতে নয়, খেতে।' আঙ্গিকের দিক হইতে এই গল্পের পরিণতি ইহা অপেক্ষা আর কোনরূপেই সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারিত না।

'মুক্তাভস্ম' গল্পটির মধ্য দিয়া লেখক সামন্তবাদের ধ্বংস ও ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জীবন-আলেখ্য রচনা করিয়াছেন। অবশ্য লেখকের কেন্দ্রবদ্ধ দৃষ্টি ছোটগল্পের ক্ষুদ্র পরিসরে সামন্তবাদের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা বর্ণনা করিতেই নিঃশেষিত হইয়াছে তথাপি শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পের ন্যায় ইহার পরিণতি গভীর ইঙ্গিতের দ্বারা বর্ণনা করিয়াছেন। আসন্ন ধনতন্ত্রের আঘাতে সামন্তশাহী সমাজচেতনার অবলুপ্তি অবিসংবাদিত। তারাশঙ্কর প্রমুখ লেখকগণ এই সামন্তবাদের বর্ণনা বিস্তারিতভাবেই করিয়াছেন, কিন্তু এখানে লেখক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার অবতারণা করিয়া সামগ্রিক সামন্ততন্ত্রের প্রতিভাস ফুটাইয়াছেন। লেখকের অভিপ্রেত উদ্দেশ্যই ইহাতে সফলই হইয়াছে।

'বাসকসজ্জিকা' গল্পটির মধ্যে লেখকের কোনো কোনো পূর্বসূরীর প্রভাব থাকা বিচিত্র নয়। পতিতা জীবনের মর্মন্তুদ কাহিনী এ গল্পে প্রকাশিত। 'উদয়াস্তের কাহিনী' একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের দিনলিপি সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সাহায্যে বর্ণিত হইয়াছে। সেই তুলনায় 'সাধিকার অভিসার' ও 'কেউ কারও নয়' গল্প দুইটি খুব বেশী উচ্চাঙ্গ শিল্পকলার নিদর্শন বলিয়া মনে হয় না।

গ্রন্থে গল্পগুলি আপাতদৃষ্টিতে কতকটা বিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু সূক্ষ্মতর পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, প্রত্যেকটি গল্পের (মুক্তাভস্ম বাদে) চরিত্র পরিকল্পনা ও ঘটনাবিন্যাস মধ্যবিত্ত পরিবারের সমাজ-মানস হইতে গৃহীত। লেখকের এই সমাজের প্রতি মমত্ববোধ ও প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রত্যেকটি গল্পেই সুস্পষ্টরূপে মুদ্রিত। লেখক শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক নিজেকে বিবিক্ত রাখিয়া চরিত্রগুলিকে তাহাদের স্বরূপে দেখিবার প্রয়াস পাইয়াছেন এবং এইখানেই লেখকের চরম সাফল্য। কেবলমাত্র তথ্যপরিবেশন নয়, তথ্য উপস্থাপনের মধ্যে লেখক যে শিল্পকুশলতা ও মননশীলতার পরিচয় দিয়াছেন তাহাও এই গ্রন্থের অন্যতম আকর্ষণ।

অপরাজিত (আনভ্যাঙ্কুইস্‌ট্): রুশিয়ার জার শাসনতন্ত্র ধূলায় বিলুণ্ঠিত করিয়া দিতে একদিন যেমন গণশক্তির বিরাট অভ্যুত্থান দেখা দিয়াছিল, আমেরিকায় বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকে ভাঙিয়া দিয়া নূতন স্বাধীন উপনিবেশ রচনার কার্যেও তেমনি এই গণশক্তির অভ্যুত্থানই লক্ষ্য করিবার বিষয়। সেদিন জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে এই গণশক্তিই আপন লক্ষ্যবস্তুকে স্বায়ত্ত করিতে জীবনপণ সংগ্রাম করিয়াছিল। বিভিন্ন অঞ্চলের পারস্পরিক ধর্মীয় বিরোধ, রাজনিগ্রহের ভীতি বা যুদ্ধের বিভীষিকা—কোনো কিছুই তাহাদের প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইতে পারে নাই, বৃটিশ পার্লামেণ্টারী কর-নীতির বিরুদ্ধে তাহারা একপায়ে দণ্ডায়মান হইয়া যে প্রতিবাদের ধ্বনি তোলে—তাহাই তাহাদের মুক্তিসংগ্রামের প্রথম স্মারক। বিচ্ছিন্ন শক্তির মধ্যে আপোষপন্থী আর উগ্রপন্থীদের প্রারম্ভিক বিরোধ পরে এক ঐক্যবিধায়ক নীতির পথ ধরিয়া অগ্রসর হয়। ক্রমে আমেরিকার এই মুক্তিযুদ্ধের উজ্জ্বল প্রভাত দেখা দেয়; নবীন এক প্রাণস্ফূর্ত হিরণ্ময় আভায় সেই প্রভাত শান্তির ললিতলাস্যে লাবণ্যময়। 'অপরাজিত' (আনভ্যাঙ্কুইস্‌ট্) আমেরিকার এই মুক্তি-সংগ্রামেরই ঐতিহাসিক উপন্যাস। সাম্প্রতিক আমেরিকার নিষ্পিষ্ট গণজীবনের দরদী শিল্পী হাওয়ার্ড ফাস্ট্ তাঁহার এই উপন্যাসে সেদিনের ঐতিহাসিক তথ্যকে ইতিহাসের শাশ্বত মর্যাদায় অক্ষুণ্ণ রাখিয়া মর্মস্পর্শীভাবে ঘটনাসংস্থান, কথোপকথন ও নায়কনায়িকা সৃষ্টি করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে ফাস্ট্ নিজেই বলিয়াছেন: গ্রন্থে বর্ণিত প্রত্যেকটি নামের এক একটি মানুষ ছিলেন এবং কাহিনীতে যেভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, মূল বিপ্লবেও তাঁহারা অনুরূপ ভূমিকাই গ্রহণ করিয়াছেন।

—অপরাজিতের প্রধান নায়ক আমেরিকার মুক্তিযুদ্ধের মহান নেতা জর্জ ওয়াশিংটন। তাঁহার বীরত্বের কাহিনী আমাদিগকে শুধু রোমাঞ্চিতই করে না, সেই যুগে জীবনধর্মেও উজ্জীবিত করিয়া তোলে। ফাস্টের রচনা আমাদের সেই প্রবাদটিকেই স্মরণ করাইয়া দেয় 'ফ্যাক্টস্ আর স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিক্‌শন।' এই দিক হইতে তাঁহার অপরাজিত (আন্‌ভ্যাঙ্কুইস্‌ট্) উপন্যাসের পূর্ণ ধর্ম রক্ষা করিয়া অতি-উপন্যাসের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। বাংলা অনুবাদের জন্য অনুবাদক ও প্রকাশকের উদ্যম প্রশংসনীয়।

গ্রন্থগুলি বিভিন্ন পর্যায়ের হওয়ায় স্পষ্টই বুঝা যাইবে, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাহাদের আবেদন নানামুখী হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃত শিক্ষার পথের যেমন নির্দেশ আছে, কথা-সাহিত্য ও অনুবাদ-সাহিত্যের রসগ্রাহিত্বও তেমনি ইহাতে একই সঙ্গে আসিয়া মিলিয়াছে।

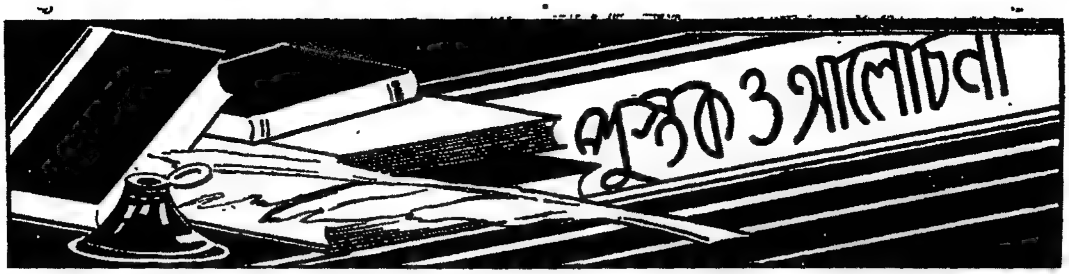

সম্প্রতি গত কিছুদিনের মধ্যে যে কয়খানি বই সমালোচনার জন্য আমাদের হাতে আসিয়াছে, তাহার কয়েকখানি সম্পর্কে এখানে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

বঙ্গশ্রীতে যখন ইতিপূর্বে **সুবোধ বসুর** উপন্যাস **'ঊর্ধ্বগামী'** ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়, তখনই ইহার কাহিনীর সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটে। সম্প্রতি উপন্যাসখানি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশ করিয়াছেন—গ্রন্থাগার: পি-৫৮ ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা। দাম তিন টাকা মাত্র। সমাজের ঊর্ধ্বস্তরে উঠিবার চেষ্টায় পিছল সিঁড়িতে যাহারা আছাড় খাইয়া পড়ে এবং যাহারা সবল পদক্ষেপে আগাইয়া যায়, ঊর্ধ্বগামী তাহাদেরই উত্থান-পতনের কাহিনী, সমাজের তিনতলার ইতিহাস। কাহিনী বর্ণনায় ও চরিত্র-চিত্রণে দক্ষ শিল্পী সুবোধ বসু। গ্রন্থের কাশীপতি, বিরজাসুন্দরী, উমা, সতীশ লাহিড়ী, হরিপদ, তারাপদ, সুষমা প্রভৃতি চরিত্রগুলি জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া পাঠকসাধারণ স্বভাবতঃই আনন্দলাভ করিবেন।

তরুণ লেখকদের মধ্যে মাঝে মাঝে এমন শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, যাহা বিস্ময়কর। এমনই কয়েকজন শক্তিমান লেখক—**মানব বন্দ্যোপাধ্যায়, হিমাদ্রিশেখর বসু, নন্দদুলাল ঘোষ ও অসীম ভট্টাচার্য।** সমবেতভাবে তাঁহারা প্রকাশ করিয়াছেন **'চার কলম'।** প্রাপ্তিস্থান—ভবানীপুর বুক ব্যুরো, কলিকাতা। চারিজন লেখকের অন্যূন দশটি গল্প 'চার কলমে' স্থান পাইয়াছে। ভীরু পদক্ষেপ হইলেও দুঃসাহসিক সন্দেহ নাই। মানব বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলা' গল্পটি ইতিপূর্বে বঙ্গশ্রীতে প্রকাশিত হইয়াছে এবং আলোচ্যগ্রন্থের শ্রেষ্ঠ গল্প হিসাবে 'নীলা' দাবী করিতে পারে। বিষয়বস্তু এবং প্রকাশভঙ্গীর দিক দিয়া গল্পগুলি আরও বাস্তবানুগ হইলে সুখকর হইত। বাণীসাধনার পথে এই তরুণ সাধকদের অভিযাত্রা জয়যুক্ত না হইবার কারণ নাই।

বাংলার আধুনিক কাব্যজগতে সাম্প্রতিক প্রকাশিত দুইখানি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একখানি **বটকৃষ্ণ দাসের 'পাখনা'।** প্রকাশ করিয়াছেন—ইউনাইটেড বুকস, কলিকাতা; দাম—দুই টাকা। অন্যখানি **তারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রাত্যহিক'।** প্রাপ্তিস্থান—কমলা বুক ডিপো, কলিকাতা; দাম দুই টাকা। উভয়েই শক্তিমান কবি, তবে জীবন-দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গীতে স্বতন্ত্র। 'পাখনা'র কবি যেখানে আশাবাদের উজ্জ্বল শিখাকে অনির্বাণ দীপ্তিতে সংগ্রামের দুস্তর পথে জাগ্রত সৈনিকের মতো আগাইয়া নিয়া গিয়াছেন, 'প্রাত্যহিকে'র কবি সেখানে সুবর্ণরেখার ললিত আলোয় অবগাহন করিয়া (চাতুষ্পার্শ্বিক বিক্ষুব্ধতার মধ্যে) শান্ত হইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তবে বর্তমান সমাজব্যবস্থার অসারতা ও আশাহত মধ্যবিত্ত জীবনের কারুণ্য উভয় কবিকেই নাড়া দিয়াছে। প্রকাশভঙ্গী সম্পর্কে 'পাখনা' যেখানে অত্যাধুনিকতার অভিযাত্রী, 'প্রাত্যহিক' সেখানে মধ্যপন্থী। গ্রন্থ দুইখানি পাঠ করিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি, এবং বিশ্বাস রাখি—পাঠকবর্গও মুগ্ধ হইবেন।

প্রাপ্তি স্বীকার

(ক) Benoy Kumar Sarker (a study) by Prof. Haridas Mukherjee.

(খ) বিবর্ত্তনে বাঙ্গালী—শ্রীঅমিয়মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(গ) বাঙলা ও বাঙালী, পরাজিত বাঙলা — চুণীলাল গঙ্গোপাধ্যায়

(ঘ) মধুমিতা, তিমির তৃষা — দিলীপ দাশগুপ্ত

(ঙ) পূর্ণিমা [দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা] — শ্রীদেবপ্রসাদ গুহ ও শিশিররঞ্জন গুহ সম্পাদিত

সম্পাদকীয়

বঙ্গশ্রীর বর্ষ শেষ

বর্তমান সংখ্যার সঙ্গে বঙ্গশ্রী তাহার বিংশতিবর্ষ বয়স অতিক্রম করিল। আগামী আষাঢ় হইতে বঙ্গশ্রীর একবিংশতিতম বর্ষারম্ভ। যাঁহারা গত বিশ বৎসর ধরিয়া অকুণ্ঠচিত্তে আমাদিগকে নানাভাবে সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন, আগামী বৎসরেও আশা করি তাঁহাদের সাহচর্য হইতে আমরা বঞ্চিত হইব না।

গত বিশ বৎসরের ইতিহাস কোথাও কোনো একটা মুহূর্তের জন্যও সুস্থতার ইতিহাস নয়। যেমন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, তেমনি আন্তঃপ্রাদেশিক পরিবেশে রাজনীতি ও সমাজনীতির ঢেউ বার বার ভাঙিয়া পড়িয়াছে, বার বার জাতির প্রাণসত্তাকে নিষ্পিষ্ট করিয়াছে; দুর্ভিক্ষে বন্যায় মারী মড়কে, দাঙ্গায় সহস্র সহস্র প্রাণ বলি হইয়াছে, দেশ বিভক্ত হইয়াছে, দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার সূর্য অস্তমিত হইতে বসিয়াছে,—কোথাও কোনো ক্ষেত্রেই বঙ্গশ্রী নিষ্ক্রিয় হইয়া মাত্র দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া বসিয়া থাকে নাই। কি ভাবে দেশের অনুর্বর ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি পাইয়া জাতি অন্নেবস্ত্রে স্বাবলম্বী হইয়া পূর্ণ মনুষ্যত্বের অধিকারী হইতে পারে, কিভাবে বিশ্ব হইতে যুদ্ধের ভীতি বিদূরিত হইয়া সমগ্র জাতির মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করিতে পারে, কিভাবে ব্যাধি ও রোগ-বীজাণুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়া মানুষ অটুট স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া সুখের জীবন উপভোগ করিতে পারে, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সেই সব পথের নির্দেশ দিয়া বঙ্গশ্রী আগাগোড়াই সংগঠনী শক্তিতে ভারতকে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। মানুষের মন হইতে যতক্ষণ পর্যন্ত না নীচ প্রবৃত্তিগুলি বিদূরিত হইয়া জ্ঞানরঞ্জনীপ্রসূত সুকুমার বৃত্তিগুলির পূর্ণ বিকাশ হইতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ মনুষ্য নামের অযোগ্য। মনুষ্যত্বের ভিত্তিতে পূর্ণ ও স্থিতধী মানুষ গঠন করার দায়িত্ব যদি দেশের সাময়িক পত্রসমূহের কিছুমাত্রও থাকিয়া থাকে, তবে বঙ্গশ্রী তাহা প্রতি অনুতে অনুতে পালন করিয়াছে। দাঙ্গা-বিধ্বস্ত বাঙালী জীবনে যখন দেশ-বিভাগ অনিবার্যরূপে দেখা দিল—তাহার আশু ভবিষ্যতের দিকে জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বঙ্গশ্রী দেশকে তাহার অখণ্ড অধিকারে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে নির্দেশ দিয়াছিল।

এ কথা নিশ্চিত যে, দেশ রক্ষা না পাইলে, জাতি না বাঁচিলে এ-দেশের শিল্প-সাহিত্যেরও সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটিবে। দেশের মানুষ যদি না বাঁচিল, তবে কাহার জন্য শিল্প, কাহার জন্য সাহিত্য, কাহার জন্য শিক্ষা আর ললিতকলা—ভাস্কর্য? সুতরাং মানুষই একমাত্র আধার যাহাকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র একটা দেশ, সমগ্র একটা জাতি গরীয়ান হইয়া উঠিতে পারে। সেই মানুষের সর্ববিধ কল্যাণের পথকে উন্মুক্ত করিয়া দিতেই তবরুদ্ধ চেতনার দ্বার ঠেলিয়া একদিন দীপ্ত বিভায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল বঙ্গশ্রী। অদ্যও তাহার সাধনার পথ হইতে সে ভ্রষ্ট হয় নাই অদ্যও নিয়মিতই সে ভারতআত্মার বাণী দুয়ার হইতে দুয়ারে বহন করিয়া নিয়া চলিয়াছে। সুদীর্ঘ উজ্জ্বল অতীত হইতে অনাগত ভবিষ্যতের পথে আজও তাহার অপ্রতিহত গতি কোথাও শিথিল হয় নাই, বরং দ্রুত হইয়াছে।

গত বিশ বৎসর ধরিয়া নানা শুভানুধ্যায়ী লেখক লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও গ্রাহক অনুগ্রাহক বঙ্গশ্রীর পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া আসিতেছেন। এই অবকাশে তাঁহাদের সকলকে আমাদের বর্ষ-শেষের সাদর অভিবাদন ও প্রীতি নমস্কার জ্ঞাপন করি। ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল

গত ১১ই মে পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের ঊর্ধ্বতন সভায় কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল লইয়া সর্বশেষ আলোচনার সূত্রপাত হয়। জমিদারী গ্রহণ ও বালিকা তর জীর্ণ-গৃহ ও বস্তী অঞ্চলের সংস্কার সাধন—এই উভয় দিককে কেন্দ্র করিয়াই প্রধানতঃ আলোচনা গড়িয়া উঠে।

অধিবেশনে বিরোধী পক্ষ হইতে কলিকাতার নাগরিক সাধারণের নিরাপত্তার স্বার্থে মহানগরীর জীর্ণ গৃহগুলির ধ্বংস সাধন করার দাবী উত্থাপিত হয়। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বলেন যে, কলিকাতার জীর্ণ বাড়ীগুলির সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করার ক্ষমতা কর্পোরেশনের রহিয়াছে। জনসাধারণের কল্যাণের জন্য ঐ ক্ষমতা কিভাবে প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তাহাই একমাত্র প্রশ্ন।—মিউনিসিপাল বিল প্রসঙ্গেই এই আলোচনাগুলি বিশেষভাবে প্রাধান্য লাভ করে। বিতর্কের শেষে স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে বিলটি গৃহীত হয়। রাজ্য বিধান সভায় ইতিপূর্বেও এই বিল গৃহীত হইয়াছিল।

প্রসঙ্গতঃ জমিদারী গ্রহণ বিল সম্পর্কে বিবেচনার জন্য বিধান সভার প্রস্তাবানুযায়ী নিযুক্ত সংযুক্ত কমিটিতে পরিষদের চারিজন সদস্য গ্রহণের প্রস্তাব গৃহীত হয়। মিউনিসিপাল সংশোধন বিলের আলোচনাকালে বিরোধী পক্ষের বিভিন্ন সদস্য কর্পোরেশন পরিচালন ব্যবস্থায় গলদ এবং নগরীর মধ্যবিত্ত ও গরীবদের বিশেষ করিয়া বস্তীবাসীদের শোচনীয় দুর্দশার উল্লেখ করেন এবং এ সম্পর্কে জনমত-সংগ্রহের জন্য তাঁহারা বিলটি প্রচারের দাবী জানান। ইহার সপক্ষে কেহ কেহ এই অভিমতও ব্যক্ত করেন যে, এই সংশোধনী বিলে নির্বাচিত কাউন্সিলারদের ক্ষমতা হরণ করা হইয়াছে এবং কমিশনারকে অধিকতর ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ইহা গণতান্ত্রিক নীতিসম্মত নয়। কলিকাতার জীর্ণভবনগুলির ধ্বংসসাধনের কোনো বিধান বিলে নাই বলিয়াও বিরোধী পক্ষ হইতে অভিযোগ করা হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে কলিকাতার শতকরা ৫০ ভাগ বাড়ীই দীর্ঘকালের পুরাতন। ঐগুলির অধিকাংশের অবস্থাই অত্যন্ত বিপজ্জনক। বিত্তশালী ব্যক্তিরা ঐসব ভবনের মালিক বলিয়াই ঐগুলিতে হস্তক্ষেপ করা হয় না। এতদ্ব্যতীত ড্রেন এবং বস্তীর উন্নয়ন ব্যাপারেও কোনো ধারা বিলে নাই।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় বলেন যে—ড্রেন, জল সরবরাহ এবং বস্তী উন্নয়ন সম্পর্কে শুধু কর্পোরেশন নহে—সরকারের দায়িত্বও রহিয়াছে। এই সব কাজ করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন। ক্ষমতাসম্পর্কে কোনো অসুবিধার প্রশ্ন নাই, অসুবিধা হইতেছে অর্থের। সরকার এবং কর্পোরেশন উভয়েই কতকগুলি নলকূপ খননের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সমস্যা সমাধানকল্পে উহাই যথেষ্ঠ নয়। লবণ হ্রদ অঞ্চলের সংস্কার এবং ময়লা নিষ্কাষণ সম্পর্কে তাঁহারা এক পরিকল্পনা করিয়াছেন। বস্তীর উন্নয়ন করিতে এবং বস্তীবাসীদের বাসের বিকল্প ব্যবস্থা করিতে একশত কোটি টাকার প্রয়োজন হইবে। টাকা কোথা হইতে আসিবে, ইহাই সমস্যা।

কিন্তু কথা হইতেছে যে—এই সমস্যার সমাধানও কর্পোরেশনের সঙ্গে একযোগে গভর্ণমেণ্টকে করিতে হইবে। শুধু সমস্যা দেখাইয়া দিয়া বিতর্কের অবসান ঘটাইলেই কাজ হইবে না, সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশনের যে গুরু দায়িত্ব বাড়িয়াছে, সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া গঠনমূলক পন্থার উপর বিশেষ চাপ দিতে হইবে। ইহার জন্য গভর্ণমেণ্টকে যদি অধিক অর্থ ব্যয় করিতে হয়, তবে সে-দায়িত্ব ডাঃ রায়কেই গ্রহণ করিতে হইবে। কলিকাতা কর্পোরেশন ক্রমেই সম্প্রসারিত হইতে চলিয়াছে। বৃহত্তর কলিকাতার স্কীম ইতিমধ্যেই কার্যকরী হইতে সুরু হইয়াছে। টালিগঞ্জ মিউনিসিপালিটি গত ১লা এপ্রিল হইতেই কলিকাতা কর্পোরেশনের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। এমতাবস্থায় কলিকাতা কর্পোরেশনের দায়িত্ব পালন নিতান্ত অর্থসাপেক্ষ হইয়া দাঁড়াইবার অবকাশ এখন আর নাই বলিলেই হয়। আমরা আশা করিব—উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষ এবং পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট একযোগে কার্যকরী দায়িত্ব পালন করিয়া অবিলম্বে নাগরিক জনসাধারণের মহৎ কল্যাণ সাধন করিতে ব্রতী হইবেন।

ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠন সমস্যা

পশ্চিমবঙ্গের জীবন-মরণ প্রশ্নের সহিত জড়িত ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের দাবী এ পর্যন্ত রাজ্যের সকল শ্রেণী, স্তর ও দলের লক্ষ লক্ষ নরনারীর অন্তর হইতে প্রতিধ্বনিত হইলেও উহার প্রতি ভারত গভর্ণমেণ্টের যথেষ্ট মনোযোগ আকৃষ্ট হইতেছে না বলিয়া এতদিন রাজ্যের আপামর জনসাধারণের মনে চাপা একটা ক্ষোভ ও হতাশা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছিল। ইহারই ভিত্তিতে কলিকাতার বালিগঞ্জ অঞ্চলে শ্রীবৈদ্যনাথ ভৌমিক নামক পঞ্চাশৎবর্ষ বয়স্ক এক প্রবীণ কংগ্রেসকর্মী (বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলগুলি পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্তির দাবীতে) আমরণ অনশন গ্রহণ করেন। সত্যাগ্রহের এই দুর্জয় সঙ্কল্প তিনি কিছুতেই ত্যাগ করিবেন না বলিয়া শ্রীযুক্ত ভৌমিক ঘোষণা করেন। তাঁহার এই অনশনকে পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া গত ২৫শে এপ্রিল নাগরিকবৃন্দের এক জনসভায় এই দাবী পূরণের জন্য দেশব্যাপী গণ-আন্দোলন সৃষ্টির আহ্বান জানানো হয়। উক্ত সভায় কংগ্রেসী সরকার কর্তৃক শ্রীযুক্ত ভৌমিকের অমূল্য জীবন রক্ষার ব্যাপারে

সরকারের ঔদাসীন্যের তীব্র সমালোচনা করা হয় এবং এই মর্মে সতর্ক করিয়া দেওয়া হয় যে, সরকারের ঔদাসীন্যের ফলে কোনো অশুভ ঘটনা ঘটিলে ঐজন্য পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস ও সরকার দায়ী হইবেন।

ঘটনাটি এমন সময় অধিকতর উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে যখন স্বতন্ত্র অন্ধ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা পুরাপুরি স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে। অথচ ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের দাবীটি বাংলাই সর্বাগ্রে তুলিয়াছিল। এ সম্পর্কে আমরা উপর্যুপরি ভারত গভর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি এবং অন্ধ্র নেতা শ্রীরামুলুর মৃত্যুর পর একথাও আমরা ভারত গভর্ণমেণ্টকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলাম যে, অনুরূপ কোনো ঘটনা যদি পশ্চিমবঙ্গে ঘটে, তবে যে-অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহার দায়িত্ব গ্রহণ করা ভারত গভর্ণমেন্টের পক্ষে যুক্তিযুক্ত হইবে না।

গড়বেতায় গত ২৫শে এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক পরিষদের সভায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রী এস্ এন্ অগ্রবাল ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের সীমানা পুনর্নির্ধারণের ব্যাপক পরিকল্পনা রচনার আভাস দিয়া বলেন, ভারত সরকার এতদুদ্দেশ্যে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিশন নিয়োগ করিবেন। সমস্যার সমাধান বিলম্বিত করিয়া তোলা অথবা সমগ্র প্রশ্ন ধামাচাপা দেওয়া কমিশন গঠনের উদ্দেশ্য নয়; 'ভাষা ও শিক্ষা সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধার' ভিত্তিতে রাজ্যসমূহের সীমানা পুনর্নির্ধারণের জন্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে সুষ্ঠু পরিকল্পনা রচনাই উহার লক্ষ্য।—খণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গের সহিত বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলসমূহ যুক্ত করার দাবীর উত্তরে শ্রীঅগ্রবাল ভারতের বিভিন্ন রাজ্য পুনর্গঠনের কথা বলেন।

অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সীমানা পুনর্নির্ধারণের দাবী জানাইয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। উহাতে বলা হয়, শুধু ভাষাভিত্তির নীতিতে নহে, পশ্চিমবঙ্গের তিনটি বিচ্ছিন্ন অংশের মধ্যে সংযোগ সাধন ও উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্যও এতৎরাজ্যের সীমানা বৃদ্ধির প্রয়োজন। অন্ধ্র রাজ্য গঠনের প্রস্তাবে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া এই সভা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ক্ষেত্রেও অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কংগ্রেস ও ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলসমূহ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করিবার দাবী জানাইয়া শ্রীবৈদ্যনাথ ভৌমিক যে অনশন করেন, তাহাতে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া সভায় একটি প্রস্তাবে তাঁহাকে অনশন ত্যাগ করিতে অনুরোধ জানানো হয়।

এদিকে শ্রীযুক্ত ভৌমিকের অনশনের দ্বাদশ দিবসে লেক অঞ্চলের এক উদ্বাস্তু কলোনীতে ৭৩ জন উদ্বাস্তু এই উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতিজ্ঞাপক অনশন ধর্মঘট পালন করেন। হাজরা পার্কে এক জনসমাবেশকে সম্বোধন করিয়া পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন দল ও মতের নেতৃবৃন্দ ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে ভারত সরকারের বৈষম্যমূলক ও সুবিধাবাদী নীতির তীব্র নিন্দা করেন। অনশনরত শ্রীবৈদ্যনাথ ভৌমিকের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহারা এই মন্তব্য করেন যে, তন্ধে পাট্টি শ্রীরামুলুর মৃত্যুর পরও দেখা যাইতেছে, বলিদান বা গণবিক্ষোভ না হইলে ভারত সরকার জনমতের নিকট নতি স্বীকারে সম্মত নহেন। ইংরাজেরা শোষণের ভিত্তিতে যে প্রদেশ বিভাগ করিয়াছিল, কংগ্রেস সরকার উহাই বজায় রাখিতে বদ্ধপরিকর। গত ৪ঠা মে এতদুদ্দেশে 'সারা বাংলা দাবী দিবস' পালন করা হয়। এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এক প্রস্তাবে বিহারে বাংলা ভাষা যাহাতে সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃত হয়, তন্নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতিকে নির্বন্ধ অনুরোধ জানানো হয়। বিরোধী পক্ষ হইতে উত্থাপিত বেসরকারী ঐ প্রস্তাবে সরকারী সমর্থন জানাইয়া রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ও বিহারে বঙ্গভাষা ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে কোনো রাজ্যের পক্ষে এরূপ মনোভাব সংবিধান বিরোধী এবং উহা সমগ্রভাবে ভারতীয় স্বার্থের পরিপন্থী।—বিরোধী পক্ষ হইতে উত্থাপিত অপর একটি বেসরকারী প্রস্তাবে বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলগুলি পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্তির জন্য রাজ্য সরকার কর্তৃক যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বনের নিমিত্তও পুনরায় দাবী উত্থাপিত হয়। বিগত ৬ই মে বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁহার বিবৃতি দান প্রসঙ্গে বলেন যে, বিধানসভা গত বৎসর এই সম্পর্কে একটি প্রস্তাবও করিয়াছেন এবং মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তসমেত ঐ প্রস্তাবটি কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেরণও করা হইয়াছে। এমতাবস্থায় শ্রীভৌমিকের অনশন চালান আর সমীচীন নহে। কিন্তু জীবনসঙ্ঘের পুরোধা শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ ভৌমিক তাঁহার অভিষ্ট লাভ না হওয়া পর্যন্ত সঙ্কল্পচ্যুত হইতে রাজি নহেন বলিয়া জানান। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তিনি অনশন ভঙ্গ করেন। কিন্তু অপর একজন অনশনব্রতী শ্রীসুখেন্দুবিকাশ দাস এখনও অনশন-

ধর্ম্মঘট চালাইয়া যাইতেছেন। আমরা আশা করিব, ভারত গভর্ণমেণ্ট অবিলম্বে এই ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন সমস্যার সমাধান করিয়া দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিবেন।

জাতীয় সাহিত্য একাডেমি ও কপিরাইট্ প্রথার বিলোপ সাধন

গত ২৪শে এপ্রিল রাজ্য পরিষদে সহকারী শিক্ষামন্ত্রী শ্রী কে ডি মালব্য উল্লেখ করেন যে, ভারতীয় ভাষাসমূহের বিকাশ এবং দেশে সাংস্কৃতিক সংহতি প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুকে সভাপতি করিয়া একটি জাতীয় সাহিত্য একাডেমি গঠিত হইবে বলিয়া ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন। ১৯৫১ সালে ভারত সরকারের শিক্ষা-দপ্তর দেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ এবং রাজ্য সরকারসমূহের প্রতিনিধিদের যে সম্মেলন আহ্বান করেন, তাহাতে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী এই একাডেমি গঠিত হইতেছে। ভারতীয় ভাষায় রচিত সাহিত্যসমূহের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তদন্তের জন্য একটি কমিশন নিয়োগের অনুরোধ জানাইয়া শ্রী কে রামরাও কর্তৃক উত্থাপিত একটি প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে সহকারী শিক্ষামন্ত্রী বলেনঃ ভারত সরকার বর্তমান কপিরাইট আইন সংশোধন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এ সম্পর্কে বিভিন্ন রাজ্য সরকারের প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা করা হইয়াছে এবং আইন দপ্তরকে একটি সংশোধন বিলের খসড়া প্রণয়নের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। শীঘ্র উক্ত সংশোধন বিল বিধিবদ্ধ হইবে এবং তাহার ফলে গ্রন্থকারদের শোষণের অবসান ঘটিবে বলিয়া অনুমান করা যায়।

কপিরাইট প্রথার বিলোপসাধন সম্পর্কে এ পর্যন্ত নানা কাগজে বহু লেখালেখি হইয়া গিয়াছে ; আমরা জানিতাম —যতদিন পর্যন্ত না এই আন্দোলন সরকারী অনুমোদন লাভ করিয়া সরকারী বিধি-ব্যবস্থায় আরোপিত হইতেছে, ততদিন এ সম্পর্কে বিশেষ কিছু-একটা কার্যকারিতা আশা করা মিথ্যা। সুখের বিষয় যে, বর্তমানে ইহা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু আইন বিধিবদ্ধ হইলেই যে কপিরাইট প্রথা সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, এমন কথা মনে করা যায় না। কালোবাজারী আইন পাশ হওয়া সত্ত্বেও যেমন সমাজ-দেহের নাড়ীতে নাড়ীতে উহা ছড়াইয়া রহিয়াছে, তেমনি আইনের চোখে ধূলা দিয়া ইহাও হয়ত রহিয়া যাওয়া বিচিত্র হইবে না। আর একটি কথা হইতেছে এই যে, কপিরাইট সম্পর্কে যেমন প্রকাশকশ্রেণীর পক্ষ হইতে যথেষ্ট জুলুম আছে, লেখকশ্রেণীর পক্ষ হইতেও তেমনি যথেষ্ঠ দুর্বলতা রহিয়াছে। লেখক যদি প্রকাশককে গ্রন্থের কপিরাইট বিক্রি না করেন, তবে হয়ত প্রকাশক সেই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে রাজী থাকেন না। এদিকে লেখক আর্থিক প্রয়োজনীয়তার চাপে বাধ্য হইয়া প্রকাশকের ইচ্ছানুসারে তাঁহার হাতে গ্রন্থ সঁপিয়া দিলেন ; যৎসামান্য যাহা দক্ষিণা মিলিল, তাহাতেই তিনি খুশী থাকিলেন। এ অবস্থার অবশ্য ইদানীং কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে, কিন্তু পরিবর্তন ঘটিলেও সংশোধন হয় নাই। সুতরাং কপিরাইট প্রথা বিলুপ্তির মূলে লেখকশ্রেণীর আর্থিক অস্বাচ্ছল্য যাহাতে দূরীভূত হইতে পারে, সেইদিকেই গভর্ণমেণ্টকে দৃষ্টি দিতে হইবে। জাতীয় সাহিত্য একাডেমি প্রতিষ্ঠার ফলে লেখকশ্রেণীর এই দুর্গত অবস্থার যে অনেকখানি পরিবর্তন হইবে, তাহা আমরা বিশ্বাস করি। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে এইরূপ একটি একাডেমি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তাও যথেষ্টই রহিয়াছে। ভারতীয় ভাষার বিকাশ ও সাংস্কৃতিক সংহতির প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে জাতীয় সাহিত্য একাডেমি সুপ্রতিষ্ঠভাবে গড়িয়া উঠিলে শিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রেই আনন্দিত হইবেন, সন্দেহ নাই।

পাকিস্থানে মন্ত্রিত্বের পরিবর্ত্তন

পাকিস্থানের গভর্ণর জেনারেল গত ১৭ই এপ্রিল খাজা নাজিমুদ্দীনকে প্রধানমন্ত্রীর পদ হইতে অপসারিত করিয়া জনাব মহম্মদ আলীকে উক্ত পদে বহাল করিয়াছেন। এই সময়ে জনাব মহম্মদ আলী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে পাক-রাষ্ট্রদূতরূপে নিযুক্ত ছিলেন। এই পরিবর্তনের যুক্তিস্বরূপ এক ইস্তাহার প্রচার করিয়া পাক-গভর্ণর জেনারেল জনাব গোলাম মহম্মদ বলেনঃ 'পাকিস্থানকে যে ক্রমবর্ধমান অশান্তি এবং গুরুতর সঙ্কটজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, তাহা আমি লক্ষ্য করিয়াছি। দেশের খাদ্য পরিস্থিতি বিশেষ সঙ্কটজনক হইয়া উঠিয়াছে। দেশের সাধারণ অর্থনীতিক্ষেত্রে এমন কয়েকটি সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে—যেগুলি সম্পর্কে দৃঢ়তার সহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারেও দৃঢ়তার সহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন, সরকারী ব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা হইয়াছে এবং সরকার পরিস্থিতির উপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন নাই বলিয়া গুরুতর অভিযোগ করা হই-

য়াছে। আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিসভা দেশের বিবিধ সঙ্কট সমাধানে চূড়ান্ত অক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। দেশে যে জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করিতে নির্দেশ দেওয়া আমার কর্তব্য বলিয়া আমি মনে করিয়াছি। মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিলে অধিকতর দক্ষতার সহিত পাকিস্থানের প্রতি দায়িত্ব পালনে সক্ষম হইবে, এইরূপ এক নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করা যাইতে পারে। সুতরাং আমি পাকিস্থানে বলবৎ ভারত শাসন আইনের ১০ ধারা অনুযায়ী খাজা নাজিমুদ্দীনের মন্ত্রিসভাকে তাঁহাদের দায়িত্ব হইতে মুক্তি দিতেছি। আমি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে পাক-রাষ্ট্রদূত জনাব মহম্মদ আলীকে নূতন সরকার গঠনের জন্য আহ্বান করিয়াছি।'

এতদনুযায়ী ১৭ই এপ্রিল রাত্রি ৮-৪০ মিনিটে করাচী গভর্ণমেণ্ট হাউসে জনাব মহম্মদ আলীর নেতৃত্বে নূতন পাকিস্থান গভর্ণমেণ্টের সদস্যগণ আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। নূতন এই মন্ত্রিসভায় বর্তমানে ১০ জন সদস্য গ্রহণ করা হইয়াছে; পরে প্রয়োজনানুযায়ী আরও কয়েকজন সদস্য গ্রহণ করা হইবে বলিয়া বুলেটিনে বলা হইয়াছে। নূতন মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রী জনাব মহম্মদ আলী ভিন্ন আছেন—জনাব মহম্মদ জাফরুল্লা খাঁ, মহম্মদ আলী, জনাব এম্ এ গুরমানী, সর্দার বাহাদুর খাঁ, ডাঃ এ এম্ মালিক, জনাব আই এইচ কুরেশী, জনাব এ কে বারোরী, খাঁ আব্দুল কোয়ায়ুম খাঁ, জনাব এস কুরেশী।

নূতন প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিয়া জনাব মহম্মদ আলী করাচী বেতার কেন্দ্র হইতে তাঁহার দেশবাসিগণের উদ্দেশ্যে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেনঃ 'যে ঐক্য ও সংহতির আদর্শের উপর পাকিস্থানের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল, সেই আদর্শকে পুনরায় দৃঢ়ভাবে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। পাকিস্থানের সম্মুখে আজ ইহাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। বিরোধ, অনৈক্য, প্রাদেশিকতা এবং অসহিষ্ণুতার অবশ্যই সমাপ্তি ঘটাইতে হইবে। কায়েদে আজম কর্তৃক স্বাধীনতার লক্ষ্যাভিমুখে চালিত হইবার কালে আমরা যেরূপ এক ও সুদৃঢ় উদ্দেশ্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলাম, সেইরূপ বর্তমানেও ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসাবে আমাদিগকে উঠিয়া দাঁড়াইতে হইবে। দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র স্থাপন করিতে হইবে। পাকিস্থানের ঐক্য ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য পাকিস্থান সরকার সর্বদা যত্নবান থাকিবেন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার পূর্ণভাবে রক্ষা করা হইবে। দুর্নীতি ও আত্মীয়তোষণ হইতে মুক্ত করিয়া শাসনব্যবস্থাকে সুযোগ্য ও নিষ্কলুষ করাই আমার প্রধান কর্তব্য হইবে।—আমাদের সম্মুখে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, খাদ্য সমস্যা, উদ্বাস্তু সমস্যা প্রভৃতি বড় বড় সমস্যা রহিয়াছে। বর্তমান সঙ্কট হইতে দেশকে মুক্ত করার জন্য এবং ঐ সকল সমস্যা সমাধানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে।...'

নয়া গঠনমূলক প্রস্তুতির এই বাণী যখন বেতার মাধ্যমে প্রচারিত হইতেছিল, খাজা নাজিমুদ্দীন তখনও নিজেকে আইনতঃ পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী বলিয়া দাবী করেন এবং গভর্ণর জেনারেলের কার্য বেআইনী ও শাসনতন্ত্র-বহির্ভূত বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি বলেন যে, পাকিস্থান শাসনতন্ত্রে এমন কোনো বিধান নাই যাহাতে গভর্ণর জেনারেলকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশক্রমেই গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছেন। গভর্ণর জেনারেল জনাব গোলাম মহম্মদ বে-আইনী ও অনিয়মতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন এবং গণতন্ত্রের মূলনীতিবিরুদ্ধ কার্য করিয়াছেন।'

কিন্তু এইরূপ অসাড় ঘোষণা দ্বারা নিজের প্রধানমন্ত্রিত্বের আসন শেষ পর্যন্ত কিন্তু সত্যি সত্যই তিনি টিকাইয়া রাখিতে পারিলেন না। জনাব মহম্মদ আলীই প্রধানমন্ত্রিত্বের আসন গ্রহণ করিয়া কার্যপরিচালনা আরম্ভ করিয়া দিলেন। লণ্ডনের কোনো কোনো রাষ্ট্রনীতিবিদ এই মন্ত্রিত্বের পরিবর্তনকে পাকিস্থান ও ভারতের সম্পর্কের দিক হইতে ভাবী কল্যাণের ইঙ্গিত বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। এই মন্তব্য যে নিতান্তই অমূলক নয়, তাহা যে কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তিই অনুধাবন করিবেন। পাকিস্থানের অভ্যন্তরে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সমস্যা যেভাবে ক্রমেই গুরুতর হইয়া উঠিতেছিল এবং ভারতের সহিত পাকিস্থানের সম্পর্ক যেরূপ ক্রমেই তিক্ততার মধ্যে পর্যবসিত হইতেছিল, তাহাতে পাকিস্থানের জনসাধারণের মনে এইরূপ একটা পরিবর্তন ক্রমেই মূর্ত হইয়া উঠিতেছিল। খাজা নাজিমুদ্দীন যত বড় বানু রাষ্ট্রনীতিবিদই হন না কেন, তাঁহার সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির দ্বারা তিনি একটি দিনের জন্যও যে জনসাধারণের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারেন নাই, একথা নিশ্চিত। এই নিশ্চিত নির্ভরতার উপরেই তাঁহাকে অবশেষে কর্মক্ষমতা হইতে অপসৃত হইতে হইল। জনাব মহম্মদ আলীর উপর পাকিস্থানের জনসাধারণের যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে বলিয়াই আমরা বিশ্বাস রাখি। অবিভক্ত বঙ্গেও আমরা তাঁহার কার্যাবলী লক্ষ্য করিয়াছি। তাহা যথেষ্ট সন্তুষ্টির পর্যায়ে

না উঠিলেও কোথাও তিক্ততার সৃষ্টি করে নাই। দপ্তরের ভার গ্রহণ করিয়া তিনি বেতার-মাধ্যমে যে সমস্ত সমস্যার কথা উল্লেখ করিয়া তাহার সমাধানে যথোপযুক্ত শক্তি নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তাহা তিনি মনেপ্রাণে পালন করিবেন বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি। ভারতের প্রতি তাঁহার একটি স্বাভাবিক মমতাও আমরা ইতিমধ্যে লক্ষ্য করিয়াছি। তাহা নিতান্তই 'রাষ্ট্রনৈতিক চাল' হইবে না—এ বিশ্বাসও আমাদের আছে। আমরা আশা করিব—তাঁহার সুযোগ্য কর্মক্ষমতা দ্বারা তিনি অল্পদিনেই একদিকে যেমন পাকিস্থানের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করিয়া দেশকে নতুন করিয়া গড়িয়া তুলিবেন, তেমনি ভারতের সঙ্গে পাকিস্থানের মধুর সম্পর্ক সৃষ্টি করিয়া একই সঙ্গে উভয় দেশের শ্রদ্ধা লাভ করিবেন।

ইরাণের রাজনৈতিক পটক্ষেপ

পারস্যের বর্তমান সমাজ-জীবন এক গুরুতর সঙ্কটের মধ্য দিয়া অতিক্রান্ত হইয়া চলিয়াছে। এই পরিস্থিতি আরও শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছে তেহেরাণের জনতা। সমকালীন ইতিহাসের তাহারাই প্রধান রচয়িতা। দেশের রাজনৈতিক জীবন অবাঞ্ছনীয় রূপে রাজধানীতে সংহত হওয়ার ফলেই এই পরিস্থিতির উদ্ভব।—টাইমস্ অব ইণ্ডিয়ার নিউজ সার্ভিস' এই মর্মে ঘোষণা করিয়াছেন যে, তেহেরাণের জনতার প্রকৃতি ফরাসী বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ের জনতার অনুরূপ। দেশের যে কোনো রাজনৈতিক দলই এই জনতাকে প্রতিশ্রুতিপূর্ণ ফাঁকা বুলিতে বিভ্রান্ত করিয়া গোলযোগ সৃষ্টি করিতে পারে। গভর্ণমেণ্টের উত্থান-পতন এই জনতার অনুগ্রহের উপরই নির্ভর করিয়া আছে।

শাহ হইতে সুরু করিয়া পারস্যের সমস্ত সংস্কারকগণই শাসনব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছেন এবং তদনুযায়ী রাজক্ষমতার একটা মোটা অংশ প্রদেশসমূহের মধ্যে বন্টনের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির পথে অসুবিধাজনক বলিয়া নেতৃবৃন্দ তাহার বিরোধিতা করিয়াছেন। ফলে, পারস্যের রাজধানী বর্তমানে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের স্বার্থসিদ্ধির একটি উর্বরক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।—ডাঃ মোসাদ্দেক ও তাঁহার সমর্থকগণ, এমন কি তাঁহার পূর্বেও যাঁহারা বিদেশবিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়া ক্ষমতালাভ করিয়াছেন, তাঁহারা রাজনৈতিক অস্ত্ররূপে উক্ত তেহেরাণ-জনতাকেই বিরোধীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু বিভিন্ন দল দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত এই মারাত্মক জনতা কেবলমাত্র কতিপয় কাজেরই উপযুক্ত—যেমন, বৈদেশিক শোষণকে নিন্দিত করা, কি বরবাদের চেষ্টা করা—অথবা বৈদেশিক শক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সন্দেহ করিয়া গাভাম-ও-শালতানের মতো লোককে রাষ্ট্রজীবন হইতে অপসারিত করা। ফলে এই জনতা কখনও কোনো দল বা নেতার নির্ভরযোগ্য সহায়-সমর্থকরূপে সংহত থাকিতে পারে না। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য কিভাবে জনতাকে কাজে লাগানো যায়, সে সম্পর্কে ডাঃ মোসাদ্দেককে কেহই উপদেশ দিতে পারে না। তিনি এ বিষয়ে পারদর্শী। কিন্তু দেখা যাইতেছে, তিনি ইহাকে বশে রাখিতে ব্যর্থ হইয়াছেন, এইজন্যই দেখা যাইতেছে, আজ যাহারা 'শাহকে চাই না' বলিয়া গগন বিদীর্ণ করিতেছে, তাহারাই কাল অনুরূপ আবেগে ও উত্তেজনায় দাবী তুলিতেছে—'আমাদের শাহকে দাও, নইলে মৃত্যু।' আবার আর একদিন ডাঃ মোসাদ্দেককে ইরাণের শ্রেষ্ঠ লোক বলিয়া অভিনন্দিত করিয়া পরদিন তাঁহারই বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়া বলিতেছে—'বিশ্বাসঘাতক নিপাত যাউক।'

জনতার উপরে প্রভাব আছে, দরকার হইলে তাহাদিগকে সংহত ও সমবেত করিতে পারে, এমন দলের সংখ্যা তেহেরাণে ৬টি, যথা—তুদে পার্টি (কম্যুনিষ্ট), ডাঃ মোসাদ্দেক পরিচালিত ন্যাশ্‌নাল ফ্রণ্ট, কাসানীর ধর্মান্ধ দল, অবসরপ্রাপ্ত ও পদচ্যুত অফিসারদ্বারা পরিচালিত রাজপ্রাসাদ দল, শাহের ভ্রাতার ফ্যাসিস্ত সুমকা এবং অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ নিখিল পারস্য দল (প্যান্-ইরাণীয়ান পার্টি)। শেষোক্ত দল পারস্যের হৃত অংশ উদ্ধার করিয়া পূর্বগৌরব ফিরাইয়া আনিতে চায়।

গত জুলাই মাসে যখন ডাঃ মোসাদ্দেক পদত্যাগ করেন, এবং গাভাম-ও-শালতানে প্রধানমন্ত্রী হন, তখন তেহেরাণ ৪ দিন জনতার অধীনে ছিল। তুদে দল ও কাসানীর ধর্মান্ধ দলই উক্ত জনতাকে সমবেত করিয়াছিল। ডাঃ মোসাদ্দেকের ন্যাশ্‌নাল ফ্রণ্ট দল সেই জনতার বিক্ষোভে যোগদান করিয়াছিল তাহাদের নেতার বিরুদ্ধে ধ্বনি তুলিতে, কিন্তু তাঁহাকে ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার সকল কাজ কম্যুনিষ্ট ও কাসানীর লোকেরাই করিয়াছে। যাহাতে তাহারা অধিক ক্ষমতাশালী না হয়, এইজন্য ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর ডাঃ মোসাদ্দেক চাহিলেন কম্যুনিষ্ট জনতাকে ভাঙ্গিয়া দিতে। গত সেপ্টেম্বর মাসে তিনি নিজের এবং কাসানীর দলকে নিযুক্ত করিলেন

কম্যুনিস্টদের অফিসে হানা দেওয়া, তাহাদের শান্তি-কেন্দ্রগুলি পোড়াইয়া দেওয়া, ষ্ট্যালিনের প্রতিকৃতি ছিঁড়িয়া ফেলা এবং তাহাদের পুস্তকের দোকান ধ্বংস করার জন্য। কিন্তু গতমাসের প্রথম দিকে যখন কাসানীর ধর্মান্ধরা নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া শাহের রাজ্যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিল, তখন আবার কম্যুনিস্টদেরই তিনি কাসানীর লোকদের বিরুদ্ধে লাগাইয়া দিলেন। এইভাবে কম্যুনিস্ট ও কাসানীদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করিয়া ও বিরোধ বাধাইয়া দিয়া শান্তিশৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হইলেন। পুনরায় ২ সপ্তাহ পূর্বে ডাঃ মোসাদ্দেক শাহের বিরুদ্ধে কম্যুনিস্টদের নিযুক্ত করিয়া ৮ জন সদস্যের কমিটির রিপোর্ট পাশ করার দাবী তোলেন।

ডাঃ মোসাদ্দেক জানেন, শাহ তেমন কিছু শক্তিশালী নন—শীঘ্রই তিনি তাঁহাকে অপসারিত করিয়া অথবা তাঁহাকে নামে মাত্র শাহ রাখিয়া চরম ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারিবেন। কিন্তু ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলেও, তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না—যতদিন না তিনি তেহেরাণের উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন।

ইন্দোচীনের অভ্যন্তরে

ইন্দোচীনের লাওস রাজ্যের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ইতি-মধ্যেই বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ভিয়েৎমিনরা লাওস রাজ্যে অভিযান সুরু করিলে ফরাসী ও লাওসিয়ান সৈন্যরা সামনেউয়া রাজ্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। সংবাদ-পত্র-পাঠকদের একথা অবশ্যই স্মরণে আছে বলিয়া মনে করি। ইতিপূর্বে ভিয়েৎমিন বেতারে বলা হইয়াছিল যে, লাওসে 'একজন ভিয়েৎমিন সৈন্যও নাই' এবং 'যে সকল লাওসিন ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করি-য়াছে,' তাহারাই সেখানে যুদ্ধ করিতেছে।' এ সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন রয়টার। 'নিউইয়র্ক হেরাল্ড' পত্রিকার এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, ইন্দো-চীনে ভিয়েৎমিন বাহিনীর সম্ভবদ্ধ অভিযানের ফলে লাওস রাজ্য অপেক্ষা বৃহত্তর অঞ্চল বিপন্ন হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। সম্প্রতি কম্যুনিস্টদের এক ঘোষণায় বলা হয় যে, ভিয়েৎনাম লাওস তাইল্যান্ড ও ব্রহ্মের বিভিন্ন অংশ এবং চীনের য়ুনান প্রদেশ লইয়া একটি সম্মিলিত 'তাই রাষ্ট্র' গঠনের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। তদুপরি উক্ত পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ইহাও বলা হইয়াছে যে, লাওস রাজ্য কুক্ষিগত হইলে কম্যুনিস্টরা তাইল্যান্ড ও ব্রহ্ম সীমান্ত-বর্তী মেকং নদীর তীরে পৌঁছিবে। অরণ্যবর্তী লাওস রাজ্যে সামরিক লক্ষ্যবস্তুসমূহ উপেক্ষার যোগ্য হইলেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সম্মিলিত তাই রাষ্ট্র গঠনের পরি-কল্পনা কখনও উপেক্ষণীয় নয়। প্যারিসের সংবাদে প্রকাশ, ইন্দোচীন হইতে প্রাপ্ত সর্বশেষ সংবাদে জানা যায় যে, লাওস রাজ্যের সামনেউয়া ঘাঁটি হইতে পশ্চাদপসরণকারী ফরাসী সৈন্যদল সুদীর্ঘ অরণ্যাঞ্চল অতিক্রম করিয়া সমতল-ক্ষেত্রস্থিত ফরাসী ব্যূহে উপনীত হইয়াছে। ওয়াশিংটন-স্থিত লাওস রাজ্যের দূত মিঃ কুর্ত্তসুভ্রনা ভন সাইগন বলেন যে, লাওস দখলের সংগ্রাম সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। ফরাসী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের সংবাদে জানা যায় যে, ভিয়েৎমিন বাহিনীকে এক্ষণে সমতল ক্ষেত্রে অবস্থিত সুদৃঢ় ফরাসী ঘাঁটির বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইতে হইবে। তবে এই অভিযান ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

ঘটনা দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে ঘটনাবিবর্তন সম্পর্কে পূর্বাহ্নে কোনো মন্তব্য প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত না হইলেও একথা স্পষ্টই বলা চলে যে, যখন বিশ্বশান্তি লইয়া বৃহত্তর নীতি রচিত হইতেছে, তখন এই জাতীয় যুদ্ধ বিদ্রোহগুলি এখনও কিভাবে নতুন ইতিহাসের ভিত্তি রচনা করিবার সুযোগ পাইতেছে?

বিশ্বশান্তি আলোচনা

বিশ্বশান্তি সম্পর্কিত প্রশ্নটি অতঃপর যুদ্ধ-বন্দী-বিনিময়ের সূত্র ধরিয়া খানিকটা মধ্যলয়ে আসিয়া দাঁড়াই-য়াছে। পানমুনজনে যুদ্ধবিরতি আলোচন বৈঠকে রাষ্ট্র-পুঞ্জের মুখ্য প্রতিনিধি জেনারেল হ্যারিসন স্বদেশ প্রত্যা-বর্তনে অনিচ্ছুক যুদ্ধবন্দী সমস্যার মীমাংসা সংক্রান্ত কম্যুনিস্টদের প্রস্তাব সম্পর্কে বিশদ তথ্য সরবরাহ করিতে কম্যুনিস্টদের অনুরোধ জানান। কম্যুনিস্টদের প্রস্তাব অবশ্য তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই। তিনি বলেন যে, তাঁহার প্রস্তাবিত একটি নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পরিবর্তে পাঁচটি নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের হেফাজতে যুদ্ধবন্দীদের রাখার প্রস্তাবে সমগ্র সমস্যা জটিলতর হইয়াছে। লণ্ডনের এক সংবাদে প্রকাশ, বৃহৎ পঞ্চশক্তির মধ্যে শান্তিচুক্তি সম্পাদনের যে অনুরোধ রাশিয়া জানাইয়াছে, পশ্চিমী রাজনৈতিক মহল 'পুরাতনের পুনরাবৃত্তি' বলিয়া উহার প্রতি উপেক্ষার ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন।

মঃ মলোটভের লিখিত এক লিপিতে বিশ্বশান্তি সংস্থার তিনজন নেতৃস্থানীয় সদস্যের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ

করিয়া বলা হয় যে, সোভিয়েট মনে করে—শান্তিপূর্ণ উপায়ে সর্বপ্রকার বিতর্কমূলক বিষয় ও অমীমাংসিত সমস্যার সমাধান করা যাইতে পারে। সুতরাং বিশ্বশান্তি ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠায় অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত সহযোগিতা করিতে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট সব সময়ই প্রস্তুত আছেন বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। সোভিয়েট সরকারের নির্দেশক্রমেই মঃ মলোটভ এই লিপি ব্যবহার করেন।

জেঃ হ্যারিসন জানিতে চাহেন যে, কমুনিষ্টদের প্রস্তাবে সম্মতি দিলে যুদ্ধবন্দী সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসার তারিখ আরও পিছাইয়া যাইবে কিনা। তাহা ছাড়া নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহ লইয়া গঠিত কমিশনের সিদ্ধান্ত ভোটাধিক্যে গৃহীত হইবে অথবা 'ভিটো' প্রয়োগ করা হইবে কিনা; এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তনে অনিচ্ছুক বন্দীদের বিষয়টি চূড়ান্তভাবে স্থির করার ভার একটি রাজনৈতিক সম্মেলনের উপর দেওয়ার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে কিনা। কমুনিষ্টদের মুখ্য প্রতিনিধি জেনারেল নাম ইল বলেনঃ নিজের দেশের প্রতিনিধিবর্গ প্রকৃত অবস্থা বুঝাইয়া বলিলে সকল বন্দীই স্বদেশে প্রত্যাবর্তনে সম্মত হইবে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও যদি কেহ স্বদেশে প্রত্যাবর্তনে অনিচ্ছুক হয়, তবে তাহাকে কাহারও জিম্মায় অবশ্যই রাখিতে হইবে। অস্ত্র সম্বরণের পরে যে রাজনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে, উহাই এই ধরণের বন্দীদের ভবিষ্যৎ স্থির করিবে।

ইতিপূর্বে কমুনিষ্টরা যে পরিকল্পনা পেশ করে, উহাতে ভারত, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড, পোলাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়াকে লইয়া একটি নিরপেক্ষ কমিশন গঠন করিতে বলা হইয়াছিল। যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদিত হইবার পরেও যাহারা স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে অসম্মত হইবে, এই কমিশন কোরিয়ায় তাহাদের তদারকী করিবে। কিন্তু এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপুঞ্জ-পরিষদ রাজি হন নাই। ইহার পরেও রহিয়াছে রাষ্ট্রপুঞ্জে চীনকে স্বীকার করিয়া লইবার গুরু প্রশ্ন। জেনারেল মরিসন এই বলিয়া প্রশ্ন তুলিয়াছেন যে, এই চীন কোন্ চীন? চিয়াং কাইশেক পরিচালিত চীন না মাও-সে-তুং-এর নয়া গণতান্ত্রিক চীন? এইরূপ একটি প্রশ্নের পিছনে আদৌ কোনো যুক্তি আছে বলিয়া মনে করিবার কিছু নাই। ইহা দ্বারা জল ক্রমেই ঘোলা হইয়া উঠিবে ভিন্ন সমস্যা সমাধান দ্রুততর হইবে না। বিশ্বশান্তি ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠার আগ্রহে সম্প্রতি যে পঞ্চশক্তি শান্তি-আলোচনার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে—তাহাতে সর্বাগ্রে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন রাশিয়া ও নয়াগণতান্ত্রিক চীন। মিঃ চার্চিল রাশিয়ায়

গিয়া আলোচনায় যোগদান করিতে সম্মত হইয়াছে
এই জাতীয় সম্মতি সমাধানের পথ উন্মুক্ত করিবার প
অনুকূল হইলেও শেষ সিদ্ধান্তের পক্ষে যথেষ্ঠ নয়। য
ক্ষণ না পঞ্চশক্তির মিলিত স্বাক্ষরে একথা ঘোষিত হইতে
যে—গত দীর্ঘকালের অন্ধকার অপসারিত হইয়া ন
আলোক দেখা দিয়াছে, নিরস্ত্রীকরণ ও যুদ্ধবন্দী বিনিম
ভিত্তিতে বিভিন্ন জাতির মন হইতে যুদ্ধলিপ্সা চিরত
মুছিয়া গিয়াছে, পৃথিবীব্যাপী শান্তি ও নিরাপত্তা যাহা
অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহার জন্য এখন হইতে এই বৃহত্তর প
শক্তি নিয়মিত কাজ করিয়া যাইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আশ
ও সন্দেহ আদৌ বিদূরিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

প্রসঙ্গতঃ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট জেঃ আইসেনহাওয়
সম্প্রতি শান্তিসম্পর্কিত যে নীতি প্রকাশ করিয়াছেন, তা
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার মতে—মার্কিণ যুক্তরা
যে পথ বাছিয়া লইয়াছে, তাহা কয়েকটি সুস্পষ্ট নীতি
দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়াছে। বিশ্ব-পরিস্থিতিতে এই নীতি
গুলি দ্বারা যুক্তরাষ্ট্র পরিচালিত হয়। নীতিগুলি এ
রূপ, যথা—প্রথমতঃ, পৃথিবীর কোনো জাতিকে শত্রু ম
করা যাইবে না, কারণ শান্তি, মৈত্রী ও ন্যায়বিচার লাভে
আকাঙ্ক্ষা সকল লোকেরই সমান রহিয়াছে। দ্বিতীয়ত
কোন রাষ্ট্র স্থায়ী নিরাপত্তা ও কল্যাণ লাভ করিতে পা
অপর রাষ্ট্রের সহিত সক্রিয় সহযোগিতা করিয়া, তাহাদে
নিকট হইতে পৃথক থাকিয়া নয়। তৃতীয়তঃ, কি ধরণে
সরকার গঠন করা হইবে এবং দেশে কি ধরণের অর্থনৈতি
ব্যবস্থা অনুকরণ করা হইবে, তাহা স্থির করার অধিক
জাতির থাকিবে এবং এই অধিকারের কোন পরিবর্ত
হইবে না। চতুর্থতঃ, কোন রাষ্ট্র যে তাহাদের অবলম্বি
শাসনপদ্ধতি অপর রাষ্ট্রের উপর চাপাইয়া দিবে, তা
সমর্থনযোগ্য নহে; এবং পঞ্চমতঃ, কোন রাষ্ট্রের স্থা
শান্তির আশা অপর রাষ্ট্রসমূহের সহিত সাধু মনোভ
প্রণোদিত বুঝাপড়া ও ন্যায়সঙ্গত সম্পর্কের উপর নির্ভ
করে, অস্ত্র প্রতিযোগিতার মধ্যে নহে।

নীতি হিসাবে বিষয়গুলি হৃদয়গ্রাহী সন্দেহ না
প্রসঙ্গতঃ জেনারেল আইসেনহাওয়ার বলিয়াছেনঃ 'সম
জাতির জন্য ন্যায়সঙ্গত শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আম
পবিত্রতম চুক্তি সম্পাদন করিব, তাহাকে স্বাগত জানাই
এই সব চুক্তি পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনী
সীমাবদ্ধ রাখিবে, গুরুত্বপূর্ণ সমর সম্ভার উৎপাদন সী
বদ্ধ রাখিবে, কেবল শান্তিপূর্ণ লক্ষ্য পূরণের জন্যই এ
সকল জাতির কল্যাণার্থে—পরমাণবিক শক্তির ব্যবহ

র্দিষ্ট করিবে, অন্যান্য ব্যাপক মারণ ক্ষমতাসম্পন্ন অস্ত্রস্ত্র হয় সীমাবদ্ধ থাকিবে, নতুবা নিষিদ্ধ করিবে। এ স্তই কার্যকরী করিবার জন্য পর্যাপ্ত রক্ষাকবচ থাকিবে .হার মধ্যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধীনে কার্যকরী আন্তর্জাতিক যন্ত্রণ ও পরিদর্শন ব্যবস্থা অন্যতম।'

বিষয়গুলির এই পর্যন্তও উত্তম। কিন্তু ইহার পরেরই জেঃ আইসেনহাওয়ার এই বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন কেবল কথার তুফান না ছুটাইয়া সোভিয়েট ইউনিয়ন জ করিতে রাজি আছে কি? সোভিয়েট ইউনিয়ন কি ধীন বিশ্বের সঙ্গে একত্রিত হইয়া এই প্রশ্নগুলির ব দিতে পারেঃ কোরিয়ায় সম্মানজনক পন্থায় যুদ্ধবতি ঘটাইয়া, সংযুক্ত কোরিয়ায় স্বাধীন নির্বাচনের স্থা করিয়া, ইন্দোচীন এবং মালয়ে কম্যুনিষ্ট আক্রমণের সান ঘটাইয়া, অস্ট্রিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইয়া, নে বিদেশী সৈন্য থাকিবে না, দখলে রাখার জন্য অর্থ ত হইবে না; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হাজার হাজার ন্দীকে মুক্তি দিয়া, স্বাধীন ও গোপন ব্যালটে নির্বাচিত সরকারসহ স্বাধীন ও অখণ্ড জার্মাণী প্রতিষ্ঠা করিয়া, পূর্ব ইউরোপীয় জাতিগুলি সমেত পৃথিবীর সমস্ত জাতির নিজ নিজ পছন্দমত সরকার গঠনের অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়া, এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধীনে কড়া নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে অস্ত্রশস্ত্র ও সশস্ত্র বাহিনী সীমাবদ্ধ রাখিয়া।—যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘকাল ধরিয়া এই লক্ষ্য পূরণের জন্য কাজ করিয়া আসিতেছে।

ইহার ঐতিহাসিক সত্যতা সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় ইতিহাসবেত্তারাই বলিতে পারিবেন। আমরা বহুবার যেকথা বলিয়াছি, এখানেও তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া বলি যে, অপর পক্ষের সঙ্গে রেশারেশি করিয়া কখনও আসল সত্যে উপনীত হওয়া যায় না। যদি জেঃ আইসেনহাওয়ার সর্বৈব যুদ্ধবিরতির পরিচয় দিতে সক্ষম হইতেন, তবে বিভিন্ন জাতি অবশ্যই তাঁহার গঠনমূলক নীতিগুলিকে গ্রহণ করিত। আশা করি অতঃপর প্রাণঃশীলতার পরিচয় দিয়া বিশ্বশান্তিকে জয়যুক্ত করিয়া তুলিয়া তিনি বিশ্ববাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

★

শোক-সংবাদ

বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রীহেমচন্দ্র নাগ

াংলার বিশিষ্ট প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীহেমচন্দ্র নাগ গত এপ্রিল তাঁহার বিডন রো'র বাসভবনে ৭২ বৎসর পরলোকগমন করেন। প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল ধরিয়া সাংবাদিক জগতের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত । প্রথম জীবন হইতেই সাংবাদিকতার দিকে তাঁহার ষ্ঠ নিষ্ঠা দেখা যায়, এবং পরবর্তীকালে ব্যবহারিক ইহাকেই তিনি বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন। স্বদেশীশ্রীঅরবিন্দ, সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ ভারতের মুক্তি আন্দোনেতাদের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ লাভ করিয়া জীবনশেষভাবে অনুপ্রাণিত হন। তাহাতে সহজেই তিনি তক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া রাজনীতিকরূপে নিজের ক গড়িয়া তুলিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া সেই দুর্লভ অনুপ্রেরণার প্লাবনধারা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে প্রবাহিত করিলেন।

ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার নাগরপুর থানার অন্তর্গত আকুটিয়া গ্রামে হেমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রামচন্দ্র নাগ মুক্তাগাছা জমিদারের নায়েব ছিলেন। শিশুকালে পিতৃহীন হইয়া মাতামহ কালীশঙ্কর গুহের গৃহে হেমচন্দ্র প্রতিপালিত হইতে থাকেন। কালীশঙ্কর ময়মনসিংহের সুপ্রসিদ্ধ আইনজীবী ও স্বদেশী আন্দোলনের নেতা ছিলেন। ময়মনসিংহে সরকারী বিদ্যালয়ে পাঠকালে হেমচন্দ্র মেধাবী ছাত্ররূপে শিক্ষকগণের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। ১৯০০ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ঢাকা কলেজে ভর্তি হন এবং সেখান হইতে

কৃতিত্বের সহিত আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কটকের র‍্যাভেনশ কলেজে ভর্তি হইয়া ১৯০৫ সালে বি-এ পাশ করেন। বি-এ পাশ করিয়াই তিনি সাংবাদিকজীবনে প্রবেশ

শ্রীহেমচন্দ্র নাগ

করেন। মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার 'নবযুগ' পত্রিকার সহ-সম্পাদক রূপে তিনি প্রথম কাজ আরম্ভ করেন। 'নবযুগ' তখন স্বদেশী আন্দোলন ও প্রগতিশীল কংগ্রেসী দলের চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীদের মুখপত্র। পরে ঢাকায় দীনবন্ধু সেন প্রতিষ্ঠিত 'ইষ্ট বেঙ্গল হেরল্ড' পত্রিকার সহ-সম্পাদক রূপে তিনি কার্য করেন এবং কিছুকাল পর এই পত্রিকা ত্যাগ করিয়া 'চব্বিশ পরগণা বার্তাবহের' সম্পাদনা ভার গ্রহণ করেন। ইহার পর তাঁহার জীবনের মোড় ঘুরিয়া গেল। পৃথ্বীশচন্দ্র রায়চৌধুরীর সহিত তিনি 'ইণ্ডিয়ান ওয়ার্ল্ড' পত্রিকার যুগ্মসম্পাদকের ভার গ্রহণ করিলেন। পৃথ্বীশচন্দ্র তরুণ হেমচন্দ্রকে নানাভাবে সাহায্য করিতে লাগিলেন। অতঃপর 'ইণ্ডিয়ান ওয়ার্ল্ড' হইতে তিনি আসিয়া সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় সহ-সম্পাদকরূপে যোগদান করেন। অতঃপর 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকার সহ-সম্পাদক হন। ইহার পর শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের সহিত তিনি 'ইংরেজি বসুমতী' পত্রিকা সম্পাদ করেন। ইহার অব্যবহিত কিছুকাল পর 'লিবার্টি' পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে উহার সম্পাদকরূপে নিয়োগ করেন 'লিবার্টি' দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রতিষ্ঠিত 'ফরোয়ার্ড' পা কারই পরবর্তী রূপ। এইভাবে তাঁহার সম্পাদনা কা অগ্রসর হইতে থাকে। ১৯৩৭ সালে আনন্দবাজার পত্রি লিমিটেড হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকা প্রকাশ করিলে হে চন্দ্র উহাতে সহ-সম্পাদকরূপে যোগদান করেন এবং ক্রম ন্বয়ে তিনি উক্ত পত্রের সম্পাদক হন। মৃত্যুকাল পর্য তিনি উক্তপত্রের সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিশে ধর্মভীরু লোক ছিলেন হেমচন্দ্র। রামকৃষ্ণ মিশনের স্বা বিরজানন্দের নিকট তিনি দীক্ষা লইয়াছিলেন। জীব কখনও তিনি সংশয় রাখিয়া চলেন নাই। যদিও পরিণ বয়সেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, তথাপি বাংলার সাংবাদি ক্ষেত্রে তাঁহার অভাব শীঘ্র পূরণ হইবার নয়। আ তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

শ্রী আর. কে. ষন্মুখম চেট্টি

গত ৫ই মে ভারত সরকারের ভূতপূর্ব অর্থম শ্রী আর কে ষন্মুখম চেট্টি মাত্র ৬১ বৎসর বয়সে পরলো গমন করিয়াছেন। ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে তাঁ ব্যুৎপত্তি ছিল অনন্যসাধারণ। ১৮৯২ সালের অক্টোবর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে মা ক্রিশ্চিয়ান কলেজে তাঁহার শিক্ষালাভ হয়। ১৯২০ স শ্রীষন্মুখম চেট্টি মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বা হন। ১৯২৩ সাল হইতে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত তিনি ভার ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯২৬ সালের সেপ্ট মাসে শ্রীষন্মুখম চেট্টি এম্পায়ার পার্লামেন্টারী সিয়েশনে ভারতীয় প্রতিনিধিরূপে অষ্ট্রেলিয়া গমন ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেসী দলের তিনি চীফ ছিলেন। ১৯৩১ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি ভা ব্যবস্থা পরিষদের ডেপুটি প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হন। ১ সালের এপ্রিল মাসে ভারতীয় মালিকদের প্রধান প্রতি রূপে তিনি জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে যো করেন এবং জুলাই-আগষ্ট মাসে অটোয়ায় সাম্রাজ্যিক সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৩৩ সালের মাসে শ্রীষন্মুখম চেট্টি ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভাপ নির্বাচিত হন এবং 'নাইট' উপাধি লাভ করেন (পরে ১৯ সালে তিনি উক্ত উপাধি ত্যাগ করেন)। ১৯৩৮ সা

…বর মাসে জেনেভায় রাষ্ট্রসংঘের অধিবেশনে তিনি …তের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন। ১৯৩৫ সাল … ১৯৪১ সাল পর্যন্ত শ্রীষন্মুখম চেট্টি কোচিনের …ন ছিলেন এবং ১৯৪১-৪২ সালে আমেরিকায় ভারত- …রের ক্রয় মিশনের প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন। ১৯৪৪ … বিশ্ব-অর্থনৈতিক সম্মেলনে তিনি ভারতের প্রতি- … করেন। ১৯৪৫ সালে তিনি রাজন্যসভার চ্যান্সে- …য়ে শাসনতান্ত্রিক উপদেষ্টা ছিলেন এবং উক্ত সালেরই …ার মাসে ভারতীয় শুল্কবোর্ডের সভাপতি হন। …৭ সালের আগষ্ট মাসে শ্রীষন্মুখম চেট্টি ভারতের …ন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং ১৯৪৮ সালের আগষ্ট মাসে …র তদন্ত কমিশন সংক্রান্ত ঘটনা সম্পর্কে উক্ত অর্থ- …র পদ ত্যাগ করেন। অর্থনীতিবিদ হিসাবে তিনি …ষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোকগত …যেখ কল্যাণ হউক, এই কামনা করি।

শ্রী এস্‌. পি. বসু

১লা মে শ্রী এস্‌, পি, বসু হঠাৎ পরলোকগমন …য়াছেন জানিয়া আমরা মর্মাহত হইলাম।

শ্রীযুক্ত বসু ১৮৯৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। এখানকার শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি লণ্ডনে যান এবং স্থানীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে বি-কম ডিগ্রী লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যা-বর্তনের পরে ১৯২৩ সালে স্যার রাজেন্দ্রনাথের—মার্টিন এণ্ড কোম্পানীতে তাঁহার কর্মজীবন আরম্ভ হয়। ১৯৩৪ সালে তিনি ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান লাইফ ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর ম্যানেজারের পদে অধিষ্ঠিত হ'ন এবং ১৯৪২ সালে উক্ত কোম্পানীর ডিরেক্টারের গুরুদায়িত্ব তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়। ১৯৪৬ এবং ১৯৪৭ সালে তিনি ইণ্ডিয়ান লাইফ অফিস এসোসিয়েশনের ডেপুটী প্রেসিডেণ্ট ছিলেন এবং ১৯৪৭ সালে তিনি উক্ত সংস্থার প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হ'ন।

যে কেহ তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছে—সেই তাঁহার শিষ্ট, অমায়িক এবং সহজ সরল ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতের বীমাজগতের যে স্থান শূন্য হইল তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে।

আমরা তাঁহার স্বর্গত আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

আষাঢ় নববর্ষ সংখ্যা বঙ্গশ্রী

আগামী আষাঢ় সংখ্যা হইতে বঙ্গশ্রীর একবিংশ বর্ষ আরম্ভ। এতদুপলক্ষে উক্ত সংখ্যা বঙ্গশ্রী বাংলার প্রতিভাবান লেখকদের সুনির্বাচিত রচনায় সমৃদ্ধ হইয়া বিশেষ নববর্ষসংখ্যারূপে আত্ম-প্রকাশ করিবে। মূল্য যথারীতি একই থাকিবে।

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস্‌ লিমিটেড
৯০, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-১৪ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বঙ্গশ্রী

★ *সংস্কৃতিমূলক শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্র* ★

বঙ্গ-ভারতীর নবীন ও প্রবীন চিন্তানায়কদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনায় সমৃদ্ধ হইয়া প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে আত্মপ্রকাশ করে। রসানুভূতির সঙ্গে জ্ঞানানুভূতির একত্র সমন্বয় বঙ্গশ্রীর অন্যতম বৈশিষ্ঠ্য।

আষাঢ় হইতে বর্ষারম্ভ। সম্প্রতি বিংশবর্ষ চলিতেছে। বৎসরের যে কোনো মাস হইতে গ্রাহক হওয়া চলে। বার্ষিক মূল্য ৮।০ মাত্র, প্রতি সংখ্যা ৸০ আনা। কোনো বিশেষ সংখ্যার জন্যই গ্রাহকগণকে অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয়না।

ভারতীয় সংস্কৃতি তথা বর্ত্তমান বিশ্বের চিন্তাধারার সঙ্গে সংযোগ রাখিতে হইলে বঙ্গশ্রী-পাঠ একান্ত অপরিহার্য্য।

সারা ভারত, পাকিস্থান ও সুদূর ব্রহ্মে বহুল প্রচারিত বঙ্গশ্রীতে বিজ্ঞাপন দিয়া ব্যবসায়ী মাত্রেই লাভবান হন। এজেন্টগণকে উচ্চ-হারে কমিশন দেওয়া হয়।

কার্য্যালয়

* ৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা—১৩ *

াট বই, মোট ব'য়ে চলি মোরা হর্দ্দম,
াক্ ঝোপ জঙ্গল থাক্ পথে কর্দ্দম,
হেঁটে চলি দুর্দ্দম।

শিল্পী
শ্রীসরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়